উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

মাঘ ১৩৯২

৮৮তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা
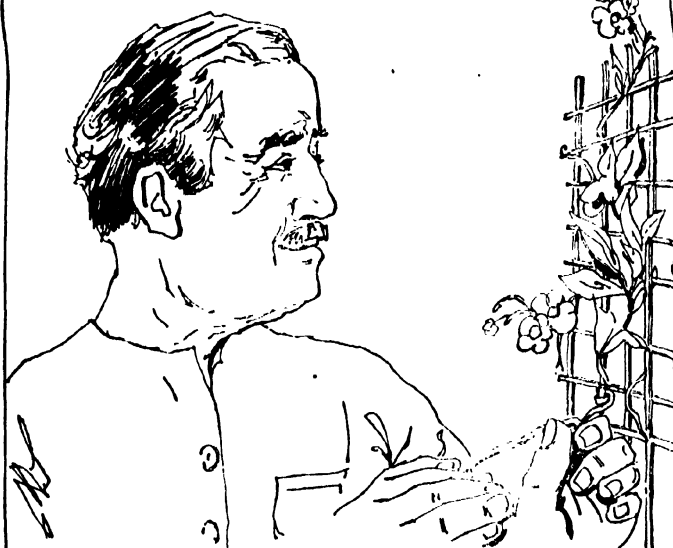
৮৮তম বর্ষ

(মাঘ, ১৩৯২ হইতে পৌষ, ১৩৯৩ ; ইংরেজী : ১৯৮৬)

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'

সম্পাদক

স্বামী নির্জরানন্দ

সংযুক্ত সম্পাদক

স্বামী প্রমেয়ানন্দ
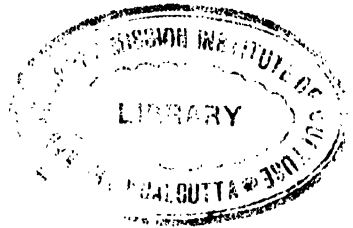
উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

বার্ষিক মূল্য ২৫'০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ২'৫০ টাকা

উদ্বোধন—বর্ষসূচী

৮৮তম বর্ষ

(মাঘ, ১৩৯২ হইতে পৌষ, ১৩৯৩)

৮০/৬ গ্রে-স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী নির্জরানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত এবং ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩ হইতে প্রকাশিত।

যুব সংখ্যা

(চৈত্র, ১৩৯২)

প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ: ৭ এপ্রিল, ১৯৮৬

যুবচেতন-মানসে বর্তমান যুগের নানা সমস্যাবলী প্রসঙ্গে যাঁদের লেখায় ও কথায় সমৃদ্ধ হবে:

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
স্বামী গম্ভীরানন্দ
স্বামী ভূতেশানন্দ
স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ
স্বামী আত্মস্থানন্দ
স্বামী প্রভানন্দ
এ. এল. ব্যাসম
ডঃ রাজা রামন্না
শঙ্করীপ্রসাদ বসু
শিবশঙ্কর চক্রবর্তী
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

প্রভৃতি আরও অনেকে।

অঙ্গ-সজ্জা ও অলঙ্করণে থাকবে:

সম্প্রতি বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় যুবসম্মেলনের বেশ কিছু আলোকচিত্র।

মূল্য: চার টাকা

[**উদ্বোধনের গ্রাহক-গ্রাহিকাকে মূল্য দিতে হবে না।**]

গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ নিজের কপি ছাড়া অতিরিক্ত কপি তিন টাকায় পাবেন।

পুস্তক বিক্রেতা এবং এজেন্টগণ এই বিশেষ সংখ্যার জন্য উদ্বোধন কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। সীমিত কপি ছাপা হচ্ছে।

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

●● **লেখক-লেখিকাগণের জন্য :** ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক অপ্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। ডট্ পেনে লেখা বা কার্বন কাগজে লেখা প্রবন্ধাদি গ্রাহ্য হইবে না। রচনার নকল রাখিয়া পাঠাইবেন।

আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখায় প্রকাশিত মতামতের জন্য সম্পাদকের দায়িত্ব থাকিবে না।

উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আকরের যথাযথ নির্দেশ থাকা প্রয়োজন। যে পুস্তক হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার নাম, গ্রন্থকারের নাম, প্রকাশকের নাম-ঠিকানা, প্রকাশন-বর্ষ, সংস্করণ সংখ্যা ইত্যাদির নির্ভুল উল্লেখ একান্ত আবশ্যক।

অমনোনীত রচনা ফেরত পাইতে হইলে রেজেস্টারি ডাকের উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক। কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না।

পত্রের উত্তরের জন্য ২৫ পয়সার ডাকটিকিট বা ঠিকানা সম্বলিত খাম / কার্ড পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠি-পত্র, সংযুক্ত সম্পাদক অথবা সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। চিঠি-পত্র বাংলায় লেখা বাঞ্ছনীয়।

প্রবন্ধাদির মধ্যে যদি ইংরেজী ভাষায় কোন উদ্ধৃতি থাকে, তাহা হইলে লেখক যেন উহার বাংলা অনুবাদ প্রবন্ধের মধ্যে সন্নিবেশিত করেন।

●● **গ্রাহকগণের জন্য :** মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হওয়া যায়। বৎসরের যে-কোন সময়ে বার্ষিক চাঁদা গৃহীত হইলেও গ্রাহক করা হইবে মাঘ মাস হইতে। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৫·০০ টাকা, বাংলাদেশ ৪৩·০০ টাকা, ভারতের বাহিরে হইলে সি মেল-এ ৮৮·০০ টাকা, এয়ার মেল-এ ২৩৩·০০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ২·৫০ টাকা।

●● **আজীবন গ্রাহকগণের জন্য :** এককালীন অথবা ১২ মাসের মধ্যে সুবিধানুযায়ী একাধিক কিস্তিতে ৪০০·০০ (চারশত) টাকা পাঠাইলে আজীবন গ্রাহক (৩০ বৎসরান্তে পুনরায় নবীকরণ সাপেক্ষ) হওয়া যায়। প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৪০·০০ টাকা দিতে হইবে। যে কোন মাস হইতে আজীবন গ্রাহক হওয়া চলে।

পরের মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে, অবিলম্বে কার্যালয়ে জানাইলে পুনরায় ঐ সংখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পরবর্তী মাসের মধ্যে না জানাইলে, পত্রিকা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকিবে না।

উদ্বোধনের চাঁদা মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।

●● **কার্যালয়ের সময় :** সকাল ৯-৩০ থেকে বিকাল ৫-৩০

শনিবার সকাল ৯-৩০ থেকে দুপুর ১-৩০

রবিবার বন্ধ।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, পত্রাদি লিখিবার সময় তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের গ্রাহক-সংখ্যা অবশ্যই উল্লেখ করেন। অন্যথায় কাজের অসুবিধা হয় এবং অযথা বিলম্ব হইবার আশঙ্কা থাকে।

ঠিকানার পরিবর্তন হইলে অন্ততঃ একমাস পূর্বে নূতন ঠিকানা কার্যালয়ে জানাইতে হইবে। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার কালে গ্রাহক-সংখ্যা এবং পূর্ব ঠিকানা অবশ্যই উল্লেখ করিবেন।

নমুনা সংখ্যার জন্য ২·৭৫ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়।

মনিঅর্ডারযোগে অথবা ডিম্যাণ্ড ড্রাফট্ মাধ্যমে টাকা প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয়। "UDBODHAN OFFICE" এই নামে ড্রাফট্ করিতে হইবে।

●● **প্রকাশকদিগের জন্য :** সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

●● **বিজ্ঞাপনদাতাদিগের জন্য :** কার্যালয়ে যোগাযোগ করিলে বিজ্ঞাপনের হার জানা যাইবে।

কার্যাধ্যক্ষ

উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন

কলিকাতা-৭০০ ০০৩

উদ্বোধন : মাঘ ১৩৯২

সূচীপত্র

॥ প্রচ্ছদ-পরিচিতি ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে গলরোগে আক্রান্ত হলে ডাক্তারের পরামর্শে, ভক্তগণ তাঁকে দক্ষিণেশ্বর থেকে প্রথমে শ্যামপুকুরে এবং পরে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে নিয়ে আসেন। আটমাসেরও কিছু অধিককাল এখানে তিনি মধুর লীলাবিলাসের পর মহাসমাধি লাভ করেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবান্দোলনের সূত্রপাত হয় নানা ঘটনার মাধ্যমে এখানেই। শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র স্মৃতি এবং ভাবান্দোলনের নানা ঐতিহাসিক ঘটনা বিজড়িত কাশীপুর উদ্যানবাটীই প্রচ্ছদ-মুদ্রণ।

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

[উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন]

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

কর্মযোগ ৬·০০
ভক্তিযোগ ৪·০০
ভক্তি-রহস্য ৫·০০
জ্ঞানযোগ ১৪·০০
রাজযোগ ১০·০০
সরল রাজযোগ ১·৮০
সন্ন্যাসীর গীতি ০·৮০
ঈশদূত যীশুখৃষ্ট ১·০০
পত্রাবলী। (সমগ্র পত্র একত্রে, নির্দেশিকাদি সহ)
রেক্সিন বাঁধাই ৩০·০০
পওহারী বাবা ১·২৫
স্বামীজীর আহ্বান ১·২৫
বাণী-সঞ্চয়ন ১২·০০
জাগো, যুবশক্তি ৫·০০
ধর্ম-সমীক্ষা ৪·০০
ধর্মবিজ্ঞান ৫·৫০
বেদান্তের আলোকে ৪·৫০
কথোপকথন ৫·০০
ভারতে বিবেকানন্দ ২০·০০
দেববাণী ৮·০০
মদীয় আচার্যদেব ২·৫০
চিকাগো বক্তৃতা ২·২১
মহাপুরুষপ্রসঙ্গ ১২·০০
ভারতীয় নারী ৫·০০
ভারতের পুনর্গঠন ২·৫০
শিক্ষা (অনূদিত) ৪·২০
শিক্ষাপ্রসঙ্গ ৮·০০

স্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচনা

পরিব্রাজক ৪·২৫
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ৫·০০
ভাববার কথা ২·৩০
বর্তমান ভারত ২·৫০

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণ। প্রতি খণ্ড—২৫ টাকা। সম্পূর্ণ সেট ২৫০ টাকা
সাধারণ বাঁধাই সুলভ সংস্করণ। প্রতি খণ্ড—১৭·৫০ টাকা। সম্পূর্ণ সেট ১৭৫ টাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

স্বামী সারদানন্দ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (দুই ভাগে)
রেক্সিন-বাঁধাই। ১ম ভাগ ৩৫·০০, ২য় ভাগ ৩·০০
সাধারণ (পাঁচ খণ্ডে)
১ম খণ্ড ৬·০০, ২য় খণ্ড ১৩·৫০, ৩য় খণ্ড ৯·৫০,
৪র্থ খণ্ড ৯·৫০, ৫ম খণ্ড ১৪·৫০

অক্ষয়কুমার সেন
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি ৪৫·০০
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা ৫·৫০

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংকলিত
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ
সাধারণ বাঁধাই ৩·০০, বোর্ড ৩·৫০

স্বামী ভূতেশানন্দ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ (তিন ভাগে)

স্বামী প্রেমঘনানন্দ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প ৫·০০

শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ১·৫০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র) ৫·৫০

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বাণী ·৭৫

স্বামী তেজসানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী ৯·০০

স্বামী নির্বেদানন্দ
(অনুবাদ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)
শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ ১২·৫০

স্বামী প্রভানন্দ

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা (দুই ভাগে)
১ম ভাগ ১৫·০০, ২য় ভাগ ১৫·০০
স্বামী গম্ভীরানন্দ
শ্রীমা সারদাদেবী ২৭·০০
স্বামী সারদেশানন্দ
শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা ১০·০০
স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
শিশুদের মা সারদাদেবী (সচিত্র) ৭·০০
স্বামী ঈশানানন্দ
মাতৃসান্নিধ্যে ৯·৫০

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

স্বামী গম্ভীরানন্দ
যুগনায়ক বিবেকানন্দ (তিন খণ্ডে)
১ম খণ্ড ৩০·০০, ২য় খণ্ড ১৬·০০,
৩য় খণ্ড ১৮·০০
ভগিনী নিবেদিতা (অনুবাদ। স্বামী মাধবানন্দ)
স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি ১৬·০০
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ১০·০০
স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
স্বামী বিবেকানন্দ ৫·০০
শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র) ৫·৫০
স্বামী নিরাময়ানন্দ
ছোটদের বিবেকানন্দ ২·৫০
শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য
স্বামী বিবেকানন্দ ২·৫০
স্বামী বুধানন্দ
ওঠ, জাগো, এগিয়ে চল ৪·২৫
ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর ১·৫০
স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা ৩·৫০
ভগিনী নিবেদিতা
স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ৫·০০
প্রমথনাথ বসু
স্বামী বিবেকানন্দ
১ম খণ্ড ২০·০০, ২য় খণ্ড ২০·০০

বিবিধ

মহাপুরুষজীর পত্রাবলী ৭·৫০
স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র ৭·৮০
স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী ৪·৫০
আরতি-স্তব ও রামনাম ১·২৫
ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ৬·০০
স্বামী গম্ভীরানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা (দুই ভাগে)
১ম ভাগ ২০·০০, ২য় ভাগ ১৫·০০
স্বামী সারদানন্দ
ভারতে শক্তিপূজা ৩·২৫
গোপালের মা ২·২৫
গীতাতত্ত্ব ৭·০০
পত্রমালা ৪·০০
বিবিধ-প্রসঙ্গ ৩·৫০
স্বামী অখণ্ডানন্দ
তিব্বতের পথে হিমালয়ে ৬·৫০
স্মৃতি-কথা ১০·০০
শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ
শ্রীরামানুজ চরিত ১৭·৫০
স্বামী প্রেমেশানন্দ
রামানুজ চরিত ৩·৫০
ভগিনী নিবেদিতা
শিব ও বুদ্ধ ৩·৭৫
স্বামী অপূর্বানন্দ
আচার্য শঙ্কর ৮·০০
শিবানন্দ-বাণী (সঙ্কলিত)
১ম ভাগ ৯·০০, ২য় ভাগ ৫·০০
শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য
শঙ্কর-চরিত ৩·০০
দশাবতার চরিত ৩·৭৫
স্বামী দিব্যাত্মানন্দ
দিব্যপ্রসঙ্গে ৬·৩৫
স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ
পুণ্যস্মৃতি ৩·০০
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ
অতীতের স্মৃতি ২০·০০

৮৮তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। মাঘ, ১৩৯২

দিব্য বাণী

'উদ্বোধনে' সাধারণকে কেবল Positive ideas (গঠনমূলক ভাব) দিতে হবে। Negative thought (নেতি-বাচক ভাব) মানুষকে weak (দুর্বল) ক'রে দেয়। দেখছিস না, যে-সকল মা বাপ ছেলেদের দিনরাত লেখাপড়ার জন্য তাড়া দেয়, বলে 'এটার কিছু হবে না—বোকা, গাধা', তাদের ছেলেগুলি অনেকস্থলে তাই হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেদের ভাল বললে—উৎসাহ দিলে সময়ে নিশ্চয় ভাল হয়। ছেলেদের পক্ষে যা নিয়ম, children in the region of higher thoughts (ভাব-রাজ্যের উচ্চ স্তরে যারা শিশু, তাদের) সম্বন্ধেও তাই। Positive ideas (গঠন-মূলক ভাবগুলি) দিতে পারলে সাধারণে মানুষ হয়ে উঠবে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্প সকল বিষয়ে যা চিন্তা ও চেষ্টা মানুষ করছে, তাতে ভুল না দেখিয়ে ঐ-সব বিষয় কেমন ক'রে ক্রমে ক্রমে আরও ভাল রকমে করতে পারবে, তাই ব'লে দিতে হবে। ভ্রমপ্রমাদ দেখালে মানুষের feeling wounded (মনে আঘাত দেওয়া) হয়। ঠাকুরকে দেখেছি—যাদের আমরা হেয় মনে করতুম্, তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতি-গতি ফিরিয়ে দিতেন। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার রকমটা অদ্ভুত !

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৭৬]

কথাপ্রসঙ্গে

'উদ্বোধন'-এর নববর্ষ

'উদ্বোধন'-এর নববর্ষের সূচনায় আমরা ভক্তি-বিনম্রচিত্তে স্মরণ করি যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দকে। তাঁহার জীবনসেবাব্রতরূপ কর্মযজ্ঞের বহুমুখী পরিকল্পনার অন্যতম এই পত্রিকা প্রকাশ। সসম্ভ্রম শ্রদ্ধা নিবেদন করি উদ্বোধনের প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীকে। তাঁহার অপরিসীম উদ্যম, অক্লান্ত পরিশ্রম ও দুরতিক্রম্য বাধা-বিঘ্নের উল্লঙ্ঘন-সামর্থ্য স্বামীজীর পত্রিকা-প্রকাশের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছিল। সভক্তি প্রণতি জানাই পরবর্তিকালের অন্যতম সম্পাদক স্বামী সারদানন্দজীকে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য পার্ষদদের। তাঁহাদের লেখায় উদ্বোধন সমৃদ্ধ এবং উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা উদ্বোধনের চলার পথের আলোক-বর্তিকা। এই-সঙ্গে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই উদ্বোধনের লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং পত্রিকা-সংশ্লিষ্ট শুভানুধ্যায়ী অন্যান্য সকলকে। আমাদের আশা এবং বিশ্বাস, উদ্বোধনের ঐতিহ্য বজায় রাখিতে অতীতের ন্যায় এই বৎসর এবং ভবিষ্যতেও তাঁহাদের নিকট হইতে অনুরূপ সহযোগিতা আমরা লাভ করিব।

পরম মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় সফলতার সঙ্গে আরও একটি বৎসর অতিক্রম করিয়া উদ্বোধন ৮৮তম বর্ষে পদার্পণ করিল। অর্থাৎ, উদ্বোধনের বয়স এখন ৮৮ বৎসর। স্বামীজী এক সময় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ভাব পনেরশত বৎসর চলিবে। পনেরশত বৎসর-পরিকল্পনার মাপ-কাঠিতে উদ্বোধনের এখনও শৈশব অবস্থা উত্তীর্ণ হয় নাই। শৈশব উত্তীর্ণ না হইলেও আমাদের দেশে কোন একটি পত্রিকার পক্ষে সুদীর্ঘ ৮৮ বৎসর বাঁচিয়া থাকা কম বিস্ময়ের কথা নহে। বহু পত্র-পত্রিকারই এই বয়স লাভ করিবার সৌভাগ্য হয় না। শৈশব অবস্থাতেই উদ্বোধন স্বকীয় মহিমায় যেভাবে মাটিতে দৃঢ়মূল বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার অন্যতম বিশিষ্ট প্রচার-মাধ্যম হইয়া যে উহা দেশের ও দশের কল্যাণসাধনে সুদীর্ঘকাল নিয়োজিত থাকিবে—এ-বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিগত বর্ষটি একটি সাধারণ বর্ষ ছিল না। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ঘোষণায় বর্ষটি ছিল বিশ্ব-যুববর্ষ। এই ঘোষণায় বিশ্বের যুবশক্তির স্বীকৃতিই সূচিত হইয়াছে। আমাদের জাতীয় সরকার বর্ষটির সঙ্গে স্বামীজীর নাম যুক্ত করিয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। জাতীয় সরকার যুববর্ষের সূচনা ঘোষণা করিয়াছেন স্বামীজীর শুভ আবির্ভাব দিবস ১২ জানুআরি হইতে। আরও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, প্রতি বৎসর এই তারিখটি 'জাতীয় যুবদিবস' হিসাবে দেশের সর্বত্র প্রতিপালিত হইবে। বিবেকানন্দ-অনুরাগী যুবক-যুবতীদের নিকট ইহা অপেক্ষা আনন্দের সংবাদ আর কী হইতে পারে?

বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচীর মাধ্যমে জাতীয় যুব-বর্ষটি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। তবে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের মনে রাখিতে হইবে যে স্বামীজীর জীবনাদর্শ দেশের যুবকদের নিক

পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং তদনুযায়ী জীবন ও দেশ-গঠনের কাজে যুবকদের অনুপ্রাণিত করা এইসব অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বামীজীর নিকট প্রার্থনা—তিনি আমাদের সকলকে সেই শক্তি ও অনুপ্রেরণা দিন।

স্বামীজীর বাণী-চিন্তন

আমরা বলিয়া থাকি এবং বিশ্বাসও করি যে, স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের নৈরাশ্য-আচ্ছন্ন দুঃখ-দৈন্য-দুর্দশাক্লিষ্ট মৃতপ্রায় জাতীয়জীবনে নূতন করিয়া প্রাণসঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার কশাঘাত-সদৃশ তেজোদীপ্ত কঠোর বাণীর আঘাতে আমাদের ঘোর তামসিকতার মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের জাতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ, দেশের সার্বিক উন্নতির অগ্রদূত। তাঁহার বিশ্বজনীন উদার বাণীর প্রচারের ফলে বিশ্বসভায় ভারতবর্ষের মহিমা ও গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতীতের আদর্শ ও বর্তমানের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিয়া নূতনভাবে দেশ ও জাতীয় জীবন গঠন করিবার উদ্‌যোগ ইত্যাদির মূলে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে নানা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার জীবনী ও বাণী লইয়া বক্তৃতা ও আলোচনাদিও হইতেছে। ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণাময় জীবন এবং তাঁহার প্রাণদ ও বরদ বাণীর আলোচনা যত বেশি হয় ততই আমাদের মঙ্গল।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত বাণী কি—তাহা লইয়া সাধারণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। মহাপুরুষদের বাণী সম্বন্ধে মতদ্বৈধের ফলে, তাঁহাদের বাণীর বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যার সৃষ্টি হইয়াছে। বুদ্ধের বাণী, যীশুখ্রীষ্টের বাণীর কত রকম ব্যাখ্যাই না হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ-বাণী গীতার কত রকমের ব্যাখ্যা, ভাষ্য, টীকা ইত্যাদি আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। স্বামীজীর বাণী সম্বন্ধেও ঐরূপ।

স্বামীজীর প্রকৃত বাণী কি—তাহা বিচার করিতে যাইয়া তাঁহার বাণীর ভিতর হইতে প্রত্যেকেই নিজ প্রয়োজন-অনুযায়ী কথাগুলি বাছিয়া লইয়া সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া, মতদ্বৈধ হওয়ার প্রধান আর-একটি কারণ—স্বামীজী যখন যে-বিষয়ে বলিতেন তাহা এত আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার সহিত বলিতেন যে, শ্রোতাদের মনে হইত ইহাই যেন স্বামীজীর অন্তরের একমাত্র ভাব। তাই স্বভাবতই দেখা যায়: "কেউ তাঁকে দেখেছেন শিক্ষাবিদ্‌রূপে, কেউ দেশপ্রেমিকরূপে, কেউ রাজনীতিজ্ঞরূপে, কেউ সমাজসংস্কারকরূপে, কেউ দার্শনিকরূপে, কেউ ধর্মগুরুরূপে।" শিক্ষাবিদ্‌ মনে করিয়া থাকেন যে, আদর্শ শিক্ষা অর্জনের চেষ্টাই স্বামী বিবেকানন্দের বাণী; দেশপ্রেমিক মনে করেন, আদর্শ দেশপ্রেমিক হওয়ার জন্যই স্বামীজীর বাণী। অনুরূপভাবে রাজনীতিজ্ঞ, সমাজসংস্কারক, দার্শনিক, ধর্ম-মার্গী—সকলেই নিজ প্রয়োজন-অনুযায়ী কথাগুলি স্বামীজীর বাণীর ভিতর হইতে গ্রহণ করিয়া বাণীর মূল্যায়নও সেইরূপ করিয়া থাকেন। ইহা ঠিক যে, প্রকৃত বিবেকানন্দ এই সবই, আবার এই সবের ঊর্ধ্বে আরও কিছু। তাই স্বামীজীর বাণী বিচার করিবার সময় তাঁহার কোন বাণী-বিশেষকে পৃথক্‌ভাবে দেখিয়া বিচার করিলে বাণীর যথার্থ মূল্যায়ন হইবে না। সমগ্রতার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচারের সার্থকতা।

স্বামীজী ছিলেন অতিমানব। অতিমানবের মধ্যে প্রতীয়মান পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন ভাবের সমাবেশ পরিলক্ষিত হইলেও তাহার প্রত্যেকটি ভাবই সত্য। স্বামীজী তাঁহার বক্তৃতা, লেখা,

কথোপকথন ইত্যাদির মাধ্যমে যে-সব কথা বলিয়া গিয়াছেন সেইগুলি সময়োপযোগী, দেশোপযোগী এবং ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজনানুযায়ী। তাঁহার এই সকল বাণী যদি আমরা ভালভাবে পাঠ করি এবং তাহা লইয়া গভীরভাবে চিন্তা করি তাহা হইলে তাঁহার প্রকৃত বাণী কি—তাহা কতকটা ধারণা করিতে সমর্থ হইব। 'কতকটা' বলিতেছি এইজন্য যে, তাঁহার সমগ্র রূপ আমাদের ধারণার অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি নিজেই একবার বলিয়াছিলেন: "যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকত তবে বুঝতে পারত এ বিবেকানন্দ কি করে গেল।"

মানুষের সমস্যা দ্বিবিধ—ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। ব্যবহারিক সাময়িক সমস্যার সমাধান না করিয়া পারমার্থিক চিরন্তন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা—বৃথা শক্তিক্ষয় ছাড়া আর কিছু নয়। আবার ইহাও ঠিক যে, ব্যবহারিক সাময়িক সমস্যার সমাধান এমনভাবে হওয়া উচিত যাহা পারমার্থিক জন্ম-মৃত্যু সমস্যা-সমাধানের অনুকূল হয়। সমস্যা দুইটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়া অন্যটির সমাধান আপাতদৃষ্টিতে যতই সুষ্ঠু বলিয়া মনে হউক না কেন, অচিরেই উহা আপাত-সমাধান বলিয়াই প্রতীত হইবে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্বামীজী ছিলেন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। "তাই তিনি তাঁর আত্মজ্ঞানের দিব্য আলোকে মানুষের ঐহিক সত্তার সকল ক্ষেত্রকে উদ্ভাসিত করে দিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে তাদের এমনভাবে রূপায়িত করেছিলেন যাতে তারা মানবাত্মার বিকাশ এবং মানবজীবনের লক্ষ্য আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বরোপলব্ধির সহায়ক হয়।"

ভারতের অবহেলিত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখিয়া অভিভূত হইয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন: "আমার ব্যক্তিগত জীবনে এক অশেষ দুর্বলতা—ভারতবর্ষের প্রতি আমার গভীর ভালবাসা। উহাকে ছাড়াইয়া আমি উপরে উঠিতে পারি না।" আরও বলিয়াছিলেন: "যে ভগবান ক্ষুধাতুরের মুখে একমুঠো অন্ন দিতে পারে না অথবা মাতৃ-পিতৃ-হীন বালকের দুঃখ দূর করিতে পারে না, সেই ভগবানে আমার কোন প্রয়োজন নাই।" আবার সেই বিবেকানন্দই অন্য এক সময় বলিয়াছিলেন: "আমার পক্ষে ভারতবর্ষই বা কি, আমেরিকাই বা কি? আমি একমাত্র ভগবানের দাস, যাঁহাকে অজ্ঞ লোকেরা 'মানুষ'রূপে ভ্রম করিয়া থাকে।"

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে স্বামীজীর একটি বাণী: দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন, দুঃখ-দারিদ্র্য নিবারণ, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, শিক্ষার বিস্তার এবং সর্বোপরি ভারতের জাতীয়জীবনের মূলমন্ত্র ও প্রাণ আধ্যাত্মিকতাকে প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া সজীব করিয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট হওয়া। পাশ্চাত্যদেশে, যেখানে আর্থিক অনটন নাই, ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব নাই; অভাব আছে উচ্চ-আদর্শের ও শাশ্বত শান্তির, সেখানে বেদান্তের উচ্চ আদর্শের বাণী, প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার বাণী তাহাদিগকে শুনাইতে হইবে। স্বামীজী বলিয়াছেন: "সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ যেন একটি আগ্নেয়গিরির উপর অবস্থিত, কালই ইহা ফাটিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে।" আবার তিনি ইহাও বলিয়াছেন: আধ্যাত্মিকতার বাণী ভারতবর্ষ হইতে প্রচারিত হইয়া সমগ্র জগৎকে শান্তি দান করিবে।

অনেকেই বলিয়া থাকেন—ধর্মই ভারতের অধোগতির একটি প্রধান কারণ। সর্বপ্রকার উন্নতি ও অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। প্রকৃত ধর্ম কি—সে-সম্বন্ধে যাহাদের ধারণা স্বচ্ছ নহে এবং দেশের ইতিহাস সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট ধারণা নাই, তাহারাই যে এইরূপ মন্তব্য করিয়া থাকেন, ইহা

বলা বাহুল্য। লক্ষণীয় যে, যে স্বামীজী একদা বলিয়াছিলেন : "আমাদের আর ধর্ম ? আমাদের 'ছুঁৎমার্গ', খালি 'আমায় ছুঁয়ো না', 'আমায় ছুঁয়ো না'। হে হরি! যে দেশের বড় বড় মাথা-গুলো আজ দুই হাজার বৎসর খালি বিচার করছে, ডান হাতে খাব, কি বাম হাতে ; ডান দিকে জল নেব, কি বাম দিক থেকে নেব।…তাদের অধোগতি হবে না তো কার হবে ?" সেই স্বামীজীই আবার বলিয়াছেন : "একমাত্র ভারতবর্ষ হইতে শান্তির বাণী প্রবাহিত হইয়া জগৎকে রক্ষা করিবে।" স্বামীজীর উপরি-উক্ত দুইটি বাণীকেই গ্রহণ করিতে হইবে। তবেই বাণীর মর্মার্থ বোঝা যাইবে।

তমসাচ্ছন্ন কর্মবিমুখ ভারতবর্ষের জন্য স্বামীজীর অন্য বাণী : চরিত্র গঠন, আত্ম-উদ্ধারের জন্য আত্মবিশ্বাসী হওয়া, জন্ম-মৃত্যু-প্রহেলিকার রহস্যভেদ ও তাহার যথার্থ মীমাংসা।

বালির উপর যেমন কোন সৌধ নির্মাণ করা যায় না, সুদৃঢ় ভিত্তির প্রয়োজন ; মহৎ কাজের সম্বন্ধেও একই নিয়ম। সুদৃঢ় ভিত্তির প্রয়োজন। চরিত্রবলই মহৎ কাজের সুদৃঢ় ভিত্তি। চরিত্রবল না থাকিলে কোন মহৎ কাজ করা সম্ভব নয়। চরিত্রবলহীন লোকের কাজ কখনও দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। আধ্যাত্মিকতার বিকাশে চরিত্র-বলের বিকাশ ঘটে। তাই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক-বোধ জাগরণের চেষ্টা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

স্বামীজীর আর একটি বাণী—আত্মবিশ্বাসের বাণী। তিনি বলিতেন : "প্রাচীন ধর্ম বলিত, 'যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক'। নূতন ধর্ম বলিতেছে, 'যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক'।" "জগতের ইতিহাসে দেখিবে, যে-সকল জাতি নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, শুধু তাহারাই শক্তিশালী ও বীর্যবান হইয়াছে। প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে ইহাও দেখিবে, যে-সকল ব্যক্তি নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারাই শক্তিশালী ও বীর্যবান হইয়াছে।"

স্বামীজীর আত্মবিশ্বাসের বাণী নিম্নতম স্তরের মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম স্তরের মানুষ পর্যন্ত—সকলের ভিতরকার সুপ্ত ব্রহ্মভাব জাগ্রত করিবার বাণী। তাঁহার তেজোদীপ্ত "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—বাণী একবার কর্ণে স্পন্দিত হইলে মৃত ব্যক্তির শরীরেও যেন প্রাণসঞ্চার হয়, সে জাগিয়া উঠে। মানুষের আত্মবিশ্বাস জাগিয়া উঠিলে তাহার জীবনের আমূল পরিবর্তন কি ভাবে সাধিত হয়, স্বামীজী নিজেই তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি বলিতেন : "নিউইয়র্কে দেখিতাম, **Irish Colonists** (আইরিশ ঔপনিবেশিকগণ) আসিতেছে—ইংরেজ-পদ-নিপীড়িত, বিগতশ্রী, হৃতসর্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ—সম্বল একটি লাঠি ও তার অগ্র-বিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি। তার চলন সভয়, তার চাউনি সভয়। ছ-মাস পরে আর এক দৃশ্য—সে সোজা হয়ে চলছে, তার বেশ-ভূষা বদলে গেছে ; তার চাউনিতে, তার চলনে আর সে 'ভয় ভয়' ভাব নাই। কেন এমন হল ? আমার বেদান্ত বলছেন যে, ঐ **Irishman**কে তাহার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল—সমস্ত প্রকৃতি একবাক্যে বলেছিল, 'প্যাট্ (**Pat**), তোর আর আশা নাই, তুই জন্মেছিস গোলাম, থাকবি গোলাম।' আজন্ম শুনিতে শুনিতে প্যাট্-এর তাই বিশ্বাস হল, নিজেকে প্যাট্ হিপনটাইজ (সম্মোহিত) করলে যে, সে অতি নীচ ; তার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামিবামাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠল—'প্যাট্, তুইও মানুষ, আমরাও মানুষ, মানুষেই তো সব করেছে, তোর আমার মতো মানুষ সব করতে পারে, বুকে সাহস বাঁধ।' প্যাট্ ঘাড় তুললে, দেখলে ঠিক কথাই তো ; ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বললেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' ইত্যাদি।" মানুষের ভিতরকার সুপ্ত এই ব্রহ্মসত্তার জাগরণের বাণী—স্বামীজীর বাণী। স্বামীজীর এই আত্মবিশ্বাসের বাণী আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিফলিত হইলে জাতীয়জীবনে তাহার বিকাশ দেখা যাইবে।

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[১]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Ramakrishna Advaita Ashrama
Laksha, Benaras City
28. 11. 27

মা হরিদাসী,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমরা গত ২২শে মধুপুর হইতে এখানে আসিয়াছি এবং ঠাকুরের কৃপায় ভালই আছি। ইচ্ছা আছে মাস খানেক দেড় এখানে থাকিব। তাহার পর ঠাকুর যাহা করেন তাহাই হইবে।

মা তুমি নিজেকে অত ক্ষুদ্র মনে করিতেছ কেন? ঠাকুরের যখন আশ্রয় পাইয়াছ তখন তোমার কোন ভাবনাই নাই। তিনিই তোমার মন বশীভূত করিয়া দিবেন। তোমার হৃদয়, ভক্তি, বিশ্বাস ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। শৈলেশকে দেখিতেছ,—ঠিক তাকে আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া ঠাকুরের নাম ধরিয়া চলিতে থাক—দেখিবে ঠাকুর তোমার কত আপনজন—তোমার সমস্ত কষ্ট ও দুঃখ দূর করিয়া দিতেছেন—। তোমার জীবনের সার্থকতা কোথায় তাহা তুমি কি জান? আমরা জানি তোমার দ্বারা জগতের বহু কল্যাণ হইবে। আমাদের কাছে আসিয়াছ, আমরা তোমায় আশীর্ব্বাদ করিতেছি—তাহা ঠাকুরের ইচ্ছায় কখনও বিফল হইবে না। তুমি নিশ্চয়ই ঠাকুরের কৃপা লাভ করিবে। অধিক আর কি লিখিব। ঠাকুর তোমার ভক্তি বিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন। তুমি তাঁতে তন্ময় হইয়া যাও। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে এবং বাড়ীর সকলকে জানাইয়া সুখী করিবে।

ইতি
সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

[২]

[প্রাপক : জনৈক সন্ন্যাসী]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Belur Math P. O.
Dt. Howrah (Bengal)
26. 5. 28

শ্রীমান্ সুরেন,

তোমার পত্র পড়িয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম, বাবা মন একটানা তাঁর দিকে ধাবিত হওয়া কি সোজা কথা—তা মানুষের চেষ্টায় হয় না—হাজার ধ্যান জপই কর আর বিচার বুদ্ধি আন। তাঁর কৃপা না হলে হয় না। তাঁর কৃপায় মনের গতি এক মুহূর্তে বদলাইয়া যায়। সেই মুহূর্ত যে কখন আসিবে তা তিনিই জানেন—সেইজন্য সদা সর্ব্বদা তাঁর কৃপার প্রতি লক্ষ্য রেখে জীবন যাপন করতে হয়। ইহাই হচ্ছে সাধনা। তাঁর দয়ায় মন বিষয় বিমুখ কিছু হলে তবে ঐরূপ ভাবে থাকা যায়। তাই সদা সর্ব্বদা তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়। মন মাঝে মাঝে ঐরূপ বিমুখ হয়—তখন ছেড়ে না দিয়ে পুরুষকার দ্বারা মন বশীভূত করে তাঁর দিকে লাগিয়ে রাখতে হয়—ধীরে ধীরে মনের শান্তি এবং একাগ্রতা আবার আসে। ঐরূপ করতে করতে তবে মনের গতি একমুখী হয়। সেইজন্য চিন্তিত হইবার কিছু নাই—তাঁকে ধরে থাক। তিনি শান্তি দিবেন।

নিজের ও পরের দোষগুণ বিষয়ে শক্তি ক্ষয় করার চেয়ে তাঁর নাম স্মরণ-মননে শক্তি নিয়োজিত করা খুবই ভাল। তবে তারই মধ্যে মন যাহাতে অসৎ দিকে না যায়—কুচিন্তা না করে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়। ঐরূপ সময় positive এবং good food মনকে দিতে হয়। আমার শরীর তাঁর কৃপায় এক প্রকার চলে যাচ্ছে। মঠের সব কুশল। তোমার শরীর আজকাল কেমন। তুমি এবং মঠের সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ঠাকুরের কৃপায় তোমার ভক্তি, বিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করুক।

ইতি
সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[প্রাপক : শ্রীপ্রমদাদাস মিত্র]

শ্রীশ্রীগুরুদেবো জয়তি

জামনগর
28 June 92

পূজনীয়েষু—

আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন। বহুদিন পরে গতকল্য আপনার পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। এরূপ স্ফোটক রোগাক্রান্ত হইয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছেন শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলাম। শ্রীস্বামী নরেন্দ্রনাথ গতবর্ষ গ্রীষ্মে 'আবু'তে ছিলেন। তথায় রাজপুতানার কয়েকটি রাজা ও অপরাপর রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া এবং তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি সন্দর্শনে ও তাঁহার সৎধর্ম্মার্থযুক্ত উপদেশ প্রাপ্তে তাঁহারা অতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হন। পরে জয়পুর রাজধানীস্থ একটি রাজা তাঁহাকে আবু হইতে স্বরাজ্যে লইয়া যান। স্বামীজী তথায় ২।৩ মাস ছিলেন। রাজার স্বভাব চরিত্রে তিনি অতিশয় প্রীত হইয়াছেন। এমন কি এক্ষণে রাজপুতানায় উপরি উক্ত রাজার ন্যায় ক্ষত্রিয় সন্তান অতি বিরল। তৎপরে তিনি তথা হইতে জুনাগড়ে আসেন, তথায় ঘটনাক্রমে কচ্ছ ভুজের রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। রাজা তাঁহাকে স্বরাজ্যে আসিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ও আমন্ত্রণ করিয়া যান। পরে তিনি তথায় গিয়া আমন্ত্রণ রক্ষা করেন। তাঁহার শারীরিক অবস্থা ভাল নহে, সদাই অগ্নিমান্দ্য। পথে তাঁহার সংবাদ পাইয়া আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হই। পরে সাক্ষাৎ করিয়া জানিলাম যে তিনি এক্ষণে নিতান্তই একাকী ভ্রমণ করিবেন। কচ্ছে তাঁহার সহিত আমার বিয়োগ, পরে তিনি জুনাগড় হইতে বরোদা হইয়া বোম্বাই যান, তারপর তাঁহার আজ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ পাই নাই। হ্যাঁ, শুনিয়াছি বরোদা যাইবার কালীন গিরনারে তাঁহার সহিত শ্রীঅভেদানন্দের সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু তিনি তাঁহার সহিত অধিক দিন ছিলেন না।

মহাশয় আমি হিমালয় হইতে নেমে অবধি যথার্থই নানারোগ কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে বিরক্ত হইয়াছি, এক্ষণে আর অধিক ঘুরিবার ইচ্ছা নাই। এখানে আমার পার্শ্বস্থ ঘরে একটি বৈদিক পাঠশালা আছে তথায় ত্রয়ী সংহিতাই পড়ান হয়। এখানে কয়েকটি বালক বেদ পাঠ করিবার জন্য অতি দূর দেশ হইতে আসিয়া ভিক্ষাটন মাত্রে অতিশয় কষ্টে দিনপাত করে। অতএব আপনি যদি তাহাদের ভিক্ষার জন্য কিছু আর্থিক সাহায্য করেন তো তাহারা যথার্থ ই কৃতকৃত্য ও পরম উপকৃত হয়।

ইতি—
দাস গঙ্গাধর

To P. D. Mitra
Benares City

নারদীয় ভক্তি

স্বামী ভূতেশানন্দ

সব দেশেই কিছু মানুষ আছেন যাঁরা ভক্তি-পথে চলতে আগ্রহী। সাধারণভাবে পূজনীয় ব্যক্তির প্রতি যে ভালবাসা তার নাম ভক্তি। ভক্তি ভালবাসারই একটা বিশেষ রূপ এবং সেখানে ভালবাসার সঙ্গে পূজ্যভাব থাকে। সাধারণভাবে ভক্তি শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হয় তবে এর বিশেষ প্রয়োগ হয় ভগবানের ক্ষেত্রে। লোকটি ভক্তিমান বললে বোঝা যায়, সে ভগবানকে ভক্তি করে।

ভক্তিরই এক বিশেষ প্রকার হল নারদীয় ভক্তি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে ঠাকুর বলছেন, 'কলিতে নারদীয় ভক্তি'। নারদ যে ভক্তির উপদেশ করতেন তাকে বলে নারদীয় ভক্তি, যার মূল কথা অহৈতুকী ভক্তি। কোন হেতু বা কারণ ব্যতিরেকে ভগবানকে ভক্তি করা। ভাগবতে (১।৭।১০) এই অহৈতুকী ভক্তির উল্লেখ আছে—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিম্ ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

বলছেন, যে মুনিরা আত্মারাম মানে নিজের ভিতরেই যাঁদের আরাম অর্থাৎ আনন্দ, নিজের ভিতরেই যাঁদের আনন্দের উৎস; যাঁরা আনন্দের জন্যে বাইরের কোন জিনিসের অপেক্ষা রাখেন না, যাঁদের গ্রন্থি বা বাসনা নেই, তাঁরাও ভগবানকে ভক্তি করেন। সেই ভক্তির কোন হেতু নেই অর্থাৎ ইহকালে সুখ কিংবা পরকালে স্বর্গপ্রাপ্তির প্রত্যাশা নিয়ে তাঁরা ভগবানকে ভালবাসেন না। তাঁদের মুক্তিকামনাও নেই। তবু তাঁরা ভক্তি করেন কেন? সেখানে ভাগবত বলছেন, 'ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ'—ভগবানের এমনই গুণ যে, মানুষ তাঁকে ভক্তি না করে পারে না। তিনি স্বতঃপ্রিয়।

গীতায় (৭।১৬) চার রকমের ভক্তের কথা শ্রীভগবান বলছেন—

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

—আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চার প্রকারের সুকৃতিশালী ব্যক্তি আমার ভজনা করেন। এঁরা সকলেই সুকৃতিশালী না হলে ভগবানের ভজনা করতেন না।

এক রকম হচ্ছে আর্ত। কোন না কোন বিপদ বা দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য যাঁরা ভগবানের ভজনা করছেন। বিপদে পড়লে সবাই যে ভগবানের ভজনা করেন তা নয়, অনেকে হাহাকার করেন, প্রতিকারের নানা উপায় খোঁজেন, কিন্তু যাঁরা পুণ্যবান তাঁদের বিপদের দিনে ভগবানের কথা মনে পড়ে। এই এক রকমের ভক্ত আর-এক রকমের ভক্ত আছেন যাঁরা তত্ত্বজিজ্ঞাসু। জানতে চান জগতের স্রষ্টা, জীবের নিয়ন্তা কে? এইরকম জানবার যাঁদের ইচ্ছা, তাঁরা নিজেরা সন্ধান করতে না পেরে ভগবানের শরণাপন্ন হন। আর-এক রকম আছেন যাঁরা অর্থার্থী। কোন-রকম বৈষয়িক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ভগবানকে ভজনা করেন। চতুর্থ হলেন জ্ঞানী, যাঁরা ভগবানের স্বরূপকে জেনেছেন। আবার গীতা (৭।১৮) এর পরেই বলেছেন—

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।

—এই চতুর্বিধ ভক্তেরা সকলেই মহান, কিন্তু জ্ঞানী এঁদের ভিতরে শ্রেষ্ঠ। কারণ তাঁরা আমাকে ছাড়া আর কিছুই কামনা করেন না, তাঁরা আমার আত্মা। আত্মা যেমন স্বতঃপ্রিয়, সেই ভক্তেরাও তেমনি বিনা কারণে আমার প্রিয়। এখানে দেখা গেল, যিনি ভগবানের স্বরূপকে জেনে তাঁকে

ভক্তি করছেন তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। এঁরা অকারণে তাঁকে ভক্তি করেন। তিনি এমন গুণসম্পন্ন যে, তাঁকে ভক্তি না করে তাঁরা পারেন না। তাহলে এখানে সেই অহৈতুকী ভক্তির উপরই জোর দেওয়া হল যা নারদ বলেছেন। আর সেই ভক্তির সংজ্ঞা দিয়েছেন নারদ, 'সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা'—একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি পরমপ্রেমকে ভক্তি বলে। সেই ভক্তি পরমপ্রেম-স্বরূপা। এই পরমপ্রেম কথাটির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। পরমপ্রেমের অর্থ হচ্ছে সেই প্রেম যার কোন কারণ নেই, হেতু নেই। এই প্রেম ভগবান ছাড়া আর অন্য কারও উপর হয় না।

প্রশ্ন উঠবে জগতে ভালবাসার আরও সব দৃষ্টান্ত আছে। যেমন মায়ের সন্তানের প্রতি ভালবাসা, সন্তানের মায়ের প্রতি ভালবাসা, পতিপত্নীর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা—এগুলি খুব নিবিড় ভালবাসা। নারদ বলছেন, এগুলিও প্রেম বটে তবে পরমপ্রেম নয়। ওর ভিতরে একটু স্বার্থ জড়িত আছে। স্বার্থবুদ্ধি এইখানে যে, আমার সঙ্গে সেই বস্তুর বা ব্যক্তির সম্বন্ধ থাকায় এই প্রেম। মা ছেলেকে ভালবাসে 'আমার ছেলে' বলে। এইরকম ছেলে বাবা-মাকে 'আমার বাবা' 'আমার মা' বলে ভালবাসে। পতিপত্নী পরস্পরকে 'আমার' বলে ভালবাসে। এই যে 'আমার' বলে ভালবাসা এইখানেই প্রেম সীমিত হয়ে গেল। পরমপ্রেম হবে অসীম।

কিন্তু ভক্তদের ভগবানের প্রতি 'আমার ভগবান' এ-বোধ কি হয় না? গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে 'আমার শ্রীকৃষ্ণ' বলেননি? কিন্তু সেই যে 'আমার' ভাব সেটা কোন স্বার্থবুদ্ধি থেকে উৎপন্ন নয়। সেখানে ভগবানকে ভক্ত ভালবাসে 'আমার ভগবান' বলে নয়, ভগবান বলেই তাঁকে ভাল-বাসে। তাঁরই জন্য তাঁকে চাওয়া, কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নয়। একথাটি আর একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়। গোপীরা ভগবানকে ভালবেসে তাঁকে সর্বস্ব সমর্পণ করে। এই সর্বস্ব সমর্পণ যেখানে তাকেই বলে নিঃস্বার্থ ভালবাসা। এই জিনিসটি একটু বোঝা কঠিন, কারণ মানুষের মন এত স্বার্থপর যে, একেবারে নিঃস্বার্থ ভাল-বাসার কথা সে ভাবতেই পারে না। অনেক সময় আমরা মাতৃস্নেহের দৃষ্টান্ত দিই যে, মা সন্তানের কাছে কোন প্রত্যাশা করে না। কেবল তাকে দিয়েই যায়। কিন্তু সেখানেও ভালবাসাটা 'আমার' বুদ্ধির জন্যে। তা না হলে অন্যত্রও সেই ভালবাসা হত। পরন্তু ঐ সন্তানের জন্য মা অন্যত্র অপরের সঙ্গে কখন কখন নিষ্ঠুর আচরণ পর্যন্ত করে। এক্ষেত্রে মা তার নিজের আত্মার সঙ্গে ছেলেকে জড়িয়ে নিয়েছে; নিয়ে, দুটো মিলে যেন একটা হয়েছে।

মাতৃস্নেহ যে নিঃস্বার্থ নয় এটা ভাল করে বিচার করলে বোঝা যায়। একবার কোন মা বলেছিলেন, সন্তানের প্রতি ভালবাসায় তাঁদের কোন স্বার্থবুদ্ধি নেই। আমরা তাঁকে বলেছিলাম, কিন্তু তুমি তোমার সন্তানকে যেমন ভালবাস, ভেবে দেখ দেখি আর একটি ছেলেকে ঠিক ঐ-রকম ভালবাসতে পার কিনা। সেই মা চিন্তা করে বললেন, না। আমরা বললাম, এইটিই তোমার সীমা, তুমি তোমার সীমিত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে ছেলেটিকে ভালবাস।

যেহেতু ভগবান সর্বব্যাপী সেইহেতু ভগবানকে যখন আমরা ভালবাসি সে প্রেমও হয় সর্বব্যাপী। ভগবান অসীম সুতরাং ভগবানের প্রতি ভাল-বাসাও অসীম। এইজন্যে তাকে পরমপ্রেম বলা হয়। এই পরমপ্রেমের সঙ্গে আবার আর একটু কথা বললেন—'সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা'। সেই প্রেমকে আবার কোন একটি পাত্রের প্রতি বললেন। ভগবানকে উল্লেখ করে, তাঁকে বিশ্লেষণ

করে দেখে বললেন—না, এ একটি খুব গূঢ় তত্ত্ব। ভক্ত ভগবানকে ঠিক চিনতে পারে না, জানে না বা জানবার চেষ্টাও করে না। এইজন্যে 'অস্মিন্' মানে—কোন একটি পাত্রের প্রতি বললেন। সেই পাত্রকে সে ভাল করে বোঝেনি। এইটুকু বোঝে যে, তিনি আমার ভিতরে বাইরে পরিব্যাপ্ত, কিন্তু তাঁকে সীমিত করতে সে পারে না। কোন বিশেষণের দ্বারা তাঁকে বিশিষ্ট করতে পারে না এইজন্যে তাঁকে 'অস্মিন্' বলা হল। বুদ্ধির দ্বারা পাত্রটিকে সীমিত করা যায়নি। 'অস্মিন্' মানে যে কোন লোকের উপর, যে কোন পাত্রের প্রতি হতে পারে, কিন্তু তা হয় না। তার কারণ এ পরমপ্রেম। এই পরমপ্রেম একমাত্র ভগবানের প্রতি হতে পারে। আর সব জায়গায় প্রেম হচ্ছে সীমিত। অন্য প্রেমের ভিতরে পূর্ণশুদ্ধি নেই, ঐ একটুখানি অশুদ্ধি থেকে যায়। মায়ের সন্তানের প্রতি প্রেম যে গভীর এতে কোন সন্দেহ নেই। এরকম আত্মদান আর অন্য কোথায় আছে? দেহ-ইন্দ্রিয়ের সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে মা সন্তানের সেবা করে, তা না হলে সন্তান মানুষ হত না। আর তখন অন্ততঃ মা কিছু চায় না। ভবিষ্যতে সন্তান বড় হবে, তাকে পালন করবে তখন মায়ের মনে এ-সব আসে না। এইটুকু হয়তো ভাবে সে আমার অপেক্ষা রাখে। এইরকম, যে পরমভক্ত সে হয়তো ভাবে যে, ভগবান তার অপেক্ষা রাখেন। এ অদ্ভুত একটি ভাব যে, আমি না হলে ভগবানের চলবে না। যশোদার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে-প্রেম দেখা যায় তাতেও এই ভাব যে, আমি ছাড়া গোপালের সেবা আর কে করবে? শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে-প্রেম তার ভিতরেও এই ভাব যে, আমি ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা কে করবে? ঠাকুর কথামৃতের ভিতরেও উল্লেখ করেছেন যে, রাধা বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ যে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যান তার জন্য আমার কোন বাধা নেই। কিন্তু চন্দ্রাবলী যে তাঁর সেবা করতে জানেন না। কি মধুর চমৎকার ভাবটি এই সাধারণ কথার ভিতরে লুকানো রয়েছে যা ভক্তেরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন। যখন আমি ছাড়া ভগবানের চলবে না, এই বুদ্ধি আসে তখন তাঁর কাছে আর কিছু চাইবার থাকে না। এই অহৈতুক প্রেম যার সে আর ভগবানকে বিশ্লেষণ করে দেখতে যায় না। এই ভক্ত স্বতই স্বাভাবিকভাবে ভগবানকে ভালবাসে, যেমন সে নিজেকে ভালবাসে। আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসি। কেন? আমি তো আমি বলেই আমাকে ভালবাসি, আর কোন কারণ নেই। আর ভক্ত ভগবানকে ভাবে আমার আমি। সে নিজেকেও সেখানে কোন স্থান দেয় না, সে কেবল সেবক।

সেরকম ভক্তের কাছে মুক্তিও তুচ্ছ। তিনি তার চেয়েও বেশি সম্পদের অধিকারী। বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য লোকে যে মুক্তি চায় সে তো আর্ত ভক্তের চিহ্ন। ভাগবতে (৩।২৯।১৩) আছে, আমার ভক্ত যারা তারা মুক্তি চায় না—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

মুক্তি বলতে ভক্তের দৃষ্টিতে এইগুলি—সালোক্য সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য এবং একত্ব।

সালোক্য—ভগবানের সঙ্গে চিরকাল এক লোকে বাস করা। বৈকুণ্ঠ হোক, গোলোক হোক, শিবলোক হোক, যে লোক হোক তাঁর সঙ্গে এক লোকে বাস করা কম ভাগ্যের কথা নয়।

সার্ষ্টি অর্থাৎ ভগবানের মতো সমান ঐশ্বর্য।

সারূপ্য—ভগবানের মতো রূপ অর্থাৎ নারায়ণের ভক্তের নারায়ণের মতো রূপ হওয়া। সে হল আরও বেশি কাছাকাছি। শুধু সহাবস্থান নয়, তাঁর মতো রূপ, ঐশ্বর্য, গুণ সবই পাওয়া

তার চেয়ে আরও নিকট আছে, একত্ব। একত্ব মানে ভগবানের সঙ্গে তাঁর অঙ্গীভূত হয়ে থাকা। অন্য অন্য ভক্তিতে বিরহ আছে। ভগবানের অঙ্গ হয়ে থাকলে আর বিচ্ছেদের ভয় নেই, তাঁর সঙ্গে নিত্য যুক্ত হয়ে থাকা। আমার ভক্ত যারা তারা এইসব মুক্তি দিলেও নেয় না। নিতে পারে কেবল একটি কারণে যদি এর দ্বারা ভগবৎ-সেবার সুবিধা হয়—

'বিনা মৎসেবনং জনাঃ'।

এই হল পরমপ্রেমের চিহ্ন।

নারদীয় ভক্তি মানে এইরকম পরমপ্রেম। সেই প্রেমাস্পদ যিনি তাঁর প্রতি মানুষ যখন একবার এ প্রেম অনুভব করে তখন সে,—

'যজ্‌জ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি, স্তব্ধো ভবতি,
আত্মারামো ভবতি'।

মত্ত মানে পাগল হয়ে যায়। স্তব্ধো ভবতি—জড় হয়ে যায়, ভাবে বিভোর হয়ে যায়, ভরপুর হয়ে যায়, তার আর কোন বাহ্যিক চেষ্টা থাকে না। 'আত্মারামো ভবতি'—আত্মার আনন্দে বিভোর হয়। অপার আনন্দের উৎস তার ভিতরে, আনন্দের জন্য বাইরের কোন জিনিসের অপেক্ষা থাকে না।

ভক্ত যখন ভক্তির পরাকাষ্ঠায় পৌঁছায় তখন তার এই অবস্থা হয়। এইটি নারদীয় ভক্তির লক্ষণ। নারদ এইরকম বলে তারপরে তার বিস্তার করে বলছেন, সে কিছু কামনা করে না—'সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ'—ভক্তি সর্বপ্রকার বাসনার নিরোধ হলে তবে হয়। তাই বাসনা পূরণের জন্য ভক্তিকে ব্যবহার করার প্রশ্ন আসে না। সূত্রাকারে এই হল যে, তার এমন কোন কামনা নেই যার জন্যে ভগবানকে সে ভালবাসে, আর সেই ভালবাসার কোনও সীমাও নেই। ভগবান যেমন অসীম তাঁর ভালবাসাও তেমনি অসীম। আরও বলেছেন, এই ভালবাসার শেষ তো নেই-ই উপরন্তু ক্রমবর্ধমান। দিনে দিনে সেই ভালবাসায় ভগবান যেন তাকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে দেন। অন্তরে বাইরে তাঁকে উপলব্ধি করে ভক্ত ডুবে যায় তাতে।

নারদীয় ভক্তি এককথায় অহৈতুকী ভক্তি। সে ভক্তির কোন কারণ নেই, কোন কামনা নেই। সে কিছু চায় না, কেবল দিতে চায়, দিয়ে নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করতে চায়, তার নিজের বলতে কিছুই থাকবে না, সর্বস্ব সমর্পণ।

গীতায় ভগবান বলছেন যে, আমাতে সমস্ত অর্পণ কর। 'ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়' (১২।৮)—আমাতেই তোমার মনকে নিযুক্ত রাখ, বুদ্ধি নিবিষ্ট কর। 'নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ' (১২।৮)—অতঃপর আমাকেই প্রাপ্ত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। অনন্যভাবে তাঁকে চিন্তা করা। অনন্য মানে তিনি ছাড়া আর আমার জগতে কিছুই কাম্য নেই—এই ভাব নিয়ে তাঁর উপর যে ভালবাসা। ভক্ত যখন এইভাবে ভালবাসে সে তার নিজের অস্তিত্বকেও তাতে বিলীন করে দেয়।

এককথায় জ্ঞানী জ্ঞানের দ্বারা যে বস্তু লাভ করেন, ভক্ত ভক্তির দ্বারা এইভাবে সেই একই বস্তু লাভ করেন। জ্ঞানী বলেন, আমি জ্ঞান-সমুদ্রে নিমগ্ন হচ্ছি, ভক্ত বলেন, আমি প্রেমসমুদ্রে অবগাহন করছি!

যিনি জ্ঞানস্বরূপ, তিনিই প্রেমস্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ! তাঁকে যে যেভাবে চায়, সেভাবে সে তাঁর দিকে এগোয় এবং এর পরিণতি হচ্ছে তন্ময় হয়ে যাওয়া। এই হল শেষ পরিণাম। এরই নাম অহৈতুকী ভক্তি, এরই নাম নারদীয় ভক্তি।*

* বিগত ১৯ ডিসেম্বর ১৯৮৪, রামহরিপুরে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ মহারাজের প্রদত্ত ভাষণের অনুলিপি।

যুবকদের প্রতি স্বামীজীর আহ্বান

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

…যুবকবৃন্দ,

আজ সকালবেলা তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি এবং সম্মেলনে যোগদানের সুযোগ দেওয়ার জন্য যাঁরা এটির আয়োজন করেছেন তাঁদের প্রথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই যে যুবসম্মেলন, এর প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল গত ১৯৮০-এর মহাসম্মেলনের সময় থেকেই। তারপর থেকেই ভারতের নানা স্থানে যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দিল্লী, মাদ্রাজ, পুরুলিয়ায় হয়ে গেছে। আরও অনেক জায়গায় হয়েছে, বোম্বাই শহরেও আয়োজন করা হচ্ছে। কিন্তু এখানে যে সম্মেলনটি হচ্ছে তা সেগুলির থেকে একটু পৃথক্। কেননা সেগুলি একটা নির্দিষ্ট জায়গার ভিতরে নিবদ্ধ, কিন্তু এটি একটি আঞ্চলিক যুবসম্মেলন—পূর্বাঞ্চলীয় যুবসম্মেলন। এখানে বিভিন্ন প্রান্তভূমি থেকে যুবকরা এসে যোগ দিয়েছে। তারা এসেছে একটা অন্তরের আবেগ নিয়ে, একটা আশা নিয়ে এবং একটা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে, এখান থেকে তারা কিছু নিয়ে যাবে। সেইজন্য কেবলমাত্র সভা করে এর কর্তব্য নিষ্পাদিত হবে না, তাই এখানে দেখানো হবে একটি জীবন-যাত্রার প্রণালী। সমস্ত কোলাহলপূর্ণ জগৎ থেকে দূরে এসে একটা কর্মসূচী অবলম্বন করে সারাদিন নিজের জীবনকে তার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে সেইভাবে জীবনটাকে তৈরি করে নেওয়া—এটা এখানে করা হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বলেছেন যে, কিছুদিনের জন্য সংসার থেকে দূরে চলে যেতে হয়, তাহলে নিজেকে বোঝা যায়। নিজেকে বুঝবার, নতুন চিন্তা সংগ্রহ করবার যে উপযোগ তা এখানে পাওয়া যাবে। আমি আশা করি, যুবকরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছ, তোমরা সবাই ফিরে যাবে এখান থেকে নতুন জীবনের একটা আবেগ, নতুন জীবনের প্রতি একটা অনুরাগ এবং নতুন আদর্শের প্রতি দৃষ্টি নিয়ে।

যুবকবৃন্দ, এই যুবসম্মেলন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তোমরা জানো, শ্রীরামকৃষ্ণের আশেপাশে অনেক মানুষ এসে দাঁড়াতেন। তাঁরা বিভিন্ন বয়সের। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁদের কৃপা করতেন, যাঁদের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করতেন, তাঁরা সবাই প্রায় অল্পবয়স্ক। তিনি তাঁদের জীবন গঠিত করে একটা নতুন ভাবধারা জগতে ছড়িয়ে দেওয়ার আয়োজন করেছিলেন।

এই সম্মেলন স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা—এঁদের অবলম্বন করেই হচ্ছে। এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, সামনে একটা বিরাট স্বামীজীর ছবি। তার উভয় পার্শ্বে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং মা সারদামণির ছবি দেওয়া হয়েছে ক্ষুদ্রাকৃতির। আমার প্রথমে মনে খটকা লেগেছিল—এটা কেন করা হল? তখন আমার পূর্বাশ্রম জীবনের কথা—আজ থেকে প্রায় ৬০ বছর আগের কথা স্মরণে এল। যখন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার সংস্পর্শে আসি তখন আমার প্রথম দৃষ্টি পড়েছিল স্বামীজীর উপর। স্বামীজী ছাড়া তখন কিছু বুঝতাম না। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের লেখা স্বামীজীর জীবনীগ্রন্থ পড়ে স্বামীজীর ভাবধারায় অভিস্নাত হয়েছিলাম এবং সেই যে স্বামীজীর প্রতি প্রেম-প্রীতি—সেটাই ধীরে ধীরে আমার হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখন শুধু শ্রীরামকৃষ্ণকে জানতাম স্বামী বিবেকানন্দের গুরু বলে। মা সারদামণিকে জানি আরও পরে। স্বামীজীর প্রতি এই ভালবাসাই আমাকে দিব্যজ দৃষ্টি দিয়েছে—যাতে আমি শ্রীরামকৃষ্ণের এবং জননী সারদামণির যে স্বরূপ তা কিছুটা

বুঝতে পেরেছি। তাই যুবকগণের সম্মুখে স্বামীজীর চিত্র উদ্ভাসিত করা হচ্ছে। স্বামীজীকে জানলেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদামণিকে জানা যাবে। স্বামীজীকে জানা-ই আসল কথা। একবার শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শিষ্য স্বামী শিবানন্দকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, স্বামীজী এবং শ্রীঠাকুরের মধ্যে পার্থক্য কি? তিনি বলেছিলেন, "ঠাকুর যেন aphorism (সূত্র), স্বামীজী হলেন commentary (ভাষ্য)।" সংস্কৃত ভাষায় পুস্তক লেখা হত অতি অল্প কয়েকটি শব্দ দিয়ে; সূত্রাকারে লেখা বাক্য কেউ বুঝতে পারত না। তাই তখন তার উপর ভাষ্য লেখা হত। এই রকম বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র লিখেছিলেন এবং শংকরাচার্য সেটা বুঝিয়েছিলেন মানুষকে তাঁর ভাষ্যের দ্বারা। সেই রকম শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন হচ্ছে সূত্র এবং স্বামী বিবেকানন্দ তার ভাষ্য। কাজেকাজেই স্বামী বিবেকানন্দরূপ ভাষ্যকে না পড়লে শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপ সূত্র বুঝা যাবে না। সেজন্য স্বামীজীকে ধরেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে

অনেকদিন পূর্বের কথা। স্বামী অশোকানন্দ—তাঁর এখন দেহত্যাগ হয়েছে—আমাদের সঙ্ঘের একজন বিশিষ্ট সাধু ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম যখন আলাপ হয়, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন, **I do not believe in a love which is not a love at first sight.**—আমি সেই প্রেমে বিশ্বাস করি না, যে-প্রেম প্রথম দৃষ্টিতে হয় না। বলেই আমাকে বলেছিলেন, **Fall in love with Swamiji**—স্বামীজীর ভালবাসায় ভরে যাও।

গত ১৯৮০-তে রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের মহাসম্মেলন হয়েছিল। এই সম্মেলনের অন্যান্য অনেক কিছু উদ্দেশ্য ছিল—একথা তখন যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা শুনেছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয়, সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য ছিল—ভক্ত এবং যাঁরা সন্ন্যাসী তাঁদের একত্রিত করে তাঁদের সামনে বিভাসিত করা—স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—এই সঙ্ঘই হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূলশরীর। শ্রীবুদ্ধ একটি বিরাট সঙ্ঘ করে গিয়েছিলেন। সেই সঙ্ঘের ত্রি-শরণ মন্ত্রের মধ্যে রয়েছে:

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

আজ রামকৃষ্ণ মিশন এবং রামকৃষ্ণ মঠের অনুরাগীদের সামনে এই সত্যটি উদ্ভাসিত করতে হবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণং শরণং গচ্ছামি, তাঁর প্রদর্শিত ধর্মই সেই ধম্মং শরণং গচ্ছামি এবং তাঁর সঙ্ঘ—সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ কেবলমাত্র একটা সাধারণ প্রতিষ্ঠান নয়। এই সঙ্ঘ হচ্ছে একটা সজীব বস্তু—আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ। এই বস্তুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। সেজন্যই যুবকগণকে সম্মেলনে যোগদানের জন্য আহ্বান করে এই সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে। আমি প্রথমেই বলেছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ যুবকদের ভালবাসতেন। স্বামীজীও ভালবাসতেন। তবে তাঁর ভালবাসার প্রকাশভঙ্গিটা একটু আলাদা। তাঁর ভালবাসায় আত্মোৎসর্গের কথা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন: "ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়।" যে-সব যুবক পাশবৃত্তি পরিহার করে "আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী" রূপে প্রতিষ্ঠিত সেই যুবকগণকেই স্বামীজী আহ্বান জানিয়ে গেছেন। আহ্বান জানিয়েছিলেন মাত্র ৮৫ বৎসর পূর্বে। সেই আহ্বানের সাড়া ধীরে ধীরে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু যতটা আমরা আশা করেছিলাম ততটা সাড়া এখনও আসেনি। ৮৫

বৎসর পরে সেই যুবকগণকে আমরা ডাকছি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে। শ্রীরামকৃষ্ণ ডেকেছিলেন: "ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস আয়।" শ্রীরামকৃষ্ণের সেই আহ্বান আজও আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তাঁর এই আহ্বানের কথা সমস্ত জগৎকে জানাতে হবে। কেন জানাতে হবে? নতুন সভ্যতার অভ্যুদয়ের জন্য। নতুন সংস্কৃতির উজ্জীবনের জন্য। নতুন একটা সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য দিতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীকে ছড়িয়ে। কে দেবে? আমরা বৃদ্ধ। আমাদের সে সামর্থ্য কোথায়? তোমরা যুবকবৃন্দ এগিয়ে এস, তোমরা ভার বহন করে নিয়ে চল এই বাণী দেশ-দেশান্তরে। এই বাণী ছাড়া জগতের বাঁচবার আর কোন উপায় নেই। বর্তমানে জগৎ কোথায় এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—তা তোমরা জানো। সম্মুখে বিরাট গহ্বর। আণবিক বিস্ফোরণে সমস্ত জগৎ ধূলি পরমাণুতে পরিণত হয়ে যাবে। আজ আমরা পাশ্চাত্য দেশকে অনুসরণ করছি। এই অনুকরণ-প্রীতির ভিতরে রয়েছে কি? হীনম্মন্যতা। আমরা ভাবছি, তাদের সমাজব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থার ভিতর দিয়ে আসবে আমাদের মুক্তি। পাশ্চাত্য সভ্যতা হল অবক্ষয়ী সভ্যতা—Decadent civilisation. এই Decadence যাদের মধ্যে আসবে তারা ধরাবক্ষ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। স্বামীজী এই কথাই বলেছিলেন: "The whole of Western civilisation will crumble to pieces in the next fifty years if there is no spiritual foundation.···Europe, the centre of the manifestation of material energy, will crumble into dust within fifty years if she is not mindful to change her position, to shift her ground and make spirituality the basis of her life." যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয়, তবে তা আগামী ৫০ বছরের মধ্যে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।···জড়শক্তির লীলাভূমি ইউরোপ যদি নিজ সমাজের ভিত্তি পরিবর্তন করে আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত না করে তবে ৫০ বছরের মধ্যে টুকরো টুকরো হয়ে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

কেউ কেউ বর্তমান পাশ্চাত্য ভাবধারা পরিবর্তিত করবার চেষ্টা করছেন, কেউ কেউ হিপি হচ্ছে, কেউ কেউ ভাবছে ভারতবর্ষে এসে কিছু পাবে। নিজের সভ্যতায় শান্তি নেই; নিজেদের মনে শান্তি নেই, গৃহে শান্তি নেই। তারা আসছে আমাদের কাছে। আর আমরা তাদের অনুকরণ করে হীনম্মন্যতায় ভুগছি। ওদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ওদের মতো সাজবার চেষ্টা করছি। না,—তোমরা এভাবে অনুকরণ করো না। তোমাদের ভিতরে রয়েছে সেই শক্তি, যে-শক্তি মানুষকে অমৃতত্ব দিতে পারে। এই অমৃতত্বের সন্ধান বৈদিক ঋষিরা দিয়ে গেছেন। যার ফলে আজও আমাদের দেশ বেঁচে রয়েছে। জগতের পুরাতন দেশগুলির মধ্যে একটি ইজিপ্ট। সেই ইজিপ্ট নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে অমৃতত্বকে আকিঞ্চন করেছিল। কিভাবে সে অমৃতত্ব পেতে চেয়েছিল? —দেহটাকে বাঁচিয়ে রেখে। সেজন্য সে দেহটাকে কাপড়চোপড়ে মুড়ে মুড়ে তার উপর পিরামিড তৈরি করেছিল। কিন্তু অমৃতত্ব সে পায়নি। ইজিপ্ট আজ ধ্বংস হয়ে গেছে। ইজিপ্ট সভ্যতা আজ নেই। আজ ব্যাবিলন সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে। আসিরীয় সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে, গ্রীক ও রোমান সভ্যতাও ধ্বংস হয়ে গেছে। বেঁচে আছে কেবল ভারতীয় সভ্যতা। তার ঐতিহ্যবাহী সভ্যতাকে ধরে সে বেঁচে আছে। কেননা—পতন-অভ্যুদয়ের বন্ধুর পন্থার ভিতর

দিয়ে যেতে যেতে সে যাগদীপ রূপে নিজের যে আত্মা তাকে ধরে ছিল। এই আত্মাকে পেলে অমৃতত্বকে পাওয়া যায়। একথা বৈদিক ঋষি বলেছেন: "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"—আমি সেই মহান্ পুরুষকে জেনেছি যিনি আঁধারের পারে জ্যোতির্ময় পুরুষ। তাঁকে না জেনে আঁধাররূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করার অন্য কোন পথ নেই। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"—এছাড়া আর কোন পথ নেই। সেজন্যই আমাদের দৃষ্টি আত্মমহিমার দিকে নিবদ্ধ করতে হবে যদি সমগ্র মানব-সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। আজ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেদের জীবন গঠিত করতে হবে। বিদ্যুতের মতো ক্ষণকালস্থায়ী পাশ্চাত্যের চাকচিক্যময় সভ্যতা দেখে ভুলো না—একথা স্বামীজী বলেছেন। অন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, সেই অভূতপূর্ব জ্যোতির্ময় পুরুষকে দেখ, এবং তাঁর বাণী, তাঁর সম্বন্ধীয় কথা বহন করে নিয়ে চল সমস্ত দেশে দেশে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "...We must conquer the world through our spirituality and philosophy.—আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিক চিন্তা দিয়ে আমাদের পৃথিবীকে জয় করতে হবে। এইভাবেই ধ্বংসোন্মুখ জগৎকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। এইটাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন করতে আমাদের প্রচণ্ড খাটতে হবে। সেজন্যই যুবকগণের প্রয়োজন। তোমাদের মতো উৎসাহী যুবকরাই কাজ করবে। তোমাদের সামনে এই ক্ষণস্থায়ী জীবন। গিরিশচন্দ্র বলেছেন:

ক্ষণস্থায়ী জীবন, অর্ধচেতন, অর্ধঅচেতন। দ্বন্দ্বল-বিশিষ্ট একটা জীবন। খানিকটা নিদ্রায় অচেতন, খানিকটা সচেতন জাগ্রত অবস্থায়। এ ক্ষণস্থায়ী দ্বন্দ্বল জীবনের জন্য মানুষ কত কি করছে। মনে ভোগের স্পৃহা জেগেছে। দৃষ্টি পড়েছে পাশ্চাত্যের চাকচিক্যময় সভ্যতার দিকে। আবার মনে ভয় পাশ্চাত্যের ভাবধারা এসে বুঝি সব নষ্ট করে দেবে। স্বামীজী বলছেন: না,—নষ্ট করে দেবে না। আসুক পাশ্চাত্য কিরণ। সমস্ত জানলা দরজা উন্মুক্ত করে দাও। তাতে আমাদের ভিতরের কুসংস্কারগুলি নষ্ট হয়ে যাবে। সেগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়া উচিতও। সত্যের কখনও বিনাশ নেই। যেগুলি সত্য, তা অমৃত—অমর। তাকে মারে কে? তাকে কেউ মারতে পারে না। আমাদের সেই যাগদীপরূপ আত্মাকে, সেই প্রদীপকে জ্বালিয়ে রাখতে হবে। যদি না জ্বালিয়ে রাখি আমাদের সমূহ বিপদ সম্মুখে,—সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমরাও বিলুপ্ত হয়ে যাব। সেইজন্য যুবক-দলকে এগিয়ে আসতে হবে। এগিয়ে আসতে গিয়ে তাড়াতাড়ি, রাতারাতি একটা বিপ্লব, বিক্ষোভ নিয়ে এলাম,—এভাবে হবে না। গুরু-গোবিন্দের জীবনের কথা স্মরণ কর। তিনি গুরু-রূপে আত্মপ্রকাশ করার আগে তপস্যার জীবন-যাপন করেছিলেন ১২ বছর। ডাকতে গেছে অনুচর রামদাস—ফিরে এস গুরু, ফিরে এসে আমাদের নেতৃত্ব দাও। গুরু বললেন:

> যাও রামদাস, যাও গো লেহারি,
> সাথু, ফিরে যাও তুমি।
> দেখায়ো না লোভ, ডাকিয়ো না মোরে
> ঝাঁপায়ে পড়িতে কর্মসাগরে,
> এখন পড়িয়া থাক্ বহু দূরে

বলার পর বলছেন:

> এখন বিহার কল্পজগতে,
> অরণ্য রাজধানী—
> এখন কেবল নীরব ভাবনা,
> কর্মবিহীন বিজন সাধনা,
> দিবানিশি শুধু ব'সে ব'সে শোনা
> আপন মর্মবাণী।

নীরবে সাধনা করতে হবে, নিজের শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। তারপর বলছেন :

হায়, সেকি সুখ, এ গহন ত্যজি
হাতে লয়ে জয়তূরী
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে—
রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে,
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।

তাই জাগরূক কর আত্মশক্তি। স্বামীজী বলেছেন : "Be like a thunderbolt". বজ্র বাঁটুলের মতো হয়ে চারদিকে যা কিছু অন্যায়, অবিচার তা ধ্বংস কর। প্রচণ্ড বেগে প্রস্ফুরিত হও, বিস্ফুরিত হও। এইভাবেই আমাদের কাজ করতে হবে। স্বামীজী তোমাদের ডেকে বলছেন : "Have faith that you are all, my brave lads, born to do great things! Let not the barks of puppies frighten you—no, not even the thunderbolts of heaven—but stand up and work!"—হে আমার বীরহৃদয় সন্তানগণ, তোমরা বিশ্বাস কর যে, তোমরা বড় বড় কাজ করবার জন্য জন্মেছ। কুকুরের 'ঘেউ ঘেউ' ডাকে ভয় পেও না—এমন কি আকাশ থেকে প্রবল বজ্রাঘাত হলেও ভয় পেও না—সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং কাজ কর। তোমরা স্বামীজীর সন্তান, তোমাদের ভয় কি? তাঁর এই অভীঃ মন্ত্রে দীক্ষিত হও।

স্বামীজী বলেছেন, এই ভাবধারা ১৫০০ বৎসর পর্যন্ত চলবে। আমরা কেবল পথ তৈরি করে যাচ্ছি। দধীচির মতন আত্মাহুতি দিয়ে, নিজেদের অস্থি দিয়ে বজ্র তৈরি করে যাচ্ছি। ইন্দ্ররূপ অমিত শক্তিশালী যুবকগণ এসে এই বজ্র ব্যবহার করবে ভবিষ্যতে। সমস্ত পৃথিবীর অন্য চেহারা হয়ে যাবে। নতুন মানবজাতির সৃষ্টি হবে। কোন জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, ঘৃণা থাকবে না —এই স্বামীজীর স্বপ্ন। এই স্বপ্ন সফল করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। এটাই আমাদের সাধনা। তাঁর এই বাণী তোমাদের কাছে উপস্থাপিত করছি। এই কার্য সম্পাদিত করার জন্য সাধনার বিশেষ প্রয়োজন। তোমাদের মধ্যে কেউ হয়তো বলবে : আমি তো অত্যন্ত ক্ষুদ্র, আমি অমুক জায়গার একটা বালক মাত্র; আমার অর্থ নেই, সম্পদ নেই, সহায় সম্বল নেই; আমি কি করব? কিন্তু স্বামীজী বলেছেন: "ক্ষীণাঃ স্ম দীনাঃ স-করুণা জল্পন্তি মূঢ়া জনাঃ"—আমি ক্ষীণ, আমি দীন বলে একথা বারবার কে জল্পনা করছে? যারা মূঢ় ব্যক্তি তারা জল্পনা করছে। "নাস্তিক্যস্ত্বিদন্তু অহহ দেহাত্মবাদাতুরাঃ"। যারা দেহাত্মবাদী তারা এটা প্রচার করছে যে, তুমি দেহ, দেহই আত্মা। কাজেকাজেই দেহাত্মবাদী যারা তারা বলবে আমি ক্ষীণ ও হীন,—এটাই নাস্তিক্য। এই নাস্তিক্যে বিশ্বাস করো না।

প্রাপ্তাঃ স্ম বীরা গতভয়া অভয়ং
প্রতিষ্ঠাং যদা
আস্তিক্যস্ত্বিদন্তু চিনুমঃ রামকৃষ্ণ-
দাসা বয়ম্॥

—আমরা যখন অভয় পদে অবস্থিত, তখন আমরা ভয়শূন্য এবং বীর হব—এই বিশ্বাসকে আস্তিক্য বলে। আমরা রামকৃষ্ণের দাস। আমরা পারব, আমাদের করতে হবে। আমাদের দেশকে বাঁচাতে হবে। আমাদের সমাজকে বাঁচাতে হবে। পৃথিবীকে বাঁচাতে হবে। এই আমাদের কর্তব্য। যুবকবৃন্দ, এই কর্তব্য সাধন আমাদের করতে হবে। তোমাদের এই দায়। এই দায় রেখে গেছেন স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীমা সারদামণি। এই দায় তোমাদের বহন করতে হবে। এই গুরু দায়িত্ব বহন করার জন্য জীবনকে তৈরি কর। "কিন্নাম রোদিষি সখে"—হে সখে, কাঁদছ কেন? "ত্বয়ি সর্বশক্তিঃ"—তোমার ভিতরেই তো সমস্ত শক্তি

রয়েছে। "আমন্ত্রয়স্ব ভগবন্ ভগদং স্বরূপম্"—তোমার ভিতরে যে ঐশ্বর্যশালী শক্তি রয়েছে তাকে জাগ্রত কর।

ত্রৈলোক্যমেতদখিলং তব পাদমূলে
আত্মৈব হি প্রভবতে ন জড়ঃ কদাচিৎ॥

—এই ত্রিভুবন, সমস্তই তোমার পদতলে। জড়ের কোন ক্ষমতা নেই—আত্মার শক্তিই প্রবল। বিশ্বাস কর—আমি আত্মা। এই বাণী বহন করে নিয়ে যাও। আমি আত্মা—এই বাণী হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের, তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের এবং মা-সারদামণির। এই বাণী হচ্ছে, রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের বাণী। এই বাণী বহন করে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হও। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন: "The old religion said that he was an atheist who did not believe in God"—প্রাচীন ধর্মে বলে, যে ভগবানে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। "The new religion says that he is an atheist who does not believe in himself"—নতুন ধর্ম বলছে, যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক। এই আস্তিক্য ধর্ম। এইটাকেই ধর। এইটাকে নিয়ে নিজেদের জীবন তৈরি কর এবং "Be like a thunderbolt"—বজ্রবাঁটুলের মতো হও। সমস্ত পৃথিবী ধুঁকছে। এইখান থেকে শুরু হোক তোমাদের জীবনগঠন। জীবনগঠন করে স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীমা সারদামণির ভাবধারা চারদিকে সঞ্চারিত করে দাও,—সমগ্র যুবশক্তিকে জাগিয়ে তোল। এই যে চারদিকে নানারকম corruption (দুর্নীতি) ইত্যাদি দেখছ, মানুষের উপরে অত্যাচার দেখছ, তার কারণ বহু বছর ধরে ভারত পরাধীন ছিল। বিজেতারা বহু বছর ধরে শোষণ করেছে। তাই শত শত বৎসর ধরে উপবাসী। একটা খাটের ভিতরে যদি ছারপোকা বহুদিন উপবাসী থাকে, তাহলে একটা কোন মানবদেহ এলেই তারা আক্রমণ করে। এইভাবে তারা বেঁচে থেকে বংশ বৃদ্ধি করে। আমরাও সেইরকম শত শত বছর ধরে উপবাসী আছি। কিছু ভোগ্যবস্তু দেখেই বহু-দিনের পুঞ্জীভূত ভোগেচ্ছার তাড়নায় তার দিকে ছুটে যাচ্ছি। কিন্তু বিদেশের দিকে তাকাও। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য জগতের দিকে তাকাও—কোথাও সুখ নেই, কোথাও শান্তি নেই। ভোগের দ্বারা শান্তি আসতে পারে না। সুখ তোমাদের আদর্শের ভিতরেই। সেই আদর্শ হচ্ছে—ত্যাগ। অতএব যুবকবৃন্দ, নিজের ত্যাগাদর্শমণ্ডিত জীবনের দ্বারা অপরের জীবন তৈরি কর। নিজের শক্তি দিয়ে অপরের ভিতর শক্তি সঞ্চারিত কর, নিজের জীবন দিয়ে অপরকে সাহায্য কর। এই হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং শ্রীমা সারদামণির বাণী। এই বাণীতে তোমরা উজ্জীবিত হও। উদ্দীপিত হয়ে সমগ্র-জগৎকে উজ্জীবিত কর—এইটাই আমাদের কাম্য।*

* রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক বিগত ২৬ ডিসেম্বর ১৯৮২, বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের প্রদত্ত ভাষণটি টেপরেকর্ড থেকে প্রতিলিখিত।

বিশ্বশান্তি

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

বন্ধুগণ,

আমি ভারতের কোটি কোটি মানুষের সৌভ্রাতৃত্বের শুভেচ্ছা বহন করে এনেছি, যাদের প্রার্থনা : আর যুদ্ধ নয়। পৃথিবীতে শান্তি বিরাজিত হোক ; বিশ্বের মানুষ সুখী হোক, সমৃদ্ধ হোক। ভারতের জনসাধারণ চিরদিনই শান্তির নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো ধর্মসভায় ভারতের হিন্দুসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছিলেন : "সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বার বার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করিয়াছে। এই সকল ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত তাহা হইলে মানবসমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইত।" তিনি বলেছিলেন : "বিবাদ নয়, সহায়তা" ; "বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ" ; "মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।" তাঁর বক্তব্য : এই লক্ষ্যই বিশ্ববাসীর অনুসরণীয় পথ। একথা আজও সত্য। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য ভ্রমণের পর ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথে বুলগেরিয়ায় এসেছিলেন। বুলগেরিয়া পরিদর্শন করে তিনি বলেছিলেন : "মনে হচ্ছে, আমি যেন ভারতেই ফিরে এসেছি।"

ভারতবর্ষের মানুষ যুদ্ধ একদম চায় না। তারা মনে করে, যুদ্ধ যদি হতেই হয়, তবে তা হোক দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, অজ্ঞতার বিরুদ্ধে, অস্বাস্থ্য ও বেকারীর বিরুদ্ধে—তা বিশ্বের যে-অঞ্চলেই থাক না কেন। সত্যিই পরিতাপের বিষয়, মানুষ বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যায় এত উন্নতি করা সত্ত্বেও আজও পৃথিবীতে এমন লোকের অভাব নেই, যাদের জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনটুকুর সমস্যাও আজ মেটেনি। এই-সব মানুষের সহায়তার জন্য আমাদের সকল সামর্থ্য, জ্ঞান ও ঐশ্বর্য নিয়োজিত হোক। আমাদের সুখসমৃদ্ধি অন্যের সঙ্গে বন্টিত হোক যাতে কারও মনে এ-ধারণা না গড়ে ওঠে যে, সে বঞ্চিত। মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে বাস করতে পারে না। আবার একটি দেশ অপর দেশের বা একটি জনসম্প্রদায় অন্য জনসম্প্রদায়ের সঙ্গে অস্বাভাবিক পার্থক্য বজায় রেখে একসঙ্গে বাস করতে পারে না। হয় আমরা সকলে সুখসমৃদ্ধি লাভ করব নতুবা সকলকেই দুঃখ পেতে হবে। প্রকৃতিতে সুবিধাবাদের স্থান নেই। আপনি আমার চেয়ে বুদ্ধিমান হতে পারেন, কিন্তু তার জন্য আমাকে বঞ্চনা করার অধিকার আপনার নেই। আমি যাতে আপনার সমকক্ষ হয়ে উঠি, তার জন্য আমাকে সহায়তা করুন। হয় আপনি আমাকে সাহায্য করুন, নচেৎ আমিই আপনাকে আমার স্তরে টেনে নামাব। একথা স্বীকৃত সত্য যে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য আছে, পার্থক্য আছে জাতিতে জাতিতেও, কিন্তু এই পার্থক্য exploitation বা বঞ্চনার অজুহাত হতে পারে না। প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী বিকাশ লাভ করে। জাতিগুলির পক্ষেও সেকথা সত্য। বিকাশের কোন সাধারণ নিয়ম, সাধারণ রীতি বা পদ্ধতি হতে পারে না। প্রকৃতিতে সামঞ্জস্য (uniformity) বলে কিছু নেই—আছে বৈচিত্র্য (diversity)। একটা জাতি বিকশিত হয়ে ওঠে যদি সে স্বাধীনতা

পায় ; যদি সে অবাধে তার চিন্তা ও অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারে। জাতির স্ফূর্তি ঘটে তার নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুসারী অভিব্যক্তিতে, তার চিন্তার গুরুত্ব সম্পর্কে চেতনার জাগরণে। ব্যক্তি বিশেষ যেমন অন্যের চেয়ে শক্তিশালী হতে পারে, তেমনি কোন জাতিও অন্যের চেয়ে শক্তিশালী হতে পারে। এই অবস্থায় শক্তিশালী জাতির পক্ষে দুর্বল জাতিকে কোন অভিসন্ধি ছাড়া কি সাহায্য করা সম্ভব? অথবা সম্ভব কি দুর্বল জাতিকে নিঃশর্ত সাহায্য দান—যা তার মনে অনুগ্রহ লাভের ধারণা জাগিয়ে তুলবে না, তার আত্মসম্মানকে আঘাত করবে না? প্রকৃতপক্ষে এইটাই আজ শক্তিশালী জাতিসমূহের সামনে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ। তাদের বুঝতে হবে যে, তাদের নিজেদের স্বার্থেই দুর্বল জাতিগুলিকে সাহায্য করা উচিত। যে জাতি আজ দুর্বল, সে যে বরাবরই দুর্বল থাকবে এমন কোন কথা নেই। তার বর্তমান দুর্বলতা কোন জাতিগত আভ্যন্তরীণ ক্রটির জন্য নয়—তার দুর্বলতা হয়তো কোন ঐতিহাসিক কারণে যার উপরে তার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না, অথবা প্রতিবেশী শক্তিশালী জাতিসমূহের অনুসৃত নীতির জন্য। তার দুর্বলতা অবশ্যই দুঃখজনক। কিন্তু শক্তিমানের সেই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণের কোন কারণই থাকতে পারে না। চিন্তাশীল মনীষীদের মধ্যে একটা ধারণা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে ; তা হল, সমগ্র পৃথিবীর একটি সত্তা এবং বিশ্বের সকল অধিবাসীর পরিণতিই একসূত্রে বাঁধা। জাতি, শ্রেণী বা সম্প্রদায়গত বিভেদগুলি কৃত্রিমভাবে রচিত। বহুকাল পূর্বেই ভারতবর্ষ এই সত্তার একত্বের সত্যটি আবিষ্কার করেছে। একত্বের এই ধারণাই ভারতবাসীর জীবনদৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। সকল মানুষ এক এবং অভিন্ন—এই ধারণার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে অহিংসাতত্ত্ব। অপরকে আঘাত করা প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই আঘাত করা। তাই আমরা অন্যকে আঘাত করতে পারি না-ভালবাসতে পারি। অপরকে আঘাত করার প্রতিক্রিয়া হয়তো আমরা সেই মুহূর্তে অনুভব না করতে পারি, কিন্তু যথাকালে তা দ্বিগুণ হয়ে আমাদেরই আঘাত করে। বন্ধুত্ব, শুভেচ্ছা, দান ও ভ্রাতৃত্ববোধ এই ঐক্যানুভূতি থেকেই জন্ম নেয়। এই ঐক্যবোধের স্বাভাবিক পরিণতি হল অন্যের মধ্যে নিজেকে অনুভব করা এবং নিজের মধ্যে অন্যকে অনুভব করা। অল্প কথায় বলা যায়, আপনি তখনই সুখ আশা করতে পারেন, যখন অন্য সকলে সুখী। আপনি কখনই অপরকে অসুখী রেখে নিজের স্থায়ী সুখ কামনা করতে পারেন না। যেখানে মানুষে মানুষে এই অভিন্নতার ধারণা গড়ে ওঠেনি সেখানে প্রকৃত সৌভ্রাত্র, প্রকৃত ঐক্য রচিত হতে পারে না।

একথা আজ বোঝার সময় এসেছে যে, শান্তির কোন বিকল্প নেই। যুদ্ধ কখনও যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটায় না, তা অপর একটি যুদ্ধের বীজ বপন করে মাত্র। হিংসা হিংস্রতরতা, ঘৃণা অধিকতর ঘৃণা জাগিয়ে তোলে। কেবলমাত্র ভালবাসাই ভালবাসাকে উদ্রিক্ত করতে পারে। কথাটা শুনতে হয়তো খুবই সাদামাঠা, কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোন পথই বা কোথায়? আপনার ডান গালে কেউ চড় মারলে আপনি যদি তাকে বাম গাল এগিয়ে দিতে পারেন, তাহলে তো খুবই ভাল। কিন্তু সকলেই তো আর সাধু-সন্ন্যাসী নয়, তাই সবার কাছ থেকে এ ব্যবহার আশা করা যায় না। কিন্তু একজন অপরকে আঘাতই বা করবে কেন? আমরা কি আমাদের মনকে সেইভাবে গড়ে তুলতে পারি না যাতে যথেষ্ট প্ররোচনা সত্ত্বেও পরস্পরকে আঘাত হানার চিন্তা থেকে বিরত থাকতে পারি? অন্ততপক্ষে ব্যবহারিক কারণের দিকে তাকিয়ে যে-কোনও

উপায়ে চিরতরে যুদ্ধ পরিহার করার সিদ্ধান্ত নিতে পারি না কি? এখনও পর্যন্ত আমরা এই চিন্তায় অভ্যস্ত যে, যুদ্ধ পরিহার করা অসম্ভব। আঘাত হানা ব্যাপারটার সঙ্গে আমাদের এত পরিচিতি হয়েছে যে, আমরা শুধু একে ন্যায়সঙ্গত বলেই মনে করি না, অবশ্যম্ভাবী, এমন কি প্রশংসনীয় বলেও মনে করি। আপনার ন্যায্য অধিকারের জন্য সংগ্রাম না করলে আপনি কাপুরুষ বলে পরিগণিত হবেন। কাপুরুষতা অবশ্য কোন মহৎ গুণ নয়, কিন্তু সংঘর্ষে লিপ্ত হবার আগে আপনি কি একবার খুঁজে দেখবেন না, আপনার 'ন্যায্য অধিকার' লাভ করার অন্য কোনও পথ আছে কিনা! সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লে যা আপনার বর্তমানে আছে সেটাও হারাবার আশঙ্কা থাকে না কি?

কাউকে ন্যায্য অধিকারের সংগ্রাম থেকে বিরত করার পক্ষে এই যুক্তি হয়তো ততখানি জোরালো নয়। কিন্তু এমন কোন উপায় কি তাহলে নেই, যাতে কোন জাতির মধ্যে থেকে 'যুদ্ধই অধিকার প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ'—এই মনোভাব দূর করে দেওয়া যায়? প্রতিষেধ যদি নিরাময়ের চেয়ে উৎকৃষ্টতর হয়, তাহলে প্রত্যেক বুদ্ধিজীবী ও নৈতিক নেতার কর্তব্য মানুষকে সেইভাবে শিক্ষিত করে তোলা যাতে তারা অন্যকে আঘাত না করে, এবং নিজে আহত হবার সুযোগ সৃষ্টি না করে। আত্মসংযম ছাড়া সভ্যতার মূল্য কি? সাম্রাজ্যবাদ লোভ ও অহঙ্কারের স্বাভাবিক ফল। যে-কোন রকমের আগ্রাসনও তাই। মানুষের মনের মধ্যেই থাকে যুদ্ধের বীজ—যেমন, ক্রোধ, ঘৃণা, অহং-মত্ততার অলীক মনোভাব, যে-কোনও উপায়ে অন্যের সম্পত্তি গ্রাসের প্রবণতা প্রভৃতি। শান্তি চাইলে এগুলিকে আগে মন থেকে উৎপাটিত করতে হবে। তার একটি উপায় হল, মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া—লোভ, ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতি পশুবৃত্তির প্রেরণায় যে-কাজগুলি করা হয়, সেগুলি কতদূর অনৈতিক। আর একটি উপায়: মানুষকে দেখিয়ে দেওয়া যে, এই ধরনের কাজগুলি কিভাবে পরিণামে সর্বদাই অকল্যাণ ডেকে আনে—সে অকল্যাণ আগ্রাসী শক্তি এবং যার বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করা হয় উভয়ের পক্ষেই।

এইখানেই দেখা দেয় লেখক সম্প্রদায়ের ভূমিকার গুরুত্ব। লেখকরাই পারেন যুদ্ধের অশুভ ফলাফল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তুলতে। এটা তাঁদের কর্তব্য ও নৈতিক দায়িত্ব। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য তখনই সার্থক হবে এবং উদ্যোক্তারা মানুষের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা লাভ করবেন, যদি এখানে সমবেত লেখকগণ এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যুদ্ধ যে নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, এ-সম্পর্কে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। যুদ্ধ বিজয়ী অথবা বিজিত উভয়েরই ধ্বংসের পথ। যুদ্ধে তাৎক্ষণিক লাভ মরীচিকা মাত্র এবং জয়ী অথবা পরাজিত, কেউই স্থায়ী কোন লাভ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাশা করতে পারেন না। বর্তমানে সম্ভাব্য পারমাণবিক যুদ্ধের তুলনায় অতীত যুদ্ধগুলি ছিল ছেলেখেলা মাত্র। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভবিষ্যৎ যুদ্ধ হবে 'টোটাল ওয়ার' বা সর্বব্যাপী সংগ্রাম। এই 'টোটাল ওয়ার' বলতে কি বোঝায়? এ যুদ্ধে শুধু পেশাদার সৈনিকরাই অংশগ্রহণ, হনন এবং মৃত্যুবরণে নিয়োজিত হবে না—সমগ্র মানবসমাজই হবে এ যুদ্ধের বলি। এ যুদ্ধে মৃত্যু সীমাহীন—বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশু, জীবজন্তু এমন কি উদ্ভিজ্জ বস্তুও ধ্বংস থেকে নিস্তার পাবে না। বৃহৎ শক্তিগুলি আজ আপাদমস্তক শস্ত্রসজ্জিত। তাদের অস্ত্রসজ্জার কারণ অন্য বৃহৎ শক্তি সম্পর্কে। তাদের আশঙ্কা যে, যে-কোন মুহূর্তে তারা আক্রান্ত হতে পারে, আর অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত হতে তারা

নারাজ। এই কারণে তাদের মধ্যে অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা। কিন্তু তারা কে কোন্ অস্ত্রে বলীয়ান সেকথা অপর কেউ নিশ্চিতভাবে জানে না, কারণ অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে সে সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষিত। কিন্তু পারমাণবিক প্রযুক্তি-বিস্তার (nuclear technology) ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতি দেখে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, তাদের হাতে এমন আয়ুধ রয়েছে যা ব্যবহৃত হলে গোটা মানবসমাজই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। হয়তো সবক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক মৃত্যু নাও ঘটতে পারে, কিন্তু ধীরে ধীরে এই ধ্বংসক্রিয়া এর পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত প্রসারিত হবে। কারণ যদি কেউ জীবিত থাকে তারাও হবে বিকলাঙ্গ। তাদের সন্তানরাও সেই অভিশাপ বহন করে জন্মগ্রহণ করবে এবং এমনিভাবেই মানবসমাজ ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সেই বিপর্যয়ের বিপুলতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা কঠিন। যুগ যুগ ধরে গড়ে-ওঠা আমাদের বহু গৌরবের সভ্যতা নিঃশেষে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এই বিপুল ধ্বংসকাণ্ডের পর হয়তো আর একটিও সজীব প্রাণের লক্ষণ থাকবে না।

একি কোন অতিশয়োক্তি? না। এদিক থেকে আমরা চোখ ফিরিয়ে থাকলেও এটা আজ অত্যন্ত নিষ্ঠুর সত্য। ইংরেজ ঐতিহাসিক টয়েনবীর মতে, 'মানবজাতির জীবন আজ বিপন্ন।'

টয়েনবীর সমগ্র বক্তব্যটিই আমি উদ্ধৃত করছি: "আজও আমরা বিশ্ব-ইতিহাসের এক পরিবর্তমান অধ্যায়ে, কিন্তু আজ এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যে-অধ্যায়টির আরম্ভ ছিল পশ্চিমীভাবে তার পরিসমাপ্তি ভারতীয়ভাবে হতেই হবে, যদি না আমরা মানবসমাজের আত্মহননের পন্থাকে শেষ পরিণতি হিসাবে বেছে নিই। বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য কারিগরি শিক্ষার দৌলতে বৈষয়িকক্ষেত্রে আমরা মিলিত হতে পেরেছি। কিন্তু এই পশ্চিমী নৈপুণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের দূরত্বই শুধু ঘুচিয়ে দেয়নি—সেই সঙ্গে বিশ্বের মানুষকে বিধ্বংসী আয়ুধে সজ্জিত করেছে। এখন তারা পরস্পরের খুব কাছে—পরস্পরের আক্রমণের সীমানার মধ্যে। অথচ এখনও তারা একে অন্যকে জানবার, বুঝবার বা ভালবাসার শিক্ষা লাভ করেনি। মানব-ইতিহাসের এই মহাসঙ্কটময় মুহূর্তে মানবজাতির পরিত্রাণের একমাত্র পথ ভারতীয় পথ। সম্রাট অশোক এবং মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা-নীতি এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বিধানই সেই পথ। এঁদের কাছেই আমরা পেতে পারি সেই মানসিকতা এবং আদর্শ—যা সম্ভব করে তুলতে পারে সমগ্র মানব-সমাজকে এক অখণ্ড পরিবার রূপে গড়ে উঠতে। পারমাণবিক যুগে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে হলে সেটাই মানবসমাজের কাছে একমাত্র পথ।"

বিশ্বের বিজ্ঞানীরা জানেন, শক্তিমান জাতিগুলির শস্ত্রাগারে কি ধরনের শক্তিশালী অস্ত্র থাকা সম্ভব। পৃথিবীতে পারমাণবিক যুদ্ধ হলে তার পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে সে-সম্পর্কে তাঁরা সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। বিলম্ব হয়ে যাওয়ার আগেই আমাদের সেই সতর্কবাণী সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। লেখক হিসাবে আপনাদেরই সেই সতর্কবাণী বহন করে নিয়ে যেতে হবে সাধারণ মানুষের কাছে এবং যেখানে যুদ্ধের কোন উদ্যোগ চলছে সেখানেই তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ জানাতে হবে। যে-কোন উপায়ে হোক, যুদ্ধকে প্রতিহত করতেই হবে। যুদ্ধ যদি উপস্থিত হয় তাতে সাধারণ মানুষকেই দুঃখভোগ করতে হবে সবচেয়ে বেশি। তাদের বোঝাতে হবে, যুদ্ধ বাধলে কি চরম মূল্য তাদের বহন করতে হবে। বর্তমান রণোন্মাদনাকে (war-

psychosis) পরিবর্তিত করতে হবে শান্তি-উন্মাদনায় (peace psychosis)। পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে গড়ে তুলতে হবে ভালবাসা ও শুভেচ্ছার পরিবেশ। এই পরিবর্তন আসতে পারে যদি বিশ্বব্যাপী লেখক-সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে সাধারণ মানুষের মনে ঐক্যবোধ জাগিয়ে তুলতে সক্রিয় হন। অতীতে ভারতের একটি সাধারণ মন্ত্র ছিল, 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ···মা কশ্চিৎ দুঃখভাক্ ভবেৎ।'—সকলে সুখী হোক, কোথাও দুঃখী যেন কেউ না থাকে। বিশ্বমানব যে একই পরিবার-ভুক্ত সেই মনোভাবের ভিত্তি এই মন্ত্রটি। বিশ্বপরিবারে এক-জনও যদি অসুখী থাকে তাহলে পরিবারভুক্ত কেউ সুখী হতে পারে না। বিশ্বসংসার যেন একটি মানবদেহ—মানবদেহের একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে সমগ্র দেহযন্ত্রটিই অসুস্থ হয়ে পড়ে। ঐক্যানুভূতির এই চিন্তার সঙ্গেই বিশ্বশান্তি-কামনা পূর্ণ সঙ্গতি লাভ করেছে। আমাদের শান্তির সৌধ গড়ে তুলতে হবে প্রেম ও শুভেচ্ছার ভিত্তিভূমির উপর, কারণ আমরা সকলেই এক। সংহারক যন্ত্র উৎপাদনে মানুষ যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। আজ শান্তি, ভালবাসা ও বন্ধুত্বের 'যন্ত্র' নির্মাণেও তাকে সমান দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে। মানুষ আজ দাঁড়িয়ে আছে সজীব আগ্নেয়-গিরির উপর, যে-কোন মুহূর্তে তার ধ্বংস ঘটতে পারে; কিন্তু এখনও সে পারে নিজেকে রক্ষা করতে। মানুষ যে এখনও তার শুভবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেনি এই সম্মেলনই তার প্রমাণ। এই সম্মেলনের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হোক—'আমরা যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই—যে-কোন উপায়ে শান্তি চাই।' ভারত-বর্ষে 'শান্তি' শব্দটি তিনবার উচ্চারণ না করলে কোন প্রার্থনা সম্পূর্ণ হয় না। সেই রীতির অনুসরণে আমার ক্ষুদ্র অভিভাষণ শেষ করছি সেই সংস্কৃত শব্দটি উচ্চারণ করে, 'শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ'।*

* বিগত ২৩ থেকে ২৬ অক্টোবর ১৯৮৪, চারদিনব্যাপী বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া শহরে বুলগেরিয়ার 'ইউনিয়ন অব রাইটার্স'-এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক পঞ্চম 'বিশ্বশান্তি' সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজিত এই শান্তি সম্মেলনে পৃথিবীর ৪৯টি দেশের ২০০ জন খ্যাতনামা সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। এই সমাবেশের প্রথম দিনের প্রদত্ত ভাষণটি বঙ্গানুবাদ করেছেন অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

সত্যের উপরই সকল সমাজ গঠিত হইবে; সত্য কখনও সমাজের সহিত আপস করিবে না। নিঃস্বার্থতার ন্যায় একটি মহৎ সত্য যদি সমাজে কার্যে পরিণত না করা যায়, তবে বরং সমাজ ত্যাগ করিয়া বনে গিয়া বাস কর। তাহা হইলেই বুঝিব, তুমি সাহসী। সাহস দুই প্রকারের: এক প্রকারের সাহস কামানের মুখে যাওয়া; আর এক প্রকার—আধ্যাত্মিক দৃঢ় প্রত্যয়ের সাহস।

—স্বামী বিবেকানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা ও তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য

ডক্টর নিমাইসাধন বসু

স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন তার জন্মলগ্ন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে লক্ষ লক্ষ দুর্গত জনগণের সেবা করছেন এবং সংগঠিত সমাজ-সেবামূলক প্রতিষ্ঠানরূপে সর্বজনস্বীকৃত। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই এর বীজ বপন করেছিলেন, এ ঘটনা সকলের জানা। মানবসেবার আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে নিজেই অনুপ্রবেশ করিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদাই দুঃখী মানুষের দুর্দশায় চিন্তিত ছিলেন। তিনি বলতেন, জীবই শিব! কে বলে যে তাদের দয়া দেখাও? দয়া নয়, সেবা—মানবসেবাই ঈশ্বর সেবার সম্মান পাবে! বিবেকানন্দকে তাঁর গুরুর এই কথা গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং স্বামীজী স্থির করেছিলেন যে, যখনই সুযোগ পাবেন তখনই এই নির্দেশকে কর্মে পরিণত করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিন-রাত্রি অসংখ্য পুরুষ ও নারীর দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনেছেন। সকলে তাঁর কাছে আসছেন একটু সান্ত্বনা ও আরামের জন্য, একটু করুণা, ভালবাসা, তাদের দুঃখ-দুর্দশায় একটু আশার আলোর জন্য। একবার বিবেকানন্দ যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন, তাঁকে নির্বিকল্প সমাধি দেবার জন্য, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কার করলেন, কারণ তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বরপ্রাপ্তিকেই জীবনের সর্বোত্তম প্রাপ্তি বলে মনে করতেন না। তিনি স্বামীজীকে বললেন একচোখো দৃষ্টিভঙ্গি বা স্বার্থপর না হতে। তিনি আশা করেন, সর্বোচ্চ জ্ঞান যেন সর্বোচ্চ মানবসেবায় পরিণত হয়।

এই বীজ, এর থেকে বেশি উর্বর জমিতে বপন করা সম্ভব হয়নি। বিবেকানন্দের মনে এইভাব সর্বদা জাগরূক ছিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ মে এই সম্বন্ধে তিনি প্রমদাদাস মিত্রকে এক পত্র লেখেন। ভারত ভ্রমণকালে তাঁর সর্বদা এই বিষয় মনে ছিল, এমন কি যুক্তরাষ্ট্র সফরকালেও। এই ভাব ক্রমশঃ তাঁর মনে দানা বাঁধছিল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা ২৭ এপ্রিল ১৮৯৬ তারিখের চিঠিতে এটা স্পষ্ট আকারে দেখা গেল। এই চিঠিতে তিনি সবিস্তারে এই ভাবী প্রতিষ্ঠানের কি আচরণবিধি হবে তাও জানিয়েছেন। এই চিঠিটি একটি স্মরণীয় দলিল। এটি স্বামীজীর সাংগঠনিক ক্ষমতা, কার্যকরী জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও দূর-দৃষ্টির প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তারপর এল সেই ঐতিহাসিক 'মে দিবস'। এ এক নতুন ধরনের 'মে দিবস'। ভারতবর্ষে একটি স্থায়ী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পক্ষে এটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে ঐতিহাসিক 'মে দিবসে'র সঙ্গে আমরা অধিক পরিচিত সেটা ছিল ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে। স্থানটি উত্তর কলকাতার বাগবাজার; বলরাম বসুর বাড়ি। মূল বক্তা স্বামী বিবেকানন্দ। অন্যান্য ত্যাগী সন্ন্যাসীরাও উপস্থিত। রামকৃষ্ণের বহু অনুরাগীও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ঐ ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় বক্তব্যের মধ্যে স্বামীজী বিশেষভাবে জোর দেন যে, যে-সঙ্ঘ স্থাপন করার প্রস্তাব তিনি রাখছেন তার মধ্যে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কার্যসূচী অবশ্যই থাকবে।—

(১) মানব কল্যাণের জন্য রামকৃষ্ণ যে সত্য প্রচার করেছেন, সেই সত্য প্রচার ও নিজ জীবনে তার প্রয়োগ করতে হবে।...এই সত্যকে নিজ জীবনে প্রতিফলিত করে জনজীবনে মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা করতে হবে।

(২) এই সঙ্ঘকে বিভিন্ন ধর্মের অনুগামীদে

মধ্যে একমাত্র অনাদি ও শাশ্বত ধর্মই যে বর্তমান তার প্রচার করতে হবে।

(৩) কার্যের পদ্ধতি হবে এই রকম :

(ক) এমন জ্ঞান ও বিজ্ঞান মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে যা জনগণের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক হবে।

(খ) কলা ও শিল্পে উৎসাহিত করতে হবে।

(গ) শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মমত গ্রহণ,—জনগণের মধ্যে প্রচার ও ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে।

(৪) বিদেশে এই সঙ্ঘের কাজ হবে ভারতবর্ষের সঙ্গে সেই দেশের সম্পর্ক আরও ভাল করা।

শুধু ভারতে নয় পৃথিবীর ইতিহাসে স্বামীজীর এই সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠা একটি নজীরবিহীন আন্দোলন। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে বিবেকানন্দ দায়মুক্ত হলেন। স্বামীজী দেখেছিলেন, ঠাকুরের মনে কি তীব্র প্রতিক্রিয়া হত যখন চরম দারিদ্র্য ও দুর্দশাতে সাহায্য করার জন্য কেউ দয়া দেখাত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, জীবে দয়া? দয়া দেখাবার তুমি কে? তুমি তো একজন হতভাগ্য! তুমি দয়া করবে? না—না, দয়া নয়।—শিবজ্ঞানে জীবসেবা। স্বামীজীর এই কথাগুলি শোনার সুযোগ হয়েছিল। তার অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করে স্বামীজী স্থির করেছিলেন, যদি ঈশ্বর সুযোগ দেন, তাহলে এই সত্য আমি পৃথিবীতে জ্ঞানী-অজ্ঞানী, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলের মধ্যে প্রচার করব।

রামকৃষ্ণ মিশনের উৎপত্তি, ভিত্তি ও উদ্দেশ্য আলোচনা এখানে প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক। 'সংগঠিত সেবাকার্য' ভারতে ও পশ্চিমী পৃথিবীতে খ্রীষ্টীয় আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত এই ধারণাই বদ্ধমূল। স্বামীজী এই আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হন। বিদেশী পণ্ডিতদের মধ্য থেকে দুজনের দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যায় এই প্রসঙ্গে। সি. এইচ. হেমস্থাথ তাঁর 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যালিজম্ ও হিন্দু সোস্যাল রিফর্ম' গ্রন্থে লিখেছেন, রামকৃষ্ণ মিশন গভীর মনন ও সমাজ-সেবার দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। প্রথমতঃ, প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস ও ভক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা। দ্বিতীয়তঃ, হেমস্থাথের মতে, পাশ্চাত্যের আদর্শে সমাজ-সেবা ও লোকহিতৈষণার দ্বারা। রিচার্ড ল্যানয় তাঁর 'দি স্পীকিং ট্রি' গ্রন্থে ইঙ্গিত করেছেন যে, রামকৃষ্ণ মিশন খ্রীষ্টীয় চিন্তায় প্রভাবিত এবং হিন্দুধর্ম যে একেশ্বরবাদ ধর্মের মধ্যে নিহিত সেই ঐতিহাসিক সার্বজনীন ভাব প্রচারে উদ্যমী,—তাও পাশ্চাত্য মতের অনুগামী এই ইঙ্গিতও করেছেন।

ঠিকভাবে বলতে গেলে এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলি ভ্রান্ত। আগেই সংক্ষেপে জানানো হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে। সেখানে খ্রীষ্টীয় মতের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের মতবাদের মূলগত পার্থক্য পরিষ্কারভাবে জানানো হয়েছে। সঙ্ঘ-গঠনের জন্য স্বামীজীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, যদিও পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ফলে তা সম্ভব হয়েছিল। তিনি নিজেই তা পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন তাঁর 'মে দিবসে'র বক্তৃতায়। যখন তিনি বললেন, বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণের পর আমার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, কোন প্রতিষ্ঠান গঠন ছাড়া কোন বড় অভিপ্রায় কৃতকার্য করা সম্ভব নয়। এটাও অবশ্য স্বীকার্য যে, স্বামীজীর কয়েকজন গুরুভাই, স্বামীজী যে আদর্শ বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করছেন সে-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। স্বামী যোগানন্দ সন্দিগ্ধভাবেই স্বামীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি বিদেশী নিয়মে এই সকল রীতি এখানে প্রয়োগ করতে চাইছ! তুমি কি বলতে পার, ঠাকুর এই রকম কোন নির্দেশ দিয়েছিলেন? সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী যে উত্তর দিয়েছিলেন তা অত্যন্ত

প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, বেশ, তুমি কেমন করে জানলে যে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ নয়? তাঁর ছিল এক অফুরন্ত উদার সহানুভূতি। জীবনের সীমাবদ্ধ চিন্তাকে তিনি সাহসের সঙ্গে অসীমের দিকে চালিত করতে পারতেন। আমি সকল গণ্ডীকে ভেঙে দেব এবং পৃথিবীতে তাঁর সেই অসীম ভাবের কথা প্রচার করব। দিকে দিকে ছড়িয়ে দেব···। আমি পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে জন্মগ্রহণ করিনি। স্বামীজী এখানেই থামেননি। তিনি আরও এগিয়ে যান। উত্তরের শেষ অংশে যোগানন্দ স্বামীকে আরও জানান যে, তিনি ভারতের ভূমি ও মানুষকে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখেছেন এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর অনন্ত পরিধিকে জীবনের অঙ্গীভূত করে উপলব্ধি করেছেন। কিছুক্ষণের জন্য যেন স্বামীজীর মধ্যে ঢাকা আগ্নেয়গিরির আবরণ উন্মোচিত হয়েছিল। তিনি আবেগের সঙ্গে জানালেন :

"প্রভুর দয়ার নিদর্শন ভূয়োভূয়ঃ এ জীবনে পেয়েছি। তিনি পেছনে দাঁড়িয়ে এ-সব কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। যখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে গাছতলায় পড়ে থাকতুম, যখন কৌপীন আঁটবার বস্ত্রও ছিল না, যখন কপর্দকশূন্য হয়ে পৃথিবীভ্রমণে কৃতসংকল্প, তখনও ঠাকুরের দয়ায় সর্ববিষয়ে সহায়তা পেয়েছি। আবার যখন এই বিবেকানন্দকে দর্শন করতে চিকাগোর রাস্তায় লাঠালাঠি হয়েছে, যে সম্মানের শতাংশের একাংশ পেলে সাধারণ মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়, ঠাকুরের কৃপায় তখন সে সম্মানও অক্লেশে হজম করেছি—প্রভুর ইচ্ছায় সর্বত্র বিজয়! এবার এদেশে কিছু কাজ ক'রে যাব, তোরা সন্দেহ ছেড়ে আমার কাজে সাহায্য কর্, দেখবি—তাঁর ইচ্ছায় সব পূর্ণ হয়ে যাবে।" [বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৬৩]

রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে খ্রীষ্টান মিশনের মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে পার্থক্য দেখা যায় তুলনামূলক বিচার, অভীষ্ট ও লক্ষ্য অনুধাবন করলে। এতৎ সত্ত্বেও বলা যায় যে, খ্রীষ্টান মিশনারিদের বিশ্বাস ও কাজের মধ্যে সমবেদনার কঠিন চাপ, কর্তব্যনিষ্ঠা, পরোপকার, পাপীর মুক্তি এবং ধর্মান্তরকরণ ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হয়েছে যা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিক্ষা এবং সামাজিক ও ধর্মীয় প্রত্যয়ের মধ্যে নেই। আমরা তা দেখতে পাই কতকগুলি খ্রীষ্টান মিশনারির নামের মধ্যেই; যেমন, খ্রীষ্টান জ্ঞানোন্নয়ন সমিতি, খ্রীষ্টীয় প্রত্যাদেশ প্রচার সমিতি, ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সমিতি, লণ্ডন মিশনারি সমিতি, চার্চ মিশনারি সমিতি, ব্রিটিশ ও বিদেশী বাইবেল সমিতি ইত্যাদি। নামকরণের মধ্য দিয়েই তাদের উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কারভাবে লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, খ্রীষ্টানসম্প্রদায়ের মত হচ্ছে, যখন কারও ব্যক্তিগত মুক্তির পূর্ণ বিশ্বাস আসে, নতুন জন্মান্তর হয়, তখনই ধর্মান্তরকরণ সম্ভব এবং পাপের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্প্রদায় প্রচার করে, "মানুষ দোষী, ভগবান যীশু মৃত, আবার মুক্তিও সম্ভব।" উইলিয়ম কেরীর উদ্যমে খ্রীষ্টীয় সমিতি গঠন করা হয়, যিনি 'অ্যান ইনকোয়ারী ইন্টু দি অবলিগেশনস্ অব খ্রীষ্টানস্ টু ইউস মীনস্ ফর্ দি কনভারসন অব দি হীদেনস্' ইত্যাদি পুস্তিকায় উল্লেখ করেন, খ্রীষ্টান মিশনারি সমিতির মূল উদ্দেশ্য "দরিদ্র, অন্ধকারাচ্ছন্ন, প্রতিমাপূজক, ধর্মহীন ব্যক্তিদের খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক দ্বারা খ্রীষ্টান করা।" চার্চ মিশনারি সোসাইটির প্রচারক রিচার্ড বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন, "কবে এমন দিন আসবে যখন ভারত আমাদের মহান ত্রাণকর্তা যীশুর কাছে মাথা নত করবে?" ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন মিশনারি সোসাইটির একজন

প্রচারক লিখেছিলেন, "আমরা শত্রুর দুর্গে আমাদের ক্রুশ তুলে দিয়েছি…আমরা আমাদের তরবারি নামিয়ে রেখেছি এবং স্থির করেছি এই ভারতে ভগবান যীশুকে তাঁর সিংহাসনে স্থাপনের জন্যই ব্যবহৃত হবে।"

খ্রীষ্টান মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যাবলী ও উদ্দেশ্য সমসাময়িক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর মূল্যায়ন করতে হবে। খ্রীষ্টীয় সংগঠন এবং প্রচারকগণ সুস্পষ্টভাবে সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা সত্বেও ভারতীয় জীবনে ও চিন্তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুমুখী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ভারতে ও বিদেশে সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনগুলির বিভিন্ন স্তরভেদে সংশোধন বা ধর্মাভিযানের কোন স্থান নেই, লক্ষ্য করা যায়। অন্য কেউ নয় স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই খুব জোরের সঙ্গে সমালোচনা করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের মধ্যে কোন ব্যক্তি-বিশেষ, দল বা ধর্মসম্প্রদায়ের সমালোচনা স্বামীজী নিজেই কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ উভয়েরই যীশু ও তাঁর উপদেশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। যীশুখ্রীষ্টকে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ও অনুরাগিগণ মূল সত্যের এক আধ্যাত্মিক নেতা রূপে মনে করেন। তবুও ঐতিহাসিকদের ভুল ধারণা, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত, আপত্তি ও সংশোধন করা প্রয়োজন।

ভারতে ও বিদেশে সহস্র-সহস্র হতভাগ্য আর্তজনের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন মাদার টেরেসা ও তাঁর 'মিশনারিস্ অব চ্যারিটি' নামক প্রতিষ্ঠান। তাঁর মতে তাদের সেবাই ভগবান যীশুর সেবা। আমরা স্মরণ করতে পারি, কয়েক দশক আগে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের যুবকদের ডাক দিয়ে বলেছেন যে, ঈশ্বর সর্বত্র এমন কি সকলের মধ্যে বিদ্যমান। তারা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে পীড়িতের মধ্যে, কুষ্ঠরোগীর মধ্যে, পাপীর মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, মানুষ ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারে, যদি মানবদেহের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে তাঁকে ভাই, বোন, পিতা, মাতা বা শিশুর মতো স্নেহ ভালবাসা দেখাতে পারে। এই শ্রীরামকৃষ্ণই আবার বলেছেন যে, তোমরা আমার নিন্দা করতে পার, কারণ যদি একজনকে সাহায্য করার জন্য আমাকে বার-বার জন্মগ্রহণ করতে হয়, এমনকি কুকুরের রূপেও। এজন্যই রোমাঁ রোলাঁ তাঁর রামকৃষ্ণ-জীবনীতে পাঠকদের জানিয়েছেন, "সময় ও দেশের পার্থক্য বাদ দিলে আমরা রামকৃষ্ণদেবকে যীশুর ছোট ভাইরূপে দেখতে পাই।"

ঐতিহাসিকগণসহ অধিকাংশ লোকই ঠিক-ভাবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার শক্তি, গতি ও গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত নন। ক্রিস্টোফার ইশারউডের মতে "আমাদের সময়ে এই ধর্মীয়-ভাবধারাই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ।" ইশারউড আরও ব্যাখ্যা করেছেন, কারণ এর উৎসে এক অতুলনীয় ব্যক্তি—'এক অসাধারণ দৃশ্য'। শ্রীরাম-কৃষ্ণ ঐশ্বরিক সত্যের এক জীবন্ত রূপ। এই ভাব, পূর্বে ও পশ্চিমে এক নতুন সমত্ববোধ, শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়ার সৃষ্টি করেছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা বিনা কারণে ধর্মের ছদ্মবেশে সাম্রাজ্য-বাদকে লক্ষ্য রেখে ধর্মান্তর বা পরিবর্তন করার চেষ্টা করেনি বা আজও করছে না।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর পর্বতপ্রমাণ গ্রন্থ 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষে'র কয়েক-খণ্ডে প্রচুর প্রমাণসহ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রকাশ করেছেন। মার্গারেট ই. নোবল (পরবর্তিকালে সিস্টার নিবেদিতা) ১ অক্টোবর ১৮৯৭ তারিখের এক চিঠিতে নতুন প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "ব্যবহারিক কর্ম ও মানব সেবার

আদর্শ আমাদের বিস্মিত করে এবং কেউ কিছু বলতে চাইলে অবশ্যই এই ভাষায় বলবেন। এই ভ্রাতৃভাব মঠে বর্তমান এবং এর প্রসার এতেই সম্ভব —যা আমাদের চোখে সহযোগ-সংগঠনের মাধ্যমে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বিভিন্ন শাখায় প্রসারিত।" রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলীর সংগঠন ও সন্ন্যাসিগণের নিঃশব্দ কর্মপদ্ধতি এবং নিজেদের সর্বতোভাবে প্রচারবিমুখতা আশ্চর্যজনক সফলতা এনে দিয়েছে। প্রচারবিমুখতা একটি নতুন দৃষ্টান্ত এবং উচ্চপর্যায়ের সরকারী কর্মচারীদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। দেওঘরের সাবডিভিশনাল অফিসার এইচ. এইচ. হার্ড তাঁর রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মপদ্ধতি প্রসঙ্গে লিখেছেন, "এত নিঃশব্দে, উদারভাবে ও নিঃস্বার্থরূপে এই মিশনের কার্য সাধিত হয় যা তিনি নিজে উপস্থিত থেকেও অনুভব করতে পারেননি।" তাঁকে সবচেয়ে বেশি অভিভূত করেছে এই সংগঠনের কর্মপদ্ধতি। ১৫ ডিসেম্বর ১৯০১ তারিখের 'দি রিফর্মার' মিশনের সর্বতোভাবে অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের কথা লিখেছে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুলাই-এর 'নেটিভ অপিনিয়ন' রামকৃষ্ণ মিশনের যথোচিত গুণাবলী উল্লেখ করে লিখেছে যে, মানবের দুঃখভার লাঘবের জন্য কার্যকরী পদ্ধতি রামকৃষ্ণ মিশনই গ্রহণ করেছে। ঐ কাগজের মতে, রামকৃষ্ণ মিশন পূর্ব ও পশ্চিমের আদর্শকে একীভূত করেছেন। বিবেকানন্দের অতুলনীয় কীর্তি হচ্ছে মানবকে এক ধর্মীয় রূপ দান যা উপযুক্তভাবে নির্ণয় করেছেন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী জি. এস. ঘোরে। তিনি লিখেছেন, "(রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মতো) দুজন অত্যন্ত উন্নত ও অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এক ঐশ্বরিক শক্তি উদ্ভব হয়েছে যা বিবেকানন্দকে আধুনিক কালের সবচেয়ে মৌলিক ও বিশিষ্ট যোগীর আদর্শে পরিণত করেছে।...তিনি রুচিবিজ্ঞানের আদর্শ সংগঠন ও সংশোধন করেছেন।"

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মতবাদ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মধারা যুবকদের মনে গভীর এবং স্থায়ী রাজনৈতিক শক্তির সঞ্চার করেছিল। তাও সর্বজনবিদিত যে, বিবেকানন্দ নিজে কোনরূপ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হোক এটা কখনও চাননি। স্বামীজীর মহাসমাধির পর মিশনের কর্তৃপক্ষ সেই একই ভাবধারা অনুসরণ করছেন এবং কখনও রামকৃষ্ণ মিশন ও তার কোন শাখাকেন্দ্রে ভারতীয় বিপ্লবীদের থাকার বা কার্যক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করার অনুমতি দেননি। তবুও মিশনের কর্মপদ্ধতি পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীদের বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। ১৯১৭, ২ মার্চ চিফ সেক্রেটারী স্টিফেনসন তাঁর নিজস্ব গোপন রিপোর্টে লিখেছেন, "এক মুহূর্তের জন্যও মনে হয় না যে এরা বিপ্লবী, কারণ এদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের যোগ আছে। আবার আমি মনে করি যে, অনেক ক্ষেত্রে বিপ্লবীরাই মিশনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এটাও ঠিক।" স্টিফেনসন ব্যাখ্যা করে বলেন, "বিবেকানন্দের শিক্ষা শাসকবিরোধী বা ক্ষতিকারক নয়। কিন্তু তা বিপ্লবী চিন্তাধারায় প্রথম পদক্ষেপ রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে।" এই হচ্ছে 'রামকৃষ্ণ ভাবধারা' যেখানে বিবেকানন্দের শিক্ষা ও রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যধারা প্রসারিত, যা বিশেষ পুলিশ প্রধান টেগার্ট ও বিচক্ষণ পুলিশ কর্মচারী স্টিফেনসনকে চিন্তান্বিত করেছিল। বিবেকানন্দের শিক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশনের সমাজসেবা ও মর্যাদা সম্বন্ধে তাঁরা অবহিত ছিলেন। এটি রামকৃষ্ণ ভাবধারার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত আত্মোন্নতি ও বিশেষ সেবার দ্বারাই সম্ভব, যা যুবক বিপ্লবীদের আহ্বান করেছিল। সমকালে কথিত 'রেডবুক'-এর টেগার্ট-বিবরণী ও স্টিফেনসনের টীকায় উল্লেখ

আছে, "বিপ্লবিগোষ্ঠীতে যুক্ত বিপ্লবীরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আদর্শে গঠিত। এই আদর্শ যেখানে বর্তমান সেখানে এঁদের কাজ সহজ হয়েছে।" নির্ভীক জাতীয়তাবাদকে শুধু ত্বরান্বিত করা নয়, রামকৃষ্ণ মিশন এমন এক বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল যার প্রমাণ হচ্ছে চতুর্দিকে জাতীয় অভ্যুত্থান ও উন্নতিতে উৎসাহদান।

স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের অসংখ্য কর্মী, অনুরাগী ও সন্ন্যাসীদের জন্য একটি মহৎ, উচ্চ ব্যবহারিক কর্ম ও আদর্শ রেখে গেছেন। স্বামীজীর সকল কর্মের পিছনেই রামকৃষ্ণ বর্তমান, স্বামীজীর অনুপ্রেরণার মূল উৎস রামকৃষ্ণ, যিনি তাঁর জীবন-দেবতা। তিনি তাঁর গুরুর নামেই এই সঙ্ঘ করেছেন। তবুও স্বামীজী তাঁর গুরু-ভাই, শিষ্য ও অনুরাগীদের সতর্ক করে বলেন, "আদর্শকে ধরে কাজ করবে,ব্যক্তি মানুষকে নয়।" তিনি সতর্ক করে মনে করিয়ে দেন যে, পূর্ববর্তী আচার্যের শিষ্যগণ তাঁর নির্দেশিত পথ ও সেই ব্যক্তি মানুষকে এমনভাবে মিশিয়ে ফেলেছেন যে, আর আলাদা করা অসম্ভব এবং শেষে দেখা গেছে, সেই আচার্যের জন্যই সেইভাব নষ্ট হয়ে গেছে। স্বামীজী চাননি যে, রামকৃষ্ণ মিশন সেই ভুলই করুক। তিনি খুব জোরের সঙ্গে বলেন, আমাদের দেখা প্রয়োজন এবং অনুভব করা দরকার যে, ঈশ্বর সকলের মধ্যে এবং সর্বত্র আছেন। তিনি জনসাধারণকে নির্দেশ দেন, "শতবর্ষ বাঁচার ইচ্ছা ভাল, পার্থিব ইচ্ছাও পূরণ হতে পারে, তাকে দেবত্বে আরোপ কর, ঈশ্বর-সুখের দিকে পরিবর্তিত কর। সুখী ও উপকারী দীর্ঘ জীবনযাপনের ইচ্ছা কর এবং পৃথিবীতে তার উদ্যোগ দেখাও···সকল জিনিসের মধ্যে ভগবান আছেন; এখান ছেড়ে কোথায় তাঁকে খুঁজতে যাবে? তিনি সকল কাজের মধ্যে, সকল চিন্তার মধ্যে এবং সকল অনুভবের মধ্যে বর্তমান।"

স্বামীজী তাঁর শিষ্যদের এই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ও অপর সকল সঙ্ঘ যে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই মত ও কর্মের গুরুত্ব সম্বন্ধে স্মরণ করিয়ে দেন। যে-কোন ক্ষেত্রে ও পেশায় উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিদের কাছে এটাই মূল শক্তি। স্বামীজী বলেছেন, "যে-কোনরূপ কাজকে কখনও ছোট করে দেখো না।···মানুষকে তাঁর কাজ দিয়ে বিচার করো কাজের পদ্ধতি দিয়ে নয়।···একজন মুচি তার পেশা ও কাজের দ্বারা খুব কম সময়ে একজোড়া সুন্দর জুতা তৈরি করছে অথচ একজন অধ্যাপক জীবনের প্রতিদিন বাজে বকে সময় নষ্ট করছে।" পরিশ্রমের এমন সুন্দর শক্তিশালী ব্যাখ্যা খুব কমই দেখা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হওয়ার পর জন্ এফ. কেনেডি তাঁর দেশবাসীকে বলেছিলেন যে, কেউ যেন জিজ্ঞাসা না করেন, দেশ তার জন্য কি করল? সে যেন নিজেকেই জিজ্ঞাসা করে, সে নিজে দেশের জন্য কি করতে পারে। কেনেডির এই বক্তব্য দেশবাসীর উপর বিশেষ বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। এটা এখন বেশ চালু হয়েছে। কিন্তু আমরা বেশ কষ্ট করে মনে করি যে, স্বামীজী তাঁর দেশবাসীকে বেশ জোরের সঙ্গে উৎসাহিত করে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন এবং অনুসরণ করতে বলেছিলেন :

"প্রথমতঃ আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা সকলেই জগতের নিকট ঋণী; জগৎ আমাদের নিকট এতটুকু ঋণী নয়। আমাদের সকলেরই মহা সৌভাগ্য যে, আমরা জগতের জন্য কিছু করিবার সুযোগ পাইয়াছি। জগৎকে সাহায্য করিতে গিয়া আমরা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরই কল্যাণ করিয়া থাকি। দ্বিতীয়তঃ এই জগতে একজন ঈশ্বর আছেন। ইহা সত্য নয় যে, এই জগৎ স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে এবং তোমার বা আমার সাহায্যের অপেক্ষায়

রহিয়াছে। ঈশ্বর জগতে সর্বদাই বর্তমান। তিনি অবিনাশী, নিয়ত ক্রিয়াশীল, তাঁহার সতর্কদৃষ্টি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। যখন বিশ্বজগৎ নিদ্রা যায়, তখনও তিনি জাগিয়া থাকেন। তিনি অবিরত কাজ করিতেছেন। জগতে যাহা কিছুর পরিবর্তন ও বিকাশ দেখা যায়, সবই তাঁহার কাজ। তৃতীয়তঃ আমাদের কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নয়। এই জগৎ চিরকাল শুভাশুভের মিশ্রণ হইয়াই থাকিবে। আমাদের কর্তব্য—দুর্বলের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা এবং অনিষ্টকারীকেও ভালবাসা। এ জগৎ একটি বিরাট নৈতিক ব্যায়ামশালা—এখানে আমাদের সকলকেই অনুশীলন করিতে হইবে, যাহাতে দিন দিন আমরা আরও বেশি আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিতে পারি। চতুর্থতঃ আমাদের কোনপ্রকারের গোঁড়া হওয়া উচিত নয়, কারণ গোঁড়ামি প্রেমের বিপরীত।" [বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৬-০৭]

আমি আবার আর একটি উপমা দিতে প্রলুব্ধ হচ্ছি। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে সভাপতি ফ্রাঙ্কলিন ডিলেনো রুজভেল্ট যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি নিয়ে চারটি মুক্তির বাণী উচ্চারণ করেছিলেন—বাক্-স্বাধীনতা, পূজা করার স্বাধীনতা, না চাওয়া থেকে বিরত থাকার স্বাধীনতা এবং ভয়শূন্য হবার স্বাধীনতা। এইগুলি সাধারণ মানুষের মনে ধরেছিল। যুদ্ধকালীন জরুরীর মতো আজকের পৃথিবীকে স্বামীজীর ঐ চারটি আদর্শ মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ্যে স্বীকার করতে হবে। রামকৃষ্ণ মিশনও তাই বিবেচনা করে এবং স্বামীজী প্রবর্তিত মানবজীবনের মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসের বীজরোপণ এবং তাকে পুষ্টিসাধনের কার্যকরী রূপ দেবার বিষয় বিবেচনা করে। রামকৃষ্ণ মিশন অত্যাবশ্যকভাবে এবং স্বাভাবিকভাবে ভারতীয়—মূলে ও চরিত্রে।*

*২৪ জুলাই ১৯৮৪; রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের ৫২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণটি শ্রীবিমলকুমার ঘোষ কর্তৃক অনূদিত।

তুমি ব্রহ্ম

শ্রীরতনকুমার নাথ

সন্ধ্যার তপোবনে মহাযোগী গুরু উদ্দালক
সস্নেহে কহিলেন, 'শ্বেতকেতু!' দাঁড়াল বালক
নতমুখে। গুরু তারে কহিলেন, 'শুন দিয়া মন,
জল পাত্রে রেখে দিও একখণ্ড মণ্ডিত লবণ,
কাল প্রাতে এনো তারে।' বালক চলিয়া গেল ধীরে।

রাত্রি গেল। সূর্য এসে দাঁড়ালেন পূরবীর তীরে।
প্রিয়শিষ্যে গুরুবর কহিলেন, 'তোমারে শুধাই,
আছে কি লবণখণ্ড?' উত্তরিল শ্বেতকেতু, 'নাই।'

গুরু কহিলেন পুনঃ, 'পান করো প্রিয় পুত্রবর
পাত্র হতে আদিমধ্য অন্তস্থিত জল পরস্পর,
তারপর বলো স্বাদ।' পানশেষে শ্বেতকেতু কহে,—
'সর্বত্র লবণময়। একই স্বাদ, অন্য কিছু নহে।'

সৌম্য হেসে কহিলেন মহাযোগী গুরু উদ্দালক,—
'তোমার অন্তর মাঝে সত্যময় বিশ্বের চালক,
রূপহীন আত্মারূপে সর্ব অঙ্গে বিরাজিত রহে।
তুমিও ঈশ্বরময়, তুমি ব্রহ্ম, অন্য কিছু নহে।'

স্বামীজীর ইংরেজী কবিতা

ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

স্বামীজীর বাংলা কবিতার মতো স্বামীজীর ইংরেজী কবিতাও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এগুলির সাহিত্যমূল্যও যথেষ্ট। আধ্যাত্মিক ও ধর্মমূলক কবিতা উৎকৃষ্ট কবিতা হতে পারে না বলে কেউ কেউ মনে করেন। ডক্টর জনসন্ এই ধরনের কবিতা খুব একটা পছন্দ করতেন না। তাঁর মতে, 'religion clips the wings of the poet's imagination'.[1] তিনি আরও বলেছেন, 'poetical devotion cannot often please'.[2] এই সব কথা একটু অদ্ভুত শোনালেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বেশ-কিছু ধর্মমূলক কবিতা কাব্যের দিক থেকে খুব নিম্নমানের। বিষয়বস্তুর গুরুত্বের জন্য এগুলিকে কবিতা-রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ওয়র্ডসোয়র্থ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন যে, যাঁরা নীতিবাদী তাঁরা যখন তাঁদের অভিপ্রেত সত্যের সন্ধান কোন কবির রচনায় পান তখন তাঁদের কাছে সেই কবি 'মহান্ কবি'র মর্যাদা পেয়ে থাকেন। পাঠকদের মতো কবিরাও অভীপ্সা এবং প্রাপ্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেন না, এ-কথা বলেছেন টি. এস্. এলিঅট। তাঁর ভাষা উদ্ধৃত করছি :

'Why, I would ask, is most religious verse so bad ; and why does so little religious verse reach the highest levels of poetry ? Largely, I think, because of a pious insincerity···People who write devotional verse are usually writing as they want to feel, rather than as they do feel.'[3]

এলিঅটের সিদ্ধান্ত, অনেক ধর্মমূলক কবিতা ভাল কবিতা হয় না শুধুমাত্র আন্তরিকতার অভাবে। স্বামীজীর কবিতাতে তাঁর আন্তরিকতা প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে পরিস্ফুট।

আধ্যাত্মিক বা ধর্মমূলক বা নীতিমূলক কবিতাকে প্রথমে কবিতা হতে হবে, পরে আসবে অধ্যাত্মবাদ বা ধর্ম বা নীতির কথা। তবেই এর প্রকৃত উৎকর্ষ। এ সম্বন্ধেও স্বামীজী সচেতন ছিলেন। আদর্শ, মতবাদ, নীতি—এ-সবই তাঁর কবিতায় আছে, কিন্তু তা কখনও কবিতার কাব্যত্বকে নষ্ট করেনি। তাঁর বক্তব্য শুধু বক্তব্য থাকেনি, তিনি তাঁর বক্তব্যকে কবিতায় রূপান্তরিত করতে পেরেছেন। এই রূপান্তরের জন্যই তাঁর কাব্যের উৎকর্ষ। এই রূপান্তরের কথা C. Day Lewis তাঁর 'The Poet's Task'-এ আলোচনা করেছেন :

'I see no valid reason for debarring dogma from poetry, if dogma is the best grist for your particular mill. One asks nothing of a mill except that what comes out at the other end should be, not grist, but flour. Doctrinal verse, didactic verse are very well ; but they

১ ধর্ম কবির কল্পনার ডানা কেটে দেয়।

২ কাব্যিক ভক্তি অনেক সময় খুশি করতে পারে না।

৩ আমি প্রশ্ন করতে চাই, বেশির ভাগ ধর্মমূলক কবিতা এত খারাপ হয় কেন? আর কেন এত স্বল্প-সংখ্যক ধর্মমূলক কবিতা কাব্যের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছয়? আমার মনে হয়, প্রধানত এক ধরনের সততার অভাবের জন্য যেটা আপাতদৃষ্টিতে সাধু···যাঁরা ভক্তিরসের কবিতা লেখেন তাঁরা সাধারণত যা অনুভব করতে চান সেই অনুসারে লেখেন, যা সত্যি অনুভব করছেন সেভাবে নয়।

are not poetry, unless the moral truths have been translated into poetic truth.'[8]

স্বামীজী আমাদের 'অভীঃ'-মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন। তাঁর সঞ্জীবনী বাণী: 'হে বীর, সাহস অবলম্বন করো।' এই মন্ত্র, এই বাণী স্বামীজীর কাব্যেরও মূল সুর। 'বীর সন্ন্যাসী বিবেকের' যে-বাণীর কথা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখ করেছেন সে-বাণী অভয়বাণী। সে-বাণী স্বামীজীর গদ্য রচনায় যেমন স্পষ্টভাবে উচ্চারিত কবিতাতেও তেমনি উদাত্ত সুরে ঝংকৃত। তাই তাঁর কাব্যসংকলনের 'বীরবাণী' নাম সার্থক।

স্বামীজীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'Hold on yet a while, brave heart' বীররসে পূর্ণ। যে 'বীর হৃদয়'কে তিনি কিছুকাল ধৈর্য ধারণ করতে বলছেন, সে যেমন তাঁর নিজের হৃদয় তেমনি আবার পাঠকেরও হৃদয়। যে-বীররসে তিনি নিজে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, সেই রস তিনি পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। কবি এখানে পাঠকের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন, সম্পূর্ণভাবে মিলতে পেরেছেন, এটাই এ-কবিতার সবচেয়ে বড় সার্থকতা। স্বামীজীর এই কবিতা পড়তে পড়তে আর্থার হিউ ক্লাফ্-রচিত 'Say not, the struggle naught availeth' কবিতাটির কথা আমাদের স্মরণে আসে। স্বামীজীও ক্লাফের মতো আশাবন্ধে হৃদয়কে বাঁধার সংকল্পের কথা বলেছেন। ক্লাফের 'Qua Cursum Ventus' কবিতাটিও স্বামীজীর কবিতার প্রসঙ্গে মনে পড়ে, বিশেষত নিম্নোক্ত স্তবকটি :

To veer, how vain! On, onward strain,
Brave barks! In light, in darkness too,
Through winds and tides one compass guides—
To that, and your own selves, be true.'[5]

মেঘাচ্ছন্ন সূর্যের ছবি দিয়ে স্বামীজী তাঁর কবিতা আরম্ভ করেছেন; ক্লাফ্ তাঁর 'Say not' কবিতাটি সূর্যের ছবিতে শেষ করেছেন :

And not by eastern windows only,
When daylight comes, comes in the light
In front, the sun climbs slow, how slowly
But westward, look, the land is bright.'[6]

শেলি এই আশার সুরই শুনিয়েছিলেন তাঁর 'Ode to the West Wind' কবিতার শেষ পঙ্ক্তিতে—'If winter comes, can spring

৪ মতবাদকে কবিতা থেকে বাদ দেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ আমি দেখি না যদি মতবাদই কোন লেখকের পক্ষে সবচেয়ে লাভজনক হয়। তাঁর কাছ থেকে শুধু এইটাই চাওয়া হবে যে, তিনি যেটা সৃষ্টি করবেন সেটা যেন পরিচ্ছন্ন বা পরিণত কিছু হয় (গোটা গম নয়, চূর্ণিত ময়দা)। মতবাদের কবিতা, উপদেশের কবিতা, সবই ঠিক আছে; কিন্তু যতক্ষণ না নৈতিক সত্যগুলি কাব্যের সত্যে রূপান্তরিত হচ্ছে ততক্ষণ সেগুলি কাব্য হচ্ছে না।

৫ সাহসী ছোট ছোট তরী,
মোড় ঘোরানো বিফল হবে, টেনে এগিয়ে যেতে হবে সামনের দিকে।
কি আলোতে, কি অন্ধকারে,
ঝড়ের হাওয়ায়, জোয়ারের প্লাবনে, দিশারী এক,
তার প্রতি ও নিজেদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে।

৬ শুধু পূবের জানালা দিয়েই দিনের আলোর সঙ্গে আলো আসে না;
সামনের দিকে সূর্য উঠতে কত সময় লাগছে, দেরি হচ্ছে,
কিন্তু পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো,
জমিতে আলো এসে পড়েছে।

be far behind ?"[৭]—এর প্রতিধ্বনি স্বামীজীর কবিতায় শোনা গেছে :

'No winter was but summer came behind.'[৮]

এ-প্রতিধ্বনির সুরমাধুর্য ধ্বনির চেয়ে কিছু কম নয়। স্বামীজীর 'Not a work will be lost, no struggle vain'[৯] কিংবা 'No good is e'er undone'[১০] পঙ্‌ক্তিতে যে মহৎ ও সুন্দর ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তা রবার্ট ব্রাউনিঙের একটি প্রিয় ধারণা এবং তা তাঁর কবিতায় বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। এ ভাবধারণার সর্বোচ্চ প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের এই ছত্রটিতে রয়েছে—

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা
পূর্ণের পদপরশ তাদের 'পরে।

জীবনের রণক্ষেত্রে আমাদের সাহসী সৈনিকের মতো যুদ্ধ করে যেতে হবে, কাপুরুষের মতো রণে ভঙ্গ দিলে চলবে না। কুরুক্ষেত্রে তো আমরা জীবনের রণক্ষেত্রেরই একটা রূপক পাই। অর্জুনের ভয় তো আমাদের সকলের ভয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভুল ভেঙে দিয়েছেন, তাঁকে যুদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। স্বামীজী আধুনিক ভারতে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন; ভারতবর্ষের অর্জুনরূপী জনগণকে তিনি জীবনসংগ্রামে সাহসী যোদ্ধা হতে প্রেরণা দিয়েছেন :

If the sun by the cloud is hidden a bit,
If the welkin shows but gloom,
Still hold on yet a while, brave heart,
The victory is sure to come.[১১]

'Song of the Free' কবিতাটিতেও স্বামীজী সাহসের জয়গান গেয়েছেন এবং সৈনিকের আদর্শেই আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন :

March on and on,
Nor right, nor left, but to the goal !

পার্থিব সুখ বা আকর্ষণের মোহ যে আমাদের বিপর্যয়ের কারণ হয়, সে-কথা স্বামীজী আমাদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। সংসারের শাড়ি-গাড়ি-বাড়ির ফাঁসে আমরা জড়িয়ে পড়ি, যে-ফাঁস অনেক সময় আমাদের শ্বাস রোধ করে। কামিনীকাঞ্চনের শৃঙ্খল আমাদের পায়ে জড়ায়। সন্ন্যাসীকে এই সব ভেঙে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যেতে হবে :

For fetters, though of gold, are not less strong to bind. সন্ন্যাসীর মন্ত্র তাই ! 'ওঁ তৎ সৎ ওঁ'। জীবনের তৃষ্ণা ভোগে মেটে না, আরও বেড়ে যায়, আগুনে ঘৃতাহুতির মতো; কামনার উপভোগে কামনার উপশম হয় না। শুধু মাত্র জ্ঞানের বারিই জীবনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে, যেমন শুধু জ্ঞানের আলোই অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করতে পারে। তাই স্বামীজীর উপদেশ, 'Song of the Sannyasin' কবিতায় :

This thirst for life, for ever quench ; it drags

৭ শীত এসে গেলে কি বসন্তের আগমন বেশি বিলম্বিত হয় ?
৮ শীত যায়, গ্রীষ্ম আসে তার পাছে পাছে। [বাণী ও রচনা ৭।৪৬৭]
৯ কর্ম নষ্ট নাহি হবে কোন চেষ্টা হবে না বিফল। [ঐ]
১০ কল্যাণের নাহিক বিলয়। [ঐ]
১১ সূর্য যদি মেঘাচ্ছন্ন হয় কিছুক্ষণ। / যদি বা আকাশ হের বিষম গম্ভীর, / ধৈর্য ধর কিছুকাল হে বীর হৃদয়, / জয় তব জেনো সুনিশ্চয়। [ঐ]

From birth to death and death to
birth, the soul.
He conquers all who conquers self.[১২]

জীবনের অসার অন্তহীন দেওয়া-নেওয়া চাওয়া-পাওয়া মানুষকে ক্লান্ত করে। পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য সে তখন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই ব্যাকুলতা বাণীরূপ পেয়েছে 'My Play is Done' কবিতায় :

Oh ! I am sick of this unending farce* ;
these shows they please no more,
This ever running, never reaching,
nor even a distant glimpse of shore ![১৩]

স্বামীজী যখন খেলাভাঙার খেলা খেলবার জন্য ব্যাকুল, তখন তাঁর স্বাভাবিকভাবেই মনে আসবে —'Who knows how Mother plays'। দেবীর লীলা বোঝার সাধ্য ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষের নেই। তাই মৃত্যুরূপা মাতা, 'Kali the Mother', যখন ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠেন, তখন তাঁর তাণ্ডবের তাৎপর্য খুঁজে না পেয়েও সে যদি সেই প্রলয়নৃত্য উপভোগ করতে পারে, তবেই বীর-হৃদয় মানুষের প্রতি মহাকালী প্রসন্না হবেন !

Who dares misery love,
And hugs† the form of Death,
Dances† in Destruction's dance,
To him the Mother comes.[১৪]

স্বামীজী ইংরেজী কবিতা রচনায় বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ছন্দের উপর যথেষ্ট দখল না থাকলে 'The Song of the Sannyasin'-এর মতো দীর্ঘ পঙ্‌ক্তির কবিতা লেখা যায় না। শেলির কিছু কিছু কবিতায় যে ওজস্বিতার পরিচয় আছে স্বামীজীর কোন কোন কবিতায় তা ঝংকৃত। কখন আবার মার্কিন কবি এমার্সনের 'Brahma' কবিতার কথা আমাদের মনে পড়ে। স্বামীজীর মরমিয়াবাদের সুর এমিলি ব্রন্টির কবিতায় আমরা শুনেছি। অর্থগৌরবের মহিমা এবং সার্থক শব্দ ও সুরের সমাবেশ স্বামীজীর ইংরেজী কবিতাকে এক বিশেষ মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য দিয়েছে

১২ জীবনের এই তৃষ্ণা চিরতরে, মিটাও জ্ঞানের বারি পান ক'রে।
এই তম-রজ্জু জীবাত্মা-পশুরে / জন্ম-মৃত্যু মাঝে আকর্ষণ করে।
সে-ই সব জিনে—...জেনে তত্ত্ব এই। [ঐ, ৭। ৪৫২]

১৩ অন্তহীন এই প্রহসনে তিক্ত আজি প্রাণ মোর ; / আর ইহা নাহি লাগে ভালো, /
মিছে ছোটা, পাব নাতো কভু, দেখা নাহি যায় দূরে, / সাগরের পারে তীর কালো। (ঐ, পৃঃ ৪৬১)

* প্রচলিত পাঠ 'force'. কিন্তু প্রসঙ্গ থেকে এবং পরের পঙ্‌ক্তির 'shows' থেকে মনে হয় শুদ্ধ পাঠ 'farce' হওয়া সম্ভব। কবিতাটির শীর্ষকও এখানে স্মর্তব্য।

† প্রচলিত কয়েকটি সংস্করণের পাঠ 'hug' ও 'dance', কিন্তু সম্ভবত এগুলি মুদ্রণপ্রমাদ। 'dares' এর মতো 'hugs' এবং 'dances' পাঠ হওয়া উচিত মনে হয়।

১৪ সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে। [বাণী ও রচনা, ৭।৪৬০]

বিশ্ব-আচার্য*

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে চিকাগো ধর্মসভা স্বামী বিবেকানন্দের সম্মুখে অকস্মাৎ খুলে দিয়েছে প্রবল কর্মস্রোতের রুদ্ধ দুয়ার। সে যেন এক ঘূর্ণিঝড়ের কাল। আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়াচ্ছেন স্বামীজী ভারতের ধর্মের চিরন্তন সত্যকে পাশ্চাত্যবাসীর সম্মুখে উদ্ঘাটিত করার জন্য। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মে যখন তিনি আমেরিকায় প্রথম পদার্পণ করেন তখনও তাঁর কাজের পরিমাণ ও পরিধি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি। তখন তাঁর মনে প্রজ্বলিত ছিল, তাঁর অবহেলিত দেশবাসীকে সমুন্নত করার অদম্য সঙ্কল্প—তাদের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবনতি থেকে উদ্ধারের বাসনা। "যা তাঁর হৃদয় ও মনকে প্রতিনিয়ত দগ্ধ করছিল, তা হল, তাঁর দেশের আধ্যাত্মিক মনীষাকে পুনঃ সক্রিয় করে তোলার পরিকল্পনা। তিনি জানতেন, এর মধ্যেই নিহিত আছে ভারতের সমুন্নতির শক্তি।" কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি দেখেছেন, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একটি উচ্চমঞ্চে, আর তাঁর সম্মুখে বিশ্বের দিগ্-ভ্রান্ত মানুষ, যারা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে শুধু বিস্ময়ে নয়, দুঃখ-ক্লেশ-বেদনা থেকে মুক্তিপথের নির্দেশনার প্রার্থনায়। শুরু হয়েছে তাঁর নতুন ভূমিকা। চিকাগো বক্তৃতার পর তাঁর জন-প্রিয়তা ও খ্যাতির মূল্য দিতে কখন কখন নিঃশেষ হয়ে এসেছে তাঁর শক্তি, কখন কখন প্রার্থনা করেছেন একটু বিশ্রাম, একটু নির্জনতা, একটু । বিনিময়ে কি পেয়েছেন? অতি-পরিশ্রমে ক্লান্ত স্বামীজী নিউইয়র্ক ছেড়ে কিছুদিন বিশ্রাম নেবার পরিকল্পনায় চলে গেছেন সহস্র-দ্বীপোদ্যানের শান্ত পরিবেশে। কিন্তু "ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে"—স্বামীজীই লিখেছেন সেখান থেকে একটি চিঠিতে। সেখানে গিয়েও মুহূর্তের বিশ্রাম মেলেনি—সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিত ক্লাস নিতে হয়েছে, সঙ্গী অনুরাগী ও শিষ্যশিষ্যাদের জন্য। ফেরার পথে ক্লেটন থেকে নিউইয়র্কের ট্রেনে অচৈতন্যের মতো ঘুমিয়ে পড়েছেন—ট্রেন থেমেছে, চলেছে, ইঞ্জিনও একবার লাইনচ্যুত হয়েছে, এক শিষ্যা নেমে গেছেন আলবানি স্টেশনে—কোন ঘটনাই সেই ক্লান্ত সৈনিকের ঘুম ভাঙাতে পারেনি। কদিন পরে নিউইয়র্ক থেকে শ্রীমতী বুলকে চিঠিতে লিখছেন, "সহস্র-দ্বীপোদ্যানে কঠিন পরিশ্রমের পর কদিন একটু শান্তির জন্য এবং এখান থেকে চলে যাওয়ার ব্যবস্থাপনার জন্য সময় নিচ্ছি।" কিন্তু সে একই চিঠিতে নিউইয়র্কে তাঁর কদিনের বিশ্রাম গ্রহণের চিত্রটিও আভাসিত,—"একটা সভার (ক্লাসের জন্য ঠিক সময়ে [সহস্র-দ্বীপোদ্যান থেকে] পৌঁছেছি। কাল সন্ধ্যায় আরও একটা সভা ছিল—আজ সন্ধ্যায়ও আছে এবং যতদিন না এখান থেকে চলে যাচ্ছি ততদিন প্রায় প্রত্যেক সন্ধ্যাতেই একটি করে আছে।"

এই ঝঞ্ঝাবাত্যায় আমেরিকার মনোজগতে কি পরিবর্তন ঘটেছিল তার সম্পূর্ণ পরিচয় বহুদিন পর্যন্ত অনুদ্ঘাটিত ছিল। আমেরিকায় স্বামীজীর প্রাণান্তকর পরিশ্রমের সংবাদ এবং তার ফলে

* গ্রন্থ সমালোচনা : Swami Vivekananda in the West: New Discoveries—The World Teacher, Part I. By Marie Louise Burke. Published by Advaita Ashrama, 5 Dehi Entally Road, Calcutta-700014. Rs. 50·00

আমেরিকাবাসীর অন্তরস্পর্শের বিস্তারিত বিবরণ যেমন অপ্রকাশিত ছিল, তেমনি সেই সময় বিরুদ্ধ শক্তি কতখানি সক্রিয় ছিল এবং স্বামীজী কেমন করে তা পর্যুদস্ত করেছিলেন তার অনুপুঙ্খ বিবরণও অনেকের অজানা ছিল। অনেকদিন পর্যন্ত সে সংবাদ সমকালীন মার্কিনী সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠাতে লোকচক্ষের অন্তরালেই থেকে গেছে। আমাদের সৌভাগ্য, শ্রীমতী মারি লুইস্ বার্ক (যিনি রামকৃষ্ণমণ্ডলে সিস্টার গার্গীরূপে অভিখ্যাতা) তাঁর সমগ্র নিষ্ঠা, উদ্যম ও কর্ম-প্রেরণাকে উৎসর্গ করেন সেই লুপ্ত ইতিহাসকে আলোকে আনার কাজে। এ এক অসাধারণ নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও পরিশ্রমের আশ্চর্য নিদর্শন। শ্রীমতী বার্ক তাঁর গবেষণালব্ধ বহু সংবাদ, অপ্রকাশিত চিঠিপত্র ও প্রখ্যাত ব্যক্তিদের বিবৃতির মধ্যে দিয়ে বিবেকানন্দের জীবননাট্যের সম্পূর্ণতর পরিচয় আলোকিত করেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থ 'স্বামী বিবেকানন্দ ইন দি ওয়েস্ট—নিউ ডিসকভারিস' শ্রীমতী বার্কের এই পর্যায়ের তৃতীয় বা শেষ খণ্ড হলেও কালানুক্রমের বিচারে তিনি এটিকে নির্দেশ করেছেন দ্বিতীয় খণ্ড হিসাবে। পাশ্চাত্যে স্বামীজীর ১৮৯৩-৯৪ প্রবাস-কালের বিবরণ 'স্বামী বিবেকানন্দ ইন আমেরিকা' নামে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীমতী বার্কের গ্রন্থটিই প্রথম খণ্ড এবং ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'স্বামী বিবেকানন্দ—হিজ সেকেণ্ড ভিজিট ইন দি ওয়েস্ট' (বর্তমানে দ্বিতীয় খণ্ড)-এ প্রধানতঃ ১৮৯৯ এবং সম্পূর্ণত ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের কার্যাবলী পর্যন্ত বিস্তৃত। আলোচ্য তৃতীয় খণ্ড (যা প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় খণ্ড) ১৮৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দের সম্পূর্ণ বিবরণ। এই বিপুল ও বৃহদাকার গ্রন্থাবলীকে শ্রীমতী বার্ক মোট ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (বর্তমান ১ম খণ্ড) আরও বহু নতুন সংবাদে পূর্ণতর হয়ে স্বতন্ত্র দুটি গ্রন্থে বিভক্ত হবে—তার নতুন উপশিরোনাম (সাব-টাইটেল) যুক্ত হবে—'হিজ প্রফেটিক মিশন'। তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ (তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত) অনুরূপভাবে 'ওয়ার্ল্ড টিচার' (বিশ্ব-আচার্য) নতুন শিরোনামে প্রকাশিত। এবং বর্তমান দ্বিতীয় খণ্ডটিও দুটি ভাগে বিভক্ত এবং অতিরিক্ত উপশিরোনাম 'এ নিউ গসপেল'-এ (নববিধান) ভূষিত হয়ে প্রকাশের অপেক্ষায়। অর্থাৎ মোট তিনখণ্ডে ছয় ভাগে গ্রন্থটি বিন্যস্ত হবে। এই বিভাগের কারণ নতুন নতুন সংবাদ সংযোজনার ফলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি এবং উপশিরোনাম পরিকল্পনার পশ্চাতে আছে সমকালীন বক্তৃতা ও চিন্তাধারার মধ্যে স্বামীজীর মানসিকতার পরিচয়।

আলোচ্য তৃতীয় খণ্ডের ১ম ভাগে স্বামীজীর ভূমিকা প্রধানত শিক্ষকের। সমগ্র বিশ্বের কাছে এই পর্বে বিবেকানন্দের আচার্যরূপই প্রতিষ্ঠিত। চিকাগো বক্তৃতার পর তাঁর বিরাট সাফল্যের পটভূমিকায় পাশ্চাত্যে তিনি ভারতীয় আধ্যাত্মিক আদর্শের বীজগুলি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন—সেখানে তাঁর মনোভঙ্গী ছিল প্রধানত প্রচারকের—একটি মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যই সে প্রচারকর্ম। পরবর্তী অধ্যায়ে আচার্য বিবেকানন্দ আত্ম-প্রকাশিত। অঙ্কুরিত বীজগুলিকে লালন করে সবল সতেজ মহীরূহে পরিণত করাই তাঁর অভীষ্ট। সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে তাঁর আপ্রাণ প্রয়াসের অভ্রান্ত দলিল প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সমকালীন চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার এবং সংবাদপত্রের বক্তৃতার রিপোর্টগুলি। সেগুলি সযত্নে তুলে ধরে লেখিকা শিক্ষক বিবেকানন্দের পরিচয় সুসম্পূর্ণ করেছেন।

প্রাক্-কথন অংশ বাদ দিলে মোট সাতটি অধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ডটি বিন্যস্ত। এ ছাড়া আছে চারটি সংযোজন অধ্যায়, ১৮৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দের বিভিন্ন বক্তৃতা ও ক্লাস নেওয়ার

সুদীর্ঘ তালিকা ইত্যাদি। এই তালিকাটি থেকেই বিবেকানন্দের কর্মকাণ্ডের স্বরূপ বোঝা যাবে। অবশ্য তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়। অনেক কাগজপত্র আজ নষ্ট হয়ে গেছে। শ্রীমতী বার্কের অসাধারণ পরিশ্রম সত্বেও এখনও আত্মগোপন করে আছে অনেক নতুন তথ্য, হয়তো সেগুলো চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে বা যাবে কিন্তু শ্রীমতী বার্কের'ও নিরলস প্রচেষ্টা এখনও থেমে যায়নি, সংযোজন অধ্যায়গুলিই তার প্রমাণ।

এই পর্বে (১৮৯৫-৯৬) স্বামীজী যে সকল জায়গায় বক্তৃতা দিয়েছেন বা ক্লাস নিয়েছেন তার মধ্যে আছে ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক (ধারাবাহিক শিক্ষাদান), হার্ডফোর্ড, থাউজেণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক (ধারাবাহিক শিক্ষাদান), লণ্ডন, পুনশ্চ নিউইয়র্ক, ব্রুকলীন, হার্ডফোর্ড। ২৪ অগস্ট ১৮৯৫, নিউ-ইয়র্ক থেকে লণ্ডন যাওয়ার পথে কয়েকদিনের জন্য মিঃ লেগেটের বিবাহ-অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য প্যারিসে যাত্রাবিরতি এবং ঐ বছরই বড়-দিনের সময়টা শ্রী ও শ্রীমতী লেগেটের আল্‌স্‌-টারের গ্রাম-আবাসে কয়েকদিনের বিশ্রাম। এই-টুকুই মাত্র ছুটি। কত বিচিত্র বিষয়েই যে তিনি বিভিন্ন সভায় বা ক্লাসে আলোচনা করেছেন তার বিবরণ পাওয়া যাবে পুস্তক-অন্তর্গত সমকালীন সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি থেকে। প্রধান বিষয় অবশ্যই আধ্যাত্মিক—তারই পাশাপাশি ভারতীয় রীতি-নীতির বিশ্লেষণ, ভারতীয় নারীর ও নারীত্বের আদর্শ, ভারতের কাছে বিশ্বের ঋণ প্রভৃতি বিষয়ে মনোগ্রাহী আলোচনা। শেষোক্ত আলোচনাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্বামীজীর ঐকান্তিক ও অকুতোভয় প্রচেষ্টা। তার মধ্যে আবেগ আছে যতখানি ততখানিই আছে যুক্তি।

তিনখণ্ডে (ছয়ভাগে) বিভক্ত এই মহাগ্রন্থকে প্রচলিত অর্থে জীবনীগ্রন্থ সম্ভবত বলা যায় না—লেখিকার উদ্দেশ্যও তা ছিল না। তিনি যে বিপুল পরিমাণ উপাদান সংগ্রহ করেছেন তার সব কিছুকেই গ্রন্থমধ্যে স্থান দিয়েছেন—জীবনীরচনার শর্তপূরণ করার জন্য গ্রহণ-বর্জন নীতি গ্রহণ করেননি। পুনরাবৃত্তি ছাড়াও অকিঞ্চিৎকর বিষয়-কে স্থান দিয়েছেন সজ্ঞানেই—কারণ প্রকৃতপক্ষে লেখিকার উদ্দেশ্য ছিল উপযুক্ত এবং সুসম্পূর্ণ জীবনীগ্রন্থ রচনার জন্য স্বামীজীর জীবনের অনালোকিত অংশের উপর আলোকসম্পাত এবং প্রয়োজনীয় উপাদানের উপস্থাপনা। তা ছাড়া স্বামীজীর অনুরাগী ও ভক্তদের তিনি আপাতসামান্য বা অকিঞ্চিৎকর সংবাদ লাভের অধিকার থেকেও বঞ্চিত করতে চাননি। যা সাধারণ দৃষ্টিতে তুচ্ছ বলে মনে হয়, তা-ও হয়তো কোন নিষ্ঠাবান গবেষকের কাছে নতুন মূল্য নিয়ে আবির্ভূত হতে পারে। দ্বিতীয়ত, লেখিকা সর্বজনপরিচিত সংবাদগুলি, যা ইতিমধ্যেই জীবনীগ্রন্থ, স্মৃতিকথা বা চিঠিপত্রের মাধ্যমে সাধারণের গোচরীভূত, তা বাদ দেবারই চেষ্টা করেছেন। অবশ্য সংযোগ ও সংহতিরক্ষার জন্য কিছু পরিচিত ঘটনা, চিঠিপত্র ও স্মৃতিকথার অংশ অনিবার্যভাবেই ব্যবহার করতে হয়েছে, ফলে গ্রন্থটি সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু লেখিকার অভিপ্রায় যাই থাক না কেন এটিকে স্বামীজীর জীবনীগ্রন্থের পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করাই সমীচীন বলে মনে হয়। লেখিকার সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী, ঐতিহাসিক ঘটনার উপস্থাপনার নৈপুণ্যে গ্রন্থটি অতিরিক্ত মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। প্রসঙ্গত সহস্র-দ্বীপোদ্যান অধ্যায়টির উল্লেখ করতে পারি। মোটামুটি ঘটনাগুলি আমাদের জানা—কিছু কিছু নতুন সংবাদ ও চিঠি-পত্রের সংযোজন-কুশলতায় এবং যুক্তির বিন্যাসে (ভগিনী ক্রিস্টিন এবং শ্রীমতী মেরি ফাঙ্কের

আগমনের সম্ভাব্য দিন নির্ণয় প্রসঙ্গে) এবং সেই সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্বের উদ্ভাসনে অধ্যায়টি নতুনভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

এই বিশাল গবেষণা-গ্রন্থের সূত্রপাত ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে—একটি চমকপ্রদ ঘটনার মধ্যে দিয়ে। সেই সময় উত্তর কালিফোর্নিয়ার বেদান্ত সোসাইটির জনৈক সদস্যের পরামর্শক্রমে শ্রীমতী বার্ক স্বামীজীর গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত প্রবন্ধের সন্ধানে পুরাতন পত্রপত্রিকাগুলি দেখছিলেন। সেই গ্রন্থাগারেই এক পরিচিত ভদ্রলোকের কাছে জানতে পারেন ১৯৫০-এর শরৎকালে সালেমের জনৈক মিসেস প্রিন্স উড স্বামী বিবেকানন্দ-পরিত্যক্ত একটি প্যাঁটরা (ট্রাঙ্ক) এবং একটি ছড়ির জন্য ক্রেতা আহ্বান করে একটি সাময়িক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। স্বামীজী যে কোন সময় সালেমে ছিলেন, এ সংবাদ তখনও সাধারণের অগোচরেই ছিল। শ্রীমতী বার্ক এই সংবাদ পাওয়ামাত্র ছুটেছেন সালেমে—সাক্ষাৎ করেছেন বিজ্ঞাপনদাত্রীর সঙ্গে। তাঁর কাছে এবং স্থানীয় এসেক্স ইনস্টিট্যুটের কাগজপত্র দেখে লেখিকা জানতে পেরেছেন, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো সম্মেলনের আগেই স্বামীজী সালেমে এসে এক সপ্তাহ অবস্থান করেছেন এবং একাধিক বক্তৃতা দিয়েছেন। এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে লেখিকার সামনে তাঁর কাজের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। পত্রপত্রিকার সংবাদ—স্বামীজীর জীবনের অনেক তথ্য রয়েছে আমেরিকার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত সেকালের সাময়িক পত্রিকার মধ্যে। নতুন উদ্যমে তিনি শুরু করেছেন সেইসব সংবাদের অনুসন্ধান।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত সেই প্যাঁটরা এবং ছড়িটি নিয়ে যে অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল আজও তার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। এখনও লেখিকা দৃঢ়সঙ্কল্পে এগিয়ে চলেছেন নিষ্কাম কর্মযোগীর মতো —"সাচ্ ডিসকভারিস মিমড অ্যান এণ্ড ইন দেমশেলভস্; আই ডু নট লাইক টু লুক অব্ সি বিয়ণ্ড দ্যাট।"

প্রত্যাশাহীন এই মহীয়সী মহিলার কাছে আমাদের প্রত্যাশা কিন্তু অন্তহীন।

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায়

মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে,
সন্ধ্যা হয়ে এল।
এখনই মন্ত্র উচ্চারিত হবে
সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।

জীবনে যা সত্য, তাই সত্য;
সত্যই ঋত, সত্যই চিরন্তন।
শিব কল্যাণকর, শিব ভয়ঙ্কর,
শিব প্রলয়ের রূপ।

সেই শিবই শান্ত হয়ে যায়—
সুন্দর হয়।

সত্যকে দেখা যায় না, চেনা যায়;
শিবকে চেনা যায় না, বোঝা যায়;
সুন্দরকে কল্পনা করতে হয় না, দেখা যায়।

সত্যই শিব, শিবই সুন্দর—
আমি বিবেকানন্দের ছবির দিকে তাকিয়ে
থাকি।

উচ্ছিষ্ট ব্রহ্ম

স্বামী ধীরেশানন্দ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন : 'সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কেবল এক ব্রহ্মবস্তু আজ পর্যন্ত উচ্ছিষ্ট হয়নি। বেদ পুরাণ ইত্যাদি সব মানুষের মুখ দিয়ে বের হয়ে উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত ব্রহ্ম যে কি বস্তু তা কেউ মুখে বলতে পারেনি।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ, পৃ: ৪০) শ্রুতিও বলিয়াছেন : 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' (তৈ উপঃ)—মনসহ বাণী ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়া নিবৃত্ত হয়।—শ্রুতির এই কথাই ঠাকুর স্বকীয় অনুপম ভাষা ও ভঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন।

বাক্যমনের অতীত তত্ত্বকে কল্পনাত্মক মন দ্বারা কখনও গ্রহণ করা যায় না, বাক্য দ্বারাও প্রকাশ করা যায় না। উহা একমাত্র অনুভবগম্য। ভাষায় প্রকাশ করিতে গিয়াই যত মত মতান্তরের সৃষ্টি হইয়া সদা দুঃখভারাক্রান্ত এই জগৎ আরও কোলাহলময় হইয়া পড়িয়াছে। শব্দদ্বারা উহা প্রকাশ করিতে গেলেই কিছু না কিছু ঝগড়ার বা মতানৈক্যের উপাদান আসিয়া জুটে। ঢোল ও বোল যেন একই প্রকারের বস্তু। উভয়ের মধ্যেই ফাঁক বিদ্যমান। তাই কোন মহাত্মা বলিয়াছেন :

'বোল সবহী ঢোল বরাবর,
পোল সবহীঁমে পূরা।
অবোল তত্ত্বকো সম্‌ঝাওত নহীঁ,
জো সম্‌ঝাওত সো কূরা॥'

—ঢোল ও বোল উভয়ই সমানধর্মী, উভয়ের মধ্যেই ফাঁক বিদ্যমান। বাণীর অতীত তত্ত্বকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। যাহা প্রকাশ করিয়া থাকে তাহা বিবাদাস্পদ কল্পনামাত্র—মিথ্যা।

ঠাকুর পুনঃ বলিয়াছেন : 'জ্ঞানী—যেমন বেদান্তবাদী—কেবল "নেতি, নেতি" বিচার করে। বিচার করে জ্ঞানীর বোধ হয় যে, "আমি মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা—স্বপ্নবৎ।" জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে। তিনি যে কি, মুখে বলতে পারে না।···

'যেখানে নিজের আমি খুঁজে পাওয়া যায় না —আর খুঁজেই বা কে?—সেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ বোধে বোধ, কিরূপ হয়, সে কথা কে বলবে?' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।৩।৪) 'বিচার করা যতক্ষণ না শেষ হয়, লোকে ফড়্ ফড়্ করে তর্ক করে। শেষ হলে চুপ হয়ে যায়।'

শ্রীযোগবাসিষ্ঠ রামায়ণে কথিত আছে যে, শ্রীরামচন্দ্র গুরু শ্রীবসিষ্ঠজীকে বলিয়াছিলেন : 'তত্ত্ববস্তু যখন ভাষায় প্রকাশ করিবার নহে এবং মৌন অবলম্বন করিলেই যখন তত্ত্ব বুঝাইবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তখন আপনি আমাকে এত উপদেশ প্রদান করিলেন কেন? প্রথম হইতে মৌনাবলম্বন করিলেই তো হইত?' প্রত্যুত্তরে শ্রীবসিষ্ঠজী বলিলেন : 'তাহা হইলে লোকে আমাকে মূর্খ মনে করিত। মনে করিত যে আমি কিছুই জানি না। তাই নানা কথা বলিয়া এখন মৌন ধারণ করিয়াছি। এখন তুমিও আমার এই মৌন ধারণের রহস্য বুঝিবে।'

আসল তত্ত্বটি মুখে বলা যায় না। তাই আচার্যগণ ঋত, আত্মা, ব্রহ্ম, সত্য ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দ, তত্ত্ব বুঝাইবার সহায়করূপে কল্পনা করিয়াছেন :

'ঋতম্, আত্মা, পরং ব্রহ্ম সত্যমিত্যাদিকা বুধৈঃ।
কল্পিতা ব্যবহারার্থং সংজ্ঞাস্তস্য মহাত্মনঃ॥'

মহাত্মনঃ অর্থ পরমাত্মার, অন্য অর্থ স্পষ্ট।

মুখস্পৃষ্ট কোন পদার্থকেই সাধারণতঃ 'উচ্ছিষ্ট' বলা হয় ভুক্তাবশিষ্ট অন্নকে উচ্ছিষ্ট বা

চল্তি ভাষায় 'এঁটো' বলে। ঠাকুর তাই বললেন যে, মুখদ্বারা উচ্চারিত হওয়াতে বেদ পুরাণ সব যেন মুখস্পর্শে উচ্ছিষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবল ব্রহ্মকে কেহ মুখোচ্চারিত শব্দদ্বারা প্রকাশ করিতে পারে নাই বলিয়া ব্রহ্মই জগতে একমাত্র অনুচ্ছিষ্ট বস্তু। এই সুন্দর কথাটিই একদিন ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিতে পাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন: 'বাঃ, আজ একটা নূতন কথা শিখলাম।' ঠিক এই কথাই 'জ্ঞান সংকলিনী তন্ত্র, ৫২' মুখেও আমরা অবগত হই:

'উচ্ছিষ্টং সর্বশাস্ত্রাণি সর্ব বিদ্যা মুখে মুখে।
নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞানমব্যক্তচেতনাময়ম্॥'

—সর্বশাস্ত্র ও সর্ববিদ্যা মুখে মুখে উচ্চারিত হইয়া উচ্ছিষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অব্যক্ত চৈতন্যময় জ্ঞানস্বরূপ এক ব্রহ্মই এযাবৎ উচ্ছিষ্ট হন নাই। অর্থাৎ ব্রহ্মকে কেহই বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতে পারে নাই।

দেখা গেল তন্ত্রশাস্ত্র ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্রহ্মকে অনুচ্ছিষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু বিষয়টি একটু বিচার্য। উচ্ছিষ্ট শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? সাধারণতঃ আমরা উচ্ছিষ্ট বলিতে মুখস্পৃষ্ট কোন ভোজ্য পদার্থকেই বুঝি। আমাদের মানসচক্ষে সোপকরণ অন্নপূর্ণপাত্র ও ঐ পাত্রস্থ ভুক্তাবশেষই যেন ভাসিয়া উঠে, ও তাহাকে আমরা 'এঁটো' বলি। মুখস্পর্শ হইয়াছে বলিয়া উহা অপবিত্র এবং ঐ এঁটো স্পর্শ হইলে বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া থাকি। কিন্তু বিচারদৃষ্টিতে দেখিলে বোঝা যায় উচ্ছিষ্ট অর্থ, যাহা অবশেষ থাকে। তাহা হউক অথবা আর যাহাই হউক। উৎ+শিষ্টম্= উচ্ছিষ্টম্। উৎ ঊর্ধ্বম্ অনন্তরম্ শিষ্টম্ অবশিষ্টং যৎ বিদ্যতে তৎ উচ্ছিষ্টম্। কোন কার্যানন্তর যাহা অবশেষ থাকে তাহাই উচ্ছিষ্ট। দেখা যাউক শ্রীশ্রীঠাকুর এ বিষয়ে কি বলিতেছেন। তিনি ব লিতেছেন: 'বিচ ার করলে "আমি" বলে কিছু পাইনে। শেষে যা থাকে তাই আত্মা—চৈতন্য!' ঠাকুরের 'শেষে যা থাকে' এই কথাগুলি গম্ভীর তাৎপর্যপূর্ণ, গভীর অর্থদ্যোতক, অতএব লক্ষণীয়। ঠাকুর বলিলেন 'শেষে'। কিসের শেষে? তাহাও ঠাকুর বলিয়া আসিয়াছেন 'বিচার করলে', অর্থাৎ বিচারের শেষে। কি বিচার? তাহাও ঠাকুর দেখাইয়াছেন: ' "আমি কে" ভালরূপে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায় "আমি" বলে কোন জিনিস নেই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি—এর কোন্‌টা আমি? যেমন প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে "আমি" বলে কিছু পাইনে। "শেষে যা থাকে" তাই আত্মা—চৈতন্য।' এখানে ঠাকুর স্পষ্ট উপনিষদের 'নেতি, নেতি' বিচারের কথা বলিলেন। হাত, পা, রক্ত, মাংস—এর কোন্‌টা আমি? এটা নয়, এটা নয়, এইরূপে অনাত্মবোধে সর্ব জড়পদার্থ ত্যাগানন্তর অবশেষ থাকেন যে এক আত্মা, তিনিই চৈতন্য বা ব্রহ্ম। সুতরাং 'নেতি, নেতি' বিচারের শেষে অবশিষ্ট থাকেন এক ব্রহ্ম। তিনিই উচ্ছিষ্ট।

সুতরাং ঠাকুরের মতে ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট এবং অনুচ্ছিষ্ট—অর্থভেদে উভয়ই সত্য বলা যাইতে পারে।

ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট এ কথা শুনিলে অনেকেই আশ্চর্যবোধ করিবেন। কিন্তু অর্থবোধ হইলে আর আপত্তির কিছু থাকিবে না। ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট এই কথা কেবল বাগাড়ম্বর বা বুদ্ধির বিলাসমাত্র নহে। স্বয়ং বেদও এই কথা স্পষ্ট বলিয়াছেন। তাহাই আমরা এখন দেখিব। অথর্ববেদে ব্রহ্মকে উচ্ছিষ্ট বলা হইয়াছে। সেখানে 'উচ্ছিষ্ট ব্রহ্মসূক্ত' নামে রহিয়াছে। যথা অথর্ববেদ (১১।৪।১।১):

"ওঁ উচ্ছিষ্টে নামরূপং চোচ্ছিষ্টে লোক আহিতঃ।
উচ্ছিষ্ট ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ বিশ্বমন্তঃ সমাহিতম্॥ ১

উচ্ছিষ্টে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বং ভূতং সমাহিতম্।
আপঃ সমুদ্র উচ্ছিষ্টে চন্দ্রমা বাত আহিতঃ ॥ ২
ইত্যাদি।

বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য প্রথম অর্থ করিয়াছেন যে, হোমানন্তর হুতাবশিষ্ট ওদনই উচ্ছিষ্ট। সেই হুতাবশিষ্ট সর্বকারণভূত ব্রহ্মাভিন্ন অন্নে নামরূপাত্মক শব্দপ্রপঞ্চ ও অর্থপ্রপঞ্চ উভয়ই আশ্রিত হইয়া লব্ধসত্তাক হইয়া থাকে। অথবা—

'যদ্বা "অথাত আদেশ নেতি নেতীতি" "নেহ নানাস্তিকিঞ্চন" ইত্যেবং দৃশ্যপ্রপঞ্চনিষেধাৎ ঊর্ধ্বং তদবধিত্বেন শিষ্যতে ইত্যুচ্ছিষ্টং বাধাবধিত্বেন শিষ্যমানং পরংব্রহ্ম। তস্মিন্ শুক্ত্যাদৌ রজতাদিবৎ নামরূপং চেতি দ্বিধাভূতং সমস্তং জগৎ আহিতম্ আরোপিতম্ বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। ইত্থং সামান্যেন জগদাধারত্বম্ অভিধায় বিশেষতো নির্দিশতি—উচ্ছিষ্টে লোক আহিত ইত্যাদিনা।...' —'ঊর্ধ্বম্' অর্থাৎ—'অথাত আদেশ নেতি নেতীতি' 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা দৃশ্যপ্রপঞ্চ নিষেধানন্তর সর্ব নিষেধের অবধিরূপে যাহা 'শিষ্যতে'—অবশেষ থাকে তাহাই উচ্ছিষ্ট। উহাই সর্ববাধের অবধিভূত বিদ্যমান পরব্রহ্ম। তাঁহাতেই শুক্তিকাতে রজত কল্পনার ন্যায় নামরূপে দ্বিধাবিভক্ত জগৎ আরোপিত। এইরূপে সামান্যভাবে ব্রহ্মের জগদাধারত্ব কথন করিয়া বিশেষতঃ তাঁহার জগদাধারত্ব নিরূপিত হইতেছে। উচ্ছিষ্ট ব্রহ্মেই সর্বলোক, ইন্দ্র, অগ্নি, সমগ্রবিশ্ব, দ্যুলোক, পৃথিবী, জল, সমুদ্র, চন্দ্রমা, বায়ু সবই আরোপিত।

শ্রীশ্রীঠাকুরও বলিয়াছেন: 'সব শেষে যা থাকে তাই আত্মা-চৈতন্য।' আচার্য সায়নের ভাষ্যের মধ্যে আমরা আমাদের ঠাকুরের সুপরিচিত সুমিষ্ট কণ্ঠধ্বনিই শুনিতে পাইতেছি না কি?

অতএব বেদান্তোক্ত প্রধান সাধন 'নেতি নেতি' বিচার সহায়ে কল্পিত প্রপঞ্চ মিথ্যাবোধে পরিত্যাগ হইলে এক সত্যবস্তু ব্রহ্মই অবশেষ থাকিয়া যান বলিয়া তিনিই 'উচ্ছিষ্ট ব্রহ্ম'। 'নেতি নেতি' দ্বারা ইহাই ঘোষিত হইয়াছে। দ্বৈত নিষিদ্ধ হবার পর সর্ববাধের অর্থাৎ সর্বনিষেধের অবধিরূপে যে প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্ম শেষ থাকেন তিনিই উচ্ছিষ্ট। যেমন ভুক্তাবশিষ্ট অন্নকে উচ্ছিষ্ট বলা হয় সেইরূপ বিচারের পর অবশিষ্ট ব্রহ্মই উচ্ছিষ্ট। এই উচ্ছিষ্ট ব্রহ্মেই বিশ্বসংসার আশ্রিত ও আরোপিত। ইহাই অথর্ব বেদের 'উচ্ছিষ্ট ব্রহ্ম সূক্তে'র ঘোষণা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শাক্ততন্ত্র স্পষ্ট-ভাষায় ব্রহ্মকে 'অনুচ্ছিষ্ট' বলিয়াছেন, আর বেদ তাঁহাকে 'উচ্ছিষ্ট' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সমন্বয়াবতার ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সুন্দর সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক উভয় মতই গ্রহণ করিয়া সকলের সুখবোধ্যরূপে বিষয়টি আরও সুন্দর-রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

নিত্যশুদ্ধ নিত্যপূর্ণ অপরিণামী অপরিবর্তনীয় এক আত্মা আছেন; তাঁহার কখন পরিণাম হয় নাই, আর এই-সকল বিভিন্ন পরিণাম সেই একমাত্র আত্মাতে শুধু প্রতীত হইতেছে। উহার উপরে নাম-রূপ এই-সকল বিভিন্ন স্বপ্নচিত্র আঁকিয়াছে। রূপ বা আকৃতিই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়াছে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

সপ্তর্ষি-প্রসঙ্গে

ডক্টর অরুণকুমার বিশ্বাস

অবতার- এবং সপ্তর্ষি-প্রসঙ্গ গভীর মনন ও নিদিধ্যাসনের বিষয়। এই বিষয়বস্তুর আধ্যাত্মিক পর্যালোচনা করার জন্য যে মানসিকতার প্রয়োজন তা বর্তমান লেখকের নেই। শাস্ত্র-ইতিহাসে নিবদ্ধ কয়েকটি তথ্যের উপস্থাপনা করাই এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। সপ্তর্ষি-প্রসঙ্গের আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ-সাহিত্যের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় দেখি না।

১

বৈদিক/হরপ্পা সভ্যতায় সপ্তর্ষি: মানব-সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে যে শব্দগুলি 'ঋ' অক্ষর দিয়ে শুরু সেইগুলি প্রায় সমার্থক—যথা,'ঋষ্'=তপস্যা ও আধ্যাত্মিক গতি ; 'ঋষি'= নিজেদের তপস্যার শক্তিতে যাঁরা সৃষ্ট জগতের রক্ষণাবেক্ষণ করছেন[১] ('বিপ্র' শব্দের মূলার্থও তাই) ; 'ঋচ্'=অর্চ্=আদি শক্তির উপাসনা বা প্রশস্তি (যার থেকে 'ঋগ্বেদ' শব্দের উৎপত্তি) ; 'ঋত'=উপাসিত আদিশক্তি বা সত্য ; 'ঋক্ষ:'= উজ্জ্বল নভচারী বা তারকা ইত্যাদি।

দিব্যজ্ঞানের অধিকারী ঋষিরাই যে সনাতন (বৈদিক) ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা তা ঋগ্বেদের বিভিন্ন শ্লোকে লিপিবদ্ধ হয়েছে। "উতো ঘা তে পুরুষ্যা ইদাসন্‌ষেষাং পূর্বেষামশৃণোর্ঋষীণাম্"—সেই প্রাচীন ঋষিরা যাঁরা তোমাকে স্তুতি করেছেন তাঁরা বাস্তবিকই পুরুষরত্ন মানবসখা।[২] তাঁরা প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত তোমার সখা হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছেন—"পুরাজাঃ প্রত্নাস আসুঃ পুরুকৃৎসখায়ঃ।"[৩] স্মরণাতীত কাল থেকে আমাদের পিতৃপুরুষ নভচারী সপ্তর্ষিরা নব নব কার্যের ভার নিয়েছেন এবং পরমপিতার স্তুতিগান করে আসছেন—"ত্বম্ নঃ পূর্বে পিতরো নবগ্বাঃ সপ্ত বিপ্রাসো অভি বাজয়ন্তঃ।"[৪] সপ্তর্ষির আরাধ্য এক অদ্বৈত পরমসত্তা— "সপ্তঋষীন্ পর একমাহুঃ"[৫]—এবং তাঁরই আরাধনার জন্য সপ্তর্ষিরা উপনীত— "সপ্তঋষয়স্তপসে যে নিষেদুঃ।"[৬]

সরস্বতী নদীর তীরবর্তী এবং ঋগ্বেদে বর্ণিত আর্যসভ্যতা যে বহিরাগত নয় তা স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম জোর দিয়ে বলেন।[৭] এই সম্পর্কে বর্তমান লেখকের বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র প্রকাশিতব্য।[৮] সরস্বতী উপত্যকার পুরাতত্ত্বের সঙ্গে মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা-সভ্যতার আত্মিক যোগসূত্র প্রমাণিত হয়েছে। তাই হরপ্পা-সভ্যতা যে বৈদিক তা অনস্বীকার্য হয়ে পড়েছে।

মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত একটি seal বা প্রতীক-চিহ্নে পরমদেবতার আরাধনার জন্য আগত সাতটি ঋষি চিত্রায়িত হয়েছেন। উষ্ণীষ ও বেণীধারী[৯] সপ্তর্ষিরা পীপল বৃক্ষের মধ্যে দণ্ডায়মান

১ শতপথ ব্রাহ্মণ, ৬।১।১।১—৫
২ ঋগ্বেদ, ৭।২১।৪ ; ৭।২২।৯
৩ ঐ, ৬।২১।৫
৪ ঐ, ৬।২২।২ নভগামী সপ্তর্ষিদের সম্বন্ধে এইটিই বোধহয় সর্বপ্রথম শাস্ত্রোল্লেখ।
৫ ঐ, ১০।৮২।২
৬ ঐ, ১০।১০৯।৪
৭ বাণী ও রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৯—২১১
৮ *Traditions of the Sarasvati Valley*—Prabuddha Bharata
৯ মহাভারতের শান্তিপর্বে (১২।৩২২।২৬—২৮) সপ্তর্ষিদের 'সপ্তচিত্র শিখণ্ডিনঃ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শিখণ্ডঃ=উষ্ণীষের পাশ দিয়ে লম্বা কেশগুচ্ছ—উচ্চ মর্যাদার প্রতীক।

দেবতার সামনে উপনীত। দেবতার সামনে একজন সাধারণ উপাসক এবং একটি পশু—সম্ভবত ঋষভ বা বৃষ। ত্রি-শৃঙ্গধারী দেবতা সম্ভবত রুদ্র বা পশুপতি—ত্রিলোকের অধীশ্বর—তাঁর মাথায়ও বেণী।

আরও কয়েকটি পশুপতি-seal পাওয়া গেছে।[১০] তার একটিতে পশুপতি বা রুদ্রের শরীরে সাতটি রেখা চিহ্নিত করেছে যে, তিনি 'সপ্তরশ্মি'। ঐ seal-এর হরফ (script) সম্প্রতি পঠিত হয়েছে: 'রম-ত্রিদ-ওষ'—প্রসন্ন ত্রিলোকে উজ্জ্বল।[১১] সামনের পশুটি—'বৃষভঃ রোরবীতি মহোদেবো মর্ত্যানাবিবেশঃ'—উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করছে যে, পরমেশ্বর মর্ত্যে বৃক্ষ ও জীবলোকে অবতীর্ণ হয়েছেন।[১২]

২

সপ্তলোক ও সপ্তর্ষির ব্যাখ্যা: বৈদিক সাহিত্যে ত্রিলোক এবং সপ্তজনপদের কথা পাওয়া যায়। ভূঃ (পৃথিবী), ভুবঃ (বায়বীয় মণ্ডল) এবং স্বঃ (স্বর্গ বা আকাশ) মিলে ত্রিলোক। সপ্তলোকের কথা পাই পরবর্তিকালের পুরাণে। ঋগ্বেদে আছে শুধুমাত্র সপ্তঋষি (নাম নেই) এবং সপ্তধামের কথা। "অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে। পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ"—পৃথিবীর সপ্তধামে বিষ্ণু আমাদের রক্ষা করুন।[১৩] 'সপ্তধাম' বলতে সম্ভবত সিন্ধু-আদি সপ্তনদীর সংলগ্ন উপত্যকাগুলিকেই বোঝানো হয়েছে। বর্তমান পঞ্চনদ ছাড়া ষষ্ঠ এবং সপ্তম নদী ছিল অধুনালুপ্ত ('বিনশন') বিখ্যাত সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী।[৮] এই উপত্যকাগুলির অধিবাসিবৃন্দের কাছে ঋষিরাই ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের নেতা। বিশেষ পূজা বা উপাসনার সময়ে সপ্তর্ষি বা সপ্তগোত্রের নেতারা একত্রে সম্মিলিত হতেন। বিপাশা, শতদ্রু, সরস্বতী প্রভৃতি নদীর সঙ্গে বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রমুখ সপ্তর্ষিদের বহু কাহিনী জড়িত আছে। বসিষ্ঠের অপর এক নাম 'বিপশ্চিন্'। বেদে ও পুরাণে প্রাপ্ত সপ্তর্ষিদের বহুবিধ উল্লেখ সংগ্রহ করেছেন মিচাইনার।[১৪] সিন্ধু-সরস্বতীর সপ্তধাম থেকেই (পুরাণে) পরিকল্পিত হয়েছে সপ্তলোকের কথা: ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ-এর উপরে আরও চারটি লোক—মহঃ, জনঃ, তপঃ এবং ব্রহ্ম বা সত্য-লোক যা সর্বোচ্চ এবং ব্রহ্মার আবাসভূমি।[১৫] মন্বন্তর-বাদ অনুযায়ী এক এক কল্পে সপ্তর্ষিরা সত্যধর্মের প্রচার ও রক্ষণ করেন এবং কল্পশেষে মহঃলোক এবং ব্রহ্মলোকে স্থিতি লাভ করেন।[১৬]

ঋগ্বেদে অদ্বৈততত্ত্ব যতটা পরিস্ফুট,[১৭] অবতারতত্ত্ব ততটা নয়। ইন্দ্র বা বিষ্ণু বিভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হতে পারেন, এইরকম সামান্য আভাসমাত্র দেওয়া হয়েছে।[১৮] অপরদিকে দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ঋষিরাই যে দেবতুল্য তা ঘোষণা করা হয়েছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে বলা হয়েছে যে, মরুৎ প্রভৃতি দেবতা পুরাকালে নররূপী ঋষি

১০ J. Marshall, *Mohenjo Daro and the Indus Civilisation*—3 Volumes

১১ S. R. Rao, *Decipherment of Indus Valley Script*, 1982

১২ T. N. Ramachandran, Presidential Address, *Indian History Congress*, 1956

১৩ ঋগ্বেদ, ১।২২।১৬

১৪ John E. Mitchiner, *Tradition of the Seven Ṛsis*, Motilal Banarasidass; Delhi 1982; এই গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত কিছু তথ্য বর্তমান প্রবন্ধে পরিবেশিত।

১৫ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৩।৪।২।৩—৪; বায়ুপুরাণ; ২।৩১।৩—৫ ইত্যাদি

১৬ পদ্মপুরাণ, ৫।৭।১০৫—১০৬; বিষ্ণুপুরাণ, ৩।২।৪৪

১৭ ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬; ৩।৫৫।১—২২; ১০।১১৪।৪—৫ ইত্যাদি

১৮ ঐ, ৬।৪৭।১৮; ৭।১০০।২

ছিলেন এবং দয়া, সৎকার্য ও তপোবলেই তাঁরা দেবমর্যাদায় উন্নীত হয়েছেন।[১৯]

ঋগ্বেদের প্রথম নয়টি মণ্ডলে সপ্তর্ষিদের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু নাম পাই না, তার কারণ হয়তো এই যে, তাঁরা নিজেরাই মণ্ডলগুলির রচয়িতা। অথর্ব (অত্রি), অঙ্গিরস, বসিষ্ঠ ইত্যাদি 'পূর্বতন' ঋষিদের নাম দশম মণ্ডলে পাওয়া যায়।

কল্পসূত্রে সর্বপ্রথম গোত্র-নেতা সাতটি ঋষির নাম দেওয়া হয়—বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গোতম, অত্রি, বসিষ্ঠ এবং কশ্যপ।[২০] পরবর্তিকালের রচনায় অন্যান্য নাম পরিলক্ষিত হয়।[১৪]

ঋগ্বেদে ঋষিদের দীপ্যমান নক্ষত্রের সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে—"অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা নক্তং দদৃশে কুহ চিদ্দিবেয়ুঃ"—ঐ যে সপ্তর্ষি নক্ষত্র যা উচ্চে স্থাপিত আছে এবং রাতে দৃষ্ট হয়, দিনে কোথায় চলে যায়।[২১] সায়নাচার্য বলেছেন—"ঋক্ষাঃ সপ্ত ঋষয়ঃ নক্ষত্র বিশেষাঃ।" ম্যাক্সমূলার তাঁর Science of Language পুস্তকে স্বীকার করেছেন যে, পরবর্তিকালে ইউরোপীয় ভাষায় 'ঋক্ষ' (উজ্জ্বল) শব্দের অর্থ দাঁড়ায় ভাল্লুক 'so called either from his bright eyes or from his brilliant tawny fur', যেহেতু সপ্তর্ষি নক্ষত্র Ursa Major বা Great Bear হিসাবে পাশ্চাত্য জগতে পরিচিত, তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন যে, ভাল্লুকরূপী সপ্তর্ষি-কল্পনা নাকি মধ্য-এশিয়ার আর্যেরা সঙ্গে করে এনেছিলেন ভারতবর্ষে!![২২]

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে (505 A.D.) বরাহমিহির সপ্তর্ষি নক্ষত্রের নাম দেন: ক্রতু (ধ্রুবতারার দিক থেকে প্রথম α Ursa Major), পুলহ (β), পুলস্ত্য (γ), অত্রি (δ); অঙ্গিরস (ϵ), বসিষ্ঠ (ζ) এবং সর্বশেষে মরীচি (η Ursa Major)[২৩]। কল্পসূত্র থেকে বৃহৎ সংহিতা পর্যন্ত সমস্ত শাস্ত্রেই বসিষ্ঠ এবং তাঁর সাধ্বী স্ত্রী অরুন্ধতী (ζ Ursa Major-এর পাশে ছোট তারা Alcor) সপ্তর্ষি-তালিকায় স্থান পেয়েছেন। উত্তর গোলার্ধের নিশ্চল তারা (north pole star) ধ্রুবর কথা ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না—প্রথম পাই পুরাণে[২৪] এবং পরে বৃহৎ সংহিতায়।[২৩]

সপ্তর্ষিদের নাম যে যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে তার একটি ব্যাখ্যা হল যে, এঁরা একটিমাত্র 'কল্প' বা যুগের অধিষ্ঠাতা। আরও একটি ব্যাখ্যা অনুমান করতে পারি, যখন দেখি পরবর্তিকালের ঋষিদের 'ব্রহ্মার মানসপুত্র' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ব্রহ্মা নারদের কাছে অনুযোগ করছেন যে, সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার আদি শ্রীহরির ভক্তেরা জগতের দুঃখ সম্বন্ধে উদাসীন হয়েছেন এবং শুধু তাঁর 'মানস পুত্রেরা'ই জগতের দুঃখনিবারণ কার্যে ব্যাপৃত আছেন।[২৫] সম্ভবত এই পুরাণে বৌদ্ধযুগের হীনযান-মহাযান বিতর্কের ছাপ পড়েছে। কথিত আছে যে, গৌতম বুদ্ধের নির্বাণ-লাভের পরে ব্রহ্মা তাঁকে অনুরোধ করেন যে, নিরন্তর সমাধিতে নিমগ্ন না থেকে তিনি যেন জগতের কাজে আত্মসমর্পণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণও অনুরূপ আদেশ

১৯ ঐ, ১০।৭৭।২

২০ হিরণ্যকেশিন গৃহ্যসূত্র, ২।৮।১৯।২—৭ ; আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র, ১২।১৫

২১ ঋগ্বেদ ১।২৪।১০। অন্যত্র 'নবগ্বাঃ সপ্ত বিপ্রাসো'র কথাও বলা হয়েছে। [৪]

২২ Mitchiner [১৪] পৃষ্ঠা ২৬২—২৬৯

২৩ বৃহৎ সংহিতা, ১৩।১—৬

২৪ বিষ্ণুপুরাণ, ১।১১।২৯—৫৬ ; স্কন্দপুরাণ, ৪।১।১৯।১০১

২৫ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ১।৮।১ ; ১।২৪।১—৫

স্বামীজীকে দেন। ভগবদ্গীতাতে বলা হয়েছে যে, পুরাকালের চারজন (সনকাদি) মহর্ষি, পরবর্তিকালের সপ্তর্ষি এবং চতুর্দশমনু শ্রীভগবানের মানসপুত্র ('মদ্ভাবা মানসা জাতা') বলে তাঁরা দৈবীশক্তিসম্পন্ন।[২৬] সপ্তর্ষিরা ঈশ্বরের মানসপুত্র হিসাবেই যুগে যুগে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন।[২৭]

অথর্ববেদ এবং পরে বৃহদারণ্যক উপনিষদে সপ্তর্ষিদের তুলনা করা হয়েছে সাতটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারের সঙ্গে। "অর্বাগ্‌বিলশ্চমস ঊর্ধ্ববুধ্নস্তস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপম্। তস্যাসত ঋষয়ঃ সপ্ত তীরে..."[২৮] —নিম্নবিবর, উপরে বর্তুলাকার মস্তকের যেমন সাতটি দ্বার—দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকাছিদ্র ও মুখগহ্বর—তেমনই সপ্তর্ষি প্রাণরূপ পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগের সাতটি সেতু।

৩

নরনারায়ণ, গৌতম বুদ্ধ ও সপ্তর্ষি-অবতার : কল্পসূত্র থেকে বৃহৎ সংহিতা পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রন্থে সপ্তর্ষিদের নামের যে সমস্ত তালিকা পাওয়া যায় তার মধ্যে অবতারকল্প কয়েকজন ঋষির নাম নেই—যথা, নর, নারায়ণ ও গৌতম বুদ্ধ।

মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, পুরাকালের নারায়ণ ঋষিই শ্রীকৃষ্ণ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবত এই নারায়ণ ঋষিই ঋগ্বেদের বিখ্যাত পুরুষ সূক্তের (১০।৯০) রচয়িতা এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ভাগবতপুরাণে পাই যে, শ্রীভগবানের চব্বিশটি অবতারের মধ্যে চতুর্থ হলেন নর ও নারায়ণ নামে দুই ঋষি—দক্ষকন্যা মূর্তির গর্তে জাত দুই ভাই।[২৯] তাঁদের আশ্রম সম্ভবত সরস্বতী-মার্কণ্ড নদীর তীরে ভগবানপুরা নামক প্রাচীন জনপদ অথবা আদি-বদরীর কাছে অবস্থিত ছিল।[৮] "নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ" স্তুতির মধ্যে নর, নারায়ণ এবং সরস্বতী নদী বা দেবীর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক চিরকালের মতো গাঁথা রয়েছে।

নারায়ণ ঋষি "ভারতবর্ষের মানুষের মঙ্গলের জন্য কল্পের শুরু থেকে ধর্ম, জ্ঞান আর শমযুক্ত হয়ে তপস্যা করেছিলেন।"[৩০] পরে ভৃগু-সন্তান মার্কণ্ডেয় মুনি নর-নারায়ণের 'অবতারতত্ত্বে'র প্রমাণ এবং দিব্যশিশুরূপী ভগবানের দর্শন পান।[৩১] বিষ্ণু-নারায়ণ-বাসুদেব কাহিনীর মধ্যেই অবতারত্বের প্রথম সূত্রপাত। মহাভারতে বাসুদেব-কৃষ্ণই সর্বপ্রথম অবতাররূপে স্বীকৃতি পান। প্রথম বর্ণনায় রাম অথবা বুদ্ধের নাম নেই।[৩২] আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে 'সপ্তর্ষির একজন' বলে বিবেচিত হয়েছিলেন এবং বৈদিক যুগের 'ঋষি'ই পৌরাণিক যুগে ঈশ্বরাবতার বলে পরিগণিত হন—এই প্রসঙ্গে পরে আসছি।

গৌতম বুদ্ধকে পরে অবতারত্বের সম্মান দেওয়া হলেও তিনি নিজে বৈদান্তিক প্রজ্ঞায় ব্যক্তি-ঈশ্বর বা অবতারতত্ত্বের সমর্থন জানাতে পারেননি। অথচ সপ্তর্ষিতত্ত্বে তিনি আস্থা রাখতেন। মহাপদানসুত্তে নিজেকে সপ্তম ঋষি

২৬ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, ১০।৬
২৭ বায়ুপুরাণ, ২।৪।৮—২২ ; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ২।৩।১।৯—২১
২৮ অথর্ববেদ, ১০।৮।৯ ; বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২।২।৩—৪
২৯ শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণ, ১।৩।৬—১৩ ; ২।৭।১—৭
৩০ ঐ, ১০।৮৭।১—৮
৩১ ঐ, ১২।৮—৯ এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সপ্তর্ষি এবং দিব্যশিশু সম্পর্কিত দর্শন তুলনীয়—লীলাপ্রসঙ্গ ৫ম খণ্ড, ১৩৫৪ সংস্করণ, পৃষ্ঠা, ৯১—৯২
৩২ মহাভারত, ১২।৩৩৭।৩৬

বলার আগে তিনি পূর্ববর্তী ছয়টি ঋষির ('পুব্বা ভগবন্তো') কথা বলেন। এই নামগুলির সঙ্গে অন্তত্র প্রদত্ত[২০,২৩] নামগুলির (বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া) কিছু সাদৃশ্য আছে—বিপশ্চিন্ (বিপাশা নদীর নিকট অধিবাসী বসিষ্ঠ),[৩৩] শিখিন (অগ্নি-উপাসক অত্রি), বিশ্বভূ (বিশ্বামিত্র অথবা ভৃগু), ক্রকুচ্ছন্দ (ক্রতু), কোনগমন (কণ্ব গোতম অথবা কপিল; প্রিয়দর্শী রাজা অশোক 'কোনগমন' ঋষির স্মারকস্তূপের সংস্কারসাধন করেছিলেন[৩৪]) এবং কশ্যপ। বোধিসত্ত্ব-বাণীর মধ্য দিয়ে গৌতম বুদ্ধ 'ঈশ্বর'-নির্ভরতার চেয়ে আত্মশক্তির উপর জোর দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, সাধারণ মানুষই জন্মজন্মান্তর ধরে অসত্য, লোভ আর তৃষ্ণার সঙ্গে সংগ্রাম করে নির্বাণ বা বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয় এবং দেবতার আসনে উন্নীত হয়। তাঁর বৈদান্তিক বার্তা ঋগ্বেদের বাণীরই[১১] প্রতিধ্বনি।

আবার ঋগ্বেদের ঐ বাণী অনুযায়ীই ভক্তেরা বুদ্ধকে ভগবানের আসনে বসিয়েছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিমার্গের অনুকরণে মহাযানীরা বোধিসত্ত্বের দেবর্ষিত্ব আর বুদ্ধের অনন্ত অবতারত্ব বা 'রূপকায়'ত্বের ঘোষণা করলেন—"গঙ্গার তীরে বালুকার মতো বুদ্ধ অনন্ত।"[৩৫] "যেমন অক্ষয় জলাধার থেকে হাজার হাজার ছোট ধারা বেরিয়ে আসে, সেইরূপ সত্ত্বগুণনিধি হরির থেকে অসংখ্য অবতারই এসেছেন।"[৩৬,৩৭]

গৌতম বুদ্ধ জোর দিয়েছেন বোধিসত্ত্বের মানবিক করুণা ও আত্মত্যাগের উপর। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত দধীচি, রন্তিদেব প্রমুখ মহাপ্রাণ ঋষিদের হৃদয়েও একই প্রকার লোক-হিত ও আত্মত্যাগের প্রেরণা। সাধারণ জীবের তারণ-কল্পে মহাকরুণার এই অবতরণই সপ্তর্ষিত্ব ও অবতারতত্ত্বের মূল কথা। দ্বিতীয়টি প্রথমটির নির্যাস। স্বামীজীর কথায়, ভগবানই মানুষ হয়েছেন আর মানুষই ভগবান হবেন।

৪

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে সপ্তর্ষি-অবতার প্রসঙ্গ: 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে স্বামী সারদানন্দ ঈশ্বরকোটী-অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। তাঁর একটি বিশেষ মূল্যবান মন্তব্য—"বৈদিক যুগের ঋষিই যে কালে পৌরাণিক যুগে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না···ঋষিগণ সকলেই সমশক্তিসম্পন্ন নহেন; আধ্যাত্মিক জগতে তাঁহাদিগের কেহ সূর্যের ন্যায়, কেহ চন্দ্রের ন্যায়···আবার কেহ বা সামান্য খদ্যোতের ন্যায়···বিশিষ্ট ঋষিগণের ঈশ্বরাবতারত্বে পরিণতির অন্য প্রধান কারণ—ভারতের গুরু-উপাসনা।"[৩৮]

"সাংখ্যকার কপিল এইরূপে সর্বকালব্যাপী এক নিত্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও এককল্প-ব্যাপী সর্বশক্তিমান পুরুষসকলের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে 'প্রকৃতিলীন' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন[৩৯]···'প্রকৃতি-লীন' পুরুষদের আবার 'কল্পনিয়ামক ঈশ্বর' (ruler for one cycle)

৩৩ মহাযান সূত্রালংকার, ৪৮।১১; ৮৩।২ ইত্যাদিতে বুদ্ধের ঘোষণা: "আমিই সেই পুরাকালের বুদ্ধ—বিপশ্যিন্।"

৩৪ J. E. Jennings: *The Vedantic Buddhism of the Buddha*, P. 449

৩৫ ললিতবিস্তর, ৩৭৬।৫, ৪০২; লংকাবতার সূত্র, ২০৪

৩৬ শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ, ১।৩।২৬

৩৭ বর্তমান লেখকের '*Buddha and Bodhisattva—A Hindu View*' Cosmo Publications, Delhi 1985, গ্রন্থে বোধিসত্ত্ব-সপ্তর্ষি-অবতারবাদ প্রসঙ্গ সবিশেষ আলোচিত হয়েছে।

৩৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, প্রথম ভাগ, ১৩৫৩ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২—৫

এবং 'ঈশ্বরকোটী' (satellites of the former) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।[৩৮,৪০] ...সাংখ্যের প্রকৃতি-লীন ঋষিরাই বেদান্তের 'আধিকারিক' এবং পুরাণের 'অবতার'। ঈশ্বর-কোটীরা লোকহিতার্থে সংসারে পুনরাগমন করেন; জীবকোটীরা সিদ্ধিলাভ করিয়া পুন-রাগমন করেন না।"[৪১]

সপ্তর্ষি-কল্পনা থেকেই যে অবতারতত্ত্ব ক্রমশ উদ্ভূত তার একটি প্রমাণ মহাভারতের অনুশাসন-পর্বে পাওয়া যায়—যেখানে বলা হয়েছে যে, সাবর্ণি মন্বন্তরে শ্রীকৃষ্ণ 'সপ্তর্ষির একজন' বলে পরিগণিত হবেন।[৪২] এর পরে শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র মানবদেহধারী অবতার বলে গণ্য হন—অবতার হিসাবে রাম, বুদ্ধ ইত্যাদির নাম আরও পরে গ্রহণ করা হয়।[৩২] অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকদের পক্ষে নামরূপে আবদ্ধ মহর্ষিদের পরমব্রহ্মের 'অবতার' বলে গ্রহণ করা দুরূহ হয়ে পড়েছিল; তাই তাঁরা শুধু চাপরাশ-প্রাপ্ত 'আধিকারিক'-এর কথা স্বীকার করেছেন।[৪৩]

শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতে ঈশ্বরকোটী-সপ্তর্ষি-অবতার প্রসঙ্গ অল্পকথায়, অথচ সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে—

"অবতার—যিনি তারণ করেন। তা দশ অবতার আছে, চব্বিশ অবতার আছে, আবার অসংখ্য অবতার আছে[৪৪]...ঈশ্বর অনন্ত হউন আর যত বড় হউন,—তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সারবস্তু, মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে। তিনি অবতার হয়ে থাকেন,[৪৫] ...অনন্ত ঢুকুতে চাও কেন? তোমাকে ছুঁলে কি তোমার সব শরীরটা ছুঁতে হবে? যদি গঙ্গাস্নান করি তা হলে হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত কি ছুঁয়ে যেতে হবে?[৪৬]...অবতার বা অবতারের অংশ, এদের বলে ঈশ্বরকোটী; আর সাধারণ লোকেদের বলে জীব বা জীবকোটী।...যারা ঈশ্বরকোটী—তারা যেন রাজার বেটা; সাত তলার চাবি তাদের হাতে। তারা সাত তলায় উঠে যায়, আবার ইচ্ছামতো নেমে আসতে পারে[৪৭]।...ফেরে না, ফেরে না, সব বলে। তবে শঙ্করাচার্য, রামানুজ এরা সব কি?[৪৮]... অবতারাদি ঈশ্বরকোটী।...অবতারাদির 'আমি' ঐ ফোকরওয়ালা পাঁচিল, পাঁচিলের এধারে থাকলেও অনন্ত মাঠ দেখা যায়;—এর মানে, দেহধারণ করলেও তারা সর্বদা যোগেতেই থাকে!"[৪৯]

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে 'অবতার' এবং তাঁর ভক্তমণ্ডলীর বিশেষ ছয়জনকে 'ঈশ্বরকোটী' বলে ঘোষণা করে গেছেন। ব্যক্তিবিশেষে আধ্যাত্মিক শক্তির তারতম্য আছে—এই বিষয়টির অধিক

৩৯　ঐ,　চতুর্থ ভাগ, ১৩৫৩ সংস্করণ; পৃষ্ঠা, ১৪১—১৪৩

৪০ *Sri Ramakrishna The Great Master, Volume* 1, Madras, 1983 edition, পৃষ্ঠা ৭-৪ ইংরেজী প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে।

৪১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, তৃতীয় ভাগ. পৃষ্ঠা ৪৮ এবং ২৭১

৪২ মহাভারত, ১২।১৮।২৯

৪৩ ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩।৩২

৪৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩ ২০।২

৪৫　ঐ,　১।১৪।২

৪৬　ঐ,　৩।১৪।৭

৪৭　ঐ,　৩।১৪।৩ সপ্তলোক ও সপ্তর্ষির প্রসঙ্গ তুলনীয়।

৪৮　ঐ,　২।২৪।৭

৪৯　ঐ,　৩।১৪।৭
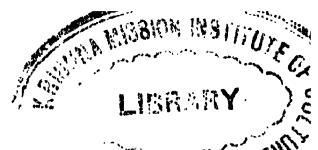
আলোচনা অনধিকার চর্চা বলে মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—"পুরাণকারেরা পরে কল্পনাসহায়ে অবতার-পুরুষদিগের প্রত্যেকে কে কতটা ঈশ্বরের অংশসম্ভূত ইহা নির্ধারণ করিতে অগ্রসর হইয়া ঐ চেষ্টার একটু বাড়াবাড়ি করিয়া বসিয়াছেন।"[৩৯] অলমতি বিস্তারেণ।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে বড় আদরের সামগ্রী স্বামীজীর ঋষিত্ব সম্বন্ধে শ্রীঠাকুরের মন্তব্য—"জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীরধারণ করিয়াছ।"[৫০] "নরেন্দ্র অখণ্ডের ঘরের চারিজনের একজন এবং সপ্তর্ষির একজন।"[৫১]

নর ঋষির ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে তথ্য [২১,৩১] খুবই কম। অপরদিকে স্বামীজীর সঙ্গে ইতিহাসের চরিত্র গৌতম বুদ্ধের (জীবনী- ও বাণী-গত) *সাদৃশ্য* বিস্ময়কর। গৌতম বুদ্ধ নিজেকে সপ্তর্ষির একজন বলে মনে করতেন এবং স্বামীজী নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলে যে মনে করতেন, তার প্রমাণ আছে।[৫২] স্বামীজী নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করলে সমাধিলীন হয়ে পড়বেন এই আশঙ্কাতেই হয়তো শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ-বুদ্ধের অভিন্নতা বা সাদৃশ্য-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি।

'অদ্ভুত দেবশিশু' শ্রীরামকৃষ্ণ 'অখণ্ডের রাজ্যের দিব্যজ্যোতিঃ ঘনতনু সাতজন প্রবীণ ঋষির অন্যতম' স্বামীজীকে পৃথিবীতে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন—দিব্যদর্শনের সেই অমর সাহিত্য[৫৩] উদ্ধৃত করে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। শ্রীরামকৃষ্ণ সপ্তর্ষি ও নরেন্দ্রনাথ সংক্রান্ত তাঁর দিব্যদর্শন একাধিকবার বর্ণনা করেছেন।[৫৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে প্রচলিত এক সুদৃঢ় ধারণা এই যে, স্বামীজী সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে এসেছিলেন। স্বামী শিবানন্দ দর্শন পেয়েছিলেন—"স্বামীজীকে দেখলাম। একটি জ্যোতির্ময় string-এর (সুতো) মতন আছে—সেটিকে ছেড়ে দিয়ে স্বামীজী নীচে এসেছিলেন, তাই জন্ম বলে।"[৫৪] এই প্রসঙ্গে শ্রীঠাকুরের আর একজন সাক্ষাৎ শিষ্য এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দের অনুভূতি বিশেষ মূল্যবান। স্বামী সদাশিবানন্দের উক্তি উদ্ধৃত করে প্রবন্ধের উপসংহার টানছি—

"পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের আহ্বানে বিজ্ঞানানন্দজী স্বামীজীর সমাধিমন্দির নির্মাণ উপলক্ষে কিছুদিনের জন্য বেলুড় মঠে যাইয়া অবস্থান করেন। এলাহাবাদে থাকিতে আমরা দেখিয়াছি, সেই সময় পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ স্বামীজীর ধ্যানে গভীর ভাবে মগ্ন থাকিতেন··· প্রায়ই তিনি ভরদ্বাজ আশ্রমে যাইয়া সপ্তর্ষির যে মূর্তিটি আছে তাহা তন্ময় হইয়া দর্শন করিতেন। আবার আমাদিগকে বলিতেন, কল্পে কল্পে যে সকল সপ্তর্ষিমণ্ডল হয়, তাঁহারাই বিশ্বমঙ্গলের

৫০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পঞ্চম ভাগ, ১৩৫৪ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬০। *The Great Master*, Volume two, পৃষ্ঠা ৮২৫-এ অনুবাদ দেওয়া হয়েছে "ancient Rishi Nara, a part of Narayana" আগেকার আলোচনা [২১,৩১] দ্রষ্টব্য।

৫১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পঞ্চম ভাগ, ১৩৫৪ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১০৭। *The Great Master*, Volume two, পৃষ্ঠা ৮৫৭ পাদটীকায় নামগুলি দেওয়া হয়েছে : অখণ্ডের ঘরের চারিজন—সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার ; সপ্তর্ষির তালিকায় আরও তিনজন—সন, সনৎ-সুজাত এবং কপিল। আগেকার আলোচনা [২৫,২৬] দ্রষ্টব্য।

৫২ বর্তমান লেখকের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের ৩৭, 'বিবেকানন্দ জাতক' পরিচ্ছেদে এই বিষয়টি আলোচিত।

৫৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পঞ্চম ভাগ, ১৩৫৪ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১১-১২

৫৪ স্বামী অপূর্বানন্দ. মহাপুরুষ শিবানন্দ, উদ্বোধন; ১৩৫৯ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩২৩

একমাত্র নিয়ন্তা। এই সময় তিনি জয়পুরবাসী নরসিংহ দাস নামক একজন প্রবীণ চিত্রশিল্পীর দ্বারা সপ্তর্ষিমণ্ডলের একখানি তৈলচিত্র অঙ্কন করান ও তাঁহার শয়নকক্ষে তাহা রাখেন। মহারাজজী বলিতেন,'বিশ্বের সর্বত্র স্বামীজী আছেন; কিন্তু সপ্তর্ষিমণ্ডলেই তাঁর স্থান, তিনি সেখান থেকেই জগতের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন।'[৫৫]

ঋগ্বেদে এবং মহেঞ্জোদারোতে যে সপ্তর্ষি-তত্ত্বের অবতারণা, বিংশ শতাব্দীতেও সেই অনুপম বিষয়ের মনন ও নিদিধ্যাসন অব্যাহত। মহেঞ্জোদারোর প্রতীক চিহ্ন এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্দের তত্ত্বাবধানে অঙ্কিত তৈলচিত্রে ভারতীয় সংস্কৃতির এক অমর আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য চিত্রায়িত। পরমেশ্বরের লীলাসহচর ঈশ্বরকোটী সপ্তর্ষিগণ বিশ্বমঙ্গলের ধ্যানে নিরত—আমরা তাঁদেরই গোত্রজ, সন্তান।

৫৫ 'প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ', সুরেশচন্দ্র দাস ও জ্যোতির্ময় বসুরায় সম্পাদিত, জেনারেল প্রিন্টার্স পাবলিশার্স, কলিকাতা; ১৩৮৪ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩০২—৩০৩

বিবেকানন্দ বন্দনা

শ্রীশুভাশিস সাঁতরা

ভারত-আত্মা ভারত-পথিক চির-সচ্চিদানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্ত্রশিষ্য স্বামীজী বিবেকানন্দ।
অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হিয়া, তেজস্বী ভাস্কর
শৌর্য-বীর্যে অমিত দীপ্ত, নমি তোমা' নরবর।
অপরের তরে নিবেদিত প্রাণ, স্বার্থ-বুদ্ধিহীন,
প্রেম-পারাবার, করুণা-অপার, নিয়ত ব্রহ্মলীন।
'নরেন্দ্র' তুমি সত্যই ছিলে—অতুলিত প্রতিভায়,—
কর্মে-জ্ঞানে, বল-বুদ্ধিতে, ভক্তি-ত্যাগ-সেবায়।
মানবতাবাদী মহান্ সাধক, পরম কর্মবীর
কর্মযোগের গতি-প্রকৃতি-সাধনা করিলে স্থির।

ব্রহ্ম তোমার মানুষেরই মাঝে, তারি লাগি' প্রেমময়
রূপটি দেখায়ে প্রকাশিলে তব আদর্শ পরিচয়।
আর্ত-পীড়িত দরিদ্র জনের সেবাই প্রভুর সেবা
এমনতর স্পষ্ট করিয়া ঘোষিয়াছে আর কেবা?
শুধু কথা নয়, কাজেতে দেখায়ে করিলে সপ্রমাণ—
জীবগণ মাঝে জগন্নাথের নিত্য অধিষ্ঠান।

বিশ্বজগতে আপন করিতে হে মহা সন্ন্যাসি
কহিলে 'মোর ভগিনী ও ভ্রাতা যত আমেরিকাবাসী'।
একটি কথায় মোহিত করিয়া করিলে দিগ্বিজয়
রাখিলে ধরায় তোমার অমোঘ শক্তির পরিচয়।
জগৎমাঝারে ভারত মাতারে শ্রেষ্ঠ আসনখানি
তুমিই দানিলে গৌরবে তাঁরে অবহেলা হতে টানি'।
তোমার কণ্ঠে বাণী রূপ পেল লাঞ্ছিত মানবতা
ঘোষিত হইল মুক্তির ডাক, সকলের স্বাধীনতা।

বন্ধন-গ্লানি ঘুচাইতে তব বীরবাণী নির্ভীক
কাশ্মীর হতে কন্যাকুমারী—ছুটিল দিগ্‌বিদিক।
স্বদেশপ্রেমে স্বদেশবাসীর চিত্ত করিলে জয়;
পরপদানত ভারতীয়গণে বিতরিলে বরাভয়।
প্রেরণা তোমার যোগাইল তেজ, বীর্য, পরাক্রম—
জীবনস্রোতে আসিল জোয়ার, টুটিল সকল ভ্রম।

জাতীয়তাবাদী যোদ্ধা তাপস, সংগ্রামী ত্যাগবীর
'মানুষ' গড়িতে তোমার 'মিশনে' করিলে ব্রতস্থির।
দেশের সেবায় যতেক যুবায় নিবেদিল মনপ্রাণ
আদর্শে তব করি' সার্থক জীবনের আহ্বান।
তোমার মন্ত্র তাহাদের কাছে সম্পদ অক্ষয়—
আত্মশ্রদ্ধা-সাহসে সেথায় ভীরুতার পরাজয়।
আত্মবিশ্বাসে, আত্মশক্তিতে ভরিল ভারত, বেদান্ত গান
উঠিল ধ্বনিয়া, সুপ্তি ছাড়িয়া জাগিল মুক্ত মহান্ প্রাণ।

* *

চিরযুবার আদর্শ তুমি—স্মরিছে তোমায় ভারতবর্ষ
যৌবনের প্রতিভূ! তোমার পরশে ধন্য এ যুববর্ষ।
শির-উন্নত চির-জাগ্রত বিবেক-সহায়ে চতুর্দিক
নবযৌবনের উচ্ছলতায় গায় যেন তব মাঙ্গলিক॥

ভজ রে বিবেকানন্দম্

স্বামী হর্ষানন্দ

ভজ রে স্বামি বিবেকানন্দম্
ভজ যতিরাজং মানস সততম্ ॥১॥

—রে মন, প্রতিনিয়ত যতিরাজ স্বামী বিবেকানন্দের ভজনা কর।১

ত্যক্তসপ্তমুনিবিশাললোকম্
নাশিতভুজনগুরুতরশোকম্ ॥২॥

—যিনি সপ্তর্ষিলোক থেকে ধরায় অবতীর্ণ হয়ে বিশ্ববাসীর নিদারুণ দুঃখ মোচন করেছিলেন সেই স্বামী বিবেকানন্দকে ভজনা কর।২

রামকৃষ্ণগুরুপদাব্জভৃঙ্গম্
প্রসাদমধুবলবিজিতানঙ্গম্ ॥৩॥

—শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে যিনি মধুকরের মতো ছিলেন এবং তাঁর প্রসাদে যিনি কামনা-বাসনা জয় করেছিলেন সেই স্বামী বিবেকানন্দকে ভজনা কর।৩

আত্মশ্রদ্ধাস্থাপিতধর্মম্
মজ্জদ্ভারতমন্দরকূর্মম্ ॥৪॥

—যিনি 'আত্মশ্রদ্ধা' ধর্ম প্রতিষ্ঠা এবং কূর্মাবতারের মতো নিমজ্জমান ভারতকে রক্ষা করেছিলেন সেই স্বামী বিবেকানন্দকে ভজনা কর।৪

হংসশক্তিযুতমহদর্ণনাবম্
পরহংসসুধাপূরিতভাবম্ ॥৫॥

—যিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণশক্তি-চালিত অর্ণবপোত এবং যাঁর হৃদয় ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবসুধায় পরিপূর্ণ সেই স্বামী বিবেকানন্দকে ভজনা কর।৫*

* লেখক-কৃত স্তোত্রের ইংরেজী অনুবাদের ভাষান্তর করেছেন শ্রীপ্রভাতকুমার বিশ্বাস।

শতবর্ষের আলোকে কাশীপুর উদ্যানবাটী

স্বামী গম্ভীরানন্দ

আজ থেকে ঠিক একশ বছর আগে এই দিনটিতেই শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর উদ্যানবাটীতে পদার্পণ করেছিলেন এবং আটমাসের অধিক কাল এখানে অবস্থান করেছিলেন। ভক্তের স্বভাব এই যে, তাঁরা ভগবানের নর-লীলা নানাভাবে আস্বাদন করে থাকেন। কেন, কিভাবে ইত্যাদি প্রশ্ন তাঁদের মনে জাগে না। স্বভাবতই তাঁরা ঠাকুরের বাল্যকাল থেকে নানা লীলা, যেমন যা ঘটেছিল তাই শুনে, আলোচনা করে ভক্তিতে বিহ্বল হয়ে থাকেন। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা—এগুলো পরের কথা। আমরা জানি যে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব মেঁড় গাঁও দিয়ে যাচ্ছিলেন, শুনতে পেলেন সেখানকার মাটিতে কীর্তনের খোল তৈরি হয়। অমনি তিনি সমাধিতে লীন হয়ে গেলেন। একটি প্রচলিত কথা আছে, প্রহ্লাদ লেখা-পড়া শিখতে গিয়েছিলেন। প্রথমে যখন 'ক' অক্ষর পড়তে যান, অমনি শ্রীকৃষ্ণের কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। তাঁর আর পড়াশুনা হল না। তিনি মহাভাবে বিভোর হয়ে গেলেন।

আমরা দেখতে পাই—শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টার মশাইকে বারবার বলছেন, বল আর বিচার করবে না। বারবার তাঁকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিচ্ছেন যে, তিনি বিচার করবেন না। ভক্ত শুধু তাঁর জীবনীর কথা আলোচনা করে, শুনে বা পড়ে আনন্দ পান। ভক্ত শুধু বলেন—"প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে।/দেখা নাহি পাই পথ চাই,/সেও মনে ভাল লাগে।" এটি হচ্ছে ভক্তির বিশেষ প্রকাশ। কিন্তু আমরা যারা সেই উঁচু স্তরে উঠতে পারিনি—আমাদের ভক্তির প্রকাশ অন্যভাবে হয়ে থাকে। আমরা প্রশ্ন করে থাকি—কখন, কোন্ সময় ঘটেছিল ঘটনাটা, তার তাৎপর্য কি, কেন তিনি অমনটি করেছিলেন। আর তার ফলে জগতের কি হল, সমাজের কি হল ইত্যাদি নানা প্রশ্ন আমাদের কাছে এসে থাকে। এও ভক্তির একটি প্রকাশ। আমরা তারই পরিচয় পাচ্ছি ; যে ঘটনাবলী এখানে ঘটেছিল আটমাসের অধিককাল ধরে, তার পরিচয় আমরা পাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের বিভিন্ন পৃষ্ঠাতে এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের বর্ণনাতে। স্বামীজী এবং ঠাকুরের অন্যান্য সন্তানগণের বক্তৃতা, চিঠিপত্র বা স্মৃতিকথার ভিতর ইতস্তত ছড়িয়ে আছে এই কাশীপুর উদ্যানবাটীর কথা। এই উদ্যানবাটীকে স্বামীজী খুব উঁচু স্থান দিতেন। একটি লেখা চিঠির বাইরে খামের উপর তিনি লিখেছিলেন : রাখাল, মনে রেখো এটি হচ্ছে আমাদের প্রথম মঠ, এটি যেন হাতছাড়া না হয়। এটি যেন আমরা গ্রহণ করতে পারি। সুখের বিষয় এই উদ্যানবাটী আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়নি। আমাদের হাতে ফিরে এসেছে। এখন ভক্তেরা এখানে এসে সমবেত হতে পারছে। ঠাকুরের সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারছে।

আপনারা জানেন, ঠিক একশ বছর আগে এমনি একটা দিনে, অপরাহ্নে ঠাকুর এখানে এসেছিলেন। আমাদের বেলুড় মঠের স্বামী প্রভানন্দ মাস্টার মশাইয়ের দিনলিপি পাঠ করে, গবেষণা করে বের করেছেন যে, ১১ ডিসেম্বর ১৮৮৫-র অপরাহ্নে ঠাকুর

এসেছিলেন এখানে। অপরাহ্ন সাড়ে তিনটেও হতে পারে, সাড়ে চারটেও হতে পারে। তবে সন্ধ্যার আগে নিশ্চয়ই। ঘোড়ার গাড়ি করে এখানে এসে পৌছেছিলেন। শ্রীশ্রীমাও সঙ্গে এসেছিলেন। অপর ভক্তরাও এসেছিলেন। এসে এখানে কি হল? প্রধান দুটি ঘটনা আমাদের মনে পড়ে। একটি ঘটনা : স্বামীজী বলেছেন যে, মনে রেখো এইটিই হচ্ছে আমাদের প্রথম মঠ। কি করে প্রথম মঠ হল? এখানে ঠাকুরের অল্পবয়স্ক ভক্ত যাঁরা ছিলেন, (বয়স্ক ভক্ত বুড়ো গোপালদা—স্বামী অদ্বৈতানন্দও ছিলেন, কিন্তু বেশির ভাগই ছিলেন যুবক ভক্ত)—নরেন্দ্রনাথ, বাবুরাম প্রমুখ—তাঁদের তিনি গেরুয়া বস্ত্র দিয়েছিলেন। একথা আপনাদের সবার জানা আছে। তথাপি একই কথা বারবার ঠাকুরের সম্বন্ধে আলোচনা করলে পুনরাবৃত্তি দোষ আসে না। কেননা ঠাকুরের কথা যতবার শুনি ততবারই মিষ্টি লাগে। একদিন বুড়ো গোপালদা ঠিক করেছিলেন, যেসব সাধু গঙ্গাসাগর-স্নানে যাবেন তাঁদের তিনি গেরুয়া কাপড় দেবেন। শুনে ঠাকুর বললেন, এখানে তুমি ত্যাগী ভক্তদের দাও। এখানেই আমি বিলিয়ে দেব, এদের থেকে কে আর উচ্চস্তরের সাধু আছে? শোনা যায়, বারো খানা গেরুয়া কাপড় এবং তার সঙ্গে রুদ্রাক্ষের মালাও ছিল। এগার খানা গেরুয়া কাপড় ভাবী সাধুদের ঠাকুর দিয়েছিলেন। যাঁদের তিনি গেরুয়া দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন—নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, যোগীন্দ্র, বাবুরাম, নিরঞ্জন, তারক, শরৎ, শশী, কালী, লাটু ও বুড়োগোপাল। আর একখানি নাকি গিরিশবাবুর জন্য রেখেছিলেন। তিনি ভৈরবাংশে জাত ছিলেন। গেরুয়া কাপড় দেওয়ার পর যুবক ভক্তদের ঠাকুর বলেছিলেন,—তোমরা গ্রামে গিয়ে ভিক্ষা কর। তাঁরা ভিক্ষা করেছিলেন। এইভাবেতে সাধু-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা কাশীপুর উদ্যানবাটীতে হয়েছিল। তারপর তাঁরা বরানগর মঠে, আলমবাজার মঠে রইলেন এবং নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে গেলেন, বেলুড় মঠ স্থাপিত হল ইত্যাদি, পর পর অনেক ঘটনা ঘটে গেল। কিন্তু সূত্রপাত হল এখানে। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ হাতে করে সঙ্ঘ গড়লেন। আর কারু ডাকা নয়, তিনিই এসে তাঁদের ডেকে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের সঙ্ঘবদ্ধ করেছিলেন। স্বামীজীর পত্রাবলীর ভিতরে আমরা পাই, প্রমদাদাস মিত্র মশাইকে তিনি লিখছেন : এদের অর্থাৎ যুবক-ভক্তদের ভার ঠাকুর আমার উপরে দিয়ে গেছেন। ঠাকুরই স্বামীজীকে Leader-রূপে ঠিক করে রেখে গেছিলেন। স্বামীজী সেই নায়কের পদ গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং নায়ক হয়ে তিনি ঠাকুরের মনস্কামনা পূর্ণ করেছিলেন—সে আরও পরের কথা। কিন্তু তার সূত্রপাত হয়েছিল এখানেই; শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের দ্বারা।

আর একটি প্রধান ঘটনা আপনাদের সকলেরই জানা আছে। ১ জানুআরির কল্পতরু উৎসবে এসব ঘটনার কথা আলোচনা হয়ে থাকে। তবুও স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভাল এজন্য যে, আটমাসের ভিতরে এই ঘটনাও এখানে ঘটেছিল। ১ জানুআরি ১৮৮৬, অসুস্থ অবস্থায় ঠাকুর নেমে এসেছিলেন দোতলা থেকে। হেঁটে অনেকটা দূর পর্যন্ত এসেছিলেন এবং যেচে সকলকে কৃপা বিতরণ করেছিলেন। ফলে যার যে রকম চাই তার সেই রকম ইষ্ট দর্শনাদি হয়েছিল। কাউকে কাউকে তিনি মহামন্ত্রও দিয়েছিলেন এই ১ জানুআরির কল্পতরু দিবসে।

আর একটি প্রধান ঘটনার কথা মনে পড়ে—সেটা হচ্ছে ঠাকুরের নিজ মুখে স্বীকার করা যে, তিনি অবতার। এই সঙ্গে একটা মজার কথা আমার মনে পড়ছে। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচার তখন ভাড়া বাড়িতে ছিল। সেখানে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের একজন অধ্যাপক, সাদা fellow—বিদেশী লোক। তিনি আমার ঠিক সামনে বসেছিলেন। আমার দিকে প্রায় তাকিয়ে বলতে লাগলেন, **Ramakrishna was not an Avatara. He never says that he is an Avatara.** অর্থাৎ রামকৃষ্ণ অবতার ছিলেন না। তিনি নিজ মুখে কখন নিজেকে অবতার বলে স্বীকার করেননি। তিনি বলে গেলেন! কি আর করব, তিনি আমাদের অতিথি অভ্যাগত! আমি রামকৃষ্ণ মিশনের লোক। তার মুখের উপর কি করে বলি, মশাই আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। আপনি এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। আসল কথা হচ্ছে কি, ঠাকুর 'আমি' বলে তো কখন বলতেন না। 'এখানে' বা নানাভাবে ঘুরিয়ে বলতেন। যাঁরা ভক্ত, তাঁদের জানা আছে যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের কত জায়গায় তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন অবতার রূপে। একটা জায়গায় নয়, অনেক জায়গায় আছে—যেখানে মাস্টার মশাই বা অপরকে বলছেন যে, তিনি অবতার,—একটু ঘুরিয়ে, ঠিক আমি অবতার এভাবে নয়। কিন্তু আরও পরিষ্কারভাবে তিনি যে অবতার সেই কথাটি বেরিয়েছিল এই কাশীপুরে। মহাসমাধির কয়েকদিন আগে ঠাকুর একদিন শুয়ে আছেন, সে-সময় স্বামীজীর মনে হঠাৎ ঔৎসুক্য জাগল যে, এই অবস্থার ভিতরে যদি শ্রীরামকৃষ্ণ স্বমুখে বলেন, তিনি অবতার, তাহলে আমি স্বীকার করব যে, তিনি অবতার। অমনি ঠাকুরের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো : 'এখনও তোর জ্ঞান হল না? সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ…।' এর থেকে আর কি করে পরিষ্কারভাবে বলবেন যে, আমি অবতার রামকৃষ্ণ। এই কথাটি একবার তো নয়, লীলাপ্রসঙ্গতে শরৎ মহারাজ—স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন—আমরা (বহুবচনে বলেছেন), তাঁর নিজ মুখে শুনেছি। স্বামীজীকে যে একবার বলেছিলেন তা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ আছে—শুধু তা নয়; লীলাপ্রসঙ্গতেই তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আমরা অনেকবার তাঁর মুখে এই কথাটি শুনেছি। সবকথা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ভিতর তো ছাপা হয়নি এবং অন্যান্য গ্রন্থেতেও বেরোয়নি। কিন্তু এটি সত্য যে, তিনি স্বমুখেই বলেছিলেন এবং স্বমুখে বলাটাই হচ্ছে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। গীতাতেও (১০।১৩) রয়েছে 'স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে'—তুমি নিজেও একথা আমাকে বলেছ যে, তুমি ভগবানের অবতার। সেই কথাই ঠাকুর নিজ মুখে এই কাশীপুর উদ্যানবাটীতে পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন।

এইরকম নানা ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাশীপুর উদ্যানবাটী। সেজন্য এই স্থানটি আমাদের কাছে অতি প্রিয়। অতি প্রিয়—আমি বলব—কেননা যুগাবতার আটমাসের অধিককাল এখানে বাস করে গেছেন। আমি কয়েকটি ঘটনার কথা মাত্র বললুম। আরও কত ঘটনা আছে। সুতরাং এ স্থানটি এবং এই ঘটনাবলী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের মনে যদি প্রশ্ন জাগে যে, কেন এ জায়গা এত গুরুত্বপূর্ণ? তার উত্তর আমরা কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গের ভিতরেই পাব।*

* গত ১১ ডিসেম্বর ১৯৮৫, কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ পদার্পণ ও তাঁর অন্ত্যলীলার শতবার্ষিকী উপলক্ষে 'শতবর্ষ'-জয়ন্তী' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ মহারাজ কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণটি টেপরেকর্ড হতে প্রত্যালিখিত।

বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকারঃ দ্বিতীয় দিনের কথা

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

পূর্ব প্রতিশ্রুতিমতো হেমচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলাম ৫ এপ্রিল, ১৯৭৮। তাঁর কাছে সেটি আমার দ্বিতীয়বার যাওয়া। সেদিন তাঁকে বললাম: গতদিন আপনার স্বামীজীর স্মৃতিচারণ শুনে খুব ভাল লেগেছে। আপনার তো দেখলাম এতকাল পরেও সব মনে আছে।

হেমচন্দ্র ঘোষ: বলেন কি? বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের স্মৃতি কি কেউ কখনও ভুলতে পারে? তাছাড়া, তাঁর সঙ্গে যে জড়িত হয়ে রয়েছে আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেমন করে তা আমি ভুলে যাব? আর ঢাকায় স্বামীজীর আগমন উপলক্ষে সারা শহরে যে একটা বিরাট সাড়া পড়ে গিয়েছিল। যারা ঢাকার মানুষের সেই উৎসাহ-উদ্দীপনা স্বচক্ষে দেখেছিল, তাদের কারুর পক্ষেই সেই দিনগুলির কথা ভোলা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন: আচ্ছা, আপনার কাছে শুনতে চাই—ঢাকার মানুষের ঐ উৎসাহ-উদ্দীপনার কারণ কি ছিল?

হেমচন্দ্র ঘোষ: (ধীরভাবে কিন্তু আবেগভরে) কারণ, স্বামীজী ছিলেন তৎকালীন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ—সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তিত্ব। আমাদের চোখে তিনি ছিলেন যুগনায়ক। শুধু আমাদের কেন, সারা দেশের অধিকাংশ হিন্দুর, বিশেষতঃ যুবসম্প্রদায়ের, মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছিল আমাদের ভাবনায়। মাদ্রাজ, কলকাতা, লাহোর এবং ভারতের অন্যত্র তাঁকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার যে উত্তাল তরঙ্গ উঠেছিল তা স্বভাবতই দেশের ঐ প্রান্তকেও [অর্থাৎ পূর্ববঙ্গকেও] প্রভাবিত করেছিল। অবশ্য কলকাতার মতো ঢাকার রক্ষণশীল মহলেও স্বামীজীর সম্পর্কে অসহিষ্ণুতার মনোভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সর্বসাধারণের উৎসাহ-উদ্দীপনার তুলনায় গোঁড়াদের অসন্তোষের ব্যাপারটি কিছুই উল্লেখযোগ্য ছিল না। শুধু যে তা বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি তাই নয়, অগণিত মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনায় তা কার্যত চাপাই পড়ে গিয়েছিল। শিকাগোতে যে অভূতপূর্ব ইতিহাসের সৃষ্টি হয়েছিল সে তো মাত্র কয়েক বছর আগেকার টাট্‌কা ঘটনা তখন। আর তারপর বিজয়গর্বে দেশে ফিরে ভারতের সর্বত্র স্বামীজী যে বিরাট অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন সে তো তারও পরের ঘটনা। সমগ্র জাতি তখন পাশ্চাত্যের মাটিতে স্বামীজীর অসাধারণ সাফল্যের উত্তেজনায় চঞ্চল। শিকাগোর ধর্ম মহাসভায় স্বামীজীর সেই দৃপ্ত আবির্ভাবের সংবাদ বৃটিশ-পদানত ভারতবর্ষের উপর যেন একটা প্রচণ্ড ইলেক্‌ট্রিক শকের মতো কাজ করেছিল। ঐ আকস্মিক আঘাতেই ভারতের ঘুম ভেঙেছিল। আর সেটাই ছিল বর্তমান ভারতবর্ষের জাগরণের প্রথম স্পষ্ট চিহ্ন—তার প্রায় হাজার বছরের গভীর জড়তা ভেঙে উত্থানের সুস্পষ্ট লক্ষণ। সারা দেশের মানুষের বুকে শিকাগোর ঘটনা একটা বিরাট স্বপ্ন, একটা বিরাট কল্পনা জাগ্রত করে দিয়েছিল। ভারতের মানুষ অধীর আগ্রহে এবং উল্লাসে লক্ষ্য করেছিল কি অসীম সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে স্বামীজী পাশ্চাত্যে ভারতের মহিমা ও গৌরবকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভারতের জন্যে পাশ্চাত্যের কাছে তিনি কোন করুণা ভিক্ষা করেননি। উপরন্তু তিনি স্পষ্ট

ভাষায় পাশ্চাত্যের মানুষকে বলেছিলেন, জ্ঞান এবং কৃষ্টির পীঠস্থান এই মহান প্রাচীন দেশকে যে চোখে পাশ্চাত্য এত-দিন দেখে এসেছে তার জন্য তাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। কিন্তু ভারতের গরিমার কথা বলতে গিয়ে বিবেকানন্দ কোন আজগুবী গল্প বানাননি, কোন অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেননি। ভারতের মহিমার কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী ইতিহাসের কোন তথ্য বিকৃত করেননি। **It was not his story, but history, pure and simple.** ভারতবর্ষের যা সনাতন রূপ, ভারত-বর্ষের যা শাশ্বত, চিরন্তন রূপ—তার কথাই স্বামীজী বলেছিলেন তাদের কাছে। বর্তমান কালে তিনিই ছিলেন সেই ভারতবর্ষের যোগ্যতম প্রবক্তা। পাশ্চাত্যের মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি তাদের কাছে আধ্যাত্মিকতা এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বামীজী বলে-ছিলেন, মানুষের মহত্তম চিন্তার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষই সারা পৃথিবীর আচার্য এবং পাশ্চাত্যকে আজও ভারতবর্ষের পায়ের তলায় বসে তার পাঠ নিতে হবে। ভারতকে স্বামীজী বলতেন সভ্যতার জন্মদাত্রী। অতীতে ভারতবর্ষ কিভাবে জগতের চিন্তা ও কৃষ্টিকে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট করেছে স্বামীজী তার খতিয়ান তুলে ধরেছিলেন। শুধু সেখানেই তিনি থামেননি। তিনি জোরের সঙ্গে বলে-ছিলেন, ভবিষ্যৎ মানব-প্রগতির ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ অতীতের চেয়ে আরও মহান ভূমিকা পালন করতে দৈবনির্দিষ্ট। আবার কঠোর ব্যঙ্গ এবং তীব্র বিদ্রূপের সঙ্গে স্বামীজী পাশ্চাত্যের মানুষের মুখের উপরে বলেছিলেন যে, তারা যে-সভ্যতার এত বড়াই করে সেই সভ্যতা হল আসলে একটা মুখোশমাত্র, যার আড়ালে রয়েছে পাশ্চাত্যের ভয়ঙ্কর স্বরূপ যা বর্বরতা আর পাশবিক হিংস্রতায় ভরা। বছরের পর বছর ধরে প্রাচ্যের অপেক্ষা-কৃত দুর্বল জাতিগুলির উপর পাশ্চাত্য যে নির্লজ্জ অত্যাচার ও শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে স্বামীজী সে-কথা বলেছিলেন। ভাবতেই পারা যায় না যে, পাশ্চাত্যেরই একটি জাতির পদানত, দরিদ্র ও দুর্বল ভারতবর্ষের এক দরিদ্র ও অজ্ঞাত তরুণ সন্ন্যাসী শক্তিশালী পাশ্চাত্যের বুকের উপর দাঁড়িয়ে ঐ সমস্ত কথা বলেছেন। শুধু যে বলেছেন তাই নয়, পাশ্চাত্যকে তা স্বীকারও করিয়েছেন। এটা বাস্তবিক একটা অত্যন্ত অভাবনীয় ঘটনা। স্বভাবতই এই ঘটনা ভারতে একটা বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। শ্রেষ্ঠতর তো দূরের কথা—ভারতবাসী যে পাশ্চাত্যের মানুষের সমকক্ষ—এটাই ভারতবর্ষের মানুষের কাছে ছিল দুঃসাহসিক কল্পনারও অতীত। স্বামীজীর দৃষ্টান্ত দেখে এবং পাশ্চাত্যে তাঁর বলিষ্ঠ প্রচারের প্রতিক্রিয়া দেখে ভারতবাসী তখন থেকে সগর্বে ভাবতে শুরু করল যে, তারা শুধু পাশ্চাত্যের মানুষের সমকক্ষই নয়, কৃষ্টি এবং আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তারা তাদের চেয়ে উন্নত-তর এবং মহত্তর ঐতিহ্যের অধিকারী। ভারত-বাসী দরিদ্র হতে পারে, কিন্তু চরিত্রের তেজে, জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার মহিমায় ভারতবাসীর কাছে পাশ্চাত্যের মানুষ মাথা নত করতে বাধ্য —স্বামীজী তা বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করে দিয়ে-ছিলেন। স্বামীজী প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষ তার আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে শুধু পাশ্চাত্যকেই নয়, সারা পৃথিবীকে জয় করার ক্ষমতা রাখে। আর সেটাই হল আসল শক্তি, সেটাই আসল জয়। এতে ভারতের মানুষের উপর যেন সঞ্জীবনী শক্তি প্রয়োগের কাজ হল। তাদের লুপ্ত চেতনা আবার জেগে উঠল, তাদের সুপ্ত শক্তি আবার প্রবুদ্ধ হয়ে উঠল। বহু শতাব্দী আগে যে আত্মবিশ্বাস ভারতবর্ষ হারিয়েছিল

আবার সে তা ফিরে পেল। বহু শত বৎসর পর ভারতবর্ষ আবার সগর্বে পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। এতকাল অধিকাংশ পাশ্চাত্যবাসীর কাছে ভারত একটা কিম্ভূতকিমাকার দেশ বলে পরিচিত ছিল—যে দেশের মানুষ নাকি আরও আজব, আরও বিচিত্র। এক উলঙ্গ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আদিম জাতির বাস ভারতবর্ষে—যাদের কাছে শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোন আলোই নাকি কখনও পৌঁছয়নি। আর তা পৌঁছে দেবার 'পবিত্র দায়িত্ব' যেন বিধাতা পাশ্চাত্যের উপরই অর্পণ করেছিলেন! স্বামীজীকে দেখে, তাঁর কথা শুনে পাশ্চাত্যের মানুষ বুঝল যে, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের দিক দিয়ে তাদের চেয়ে অনেক উন্নত একটা দেশ এবং জাতির সম্পর্কে তারা এতদিন কি অবিচারই না করেছে, কত ভ্রান্ত ধারণাই না এতকাল পোষণ করে এসেছে। এর ফলে শুধু পাশ্চাত্যেরই নয়, ভারতের চোখও খুলে গিয়েছিল। যে-ভারতবর্ষ এতকাল নিজের মহিমা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, যে-ভারতবর্ষ প্রায় ভুলেই গিয়েছিল তার অতীত গৌরবময় ইতিহাসের কথা—সেই ভারতবর্ষ যেন আবার নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করল। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এর ফল হল ম্যাজিকের মতো। অকস্মাৎ সেই বিরাট লেভায়াথান (Leviathan) যেন ঘুমের নেশা ছিঁড়ে গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। আর বস্তুতঃ সেইক্ষণ থেকেই ভারতের সত্যিকারের জাগরণের সূচনা হল। স্বামীজী যেন কশাঘাত করে সেই ঘুমন্ত লেভায়াথানকে জাগিয়ে দিলেন।

এইভাবে ক্ষেত্র যখন প্রস্তুত হয়েছে, তখনই স্বামীজী পাশ্চাত্য থেকে ফিরে এলেন ভারতে। ভারতমাতা যেন তাঁর বিজয়ী সন্তানের ঘরে ফেরার জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন। সারা ভারতবর্ষ তাঁকে যেভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, তাঁর দেশে ফেরাকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে যে উন্মাদনা দেখা গিয়েছিল, ইতিহাসে তার কোনও তুলনা নেই। স্বামীজী কোন সুলতান-বাদশা ছিলেন না, কোন জবরদস্ত সেনাপতিও ছিলেন না। কিন্তু দেখা গেল দেশের রাজা-মহারাজরা, দেওয়ান বাহাদুররা তাঁর পায়ের তলায় মাথা লুটোচ্ছে। গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজেরাই তাঁর গাড়ি টানছে। এবং তা করে নিজেদের কৃত-কৃতার্থ মনে করছে। কিন্তু কেন? কেন এই অসাধারণ ঘটনা ঘটল? ঘটল এই জন্যে যে, স্বামীজী ছিলেন যুগনায়ক, যুগাচার্য; যেমন ছিলেন কৃষ্ণ, বুদ্ধ অথবা শঙ্করাচার্য। সারা দেশটাকে তিনি তাঁর অগ্নিবাণীতে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। অমানুষী শক্তিতে জাতটাকে তিনি উত্তোলন করেছিলেন চরম অবক্ষয়ের পঙ্ক থেকে। ভারতবর্ষের তখন সত্যিই প্রয়োজন ছিল জাগরণের, এক তেজস্বী আহ্বানের। প্রয়োজন ছিল শক্তি, সাহস এবং আশাবর্ষী অগ্নিবাণীর। প্রয়োজন ছিল সারা দেশটাকে ধরে আপাদমস্তক একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দেওয়ার। আর স্বামীজী তা দিয়েছিলেন। আমি মনে করি, পাশ্চাত্যে স্বামীজীর আবির্ভাবকে কেন্দ্র করেই ভারতের জাগরণের সূচনা হয়েছে, আর তাঁর ভারতে ফেরার পর থেকেই সেই জাগরণের লক্ষণগুলি স্পষ্টতরভাবে প্রতিভাত হতে শুরু করেছিল। এখন আমাদের সকলের চোখেই ব্যাপারটা ধরা পড়ছে। [কথাগুলি বলতে বলতে রোমাঁ রোলাঁর লেখা স্বামীজীর ইংরেজী জীবনী তুলে বললেন :] দেখুন, স্বামীজীর ভারতে ফেরার প্রায় তিরিশ বছর পরে রোমাঁ রোলাঁ কি লিখেছেন! [বইটি থেকে নিচের অংশটি বের করে আমাকে পড়তে বললেন। আমি মনে মনে পড়তে থাকলে তিনি বললেন : 'জোরে পড়ুন। আমিও শুনি। বড় ভাল

লাগে রোমাঁ রোলাঁর এই বর্ণনাটি। কি অপূর্ব ভাষায় তিনি লিখেছেন!' আমি পড়ে চললাম :]

'The storm passed; it scattered its cataracts of water and fire over the plain, and its formidable appeal to the Force of the Soul, to the God sleeping in man and His illimitable possibilities! I can see the Mage erect, his arm raised, like Jesus above the tomb of Lazarus in Rembrandt's engraving with energy flowing from his gesture of command to raise the dead and bring him to life.…

'Did the dead arise? Did India, thrilling to the sound of his words, reply to the hope of her herald? Was her noisy enthusiasm translated into deeds? At the time nearly all this flame seemed to have been lost in smoke. Two years afterwards Vivekananda declared bitterly that the harvests of young men necessary for his army had not come from India. It is impossible to change in a moment the habits of a people buried in a Dream, enslaved by prejudice, and allowing themselves to fail under the weight of the slightest effort. But the Master's rough scourge made her turn for the first time in her sleep, and for the first time the heroic trumpet sounded in the midst of her dream the Forward March of India, conscious of her God. She never forgot it. From that day the awakening of the torpid Colossus began. If the generation that followed, saw, three years after Vivekananda's death, the revolt of Bengal, the prelude to the great movement of Tilak and Gandhi, if India today has definitely taken part in the collective action of organised masses, it is due to the initial shock, to the mighty "Lazarus, come forth!" of the Message from Madras. [pp. 113—114.]

['ঝড় বয়ে গেল একটা। সমগ্র দেশকে, ভাসিয়ে দিয়ে গেল বর্ষণ ও অগ্নির প্লাবনে। সেই সঙ্গে দিয়ে গেল আত্মার শক্তির কাছে, মানুষের মধ্যে যে ভগবান নিদ্রিত আছেন, তাঁর কাছে এবং তাঁর অসীম সম্ভাবনার কাছে দুর্জয় এক আবেদন। আমার চোখের সামনে দেখছি রেমব্রাণ্ট-খোদিত চিত্রে বর্ণিত ল্যাজারাসের সমাধিপার্শ্বে যিশুর মতো দাঁড়িয়ে আছেন ঊর্ধ্ববাহু এই প্রাচ্য ঋষি : মৃতকে উত্থিত করে পুনরায় তাকে জীবন দান করছেন, আর তাঁর দেহভঙ্গী থেকে উৎসারিত হচ্ছে শক্তিতরঙ্গ।

মৃত কি জাগ্রত হয়েছিল? তাঁর বাণীর ধ্বনিতে রোমাঞ্চিত ভারতবর্ষ কি তার এই অগ্রদূতের আশায় সাড়া দিয়েছিল? তাঁর কোলাহলময় উৎসাহ-উদ্দীপনা কি বাস্তবে রূপ পেয়েছিল? এক সময় মনে হয়েছিল, সমস্ত আগুন বুঝি কেবল ধোঁয়ার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে। দুবছর পরে বিবেকানন্দ অত্যন্ত তিক্ততার সঙ্গে বললেন : তাঁর বাহিনী গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় তরুণ দলের ফসল ভারতবর্ষ থেকে আসেনি। যে-জাতি এতদিন স্বপ্নের কবরে নিদ্রিত হয়েছিল, কুসংস্কারের ঘোরে আবিষ্ট হয়েছিল, এবং সামান্যতম প্রচেষ্টার শক্তিও যে হারিয়ে ফেলেছিল, এক

মুহূর্তে সেই জাতির অভ্যাসগুলিকে পরিবর্তন করা অসম্ভব। কিন্তু এই আচার্যের রূঢ় কশাঘাতে এই সর্বপ্রথম সে তার নিদ্রায় পাশ ফিরল এবং এই সর্বপ্রথম সে তার স্বপ্নের মধ্যে ভারতের অগ্রগামী অভিযানের শৌর্যময় তূর্যনিনাদ শুনতে পেল—যে ভারত তখন সচেতন হয়েছে তার ভাগ্যদেবতার শক্তি সম্পর্কে। এই তূর্যনিনাদ সে আর ভোলেনি। সেদিন থেকেই এই অতিকায় কুম্ভকর্ণের নিঃসাড় নিদ্রাভঙ্গের সূচনা হয়েছিল। [বিবেকানন্দের দেহান্তের তিন বছর পরে তাঁর উত্তরসূরীরা যদি বাংলায় বিদ্রোহ এবং তিলক ও গান্ধীর আন্দোলনের সূচনা প্রত্যক্ষ করেন, ভারত যদি আজ সমগ্র জনসাধারণকে সংগঠিত করে সঙ্ঘবদ্ধভাবে একটি জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে থাকে, তবে তার জন্য প্রথম চেতনাদায়ী আঘাতটি সে পেয়েছিল মাদ্রাজের সেই বীর্যময় আহ্বান থেকে : "ল্যাজারাস, উত্থিত হও"।]

হেমচন্দ্র বললেন : জাতীয় চেতনা জাগানোর ব্যাপারে স্বামীজীর ভূমিকা সম্পর্কে রোমাঁ রোলাঁ যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ সত্যি। বাস্তবিক, স্বামীজীই তো ভারতে জাতীয় জাগরণের জন্মদাতা। দেখেছি, ব্রহ্মবান্ধবের মতো নেতারাও নিজেদের 'Products of Swamiji's influence' বলে পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করতেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মবান্ধব আমাদের বলেছিলেন : 'বিবেকানন্দই আমার চোখ খুলে দিয়েছে। যদিও সে ছিল আমার বন্ধু, আমার সহপাঠী, আমারই সমবয়সী তবুও তাকে আমার "গুরু" বলে, আমার "চৈতন্যদাতা" বলে ভেবে আমি গর্ব অনুভব করি। বিবেকানন্দকে আমি একজন ব্যক্তি হিসেবে দেখিনা। দেখি দেশপ্রেমের একটা জ্বলন্ত অগ্নিশিখারূপে, যে-অগ্নিশিখা থেকে একটা ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ ছিটকে আমার বুকের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। আর তার ফলেই আজ তোমরা আমাকে এখানে দেখছ। এই ব্রহ্মবান্ধব বিবেকানন্দরই সৃষ্টি। শুধু আমি নই, আমার মতো অনেকেই স্বামীজীর প্রভাবে নবজন্ম লাভ করেছে। **We are all products of Swamiji's influence**।' স্বামীজীকে আমি দেখেছি এবং তাঁর আশীর্বাদও লাভ করেছি শুনে ব্রহ্মবান্ধব অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কাহিনী তাঁকে বলেছিলাম। বলেছিলাম, স্বামীজীর সঙ্গে সেই সাক্ষাৎই আমার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে। বলেছিলাম, স্বামীজীর উদ্দীপনাময় বাণী এবং আশীর্বাদই প্রধানতঃ আমাদের বিপ্লবের পথকে বরণ করতে এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 'মুক্তিসঙ্ঘ' সংগঠন করতে প্রেরণা যুগিয়েছে। সে-কথা শুনে গভীর আবেগভরে ব্রহ্মবান্ধব বলেছিলেন : 'আমরা জানি বা না জানি, নবীন প্রবীণ আমাদের সকলের পিছনেই রয়েছে ঐ সাইক্লোনিক বিরাট মানুষটি। সে-ই আমাদের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক জাগরণের পিতা। আর পরমহংসদেব হলেন সেই জাগরণের পিতামহ।' এই প্রসঙ্গে বলি যে, আমাদের দলের 'মুক্তিসঙ্ঘ' নামটি ব্রহ্মবান্ধবের খুব পছন্দ হয়েছিল।

হেমচন্দ্রকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। বললাম : আজ এখানেই থাক। আবার আসব আমি আপনার কাছে স্বামীজীর কথা শুনতে।

হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়

স্বামী চেতনানন্দ

অবতার-পুরুষদের জন্ম, কর্ম, লোকব্যবহার সবকিছুই দিব্য ও তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগোচর। তাঁরা আসেন ছদ্মবেশে যুগ-প্রয়োজনে ধর্মস্থাপনার জন্য, আবার কাজ সমাধা হলে তাঁরা অন্তর্হিত হন। তাঁরা নিজেদের গৌরব প্রকাশের জন্য আত্মজীবনী লেখেন না। তবে তাঁরা তাঁদের সংগ্রাম, অভিজ্ঞতা, দর্শন, জীবনকথা কখন কখন কথোপকথনচ্ছলে নিজেদের অন্তরঙ্গ শিষ্যদের বলেন, তা না হলে সাধারণ মানুষ অবতারের লীলা কিছুই জানতে পারত না। অথচ অবতারকে জানা বিশেষ প্রয়োজন। অবতারের ভিতর দিয়েই অনন্তে পৌঁছবার পথ। কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্যের ব্যক্তিগত জীবন, সাধনা ও সংগ্রাম প্রভৃতির কথা বিশদভাবে জানা যায় না। তাঁদের দিব্য জীবনের অনেক কিছু কালের কবলে অবলুপ্ত বা লুক্কায়িত।

আজ থেকে একশ বছর আগে শ্রীরামকৃষ্ণ স্থূলশরীরে এই মাটির পৃথিবীতে ছিলেন। কালের ব্যবধান শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিকে ম্লান করতে পারেনি। শ্রীম তাঁর অমরগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে' ধরে রেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের দৈনন্দিন জীবন, কথোপকথন, ভ্রমণ-ভোজন-শয়ন, প্রার্থনা-ধ্যান-সমাধি, সাধনা-সংগ্রাম-সিদ্ধি, মানুষভাব ও দেবভাব। স্বামী সারদানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গে' সন্নিবদ্ধ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের বিশদ তথ্যপূর্ণ জীবনী। ঐ জীবনীর অনেকাংশের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী, কিছু অংশ তিনি ঠাকুরের মুখ থেকে নিজে শুনেছেন, কিছু অংশ তিনি অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের 'সাধকভাব' লিখবার সময় তিনি হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বিস্তর সাহায্য পেয়েছেন, তা তিনি 'লীলাপ্রসঙ্গে' উল্লেখ করেছেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রীরামকৃষ্ণের প্রায় ৫১ বছরের জীবৎকালের মধ্যে হৃদয় প্রায় একটানা ২৬ বছর (১৮৫৫—১৮৮১) তাঁর সঙ্গে দিনরাত থেকেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বাপ, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী বা কোন শিষ্য কেউ হৃদয়ের ন্যায় অতদিন তাঁর কাছে কাটাননি।

হৃদয় সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগিনেয় (ক্ষুদিরামের ভগিনী রামশীলার কন্যা হেমাঙ্গিনীর পুত্র)। তিনি বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণের চেয়ে ৪ বছরের ছোট। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে শিহড়ে তাঁর জন্ম। বাল্যকালে শ্রীরামকৃষ্ণ শিহড়ে যেতেন, ফলে তখন থেকেই তিনি হৃদয়ের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় যান; তারপর ১৮৫৫-তে দক্ষিণেশ্বরে। হৃদয়ের বয়স তখন ১৬। বর্ধমানে কাজের উদ্দেশ্যে বিফলকাম হয়ে তিনি খবর পান তাঁর মামারা দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির মন্দিরে পুরোহিতের কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। কালবিলম্ব না করে তিনি দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন।

হৃদয় দীর্ঘাকৃতি ও দেখতে সুপুরুষ ছিলেন। তাঁর শরীর ছিল পুষ্ট ও বলিষ্ঠ; মনও উদ্যমশীল ও ভয়শূন্য। প্রতিকূলাবস্থায় পড়লে কি করে অদ্ভুত উপায়ের দ্বারা নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তা তিনি ভালভাবে জানতেন। আত্মভোলা ছোট মামাকে তিনি সত্যই ভালবাসতেন এবং তাঁকে সুখী করতে চেষ্টা করতেন। হৃদয়ের এত গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন ভোগী, অর্থলোলুপ, বিষয়ী। সে যা হোক, তীব্র সাধনকালে শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়ের ন্যায় একজন সেবকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ঠাকুর নিজে বলেছেন, হৃদয় না থাকলে সাধনকালে তাঁর শরীররক্ষা অসম্ভব হত।

সুতরাং হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে আগমন দৈবনির্দিষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের পক্ষে হৃদয়কে ভুলে যাওয়া বা উপেক্ষা করা অসমীচীন।

বন্ধুবান্ধবহীন দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুর এক-প্রকার নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছিলেন। হৃদয়ের আগমনে তিনি যে বিশেষ খুশি হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। হৃদয়ও নিজমুখে বলেছেন, "এই সময় হইতে আমি ঠাকুরের প্রতি একটা অনির্বচনীয় আকর্ষণ অনুভব করিতাম ও ছায়ার ন্যায় সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতাম। তাঁহাকে ছাড়িয়া একদণ্ড কোথাও থাকিতে হইলে কষ্ট বোধ হইত।" যা হোক, শ্রীরামকৃষ্ণ তখন পঞ্চবটীতে দুপুরে নিজে রেঁধে খেতেন, এবং রাতে মায়ের প্রসাদী লুচি খেতেন। এ ব্যবস্থা ২।৩ মাস চলেছিল। শেষে ঠাকুর যখন মায়ের পূজারী হলেন, তখন দুবেলা মায়ের প্রসাদই খেতেন।

হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ নজর রেখেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করছিলেন, দুপুরে খাওয়ার পর ২।৩ ঘণ্টা ঠাকুর কোথায় চলে যান। শেষে তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করাতে ঠাকুর বলেন, "এইখানেই ছিলাম।" কোন কোন দিন পঞ্চবটীর দিক থেকে আসতে দেখে হৃদয় ভেবে-ছিলেন যে, ঠাকুর শৌচে গিছলেন। তারপর থেকে আর তিনি জিজ্ঞাসা করতেন না।

ছোট বয়স থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি গড়ার অভ্যাস ছিল। দক্ষিণেশ্বরে একদিন তিনি গঙ্গামাটি দিয়ে এক অপূর্ব শিবমূর্তি গড়ে পূজা করেন। মথুর বেড়াতে বেরিয়ে তা দেখে হৃদয়ের মারফত খবর পান যে, ওটা শ্রীরামকৃষ্ণের তৈরি। তিনি মূর্তিটি চেয়ে নিয়ে রানী রাসমণিকে দেখান। তখন উভয়ে খুশি হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে মন্দিরের কাজে নিয়োগ করতে চেষ্টা করেন। তাঁরা রামকুমারকে অনুরোধ করলে, তিনি বলেন যে, রামকৃষ্ণ ঈশ্বর ছাড়া অপর কারও দাসত্ব করবে না।

ক্রমে রামকুমার ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর পক্ষে একা মন্দিরের কাজ চালানো কঠিন হয়ে পড়ল। মথুর একটা সুযোগ খুঁজছিলেন। একদিন বাগানে ঠাকুরকে হৃদয়ের সঙ্গে বেড়াতে দেখে, মথুর একজন কর্মচারীকে শ্রীরামকৃষ্ণকে ডাকতে বললেন। ঠাকুর জানতেন মথুরের মনের কথা। কর্মচারী শ্রীরামকৃষ্ণকে মথুরের আদেশ জানালে, তিনি হৃদয়কে বললেন, "যাইলেই আমাকে এখানে থাকিতে বলিবে, চাকরি স্বীকার করিতে বলিবে।" হৃদয় বললেন, "তাহাতে দোষ কি? এমন স্থানে, মহতের আশ্রয়ে কার্যে নিযুক্ত হওয়া তো ভাল বই মন্দ নয়, তবে কেন ইতস্ততঃ করিতেছ?" ঠাকুর: "আমার চাকরিতে চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ এখানে পূজা করিতে স্বীকার করিলে দেবীর অঙ্গে যে সমস্ত অলঙ্কারাদি আছে তাহার জন্য দায়ী থাকিতে হইবে, সে বড় হাঙ্গামার কথা; আমার দ্বারা উহা সম্ভব হইবে না। তবে যদি তুমি ঐ কার্যের ভার লইয়া এখানে থাক, তাহা হইলে আমার পূজা করিতে আপত্তি নাই।"

হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে চাকরির জন্য এসেছিলেন। তিনি সানন্দে রাজী হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন মথুরের কাছে গেলেন এবং মন্দিরে কাজ গ্রহণে অনুরুদ্ধ হলে তাঁর কাছে পূর্বোক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন। মথুর রাজী হলেন এবং সেদিন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ কালীমন্দিরে মায়ের বেশকারী ও হৃদয় সহকারী হলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার তিনমাসের মধ্যে বিষ্ণুমন্দিরে এক অঘটন ঘটল। পুরোহিত ক্ষেত্রনাথ অনবধানতাবশতঃ কৃষ্ণমূর্তি শয়ন দেবার সময় পড়ে যান। তাতে বিগ্রহের পা ভেঙে যায়, ফলে পূজক কর্মচ্যুত হন। মথুর তখন শ্রীরামকৃষ্ণকে বিষ্ণুমন্দিরে পূজারী

করেন। রামকুমার ক্রমশঃ বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার জন্ম কালীমন্দির থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কালীমন্দিরে এবং হৃদয় বিষ্ণুমন্দিরে পূজারী হন।

হৃদয় বলতেন, "ঠাকুরের পূজা একটা দেখিবার বিষয় ছিল; যে দেখিত সে মুগ্ধ হইত। আর ঠাকুরের সেই প্রাণের উচ্ছ্বাসে মধুর কণ্ঠে গান! —সে গান যে একবার শুনিত, সে কখন ভুলিতে পারিত না।…গীত গাহিতে গাহিতে দুই চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত; এবং যখন পূজা করিতেন, তখন এমন তন্ময়ভাবে উহা করিতেন যে, পূজাস্থানে কেহ আসিলে বা নিকটে দাঁড়াইয়া কথা কহিলেও তিনি উহা আদৌ শুনিতে পাইতেন না।"

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রামকুমারের মৃত্যুতে শ্রীরামকৃষ্ণ বড়ই আঘাত পান। এই শোক তাঁর বৈরাগ্যবহ্নি উদ্দীপিত করল। তিনি প্রাণে প্রাণে জগতের অনিত্যত্ব অনুভব করলেন। আহার-নিদ্রা ব্যাপারে হলেন উদাসীন। লোকসঙ্গ ছাড়লেন। দুপুরে ও রাতে মন্দির বন্ধ হলে পঞ্চবটীর জঙ্গলে মায়ের ধ্যানধারণায় রত হলেন। মামার এরূপ কার্যকলাপ হৃদয়কে ভাবিয়ে তুলল। তিনি মনে করলেন, মামা যদি এভাবে দিনের পর দিন কাটান তবে তো তাঁর পক্ষে মন্দিরের কঠোর কাজ করা সম্ভব হবে না।

এক নিশুতি রাতে ঠাকুর যখন জঙ্গলে ঢুকছিলেন, হৃদয়ও তাঁকে না জানিয়ে অনুসরণ করলেন। তিনি কাছে গেলেন না, ভয় ছিল পাছে মামা বিরক্ত হন। তবে ঠাকুরকে ভয় দেখানোর জন্য তিনি দূর থেকে আশেপাশে ঢিল ছুঁড়তে শুরু করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ফিরলেন না দেখে হৃদয় ঘরে ফেরেন। তার পরদিন হৃদয় ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন, "জঙ্গলের ভিতর রাত্রে যাইয়া কি কর বল দেখি?" ঠাকুর বললেন, "ঐ স্থানে একটা আমলকী গাছ আছে, তাহার তলায় বসিয়া ধ্যান করি; শাস্ত্রে বলে, আমলকী গাছের তলায় যে যাহা কামনা করিয়া ধ্যান করে, তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়।" যাহোক, হৃদয় কয়েক দিন ক্রমাগত ইটপাটকেল ছুঁড়ে যখন কিছুতেই মামার নিশা-অভিযান বন্ধ করতে পারলেন না, তখন একদিন নিজে কাছে গিয়ে দেখেন, ঠাকুর বৃক্ষতলে পরিধেয় বস্ত্র ও যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করে সুখাসীন হয়ে ধ্যানমগ্ন। তিনি ভাবলেন —মামা বোধ হয় পাগল হয়ে গেছেন। তিনি সজোরে ডাকেন, "এ কি হচ্ছে? পৈতে কাপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে বসেছ যে?" ধ্যানোত্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন: "তুই কি জানিস? এইরূপে পাশমুক্ত হয়ে ধ্যান করতে হয়। জন্মাবধি মানুষ ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাতি ও অভিমান—এই অষ্ট পাশে বদ্ধ হয়ে রয়েছে। পৈতেগাছটাও 'আমি ব্রাহ্মণ, সকলের চেয়ে বড়' —এই অভিমানের চিহ্ন এবং একটা পাশ। মাকে ডাকতে হলে ঐসব পাশ ফেলে দিয়ে এক মনে ডাকতে হয়। তাই ঐসব খুলে রেখেছি। ধ্যান করা শেষ হলে ফিরবার সময় আবার পরব।" হৃদয় নির্বাক হয়ে সব শুনে ঘরে ফিরলেন।

কালীদর্শনের পর শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যোন্মত্ততা শুরু হল। হৃদয়ের বর্ণনা: "ঠাকুর যখন শ্রীমন্দিরে থাকিতেন তখন তো কথাই নাই, অন্য সময়েও এখন কালীঘরে প্রবিষ্ট হইলে এক অনির্বচনীয় দিব্যাবেশ অনুভূত হইয়া গা 'ছমছম' করিত। পূজাকালে ঠাকুর কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা দেখিবার প্রলোভন ছাড়িতে পারিতাম না। অনেক সময়ে সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিতাম, তাহাতে বিস্ময়ভক্তিতে অন্তর পূর্ণ হইত। বাহিরে আসিয়া কিন্তু মনে সন্দেহ হইত। ভাবিতাম, মামা কি সত্যসত্যই পাগল হইলেন? নতুবা পূজাকালে এইরূপ ব্যবহার করেন কেন?

রানীমাতা ও মথুরবাবু এইরূপ পূজার কথা জানিতে পারিলে কি মনে করিবেন, ভাবিয়া বিষম ভয়ও হইত। মামার কিন্তু ঐরূপ কথা একবারও মনে আসিত না এবং বলিলেও তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। অধিক কথাও তাঁহাকে এখন বলিতে পারিতাম না; একটা অব্যক্ত ভয় ও সঙ্কোচ আসিয়া মুখ চাপিয়া ধরিত, এবং তাঁহার ও আমার মধ্যে একটা অনির্বচনীয় দূরত্বের ব্যবধান অনুভব করিতাম। অগত্যা নীরবে তাঁহার যথা-সাধ্য সেবা করিতাম।"

হৃদয়ের ভয় হবারই কথা। তিনি গাঁয়ের ছেলে, তখন তাঁর বয়স ১৭। তারপর আবার এরূপ অদ্ভুত কার্যকলাপ তিনি জীবনে কখনও দেখেননি। প্রত্যক্ষদর্শী হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণের পূজাপদ্ধতি বর্ণনা করেছেন:

"দেখিতাম, জবাবিল্বার্ঘ্য সাজাইয়া মামা প্রথমতঃ উহা দ্বারা নিজ মস্তক, বক্ষ, সর্বাঙ্গ, এমনকি নিজ পদ পর্যন্ত স্পর্শ করিয়া পরে উহা জগদম্বার পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন।

"দেখিতাম, মাতালের ন্যায় তাঁহার বক্ষ ও চক্ষু আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে এবং তদবস্থায় টলিতে টলিতে পূজাসন ত্যাগ করিয়া সিংহাসনের উপর উঠিয়া সস্নেহে জগদম্বার চিবুক ধরিয়া আদর, গান, পরিহাস বা কথোপকথন করিতে লাগিলেন, অথবা শ্রীমূর্তির হাত ধরিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

"দেখিতাম, শ্রীশ্রীজগদম্বাকে অন্নাদি ভোগ নিবেদন করিতে করিতে তিনি সহসা উঠিয়া পড়িলেন এবং থালা হইতে এক গ্রাস অন্নব্যঞ্জন লইয়া দ্রুতপদে সিংহাসনে উঠিয়া মার মুখে স্পর্শ করাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'খা, মা খা! বেশ করে খা!' পরে হয়তো বলিলেন, 'আমি খাব? আচ্ছা, খাচ্ছি!'—এই বলিয়া উহার কিয়দংশ নিজে গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ পুনরায় মার মুখে দিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমি তো খেয়েছি, এবার তুই খা!'

"একদিন দেখি, ভোগ নিবেদন করিবার সময় একটা বিড়ালকে কালীঘরে ঢুকিয়া ম্যাও ম্যাও করিয়া ডাকিতে দেখিয়া মামা 'খাবি মা, খাবি মা?' বলিয়া ভোগের অন্ন তাহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন।"

ক্রমে মন্দিরের কর্মচারীরা সব জানতে পারল। ঠাকুরের এসব আচরণ শাস্ত্রসম্মত নয় এবং তাঁর এই স্বেচ্ছাচারে দেবমন্দির কলুষিত হচ্ছে সাব্যস্ত করে তারা মথুরবাবুর কাছে সংবাদ পাঠাল। মথুর কাউকে না জানিয়ে হঠাৎ একদিন এসে ঠাকুরের পূজা দেখেন। তিনি ঠাকুরের দিব্যভাবের পূজার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন এবং কর্মচারীদের তাঁকে বিরক্ত করতে নিষেধ করলেন। যাহোক শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে আর বেশিদিন পূজা করা সম্ভব হল না। একদিন ঠাকুর মন্দিরে পূজা করছিলেন; তখন মথুর ও হৃদয় উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ ঠাকুর পূজাসন থেকে উঠে হৃদয়ের হাত ধরে পূজাসনে বসিয়ে মথুরকে বললেন, "আজ হইতে হৃদয় পূজা করিবে; মা বলিতেছেন, আমার পূজার ন্যায় হৃদয়ের পূজা তিনি সমভাবে গ্রহণ করিবেন।" বিশ্বাসী মথুর ঠাকুরের ঐ কথা দেবাদেশ বলে গ্রহণ করে নিলেন।

কাজ ছেড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনসমুদ্রে মগ্ন হলেন। শরীরের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই। দিন-রাতের খেয়াল নেই। ঠাকুরের নিদ্রাহীনতা এবং সারা শরীরে জ্বালা শুরু হল। মথুর ও হৃদয় উদ্বিগ্ন হলেন। মথুর বায়ুরোগ মনে করে ডাক্তার ডাকলেন, কিন্তু কোন উপশম হল না। মথুর তখন হৃদয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠাকুরের মন নিচুতে নামাবার জন্য সুন্দরী মেয়ে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু তাঁর মন দিব্যভূমি থেকে

নামল না। প্রথম চার বছর দক্ষিণেশ্বরে নিরন্তর সাধনার পর তিনি কামারপুকুরে যান। কামার-পুকুর থেকে ফিরে এসে আবার সাধনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। জ্ঞানোন্মাদ অবস্থা। এই সময় তাঁকে দেখে একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক বলেছিলেন, "এ যোগজ ব্যাধি।" যা হোক ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চার বছর নিরন্তর সাধনার পর শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে গেলে মাতা চন্দ্রমণি ও ভ্রাতা রামেশ্বর জয়রামবাটীর রাম মুখুজ্জের মেয়ে সারদার সঙ্গে তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করেন।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভৈরবী ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে চাঁদনীতে দেখে হৃদয়কে ডাকতে বলেন। হৃদয় ইতস্ততঃ করে বলেন, "রমণী অপরিচিতা, ডাকিলেই আসিবে কেন?" ঠাকুর—"আমার নাম করিয়া বলিলেই আসিবে।" হৃদয় অবাক হলেন, কারণ তিনি কোনদিন মামার অপরিচিতা নারীর সঙ্গে আলাপের আগ্রহ দেখেননি। যাহোক তিনি ভৈরবীকে ডেকে আনেন এবং তাঁকে ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করতে দেখে আরও অবাক হন। ভৈরবী শ্রীরামকৃষ্ণকে চৌষট্টি রকম তন্ত্রসাধনা শিক্ষা দেন।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তন্ত্রসাধনা শেষ করে শ্রীরামকৃষ্ণ দাস্য ও মধুর ভাবের সাধন করেন। মধুর ভাবে সাধনকালে ঠাকুর মেয়েদের ন্যায় শাড়ি, গহনা পরতেন। তিনি রাধার ন্যায় কৃষ্ণচিন্তায় তন্ময় হয়ে থাকতেন। এবং কিছুকাল মথুরের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে বসবাস করেছিলেন। হৃদয় বলতেন, "ঐরূপে রমণীগণপরিবৃত হইয়া থাকিবার কালে ঠাকুরকে সহসা চিনিয়া লওয়া তাঁহার নিত্যপরিচিত আত্মীয়দিগের পক্ষেও দুরূহ হইত। মথুরবাবু ঐকালে একসময়ে আমাকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'বল দেখি, উহাদিগের মধ্যে তোমার মামা কোন্‌টি?' এতকাল একসঙ্গে বাস ও নিত্য সেবাদি করিয়াও তখন আমি তাঁহাকে সহসা চিনিতে পারি নাই!"

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণকে সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষিত করেন। তিনদিনের মধ্যে ঠাকুর অদ্বৈত সাধনার চরম অনুভূতি নির্বিকল্প সমাধি লাভ করলেন। ঠাকুরের জীবনে সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনের ফলে যে একাত্মানুভূতি হয়, তার প্রমাণ নিম্নোক্ত ঘটনায় জানা যায়। একদিন তিনি ভাবে চাঁদনীতে দাঁড়িয়ে গঙ্গা দর্শন করছিলেন। হঠাৎ দুই মাঝির মধ্যে কলহ শুরু হয় এবং বলবান ব্যক্তি দুর্বলের পিঠে জোরে চাপড় মারে। ঠাকুর যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠেন। হৃদয় মন্দির থেকে তা শুনে ছুটে আসেন এবং মামার পিঠে আরক্তিম আঙুলের দাগ দেখে রেগে বলতে লাগলেন, "মামা, কে তোমায় মারিয়াছে দেখাইয়া দাও, আমি তার মাথাটা ছিঁড়িয়া লই।" পরে ঠাকুর একটু শান্ত হয়ে সব ঘটনা বললেন। স্তম্ভিত হৃদয় ভাবতে লাগলেন, "ইহাও কি কখন সম্ভবপর?" [ক্রমশঃ]

ভ্রমসংশোধন

কার্তিক (১৩৯২) সংখ্যায় ৬৯২ পৃষ্ঠার ২য় কলমের নিচের দিক থেকে নবম পঙ্‌ক্তির 'খড়্গপুর-কাড়গ্রাম' স্থানে 'হাওড়া-খড়্গপুর' পড়তে হবে। —সঃ

প্যারিস পেরিয়ে

ডক্টর অমিয়কুমার হাটি

[পূর্বানুবৃত্তি]

১২

রাত পেরুতেই হিথরো বিমানবন্দর—লণ্ডন। পৃথিবীর ব্যস্ততম বিমানবন্দরগুলির অন্যতম।

কোথায় যাব, হিথরোর মাটিতে পা দেবার আগে পর্যন্ত কিছু ঠিক ছিল না। কয়েকটা ঠিকানা অবশ্য ছিল। ছিল অভিন্নহৃদয় বন্ধু 'জন' (সুবিমল ভট্টাচার্য)-এর ঠিকানা। কিন্তু এ-পকেট, ও-পকেট, এখানে সেখানে খুঁজলাম, পেলাম না। হারিয়ে ফেলেছি। ওকে চিঠিও লিখিনি যে নিতে আসবে। ভেবেছিলাম ওর ওখানে গিয়েই অবাক করে দেব। হল না।

যেতে পারি আমাদের সহকর্মী কমলবাবুর দাদা ডাঃ মৃণালকান্তি ঘোষের কাছে। সেফিল্ড-এ—অনেকদিন ধরে আছেন ইংলণ্ডে, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক—বারবার বলেছেন আসতে—কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে অনেক দূর।

ডি. টি. এম্. অ্যাণ্ড এইচ. পাশ করা এক তরুণ ও কৃতবিদ্য চিকিৎসক ছাত্র ডাঃ মণ্ডল দিয়েছিলেন তাঁর কাকার ঠিকানা। ফ্রান্সে অ্যানেসিতে যিনি আমার প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলেন, লণ্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সেই ডঃ মেজেস্কিকে অনুরোধ করেছিলাম, যেন তিনি লণ্ডনে ফিরে এসে মিঃ মণ্ডলকে ফোনে অন্ততঃ জানান যে, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব। তাঁর সঙ্গে দেখা করা, আমার বিশেষ দরকারও ছিল।

কী ভেবে মিঃ মণ্ডলকেই ফোন করলাম হিথরো বিমানবন্দর থেকে ইংরেজীতে, তখন প্রায় ৯টা। মিঃ মণ্ডলকে পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে। বললেন, "আমি আজ অফিসে ছুটি নিয়েছি, নইলে ফোন করেও পেতেন না—ডঃ মেজেস্কি আমাকে আপনার কথা বলেছেন, আপনি বিন্দুমাত্র দেরি না করে চলে আসুন। খুব দুঃখের যে, আমার গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে হঠাৎ, তাই যেতে পারছি না আপনাকে আনতে।" তিনি অবশ্য পথের নির্দেশ দিলেন।

বিমানবন্দরের লাগোয়াই পাতালরেল। উঠে বসলাম চটপট। হুস করে আধঘণ্টায় পৌঁছে দিল 'কিংস ক্রস' স্টেশনে। পাতাল থেকে উঠে দেখি রৌদ্রকরোজ্জল রাজপথ—তবে প্রায় ফাঁকা। ২।১টা বাস যাতায়াত করছে। যাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা, তিনি বাঙালী, নাম আলি, পূর্ববঙ্গের উচ্চারণ, চট্টগ্রামের টান।

—"বাঙালী বলে মনে হচ্ছে! নতুন বুঝি? কবে এসেছেন? কোথায় যাবেন?" একটুতেই দিলখোলা আলাপ।

—"৬নং ক্লেয়ার স্ট্রীট," শেষ প্রশ্নের উত্তরটা দিই।

—"তাহলে তো এসেই গেছেন। ঠিক চিনেছেন—হেঁটে যেতে বড় জোর ১৫ মিনিট লাগবে, ঐ যে বাড়িটা দেখছেন, উল্টো দিকের ফুটপাতে, তার পাশ দিয়ে যে চওড়া রাস্তাটা চলে গেছে—ঐটা ধরে হাঁটলে বাঁ দিকে পাবেন,—এগিয়ে যান—শুভ হোক"—হেসে বিদায় নিলেন।

ধন্যবাদ জানিয়ে আমিও রাস্তা ধরলাম। মিনিট পনেরো এগুতেই বাঁ দিকের একটা বাড়ির জানালা থেকে নাম ধরে ডাক—হয়তো আমার গায়ের রং এবং হাতের স্যুটকেশ ও ব্যাগ দেখেই—দাঁড়িয়ে আছেন জানালায় মিঃ মণ্ডল, কারণ তাঁর নির্দেশ অনুসারে এলে এই

সময়েই আসার কথা—সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন ঘরে।

একটি ঘর। আসবাবে ঠাসা। এক বৃদ্ধ ইংরেজ ভদ্রলোক বসে। কথাবার্তা তখনও সব ইংরেজীতে চলছে।

—"ডাঃ হার্টি, আফ্রিকার কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন আপনি?" শুধান মিঃ মণ্ডল।

আকাশ থেকে পড়ি। বলি, "মানে, আমি তো কলকাতার ট্রপিক্যাল স্কুল থেকে আসছি।"

—"ও। তাহলে আফ্রিকা থেকে কতদিন আগে ওখানে গেছেন? আফ্রিকার কোন্‌টাই বা আপনার দেশ?" আবার প্রশ্ন করেন।

রীতিমত বিব্রত! "মানে, আমি তো কলকাতারই ছেলে—"

—"তাই নাকি! আপনি বাঙালী!" সোল্লাস চীৎকার, "তা, তবে এতক্ষণ ইংরেজীতে কথা বলছি কেন আমরা!"—ফিরলেন ঐ চেয়ারে বসা সাহেবের দিকে, বললেন, "ব্র্যাম, দেখ, আমার দেশ থেকে এসেছেন।" যেন হাতে চাঁদ পেয়েছেন।

শুভদিন জানালাম ব্র্যামকে।

গণ্ডগোলটা মেজেস্থির ফোন করাতেই। ভেবেছিলেন আমি বুঝি আফ্রিকান। আর ডাঃ মণ্ডলের চিঠিও পাননি। আমি বিস্তারিত বলি সব। খুব খুশি হলেন, "যাক! ও তাহলে ভাল ফল করেছে ডাক্তারী পরীক্ষায়—এম. ডি.

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, তারপরই বললেন, "চলুন, আজই একটুও দেরি না করে ওর দরকারী গবেষণাপত্রটা খুঁজে দেখি। ও হ্যাঁ—তার আগে চা আর জল খাবার খান—ব্র্যাম, তুমিও থাবে তো!"

আত্মভোলা, অমায়িক, অদ্ভুত সুন্দর মানুষ মিঃ মণ্ডল। পুরো নাম প্রদীপ মণ্ডল। ১৩ বছর ধরে লণ্ডনে আছেন। কাজ করেন একটি সরকারী অফিসে। তরুণ বয়স ৪-এর কোঠা পেরোয়নি।

চা-টা খেয়ে বেরুলাম। এটা মধ্য লণ্ডন। মধ্য কলকাতার মতো বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন প্রভৃতি কাছাকাছি। শুরু হল ডাঃ মণ্ডলের গবেষণাপত্র খোঁজা। প্রথমে খুব বড় একটা বই-এর দোকানে গেলাম। মিলল না। তারপর ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনে। সেখানে বিজ্ঞান পত্রিকাটা—যাতে ঐ গবেষণাপত্রটি রয়েছে, তার সন্ধান মিলল, কিন্তু আপাততঃ ওটা বাঁধাতে গেছে, দিন সাত পরে আসবে। ওখান থেকে গেলাম লণ্ডন স্কুল অব ফার্মেসীতে। নেই সেখানেও। তারপর কাছাকাছি সবই, হাঁটাপথে পড়ছে—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার। এ-ঘর ও-ঘর খুঁজতে খুঁজতে আসল জায়গায় মিলল বইটি। পাশেই আছে জেরক্স যন্ত্র। প্রতি পৃষ্ঠা ৫ পেনি। ১৫ মিনিটের মধ্যে ফটোকপি নেওয়া হয়ে গেল। উদ্ধার হল আসল কাজ। আবার স্বস্তির নিশ্বাস বেরুল মিঃ মণ্ডলের নাক দিয়ে, "যাক এবার ওর এম. ডি.-টা পাকা!"

—"এর থিসিস-এর জন্যে এটা খুবই জরুরী ছিল।" বলি।

—"বুঝেছি। তাই একটুও দেরি করিনি। দেখলেন তো!"

সত্যিই অবাক হবার কথা। এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র না হয়েও যেভাবে খুঁজে বের করলেন পেপারটা! সেটাও দেখার মতো, শেখার মতো।

আমাকে থেকে যেতে বললেন ওঁর কাছে, এ-সফরে যে-কদিন আছি, যতদিন ভাল লাগে

কেমন অস্বস্তি লাগছিল। বললেন, "আপনার কিন্তু কিন্তু করার কোন কারণ নেই। আমার ভাইপোর সঙ্গে আপনার এত ঘনিষ্ঠতা, আর এটুকু করতে পারব না আমি? আর দেখলেন তো, আছি শুধু দুজন আমরা—আমি এবং ব্র্যাম। আপনাকে কদিন পেলে ভালই লাগবে। আপনারও খারাপ লাগবে না আশা করি।"

—"না-না সেকি—অনেক ধন্যবাদ।" বলি।

—"ধন্যবাদ তো মামুলি ব্যাপার হল ডাঃ হাটি।" হাসলেন প্রদীপবাবু।

—"হ্যাঁ, মামুলি, ঠিকই বলেছেন, আপনার মহানুভবতার কাছে কিছুই নয়।" হাসির সঙ্গে আমার কৃতজ্ঞতা মেশানো।

লণ্ডনকে একটা নতুন চোখে দেখলাম। সে চোখে দেখা সম্ভব হল শুধু বুঝি প্রদীপবাবুর জন্যেই। প্রায় অপরিচিত আমাকে এমনভাবে কেন কাছের মানুষ করে নিয়েছিলেন—যে কদিন ছিলাম, অতি সমাদরে রেখেছিলেন? আজও যখন সে প্রশ্ন নিজেকে করি, তার কোন সদুত্তর খুঁজে পাই না।

হয়তো এটাই আভিজাত্য। এবং আভিজাত্যের যে একটা গর্ব আছে, সেই গর্বে বৃটেন এখনও গরীয়ান। সে অতীত গৌরব নেই। সাম্রাজ্যসূর্য তার অস্তমিত। অনিবার্য সেই ছাপ পড়েছে অর্থনীতিতে, সমাজজীবনে। তবু লণ্ডন এখনও লণ্ডন। ইউরোপীয় শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র, ও-সবের ধারক ও বাহকও বটে। এবং এ জাতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অন্তর্মুখিতা, ভদ্রতা, পরিমিতি বোধ, অন্ততঃ নিজের দেশে। পরিবেশের সঙ্গে বেশ মানিয়ে নিতে পারে।

কিন্তু আরেকটু তলিয়ে দেখলে এ জাতির হৃদয়েও যে ঘুণ ধরেছে, বোঝা যায়। আইরিশ জাতিগোষ্ঠীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। বর্ণদাঙ্গা মাঝে মাঝেই লাগে। প্রত্যন্ত-প্রক্ষিপ্ত সাম্রাজ্যরক্ষার জন্যে এখনও সাড়ম্বরে যুদ্ধযাত্রা করতে হয়, মানসম্ভ্রম বাঁচাবার তাগিদে। কেমন যেন স্থাণু হয়ে থাকার, মুখ ঘুরিয়ে থাকার প্রচেষ্টা। একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যায়। রানীর জীবন্ত প্রহরীর কথাই ধরা যাক। রানীর বাড়ির সামনে। একদম কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। নট নড়নচড়ন। চোখের পাতা পড়ে না এমন। ছেলে, মেয়ে ভ্রমণকারীরা ফটো তোলে তাকে নিয়ে। সেই অতীত আঁকড়ে থাকা। এ-সবের মানে আছে কোন এ-যুগে? হাসি পায় দেখে আমাদেরই।

রাসেল স্কোয়ার পাতালরেলের স্টেশনে নামতে একদিন একটা ঘটনা ঘটেছিল। দিনের বেলা হলেও পথটা একদম ফাঁকা। ছিলাম একা। দুজন লোক এগিয়ে এল, দুজনেই বলল, "আমাকে দশ পেনি দাও তো!" ভয় ভয় করল কীরকম, এক ছুটে স্টেশনের দিকে চলে গেলাম, যেখানে দুচারজন লোক দাঁড়িয়ে। ওরা ফিরে গেল। প্রদীপবাবু বলেছিলেন, ঠিকই করেছিলাম। এভাবেই অতর্কিতে এরা যা পায়, ছিনতাই করে। লণ্ডনেও সাউথ কেনিংটন স্টেশনের পাতালরেলের পথে স্প্যানিশ গীটার নিয়ে দুজনকে গান গাইতে দেখেছি, খুশি হলে কেউ কিছু দেয়। বাজার করছি একদিন, প্রকাশ্য রাজপথেই এক সাহেব হাত পাতল প্রদীপবাবুর কাছে, প্রদীপবাবু কয়েকটা পেনি তুলে দিলেন। দেখেও আনন্দ। সাহেব ভিক্ষা নিচ্ছে আমাদের হাত থেকে। এবং দুঃখও। যাদের আছে আর যাদের নেই, এই দুটি শ্রেণী এখানেও রয়ে গেছে—সেখানে সাহেব আর কালো মানুষের তফাত নেই। রয়েছে বেকারীর জ্বালা এবং তা ক্রম-

বর্ধমান। আছে রাগী তরুণ, তাদের নেশার জগৎ। পাতালরেলের সুন্দর গদী কখন-সখন কে বা কারা ব্লেড দিয়ে কেটে দিয়ে যায় এ-সব অস্থিরতাও চোখে পড়ে, অনুভব করা যায়।

একদিন বড়ধরনের এক সুসজ্জিত কেন্দ্রীয় বিপণন থেকে ছোটদের টুকিটাকি কিছু জিনিস কিনছি। সঙ্গে প্রদীপবাবু। দাম যা পড়েছে, বা বলেছে, তাই পকেট থেকে বার করেছি, কিন্তু প্রদীপবাবু হিসাব করছেন। এ তো তাঁর স্বভাবের সঙ্গে মেলে না—শুধাই তাঁকে তাই, "যে মহিলা হিসাব করলেন, তিনি তো যন্ত্রগণক ব্যবহার করেছেন, তবু আপনি আবার হিসাব করছেন কেন?" হাসলেন প্রদীপবাবু, বললেন, "এদের বিদ্যে ঐ পর্যন্ত—যন্ত্রগণকের যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগ চিহ্নগুলোই জানে, আসল যোগ-বিয়োগ জানে না, তাই ভুলও করে, তাই আমাদের পুরানো প্রথায় আঙুল গুণে হিসাব করে নেওয়াও ভাল, এভাবে অনেকবার ভুল এড়িয়েছি।

তো, দুপক্ষেরই হিসাব ঠিক ছিল, যে টাকা দিয়েছি, তার খুচরো হিসাবে কয়েকটা ১ পাউণ্ডের নোট ফেরত দিচ্ছিলেন মহিলা, তার মধ্যে একটা একটু ছেঁড়া—সেটা প্রায় ফেরত দিতে যাচ্ছি, বাধা দিলেন প্রদীপবাবু—ফিসফিস করে বললেন, "করছেন কি—এখানে ছেঁড়া কাটা সব চলে, রানীর ছবি আঁকা, দেখছেন না?" অবশ্য আমাদের দেশেও অতি অধুনা এক টাকার ছেঁড়া কাটা নোট নিতে খুব কম লোকই অস্বীকার করেন।

আবার দরদাম করে জিনিস কেনা যায়—তার জন্যেও বাজার বসে, রবিবার সকালে। আমাদের যাত্রা সিনেমার কাছে যেরকম বেচা-কেনা হয় বুধবার-রবিবার, সেরকম। জায়গাটার নাম পেটিকোট গলির বাজার। তবে, লণ্ডনের ঝানু লোককে পাশে না রাখলে ঠকার ভয় আছে।

এবং এখানকার বাসও সব সরকারী—কলকাতার সরকারী বাসের মতো লাল-দোতলা। বাসের নম্বরগুলোও কলকাতার মতো—একদিন তো দোতলা একটা বাসের নম্বর ১১ দেখে মনে হল উঠে বসি, পৌঁছে দেবে ডানলপ!

বাসের টিকিট যাঁরা কাটেন, তাঁদের বেশির ভাগ মহিলা নিগ্রো। টিকিট দেবার পরই বলছেন, "ধন্যবাদ"। কলকাতার কনডাক্টরকে এরকম ধন্যবাদ যদি বলতে হয়, তাহলে এক-দিনেই তাঁর গলায় হয়তো ক্যানসার হয়ে যাবে। এখানে যাত্রিবাসে ধূমপান অচল, কিন্তু ভাবতে পারেন, লণ্ডনে এখনও চালু—তবে উপরের তলায়, পিছনের দিকের সিট-এ বসে।

রাত ১২টা পর্যন্ত চলে বাস, কখন-সখন ভীড় হয়, ২০-২০ জন দাঁড়িয়ে থাকেন, তবে বাদুড়-ঝোলা নয়। রাত ১২টা থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত সামান্য কিছু বাস চলে রুটিন মাফিক। তিন ধরনের ভাড়া, ১৬ বছর পর্যন্ত অর্ধেক ভাড়ার ব্যবস্থা, বয়স ৫ বছরের নিচে হলে ভাড়া লাগে না। ২০ মাইলের পরিধি নিয়ে লণ্ডনের সরকারী বাস ঘোরে। তবে, ইদানীং ওখানেও ভর্তুকির বহর বোধ হয় বাড়ছে। ব্যবসা হস্তান্তরের কথা শুনেছিলাম যেন। আমাদের যেমন, ট্রামের 'অল ডে' টিকিট আছে, ওখানে সেরকম, সারা-দিন, তিনদিন বা একসপ্তাহের জন্যে টিকিট কাটা যায়। এতে লণ্ডন দেখার সুবিধা হয়, কারণ সব মূল কেন্দ্র দিয়েই বাস যায়। লণ্ডনের এরকম কয়েকটি বিখ্যাত মূল কেন্দ্র হল পিকাডিলি সার্কাস, কিংস ক্রস, ভিক্টোরিয়া, ইউস্টন, হিথরো সেণ্ট্রাল প্রভৃতি। এগুলো হারাবার নয়—লণ্ডন তাই কখন হারিয়ে যায় না কারুর কাছেই। এবং

পাতালরেলও খুব সহজে রপ্ত হয়ে যায়, খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেয় নির্দিষ্ট জায়গায়। সারা লণ্ডনে শুধু পাতালরেলের স্টেশনই আছে ২৬৩ টা।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১ অক্টোবর স্পেনের ট্রাফালগার অন্তরীপে স্পেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বৃটিশ-নৌশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হল—যদিও যুদ্ধের নায়ক নৌ-সেনাপতি নেলসন মারা পড়লেন। এঁরই স্মরণে লণ্ডনের বিখ্যাত ট্রাফালগার স্কোয়ার। বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতীকচিহ্ন সিংহমূর্তি রয়েছে যেখানে, যদিও তাদের নখ ও দাঁত এখন প্রায় ভোঁতা হয়ে গেছে। নেলসনের স্মরণে নেলসনস্তম্ভও আছে। আর রানীর বাড়ি—বাইরে থেকে দেখলে এমন কিছু কিন্তু আহামরি নয়—আমাদের দেশীয় রাজাদের বাসভবনের চাকচিক্য এর থেকে অনেক বেশি, সম্রাট বা বাদশাদের কথা ছেড়েই দিলাম। বয়ে চলেছে টেমস—ইতিহাসের কত ভাঙা-গড়া দেখতে দেখতে। ধারগুলো বাঁধানো। সাজানো। রেস্টুরেন্ট প্রভৃতি আছে। অন্ততঃ গোটা দশেক সেতু এর উপর পারাপারের। আলো ঝলমল রাতের টেমস, সে কি ভুলবার—ওয়াটারলু সেতু থেকে? একদিকে তার ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবি, আরেকদিকে সেণ্ট পল গীর্জা। দিনের বেলা দেখলাম টেমস-এর জল ওয়েস্টমিনিস্টার সেতুর উপর দাঁড়িয়ে। জল-দূষণ ভীষণ সমস্যা। আগে স্যামন মাছ পাওয়া যেত। এখন পুরস্কার ঘোষণা করা আছে, লণ্ডনের টেমস থেকে কেউ ঐ মাছ ধরতে পারলে তাকে ১০০ পাউণ্ড দেওয়া হবে। এক সাহেব ধরেছিল নাকি কিছুদিন আগে, কিন্তু ধোপে টেঁকেনি, পরীক্ষায় জানা গেছিল, সে-মাছ সে ধরে এনেছে অন্য কোথাও থেকে। পুরস্কারের লোভে। সাহেবের অতি চালাকি ধরা পড়ে গেল। গ্রীনিচ যাবার দিন টেমস নদী পার হয়েছিলাম এর নিচের সুড়ঙ্গ দিয়ে। কলকাতার সঙ্গে হাওড়ার যোগাযোগ এইভাবে করা হবে বলে কথা উঠেছে। গ্রীনিচ মানমন্দিরে আছে পুরানো, নতুন নানা ধরনের জাহাজের একটি মিউজিয়াম। গ্রীনিচ যাওয়াটা আরেকটা কারণে স্মরণীয় হয়ে রইবে। বিকাল বেলা। একটা বাজারের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। প্রদীপবাবুর এক বাঙালী বন্ধুর গাড়িতে। প্রদীপবাবু শুধালেন, "এসে গেছি দোকানটা?"

—"ঐতো", ওঁর বন্ধু বললেন।

নামলাম সবাই। কীসের দোকান? তেলে-ভাজা আর পাক দেওয়া জিলিপি! আঃ—রসনায় জল এসেই গেল। তবে দোকানটা ছিমছাম—যদিও এক বাংলাদেশীর। এবং বেগুনী দিচ্ছে কাপড়ের দস্তানাপরা হাতে—চিমটে দিয়ে তুলে। ভাবা যায় কলকাতায় এভাবে বেগুনী পরিবেশন করার কথা—আগামী—ধরুন ২৫ বছরের মধ্যে? কাটাফল—বেলের সরবৎ—ফুচকা—ভেলপুরী—হায় হায়! এ স্বপ্ন না দেখাই ভাল!

লণ্ডনে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে। পার্লা-মেণ্টের আশপাশ দিয়ে, বা টেম্পল, যেখান থেকে ব্যারিস্টারের দল আসে, বিচারালয়, পিকাডিলি সার্কাস, চিড়িয়াখানা, বা কিংস ক্রস স্টেশন। এবং আবহাওয়াটা বেশ চমৎকার। শীত বেশি নেই। একদিন ছাড়া বৃষ্টি হতে দেখিনি, যাকে বলে এরা 'হোম ওয়েদার'—কুয়াশা, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, টিপটিপ বৃষ্টি—পাইনি বেশি এ-সব।

[ক্রমশঃ]

পথ ও পথিক
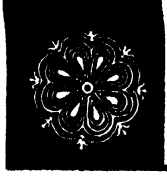
স্বামী চৈতন্যানন্দ

হর্ম্যসভ্যতা

পাশ্চাত্য শহরের অট্টালিকাগুলি আকাশ-চুম্বী। কিছু সময় তাকিয়ে দেখলে মাথা ঘুরে যায়। সেখানকার মানুষ আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে প্রভূত ধন-সম্পদের অধিকারী। প্রকৃতির সম্পদকে অধিগত করে নানারকম ভোগ্যবস্তু কিভাবে উৎপন্ন করতে হয় তা সেখানকার বিজ্ঞানীরা আক্ষরিক অর্থে প্রমাণ করেছেন। এত ভোগের সামগ্রী যে, মানুষের এক জীবনে ভোগ করে শেষ করা যায় না। ভোগের প্রাচুর্য অনুযায়ী মানুষের আয়ু খুবই অল্প। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বিজ্ঞান আজ মানুষের আয়ুকে দীর্ঘতর করেছে। পূর্বের মতো আর অল্প অসুখ-বিসুখে সে মরে না। রোগ নিরাময়ের ভাল ভাল ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। আজ বিজ্ঞানের সর্বত্র জয়যাত্রা।

পাশ্চাত্যের চাকচিক্যময় সুসজ্জিত শহরগুলি আজ স্বর্গে পরিণত হয়েছে। সেখানকার মানুষ ভোগের নানা উপকরণের মধ্যে আকণ্ঠমগ্ন। জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপে তারা ভোগ করছে। পাশ্চাত্যের এত ভোগ্যবস্তু দেখে প্রতিবেশী অন্যান্য দেশগুলি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পাশ্চাত্যের তুলনায় তারা গরিব। তাদের ভোগ করার এত সামগ্রী নেই—এত ঐশ্বর্যও নেই। তাদের দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার এত উন্নতিও ঘটেনি। ফলে তারা ইচ্ছামতো মনের আনন্দে ভোগ করতে পারছে না। সতৃষ্ণ নয়নে পাশ্চাত্যের থরে থরে সাজানো ভোগ্যবস্তুর দিকে তাকিয়ে আছে।

ভারতও পাশ্চাত্যের অনুকরণে নিজের ভোগ্যবস্তুর সামগ্রী বৃদ্ধি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। নিজের জাতীয় আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্যানুকরণে প্রবৃত্ত। ভারত থেকে যে-সব ভাল ভাল মেধাবী ছেলেমেয়েরা পাশ্চাত্যে পড়াশুনা, ভ্রমণ বা ব্যবসা করতে যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে তাদের মাথা ঘুরে যায়। এত ভোগ্যবস্তু তো তারা জীবনে চোখে দেখেনি। ফলে কি করে যে ভোগ করবে তা নিয়ে তারা মহা ব্যস্ত। অনেকেই পড়াশুনা শেষে বিদেশরূপ স্বর্গে থেকে যাচ্ছে। তারা ভাবে দরিদ্র ভারতে ফিরে গিয়ে কি হবে! এখানকার মতো এত ভোগের সামগ্রী তো পাব না! যারা ফিরে আসে তারা ওই দেশীয় ভোগের বস্তুগুলি নিয়ে আসার চেষ্টা করে। তারাই ভারতে হাল-ফ্যাশানের প্রধান নায়ক-নায়িকা। তাদের দেখেই ভারতের শহরগুলিতে ফ্যাশন আরম্ভ হয়। এখান থেকে গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে হাল-ফ্যাশান। পোশাক-পরিচ্ছদে, চলনে-বলনে, জীবনযাত্রাপ্রণালীতে—সবকিছুর মধ্যে এই তথাকথিত নায়ক-নায়িকারা পাশ্চাত্য ঢঙে নিজেদের জাহির করে। ভারতের সব-কিছুকে পুরানো আমলের জিনিস বলে তারা বর্জন করে। তারা সব সময় অত্যাধুনিক হতে চায়। জীবনটা চলমান। অতএব আমাদেরও পাশ্চাত্যের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলতে হবে। মাপকাঠি হচ্ছে ওই পাশ্চাত্য সভ্যতা। ওই সভ্যতায় যদি নিজেদের প্রস্তুত করতে না পারলাম তাহলে আমরা ব্যাক্ ডেটেড হয়ে গেলাম। এর থেকে কি লজ্জা আছে!! তাই যত ক্ষতিই হোক না কেন হাল-ফ্যাশানের সঙ্গে আমাদের তাল

রেখে চলতেই হবে। তাতে যা হবার হবে। তার জন্ত যদি সংসার-পরিজন, স্ত্রীপুত্র-স্বামী পরিত্যাগ করতে হয় হোক না!! তবু তো হাল-ফ্যাশান ধরে মডার্ন বলে পরিচিত হতে পারব!

আজ এভাবে ভারত পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতার দিকে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে। তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে যাচ্ছে। তার যে বহু-কালের সযত্নে সঞ্চিত সম্পদ, তাকে অবহেলায় ধূলায় লুণ্ঠিত করে ছুটে চলেছে। ধূলায় ধূসরিত হয়ে তা পড়ে আছে। তার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না। এই ভূ-লুণ্ঠিত সম্পদ—আমাদের আধ্যাত্মিকতা।

স্বর্গভূমিরূপ পাশ্চাত্য আজ এত ভোগ্যবস্তুর সামগ্রী পেয়েও খুশি হতে পারছে না। আরও বেশি কি করে ভোগ করবে তার অনুসন্ধানে তারা পাগলের মতো ছুটছে। সমাজের এই দুর্দশা দেখে পাশ্চাত্যের মনীষিবৃন্দ চিন্তান্বিত। অনেকে আতঙ্কিত। তাঁদের মধ্যে একজন উইল ডুরাণ্ড। 'দ প্লেজার অব্ ফিলজফি' গ্রন্থে তিনি তেত্রিশ বছর পূর্বে বলেছিলেন: কৃষিকাজের জায়গায় শ্রমশিল্প (Industry) এসেছে, গ্রামের পরিবর্তে শহর, শহরের জায়গায় নগর গড়ে উঠেছে, বিজ্ঞানের প্রচণ্ড উন্নতি হয়েছে, শিল্পকলার মান অপকৃষ্ট হয়েছে, চিন্তার স্বাধীনতা এসেছে, রাজতন্ত্রের অবলুপ্তি ঘটেছে, এসেছে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, নারী স্বাধীনতা পেয়েছে, বিবাহব্যবস্থা ভেঙে গেছে, পুরানো নৈতিকচরিত্রের নিয়মগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, ভোগের মধ্যে আকণ্ঠ-মগ্ন হয়ে তপস্যাময় জীবনযাত্রা ধ্বংস হয়ে গেছে, ভোগের অত্যধিক উত্তেজনায় মনের শান্তি একেবারে চলে গেছে, যখন তখন যুদ্ধ বাধছে, ধর্ম আমাদের থেকে বহু দূরে চলে গেছে। এখন আমাদের জীবন যন্ত্রের দ্বারা চালিত। অনুভূতিশীল জীবনদর্শনের জায়গা দখল করেছে যান্ত্রিক ও সর্বনাশা জীবনদর্শন। উইল ডুরাণ্ড এই কথা বলার পর আক্ষেপ করে আরও বলেছিলেন: 'সহজাত সমস্ত সুখ আমাদের মধ্য থেকে চলে গেছে, আমরা যুক্তিতর্ক ও সন্দেহের সমুদ্রে নাকানি-চুবানি খাচ্ছি; অদ্ভুত জ্ঞান ও শক্তির মধ্যে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, জীবনের মূল্য, জীবনের গন্তব্যস্থান হারিয়ে গেছে। আজ আমাদের জীবন অনিশ্চয়তার আবর্তে ঘূর্ণমান।' পাশ্চাত্যের সমাজে ভালবাসার বন্ধন অবলুপ্তির পথে। এই সমাজ একটি বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চলছে। সমাজের আর-একটি চিত্র 'ম্যানসন্স্ অব্ ফিলজফি' গ্রন্থে উইল ডুরাণ্ড বর্ণনা করছেন: 'গৃহ এবং পরিবার একটা অনিশ্চিত পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে চলছে, গৃহের বদলে বাড়ি, সন্তানের বদলে কুকুর আসছে, স্ত্রী-পুরুষের মিলন এখনও হয় এবং কখন কখন সন্তানও হয়, কিন্তু এই মিলন সব সময় বিবাহসঞ্জাত নয়, আর বিবাহও সব সময় মাতৃত্ব-পিতৃত্বের জন্য নয়; আর সন্তানেরা জনক-জননীর কাছে শিক্ষা পায় কদাচিৎ।'

পরিষ্কার ঝকঝকে শহরে আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকায় বাস করেও তারা অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবনযাপন করছে। প্রায় সবারই মধ্যে হতাশা। সব সময় তারা একটা টেনশনে বা চাপা উত্তেজনায় ভুগছে। নানারকম টেনশন তাদের। ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেমস্ সি কোলম্যান তাঁর 'অ্যাবনর্ম্যাল সাইকোলজি অ্যাণ্ড মডার্ন লাইফ' গ্রন্থে এই টেনশনের বহু কারণ দেখিয়েছেন।

আজ পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের সমাজকে এই হতাশা থেকে কি করে রক্ষা করবেন তাই নিয়ে প্রচণ্ডভাবে চিন্তা-ভাবনা করছেন। তাঁরা দেখছেন, তাঁদের চোখের সামনে সমাজ কিভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ধনসম্পদে ঐশ্বর্যশালী হয়েও তারা এত টেনশনে ভোগে কেন? টেনশন

কমাবার জন্য তারা ঘুমের বড়ি খায়, মদ খায়, আত্মহত্যা করে প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বন করে। টেনশন কমানোর জন্য অধিকাংশকে মনোবিজ্ঞানীদের কাছে পাঠানো হয়। কেউ ভাল হয়, কেউ পাগল হয়ে যায়।

আজ পাশ্চাত্যের সমাজে নৈতিকচরিত্র ধ্বংস হয়ে গেছে—উইল ডুরাণ্ডের ভাষায়। সমাজে সর্বত্র একটা যৌনভাবের প্রবাহ বয়ে চলেছে। স্বামীজী বলছেন: 'পবিত্রতাই জাতির জীবনী-শক্তি। তুমি কি ইতিহাসে লক্ষ্য কর নাই যে, অপবিত্রতার মধ্য দিয়াই জাতির মৃত্যুচিহ্ন দেখা দেয়? যখন যৌন অপবিত্রতা কোন জাতির মধ্যে প্রবেশ করে, তখনই বুঝিতে হইবে উহার বিনাশ আসন্ন।'

পাশ্চাত্যের ভোগসর্বস্ব মানুষকে সাবধান করে দিয়ে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী বলেছিলেন: 'যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয়, তবে উহা আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সমূলে বিনষ্ট হইবে।' স্বামীজীর এই সাবধান-বাণী পাশ্চাত্যবাসীরা তখন শোনেনি। তার ফল হল পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি ঐতিহাসিকরা তাঁদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ঐ যুদ্ধের বিভীষিকা ভুলতে না ভুলতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘনায়মান। এবার যুদ্ধ বাধলে তার পরিণতি পূর্বের দুটি যুদ্ধ থেকে সহস্রগুণ। এবার আর যুদ্ধ ভূমিতে হবে না, মহাকাশে হবে। পরিণামে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পৃথিবী শ্মশানে পরিণত হবে। সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে এই ভয়াবহ যুদ্ধের ফল ভোগ করতে হবে। কেউ নিস্তার পাবে না।

পাশ্চাত্য সভ্যতার এই মহাসঙ্কট থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র ভারতীয় সভ্যতা। ভারতের আধ্যাত্মিকতাই ধ্বংসোন্মুখ পাশ্চাত্যকে বাঁচাতে পারে। ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবী বলছেন: 'বিশ্ব-ইতিহাসের এই মহাসঙ্কটময় মুহূর্তে মানবজাতির পরিত্রাণের একমাত্র পথ ভারতীয় পথ। সম্রাট অশোক ও মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা-নীতি এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রামাণিক সাক্ষ্য—এরই মধ্যে আমরা পাই সেই মানবিকতা ও ভাবাদর্শ যার দ্বারা মানবজাতির পক্ষে একপরিবারভুক্ত হয়ে গড়ে ওঠা সম্ভব; এবং পারমাণবিক যুগে আমাদের আত্মধ্বংসের এটাই একমাত্র বিকল্প।'

পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতার এই তো পরিণতি! আর আমরা ওই আপাত চাকচিক্য-ময় ধ্বংসোন্মুখ সভ্যতার পিছনে ছুটে চলেছি। আমাদের মহামূল্য জীবনদায়ী সঞ্জীবনীশক্তি—আধ্যাত্মিকতা ধূলায় লুণ্ঠিত। আমরা মহামৃত্যুর দিকে ছুটে চলেছি। আমাদের মতো দুর্ভাগা কে আর আছে!

হর্ম্যসভ্যতা—প্রাচুর্যময় সভ্যতা—জড়বাদী সভ্যতার পরিণতি ধ্বংস। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই ধ্বংসকাহিনীর বর্ণনা আছে। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে আজ বেঁচে আছে ভারতীয় সভ্যতা,—তার আধ্যাত্মিকতার জন্য। ভারতের এই আধ্যাত্মিকতাকে উজ্জীবিত করে পৃথিবীকে বাঁচানোর নৈতিক দায়িত্ব ভারতবাসীর। অন্যথা পৃথিবী থেকে সমস্ত ভাল ভাবগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। স্বামীজী বলছেন: 'ভারত কি মরিয়া যাইবে? তাহা হইলে জগৎ হইতে সমুদয় আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হইবে; চরিত্রের মহান্ আদর্শসকল বিলুপ্ত হইবে, সমুদয় ধর্মের প্রতি মধুর সহানুভূতির ভাব বিলুপ্ত হইবে, সমুদয় ভাবুকতা বিলুপ্ত হইবে; তাহার স্থলে দেবদেবীরূপে কাম ও বিলাসিতা যুগ্ম রাজত্ব চালাইবে; অর্থ—সে পূজার পুরোহিত; প্রতারণা, পাশব বল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা—তাহার পূজাপদ্ধতি আর মানবাত্মা তাহার বলি।'

পুরাতনী

তত্তাবৎ বুদ্ধি

একটি পুকুর। তার গভীরতা খুবই কম। তাতে প্রচুর মাছ। একদিন কয়েকটি জেলে ঠিক করল, পুকুরের জল একেবারে শুকিয়ে সব মাছ ধরবে। তারা পাশের একটি বড় ও গভীর পুকুরের সঙ্গে এই পুকুরের সংযোগ করে দিল। ফলে ক্রমশঃ অগভীর পুকুরের জল শুকিয়ে যেতে লাগল।

এই অগভীর পুকুরে অন্যান্য মাছের সঙ্গে তিনটি শোল মাছ ছিল। তারা পরস্পরের বন্ধু। তাদের মধ্যে দুটির খুব বুদ্ধি। সবচেয়ে যার বেশি বুদ্ধি সে অপর দুটি শোল মাছকে বলল: 'ভাই, পুকুরের জল শুকিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমাদের ধরার জন্য জেলেরা ফন্দি করে জল শুকিয়ে ফেলছে। চল, জল থাকতে থাকতে আমরা পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা বের করি।' অপর শোল মাছ দুটির একটি বলল: 'আরে, অত ব্যস্ত হওয়ার কি আছে। বিপদ যদি সত্যিই আসে, তখন বুদ্ধি খাটিয়ে বিপদ-মুক্তির পথ বের করে ফেললে হবে।' তৃতীয় শোল মাছটি বলল: 'তোমরা বড় বেশি কথা বলছ। আমি তো বিপদের কিছুই বুঝতে পারছি না। খামকা তোমরা বিপদের গন্ধ পেয়ে ভয় পাচ্ছ। অত অধীর হলে চলবে কেন! চুপচাপ থাক, ভয়ের কোন কারণ নেই।'

প্রথম শোল মাছটি পরিণামদর্শী। সে ভাবল এদের সঙ্গে থাকলে পরিণামে নির্ঘাত মরতে হবে। জল থাকতে থাকতে পালিয়ে বিপদ-মুক্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। এই চিন্তা করে অপর দুটি শোল মাছকে সে বলল: 'ভাই, আমার খুব সুবিধা ঠেকছে না; সামনে আমাদের সমূহ বিপদ। সময় থাকতে তোমরা যদি না পালাও, আমি পালাবার পথ অনুসন্ধান করছি।' এই বলে সে পালাবার পথ খুঁজতে লাগল। সে দেখতে পেল, বেশ কয়েকটি জায়গা দিয়ে জলের স্রোত অন্য একটি পুকুরে গিয়ে পড়ছে। তৎক্ষণাৎ সে একটি স্রোতের ধারা দিয়ে গভীর পুকুরে গিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌছাল। সেখানে সে নিশ্চিন্তে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

অপর দুটি শোল মাছ নিশ্চিন্তে সেখানে থেকে গেল। হঠাৎ তারা দেখতে পেল, পুকুরের জল একেবারে শুকিয়ে গেছে। তাদের শরীরের অর্ধভাগ জলের উপরে। দ্বিতীয় শোল মাছটি তৃতীয় শোল মাছকে বলল: 'ভাই, আমাদের বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। জেলেরা এখুনি আমাদের ধরে ফেলবে। একবার ধরে ফেললে মৃত্যু অবধারিত। অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বুদ্ধি খাটিয়ে পালাবার পথ খুঁজে বের কর।' তৃতীয় শোল মাছটি বলল: 'আরে অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন! আগে তো জেলেরা আমাদের ধরুক, তারপর ঠিক করা যাবে কি করা যায়। চুপচাপ ধৈর্য ধরে থাক।' দ্বিতীয় শোল মাছটি প্রত্যুৎপন্নমতি। সে ভাবল, এর বুদ্ধির উপর নির্ভর করে থাকলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। সে তৃতীয় শোল মাছকে বলল: 'ভাই, মৃত্যু আমাদের সামনে। এখুনি পালাবার উপায় বের না করলে মরতেই হবে। আমি চললাম। তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর।' এই বলে সে বিপদ-মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করতে লাগল। সে দেখতে পেল, জেলেরা একটি করে মাছ ধরছে,

আর একটি দড়িতে গেঁথে রাখছে। এইভাবে বহু মাছ দড়িতে গেঁথেছে। সে তাড়াতাড়ি গাঁথা বহু মাছের মধ্যে ঢুকে পড়ে দড়ি কামড়িয়ে থাকল। এমনভাবে কামড়িয়ে রইল যে, বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, জেলেরা তাকে দড়িতে গেঁথে রেখেছে। সে দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকল—কখন কি হয় ভেবে।

তৃতীয় শৌল মাছটি দীর্ঘসূত্রী তখনও সে সামান্য জলে কাদার মধ্যে মাথা গুঁজে নিশ্চিন্তে রয়েছে। হঠাৎ জেলেরা তাকে ধরে দড়ির মধ্যে গেঁথে রাখল। সে অচৈতন্য হয়ে পড়ল। এমনি-ভাবে জেলেরা পুকুরের সব মাছ ধরে দড়িতে গেঁথে ফেলল। এবার মাছগুলি ধোয়ার জন্য গাঁথা মাছের দড়িটি তুলে নিয়ে পাশের বড় ও গভীর পুকুরের জলে ধুতে লাগল। এই সুযোগে দ্বিতীয় শৌল মাছটি দড়ির কামড় ছেড়ে দিয়ে গভীর জলের মধ্যে পালিয়ে গেল। এখন সে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হল এবং মনের আনন্দে জলের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আর তৃতীয় শৌল মাছটি অলসতার জন্য পূর্বে আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা না করায় অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হল।

এইরকম তিনপ্রকার স্বভাবের মানুষ আছে। যে ব্যক্তি পরিণামদর্শী শৌল মাছের মতো বিপদের সঙ্কেত পাওয়া মাত্র বিপদ-মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করে, তার কখনও বিপদ হয় না। সে সব সময় নিশ্চিন্তে থাকতে পারে। সে জীবনে উন্নতি করে। যে ব্যক্তি পূর্বে বিপৎপ্রতিকারের উপায় না করে বিপৎকালে করে সে প্রত্যুৎপন্নমতি শৌল মাছের মতো দুশ্চিন্তায় থাকে—জীবন-সংশয় প্রাপ্ত হয়। সে চেষ্টা করলে জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে। আর যে ব্যক্তি দীর্ঘসূত্রী শৌল মাছের মতো, তার জীবন বিনষ্ট হয়। সে কোন কালেও উন্নতি করতে পারে না।

[মহাভারত, শান্তিপর্ব অবলম্বনে।]

পুস্তক সমালোচনা

বিবেকানন্দের সাধনা—দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। প্রকাশক: পুঁথিপত্র, ৯ এ্যান্টনি বাগান লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯। পৃষ্ঠা ৫+১০৪, মূল্য: ১৫'০০.

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে অধুনা বহু চিন্তা-মূলক বই লেখা হচ্ছে: অনেক মনস্বী ও বিদগ্ধ লেখকই এই মহাজীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরছেন পাঠকসমাজের কাছে। স্বামীজী সম্বন্ধে মননশীল বইয়ের জগতে উল্লিখিত নিঃসন্দেহে এক শক্তিশালী সংযোজন।

বর্তমান ভারতবাসীর কাছে স্বামী বিবেকা-নন্দের পরিচয় শুধু একজন অধ্যাত্মজগতের শক্তিশালী পুরুষ হিসাবে নয়, প্রত্যুত ক্ষয়িষ্ণু দেশ ও সমাজকে নবরূপে গঠনের অন্যতম দিগ্‌নির্ণায়ক হিসাবে। তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভা স্বতই আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্ববাসীর গভীর বিস্ময় আকর্ষণ করে। একদিকে তাঁকে দেখি ধর্মজগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিল দার্শনিক মতবাদ ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপরিচিত পাশ্চাত্য শ্রোতাদের কাছে অতি সরলভাবে বোঝাতে, আবার অন্যদিকে তাঁকে দেখি বিশ্ব ইতিহাস ও সমাজ-ব্যবস্থার সবরকম বিবর্তন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বন্ধে বিদগ্ধ ও কুশলী মতামত দিতে। এক-দিকে দেখি, আমেরিকার মতো ভোগবহুল দেশে এই 'ঝঞ্ঝাসদৃশ হিন্দু' সপ্তাহে ১৪টি বক্তৃতা করেও দেশকালের সীমা হারিয়ে সমাধিস্থ হচ্ছেন, আবার অন্যদিকে দেখি ভারতে লেখা চিঠিপত্রে সঙ্ঘ কিভাবে চালাতে হবে তার খুঁটিনাটি নির্দেশ, বাংলা ও ইংরেজী পত্রিকার জন্য লেখা পাঠানো

এবং সমাজের বিভিন্ন খারাপ দিক তুলে ধরে তীক্ষ্ণ শ্লেষের সঙ্গে সেখান থেকে উত্তরণের পথ-নির্দেশ দিচ্ছেন। একই সত্তায় একই কালে সত্ত্ব-গুণ ও রজোগুণের এই চরম উৎকর্ষ জগতের ইতিহাসে আগে দেখা যায়নি। চিন্তাশীল লেখক বিবেকানন্দ-জীবনের এই মূলসুরটি ঠিক ধরেছেন এবং এই মূলসুরকে কেন্দ্র করেই তিনি অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে তাঁর বিশ্লেষণী মনোভাব নিয়ে স্বামীজীর জীবনের বহুমুখিতার আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন: "বিবেকানন্দের মহাজীবন আলোচনায় তাঁর ধ্যানস্তব্ধ এবং কর্মচঞ্চল যুগল রূপই লেখকের সমীক্ষার বিষয় হওয়া উচিত—এই উভয়রূপেই বিবেকানন্দের জীবনসাধনা সার্থক।" (পৃঃ ৪৩)

বিগত কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও আলোচনা-সভায় স্বামীজীর বক্তৃতা ও পত্রাবলীর কিছু কিছু অংশ বিক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরে তাঁকে একজন প্রতিভাবান সমাজতন্ত্রবাদী প্রমাণ করার জন্য বুদ্ধিজীবিমহলে একটা প্রবণতা দেখা গেছে। দেশবাসীর চরম দুরবস্থা ও দুঃখ-দারিদ্র্য দেখে তিনি মাঝে মাঝে জ্বালাময়ী ভাষায় সমাজতন্ত্রবাদের হয়ে কিছু বক্তৃতাদি দিয়েছেন। কিন্তু বিবেকানন্দের জীবনদর্শন জানতে হলে তাঁর সমগ্র জীবন ও কাথাবলীর মূলসুরটি বুঝতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দের প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ এবং তাঁর সমগ্র রচনাবলী ভাল করে পড়লে দেখা যাবে, উপনিষদ্-কথিত সুউচ্চ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে কেন্দ্র করেই তাঁর সবরকমের কর্ম আবর্তিত হয়েছে। এই মূলসুরকে বাদ দিলে তাঁর সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা-গবেষণা ভুলপথে যেতে বাধ্য। শিক্ষাজগতে বহু অভিজ্ঞ লেখকের দৃষ্টি এদিকে যথেষ্ট সজাগ। তিনি লিখেছেন: "যে অনির্বাণ অধ্যাত্মতৃষ্ণা স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্যজীবন ও কর্মকে সর্বযুগের মানব-মাহাত্ম্যের একটি উচ্চ সীমায় উন্নীত করেছে, সে মহামানবকেও রাজনৈতিক তত্ত্বানুযায়ী সোশ্যালিস্ট প্রমাণ করবার জন্য ইদানীং সংস্কৃতিমন্য বাঙালী লেখকমহলে উদ্যমের অন্ত নেই।" (পৃঃ ৪২)

চব্বিশ পৃষ্ঠায় লেখক লিখছেন: "সাধারণত স্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগী মহলে জাতি ধর্ম শ্রেণী বর্ণ নির্বিশেষে ব্রহ্মবোধে জীবসেবাকেই বিবেকানন্দের ধর্ম উপলব্ধির শ্রেষ্ঠতম বিকাশ বলে মনে করা হয়।" একটু পরেই আবার লিখছেন: "আমাদের মনে হয়, স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম-ভাবনার মহত্তম পরিণতি হল মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য, শক্তি ও বীর্যের অনুভব—যে অনুভবের সাহায্যে মানুষ জীবনে দুঃসাধ্য কর্মকেও সহজ করে তুলতে পারে।" প্রকৃতপক্ষে এই দুটি বক্তব্যের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। একটি লক্ষ্য আর একটি সেই লক্ষ্যে যাওয়ার উপায়। ঈশ্বরের অনন্ত ভাবগুলি নিজের মধ্যে অনুভব করা হচ্ছে লক্ষ্য, আর ব্রহ্মবোধে জীবসেবা হচ্ছে তার উপায়। ঈশ্বরবুদ্ধিতে মানুষের সেবা করলে তা আর মানুষের সেবা হয় না,—হয় ঈশ্বরের পূজা, ঈশ্বরের চিন্তা—তাঁর ধ্যান। দীর্ঘ-কাল এইভাবে সেবা করলে নিজের মনের আবরণ, যা তাকে ক্ষুদ্র মানুষ বলে মনে করাচ্ছে এবং তার অসীম, অনন্ত শক্তির বিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করছে, তা দূর হয়ে যায়। শাস্ত্রের ভাষায়, চিত্তের রজঃ-তমোগুণরূপ মলিনতা চলে গিয়ে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি ঘটে, আর তখন সেই স্বচ্ছচিত্তে ব্রহ্মচৈতন্যের যথার্থ প্রতিফলন পড়ে। যুগাচার্য বিবেকানন্দ এ-যুগের সহজতম উপায়টির কথা তাই বলেছেন 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' এবং বলেছেন এই উপায়েই বেদান্ত, যা এতদিন গিরিগুহায়, অরণ্যে মুনিঋষিদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তাকে প্রাত্যহিক জীবনে কাজে লাগানো যাবে। স্বামী

বিবেকানন্দের বিখ্যাত বক্তৃতামালা 'কার্যে পরিণত বেদান্ত' এরই ভিত্তিতে প্রদত্ত।

তেরোটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই বইয়ে লেখক বিবেকানন্দ-মনীষাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ও আলোচনা করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে স্বামীজীর আবির্ভাবের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পটভূমিকা—খুবই মনোজ্ঞ ও তথ্যসমৃদ্ধ হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বিবেকানন্দের সকল শিক্ষার উৎস যে শ্রীরামকৃষ্ণ—তা তিনি ঠিকই বুঝেছেন এবং যুক্তি বিচারের সাহায্যে সেটি তুলে ধরেছেন। পঞ্চম অধ্যায় এই বইয়ের সব থেকে উল্লেখযোগ্য অধ্যায় ; এই অধ্যায়ে স্বামী বিবেকানন্দের সাধনার প্রকৃত রূপ, তাঁর জীবনসাধনাকে কালজয়ী করার পিছনে ক্রিয়াশীল শক্তিগুলির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, তাঁর স্বদেশপ্রেমের মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য এবং পাশ্চাত্যবাসীর কাছে তাঁর পবিত্র আধ্যাত্মিক ভাবের স্ফুরণ প্রভৃতি আলোচনাগুলিতে লেখক তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় (১০ ডিসেম্বর, ১৯৮৫) শ্রীনারায়ণ চৌধুরী গ্রন্থটির এক সমালোচনা করেছেন যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

তিনি শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথের উক্ত গ্রন্থটির ভিতরে কতকগুলি অপূর্ণতা পেয়েছেন। তিনি লিখেছেন : "বিবেকানন্দের সবচেয়ে বিচারবিভ্রম এই হয়েছিল যে, তিনি কর্মের ভূমি ত্যাগ করে ধর্মের ভূমি আশ্রয় করলেন···।" বস্তুতঃ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে প্রায় সুদীর্ঘ নবছর কর্মের ভূমি প্রস্তুত করার জন্যই আমেরিকাতে এবং ভারতবর্ষে প্রভূত চেষ্টা করেছিলেন এবং এই কঠোর পরিশ্রমের ফলে হৃতস্বাস্থ্য ও রোগজীর্ণ অবস্থায় মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর দেহান্ত ঘটে। যদিও সন্ন্যাসিসঙ্ঘের পত্তন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবই করেছিলেন, কিন্তু এই সঙ্ঘকে সুদৃঢ় ভিত্তিভূমিতে স্থাপন করে তিনি একদল কর্মী গঠন করেছিলেন যাঁরা তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদত্ত শিক্ষার প্রচারের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারেন। তাঁর জীবিতকালেই ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে 'আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো মেধাবী' যুবকরা এই সঙ্ঘে যোগ দিতে থাকেন। সে-সময় তাঁদের সংখ্যা ছিল সীমিত ; কিন্তু আজ তাঁর দেহত্যাগের মাত্র তিরাশী বছর পরে নানাবিধ মতবাদ থাকা সত্ত্বেও সারা পৃথিবীর প্রায় বারোশ যুবক সর্বস্ব ত্যাগ করে তাঁর ভাবপ্রচারে জীবন উৎসর্গ করেছেন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে, তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন যাতে সন্ন্যাসী ছাড়াও রামকৃষ্ণবিবেকানন্দ ভাবানুসারী গৃহস্থরাও মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে তাঁদের জীবন নিয়োজিত করতে পারেন। গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়ের দ্বারা গঠিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন এই দুইটি প্রতিষ্ঠান এখনও পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে রামকৃষ্ণবিবেকানন্দ ভাবধারার প্রচারকে অব্যাহত রেখেছে এবং বর্তমান বিশ্বের ধ্বংসাত্মক ও সর্বনাশা রাজনীতি যা মানবসভ্যতাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে, সেই পটভূমিকায় বিবদমান দেশগুলির মধ্যে শান্তি, কল্যাণ ও মানবসেবার বার্তা বহন করে 'এক জগৎ' (one-world) প্রস্তুতির পক্ষে কাজ করে চলেছে। এ-কথা কেবলমাত্র আমাদের কথা নয়,—এ-যুগের সর্বাপেক্ষা বিদগ্ধ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি বলছেন :

"In the present age, the world has been united on the material plane by Western technology. But this Western skill has not only 'annihilated distance', it has armed the peoples of the world with weapons of devastating power at

a time when they have been brought to point-blank range of each other without yet having learnt to know and love each other. At this supremely dangerous moment in human history, the only way of salvation for mankind is an Indian way. The Emperor Asoka's and the Mahatma Gandhi's principle of non-violence and Sri Ramakrishna's testimony to the harmony of religions: here we have the attitude and the spirit that can make it possible for the human race to grow together into a single family—and, in the Atomic Age, this is the only alternative to destroying ourselves."

এখানে আমরা আর্নল্ড টয়েনবিকেও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা উল্লেখ করতে দেখছি। শ্রীচৌধুরী ধর্ম সম্পর্কে অনীহা দেখিয়েছেন এবং বলেছেন : "এখন ধর্মের ভূমিকা হয়ে পড়েছে নিতান্ত অনুৎপাদক এবং প্রতিক্রিয়ার হাত শক্ত করার একটা সুবিধাজনক প্রকরণ।" আমরা জানি যে, সমগ্র বিশ্বের একটি মতবাদই ধর্মকে এভাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু শ্রীচৌধুরী এ-কথার দ্বারা ভারতবর্ষের কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসকে ভুলে গেলেন; বাস্তবিক পক্ষে ধর্ম যে কী, তা বোঝার মতো বুদ্ধির স্বচ্ছতা ও গভীরতা তাঁর আছে কিনা তাতেই সন্দেহ দেখা যাচ্ছে। ভারতবর্ষে ধর্ম বলতে নিশ্চয়ই শুধুমাত্র আচার-ব্যবহার (doctrine and dogma) বোঝায় না; আচার-ব্যবহারসর্বস্ব যে ধর্ম সেই ধর্ম স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের ভিতর দিয়ে সমাজ পরিচালনায় সাহায্য করেছে,—কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ যে-ধর্মের কথা বলেছেন, তা প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর। তিনি বলেছেন, ধর্ম কেবলমাত্র প্রচারের বস্তু নয়, অনুভূতির বস্তু। সেজন্য উপনিষদের যুগ থেকেই ভারতবর্ষে ধর্ম সম্পর্কে সর্বোচ্চ কথা হচ্ছে—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো"—এই আত্মাকে জানতে হবে—নিজের স্বরূপ অর্থাৎ 'প্রকৃত আমি কি' তা জানতে হবে; আর তার উপায় হচ্ছে—এর সম্বন্ধে ঠিকমত শোনা, গভীরভাবে চিন্তা করা এবং সমগ্র মন দিয়ে ধ্যান করে যাওয়া।

ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার সর্বশেষ কথা হচ্ছে, প্রতি জীবের ভিতর ভগবানকে দেখা। স্বামী বিবেকানন্দ এই বাণীকে, এই কর্মে পরিণত অদ্বৈতকে লোকের ঘরে ঘরে গিয়ে প্রচার করতে বলেছেন। কিন্তু এজন্য তিনি কোনও ধর্ম-প্রচেষ্টাকে নিন্দা করেননি; পরন্তু আদিম সমাজের সর্পপূজা, বৃক্ষপূজা থেকে শুরু করে হিন্দুধর্মের সকল শাখার উৎকৃষ্ট উপাসনা-পদ্ধতি, এমনকি ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের উপাসকদেরও ধীরে ধীরে এই কর্মে পরিণত অদ্বৈতবাদে আকৃষ্ট করানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। শ্রীচৌধুরী ধর্মকে দেখেছেন পাশ্চাত্য 'রিলিজিয়নের' দৃষ্টিতে,—কিন্তু ধর্ম আর 'রিলিজিয়ন' সমার্থক শব্দ নয়। তিনি বস্তুবাদী,—কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সেই বস্তুই এখন শক্তিতে পরিণত,—যা তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। আবার সময়ের সাথে সাথে সেই শক্তি কিসে পরিণত হবে এবং তা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে এক তত্ত্বের সৃষ্টি করবে না তা কে বলতে পারে?

শ্রীচৌধুরী ঊনবিংশ শতাব্দীর এক ব্যক্তির ভাবধারা গ্রহণ করে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন; কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, সেই ব্যক্তি নিজেই তাঁর ভাবধারাকে কার্যে রূপায়িত করতে পারেননি। শ্রীচৌধুরীর কাছে নিবেদন এই

যে, তিনি ভারতবর্ষের সমগ্র চিন্তাস্রোতের যে উৎস সেই বেদান্তশাস্ত্র ভাল করে পড়ুন, ধর্মের উদ্দেশ্য কী তা জানুন এবং স্বামী বিবেকানন্দকে আর একটু বুঝতে চেষ্টা করুন তাঁর সমগ্র গ্রন্থাবলী ভাল করে পাঠ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মার্ক্স বা বিংশ শতাব্দীর লেনিন নিজেরা আর কতটা কাজ করে গেছেন! কিন্তু তাঁদের কাজের গতিবেগ এখনও চলছে। স্বামী বিবেকানন্দ সেরকম জগতে ভাবরাশি দিয়ে গেছেন যার গতিবেগ উত্তরোত্তর বাড়ছে। কিছুদিন আগে রাশিয়ার এক বিখ্যাত ব্যক্তি বেলুড় মঠে এসে আমাদের বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম ভাবধারা তাঁদের দেশে প্রচারিত ও প্রসারিত হচ্ছে এবং জনসমাজের মধ্যে তাঁর রচনা খুবই জনপ্রিয় হচ্ছে। তিনি আমাদের আরও বলেন যে, রামকৃষ্ণ মিশন বছরে যেন অন্ততঃ একজন প্রতিভূকে ঐ দেশে উক্ত ভাবধারা প্রচারের জন্য পাঠান। অতএব, ভারতবর্ষের যাঁরা ঐসব মতের ধারক ও বাহক, তাঁরা জগতের অন্যান্য দেশের অনুরূপ মতবাদের ধারক ও বাহকদের চিন্তার ও ভাবের পরিবর্তন গ্রহণ না করে কতকগুলি বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে পড়ে আছেন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত মতবাদ স্থিতাবস্থার সংরক্ষক নয়, কায়েমী স্বার্থের পোষক নয় এবং রক্ষণশীলও নয়। শ্রীচৌধুরী এই আন্দোলনকে বলেছেন, একটি 'সেক্ট' (Sect), কিন্তু মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলে তিনি বুঝতে পারবেন এটি 'সেক্ট' বটে, কিন্তু নন্‌ সেক্টেরিয়ান্‌ সেক্ট (Non-sectarian Sect)। তাঁরা কাউকে বাদ দিচ্ছেন না সকলকে গ্রহণ করছেন এবং এভাবে ভারতের অধ্যাত্মসাধনার চরম অবস্থা অদ্বৈতভূমিতে সকলকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন; আর অদ্বৈতভাবকে অবলম্বন করে প্রতি মানুষের অন্তরে একই ভগবান আছেন,—এভাবে পৃথিবীর সব মানুষকে সেবাধর্মে নিয়োজিত করতে চাচ্ছেন।

শ্রীচৌধুরী আরও লিখেছেন: "বিবেকানন্দের যদি রাজনীতিতে এতই অনীহা তবে তিনি একজন সুনাগরিক তথা 'পাব্‌লিক ম্যান' হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে…।" এই উক্তিতে শ্রীচৌধুরীর স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অন্ধতাই প্রকাশিত হচ্ছে। নিজের দেশ সম্পর্কে এবং এই দেশের লোকদের অধ্যাত্মচর্চাকে জীবনের আদর্শ করার হেতু সম্পর্কে না জেনে বিদেশাগত কতকগুলি মতবাদকে যা সে-সব দেশেও পরিবর্তিত হয়ে নূতনরূপে অধ্যাত্মচিন্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করছে তা না দেখে, সেই পুরাতাত্ত্বিক মতবাদকে আঁকড়ে ধরে থাকা শিশুসুলভ মনোভাবের প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

পরিশেষে, উল্লিখিত গ্রন্থের আলোচনায় ফিরে এসে বলতে হয় যে, একটি স্বল্পপরিসর গ্রন্থে স্বামীজীর চরিত্রের এতগুলি দিক নিয়ে যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করার কৃতিত্বের জন্য গ্রন্থকার সত্য-সত্যই প্রশংসার দাবী রাখেন। লেখক যে উদ্দেশ্যে এই মূল্যবান গ্রন্থটি রচনা করেছেন তা নিশ্চয়ই সার্থক হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে উত্তরসূরী লেখকদের কাছে এই তথ্যপূর্ণ বইটি পথপ্রদর্শকের কাজ করবে। আমরা বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

—স্বামী পরাশরানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

অন্ধ্রপ্রদেশে অগ্নিত্রাণ : বিশাখাপতনম্ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মাধ্যমে ভাইজাগ্ জেলার মহারানীপেটায় একটি জেলে-কলোনীতে অগ্নি-বিধ্বস্ত লোকদের মধ্যে ১৫৬টি তুলার কম্বল এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য জামা-কাপড় বিতরণ করা হয়।

শ্রীলঙ্কা শরণার্থিত্রাণ : মাদ্রাজ ত্যাগ-রাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম শ্রীলঙ্কা থেকে তিরুচি ও মন্দাপম্ শিবিরে আগত শরণার্থীদের মধ্যে ৩৪৬টি তুলার কম্বল, ৮টি উলের কম্বল, ১০টি বালিশ, ৮টি হোল্ডল, ৮ সেট উলের পোশাক (একটি উলের সোয়েটার, একটি শাল, একটি ওড়না চাদর ও একটি ফতুয়া নিয়ে প্রতিটি সেট), ২০ সেট বই, নোট বই, পেন ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। এছাড়া, আরও তিনটি শিবিরে আগত ৮৭৩০, ৪৬২৫ ও ৩০৩৭৫ জনকে দুধ, বান্‌রুটি ও সুন্দল (জলখাবার) দেওয়া হয়।

সূর্যতাপ নিয়ন্ত্রিত জলপ্রকল্পের উদ্বোধন

গত ২২ নভেম্বর ১৯৮৫, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রমে ৫০০০ লিটার ক্ষমতা-সম্পন্ন একটি 'সূর্যতাপ নিয়ন্ত্রিত জলপ্রকল্প' (Solar water system) উদ্বোধন করেন।

গ্রন্থ-প্রকাশ

নিউ দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১ ডিসেম্বর, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ 'এন্‌লাইটেনড্ সিটিজেনশিপ্' নামক গ্রন্থের প্রকাশ ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি লোকসভার সভাপতি শ্রীবলরাম ঝাকরকে প্রথম কপিটি দেওয়া হয়। ভাষণ দেন দিল্লী মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের কমিশনার শ্রী পি. পি. শ্রীবাস্তব।

ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন

মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল অধ্যাপক কে. এম. চণ্ডি গত ৭ ডিসেম্বর ১৯৮৫, নারায়ণপুরে অবুঝ্‌মার পল্লী-উন্নয়ন-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত একটি বিপণিকেন্দ্রের শিলান্যাস করেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ গত ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫, নারায়ণপুরস্থ অবুঝ্‌মার-পরিকল্পনার বাসভবনের প্রথম ইউনিটটির উদ্বোধন এবং সাধুনিবাসের শিলান্যাস করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

গত ২০ ডিসেম্বর ১৯৮৫ ও ৬ জানুআরি ১৯৮৬, যথাক্রমে স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ ও স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর স্বামী সত্যব্রতানন্দ তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-উৎসব : গত ১৯ পৌষ (৩ জানুআরি ১৯৮৫), শুক্রবার, 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'-তে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীর ১৩৩তম আবির্ভাব-তিথি এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে সাড়ম্বরে পালিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভজনগান প্রভৃতি হয়। ভোরে মঙ্গলারতির পর থেকে রাত প্রায় নটা পর্যন্ত অগণিত ভক্ত নরনারী মাতৃচরণে প্রণাম জানাতে আসেন। সকলকে মায়ের প্রসাদ দেওয়া হয়।

সকাল ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত 'সারদানন্দ হলে' শ্রীসমরকুমার মণ্ডলের পরিচালনায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা ভজন সুধা" পরিবেশিত হয়। সন্ধ্যারতির পর করুণাময়ী আশ্রম "রামকৃষ্ণ-সারদা লীলাগীতি" পরিবেশন করে।

খ্রীষ্টোৎসব : গত ২৪ ডিসেম্বর ১৯৮৫, 'সারদানন্দ হলে' ভগবান্ যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের প্রাক্সন্ধ্যা উদ্‌যাপিত হয়। তাঁর প্রতিকৃতির সামনে আরতি করা হয়। স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক যীশুখ্রীষ্টের জীবনী আলোচনার পর ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা : সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী বিকাশানন্দ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

দেহত্যাগ

স্বামী বিমলানন্দ (মাধবন্ মহারাজ) গত ১৯ ডিসেম্বর ১৯৮৫, বিকাল ৫-৩০ মিনিটে মূত্রগ্রন্থির ক্রিয়া বন্ধ হয়ে অম্লাধিক্য রোগসৃষ্টির ফলে ত্রিবান্দ্রম্ রামকৃষ্ণ আশ্রম হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বৎসর। প্রস্রাব বন্ধ হয়ে নানা উপসর্গের সৃষ্টি হওয়ায় গত ৬ অগস্ট তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি দীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিরুভাল্লা রামকৃষ্ণ আশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৩৯-তে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিরুভাল্লা আশ্রম ছাড়াও তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের রেঙ্গুন, ত্রিবান্দ্রম্ ও ম্যাঙ্গালোর আশ্রমে বিভিন্ন সময়ে নিযুক্ত ছিলেন। কয়েক বৎসর তিনি 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। বহু সন্ন্যাসী ও ভক্ত তাঁর কাছে পেতেন শাস্ত্রীয় ও আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সরল সুন্দর মীমাংসা। সহজ সরল ব্যবহারের জন্য তিনি অনেকের প্রিয় ছিলেন।

তাঁর দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে চিরশান্তি লাভ করুক—এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

সংবাদ

শিশুদের শান্তি-সম্মেলন

গত ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৫, নিউইয়র্কে সোভিয়েট রাশিয়া এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিশুদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই দুই পরমাণু-শক্তিধর দেশের মধ্যে যুদ্ধের প্রতিরোধকল্পে তারা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবটি হল—স্কুলের ছুটিতে তারা একে অপরের দেশে গিয়ে ভাবের দাদান-প্রদান করবে। এই অনুসারে তারা দুই দেশের প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভ ও রেগনকে চিঠি দিয়ে জানায় যে, আগামী গ্রীষ্মের ছুটিতে ২৫ জন আমেরিকান শিশু রাশিয়ায় এবং ২৫ জন রাশিয়ান শিশু আমেরিকায় গিয়ে থাকবে। এইভাবে এমন একদিন আসবে যখন হাজার হাজার রাশিয়ান শিশু আমেরিকায় এবং আমেরিকান শিশু রাশিয়ায় থাকবে। তারা আরও বলে, 'কেউ চায় না তাদের নিজেদের শিশুকে হত্যা করতে।' ভাষা আলাদা হলেও তারা পরস্পর ভাব-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে শান্তিতে ও বন্ধুত্বের মধ্যে বাস করতে চায়।

১৯৮৬—বিশ্বশান্তি বর্ষ

রাষ্ট্রসঙ্ঘের (U. N. O.) মহাসচিব জাভিয়ের পেরেজ দ্য কুয়েলার ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দকে আন্তর্জাতিক শান্তিবর্ষ হিসাবে ঘোষণা করেছেন। পরমাণু যুদ্ধের উদ্বেগজনক সন্ধিক্ষণে এই ঘোষণা নিঃসন্দেহে বিশ্ববাসীর কাছে এক আনন্দের সংবাদ। কুয়েলার বলেন—পরমাণু যুদ্ধ ও সামরিক অস্ত্র-প্রতিযোগিতাই একমাত্র সমস্যা নয়, পরন্তু দারিদ্র্য, জরা, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতিরও মোকাবিলা করতে হবে। শান্তিবর্ষের এই ঘোষণা জনকল্যাণমূলক বহু সরকারী ও বে-সরকারী সংস্থার কাছে শান্তির সমস্যা-সমাধানে নতুন আলোকপাত করতে সাহায্য করবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা

আরারিয়া (বিহার) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গত ২৬ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর ১৯৮৫, ছয়দিনব্যাপী এক আনন্দ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ, আলোচনা, চলচ্চিত্র-প্রদর্শন, রামায়ণ গান, নরনারায়ণ-সেবা প্রভৃতি হয়। মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী ঋদ্ধানন্দ।

উদ্বোধন : ফাল্গুন ১৩৯২

সূচীপত্র

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

[উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন]

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

কর্মযোগ	৫·৯০	ধর্ম-সমীক্ষা	৫·০০
ভক্তিযোগ	৪·৫০	ধর্মবিজ্ঞান	৫·৫০
ভক্তি-রহস্য	৫·০০	বেদান্তের আলোকে	৪·৫০
জ্ঞানযোগ	১৪·০০	কথোপকথন	৫·০০
	১০·০০	ভারতে বিবেকানন্দ	২০·০০
সরল রাজযোগ	১·৮০	দেববাণী	৮·০০
সন্ন্যাসীর গীতি	০·৮০	মদীয় আচার্যদেব	২·৫০
ঈশদূত যীশুখৃষ্ট	১·০০	চিকাগো বক্তৃতা	২·২?
পত্রাবলী। (সমগ্র পত্র একত্রে, নির্দেশিকাদি সহ) রেক্সিন বাঁধাই	৩০·০০	মহাপুরুষপ্রসঙ্গ	১২·০০
পওহারী বাবা	১·২৫	ভারতীয় নারী	৫·০০
স্বামীজীর আহ্বান	১·২৫	ভারতের পুনর্গঠন	২·৫০
বাণী-সঙ্কলন	১২·০০	শিক্ষা (অনূদিত)	৪·২০
জাগো, যুবশক্তি	৫·০০	শিক্ষাপ্রসঙ্গ	৮·০০

স্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচনা

পরিব্রাজক	৪·২৫	ভাববার কথা	২·৩০
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য	৫·০০	বর্তমান ভারত	২·৫০

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণ। প্রতি খণ্ড—২৫৲ টাকা। সম্পূর্ণ সেট ২৫০৲ টাকা

সাধারণ বাঁধাই সুলভ সংস্করণ। প্রতি খণ্ড—১৭·৫০ টাকা। সম্পূর্ণ সেট ১৭৫৲ টাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

স্বামী সারদানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (দুই ভাগে)

রেক্সিন-বাঁধাই। ১ম ভাগ ৩৫·০০, ২য় ভাগ ৩০·০০

সাধারণ (পাঁচ খণ্ডে)

১ম খণ্ড ৬·০০, ২য় খণ্ড ১৩·৫০, ৩য় খণ্ড ৯·৫০,

৪র্থ খণ্ড ৯·৫০, ৫ম খণ্ড ১৪·৫০

অক্ষয়কুমার সেন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি ২৫·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা ৫·৫০

স্বামী প্রেমঘনানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প ৪·০০

শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ১·৫০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র) ৫·৫০

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বাণী ·৭৫

স্বামী তেজসানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী ৯·০০

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংকলিত
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ
সাধারণ বাঁধাই ৩.০০, বোর্ড ৩.৫০

স্বামী ভূতেশানন্দ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ (তিন ভাগে)
১ম ভাগ ১০.০০, ২য় ভাগ ১২.৫০, ৩য় ভাগ ১০.০০

স্বামী নির্বেদানন্দ
(অনুবাদ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)
শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ ১২.৫০

স্বামী প্রভানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা ১৫.০০

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা (দুই ভাগে)
১ম ভাগ ১৫.০০, ২য় ভাগ ১৫.০০

স্বামী গম্ভীরানন্দ
শ্রীমা সারদাদেবী ২৭.০০

স্বামী সারদেশানন্দ
শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা ১০.০০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
শিশুদের মা সারদাদেবী (সচিত্র) ৭.০

স্বামী ঈশানানন্দ
মাতৃসান্নিধ্যে ৯.৫০

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

স্বামী গম্ভীরানন্দ
যুগনায়ক বিবেকানন্দ (তিন খণ্ড)
১ম খণ্ড ৩০.০০, ২য় খণ্ড (যন্ত্রস্থ)
৩য় খণ্ড ১৮.০০

ভগিনী নিবেদিতা (অনুবাদ : স্বামী মাধবানন্দ
স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি ১৬.০০

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ১০.০০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
স্বামী বিবেকানন্দ
শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র) ৫.৫০

স্বামী নিরাময়ানন্দ
ছোটদের বিবেকানন্দ ২.৫০

শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য
স্বামী বিবেকানন্দ ২.৫০

স্বামী বুধানন্দ
ওঠ, জাগো, এগিয়ে চল ৪.২৫
ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর ১.৫০
স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা ৩.৫০

ভগিনী নিবেদিতা
স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ৫.০০

প্রমথনাথ বসু
স্বামী বিবেকানন্দ
১ম খণ্ড ২০.০০, ২য় খণ্ড ২০.০

বিবিধ

মহাপুরুষজীর পত্রাবলী ৭.৫০
স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র ৭.৮০
স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী ৪.৫০
আরত্রিক-স্তব ও রামনাম ১.৫০
ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ৬.০০

স্বামী গম্ভীরানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা (দুই ভাগে)
১ম ভাগ ২০.০০, ২য় ভাগ ১৫.০০

স্বামী সারদানন্দ
ভারতে শক্তিপূজা ৪.০০

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ
শ্রীরামানুজ চরিত ১৭.৫০

স্বামী প্রেমেশানন্দ
রামানুজ চরিত ৩.৫০

ভগিনী নিবেদিতা
শিব ও বুদ্ধ ৫.৫০

স্বামী অপূর্বানন্দ
আচার্য শঙ্কর ৮.০০
শিবানন্দ-বাণী (সঙ্কলিত)
১ম ভাগ ৯.০০, ২য় ভাগ ৫.

গোপালের মা ২'২৫
গীতাতত্ত্ব ৭'০০
পত্রমালা ৪'০০
বিবিধ-প্রসঙ্গ ৩'৫০

স্বামী অখণ্ডানন্দ
তিব্বতের পথে হিমালয়ে ৬'৫০
স্মৃতি-কথা ১০'০০

শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়
লাটুমহারাজের স্মৃতিকথা ২০'০০

স্বামী সিদ্ধানন্দ সংগৃহীত
সৎকথা ১০'০০
অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ ৭'৫০

স্বামী বিরজানন্দ
পরমার্থ-প্রসঙ্গ ৪'৫০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
মহাভারতের গল্প ৪'৫০

স্বামী দেবানন্দ
ব্রহ্মানন্দ স্মৃতিকণা ১'৭৫

স্বামী বামদেবানন্দ
সাধক রামপ্রসাদ ৬'০০

স্বামী পরমানন্দ
প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা ২৪'০০

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
সাধু নাগমহাশয় ৬'০০

স্বামী নিরাময়ানন্দ-সম্পাদিত
স্বামী শুদ্ধানন্দ : জীবনী ও রচনা ১৫'০০

শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য
শঙ্কর-চরিত ৩'০০
দশাবতার চরিত ৫'০০

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ
দিব্যপ্রসঙ্গে ৬'৩৫

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ
পুণ্যস্মৃতি ৬'০০

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ
অতীতের স্মৃতি ২০'০০
বন্দি তোমায় ১০'০০

স্বামী নরোত্তমানন্দ
রাজা মহারাজ ৭'০০

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
ভগবানলাভের পথ ১'৫০
মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্য ৩'০০

স্বামী প্রভানন্দ
ব্রহ্মানন্দচরিত ৩০'০০

স্বামী অন্নদানন্দ
স্বামী অখণ্ডানন্দ ১৬'০০

স্বামী নিরাময়ানন্দ
স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয় ৩'৩০

স্বামী ধ্যানানন্দ
ধ্যান ৩'৫০

স্বামী তেজসানন্দ
ভগিনী নিবেদিতা ৪'৪০

স্বামী অপূর্বানন্দ
মহাপুরুষ শিবানন্দ ১৫'০০

সংস্কৃত

শ্রীরামকৃষ্ণপূজাপদ্ধতি ২'২৫

স্বামী গম্ভীরানন্দ-অনূদিত ও সম্পাদিত
উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (তিন ভাগে)
১ম ভাগ ১৮'০০, ২য় ভাগ ১৮'০০,
৩য় ভাগ ১৮'০০
স্তবকুসুমাঞ্জলি ১৫'০০

স্বামী রঘুবরানন্দ-অনূদিত ও সম্পাদিত
গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা ৩'০০

স্বামী ধীরেশানন্দ-অনূদিত ও সম্পাদিত
যোগবাসিষ্ঠসারঃ ১২'৫০
বৈরাগ্যশতকম্ ১১'০০
বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা ৯'৫০

স্বামী জগদানন্দ অনূদিত
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ ১৭'৫০

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত ও সম্পাদিত
শ্রীশ্রীচণ্ডী ১৪'০০
গীতা ১৫'৫০

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত
বেদান্তদর্শন
১ম অধ্যায়ের ১ম খণ্ড ১৪'০০; ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ খণ্ড ৩'০০; ৩য় অধ্যায় ১৩'০০; ৪র্থ অধ্যায় ৯'০০

স্বামী প্রভবানন্দ
নারদীয় ভক্তিসূত্র ১১'০০

৮৮তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ফাল্গুন, ১৩৯২

দিব্য বাণী

…এই মহাযুগের প্রত্যূষে সর্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্ত ভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্মে নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চনিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে।

এই নবযুগধর্ম সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান এবং এই নবযুগধর্ম-প্রবর্তক শ্রীভগবান্ পূর্বগ শ্রীযুগধর্মপ্রবর্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর ও ধারণ কর।

মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গতরাত্রি পুনর্বার আসে না। বিগতোচ্ছ্বাস সে রূপ আর প্রদর্শন করে না। জীব দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি। লুপ্ত পন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে সদ্যোনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান্, বুঝিয়া লও।

যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্তব্যাপী প্রতিধ্বনি জাগরিত হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর; এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্বলতা ও দাসজাতি-সুলভ ঈর্ষাদ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র-পরিবর্তনের সহায়তা কর।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬]

কথাপ্রসঙ্গে

সমন্বয়: রামকৃষ্ণ
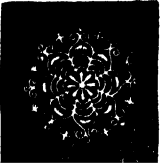
ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, তত্ত্বান্বেষী নারদ আত্মবিদ্যা লাভের পথনির্দেশ জানিবার জন্য মহর্ষি সনৎকুমার-সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন: আমি ঋগ্বেদাদি চতুর্বেদ, ইতিহাস-পুরাণ, ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও অন্যান্য সকল শাস্ত্র, সর্পবিদ্যা, ভূতবিদ্যা ইত্যাদি যাবতীয় বিদ্যা অবগত আছি। এত সব অবগত হইয়াও আমি শুধু মন্ত্রবিদ্‌ই হইয়াছি, আত্মবিদ্‌ হইতে পারি নাই। আপনি আমাকে সেই পথের সন্ধান দিন, যে পথ অবলম্বন করিলে আমি জীবনের পরম বস্তু আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিব। আত্মবিদ্‌ হইতে সক্ষম হইব। মহর্ষি সনৎকুমার তখন নারদকে পরম সত্য আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে ধাপে ধাপে উপদেশ দিতে দিতে শেষে বলিলেন: যাহা ভূমা তাহাতেই সুখ, অল্পে সুখ নাই। সত্যিকারের সুখ একমাত্র ভূমাতেই, তুমি সেই ভূমার অন্বেষণ কর।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার কৈশোর অবস্থাতেই এই ভূমার অন্বেষণে রত হইয়াছিলেন। তাই 'আমরা দেখিতে পাই, তিনি যখন কলিকাতায় তাঁহার ভ্রাতার চতুষ্পাঠীতে—যেদিন বিদ্যাশিক্ষায় অমনোযোগী হইবার জন্য অগ্রজ রামকুমারের তিরস্কার ও অনুযোগের উত্তরে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন, চালকলা-বাঁধা বিদ্যা আমি শিখিতে চাহি না, আমি এমন বিদ্যা শিখিতে চাহি যাহাতে জ্ঞানের উদয় হইয়া মানুষ বাস্তবিক কৃতার্থ হয়।' এই বয়সেই তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন—যে বিদ্যায় ভগবান লাভের সহায়তা হয় না, সে বিদ্যা—বিদ্যা নয়, অবিদ্যা।

'যাহাতে জ্ঞানের উদয় হইয়া মানুষ বাস্তবিক কৃতার্থ হয়'—সেই বিদ্যা শিক্ষালাভ করিবার সুযোগের জন্যও তাঁহাকে বেশিদিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই। সুযোগ আসিয়াছিল অতি অভাবনীয় ভাবেই। উপরি-উক্ত ঘটনার অল্পদিন পরেই দক্ষিণেশ্বরের নবনির্মিত কালীমন্দিরে যেন দৈব-নির্দিষ্ট হইয়াই তিনি প্রথমে দেবীর বেশকারী এবং পরে পূজকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বর-কালীমন্দির এবং মন্দির-উদ্যানকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সুদীর্ঘ দ্বাদশবর্ষব্যাপী বিচিত্র অধ্যাত্ম-সাধনার ইতিহাস তাঁহার জীবনী-পাঠকদের নিকট সুবিদিত। আধ্যাত্মিক সাধনেতিহাসে তাঁহার এই বিচিত্র সাধনার ইতিহাস একদিকে যেমন একটি অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা, অপর দিকে তেমনি অধ্যাত্ম পথের পথিকদের নিকট অনুপ্রেরণার একটি চির-উৎস।

আবাল্য সত্যানুসন্ধিৎসা, পবিত্রতা, একাগ্রতা ও অনন্যা-ভক্তির অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনলব্ধ উপলব্ধিতে উদ্‌ভাসিত হইয়াছিল: সব ধর্মই পরিণামে ঈশ্বরোপলব্ধির সেই এক পরম লক্ষ্যেই পৌঁছাইয়া দেয়। ধর্ম যত, ভগবানলাভের পথও তত। যত মত তত পথ। এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে—ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চ-নীচ, সকল জাতির স্ত্রী ও পুরুষ—সকলের মধ্যেই আছে দেবত্ব, বিরাজ করিতেছে সেই এক আত্মা। সকল বিভেদ কল্পিত এবং মানুষেরই সৃষ্ট। সমগ্র মানবসমাজ একই সত্তা।

'ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) বলিতেন: "ফুল ফুটিলেই ভ্রমর আপনি আসিয়া জুটে, তাহাকে

ডাকিয়া আনিতে হয় না।" তোমার ভিতরে ঈশ্বরভক্তি ও প্রেম যথার্থই বিকশিত হইলে যাহারা ঈশ্বরতত্ত্বের অনুসন্ধানে, সত্যলাভের জন্য জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন বা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে কি একটি অনির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক নিয়মের বশে তোমার নিকট আসিয়া জুটিবেনই জুটিবেন।' শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের জীবনেই ইহা প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন যতই বিকশিত হইতে লাগিল, দূরান্তিকের বিভিন্ন স্তরের ভগবদন্বেষী মানুষও ততই দলে দলে তাঁহার নিকট আসিয়া জুটিতে লাগিল। এইভাবে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের পূত সংস্পর্শে আসিলেন নানা সম্প্রদায়ের বহু সাধু-সন্ন্যাসী, ভগবদন্বেষী অগণিত ভক্ত নর-নারী, জুটিলেন ব্রাহ্মসমাজের নেতা মনীষী কেশব সেন, আচার্য বিজয়কৃষ্ণ ও অন্যান্য বহু ব্রাহ্মভক্ত, এবং নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ 'ইয়ং বেঙ্গলের দল'। শ্রীরামকৃষ্ণের পূত সংস্পর্শ ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রভাব তাঁহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব সাধন পথের আধ্যাত্মিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিল।

'ইয়ং বেঙ্গল দলের', বিশেষ করিয়া দলনেতা নরেন্দ্রনাথের শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে আগমন একটি যুগান্তরকারী ঘটনা। এই ঘটনার পরিধি যেমন বিস্তৃত, প্রভাবও তেমনি সুদূরপ্রসারী। কুশলী শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের তুলির সুনিপুণ স্পর্শ নরেন্দ্রনাথকে ধীরে ধীরে 'বিবেকানন্দে' রূপান্তরিত করিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-সূত্রের ভাষ্যকার এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা-প্রচারের প্রধান যন্ত্ররূপে পরবর্তী কালে জগৎ-সমক্ষে বিবেকানন্দের আত্মপ্রকাশের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই 'কুশলী শিল্পী'র তুলির সুনিপুণ স্পর্শের ছাপ সুস্পষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে উপলব্ধ সত্যগুলি তাঁহার অপরোক্ষ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কেন না, সত্য-নির্ধারণের অনুশাসনগুলি নিজ জীবনে অনুশীলন করিয়া তিনি ঐগুলি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, এবং আপনার আচরণের আলোকে ঐগুলির বাস্তব প্রয়োগ দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাধনোপলব্ধ সত্যগুলির বাস্তব প্রয়োগ স্বামীজী তাঁহার নিকট শিক্ষা করিয়া লৌকিক ভাষায় সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া মানব-সাধারণের নিকট প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনোপলব্ধ একটি অভিনব ভাবনা যাহা তিনি আমাদের মনে জাগাইয়াছেন, তাহা : যত্র জীব তত্র শিব; জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।

মানুষের ক্ষুধা দ্বিবিধ—দৈহিক ও পারমার্থিক। যদিও ইহা সত্য যে, পারমার্থিক ক্ষুধার নিবৃত্তিতেই সর্বপ্রকার ক্ষুধার নিবৃত্তি, তথাপি দেহের চাহিদাই প্রথম, ইহা অনস্বীকার্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনেও ইহা উপেক্ষিত হয় নাই। তাই তাঁহাকে বলিতে শোনা যায় 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।'

'মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ভগবানলাভ', 'ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু, আর সব অবস্তু',—শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রায়শঃ এই কথাগুলি বলিতে, এবং 'শ্রীমুখে ঈশ্বর কথা বই আর কিছুই নাই', 'মন সর্বদা অন্তর্মুখ', 'কখনও সমাধিস্থ', 'কখনও প্রাকৃত লোকের ন্যায় ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন'—অবস্থায় দেখিতেই আমরা অভ্যস্ত। সেই শ্রীরামকৃষ্ণকেই যখন বলিতে শোনা যায়—'খালি পেটে ধর্ম হয় না', কথাটি তখন কিছুটা বেমানান বলিয়াই মনে হয়। মনে হয়, কোথাও যেন কোন অসঙ্গতি আছে। মনে রাখিতে হইবে এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ একজন অত্যন্ত বাস্তববাদী। তিনি জানিতেন নিরন্নের নিকট ধর্মের কথা বলা অর্থহীন। আগে অন্নবস্ত্রের সংস্থান, ব্যবহারিক শিক্ষা দান, তারপর মানুষের মধ্যে যে দেবসত্তা আছে সে-সম্বন্ধে তাকে সচেতন করানো। তাই দেখি অন্নবস্ত্রাভাবে কাতর মানুষের দুঃখে শ্রীরামকৃষ্ণের কোমল হৃদয়

তাহাদের প্রতি করুণায় উদ্বেলিত হইতে। তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী মথুর দুঃখ-দারিদ্র্য-পীড়িত গ্রামবাসীদের এক মাথা করিয়া তেল, একখানা করিয়া কাপড় ও পেট ভরিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত তীর্থযাত্রা বাতিল করিয়া তিনি তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। আর একবার দুর্ভিক্ষপীড়িত, অন্নাভাবক্লিষ্ট, খাজানা দিতে অসমর্থ দরিদ্র প্রজাদের খাজানা মথুরকে দিয়া সেই বারের মতো মকুব করাইয়া দিয়াছিলেন।

আসলে সর্বভূতে যিনি ব্রহ্মদর্শন করিয়াছেন, ব্রহ্মে ও মানুষে যাঁহার নিকট কোন ভেদ নাই, তাঁহার পক্ষেই ক্ষুধা দুইটির মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ একদিকে যেমন নিরন্ন মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় কাতর, তাহাদের দুঃখ নিবারণের জন্য ভাবিত, অপরদিকে তেমনি মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সমভাবে সচেষ্ট। জীবনের উদ্দেশ্য কি—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুত কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় যখন বলিতেছেন: 'আমার মতে জগতের উপকার করা, জগতের দুঃখ দূর করা', তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিতেছেন: 'তুমি জগতের দুঃখ দূর করবে?…জগতের পতি যিনি তিনি সকলের খবর নিচ্ছেন। তাঁকে আগে জানা—এই জীবনের উদ্দেশ্য।' আবার তিনিই অন্য এক সময় শ্রীযুত মণি মল্লিক মহাশয়কে বলিয়াছিলেন: 'দেখ,… ওদের দেশে বড় জলকষ্ট। তুমি সেখানে একটা পুষ্করিণী কাটাও না কেন। তা'হলে কত লোকের উপকার হয়।' দৈহিক ক্ষুধার সঙ্গে পারমার্থিক ক্ষুধা নিবারণের সার্থক সমন্বয় বিধান!

যত্র জীব তত্র শিব, জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা—শ্রীরামকৃষ্ণ-উক্ত এই কথাগুলির সূত্র ধরিয়াই স্বামীজীর জগতের সম্মুখে একটি নূতন আদর্শ স্থাপন: 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—অর্থাৎ নিজের মুক্তি এবং জগতের হিতসাধন। ইহার ফলশ্রুতি: স্বামীজীর 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-রূপ কর্মযজ্ঞ ও পূজা-উপাসনার প্রবর্তন। ইহা দ্বারা পরোপকারাদি সকল কর্ম উপাসনার স্তরে উন্নীত হইবে। সেবাব্রতে কর্তার মনোভাব হইয়া উঠিবে আধ্যাত্মিক।

সব ধর্মই সত্য, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে—সকলের মধ্যেই আছে দেবত্ব, বিরাজ করিতেছে সেই একই আত্মা, জগতের বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে পরিদৃশ্যমান বিভেদ কল্পিত, সমগ্র মানবসমাজ একটি সত্তা—শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে উপলব্ধ এই সত্যগুলি জগতের নিকট তাঁহার একটি মহতী বাণী। শান্তি ও সমন্বয়ের বাণী। শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণী জগৎকে একটি নূতন আলোর সন্ধান দিয়াছে। বিভিন্ন মতের সমন্বয়কারী এবং বিভিন্ন মানুষের বিভেদনাশক তাঁহার শান্তি ও সমন্বয়ের বাণী স্বামীজী শুধু ভারতবর্ষেই প্রচার করেন নাই, সুদূর পাশ্চাত্যেও বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

উপনিষদের 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই সত্যের মধ্যেই আছে বহুত্বের মধ্যে একত্ব অনুভবের, বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয় বিধানের সূত্রটি। উপনিষদের এই সত্যটি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ করিয়া সুস্পষ্টভাবে এই যুগে মানব-সাধারণের নিকট আবার উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার শান্তি ও সমন্বয়ের বাণীই সকল বিভেদকে উপেক্ষা করিয়া মানবসমাজকে পরম সাম্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবার সামর্থ্য দিতে পারে, সমগ্র মানবজাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও মতের সমন্বয়সাধন ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের উদার বাণী জগতের সমস্ত মানবসমাজকে অনুপ্রাণিত করিবে। জগতের সকল ধর্ম ও সকল জাতির মিলনসাধনের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম যে চিরসংযুক্ত থাকিবে—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথির শুভ লগ্নে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা: আমরা যেন তাঁহার প্রদর্শিত বিশ্বজনীন উদার সমন্বয়ের ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারি। সম্প্রদায়সমূহের মধ্য হইতে সঙ্কীর্ণতা ও ভেদভাব দূরীভূত করিয়া পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করিতে কায়মনোবাক্যে যেন সচেষ্ট হই। তাঁহার কৃপায় জগতের সর্বপ্রকার দ্বেষ-দ্বন্দ্বের চির অবসান হউক।

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[প্রাপক : শ্রীপ্রমদাদাস মিত্র]

শ্রীশ্রীগুরুদেবো জয়তি

মীরাট
25 Nov. 90

পূজনীয় মহাশয়েষু—

আমার বহুতর প্রণাম জানিবেন। স্বামীদ্বয় যদি আসেন ত তাঁহাদিগকেও আমাদের অসংখ্য প্রণাম দিবেন। আজ কয়েকদিন হইল আপনার পত্র পাইয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। আমার পত্র বালকের জল্পনা। হৃদয়ের আবেগে যাহা মনে হয় তাহাই লিখি। আমি শাস্ত্রজ্ঞ হইলে শাস্ত্রসঙ্গত যুক্তিযুক্ত বাক্যে আপনার পত্রের যথার্থ উত্তর দিতে সক্ষম হইতাম। বিশেষ আপনি শাস্ত্রজ্ঞ। আমার পত্র শাস্ত্রসম্মত যুক্তিযুক্ত বিবেচনায় আপনার কিরূপ হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিতে পারি না। তবে সদালাপ আশ্রয়ে যাহা মনে হয় তাহা লিখিতেছি।

আপনি আমাকে সংসারের দিকে অভিমুখ হইতে বলেন নাই। কিন্তু সে পত্রে আপনি পিতামাতার সেবা ইত্যাদি সংসার ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। আমি যে আপনার ন্যায় সংসারধর্ম্মের আবশ্যকতা ও শ্রেষ্ঠতা বোধ করি না তাহাই লিখিলাম, সন্ন্যাসী বলিয়া নহে। প্রকৃত সন্ন্যাস গ্রহণে অসমর্থ হইলেও আমার আমি ভিন্ন কেহ এ সংসারে নাই। আপনি আমায় বাস্তাশী হইতে আদেশ করিবেন—ইহা আমি কখনই জানি না। তবে আপনি স্নেহবশতঃ পিতামাতার সম্বন্ধে যে কথা লিখিয়াছেন তাহাতে পিতামাতার প্রতি যে আপনার অলৌকিক ভক্তি তাহা স্পষ্টই বুঝিয়াছি। তদ্ভিন্ন দেহাভিমানী জীবের পিতামাতার স্নেহ বিস্মৃত হওয়াও সুসাধ্য নহে। অতএব আপনি আমার সেই স্নেহের কথা স্মরণ করাইয়া বড় ভালই করিয়াছেন। ভাল, আশীর্ব্বাদ করুন যেন (জগতের আর সকল স্নেহ ভুলিয়া) সেই অসীম বিশুদ্ধ স্নেহের (যাহাতে এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড স্থিত এবং যাহার কণামাত্র স্নেহে শত শত জীব মুগ্ধ) প্রত্যাশী হইয়া চিরদিন তাঁহারই স্নেহভাজন হইয়া থাকিতে পারি। দুর্ব্বলচিত্ত মনুষ্যের কর্ত্তব্যতা বিষয় স্মরণ করিয়া তদ্বিষয়ে সতত সাবধান থাকা কর্ত্তব্য।

সন্ন্যাসীর ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করা কি অবিধেয়? অথবা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করাই সর্ব্বাপেক্ষা সদুপায়? "আমরা যে শিশু অতি···ইত্যাদি" গানটিকে আপনি প্রবৃত্তি মার্গের বলিয়াছেন। তাহা হইলে উপনিষদুক্ত—"ওঁ সহনাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্য্যং করবাবহৈ" ইত্যাদি, ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি, বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথ বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং ইত্যাদি, ওঁ শং নো মিত্রঃ

ইত্যাদি, যজুর্ব্বেদ সংহিতায় ওঁ তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি, বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি, বলমসি বলং ময়ি ধেহি ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য কি কেবল প্রবৃত্তি মার্গের জন্যই উপদিষ্ট হইয়াছে? অথবা নিবৃত্তি মার্গের অনুষ্ঠেয়? পূর্ব্বোক্ত গানটিতে কি কেবল ৺ভগবৎ সমীপে আত্মনিবেদন ভিন্ন আর কোন অভিপ্রায় আছে? গানটির মর্ম্ম আমি এই বুঝি—'হে প্রভো, আমরা অতি শিশু, অতি দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র চেতা, অতএব আমাদিগকে সদা তোমার নিকটে রেখো, দেখো প্রভু [,] আমাদের যেন পদস্খলন হয় না" ইত্যাদি অবিকল শ্রুতিবাক্য—'মাঽহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ'—এই শ্রুতির মর্ম্ম ও গীতের মর্ম্মে কি কিছু প্রভেদ আছে? শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের চরণে সরল প্রাণে আত্মনিবেদন করাই কি নিবৃত্তির কারণ নহে? কোন সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়াই অসদনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত হইবার হেতু। এবং নিবৃত্তিই স্বয়ং প্রবৃত্তির সহিত নাশ পায়। যেমন কণ্টক দ্বারা কণ্টকোদ্ধার। প্রবৃত্তিই সকল সুখ দুঃখের কারণ। আত্মৈব হি আত্মনো বন্ধুঃ, আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।

মহাশয়, আমার ছেলেমানুষি মাফ করবেন। যা মনে আস্চে বক্‌ছি। আমার আপনার সহিত শাস্ত্রার্থ করা আর হাস্যাস্পদ হওয়া একই কথা। তথাপি সৎকথা শ্রবণ লালসায় প্রবৃত্ত হইলাম। আপনি লিখিয়াছেন 'সেই প্রহ্লাদই প্রকৃতরূপে ভগবানে শরণাগত হইয়াছিলেন'—আমার জিজ্ঞাস্য—তবে সেই প্রহ্লাদের মত ভগবানের শরণাগত হইবার সর্ব্বোত্তম উপায় কি? এবং কি উপায়েই বা ধ্রুব প্রহ্লাদ এত দূর নির্ভরশীল হইয়াছিলেন?

পিতৃমাতৃ-আচার্য্যভক্তি ঈশ্বরভক্তির অঙ্গ স্বরূপ—বিরুদ্ধ কখনই নহে। কিন্তু যদি পিতৃমাতৃভক্তিতে মায়ার সংশ্রব থাকে ত আর ঈশ্বরভক্তির অঙ্গ হইতে পারে না। কারণ ভগবদ্ভক্তি মায়িক—সংসৃষ্ট নহে। যিনি সতত ভগবানের ধ্যান করিতেছেন ও সর্ব্বদাই আত্মাতে ক্রীড়া করিতেছেন—তাঁহার ত আর কিছু কর্ত্তব্য নাই। তিনিই আত্মানন্দে ভূমানন্দ—স্বানন্দে পরমানন্দ। তখন তাঁহার আবার অপর কর্ত্তব্য কি? কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ইহার প্রাগ্‌ভাব নয় কি? এবং আরও বলিয়াছেন—'যিনি সম্পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানী ও আত্মরতি নহেন তাঁহার পিতামাতা বর্ত্তমান থাকিতে সন্ন্যাস গ্রহণে অধিকার নাই।' অতএব আপনার কথায় ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে সিদ্ধ হইয়া আত্মজ্ঞানান্তর সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। আমার বোধ হয় আত্মজ্ঞানেচ্ছু মুমুক্ষু ব্যক্তিই সন্ন্যাসগ্রহণের যোগ্য। আত্মজ্ঞানের প্রাগ্‌ভাবই সন্ন্যাস।

উদ্যোগপর্ব্বের 'সঞ্জয় যান পর্ব্বাধ্যায়ে' মহারাজ যুধিষ্ঠির স্পষ্টই বলিয়াছেন—মনীষিগণের তত্ত্বজ্ঞানান্বেষণার্থে সজ্জনগণ সমীপে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা শাস্ত্রসম্মত বিধান। তবেই তত্ত্বজ্ঞানান্বেষণার্থে সন্ন্যাস। এবং সন্ন্যাসান্তর জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞ যিনি তাঁহার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব

ভবতি'। তাঁহার অবশিষ্ট ব্রহ্মই। অতএব আত্মজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞ এ সকল তাঁহার বিশেষণ। এখানে জীব সংজ্ঞা নাই। শ্রুতির উপদেশ স্মরণ হইল, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং-স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম।' অর্থাৎ যে বিদ্বান ব্যক্তি অপ্রমাদে সন্ন্যাস যুক্ত জ্ঞানাদি উপায় দ্বারা যত্ন করেন তাঁহার আত্মা সেই ব্রহ্মধামে প্রবেশ করে। অতএব বিচার করুন—সন্ন্যাস, যত্নশীল ব্যক্তির জন্যই কথিত হইয়াছে। এবং ইহা আমি শতবার স্বীকার করি যে যত্নশৈথিল্যে সমূহ ক্ষতি। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি সংসারী অপেক্ষা শতগুণ প্রযত্নশীল। কারণ বিরক্ত আপন কার্য্যে কখনই অমনোযোগী নহেন। অপিচ সর্ব্বদাই নিযুক্ত। আমার বোধ হয় পাতঞ্জলির যোগসূত্রের ২য় [অধ্যায়ে] 'তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ' সন্ন্যাসী সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিবেন।

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারাও কেবল প্রার্থনা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। কেবল তাঁহাকে প্রার্থনা করিলে তিনি প্রকাশ হন। নতুবা আর অন্য কোন উপায়ে তিনি প্রাপ্য নহেন। সংসার মধ্যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক কেহ তাঁহাকে প্রার্থনা কিংবা বরণ করিতে সমর্থ হন ভালই। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বীর তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু আমাদের আচার্য্য তাহা উপদেশ করেন না। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের উপদেশপঞ্চক দেখুন—তাহাতে পূর্ব্বেই নিজ-গৃহ হইতে নির্গমনের উপদেশ দিতেছেন। 'বেদো নিত্যমধীয়তাম্' ইত্যাদি শ্লোকে আছে। গার্হস্থে কোন বিঘ্ন হইলে বিচার না করিয়াই সন্ন্যাস বিধেয়। তথা— 'দ্বন্দ্বাহতস্য গার্হস্থং ধ্যানভঙ্গাদিকারণম্। লক্ষয়িত্বা গৃহী স্পষ্টং সন্ন্যাসেদবিচারয়ন্'। আমার অতিশয় ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। তথা বৈরাগ্যের সঞ্চার হইলে আর কোন কর্ম্মের অপেক্ষা করিবে না। তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাস বিধেয়। 'অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকোবাঽস্নাতকো বা উৎপন্নাগিরগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ' ইতি শ্রুতিঃ—বৈরাগ্যবান্ অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াকর্ম্মসম্পন্ন হউন আর নাই হউন তন্মুহূর্ত্তেই প্রব্রজিত হইবেন। যিনি প্রব্রজিত হইয়াছেন তিনি সততই ভগবানের চিন্তা, কীর্ত্তন, ধ্যান, গান, ও স্তুতি যজন ও নমস্কার করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আর কোন বিষয়ে প্রীতি নাই, এবং অনুক্ষণ ভগবৎ চিন্তার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। অবশ্যই তিনি মুহূর্ত্তের জন্য লক্ষ্যচ্যুত হন না। এই কথাটি স্মরণ রাখা উচিত যে, যতি কিন্তু সিদ্ধ নহেন। শম দমাদি সাধনও যতির অঙ্গ বিশেষ। তাহা না থাকিলে যতি অঙ্গবিহীন হইবেন। কিন্তু তাই বলিয়া কি ভগবৎ প্রার্থনা হইতে বিরত হইবেন? যেমন কোন হস্তপদবিশিষ্ট জীব স্বীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি কোন কর্ম্মের ভার দিয়া স্বয়ং নিশ্চিত হইতে পারে না—তদ্রূপ শম দমাদিও জানিবেন। মনেরও যিনি দুর্লক্ষ্য ধ্যান ধারণায় তাঁহার কি করিবে? তথাপি ভক্ত কিছু না করে বাঁচে না।

'অনেজদেকং মনসো জীবয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ। তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নাপো মাতরিশ্বা দধাতি', ইতি শ্রুতিঃ।

পূর্ব্বকালে (পুরাণাদিতে দেখিতে পাই) ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়ের প্রথা অনুসারে সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালনে রত ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সকলেই কি পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন? মহাভারতেই বা মহারাজ যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের মত কয় জন আছেন? তৎকালে কেহই নিয়মিত সময় অতিক্রম করিতে পারিতেন না। অবস্থা ভেদে শাস্ত্রোক্ত আশ্রম চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান সকলকেই করিতে হইত। স্ব স্ব আশ্রমোক্ত ধর্ম্মের প্রতিপালনই ধর্ম্ম ছিল। পুত্রের বাল্যকালাবধি গুরুগৃহে বাস নিবন্ধন সে দীর্ঘকাল পিতামাতার পুত্রের সহিত বাক্যালাপেরও অবসর হইত না এবং পুত্রের গুরুগৃহ হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিবার অব্যবহিত পরেই বোধ হয় তাঁহারাও বানপ্রস্থান করিতেন। এইরূপ আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর নিয়মজন্য পিতাপুত্রের অধিককাল একত্র বাস সম্ভবিত না। আহা! অতি বাল্যকালেই মাতা-পিতা মায়ার বিচিত্র চিত্র পুত্রের হৃদয়ে অঙ্কিত না করিয়া পুত্রকে গুরুগৃহে প্রেরণ করিয়া পুত্রের হিত কামনা করিতেন। ইহাই জীবের প্রকৃত কল্যাণ। বাল্যকালে চিত্তে একবার যাহা প্রবেশ করে কালে তাহার দূরীকরণ দুঃসাধ্য। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া পিতামাতার স্নেহালিঙ্গনে বঞ্চিত হওয়ায় পুত্রের হৃদয়ে মায়ারূপী অশ্বত্থমূলে সুকোমল হৃদয় আক্রান্ত হইত না। সেই বাঁচোয়া ছিল। এখন দেখুন সকল আশ্রমীরই চরমাশ্রম সন্ন্যাসের প্রতি লক্ষ্য। সন্ন্যাসের পরে আর কোন আশ্রমের কথা আমাদের গোচর নহে। সকলেই এই তিন আশ্রমের অনুষ্ঠানান্তর মুখ্যাশ্রম সন্ন্যাসের অধিকারী হইবেন। তবে তিন আশ্রমীরই কেন সন্ন্যাস উদ্দেশ্য হইল?

যাহা হউক 'জ্যেষ্ঠাশ্রম গৃহস্থ সন্ন্যাসীর উপজীব্য' কেমন জানেন পিতার বার্দ্ধক্যে পুত্র যেমন তাঁহার উপজীব্য!! গৃহস্থের ধর্ম্ম ত আপনি জানেনই। জ্যেষ্ঠাশ্রম না থাকিলেই সন্ন্যাস প্রভৃতি ধর্ম্মের লোপ হয়ে যায়। সন্ন্যাস প্রভৃতি ধর্ম্মের অভাব হইলে জ্যেষ্ঠাশ্রমের গতি কি হয়? অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিখিবেন। আমার বোধ হয় জ্যেষ্ঠাশ্রমীর চাষবাসে অধিকার জন্য দেব, ঋষি, ব্রাহ্মণ, যতির সেবাই ধর্ম্ম। আর স্থানাভাব। ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন।

আপনাকে জ্যেষ্ঠাশ্রমী বলিয়া গৌরব করিয়াছেন। আমি আপনার কথায় হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কৈশোরে বৃদ্ধ হইতে বাসনা করিয়াছেন। কিন্তু আমি বহুতর সন্ন্যাসের শ্রেষ্ঠতা—যথা 'ন্যাসঃ শীর্ষাণি সংস্থিতঃ—আশ্রমানামহং তুর্য্যো ধর্ম্মানামস্মি সন্ন্যাসঃ।' কৈশোরে বৃদ্ধ হওয়া যেমন অসম্ভব!! গৃহস্থের জ্যেষ্ঠ হওয়াও তেমন!!! সকল আশ্রমের পরিপক্কাবস্থাই সন্ন্যাস। এক দিকে বৃদ্ধেরও মৃত্যু—সন্ন্যাসেরও মুক্তি!!! ইতি

To P. D. Mitra
Benares City

দাস গঙ্গাধর

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

ডক্টর রণজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কষিত-কাঞ্চন-দেহ, অনুপম শ্রীঅঙ্গের ছাঁদ,
কামারপুকুর-মাঝে এল এক ভাবুক উন্মাদ।
শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, গীতহাস্যে সদাই উচ্ছল,
আদর করিয়া সবে আখ্যা দেয় 'গদাই পাগল'।

সপ্তবর্ষ বয়সেতে বালক-সুলভ রসে মাতে,
ক্ষেত্রের আলিতে ধায় জলপানি-পাত্র লয়ে হাতে,
সহসা ঘনায় মেঘ,—কৃষ্ণবর্ণ, যথা ঘনশ্যাম,
বৃষভানু-সুতাসম কোলে খেলে বিদ্যুতের দাম,
নিম্নে চলে শীঘ্র-গতি হংস-বক ফেনবর্ণসিত,
গদাই সে দৃশ্য হেরি' ভূমে পড়ে হইয়া মূর্ছিত।
ভাবের চিন্ময় ধাতু দিয়া তাঁর গড়া দেহখান,
ভাবের উদয়ে তাই সমাধিস্থ হয়ে মূর্ছা যান।

তারপরে হের ঐ দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থ ধামে
পূজে সে শ্যামার মূর্তি, 'মা-মা' বলি' ডাকে সর্বযামে,
মাতৃমূর্তি-দর্শনের লাগি' হয় উন্মাদ অস্থির,
বিগ্রহের খড়্গ লয়ে ছেদিবারে ধায় নিজ শির,
সহসা প্রকট হয় সর্বদেহ-রোম হরষিয়া
চিন্ময় জ্যোতির জালে চরাচর ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া
আনন্দ-মূরতিঘন, সতী, আর চৈতন্যরূপিণী
তনয়ে তারিতে সেই ব্রহ্মময়ী কৈবল্যদায়িনী!
পাগল সাধক হেরে মাতৃমূর্তি অন্তর-বাঞ্ছিত,
বিস্ময়ে, আনন্দে, প্রেমে ভূমে পড়ে ধূলি-বিলুণ্ঠিত!

তারপরে হের ঐ পঞ্চনদ-তীর হতে আসে—
বিশাল সুদীর্ঘ দেহ, 'সোঽহং-সোঽহং' সদা ভাষে
বৈদান্তিক তোতাপুরী সাধনেতে পরম নিপুণ,
গদাইয়ে দানিয়া দীক্ষা, বলে,—'ধ্যান করহ নির্গুণ'।
কঠিন সাধনা,—যাহা যোগী লভে বহু বর্ষ সাধি',
চল্লিশ বরষ সাধি' তোতা যাহে লভয়ে সমাধি,

অপূর্ব বালক এই সাধি' মাত্র তাহা তিনদিন,
চতুর্থ দিবসে তাঁর চিত্ত হল নির্বিকল্পে লীন।

তারপরে হের ঐ গুরু আসে নানা দিক হতে,
অপূর্ব সাধক তাঁরা, সিদ্ধ সব ভিন্ন ভিন্ন মতে,
শাক্ত, শৈব, নানকীয়, বৈষ্ণব বা রামাৎ, নিমাৎ,
ভৈরবী ব্রাহ্মণী আসে তন্ত্রে-মন্ত্রে অতি সিদ্ধ হাত
চতুঃষষ্টি তন্ত্র মতে করাইলা যতেক সাধন,
নরদেহে কেহ কভু এত কৃচ্ছ্র করেনি কখন।
সকল ভাবেতে ইনি অবহেলে করে সিদ্ধি লাভ,
মোহাম্মদী-খ্রীষ্টধর্মে হেরে একই ঐশ্বরিক ভাব।

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে যবে বঙ্গদেশে
পাশ্চাত্য শিক্ষার সাথে নাস্তিক্যের গ্লানি পরবেশে,
তখন এ ভাবোন্মাদ ব্রহ্মজ্ঞানী সাধক মহান্‌
হিন্দুধর্ম সত্য বলি ঘোষিলেন সু-উচ্চে বিষাণ।
স্থাপিলা ধর্মেরে পুনঃ সর্বধর্ম করি' সমন্বয়,
শিখাল হিন্দুরে বেদ, দেব-দেবী মিথ্যা কেহ নয়,
'রামকৃষ্ণ পরমহংস' এই আখ্যা করিয়া গ্রহণ
সমগ্র বিশ্বের মাঝে আনে এক নব জাগরণ।

নর-ই ঈশ্বর হয়

মায়ের মধুভরা মমতা
প্রিয়ার প্রাণের টান ;
বন্ধুর বুকভরা ভালবাসা
এ-জগতে প্রেম-ই মহান।
প্রেম আছে প্রাণে প্রাণে
প্রেম আছে ঈশ্বরে—
মানবের প্রাণে তাঁর-ই পরিচয় ;
প্রেম আছে ফুলের কাননে
ঝর্নায় আর সাগরে,—
প্রকৃতির মাঝে প্রেমের পরিচয়।
সেই প্রেম আছে যে-নরে,
সেই নর-ই ঈশ্বর হয়।

ধর্মে ও দর্শনে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার এবং আমরা

ডক্টর বন্দিতা ভট্টাচার্য

১

পৃথিবীর প্রাচীনতম পুঁথিটির প্রথম ও শেষ পাতাটি আজও পাওয়া যায়নি। মানুষের আত্ম-চেতনার শুরু থেকে সেই হারানো পাতা দুটির অনুসন্ধানের বিরাম নেই। সেই নিরন্তর অনু-সন্ধানের পথ বেয়ে পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির তথা ধর্ম ও দর্শনের নব নব রূপান্তর ঘটছে।

সভ্যতাকে যদি জীবনের সঙ্গে তুলনা করি তবে সেই জীবনের হৃদয়-কমল হল সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির প্রাণরস তার ধর্ম এবং তার দর্শন। সাহিত্য-দর্পণের মধ্য দিয়েই আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি তথা ধর্ম ও দর্শনের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত। শুধু আমাদের ভারতখণ্ডেই নয়, সর্ব দেশে এবং সর্ব কালে এই একই আধারে সকল সভ্যতা ও সংস্কৃতির যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বর্তমান ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির যথার্থ পরিচয় গ্রহণের পূর্বে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি তথা ধর্ম ও দর্শনের ঐতিহ্য সম্পর্কে স্বতই অনুসন্ধিৎসা জাগে। তাছাড়া এই ঐতিহ্যের সূত্রানুসরণেই আজকের জীবন এবং তার প্রাণ-স্পন্দনটিকে অনুভব করা যাবে।

বৈদিক সাহিত্য, পৃথিবীর প্রাচীন সাহিত্য-সমূহের অন্যতম এবং ঋগ্বেদই, নিঃসন্দেহে প্রাচীনতম। ঋগ্বেদের সঠিক কাল নির্ণয় আজও স্থির হয়নি। ঋগ্বেদকে আর্য-বিশ্বাসের ছন্দোবদ্ধ বিবরণরূপে চিহ্নিত করলে তা স্ব রূপে প্রতিভাত হতে পারে। ঋগ্বেদ থেকে অথর্ববেদের বর্ণনীয় বিষয় এবং তার প্রকাশের মাধ্যমে আর্য এবং অনার্য জীবনের সংমিশ্রণের বিচিত্র ইতিহাস মাঝে মাঝেই বড় স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে। প্রাচীন ভারতের জীবন-চর্যার সেই বিচিত্র ইতিহাসের মধ্যেই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার যথার্থ পরিচয়। সে পরিচয় নিরবচ্ছিন্ন, গৌরব বা অগৌরবের নয়। তার মধ্যে বিজয়ীর সহর্ষ উল্লাসের সঙ্গে বিজিতের আত্মগোপনের দীর্ঘশ্বাস যেমন শোনা যায়, তেমনি বিজিতের সভ্যতার ও সংস্কৃতির কাছে নতি স্বীকারের গোপন যন্ত্রণাও অনভি-ব্যক্ত থাকেনি। সভ্যতার এই বৈচিত্র্যময় বিবর্তনের পথেই সংস্কৃতির যথার্থ উদ্ভব এবং বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধানের কালে পুরাতত্ত্ব এবং নৃ-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়সমূহকে 'বাস্তব সংস্কৃতি' রূপে চিহ্নিত করা চলে। অন্যদিকে ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, চিত্রকলা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে 'মানস সংস্কৃতির' যথার্থ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে যথার্থ মননের পরিচয় উপনিষদের রাজ্যে। যাগ-যজ্ঞ-মন্ত্রাদির রাজ্য পেরিয়ে উপনিষদের যুগের মানুষেরা, গভীর মননের মধ্য দিয়ে যে মহাজীবনের সন্ধান লাভ করলেন তারই নাম ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি। আমাদের 'ধর্ম' দর্শনের প্রজ্ঞায় চির-প্রোজ্জ্বল। 'ধর্ম' কথাটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। 'যা লোকসকলকে ধারণ করে, তাই ধর্ম। যা রাষ্ট্ররক্ষা বা সমাজস্থিতির মূল, তাই ধর্ম। যা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই ধর্ম। সুতরাং ধর্ম বলতে বোঝায় justice and equity. আবার যা মানুষকে শ্রেয়ের পথে নিয়ে যায়, তাই ধর্ম।'[১]

দহন-ক্রিয়াই যেমন অগ্নিকে ধারণ করে আছে

১ গীতার সমাজ দর্শন—ত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী, (১৩৭৫), পৃঃ ১০

তেমনই মানুষের ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বই মানুষকে ধারণ করে আছে। তাই মনুষ্যত্বই মানুষের ধর্ম। মানুষ বলতে শুধু তার দেহই নয়। তার মন-বুদ্ধি অর্থাৎ চিন্তাশক্তিকেও বুঝি। দেহকে পরিপোষণের সঙ্গে সঙ্গে মনের ও বুদ্ধির চর্চাও করতে হয়। মননের দ্বারাই আমরা শান্তি লাভের উপায় খুঁজে নেওয়ার সাধনা করি, ধর্মই শান্তি লাভের উপায়।

ধর্মের লক্ষণ নির্ণয়-প্রসঙ্গে মনুসংহিতাকার বলেছেন :

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ঃ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্॥

—ধর্মের দশটি লক্ষণ এবং তা হচ্ছে ধৈর্য, ক্ষমা, সংযম, অচৌর্য, দেহ ও মনের শুদ্ধি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, জ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা, সত্য কথা এবং অক্রোধ। জীবন-চর্যায় এগুলি সার্থকরূপে প্রতিপালিত হলে মানুষ যথার্থ 'মনুষ্যত্ব' লাভ করে জীবনকে মহাজীবনে রূপান্তরিত করতে পারবে পরম প্রার্থিত প্রজ্ঞার আলোকে। এই প্রজ্ঞার আলোকেই দর্শনের উদ্ভব। 'জীবন এবং সত্তার স্বরূপ বুঝবার চেষ্টার নামই দর্শন।'[২]

দর্শনের উদ্দেশ্য শুধু কৌতূহলনিবৃত্তি নয়, নিছক তত্ত্বালোচনা নয়, বরং তত্ত্বের আলোকে জীবনকে সুন্দরতর ও মহত্তর করা। দর্শন শুধু সত্যচর্চা নয়—সত্যচর্যা। এই দর্শন, সর্বপ্রথম, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে চিহ্নিত হয়েছে উপনিষদের যুগে। উপনিষদে যার সূচনা তারই বিস্তার ঘটেছে—রামায়ণ-মহাভারত তথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মহিমময় রাজ্যে। গীতাতেও দৈবীসম্পদ লাভকে একটি প্রধান ধর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সে সম্পদ লাভের জন্য অভয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি, জ্ঞান, যোগনিষ্ঠা, দান, সংযম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপস্যা ও আর্জব (অকপটতা) প্রভৃতির অনুশীলন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। গীতা থেকে জানা যায়, নিষ্কাম কর্মযোগ ও শরণাগতি ধর্মসাধনার প্রকৃষ্ট উপায়।

ঔপনিষদ সংস্কৃতির বিজয় অব্যাহত ছিল জৈন এবং বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় কাল পর্যন্ত। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, ভারতীয় দর্শনের যখন মধ্যাহ্নকাল তখন পাশ্চাত্য দর্শনের মাত্র প্রত্যুষ।

ঔপনিষদ জীবন-দর্শনের ভূমিতেও কাল-প্রবাহে কর্মযজ্ঞই প্রাধান্যলাভ করেছিল। গীতার সাম্যাদর্শ তখন বিলুপ্ত হয়েছে। বর্ণাশ্রমধর্মের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত এক নবীন সম্প্রদায় ধর্ম ও দর্শনকে আপন আপন উদ্দেশ্যের অনুবর্তী করে এক অন্ধকার যুগের মধ্যে বাস করছিল। সকল মানুষের কল্যাণ-কামনা তখন ব্যক্তিকেন্দ্রিক তন্ত্রমন্ত্র বা জপ-তপের নিভৃত গুহায় বন্দী। এই বন্দিত্ব মোচন করলেন কপিলবাস্তুর রাজপুত্র দীন ভিক্ষুকের বেশে, তথাগত বুদ্ধ নামে। মহাবীরকে কেন্দ্র করে জৈন-দর্শন এবং বুদ্ধদেবকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ-দর্শনের মর্মবাণী প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নবীনতার রাজ্যে অভিষিক্ত করল। এই নবীনত্ব প্রথমে বিদ্রোহীর ভূমিকায় আত্ম-প্রকাশ করলেও কালক্রমে বৃহৎ ভারত-সংস্কৃতি তথা ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গেল। এই বৌদ্ধ-প্লাবনকে যিনি প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের রাজ্যে প্রতিহত করে নবতর বেগ সঞ্চারিত করেছিলেন তিনি আচার্য শঙ্কর। বেদান্তবাদের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সমগ্র ভারতাত্মার সচেতনতার ইতিহাসকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করলেন। ঐ পথ অবলম্বন করে ক্রমে এলেন রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য

২ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস—সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (আবুল কালাম আজাদ লিখিত সূচনাংশ), পৃঃ ৩

প্রভৃতি। পাশাপাশি শৈব এবং শক্তিতন্ত্রের অবস্থানও অনস্বীকার্য। বহুমত বহুপথ সাধারণ মানুষকে স্বভাবতই বিভ্রান্তির রাজ্যে ঠেলে দিল। ধীরে ধীরে ধর্ম ও দর্শনের আকাশ ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল। এলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। সেদিনের সেই অন্ধকার যুগের অবসান-লগ্নে তিনি যেন ভোরের কোকিল। মৃদঙ্গের মূর্ছনায় নবজাগরণের প্রভাতী সঙ্গীত মানুষের দ্বারে দ্বারে শুনিয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু পরিপূর্ণ আলোকস্নাত হতে তখনও কিছু দেরি ছিল। পূর্বাকাশে তখনও পূর্ণ অরুণোদয় হতে ৩৫৬ বৎসর বাকী ছিল। সে উদয়ালোক মানুষ অবলোকন করেছিল গঙ্গাতটে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-শীর্ষে। তারপরেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নবযুগের শুভ সূচনা

২

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্মিলিত আর্য এবং আর্যেতর সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় ভারতবর্ষের যে প্রাণমন্ত্র ঔপনিষদ ঋষিদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল, তারই প্রয়োগক্ষেত্র নির্দিষ্ট হয়েছিল জাহ্নবীর তীরে সেই বিশাল পঞ্চবটীমূলে। পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষের নবরূপ চিত্রিত হয়েছে। সে রূপ হচ্ছে—সমন্বয়ের, মিলনের। সেই মহামিলনের ক্ষেত্র হল—ভারতবর্ষ। মধ্যযুগে মোগলরা এদেশে এসেছেন। সঙ্গে এসেছে ইসলামী ধর্ম এবং তার সংস্কৃতি। মুসলমানরা এদেশে এসেছেন এবং এদেশকেই অবশেষে তাঁদের বাসভূমিরূপে বরণ করে নিয়েছেন। তারপর এসেছেন ইউরোপীয় বণিকমণ্ডলী তথা ইংরেজরা। ইতিহাসের রক্তাক্ত পথে ইংরেজ ধীরে ধীরে বণিকের মুখোশ খুলে রাজদণ্ডের অধিকারী হয়েছিলেন এবং বোধ করি তা কালেরই বিধানে। ইংরেজের সঙ্গে এল পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির চোখ ঝলসানো আলোক, যার সঙ্গে আমাদের কোনরকম পরিচয় ছিল না। আমাদের শান্ত প্রদীপালোকের রাজ্যে ইংরেজের আবির্ভাব যেন বিদ্যুতের চমক। ইংরেজেরই মাধ্যমে তথা তাদের সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এক নবীন যুগ আমাদের জীবনমঞ্চের দ্বারপ্রান্তে এসে তার আহ্বান ঘোষণা করল। এ আহ্বান—পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জড় বিজ্ঞানের আহ্বান। একে অবহেলা করবার ইচ্ছা যাঁদের হল তাঁরা ধীরে ধীরে নবীন জোয়ারের বেগে কোথায় হারিয়ে গেলেন এবং যাঁরা এই আহ্বান মন্ত্রে উৎসাহী হয়েছিলেন কার্যতঃ তাঁরাই হলেন ভারতবর্ষের নবযুগের রচনাকার। তাতে যা ঘটেছিল সেইকালে—তার ফল শুধু সুফল নয়, এর অন্তদিকটাও রয়েছে। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকেরা ভারতবর্ষের সবকিছুকেই হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসের মূলে আঘাত করে তাঁরা নতুন ধর্মের জয় ঘোষণার চেষ্টা করেছিলেন। প্রতিমাপূজাকে তাঁরা পৌত্তলিকতা বলতে থাকেন। এদেশের ইংরেজী শিক্ষিত নব্য যুবসমাজ তখন ইংরেজী-আলোকের কাছে পতঙ্গের মতো ধাবমান হয়েছিলেন। প্রাচীনভারতের সঙ্গে এই নবভাবধারার অভিঘাতের মধ্য দিয়েই জন্ম হল ব্রাহ্মধর্মের। রাজা রামমোহন উনবিংশ শতাব্দীর সেই নবজাগৃতির অগ্রদূত। এই ধর্মকোলাহলের মধ্য দিয়েই শাশ্বত আত্মার অমৃতবাণী ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করল দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় ও ভাবে।

ইউরোপীয় বস্তুবাদী শিক্ষা, বিশেষতঃ জড়বিজ্ঞান প্রতিনিয়তই আকর্ষণ করে চলেছে ভোগরাগদীপ্ত জীবন-যৌবনের দিকে। পাশ্চাত্যের এই ভাবসমুদ্রে তরঙ্গাহত হয়ে আমরা নিক্ষিপ্ত হয়েছি এক শূন্যতাময় শান্তিহীন বালুকাচরে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার মানুষেরা কুবেরের ঐশ্বর্য এবং ইন্দ্রের শক্তি করায়ত্ত করে শ্রীহীন বালুকাচরের মধ্যে ধীরে ধীরে ইমারত গড়ে তুলছে। বর্তমান পৃথিবীর এমন নিদারুণ করুণ আত্মধ্বংসী চেহারা বোধ করি অতীতে কখনও কেউ কল্পনাও করেনি। কিন্তু যা ছিল অকল্পনীয়, তা বাস্তবে পর্যবসিত। শান্তিহীন জীবন-সমুদ্রে তাই আজ মানুষ নিত্য বেদনা-তাড়িত।

৩

আধুনিক ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস—সমন্বয়ের ইতিহাস তথা মহান মানবিকতা-বোধের ইতিহাস। আধুনিককালের মানুষ জীবনের আত্মঘাতী রূপের পরিচয় পেয়েছে। মানুষ শক্তিমান হয়েছে এবং হচ্ছে দিন দিন। তার শৌর্যবীর্যের পরিচয় তাকে গর্বোদ্ধত করেছে। কিন্তু অন্তরের মধ্যে এক বিশাল এবং গভীর শূন্যতাবোধ তাকে নিত্য পর্যুদস্ত করছে। আধুনিক সভ্যতায় জীবনের পরিপূর্ণতা মানুষ খুঁজে পাচ্ছে না। অর্থ-ক্ষমতা-বিলাসিতার মধ্যে থেকে ক্রমশই তারা অন্তরের দিক থেকে হয়ে উঠছে রিক্ত। ভারতবর্ষে পশ্চিমী সভ্যতার পরিণতি ভারতবর্ষের মানুষকেও বিহ্বল করেছে। কিন্তু এই বিহ্বলতার মধ্য দিয়ে নবভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতময় ভাব-গঙ্গায় অনাবিল শান্তিধারার সন্ধান সে পেয়েছে। তাই আধুনিক বিশ্বে ভারতবর্ষ এক নবজাগৃতির পথিকৃৎরূপে প্রতিভাত।

যে ধর্ম শুধুই বলে তার পথই শ্রেষ্ঠ পথ, যে ধর্ম অপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, সে ধর্ম সর্বমানবিক নিশ্চয়ই নয়। সে ধর্মে মানুষের যথার্থ কল্যাণ হতে পারে না—পরমের দিকেও নিয়ে যেতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণই সর্বপ্রথম বিশ্বমানবের কাছে বললেন: 'আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল—এমত ভাল না। ঈশ্বর এক বই দুই নাই।'[৩] সমন্বয়-চিন্তার মূর্ত-প্রকাশ তিনি। শুধু বাণী নয়—তাঁর জীবন-চর্যাতেও এই সত্যই ব্যক্ত। 'আমায় সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল,—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত, এ সব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে। দেখলাম সেই এক ঈশ্বর—তাঁর কাছেই সকলি আসছে,—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।'[৪]

বুদ্ধদেব, শংকরাচার্য, যীশুখ্রীষ্ট ও শ্রীচৈতন্যের জীবন বিচার করলে দেখা যাবে, তাঁরা সন্ন্যাস-গ্রহণ করে ধর্মরাজ্যের প্রতিভূরূপে দেখা দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহকে তপোবনে পরিণতি দান করেছেন। পৃথিবীর মানুষ তো গৃহবদ্ধ জীব। এই গৃহী মানুষদের কাছে সারদেশ্বরীকে বিশ্বেশ্বরীরূপে চিহ্নিত করেছেন। কামিনী বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বারবার। কিন্তু বিদ্যারূপিণী নারীকে তিনি বিশ্ব-শক্তির সঙ্গে অভিন্ন দেখেছেন। 'নারীর মধ্যে যে পশু-সত্তা রয়েছে তাকেই শ্রীরামকৃষ্ণ কামিনীরূপে বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন।'[৫] কাম থেকেই কামিনী। শুধু তাই নয়, তিনিই দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন: 'গৃহস্থাশ্রমেও ঈশ্বর লাভ সম্ভব।'[৬] তাঁর মতে—'ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।'[৭] সেই সচ্চিদানন্দ অখণ্ড ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকারও। 'কলিযুগে ভক্তিযোগ।... ঈশ্বরের নাম গুণগান করা আর ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করা।'[৮] শ্রীরামকৃষ্ণের সকল কথার

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।৪।৪
৪ " " ৩।৩।২
৫ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা—নীরদবরণ চক্রবর্তী, (১৩৭৭), পৃঃ ৯
৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।১।২
৭ " " ১।১০।৬
৮ " " ১।১০।৬

মূর্ত প্রমাণ তাঁর দিব্য জীবন। তিনি সোচ্চারে বলেছেন, তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়: 'For the first time I found a man who dared to say that he saw God,···One touch, one glance, can change a whole life'[৯] শ্রীরামকৃষ্ণের মহান আবির্ভাব সমগ্র ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক নবযুগের অভ্যুদয়কে সূচিত করেছে। সনাতন আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ধারাকে অব্যাহত রাখাই তাঁর আবির্ভাবের কারণ। এ হল সেই বিরামবিহীন স্রোতস্বিনী যার ফল্গুধারা যুগ যুগ ধরে বয়ে চলেছে। যখনই বিবেকানন্দে শক্তি সঞ্চার করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, তখনই নবযুগ রচনার কাজ শুরু হয়েছে। স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার, জাতীয়তার নামে পরলোলুপতা, ধর্মের নামে পরধর্মে বিদ্বেষ—সে যুগের চরিত্র। সেই সংকটের যুগে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের বাস্তবরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়েছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ নিভৃত গুহার মধ্যে ঈশ্বর সন্ধান অপেক্ষা জীব সেবার মধ্যে ঈশ্বর দর্শনই কাম্যবস্তু রূপে নির্দেশ করেছেন। তিনি বললেন—জীবে দয়া নয়—জীবে সেবা, জীবে প্রেম এই প্রেমের মন্ত্রেই মানুষের মহামিলন

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাকে মূর্ত করার কাজে প্রধান রূপকার হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীঅরবিন্দের একটি উদ্ধৃতি এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য; 'The work that was begun at Dakshineswar is far from finished, it is not even understood. That which Vivekananda received and strove to develop, has not yet materialised'[১০] শ্রীঅরবিন্দের জীবন-সাধনার মধ্যেও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবের অনুরণন:

'আমাদের উদ্দেশ্য কর্মফল ও কর্তৃত্বাভিমান উভয়েই ভগবানের হাতে সমর্পণ করে তাঁর খেলার সাথী হওয়া। ইচ্ছা করলে সমস্ত বিসর্জন দিয়ে অবশ্য ভগবানে বিলীন হয়ে থাকা যায়। কিন্তু তার চাইতে বড় আদর্শ হল বিশ্বলীলায় ভগবানের সহচর হওয়া, জগতে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনে তাঁর সহায়ভূত হওয়া, কারণ তাই ভগবানের অভিপ্রেত। জীবাত্মা তো নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত; ইচ্ছা করলেই ভগবানের বিশ্বাতীত সত্তায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু ভগবানের লীলাপ্রবণ ইচ্ছার কাছে আপনাকে সমর্পণ করে পৃথিবীতে ভগবানের কাজ করাই জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।'[১১]

বিবেকানন্দকে সমাধিতে ডুবে থাকতে দেননি শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি কিন্তু সকল মানুষকেই ভগবানের 'খেলার সাথী' রূপেই দেখতে চেয়েছেন—যন্ত্র ও যন্ত্রীর সঙ্গে তুলনা করে। শ্রীঅরবিন্দের দিব্য জীবনও শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছার মূর্তপ্রকাশ। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রীঅরবিন্দের হৃদয়-নৈবেদ্য কিভাবে উৎসর্গিত হয়েছিল তা এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তিনি বলেছিলেন: 'যাঁহার পা দুখানি বুকে রাখিবার জন্য পৃথিবী চিরদিন উৎসুক, যাঁহার অবতরণের দিন হইতে সত্যযুগের সূচনা হইয়াছে, তিনি আসিয়াছেন, এবার তিনি স্বয়ং আসিয়াছেন।'[১২]

ভারত আত্মার প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর কথামৃতই আধুনিক ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণমন্ত্র। এ-যুগের সকল ধর্ম, সকল দর্শনের তিনিই প্রেরণা। সেই নররূপী ঈশ্বরের চরণ-প্রান্তে আমাদের কোটি কোটি প্রণাম।*

৯ Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. IV, P. 179

১০ Karmayogin—Sri Aurobinda, 1909

১১ শ্রীঅরবিন্দের সাধনা—হরিদাস চৌধুরী (পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'সম-সাময়িকের চোখে শ্রীঅরবিন্দ' গ্রন্থ থেকে পৃঃ ১৩৫-৬)

১২ শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে—গিরিজাশংকর রায় চৌধুরী, (১৩৬৮), পৃঃ-৫৯

* নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সুবর্ণ জয়ন্তী (ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮) অধিবেশনে ধর্ম ও দর্শন শাখায় পঠিত লেখিকার অভিভাষণ।

প্যারিস পেরিয়ে

ডক্টর অমিয়কুমার হাটি

[পূর্বানুবৃত্তি]

সব থেকে বোধ হয় ভাল লেগেছে, নতুন জিনিস—মাদাম টুসড-এর প্রদর্শনী। এখানে রয়েছে মোম দিয়ে তৈরি বিখ্যাত সব মানুষ—নানান দেশের। অবিকল প্রতিমূর্তি, এবং মনে হয় জীবন্ত। আবার বিখ্যাত গায়কের গলায় জুড়ে দেওয়া হয়েছে তারই টেপ করা গান, ঠোঁট নড়ছে—সত্যিই যেন তিনি গান গাইছেন! কে নেই এই মিছিলে! রাজনীতির দিক দিয়ে ইংলণ্ডের রাজপরিবার, লেনিন, স্তালিন, মাও সেতুং, চার্চিল, ঈজিপ্টের আনোয়ার সাদাত, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী, আব্রাহম লিঙ্কন, কামাল আতাতুর্ক, জর্ডানের রাজা হুসেন, ট্রুম্যান, রোনাল্ড রেগন প্রভৃতি; শিল্পী-সাহিত্যিক খেলোয়াড়দের মধ্যে ওয়াল্টার স্কট, চার্লস ডিকেন্স, সেক্সপীয়র, ভলতেয়ার, ভিক্টর হুগো, আলফ্রেড হিচকক, অগাথা ক্রিস্টি, সোফিয়া লরেন, লিজা মেনেলি, রেমব্রাণ্ট, পিকাসো, বিয়ন বর্গ, ম্যাকেনরো প্রভৃতি। এ ধরনের অনুরূপ একটি মোমের মূর্তির প্রদর্শনী আছে আমস্টার্ডাম-এ।

মাদাম টুসড-এর জীবন বড় বিচিত্র। জন্ম ফ্রান্সে, ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে। ছোট বেলার নাম মেরী। বাবা জার্মান সৈনিক, মারা যান তাঁর জন্মের আগে। ৬ বছর বয়সে তাঁর বিধবা মা তাঁকে প্যারিসে নিয়ে আসেন, সেখানে জার্মান ডাক্তার কুর্টিস-এর কাছে নিয়ে যান, চিকিৎসাবিদ্যা ছাড়া মোমের মূর্তি গড়ানো ব্যাপারে ঐ চিকিৎসক তখন একজন নাম করা বিশেষজ্ঞ। তাঁর কাছেই মেরীর হাতেখড়ি। মেরীর বয়স যখন ১৭, তখন তিনি ডাঃ কুর্টিস-এর বন্ধু ও অনুরাগী ভলতেয়ার-এর মোমের মূর্তি তৈরি করেছিলেন। ডাঃ কুর্টিস ছিলেন বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের শুরু। ডাঃ কুর্টিস জড়িয়ে পড়েন এই বিপ্লবে প্রত্যক্ষভাবে। শেষ হল বিপ্লব ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বছর মারা গেলেন ডাঃ কুর্টিস। মেরীকে সব স্বত্ব দিয়ে গেলেন মোমের মূর্তি প্রদর্শনীর। এক বছর পরে মেরী বিয়ে করলেন, হলেন মাদাম টুসড। মূর্তি গড় নিয়ে পড়ে থাকলেন। অনেক উত্থান-পতনের মধ্যে রইলেন অবিচল, ভাল বাজার পেতে এলেন লণ্ডনে। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি প্রভূত নাম-যশের অধিকারী হন, এই অভিনব শিল্পকলার বিকাশ সাধন করেন। মারা যান ৮৯ বছর বয়সে, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে। পরে এটা হয় একট পাবলিক কোম্পানি। এই প্রদর্শনীটি দেখতে বছরে অন্ততঃ ২০ লক্ষ লোক আসে। এমনকি দেখতে আসেন তাঁরাও যাঁরা বেঁচে আছেন অথচ যাঁদের মূর্তি আছে। পাশাপাশি দাঁড়ালে কোন্‌টা আসল, কোন্‌টা নকল চেনা যায় না। আবার আনোয়ার সাদাত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নিজের পোশাক, নিজের মূর্তিতে পরাবার জন্যে ইন্দিরা গান্ধী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শাড়ী, ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রেগন পাঠিয়েছেন তাঁর একটা টাই। পাবলো পিকাসো তাঁর কিছু কিছু জামাকাপড় এবং জুতো খুঁজে পাচ্ছিলেন না। মাদাম টুসড-এর প্রদর্শনীতে এসে দেখেন, তাঁর প্রতিমূর্তির গায়ে ওসব লাগানো, পায়ে ঐ জুতো, কখন যে তিনি পাঠিয়েছিলেন ওগুলো, খেয়াল ছিল না ভুলে গেছিলেন। এদের নিজস্ব স্টুডিও আছে সময় বিশেষে দরকার হলে অন্য জায়গায় গিয়েও যার মূর্তি গড়া হবে তাকে দেখে টেখে আসে, ফটো নেয়। পিকাসোর সবই অদ্ভুত, তিনি

কোনদিন এদের কোন শিল্পীকে দেখা করতে দেননি, অথচ নিখুঁত তাঁর মূর্তি দেখে নিজেই অবাক হয়েছিলেন। প্রদর্শনীর আরেকটা দেখার জিনিস বিভীষিকার ঘর। ঘরে ঢোকার মুখেই বিশ্বত্রাস নাজী দস্যু হিটলারের মূর্তি। ভিতরে নানা অপরাধের এবং অপরাধীর বর্ণনা ও মূর্তি। একবার হঠাৎ আগুন লেগে বেশ কিছু মূর্তির ক্ষতি হয়েছিল। যুদ্ধের সময় বোমাও পড়েছে—তবে সে-সব ক্ষয় ক্ষতি এখন কাটিয়ে উঠেছে। প্রদর্শনীর সব থেকে পুরানো হচ্ছে "ঘুমন্ত সুন্দরী"—ফ্রান্সের পঞ্চদশ লুই-এর শেষ পত্নী—মাদাম ডু বারীর—তৈরি হয়েছিল ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। ইলেকট্রিক-এর কারসাজিতে মনে হবে শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছেন, এত জীবন্ত এখনও!

এরই লাগোয়া লণ্ডন তারামণ্ডল, বিশালত্বে, বৈচিত্র্যে সেটাও মনে রাখার মতো।

আর্টগ্যালারি (ট্রাফালগার স্কোয়ার-এর কাছে), ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ব্রিটিশ ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম, সায়েন্স মিউজিয়াম প্রভৃতিতে ঢুকে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেওয়া যায়। সাজানো গোছানো সব। সহজ করে লেখা, বোঝানো। কোন কোন সময় কোন কোন বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়। লোকের ভিড়েরও অন্ত নেই এ-সব জায়গায়। এর মধ্যে আছেন অনেক মনোযোগী ছাত্র—নোট নিচ্ছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে যাচ্ছে। প্রদীপবাবু পথনির্দেশ দিয়ে দিতেন, হাতে দিতেন লাঞ্চ প্যাকেট। অতএব সারাদিন টোটো কোম্পানি।

নিয়ে গেলেন একদিন তাঁর নিজের বাড়ি—লণ্ডন শহরের উপকণ্ঠে। ঘণ্টাখানেক লাগল বোধ হয় পাতালরেলে যেতে, তারপর কিছুটা হাঁটা পথ। ছিমছাম দোতলা বাড়ি। একরাত ছিলাম ওখানে। লাগোয়া বাগান, কয়েকটি আপেল গাছ, আপেল পড়ে রয়েছে অনেক মাটিতে। এখানে আসেন খুব কম—সপ্তাহান্তে বা পক্ষান্তে একবার। নতুন পড়া আপেলগুলো তুলে নেন—বাকীগুলো পচে সার হয়। অজস্র গোলাপ—প্রদীপবাবুর ঠিকমতো সমাদর না পেয়েও ঝাড়ে বংশে বাড়ছে, নানান রঙের রোশনাই ছড়িয়ে।

আর একদিন সকাল থেকে ছুটোছুটি। একে ফোন, ওকে ডাকা। বিকেলে এসে হাজির জো, প্রদীপবাবুর সাহেব বন্ধু, বয়স যদিও প্রদীপবাবুর থেকে ৩০ বছর বেশি, তবে তারুণ্যের প্রতীক—সানডে টাইমস-এর রিপোর্টার। সঙ্গে আরেকজন, প্রদীপবাবুরই বয়সী, মিঃ কেথ। ইনি ভারতীয়দের খুব পছন্দ করেন। তার কারণ আছে। ওঁর বাবা-মা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ছিলেন বর্মা মুলুকে, তারপর ৪ বছর ছিলেন বোম্বাই-এ—নার্স-এর কাজ করেছেন, হাসপাতালে। মিঃ কেথ-এর জন্মও বোম্বাই-এ। তাই ভারতের কথা বলতে ইনি উচ্ছ্বসিত। জমাট সেদিন রাতের খাবার আসর। খুব ভাল রান্নাও জানেন প্রদীপবাবু। এবং সব বাঙালী খানা—জাফরান দেওয়া সরু দেরাদুন চালের (এক বাংলাদেশীর দোকানে পাওয়া যায়—সেই তেলেভাজার দোকানের পাশে) পোলাও, বেগুনভাজা, ভেড়ার মাংস, চাটনি এবং পায়েস ধরনের পুডিং। ব্রায়ান তো বাঙালীই বনে গেছেন। এ ছাড়াও জো এবং মিঃ কেথও তৃপ্তি সহকারে খেলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা কি? আমার সম্মানে টিকিট নিয়ে এসেছেন এক গানের জলসার। এক একটা টিকিটের দাম ১৫ পাউণ্ড। জো দাম দিতে হবে না, সৌজন্য টিকিট—দিয়েছেন এক সাংবাদিক জোকে—৪টি। ব্রায়ান তো অসুস্থ—যেতে

পারবেন না—চললাম চারজন—প্রদীপবাবু, জো, মিঃ কেথ ও আমি। রাতের বাস। দোতলায় আমরা। মিঃ কেথ খুব হাসছেন, নানা গল্প করছেন ভারতের, কথাও জোরে জোরে। সবাই চাইছে আমাদের দিকে। এরকম উচ্চকণ্ঠ সাধারণতঃ কেউ হয় না। কিন্তু কেথের রক্তে আছে ভারতের হৈচৈ, আটকাবে কে? এ যেন কলকাতার বাসে চেপে হৈ হৈ করতে করতে জলসায় চলেছে!

বিখ্যাত অ্যালবার্ট হল। ৬ হাজার লোক বসতে পারে। ঠাসা ভীড়। গান গাইবেন টম জোন্‌স্‌। শক্ত ভরাট গলা, সুরের বৈচিত্র্য আছে, আবেগ আছে, লোককে কাছে টানতে পারেন। পপ সঙ্গীত। দেখলাম ছেলে-মেয়ে-যুবক-যুবতী-বুড়ো-বুড়ী গুণমুগ্ধ সবাই—এক একটা গান থামে, তারপর হাততালি—কোন মহিলা রুমাল ছুঁড়ে দেন, টম জোন্‌স্‌ মুখ মুছে আবার তা ছুঁড়ে দেন। কেমন যেন বাড়াবাড়ি বলেই মনে হল। তবে এটা সন্দেহ নেই, টম জোন্‌স্‌ একজন উঁচুদরের সঙ্গীতশিল্পী—ইউরোপ এবং আমেরিকায় তাঁর অনুষ্ঠান সবসময় জমজমাট থাকে। একক সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। ঘণ্টা তিনেক। রাত ১২টায় বাস ধরলাম। জলসা-ভাঙা ভীড়। যেন রবীন্দ্রসদন থেকে উঠছি মনে হচ্ছিল।

এক অদ্ভুত বিচিত্র অনাসক্ত মানুষ এই প্রদীপবাবু। মমতায় ভরা দুটো চোখ, হৃদয়-মন। ব্র্যামের তিনিই এখন অভিভাবক। ব্র্যাম—অর্থাৎ ইব্রাহিম বুটম্যান—জাতিতে ইহুদী, কিন্তু লণ্ডনের অধিবাসী ছোট থেকে। কাজ করতেন প্রদীপ-বাবুদেরই অফিসে, প্রদীপবাবুর সঙ্গে সেই সূত্রে আলাপ, পরে ঘনিষ্ঠতা।

ইব্রাহিম বুটম্যানের জীবনে কেমন যেন একটা ক্লান্তি ও হতাশার ছায়া। অথচ স্নেহময়, প্রীতিপূর্ণ হৃদয় তাঁরও। হার্টের একটা অসুখে ভুগছেন, মাঝে মাঝে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন, তখন হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। নিয়মিত ডাক্তারের কাছে যেতে হয়।

সব কিছু করেন প্রদীপবাবু। কাজ থেকে অবসর নেবার পর আছেন প্রদীপবাবুর সঙ্গে—দুখানা ঘর একতলায়, ছোট একটা বাথরুম, একচিলতে রান্নাঘর। মাঝে-মাঝে জলের কল কাজ করে না, তবে খুব বেশি অসুবিধা কিছু নেই। আর, বলেইছি আগে, মধ্য লণ্ডন—এমন জায়গা পাওয়া দুর্লভ—এবং বর্তমান বাজার দর অনুসারে এ জায়গার প্রতি বর্গফুটের দাম ৭০ ডলার (১০০০ টাকা)।

ইব্রাহিম বা ব্র্যাম বিয়ে করেননি। মনের মানুষ ছিল তাঁর, নাম গ্ল্যাডিস, বিয়ে হবার কথাও ছিল, কিন্তু হয়নি শেষ পর্যন্ত। ব্র্যামকে দেখতে হত তাঁর মাকে, তাঁর বোনের ছিল মৃগীরোগ। এঁদের সেবা করতে গিয়ে ব্র্যামের আর বিয়ে করাই হয়ে উঠল না। আর গ্ল্যাডিস? না—তিনিও বিয়ে করেননি—মেট্রন হিসাবে কোথায় কাজ করছেন, লণ্ডন থেকে বেশ কিছু দূরে। তিনিও এখন প্রায় বৃদ্ধা। ভাগ্যক্রমে আমি থাকার সময়েই পড়েছিল গ্ল্যাডিস-এর জন্মদিন। উপহার পাঠিয়েছিলেন ব্র্যামের সঙ্গে প্রদীপবাবুও। পৌঁছে গেছিল সে উপহার জন্মদিনেই। দূরভাষে ভেসে এসেছিল গ্ল্যাডিসের কণ্ঠস্বর—ব্র্যামের আনন্দ দেখে কে—"দীপ—দেখো বলেছি তোমাকে, ঠিক সময়ে পৌঁছুবে, পাবে ও উপহারগুলো, ফোন করবে আমাদের—"

"ব্র্যাম, তুমিই তো রেগে গেলে, বললে গ্ল্যাডিস তার আসছে জন্মদিনে পাবে ওগুলো—"

—"ডাকের কথা কি বলা যায়? তাই তো এক মাস আগে থেকেই তোমায় তাড়া দিই

উপভোগ করছিলাম এই জীবন-নাটক। শিশুর মতো ব্র্যাম। একবার ভারতও ঘুরে এসেছেন। খুব ভাল লেগেছে দার্জিলিং, বিশেষ করে আগ্রার তাজমহল! স্নেহ-দরদ দিয়ে আগলে রেখেছেন ব্র্যামকে প্রদীপবাবু। ওষুধ ঠিক সময়ে খাইয়ে দেন, বা মনে করিয়ে দেন। একদিন বললেন, "ব্র্যাম, তোমার ভারত থেকে আনা জামাটা কোথায়? পর।" আর, রবিবার সকালে, কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত, কিছু নজরুলসঙ্গীত, বা রবিশঙ্করের সেতার ব্র্যামের খুব পছন্দ।

এই ঘরের এক কোণে হঠাৎ এক সন্ধ্যায় একটা চিড় ধরা ফাটল দেখলাম। —"কী ব্যাপার?" জানতে চাইলাম।

ব্র্যামের মুখ কেমন যেন শুকনো হয়ে গেল! প্রদীপবাবু ব্র্যামের কাছে সরে বসলেন।

—"না—না দীপ, আমি বেশ শক্ত হয়ে গেছি। শোন ডাক্তার, ঐ দাগটা হিটলারের বোমার আঘাতের চিহ্ন। ১৯৪০-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪১-এর মে পর্যন্ত জার্মান দখলী-কৃত প্যারিস থেকে সপ্তাহে একবার ওরা বোমা ফেলতে আসত—এখানেই তখন থাকতাম মাকে নিয়ে—একদিন একটা সেল ফাটল আমাদের সামনেই—মা তো অজ্ঞান হয়ে গেলেন, ওঁকে নিয়ে কিছুদিনের জন্যে অন্য জায়গায় উঠে যেতে হল। না—আমরা কেউ মরিনি—কিন্তু উড়ো-জাহাজের সেই শব্দ—মায়ের সে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া—সব মনে পড়ে যায় ঐ দাগ দেখলে—তাই দেখো, চেয়ার ঘুরিয়ে নেওয়া আছে আমার—চোখে যাতে ঐ চিড়টা না পড়ে!" ভয়াবহ সে-সব দিন কেউ কি মন থেকে মুছে ফেলতে পারে? কে জানে সেটাও আর একটা কারণ কী না ব্র্যামের বিয়ে না করার! কারণ, হিটলার যদি লণ্ডনে আসত, সেখানকার একটা ইহুদীকেও সে কি আস্ত রাখত? সেই জীবনমৃত্যুর অনিশ্চয়তার দোলায় দুলতে হয়নি কি ব্র্যামকে, ভুগতে হয়নি কি অস্তিত্বের সঙ্কটে?

এবং প্রদীপবাবু? ওঁর স্ত্রী থাকেন কলকাতায়। নিজের অফিসের কাজ। ব্র্যাম-এর সেবা, নিজের দেশের এবং বিদেশের বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আছেন,—উদার, আত্মভোলা, এবং কোন কোন মুহূর্তে বুঝি আত্মমগ্নও। ব্যবহারে নেই কোন চাঞ্চল্য, উগ্রতা, নেই কোন রকম অনীহার ভাব। শান্ত, ধীর, স্থির, বিচক্ষণ, প্রত্যয়ী। অথচ তাঁর অন্তরের গভীরেও বুঝি একটা আটলান্টিক মহাসাগর হাহাকার করছে! সহজে তা বোঝা যায় না, পরিমাপ করা তো দূরের কথা!

এবার বিদায় নেবার পালা। হিথরো বিমান-বন্দর থেকে রাতের বিমানে একেবারে বোম্বাই ফ্র্যাঙ্কফুর্টে আধ ঘণ্টার বিরতি। ফ্র্যাঙ্কফুর্টেও চমক! প্রমাণ হল পৃথিবী গোল। ডঃ মাইতি এবং ডঃ সরকারের সঙ্গে তো ছাড়াছাড়ি হয়ে-গেছিল সেই প্যারিসে! কী আশ্চর্য—দেখি ওঁরা দুজন উঠছেন ফ্র্যাঙ্কফুর্ট থেকে এই বিমানেই। কী আনন্দ তখন! এর মধ্যেই মন খারাপ হয়ে গেল যখন শুনলাম, প্যারিসে এবারেও পকেটমার হয়েছে ডঃ মাইতির—কয়েকশো টাকা—অদ্ভুত নতুন কায়দায়—চলমান সিঁড়িতে ওঠার সময়—ডঃ মাইতির সামনের লোক কিছুতেই উঠছে না—অনবরত পা নামাচ্ছে ওঠাচ্ছে, সিঁড়ি উঠছে। কাজেই ডঃ মাইতিও উঠতে পারছেন না, তাঁকেও লেফট-রাইট করতে হচ্ছে। এই ফাঁকে কখন—বেচারা ডঃ মাইতি···

কিন্তু সব ছাপিয়ে মনে পড়ছিল হিথরোতে 'জো'র একটা কথা। প্রদীপবাবু এবং জো দুজনে এসেছিলেন আমাকে বিদায় জানাতে—পাতাল-রেলে। শেষ অবধি সঙ্গে ছিলেন। কী করে ভুলি লণ্ডনের এ কটা দিন? লণ্ডন মনে পড়লেই মনে পড়বে এঁদের কথা সর্বাগ্রে। মানুষ নিয়েই যদি দেশ হয়, তাহলে লণ্ডনের এই সব সাধারণ অথচ অসাধারণ মানুষ তাঁদের হৃদয়ের স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা, আবেগ ও উষ্ণতা দিয়ে আমার এই কটা দিনকে সুন্দর, রমণীয়, প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। আমি ঋণীই থেকে গেলাম। অনেক সাজিয়ে গুছিয়ে, ভাষা হৃদয় থেকে বের করে বলছিলাম জোকে, "কত রকম ভাষায় এবং কত ভাবে তোমাদের কাছে আমার হৃদয়ের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব—"

জো হাসল, বলল,—"বল—ধন্যবাদ।"

—"ধন্যবাদ।"

এই একটি শব্দ যে এত অর্থবহ, এর আগে কোনদিন তা উপলব্ধি করিনি।
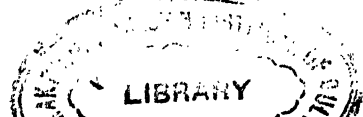
সুভাষচন্দ্রের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পৌষ, ১৩৭২ সংখ্যার পর]

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বেরোয় সুভাষচন্দ্রের সুবিখ্যাত 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল্ : ১৯২০—৩৪' গ্রন্থ। লেখকের বয়স ৩৭। এই গ্রন্থের শেষে "এ গ্লিম্প্‌স্ অব দি ফিউচার" অধ্যায়ে তিনি পুনশ্চ নতুন দলের পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। শ্রমিক-কৃষকের এই দলের আদর্শের কথা বলতে গিয়ে তিনি জহরলালের তৎকালীন একটি বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। জহরলাল বলেছিলেন : পৃথিবীকে কমিউনিজম্ ও ফ্যাসিজম্-এর বিরুদ্ধে কোন একটিকে বেছে নিতে হবে; তিনি ফ্যাসিজম্-এর প্রচণ্ড বিরোধী; কমিউনিজম্‌কেই বরণের তিনি পক্ষপাতী। সুভাষচন্দ্র বলেন, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে কোন একটি মতবাদকে চূড়ান্তভাবে গ্রাহ্য করা যায় না। যদি ইতিহাসের গতি থেমে না যায়, যদি সৃষ্টির পথ রুদ্ধ না হয়, তাহলে কখনই বলা যাবে না—এই একটি পথই শ্রেয়ঃ পথ। থীসিস, অ্যান্টিথীসিসের সংঘর্ষের পরে সিনথীসিস। যা এক যুগের সিনথীসিস, তা পরের যুগে থীসিস, ইত্যাদি। সুতরাং তিনি ফ্যাসিজম্ শব্দটির বিরুদ্ধে পণ্ডিতী অস্পৃশ্যতাবোধ না রেখে, তার থেকে জাতীয়তার প্রেরণা ইত্যাদি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষণীয় বস্তুকে শিক্ষা করে, গ্রাহ্যকে গ্রহণ করে, তিনি সমন্বয়ে উপনীত হতে চেয়েছেন। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের অভিনব দানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেছিলেন—ভারতবর্ষ যদি ঐ প্রকার নতুন বস্তু দান করতে পারে—কে জানে এই সমন্বয়ের দ্বারা পৃথিবীর সভ্যতায় আর কোন্ বস্তু সে উপহার দেবে! পরিষ্কার বলেছিলেন, ভারতবর্ষ সোভিয়েত রাশিয়ার নতুন এক সংস্করণ হয়ে উঠবে না। কমিউনিজম্-এর বিরুদ্ধে তিনি পাঁচটি আপত্তি উত্থাপন করেন, তার তিনটি বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : এক, কমিউনিজম্-এ জাতীয় ভাবানুভূতির প্রশ্রয় নেই (হায়, বর্তমানে কমিউনিস্ট দেশগুলি ঘোর জাতীয়তাবাদীদের চেয়েও ঘোরতর জাতীয়তাবাদী, এবং স্ব-রাষ্ট্রীয় ভূগোলের সংরক্ষণে, এমনকি প্রভাব-পরিমণ্ডল বৃদ্ধিতে, তারা বজ্রধর)। দুই, কমিউনিজম্ নাস্তিক্যবাদী ও ধর্মবিরোধী। তিন,—"কমিউনিস্ট থিয়োরীর প্রধান বস্তু ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা।" সুভাষচন্দ্র বলেছেন, ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষের পক্ষে জাতীয়তাবাদ ত্যাগ করা সম্ভব নয়, ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বা নাস্তিক্যবাদ ও ধর্মবিরোধিতাকে গ্রহণ করাও সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র সমন্বয় চেয়েছিলেন—এবং সেই সমন্বয়কে সাম্যবাদ নামে অভিহিত করেন।

"That synthesis is called by the writer Samyavada—an Indian word, which means literally 'the doctrine of synthesis or equality.' It will be India's task to work out this synthesis."

শেষ ভারতত্যাগের অল্প পূর্বে লিখিত 'ফরোয়ার্ড ব্লক-এর যৌক্তিকতা' প্রবন্ধে (১. ১. ১৯৪১; বয়স ৪৪) সুভাষচন্দ্র যদিও তাত্ত্বিক আলোচনায় বেশি মনোযোগ দিতে পারেননি, ফরোয়ার্ড ব্লক স্থাপনের পিছনে কোন্ ঐতিহাসিক কার্যকারণ ছিল, এবং এই দল কোন্ কর্মসম্পাদনের জন্য গঠিত—সেই বক্তব্যই তুলে ধরেছিলেন, তবু এই প্রবন্ধে শেষে না বলে পারেননি :

"এই দল বহিঃপৃথিবী থেকে যে-শিক্ষা পাওয়া সম্ভব তা আত্মসাৎ করতে, এবং অন্য

প্রগতিশীল দেশগুলির অভিজ্ঞতার সাহায্যে লাভবান হতে প্রস্তুত। এই দল মনে করে—প্রগতি কিংবা বিবর্তন নিত্য ব্যাপার—সে ধারায় ভারতবর্ষেরও দান করার যোগ্যতা আছে।" [ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল্, ১৯৩৫—৪২, পৃঃ ১০১]

সুভাষচন্দ্রের জীবনের শেষ উল্লেখযোগ্য ভাষণ—টোকিও ইউনিভার্সিটিতে (নভেম্বর ১৯৪৪, বয়স ৪৭)। এই ভাষণে তিনি ভারতবর্ষের মৌল সমস্যার আলোচনা করেন—কিন্তু তা করবার আগে সংক্ষেপে ভারতের ইতিহাসধারার পরিচয় দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের বহুকথিত উক্তি নিজ কণ্ঠে তুলে নিয়ে বক্তৃতা-সূচনায় বলেছিলেন, ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন সভ্যতার অধিকারী, কিন্তু মিশর, ব্যাবিলন, ফিনিসিয়া বা গ্রীসের মতো তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি মৃত নয়—এখনও জীবিত। "আমাদের পূর্বপুরুষেরা দু'হাজার কি তিন হাজার বছর আগে যে চিন্তা, অনুভূতি ও জীবনাদর্শকে গ্রহণ করে বর্তমান ছিলেন, বর্তমান ভারতবাসী আমরা এখনও মূলগতভাবে ঠিক তারই অনুবর্তন করছি। অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত এদেশে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে, যা একদিক থেকে ইতিহাসে অসামান্য ঘটনা।" তাই বলে এদেশের জীবনে পরিবর্তন ঘটেনি তা নয়। পরিবর্তনের রূপরেখা দেবার পরে সুভাষচন্দ্র প্রশ্ন তুলেছেন—এই প্রাচীন জাতির প্রাণশক্তি কি নিঃশেষিত হয়ে গেছে? [এই প্রশ্ন সুভাষচন্দ্র অন্যত্রও তুলেছেন], তাঁর উত্তর—না, তা হয়নি। ভারতে এখনও যথেষ্টই প্রাণশক্তি আছে, যা পরাধীনতার মধ্যেও নব নব সৃষ্টিতে উচ্ছ্বসিত। [স্বামীজী-প্রসঙ্গে নিবেদিতার উক্তি এখানে মনে পড়েই: "স্বামীজীর কাছে এদেশ নবীন। ভারতের প্রাণশক্তি অব্যবহৃত। স্বামীজীর স্বপ্নের ভারত ভবিষ্যতের গর্ভে।...শুধু দেখতে হবে, ভারত যেন তার নিজস্ব জীবনের মধ্যেই জীবন লাভ করে—অন্যের অনুকরণ নয়। বিদেশীদের কাছ থেকে আদর্শ ধার না করে সে যেন নিজের অতীত ইতিহাসের সত্যরূপের কাছ থেকে প্রেরণা পায়।"] সুভাষচন্দ্র সুস্পষ্টভাবে বললেন, "আমরা প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে নতুন আধুনিক জাতি গঠন করতে চাই।" তিনি জানালেন, সমাজতান্ত্রিক রীতিতে ভারতবর্ষের পুনর্গঠন অবশ্যই কাম্য, কিন্তু "আমরা আমাদের নিজের পথই গ্রহণ করব। অপর দেশের অভিজ্ঞতার শিক্ষা অবশ্যই নেব, কিন্তু যতই যা হোক সমস্যা যখন ভারতের তার সমাধান ভারতীয় পরিবেশে ভারতীয় পদ্ধতিতেই করতে হবে।" তিনি আরও জানালেন, দশ বছর আগে ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল্ গ্রন্থে অবলম্বনীয় রাজনৈতিক দর্শন সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য এখনও বলবৎ। তিনি সমন্বয় চাইছেন। "বিদেশী প্রভাবে গঠিত কমুনিস্ট পার্টির মতো কোনো পার্টিতে ভারতের প্রয়োজন নেই;" ভারতবর্ষ রাশিয়ার কাছ থেকে জাতীয় পুনর্গঠনের পরিকল্পনা জানতে চায়, তার রাজনৈতিক পদ্ধতি নিতে নয়, ইত্যাদি। এই বক্তৃতাতেও (জীবনের শেষ স্মরণীয় ভাষণে) তিনি কমিউনিজমের বিরুদ্ধে তাঁর পূর্বকথিত আপত্তিগুলি উত্থাপন করেছিলেন—কমিউনিজম্ ধর্ম সম্বন্ধে অনুচিতভাবে আক্রমণশীল, তাতে জাতীয় ভাবানুভূতি সম্বন্ধে সমাদর নেই, তা মানবজীবনে অর্থনৈতিক ব্যাপারকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছে। সুভাষচন্দ্র পুনশ্চ দৃঢ়ভাবে বললেন: "দর্শনের কোন ছাত্র স্বীকার করবে না যে, মানবপ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। পুরাতন অভিজ্ঞতার ভিতর থেকে নতুন পদ্ধতি বেরিয়ে আসেই। সুতরাং ভারতবর্ষ বিরোধী মতসমূহের মধ্য থেকে উত্তম বস্তু গ্রহণ করে সমন্বয়ী পদ্ধতি নির্মাণ করার চেষ্টা করে যাবেই।"

এই যাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে মার্কসবাদী বলা যাবে কি করে? সুভাষচন্দ্র নিজেকে কদাপি কোথাও মার্কসবাদী বলে চিহ্নিত করেননি। "ফরোয়ার্ড ব্লকের ভূমিকা" নামক রচনায় (১২. ৮. ১৯৩৯) তিনি একবার বলেছিলেন বটে—"একটা সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলে মার্কসবাদী দলের বিকাশের উপযোগী ভূমি প্রস্তুত হতে পারে।" ['ক্রসরোডস্', পৃঃ ১৭৯]। কিংবা তিনি মার্কসবাদিরূপে পরিচয়-দানকারী কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দলকে তিরস্কার করেও বলেছেন—তোমরা নিজেদের মার্কসবাদী বলছ অথচ তদনুযায়ী দক্ষিণপন্থীদের বিরোধিতা করছ না। এর সাহায্যে যাঁরা সুভাষচন্দ্রকে মার্কসবাদী বলতে চাইবেন তাঁরা শূন্যে সৌধনির্মাণের স্থপতি-গৌরব অবশ্যই পাবেন। তবে একই সঙ্গে সুভাষচন্দ্রকে তাঁরা লাঞ্ছিতও করবেন, কারণ তাঁদের বিবেচনায়—সুভাষচন্দ্র হয় (ক) মার্কস-বাদ কাকে বলে জানতেন না, (খ) না হয় তিনি ভণ্ড ছিলেন, যেহেতু তাঁর অভীপ্সিত দলকে মার্কসবাদী বলা না গেলেও রাজনৈতিক সুবিধা-বাদে তাকে মার্কসবাদী বলতে চেয়েছেন। কিন্তু দর্শনের ও রাজনীতি-দর্শনের এই প্রথমশ্রেণীর ছাত্র মার্কসবাদ কাকে বলে জানতেন না, হতে পারে না। তিনি নিজেই বলেছেন, ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা মার্কসবাদের মৌল নীতির অন্তর্গত। সুভাষচন্দ্রের জীবন ও রচনার সঙ্গে সামান্যমাত্র পরিচিত ব্যক্তিরা জানেন, তিনি কী পরিমাণে ধর্মপ্রাণ ছিলেন। "সর্বক্ষণ গীতা ও চণ্ডী তাঁর সঙ্গে থাকত"—আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়ক সম্বন্ধে এই সাক্ষ্যকে না হয় সরিয়েই রাখলাম, কিন্তু তিনি ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ অক্টোবর তারিখে মুক্তিলাভের দাবিতে আমরণ অনশনের প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করে প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেণ্ট-কে যে-পত্র লিখেছিলেন, তার এই অংশকে অগ্রাহ্য করব কি করে? —"I repeat that this letter, written on the sacred day of Kali Pujah·· is··· an affirmation of one's faith," তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভায় উদ্দেশে লিখিত ২৫. ১২. ৪০ তারিখের পত্রেও অসংকোচে লিখেছিলেন: "The step that I have now taken is not an ordinary fast. It is the result of several months' mature deliberation, finally sealed by a vow prayerfully taken by me on the sacred day of Kali Pujah." [*Crossroads*, P. 336—45].

সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন—কালীপূজার পবিত্র রাত্রে লিখিত তাঁর পত্র (ও সংশ্লিষ্ট আরও দু-একটি পত্র) যেন তাঁর 'পোলিটিক্যাল টেস্টামেণ্ট' রূপে সযত্নে সরকারী মহাফেজখানায় রক্ষিত হয়।

এই পত্রগুলিতে সুভাষচন্দ্র যা লিখেছিলেন—বিবেকানন্দ রক্তের মধ্যে মিশে থাকলেই তবে সেভাবে লেখা সম্ভব। আমি মূল লেখার কয়েক লাইন উদ্ধৃত করছি:

"In this mortal world everything perishes and will perish—but ideas, ideals and dreams do not. One indiv-idual may die for an idea but that idea will, after his death, incarnate itself in a thousand lives.···

"What greater solace can there be than the feeling that one has lived and died for a principle? What higher satisfaction can a mass possess than the knowledge that his spirit will beget kindred spirits to carry on his

unfinished task? What better reward can a soul desire than the certainty that his message will be wafted over hills and dales and over the broad plains to every corner of his land and across the seas to distant lands? What higher consummation can life attain than peaceful self-immolation at the altar of one's Cause?...

"This is the technique of the Soul. The individual must die, so that the nation may live. Today I must die, so that India may live and may win freedom and glory."

বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করতে পারি এই ভরসা নিয়ে—যে অজস্র তথ্য আমরা কালানুক্রমিক-ভাবে সাজিয়ে দিয়েছি তার থেকে অবশ্যই প্রতীয়মান হয়েছে—১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র ভারতীয় সংস্কৃতি-ভিত্তিতে গঠিত, বিবেকানন্দ-উপস্থাপিত সমাজতন্ত্রের ধারণাকেই ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত (অর্থাৎ তাঁর জ্ঞাত জীবনের শেষ অবধি) পোষণ করে গেছেন।

(ঘ) "রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দেই সমন্বয়ের পূর্ণতা..."

বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রের পশ্চাৎপটে বা ভিত্তিভূমিতে কী ছিল—তার দার্শনিক প্রস্থান কী? অবশ্যই বেদান্ত। সুভাষচন্দ্র তা জানতেন। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমন্বয়তন্ত্রের কথা বলবার সময়ে বেদান্ত কথাটি প্রায় এড়িয়ে গেছেন—যা কিন্তু অরবিন্দ তাঁর স্বদেশী যুগের রাজনৈতিক রচনা-বলীতে করেননি। অরবিন্দ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বৈদান্তিক সমন্বয়বাদের পূর্ণতার কথাই বারবার বলেছেন (সে প্রসঙ্গ অন্যত্র এসেছে), এবং রাজনীতিতে সেই বৈদান্তিক সমন্বয়বাদ প্রবেশ করানোর চেষ্টা করে গেছেন। সুভাষচন্দ্র সম্ভবত, আমাদের অনুমান, বেদান্ত কথাটি বিশেষভাবে হিন্দুধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায়, রাজনীতিতে তার ব্যবহারে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু ঐ বেদান্তেরই অন্তর্নিহিত তত্ত্বের উপর যেহেতু তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন দাঁড় করাতে চেয়েছেন তাই সরলীকৃত একটি সূত্র বেছে নিয়েছিলেন—'এক ও বহু'র সমন্বয়। এই 'এক ও বহু'র সমন্বয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কিভাবে করেছেন—পরবর্তী কালে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ কিভাবে হয়েছে, বা হতে পারে—সুভাষচন্দ্র অবিরাম তা বলে গেছেন। আমরা ইতিমধ্যে 'ভারত পথিক' গ্রন্থ, রংপুর-ভাষণ ও হুগলী-ভাষণ থেকে তার রূপ অল্পবিস্তর দেখে এসেছি, পরবর্তী আরও কিছু বক্তব্য লক্ষ্য করব—তার আগে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি নিবেদিতার বিবেকানন্দ-বিষয়ক যে রচনাংশ দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত ছিলেন সেই অংশ উদ্ধৃত করতে চাই। নিবেদিতার এইসব রচনা তাঁর বহুপঠিত, তা আগেই জেনেছি।

নিবেদিতা স্বামীজীর ইংরেজী রচনাবলীর ভূমিকা লিখেছিলেন। তার একাংশে তিনি বিবেকানন্দের চিন্তার নূতনত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন—স্বামীজী 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—এই অদ্বৈত-দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করলেও, সেইসঙ্গে বলেছেন—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত—একই বিকাশের তিনটি স্তর। নিবেদিতা তারপর লিখেছেন:

"এই ঘোষণাতেই আমাদের আচার্যদেবের জীবনের সর্বোচ্চ তাৎপর্য প্রকাশিত—এইখানেই তিনি কেবল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনভূমি হননি—অতীত ও ভবিষ্যতেরও মিলনকেন্দ্র হয়েছেন। 'বহু' এবং 'এক'—যদি অখণ্ড সত্যবস্তু হয়—তাহলে কেবল সর্বপ্রকার উপাসনাপদ্ধতি

নয়—সর্বপ্রকার কর্মপদ্ধতি, সর্বপ্রকার সংগ্রাম-পদ্ধতি, সর্বপ্রকার সৃষ্টিপদ্ধতি একই সত্যোপলব্ধির বিভিন্ন পথ হয়ে দাঁড়ায়। আধ্যাত্মিক ও লৌকিকে অতঃপর আর পার্থক্য নয়। এখন শ্রমই প্রার্থনা। জয়ই ত্যাগ। এখন জীবন মানে ধর্ম। অর্জন ও ধারণ—ত্যাগ ও বর্জনের মতোই জীবনের কঠিন দায়।

"এই উপলব্ধিই বিবেকানন্দকে কর্মাদর্শের মহান প্রচারক করেছে—সে কর্ম অবশ্য জ্ঞান ও ভক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়—পরন্তু তাদের প্রকাশক। তাঁর কাছে ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের উপযুক্ত মিলন-স্থল যেমন সাধুর কুঠিয়া বা মন্দিরদ্বার, তেমনি তা কারখানা, পাঠগৃহ, খামার ও শস্যক্ষেত্র। তাঁর নিকট মানবসেবা ও ঈশ্বরারাধনায় পার্থক্য ছিল না—পার্থক্য ছিল না পৌরুষে ও ধর্মবিশ্বাসে, যথার্থ ন্যায়বোধে ও আধ্যাত্মিকতায়। একদিক দিয়ে দেখলে, তাঁর সকল বাণীই এই মৌল প্রত্যয়েরই ভাষ্য। তিনি একবার বলেছিলেন—'কলাশিল্প, বিজ্ঞান ও ধর্ম—একই সত্যকে প্রকাশ করার তিনটি উপায়। কিন্তু সে সত্য উপলব্ধি করতে হলে অদ্বৈতবাদকে গ্রহণ করতেই হবে'।"

সুভাষচন্দ্র উল্লিখিত চিন্তা-পরিধির মধ্যেই আবর্তিত হয়েছেন। যাঁরাই ঘনিষ্ঠভাবে সুভাষ-চন্দ্রের জীবন ও চিন্তার অনুশীলন করেছেন তাঁরাই তা স্বীকার করবেন। মনীষী বিপ্লবী অনিল রায়, যাঁকে বলা যায় বিপ্লবের বজ্রপুষ্প—'নেতাজীর জীবনবাদ' নামক পুস্তকে এর স্বীকৃতিতে যা লিখেছেন তা আমরা অন্যত্র অনিল রায়-প্রসঙ্গে উৎকলন করেছি। [ক্রমশঃ]

আত্মজ্ঞানী

শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায়

কত না রূপের ছটা চক্ষে দেয় ধরা,
আকুল অন্তরে হেরি মুগ্ধ পুলকিত।
অন্তরাল হলে চিত্ত কত বিষাদিত,
মনে হয় পুনরায় ফিরে আসে যেন।

কত শব্দ কত মতে কর্ণে আসি পশে,
কত স্নেহ সম্ভাষণ—প্রাণ মন কাড়া;
পরকে আপন করে নিমেষের তরে
বদ্ধ হয়ে পড়ে প্রীতি মায়া মোহ জালে।

রসনার তৃপ্তি হয় রস আস্বাদনে,
মিটে যায় ক্ষুধা তৃষ্ণা; তবু লালায়িত
আরো কিছু ভাল পেতে অধিক সুস্বাদু।
যত পায় লোভ তত পাল্লা দিয়ে চলে।

জিজ্ঞাসু হইয়া তীব্র প্রশ্ন শত শত
ধেয়ে চলে চারিদিকে জানিতে সমগ্র,
শ্রান্ত ক্লান্ত দিশাহারা অবসন্ন দেহ
হয় না জীবনে আর জানিবার শেষ।

জ্ঞানের পিপাসা নিয়ে যায় গুরুগৃহে,
অধ্যয়ন জপ তপ; ঢুঁড়ি লক্ষ পুঁথি
শেষ তবু নাহি হয় জ্ঞানের ভাণ্ডার,
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা শুধু মরে মাথা কুটে।

ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি আত্মজ্ঞানী
তাই বুঝি রন বসে সদা মৌন ধ্যানী।

কবি দুঃখী শ্যাম ও 'গোবিন্দ মঙ্গল'

শ্রীরাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী

'গোবিন্দ মঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা দুঃখী শ্যাম দাস আজ বাঙালীর কাছে বিস্মৃত। অথচ একটি বিশেষ যুগে উক্ত কাব্যটি বাঙালীর হৃদয় জয় করেছিল।

'গোবিন্দ মঙ্গল' কবির এক অতুল্য কীর্তি। এই কাব্যটির মধ্যে তাঁর সৃজনী-শক্তি ও কবিত্ব-শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রমাণিত হয়েছে।

দুঃখী শ্যামের নিবাস,—মেদিনীপুর জেলার হরিহরপুর গ্রাম। পিতার নাম, শ্রীমুখ। মাতা—ভবানী। কায়স্থ পরিবারে কবির জন্ম। তাঁর কৌলিক উপাধি, 'দেব'; কিন্তু 'গোবিন্দ মঙ্গল' কাব্যে তিনি 'দাস' উপাধিতে পরিচিত। কবির জন্মকাল সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে অনুমিত হয়, ষোড়শ শতকের কোন এক সময়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। কারো মতে তিনি সপ্তদশ শতকের লোক; আবার অনেকে মনে করেন, তিনি অষ্টাদশ শতকের কবি। সুপণ্ডিত ও যশস্বী ভাষাচার্য ডঃ সুকুমার সেন দুঃখী শ্যামকে ষোড়শ শতকের কবি বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, দুঃখী শ্যামের পিতা এবং মহাভারত খ্যাত কাশীরাম দাসের খুল্ল পিতামহ শ্রীমুখ, অভিন্ন ব্যক্তি। আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কবি জানিয়েছেন :

'শ্রীমুখ জনম দাতা সুমতি ভবানী মাতা
যাঁর পুণ্যে নিরমল তনু।
দুর্লভ জগত রঙ্গ দেখি শুনি সাধু-সঙ্গ
শিরে বন্দোঁ পিতৃপদ রেণু॥'

'গোবিন্দ মঙ্গল' একটি গীতিকাব্য। পদগুলি সুমধুর,—নানা ছন্দ-বৈচিত্র্যে হৃদ্য। প্রধানতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে কাব্যটি রচিত। এ ছাড়া ভাগবতের প্রথম, দ্বিতীয়, দশম ও একাদশ স্কন্ধের অংশবিশেষ কাব্যরচনায় গৃহীত হয়েছে। পুরাণ হতেও কবি বিষয়বস্তুর উপাদান কিছু কিছু সংগ্রহ করেছেন।

লীলাকাব্য হিসাবে বাংলাসাহিত্যে গোবিন্দ-মঙ্গলের একটি বিশেষ স্বীকৃতি আছে। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের উল্লেখ্য ঘটনাবলী এই কাব্যের বিষয়বস্তু। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হতে মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত স্মরণীয় ঘটনা সমুদয় এই কাব্যে গীত-ছন্দে বিবৃত হয়েছে। তবে বৃন্দাবন ও মথুরা লীলাকেই কবি সমধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। বৈষ্ণব ভাব-বিশ্বাসের কল্যাণে ভাগবতের ঐ দুই লীলাংশ একসময় বিশেষ ভক্তি ও জনপ্রীতির আকর হয়েছিল। বৈষ্ণব-পদাবলীর বিভিন্ন পালাগানে কৃষ্ণলীলা গীত-সৌন্দর্যে রসরূপ পেয়েছে। গোবিন্দ মঙ্গলের গানগুলিও রূপ-রস-সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ। ভাগবতের অনুপম মাধুরী ভক্ত কবি দুঃখী শ্যামকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর কবিপ্রাণ রাধাকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ প্রেমলীলারসে বিহ্বল হয়েছিল। শ্রীগোবিন্দের অগোচর লীলামাধুর্য যাতে সর্বস্তরের জনসাধারণ অবাধে উপভোগ করতে পারে, সেই জন্য মরমী কবি 'শ্রীগুরু চরণ ভরসা' করে অপরূপ ভাষা ছন্দে 'গোবিন্দ মঙ্গল' গীতিকাব্য রচনা করেছেন। এর প্রতিটি অংশে কবি ধুয়া ও রাগ-রাগিণী সন্নিবেশ করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ ইত্যাদি ছাড়াও কবি তৎ-কালীন কথক ও পাঁচালী-গায়কদের কাছে নানা আখ্যায়িকা শুনে সেগুলি স্বীয় গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। রচনা অতি সরল, বর্ণনা প্রাঞ্জল এবং কবিত্ব অতি মধুর। স্রোতস্বিনীর সুমধুর কলধ্বনির মতো সুরের লহর তুলে পাঠকের শ্রবণ-পথে ভেসে বেড়ায়। এখানে কোথাও উপমা ও

অলঙ্কার প্রয়োগের চাতুর্য নেই, নেই কোন পাণ্ডিত্যপ্রকাশের ক্ষীণতম প্রয়াস। এই কাব্য সহৃদয় পাঠকের মনে এক অপরূপ কৃষ্ণ-অনুরক্তিময় ভাবাবেশ সৃষ্টি করে,—কৃষ্ণভক্তি ঋদ্ধতায় আবিষ্ট করে। এখানেই ভক্তকবি দুঃখী শ্যামের অক্ষয় সিদ্ধি এবং তাঁর কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা।

'গোবিন্দ মঙ্গল' কবির পরিণত বয়সের রচনা। কাব্যটি ষোড়শ শতকের রচনা বলেই অনুমিত হয়। পরিণত বয়সে কবি কৃষ্ণপ্রেম মহিমায় প্রভাবিত হয়েছিলেন; নিত্যদিনের জীবন-চর্চায় মধুস্বাদী কৃষ্ণনামকে জপমালা স্বরূপ বরণ করে নিয়েছিলেন। স্বরচিত গ্রন্থটি সঙ্গে করে মেদিনীপুরের নানা জায়গায় গান করে বেড়াতেন। ফুল-চন্দনসহ ভক্তি সহকারে গ্রন্থটিকে নিত্য পূজা করতেন। আজও তাঁর বাড়িতে এই গ্রন্থ ভক্তিনিষ্ঠায় পূজিত হয়ে আসছে।

'গোবিন্দ মঙ্গল' কবির ভক্তপ্রাণের এক স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। ভক্তিবিহ্বল কবি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ ও মথুরা লীলামাধুর্য একদিন বাঙালীর ঘরে ঘরে পরিবেশন করেছিলেন। তাঁর পূর্বে ভাগবত অবলম্বনে যাঁরা বাংলাভাষায় কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গাথা রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মালাধর বসু (গুণরাজ খাঁ), মাধবাচার্য, কৃষ্ণদাস, রঘুনাথ ভাগবতাচার্য, দ্বিজ মাধব প্রভৃতি। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্যগ্রন্থটি বাংলাভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম অনুবাদ। 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' নিঃসন্দেহে একটি ঐশ্বর্যগুণান্বিত কাব্য। এই কাব্যটি রচনা করে মালাধর বসু গৌড়েশ্বর কর্তৃক 'গুণরাজ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী' ভাগবতেরই এক নিষ্ঠাপূর্ণ অনুবাদ। রচনাটির শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে চৈতন্য মহাপ্রভু কবিকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন :

'এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য।
ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য॥'

মাধবাচার্যের 'গোবিন্দ মঙ্গল' একটি হৃদয়স্পর্শী রচনা। এই রচনা-কর্মে পাণ্ডিত্যের চেয়ে কবির কৃষ্ণানুরক্তির ভাবাতিশয্য সমধিক প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিজমাধবের 'কৃষ্ণমঙ্গল' গ্রন্থটিও ভাগবতের এক নিষ্ঠাপ্লুত মূলানুবাদ রচনায় অনুবাদের বৈশিষ্ট্য কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। কৃষ্ণদাসের 'কৃষ্ণমঙ্গল' কোন অনুবাদ রচনা নয়। তবে তাঁর কবি-কর্মে দ্বিজমাধবের রচনা কৃতির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ভাগবত, হরিবংশ, পুরাণ এবং সেই সঙ্গে লৌকিক উপাখ্যানগুলির সংমিশ্রণে কৃষ্ণদাসের 'কৃষ্ণমঙ্গল' গড়ে উঠেছে। রচনাটি মধুস্বাদী।

উপরি-উক্ত রচনাগুলির মধ্যে কোথাও কৃষ্ণ-চরিতের পূর্ণাঙ্গ চিত্র বিধৃত হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রচনাগুলি আংশিক এবং খণ্ডাকারে বিবৃত। দুঃখী শ্যামের 'গোবিন্দ মঙ্গলে'ও কৃষ্ণ-চরিতের সম্পূর্ণ চিত্র অনুপস্থিত। তবু তাঁর কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের জীবনসম্পর্কিত প্রধান ঘটনাগুলি বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণ-কল্পনার কল্পতীর্থে অবগাহন করে কবি কৃষ্ণচরিতের একটি পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং পরম আগ্রহে কৃষ্ণচরিতের উপাদানগুলি বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। তৎ-কালীন লৌকিক পালাগীতি ও উপাখ্যান সমূহ পুঙ্খানুরূপে বিচার বিশ্লেষণ করে কৃষ্ণজীবনের নানা ঘটনার তথ্য অনুসন্ধান করেছিলেন। নিঃসন্দেহে এ এক মহৎ প্রচেষ্টা।

বাংলায় একসময় 'কানু' ছাড়া গীত ছিল না। কৃষ্ণ-গানের রসমাধুর্য বাঙালী চিত্তকে আকৃষ্ট করেছিল,—ভক্তি-নিষিক্ত মধুর ভাবে আবিষ্ট

করেছিল। শ্যামবিরহিণী শ্রীরাধিকার বেদনার্তি বাঙালীকে এক গভীর সকরুণতায় আচ্ছন্ন করেছিল। আজও সেই বেদনা বাঙালী ভুলতে পারেনি। সেই বিষাদ রাগিণী বাঙালীচিত্তে নিত্য নতুন রূপে ধ্বনিত। দুঃখী শ্যামের বর্ণনায় রাধার বারমাস্যা যেমন অভিনব তেমনি সকরুণ :

'উদ্ধব ফাটিয়া যায় হিয়া।
ফুকরি ফুকরি কান্দি শ্যাম স্মউরিয়া॥
চৈত্রেতে চাতক পক্ষী ডাকে মন্দ মধু।
চেতন না রহে অঙ্গ, না দেখিয়া বঁধু॥
চিত্ত নিবারিব কত বিরহ ব্যথায়।
চিতা যেন দহে দেহ বসন্তের বায়॥
উদ্ধব! চিত্ত ছল ছল করে।
চঞ্চল চড়ুই যেন পড়িয়া পিঞ্জরে॥'

শ্রীকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে ভক্ত কবি বলেছেন :

'ব্যাস কৈল যত গ্রন্থ　　কেহ না পাইল অন্ত
অগোচর গোবিন্দের লীলা।
"গোবিন্দ মঙ্গল" কহি　　ভুবনে দুর্লভ এহি
ভবসিন্ধু তরিবার ভেলা॥'

কবির মতে, শ্রীগোবিন্দের লীলা অপার এবং সকলের অগোচর। স্বয়ং ব্যাসদেবও সেই লীলার অন্ত খুঁজে পাননি। কবি শ্যামদাস শ্রীগোবিন্দের লীলামাধুর্য উপভোগ করতে সকলকে আহ্বান জানাচ্ছেন। শ্রীগোবিন্দের লীলাকীর্তন বড়ই মধুর,—এক অপরূপ লীলামাধুর্যে সমৃদ্ধ ও শোভমান।

'গোবিন্দ মঙ্গলে' মধুর এবং করুণ রস দুই-ই প্রাধান্য পেয়েছে। দুয়ের বর্ণনায় কবি সুনিপুণ। কাব্যে কোথাও আদিরস বা তরল হাস্যরসের অবতারণা নেই। কৃষ্ণলীলা বর্ণনায় কবি যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়েছেন।

কাব্যে শিশু গোপালের দুরন্তপনার চিত্রটি সংক্ষিপ্ত হলেও সজীব। সহজ ও অনাড়ম্বর ভাষায় কবির বর্ণনা এখানে সার্থক শিল্পরূপ পেয়েছে :

'প্রতিদিন যশোদা যাদুর বেশ করে।
বড়ই চঞ্চল কৃষ্ণ নাহি রহে ঘরে॥
ভুজঙ্গ দেখিয়া তারে ধরিবারে যায়।
প্রোজ্জ্বল অনলে কৃষ্ণ হস্ত যে বাড়ায়॥
বৎসক শুতিয়া থাকে তার পাছে ধায়।
লাঙ্গুল ধরিয়া তার টানে যাদু রায়॥
প্রাণ ভয়ে বাছুরি পলায়ে যায় দূরে।
হাঁটু ভাঙ্গি পড়ে কৃষ্ণ শোণিত নিকলে॥
শূকর তুণ্ডেতে কৃষ্ণ চালায় অঙ্গুলি।
মার্জারের শিশু কোলে তুলে বনমালী॥
শ্বানের বদনে কৃষ্ণ ঘন দেয় হাত।
যশোদা না ছাড়ে তিলে কৃষ্ণের পশ্চাৎ॥'

গোপালের দুরন্তপনায় যশোদা অস্থির। কিছুতেই তিনি তাঁকে সামলাতে পারেন না। সতর্ক দৃষ্টির মধ্যেও কৃষ্ণের দুরন্তপনা ক্রমশঃ বেড়ে চলে। তাঁর দৌরাত্ম্যে সমস্ত গোকুল অতিষ্ঠ। গোপীরা যশোমতীর কাছে অহরহ নালিশ জানায়,—'এমন দুরন্ত শিশু গোকুলে আর কারও নেই।' তাদের নিত্য ননী চুরি যায়। গোপাল প্রতি ঘরে ননী চুরি করে বেড়ায়। তার এই ননী-চুরি খেলার দাপটে গোপীরা সন্ত্রস্ত। কবির বর্ণনায় :

'শিকায় দধির হাঁড়ি দেখিল সাক্ষাতে।
উদুখলে ভর করি না পাইল হাতে॥
নড়ি দিয়া সেই হাঁড়ি ভাঙ্গে যাদু রায়।
দধি পড়ে হেঁট হৈয়া মুখ পাতি খায়॥
মোরে বলে সব দধি খাইল বিড়াল।
সেই হৈতে জানি দধি-চোর নন্দলাল॥'

শৈশবকাল অতিক্রম করে কৃষ্ণ যখন নব কিশোর, তিনি আর ননী-চোরা নন। তাঁর দৌরাত্ম্য কমেছে। গোপীরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। এখন তিনি প্রতিদিন সমবয়সী রাখাল

ছেলেদের সঙ্গে ধেনু চরাতে যান সকলেই তাঁকে প্রাণের তুল্য ভালবাসে। তাঁর অঙ্গে বনফুলের সাজ, হাতে বাঁশী। কেলিকদম্বের তলায় দাঁড়িয়ে থেকে তিনি বাঁশী বাজান। সকলে তাঁর ভুবনমোহনরূপ-মাধুরী উপভোগ করে এবং অপরূপ বংশীধ্বনি শুনে আনন্দে অভিভূত হয়। কবির ভাষায়:

'নিন্দি কত কোটি কাম মোহন মুরতি শ্যাম
কেলিকদম্বের মালা গলে।
বামেতে বিনোদ চূড়া বিবিধ কুসুমে বেড়া
মধু আশে অলিকুল বুলে॥
ত্রিভঙ্গ অঙ্গের ঠাম তরুণ তুলসী দাম
আজানুলম্বিত গলে দোলে।
কেশরী জিনিয়া কটা বিরাজিত পীতধটা
রসাল কিঙ্কিনী মধু বোলে॥'

শৈশবে কৃষ্ণ কংসের ভগিনী রাক্ষসী পুতনাকে বধ করেছিলেন। কৃষ্ণবধের উদ্দেশ্যে নানা সজ্জায় সজ্জিতা হয়ে পুতনা দ্রুতপদে যাত্রা করেছে। তার দীর্ঘ কেশ লোটনের মতো করে বাঁধা। সেখানে নানা রঙের ফুলের শোভা। কবির বর্ণনায়:

'নগরে প্রবেশ করে রাক্ষসী পুতনা।
কামরূপী দেখি তারে ভুলে সর্বজনা॥
মথুরা নগরে মারি শিশু ছয় বুড়ি।
গোকুল নগর মুখে যায় তড়বড়ি॥'

নবকিশোর কৃষ্ণের হাতে একে একে অঘ, বক, তৃণাবর্ত প্রভৃতি অসুরের বিনাশ ঘটেছে। কংসরাজ উদ্বেগে অস্থির। শত্রু কৃষ্ণকে বিনাশ করতে তিনি মথুরায় ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন করলেন। অক্রূরকে ব্রজধামে পাঠালেন কৃষ্ণকে আনতে। কৃষ্ণের মথুরা গমন সংবাদে সমস্ত ব্রজধাম শোকাকুল। নিদারুণ মর্মবেদনায় যশোমতী কাতর। সেই বেদনার্তি কবিকেও আচ্ছন্ন করেছে:

'ওহে নিদারুণ বিধি কানু হেন গুণনিধি
ঘটাইয়া আমা সবাকারে।
যেন চক্ষুদান দিয়া নিল পুনঃ উপাড়িয়া
অন্ধ দগ্ধ করিয়া গোপীরে॥'

কংসরাজকে নিধন করে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় রাজা হয়েছেন। কিন্তু অতুল রাজ-ঐশ্বর্যের মধ্যেও তিনি ব্রজবাসীকে ভুলতে পারেননি। শোকসন্তপ্ত ব্রজবাসীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তিনি উদ্ধবকে প্রেরণ করেছেন। উদ্ধবের কাছে কৃষ্ণপ্রাণ রাধিকা এবং গোপীদের বিলাপধ্বনি কবির লেখনীতে এক গভীর সকরুণতায় ব্যঞ্জিত হয়েছে।

'গোবিন্দ মঙ্গলে' শ্রীরাধিকার 'চৌতিশা' ও 'বারমাস্যা' মঙ্গলকাব্যের আদর্শে রচিত। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ভাদ্রমাসে। কবি তাই ভাদ্র হতে শ্রীরাধিকার 'বারমাসি' শুরু করছেন। এই বর্ণনা যেমন অভিনব তেমনি গভীর আন্তরিকতায় স্নিগ্ধ।

'গোবিন্দ মঙ্গলে' কবি দুঃখী শ্যাম বিভিন্ন অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে, পয়ার, ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী, একাবলী ইত্যাদি। তাঁর অপর একটি রচনাগ্রন্থ মূল ভাগবতের পদ্যানুবাদ। শ্রীধর স্বামী-কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা অবলম্বনে গ্রন্থটি রচিত। রচনাটি সম্পাদনা করেছেন মেদিনীপুর নিবাসী ঈশানচন্দ্র বসু। কলকাতার বঙ্গবাসী প্রেসে একসময় ভাগবতের এই পদ্যানুবাদটি (১ম ও ২য় স্কন্ধ) মুদ্রিত হয়েছিল।

মধুর ও করুণ রসাশ্রিত এক অভিনব রচনা, এই 'গোবিন্দ মঙ্গল'। শ্যাম দাসের বাগ্‌ভঙ্গি এবং ছন্দশৈলী এখানে আপন স্বভাবে বিমূর্ত। বাংলাসাহিত্যে 'গোবিন্দ মঙ্গল' একটি সুমধুর কাব্য। কেবল এই কাব্যটি রচনা করেই কবি বৈষ্ণব মহাজনের হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মমত

অধ্যাপক শ্রীসমরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

কোন বিষয়ের সার্থক আলোচনা করতে হলে তা করণীয় তার যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মমত প্রসঙ্গটিও তাই বিচার্য তাঁর সমসাময়িক কালের প্রেক্ষাপটে।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব বাংলা তথা ভারতের সেই যুগসন্ধিক্ষণে যাকে ঐতিহাসিকরা চিহ্নিত করেছেন 'রেনেসাঁস' বা 'নবজাগরণ' অভিধায়। মানুষের মন মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও প্রথার অন্ধ দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে একদিন যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির আলোকে ধীরে ধীরে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল—পাশ্চাত্যের ও প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে। মোহাচ্ছন্ন মনের এই জাগৃতিই 'রেনেসাঁস' বা 'নবজাগরণ'-রূপে ইতিহাসে আখ্যাত। ইউরোপে এই রেনেসাঁসের সূত্রপাত হয় ইতালিতে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে। তারপর তার তরঙ্গ ক্রমে বিস্তৃত হয় জার্মানি, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে। ভারতভূমিতে রেনেসাঁসের ঢেউ এসে পৌঁছায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। একদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনের ব্যাপক অনুশীলন, অন্যদিকে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ শিক্ষিত ও বিদগ্ধ মনে জাগাল নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনা। "তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি" বিচারের যে স্রোতঃপথ গ্রাস করে ফেলেছিল, তার থেকে জাগরিত হল ভারতীয়-মানস এই 'নূতন যুগের ভোরে'।

উনিশ শতকের এই নবজাগরণে বঙ্গদেশ নিয়েছিল অগ্রণীর ভূমিকা। ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন আদর্শ ও চিন্তাধারার বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছিল এই দেশে, এই কালে। সর্বত্রই স্বাধীন, সংস্কারমুক্ত, অবাধ-চিন্তার বিকাশ ঘটল দীর্ঘ মানসিক জড়ত্বের পর। তাই দেখি, আত্মিক ও বৈষয়িক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতশির, নির্ভীক, স্বাধীনচেতা মহাপুরুষদের আবির্ভাব—রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ-পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ।

ধর্মের ক্ষেত্রে সংস্কারমুক্ত চিন্তার প্রকাশ বড়ই বিস্ময়কর, বড়ই অভিনব,—কেননা অত্যুগ্র রক্ষণশীলতা বা গোঁড়ামির বৃহত্তম লীলাভূমি হল ধর্মক্ষেত্র। পৃথিবীর ধর্মীয় ইতিহাস বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর স্ব স্ব মতের অকাট্যতা স্থাপন প্রয়াসের ইতিহাস।

এই যুক্তিহীন ধর্মোন্মত্ততার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে অমানুষিক নৃশংসতা। পৃথিবীর ধর্মের ইতিহাস বর্বরোচিত নিষ্ঠুরতার ঝলকে কলুষিত। খ্রীষ্টান-ধর্মের 'ক্রুসেড্' (Crusade) ও মুসলমান ধর্মের 'জেহাদ্' উভয় সম্প্রদায়ের সংজ্ঞায় 'বিধর্মী' নিধনের পবিত্র (?) ধর্মযুদ্ধ নামে ইতিহাসে আখ্যাত। একমাত্র তৃতীয় ক্রুসেডেই নরবলির নির্ণিত সংখ্যা তিন লক্ষেরও অধিক! এছাড়া ইহুদী-দলন, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ প্রভৃতির মতো নিষ্ঠুর কার্যাবলীও কালিমা লেপন করেছে ধর্মের ইতিহাসে।

ধর্মের ক্ষেত্রে পরমত-অসহিষ্ণুতা ও দৃঢ়স্বৈরিতা চিরাচরিত। প্রখ্যাত ইংরেজ প্রাবন্ধিক যোড্ যথার্থই বলেছেন :

"This intolerance has been particularly common in religious matters. All over the Western world people have killed and tortured other people for not believing the same things as they did or for worshipping God in a different way,"[১]

—এই অসহিষ্ণুতা বিশেষভাবে বিরাজিত ধর্মীয়

[১] The Story of Civilization—C. E. M. Joad, Chap. V, (1958), P. 72

ব্যাপারে। সারা পাশ্চাত্য দুনিয়ায় মানুষ মানুষকে হত্যা এবং নির্যাতন করেছে শুধুমাত্র এই কারণে যে, তারা যে-সব জিনিস বিশ্বাস করে তাদের বিপক্ষেরা তা করে না অথবা তাদের ঈশ্বর-উপাসনা পদ্ধতি ভিন্ন রকম।

গীতায় (৪।৭) শ্রীভগবান বলেছেন ;

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌॥

—হে ভারত (অর্জুন), যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি তখনই নিজেকে সৃষ্টি করি (অর্থাৎ মানবদেহ-ধারণপূর্বক ধরায় অবতীর্ণ হই)।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মকালে আমাদের দেশে প্রকৃতই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়েছিল এবং ধর্মের নামে অভ্যুদয় ঘটেছিল অধর্মের। বিশ্বের উদারতম সনাতন ধর্ম তখন তার বিশ্বজনীন আদর্শ হারিয়ে পর্যবসিত হয়েছিল সঙ্কীর্ণ আচার-বিচার ও সহস্রবিধ বিধি-নিষেধের সমষ্টিতে। অথচ মহাভারতে—যে মহাভারত সম্বন্ধে বলা হয়, "যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে"—সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়েছে সনাতন ধর্মের :

"সর্বেষাং যঃ সুহৃন্নিত্যং সর্বেষাং চ হিতে রতঃ।
কায়েন মনসা বাচা স ধর্মং বেদ জাজলে॥"
(মহাভারত, শান্তিপর্ব)

—যিনি কায়, মন ও বাক্য দ্বারা সকলের হিতে রত থাকেন, যিনি সকলের নিত্য সুহৃৎ, হে জাজলে, তিনিই ধর্ম জানেন।

সনাতন ধর্মের এই আদর্শ ও মূল উদ্দেশ্য তখন ঢাকা পড়েছিল প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানের আবরণে। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে এই অবস্থাটিই ধ্বনিত হয়েছে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় :

"তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।"[২]

তাঁর প্রতীক-নাটক 'অচলায়তন'-এর মাধ্যমে তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাত করেছেন তিনি সনাতন ধর্মকে এই আচার-সর্বস্বতায় অধঃপতনের জন্যে। এই নাটকের সঞ্জীব ও পঞ্চক নামক দুটি চরিত্রের কথোপকথনের সামান্য অংশ নিদর্শন হিসাবে এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"সঞ্জীব—আটান্ন প্রকার আচমন-বিধির মধ্যে পঞ্চক বড়োজোর পাঁচটা প্রকরণ এতদিনে শিখেছে। পঞ্চক—অত্যুক্তি করছ।...আমি দুটোর বেশি একটাও শিখিনি। তৃতীয় প্রকরণে মধ্যমাঙ্গুলির কোন্‌ পর্বটা কতবার কতখানি জলে ডুবাতে হবে সেটা ঠিক করতে গিয়ে অন্য আঙুলের অস্তিত্বই ভুলে যাই।"[৩]

আচারে-বিচারে, আহারে-বিহারে, অশনে-বসনে, তখন আরোপিত হয়েছিল কঠিন বিধি-নিষেধের বেড়াজাল এমনভাবে, যেন এগুলি ঈশ্বর-প্রাপ্তির পক্ষে অপরিহার্য ও আবশ্যিক!

এ-হেন বিকৃত সনাতন হিন্দুধর্মের যুক্তিহীন গোঁড়ামি, সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কার উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিক আলোকপ্রাপ্ত, যুক্তিবাদী উদার মনকে আর ভরিয়ে রাখতে পারছিল না। তাই সে-যুগের বহু শ্রেষ্ঠ মনীষী তাঁদের আধ্যাত্মিক আকুতির পরিতৃপ্তি কামনায় যেন বাধ্য হয়েই গ্রহণ করছিলেন ধর্মান্তর। তাঁরা আশ্রয় চাইছিলেন এমন কোন ধর্মবিশ্বাসে যা "তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি"র ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়—বিবেক ও বিচারবুদ্ধির মৌল ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিশীল। ব্রাহ্মধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম বহু কৃষ্টিসম্পন্ন বিদগ্ধ মনকে তাই আকৃষ্ট করছিল অনিবার্যভাবে।

ধর্মজগতে এ-হেন সঙ্কটকালে শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন রেনেসাঁসের যুক্তিদীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। এই গণ্ডী-লাঞ্ছিত, পার্থক্যের প্রাচীর-

২ "পূজা"—১০২ নং সঙ্গীত—রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, (১৩৬৮)

৩ "অচলায়তন"—রবীন্দ্ররচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, (১৩৬৮), পৃষ্ঠা ৩৬৯—৩৭০

বেষ্টিত ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি এলেন মহাসমন্বয়ের বাণী নিয়ে। সব মালিন্য, সব বিবাদ-বিসম্বাদ চিরতরে ঘুচিয়ে দিয়ে তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন সনাতন ধর্মকে তার যোগ্য আসনে—গীতা ও উপনিষদের বাণীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক উদার ও মহান ধর্মবিশ্বাসে। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন: "যত মত, তত পথ।" সব ধর্মেরই লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ—তাই সব পথই সেই এক লক্ষ্যাভিমুখী। All roads lead to Rome. ইতিহাসের প্রাচীন যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পথের যেমন গন্তব্য ছিল তৎকালীন বৃহত্তম সাম্রাজ্যের মহত্তম রাজধানী—রোমনগরী, তেমনি সকল ধর্ম-মার্গেরই উদ্দিষ্ট হল ঈশ্বরপ্রাপ্তি। পন্থাই শুধু বিভিন্ন, চরম লক্ষ্য কিন্তু অভিন্ন। এই সোজা কথাটি এমন সহজ করে তাঁর পূর্বে আর কেউ বলতে পারেননি। তাঁর যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এটি নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক উক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই মহান ধর্মসমন্বয়ের বাণী সে-যুগের জনচিত্তে জাগিয়েছিল অভূতপূর্ব স্পন্দন, স্পর্শ করেছিল শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলের মর্ম। এটা সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে, সে-বাণীর উদ্ভব হয়েছিল প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হতে। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মমত শুষ্ক জ্ঞানসঞ্জাত নয়, স্বীয় অভিজ্ঞতার নিরীক্ষায় তা প্রতিপাদিত। সাকার ও নিরাকার উপাসনার যত রকম পদ্ধতি প্রকরণ আছে তিনি তার সবগুলিই আচরণ করেছেন ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও পরম একাগ্রতার সঙ্গে। তাই প্রতিটি সাধনাই তাঁকে দিয়েছে সিদ্ধি। তিনি উপনীত হয়েছেন সেই পরম-তীর্থে "সকল পন্থা যেথায় মেলে।" তাই তিনি পরম নিঃসংশয়তায় ঘোষণা করতে পেরেছেন যে, ঈশ্বরোপলব্ধির ক্ষেত্রে কোন বিশেষ পন্থাই অদ্বিতীয়ত্বের বা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের আচরিত ধর্মই তাঁর প্রচারিত ধর্ম। শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে প্রযুক্ত উক্তিটি তাঁর সম্পর্কেও প্রযোজ্য:

"আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে, এ তত্ত্বটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তা বহুঈশ্বরবাদ (polytheism) নয়। যাঁর "ব্রহ্মসদ্ভাব" বা "ব্রাহ্মীস্থিতি" ঘটেছে, তিনি বেদান্ত-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে নির্বিকল্প সমাধিতে লীন হয়েছেন; তাঁর সম্পর্কে বহুঈশ্বরবাদের বা পৌত্তলিকতার অপবাদ অযৌক্তিক। তাঁর এই বিচিত্র সাধন-পদ্ধতিকে চিহ্নিত করতে হবে নতুন অভিধায়।

অনেকের ধারণা চতুর্বেদে বহুদেবদেবীতে বিশ্বাসের অর্থাৎ polytheism-এর হয়েছে। কিন্তু বিশ্ব-বিশ্রুত জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্স-মূলার (Max Muller) এ-ধারণা খণ্ডন করেছেন। তিনি বেদ-উপনিষদাদি ভারতীয় দর্শন ও ধর্মগ্রন্থসমূহ মূল সংস্কৃত ভাষায় নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, চতুর্বেদে বহু দেবদেবীর উল্লেখ থাকলেও সেখানে বহুঈশ্বরবাদের তত্ত্ব ঘোষিত হয়নি। ঋগ্বেদের ঋষি যখন ইন্দ্রস্তুতি করেন তখন তাঁর স্তবমন্ত্র হল: "হে ইন্দ্র, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই অগ্নি, তুমিই বরুণ, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সব।" আবার বরুণস্তুতি কালে তিনিই বলেন: "হে বরুণ, তুমিই বরুণ, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই অগ্নি…" ইত্যাদি। অর্থাৎ ঋষি যখন যে-দেবতার আরাধনা করেছেন, তখন অনন্যমনা হয়ে তাঁকেই একমাত্র পরমেশ্বর-রূপে গণ্য করেছেন। এ-সাধনা অনেকেশ্বরবাদীর সাধনা নয়। এর সন্ধান জগতের অন্য কোন ধর্মক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। ম্যাক্সমূলার একে অভিহিত করেছেন "হেনোথিইজম্" (henotheism) নামে। সংক্ষেপিত অক্সফোর্ড অভিধানে (C. O. D.) হেনোথিইজম্ এর সংজ্ঞা নির্ণীত হয়েছে: "Belief in one God with-

out asserting that he is the only God."
—এক ঈশ্বরে বিশ্বাস, কিন্তু সেই ঈশ্বরকেই এক ও অদ্বিতীয় গণ্য না করে

শ্রীরামকৃষ্ণ সনাতন আর্য-ধর্মের এই প্রাচীনতম শ্রুতিসম্মত পন্থাকেই বরণ করেছিলেন তাঁর অধ্যাত্মসাধনায়। যখন সাকার উপাসনা করেছেন, তখন কালীকেই একমাত্র আরাধ্যা দেবীরূপে গণ্য করে তদ্গতচিত্ত হয়েছেন। আবার যখন বেদান্ত-মতে সাধনা করেছেন, তখন উপলব্ধি করেছেন জগৎ ব্রহ্মময়,—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। আবার যখন ইস্‌লামমতে সাধনা করেছেন, তখন আল্লাই পরমাত্মা রূপে প্রতিভাত হয়েছেন তাঁর চিন্তাকাশে। এইভাবেই তিনি সব ধর্মের সাধন-পদ্ধতি একের পর এক অবলম্বন করে সেই জগৎ-কারণকে, সেই "কেবল" (The Absolute)-কে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং প্রত্যয়- দীপ্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন যে, ঈশ্বরলাভ কোন বিশেষ ধর্মেরই নির্ব্যূঢ় অধিকারভুক্ত নয়। এ-ব্যাপারে কোন সাধন-মার্গই অদ্বিতীয়ত্বের দাবী করতে পারে না। "যত মত, তত পথ"। শ্রীরাম-কৃষ্ণের সাধন-পদ্ধতি তাই সঙ্গতভাবেই ম্যাক্স মূলার-কথিত "হেনোথিইজম্" রূপে আখ্যাত হবার যোগ্য।

স্বামী বিবেকানন্দ অবশ্য সনাতন ধর্মের সাধন-রীতির অভিনবত্বকে কোন নামের গণ্ডীতে আবদ্ধ করতে চাননি। তাঁর শিকাগো বক্তৃতার প্রাসঙ্গিক অংশটি এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য :

"প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, ভারতবর্ষে বহু-ঈশ্বরবাদ নাই। প্রতি দেবালয়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যদি কেহ শ্রবণ করে, তাহা হইলে শুনিতে পাইবে পূজক দেববিগ্রহে ঈশ্বরের সমুদয় গুণ এমন কি সর্বব্যাপিত্ব পর্যন্ত আরোপ করিতেছে। ইহা বহুঈশ্বরবাদ নয়, বা ইহাকে কোন দেব-বিশেষের প্রাধান্তবাদ বলিলেও প্রকৃত ব্যাপার ব্যাখ্যাত হইবে না।"[৪]

অতএব দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মমত সনাতন হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বেরই সরলীকৃত অভি-ব্যক্তি। ঈশ্বরোপাসনার পদ্ধতি-প্রকরণ বিষয়ে সনাতন ধর্মে রয়েছে অবাধ স্বাধীনতা। সনাতন ধর্মের প্রবক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (৪।১১) পার্থকে পরম আশ্বাস দান করেছেন :

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥"

—হে পার্থ, যে আমাকে যে-ভাবে উপাসনা করে, আমি তাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। সে যে-পথই অনুসরণ করুক, সকল পথেই আমাতে উপনীত হয়।

এই শ্লোকটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলেছেন : "ইহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্মের তুল্য উদার ধর্ম আর নাই—আর এই শ্লোকের তুল্য উদার মহাবাক্য আর নাই।"

অন্য ধর্মের তুলনায় সনাতন ধর্মের অনন্যতার তত্ত্বটি যথার্থভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের অপূর্ব ভাষায় :

"We speak often of the Hindu religion, of the Sanatana Dharma, but few of us really know what that religion is. Other religions are preponderatingly religions of faith and profession, but the Sanatana Dharma is life itself; it is a thing that has not so much to be believed as lived."[৫]

—আমরা প্রায়শই হিন্দুধর্মের কথা, সনাতন ধর্মের কথা, বলে থাকি; কিন্তু আমাদের মধ্যে

৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ২০
৫ "Uttarpara Speech"—(1943), P. 7

কম লোকই জানে প্রকৃতপক্ষে সে ধর্মের স্বরূপ কি। অন্যান্য ধর্ম হল—বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষিত তত্ত্বের প্রকাশ। কিন্তু সনাতন ধর্ম জীবনেরই অনুষঙ্গ। এটি ততটা আরাধনার ব্যাপার নয় যতটা আচরণের।

সনাতন ধর্মের মধ্যে নেই কোন এক-দেশদর্শিতা, নেই কোন সীমাবদ্ধতা। এ-ধর্মে রয়েছে সকলের গ্রহণ ও আচরণযোগ্য স্থিতি-স্থাপকতা। স্বামীজী তাই বলেছিলেন তাঁর শিকাগো বক্তৃতায় :

"অন্যান্য ধর্ম কতকগুলি নির্দিষ্ট মতবাদ বিধি-বদ্ধ করিয়া সমগ্র সমাজকে বলপূর্বক সেগুলি মানাইবার চেষ্টা করে। সমাজের সম্মুখে তাহারা একমাপের জামা রাখিয়া দেয়;-জ্যাক, জন, হেনরি প্রভৃতি সকলকেই ঐ এক মাপের জামা পরিতে হইবে। যদি জন বা হেনরির গায়ে না লাগে তবে তাহাকে জামা না পরিয়া খালি গায়েই থাকিতে হইবে। হিন্দুগণ আবিষ্কার করিয়াছেন। আপেক্ষিককে আশ্রয় করিয়াই নিরপেক্ষ পরম-তত্ত্ব চিন্তা উপলব্ধি বা প্রকাশ করা সম্ভব; এবং প্রতিমা, ক্রুশ বা চন্দ্রকলা প্রতীকমাত্র, আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করিবার অবলম্বনস্বরূপ।"[৬]

সনাতন ধর্মের এই মূল ভাবটি শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মচেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। গীতা-বেদ-উপনিষদাদি গ্রন্থপাঠের মতো পণ্ডিতী শিক্ষা-দীক্ষা তাঁর ছিল না। অথচ কেমন করে যে ঐসকল গ্রন্থের সারাৎসার তাঁর উপলব্ধিতে প্রতীত হয়েছিল তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এই প্রসঙ্গে মনে উদয় হয় গীতায় (৪।৩৮) শ্রীভগবানের সেই অমূল্য উক্তিটি :

"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥"

—ইহলোকে জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছুই নেই। সেই জ্ঞান কর্মযোগে সিদ্ধ পুরুষ কালক্রমে স্বয়ং অন্তঃকরণে লাভ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বিশেষ কোন ধর্মমত বা উপাসনা-রীতিকেই চরম ও অদ্বিতীয় বলে স্বীকার করেননি;—যেমন করেছেন জগতের বহু ধর্মগুরু। তাঁদের প্রচারিত সেইসব ধর্মমত জগতে বিরাজ করছে তাঁদের নামাঙ্কিত হয়ে,—যেমন বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মমত বৌদ্ধধর্ম নামে, মহাবীর জিন প্রচারিত ধর্মমত জৈনধর্ম নামে, খ্রীষ্ট প্রচারিত ধর্মমত খ্রীষ্টান-ধর্ম রূপে। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমন সংহিতাকারে পরিণত (codified) কোন ধর্মমত নেই,—যাকে আমরা অভিহিত করতে পারি "রামকৃষ্ণীয় ধর্ম" রূপে! তাঁর ধর্ম সার্বজনীন। তাকে বলা যায় 'গণধর্ম'।

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মোপদেশও (Sermon) প্রদত্ত হয়েছে ভক্তদের গ্রহণ ও আচরণ-ক্ষমতা অনুযায়ী। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বেদান্ত সাধনায় নির্বিকল্প সমাধি লাভই শ্রেষ্ঠতম সাধনা—"উত্তমোব্রহ্ম-সদ্ভাবঃ"। কিন্তু তিনি জানতেন এ-সাধনা দুরূহ,—সাধারণ ভক্তের অনধিগম্য। তাই গণ-ধর্মের প্রধান প্রকরণ যে সাকার উপাসনা তারই বিধান দিলেন তিনি সাধারণের জন্যে। কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান—এ তিন মার্গের বিধান দিয়েছেন তিনি বিভিন্ন ভক্তকে তাঁদের সাধন-ক্ষমতা অনুযায়ী। কিন্তু সাধনার সর্বোচ্চ স্তর যে ব্রহ্ম-জ্ঞানলাভ এ-কথা সর্বদা বলেছেন সকলকে। তাঁর অমৃতোপম কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য :

"কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্ম ব্যতীত সব কিছু মিথ্যা বলে অনুভব করতে না পারছ ততক্ষণ সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পারবে না। 'ব্রহ্ম-সত্য জগৎ মিথ্যা'—বড় কঠিন পথ। কি রকম জানো,—যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী

৬ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ২৫

থাকে না। সমাধির পর 'আমি', 'তুমি', 'জগৎ' এ-সবের খবর থাকে না।"

অথচ তিনিই আবার গণধর্মের স্তরে নেমে এসে বলছেন : "যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী। যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্ম, যখন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় এ-সব কাজ করেন, তখন তাঁকে শক্তি বলি। কালী 'সাকার আকার নিরাকারা'। তোমাদের যেমন বিশ্বাস কালীকে সেইরূপ চিন্তা করবে। তবে জোর করে বলতে যেও না যে তিনি এই হতে পারেন, আর এই হতে পারেন না। বল,— আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার, আর কত কি হতে পারেন তিনি জানেন,—আমি জানি না, বুঝতে পারি না।" এ একেবারে রেনেসাঁসের বৈজ্ঞানিক-চিন্তন-প্রণালী (Scientific method) -তে অভ্যস্ত যুক্তিবাদী মনের কথা!

বর্তমান যুগের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক হ্যালডেন্ ধর্মের ক্ষেত্রে এই যুক্তি-নির্ভর বৈজ্ঞানিক মানসিকতার অভাবের তত্ত্বটিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন তাঁর এক প্রবন্ধে :

"Scientific men agree to suspend judgment when they do not know. On the whole, however, the opposite has been the case in the history of religion. Where there was obvious room for different opinions, for example as to the nature of Jesus' relationship with God, a highly complex theory was gradually built up and was accepted by most Christian churches. The Unitarians regard themselves as more reasonable than the Trinitarians and have adopted a quite different theory. To my mind a far more rational view than either would be as follows: 'I believe in God and try to obey and imitate Jesus, but I do not know exactly what is their relationship.'"[৭]

—বিজ্ঞানসেবীরা যে বিষয় জানেন না, সে বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করা থেকে বিরত থাকেন। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে এর ঠিক বিপরীতটাই ঘটেছে ধর্মের ইতিহাসে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যীশুর সঙ্গে ভগবানের সম্পর্কের যথার্থ রূপ সম্বন্ধে যেখানে সঙ্গতভাবেই মতপার্থক্যের অবকাশ বিদ্যমান, সেখানে ক্রমে জটিল তত্ত্বসমূহ গড়ে ওঠে এবং অধিকাংশ খ্রীষ্টান-ধর্মসম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত হয়। একেশ্বরবাদীরা ত্রয়াত্মকবাদীদের চেয়ে নিজেদের অধিকতর বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞান করেন এবং সেই হেতু সম্পূর্ণ ভিন্ন এক তত্ত্ব গ্রহণ করেছেন। আমার মনে হয়, উভয়ের এই মতবাদের চেয়ে ঢের বেশি যুক্তিযুক্ত মতবাদ হবে এইরকম: আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি এবং যীশুকে অনুসরণ ও অনুকরণ করতে চেষ্টা করি, কিন্তু আমি সঠিকভাবে জানি না তাঁদের পরস্পরের মধ্যে যথাযথ সম্পর্কটি কি।

কোনরকম গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় না দিয়ে মনকে খোলা এবং জানা-অজানার মাঝখানে রাখাই যে সত্যপন্থা—এ-কথা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে কেনোপনিষদে (২।২):

"নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥"

—আমি এমন মনে করি না যে, আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জেনেছি; অর্থাৎ 'জানি না' এও যেমন

৭ Topics and opinions—(First Series) Selected and Edited by A. F. Scott, (1979), P. 73

মনে করি না, তেমনই 'জানি' তাও মনে করি না। 'জানি না যে তাও নয়, আবার জানি যে তাও নয়'—আমাদের মধ্যে যিনি এই বচনটির মর্ম জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন।

অন্ধের হস্তী-দর্শনের মতো সত্যকে খণ্ডিত ও বিকৃত করে দেখা এবং সেই দেখাকেই চরম ও অভ্রান্ত জ্ঞান করার অযৌক্তিক দার্ঢ্য ছিল যে-যুগের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই যুগে প্রতিষ্ঠা করলেন যুক্তি-নির্ভর বৈজ্ঞানিক চিন্তন-প্রণালী,—বাংলার নবজাগরণের যোগ্যতম প্রতিভূরূপে। তাঁর মতো একজন প্রায়-নিরক্ষর গ্রাম্য মানুষের পক্ষে বাংলার তৎকালীন বিদগ্ধ (elite) সমাজের চিত্ত জয় করার রহস্য নিহিত রয়েছে এখানেই!

শ্রদ্ধা

ব্রহ্মচারী শ্রীবৎসচৈতন্য

সমাজের চারদিকে কর্মবিমুখতা। হীনম্মন্যতা, হতাশার ছাপ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে উচ্ছৃঙ্খলতার তাণ্ডব নৃত্য। আজ কেন সমাজের এই চেহারা? নিজের মনেই প্রশ্ন করলাম। উত্তর পেলাম—শ্রদ্ধার অভাব। শ্রদ্ধাই মানুষের মেরুদণ্ড। জাতিরও মেরুদণ্ড। শ্রদ্ধাই মানুষকে উন্নতির শিখরে তুলে দেয়। এই শ্রদ্ধা দ্বারাই মানুষের ভববন্ধন খণ্ডন হয়। বৈষয়িক উন্নতির আর কা কথা! হৃদয়ে শ্রদ্ধা জেগে উঠলে মানুষের চরিত্র পালটিয়ে যায়। ফলে জাতিরও চরিত্র পালটিয়ে যায়।

'শ্রদ্ধা' শব্দের ব্যুৎপত্তি [শ্রৎ+ √ধা+অঙ্ (ভা)+আ (স্ত্রী)]-গত অর্থ শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' এবং শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'-এ (১) বিশ্বাস, (২) শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয় (আস্তিক্য-বুদ্ধি), (৩) ভক্তি, (৪) নিষ্ঠা প্রভৃতি পাওয়া যায়। এই থেকে বোঝা যায় 'শ্রদ্ধা' শব্দটি বিভিন্ন ভাবের প্রকাশক। শব্দটি যেন নানা ভাব-পুষ্পের সমন্বয়ে তৈরি একটি ফুলের মালা। উপরি-উক্ত প্রতিটি ভাব নিয়ে নিচে আলোচনার চেষ্টা করছি।

(১) বিশ্বাস—আত্মবিশ্বাস—নিজের উপর বিশ্বাস। স্বামীজী বলছেন: 'যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক। প্রাচীন ধর্ম বলিত: যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। নূতন ধর্ম বলিতেছে: যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক।' এই বিশ্বাস-অগ্নির স্ফুরণ হয়েছিল অষ্টম বর্ষীয় বালক নচিকেতার মধ্যে। আত্ম-বিশ্বাসই তাকে সত্যানুসন্ধানের জন্য মৃত্যুর রাজা যমের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। এই কাহিনী নিয়েই যম-নচিকেতার উপাখ্যান।

বাজশ্রবা নামে এক ঋষি যজ্ঞশেষে বৃদ্ধ, জরা-জীর্ণ, ভবিষ্যতে আর কোনদিন দুধ দেবে না—এমন সব গাভী ব্রাহ্মণগণকে দান করছিলেন। দেখে ঋষির পুত্র অষ্টম বর্ষীয় বালক নচিকেতার মনে খুব দুঃখ হয়। সে ভাবল—এই দানের ফলে পিতা পুণ্য অপেক্ষা পাপই বেশি করছেন। তিনি যদি আমাকে কারো কাছে দান করেন, তবে কিছুটা অন্ততঃ তাঁর পুণ্য হবে। উপনিষদ্ বলছেন, তখনই নচিকেতার মনে 'শ্রদ্ধা' প্রবেশ করল—'শ্রদ্ধা আবিবেশ'। পিতার পুণ্য কামনায় নচিকেতা তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'পিতা, আপনি আমাকে কার কাছে দান করবেন?' ঋষি বালকের কথায় কান দিলেন না। দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার নচিকেতা একই প্রশ্ন করল।

বারবার একই প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে বাজশ্রবা ঋষি নচিকেতাকে বললেন, 'আমি তোমায় যমকে দান করলাম।' নচিকেতা তখন চিন্তা করতে লাগল: 'বহূনামেমি প্রথমো, বহূনামেমি মধ্যমঃ'—আমি পিতার অনেক শিষ্যের মধ্যে প্রথম, আবার অনেক শিষ্যের মধ্যে মধ্যম। আমি কখনই সবার অধম নই। তবে পিতা যখন আমাকে যমের কাছে যেতে বলছেন, তখন নিশ্চয়ই আমি পিতৃবাক্য রক্ষার্থে তাঁর কাছে যাব। যাতে তাঁর বাক্য মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় তা কোনমতেই আমার করা উচিত নয়। 'বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ'—নিজের প্রতি গভীর আস্থারূপ আত্মবিশ্বাসই নচিকেতাকে ভয়ঙ্কর যম-ভবনে যাওয়ার প্রেরণা জাগিয়েছিল। এই আত্মবিশ্বাসই তাকে যমরাজ-কর্তৃক প্রলোভন—ভোগবিলাস, দীর্ঘায়ু প্রভৃতি প্রত্যাখ্যান করে আত্মতত্ত্ব জানতে অনুপ্রাণিত করেছিল। স্বামীজী নচিকেতার শ্রদ্ধার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলছেন: 'নচিকেতার মতো শ্রদ্ধা, সাহস, বিচার ও বৈরাগ্য জীবনে আনবার চেষ্টা কর।' (বাণী ও রচনা, ৯।১৪)। 'নিজে শ্রদ্ধাবান্ হয়ে দেশে শ্রদ্ধা নিয়ে আয়। নচিকেতার মতো শ্রদ্ধা হৃদয়ে আন।' (ঐ, পৃঃ ৫১)। 'নচিকেতার মতো শ্রদ্ধাবান্ দশ-বারোটি ছেলে পেলে আমি দেশের চিন্তা ও চেষ্টা নূতন পথে চালনা করে দিতে পারি।' (ঐ, পৃঃ ২১৭)।

(২) শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয়—আস্তিক্যবুদ্ধি। এই আস্তিক্যবুদ্ধি দ্বারাই মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। দৃঢ় প্রত্যয় রূপ যে শ্রদ্ধা তা যদি কোন মানুষের মধ্যে জেগে ওঠে, তাকে আর কোনকিছুতেই টলানো যায় না। এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী মনে পড়ছে।

আগেকার দিনে নিয়ম ছিল যে, কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তি অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোকের কাছে বিচার-যুদ্ধে পরাজিত হলে তাকে জয়ী সম্প্রদায়ের মত গ্রহণ করতে হত। এই-রকম এক যুদ্ধে মীমাংসক কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মকীর্তির কাছে পরাজিত হন। কুমারিলকে বাধ্য হয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে হয়। তিনি নালন্দায় এসে ধর্মপালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর কাছে কুমারিল বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। তিনি অন্তরে কিন্তু বৈদিক। একদিন বৌদ্ধগুরু ধর্মপাল শাস্ত্রব্যাখ্যা করতে করতে ভীষণভাবে বেদের নিন্দা করেন। বেদের তীব্র নিন্দা কুমারিল সহ্য করতে পারলেন না। তিনি কেঁদে ফেললেন। অন্য একজন ভিক্ষু তাঁর কান্নার প্রতি বৌদ্ধ-গুরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গুরুদেব বুঝতে পারলেন শিষ্যের মনোভাবের কথা। তিনি বিরক্ত হয়ে কুমারিলের প্রতি কটূক্তি করলেন: 'তোমার বেদের উপর শ্রদ্ধা এখনও যায়নি এবং তুমি ভান করে বৌদ্ধ সেজে আমাদের বিদ্যা গ্রহণ করছ।' কুমারিল গুরুবাক্যে মর্মাহত হয়ে উত্তেজিত হলেও বিনীত-ভাবে বললেন: 'আপনি বেদবিষয়ে অযথা নিন্দাবাদ করছেন—এটাই আমার রোদনের কারণ।' এই কথা শুনে ধর্মপাল কুমারিলের প্রতি আরও রুষ্ট হলেন। তিনি কুমারিলকে বললেন: 'তুমি প্রমাণ কর আমি অন্যায় বলছি।' ক্রমে গুরু-শিষ্যের মধ্যে দারুণ বিচার-যুদ্ধ আরম্ভ হল। কুমারিলের কথা শুনে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। ক্রোধে ধর্মপাল বললেন: 'তোমাকে এই উচ্চ প্রাসাদ থেকে ফেলে দিয়ে প্রাণে মেরে ফেলা উচিত।' ভিক্ষু শিষ্যগণ এতসময় উত্তেজিত হয়ে ছিলেন। এই কথা শোনা মাত্র তাঁকে জোর করে ধরে তাঁরা ফেলে দিলেন। পতনকালে কুমারিল উচ্চৈঃস্বরে বললেন: 'বেদ যদি প্রমাণ হয়, তা হলে/

আমি যেন অক্ষত শরীরে জীবিত থাকি।' ভূমিতে পতিত হয়েও কুমারিলের মৃত্যু হল না। এমনকি তিনি বিশেষ আঘাতও পেলেন না। 'বেদ যদি প্রমাণ হয়' এইরূপ একটু সংশয় বাক্যের জন্য তাঁর একটি চক্ষুতে সামান্যমাত্র আঘাত লাগে। বেদের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকার ফলেই তাঁকে বহুতল বাড়ি হতে নিক্ষেপ করাতেও তাঁর মৃত্যু হয়নি। পতনকালে তিনি এতটুকু ভীত হননি।

(৩) ভক্তি—ভালবাসা। গুরুর প্রতি সশ্রদ্ধ গভীর ভালবাসা। ভগবানের প্রতি গভীর ভালবাসা। এই ভালবাসা দ্বারাই মানুষের শক্তির স্ফুরণ হয়। গুরু অবহেলা করলেও শিষ্যের যদি তাঁর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা থাকে—গুরুর শক্তি শিষ্যের ভিতর সঞ্চারিত হয়। এইরকম গুরুভক্তির দৃষ্টান্ত মহাভারতের একলব্যের কাহিনী। নিষাদরাজ-পুত্র একলব্য অস্ত্র শিক্ষার জন্য দ্রোণাচার্যের কাছে গেলেন। কিন্তু নীচ কুলে জন্ম বলে একলব্যকে দ্রোণাচার্য শিষ্যরূপে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না। একলব্য দ্রোণাচার্যকেই মনে মনে গুরুরূপে বরণ করে নিয়েছেন। গভীর বনের মধ্যে গুরু দ্রোণাচার্যের এক মূর্তি তৈরি করে, তাঁর সামনে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করতে লাগলেন। গুরুর প্রতি তাঁর এই সশ্রদ্ধ ভালবাসা গুরুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ব্যতিরেকেই একলব্যকে অস্ত্রবিদ্যায় অসম্ভব পারদর্শিতা এনে দিল। একবার পাণ্ডবগণ ও কৌরবগণের সঙ্গে দ্রোণাচার্য সেই বন দিয়ে যাচ্ছিলেন। একটি কুকুর তাঁদের দেখে চিৎকার করতে লাগল। একলব্য তখন একসঙ্গে সাতটি বাণ মেরে কুকুরের মুখ বন্ধ করে দেন। দ্রোণাচার্য দেখলেন, অস্ত্রবিদ্যার নিপুণতায় একলব্য তাঁর প্রিয় শিষ্য অর্জুনকেও অতিক্রম করেছেন। 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্' —শ্রদ্ধাবানরাই জ্ঞানলাভ করেন।

(৪) নিষ্ঠা—শ্রদ্ধাহীনভাবে কোন কিছু না করা। সব কিছুই শ্রদ্ধাসহ করতে হবে। নিষ্ঠা না থাকলে কোন কাজেই সফল হওয়া যায় না। এমনকি ছোট ছোট কাজের মধ্যেও এই নিষ্ঠা রাখা দরকার। একবার একজনকে ঝাঁট দিয়ে ঝাঁটাটি ছুঁড়ে ফেলে দিতে দেখে শ্রীশ্রীমা বলেন, 'ও কি গো, কাজটি হয়ে গেল, আর অমনি ওটি অশ্রদ্ধা করে ছুঁড়ে দিলে? ছুঁড়ে রাখতেও যতক্ষণ, আস্তে ধীর হয়ে রাখতেও ততক্ষণ। ...সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।' (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৫ম সং, পৃঃ ২৫৪)। কোন কিছু কাউকে দিতে গেলে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেওয়া উচিত। উপনিষদ্ বলছেন: 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্।'

জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে উন্নতি করতে হলে চাই শ্রদ্ধার অনুশীলন। ব্যক্তিজীবনে শ্রদ্ধার প্রকাশ হলেই বর্তমান সমাজের অবক্ষয় দূর হতে পারে। স্বামীজী বলছেন: 'চাই শ্রদ্ধা, নিজেদের উপর বিশ্বাস চাই। **Strength is life, weakness is death** (সবলতাই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু)। আমরা আত্মা, অমর, মুক্ত—**pure, pure by nature** (পবিত্র, স্বভাবতঃ পবিত্র)। আমরা কি কখনও পাপ করতে পারি? অসম্ভব। এইরকম বিশ্বাস চাই। এই বিশ্বাসই আমাদের মানুষ করে, দেবতা করে তোলে। এই শ্রদ্ধার ভাবটা হারিয়েই তো দেশটা উৎসন্ন গিয়েছে।' মানুষের মধ্যে কিভাবে এই শ্রদ্ধাভাব আনা যায় সে-সম্বন্ধে স্বামীজী বলছেন: 'ছেলেবেলা থেকে আমরা **negative education** (নেতিমূলক শিক্ষা) পেয়ে আসছি। আমরা কিছু নই—এ শিক্ষাই পেয়ে এসেছি। আমাদের দেশে যে বড়লোক কখন জন্মেছে, তা আমরা জানতেই পাই না। **Positive** (ইতিমূলক) কিছু শেখানো হয়নি। ...দেশে এই শ্রদ্ধার ভাবটা আনতে হবে।... তাহলেই দেশের যতকিছু **problems** (সমস্যাগুলি) ক্রমশঃ আপনা-আপনিই **solved** (মীমাংসিত) হয়ে যাবে।' (বাণী ও রচনা, ৯।৪১৯)

পথ ও পাথিক

স্বামী চৈতন্যানন্দ

'মন চল নিজ নিকেতনে'

নীল আকাশ। মনের আনন্দে ডানা মেলে দুটি পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। ডানা-ব্যথা হলে মাঝে মাঝে কোন গাছের ডালে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। প্রয়োজন মতো খাবার খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। এমনিভাবে সারাদিন কাটিয়ে, ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যার সময় তারা নীড়ে ফিরে যায়। ফেরার সময় কোন দিকে আর ভ্রূক্ষেপ করে না। সোজা নীড়ে ফিরে যায়। এমনি করে মানুষও সারাদিন বিষয়বাসনার আহার সন্ধান করে, ইতস্তত ঘুরে বেড়িয়ে ক্লান্ত শরীরে রাত্রে গৃহে ফেরে। বিশ্রামের আশায়। সকাল হলে আবার পূর্বদিনের মতো বেরিয়ে পড়ে। এমনিভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলে যায়। বাসনার তাড়নায় মানুষ সর্বদা ছুটছে। কোন বিশ্রাম নেই—অবিরাম ছুটে চলেছে। বিনা নোটিশে, হঠাৎ একদিন পৃথিবী থেকে চলে যায়—অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে।

মানুষের মনেই বাসনা। মনই মানুষকে ছোটায়। প্রলুব্ধ করে। সুখ-দুঃখ-যন্ত্রণা-আনন্দ দেয়। এমনিভাবে মন মানুষকে নিয়ে সংসার-সংসার খেলা করে। সংসার-খেলা খেলতে খেলতে কারো কারো তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়। খেলতে আর ভাল লাগে না। মনে হয়, খেলা ছেড়ে দিয়ে ঘরে ফিরে যাই। তখনই যেন কারো আহ্বান শোনা যায়—'মন, চল নিজ নিকেতনে'। এই সংসার তখন তার কাছে বিদেশস্বরূপ হয়ে ওঠে। বিদেশীরা যেমন সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখে—কিন্তু কোন কিছুতে আকৃষ্ট হয় না; মনও তেমনি আর কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হয় না। সে তখন নিজ নিকেতনে ফেরার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

এই নিকেতন—আমাদের আত্মা, যেখানে গেলে চিরশান্তি লাভ করা যায়। আত্মাই আমাদের একমাত্র বিশ্রামস্থল। আত্মা ব্যতীত আর কিছুতেই বিশ্রাম হয় না। মন যখনই বিষয়ারণ্যে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয় তখনই সে বিশ্রাম চায়। তখনই সে শুনতে পায় অন্তরের আহ্বান—'মন, চল নিজ নিকেতনে'। ভগবান যিশু বলছেন: 'Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest,' (St. Matthew, 11:28)—হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত জীবগণ, আমার কাছে এস, আমি তোমাদের বিশ্রাম ও শান্তি দেব।

মানুষের আত্মা—নিজ নিকেতন কোথায়? আত্মা তো সর্বব্যাপী। সবকিছুর মধ্যে তিনি অনুস্যূত। তবে আমাদের ধারণা হয় না কেন? নিজের মধ্যে—এই পাঞ্চভৌতিক শরীরের মধ্যে যে তিনি রয়েছেন, তা ধারণা করতে পারি না বলেই সবকিছুর মধ্যে তাঁর অনুভূতি হয় না। প্রথমে আমাদের নিজের শরীরের মধ্যেই তাঁকে অনুভব করতে হবে। নিজের পাঞ্চভৌতিক শরীরের মধ্যে কোথায় তাঁর অবস্থান? এই শরীর তো—

মজ্জাস্থিমেদঃপলরক্তচর্ম-
ত্বগাহ্বয়ৈর্ধাতুভিরেভিরন্বিতম্।

পাদোরুবক্ষোভুজপৃষ্ঠমস্তকৈ-
রঙ্গৈরুপাঙ্গৈরুপযুক্তমেতৎ ॥
[বিবেকচূড়ামণি, ৭২]

—'মজ্জা, অস্থি, চর্বি, মাংস, রক্ত, চামড়া ও ত্বক—এই সাতটি ধাতুর দ্বারা গঠিত এবং পা, উরু, বুক, হাত, পিঠ ও মাথা—এই সকল অঙ্গ ও উপাঙ্গ-সংযুক্ত এই শরীর।' এই শরীর তো মরণশীল, অনিত্য। তাকে আত্মা বলে মনে করে আমরা দুঃখ পাই। আত্মার জরা, ব্যাধি, মৃত্যু নেই। আত্মা নিত্য। আত্মা আনন্দস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ। কাজেই পাঞ্চ-ভৌতিক শরীর আমাদের চির শান্তির নিকেতন—আত্মা নয়। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৮।১২।১) আছে—'যিনি দেহাভিমানী তাঁর সুখদুঃখের বিরাম নেই। নিজের অশরীরী স্বরূপ জেনে দেহাভিমান ত্যাগ করতে পারলে সুখদুঃখ আর স্পর্শ করতে পারে না।'

তবে শরীরের মধ্যে যে প্রাণ পরিব্যাপ্ত রয়েছে সেটাই কি আমাদের আত্মা? এই প্রাণ তো বৃত্তিভেদে ও বিকৃতিভেদে পাঁচ প্রকার। যেমন—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান। 'প্রাণবায়ুর স্থান হৃদয়ে। অপানবায়ুর মলনাড়ীতে, সমান-বায়ুর নাভিতে, উদানবায়ুর কণ্ঠদেশে এবং ব্যান-বায়ুর স্থান সর্বদেহে।' এই প্রাণ তো জড়, বিকার-বান এবং অনিত্য। অতএব চৈতন্যস্বরূপ, অপরিবর্তনশীল, স্থির আত্মা হতে পারে না।

তবে কি আত্মা অন্তরিন্দ্রিয় বা মন? অন্তরিন্দ্রিয় বা মন স্তরভেদে চারটি নামে কথিত হয়। সংকল্প-বিকল্প—কোন বস্তু 'এটা এই', 'এটা এই নয়' এরূপ চিন্তা যখন করে তখন তাকে মন বলে। কোন বস্তুকে যখন নিশ্চয় করে 'এটা এই' বলে তখন তাকে বুদ্ধি নামে অভিহিত করে। দেহ প্রভৃতিতে যখন 'আমি এই' বলে অভিমান প্রকাশ করে তখন তাকে অহংকার বলে। চিত্ত হল উপাদান—'যাতে সকল বৃত্তি ক্রিয়া করছে, মনের ভিত্তি-তল, সকল বৃত্তির আধার।' তাই অস্থির মন বা অন্তরিন্দ্রিয় কখনও আত্মা হতে পারে না। মন তো জড় পদার্থ, চৈতন্যস্বরূপ আত্মা কি করে হতে পারে?

তবে আত্মা শরীরের মধ্যে কোথায়? বিশ্লেষণ করে তাঁর সন্ধান পেলাম না। তা হলে শরীরের মধ্যে কি আত্মা নেই? আছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৮।১।১—৫) আছে, আচার্য ঘোষণা করছেন: 'আমাদের এই পাঞ্চভৌতিক শরীরের অভ্যন্তরে যে হৃদয়, সেই হৃদয়ের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম আকাশ আছে, উহা অন্বেষণ করিতে হইবে।' শিষ্য জিজ্ঞাসা করছেন: 'কেন? কী আছে সেখানে?'

গুরু: 'বাহিরের অনন্ত আকাশে যেমন স্বর্গ-মর্ত্য, অগ্নিবায়ু, সূর্যচন্দ্র, বিদ্যুৎনক্ষত্র এবং আরও কত কিছু অধিশ্রিত রহিয়াছে, মানুষের হৃদয়াভ্যন্তরস্থ আকাশেও তেমনি ওই সব তো রহিয়াছেই, তাহা ছাড়া আরও অনেক কিছু আছে।'

শিষ্য: 'কিন্তু মানুষের শরীর ধ্বংস হইলে অন্তর্বর্তী আকাশও তো ধ্বংস হইবে এবং সেই আকাশে যত কিছুই থাক, সকলেরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইলে আপনার কথিত অন্তরাকাশের আর এমন কি গৌরব?'

গুরু: 'না বৎস, দেহের মৃত্যুতে সেই অন্তরা-কাশের বিলয় ঘটে না। সেই অন্তরাকাশ চৈতন্যমাত্র। এই অন্তরাকাশই মানুষের আত্মা। ইনি নিষ্পাপ; জরামৃত্যু ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইনি শোকহীন; ক্ষুধা-পিপাসা ইঁহাকে পীড়িত করে না। সকল বাঞ্ছিত বস্তু ইঁহাতেই বর্তমান, ইঁহারই সংকল্পে সবকিছু বাস্তব মূর্তি পরিগ্রহ করে।'

এই অন্তরাকাশ—আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারলে জগতে সর্বত্র আত্মদর্শন হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ (৭।২৫।২) বলছেন: 'আত্মাই নিচে, আত্মা উপরে, আত্মা পিছনে, আত্মা সম্মুখে, আত্মা দক্ষিণে, আত্মা উত্তরে, আত্মাই সবকিছু।'

অন্তরাকাশই আমাদের 'নিজ নিকেতন'। সেখানে মনকে নিয়ে যেতে পারলে জগতের দুঃখ-যন্ত্রণা আর স্পর্শ করে না। সেখানে অনাবিল আনন্দ, চিরশান্তি বিরাজ করছে। ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ই বলছেন: 'তরতি শোকমাত্মবিৎ'—আত্মাকে জানলে সর্বপ্রকার শোক উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

মন বিষয়ারণ্যে সর্বদা বিচরণ করে। সে অন্তর্মুখ হতে চায় না। তাই তাকে দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ঠাসহকারে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মলরহিত করে অন্তর্মুখ করা প্রয়োজন। তা না-হলে আমাদের বিশ্রাম কোন দিন হবে না। নিজ নিকেতনে আর ফেরা হবে না। গৃহহারা উদ্বাস্তুর মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে। বিদেশ বিভুঁই-এ দুঃখকষ্টের মধ্যে রাস্তাঘাটে জন্মজন্মান্তর ধরে ঘুরে মরতে হবে।

পুস্তক সমালোচনা

ভাগবতের কথা ও গল্প—স্বামী অমলানন্দ। প্রকাশক: রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস্‌ হোম, বেলঘরিয়া। পৃঃ ৭+১৬০, মূল্য: ১০'০০।

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের শুভ আবির্ভাবের পঞ্চশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এই ছোট গ্রন্থে ১২ স্কন্ধে ১৮০০০ শ্লোক সম্বলিত শ্রীমদ্ভাগবতরূপ মহাপুরাণের নির্যাসটুকু জনসাধারণকে উপহার দিয়া গ্রন্থকার স্বামী অমলানন্দজী সমাজে ভাগবত-সচেতনতা ফিরাইয়া আনিতে প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থটিকেও ১২ স্কন্ধে ভাগ করিয়া ও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মূলশ্লোক (মোট ৫২টি) ও ছবি (মোট ২১টি) সন্নিবেশ করিয়া অল্পকথায় সহজ সুললিত ভাষায় আখ্যান ও তত্ত্বগুলি যেমন পাঠকবর্গের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছেন, তেমনই শ্লোকগুলি পাঠে মূল ভাগবতের রসাস্বাদনের সুযোগ দিয়াছেন। প্রয়োজন বোধে পাঠক স্কন্ধ ও শ্লোক সংখ্যার সাহায্যে মূল ভাগবতের বিশেষ অংশে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারিবেন। শ্রীমৃণাল রায়ের অঙ্কিত প্রচ্ছদপটে বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতিটিও মনোরম ও আকর্ষণীয় হইয়াছে।

দুরূহ বেদশাস্ত্রের তত্ত্বগুলিকে সাধারণের নিকট সহজবোধ্য করিয়া পরিবেশনের নিমিত্ত ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করেন। বর্তমান কালে সময় ও সুযোগ বা সংস্কৃতশিক্ষার অভাবে তাহাও যেন সাধারণের নাগালের বাহিরে। ফলে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে লোকে এগুলি না পড়িয়াই—ইহাতে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পায়। এই ছোট্ট সচিত্র ও শ্লোকসহ গ্রন্থখানি সেই সব পাঠককেও আকর্ষণ করিবে ও তাঁহাদের চক্ষু উন্মীলনে সাহায্য করিবে।

উপরন্তু বড় স্কন্ধগুলিকে বিভিন্ন শিরোনামে বিভাজন ও স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয় মন্তব্য সংযোজন গ্রন্থপাঠে অধিক আগ্রহ সঞ্চার করিবে।

আখ্যানগুলি অল্পবয়সী পাঠকের মনে যেমন ব্যক্তি বা সমাজজীবনগঠনের উপযোগী চিন্তার উন্মেষ ঘটাইবে তেমনি প্রবীণদেরও পুনঃ পুনঃ ভাগবত-অনুধ্যানের সুযোগ দিবে।

এই গ্রন্থ শুধু গ্রন্থাগারে নয়, স্কুল-কলেজে

এবং প্রত্যেক গৃহে অবশ্য পাঠ্য হইবার যোগ্যতা রাখে। ইহার মাধ্যমে ভাগবতের বহুল প্রচার কামনা করি।

চার মাসের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনের প্রয়োজনেই পুস্তকটি পাঠক সমাজে সমাদৃত হইতেছে বুঝা যাইতেছে।

—ডক্টর শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটদের শ্রীরামকৃষ্ণ—শোভনা সেন। পরিবেশক: এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩। পৃষ্ঠা ৪৩, মূল্য: পাঁচ টাকা।

প্রচ্ছদের শেষ পৃষ্ঠায় লেখিকার (চিত্রসহ) সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এই গ্রন্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে —'ছোটদের শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীরাম-কৃষ্ণের পুণ্য জীবন-কথা ভক্তি-সিঞ্চিত সুললিত ছন্দে লিখিত।'—বাস্তবিকই গ্রন্থটি সম্পর্কে এটিই প্রথম ও শেষ কথা। লেখিকা যেন পরিণত বয়সের স্নিগ্ধ শান্ত দৃষ্টি শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে নিবদ্ধ করে সহজ সরল ভাষায় ও ছন্দে তাঁর অনুপম জীবনের মূল কটি ঘটনার পরিচয় দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য দেখানোর বিন্দুমাত্র প্রয়াস না থাকলেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রীরামকৃষ্ণভাবনার কোন কোন গভীর দিক কাব্যটির নানা অংশে ফুটে উঠেছে। লেখিকার ভক্তিভাব আর পরিণত বয়সের ধারণাশক্তি এর মূল।

লেখিকার ছন্দবোধ দুর্বল। মুখ্যত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা হলেও মাঝে মাঝে অক্ষরবৃত্ত বা স্বরবৃত্তও মিশে গেছে—ছন্দপতনও আছে। তবে যাদের জন্য এই জীবনীকাব্যটি লেখা, সেই ছোটরা অবশ্যই তা নিয়ে খুঁত খুঁত করবে বলে মনে হয় না; বিশেষত ভাষা আর ছন্দ দুইয়ে মিলে এমন সহজ গতিশীলতা সৃষ্টি করেছে যে, ছোটখাট ত্রুটি উপেক্ষা করা যায়।

ছোটদের উপহার দেবার পক্ষে উপযোগী এই গ্রন্থটির মুদ্রণাদি প্রশংসনীয়, প্রচ্ছদটিও সুশোভন।

—ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

সংস্কৃতির সংকটে ভারত—ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী শাস্ত্রী। প্রকাশিকা: ঊষাদেবী চক্রবর্তী, ঋষিধাম, পোঃ দত্তপুকুর, জিলা—২৪ পরগনা। পকেট সাইজ, পৃঃ ৫১; মূল্য: চার টাকা।

পুস্তিকাটিতে নানা উদ্ধৃতি সহকারে হিন্দু-ধর্মের মাহাত্ম্য তুলে ধরা হয়েছে। এই ধর্মে আছে এমন সাম্যবাদ যা মার্কসীয় সাম্যবাদের চেয়ে আরও সুদূরপ্রসারী; সকল ধর্মের মাধ্যমে যে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো যায়, সেই উদার বাণী কেবলমাত্র হিন্দুধর্মেই আছে। অর্থাৎ বর্তমান দ্বন্দ্ব ও হিংসাবিজড়িত পৃথিবীর মোড় ফিরাবার জন্য প্রয়োজন হিন্দুধর্মের প্রসার ও প্রচার। কিন্তু এই বক্তব্যটি রাখতে গিয়ে লেখক আরব, জার্মানি, তুরস্ক, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি বহু দেশের ঘটনামাত্র উল্লেখ করে তাদের ছোট করে দেখিয়েছেন। কোন জাতি বা ধর্মের প্রকৃত পরিচয় কোন ঘটনামাত্র উল্লেখ করে দেখানো যায় না। ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের বহু প্রশস্তিবাচক উক্তি বাদ দিয়ে কেবলমাত্র একটি অভিমত তুলে ধরে পাঠককে কিছুটা বিভ্রান্ত করা হয়েছে। হয়তো পুস্তিকাটি ছোট করার জন্য লেখক এরূপ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু আবার একথাও সত্য, হিন্দুধর্ম ও তার বেদ উপনিষদ এতই ঐশ্বর্যশালী ও ভাস্বর যে, তাদের দীপ্তি প্রকাশ অন্য কাউকে হীন না দেখিয়েও করা যেতে পারে। তা ছাড়া লেখকের কয়েকটি মন্তব্য, যেমন—"আয়াতুল্লা খোমেনীর নির্দেশে শত শত নরনারীর নিষ্ঠুর হত্যা" (পৃঃ ৩০) কতটা তথ্যভিত্তিক জানি না।

বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত রত্নাবলীকে লোকচক্ষুর সম্মুখে আনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং সে হিসাবে পুস্তিকাটি অনেকের সমাদর লাভ করবে।

—ডক্টর জলধিকুমার সরকার
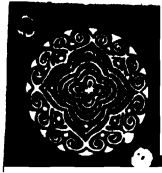
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব

বেলুড়মঠে গত ৩ জানুআরি ১৯৮৬, শ্রীশ্রীমা সারদামণির ১৩৩তম আবির্ভাব-তিথি এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে সাড়ম্বরে পালিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, পাঠ, ভজন, হোম প্রভৃতি হয়। প্রায় ১০,০০০ ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে ধর্মসভায় স্বামী ভূতেশানন্দজীর পৌরোহিত্যে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়।

বেলুড়মঠে স্বামী বিবেকানন্দের ১২৪ তম আবির্ভাব-তিথি গত ১ ফেব্রুআরি ১৯৮৬, বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ, ভজনকীর্তনাদির মধ্য দিয়ে মহাসমারোহে উদ্যাপিত হয়। সারাদিন মঠভূমি আনন্দে মুখরিত ছিল। দুপুরে প্রায় ১২,০০০ ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকালে মঠপ্রাঙ্গণে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের সভাপতিত্বে স্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়।

মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৩ জানুআরি বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-তিথি পালিত হয়।

বারাসত রামকৃষ্ণ মঠে গত ৩ থেকে ৬ জানুআরি ১৯৮৬ পর্যন্ত স্তবগান, পাঠ, ভজন, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা সারদা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী শিবানন্দের জন্মোৎসব মহাসমারোহের সঙ্গে উদ্যাপিত হয়।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

তামিলনাড়ুতে বন্যাত্রাণ: মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মাধ্যমে চেংলাপট্টু জেলার তিরুমণি-ভরতপুরম্ অঞ্চলে বন্যা-বিধ্বস্ত লোকদের মধ্যে ৪০০টি কম্বল, ৭৫০টি মেঠাই বিতরণ করা হয়।

শ্রীলঙ্কা শরণার্থিত্রাণ: মাদ্রাজ ত্যাগ-রাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম কর্তৃক মণ্ডাপম্ ও তিরুচি শিবিরে আগত শরণার্থীদের মধ্যে ২১০০ প্যাকেট মিষ্টি, ২১.৫ কেজি মুড়ি ও ছোলা, ১১ কেজি চকোলেট, ১৪০০ খানা বই ও খাতা বিতরিত হয়। এছাড়াও ২২,৪৬৬; ৪১, ৫৭৫ ও ৬,৫৪৫ জনকে যথাক্রমে দুধ, সুন্দল (এক ধরনের জলখাবার) ও পঙ্গল (মিষ্টি বিশেষ) দেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসাত্রাণ: রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ও মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গত ১০ থেকে ১৫ জানুআরি ১৯৮৬, গঙ্গাসাগর মকরসংক্রান্তির মেলায় আগত তীর্থ-যাত্রীদের মধ্যে ১,৬২৬ জন বহির্বিভাগে, ৪৩ জন আন্তর্বিভাগে এবং ১৭৮জন সংকটাপন্ন রোগী চিকিৎসিত হয়। তাদের মধ্যে ২২টি তুলার কম্বল বিতরণ করা হয়। ১৪ জানুআরি, মেলাপ্রাঙ্গণে বীভৎস অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ অনেক রোগীকে চিকিৎসা করা হয় এবং অনেককে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন: ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানায় ১৯৮৩-র ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত ঠাকুরনগর বালিকা বিদ্যালয়-ভবনের পুনর্নির্মাণের কাজ এখন শেষ পর্যায়ে।

বিবেকানন্দ-পুরস্কার

গত ৪ জানুআরি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচারের 'বিবেকানন্দ হলে' ইনস্টিট্যুটের পক্ষ থেকে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর হাতে 'বিবেকানন্দ-পুরস্কার' তুলে দেন সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন, বিশেষত স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে অধ্যাপক বসু দীর্ঘকাল যে মূল্যবান গবেষণা করে আসছেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই পুরস্কার। দশ হাজার টাকা অর্থমূল্যের এই 'বিবেকানন্দ-পুরস্কার' প্রথম দেওয়া হয়েছিল ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়ার মারি লুইস বার্ক (গার্গী)-কে। শঙ্করীপ্রসাদ বসু হলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি, যিনি এই পুরস্কার পেলেন।

মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের সূচনা হয় অধ্যাপক বসু রচিত স্বামীজী সম্পর্কিত একটি গানের মাধ্যমে। স্বাগত ভাষণে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ উল্লেখ করেন : এই পুরস্কার সৃষ্ট হয়েছে অধ্যাপক তারাপদ চৌধুরীর অর্থসাহায্যে। অধ্যাপক বসুর হাতে পুরস্কারটি তুলে দিয়ে শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ বলেন : 'মূলত উপলব্ধিমান্ বিরাট আধ্যাত্মিক পুরুষ হয়েও স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় নবজাগরণের ভিত্তি রচনা করে গেছেন। অধ্যাপক বসু দীর্ঘকাল অক্লান্তভাবে যে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, তার ফলে স্বামীজীর কর্মজীবনের বহু নতুন তথ্য ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছে। এর ফলে আমরা স্বামীজীকে আরও ভাল করে বুঝতে পারছি।' সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ বলেন : 'শঙ্করীপ্রসাদ বসুর গবেষণা ব্যতীত স্বামীজীর জীবনের বহু ঘটনা অজানাই থেকে যেত। স্বামীজীকে সঠিকভাবে বোঝার অর্থ বস্তুত ভারতবর্ষকেই ঠিকঠিকভাবে বোঝা। এই দিক দিয়ে অধ্যাপক বসুর গ্রন্থগুলি অসীম মূল্যবান। শুধুমাত্র এই কারণেও আজকের ভারতবাসীর অধ্যাপক বসুর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।'

শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর ভাষণে বলেন যে, বিবেকানন্দ-পুরস্কারকে তিনি স্বামীজীর আশীর্বাদ বলে মনে করছেন; তিনি চেষ্টা করবেন এই পুরস্কারের মর্যাদা রাখতে। যাঁরা তাঁর গবেষণা-কাজে কোন-না-কোনভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রত্যেককে তিনি কৃতজ্ঞতা জানান। অধ্যাপক বসু বলেন যে, দু-দশক ধরে তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন, বিশেষত স্বামী বিবেকানন্দকে সমকালীন ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে রেখে যে-গবেষণা করে চলেছেন, তা তিনি শুরু করেছিলেন মারি লুইস বার্কের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে।

এদিনের অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল (এবং ইনস্টিট্যুটের প্রেসিডেন্ট) শ্রীউমাশঙ্কর দীক্ষিত। তিনি বলেন : এই স্মরণীয় পুরস্কার-প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে তিনি গৌরব বোধ করছেন। শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজীর একটি কথার সূত্র ধরে রাজ্যপাল বলেন : 'স্বামী বিবেকানন্দ-সম্পর্কিত সবরকম ভুল ধারণার অবসান হওয়া উচিত নিঃসন্দেহে। তবে এটাও ঠিক, কোনরকম ভুল-ধারণাই স্বামীজীর ভাবমূর্তিকে মলিন করতে পারে না—সমস্ত সমালোচনাকে অতিক্রম করে সেই ভাবমূর্তি চির-উজ্জ্বল।' সবশেষে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বহু বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্, বুদ্ধিজীবী এবং রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের বেশ কয়েকজন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন সংবাদ

গত ১২ জানুআরি ১৯৮৬, রামকৃষ্ণ মিশন সারদা পীঠের এলাকার মধ্যে গ্রামীণ উন্নয়নে যুবকদের শিক্ষণের জন্য 'সমাজ সেবক শিক্ষা

মন্দির'-এর শুভ উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ।

গত ২৬ জানুআরি ১৯৮৬, নারায়ণপুরে অবুঝ্‌মার গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনস্থ 'বিবেকানন্দ আরোগ্য ধাম' (হাসপাতালে রোগীদের বহির্বিভাগ) এবং একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতিলাল বোরা।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জন্ম-জয়ন্তী : গত ১৬ জানুআরি ১৯৮৬, বৃহস্পতিবার স্বামী সারদানন্দ মহারাজের ১২২তম জন্মজয়ন্তী সারাদিনব্যাপী আনন্দানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, ভোগ, রাগ, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভজন-গান প্রভৃতি হয়। বহু সাধু ও ভক্ত স্বামী সারদানন্দজীকে প্রণাম নিবেদন করতে আসেন। ভক্তগণকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয় সন্ধ্যারতির পর তাঁর জীবনী ও বাণী আলোচনাকরেন স্বামী সত্যব্রতানন্দ।

২৪ জানুআরি ১৯৮৬, স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর তাঁর জীবনী পাঠ করেন স্বামী সত্যব্রতানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তিথি উৎসব : গত ১ ফেব্রুআরি ১৯৮৬, শনিবার, স্বামী বিবেকানন্দের ১২৪তম শুভ আবির্ভাব-তিথি বিশেষ পূজা, হোম, ভজন কীর্তনাদির মাধ্যমে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। বহু ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যারতির পর স্বামীজী সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী শান্তরূপানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা : সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী বিকাশানন্দ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

দেহত্যাগ

স্বামী বিপাশানন্দ (রমণ মহারাজ) গত ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৫, সকাল ৯-৩০ মিনিটে, হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৭৭ বৎসর বয়সে কালিকটের পি. ভি. এস. হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এর পূর্বে দুবার তিনি হৃদ্‌যন্ত্রের যন্ত্রণার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিচুর রামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। ত্রিচুর রামকৃষ্ণ মঠ ছাড়াও তিনি মহীশূর, মাদ্রাজ (মঠ), ত্রিবান্দ্রম আশ্রমে বিভিন্ন সময়ে কর্মী ছিলেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কালিকট রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি একান্ত জীবন যাপন করছিলেন। তাঁর জীবন ছিল কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ। শিশুশিক্ষার জন্য, বিশেষতঃ স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারে তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। এজন্য স্থানীয় লোকেরা তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন।

স্বামী বেদ্যানন্দ (বসন্ত মহারাজ) গত ৪ জানুআরি ১৯৮৬, সকাল ৮-৩০ মিনিটে শ্বাসকার্য বিঘ্নিত হয়ে দেহত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বৎসর। গত কয়েক বছর শয্যাশায়ী হয়ে রোগকষ্টে ভুগলেও তিনি সর্বদা শান্ত ও প্রফুল্ল থাকতেন। সজ্ঞানে ও প্রশান্তির মধ্যে তাঁর শেষ মুহূর্তটি ঘনিয়ে আসে।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সারদাপীঠ রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন এবং ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। সারদাপীঠ ছাড়া তিনি মায়াবতী, লখ্‌নৌ, কিষেণপুর ও কনখল আশ্রমে বিভিন্ন সময়ে কর্মিরূপে ছিলেন। ১৯৮২-রসেপ্টেম্বর মাস থেকে বেলুড় মঠে তিনি একান্ত জীবন যাপন করছিলেন। কৃচ্ছ্রসাধুজীবন ও সরল অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি অনেকের প্রিয় ছিলেন।

তাঁদের দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে শান্তিলাভ করুক—এই আমাদের প্রার্থনা।

বিবিধ সংবাদ

উত্তরপ্রদেশে দশ হাজার বছরের জীবাশ্ম

ডঃ প্রতাপ চন্দ্রের নেতৃত্বে একদল ভারতীয় নৃতত্ত্ব গবেষক উত্তর প্রদেশের সরাই-নগর-রাই অঞ্চলে খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ৮৩৯৫-র একটি নাতিদীর্ঘ, বলিষ্ঠ মানুষের জীবাশ্মের (ফসিল) সন্ধান পেয়েছেন বেশ কিছুকাল পূর্বে। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, দাঁতের চেহারায় প্রমাণিত হয় যে, গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিচরণশীল মানুষটি কঠিন দ্রব্য চিবিয়ে খেত। গত ১৮ জানুআরি থেকে ভারতীয় জাদুঘরে এই ফসিলটি নিয়ে প্রদর্শনী শুরু হয়েছে।

উৎসব

শ্যামপুকুর (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘের উদ্যোগে, শ্রীশ্রীঠাকুরের ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২ অক্টোবর থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত শ্যামপুকুর-বাটীতে অবস্থান উপলক্ষে শতবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সত্তরদিন ধরে ধর্মীয় ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাড়ম্বরে শতবার্ষিকী পালিত হয়। ১৯৮৫-র ২ অক্টোবর, অনুষ্ঠানের শুভ আরম্ভ হয় বৈদিক মন্ত্রপাঠ ও বিশেষ পূজার মধ্য দিয়ে। ঐ দিন বিকাল চারটার সময় শোভাযাত্রা সহ ঘোড়ার গাড়ি করে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি বলরাম-মন্দির থেকে শ্যামপুকুরবাটীতে আনা হয়। ৪ নভেম্বর ১৯৮৫, বিকালে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতিতে অর্ঘ্য নিবেদন করেন। সত্তরদিনের বিভিন্ন দিনে বিশিষ্ট সন্ন্যাসিবৃন্দ ও বিদ্বজ্জন ভাষণ দান করেন। ১১ ডিসেম্বর, অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় ঘোড়ার গাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি স্থাপন করে শ্যামপুকুর থেকে কাশীপুর উদ্যানবাটী পর্যন্ত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে।

নববারাকপুর (২৪ পরগনা) বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে গত ২৫ ডিসেম্বর ১৯৮৫, শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব-উৎসব এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠার অষ্টম বার্ষিক উৎসব পূজা, পাঠ, ভজন, প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

গুড়াপ (হুগলি) শ্রীরামকৃষ্ণ-বিশুদ্ধানন্দ আশ্রম ও সেবাকেন্দ্রে গত ৩ ও ৪ জানুআরি ১৯৮৬, শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি ও শ্রীশ্রীঠাকুরের ১৫০তম জন্মোৎসব পূজা, হোম, পাঠ, ভজন, দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ, দরিদ্র-নারায়ণ সেবা প্রভৃতির মাধ্যমে পালিত হয়।

বিডন স্ট্রীট (কলিকাতা) 'নাগ ভবনে' ও **ভাঙড়** (২৪ পরগনা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত সঙ্ঘে পূজা, পাঠ, ভজন-কীর্তনাদির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের 'কল্পতরু উৎসবে'র শতবার্ষিকী সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে।

শিখরপুর (২৪ পরগনা) সারদা সঙ্ঘ-মাতৃমন্দির ও **গোলাঘাট** (আসাম) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি পূজা, পাঠ, ভজন প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের দ্বারা শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালন করেন।

পরলোকে

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য **ডাঃ প্রতাপাদিত্য রায়** গত ১১ নভেম্বর ১৯৮৫, রাত্রি ১১টায় ৮৫ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে, ১৫ বছর বয়সে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রলাভ করেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য শিলচর শহর নিবাসী **ডাঃ উমাচরণ নাথ** গত ৩১ অক্টোবর ১৯৮৫, রাত্রি ৮-২০ মিঃ ৯৪ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। শেষ মুহূর্তে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের ফটোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে এঁদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

ভ্রমসংশোধন

মাঘ ১৩৯২ সংখ্যা, ৩০ পৃষ্ঠার ২য় কলমের উপর থেকে ৬ষ্ঠ পঙ্‌ক্তির 'না চাওয়া থেকে' স্থলে 'চাওয়া থেকে' এবং ৭১ পৃষ্ঠার উপর থেকে ১ম কলমের ১৮ পঙ্‌ক্তি. ২য় কলমের ১ম ও ১২শ পঙ্‌ক্তি এবং ৭২ পৃষ্ঠার ১ম কলমের উপর থেকে ৭ম পঙ্‌ক্তির 'ভুরান্ড' স্থলে 'ভুরান্ট' পড়তে হবে।—সঃ

ভারততত্ত্ববিদ্ এ. এল. ব্যাসমের দেহান্ত

প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ এ. এল. ব্যাসম গত ২৭ জানুআরি ১৯৮৬, সকাল ৮টায় কলিকাতায় 'উডল্যাণ্ডস্ নার্সিং হোম'-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তিনি গত দুবছর ধরে ক্যানসারে ভুগছিলেন। ১৯৮৫-র সেপ্টেম্বরে তিনি কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির স্বামী বিবেকানন্দ অধ্যাপকের পদগ্রহণ করে, বিশ্বকোষ তৈরির কাজ নিয়ে ক্যানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারতে আসেন। স্ত্রী ও কন্যাসহ তিনি কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ইন্স্টিট্যুট অব কালচারে অতিথি হিসাবে ছিলেন। শরীরের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটায় তাঁকে সেখান থেকে ২২ জানুআরি, বুধবারে নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়।

১৯৮৫-র ২৮ ডিসেম্বর, বেলুড়মঠে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় যুবসম্মেলনে অধ্যাপক ব্যাসম 'বিশ্বশান্তি ও শ্রীরামকৃষ্ণ' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শরীরের অসুস্থতার জন্য তিনি বেশি সময় বলতে পারেননি। অল্প সময়ের মধ্যেও, বর্তমান যুগসঙ্কটে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বারবার উল্লেখ করেন। গত ২৯ জানুআরি, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্স্টিট্যুট অব কালচারের ৪৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল তাঁর, কিন্তু তার ২ দিন পূর্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

২৪ মে, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ইংলণ্ডের এসেক্স কাউন্টির লটন নগরীতে। তাঁর পিতা আর্থার এডোয়ার্ড ব্যাসম বৃত্তিতে সাংবাদিক হলেও কিছুকালের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কাজ করেন। মা মারিয়া জেন টমসন ছিলেন সুগৃহিণী। তাঁরা পুত্রের নাম রেখেছিলেন আর্থার লেওয়েলিন ব্যাসম। এ. এল. ব্যাসম নামেই তিনি সবার কাছে বেশি পরিচিত। অধ্যাপক ব্যাসম লণ্ডনের ওরিয়েণ্টাল স্কুল অব এশিয়ান অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজের ছাত্র ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকের পদে বৃত হন। পরে তিনি অস্ট্রেলীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক ব্যাসম ভারতকে হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছিলেন। ভালবাসতেন ভারতের উন্নত সংস্কৃতি ও উদার ধর্মমতের জন্য। কিশোর বয়সে তিনি একবার ভারতে এসেছিলেন। সে-সময় থেকেই ভারতবর্ষ ও ভারতীয়দের সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ বেড়ে যায়। পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা করে খ্যাতি লাভ করেন। প্রাচ্যবিদ্যায় অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার ভিজিটিং অধ্যাপক হিসাবে কাজ করার আমন্ত্রণ পান। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে তাঁর ছাত্রছাত্রীরা। তিনি একজন সুযোগ্য শিক্ষক ছিলেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন ভারততত্ত্ববিদ্। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য ইণ্ডিয়ান সাব-কন্টিনেণ্ট ইন্ হিস্টরিক্যাল পার্সপেক্টিভ', 'হিস্ট্রি অ্যাণ্ড ডক্ট্রিন্স্ অব্ দ্য আজিবিকস্', 'পেপারস্ অন্ দ্য ডেট অব্ কনিষ্ক', 'দ্য সিভিলাইজেশনস্ অব্ মনস্থন এশিয়া', 'দ্য ওয়াণ্ডার দ্যাট ওয়াজ ইণ্ডিয়া', 'স্টাডিজ ইন্ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার' প্রভৃতি। এছাড়াও তিনি শতাধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন। বহির্বিশ্বে ভারত বিষয়ে জনপ্রিয়তার অনেকাংশ অবদান অধ্যাপক ব্যাসমের।

১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড়মঠ কর্তৃপক্ষ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার আন্তর্জাতিক সমীক্ষা পরিষদ গঠন করেন। এই সমীক্ষা পরিষদের তিনি সভাপতি ছিলেন। ভারত তথা বিশ্বের নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯৮৫-তে বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' পুরস্কার অর্পণ করেন।

তাঁর দেহনির্মুক্ত আত্মার শান্তি কামনা করি আমরা।

—বিশেষ দ্রষ্টব্য—

* অতঃপর বর্তমান পৃষ্ঠাসংখ্যা নিচে।

* পুনর্মুদ্রিত অংশের পৃষ্ঠাসংখ্যা উপরে।

পুনর্মুদ্রণ

২য় বর্ষ, ১৬-১৭শ সংখ্যা ● আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৭ (পৃষ্ঠা ৪৯৮—৫২৩)

সূচী :

যাঁহারা কিছু ভাবনা চিন্তা রাখেন, তাঁহারা হয়ত স্থির করিবেন, সূর্য্য একটী নক্ষত্রবিশেষ ; অপরাপর ব্যোমচারীও যেমন পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমদিকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, সূর্য্যও সেইরূপ করিতেছে। পৃথিবী অন্যান্য গ্রহাদির ন্যায় নিরলম্বভাবে আকাশে অবস্থিত। অতএব সমস্ত নক্ষত্রাদি যদি পৃথিবীকে ঘুরিয়া আসে, তাহা হইলে কাজে কাজেই সূর্য্যের উদয় পূর্ব্বদিকে ও অস্ত পশ্চিমদিকে হইবে। আবার সূক্ষ্মতর বিচারে হয়ত প্রতিপন্ন হইবে যে, সূর্য্য পৃথিবীকে ঘুরে না, পৃথিবীই নিজ মেরুদণ্ডের উপর পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্ব্বদিক্ মুখে প্রত্যহ একবার আবর্ত্তন করিতেছে ; কাজেই সমস্ত গ্রহ তারকাদি ও সূর্য্য পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমদিকে ঘুরিতেছে বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে তাঁহারা ভূত, অদৃষ্ট বা দৈবের কথা দূর করিয়া বুদ্ধিগম্য কারণে প্রত্যক্ষ-বিষয়ের মীমাংসা করিতে অগ্রসর হন ; কিন্তু তাঁহাদিগকেই যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, যে, কেন পৃথিবীর উৎপত্তি হইল, অথবা কিরূপে ইহার সহিত সূর্য্যের বর্ত্তমান সম্বন্ধ ঘটিল, তাহা হইলে বর্ত্তমান অবস্থায় দৈববাদ বা নির্ব্বাদ ভিন্ন আর উপায় নাই। বলিতে হইবে, এক সময় এরূপ ঘটিয়াছিল, যাহাতে বর্ত্তমান সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়া থাকিবে। কেন ?—জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর নাই।

সকল 'কেন'র উত্তর মিলে না, কারণ আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ।

সে যাহাই হউক, ইহা একরূপ স্থির সিদ্ধান্ত যে, প্রকৃতির নিয়ম যতই আমাদিগের নিকট পরিচিত হইতে থাকে অর্থাৎ যতই আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই দৈববাদাদি নিরাকৃত হইয়া কার্য্য-কারণ-বাদ বিশদীকৃত হয়। বিজ্ঞান আলোচনা করিতে হইলে আমাদের প্রথম হইতেই স্থির করিয়া লইতে হইবে যে, প্রত্যেক কার্য্যের যুক্তি ও নিয়মসঙ্গত কারণ আছে, জগতে কোন ঘটনাই আকস্মিক, বা অহেতুক বা অনিয়মিত নহে। আজ যেটা আকস্মিক বা অহেতুক ভাবিয়া, অদৃষ্টাদির সাহায্যে মীমাংসা করিতেছি, সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে দেখা যাইবে, শত সহস্র ঘটনা ইহারই ন্যায় ঘটিতেছে এবং সকলেই কোন এক বিশেষ নিয়মের অন্তর্গত।

এস্থলে প্রথম হইতেই জানিয়া থাকা ভাল যে, এখানে 'বিজ্ঞান' শব্দ বিদেশীয় অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে অর্থাৎ যেখানে বিজ্ঞানের কথা হইবে, সেই খানেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বা জড়তত্ত্ব physical science বলিয়া বুঝিতে হইবে।

বর্ত্তমানে সভ্য জগৎ এই বিজ্ঞানোৎকর্ষে বলীয়ান্। ইংরাজ সমীপে ভারতের যদি কিছু শিক্ষণীয় থাকে, তবে এই বিজ্ঞানশাস্ত্র। বিজ্ঞানের অন্যতর ভিত্তিস্বরূপ উপরি উক্ত কার্য্য-কারণ-বাদ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কেবলমাত্র এই মতটীতে কত শক্তি আনিয়া দেয়। মুমূর্ষু ভারতবাসীর পক্ষে অদৃষ্টবাদ, দৈববাদ প্রভৃতির পরিবর্ত্তে বৈজ্ঞানিক কার্য্য-কারণ-বাদ প্রভৃতির পোষণ করা নিতান্তই আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। দিন দিন ভারতবাসী রোগে, অনাহারে, নিরুৎসাহে জর্জ্জরিত হইতেছে। তাহার স্থির ধারণা হওয়া উচিত যে, এ সকলের বৈজ্ঞানিক কারণ আছে, অদৃষ্ট বা বিধিলিপি হইতে এগুলি উৎপন্ন হইতেছে না। এই সকল বিপদ্-পাতের কারণানুসন্ধান বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ইহাই কেবল উল্লেখনীয় যে বিজ্ঞানচর্চ্চা দেশে

অগ্রহায়ণ, ১৩১২ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

[পুনর্মুদ্রণ]

(ফাল্গুন, ১৩১২, পৃঃ ৯২৯)

উপযুক্ত রূপে প্রবেশ লাভ করিলে, সাধারণের বর্ত্তমান অবসন্ন মনোভাব তিরোহিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কারণ বিজ্ঞানশাস্ত্রের অন্যতর মূলসূত্রই এই যে, কার্য্য মাত্রেরই প্রকৃতিনিয়মিত কারণ আছে।

আসামের কথা।

[বাবু প্রবোধচন্দ্র দে লিখিত। পৃঃ ৪৯৯—৫০৪। —বর্তমান সম্পাদক।]

রামকৃষ্ণ মিশন।

স্বামী বিবেকানন্দ গত শ্রাবণ মাসে আমেরিকা পরিত্যাগ করিয়া প্যারিস্ নগরে আসিয়াছেন। স্বামীজি এবার আমেরিকায় অবস্থিতি কালে অধিকাংশ সময় ক্যালিফোর্ণিয়া প্রদেশে বেদান্ত প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে ক্যালিফোর্ণিয়ায় প্রচার কার্য্যের আশাতীত ফল হইয়াছে। তথাকার অধিবাসীগণ বেদান্ত প্রচারের সুবিধার জন্য ১৬০ একার অর্থাৎ কমবেশী ৫৬০ বিঘা জমি প্রদান করিয়াছেন।

পূজা, ধ্যান, জপ, পাঠ, ভজন প্রভৃতি সাধন করিতে করিতে যদি দেখ, হৃদয়ে মানুষের প্রতি ভালবাসার বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে না, তবে জানিবে তুমি ভগবানের নয়, ভূতের উপাসনা করিতেছ।

ভগবদ্গীতা-শঙ্করভাষ্যানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত)

[গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ১৬ সংখ্যক ভাষ্যের শেষাংশের অনুবাদ এবং ১৭ সংখ্যক শ্লোকের মূল, অন্বয়, মূলের অনুবাদ, ভাষ্য ও ভাষ্যের অনুবাদ এবং ১৮ সংখ্যক শ্লোকের মূল, অন্বয়, মূলের অনুবাদ, ভাষ্য ও ভাষ্যের অনুবাদের প্রথমাংশ—বর্তমান সম্পাদক।]

উদ্বোধন

২য় বর্ষ।] ১লা কার্ত্তিক। (১৩০৭ সাল) [১৭শ সংখ্যা

জ্ঞানযোগ।

সন্ন্যাসীর গীতি।

(১)

উঠাও সন্ন্যাসী, উঠাও সে তান,
হিমাদ্রি শিখরে উঠিল যে গান—
গভীর অরণ্যে, পর্ব্বত-প্রদেশে,
সংসারের তাপ যথা নাহি পশে—
যে সঙ্গীত-ধ্বনি-প্রশান্ত-লহরী
সংসারের রোল উঠে ভেদ করি,
কাঞ্চন কি কাম কিম্বা যশ-আশ
যাইতে না পারে কভু যার পাশ,
যথা সত্য-জ্ঞান-আনন্দ-ত্রিবেণী—
—সাধু যায় স্নান করে ধন্য মানি—
উঠাও সন্ন্যাসী, উঠাও সে তান,
গাও গাও গাও গাও সেই গান—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

(২)

ভেঙ্গে ফেল শীঘ্র চরণ শৃঙ্খল—
সোণার নির্ম্মিত হলে কি দুর্ব্বল,
হে ধীমান্, তারা তোমার বন্ধনে?
ভাঙ্গ শীঘ্র তাই ভাঙ্গ প্রাণপণে।
ভালবাসা-ঘৃণা, ভাল-মন্দ দ্বন্দ্ব,
ত্যজহ উভয়ে, উভয়েই মন্দ।
আদর দাসেরে, কশাঘাত কর,
দাসত্ব তিলক ভালের উপর—
স্বাধীনতা বস্তু কখন জানে না,
স্বাধীন আনন্দ কভু ত বুঝে না।
তাই বলি, ওহে সন্ন্যাসিপ্রবর,
দূর কর দুয়ে অতীব সত্বর।
কর কর গান কর নিরন্তর—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

(৩)

যাক্ অন্ধকার, যাক্ সেই তমঃ,
আলেয়ার মত বুদ্ধির বিভ্রম
ঘটায়ে, আঁধার হইতে আঁধারে
নিয়ে যায় এই ভ্রান্ত জীবাত্মারে।
জীবনের এই তৃষা চিরতরে
মিটাও জ্ঞানের বারি পান করে।
এই তমঃ রজ্জু জীবাত্মা পশুরে
জন্মমৃত্যুমাঝে আকর্ষণ করে।
সেই সব জিনে—নিজে জিনে যেই,
ফাঁদে পা দিও না, জেনে তত্ত্ব এই।
বলহ সন্ন্যাসী, বল বীর্য্যবান্,
করহ আনন্দে কর এই গান—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

(৪)

'কৃতকর্ম্মফল ভুঞ্জিতে হইবে',
বলে লোকে, 'হেতু কার্য্য প্রসবিবে,
শুভ কর্ম্ম—শুভ, মন্দে—মন্দ ফল,
এ নিয়ম রোধে নাই কার বল।
এ মর-জগতে সাকার যে জন,
শৃঙ্খল তাহার অঙ্গের ভূষণ।'
সত্য সব, কিন্তু নামরূপপারে
নিত্যমুক্ত আত্মা আনন্দে বিহরে।
জানো তত্ত্বমসি, করো না ভাবনা—
করহ সন্ন্যাসী, সদাই ঘোষণা—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

(৫)

সত্য কিবা তারা জানে না কখন,
সদাই যাহারা দেখয়ে স্বপন—

(ফাল্গুন, ১৩১৯, পৃঃ ১০১)

—পিতা মাতা জায়া অপত্য বান্ধব—
আত্মা ত কখন নহে এই সব,
নাহি তাহে কোন লিঙ্গালিঙ্গ ভেদ।
নাহিক জনম, নাহি খেদাখেদ।
কার পিতা তবে, কাহার সন্তান?
কার বন্ধু, শত্রু কাহার, ধীমান্?
একমাত্র যেবা—যেবা সর্ব্বময়,
যাহা বিনা কোন অস্তিত্বই নয়,
তত্ত্বমসি, ওহে সন্ন্যাসিপ্রবর,
উচ্চরবে তাই এই তান ধর,

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

(৬)

একমাত্র মুক্ত—জ্ঞাতা আত্মা হয়,
অনাম অরূপ অক্লেদ নিশ্চয়,
তাঁহার আশ্রয়ে এ মোহিনী মায়া
দেখিছে এ সব স্বপনের ছায়া,
সাক্ষীর স্বরূপ—সদাই বিদিত,
প্রকৃতি জীবাত্মারূপে প্রকাশিত,
তত্ত্বমসি, ওহে সন্ন্যাসিপ্রবর,
ধর ধর ধর উচ্চে তান ধর—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

(৭)

অন্বেষিছ মুক্তি কোথা বন্ধুবর,
পাবে না ত হেথা, কিম্বা এর পর,
শাস্ত্রে বা মন্দিরে বৃথা অন্বেষণ—
নিজ হস্তে রজ্জু—যাহে আকর্ষণ,
ত্যজ অতএব বৃথা শোকরাশি,
ছেড়ে দাও রজ্জু, বল হে সন্ন্যাসী,

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

(৮)

ভেব না দেহের হয় কিবা গতি—
থাকে কিম্বা যায়—অনন্ত নিয়তি—
কার্য্য অবশেষ হয়েছে উহার,
এবে ওতে প্রারব্ধের অধিকার,
কেহ বা উহারে মালা পরাইবে—
কেহ বা উহারে পদ প্রহারিবে—
কিছুতেই চিত্ত-প্রশান্তি ভেঙ্গ না,
সদাই আনন্দে রহিবে মগনা।
কোথা অপযশ—কোথা বা সুখ্যাতি?
স্তাবক স্তাব্যের একত্ব প্রতীতি,
অথবা নিন্দুক নিন্দ্যের যেমতি।
জানি এ একত্ব আনন্দ-অন্তরে
গাও হে সন্ন্যাসী, নির্ভীক-অন্তরে—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

(৯)

পশিতে পারে না কভু তথা সত্য—
কাম লোভ বশে যেই হৃদি মত্ত—
কামিনীতে করে স্ত্রীবুদ্ধি যে জন,
হয় না তাহার বন্ধন-মোচন।
কিম্বা কিছু দ্রব্যে যার অধিকার—
হউক সামান্য—বন্ধন অপার—
ক্রোধের শৃঙ্খল কিম্বা পায়ে যার,
হইতে না পারে কভু মায়া পার।
ত্যজ অতএব, এ সব বাসনা,
আনন্দে সদাই কর হে ঘোষণা—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

(১০)

সুখ তরে গৃহ কোরো না নির্ম্মাণ,
কোন্ গৃহ তোমা ধরে হে মহান্
গৃহছাদ তব অনন্ত আকাশ,
শয়ন তোমার সুবিস্তৃত ঘাস—
দৈববশে প্রাপ্ত যাহা তুমি হও,
সেই খাদ্যে তুমি পরিতৃপ্ত রও।
হউক কুৎসিৎ, কিম্বা সুরন্ধিত,
ভুঞ্জহ সকলি হয়ে অবিকৃত,
শুদ্ধ আত্মা যেই জানে আপনারে,
কোন্ খাদ্য-পেয় অপবিত্র করে?
হও তুমি চল স্রোতস্বতী মত,

(৮৮তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ১০২)

স্বাধীন উন্মুক্ত নিত্যপ্রবাহিত,
উঠাও আনন্দে, উঠাও সে তান,
গাও গাও গাও সদা এই গান—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

(১১)

তত্ত্বজ্ঞের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হয়,
অতত্ত্বজ্ঞ তোমা হাসিবে নিশ্চয়।
হে মহান্, তোমা করিবেক ঘৃণা,
তাহাদের দিকে চেয়েও দেখ না।
স্বাধীন, উন্মুক্ত—যাও স্থানে স্থানে,
অজ্ঞান হইতে উদ্ধার অজ্ঞানে—
মায়া-আবরণে ঘোর অন্ধকারে,
নিয়তই যারা যন্ত্রণায় মরে,
বিপদের ভয় কোরো না গণনা—
সুখ অন্বেষণে যেন হে যেতনা—
যাও এ উভয়-দ্বন্দ্ব-ভূমি পারে,
গাও গাও গাও গাও উচ্চস্বরে—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

(১২)

এইরূপে বন্ধো, দিন পর দিন,
করমের শক্তি হয়ে যাবে ক্ষীণ—
আত্মার বন্ধন ঘুচিয়া যাইবে,
জনম তাহার আর না হইবে,
আমি বা আমার কোথায় তখন?
ঈশ্বর—মানব—তুমি—পরিজন?
সকলেতে আমি—আমাতে সকল—
আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ কেবল,—
সে আনন্দ তুমি, ওহে বন্ধুবর,
তাই হে আনন্দে ধর তান ধর—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

মায়া।

মায়া এই কথাটী আপনারা প্রায় সকলেই শুনিয়াছেন। ইহা সাধারণতঃ অত্যন্তঅযথা-পূর্ব্বক কল্পনা বা কুহক বা এইরূপ কোন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মায়াবাদরূপ একতম স্তম্ভের উপর বেদান্ত স্থাপিত বলিয়া, ইহার যথার্থ উপলব্ধি আবশ্যক। মায়াবাদ বুঝাইতে হইলে সহসা হৃদয়ঙ্গম না হইবার আশঙ্কা আছে, এ কারণ আপনারা কথঞ্চিৎ মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

বৈদিক সাহিত্যে মায়া শব্দের যে প্রাচীনতম জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কুহক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু তখন প্রকৃত তত্ত্ব প্রস্ফুরিত হয় নাই। আমরা এইরূপ শ্লোক দেখিতে পাই, "ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে," ইন্দ্র মায়াদ্বারা নানারূপ ধারণ করিয়াছিলেন। এস্থলে মায়া-শব্দ ইন্দ্রজাল বা তত্তুল্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অনেকানেক শ্লোকের ঈদৃশ অর্থগ্রহণ সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে মায়া শব্দের ব্যবহার সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইত্যবকাশে এতৎ-শব্দ-প্রতিপাদ্য ভাব ক্রমশঃই পরিপুষ্ট হইতেছিল। পরবর্ত্তী সময়ে দেখা যায় প্রশ্ন হইতেছে, "আমরা জগতের গুপ্ত রহস্য জানিতে পারি না কেন?" ইহার এইরূপ নিগূঢ় অর্থসূচক উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়:—"আমরা জল্পক, ইন্দ্রিয়সুখে পরিতৃপ্ত ও বাসনাপর বলিয়া এই সত্যকে নীহারাবৃত করিয়া রাখিয়াছি"—"নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা আশুতৃপ উকৃথশাসাশ্চরন্তি।" এস্থলে মায়াশব্দ আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই; কিন্তু আমাদের অজ্ঞতার যে কারণ অবধারিত হইয়াছে, তাহা, এই সত্য ও আমাদিগের মধ্যে, কুজ্ঝটিকাবৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে, এই ভাবটী পরিব্যক্ত হইতেছে। অনেক পরবর্ত্তী সময়ে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিষদে, মায়াশব্দের পুনরাবির্ভাব দেখা যায়। কিন্তু এ সময়ে ইহার প্রভূত রূপান্তর সংঘটিত হইয়াছে; নূতন অর্থরাশি ইহার সহিত সংলগ্ন হইয়াছে; নানাবিধ মতবাদ প্রচারিত ও পুনরুক্ত হইয়াছে; মতান্তর গৃহীত হইয়াছে; অবশেষে মায়াবিষয়ক ধারণা একটী স্থিরভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা উপনিষদে পাঠ করি, "মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে," "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু

(ফাল্গুন, ১৩১২, পৃঃ ১০০)

মহেশ্বরম্ ।" আমাদিগের দার্শনিক পণ্ডিতগণের সম্বন্ধে দেখা যায়, যদবধি মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব না হইয়াছিল, তাঁহারা এই মায়াশব্দ বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জক অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। বোধ হয়, মায়াশব্দ বা মায়াবাদ বৌদ্ধদিগের দ্বারাও কথঞ্চিৎ রঞ্জিত হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধদিগের হস্তে ইহা অনেকটা বিজ্ঞানবাদে পরিণত হইয়াছিল এবং মায়া কথাটী এইরূপ অর্থেই এক্ষণে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইতেছে। হিন্দু যখন "জগৎ মায়াময়" বলেন, সাধারণ মানবের মনে এই ভাব উদয় হয় যে, "জগৎ কল্পনা মাত্র।" বৌদ্ধদার্শনিকদিগের ঈদৃশ ব্যাখ্যার কিছু ভিত্তি আছে, কারণ এক শ্রেণীর দার্শনিকেরা বাহ্য জগতের অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু বেদান্তোক্ত মায়ার শেষ পরিপুষ্টাকৃতি, বিজ্ঞানবাদ, সর্ব্বাস্তিত্ববাদ বা কোনরূপ মতবাদ নহে। আমরা কি, ও, সর্ব্বত্র কি প্রত্যক্ষ করিতেছি, এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনার ইহা সহজ বর্ণনা মাত্র। আমি আপনাদিগকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, বেদ যাঁহাদের অন্তরনিঃসৃত, তাঁহাদের চিন্তাশক্তি মূলতত্ত্ব অনুধাবনে ও আবিষ্করণেই অভিনিবিষ্ট ছিল। তাঁহারা যেন এই সকল তত্ত্বের বিস্তারিত অনুশীলন করিবার অবসর পান নাই এবং সে জন্য অপেক্ষাও করেন নাই। তাঁহারা বস্তুর অন্তরতম প্রদেশে উপনীত হইতেই ব্যগ্র ছিলেন। পরোক্ষ কিছু যেন তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল, তাঁহারা আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না। বস্তুতঃ উপনিষদের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আধুনিক বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত বিশেষ প্রতিপত্তি সকল অনেক সময়ে ভ্রমাত্মক হইলেও, এই সকল মূলতত্ত্বই বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব। একটী দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ইথর (ether) বা আকাশ বিষয়ক অভিনব তত্ত্ব উপনিষদের মধ্যে রহিয়াছে। এই আকাশ-তত্ত্ব আধুনিক বৈজ্ঞানিকের ইথর অপেক্ষা সমধিক পরিপুষ্ট-ভাবে বিদ্যমান। কিন্তু ইহা মূলতত্ত্বেই পর্য্যবসিত ছিল। তাঁহারা এই আকাশ তত্ত্বের কার্য্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেক ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। জগতের যাবতীয় জীবনীশক্তি যাহার বিভিন্ন বিকাশ মাত্র, সেই সর্ব্বব্যাপী জীবনীশক্তি-তত্ত্ব বেদে—উহার ব্রাহ্মণাংশেই, প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংহিতার একটী দীর্ঘমন্ত্রে সকল জীবনীশক্তির বিকাশক প্রাণের প্রশংসাবাদ আছে। এই উপলক্ষে আপনাদের কাহারও হয়ত জানিতে আনন্দ হইতে পারে যে, আধুনিক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের মতানুযায়ী এই পৃথিবীর জীবোদ্ভব-তত্ত্ব বৈদিক দর্শনে পাওয়া যায়। আপনারা নিশ্চয় সকলেই জানেন যে, জীব অন্য গ্রহাদি হইতে পৃথিবীতে সংক্রামিত হয়, এইরূপ একটী মত প্রচলিত আছে। জীব চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীতে আগমন করে, কোন কোন বৈদিক দার্শনিকের ইহাই স্থির মত।

মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা বিস্তৃত ও সাধারণ তত্ত্ব সকল বিবৃত করিতে অতিশয় সাহস ও আশ্চর্য্য নির্ভীকতা দেখাইয়াছেন। বাহ্য জগৎ হইতে তাঁহারা এই বিশ্বরহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটনে যথা সম্ভব উত্তর পাইয়াছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের বিশেষ প্রতিপত্তি সকল এই প্রশ্নের মীমাংসায় একপদও অগ্রসর হইতে পারে না। কারণ ইহার মূলতত্ত্ব সকল এই মর্ম্মাবধারণে অক্ষম। যদ্যপি পুরাকালে আকাশ-তত্ত্ব বিশ্বরহস্য ভেদে অক্ষম হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার বিস্তারিত অনুশীলন আমাদিগকে সত্যাভিমুখে অধিক অগ্রসর করিতে পারিবে না। যদ্যপি বিশ্বতত্ত্ব-নির্ণয়ে এই সর্ব্বব্যাপী জীবনীশক্তি-তত্ত্ব অক্ষম হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার বিস্তারিত অনুশীলন নিরর্থক, কারণ তাহা বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিবে না। আমি এই বলিতে চাই, তত্ত্বানুশীলনে হিন্দু দার্শনিকগণ আধুনিক পণ্ডিতদিগের ন্যায় এবং কখন কখন তাঁহাদিগের অপেক্ষাও অধিকতর সাহসী ছিলেন।

(৮৮তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১০৪)

অনাথ-আশ্রম ও জাতীয় উপকারিতা।

হিন্দু-সমাজ কর্ত্তৃক পরিচালিত অনাথাশ্রম বাঙ্গালা দেশে ত কুত্রাপি নাই, সমগ্র ভারত বর্ষেও আছে কি না সন্দেহ। যদিও তুই একটী মাত্র থাকে, তাহা অতি ক্ষুদ্র এবং স্থানীয় কোন বিশেষ সম্প্রদায় ভুক্ত; তাহাতে ভারতের যাবতীয় প্রদেশের অনাথ বালক-বালিকাগণ (হিন্দু-হইলেও) স্থান পায় না। সুতরাং খ্রীষ্টানগণ আমাদের দেশের অনাথ বালক বালিকাগণকে কিছু-দিন লালনপালন করিয়া অনায়াসে নিজ সম্প্রদায় ভুক্ত করিয়া লয়েন। ইহাতে খ্রীষ্টান মিশনারী-গণেরও দোষ নাই; অনাথ বালক-বালিকাগণেরও দোষ নাই। দোষ আমাদিগের আধুনিক স্বদেশের। নীচ জাতীয় দরিদ্র দেখিলেই ত আমরা দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দি। তাহারা হিন্দু হইলেও, তাহাদিগকে শূদ্র, অস্পৃশ্য ও অগণ্য জ্ঞানে আমরা অবহেলা করিয়া থাকি। তাহারা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলেও আমরা কিছু ক্ষতি মনে করি না। যদি একান্তই দয়ার্দ্রচিত্ত হইলাম, মনে যদি একান্তই দেশহিতৈষিতারূপ প্রগাঢ় সাত্বিক ভাবের উদয় হইল, তাহাদিগকে এক মুষ্টি ভিক্ষা দিলাম, বা একখানি ছিন্ন বস্ত্র দিলাম, বা বড় জোর, বাটীতে ভৃত্য করিয়া রাখিলাম। তাহাদিগকে যত্নসহকারে লালনপালন করা, লেখাপড়া ও ভদ্রোচিত আচার ব্যবহার শিখান, অন্তরে প্রকৃত মনুষ্যত্বের ভাব প্রবেশ করাইয়া দেওয়া প্রভৃতি কর্ত্তব্য জ্ঞান কখনও আমাদিগের মনে উদয় হয় না। সুতরাং নীচবংশোদ্ভব নিরাশ্রয় অনাথগণ পেটের জ্বালায় স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, যাহারা যত্ন করে তাহাদিগের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতে, তাহাদিগের কথা শুনিতে, এবং তাহাদেরই ধর্ম্ম পালন করিতে বাধ্য হয়।

কি আশ্চর্য্য! কাহাদের ধন কাহারা ভোগ করে দেখুন; কাহাদের লোক কাহারা লইয়া যায়। কেনই বা না লইয়া যাইবে। আমরা নিজেরাই যে ঘরের লক্ষ্মী বাহির করিয়া দিতেছি! লক্ষ্মী চঞ্চলা, কখনও এক জায়গায় স্থির থাকিবার নন; যিনি যত্ন করিবেন, তাঁহারই নিকটে যাইবেন। আমরা জাত্যভিমান ও ধনগর্ব্বাদিতে মুগ্ধ হইয়া বুঝিতে পারিতেছি না যে, যাহাদিগকে আমরা ঘৃণা করিতেছি, তাহারাই আমাদিগের দেশের লক্ষ্মী; তাহাদিগের হইতেই আমাদিগের ধন, মান, সুখ, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্তই। তাহারা যদি না থাকিত, আজ আমরা অমরাবতী তুল্য সহরে রাজপ্রাসাদোপরি দুগ্ধফেণনিভ শুভ্র ও পুষ্পরেণুসম কোমল শয্যাদির সুখ ভোগ করিতে পারিতাম না। যাহাদিগকে ঘৃণা করি, আজ তাহারা যদি না থাকিত, আমাদিগকেই তাহাদিগের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইত; আমাদিগকেই আজ তাহাদিগের ন্যায় লাঙ্গল স্কন্ধে বহন করিয়া ধান্য-ক্ষেত্রে দৌড়াইতে হইত, রৌদ্রে বা বারিপাতে অনাহারে অনবরত শস্য রোপণাদি কার্য্য করিতে হইত, গৃহ নির্ম্মাণ জন্য ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে কোদাল দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে হইত; স্বাস্থ্যরক্ষা নিমিত্ত মস্তকে করিয়া ময়লা লইয়া 'ধাবার' মাঠে ফেলিয়া আসিতে হইত। মনে করুন, যাহাদিগকে ঘৃণা করি, তাহাদিগের অবর্ত্তমানে, আমাদিগের কতদূর তুর্দ্দশা হওয়া সম্ভব।

দেশপালনার্থ রাজাকেও যেমন দরকার, প্রজাকেও তেমনি দরকার; ভদ্রলোককেও যেমন প্রয়োজন, ছোটলোককেও তেমনি আবশ্যক; একের অভাবে অপরের কষ্ট ও দেশের ক্ষতি। আট-ছয়—আটচল্লিশ; এই গুণফলের পক্ষে আটও যেমন আবশ্যকীয়, ছয়ও তেমনি আবশ্যকীয়। অবশ্য আটের স্বতন্ত্র মূল্য ছয়ের অপেক্ষা বেশী স্বীকার করি; কিন্তু ঐ "৪৮"-কে লাভ করিবার জন্য, আটের সঙ্গে গুণক-ছয়কে এত আবশ্যক হয় যে, এতদভাবে আর অমন পাঁচটী

(ফাল্গুন, ১৩১২, পৃঃ ১০৫)

আটের (যোজনার্থ) প্রয়োজন হইয়া পড়ে। একটা মোট আনিতে, একটী ছোটলোক হয়ত অনায়াসেই পারিবে; আর সেইটী ভদ্রলোক দ্বারা আনাইতে হইলে, হয়ত, অমন ছয়জন ভদ্রলোককে হিম শিম খাইতে হইবে। অবশ্য, ছোটলোককে যে পূজা করিতে বা মাথায় রাখিতে বলিতেছি, তাহা নহে; যতটা তাহাদিগকে যত্ন করা কর্ত্তব্য, যতটা যত্ন বা সদ্ব্যবহার করিলে তাহারা আমাদিগের ও দেশের যথেষ্ট উপকারে আসিতে পারে, ততটা আমরা কেন না করি? দেশপালনে ও জাতীয়তা রক্ষণে তাহারাও যে কিছু কম সহায়, তাহা নহে।

ভদ্র-সন্তান অনাথ হইয়া পড়িলে অন্যের নিকট আশ্রয় পাইতে পারেন। কিন্তু, নীচবংশোদ্ভব সন্তানগণ দুর্ভিক্ষে, অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলেও আমাদের দেশের কয়জন ভদ্রলোক ব্যথিত হন? প্রতি বৎসরেই ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষবশতঃ শতসহস্র দরিদ্র নর নারী ও অনাথ বালকবালিকা অকালে কালকবলে পতিত হইতেছে; কয়জন দেশীয় ভদ্রসন্তান সেই দুর্ভিক্ষানল মধ্যে যাইয়া তাহাদিগের জীবন রক্ষার্থ দণ্ডায়মান হইতেছেন? কিন্তু দেখুন, কত খ্রীষ্টান পাদ্‌রী, কত খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনী, সেই দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে সেবা করিতে করিতে নিজেদের অমূল্যজীবন বিসর্জ্জন করিতেছেন। দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দেশে দারুণ বিসূচিকা ভীষণ রূপে বিস্তৃত হইয়া থাকে; কত শত নিরাশ্রয়গণ রোগাক্রান্ত হইয়া পথে ঘাটে ও মাঠেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়; অকপট হৃদয়ে দুই হস্ত দিয়া তাহাদিগের সেবা করিতে করিতে কত পাদ্‌রী পাদ্‌রিণী রোগাক্রান্ত হইয়া কবরে নীত হন। সহৃদয় খ্রীষ্টানগণ স্বচক্ষে এ সকল ভীষণ ব্যাপার দেখিয়াও তথা হইতে পশ্চাৎপদ হইতেছেন না; বরং দ্বিগুণ উদ্যমের সহিত সেবা-ব্রতে বদ্ধ পরিকর হইতেছেন।

আর তত্রস্থ স্থানীয় জমিদার ও স্বদেশী ভদ্রলোকগণ কি করিতেছেন? স্থান ও দেশ পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে পলায়ন করিতেছেন; যখন দুর্ভিক্ষপ্রকোপ তথায় নির্ম্মূল হইবে, তখন আবার তাঁহারা তথায় যাইয়া স্বত্বভোগ বা স্বার্থ চরিতার্থ করিবেন। আমাদিগের নিজদেশের অনাথগণের প্রাণরক্ষা, কেন বিদেশ হইতে বিধর্ম্মিগণকে আসিয়া করিতে হয়?—ইহা কি লজ্জার কথা নয়? যে ভারতের লোক এককালে সামান্য বিহঙ্গমের প্রাণ রক্ষার্থ নিজের গাত্র হইতে মাংসখণ্ড অবলীলাক্রমে স্বহস্তে কর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন; যে ভারতের রাজা প্রজা-রঞ্জনার্থ প্রাণাধিক নিজমহিষীকেও বিসর্জ্জন দিতে লেশমাত্রও বিচলিত হন নাই; যে ভারতের পিতামাতা অভুক্তের সেবার জন্য একমাত্র কুলতিলক প্রিয়তম নিজসন্তানকেও স্বহস্তে ভীষণরূপে বলিদান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; যে ভারতের দান ও অদ্ভুত পরোপকার ত্রিভুবন-খ্যাত হইয়াছিল; অতিদূর বিদেশীয় প্রাচীন কবিগণ কল্পনার উচ্চতম শৃঙ্গে উপবেশন করিয়া যখন দান ধর্ম্ম দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতির একখানি উৎকৃষ্ট চিত্র সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত করিবার বাসনায় কোন্ দেশের নাম উপমার ছলে উল্লেখ করিবেন ভাবিতেন, তখন সেই ভাবাবিষ্ট সিদ্ধ কবিগণের তুলিকা হইতে রত্নাকর ভারতের নামই স্বতঃ নিঃসৃত হইয়া পড়িত;—যে স্বর্গোপম ভারতের মাহাত্ম্য অতিদূর ও দুর্গম্য বিদেশের অন্তরেও এতদূর প্রবিষ্ট হইয়াছিল; যে ভারতের গৌরব জগতের সর্ব্বত্র শাখী পাখী পর্য্যন্ত গাহিত; আজ কিনা, সেই ভারতের অনাথগণ অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিতেছে,—দেখিয়া, 'ভদ্র' ও 'সভ্য' নামধারী ভারতবাসিগণ (ছি ছি ছি! "ভারতবাসিগণ"? স্বার্থপর কখন 'ভারতবাসী' নাম ধারণ করিবার উপযুক্ত নন।) ভয়ে দূরে পলায়ন করিতেছেন।

(৮৮তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ১০৬)

উদ্বোধন : চৈত্র ১৩৯২

সূচীপত্র

॥ প্রচ্ছদ-পরিচিতি ॥

গত ১৯৮৫-র ডিসেম্বরের ২৪ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত বেলুড়মঠে সর্বভারতীয় যুবসম্মেলন হয়ে গেল। এই উপলক্ষে জি. টি. রোড থেকে বেলুড়মঠে যাওয়ার পথে নানাবর্ণ সুশোভিত একটি বিরাট তোরণ নির্মিত হয়। এই তোরণ ও হাজার হাজার যুবক-যুবতীর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার একাংশ প্রচ্ছদ-মুদ্রণ। আলোকচিত্র-শিল্পী শ্রীপ্রশান্ত পাল এবং অলঙ্করণে শ্রীশিবরাম দত্ত।

গোপালের মা ২·২৫
গীতাতত্ত্ব ৭·০০
পত্রমালা ৪·০০
বিবিধ-প্রসঙ্গ ৩·৫০

স্বামী অখণ্ডানন্দ
তিব্বতের পথে হিমালয়ে ৬·৫০
স্মৃতি-কথা ১০·০০

শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়
লাটুমহারাজের স্মৃতিকথা ২০·০০

স্বামী সিদ্ধানন্দ সংগৃহীত
সৎকথা ১০·০০
অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ ৭·৫০

স্বামী বিরজানন্দ
পরমার্থ-প্রসঙ্গ ৪·৫০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
মহাভারতের গল্প ৪·৫০

স্বামী দেবানন্দ
ব্রহ্মানন্দ স্মৃতিকণা ১·৭৫

স্বামী বামদেবানন্দ
সাধক রামপ্রসাদ ৬·০০

স্বামী পরমানন্দ
প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা ২৪·০০

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
সাধু নাগমহাশয় ৬·০০

স্বামী নিরাময়ানন্দ-সম্পাদিত
স্বামী শুদ্ধানন্দ : জীবনী ও রচনা ১৫·০০

শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য
শঙ্কর-চরিত ৩·০০
দশাবতার চরিত ৫·০০

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ
দিব্যপ্রসঙ্গে ৬·৩৫

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ
পুণ্যস্মৃতি ৩·০০

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ
অতীতের স্মৃতি ২০·০০
বন্দি তোমায় ১০·০০

স্বামী নরোত্তমানন্দ
রাজা মহারাজ ৭·০০

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
ভগবানলাভের পথ ১·৫০
মাতৃভূমির প্রতি আমাদের কর্তব্য ৩·০০

স্বামী প্রভানন্দ
ব্রহ্মানন্দচরিত ৩০·০০

স্বামী অন্নদানন্দ
স্বামী অখণ্ডানন্দ ১৬·০০

স্বামী নিরাময়ানন্দ
স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয় ৩·৩০

স্বামী ধ্যানানন্দ
ধ্যান ৩·৫০

স্বামী তেজসানন্দ
ভগিনী নিবেদিতা ৪·৪০

স্বামী অপূর্বানন্দ
মহাপুরুষ শিবানন্দ ১৫·০০

সংস্কৃত

শ্রীরামকৃষ্ণপূজাপদ্ধতি ২·২৫

স্বামী গম্ভীরানন্দ-অনূদিত ও সম্পাদিত
উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (তিন ভাগে)
১ম ভাগ ১৮·০০, ২য় ভাগ ১৮·০০,
৩য় ভাগ ১৮·০০
স্তবকুসুমাঞ্জলি ১৫·০০

স্বামী রঘুবরানন্দ-অনূদিত ও সম্পাদিত
গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা ৩·০০

স্বামী ধীরেশানন্দ-অনূদিত ও সম্পাদিত
যোগবাসিষ্ঠসারঃ ১২·৫০
বৈরাগ্যশতকম্ ১১·০০
বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা ৯·৫০

স্বামী জগদানন্দ অনূদিত
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ ১৭·৫০

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত ও সম্পাদিত
শ্রীশ্রীচণ্ডী ১৪·০০
গীতা ১৫·৫০

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত
বেদান্তদর্শন
১ম অধ্যায়ের ১ম খণ্ড ১৪·০০; ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ খণ্ড ৩·০০ ; ৩য় অধ্যায় ১৩·০০ ; ৪র্থ অধ্যায় ৯·০০

স্বামী প্রভবানন্দ
নারদীয় ভক্তিসূত্র ১১·০০

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

Statement about ownership and other particulars of

UDBODHAN

FORM IV

(1) Place of Publication	...	1, Udbodhan Lane, Baghbazar Calcutta-700003.
(2) Periodicity of its Publication	...	Monthly
(3) Printer's Name	...	Swami Nirjarananda
Nationality	...	Indian
Address	...	1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003.
(4) Publisher's Name	...	Swami Nirjarananda
Nationality	...	Indian
Address	...	1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003.
(5) Editor's Name	...	Swami Nirjarananda
Nationality	...	Indian
Address	...	1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003.
(6) Name & Address of individuals who own the Newspaper	...	Trustees of the Ramkrishna Math, Belur Math, Howrah, West Bengal.

1.	Swami Gambhirananda	...	President	-do-
2.	Swami Bhuteshananda	...	Vice President	-do-
3.	Swami Tapasyananda	...	" "	-do-
4.	Swami Hiranmayananda	...	General Secretary	-do-
5.	Swami Gahanananda	...	Asstt. Secretary	-do-
6.	Swami Atmasthananda	...	" "	-do-
7.	Swami Prabhananda	...	" "	-do-
8.	Swami Gitananda	...	" "	-do-
9.	Swami Satyaghanananda	...	Treasurer	-do-
10.	Swami Abhayananda	...		-do-
11.	Swami Ranganathananda	...		-do-
12.	Swami Vandanananda	...		-do-
13.	Swami Smarananda	...		-do-

I, Swami Nirjarananda, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. Swami Nirjarananda
Signature of Publisher.

Date : 10. 3. 1986.

According to Rule 8 of the Registration of Newspapers (Central) Rules 1956

৮৮তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

চৈত্র, ১৩৯২

দিব্য বাণী

এস আমরা প্রার্থনা করি, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'; তা হ'লে নিশ্চয় আঁধারের মধ্যে আলোকরাশি ফুটে উঠবে, আমাদের পরিচালিত করবার জন্য তাঁর মঙ্গলহস্ত প্রসারিত হবে।···এস, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে দিবারাত্র দারিদ্র্য, পৌরোহিত্য-শক্তি এবং প্রবলের অত্যাচারে নিপীড়িত ভারতের লক্ষ লক্ষ পদদলিতদের জন্য প্রার্থনা করি; দিবারাত্র তাদের জন্য প্রার্থনা কর। বড়লোক ও ধনীদের কাছে আমি ধর্মপ্রচার করতে চাই না। আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না না—আমি সাধুও নই। আমি গরীব—গরীবদের আমি ভালবাসি।···কিন্তু ভারতের চিরপতিত বিশ কোটি নর-নারীর জন্য কার হৃদয় কাঁদছে?···তাঁদেরই আমি মহাত্মা বলি, যাঁদের হৃদয় থেকে গরীবদের জন্য রক্তমোক্ষণ হয়।···তাদের জন্য কার হৃদয় কাঁদে বলো?···এরাই তোমাদের ঈশ্বর, এরাই তোমাদের দেবতা হোক, এরাই তোমাদের ইষ্ট হোক। তাদের জন্য ভাবো, তাদের জন্য কাজ করো, তাদের জন্য সদাসর্বদা প্রার্থনা করো—প্রভুই তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৫৭—৫৮]
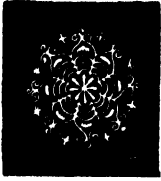
কথাপ্রসঙ্গে

'জাতির আহ্বানে সাড়া দিবে না?'

শ্রীরামকৃষ্ণ একবার মথুরবাবুকে বলিয়াছিলেন: "দেখ, মা সব আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এখানকার (ঠাকুরের নিজের) সব ঢের অন্তরঙ্গ আছে, তারা সব আসবে, এখান থেকে ঈশ্বরীয় বিষয় জানবে, শুনবে, প্রত্যক্ষ করবে; প্রেমভক্তি লাভ করবে; (নিজের শরীর দেখাইয়া) এ খোলটি দিয়ে মা অনেক খেলা খেলবে, অনেকের উপকার করবে, তাই এ খোলটা এখনও ভেঙ্গে দেয়নি—রেখেছে।" শুনিয়া মথুর বলিয়াছিলেন: মা যখন দেখাইয়া দিয়াছেন, তখন তাহা মিথ্যা হইবার নয়, তাহারা নিশ্চয়ই আসিবে। মথুর এইভাবে আশ্বাস প্রদান করিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ যেন নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। 'তাহারা এখনও আসিল না' বলিয়া ছটফট করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সকলের অলক্ষ্যে দক্ষিণেশ্বরে বাবুদের কুঠিরের ছাদে যাইয়া তথা হইতে "তোরা সব কে কোথায় আছিস্ আয়রে—তোদের না দেখে আর থাকতে পারছি না" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেন। তাঁহার এই ব্যাকুল আহ্বানের কয়েকদিন পর হইতে ভক্তসকল একে একে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাকুল আহ্বানে সাড়া দিয়া জগন্মাতা-নির্দিষ্ট সুকৃতিবান্ যে সকল অন্তরঙ্গ ভক্ত তাঁহার নিকট আসিয়া জুটিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই ছিলেন 'বয়স্ক ভক্ত', আবার অনেকে ছিলেন 'ছোকরা ভক্ত'। তাঁহাদের সকলেই 'অন্তরঙ্গ' হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণ 'ছোকরা ভক্ত'-দের অন্য ভক্তদের অপেক্ষা বেশি ভালবাসিতেন। তিনি বলিতেন: "ছোকরাদের এত ভালবাসি কেন? ওরা খাঁটি দুধ, একটু ফুটিয়ে নিলেই হয়, ঠাকুরের সেবায় চলে। তাহাদের জ্ঞানোপদেশ দিলে শীঘ্র চৈতন্য হয়। বিষয়ী লোকের শীঘ্র হয় না।" 'ছোকরা ভক্ত'-দের তিনি 'ইয়ং বেঙ্গল' দল বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। এই দলে দুই একজন ছাড়া সকলেই ছিলেন তরুণ যুবক। 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে আগমন একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তিনি তাঁহাদের জীবন গঠিত করিয়া তাঁহাদের মাধ্যমে যুগোপযোগী নূতন একটি ভাবধারা জগতে ছড়াইয়া দেওয়ার প্রস্তুতি করিতেছিলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের নেতা নরেন্দ্রনাথই পরবর্তিকালের 'স্বামী বিবেকানন্দ'।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত নরেন্দ্রনাথের যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, নরেন্দ্রনাথ দুই-চারিটি বাংলা গানও গাহিতে পারেন জানিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে একটি গান গাহিতে বলিলেন। নরেন্দ্রনাথ সেই দিন 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানটি ষোলআনা মনপ্রাণ দিয়া গাহিয়াছিলেন। গান শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথমদিনের সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ পরে এক সময় বলিয়াছিলেন: "গান ত গাহিলাম, তাহার পরেই ঠাকুর সহসা উঠিয়া আমার হাত ধরিয়া তাঁহার ঘরের উত্তরে যে বারাণ্ডা আছে, তথায় লইয়া যাইলেন" এবং "... সহসা আমার হাত

ধরিয়া দরদরিতধারে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং পূর্বপরিচিতের ন্যায় আমাকে পরমস্নেহে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন: 'এতদিন পরে আসিতে হয়? আমি তোমার জন্য কিরূপে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি তাহা একবার ভাবিতে নাই? বিষয়ী লোকের বাজে প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে আমার কান ঝল্‌সিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে; প্রাণের কথা কাহাকেও বলিতে না পাইয়া পেট ফুলিয়া রহিয়াছে।'" অন্য এক সময়ে নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন: "দেখিলাম, কেশব যেরূপ শক্তির বিশেষ উৎকর্ষে জগদ্বিখ্যাত হয়েছে নরেন্দ্রের ভেতর ওরূপ আঠারটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। আবার দেখিলাম, কেশব ও বিজয়ের অন্তর দীপশিখার মতো জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল রয়েছে, পরে নরেন্দ্রের দিকে চেয়ে দেখি তার ভেতর জ্ঞানসূর্য উদিত হয়ে মায়ামোহের লেশ পর্যন্ত সেখান থেকে দূর করেছে।" স্বামীজীর পরবর্তী জীবনের ঘটনাবলীই শ্রীরামকৃষ্ণের উপরি-উক্ত কথাগুলির যথার্থতা প্রমাণ করে।

শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর অকল্পনীয় সাফল্যের সংবাদ ভারতের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে শিহরণ সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তাহাতে সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে যে আনন্দ ও উল্লাস পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহা জাতির নবজাগরণের, পুনরভ্যুত্থানেরই দ্যোতনা করে। ধর্মমহাসভার পর আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে সাফল্যের সহিত বেদান্ত প্রচার করিয়া প্রায় চারি বৎসর পর স্বামীজী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার ভারতে প্রত্যাবর্তনের দিন হইতেই ভারতের প্রকৃত নবজাগরণ, নূতন উৎসাহে নবতর সাফল্যের প্রতি অভিযান আরম্ভ হইল বলা যায়। বিদেশে যাওয়ার পূর্বে এবং ওদেশে অবস্থানকালে আলাপ-আলোচনা ও পত্রাদির মাধ্যমে উহার কিঞ্চিৎ আভাস তিনি দিয়া থাকিলেও বস্তুত স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজী যে-সব বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা হইতেই তাঁহার ভারতের নবজাগরণ ও পুনর্গঠন-পরিকল্পনার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। স্বদেশাভিমুখে যাত্রার সময় সেভিয়ার-দম্পতিকে তিনি বলিয়াছিলেন: "এখন হইতে আমার শুধু একটি মাত্র চিন্তার বিষয় আছে—আর সে হল ভারত। আমি তাকিয়ে আছি ভারতের অভিমুখে—শুধু ভারতের দিকে।" ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই স্বামীজী তাঁহার ভারত-পুনর্গঠন-পরিকল্পনার কথা জন-সমক্ষে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রামনাদবাসীর অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন: "আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই ইঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ নহে, ইনি আর নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃশত্রু এখন ইঁহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙিতেছে।" "আমাদের সকলের এখন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, এখন ঘুমাইবার সময় নহে। আমাদের কার্যকলাপের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ঐ দেখ, ভারতমাতা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিতেছেন। তিনি কিছুকাল নিদ্রিতা ছিলেন মাত্র। উঠ, তাঁহাকে জাগাও আর নূতন জাগরণে নূতন প্রাণে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর গৌরবমণ্ডিতা করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে শাশ্বত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর।"

ভারতমাতাকে আবার 'শাশ্বত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত' করিবার মহৎ দায়িত্ব দেশের যুব-সমাজ সানন্দে গ্রহণ করিবে, এই কাজের জন্য তাহারা জীবনোৎসর্গ করিবে—যুবসমাজের নিকট ইহাই ছিল স্বামীজীর প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশার কথা তিনি তাঁহার বক্তৃতা, কথোপকথন ইত্যাদির

মাধ্যমে নানাভাবে প্রকাশও করিয়াছেন। তিনি জানিতেন যে, যে-কোন ত্যাগ স্বীকার করিয়া একমাত্র যুবসমাজই দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ। কলিকাতার যুবকদের আহ্বান করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন: "কলিকাতাবাসী যুবকগণ, উঠ-জাগো, কারণ···তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলি প্রার্থনা করিতেছেন। যুবকগণের দ্বারাই এই কার্য সাধিত হইবে। 'আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী' যুবকদের দ্বারাই এই কার্য সাধিত হইবে। আর কলিকাতায় এইরূপ শত সহস্র যুবক রহিয়াছে।" মাদ্রাজের যুবকদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানাইয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন: "হে মাদ্রাজের যুবকবৃন্দ, আমার আশা তোমাদের উপর, তোমরা কি তোমাদের জাতির আহ্বানে সাড়া দিবে না?···তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ নির্ধারণ করিবার এই সময়—যতদিন যৌবনের তেজ রহিয়াছে, যতদিন না তোমরা কর্মশ্রান্ত হইতেছ, যতদিন তোমাদের ভিতর যৌবনের নবীনতা ও সতেজভাব রহিয়াছে, কাজে লাগো—এই তো সময়। কারণ নবপ্রস্ফুটিত অস্পৃষ্ট অনাঘ্রাত পুষ্পই কেবল প্রভুর পাদপদ্মে অর্পণের যোগ্য—তিনি তা গ্রহণ করেন।" "মাদ্রাজ এমন কতকগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে কি প্রস্তুত—যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্তমুখে অন্নদান করবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করবে, আর তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে?" "যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, আর্ত, অত্যাচারপীড়িতদের জন্য (আমার) এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা—দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি।···তোমরা সারাজীবন এই ত্রিশ কোটি (বর্তমানে প্রায় ৬৯ কোটি) ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে। দুঃখীদের ব্যথা অনুভব কর, আর ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর—সাহায্য আসিবেই আসিবে।" মনে রাখিতে হইবে, স্বামীজী যদিও কলিকাতার এবং মাদ্রাজের যুবকদের উদ্দেশ করিয়া দেশোদ্ধার ব্রতে ব্রতী হওয়ার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন, বস্তুতঃ তাঁহার এই আহ্বান দেশের সকল যুবকদেরই উদ্দেশে।

যুবসম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশসেবা-ব্রতের উপযুক্ত ব্রতী হওয়ার জন্য কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন তাহাও স্বামীজী স্পষ্টভাবে বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: "বীর্যবান্, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক।" "যাহাদের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত নির্মিত, আর তার মধ্যে থাকবে একটি মন যা বজ্রের উপাদানে গঠিত।" আজ্ঞাবহতা ব্রতীর অন্যতম গুণ। তিনি বলিতেন: "সকল বিষয়ে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর; নিজ ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করিও না, গুরুজনের অধীন হইয়া চলা ব্যতীত কখনও শক্তির কেন্দ্রীকরণ হইতে পারে না; আর এইরূপ বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত না করিলে কোন বড় কাজ হইতে পারে না।" সৈনিকের মতো আজ্ঞাবহতার কথাই স্বামীজী বলিতেন। একবার সন্ন্যাস-দীক্ষা দেওয়ার পূর্বে ভাবী সন্ন্যাসীদের তিনি বলিয়াছিলেন: "তোমরা কি আমার আদেশ অম্লানবদনে মানতে পারবে? আমি যদি তোমাদের বাঘের সামনে বা বিষধর সাপের সামনে যেতে বলি, যদি বলি গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কুমীর ধরে আন, যদি বাকি জীবন আসামের চা-বাগানে কুলী হিসাবে কাজ করার জন্য বেচে দেই, অথবা যদি না খেয়ে মরতে বলি বা তুষানলে পুড়ে মরতে বলি—এই ভেবে যে এতে তোমাদের মঙ্গল হবে—তবে তোমরা আমার কথা মানতে রাজী আছ কি?" ব্রতীকে আত্মবিশ্বাসী হইতে

হইবে। আত্মবিশ্বাসই মানুষের ভিতরের দেবত্ব জাগ্রত করে। মানুষ তাহার এই অনন্ত শক্তি আত্মবিশ্বাসকে বিকশিত করিবার উপযুক্ত চেষ্টা করে না বলিয়াই বিফল হয়। সারকথা, যাহাদের দেহ সবল, মন সুস্থ, চিত্ত দৃঢ়, চরিত্র নির্মল; মনে পরম শ্রদ্ধা ও প্রবল উৎসাহ—তাহারাই এই কাজের উপযুক্ত ব্রতী।

স্বামীজীর অহ্বান ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার আহ্বান সমাজের সর্বস্তরের মানুষের, বিশেষ করিয়া যুবকদের হৃদয়ে বিপুল সাড়া জাগাইয়াছিল; প্রাণে করিয়াছিল অপরিসীম শক্তিসঞ্চার। যুবসমাজ স্বামীজীকে পাইয়াছিল তাহাদের নেতারূপে, পথপ্রদর্শকরূপে। স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বেশ কিছু যুবক তাঁহার জীবিতকালেই 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' ব্রতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়া রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছিলেন। স্বামীজীর সেবাব্রতের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দের এবং স্বামীজীর কতিপয় সন্ন্যাসী শিষ্যের নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন স্থানে সেবাকার্যের যে সূত্রপাত হয় তাহাতেও অনেক যুবক অংশ গ্রহণ করেন।

স্বামীজী নিজে কোন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। সাক্ষাৎভাবে যুক্ত না থাকিলেও তাঁহার পরোক্ষ প্রভাব ছিল অপরিসীম। দেশমাতৃকার বন্ধনমুক্তির সংগ্রামে স্বামীজীর প্রভাবের কথা মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশের মনীষিগণ—সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ১৮৯৭-এ স্বামীজী দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন: "আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন।" তাঁহার এই আহ্বানও ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার আহ্বানে উৎসাহিত এবং আদর্শে অনুপ্রাণিত যুবসম্প্রদায় মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া দেশমাতৃকার বন্ধনমুক্তির সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল। স্বামীজী ছিলেন ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা ঋষি। "আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন"—তাঁহার মুখ হইতে এই বাণী উচ্চারিত হইবার ঠিক পঞ্চাশ বৎসর পরেই ১৯৪৭-এ ভারতমাতা পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করেন, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হয়।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিলেও দেশ সামাজিক সমস্যা ও সংকট হইতে এখনও মুক্ত হইতে পারে নাই। দেশ নানা সমস্যার সম্মুখীন। সঙ্কীর্ণ আঞ্চলিকতাবাদ জাতীয় ঐক্য ও স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করিবার অপচেষ্টায় ব্যাপৃত। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অবস্থা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। জাতীয় আয় কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু এই বৃদ্ধির অতি অল্প অংশই জনসাধারণের নিকট পৌঁছায়। ফলে জনসাধারণের অবস্থার কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন হয় নাই। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রের অবস্থাও তথৈবচ। জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। প্রতিটি রন্ধ্রেই ঘুণ ধরিয়াছে। জাতির এই অবক্ষয় কে রোধ করিবে?

স্বামীজীর আশা ছিল যুবসম্প্রদায়ের উপর। তিনি বলিয়াছিলেন: "যুবকগণের দ্বারাই এই কার্য সাধিত হইবে।" শুধু তাহাই নয়। তাঁহার আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিবার দায়িত্ব দেশের যুবসমাজের উপর তিনি 'দায়স্বরূপ' অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। যুবকদের প্রতি ব্যাকুল আহবান জানাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন: "আমার আশা তোমাদের উপর, তোমরা কি তোমাদের জাতির আহ্বানে সাড়া দিবে না?" শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাকুল আহ্বানে সাড়া দিয়া একদা 'ইয়ং বেঙ্গল' দল 'মা'-এর কাজের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। 'ইয়ং বেঙ্গল' দল-এর নেতা স্বামীজীর আহ্বানে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র দল যে আরও বিপুল উৎসাহে সাড়া দিয়া দেশের ও দশের কল্যাণে তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিবেন—ইহা আমাদের শুধু আশা নয়, দৃঢ় বিশ্বাস।

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[প্রাপক : শ্রীপ্রমদাদাস মিত্র]

শ্রীশ্রীগুরুদেবো জয়তি

Etawah
8 Sept. 1891

পূজনীয় মহাশয়েষু :—

আমার বহুতর প্রণাম জানিবেন। গতকল্য আপনার পত্র পাইয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। মহাশয়ের একাগ্রতার বিঘ্ন হয় জানিলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কখনই পত্র লিখিতাম না। আপনি আমার পত্রের যথাযথ উত্তর দিতে ত্রুটি করেন নাই এবং তাহা পাঠে আপনার হৃদ্গত ভাবও কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি। আমার হৃদ্গত জিজ্ঞাস্য পত্রের দ্বারা আপনার সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইল না কারণ আমার লিখিত পত্রের ভাষা ব্যতিক্রম হইয়া থাকিবে।

আমার পত্রের উদ্দেশ্য—কাহারও সহিত বিরোধ নাই। অধিকন্তু আমার পত্রে যদি কেবল সন্ন্যাসই প্রশংসনীয় বুঝিয়া থাকেন তথাপি গৃহস্থের সহিত কোন বিরোধ হইতে পারে না। যে হেতু গৃহস্থের অপর তিন আশ্রমই সেব্য ও পূজ্য। জগতের সকল কার্য্যই শ্রেণীবদ্ধ নিয়মে প্রতিপাদিত। তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে কি কোন কর্ম্ম সুচারুরূপে সমাধা হইবার সম্ভাবনা আছে? অর্থাৎ গৃহস্থ যেমন অপর তিন আশ্রমীর উপজীব্য। অপর তিন আশ্রমী যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাহা কি গৃহস্থ কর্ত্তৃক সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইতে পারে? সন্ন্যাসী প্রভৃতি আশ্রমীরা পার্থিব সাংসারিক কার্য্য হইতে অবসর লইয়া কেবল ধ্যান ধারণা ও সমাধিতে তৎপর থাকেন, এবং ধর্ম্মের জন্য জগতে তাঁহারাই একমাত্র আশ্রয়স্থল। এদিকে গৃহস্থের পরিবারবর্গপালন—দান, কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য ও সেবার ভার আছে। যদ্যপি গৃহস্থই এ সমুদয় পার্থিব ধনোপার্জ্জনাদি কার্য্যে রত থাকিয়া অপর তিন আশ্রমীর কর্ত্তব্য বোধে সেবা না করেন ত তিনি এক কালীন ধর্ম্মচ্যুত হইবেন।

ভাল কথা জিজ্ঞাসা করি। যদি কোন সন্ন্যাসীর (ভিক্ষুক) গ্রামে ভিক্ষার অভাবে দেহ-পাত হয় ত তিনি কি তাঁহার মৃত্যুর জন্য ধর্ম্মচ্যুত হইবেন? অথবা তত্রস্থ গৃহস্থরা প্রত্যবায় ভাগী হইবেন? নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অকরণে যেমন প্রত্যবায় অবশ্যম্ভাবী। গৃহস্থ যদি যাগযজ্ঞাদির ন্যায় অপর তিন আশ্রমীর নিত্য সেবা না করেন ত তিনি নিত্য কর্ম্ম অকরণের ভাগী হইবেন। যদি বলেন সন্ন্যাসীরও ভিক্ষাটনাদি অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা না হইলেও গৃহস্থের ন্যায় উহা তাঁহার ধর্ম্মের মুখ্যাঙ্গ স্বরূপ নহে। কারণ পুরাণে শুনিতে পাই ঋষি যতি ব্রাহ্মণেরও আরাধ্য। কেবল পর্ণাশী অনাহারে কঠোর ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতেন। তৎকালে আর গৃহস্থরা তাঁহাদিগের উপযাজক হইতেন না। পরন্তু গৃহস্থ, ব্রাহ্মণ, অতিথি, যতি, স্নাতক প্রভৃতির সেবা ও যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম হইতে বিরত, কিম্বা একদিনের জন্য নিশ্চেষ্ট হইতে পারিতেন না। অতএব সেব্য সেবকের যে সম্বন্ধ— গৃহস্থ ও অপর তিন আশ্রমীতেও সেই সম্বন্ধ, এখানে সেবকের মান রাখিয়াছেন। ভগবান এক স্থানে বলিয়াছেন "মদ্ভক্তানাং চ যে ভক্তা তে মে ভক্ততমা মতাঃ"—এখানে ইহাই প্রতিপাদ্য যে গৃহস্থ ভক্তদিগের সেবা করিয়া সার্থকতা ভোগ করেন। সন্ন্যাসী কি শারীরিক উপজীবিকালাভে তদধিক সার্থকতা পান?

মহাশয় বলিয়াছেন—"সকলে সন্ন্যাসী হইলে ভারত এতদিনে অরণ্যময় ও জনশূন্য হইত।" আমি ইহার অর্থ বুঝিতে পারি না কারণ সত্যধর্ম্ম সকলকেই উপদেশ করিয়াছে এবং উহা সকলেরই অবশ্য পালনীয় ও অনুষ্ঠেয়। তবে যদি সকলেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও সত্য ব্যবহার না করে ত প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা আছে কি? যদি এক কালীন সদ্ধর্ম্মকারণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা থাকে। সত্যাসত্য মিশ্রিত অনুষ্ঠানই শ্রেয় বোধ হইতেছে (কারণ জগৎ সত্যাসত্য মিশ্রিত)—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় অবশ্যম্ভাবী নিত্য হইবে ও হইতেছে,—জীব তাঁহার অধীনে থাকিয়া কি করিতে পারে? আপনি শুনিয়াছেন—শ্রীমুখের বাণী "বুড়ী ছুঁয়ে বেড়ালে আর চোর হয় না", যে রূপে হোক আগে বুড়ী ছুঁইতে হইবে। তাহার সাংসারিক নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াই হউক, অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াই হউক যে কোন উপায়েই হউক বুড়ী ছোঁয়াই প্রধান উদ্দেশ্য। নচেৎ যে কোন কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করি না—চোর হইবার সম্ভাবনা, অতএব এক দৌড়ে গিয়া বুড়ী ছুঁইতে হইবে—তা যার যে পথে সুবিধা, কিন্তু দৌড়িতে হইবেই হইবে। আর যদি দৌড়িতে শ্রম বোধ হয় চোর হইতে আপনাকে সতর্ক হইতে হইবে। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিরা সন্ন্যাসীও ছিলেন না, গৃহস্থও না,—তাঁহারা সাক্ষাৎ ঈশ্বর কর্ত্তৃক জগতে প্রজাসৃষ্টি ধর্ম্মকর্ম্ম বিধিবন্ধের জন্য প্রেরিত।

মহাশয়, আমার প্রশংসা করিবেন না। এ পত্রেও কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। আমি তর্ক করিবার জন্য পত্র লিখি নাই। আপনার পত্র পাইলেই কত কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, তাই আমি আপনাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, আপনার নির্ম্মল সুখের ব্যাঘাত করিয়াছি। আমার সে অপরাধ কি অমার্জ্জনীয়? বিশুদ্ধভাব হইতে এ প্রসঙ্গ জানিবেন। এ পর্য্যন্ত আমি আপনাকে যাহা কিছু লিখিয়াছি সে আপনার স্নেহবশতঃ জানিবেন।…

আমার এখানে কয়েকদিন হইল মহাভাষ্যের অনুবাদ ও শ্রীধর স্বামীর গীতা অনুশীলনে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে। ধ্যান ধারণা বিষয়ে পাতঞ্জলি প্রভৃতি যোগসূত্রেই প্রকাশ পাইয়াছে। তদ্ ব্যতীত আমার নিকট কোন নূতন রহস্য নাই। ক্রিয়ার সম্বন্ধে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহাই বা আমি নূতন কি বলিব? ক্রিয়াদির কথা আপনি যাহা জানেন—অনুষ্ঠানে তৎপর হওয়াই কর্ত্তব্য। শ্রীশ্রীগুরুদেবের উপদেশ বাক্যও আপনি ধাতস্থ করিয়াছেন। একান্ত মনে তদনুযায়ী ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর হইলেই ক্রিয়ার সার্থকতা হইবে—তদ্ভিন্ন আমার নিকট কোন ক্রিয়া বা রহস্য আবিষ্কৃত হয় নাই। আশীর্ব্বাদ করুন ঋষি মহাপুরুষ কর্ত্তৃক যে তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে অচিরে তৎপ্রসাদে সেই পুরাতন তত্ত্ব লাভ করিতে পারি।

আপনি আমার কোটি কোটি প্রণাম জানিবেন। আপনার পত্র পাঠে সাতিশয় উপকৃত হইলাম। আশীর্ব্বাদ করুন আপনার ন্যায় অচল অটল ভক্তি বিশ্বাস লাভ হয়।

আপনার ঝাঁসি আগমনের কি হইল?…আপনি শারীরিক কেমন আছেন সবিস্তারে লিখিয়া সুখী করিবেন। মহাশয়, সত্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের জন্য কাহারও অপেক্ষা নাই।

একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—অবকাশ মতো লিখিবেন। হিরণ্যকোষ পর্য্যন্ত সকলই সংসার।…পূর্ব্বেই লিখিব মনে করিয়াছি—আমি দেখিতেছি—অনাদি সংসার শব্দ স্পর্শাদি বিষয় সমুদ্রে মীনের মত ভাসমান/সঞ্চরমান হইয়াই যত দুঃখ। অতএব এই সারাৎসার বুদ্ধ্যাদির অগোচর উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য পরমসত্তায় আমার দেহমন পর্য্যন্ত পরিমাণ হইলে সেই দিনই সন্ন্যাস

প্রাপ্ত হইল, কিন্তু তাঁহার ব্রহ্মলোক আদিতে আকাঙ্ক্ষা নাই। তাঁহার—ইহ লোকেই সকল নিরস্ত হইয়া যায়। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। পত্রাদিতে এরূপ লেখায় আমি দোষের অণুমাত্র মনে করি নাই। যদি দোষের মনে করেন ত বারান্তরে প্রণাম ও কয়েকটি শুভাশুভ কথা ব্যতীত অন্য কোন কথা লিখিব না। প্রাণের আবেগে…এবারও লিখিলাম। দুর্গাশঙ্কর বাবুকে প্রণাম দিবেন। ইতি

Benares দাসানুদাস—গঙ্গাধর।

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং

The Ramakrishna Math
Belur P. O.—Howrah
15/7/22

শ্রীমান কালীপ্রসন্ন,

তোমার দুইখানি পত্রই আমি ক্রমে ক্রমে পাইয়াছি—কিন্তু কি উত্তর দিব এ পর্য্যন্ত তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। দুটি মার্গ সংসারে রহিয়াছে এবং তদ্দ্বারা এই সৃষ্টি চিরকাল চলিতেছে—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রায় সমস্ত জীবই প্রবৃত্তির অধীন তবে নিবৃত্তি না থাকিলে প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করে কে? প্রবৃত্তির শেষ নাই। যতই বাড়াবে ততই বাড়িবে, অথচ তার তৃপ্তি নাই। জীবন অনন্ত কালের তুলনায় অতি ক্ষণস্থায়ী এবং সুখ ও দুঃখের অধীন—দুঃখই অধিক সুখ অতি সামান্য। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা করিতে ইচ্ছা হয় কর। প্রবৃত্তির জোর যদি মনে অধিক থাকে তাহা হইলে জোর করিয়া নিবৃত্তি করা বড়ই কঠিন। অধিক লেখার প্রয়োজন বোধ করিতেছি না। এখন পড়াশুনা করা উচিত বলিয়া আমার মনে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জপ ধ্যান প্রার্থনা ইত্যাদি করা উচিত—পরে প্রভু যেরূপ করিবেন তাহাই করিবে। **Technical** সুবিধা না হয় B. A. পড়িবে। পড়িতেই হইবে কোন না কোন রকম। এবং সঙ্গে জপ ধ্যান প্রার্থনা ও ঠাকুর স্বামিজীর গ্রন্থাদি পাঠ তাহাও করিতে হইবে। ভগবানে বিশ্বাসের জন্য তীব্রভাবে প্রার্থনা করিতে হইবে। প্রার্থনা করিলেই তিনি বিশ্বাস ভক্তি দিবেন। তিনি জীবন্ত দেবতা এ যুগের। তিনি প্রার্থনা শুনেন। তুমি প্রীতির সহিত ব্যগ্রতার সহিত প্রার্থনা করিবে, অল্প দিনেই বুঝিতে পারিবে যে তিনি তোমার প্রার্থনা শুনিতেছেন এবং নাম করিয়া আনন্দ পাইতেছ। যাহা একবার ধরিয়াছ তাহা কখন ছাড়িবে না, বিশেষ শুভ কার্য্য। প্রভু যাঁর নাম আমি তোমায় দিয়াছি, তিনিই তোমায় ঠিক পথে চালাবেন আমি বিশ্বাস করি। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ তুমি জানিবে।

ইতি
শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শিক্ষাপ্রসঙ্গে

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি।' পরিবেশ থেকে, বাইরের জগৎ থেকে ও সাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে —এইভাবে নানা উপায়ে আমরা শিখি। শুধু বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়েই আমাদের শিক্ষা সমাপ্ত হয় না। শিক্ষাকে যদি একটি নিয়ত চলমান প্রক্রিয়া বলে মনে করি, তাহলে শিক্ষাচিন্তা একেবারে জীবন-বিশ্লেষণে পরিণত হয়।

সাধারণতঃ এই ব্যাপক অর্থে আমরা শিক্ষাকে গ্রহণ করি না; শুধু বিদ্যালয়গুলিতে শিশুদের পাঠ-দেওয়ার অর্থেই আমরা একে গ্রহণ করি। এই অর্থে শিক্ষা হল—শিশুকে অপূর্ণতা ও অজ্ঞতার ঊর্ধ্বে উঠতে সহায়তা করার পন্থা। কেবল কোন বিশেষ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে সহায়তা নয়, সাধারণভাবে কোন সমাজে অতি প্রচলিত আদর্শাবলী অনুযায়ী সুসম্পূর্ণ হয়ে সেই সমাজের যথার্থ প্রতিভূ হতে তাদের সাহায্য করা। তবুও যখনই কোন পরিণত মানুষের কথা আমরা উল্লেখ করি, তখনই আমরা মনে করি, তিনি এমন একজন লোক যিনি অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশ সাধন করেছেন। এমন লোক যে শুধু সমাজের সৃষ্টি তা নয়, সমাজগঠনকারীও বটে। তিনি তাঁর সাধারণ সত্তা অতিক্রম করে যাকে আত্মা, পরমাত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত করা হয়, তার গভীরে প্রবেশ লাভ করেন। এই অন্তরতর সত্তার যত নিকটবর্তী হবেন, ততই তিনি পরিণতি বা পূর্ণতা লাভ করবেন। এই ধরনের মানুষেরাই জগতে শ্রেষ্ঠ। তাঁরাই মানবসভ্যতার প্রকৃত স্রষ্টা। মানুষের দুটি দিক —বস্তুগত এবং আত্মিক বা ভাবগত। বস্তুগত দিকে তার প্রকৃতি জানা সম্ভবপর। এবং মনো-বিদ্যা, সমাজবিদ্যা, শারীরবিদ্যা ইত্যাদি বিজ্ঞানের নানা শাখার অনুসন্ধানের বিষয় কিন্তু সত্যি-কারের মানুষ বা মানুষের সেই আত্মিক সত্তা, সাধারণ জ্ঞান ও বস্তুবিশ্লেষণের সীমা অতিক্রম করে যায়। তাঁরাই এ-সমস্ত বিজ্ঞানবিদ্যার নাগালের বাইরে। যথার্থ মানুষকে জানতে হলে তাঁর আত্মাই হবে জীবনের লক্ষ্য; সেই সঙ্গে সমস্ত শিক্ষারও লক্ষ্য। একজন শিল্পী যখন ছবি আঁকেন, তখন তিনি কাগজের উপর ইতস্ততঃ কতকগুলি রঙ শুধু লাগান না; তাঁর মনে সেই ছবির একটি ধারণা থাকে এবং তাই তিনি নানা রঙ ও রেখার সাহায্যে কাগজের উপর প্রতিফলিত করেন। সেরূপ শিক্ষার্থীদের কোন্ লক্ষ্যে উপস্থিত হতে সাহায্য করছেন, সে-সম্পর্কে অবশ্যই শিক্ষাব্রতীর স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আজকাল এরকম কোন লক্ষ্য নেই। প্রাচীন ভারতে যাকে অপরাবিদ্যা বলা হত, তার অন্তর্গত নানা বিজ্ঞান-বিষয়ে শিক্ষাদান করাতেই আজকালকার শিক্ষা সীমা-বদ্ধ। ফলে আমরা মহর্ষি নারদের অনুরূপ সমস্যায় পড়েছি। তিনি সমস্ত বিজ্ঞান ও বেদে পারদর্শী হয়েও মানসিক শান্তি লাভ করেননি। এই সঙ্কটকালে তিনি মহর্ষি সনৎকুমারের কাছে গিয়ে তাঁকে নিজের সমস্যার কথা বললেন। সনৎকুমার বললেন যে, তিনি কতকগুলি কথা বা শব্দসমষ্টি মাত্র শিখেছেন। তিনি মহর্ষি নারদকে তখন আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। আজ আমরাও অনুরূপ অশান্তিতে কষ্ট পাচ্ছি, কারণ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য থেকে আমরা বিচ্যুত। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরাবিদ্যা বা আত্মতত্ত্বের কোন স্থান নেই। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য ছিল আত্মাকে উপলব্ধি করা। তবে লৌকিক বিদ্যার উপযোগিতাকেও অস্বীকার করা হত

না, কারণ এতে সমাজের বৈষয়িক প্রয়োজন মিটিত।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার আর একটি ত্রুটি লক্ষ্য করি—তা হল, যে মাধ্যমের সাহায্যে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়, সেই 'মন'কে অবহেলা করা। প্রাচীন ভারতে শিক্ষায় মননের দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হত। একাগ্রতা ও নৈতিক বিশুদ্ধির দ্বারা মনকে সংযত ও শিক্ষিত করে তোলার জন্য, বিদ্যালাভের উপযুক্ত উপায় হিসাবে প্রস্তুত করার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। তপোবনে অথবা লোকালয় থেকে দূরে প্রাচীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থান মনকে এরূপে গড়ে তোলার পক্ষে খুবই উপযোগী ছিল। এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বিশুদ্ধ বৌদ্ধিক জীবন-যাপনের জন্য নির্জনতা ও গভীর তন্ময়তা নিতান্ত দরকার। স্বামীজী বলতেন যে, শিক্ষার মূল কথাই হল একাগ্রতা, কতকগুলো তথ্য সংগ্রহ নয়। কারণ যন্ত্রটি ঠিক মতো নিয়ন্ত্রিত হলে তার সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ খুবই সহজসাধ্য হবে।

অতএব প্রশ্ন হচ্ছে—বর্তমানের মতো শিক্ষা-ব্যবস্থা কি শুধু অস্থায়ী বস্তুর অনুশীলনেই সীমিত থাকবে, না সমাজকে সুনিয়ন্ত্রিত করার উপযোগী একটি নৈতিক শক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হবে? যদি শেষেরটি হয়, তাহলে আমাদের শিক্ষা-পরিকল্পনায় পরাবিদ্যা ও ধ্যানতন্ময়-জীবনের স্থান অবশ্যই দিতে হবে।*

* ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে আয়োজিত ছাত্র-সমাবেশে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের লোকান্তরিত দশম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের প্রদত্ত ভাষণের অনুলিপি।

অপরের নিকট ভাল যাহা কিছু পাও শিক্ষা কর, কিন্তু সেইটি লইয়া নিজেদের ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে—অপরের নিকট শিক্ষা করিতে গিয়া তাহার সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইও না; এই ভারতের জাতীয় জীবন হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইও না; এক মুহূর্তের জন্য মনে করিও না, যদি ভারতের সকল অধিবাসী অপর জাতিবিশেষের পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিত, তাহা হইলেই ভাল হইত।...জাতীয় জীবনস্রোতকে প্রবাহিত হইতে দাও। যে-সকল প্রবল অন্তরায় এই বেগবতী নদীর স্রোত অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেগুলিকে সরাইয়া দাও, পথ পরিষ্কার করিয়া দাও, নদীর খাতকে সরল করিয়া দাও, তাহা হইলে উহা নিজ স্বাভাবিক গতিতে প্রবলবেগে অগ্রসর হইবে—এই জাতি নিজের সর্ববিধ উন্নতিসাধন করিতে করিতে চরম লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়া চলিবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

যুবসম্প্রদায়ের উপর স্বামীজীর অর্পিত কাজ

স্বামী গম্ভীরানন্দ

আমার তরুণ ভাইবোনেরা,

তোমরা বসে আছ আধ্যাত্মিক ভাবে আপূরিত এক তীর্থভূমিতে। তোমাদের বাঁদিকে আছে বিশাল, সুন্দর ও দীর্ঘ মন্দির যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ এক বিস্ময়কর মর্মরমূর্তিতে অধিষ্ঠিত এবং তাঁর পবিত্র স্মৃতিচিহ্নগুলি সংরক্ষিত। তোমাদের ডানদিকে বয়ে চলেছেন মা-গঙ্গা যাঁর তটভূমিতে বিরাজিত শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্দির এবং শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ্ সাতজন মহাপুরুষের চিরবিশ্রামের স্থান। আর তোমাদের সামনে রয়েছে স্বামীজীর নেতৃত্বে উক্ত মহাপুরুষদের গড়া মঠ। তাঁরা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য সাক্ষাৎ সন্ন্যাসিশিষ্যবৃন্দ এই মঠে বাস এবং এই ভূমিতেই বিচরণ করেছেন। যে কক্ষে স্বামীজী মহাসমাধিতে লীন হয়েছিলেন সেই কক্ষও তোমাদের সামনে অবস্থিত। এখানকার সমগ্র পরিবেশ আধ্যাত্মিকতায় স্পন্দিত।

কিন্তু এই সব নয়। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড থেকে রামকৃষ্ণ রোডে ঢুকলে তোমরা তোমাদের বাঁদিকে দেখতে পাবে বহুমুখী শিক্ষাপ্রকল্প যাতে রয়েছে একটি বিবিধ-কারিগরিশিল্প-শিক্ষাকেন্দ্র, মহেশ মেকানিক্যাল সেক্সন, তত্ত্বমন্দির ও বিদ্যামন্দির। বেলুড়মঠের প্রধান ফটকে প্রবেশ করলে দক্ষিণে দেখবে রামকৃষ্ণ মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়, আরও দক্ষিণে বি. এড্. কলেজ ও ছাত্রাবাস, জনশিক্ষা-মন্দির এবং আরও কয়েকটি ক্ষুদ্রতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বড় মন্দিরের সামনে আছে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর। চিঠিপত্রের আদান-প্রদান, হিসাবরক্ষণ, ত্রাণকার্য, জনহিতকর ও গ্রামীণ প্রকল্প প্রভৃতি বিভিন্ন কাজের ভার এই দপ্তরের কয়েকটি বিভাগের উপর ন্যস্ত। তাহলে দেখ, তোমরা এসে পড়েছ এমন এক সক্রিয় আধ্যাত্মিকতার মাঝখানে যেখানে অধ্যাত্মজীবন যুক্ত হয়েছে শুদ্ধতাভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ কর্মধারার সঙ্গে। এই যুগ্ম প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বামীজী-নিরূপিত আদর্শ হল: 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—নিজের মুক্তি ও জগতের কল্যাণসাধন। শেষ কথাটি—'জগদ্ধিতায় চ'—শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর আলোকে বোঝা প্রয়োজন। তোমরা জানো, তিনি একদিন দয়ার কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে বলেছিলেন, "তুমি দয়া করবার কে? এক ঈশ্বরই দয়া করতে পারেন। তোমরা জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করতে পার মাত্র।" এই ভাব আমাদের কর্মযোগ সম্বন্ধে ধারণায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এটি সমাজসেবা মাত্র নয়,—এটি একটি আধ্যাত্মিক সাধনা—নিরহঙ্কার হয়ে ঈশ্বরার্পণের ন্যায় অপরের হিতসাধনের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধি। শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভাবকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন,—দ্বৈতভূমি থেকে অদ্বৈতভূমিতে উঠিয়ে দিলেন। উপকারক বা উপকৃত থেকে ঈশ্বর ভিন্ন নন; কাজেই ঈশ্বরে কর্মফল অর্পণ করার প্রশ্ন ওঠে না। পক্ষান্তরে, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাধর্মের কথা যা বলেছেন তার ভাব—কর্মই ঈশ্বরোপাসনা। এই কর্মের দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি ছাড়া অন্য কোন স্বার্থ সাধিত হয় না। উপকৃতের কাছ থেকে ধন্যবাদ পাওয়ার প্রত্যাশা না করে উপকারীরই বরং উচিত তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা, কারণ উপকৃত ব্যক্তি তাঁকে তাঁর সেবা করার সুযোগ দিয়ে তাঁরই মঙ্গলসাধন করেছেন। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ কৃষ্ণদাস পাল নামে তদানীন্তন এক রাজনৈতিক নেতাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কী?" তিনি জবাব দিলেন, "জগতের উপকার করা।" শ্রীরামকৃষ্ণ সবিস্ময়ে

বললেন, "জগতের উপকার! জগৎটা কত বড় বলে তোমার ধারণা? তোমার মতো একজন ক্ষুদ্র মানুষ জগতের কী উপকার করবে? না, না, তুমি অন্যের সেবা করতে পার মাত্র।" এই ভাবই ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত স্বামীজীকে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্বুদ্ধ করে, যার ফলে ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ ভাবের মধ্যে ব্যবধান অপসারিত হয় এবং আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মিলিত হয় সামাজিক গতিশীলতা।

'ধর্ম মানুষকে নিষ্কর্মা করে দেয়'—এই ক্ষতিকর অপপ্রচারকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এই ভাব। যদি তাই না হত, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুগামিগণ কেমন করে এই দুই প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুললেন? এখনও তাঁরা বিশ্বের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছেন। তোমরা খোলা মনে সব নিজেরাই বিচার করে দেখ। এমনকি পাশ্চাত্যে, যেখানে প্রথম এই মিথ্যা প্রচার করা হয়, সেখানে মাত্র সেদিন, তোমরা জানো, পোল্যাণ্ডে যে ধর্মকে দমন করে রাখা হচ্ছে না তা স্বয়ং এসে দেখে যাবার জন্য পোল্যাণ্ড পোপকে আমন্ত্রণ করেছিল। বর্তমানে রাশিয়া ও চীন তাদের নাগরিকদের পূজা করার স্বাধীনতা দিয়েছে। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি উন্নত দেশগুলি ধর্মকে অস্বীকার করে উন্নতি লাভ করেনি। তোমাদের মধ্যে যারা ইতিহাসের ছাত্র তাদের জানা আছে, ভারতবর্ষ অন্য কোন দেশ থেকে এখনকার মতো পিছিয়ে ছিল না, বরং সভ্যতার পুরোভাগে ছিল এবং তা সম্ভব হয়েছিল ধর্মকে বর্জন করে নয়, তাকে ধরে থেকেই। এমনটা ঘটেছিল আর্য, বৌদ্ধ, গুপ্ত, চোল এবং চালুক্য যুগে। আর শিবাজী ভারতের পশ্চিমাঞ্চল মুক্ত করেছিলেন তাঁর সৈন্যবাহিনীর উপর রামদাসের গৈরিক পতাকা উড়িয়ে। আমার ভাইবোনেরা, তোমরা ফন্দিবাজ লোকদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ো না। সজাগ থাক এবং তোমরা ভুল পথে যাচ্ছ না—এই বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চল।

তোমরা তরুণ। খোলা মন তোমাদের। তোমরাই পারবে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রচারিত উচ্চ আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে। আদর্শগুলি কিভাবে বাস্তবায়িত করা যায়—স্বামীজী নিজে করে দেখিয়েছেন। রাঁচীর একটি ঘটনা মনে পড়ছে। প্রতি সন্ধ্যায় আমরা শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণকথামৃত পাঠ করতুম এবং তারপর কিছু আলোচনা হত। একদিন তিনজন বৃদ্ধ আমাদের আসরে এসে যোগ দিলেন। পাঠ ও আলোচনা শেষ হলে একজন বললেন, "এ-সব তাহলে আদর্শমাত্র! তাই না?" আমি সংক্ষেপে উত্তর দিলুম, "হ্যাঁ।" তাঁরা চলে গেলেন। পরে আমার খেয়াল হল, তাঁরা 'আদর্শ' বলতে বুঝেছেন শূন্যে ভেসে থাকার মতো অলীক কিছু,—যার সঙ্গে বাস্তব-জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু শ্রীরাম-কৃষ্ণ ও স্বামীজীর বাণী নিছক অলস কল্পনা নয়,—বাস্তবে রূপায়িত করার মতো আদর্শ। এইজন্য তাঁরা নির্ভর করেছিলেন মুখ্যতঃ যুবসম্প্রদায়ের উপর। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভাবধারা প্রচার ও কার্যে পরিণত করার জন্য নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন যুবককে বেছে নিয়েছিলেন। স্বামীজীও ভারতের যুবসমাজকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাদের নিজেদের, ভারতের ও সমগ্র বিশ্বমানবের কল্যাণব্রতে তাঁর পতাকা তুলে ধরার জন্য। আমি আশা করি, তিনি যে কাজ তোমাদের উপর অর্পণ করে গিয়েছেন তা তোমরা সকলে সুসম্পন্ন করবে।

স্বামীজীর অর্পিত কাজটি আসলে কী? জনসাধারণ ও নারীজাতি সম্পর্কে কোন রাজনীতিবিদ্ কিছু চিন্তা করার পূর্বেই স্বামীজী ঘোষণা করেছিলেন, জনগণ ও স্ত্রীজাতির উন্নয়ন

যতদিন না হচ্ছে, ততদিন ভারতের অগ্রগতি অসম্ভব। এবং সেই উন্নতি আনতে হবে শিক্ষা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার মাধ্যমে—তাদের অন্তর্নিহিত ধর্মভাবে হাত না দিয়ে। স্বামীজীর মতে প্রকৃত ধর্মের অর্থ—আত্মা বা ব্রহ্মে—চিরন্তন সত্যে আস্থা। নিজের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য অপরের উপর খুব বেশি নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে যিনি অসীম শক্তি ও সম্ভাবনার আধার আত্মা বা ব্রহ্ম আছেন, তাঁতে বিশ্বাস থাকা চাই। স্বামীজী প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন হয়েও গতিশীলতার মূর্ত প্রকাশ ছিলেন। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে স্বামীজী তাঁর প্রভাব রেখে গেছেন,—ধর্মকে বর্জন করে নয়, বরং ধর্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠার দ্বারাই। কাজেকাজেই তোমাদের যে-সব কাজ করতে হবে সেগুলির মধ্যে একটি হল: ধর্মভাবে আঘাত না করে শিক্ষার মাধ্যমে জনসাধারণ ও নারীজাতির উন্নতিবিধান। আবার এই শিক্ষা পুঁথিগত মাত্র হলে চলবে না; দেখতে হবে তা যেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুখসমৃদ্ধি আনতে সক্ষম হয়। স্বামীজী বলেছিলেন, 'যে-ধর্ম বিধবার অশ্রুমোচন করতে পারে না সেই ধর্মে আমি বিশ্বাস করি না।' তারপর যাবতীয় কুসংস্কার এবং অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রভৃতির ন্যায় যে-সব অন্যায় প্রথা চলে আসছে সেগুলির সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে—অবশ্য বিপ্লবের পথ ধরে নয়, গড়ে ওঠার মাধ্যমে। স্বামীজী বলেছিলেন, অন্যান্য সংস্কারকগণ উপর উপর কাজ করেন এবং অনুরূপ ফল পান, কিন্তু তিনি নিজে একজন আমূল সংস্কারক। ঐ জাতীয় আমূল সংস্কারের উদ্ভব হয় বৈষয়িক ও পারমার্থিক উভয়ভাবে উন্নত সামগ্রিক জীবন সম্বন্ধে গভীরতর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। ধর্মের দোহাই দিয়ে যারা সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে, তাদের উপর স্বামীজী ভীষণ চটা ছিলেন। তিনি এমন কথা পর্যন্ত বলেছেন, "গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হইবে।" সক্রিয় আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে তোমাদের শরীর ও মন দৃঢ় করে গড়ে তুলতে হবে। তিনি চাইতেন এমন মানুষ "যাদের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত-নির্মিত, আর তার মধ্যে থাকবে এমন একটি মন যা বজ্রের উপাদানে গঠিত।"

আমি আমার ক্ষুদ্র ভাষণ শেষ করছি রবীন্দ্রনাথের একটি বাংলা গানের কয়েকটি ছত্র দিয়ে—

"হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে—
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,……
…তোমারি হউক জয়।
…তোমারি হউক জয়।*

* ২৪ ডিসেম্বর ১৯৮৫, বেলুড়মঠ-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী (২৪—৩০ তারিখ) সর্বভারতীয় যুবসম্মেলনে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের ইংরেজীতে লিখিত উদ্বোধনী ভাষণ। স্বামী জয়দেবানন্দ কর্তৃক অনূদিত।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী আমাদের আলোচ্য। স্বামীজীর জীবনগঠনে যে-সব প্রভাব সক্রিয় ছিল তা অনুধাবন না করলে কিন্তু আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ভগিনী নিবেদিতা এই প্রসঙ্গে তিনটি প্রভাবের কথা বলেছেন : (১) গভীর মননসহ স্বামীজীর শাস্ত্র-অধ্যয়ন এবং পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে তাঁর প্রভূত জ্ঞান; (২) গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব —যিনি তাঁকে দেন জীবনপথের নিশানা, (৩) পরিব্রাজকরূপে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা —সারাদেশব্যাপী তাঁর পরিভ্রমণ। ভ্রমণকালে সমভাবে সাধু, পণ্ডিত ও সরল সাধারণ মানুষের সঙ্গে তিনি মিশেছেন; সকলের নিকট শিখেছেন, সকলকে শিখিয়েছেন, সকলের মধ্যে থেকেছেন; তিনি দেখেছেন, ভারতমাতা যেমন ছিলেন, যেমন হয়েছেন; এইভাবে সেই বিশাল সমগ্রতার সর্বাবগাহিত্ব তিনি অনুভব করেছেন, যার সংক্ষিপ্ত, ঘনীভূত প্রতিরূপ তাঁর গুরুদেবের জীবন ও ব্যক্তিত্ব। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর বক্তব্যের উপসংহারে বলছেন : 'অতএব শাস্ত্র, গুরু এবং মাতৃভূমি এই তিনটি সুর মিলিত হয়ে সৃষ্টি করেছে বিবেকানন্দের রচনাবলীর মহান্ সংগীত। এই ত্রিরত্ন তিনি দান করেছেন। এই তিন উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তিনি জগতের সকলের জন্য তাঁর আধ্যাত্মিক করুণার এক সর্বরোগহর মহৌষধি প্রস্তুত করেছেন। এ যেন তিন দীপশিখা সেই এক দীপাধারে প্রজ্বলিত; ভারতমাতা যেন তাঁর হাত দিয়ে সেই দীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন তাঁর সন্তানদের এবং সমগ্র মানবজাতির পথনির্দেশের জন্য—১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুলাই পর্যন্ত কয়েক বছরের কর্মপর্বে।' অতএব স্বামীজীর জীবন ও উপদেশ বুঝতে হলে তাঁর উপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবের ক্রিয়াটি সম্যক্ উপলব্ধি করতে হবে।

অবতারতত্ত্বের কথা সকলেই জানেন। এই তত্ত্বও সুপরিজ্ঞাত যে, শ্রীরামকৃষ্ণ অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যে-প্রধান পার্ষদকে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারলীলা করেন, তিনি এক মহান্ ঋষি; সেই ঋষি ধরাধামে অবতীর্ণ হন স্বামী বিবেকানন্দরূপে। একখণ্ড কাগজে শ্রীরাম-কৃষ্ণ একবার লিখে দিয়েছিলেন : 'নরেন শিক্ষে দিবে, যখন দূরে বাইরে হাঁক দিবে।' শিকাগোর ধর্মমহাসভায় ঠিক তা-ই ঘটল। ঘটল—যখন বেদান্তকেশরী বিবেকানন্দ যেন গর্জন করে উঠে সমগ্র বিশ্বকে দিলেন এক নূতন বার্তা। সেই বার্তা তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট লাভ করেছিলেন। স্বামীজী প্রথমত বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে ধর্মকে তুলে ধরলেন এবং এক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত বিচারের উপর দিলেন গুরুত্ব। পক্ষান্তরে, আমরা জানি, সাধারণত ধর্মের ভিত্তি কিছু গ্রন্থ এবং অনুশাসন যা নির্বিচারে মেনে চলতে হয়। দ্বিতীয়ত, তিনি ধর্মসমন্বয়ের বাণী প্রচার করলেন এবং জগতের অন্যান্য কঠিন সমস্যার সমাধানেও দেখালেন সমন্বয়ের পথ। তৃতীয়ত, তিনি ব্যবহারিক জীবনে অদ্বৈত বেদান্তের প্রয়োগের কথা বললেন।

ভগিনী নিবেদিতা এক জায়গায় লিখেছেন : 'এই সব জীবনকথা পড়তে পড়তে প্রায়ই আমার মনে হয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নামে একটি সত্ত্ব আছেন আর সেই সত্ত্বের উপচ্ছায়ায় প্রকাশিত আরও কয়েকটি সত্তা, যাঁদের কেউ কেউ আমাদের মধ্যে এখনও বর্তমান; তাঁদের কারও সম্বন্ধেই যথার্থ বলা চলবে না যে, অন্তরের

জীবনবৃত্তের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের শেষ এইখানে অথবা তাঁর নিজস্ব অস্তিত্বের এইখানে শুরু।' উক্ত উদ্ধৃতির 'কয়েকটি সত্তা' হলেন স্বামীজীর গুরুভ্রাতৃগণ, যাঁরা স্বামীজীর বাণীকে রূপ দিলেন, সযত্নে লালন করলেন তাঁর তৈরি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে।

এইবার রামকৃষ্ণ সংঘের ত্রিমূর্তির অপর সত্তার উল্লেখ করব। তিনি শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী। ১৯৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ সারদা দেবীর শতবর্ষ জয়ন্তী পর্যন্ত তাঁকে যেন প্রচ্ছন্ন রাখা হয়েছিল। বস্তুত, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণেরই নারীসত্তা। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যিনি অভেদ, সেই শ্রীশ্রীমা ব্যতীত চিত্রটি অসম্পূর্ণ থাকে। বাংলায় তাঁকে বলা হয় 'ক্ষমারূপিণী তপস্বিনী'। এই তাঁর প্রকৃষ্ট পরিচয়।

এখন আমরা স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী পর্যালোচনা করব। শরীরত্যাগের পূর্বে স্বামীজী একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছিলেন: 'জীর্ণ বস্ত্রের মতো শরীরটা বর্জন করে দেহমুক্ত হয়ে আমি হয়তো স্বচ্ছন্দ বোধ করব। কিন্তু আমার কাজ তখনও শেষ হবে না। আমি সর্বত্র মানবজাতিকে অনুপ্রাণিত করতে থাকব—যতদিন না জগৎ জানবে সে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম, অভেদ।' স্বামীজী আরও বলেছিলেন যে, তাঁর চিন্তারাশি দেড় হাজার বছর সক্রিয় থাকবে—তাঁর দেহত্যাগের পর আমরা ৮৩ বছর কাটিয়েছি মাত্র। বুদ্ধের পরিনির্বাণের ৩০০ বছর পরে সম্রাট অশোকের কালে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ হয়েছিল। খ্রীষ্টের ৩০০ বছর পরে কনস্টানটাইনের কালে খ্রীষ্টধর্মের বিস্তার লাভ ঘটল। স্বামীজীর ধর্মচিন্তার বীজ এখন যেন একটি মুষায় উত্তপ্ত, ফুটন্ত; স্বভাবতই তা যথাযথ রূপ পরিগ্রহ করতে দেখা যাবে দীর্ঘকাল পরে। ব্যক্তিগতভাবে আমরা হয়তো সেই সুন্দর পরিণতি দেখে যাওয়ার সুযোগ পাব না; সে যাই হোক, আমাদের সকলের, বিশেষত যুবকদের, উচিত স্বামীজীর বাণী প্রচার করা—শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র—যাতে তাঁর বিশ্বের একত্বের বার্তা ফলপ্রসূ হতে পারে। কিন্তু এটি সম্ভব করতে হলে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে আধ্যাত্মিকতা প্রসঙ্গে স্বামীজীর উপলব্ধির যথার্থ ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। স্বামীজীর দেহত্যাগ প্রসঙ্গে রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন: 'কিন্তু সেই চিতা আজও বহ্নিমান। প্রাচীন উপকথার ফিনিক্স্ পাখির মতোই তাঁর চিতাভস্ম থেকে নতুন করে জেগে উঠেছে ভারতের প্রাণপাখি, ভারতের বিবেক। জেগে উঠেছে ভারতের ঐক্যে এবং তাঁর মহান বাণীতে বিশ্বাস। বৈদিক যুগ থেকে ভারতের প্রাচীন ঋষিরা এই বাণী, এই সত্য উপলব্ধি করে এসেছেন। ভারতকে এই বাণী যে পৌঁছে দিতে হবে সমগ্র মানবজাতির কাছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সম্পর্কে রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন: 'পবিত্র সেই উৎস, পবিত্র তার গতিপথ, পবিত্র তার মোহানা।' উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং; আধ্যাত্মিক তটপ্লাবিনীর গতিপথ চিহ্নিত করেছে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী—যিনি প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন নামে এই সংঘ। এই সংঘ সেই মোহানা যার ভিতর দিয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী প্রবহমান। কিন্তু কী সেই বাণী যার রূপদানের জন্য স্বামীজী সংঘকে রেখে গেলেন? না, এই বাণী কোনও তথাকথিত সংস্কারমূলক আন্দোলনের জন্য নয়। আংশিক সংস্কারে স্বামীজীর আস্থা ছিল না। তিনি বলেছেন: 'সংস্কারকদের আমি বলতে চাই, আমি তাঁদের সকলের চেয়ে বড় সংস্কারক। তাঁরা অল্পস্বল্প সংস্কার করতে চান। আমি চাই আমূল রূপান্তর। আমাদের মধ্যে প্রভেদ কেবল উপায়ের ক্ষেত্রে। তাঁদের উপায় ধ্বংসাত্মক, আমার উপায়

গঠনমূলক। বস্তুত, সংস্কার ব্যাপারটাতে আমার বিশ্বাস নেই; আমি বিশ্বাস করি গড়ে ওঠায়।' অতএব রামকৃষ্ণ মিশন সংস্কারবাদী আন্দোলন নয়। আমরা জাতির সমগ্র দেহে পুষ্টিসঞ্চারে প্রযত্নবান; তার ধমনীর রক্তপ্রবাহে যদি অশুদ্ধির লক্ষণ এসে থাকে তবে তা মুক্ত করে তাকে সুস্বাস্থ্য দান করে এই পুষ্টি। আমরা শিক্ষাদান করি এবং শিক্ষার মাধ্যমে ঘটাতে চাই স্বামীজী-কথিত 'আমূল রূপান্তর'; এই পথ স্বামীজী আমাদের জন্য নির্দেশ করে গিয়েছেন। স্বামীজী যেমন বলেছেন, প্রত্যেক জাতির কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। অন্যান্য জাতির রয়েছে এক-একটি স্বতন্ত্র আদর্শ—কোন জাতি ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে তার আদর্শ করেছে, কোন জাতির আদর্শ নিয়মশৃঙ্খলা, কোন জাতি গণতন্ত্রকে আদর্শ করেছে, কোন জাতি সাম্যবাদকে। এসবই রাজনীতিভিত্তিক। স্বামীজী এইসব পথে আস্থা-শীল ছিলেন না। তিনি বলেছেন, ভারতবর্ষে যদি কিছু করতে হয় তবে তা করতে হবে আধ্যাত্মিকতার পথে। আমাদের জাতির মেরুদণ্ড সেইখানে, এবং স্বামীজী চেয়েছিলেন, আমাদের সমগ্র জাতির প্রয়াস যেন আধ্যাত্মিক-তার পুষ্টি সাধনে নিয়োজিত হয়। আমি এখানে ইচ্ছা করেই 'ধর্ম' শব্দটি ব্যবহার করলাম না, কারণ ধর্ম বলতেই সাধারণত সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির ব্যাপার অথবা তর্কাতীত কোন মতবাদ বোঝায়। স্বামী বিবেকানন্দ চাইতেন এমন ধর্ম যে-ধর্ম মানুষকে তার বুদ্ধি এবং বিচারশক্তি ব্যবহার করতে দেবে, তাকে সত্যের মুখোমুখি হতে দেবে। যে-ধর্ম তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে প্রতিফলিত, স্বামীজী সেই ধর্ম প্রচার করেছিলেন। আমাদের এখন জানতে হবে, সে কোন্ ধর্ম। তাঁর 'রাজযোগ' গ্রন্থে স্বামীজী সংক্ষেপে কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় সেই ধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলছেন: 'আত্মা মাত্রই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করে আত্মার এই ব্রহ্মভাব প্রকাশ করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান—এই কয়েকটির মধ্যে এক বা একাধিক অথবা সব কয়টি যোগ বা উপায়ের মাধ্যমে নিজের ব্রহ্মভাব প্রকাশিত কর ও মুক্ত হও। এই হল ধর্মের পূর্ণাঙ্গ মর্মকথা। মতবাদ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির অথবা অন্য বাহ্য ক্রিয়াকর্ম তার গৌণ অঙ্গ মাত্র।' অন্য এক স্থানে তিনি বলেছেন: 'যোগ-বিদ্যার আচার্যগণ তাই বলেন, ধর্ম কেবল অতীত-কালের অনুভূতির উপর স্থাপিত নয়, পরন্তু স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে অনুরূপ প্রজ্ঞা লাভ না করলে কোন ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে ধার্মিক হতে পারেন না।' আমরা দেখছি, এটি শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকা-নন্দের জীবনে মূর্ত। তাঁরা আধ্যাত্মিকতার সত্য প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছেন এবং এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন যে, আধ্যাত্মিক জীবনই একমাত্র সত্য—আর যা কিছু সবই অসত্য এবং অনিত্য।

প্রকৃত সমস্যা এই—ধর্ম ব্যক্তি-মানুষের ব্যাপার; কীভাবে তাকে সমাজ তথা সমগ্র জগতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়? হিন্দুদের মধ্যে আবার সম্প্রদায়গত মতবাদ বা দর্শন নিয়ে বিরোধ রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের যে-ব্যাখ্যা স্বামীজী দিয়েছেন সেখানে দেখি সব ধর্মীয় মত এবং পথকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত-জ্ঞানকে ভারতবর্ষের সহস্রযুগব্যাপী আধ্যাত্মিক উপলব্ধির শীর্ষবিন্দুরূপে চিহ্নিত করতেন। স্বামীজী তাই দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অথবা অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি দর্শনের সমালোচনা না করে বলেছেন, আমরা মিথ্যা থেকে সত্যে নয়, সত্য থেকেই সত্যে উপনীত হই; আমরা নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে উত্তীর্ণ হই এবং অবশেষে অস্তিত্বের একত্ব

উপলব্ধি করি। কিন্তু এই তত্ত্ব কি সমাজে প্রয়োগ করা যায়? অদ্বৈত বেদান্ত একদা ছিল অরণ্যে ধ্যানের বিষয়; এই বনের বেদান্তকে স্বামীজী লোকালয়ে আনতে চেয়েছিলেন। সারা পৃথিবীতে বেদান্তের বার্তা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন, এ এক বৈপ্লবিক চিন্তা। তিনি বলতেন, প্রত্যেকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করুক, সে অমর আত্মা, একমাত্র সত্য, এবং অন্য সকলকে সেই দৃষ্টিতে দেখুক; এবং যেহেতু সত্য এক বই দুই নয়, অতএব আমার মধ্যে যে-সত্য অন্যদের মধ্যেও সেই একই সত্য বিরাজমান—আর এই সত্য নিত্য শুদ্ধ, নিত্য চৈতন্যময়, নিত্য বর্তমান। এই আত্মা অপাপবিদ্ধ, দোষবর্জিত; অজ্ঞানতার অন্ধকার আমাদের দৃষ্টি আবৃত করে রাখে বলে আমরা নিজেদের অশুদ্ধ এবং পাপী মনে করি। ফলিত বেদান্তকে জীবনের আদর্শ করে নেওয়ার জন্য স্বামীজী জগৎকে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই আদর্শ গ্রহণ করলে মানুষ অনেক কম অন্যায় করবে। স্বামীজীর এই চিন্তা সম্পূর্ণ নূতন। অদ্বৈত দর্শনের প্রবক্তা আচার্য শঙ্করও এ-কথা বলেননি—তিনি মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তিকে অদ্বৈতজ্ঞানের অধিকারী মনে করতেন। স্বামীজী কিন্তু চাইতেন, একত্বের এই সুপ্রাচীন জ্ঞান সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ুক। তিনি মনে করতেন, একমাত্র এর দ্বারাই সমগ্র মানবজাতি অস্তিত্বের এক উচ্চস্তরে উন্নীত হতে পারবে। তিনি বলতেন, কোন মৎস্যজীবী যদি এই দর্শনে সশ্রদ্ধ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে, তবে সে আরও ভাল মৎস্যজীবী হয়ে উঠতে পারবে; যদি কোন উকিল এই আদর্শে বিশ্বাসী হন, তবে তিনি আরও ভাল আইনজীবী হতে পারবেন—যে-কেউ এতে বিশ্বাস রাখতে পারবে, সে আরও ভাল লোক হতে পারবে। এই হল ফলিত বেদান্তের কার্যকর দিক। এই দর্শনের ভিত্তির উপর আমাদের জীবন গড়ে তুলতে হবে; এই দর্শনই আমাদের ব্যক্তিগত, জাতিগত এবং আন্তর্জাতিক সকল সমস্যার সমাধান করে দেবে। কিন্তু এই সর্বোচ্চ, অনির্বচনীয় জ্ঞানকে যদি ব্যক্ত করতে হয় তবে কীরূপে তা সম্ভব? তাকে ব্যক্ত করতে হবে ভালবাসার রূপে, প্রেমের মাধ্যমে। স্বামীজী এক জায়গায় বলেছেন: 'আমি কাউকে ঘৃণা করতে পারি না, কাউকে ত্যাগ করতে পারি না, কারণ আমি তাদের মধ্যে নিজেকে দেখতে পাই।' এই প্রেম প্রত্যেক ব্যক্তিকে শিবজ্ঞানে জীব সেবায় সক্রিয় করবে। অদ্বৈত বা এক অখণ্ড সত্যে বিশ্বাস আমাদের ভয়শূন্য—স্বামীজীর ভাষায়, অভীঃ—করবে। এই হল উপনিষদের বাণীর সারমর্ম। জনকের উপনিষদে বলা হয়েছে: 'অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি'—তুমি সেই অভয় সত্তাকে উপলব্ধি করেছ। একই সুরে স্বামীজী বলেছেন:

'ক্ষীণাঃ স্ম দীনাঃ সকরুণা জল্পন্তি মূঢ়া জনাঃ নাস্তিক্যন্তিদন্ত অহহ দেহাত্মবাদাতুরাঃ।/প্রাপ্তাঃ স্ম বীরা গতভয়া অভয়ং প্রতিষ্ঠাং যদা আস্তিক্যন্তিদন্ত চিনুমঃ রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্॥'—আমি দুর্বল, আমি নীচ এসব নির্বোধের কথা। এ হল নাস্তিকতা। যারা দেহরূপে নিজেদের দেখে তারাই এ-ধরনের কথা বলে। শ্রীরামকৃষ্ণদাস আমরা সেই অভয়কে উপলব্ধি করেছি, আমরা সত্য বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত। স্বামীজী বলছেন: 'পুরাতন ধর্ম বলে, যে-ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয় সে নাস্তিক। এই নূতন ধর্ম বলে, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস নেই যে-ব্যক্তির, সে নাস্তিক।' অতএব এই হল শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী।

আমার তরুণ বন্ধুগণ! এই বাণী তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, কার্যে পরিণত করতে হবে; ঈশ্বরের সত্তাজ্ঞানে মানবসাধারণকে সেবা করে সেই সেবার মাধ্যমে প্রচার করতে হবে এই

বাণী। অদ্বৈতবাদের মহান বাণী প্রচারের মধ্য দিয়ে তোমরা আধ্যাত্মিকতায় সম্পন্ন হয়ে উঠবে, অন্যদেরও আধ্যাত্মিক করে তুলবে। প্রথমে সমগ্র দেশে এই বাণী প্রচার কর, তারপর পৃথিবীর সর্বত্র। নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখ, গুরুর প্রতি বিশ্বাস রাখ—তবেই শক্তি আসবে, বল আসবে, যা কিছু ভাল, মহৎ সে-সবই আসবে।

যা বলা হল, তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে, ঈশ্বর-আরাধনার অন্য সব পদ্ধতিকে অস্বীকার করতে হবে। আদিম মানুষের বস্তুপূজা থেকে আরম্ভ করে অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত ধর্মসাধনার যত পথ দেখা গিয়েছে, সে-সবই ধর্মানুভূতির নানা প্রকাশ, বিভিন্ন স্তর ; মানুষের স্বভাব অনুসারে এ-সবেরই প্রয়োজন আছে। তবে সাধককে শুধু এইটুকু বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, তাঁর পথই একমাত্র যথার্থ পথ নয় এবং ধর্মপথে চরম অনুভূতি হল আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান।

স্বামী বিবেকানন্দকে ভারতবর্ষের দেশ-প্রেমিক-সন্ন্যাসী বলা হয়। নিঃসন্দেহে তিনি দেশপ্রেমিক ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা যেমন বলেছেন : 'মাতৃভূমি তাঁর আরাধ্য দেবতা।' কিন্তু স্বামীজীর দেশপ্রেমের রূপটি কী ? রাজনীতিক ক্ষমতা অথবা ধনলাভের অভীপ্সা এই দেশ-প্রেমের মূলে অবশ্যই নয়। ভারতের প্রতি এক গভীর, আন্তরিক অনুভূতির নাম এই দেশপ্রেম। মাদ্রাজে তিনি এক ভাষণে বলেন : 'আর একটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। অনেকে দেশপ্রেমের কথা বলে থাকেন। আমি দেশ-প্রেমে বিশ্বাস করি এবং এ-ব্যাপারে আমার নিজেরও একটি আদর্শ আছে। মহৎ কোনও কর্ম সম্পাদন করতে হলে তিনটি জিনিস চাই। প্রথমত, হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয়। বুদ্ধি অথবা বিচারশক্তি দিয়ে কী হবে ? বুদ্ধি আমাদের সামান্য কিছু দূর এগিয়ে দেয় মাত্র, হৃদয়দ্বার দিয়েই আসে মহাশক্তির প্রেরণা। প্রেমই অসম্ভবকে সম্ভব করে—জগতের সকল রহস্য প্রেমিকের নিকটই উন্মুক্ত। হে ভাবী সংস্কারকবৃন্দ! তোমরা হৃদয়বান হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করতে পারছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধররা আজ পশুপ্রায় হয়ে দাঁড়িয়েছে ? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করছ—কোটি কোটি লোক আজ অনাহারে মৃতপ্রায়, যুগ যুগ ধরে তারা প্রায় অনাহারেই দিনযাপন করছে ? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করছ—অজ্ঞানের কালো মেঘ ভারতের আকাশ আচ্ছন্ন করেছে ? তোমরা কি এইসব ভেবে অস্থির বোধ করছ ? এই দুশ্চিন্তা কি তোমাদের নিদ্রাহরণ করেছে ? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে—হৃদয়ের স্পন্দনের সঙ্গে কি এই ভাবনা যুক্ত হয়ে গিয়েছে ? এই ভাবনা কি তোমাদের পাগল করে তুলেছে ? দেশের দুর্দশা কি তোমাদের একমাত্র চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে আর সেই চিন্তায় বিভোর হয়ে তোমরা তোমাদের নামযশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয়সম্পত্তি, এমন-কি, শরীর পর্যন্ত ভুলেছ ? এই অবস্থা কি তোমাদের হয়েছে ? যদি হয়ে থাকে, তাহলে জানবে, তোমরা দেশহিতৈষী, দেশ-প্রেমিক হওয়ার প্রথম সোপানে মাত্র পদক্ষেপ করেছ। তোমরা অনেকেই হয়তো জানো, আমেরিকায় ধর্ম-মহাসভা হয়েছিল বলে আমি সেখানে যাইনি ; দেশের জনসাধারণের দুর্দশা দূর করবার জন্য আমার ঘাড়ে যেন ভূত চেপে-ছিল আর সেই চিন্তা ছিল আমার অন্তরাত্মা জুড়ে। অনেক বছর ধরে আমি সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু আমার দেশবাসীদের জন্য কাজ করবার কোন সুযোগ পাইনি। সেই-জন্যই আমি আমেরিকা গিয়েছিলাম। তোমাদের

মধ্যে অনেকেই এ-কথা জানো। ধর্ম-মহাসভা নিয়ে কে মাথা ঘামায়? এখানে যারা আমার আপনার জন, যারা আমার রক্তমাংসস্বরূপ, সেই জনসাধারণ দিন দিন যেন ডুবে যাচ্ছে—কে তাদের দেখে? এই ছিল আমার প্রথম পদক্ষেপ।

'মানলাম, তোমরা দেশের দুর্দশার কথা প্রাণে প্রাণে অনুভব করছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বৃথা বাক্যব্যয় না করে এই দুর্দশার প্রতিকারের কোন উপায় স্থির করেছ কি? মানুষকে গালি না দিয়ে তার দুর্দশামোচনের কোন ব্যবস্থা করতে পার কি? স্বদেশবাসীর এই জীবন্মৃত অবস্থা দূর করবার জন্য এই ঘোর দুঃখে তাকে কিছু মধুর সান্ত্বনাবাক্য শোনাতে পার কি?

'কিন্তু এতেও হবে না। তোমরা কি পর্বত-প্রমাণ বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে কাজ করতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ অসিহস্তে তোমাদের বিপক্ষে এসে দাঁড়ায়, তোমরা কি যা উচিত বলে বুঝেছ সেই কাজ সাহসের সঙ্গে করে যেতে পারবে? যদি তোমাদের স্ত্রীপুত্র তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে, যদি তোমাদের ধনমান সব যায়, তবুও কি তোমাদের কর্তব্যে অটল থাকবে? ···তোমাদের কি এই রকম দৃঢ়তা আছে? যদি এই তিনটি জিনিস তোমাদের থাকে, তবে তোমরা প্রত্যেকেই অলৌকিক কাণ্ড করে ফেলতে পারবে।'

দেশপ্রেমের এই আদর্শের কথা স্বামীজী বলেছেন। কিন্তু বর্তমানে বিশেষত দেশের স্বাধীনতার পর, আমরা বড়ই স্বার্থপর হয়ে পড়েছি। যে-সভ্যতা আজ ক্ষয়িষ্ণু, মৃতপ্রায়, সেই পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে আমরা বিত্ত, বিলাসিতা আর আড়ম্বরের পিছনে ধাবমান। তরুণ বন্ধুগণ! তোমরা স্বামীজীর আদর্শ আত্মস্থ করতে চেষ্টা কর; নিজেদের নামযশবিত্তের জন্য নয়, সমগ্র দেশকে আবার জাগিয়ে তোলার জন্য কর্মে ব্রতী হও। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখা দরকার যে, স্বামীজী কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জন্য আসেননি। ভারত আবার নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে উঠুক, তিনি এটি চাইতেন এই কারণে যে আধ্যাত্মিকতার উৎস এই দেশই কেবল মানুষকে অমৃতত্বের সন্ধান দিতে পারে। কিন্তু তিনি এক জায়গায় সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন: 'আমার দিক থেকে বলে রাখছি, আমি কারও হুকুমে চলি না। আমার জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে আমি যথেষ্ট সচেতন। কোন সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আমি থাকতে চাই না। আমি যেমন ভারতবাসী, তেমনই আবার বিশ্বের নাগরিকও বটে। এর মধ্যে কোনও অতিশয়োক্তি নেই। যতদূর সাধ্য তোমাদের জন্য খেটেছি। এখন তোমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা কর। আমার উপর আবার কোন্ দেশের বিশেষ দাবি আমি কি কোনও বিশেষ জাতির ক্রীতদাস? তিনি বলতে চেয়ে-ছিলেন, যুবকদের অর্থাৎ তোমাদের পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে উঠে তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। স্বামীজী যে তোমাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন এই বলে: 'ওঠ, ভারত! তোমার আধ্যাত্মিকতা দিয়ে বিশ্বজয় করে নাও।' অতএব শুধু নিজেদের নিয়ে থেক না, সকলের মধ্যে নিজেদের প্রসারিত কর। স্বার্থপর হয়ো না; তোমাদের যা সম্বল আছে সব উজাড় করে দাও দেশকে জাগিয়ে তোলার জন্য, পৃথিবীকে জাগিয়ে তোলার জন্য—তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য। এই হল স্বামী বিবেকানন্দের বাণী আর এই বিরাট দায়িত্ব তিনি আমাদের উপর অর্পণ করে গিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবতরঙ্গের উৎসমুখের কথা বললাম। আমরা দেখলাম, প্রত্যেক ব্যক্তি বেদান্তজ্ঞানকে যেন বাস্তবায়িত করে—এই ছিল স্বামীজীর অভিপ্রেত। কিন্তু ফলিত বেদান্তের

আদর্শ সমাজে কীভাবে প্রবর্তন করা যায়? আমাদের সমাজব্যবস্থার উপর তার প্রভাবই বা কেমন হবে? স্বামীজী বলেছেন, ভোগের অধিকারকে কেন্দ্র করেই সমাজনীতি বা সমাজ-ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে—এ-ব্যাপারে যারা সুবিধাভোগী আর যারা বঞ্চিত এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সংঘাতই বর্তমান সমাজব্যবস্থার মূলে। অন্যান্য যে-সব দেশে ধনবণ্টনে সমতা আনার চেষ্টা হয়েছে, সেইসব রাষ্ট্রে জড়বাদী পথ অনুসৃত। কিন্তু টেনিসনের ভাষায়: 'মৃত্যুই যদি জীবনের শেষ কথা, তাহলে সারা জীবন খেটে লাভ কী?' আবার সেই জড়বাদের ভিত্তিভূমি প্রতিযোগিতা, যা রণসম্ভার বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় এবং শ্রেণী সংগ্রামে পর্যবসিত। শ্রেণীসংগ্রামের ফলে বহু দেশ রক্তস্রোতে প্লাবিত। কিন্তু ষাটবছর অতিক্রান্ত হবার পরেও সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র মানুষকে কতখানি এগিয়ে দিতে পেরেছে? স্বামীজী তাই বলেছিলেন: 'সমাজ-তন্ত্রকে আমি সর্বাঙ্গসুন্দর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বলে মনে করি না; তবু যদি নিজেকে আমি সমাজতন্ত্রী মনে করতে চাই তার কারণ, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।' অন্যত্র তিনি বলেছেন: 'সমাজ-তন্ত্রের মতোই কোন মতবাদ শীঘ্রই প্রতিষ্ঠালাভ করতে চলেছে।' কিন্তু যে-সমাজতন্ত্রের কথা তিনি বলেছেন, সেটি স্থাপন করতে হবে যে-আধ্যাত্মিক জ্ঞান ভারত জগৎকে শিখিয়েছে তার উপর। যদি তুমি একমাত্র সত্য অদ্বৈত ব্রহ্মের কথা বল, যা সকলেরই অন্তরাত্মা, তাহলে কলহ অথবা রক্তপাত হতে পারে না। রক্ত দিয়ে কি রক্ত ধুয়ে ফেলা যায়? কাদা দিয়ে কি কাদা পরিষ্কার করা যায়? প্রকৃত অর্থে অগ্রগতি সম্ভব কেবলমাত্র ভারতবর্ষের মহান আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মাধ্যমে; এই জ্ঞানের পরম প্রকাশ হয় যখন সকলের মধ্যে এক সত্তা, এক আত্মাকে অনুভব করা যায়। এই একমাত্র পদ্ধতি যা আর্থনীতিক সাম্য ও সেই সঙ্গে রাজনীতিক স্থিরতা এনে দিতে পারে এবং পৃথিবীকে মুক্ত করতে পারে বিলোপের আশঙ্কা থেকে—যে-আশঙ্কা আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

স্বামীজী চার রকম বিশেষ অধিকারের কথা বলেছেন। (১) শারীরিক শক্তি মানুষকে আধিপত্যের যে-বিশেষ অধিকার দেয়; (২) ধনসম্পত্তির জোরে মানুষ কর্তৃত্বের যে-বিশেষ অধিকার দাবি করে; (৩) প্রথম দুই রকমের তুলনায় সূক্ষ্ম কিন্তু প্রবলতর আর এক প্রভুত্বের অধিকারের মূলে বুদ্ধি তথা পাণ্ডিত্য; (৪) চতুর্থ এবং নিকৃষ্ট ধরনের প্রভুত্বের অধিকার ভোগ করেন তাঁরা, যাঁরা এটি দাবি করেন ধর্মের নামে—এটি সব চেয়ে পীড়নকারী, তাই নিকৃষ্ট। বেদান্তবাদী হব আবার বিশেষ অধিকারও দাবি করব—সে শারীরিক, মানসিক, ধর্মীয়, যে-কোনও দিক দিয়েই হোক না কেন—এ-জিনিস হতে পারে না। বিশেষ অধিকার কেউ পেতে পারেন না। বৈদান্তিকের কেবল একটি অধিকার প্রাপ্য—মানুষকে সেবার অধিকার, কারণ মানবসেবা ঈশ্বর-আরাধনারই আর এক নাম। এইখানেই আমরা সামাজিক ক্ষেত্রে স্বামীজীর ফলিত বেদান্তের প্রয়োগ দেখতে পাই। যদি আমরা সকলকে একই আত্মারূপে দর্শনের জ্ঞান মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারি এবং সেই বোধ অনুযায়ী কোনও রকম বিশেষ অধিকার দাবি না করে সকলকে সেবা করতে পারি, তাদের মধ্যে ভোগ্য বস্তু বিতরণ করতে পারি, তবেই আমাদের সকল আর্থনীতিক, রাজনীতিক এবং সামাজিক সমস্যা দূরীভূত হতে পারে।

কিন্তু এতকাল অন্ধকারে নিহিত সনাতন যে-বাণী এখন শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকে উদ্ভাসিত,

বিবেকানন্দ-প্রদত্ত সেই মহান বাণীর কেতন কে বহন করবে? স্বামীজী স্বল্পায়ু ছিলেন এবং তাঁর গুরুভ্রাতৃগণ সকলেই দেহত্যাগ করেছেন। আমাদের এই বিরাট সংঘের ১২৩টি শাখাকেন্দ্রের কাজ দেখাশুনা করছেন এক সহস্র বা তার চেয়ে কিছু বেশি সাধুকর্মী। কিন্তু স্বামীজীর এই নতুন বাণী প্রচারের জন্য আরও হাজার হাজার কর্মীর প্রয়োজন। স্বামীজী বলেন: 'নতুন প্রজন্মে, প্রতি, এখনকার তরুণদের প্রতি আমি আস্থাশীল। তাদের ভিতর থেকেই আসবে আমার কর্মীরা। সিংহবিক্রমে তারা কার্যসাধন করবে। আদর্শটি আমি স্থির করে দিয়েছি, ওই আদর্শে আমার জীবন নিবেদিত।'

অন্যত্র তিনি বলেছেন: 'বৎস, আমি চাই এমন লোক যাদের দেহের পেশী হবে লৌহের মতো দৃঢ় আর স্নায়ু যেন কঠিন ইস্পাতে তৈরি—আর তাদের দেহের ভিতর থাকবে এমন একটি মন যা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য মনুষ্যত্ব; ক্ষাত্রবীর্য আর সেইসঙ্গে ব্রহ্মতেজ। আমাদের সুন্দর ছেলের দল, যারা আমাদের ভরসাস্থল—ওদের সব গুণ আছে। সবই ছিল—আহা, শুধু যদি এইসব লক্ষ লক্ষ ছেলে বিবাহ নামক পশুত্বের শিকার না হত! হে প্রভু, আমার কাতর ক্রন্দনে একটু কর্ণপাত কর! মাদ্রাজ তাহলে জেগে উঠবে, এখানকার অন্তত একশো যুবক সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসবে, তারপর কোমর বেঁধে সত্যের জন্য সংগ্রামে প্রস্তুত হবে, দেশ থেকে অগ্রসর হবে দেশান্তরে।'

কলকাতায় তিনি বলেন: 'আমার দেশের প্রতি আমি বিশ্বাস রাখি, বিশেষত দেশের যুবশক্তির প্রতি। বঙ্গদেশের যুবকদের উপর অতি গুরুভার দায়িত্ব সমর্পিত। এত গুরুভার দায়িত্ব আর কখনও কোনও অঞ্চলের যুবকদের বহন করতে হয়নি। আমি গত প্রায় দশ বছর ধরে সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছি—এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় আমার দৃঢ় প্রতীতি হয়েছে যে, বাঙালী যুবকদের ভিতর দিয়েই প্রকাশ পাবে এমন এক শক্তি যা ভারতবর্ষকে তার যথোচিত আধ্যাত্মিক গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে দেবে। হ্যাঁ, এই হৃদয়বান, উৎসাহী বাঙালী যুবকদের মধ্য থেকেই শত শত শক্তিমান পুরুষ এগিয়ে আসবে—তারা আমাদের পূর্বপুরুষদের অনুভূত সনাতন আধ্যাত্মিক সত্য জগতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রচার করবে, শিক্ষা দেবে। তোমাদের সামনে রয়েছে এই মহান কর্তব্য।'

ভারতবর্ষ এখন আর পরাধীন নয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী বলেছিলেন: 'আগামী পঞ্চাশ বছর গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা হোন। অন্য অকেজো দেবতাদের এই কয়েক বছর ভুলে গেলে কোন ক্ষতি নেই। অন্য দেবতারা সকলেই নিদ্রিত। আমাদের জাতীয়তাই, এই দেবতাই, একমাত্র জাগ্রত। সর্বত্র তাঁর হস্ত, পদ, কর্ণ—সকল স্থান জুড়ে রয়েছেন তিনি। আমাদের চতুর্দিকে যে-দেবতাকে দেখছি, সেই বিরাটের উপাসনা না করে আমরা কোন্ অকেজো দেবতার অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্ছি?' স্বামীজীর এই আহ্বানে দেশের যুবশক্তি যথাসময়ে সাড়া দিয়েছে। স্বামীজীর আদর্শ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুবকরা এক বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলে; সারা দেশ জুড়ে তাদের সংগ্রাম এবং ত্যাগের মধ্য দিয়েই আমাদের স্বাধীনতা এসেছে। কিন্তু তারা এখন কোথায়? তোমাদের কি অনুরূপ দেশপ্রেম আছে? মনে রেখ, দেশের বিপদ এখনও কাটেনি। দেশের যুবশক্তি তোমরা, তোমাদের জন্য স্বামীজী যে-কাজ রেখে গিয়েছেন, অন্য সব কিছু ত্যাগ করে সেই কর্মে তোমরা নিজেদের উৎসর্গ কর। কিন্তু স্বামীজীর কাজের উপযুক্ত যন্ত্র হয়ে উঠতে হলে, তাঁর আদর্শকে
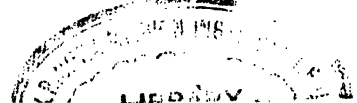
রূপায়িত করতে হলে তোমাদের হতে হবে 'আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠো মেধাবী'—শরীরে, মনে বলিষ্ঠ, দৃঢ়চেতা এবং মেধাবী।

স্বামীজী তোমাদের জন্য যে কর্মভার রেখে গিয়েছেন, সেটি তোমাদের গ্রহণ করতে হবে। তিনি এক জায়গায় বলেছেন: 'ভারতমাতা এক সহস্র যুবক বলি চান—মানুষ চান, পশু নয়।' অতএব পবিত্র এবং বলবান হও, নামযশের বাসনা ত্যাগ কর। অতঃপর স্বামীজীর কাজের ভার নাও—এ-কাজ শুধু দেশের জন্য নয়, সমগ্র জগতের জন্য।

নিজেদের তোমরা দুর্বল ভেব না, নিজেদের অক্ষম মনে করে এক কোণে বসে অশ্রুবিসর্জন করবে না কখনও। স্বামীজীর এই উৎসাহ-বাণী স্মরণ করবে:

'কিন্নাম রোদিষি সখে ত্বয়ি সর্বশক্তিরামন্ত্রয়স্ব
ভগবন্ ভগদং স্বরূপম্।
ত্রৈলোক্যমেতদখিলং তব পাদমূলে আত্মৈব
হি প্রভবতে ন জড়ঃ কদাচিৎ॥'

—বন্ধু, চোখের জল ফেলছ কেন? তোমার মধ্যেই যে রয়েছে অনন্ত শক্তি! হে শক্তিমান, তোমার সর্বশক্তিমান স্বরূপকে জাগিয়ে তোল, তাহলেই সমগ্র বিশ্ব তোমার পদানত হবে। বস্তু নয়, একমাত্র আত্মাই শক্তির আধার। বর্তমান যুগের মহান বার্তাবহ স্বামীজীর এইসব জীবনপ্রদ বাণীর উপর সশ্রদ্ধ বিশ্বাস রাখ। তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত হও, তাঁর উপদেশ কার্যে পরিণত কর এবং সমগ্র পৃথিবীতে তা প্রচার কর।*

* ২৪ ডিসেম্বর ১৯৮৫, বেলুড়মঠ-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী সর্বভারতীয় যুবসম্মেলনে ইংরেজীতে পঠিত লেখকের স্বাগত-ভাষণ। শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায় কর্তৃক অনূদিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীমতী মানসী বরাট

স্থির,
অস্ত-সূর্য—আরক্তিম ভাগীরথী নীর।
চকিত-চমকে চায়, ঘর-ফেরা
বিহগ-বিহগী।
কুটি'পরে পূত এক জ্যোতির্ময় যোগী—
সকাতর আহ্বানে, ডাকেন সন্তানে,
'ওরে আয়,
আশা-পথ চেয়ে চেয়ে দিন চলে যায়॥'
নিস্তব্ধ রাত্রি নামে, চন্দ্রে ঘেরে—
তারার প্রহরী
ভক্ত-পথে রেখে আঁখি
নিদ্রাহীন রাত্রি যাপে
আপনি শ্রীহরি॥

তারপর
মহাকাল অর্ণবে
সহস্র তরঙ্গ মুছে নিয়ে গেছে
কত শত কীর্তি-সম্ভারে
কিন্তু সেই দিব্য-অঙ্গ-জ্যোতি
পরিব্যাপ্ত রয়েছে আজও—
বিশ্ব-চরাচরে॥
আজও সেই দিব্যালোকে জ্বলে লক্ষ
লক্ষ কোটি প্রাণ
নিশ্ছিদ্র আঁধারে পায় সহস্র পথহারা
পথের সন্ধান।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিশ্বশান্তি

অধ্যাপক এ. এল. ব্যাসম

দেবপ্রতিম শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কলকাতায় সুপরিচিত, সেই সময়ে মুষ্টিমেয় মানুষ বিশ্বশান্তির সমস্যা নিয়ে আশঙ্কিত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সে সময়ে বড় রকমের কোন যুদ্ধ সংগঠিত হয়নি। ফলে বিশ্বের পরিবেশ ঐ সময়ে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণই ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার মধ্যে সরাসরিভাবে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কোন কথা ছিল না। প্রত্যক্ষভাবে পৃথিবীর শান্তি রক্ষার কথা না থাকলেও তাঁর শিক্ষায় ছিল স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের প্রেরণা—যা সমগ্র মানবসমাজে শান্তি, সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক সম্প্রীতির ভাবকে পরিপুষ্ট করে। বস্তুতঃ, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে শান্তির বার্তাবহরূপে চিহ্নিত করেননি, যদিও তাঁর শিক্ষার মধ্যেই তাঁর সেই ভূমিকা অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পারস্পরিক সম্প্রীতিবোধের প্রসার, যথাসম্ভব ব্যক্তি-সংকীর্ণতাবোধের উর্ধ্বে উঠে একটি সুস্থ জীবন-প্রণালী রচনা এবং অন্যান্য সকল ধর্মের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

সাম্প্রতিককালে পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছে। সমগ্র পৃথিবীতে সঞ্চারিত হয়েছে পারমাণবিক যুদ্ধের ত্রাস। এরই পল্লবিত সূত্র ধরে সর্বত্র মানুষ-মানুষীরা আজ নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্ত্রস্ত এবং শঙ্কিত। সম্ভবতঃ আজ মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বার্থপর এবং ধর্মবোধ তাদের এখন আগের চেয়ে অনেক কম। পৃথিবীর নানা প্রান্তে আজ মুসলমান ও ইহুদী, ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক তিক্ততা হিংস্রতার রূপ নিচ্ছে। [শুধু তাই নয়,] পৃথিবীর অনেক দেশ ধর্মকে বাদ দিয়ে চলার কথা সগর্বে ঘোষণা করছে। অনেকে আবার ধর্মকে প্রাচীনকালের অর্থহীন প্রতীকরূপে চিহ্নিত করছে।

এই পরিস্থিতিতে আজ পৃথিবীতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়োজন আগের চেয়েও বেশি। প্রয়োজন তাঁদের যাঁরা তাঁর বাণী, তাঁর শিক্ষাকে আজ পৃথিবীর নানা স্তরে পৌঁছে দেবেন। তাঁর বাণী ও শিক্ষাকে অনেকে অস্বাভাবিক বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু এছাড়া আজ পৃথিবীতে অন্য কোন পথ নেই যা মানবসমাজকে ন্যায়, নীতি ও পবিত্রতার নতুন পথে পরিচালিত করতে পারে। একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও শিক্ষাই পারে আজ পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে।*

* বিগত ২৪ থেকে ৩০ ডিসেম্বর ১৯৮৫, সপ্তাহব্যাপী সর্বভারতীয় যুবসম্মেলন বেলুড়মঠ-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এটি ২৮ ডিসেম্বর, সম্মেলনের বৈকালিক বিশেষ অধিবেশনে ক্যানবেরাস্থ 'অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশন্যাল ইউনিভারসিটি'র ভারততত্ত্বের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির ইংভলজির বিবেকানন্দ অধ্যাপক এ. এল. ব্যাসম প্রদত্ত ইংরেজী ভাষণ। বঙ্গানুবাদ অধ্যাপক প্রীতিতাপস বসু-কৃত।

স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান বিজ্ঞান

ডক্টর রাজা রামান্না

আমার জীবনের প্রারম্ভে আমি রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বারা যে কতটা উপকৃত হয়েছি, তা কখনও ভুলতে পারব না। আমি যে প্রেরণা তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি, তার খানিকটা যদি এই সম্মেলনের যুবকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, তাহলে এখানে আমার আসা সার্থক হল বলে আমি মনে করব।

'বৈজ্ঞানিক মানসিকতা' এই কথাটা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি, এরকম মন্তব্য আমরা প্রায়ই শুনি। বস্তুতঃ এই কথার পিছনে যে চিন্তা তা কিন্তু বহুদিন আগের। এজন্যে যদি কাউকে সাধুবাদ জানাতে হয়, তাহলে তা স্বামী বিবেকানন্দেরই প্রাপ্য; কারণ তিনিই প্রথম জনসাধারণকে শিখালেন যে, বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে মানুষ কোন কিছু চিন্তা করতেই পারে না, আর বিজ্ঞান দর্শনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গত শতাব্দীর শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র ভারতের উপর প্রভাবের কথা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। রবীন্দ্রনাথকেও সবাই শ্রদ্ধা করত ঠিক, তবে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি এত সূক্ষ্ম এবং এত প্রেমরসাত্মক যে, সাধারণ মানুষ তা গ্রহণ করতে পারত না। তাই বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ—এ দুজনের প্রভাবই ভারতের জাগরণকে সম্ভব করেছিল। তাঁদের উভয়ের মধ্যে যেমন আশা ও উদ্দীপনা, তেমনি বীর্যবত্তা ছিল। এ গুণগুলি দেশবাসীর মনে একটা স্থায়ী দাগ রেখে গেছে। তাঁদের প্রভাব যে এখনও বিদ্যমান তার প্রমাণ এই সমাবেশ। এই প্রসঙ্গে এটা বলা চলে, কলকাতা বলেই এই সমাবেশ সম্ভব হয়েছে। গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা শুনতে সাধারণ মানুষের একটা অনীহা লক্ষ্য করা যায়। এরকম সমাবেশ দেশের অন্যত্র সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।

স্বামীজী বৈজ্ঞানিক মানসিকতার উপর যেমন জোর দিয়েছেন, তেমনি আধ্যাত্মিক বিকাশের উপরেও জোর দিয়েছেন। ঠিক একই সুরে সেদিন আমাদের প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধীও এই কথা বললেন। বললেন, কালপাক্কম কেন্দ্রে ফাস্ট ব্রীডার রিঅ্যাক্টর (Fast Breeder Reactor) যন্ত্রটিকে দেশের সেবায় উৎসর্গ করার সময়। স্বামীজীকে দুটো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। একটি হচ্ছে সেই যুগের দেশবাসীর চিন্তার জড়তা। আমরা দেখি, স্বামীজী দেশবাসীকে ভৎর্সনা করে বলছেন: 'তোমরা তোমাদের উদরকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়েছ, আর রান্নাঘর হচ্ছে সেই ঈশ্বরের পূজার মন্দির।' অপর সমস্যাটি ছিল খ্রীষ্টান মিশনারিদের হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ। তারা হিন্দুধর্মের মধ্যে ভাল কিছু খুঁজে পেত না। যত ভাবে পারে তারা হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করে আনন্দ পেত। তাই স্বামীজী দুঃখ করে বলেছিলেন: 'আমরা দরিদ্র, আমাদের প্রয়োজন রুটি; তোমরা রুটির পরিবর্তে আমাদের ইট দিয়েছ।'

স্বামীজী ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তখনও পর্যন্ত বিজ্ঞান বস্তুবাদ ছাড়া আর কিছু জানত না। আপেক্ষিকবাদ ও কোয়ানটাম মেকানিকস (Quantum Mechanics) ইদানীং বৈজ্ঞানিক চিন্তার ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছে। তা কিন্তু তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু স্বামীজী তখনই বুঝেছিলেন যে, এই বস্তুবাদ দিয়ে মানুষের কোন পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শন হতে পারে না।

এতদিন পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বিশ্বচৈতন্য পদার্থ-বিজ্ঞানের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পাঠ্যপুস্তকে অবশ্য চৈতন্যের কথা নেই, সেখানে দ্রষ্টার কথা আছে। কিন্তু কেউ যখন কিছু দেখে বা বলে, তা চৈতন্যের সাহায্যেই করে। 'চৈতন্য' শব্দটি কোয়ানটাম মেকানিকস-এ খুব চলে, কিন্তু শব্দটির কি অর্থ তা কেউ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বুঝিয়ে বলতে পারে না। এটা একটা মজার ব্যাপার যে, যেখানে সবকিছু গাণিতিক ভাষা দিয়ে বলার কথা সেখানে যেন অসহায় হয়ে চৈতন্য নামে একটা শব্দ ব্যবহার করতে হচ্ছে যা পদার্থ-বিজ্ঞানের পরিভাষায় পড়ে না। দর্শনের কথা আলাদা। দর্শন চৈতন্যকে স্বীকার করে, কারণ এটা তো প্রত্যেক ব্যক্তির অনুভূতির বিষয়। আশ্চর্যের বিষয়, সবাই আমরা চৈতন্যের অস্তিত্বকে স্বীকার করি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভাষায় এর কোন সংজ্ঞা দিতে পারি না

যা কিছু ঘটে তার গোড়ার কথা যে বলতেই হবে, পদার্থ-বিজ্ঞান তা মনে করে না। একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্—একটা পরমাণুর আকৃতি কিরকম তা বোঝার জন্যে আমাদের পদার্থ-বিজ্ঞানের 'খণ্ডতত্ত্ব' (Particle Physics) আদ্যপ্রান্ত জানার প্রয়োজন নেই। তেমনি আবার বিশ্বতত্ত্ব বোঝার জন্যে পরমাণুর আকৃতিতত্ত্ব বোঝারও প্রয়োজন নেই। বোধ হয় এই কারণেই দর্শন চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেই তৃপ্ত, কোথা থেকে, কি করে, কি কি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি হিসেবে এর উদ্ভব ঘটেছে তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। চৈতন্যের গতি ও প্রকৃতির অবশ্যই কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়ম আছে। বহুদিন আগে বেদান্ত, বিশেষ করে শঙ্কর, আমাদের মনের যে বিভিন্ন অবস্থা আছে তা বলে গেছেন। বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রকমের অনুভূতি ঘটে, আর সেইসব অনুভূতি যে নিজস্ব ক্ষেত্রের মধ্যে সত্য, তাও মেনে নিতে হবে। জাগ্রৎ অবস্থায় আমরা সবাই জগৎকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। এটা আমাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা। এই জড় জগৎকে আমরা দেখি আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। এর অস্তিত্বকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। নিদ্রিত অবস্থাতেও আমাদের মন কিন্তু নিষ্ক্রিয় থাকে না। তখন আমাদের যে সব অভিজ্ঞতা হয় তার সঙ্গে বাইরের জগতের কোন সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। জাগ্রৎ ও নিদ্রিত অবস্থা ছাড়াও কিন্তু আমাদের আর-একটা অবস্থা আছে। এই অবস্থায় যে কি ঘটে তা অবশ্য অস্পষ্ট। কিছুদিন আগে এই কথাগুলি আমি বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলতে চেষ্টা করেছিলাম। এজন্যে কেউ কেউ আমাকে এই বলে সমালোচনা করেন যে, আমি বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শন মিশিয়ে ফেলছি। আমার বক্তব্য—বিজ্ঞান দর্শনেরই একটা অঙ্গ। দর্শন ছাড়া বিজ্ঞান অর্থহীন। স্বামী বিবেকানন্দও প্রকারান্তরে এইকথা বলেছেন। অনেক বৈজ্ঞানিক দর্শনকে 'মাথা গরম' করা ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিতে চান। অনেক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক কিন্তু চৈতন্যের কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পান না—যদিও এটা আমার, আপনার, আমাদের সকলের অভিজ্ঞতার বস্তু। বিজ্ঞানের একটা নিয়ম এই যে, যা সকলের অভিজ্ঞতার বস্তু হবে তার সত্যতাকে স্বীকার করে নিতে হবে। একজনের হলে তা কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে পারা যায়। এ অবস্থায় চৈতন্য কি তা নিয়ে মাথা ঘামাব না; এটা মেনে নিতে মন সায় দেয় না—বিশেষ করে যুক্তি যদি এই হয় যে, চৈতন্য কি তা না জানলেও এই বস্তুজগৎকে জানতে আমাদের কোন অসুবিধে হবে না। কারও কারও ধারণা চৈতন্য মস্তিষ্কের মধ্যে একটা জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়। আর মস্তিষ্কও একটা কম্পিউটার

ছাড়া কিছু নয়। কম্পিউটারকে আবার 'ব্ল্যাক বক্স' বলা হয়ে থাকে। এই ব্ল্যাক বক্স-এর কাজ হচ্ছে যা কিছু ঘটছে বা ঘটতে পারে, তা থেকে যা যা যুক্তিসিদ্ধ তা বাছাই করে নেওয়া। কিন্তু কোনটা যুক্তিসিদ্ধ বা যুক্তিসিদ্ধ নয়, তা কোন যান্ত্রিক উপায়ে নির্ধারিত হচ্ছে না, তা নির্ধারিত হচ্ছে স্বতন্ত্র মানুষের দ্বারা। মস্তিষ্ক ও চৈতন্য পৃথক্, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। মস্তিষ্ক এক ধরনের কম্পিউটার হতে পারে, চৈতন্য কিন্তু তা নয়। কোন দিন কম্পিউটার চৈতন্যের ভূমিকা নেবে এ বিশ্বাস করা যায় না। চৈতন্যের সাহায্যে ব্যক্তিসত্তার মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে তা গণিত অথবা রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। বড় জোর এই কথা আমরা বলতে পারি, মস্তিষ্কের ব্যাপারগুলি এবং চৈতন্যের উৎপত্তি—এ দুটি বিষয়ে আমরা কিছু বলতে পারি না। জীববিজ্ঞানীরা যদি বলেন তাঁরা জীবনরহস্যের সবকিছু জেনে ফেলেছেন, তাহলে তাঁরা অতিশয়োক্তি করছেন বলতে হবে। যা আগেই বলেছি, বড় জোর তাঁরা এই কথা বলতে পারেন যে, সব বৈচিত্র্যের উৎপত্তি এক সাম্য অবস্থা থেকে, এটুকু তাঁরা এতদিনে বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু এ-কথা বললেই সমস্যার সমাধান হল না। জীববিজ্ঞানীরা বৈচিত্র্যের শ্রেণীবিভাগ করে থাকেন, তা করলেই সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হল না।

এতদিন পরে এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে, পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রধান কাজ হচ্ছে মূল তত্ত্বকে জানা। এই তত্ত্বের যে বিচিত্র প্রকাশ-ভঙ্গী, তার ব্যাখ্যাই পদার্থ-বিজ্ঞানের নিয়ম বলে পরিচিত। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি শঙ্করের পরম ব্রহ্মকে বিশ্বসংসারের উৎপত্তিস্থল এক পরম সাম্য বলেছি। এই যে সাম্য, তার যখন বিক্ষেপ ঘটে, তখনই আমরা বলি সৃষ্টি হল। কয়েক মাস আগে আমার এইসব কথা যখন ছাপা অক্ষরে বেরুল, তখন কয়েকজন বেশ কৌতুক বোধ করেছিলেন। তা তাঁরা করুন, কিন্তু আমি যা বলেছি তা পদার্থ-বিজ্ঞানেরই কথা। যদি সাম্যের বিক্ষেপ, যার ফলে সৃষ্টি ঘটল, এই ঘটনাকে যদি 'মায়া' এই দার্শনিক শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হয়, তাহলে আপত্তি কিসের?

আমি এতক্ষণ যা বললাম এর দ্বারা স্বামীজী যা চেয়েছিলেন, সেইদিকেই আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছি। স্বামীজী বলতে চেয়েছিলেন, এই জড়জগৎকে বুঝতে গেলে আমাদের বিজ্ঞানের সাহায্য নিতেই হবে। আবার তেমনি চৈতন্যকে বুঝতে গেলে আমাদের অধিকতর গবেষণা ও ধ্যানের প্রয়োজন। এই সমস্যাগুলিকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না এই ভেবে যে, একদিন বিজ্ঞান এগুলির সমাধান করে দেবে। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানেরও দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা পাল্টানো দরকার।

এখানে এসে যে আমি কত আনন্দ পেয়েছি, তা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আমার বিশেষ আনন্দ এই কারণে যে, অধ্যাপক ব্যাসমের সঙ্গে একই মঞ্চে আমি বসতে পেরেছি। আমি অধ্যাপক ব্যাসমকে 'বিস্ময়কর ব্যাসম' এই আখ্যা দিতে চাই। সত্যিই তাঁর ভারতের শিল্পকলা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তা বিস্ময়কর।*

* ২৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫, বেলুড়মঠ-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় যুবসম্মেলনের বৈকালিক বিশেষ অধিবেশনে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, 'পরমাণু উর্জা আয়োগ' (Atomic Energy Commission)-এর অধ্যক্ষ ডক্টর রাজা রামান্নার ইংরেজীতে পঠিত ভাষণ। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ-কৃত অনুবাদ।

স্বামী বিবেকানন্দঃ বিশ্বশান্তি ও আধুনিক বিজ্ঞান

স্বামী ভূতেশানন্দ

১

দ্বন্দ্ব সংঘাত সংকুল বিশ্বে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও নিরাপত্তাহীন জীবনে বিশ্বশান্তি বিষয়টি আমাদের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষের উদ্বেগের কারণ। বিশ্বশান্তি সর্বদাই আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। কখন সভা সমিতি করে, কখন সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের মাধ্যমে, কখন নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে আমরা বিশ্বশান্তি লাভ করতে চাইছি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, আমরা বড় জোর তার সীমারেখা স্পর্শ করেছি, মূলে কখনই পৌঁছাতে পারিনি। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিশ্বশান্তি যে ক্রমেই দূর থেকে দূরতর হয়ে যাচ্ছে, তার কারণ হল—সম্ভবতঃ এটি ফলপ্রসূ করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা যথোচিত পথে পরিচালিত হচ্ছে না। রাজনৈতিক উপায়ে, পারস্পরিক আলোচনা ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে—এইরকম নানাভাবে আমরা সমাধান খুঁজেছি, কিন্তু সমাধান হয়নি। তার অর্থ এই নয় যে, আমাদের প্রয়াস খাঁটি ও আন্তরিক নয়। এর কারণ হল—আমরা সব-সময়ে সঠিক পথে এগোইনি।

আসল কথা হচ্ছে, আমরা কতগুলি কাজ চালানো গোছের সাময়িক উপায়ে বিশ্বশান্তি আনয়নের চেষ্টা করছি। এই উপায়গুলি কিছু-কালের জন্য হয়তো ফলদায়ী হয়েছে, কিন্তু পরিণামে হয় আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে গিয়েছে, নয় তার চেয়েও নিকৃষ্টতর অবস্থায় নেমে গিয়েছে।

জাগতিক ঘটনা প্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বর্তমান জগতে প্রত্যেকেই অপরের প্রভুত্ব থেকে মুক্ত হতে চাইছে—অন্য কোন উপায়ে নয়, কেবল নিজেকে বলশালী করে। বলশালী হওয়া মানে অপরের উপর আধিপত্য বিস্তার করা। ঠিক এইভাবে আমরা চলেছি। কোন শক্তি অন্যের চেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক অস্ত্র তৈরি করছে, আবার অপরেও সেই একই উপায়ে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছে। ফলে অভীষ্ট লক্ষ্যে না পৌঁছে, আমরা ক্রমেই তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। এমনি করেই বিশ্বশান্তি আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

স্বামীজী এই সমস্যার গভীরে গিয়েছেন এবং মনে হয় সেটাই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। শুধু নিজের মধ্যে নয়, সর্বভূতের মধ্যেই সেই পরমসত্তার অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে হবে। যদি একবার বিশ্বসত্তার সঙ্গে আপন সত্তার অভিন্নত্ব অনুভব করতে পারি, তাহলে আর পারস্পরিক বিরোধের কোন সম্ভাবনা থাকবে না। বিশ্বের প্রত্যেক অংশই আমার আত্মার অংশ। আমার সত্তা মানেই ভূমার সত্তা। যাকে সংস্কৃতে 'আত্মা' বলা হয়, তার অর্থ যা সর্বব্যাপী এবং যা সব-কিছুতে ওতপ্রোত হয়ে থাকে। পরমসত্তার এই প্রকৃত স্বরূপটি যিনি উপলব্ধি করতে পারেন, তাঁর আর কারও সঙ্গে দ্বন্দ্ব বিরোধের কোন সম্ভাবনাই নেই। স্বামীজী গোড়া থেকেই এর উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, সকল বিরোধের অবসান ঘটাবার জন্য আমরা যেন এই মৌলিক একত্বকে উপলব্ধি করি। এটা অবাস্তব কল্পনা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যে-কোন ভাবেরই সূচনাকালে সেটা অবাস্তব বলে মনে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। স্বামীজী চেয়েছিলেন, এই মৌলিক একত্বের আদর্শ যেন একটা মতবাদ, বিশ্বাস বা দার্শনিক সিদ্ধান্তমাত্র না হয় অথবা

শুধু একটা বৌদ্ধিক সমাধানে পর্যবসিত না হয়। এই একত্বের আদর্শকে স্বামীজী এমন এক সত্যরূপে দেখেছিলেন যা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমাদের রক্ষা করবে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই উপলব্ধি একান্ত প্রয়োজন, সুতরাং আমরা ভুল পথে চলেছি। বিশ্বশান্তি স্থাপনের একমাত্র উপায় হল—স্বীয় সত্তার মধ্যে বিশ্বসত্তার অনুভব।

২

পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ দ্বারা আধুনিক বিজ্ঞান বস্তুবিচার করে থাকে। এ-যুগের মানুষ লোকশ্রুতি, ঐতিহ্য, বিষয়ের কাব্যিক বর্ণনা বা শাস্ত্রজ্ঞানের উপর তেমনভাবে নির্ভর করে না, প্রত্যেকটি বিষয় যাচাই করে, যুক্তি দিয়ে বুঝে নিতে চায়। এই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। সুখের বিষয় স্বামীজীও এইরকম অপূর্ব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মূর্ত উদাহরণ। তিনি প্রতিটি বিষয় যাচাই করে দেখে তবে গ্রহণ করতেন। অনেকেরই জানা আছে যে, তাঁর মহান্ আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ একবার বলেছিলেন, আমি বলেছি বলে কোন কিছু মেনে নিবি না। নিজে পরীক্ষা করে, যাচাই করে দেখে, যদি যুক্তিসঙ্গত ও ফলপ্রসূ বলে মনে হয় তবেই গ্রহণ করবি। শৈশব থেকেই স্বামীজীর মধ্যে এই প্রবণতা ছিল। কেউ কিছু বললেই তিনি তা গ্রহণ করতেন না, সে তিনি গুরুজন বা নামী ব্যক্তি যেই হোন না কেন। উক্ত উক্তি বা মতের মধ্যে কোন সত্য নিহিত রয়েছে কি না তিনি নিজে তা যাচাই করে দেখতেন। অতএব স্বামীজী বৈজ্ঞানিক মন নিয়েই জন্মেছিলেন। শুধু বস্তুজগতের পর্যবেক্ষণের মধ্যে তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকত না, তাঁর সত্যসন্ধানী দৃষ্টি দ্রষ্টার অন্তরের গভীরে চলে যেত। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ডঃ রামান্নাও এই বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেন, আমরা দৃশ্যজগতের পর্যবেক্ষণের উপর যতটা গুরুত্ব দিই দ্রষ্টার প্রতি ততটা দিই না। স্বামীজী এইটিই করেছেন। তিনি মনে করতেন, দ্রষ্টাকেও সমানভাবে এমনকি তার চেয়েও বেশি করে জানতে হবে, কারণ তিনিই সমস্ত জ্ঞানের মূল। দ্রষ্টাকে জানবার এই যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আমরা যথোচিত গুরুত্ব দিচ্ছি না, তার কারণ এই পদ্ধতি সকলের কাছে সহজবোধ্য নয়। এমন অনেক ভাব আছে যা অপরকে বোঝানো যায় না বা অপরের মনে সহজে সঞ্চারিত করা যায় না। এই পদ্ধতির এটাই অসুবিধা। কিন্তু যাঁদের দৃষ্টি স্বচ্ছ, ধারণা পরিষ্কার, যাঁরা আন্তরিকভাবে অধ্যবসায়ী তাঁরাই কেবল এই পথ অনুসরণ করতে পারেন এবং তাঁরাই গবেষণা করে মহান্ সত্যসমূহ আবিষ্কার করেছেন। এইভাবেই সব সত্য এমনকি বৈজ্ঞানিক সত্যগুলিও আবিষ্কৃত হয়েছে। সুতরাং বিজ্ঞানকে বুঝতে হবে, কারণ সেটাই হবে দর্শনের ভিত্তি। দর্শন শুধু অনুমানভিত্তিক হলে চলবে না। শুধু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নয়, স্বজ্ঞার (intuition) আলোকে দর্শনের তত্ত্বজ্ঞানকে পরীক্ষা করে নিতে হবে, এবং সেটাই হবে তার সঞ্জীবনী শক্তি। বিজ্ঞান, ধর্ম বা দর্শনের ক্ষেত্রে সত্যলাভের জন্য স্বামীজী এই অনুসন্ধিৎসার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এটা কেবল বৌদ্ধিক আলোচনার ব্যাপার নয়, একে বাস্তবায়িত করে জীবনে প্রতিফলিত করতে স্বামীজী বলেছিলেন। পরিণামে এটাই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সোপান।

৩

মার্কিন জীবনে স্বামীজীর প্রভাব—এই প্রসঙ্গে অনেক কিছু বলার আছে। বেশি গভীরে না প্রবেশ করে এটুকু বলতে পারা যায় যে, স্বামীজী কোন কিছুই ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে দেখতেন না

তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিষয়ের একেবারে গভীরে প্রবেশ করত। অনুন্নত, হৃতভাগ্য, পদদলিত মানুষের কাছে আমেরিকা স্বর্গতুল্য এভাবেই তিনি আমেরিকাকে দেখেছিলেন। আমেরিকাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা পূর্ণ মর্যাদায় স্বীকৃত, যা আমেরিকার শ্রেষ্ঠ অবদান। স্বামীজী বলতেন, শুধু সামাজিক জীবনে স্বাধীন হলেই হবে না, আরও গভীরে প্রবেশ করে আত্মসত্তাকে জানতে হবে। বাহ্যজগতের চেয়ে অন্তর্জগতের গুরুত্ব সমধিক হওয়া উচিত। এরই উপর স্বামীজী বেশি জোর দেন। এজন্যই আমেরিকার অনেককিছুর তিনি প্রশংসা করেছেন। আবার সমগ্র মানবজাতির সমান উন্নতিসাধনের পক্ষে যা পরিপন্থী সে-সব বিষয়ের তিনি সমালোচনাও করেছেন। এভাবেই যদি আমরা অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ—এই উভয় জগৎকে জানতে পারি এবং উভয়ের মধ্যে যে নিগূঢ় সম্পর্ক তা বুঝতে চেষ্টা করি, তাহলে আমরা পূর্ণ জীবনের অধিকারী হব এবং বিশ্বশান্তিও নিকটতর হবে।

সময় সংক্ষিপ্ত, তাই এ-বিষয়ে বেশি বলা সম্ভব নয়। আমি দুঃখিত, হয়তো এই ক্ষুদ্র ভাষণ আপনাদের তৃপ্ত করতে পারবে না, কিন্তু আমি নিরুপায়। আশা করি, এই আলোচনা আমাদের সমস্যার গভীর থেকে গভীরতর স্তরে যেতে প্রণোদিত করবে এবং লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য উন্নততর উপায়ের সন্ধানে অনুপ্রেরিত করবে। এই আলোচনা কেবল আমাদের দেশকে নয়, সমগ্র বিশ্বকে পথ দেখাবে।*

* বিগত ২৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫, বেলুড়মঠ-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় যুবসম্মেলনের বৈকালিক বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের ইংরেজী ভাষণের সংক্ষেপিত তর্জমা।

মুখোমুখী আত্মসম্বোধন

ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী

এ তো শুধু লেখা নয়, লিখে লিখে নিজেকেই জানা—
নিভৃত পাপড়ি খুলে মর্মকোষ মুখোমুখী দেখা,
গোপুরম্ মণ্ডপম্ পার হয়ে সঙ্গোপন গর্ভগৃহে যাওয়া,
গুপ্তপথে আবিষ্কৃত আনন্দসরের নীরে নগ্ন নিমজ্জন।
যত লিখি কথাগুলি ডানা মেলে মেলে জানার দিগন্ত থেকে
নিয়ে যায় স্তব্ধ অজানার সঙ্গহারা তীরে। পিছনের দুঃখসুখ
অনুভব যত কণ্টকে কুসুমে কীটে পঞ্চদীপ আরতি সাজায়ে
ঊর্ধ্বমুখে জ্বলে, জ্বলে-নেভে, আর তার আলো অকস্মাৎ
উদ্ভাসিত করে নব নব দিগন্তের অদেখা জগৎ
আর অশ্রুত বারতা। আর, এরই মধ্যে পিছুটানে নিজের মধ্যেই
কত বোঝাপড়া খাদভরা সেতু গড়া—কত না বিরূপ
মুখোমুখী এসে স্বরূপকে দেখে নব নব কলেবরে।
লেখা শুধু লেখা নয়—মুখোমুখী আত্মসম্বোধন।

কক্ষচ্যুত জ্যোতিষ্ক

শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ চারিদিকে শুধু নীরন্ধ্র অন্ধকার—
পুঞ্জিত বিষাক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস চেপে আসে,
নাভিশ্বাস ওঠে।
অনর্থক আলেয়ার পশ্চাতে ঘুরে আজ আমরা ক্লান্ত,
চোরাবালির মিথ্যা প্রলোভনে প্রবঞ্চিত।
তাই আমাদের এই মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে কে দেবে আজ
বাঁচার সঞ্জীবনী সুধা,
কে আছে এমন সেই মুক্তিদাতা ঋত্বিক ?...
আছে, শুধু একজন আছে।
যে একদিন কক্ষচ্যুত জ্যোতিষ্কের মতো
নেমে এসেছিল এই পৃথিবীর মাটিতে,
শুধু স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলো দিতে।
যার প্রদীপ্ত বাণী একদিন আসমুদ্র হিমাচলে
ছড়াল আলোর স্ফুলিঙ্গ,
যার দুর্বার কর্মধারায় নিষ্প্রাণ জড়তার মাঝে এল
অফুরন্ত উদ্দাম বন্যা,
যার প্রোজ্জ্বল চেতনার প্রবাহ
বিদ্যুৎ তরঙ্গিত হল হিমাবৃত বদ্ধ অন্ধকূপে।
তাই, তাকে হৃদয়ের প্রান্তদেশে গভীর অনুধ্যান করো—
মনোবীক্ষণের দর্পণে সে ছিল, সে আজও আছে,
শাশ্বত বাঙ্ময়
আর অক্ষয় কর্মময় রূপে আমাদের একান্ত কাছে।
এই ভয়ঙ্কর তমিস্র যুগসঙ্কটে
সেই আছে একমাত্র অনির্বাণ ধ্রুবতারা—
দিগ্‌ভ্রষ্টকে দেখাবে স্বচ্ছ আলোর নিশানা।
কালোত্তীর্ণ যুগযুগান্ত সে-যে আলোকের দূত,
পরিত্রাতা—বীরেশ্বর বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান ভারত

স্বামী আত্মস্থানন্দ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত গৌরবময় ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারতবর্ষের আর্য-সংস্কৃতি এক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিল। ইংরেজ-শাসনে বিদেশী সভ্যতার শিক্ষা-প্রভাবে ভারতবর্ষের মানুষ তাঁর নিজ সুপ্রাচীন সভ্যতার প্রতি সন্দিহান হয়ে উঠেছিল। নিজের সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে ভুলতে আরম্ভ করল, অপবাদ দিতে লাগল। পাশ্চাত্য সভ্যতা যে শ্রেষ্ঠ—তারই চাকচিক্যের মোহে নিজেরা জড়িয়ে পড়ল। এই সময় ভারতীয় সভ্যতাকে এই পাশ্চাত্য মোহ থেকে রক্ষা করবার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে নানান ধর্ম আন্দোলনের ঢেউ একটার পর একটা আসতে লাগল। কিন্তু পুরোপুরিভাবে কেউ সফলকাম হলেন না। আর ঠিক এই সময় পাশ্চাত্য সভ্যতার পীঠভূমি কলিকাতার কাছেই দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়িতে মা ভবতারিণীর কৃপায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সর্বধর্মের সর্বসাধনায় সিদ্ধ হয়ে যে-ধর্ম আন্দোলনের প্রবর্তন করেছিলেন, সেই ধর্ম আন্দোলন ভারতীয় সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল, প্রতিহত হয়েছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত। স্বামী বিবেকানন্দও এই সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে পথ দেখিয়ে গেছেন। বর্তমান ভারতের তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক।

বিবেকানন্দ তাঁর প্রখর বুদ্ধিমত্তা, অলৌকিক প্রজ্ঞা ও অসাধারণ অনুসন্ধিৎসা দ্বারা ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের ইতিহাস অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি ভারতের অতীত গৌরবকে ভোলেননি। বরং ভারতবাসীরা এই মহিমময় সুপ্রাচীন সংস্কৃতিকে ভুলতে বসেছে বলেই তাদের এত অধঃপতন, হীনম্মন্যতা। তাঁর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ ছিল—"সমগ্র মানব-জাতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর—ইহাই ভারতীয় জীবন-সাধনার মূলমন্ত্র, ভারতের চিরন্তন সঙ্গীতের মূল সুর, ভারতীয় সত্তার মেরুদণ্ড-স্বরূপ। ভারতীয়তার ভিত্তি, ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান প্রেরণা ও বাণী। তাতার, তুর্কী, মোগল, ইংরেজ—কাহারও শাসন-কালেই ভারতের জীবনসাধনা এই আদর্শ হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই।" তাই ভোগসর্বস্ব পাশ্চাত্য-ভূমিতে দীর্ঘ কয়েক বছর কাটানোর পরও স্বামীজীর কাছে ভারতবর্ষের প্রতিটি ধূলিকণা ছিল পবিত্র। বৈদিক ঋষিদের অনুভূত সত্য, মহাপুরুষদের বাণী, সাধু-সন্তদের উপদেশ যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

ভারতের ইতিহাস আলোচনা করে স্বামীজী বলেছেন, ধর্মই হল ভারতের মেরুদণ্ড। সেই আবহমানকাল হতে ভারত ধর্মকে আশ্রয় করে বড় হয়েছে। বলেছেন তিনি, "এখন বুঝতে পারছ তো, এ রাক্ষসীর প্রাণপাখিটি কোথায়? —ধর্মে। সেইটির নাশ কেউ করতে পারেনি বলেই জাতটা এত সয়ে এখনও বেঁচে আছে।" "ভারতে কিন্তু ধর্ম জাতীয়জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ, উহাই যেন জাতীয়জীবন-সঙ্গীতের প্রধান সুর। আর যদি কোন জাতি তাহার এই স্বাভাবিক জীবনীশক্তি—শত শতাব্দী ধরিয়া যেদিকে উহার বিশেষ গতি হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করে এবং যদি সেই চেষ্টায় কৃতকার্য হয়, তবে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।…এই জগতে প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ পথ বাছিয়া লয়, প্রত্যেক জাতিও সেইরূপ। আমরা শত শত যুগ পূর্বে

নিজেদের পথ বাছিয়া লইয়াছি,এখন আমাদিগকে তদনুসারে চলিতেই হইবে।" "এইটি বেশ স্মরণ রাখিবে, তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য-জাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে।" "জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধক্‌ধক্ করছে, ওপরে ছাই চাপা পড়েছে মাত্র। আর দেখবে যে, এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম, আর তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান—এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয় তো হবে, নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার।" রাজনীতিও করতে হবে ধর্মের মাধ্যমে। রাজনীতি মানুষের জীবনে সর্বস্ব হতে পারে না, অঙ্গমাত্র। ধর্মই মানুষের যথার্থতা আনতে পারে। ধার্মিক মানুষ যদি রাজনীতি করে, তবেই সেটি হবে সুষ্ঠু রাজনীতি। তখন রাজনীতি পঙ্কিল আবর্তে ডুবে যাবে না। তাই স্বামীজী বলেছেন, "তোমরা ধর্মকে কেন্দ্র না করিয়া, ধর্মকেই জাতীয়জীবনের প্রাণশক্তি না করিয়া রাজনীতি সমাজনীতি বা অন্য কিছুকে উহার স্থলে বসাও, তবে তাহার ফল হইবে এই যে, তোমরা একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।"

ধর্মের মধ্যে যে কুসংস্কার, গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা সেইটি দূর করেছেন স্বামীজী। ধর্মের নামে অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা ও অধিকারের তারতম্য সৃষ্টি করা প্রকৃতপক্ষে ধর্মধ্বংসী, আত্মঘাতী ও মানবিকতার বিপরীত পশুভাব। মানুষের মধ্যে দেবত্ব রয়েছে তার উন্মোচনকে ধর্ম বলছেন স্বামীজী। মানুষের মধ্যে দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে, সে মানুষের দ্বারা কোনমতেই মারামারি, হানাহানি, দ্বেষাদ্বেষি, পরস্পরের বিরোধিতা সম্ভব নয়। তখনই একতা আসবে। বিভেদ কখনই আসবে না। দেবত্বে উন্নীত মানুষ যদি রাজনীতি করে, তাহলে সে দেশকে মঙ্গলের পথে নিয়ে যাবে, কল্যাণের দিকে নিয়ে যাবে। সেই হবে প্রকৃত নাগরিক। রাজনীতি মানুষকে কোনমতেই যথার্থতার পথে নিয়ে যাবে না।

স্বাধীনতা লাভের পর এ পর্যন্ত ভারতবর্ষে বিভিন্ন দিকে নানান উন্নতি হয়েছে। গ্রাম শহরে পরিণত হয়েছে, শহর রূপান্তরিত হয়েছে নগরে, স্থাপিত হয়েছে বিরাট বিরাট কল-কারখানা, শিল্পালয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, যন্ত্রালয়, প্রভৃত চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে বিজ্ঞানের, চিকিৎসার, সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল ও কলেজের, বড় বড় পাঁচশালা পরিকল্পনা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত মানুষ তৈরি করার কোন পরিকল্পনা করা হয়নি, একেবারে নজর দেওয়া হয়নি, কোন চিন্তা-ভাবনাও করা হয়নি। তাই ভারতবর্ষ সর্ববিষয়ে উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হলেও মানুষের নৈতিকতা, মানুষের মূল্যবোধ, মানুষের চারিত্রিক দৃঢ়তা, মানুষের সদ্‌গুণ—এগুলির অভাব একান্তভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। যার ফলে আজকে চতুর্দিকে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে, হানাহানি করছে পরস্পরের মধ্যে, অপরকে বঞ্চিত করতে কুণ্ঠাবোধ করে না, জাতীয় সম্পত্তি নষ্ট করতে একটুও চিন্তা করে না, ট্রামে-ট্রেনে-বাসে টিকিট কাটে না, ঘুষ ছাড়া কাজ চলে না ইত্যাদি। তাই আমাদের নজর দিতে হবে মানুষ গড়ার দিকে।

বহু আগে স্বামীজী বারবার বলেছেন মানুষ গড়ার কথা। তাঁর বক্তৃতা ও চিঠিপত্রে আমরা এই মানুষ গড়ার কথা পাই। তাই স্বামীজী বলেছেন, "মানুষ চাই, মানুষ চাই, আর সব হইয়া যাইবে। বীর্যবান, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী,

বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়।" "এস, মানুষ হও।...নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তাহলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য—উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেও না—অতি প্রিয় আত্মীয়-স্বজন কাঁদুক, পেছনে চেও না। সামনে এগিয়ে যাও।"

প্রকৃত মানুষ কখনও অপর মানুষকে খুন করতে পারে না। সে যদি দেখে যাকে খুন করছি, সে তার নিজেরই প্রতিরূপ, তাহলে সে কাকে খুন করবে? "প্রত্যেক নরনারীকে--সকলকেই ঈশ্বর-দৃষ্টিতে দেখিতে থাকো।" "আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন, তাছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই।"—বলেছেন স্বামীজী। তাই দেখি, স্বামীজীর সাধনা, তপস্যা, প্রব্রজ্যা—সবকিছুই মানুষকে নিয়েই হয়েছে।

মানুষ গড়তে হলে যথার্থ শিক্ষা চাই। প্রতিটি মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষার দ্বারাই মানুষ তৈরি করা সম্ভব। "জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন-গঠনের পন্থা।" "আমাদের নিম্নশ্রেণীর জন্য কর্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদের বিনষ্টপ্রায় ব্যক্তিত্ববোধ জাগাইয়া তোলা।...তাহাদিগকে ভাল ভাল ভাব দিতে হইবে। তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে। যাহাতে তাহারা জানিতে পারে—জগতে কোথায় কি হইতেছে। তাহা হইলে তাহারা নিজেদের উদ্ধার নিজেরাই সাধন করিবে। প্রত্যেক জাতি প্রত্যেক নরনারী নিজের উদ্ধার নিজেই সাধন করিয়া থাকে। তাহাদের এইটুকু সাহায্য করিতে হইবে—তাহাদিগকে কতকগুলি উচ্চ ভাব দিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহা কিছু, তাহা উহার ফল-স্বরূপ আপনিই আসিবে। আমাদের কর্তব্য কেবল রাসায়নিক উপাদানগুলিকে একত্র করা—অতঃপর প্রাকৃতিক নিয়মেই উহা দানা বাঁধিবে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য—কেবল তাহাদের মাথায় কতকগুলি ভাব প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া, বাকি যাহা কিছু তাহারা নিজেরাই করিয়া লইবে। ভারতে এই কাজটি করা বিশেষ দরকার"—স্বামীজী বহু আগে আমাদের এ-কথা বলেছেন।

সেইসঙ্গে স্বামীজী নারী জাতির উন্নতি চেয়েছেন। নারী জাতির উন্নতি ছাড়া দেশ এগুতে পারবে না। বলেছেন তিনি, "মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে-দেশে, যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে-দেশ—সে-জাত কখনও বড় হতে পারেনি, কস্মিনকালে পারবেও না।" "অনেক সমস্যা আছে—সমস্যাগুলিও বড় গুরুতর। কিন্তু এমন একটিও সমস্যা নাই, 'শিক্ষা' এই মন্ত্রবলে যাহার সমাধান না হইতে পারে। তোমাদের নারীগণকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও। তারপর তাহারাই বলিবে, কোন্ জাতীয় সংস্কার তাহাদের পক্ষে আবশ্যক। নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে।"

স্বামীজী ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয় করেছেন। ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পরের মধ্যে বিরোধ আছে বলে অনেকে মনে করেন। স্বামীজী আমাদের বারবার দেখিয়ে গেছেন যে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধ নেই। এদুটি পরস্পরের পরিপূরক। দুটির মধ্যে গভীর সামঞ্জস্য আছে।

স্বামীজী আলোচনা করে দেখিয়েছেন, "বিজ্ঞান ও আলোচনার বিষয়রূপে ধর্ম মানবমনের পক্ষে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে বেশি স্বাস্থ্যকর অনুশীলন। অনন্তের জন্য এই অন্বেষণ, অসীমকে ধরা-ছোঁয়ার জন্য এই সংগ্রাম, ইন্দ্রিয়ের সীমা লঙ্ঘন করে জড়কে অতিক্রম করার এবং মানুষের আধ্যাত্মিক স্বরূপকে অভিব্যক্ত করার এই প্রচেষ্টা, অনন্তের সঙ্গে নিজের সত্তাকে মিলিয়ে দেবার এই প্রয়াস—এ-সবই হচ্ছে মানুষের সর্বাধিক কল্যাণকর, সর্বোচ্চ গৌরবময় প্রয়াস।"

ব্যবহারিক জীবন ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে স্বামীজী কোন পার্থক্য দেখতে পাননি। আধ্যাত্মিক মানুষের প্রকাশ হয় ব্যবহারিকে। যে মানুষ আধ্যাত্মিকতা লাভ করেছে তার দ্বারা কোন অকল্যাণকর কাজ হতে পারে না। সে সমাজে শুধুমাত্র কল্যাণকর কাজেই ব্যাপৃত হয়। সমাজের মধ্যে যত বেশি আধ্যাত্মিকতা-সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা হবে, ততই সমাজের মঙ্গল।

স্বামীজী অনুকরণপ্রিয়তার বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি সর্বপ্রযত্নে অনুকরণ পরিহার করতে বলেছেন। সাবধান করে তিনি বলেছেন, "আমাদিগকে এই আর একটি বিশেষ বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে—অপরের অনুকরণ সভ্যতা বা উন্নতির লক্ষণ নহে।…অনুকরণ—হীন কাপুরুষের মতো অনুকরণ কখনই উন্নতির কারণ হয় না, বরং উহা মানুষের ঘোর অধঃপতনের চিহ্ন।"

স্বামীজী শুধুমাত্র ভারতের ছিলেন না। তিনি ছিলেন সমগ্র মানবজাতির। তিনি যেমন ভারতের কথা বলেছেন, তেমনি বলেছেন বিশ্বের কথা। তিনি কোন গোষ্ঠীতে, দেশের মধ্যে আবদ্ধ নন। তাই তাঁর মুখেই শুনতে পাই—"আন্তর্জাতিক সংহতি, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ, আন্তর্জাতিক বিধান—ইহাই এ যুগের মূলমন্ত্র।" **One World.** (এক বিশ্ব)

সর্বশেষে বলি, ধর্মের ভিত্তিতেই আমাদের জাতীয় সংহতি, একতা সম্ভব। ধর্মের ভিত্তিতেই আমাদের বিরোধ মিটবে, পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষের সমাপ্তি ঘটবে। স্বামীজী দৃপ্তকণ্ঠে বলে গেছেন, "মানবজাতির ভাগ্য নির্ধারণকল্পে যেসব শক্তি ক্রিয়াশীল হয়েছে বা এখনও হচ্ছে তাদের মধ্যে কোনটিই, যে শক্তির বিকাশকে আমরা ধর্ম বলি তার চেয়ে বেশি শক্তিমান নিশ্চয় নয়। এই অদ্ভুত শক্তিই সর্ববিধ সামাজিক সংহতির পটভূমি, পরস্পর মিলিত হয়ে থাকার জন্য যা কিছু প্রাণের বিকাশ মানুষের মধ্যে দেখা গেছে, তারও উদ্ভব হয়েছে এই শক্তি হতেই। …মানুষের মনে প্রেরণা জাগাবার জন্য সবচেয়ে বেশি বেগসঞ্চারী শক্তি এটি। আধ্যাত্মিক আদর্শ আমাদের যে-পরিমাণ শক্তি দিতে পারে, সে-পরিমাণ শক্তি আর কোন আদর্শই দিতে পারে না।" তবেই আমরা বলতে পারব—"আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"

জাতীয় সংহতির প্রশ্নে স্বামী বিবেকানন্দ এবং এক্ষেত্রে বিবেকানন্দ-ভাবাদর্শের অনুগামী যুব-নেতৃত্ব

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

১। **বর্তমান পরিস্থিতিতে যুবকদের এগিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা:** ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হয়েছে। তার ফলে, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তানের সৃষ্টি। সেখানেই শেষ নয়, ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতার ৪০ বৎসরের মধ্যে আরও নানা 'স্তান'-এর দাবির সম্মুখীন। আবৃত ও অনাবৃত আকারে সে-দাবি জানানো হচ্ছে। যথা, খালিস্তান, অহোমস্তান, ঝাড়খণ্ড-স্তান, গুর্খাস্তান, উর্দুস্তান, ইত্যাদি ইত্যাদি। স্বাধীন নাগাস্তান (খ্রীষ্টানস্তান) তো দীর্ঘদিনের দাবি ও সংঘর্ষের বিষয়। এর উপর নানা আঞ্চলিক স্বাধিকারের দাবি রয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, অবস্থা শোচনীয়।

ভারতবর্ষ তাই এখন কঠিনতম সংকটের সম্মুখীন। এখন প্রয়োজন—যুবশক্তির এগিয়ে আসা, ঐক্যবদ্ধভাবে, মাতৃভূমিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য। তাঁদের সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের ছিল বিপুল আশা। তাঁদের উপরে তিনি অর্পণ করেছিলেন দেশ ও দেশবাসীর জন্য তাঁর বিরাট হৃদয়ের ভালবাসা। নিজের বুকের রক্তে ডোবানো এই শব্দগুলি তিনি যুবকদের উদ্দেশ্যেই উচ্চারণ করেছিলেন:

> "লক্ষ লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, ঈশ্বরে অনন্ত বিশ্বাসের বর্মে সজ্জিত হয়ে, দরিদ্র, পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতির সিংহ-বিক্রমে বুক বাঁধুক। তারা ছড়িয়ে পড়ুক ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। তারা দ্বারে দ্বারে প্রচার করুক মুক্তির বার্তা—সেবা ও সামাজিক উত্থানের বার্তা। তারা প্রচার করুক—সাম্যের বার্তা।"

সকল বিবরণ থেকে একথা স্পষ্টভাবে দেখা যায়, বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে যুব-আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন। সহস্র-সহস্র যুবক তাঁর চতুর্দিকে সমবেত হয়েছিলেন, তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিয়েছিলেন। তাঁদের অনেকে তাঁর আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। মহাত্মা গান্ধী থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত সকল মহান্ ভারতীয় সংগ্রামী একথা স্বীকার করেছেন। স্বাধীনতার পরে বিবেকানন্দের প্রয়োজন একবিন্দুও কমেনি, বরং অধিকতর তীব্র জরুরী আকারে তা উপস্থিত। বর্তমান ভারতবর্ষ কি ঐক্যবদ্ধ থেকে উন্নতির পথে অগ্রসর হবে? একমাত্র ভারতবর্ষের যুবকগণই তার উত্তরে বলতে সমর্থ—হাঁ, নিশ্চয়ই, তা হতেই হবে। তাঁরাই বলতে পারবেন—আমরা স্বামীজীর সন্তান; স্বামীজী আমাদের বিশ্বাস করেছেন; এবং স্বামীজীর অনন্ত বিশ্বাস ছিল ভারতবর্ষের সম্বন্ধে। তাঁর বিশ্বাসই আমাদের ধর্ম। ভারতবর্ষ আমাদের—চিরকালের জন্য ভারতবর্ষ আমাদের থাকবে।

২। **স্বামীজী কিভাবে তাঁর কালের সংহতি-সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন?** দুভাবে স্বামীজী তার সম্মুখীন হন: প্রথম, তিনি ভারতের সুমহান্ ঐতিহ্যের রত্নাগার উন্মোচন করেছিলেন; দ্বিতীয়, বিভেদ-বোধের কারণ-গুলিকে চিহ্নিত করে তাদের প্রতিরোধ করার পথ দেখিয়েছিলেন।

৩। **ভারত-গৌরবের ইতিহাস:**

স্বামীজী ভারতবাসীকে অনুভব করিয়ে দিয়েছিলেন—ভারতীয় হওয়া গৌরবের বিষয়; তিনি অনুভব করিয়েছিলেন—জাতি, বর্ণ, ধর্ম, ও সামাজিক অবস্থার পার্থক্য সত্ত্বেও সকল ভারতবাসী পরস্পর ভ্রাতা ও ভগিনী। এই অনুভূতি না জাগলে ভারতে কোন জাতীয়তা-বোধই সম্ভব নয়। জাতীয়তাবোধের জন্য ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে গভীর ভালবাসা একান্ত প্রয়োজন। উনিশ শতকের শেষে ঐ ভাবোন্মাদনা জাগ্রত করে তিনি "জাতীয়তার প্রবলতম অনুভূতি সৃষ্টি করেছিলেন" —একথা বলেছেন অ্যানী বেসান্ত। এই কার্য সম্পাদনের সর্বোচ্চ যোগ্যতা স্বামীজীর ছিল। কারণ তিনি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হতে অধ্যাত্ম-শিক্ষা পেয়েছেন, যাঁর বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা/ ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।/ তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে / নূতন তীর্থরূপ নিল এ-জগতে।" এই বিপুল অধ্যাত্ম-সম্পদে সম্পন্ন বিবেকানন্দ, সমগ্র ভারতবর্ষ পরিক্রমণ করেছেন, প্রায়শই পদব্রজে; দেখেছেন, কিভাবে সাধারণ মানুষের জীবনে ভারতের সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত ও সংরক্ষিত হয়ে আছে। পরিব্রাজক জীবনের পূর্বে ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর ছিল সাধারণ ভালবাসা। পরে তিনি হয়ে দাঁড়ালেন—ভারত-প্রেমিক। ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, ভারতই স্বামীজীর সানুরাগ অর্চনার মহারানী। বিলাস, বৈভব ও প্রাচুর্যের পাশ্চাত্য-দেশ থেকে দরিদ্র পদদলিত জীর্ণ শীর্ণ ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পরে স্বামীজী বলেছিলেন, "এই পৃথিবীতে পুণ্যভূমি বলে যদি কোন দেশ থাকে—সে এই ভারতবর্ষ।" ভারতবর্ষ—এই শব্দটিই স্বামীজীর কাছে পবিত্র মন্ত্র। "আমাদের ভারত-প্রেমের সূত্রপাত," সিস্টার ক্রিস্টিন লিখেছেন, "যখন আমি তাঁকে তাঁর অপূর্ব কণ্ঠে ভা-র-ত-ব-র্ষ শব্দটি উচ্চারণ করতে শুনেছিলাম। পাঁচ অক্ষরের কোন একটি শব্দের মধ্যে যে এতখানি ভাব প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায়, তা কল্পনাতীত ছিল। তার মধ্যে ছিল ভালবাসা, বাসনা, গর্ব, আকাঙ্ক্ষা, বন্দনা, বেদনা, শৌর্য—এবং পুনশ্চ ভালবাসা।"

সংক্ষিপ্ত পরিসরে স্বামীজী-উন্মোচিত ভারতীয় সংস্কৃতির বহুমুখ রূপের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। এইটুকু এখানে বলতে পারি, অপূর্ব তার বিচিত্র রূপ, অনন্ত তার ঐশ্বর্য, প্রাণে ও শক্তিতে তা নিত্য স্পন্দিত।

৪। স্বামীজীর কালে বিভেদকর শক্তিসমূহের প্রকৃতি: স্বামীজী কিভাবে তাদের সম্মুখীন হয়েছেন?

(ক) হিন্দুসমাজে তার রূপ: জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা সর্বাধিক ভেদকারী। এদের বিরুদ্ধে স্বামীজীর যুদ্ধঘোষণার আকার সুপরিচিত। মহাত্মা গান্ধী তাঁর হরিজন আন্দোলনে স্বামীজীর দ্বারা প্রভাবিত। বিবেকানন্দের দ্বারা ব্যবহৃত "দলিত হিন্দু" কথাকে তিনি গ্রহণ করেছেন—"অনুন্নত হিন্দু"-র পরিবর্তে। গান্ধীজী বলেছেন, "আমরা আমাদের ভ্রাতৃগণকে দলিত করে রাখার দোষে দোষী। আমরা তাদের বুকে হাঁটতে বাধ্য করেছি; মাটিতে নাক খত দিতে বাধ্য করেছি; রাগে চোখ লাল করে তাদের ট্রেনের কামরা থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছি।... স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, অস্পৃশ্যরা অনুন্নত নয়, হিন্দুরা তাদের বিদলিত করেছে। তাদের দলিত করে নিজেরাই তারা দলিত হয়েছে অন্যের দ্বারা।"

(খ) হিন্দু ও মুসলমান সমস্যা: মুসলমান ভ্রাতৃগণের বিষয়ে স্বামীজীর ছিল বিপুল ভালবাসা। ইসলামী সংস্কৃতির তিনি বিশেষ সমঝদার। একশো বছর আগে, রক্ষণশীল ভারতবর্ষে, তিনি

খোলাখুলি মুসলমানদের সঙ্গে আহার করেছেন, যা তখন কল্পনাতীত ছিল। "কাশ্মীরে মুসলমান মাঝির ছোট্ট মেয়েটিকে উমা রূপে পূজা করেছেন।" তাঁর ভাব-নয়নে ভেসে উঠেছে—"এই সংঘাত কোলাহলের ভিতর থেকে জাগছে ভবিষ্যতের সর্বাঙ্গসম্পন্ন ভারতবর্ষ; দুর্ভেদ্য, গৌরবময়; বৈদান্তিক তার মস্তিষ্ক এবং ঐস্লামিক তার দেহ।"

(গ) হিন্দু ও খ্রীষ্টান সমস্যা: ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে খ্রীষ্টান মিশনারিদের কুৎসা-প্রচারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ স্বামীজী করেছেন। প্ররোচনার দ্বারা ধর্মান্তরকরণের তিনি দারুণ বিরোধী। একই সঙ্গে তিনি যীশু-খ্রীষ্টের পরম অনুরাগী। স্বামীজী একবার বলেছিলেন, "আমি যদি নাজারেথের যীশুর কালে জুডায় থাকতাম তাহলে চোখের জলে নয়, বুকের রক্তে তাঁর পা ধুইয়ে দিতাম।" আমেরিকায় এক গির্জায় সমবেত প্রার্থনার কালে বেদীর উপরে স্থাপিত খ্রীষ্টমূর্তির সামনে সকলের সঙ্গে তিনি নতজানু নতমস্তক হয়েছিলেন, এবং পার্শ্ববর্তী খ্রীষ্টান নারীকে মৃদুস্বরে বলেছিলেন, "সেই একই প্রভু ও ঈশ্বরকে আমরা উভয়েই পূজা করি।"

চিকাগোর ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর ভাষণ কেবল "হিন্দুধর্মের মহাসনদ" নয়, তা একইসঙ্গে সর্বজনীন ধর্মের মহাসনদ। সেখানে তিনি বলেছিলেন, "কোন খ্রীষ্টান হিন্দু হোক, আমি কি তাই চাই? ঈশ্বর রক্ষা করুন। কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ খ্রীষ্টান হোক, তাই কি আমি চাই? ঈশ্বর রক্ষা করুন।" তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন, "প্রতি ধর্মের পতাকার উপরে প্রতিরোধ সত্ত্বেও শীঘ্রই লেখা হবে: সংঘাত নয়—সহায়তা; বিনাশ নয়—গ্রহণ; মতদ্বন্দ্ব নয়—শান্তি ও সমন্বয়।"

(ঘ) শিখ সমস্যা: যে-শিখ সমস্যা অতি সম্প্রতি বিপুলায়তন গ্রহণ করে, ভারতের সংহতিকে বিপন্ন করে তুলেছে, তার মূলোদ্গম কিন্তু হয়েছিল উনিশ শতকের শেষ ভাগেই। ঐ পর্যায়েই বিবেকানন্দ তার বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। পাঞ্জাবের সমকালের সংবাদপত্র অনুসন্ধানের কালে দেখেছি—হিন্দু সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শিখদের প্রতিক্রিয়া মোটেই স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না—বৃটিশ শাসকগণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাকে খুঁচিয়ে জাগিয়েছিল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব সফরকালে স্বামীজী দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্প্রীতি সৃষ্টির জন্য যথাসাধ্য করেছিলেন। উভয় সম্প্রদায়ের সমভাবনার উপর তিনি জোর দিয়েছিলেন। পঞ্চনদের দেশের গৌরবগান করে তিনি গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দ সিংহ সম্বন্ধে শ্রদ্ধার সঙ্গে অনেক কিছু বলেন। স্বামীজী বলেছিলেন, "এই ভূমিতেই গুরু নানকের প্রশস্ত হৃদয় উন্মোচিত হয়েছিল, তাঁর বাহু প্রসারিত হয়েছিল সমগ্র জগৎ আলিঙ্গন করবার জন্য। কেবল হিন্দুদের নয়, মুসলমানদের গ্রহণ করবার জন্য তা প্রসারিত ছিল। এই ভূমিতেই আমাদের জাতির সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বীরগণের অন্যতম গুরু গোবিন্দ সিংহ, স্বধর্মের জন্য শোণিতপাত করবার পরে,...যখন যাদের জন্য রক্ত ঝরিয়েছিলেন তারাই তাঁকে ত্যাগ করল তখন দক্ষিণদেশে প্রস্থান করেছিলেন মর্মমূলে বিদ্ধ সিংহের মতো মৃত্যুবরণ করতে—কিন্তু স্বদেশের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি।" স্বামীজী ভাবোদ্বেল কণ্ঠে ঐক্যের আবেদন করেছিলেন, "আমি তোমাদের সামনে আচার্য রূপে উপস্থিত হইনি।...আমি এসেছি পূর্বভারত থেকে পশ্চিম ভারতের ভ্রাতৃগণের সঙ্গে প্রীতি-বিনিময় করতে, এসেছি পরস্পরের ভাব-বিনিময় করতে। আমি এসেছি আমাদের

মতপার্থক্যের হিসাব কষতে নয়—কোথায় আমরা একমত, তাই সন্ধান করতে। কোন্ ভিত্তিতে আমরা সর্বদা ভ্রাতা রূপে অবস্থান করতে পারি, তাই বুঝতে এসেছি।···এখানে আমি গঠনমূলক কিছু প্রস্তাব করতে চাই—ধ্বংসাত্মক কিছু নয়।" তারপরে স্বামীজী হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি-সমূহের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভাষণ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে তিনি দেখিয়েছিলেন—বিভাগ, উপ-বিভাগসহ সকল ধর্মই এক সত্যের নানামুখী বিস্তার।

(৬) উত্তরভারত ও দক্ষিণভারতের তথাকথিত সাংস্কৃতিক পার্থক্য : দক্ষিণভারতের অধিবাসীদের পৃথক জাতিগত প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রচারও উনিশ শতকের নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় শুরু হয় এবং তার মূলেও ছিলেন জনৈক মিশনারি—বিশপ কল্ডওয়েল। স্বামীজী আধুনিক ভারতের তামিলদের কেবল নয়, আর্যদের পৃথক জাতি-প্রকৃতিকেও স্বীকার করেননি। 'আর্য ও তামিল' নামক তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন—'আর্য' একটি বিশেষ সংস্কৃতির সূচক শব্দ—যা সমগ্র ভারতে বিস্তৃত ছিল। সকলেই আর্য—সংস্কৃতভাষী, তামিলভাষী বা অন্য ভাষা-ভাষী যেই হোক না কেন। স্বামীজী ভাষা ও জাতির মধ্যে অবিভাজ্য সম্পর্ক স্বীকার করেননি। তাই তিনি হিন্দু-আর্য এবং হিন্দু-তামিলদের অহংকৃত পার্থক্যবোধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে দেখিয়েছেন—ভারতবর্ষে অগণিত জাতি উপজাতির রক্তমিশ্রণ ঘটেছে যার ফলে ভারতবর্ষ "একেবারে একটি নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহ-শালা" হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বামীজী বলেছেন, "সংস্কৃতভাষী আমাদের বৈদিক পূর্বপুরুষদের জন্য আমরা গর্বিত ; ভারতবর্ষের সর্বপ্রাচীন সভ্যতার সন্তান বলে পরিজ্ঞাত তামিলভাষী পূর্বপুরুষগণের জন্য আমরা গর্বিত।" স্বামীজী সেখানেই থামেননি। আর্য ও তামিল, উভয় পক্ষের বৃথা গর্বের মূলে আঘাত করে তারপর বলেছেন, "আমরা ঐ উভয়ের থেকে প্রাচীন কোন পূর্ব-পুরুষদের জন্য গর্বিত। আমরা গর্বিত সেইসকল পূর্বপুরুষদের জন্য যাঁরা পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতেন।" যা-কিছু ভারতীয়, যা-কিছু মানবীয়—তাদের জন্যই স্বামীজীর গর্ব-গৌরব। "আমরা জন্মেছি—কাজ করেছি—যন্ত্রণা সয়েছি—তার জন্য আমরা গর্বিত।"

৫। সর্বাধিক বিভেদকর—সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য : ধর্মীয়, ভাষাগত, জাতিগত সংঘাত বলে যা আপাতত প্রতীয়মান হয়, তাদের অধিকাংশের ভিত্তিতে আছে অর্থনৈতিক অসাম্য। ভারতীয় পটভূমিকায় অবশ্য সাংস্কৃতিক বৈষম্যকে (প্রধানত জাতিপ্রথার উপর যা নির্ভরশীল) বিশেষ সংহতিনাশক শক্তি বলে স্বীকার করতে হবে। স্বামীজী তাঁর বিরাট মনীষা ও বিরাট হৃদয়ের শক্তি নিয়ে এদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আঘাত হেনেছেন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 'বংশানুক্রমিক উদ্বর্তন' তত্ত্বকে তিনি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, যে-তত্ত্বের পিছনে আছে পৌরোহিত্যের বিশেষ অধিকারবাদ, তৎসহ শ্বেত সাম্রাজ্যবাদীদের কূট কৌশল। তিনি তাই তাঁর মানুষ গড়ার আদর্শের প্রয়োগের ক্ষেত্রে জন্মের উপর গুরুত্ব না দিয়ে পরিবেশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর তিনি বারংবার অর্থনৈতিক সমানাধিকারের জন্য তাগিদ দিয়েছেন। তাঁর শ্রমজীবী শ্রেণীর বন্দনা, সর্ব-শ্রেণীর অবনমিতকে উত্তোলনের জন্য আবেগময় আহ্বান, সমাজতন্ত্রের প্রতি সমর্থন, সারা জগতে শ্রমজীবী উত্থান সম্পর্কে তাঁর দিব্যদ্রষ্টাসুলভ ভবিষ্যদ্বাণী—তাঁর মনোভাবের পরিচয়বাহী। তাঁর মতে, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবল শ্রেণীসংগ্রাম এড়ানো সম্ভব। নিঃসন্দেহে

স্বামীজী মূলে ধর্মের মানুষ, বৈদান্তিক; কিন্তু স্মর্তব্য, তিনি বেদান্তসত্যের বাস্তবে প্রয়োগের পক্ষে প্রথম প্রচারক। তাঁর বেদান্ত বলে, বিশেষাধিকারের ধারণা মানবজীবনের পক্ষে অভিশাপ। কেউই শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বিশেষাধিকারের সমর্থন করার পরে নিজেকে বেদান্তী বলে দাবি করতে পারবে না। তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরও বলেছিলেন, দুটি শক্তি যুগপৎ সক্রিয়। তার একটি বিশেষাধিকার সমর্থন করছে, অন্যটি তাকে ভাঙছে। তিনি যোগ করেছেন—সকল প্রকার অধিকারবাদকে ধ্বংস করাই অদ্বৈতের কাজ।

তরুণ বন্ধুগণ! আপনাদের কাছে জাতীয় সংহতির কয়েকটি দিক ও তাদের সমাধানের সম্ভাব্য পথনির্দেশ কিভাবে স্বামীজীর জীবন ও বাণীর মধ্য থেকে পাওয়া যায়—তা তুলে ধরলাম। আপনারা শুনলেন, কিভাবে স্বামীজী সমস্যাগুলির সামনাসামনি দাঁড়িয়ে মোকাবিলা করতে চেয়েছেন। চিরযৌবনের প্রতীক বিবেকানন্দ!—ভারতের যৌবনশক্তিকে ডাক দিয়েছেন মহৎ কর্মে। ডাক দিয়েছেন—ম্যাপ, গ্লোব, ম্যাজিক লণ্ঠন ইত্যাদি নিয়ে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে গণশিক্ষা বিস্তার করতে—যাতে সাধারণ মানুষ তাদের হারানো ব্যক্তিত্ব ফিরে পায়; যাতে তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে অনুভব করতে পারে—তারা এই দেশের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। সংক্ষেপে বলতে গেলে, যুবকগণ যেন গণচেতনা সৃষ্টির কাজে নেমে পড়েন। নৃত্য, সঙ্গীত, যাত্রা, নাটক, প্রদর্শনী, গোষ্ঠী-সভা, ইত্যাদির দ্বারাও ঐ কাজ তাঁদের করতে হবে।

স্বামীজী চেয়েছিলেন—যুবকরা যেন অনুভব করেন, এবং অপরকে অনুভব করান যে—

(ক) ভারত ধর্মসমূহের ধাত্রী-জননী এবং মহান্ সত্যের আশ্রয়;

(খ) ভারতের অতীত মহান্; এবং ভারতের জন্য অপেক্ষা করে আছে মহত্তর ভবিষ্যৎ;

(গ) সংস্কৃতির বহু বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এই দেশে বর্তমান আছে অখণ্ড ঐক্যসূত্র; সকল ভারতবাসী এক সাধারণ ঐতিহ্যের সন্তান;

(ঘ) ভারতের অধিবাসীরা যেন নিজেদের ভারতীয় জ্ঞান করে; কেবল বাঙালী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, মরাঠি, গুজরাটি ইত্যাদি আঞ্চলিক নামে চিহ্নিত না করে;

(ঙ) প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে ভারতই তার দেহ এবং আত্মা—ভারতের উপর যে-কোন আঘাত তার নিজের শরীরে প্রত্যক্ষ আঘাতের তুল্য;

(চ) আদর্শের জন্য ত্যাগ ও আত্মনিবেদন না করলে সিদ্ধি ঘটবে না; এবং ঠিক বর্তমান মুহূর্তে ভারতের সংহতির অপেক্ষা আত্মোৎসর্গের মহত্তর কোন হেতু নেই।

ভারতের তরুণেরা একদা বিবেকানন্দের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জেগে উঠেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "তোমাদের মাতৃভূমি বলি চায়।" যুবকরা আত্মবলি দিয়েছিলেন। তাঁরা স্বাধীন করেছেন এই দেশকে। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতাই শেষ কথা নয়। যদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা জনগণ না লাভ করে তাহলে জনগণের সংহতি দূর-বস্তু হয়ে থাকবে। এখন যুবকরাই সিদ্ধান্ত করুন—তাঁরা স্বামীজীর 'দর্শন'-কে নিজেদের 'দর্শন' করে তুলবেন কিনা! স্বামীজী বলেছেন, "আমি দিব্যচক্ষে প্রত্যক্ষ করছি—আমাদের সেই প্রাচীনা মাতা আবার জেগে উঠেছেন। নবজীবনে তিনি পূর্বাপেক্ষা জ্যোতির্ময়ী গরীয়সী হয়ে সিংহাসনে বসেছেন।"

বিবেকানন্দের কথা না শোনা খুবই সম্ভব। অনেকেই তাঁর কথা শোনেনি। "হে আমার সন্তানগণ! আমি আমার পরিকল্পনার কথা বলতে এসেছি" ;—স্বামীজী তাঁর বিখ্যাত মাদ্রাজ-বক্তৃতা 'আমার সমরনীতি'-র শেষাংশে বলেছিলেন, "যদি আমার কথা শোনো, তোমাদের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে প্রস্তুত আছি। যদি না শোনো, এমনকি যদি আমাকে পদাঘাতে ভারত থেকে দূর করে দাও—তবু আমি ফিরে এসে বলব—শোনো! আমরা সকলে ডুবছি; আমি তোমাদের মধ্যে এসেছি, যদি ডুবতে হয়, এক সঙ্গে যেন ডুবি।"

আমরা কি স্বামীজীর কথা শুনব না? এমনকি তা শোনার উপরে যদি ভারতের ভাগ্য নির্ভর করে—তবুও শুনব না? যুবকরা কি তাঁকে ব্যর্থ নমস্কারে বিদায় দেবেন?

তরুণ বন্ধুগণ! এর উত্তর আপনারাই দিতে পারেন।*

* ২৪ ডিসেম্বর ১৯৮৫, বেলুড়মঠ- প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় যুবসম্মেলনের বৈকালিক অধিবেশনে লেখকের পঠিত ইংরেজী ভাষণ। লেখক-কৃত অনুবাদ।

কন্যাকুমারীর স্মৃতি

শ্রীবিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এই সেই অপার বিস্ময়!
স্বপ্নের আরাধ্য আর প্রাণের প্রণতি
কন্যাকুমারী।
তোমাকে ঘিরে ইতিহাস কথা বলে
বিবেকানন্দ কিম্বদন্তী হয়
উত্তাল ফেনিল রাশি বয়ে আনে ত্রিমুখী বারতা
তোমার বেদিতলে ধন্য হয় সাগরের গান।
এই সেই শিলাখণ্ড,
যাকে ঘিরে স্মৃতির মন্দির
যে মন্দির প্রতিটি উষায় গ্রহণ করে
সূর্যের আনত প্রণাম।
আর প্রতিটি সন্ধ্যায় আরতির সুর বুক ভরে নিয়ে যায়
অগণন সাগরের ঢেউ।
যে আকাঙ্ক্ষা সত্তাকে ঘিরেছিল এতদিন
আজ উষার প্রথম আলো তাকে দিল সত্যের করুণা
এখানে। কন্যাকুমারীতে।

নতুন শিক্ষানীতি

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নতুন শিক্ষানীতির কথা ভাবছেন। একবিংশ শতাব্দী আসন্ন, দেশকে সেজন্যে প্রস্তুত করা দরকার। এ প্রস্তুতি সম্ভব হবে শিক্ষার দ্বারাই। তাই শিক্ষাকে যতটা সম্ভব যুগোপযোগী করতে সরকার তৎপর। এতদিন শিক্ষা ছিল পুঁথিগত। এই শিক্ষাতে কেরানি তৈরি হয়, কিন্তু কাজের মানুষ তৈরি হয় না। এ-যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার যুগ। শুধু কলম-পেশা মানুষ দিয়ে এ-যুগের সমাজ চলে না। এ-যুগ যন্ত্রের যুগ। শুধু কলকারখানায় নয়, ঘর-সংসারেও যন্ত্র অপরিহার্য। যন্ত্রের সাহায্যে এ-যুগের মানুষ কায়িক পরিশ্রম কমাতে পেরেছে, প্রাত্যহিক জীবন অনেক স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে পেরেছে। একবিংশ শতাব্দীর জীবন আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে, এই সকলের আশা। আজকাল আমাদের দেশেও যন্ত্রের ব্যবহার অনেক বেড়ে গেছে। কৃষির কাজে আজকাল কতরকমের ছোট বড় যন্ত্র ব্যবহার করি আমরা। গৃহস্থালীর কাজেও তাই। যাতায়াতের জন্যেও তাই। এ-সব যন্ত্রপাতি তৈরি করা, আর তাদের চালু রাখা—এজন্যে শিক্ষার প্রয়োজন। অর্থাৎ শুধু কাগজ-কলমের বিদ্যা নয়, কিছু হাতেনাতে কাজ করতে পারাও শেখা চাই। এখন যে শিক্ষা আমরা পাই তা আমাদের ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখে। মাথায় অনেক কিছু আছে, কিন্তু হাতে কিছু নেই। বিজ্ঞান পড়েও অনেকে পাখা খারাপ হলে সারাতে পারে না। সাধারণ যে-সব হাতের কাজ তার জন্যে মিস্ত্রী ডাকতে হয়। বেকার সমস্যার প্রধান কারণ সবাই আমরা আরামের কাজ খুঁজি। আরামের কাজ মানে যে-কাজে কায়িক পরিশ্রম লাগবে না। কেরানির কাজ পেলে খুশি, নিদেন পিয়নের কাজ হলেও চলে। হাতের কাজ শিখলে হয়তো আয় অনেক বেশি করতে পারব, কিন্তু হাতের কাজ করতে অপমান। শিক্ষার দোষেই আমাদের এই মনোবৃত্তি গড়ে উঠেছে। হাতের কাজ কিছু জানা থাকলে আমাদের আর চাকরি খুঁজতে হয় না। নিজেরাই হয়তো ছোটখাট কারখানা খুলতে পারি। আর চাকরি করতে চাইলে তাও সহজে পেয়ে যেতে পারি। দরকার কর্মনিপুণতা। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা আমাদের কোন বিষয়েই নিপুণ করে তোলে না। কেরানিগিরি করতে গেলেও যতটুকু ভাষাজ্ঞান দরকার তাও অনেকে অর্জন করছে না। এ-সব লক্ষ্য করেই সরকার বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে একেবারে ঢেলে সাজাতে চেয়েছেন।

একবিংশ শতাব্দীকে ইলেকট্রোনিক্স-এর শতাব্দী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই শতাব্দীতে ইলেকট্রোনিক্স প্রাধান্য লাভ করবে। সরকার বুঝতে পেরেছেন এই বিজ্ঞান শাখার আনুকূল্যে অনেক নতুন নতুন শিল্প দেশে গড়ে উঠবে। এই সব শিল্প ছোট ও মাঝারি আয়তনের হবে। নিজের ঘরে বসে এবং অল্প মূলধন নিয়েই ছেলেমেয়েরা নানারকমের জিনিস তৈরি করতে পারবে। তাতে তাদের আর বেকার থাকতে হবে না। আবার আমাদের কায়িক পরিশ্রম কমবে এবং দৈনিক জীবনও আরামপ্রদ হবে। তাই সরকার বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানারকমের বৃত্তিমূলক শিক্ষাও ছেলেমেয়েদের দিতে চান। এই শিক্ষা একেবারে মাধ্যমিক স্তর থেকেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। সব দেশেই অধিকাংশ ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে কাজ করতে লেগে যায়। কাজ তারা সঙ্গে সঙ্গে পেয়েও যায়; কারণ তারা

কোন না কোন হাতের কাজে বেশ যোগ্যতা অর্জন করেছে। যারা উচ্চ শিক্ষা পেতে চায় তাদের একদল সরকারী বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি নিয়ে লেখাপড়া করে। কিন্তু আর এক দল—এদের সংখ্যাই বেশি—কাজ করতে করতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। যে-কোন কাজ করতে তারা প্রস্তুত। থালা-বাসন ধোয়া, ঘরদোর পরিষ্কার করা, পরিবেশন করা, মোট বওয়া—যে-কোন কাজ। ধনীর ঘরের ছেলে-মেয়েরাও এ-সব কাজ করতে লজ্জা বোধ করে না। চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স থেকেই ছেলে-মেয়েরা কিছু কিছু অর্থ উপার্জন করতে চেষ্টা করে। স্কুলের পড়া শেষ করেই তারা স্বাধীন। বাবা-মা'র বদান্যতা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে তাদের আত্মসম্মানে লাগে। যদি বাবা-মা'র কাছ থেকে পয়সা নিতে হয়, তাহলে শ্রমের বিনিময়ে তারা নিতে প্রস্তুত। দান হিসেবে নয়। এই আত্মনির্ভরতা, শ্রমশীলতা, বিভিন্ন হাতের কাজে দক্ষতা—এইগুলি শিক্ষার অঙ্গ হওয়া উচিত। এইগুলি অল্প বয়স থেকেই মানুষ অর্জন করতে পারে, বেশি বয়সে অর্জন করা শক্ত।

যদি কেউ মনে করেন, সরকারের নতুন শিক্ষানীতির লক্ষ্য হচ্ছে ছেলেমেয়েদের শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া, তাহলে ভুল করা হবে। সুখের বিষয়, সরকার নৈতিক শিক্ষার উপরেও খুব জোর দিয়েছেন। যতদূর সম্ভব শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করতে তাঁরা চান। তাই ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর ভালভাবে পরিচয় হোক—এটা তাঁরা চান। শিক্ষামন্ত্রকের নতুন নামটি এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। শিক্ষামন্ত্রকের নতুন নাম—'মানবসম্পদ বিকাশের মন্ত্রক'। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—'মানুষ-গড়া'র মন্ত্রক। এই নতুন নামকরণ খুবই অর্থবহ। শিক্ষানীতির মধ্যে স্বামীজীর চিন্তার প্রভাবও সুস্পষ্ট। স্বীকৃতি নেই, তা না থাকুক—'বুদ্ধিমান্, বুঝিয়া লও'।

সরকার নীতি ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখাও ঘোষণা করেছেন। তাঁরা চেয়েছেন যে, এই প্রস্তাবিত নীতি ও শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে দেশের সব মহলে আলোচনা হোক। সকলের মত তাঁরা জানতে চান। শিক্ষা একটা জাতীয় সমস্যা। সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে শিক্ষাকে স্থান দিতে হবে। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে মতের অমিল থাকতে পারে, কিন্তু কেন্দ্র শুধু কেন্দ্রের কথা ভাববে না, রাজ্যও শুধু রাজ্যের কথা ভাববে না, অন্ততঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধু জাতির কিসে মঙ্গল হয় এই চিন্তাই করবে। শিক্ষানীতি যেটা নির্ধারিত হবে, সেটা সমগ্র জাতির শিক্ষানীতি বলে স্বীকৃত হবে। কোন দলের বা দেশের কোন বিশেষ অংশের বা শ্রেণীর নয়। এই সব কথা শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা-দলিলের মুখবন্ধে বলেছেন। তাঁর শেষ কথা: 'এই দলিলে যা বলা আছে তা কিন্তু চূড়ান্ত নয়। এ শুধু মৌল কথা। এই মৌল কথা নিয়ে দেশ-জোড়া তর্ক-বিতর্ক চলুক। এই তর্ক-বিতর্কের মধ্যে দিয়ে নতুন শিক্ষানীতি রূপ নেবে—এই আমাদের আকাঙ্ক্ষা।'

শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা

মূল কয়েকটি নীতিকে অবলম্বন করে এই শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা তৈরি হয়েছে। এই নীতিগুলি হল:

১। প্রাথমিক শিক্ষা প্রত্যেককে দিতে হবে।

২। মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থাও থাকবে। পৃথক্ বৃত্তি-মূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও থাকবে। যারা চাইবে তারা সাধারণ স্কুলে সময় নষ্ট না করে সরাসরি এই প্রতিষ্ঠানে চলে যাবে এবং বিশেষ কোন বৃত্তি বেছে নিয়ে তাতে দক্ষতা অর্জন করবে।

৩। প্রাক্-স্নাতক স্তরে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে

গঠনমূলক কিছু করার ক্ষমতা অর্জন করা। এই শিক্ষা যতদূর সম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া চাই। এই শিক্ষার ফলে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখবে মানুষ, স্বাধীনভাবে শিখতেও শিখবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে হাতেনাতে কিছু করতে শিখবে। অর্থাৎ সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হবে এই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

৪। সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে আমরা যে এক দেশ ও এক জাতি এ-বিষয়ে সকলকে সচেতন করে দেওয়া। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানব-জাতি এক, এটাও সবাই মনে রাখবে। এক-কথায় মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ লাভ করতে আগ্রহী হবে।

৫। প্রাক্-স্নাতক স্তরে শিক্ষা হবে বহুমুখী। শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা নয়, সাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শন ও নীতি, সৌন্দর্যবোধ অর্থাৎ যা কিছু মনের উৎকর্ষ ঘটায় তা থাকবে।

৬। এর পরের পর্যায়ে যে শিক্ষা দেওয়া হবে তা প্রধানতঃ পেশাদারী। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনব্যবসায়ী ইত্যাদি যে যে পেশা বেছে নেবে, সেই পেশায় তার কর্মক্ষমতা যাতে উচ্চমানের হয় সেই ভাবের শিক্ষা দেওয়া হবে।

৭। স্নাতকোত্তর শিক্ষাও হবে ঐ ঢঙের। তার মান অবশ্য অনেক উঁচু।

৮। এই পর্যায়ে নতুন পাঠ্যসূচী খুঁজে বের করতে হবে। তার লক্ষ্য হবে মানুষের কর্ম-ক্ষমতাকে আরও বাস্তবধর্মী ও যুক্তিসিদ্ধ করে তোলা।

৯। শিক্ষা কর্মজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন একটা জিনিস নয়। যে শিক্ষিত, সে প্রয়োজনমতো নানারকমের জিনিসও গড়তে পারবে। অর্থাৎ কর্মপটু হবে। বই-এর বাইরে তার কোন জগৎ নেই, এমন নয়। এই যোগ্যতা অর্জন করলে তাকে কখনও বেকার থাকতে হবে না। যে শিক্ষা মানুষকে কর্মপটু করে না তা প্রহসন মাত্র।

১০। এরপর গবেষণা। নানারকমের গবেষণা হতে পারে, কিন্তু কোন্ কোন্ গবেষণাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে তা খুব চিন্তা করে বেছে নিতে হবে।

১১। শিক্ষা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, শিক্ষা চলবে সারা জীবন ধরে। (এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি' উক্তিটি স্মরণীয়।) সমস্ত সমাজ জ্ঞানান্বেষণে মেতে উঠবে। জ্ঞানান্বেষণের জন্যে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেতে হবে, অনেক বই পড়তে হবে, পরীক্ষায় পাশ করতে হবে, তা নয়। জ্ঞান-চর্চা কোন ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না; এটা জীবনের নিত্য সঙ্গী হবে।

১২। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু জানা নয়, চরিত্র-গঠন হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য। মূল্যবোধ চরিত্র-গঠনের উপায়। মূল্যবোধ, উন্নত মানসিকতা, সংস্কৃতি—এইগুলি শিক্ষার ফলশ্রুতি হবে।

সংক্ষেপে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা উপরে বর্ণনা করা হল। এই বর্ণনা লেখকের নিজের ভাষায় ও ভঙ্গীতে। তবে মূল বক্তব্য কিন্তু যা তাই বলা হয়েছে। এই সঙ্গে আর একটি জিনিসের উল্লেখ করতে পারি—কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছা প্রত্যেক জেলায় একটা করে আদর্শ মাধ্যমিক স্কুল স্থাপন করা। এর উদ্দেশ্য বোধ হয় এই যে, তার দেখাদেখি অন্যান্য মাধ্যমিক স্কুলগুলিও উন্নত মানের হতে চেষ্টা করবে। মাধ্যমিক শিক্ষাই হচ্ছে সমস্ত শিক্ষা-কাঠামোর মেরুদণ্ড। সুতরাং সরকার মাধ্যমিক শিক্ষাকে যতদূর সম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ ও কালোপ-যোগী করতে চান।

উপায়

এখন প্রশ্ন হল, এই শিক্ষা-পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে কি কি পদক্ষেপ নিতে

হবে। এই বিষয়ে সরকার যা যা বলেছেন তা হল এই :

১। এখন যে-সব পাঠ্যসূচী আছে সেগুলিকে ঢেলে সাজাতে হবে। এই পাঠ্যসূচীর মধ্যে অনেক কিছু আছে যা সেকেলে এবং এ-যুগের পক্ষে একেবারে অযোগ্য, এগুলিকে কেটে-ছেঁটে বাদ দিতে হবে। এককথায় শিক্ষার আধুনিকীকরণ করতে হবে।

২। এখন জ্ঞানের ক্ষেত্র অনেক প্রসারিত হয়ে গেছে। সেই প্রসারিত জ্ঞানরাশিকে প্রাক্-স্নাতক স্তরে যে-সব ছাত্রছাত্রী আছে, তাদের আয়ত্তের মধ্যে এনে দিতে হবে।

৩। আমাদের সুদূর অতীতের এবং মধ্য-যুগের জ্ঞানরাশির মধ্যে অনেক উপাদান আছে যা বর্তমান কালেও সার্থক। বর্তমান যুগের প্রয়োজনে লাগতে পারে এমন যা কিছু আমরা লক্ষ্য করব তা পুনরুদ্ধার করে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করব।

৪। অনেক জ্ঞানের ক্ষেত্র আছে যেখানে ভারত মৌলিক অবদান করতে পারে। অথবা তার যা অবদান, তা শীর্ষস্থানীয় হবে। এ-সব ক্ষেত্রে নতুন করে গবেষণার উদ্যোগ করতে হবে।

৫। দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। শিক্ষাপদ্ধতি ও পরীক্ষাপদ্ধতিকেও পাল্টাতে হবে।

৭। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা-ক্ষেত্রে যতটুকু স্বাধীনতা দেওয়া চলে, তা দিতে হবে। এই স্বাধীনতা দেবার উদ্দেশ্য হবে তাদের পরিচালকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগানো এবং যাতে তারা একটা স্বাধীন পরিবেশে তাদের মান উন্নত করতে সচেষ্ট হয়।

প্রতিক্রিয়া

সরকারের ইচ্ছা অনুসারে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক সভা-সমিতি হয়ে গেল এবং এখনও হচ্ছে। এই সব সভা-সমিতিতে শিক্ষাব্রতীরা সরকারের এই শিক্ষা-পরিকল্পনা নিয়ে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এই পরিকল্পনা একটা ধাপ্পা ছাড়া আর কিছু নয়। এতে আছে শুধু বাগাড়ম্বর। কেউ কেউ বলেছেন, এই পরিকল্পনার ফলে নতুন এক কুলীনসম্প্রদায় সৃষ্টি হবে। সাধারণ মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হবে না। কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন, এর মধ্যে নতুনত্ব কি আছে? এ-সব তো পুরানো কথা। অতীতে যে-সব কমিশন হয়ে গেছে তাঁরা যা বলে গেছেন, এতো তারই চর্বিত-চর্বণ। কোন কোন রাজনৈতিক দল বলেছেন, সমস্ত শিক্ষা ব্যাপারটা রাজ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। এতে কেন্দ্রের নাক গলানো উচিত নয়। তাঁরা পাল্টা শিক্ষা-পরিকল্পনার কথা ভাবছেন।

কিন্তু যতদূর জানি, অধিকাংশ শিক্ষাব্রতী এই পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, এটা অভিনব, কালোপযোগী, খুব সুচিন্তিত, বৈজ্ঞানিক এমনকি বিপ্লবাত্মক। তাঁরা মনে করেন, এর দ্বারা দেশের মহৎ কল্যাণ সাধিত হবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও কেউ কেউ বলেছেন, মহৎ কল্যাণ সাধিত হবে যদি এটা কার্যে পরিণত হয়। আমরা অনেক কিছু করব বলি, কিন্তু করি না। প্রয়োজন সংকল্পের সঙ্গে সিদ্ধির সমতা। অন্ততঃ খানিকটা সিদ্ধি হোক তাহলেও সুখের বিষয় হবে। এই সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখতে হবে পরিকল্পনা পরিকল্পনাই। কোন পরিকল্পনা চূড়ান্ত হতে পারে না। অবস্থা ভেদে এবং অভিজ্ঞতার আলোকে পরিকল্পনা অদল-বদল করতেই হয়। এই পরিকল্পনা

শিক্ষার শেষ কথা নয়। তবু এই পরিকল্পনা যে খুব সম্ভাবনাপূর্ণ তা স্বীকার করতেই হবে। সরকার এখনও জনমত পরীক্ষা করে চলেছেন। এটাও অভিনব। এর আগে জনমতকে এতটা গুরুত্ব সরকার দেননি। বিদেশী এবং স্বদেশী কয়েকজন বিশেষজ্ঞ যা বলেছেন, তারই ভিত্তিতে শিক্ষানীতি ঠিক করেছেন। এই প্রথম দেখছি, বিদেশী বিশেষজ্ঞদের কোন ভূমিকা নেই। এটা খুব সঙ্গত, কারণ তাঁরা কতটা এ-দেশকে চেনেন ও জানেন? এবার শুধু যে স্বদেশী বিশেষজ্ঞরা আছেন তা নয়। শিক্ষা সম্বন্ধে যাঁদের কোনরকম উৎসাহ আছে তাঁদেরও মতামত চাওয়া হয়েছে। এমনকি ছাত্রছাত্রীরাও বাদ যাননি। শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা ঠিক কি রূপ নেবে তা কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা জানতে পারব।

গ্রামোন্নয়নে যুবসম্প্রদায়ের ভূমিকা

শ্রীশিবশঙ্কর চক্রবর্তী

আধুনিককালে সমাজ-উন্নয়নে যুবসম্প্রদায়ের ভূমিকা সম্পর্কে অনেকেই সজাগ হয়েছেন। ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দকে আন্তর্জাতিক যুববর্ষ হিসেবে ঘোষণার পর থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কি করে যুবকদের উন্নয়নের অংশীদার করা যায় সে-সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। আমাদের দেশে জনসংখ্যার প্রায় ২০ ভাগের বয়স ১৫—২৫-এর মধ্যে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত এই যুবশক্তিকে দেশের উন্নয়নের কাজে খুব একটা বেশি অংশীদার করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে স্বামী বিবেকানন্দ প্রায় ৯০ বছর আগে এর গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন এবং এ-সম্বন্ধে দেশকে সজাগও করে দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে স্বামীজী দেশের উন্নয়নের জন্য দুটি বিশেষ গোষ্ঠীর উপর বেশি করে নির্ভর করেছিলেন। প্রথমতঃ স্বামীজী চেয়েছিলেন, দেশের সন্ন্যাসিসম্প্রদায় যাঁদের উপর সাধারণ মানুষের এমনিতেই আস্থা আছে, তাঁরা আধ্যাত্মিকতা শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, এবং রুজি রোজগার কীভাবে বাড়ানো যায় সে-সম্বন্ধেও পরামর্শ দিন। কিন্তু স্বামীজী সেই সঙ্গে বুঝতেও পেরেছিলেন যে, শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের দ্বারা এই বিরাট দেশের সমস্যার মোকাবিলা করা যাবে না। সন্ন্যাসিসম্প্রদায় সমাজ-উন্নয়নের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবেন, কিন্তু মূল কাজ করতে হবে দেশের যুব-সম্প্রদায়কে। স্বামীজীর বিচারে যুবসম্প্রদায়ের একটা বিশেষ সত্তা আছে যা ধনী-দরিদ্র, এবং জাতি-পাতের উর্ধ্বে। যেহেতু যুবসম্প্রদায়ের হাতে সময় রয়েছে এবং আবেগ ও অনুভূতির শক্তি রয়েছে—সেহেতু এদের সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারলে এরা সমাজটাকে পাল্টে দিতে পারে। স্বামীজী এই যুবশক্তিকেই বিশেষ করে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে কাজ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

আমরা যদি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব যে, সেই সময়ে স্বামীজীর ডাকে দেশের যুবসমাজ কিভাবে সাড়া দিয়েছিলেন এবং দেশের মুক্তির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বাধীনোত্তর ভারতে স্বামীজীর

আহ্বান আমরা ভুলে গিয়েছিলাম এবং যুবশক্তিকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারিনি। সত্তরের দশকে যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে যেভাবে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে যুবশক্তির ভূমিকা সম্পর্কে পর্যালোচনা শুরু হয়েছে এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার যুবকল্যাণমূলক কর্মসূচী নিয়েছেন। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার নতুন করে যুব দপ্তর খুলেছেন, যার মাধ্যমে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচী দেশে রূপায়িত হতে শুরু করেছে। এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, আন্তর্জাতিক যুববর্ষ থেকে শুরু করে আমাদের দেশে প্রতি বৎসর স্বামীজীর জন্মদিন ১২ জানুআরি জাতীয় যুবদিবস হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের দশম অধ্যক্ষ প্রয়াত শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ বিশেষ করে তাঁর জীবনের শেষ দিকে যুবকদের দেশোন্নয়নের কাজে এগিয়ে আসার জন্য বারবার ডাক দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে অনুষ্ঠিত যুব-মহাসম্মেলন প্রয়াত অধ্যক্ষ মহারাজেরই ধ্যানধারণার ফলশ্রুতি।

গ্রামোন্নয়নে যুবকদের ভূমিকা সম্পর্কে বিশদ ভাবে আলোচনা শুরু করার আগে আমাদের বোঝা দরকার উন্নয়ন জিনিসটা কি। এটা অনস্বীকার্য যে, স্বাধীনোত্তর ভারতে গত তিন দশকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা অনেক বিষয়ে উন্নতি করতে পেরেছি—বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে। স্বাধীনতার সময়ে যেখানে আমাদের সামগ্রিক উৎপাদন ছিল ৫০ মিলিয়ন টন, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫৩ মিলিয়ন টন। জনসংখ্যা ভীষণভাবে বেড়ে গেলেও আমাদের খাদ্যোৎপাদন জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা ১ ভাগ এগিয়ে আছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রেও আমরা অনেকদূর এগোতে পেরেছি। ভারতবর্ষকে এখন শিল্পোন্নত দেশগুলির অন্যতম হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। কিন্তু এত সব উন্নতি সত্ত্বেও এটাও অনস্বীকার্য যে, দেশের প্রায় ৪০-৫০% লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। এখনও শতকরা ৬৫ ভাগ দেশবাসী নিরক্ষর। সাধারণ দারিদ্র্য ছাড়াও গ্রামের বেশির ভাগ মানুষই এখনও অপুষ্টি, ভগ্নস্বাস্থ্য, শিশু-মৃত্যু, শুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, জাতিভেদ, পণপ্রথা—এ-সব সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাধিতে ভুগছে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একদিকে যেমন দেশের উন্নয়ন হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমরা যখন গ্রামোন্নয়নে যুবসমাজের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করব তখন দেশের এই বিশেষ পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। এবং এখানেই দেশের উন্নয়ন সম্পর্কে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাসঙ্গিকতা আছে। স্বামীজী পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণ করে যখন দেশে ফিরলেন তখন আমাদের জাতীয় সমস্যা সমাধানে একটি প্রধান পথের কথাই বলেছিলেন—তা হচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো। এটা ঠিক যে পরিমাণগতভাবে সেই হিসেবে আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব প্রসার ঘটেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ এই শিক্ষার সুযোগ নিতে পারছে না। এক্ষেত্রেও স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। স্বামীজী সেই সময়ই বলেছিলেন, যারা খেটে খাওয়া মানুষ তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ে যেতে পারবে না, বিদ্যালয়কেই তাদের মাঠে-ঘাটে যেতে হবে। দুঃখের বিষয় যে, আমরা স্বাধীনতার পরে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণেই বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয় খুলে চলেছি—যে শিক্ষার বেশির ভাগই আমাদের যুবসম্প্রদায়েরও কোন কাজে লাগছে না। দুঃখের

বিষয় অনেক ক্ষেত্রে যুবকেরা নিজেরাও এ-সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন নন। যার ফলে আমরা একদিকে যেমন দেখতে পাচ্ছি গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ কোনরকম শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না, তেমনি অন্যদিকে যাঁরা এই শিক্ষা গ্রহণ করছেন তাঁরা বেশির ভাগই শিক্ষিত বেকার হিসেবে ব্যর্থতাবোধের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। এঁদের বেশির ভাগই যা হোক করে চাকরি জোটাবার আশায় দরজায় দরজায় ঘুরছেন। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, গত প্রায় দু দশক ধরে বিভিন্ন ধরনের স্বনিয়োজন-মূলক প্রশিক্ষণ চালিয়ে আসছেন, যার ফলে এই সব প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত যুবকেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিজেদের কাজ সৃষ্টি করে নিতে পারছেন। গ্রামোন্নয়নে যুবকদের ভূমিকা প্রসঙ্গে সেজন্যে আমার প্রথমেই মনে হয় যে, যুবকেরা নিজেরাই এগিয়ে আসুন, দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য একদিকে যেমন সেই শিক্ষা-ব্যবস্থা তাঁদের নিজেদের রুজি রোজগারের পথ সুগম করে দেবে, তেমনিভাবে সাধারণ মানুষও এই শিক্ষাব্যবস্থার অংশীদার হতে পারবে। আমাদের দেশে অনেকরকম যুব-আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু স্বামীজীর আদর্শে আমাদের নতুন ধরনের যুব-আন্দোলনের প্রয়োজন আছে। আমাদের উন্নয়নের লক্ষ্য শুধুমাত্র কিন্তু রাস্তাঘাট, স্কুলকলেজ, যাকে ইংরেজীতে বলে Infrastructure (সুবিন্যস্ত ও সুসংহত স্থায়ী ভিত্তি) তৈরি করা নয়, এর প্রধান লক্ষ্য হবে প্রথমতঃ যুবকদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, এবং দ্বিতীয়তঃ সাধারণ মানুষকে এই উন্নয়নের অংশীদার করা। প্রকৃতপক্ষে ইদানীং কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী মনে করছেন, উন্নয়ন অর্থ এই নয় যে, শুধুমাত্র সামগ্রিক জাতীয় আয় বৃদ্ধি বা মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি। উন্নয়নের লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া সৃষ্টি করা, যার ফলে সাধারণ মানুষ এর মধ্যে অংশ নিতে পারবে।

এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, দেশের যেখানে বেশির ভাগ শিক্ষিত যুবকই বেকার এবং অসহায় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সেখানে তাঁরা কি করে গ্রামের সাধারণ মানুষকে উন্নয়নের অংশীদার করবেন। আমার ব্যক্তিগত-ভাবে ভারত সরকারের একটি কর্মসূচীর অভিজ্ঞতা আছে। এই কর্মসূচীর নাম হচ্ছে 'জাতীয় সেবাপ্রকল্প' (National Service Volunteer Scheme)। এই কর্মসূচীতে সারাদেশে প্রায় ৮০০ স্নাতক বেকার যুবককে এক বছরের জন্য গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এঁদের প্রধান কর্মসূচী ছিল যুবসংগঠন তৈরি করা, সাক্ষরতার প্রসার ঘটানো, সামাজিক কু-প্রথা সম্বন্ধে দরিদ্র গ্রামবাসীকে সচেতন করা ইত্যাদি। এক বছরের কার্যকালে তাঁরা একটা সামান্য ভাতা পেতেন। এক বছরের সেবাবৃত্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাঁরা এখন কী করছেন সে-সম্বন্ধে একটি মূল্যায়ন করেছিলাম। তাতে দেখা গেল যে, এই সব প্রাক্তন সেবকদের মধ্যে কমপক্ষে শতকরা ৬০ ভাগ কোন না কোন স্থায়ী কাজের সুযোগ পেয়ে গিয়েছেন। এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই সব কর্মীরা আমাদের অনুসন্ধানকারীদের বলেছেন যে, তাঁদের সেবাকার্যের অভিজ্ঞতাই মূলত এই সফলতার জন্য দায়ী। এই উদাহরণটির মধ্যে দিয়ে আমি প্রধানতঃ যা বলতে চাইছি তা হচ্ছে, শিক্ষিত যুবকেরা যদি গ্রামের সেবার জন্য কিছু সময় নিয়োগ করেন, তাহলে তা যে কেবল গ্রামের দরিদ্র মানুষের উপকারেই লাগবে তা নয়, তাঁদের নিজেদের জীবনেরও পাথেয় হয়ে থাকবে। আজ সকলেই স্বীকার করেন যে,

আমাদের যে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যুবকেরা যাচ্ছেন, তার ফলে তাঁদের সামাজিক বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে কোনও সঠিক পরিচয় হয় না, ফলে তাঁরা এই শিক্ষা এবং ধ্যানধারণা ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগাতে পারেন না। এমন অনেক অভিজ্ঞতা আছে যে, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের সেরা ছাত্র হয়েও গ্রামের সমস্যার মোকাবিলা করতে পারছেন না। এই প্রসঙ্গে আমার মনে হয়, প্রতি বৎসর যে প্রায় ৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রী বি. এ., বি. এস. সি পরীক্ষায় বসছেন তাঁদের যদি পরীক্ষা-পরবর্তিকালে সামান্য ভাতা দিয়ে এক বৎসরের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠানো সম্ভব হত, তাহলে যেমন একদিকে গ্রামের মানুষের মধ্যে নতুন শিক্ষাদীক্ষার প্রসার ঘটানো যেত, তেমনি এর মধ্য দিয়ে দেশের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে দেশের মানুষের সমস্যা সম্বন্ধে নতুন ধরনের সচেতনতা আনা সম্ভব হত। অবশ্য এই ধরনের কর্মসূচী নেবার আগে এই সব ছাত্রছাত্রীদের স্বল্পকালের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হবে এবং তাদের গ্রামোন্নয়নের কাজে লাগানোর জন্য একটি সাংগঠনিক রূপরেখাও ঠিক করতে হবে। মোটামুটিভাবে আমরা যদি এইভাবে গ্রামোন্নয়নে যুবকদের ভূমিকা সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে পারি তাহলে সঠিক কর্মসূচী নির্ণয় করা কঠিন হবে না। আমি নিচে দশটি কর্মসূচীর উল্লেখ করছি, যেগুলি সহজেই আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকেরা গ্রহণ করতে পারেন।

(১) জাতীয় বয়স্ক শিক্ষাপ্রকল্প।

(২) পরিবেশ সংরক্ষণ।

(৩) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ শিক্ষার প্রসার।

(৪) দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় (Disaster management)।

(৫) সামাজিক কু-প্রথার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সংগঠিত করা।

(৬) গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের আন্দোলন

(৭) দরিদ্র ছাত্রদের জন্য কোচিং ক্লাসের আয়োজন।

(৮) ভারতীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।

(৯) বিভিন্ন রকম জাতীয় উন্নয়নপ্রকল্প সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা যাতে তাঁরা তা থেকে উপকার পেতে পারেন।

(১০) প্রদর্শনী ও বিজ্ঞান শিবিরের আয়োজন করে মানুষকে তাঁদের জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব উপলব্ধিতে সাহায্য করা।

আমি কর্মসূচীর ফর্দ আর দীর্ঘ করতে চাই না। এই কর্মসূচীর যে-কোন একটি নিয়েই যুবকেরা যদি কাজ শুরু করেন তাহলে গ্রামাঞ্চলে যুগান্তকারী বিপ্লব আনা সম্ভব হবে।*

* ২৪ ডিসেম্বর ১৯৮৫, বেলুড়মঠ-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় যুবসম্মেলনের বৈকালিক অধিবেশনে লেখকের পঠিত ইংরেজী ভাষণ। লেখক-কর্তৃক অনূদিত।

জনসাধারণের উন্নতিসাধনে স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পনা

স্বামী প্রভানন্দ

৩৩ লক্ষ বর্গকিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট ৬৮ কোটি ৩৪ লক্ষ মানুষ অধ্যুষিত এই ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার ধারক। বহু বিচিত্র প্রথা, বিশ্বাস ও লোকাচারের কথা বাদ দিলেও ভারতের প্রধান সাতটি ধর্ম, ১৬৫২টি ভাষা ও উপভাষা, ৩৭৪৩টি 'অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণী'রূপে চিহ্নিত বর্ণ নিয়ে গঠিত হয়েছে একটি অদ্বিতীয় ভারতীয় জাতি। এখানে শতকরা ৭৬ ভাগ মানুষ এখনও বাস করে গ্রাম্য সমতল ভূমিতে, গভীর অরণ্যে, পার্বত্য এলাকায় এবং অর্ধমরুভূমি অঞ্চলে। এ ছাড়া আনুমানিক ২ কোটি ৮০ লক্ষ লোক বাস করে শহরের বস্তিগুলিতে। স্বতই, ভারতবর্ষের সার্বিক কল্যাণ নির্ভর করে রয়েছে এই মানুষগুলির সমুন্নতির উপর। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এদের বেশির ভাগ মানুষই কাল যাপন করছে চরম দারিদ্র্য, অপরিচ্ছন্নতা ও আবর্জনা এবং নিষ্ঠুর উপেক্ষার মধ্যে। তার থেকেও শোচনীয় বিষয় হল, প্রকট দারিদ্র্যের বন্ধ জলাভূমির মধ্যে সংগ্রামরত এই জনসমষ্টি বিত্তবানদের সামান্যতম সহানুভূতি থেকেও বঞ্চিত। উন্নয়ন, সাম্য ও সামাজিক সুবিচারের মহৎ উদ্দেশ্যে রচিত ছ-ছটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণের পরেও ধনী ও দরিদ্রের, শিক্ষিত ও নিরক্ষরের, শহর ও গ্রামাঞ্চলের ব্যবধান কমেনি বরং আরও বেড়ে গেছে। স্বল্পসংখ্যক মানুষ যখন পাঁচতারা হোটেলের বিলাসিতায় সুখমগ্ন তখন দেশের শতকরা ৪৮.১৩ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যের সীমারেখা অতিক্রম করার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করে চলেছে। শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট বিশাল ব্যয়বরাদ্দের সুবিধাভোগ করছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন, আর শতকরা ৬৩.৮ জন ভারতবাসী আজও অক্ষরপরিচয়হীন। বেকারী ও অর্ধবেকারী তাদের জীবনের নিত্যসঙ্গী।

সন্দেহ নেই, উন্নয়নের ধ্বজাধারীরা প্রায় সব ক্ষেত্রেই অনুসরণ করে চলেছেন পশ্চিমী পদ্ধতি। জাতীয় সংস্কৃতির বনিয়াদ সম্পর্কে অভিজ্ঞতাহীন এবং সহমর্মিতার বোধহীন এইসব উন্নয়ন-বাগীশেরা গ্রামীণ মানুষের মর্মমূলে পৌছতে পারেননি।

গত তিন দশকের গ্রামীণ উন্নয়নের বিরাট জাতীয় উদ্যোগের পটভূমিকায় বুঝতে চেষ্টা করব এই সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের মতাদর্শ ও স্বপ্নকে এবং সেইসঙ্গে আমাদের প্রচেষ্টা হবে গ্রামীণ ভারতবর্ষের পুনরুজ্জীবনে স্বামীজীর পরিকল্পনার মূল্যায়ন।

ইতিহাসের উজ্জ্বল ছাত্র স্বামী বিবেকানন্দ যেমন ভারতের গৌরবময় অতীতকে পুনরাবিষ্কার করেছিলেন তেমনি বর্তমান ভারতের প্রকৃত শক্তি ও তার দুর্বলতাকেও অনুধাবন করেছিলেন। তিনিই প্রথম ভারতবাসী যিনি ঘোষণা করেছিলেন প্রকৃত ভারতবর্ষ বাস করে কুটিরে এবং এই কুটিরবাসী ভারতবর্ষই জাতীয় শক্তির প্রকৃত উৎস। ভারতের অবনতির মূল কারণ এই কুটির-বাসী সাধারণ মানুষ এবং বিশেষত নারীজাতির প্রতি চরম অবহেলা। দুঃসহ দারিদ্র্য ও নিষ্ঠুর উপেক্ষার মধ্যে বাস করেও এইসব সাধারণ মানুষ পাশ্চাত্যের সমশ্রেণীর মানুষের তুলনায় দেবদূতস্বরূপ। তাই তাদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তনও সহজতর। দ্বিতীয়তঃ ভারতের আত্মা বেঁচে আছে আধ্যাত্মিকতার উপর ভিত্তি করে—এ আবিষ্কারও বিবেকানন্দের। এই দেশের উপর দিয়ে কত ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে, কত

বিপৎপাত ঘটে গেছে, কিন্তু জাতি তাতে বিনষ্ট হয়নি কারণ ভারতের সেই আধ্যাত্মিক আত্মা এখনও অম্লান। স্বামীজী ভারতের সেই শাশ্বত প্রাণ, তার স্বকীয়তা রক্ষায় বিশ্বাসী। তৃতীয়তঃ স্বামীজীর মতে, ভারতের গ্রাম-সমাজের দরিদ্র মানুষেরা যে চিরন্তন দুঃখ ভোগ করে এসেছে তাতে লাভ করেছে অদ্ভুত প্রাণশক্তি। স্বামীজীর ভাষায়: 'একমুঠো ছাতু খেয়ে এরা দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে।' চতুর্থতঃ এই নিঃস্ব মানুষেরা সহজেই প্রগতিশীল চিন্তাধারা গ্রহণ করতে পারে। স্বামীজীর ভাষায়: 'আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই জ্ঞানলাভ করিয়াছি যে, আমাদের দেশের সাধারণ লোক নির্বোধও নহে বা তাহারা যে জগতের সংবাদ জানিতে কম ব্যাকুল, তাহাও নহে; পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোক যেমন সংবাদ সংগ্রহে আগ্রহশীল ইহারাও সেইরূপ।'[১] স্বামীজী গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, গ্রামের সাধারণ মানুষকে তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতার শিক্ষাদান সহজেই করা যায় এবং তার দ্বারাই তাদের আত্মবিশ্বাসী এবং ব্যক্তিত্বসচেতন করে তোলার সহায়তা করা যায়। পঞ্চমতঃ দরিদ্র জনগণ সম্পর্কে স্বামীজীর লক্ষ্য ছিল, প্রথম খাদ্যের ব্যবস্থা—তারপর আধ্যাত্মিকতার শিক্ষা। তিনি বলেছেন: 'যে ধর্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করিতে পারে না অথবা অনাথ শিশুর মুখে একমুঠো খাবার দিতে পারে না, আমি সে ধর্ম বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।'[২] তিনি জোর দিয়েছেন পার্থিব ভোগের সুনিয়ন্ত্রণে—যা মানুষকে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার বিকাশে উদ্বুদ্ধ করবে। বাস্তববাদী বিবেকানন্দ বলেছেন: 'বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে; প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরীব লোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।'[৩]

মানুষের অর্থনৈতিক-সামাজিক সত্তা ভিন্ন বর্তমান উন্নয়ন-পরিকল্পনায় অন্য কোনও ভূমিকা স্বীকৃতি পায়নি, কিন্তু বিবেকানন্দের ধারণায় মানুষের মধ্যে নিহিত আছে ব্রহ্মের শক্তি। তাই মানুষের জন্য প্রয়োজন অনেক উচ্চতর লক্ষ্য, ব্যাপকতর সুযোগ, উন্নততর পরিকল্পনা এবং সম্পদ ও অগ্রাধিকার সম্পর্কে নূতনতর চিন্তা-ভাবনা। আধুনিক উন্নয়ন-উদ্যোগ দৃষ্টিনিবদ্ধ করেছে কেবলমাত্র মানুষের জড়বাদী প্রয়োজনের দিকে—মানুষের অন্য সত্তা সেখানে উপেক্ষিত। এই দৃষ্টিভঙ্গীর কুফলগুলি রোধ করার জন্য চেয়েছিলেন ভারতীয় চিন্তাধারার দ্বারা তার পরিশুদ্ধি এবং সেই কারণেই যে কোনও সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ লক্ষ্য হিসাবে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধিকে।

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রামীণ ভারতবর্ষ ও তার উন্নয়ন সম্বন্ধে সামগ্রিক চিন্তা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নিম্নোদ্ধৃত উক্তি দুটিতে:

(ক) 'আহা, দেশে গরীব দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে···তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নেই রে!···এরা না উঠলে মা জাগবেন না। আমরা এদের অন্নবস্ত্রের সুবিধা যদি না করতে পারলুম, তবে আর কি হল? হায়! এরা দুনিয়াদারি কিছু জানে না, তাই দিনরাত খেটেও

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৪০
২ ঐ, ৭ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ২৭
৩ ঐ, ঐ, ঐ, পৃঃ ৪১

অশন-বসনের সংস্থান করতে পারছে না। দে—সকলে মিলে এদের চোখ খুলে। আমি দিব্য চোখে দেখছি, এদের ও আমার ভেতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র। সর্বাঙ্গে রক্ত সঞ্চার না হলে কোন দেশ কোনও কালে কোথায় উঠেছে দেখেছিস? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও ঐ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না—এ নিশ্চয় জানবি।'[৪]

(খ) 'আমাদের কাজ হওয়া উচিত প্রধানত শিক্ষাদান—চরিত্র ও বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের জন্য শিক্ষাবিস্তার।···মনে হচ্ছে, এ পর্যন্ত ঐ কার্যে ফল কিছু হয়নি; কারণ তাঁরা এখনও পর্যন্ত স্থানীয় লোকদের মধ্যে তেমন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে পারেননি, যাতে তারা দেশের লোকের শিক্ষার জন্য সভাসমিতি স্থাপন করতে পারে এবং ঐ শিক্ষার ফলে তারা আত্মনির্ভরশীল ও মিতব্যয়ী হতে পারে, বিবাহের দিকে অস্বাভাবিক ঝোঁক না থাকে, এবং এইভাবে ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। দয়ায় লোকের হৃদয় খুলে যায়; কিন্তু সেই দ্বার দিয়ে তার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ যাতে হয়, তার জন্য চেষ্টা করতে হবে।'[৫]

স্বামীজীর অনুরূপ বহু উক্তির মধ্যে থেকে গৃহীত উপরি-উক্ত দুটি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব এর মধ্যে নিম্নোক্ত বারোটি মৌলিক সূত্র বিধৃত। এইগুলি থেকেই আমরা ভারতীয় জনগণের পুনরুজ্জীবনে তাঁর অভিমত পেতে পারি:

১। প্রথম—সাধারণ মানুষকে অবহেলার মধ্যেই নিহিত আছে জাতীয় কলঙ্কের বীজ। একটি জাতির অগ্রগতি নির্ভর করে জাতীয়তার মেরুদণ্ডস্বরূপ সাধারণ মানুষের উপরে। প্রকৃত যে ভারতবর্ষ বাস করে দরিদ্রের কুটিরে সে বিস্মৃত হয়েছে আপন মনুষ্যত্ব, আপন ব্যক্তিত্ব। সাধারণ মানুষকে সেই হারানো মনুষ্যত্বে ও ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যতদিন না এই পদদলিত মানুষের পুনরুজ্জীবন ঘটছে ততদিন জাতি পূর্ণশক্তিতে বিকাশ লাভ করতে পারে না। সুতরাং উন্নয়ন-পরিকল্পনাকে নিয়োগ করতে হবে এতাবৎ অবহেলিত সাধারণ মানুষের জন্য।

২। দ্বিতীয়—এই অবজ্ঞাত শ্রেণীর সাধারণ মানুষের পুনরুত্থান ঘটাতে হবে তাদের আধ্যাত্মিক চেতনাকে আহত না করে, কারণ এই আধ্যাত্মিকতাই ভারতীয়তার প্রাণস্বরূপ। স্বামীজীর মতে, আধ্যাত্মিকতা মানুষের অন্তরস্থিত অপ্রকাশিত অসীম শক্তি, প্রজ্ঞা, নৈপুণ্য এবং পবিত্রতাকে বিকশিত করে। স্বামীজীর নির্দেশ, সমস্ত উন্নয়ন-পরিকল্পনাকে পরিচালিত করতে হবে তাদের অনন্ত আধ্যাত্মিক শক্তি বিনষ্ট না করে।

অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নয়নে ধর্মের এই অগ্রাধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। মানুষের জীবনে ধর্ম ও অর্থনীতির ভূমিকা-সচেতন বিবেকানন্দ গীতা সম্বন্ধীয় একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন: 'প্রত্যেক ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়া একটা অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। মানুষ নামক জীবের উপর ধর্মের কিছু প্রভাব আছে বটে, কিন্তু অর্থনীতির দ্বারাই সে পরিচালিত হয়। ব্যষ্টির জীবনের উপর অন্য কিছুর প্রভাব থাকিতে পারে, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে মানুষের ভিতর যখনই কোন অভ্যুত্থান আসিয়াছে, তখনই দেখা গিয়াছে, আর্থিক সম্পর্ক ব্যতীত মানুষ কখনও সাড়া দেয় নাই।···পেটের চিন্তা—অন্নের চিন্তা মানুষের

৪ ঐ, ৯ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ২৩৫—৩৬

৫ ঐ, ৭ম খণ্ড, ঐ, পৃঃ ৪১৯

প্রথম। অন্নের ব্যবস্থা প্রথমে, তারপর মস্তিষ্কের। মানুষ যখন হাঁটে, তখন তাহার পেট চলে আগে, মাথা চলে পরে। ইহা কি লক্ষ্য করেন নাই?'[৬] স্বামীজীর এই উক্তিতে মানুষের মৌলিক জীবনচর্যায় অর্থনীতির ভূমিকাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে ধর্মের লক্ষ্য শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক কল্যাণসাধনই নয়—পরিবেশগত দুর্বলতা অপসারণ করে একটি আদর্শ সমাজগঠনের প্রচেষ্টাও।

ডঃ রাধাকৃষ্ণাণের মতে ধর্ম ও মানবতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তিনি আরও বলেছেন: 'ধর্মের প্রকৃত মূল্য তার শক্তির মধ্যে নিহিত হলেও এবং মানুষের আন্তরসত্তার জাগরণ ও স্ফুরণ তার লক্ষ্য হলেও মানুষের বহিঃসত্তার সঙ্গে ধর্মের সামঞ্জস্য বিধান না হলে তা সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এই শেষোক্তটির জন্য প্রয়োজন সঠিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন—সেই শক্তি ও নৈপুণ্য যা মানুষের শুধু অস্তিত্বরক্ষাই করে না, একটি সমষ্টিগত সম্পূর্ণতায় ক্রমঃবিকশিত করে।'

বলা বাহুল্য বিবেকানন্দ যে শিক্ষার কথা বলেন তা শুধু অর্থনৈতিক মূল্যই বহন করে না, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জটিল সমস্যাগুলির একটি সুসংহত সমাধানরূপেও তা প্রতিভাত। প্রচলিত সনাতন ধর্মের সঙ্গে তার পার্থক্য পরিস্ফুট করার জন্য উল্লেখ করছি, স্বামীজী যে ধর্মের শিক্ষা দিয়েছেন তাতে আধ্যাত্মিকতাকে প্রায়শই আত্মার বিজ্ঞানরূপে অভিহিত করা হয়েছে।

(৩) তৃতীয়—স্বামীজী মানবপ্রকৃতিকে উচ্চমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বলেছেন: 'মানব আত্মা অথবা মানবদেহই একমাত্র উপাস্য ঈশ্বর। অবশ্য অন্যান্য জীবজন্তুরাও ভগবানের মন্দির বটে কিন্তু মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির—মন্দিরের মধ্যে তাজমহল।'[৭] মানুষ সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠতর দেবদূতের চেয়েও। জগতের পুঞ্জীভূত যাবতীয় সম্পদের চেয়ে মানুষ মূল্যবান। এই সত্য সম্পর্কে অবহিত করতে হবে মানুষকে।

(৪) চতুর্থ—সুস্থ সমাজ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনে স্বামীজী যে বিধান দিয়েছিলেন তাকেই বর্তমানে বলা হয় আধ্যাত্মিক সমাজতন্ত্র। স্বামীজী প্রশ্ন করেছেন, আমরা কেন মানুষের সমানাধিকার স্বীকার করে নেব? জড়বাদীরা যে দাবি করেন, সকল মানুষই জন্মসূত্রে সমান সে দাবি অসার কারণ মানুষে মানুষে রয়েছে অনেক পার্থক্য। সুতরাং সকলকে সমান করে নেবার পক্ষে যুক্তি কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে অধ্যাত্মবাদ। সেই এক অনন্ত আত্মা (ব্রহ্ম) মানব-অস্তিত্বের ভিত্তিমূল। সামাজিক সুবিচারের পক্ষে এটাই সবচেয়ে বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি। স্বামীজী বিশেষ অধিকারের ধারণাকে মানবসমাজের পাপ বলে মনে করতেন। একের চেয়ে অন্যের অধিকতর সুযোগ লাভই হল বিশেষ অধিকার। বিত্তবানের বিত্তের জন্য বিশেষ অধিকারবোধ, বুদ্ধিশক্তির জন্য বিশেষ অধিকারবোধ, আধ্যাত্মিকতার জন্য বিশেষ অধিকারবোধ পাশবচিন্তা। এ থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে। মানুষের বাহ্যিক অবয়ব বা তার ভূমিকাতেও পার্থক্য থাকতে পারে। আমাদের বিসর্জন দিতে হবে বিশেষ অধিকারের ধারণাটি। কেমন করে তা সম্ভব? স্বামীজী বলেছেন: 'প্রকৃতিতে বৈষম্য থাকলেও সকলের সমান সুবিধা থাকা উচিত। কিন্তু যদি কাকেও অধিক, কাকেও কম সুবিধা দিতেই হয়,

৬ ঐ, ৮ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ৪০৭
৭ ঐ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ ২৫১

তবে বলবান্ অপেক্ষা দুর্বলকে অধিক সুবিধা দিতে হবে।'[৮]

বর্তমান রাজনৈতিক অভিমতের সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তার পরিচয় ফুটে ওঠে বিবেকানন্দের সতর্কবাণীতে : 'ধনী-দরিদ্রের বিবাদ যেন বাধিয়ে বসো না।'[৯] তাহলে পরিহার করার উপায় কি? বিশেষ অধিকার বিলোপের জন্য বিত্তবান ও বিত্তহীনদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধাবার পথ গ্রহণ না করে, বিত্তহীনদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উজ্জীবনে সহায়তায় বাধ্য করতে হবে বিত্তবানদের।

(৫) পঞ্চম—স্বামীজী সেই সমাজ চেয়েছিলেন, যে সমাজ জনগণকে তার অধিকার দান করবে। তাদের সেই অধিকার প্রকৃতিগত। সে অধিকার অস্বীকার করার অর্থ তাদের শক্তির স্বাভাবিক স্ফুরণকে অস্বীকার করা। সাধারণ মানুষকে তার স্বকীয়তা, শক্তি, অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য বিবেকানন্দ তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা অনুমোদন করেছিলেন। এই কারণেই তিনি সমাজ সংস্কারের চেয়ে শিক্ষার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। স্বামীজী বলেছেন : 'প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ঐটি—রাজশাসন ও দম্ভবলে দেশের সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া।'[১০] জনগণের মুক্তি সংস্কারের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না—নির্ভর করে তাদের মৌলিক প্রয়োজনগুলির মোকাবিলা করার উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার উপরে।

কিন্তু জনশিক্ষা বলতে শুধু মানুষের 'রোটি-কাপড়া-মোকান'-এর ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। স্বামীজী মনে করেন, উচ্চ ধর্মীয় চিন্তা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শুধু উচ্চবিত্ত ও আলোকপ্রাপ্ত শ্রেণীর একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। সেগুলিও পৌঁছে দিতে হবে গ্রামের দরিদ্র মানুষটির কুটিরে। একটি চিঠিতে বিবেকানন্দ লিখেছেন : 'তবে একটা কথা বলে রাখি, গরীব নিম্নজাতিদের মধ্যে বিদ্যা ও শক্তির প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগল, তখন থেকেই ইউরোপ উঠতে লাগল।'[১১] এইভাবেই বৈজ্ঞানিক চেতনায় আলোকিত জীবনের উচ্চতর মূল্যায়নে গ্রামের মানুষের সহায়তা করতে হবে। এইভাবেই তাদের সাংস্কৃতিক মানকে উন্নত করে তুলতে হবে।

(৬) ষষ্ঠ—স্বামীজী সাধারণ মানুষের শক্তির উপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন এবং সেই শক্তি কর্মে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। অনেক জাতীয় নেতারই এ মনোভাব দেখা যায় না। স্বামীজী বলেছিলেন : 'সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ।'[১২] জনসাধারণের মধ্যে কর্মশক্তির যে বিপুল বেগ প্রবাহিত স্বামীজী তাকে আকর্ষণ করে গ্রামীণ উন্নয়নকর্মসূচিতে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। তাদের কর্মনিযুক্তি বলতে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, তাদের মধ্যেও আছে নিজেদের সমুন্নত করে তোলার জন্য পরিকল্পনা রূপায়ণ ও তার যাথার্থ্য বিচারের ক্ষমতা। তাদের

৮ ঐ, ৭ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ১০৮
৯ ঐ, ৮ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ১০৪
১০ ঐ, ৭ম খণ্ড, ঐ, পৃঃ ৩৭৪
১১ ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১১৭—১৮
১২ ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২৪২

তথ্য, নেতৃত্ব এবং সংগঠনের যাবতীয় সংবাদলাভের সুযোগ উপস্থিত করে এইসব পরিকল্পনায় তাদের অংশগ্রহণের স্বীকৃতি সম্পর্কে সুনিশ্চিত করে তোলা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, বেশির ভাগ সরকারী-প্রকল্পে সাধারণ মানুষের ভূমিকাটা কৃষকের ভূমিচাষে বলদের ভূমিকার মতো হয়ে দাঁড়ায়। কৃষক বলতে শিক্ষিত রুচিবান ব্যক্তিরা যাঁদের পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্তই উন্নয়ন কাজে চূড়ান্তরূপে গৃহীত হয়। আর গ্রামের মানুষেরা বড় জোর নীরব উপকৃত শ্রেণী।

(৭) সপ্তম—১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারে দেখা গেছে দেশের শতকরা ৪৮·৩ ভাগ নারী। এর মধ্যে শতকরা ৭৫ জন এখনও নিরক্ষর। যতদিন না স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার উন্নতি হয় ততদিন দেশের প্রকৃত কল্যাণ অসম্ভব। একটি ডানায় ভর করে আকাশে ওড়া পাখির পক্ষে সম্ভব নয়। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? স্বামীজী বলেছেন: 'তোমাদের নারীগণকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও। তারপর তাহারাই বলিবে কোন্ জাতীয় সংস্কার তাহাদের পক্ষে আবশ্যক।'[১৩] 'নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে।'[১৪]

(৮) অষ্টম—স্বামীজীর অভিমত, সমাজ সংস্কার যদি করতেই হয় তবে সে সংস্কার হওয়া উচিত মূল এবং সমস্ত শাখাপ্রশাখা নিয়ে। বেশির ভাগ সমাজসংস্কারকই বিশেষ ত্রুটির দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন, কিন্তু ত্রুটির প্রকৃত কারণটি নির্ণয় করতে পারেননি। কিন্তু বিবেকানন্দ প্রথম ত্রুটির মূল কারণটিকেই দূর করতে চেয়েছিলেন। তিনি সংস্কারকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেননি—গ্রহণ করেছিলেন উপায় হিসাবে—যে উপায়ের দ্বারা ব্যক্তির বিকাশ ও স্বাধীনতার পথের অন্তরায়গুলি দূর হতে পারে। তাই সংস্কারের বদলে তিনি বিকাশের উপরই বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। আইনের শক্তি বলে সমাজসংস্কারের বদলে সমাজের প্রয়োজন অনুসারে স্বাভাবিক ক্রমবিকাশভিত্তিক সংস্কার সাধনের উপর তাঁর আস্থা। তাই স্বামীজীর সংস্কারচিন্তা শিক্ষাপ্রদ, ক্রমবিকাশ ও সমৃদ্ধিমুখী।

(৯) নবম—বিবেকানন্দ আত্মবিশ্বাসের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যখন তার গুরুভ্রাতা অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদ জেলার মহুলা গ্রামে দরিদ্রদের মধ্যে কাজ করছিলেন তখন স্বামীজী তাঁর খয়রাতী পদ্ধতি অনুমোদন করেননি, কারণ দান অনেক সময় গ্রহীতার দীনতাবোধকে জাগিয়ে তোলে। স্বামীজী এক্ষেত্রে খয়রাতের পরিবর্তে জোর দিয়েছেন স্বাবলম্বনের উপর। একটি পত্রে স্বামীজী লিখেছেন: 'অখণ্ডানন্দ মহুলাতে অদ্ভুত কর্ম করছে বটে, কিন্তু কার্যপ্রণালী ভাল বলে বোধ হচ্ছে না।··· জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত সাহায্য হবে না।'[১৫] কয়েক বছর পরে আর একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন: "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং" (নিজেই নিজেকে উদ্ধার করবে)—সকল বিষয়েই এই সত্য; **We help them to help themselves** (তারা যাতে নিজেরাই নিজেদের কাজ করতে পারে, এইজন্য আমরা তাদের সাহায্য করছি) ···ওরা যখন বুঝতে পারবে নিজেদের অবস্থা, উপকার এবং উন্নতির আবশ্যকতা, তখনই তোমার ঠিক কাজ হচ্ছে জানবে।'[১৬]

১৩ ঐ, ১০ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ২২১
১৪ ঐ, ৯ম খণ্ড, ঐ, পৃঃ ৪৭৯
১৫ ঐ, ৭ম খণ্ড, ঐ, পৃঃ ৪১৯
১৬ ঐ, ৮ম খণ্ড, ঐ, পৃঃ ১০৪

গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে প্রধানত বাইরের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হলেও একাজে স্থানীয় অধিবাসীদের স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভরতার সম্ভবমত অংশ না থাকার কোন সংগত কারণ নেই। এই স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভরশীলতা নীতির অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে স্বামীজী গ্রামীণ মানুষদের মিতব্যয়িতার উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। তাদের স্বল্পসঞ্চয়ে উৎসাহিত করার পরামর্শও দিয়েছেন অনুরূপভাবে, জনসংখ্যাবৃদ্ধিরোধের জন্য গ্রামে প্রচলিত বহুবিবাহ প্রথার পরিবর্তন কামনা করেছেন।

(১০) দশম—কর্মকে উপাসনায় পরিণত করার আদর্শ। কর্মীরা গ্রামের দরিদ্রদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের মনোভাব পোষণ করে একটা ভুল করে। স্বামীজী তাঁর মাদ্রাজ বক্তৃতায় খুব স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন যে, কোন মানুষই অন্য মানুষকে সাহায্য করতে পারে না, সে ঈশ্বরভাবে মানুষের সেবা করতে পারে মাত্র সেবা আধ্যাত্মিক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। সেবা সম্পর্কে এই উপাসনার মনোভাব, আত্মোৎসর্গের মনোভাব সেবাকারীর চেতনাকে সমৃদ্ধ করে এবং সেবাপ্রাপ্তদের মধ্যে সুপ্ত আত্মচেতনা জাগিয়ে তোলে।

(১১) একাদশ—সংগতির অভাব, প্রকট আংশিক কর্মসংস্থান, সুযোগ বর্তমানেও গ্রহণের অপারগতা, উৎপাদন-স্বল্পতা এবং লাভজনক লেনদেন ক্ষমতার একান্ত অভাব—এইগুলিই গ্রামের দরিদ্রশ্রেণীর দুর্গতির কারণ। ফলে 'তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর ক্রমাগত যে আঘাত করিতেছে, তাহার বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না—কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে।'[১৭]

গ্রাম-সমাজকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য স্বামীজী পরামর্শ দিয়েছেন, তাদের সংগঠিত করে তুলতে। তিনি বলেছেন: 'সম্ভবতঃ অপর জাতির নিকট হইতে আমাদিগকে কিছু বহির্বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে; কিরূপে সঙ্ঘ গঠন করিয়া পরিচালন করিতে হয়, বিভিন্ন শক্তিকে প্রণালীবদ্ধভাবে কাজে লাগাইয়া কিরূপে অল্প চেষ্টায় অধিক ফল লাভ করিতে হয়, তাহাও শিখিতে হইবে।'[১৮] এই মনোভাববশতই চেয়েছিলেন গ্রামের যুবসম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে, 'সেবাব্রতী সংঘ' গড়ে তুলুক। সেই সেবাব্রতী সংঘগুলি দরিদ্র গ্রামবাসীদের জমিদার, আমলা, ব্যবসাদার এবং ফড়িয়াদের দীর্ঘকাল প্রচলিত শোষণের হাত থেকেই শুধু রক্ষা করবে না সেইসঙ্গে তাদের স্ব-পরিকল্পিত, আত্মনির্ভরশীল চিরস্থায়ী প্রগতির পথ দেখাবে।

(১২) দ্বাদশ—স্বামীজী সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন দারিদ্র্য-বিমোচনের উপর। যদিও IRDP, NREP, RLEGP, প্রভৃতি দারিদ্র্য-দূরীকরণের জন্য গঠিত সংস্থাগুলি একাজে অগ্রগতির পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু আপেক্ষিক দারিদ্র্যের (রিলেটিভ পভার্টি) সমস্যার ব্যাপারটি এখন পর্যন্ত আগের মতোই রয়ে গেছে। স্বামীজী চেয়েছিলেন, গ্রামীণ অর্থনীতিকে সবল করতে প্রয়োজন মতো কিছু কিছু শিল্পব্যবস্থা। স্থানীয় জন ও প্রকৃতি সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার করে কিছু ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তুললে ছদ্ম এবং আংশিক বেকারীর সমস্যা অনেকটা দূর হতে পারে। কৃষিতে অধিক

১৭ ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৩৬৩
১৮ ঐ, ৫ম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৪১

ফলনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিশ্রমজীবীর চাহিদা আনুপাতিকভাবে বাড়েনি। ফলে কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত শ্রমজীবীরা আগের মতোই দরিদ্র থেকে যাচ্ছে। এই সমস্যার মোকাবিলার জন্য ভি. কে. আর. ভি. রাও প্রমুখ বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করেছেন যে, শহরাঞ্চল থেকে আনুষঙ্গিক ও ক্ষুদ্রশিল্পগুলিকে স্থানান্তরিত করেই একমাত্র গ্রামীণ বেকারী সমস্যার একটা বাস্তব সমাধান-সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

এইভাবে উপরি-উক্ত মৌলিকসূত্রগুলি থেকে আমরা বিবেকানন্দের সমাজদর্শনের যে পরিচয় পাই, তাতে দেখি তিনি জনগণের উন্নতির পূর্ণতর পরিকল্পনাই শুধু নয়, সেইসঙ্গে চিন্তা করেছেন গ্রামীণ সমাজকে সংগঠিত করে মানব ও অন্যান্য সম্পদ সংগঠনের। এ পরিকল্পনা আন্তরিকভাবে রূপায়িত হলে কৃষকের কুটির থেকে, লাঙলের ফলা থেকে, জেলেমালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির ভেতর থেকে, ঝোড়জঙ্গল পাহাড় পর্বত ভেদ করে এক গৌরবময়, অপরাজেয় নূতন ভারতের জাগরণ ঘটতে পারে।

কিন্তু কারা এই গ্রামীণ মানুষের পরিত্রাণের জন্য এগিয়ে আসতে পারে? কে তাদের কাছে তাদের সমস্যার প্রকৃত রূপটি তুলে ধরে সমাধানের দিক চিহ্ন উদ্‌ঘাটিত করতে পারে? কে অগ্রসর হতে পারে তাদের সংগঠিত করার মহান দায়িত্ব নিয়ে? প্রকৃতপক্ষে, প্রশ্ন হল গ্রামের মানুষকে জাগ্রত করে একটি ন্যায়সঙ্গত এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ার কাজে তাদের সহযোগী করে তোলার। একাজের দায়িত্ব নিতে হবে প্রধানত গ্রামের যুবসম্প্রদায়কেই, যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু গ্রাম-সমাজ আজও চেতনাহীন—তাই প্রয়োজন বাইরের সহায়তা। এই অবস্থায় আত্মোৎসর্গের মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসার প্রয়োজন যুবসম্প্রদায়ের—সক্রিয় কর্মিরূপে, উদ্দীপনার প্রতিভূরূপে, নেতৃত্বদানের প্রেরণা নিয়ে। স্বামীজী এই যুবসম্প্রদায়কে উদ্দেশ করে বলেছিলেন: 'তোদের এখন কাজ হচ্ছে দেশে-দেশে, গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে···শিক্ষাহীন ধর্মহীন বর্তমান অবনতির কথা তাদের বুঝিয়ে দিয়ে বলগে, "ভাই সব, ওঠ, জাগো।"'[১৯] তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব হবে স্থানীয় যুবকদিগকে শক্তিশালী, সবল, বিশ্বস্ত, নিষ্ঠাবান এবং দেশের কল্যাণকর্মে সচেতন করে সংগঠিত করা। স্বামীজী বলেছেন: 'যে-সকল যুবক ভারতের নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নরূপ একমাত্র কর্তব্যে মন-প্রাণ নিয়োগ করিতে পারে, তাহাদের মধ্যে কাজ কর।'[২০] এই সকল যুবনেতা ও প্রেরণা-দাতার কাছে শিক্ষালাভ করে এবং সমাজের অন্যান্য শক্তির সহায়তায় তারা তাদের স্ব-পরিবার তথা স্ব-সমাজের কল্যাণ সাধনে নিজেরাই সমৃদ্ধির পথ খুঁজে বার করতে পারবে। স্বামীজীর মতে প্রকৃত ঋত পথ লুকিয়ে আছে যুবসম্প্রদায়ের সংঘবদ্ধতা ও সহযোগিতার মধ্যে।

আন্তর্জাতিক যুববর্ষ চলছে। যুবসম্প্রদায়ের একটি সুনিপুণ ও সুসম্পূর্ণ উন্নয়ন-পরিকল্পনা এবং জনগণের পুনরুজ্জীবন ভিন্ন অন্য কোনও অসম্পূর্ণ ও ক্ষুদ্র পরিকল্পনা জাতীয় যুবনীতি হিসাবে স্থান পাওয়া উচিত নয়। এর দ্বারাই গ্রামীণ পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে যুবশক্তির সংযোগসেতু রচিত হতে পারে।

শেষ করার আগে যুব ভাইবোনেদের

১৯ ঐ, ৯ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ১০৪
২০ ঐ, ৭ম খণ্ড, ঐ, পৃঃ ১৫২—৫৩

স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি স্বামীজীর সেই আহ্বানবাণী: 'তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ নির্ধারণ করিবার এই সময়—যতদিন যৌবনের তেজ রহিয়াছে, যতদিন না তোমরা কর্মশ্রান্ত হইতেছ, যতদিন তোমাদের ভিতর যৌবনের নবীনতা ও সতেজ-ভাব রহিয়াছে;...তবে ওঠ,...আয় ম্লান।'[21] 'লেগে যা। কদিনের জন্য জীবন? জগতে যখন এসেছিস, তখন একটা দাগ রেখে যা।'[22]*

২১ ঐ, ৫ম খণ্ড, ২য় সং. পৃঃ ২০২—২০৩

২২ ঐ, ৯ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ১৩৬

* ২৪ ডিসেম্বর ১৯৮৫, বেলুড়মঠ-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় যুবসম্মেলনের বৈকালিক অধিবেশনে লেখকের পঠিত ইংরেজী ভাষণ। অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত।

যুবসমস্যা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

স্বামী প্রমেয়ানন্দ

যুবসম্পদ মানবসমাজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যে-কোন দেশের পটভূমিতে প্রাণচঞ্চল গতিশীল যুবসমাজের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, গুরুত্ব অপরিসীম। আজ যারা যুবক, আগামী দিনে তারাই দেশের দায়িত্বশীল নাগরিক। তাই যুব-সমাজের লক্ষ্য ও প্রত্যাশা পূরণের উপর দেশের শান্তি, উন্নতি ও অগ্রগতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। আর সেজন্যই যুবশক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও প্রকাশ এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে যুবসমাজের যথাযথ সদ্ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার বিশেষ প্রয়োজন।

প্রাণময় জীবনীশক্তিতে সমৃদ্ধ যুবমন। সে চায় তার এই শক্তির বিকাশ, যা প্রকাশের জন্য সদা উন্মুখ। অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা, দুর্গমকে জয় করা—এ-সব গুণই যুবজীবনের বৈশিষ্ট্য। তাই সে ছুটতে চায় নিত্য-নতুন অভিযানে, লঙ্ঘন করতে চায় 'দুর্গমগিরি কান্তার মরু'। পাড়ি দিতে চায় মহাকাশের বুকে, ডুব দিতে চায় সমুদ্রের অতলতলে। বীরত্ব প্রদর্শনেই তার গর্ব।

আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত যুবশক্তি। কোন একটি মহৎ আদর্শ অনুযায়ী জীবন-গঠনে আগ্রহী। আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করতে সে পরাঙ্‌মুখ হয় না। আদর্শবোধে জীবন উৎসর্গ করতে, এমন কি প্রাণ দিতেও সে প্রস্তুত। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যুবকদের ভূমিকা সর্বজন-স্বীকৃত। সংগ্রামে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করে আদর্শবাদী যুবকরা আত্মত্যাগের যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের আজও তা অনুপ্রাণিত করে।

যুবমন কপটতায় অবিশ্বাসী, কপটতাকে সে মনে প্রাণে ঘৃণা করে। দুর্নীতির, বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে করে যুদ্ধঘোষণা, প্রতিবাদে হয় সোচ্চার। বড়দের কথায় ও কাজের মধ্যে কোন অসঙ্গতি দেখলে তা প্রকাশ করতে ভয় পায় না। তবে অনেক সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বয়সানুপাতিক ভাবালুতা ও অপরিপক্ব বুদ্ধির জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। এই সুযোগ নেয় সুযোগসন্ধানীর দল। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা এ-সব যুবকদের ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করে এবং ফেলেও। তাদের ফাঁদে পড়ে যুবকরা তখন আদর্শের কথা ভুলে যায়, ফলে বিপ্লবের ভাব স্তিমিত হয়ে আসে। শক্তির

আত্মপ্রকাশ হয় তখন হিংসাত্মক ও অসামাজিক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে। অমৃত গরলে পরিবর্তিত হয়।

শিশু থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধ পর্যন্ত—সমাজের প্রত্যেকটি স্তরের মানুষের কিছু না কিছু সমস্যা আছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়টি যুবজীবনের তথা যুবসমস্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই অন্যদের সমস্যা-আলোচনা এখানে অবান্তর। যুবজীবনের যে সমস্যা তার ফল যে শুধু যুবসমাজকেই ভোগ করতে হয় তা নয়। তার ফল অনেক সময় সমাজকেও প্রভাবিত করে। যুবজীবনের উচ্ছলতা এবং বুদ্ধির অপরিপক্বতা থেকে সমাজেও নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই যুবজীবনের প্রকৃত সমস্যাগুলি কি এবং কিভাবে সেগুলির সমাধান হলে যুব-সম্পদের ক্ষয় রোধ হবে, যুবশক্তিকে দেশের উন্নয়ন ও গঠনমূলক প্রণালীতে প্রবাহিত করা যাবে, এবং সম্পদেরও যথার্থ সদ্ব্যবহার হবে—চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

প্রত্যেক সমস্যারই দুটি দিক আছে। অর্থাৎ সমস্যা দ্বিবিধ—একটি গৌণ বা বাহ্যিক সমস্যা, অপরটি মৌল বা আন্তর সমস্যা। যুবসমস্যা সম্বন্ধেও এরূপ বুঝতে হবে। সমস্যার গৌণ বা বাহ্যিক দিকটির কথাই প্রথমে আলোচনা করছি। ব্যবহারিক শিক্ষা ও অর্থোপার্জনই প্রধানত এই সমস্যার আওতায় পড়ে। শিক্ষা-সুযোগের অপ্রতুলতা এবং অর্থোপার্জনের সীমিত সুযোগ যুবজীবনকে হতাশাগ্রস্ত করে তুলেছে। স্বাধীনতার আটত্রিশ বছর পরেও শিক্ষা ও শিল্পায়ন—কোন প্রকল্পই দেশের শেকড়-ছোঁয়া ও সামাজিক বাস্তবতাসম্মত করা সম্ভব হয়নি। ফলে শিক্ষার সুযোগ সঙ্কুচিত, অর্থোপার্জনের পথও অপ্রশস্ত। শিল্প-বিকাশ-উদ্যোগ ও অন্যান্য উন্নয়ন-প্রকল্পাদি চালু করার ফলে জাতীয় আয় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই বৃদ্ধির ফল ভোগ করছে সমাজের অতি মুষ্টিমেয় এক অংশ। ব্যাপক জনসাধারণ এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত, বিশেষ করে তরুণরা। কেননা, প্রকল্পগুলিতে অধিকতর মাত্রায় যুবশক্তি বিনিয়োগের পরি-কল্পনার অভাব, ফলে বেকারসমস্যা। বেকার-সমস্যা যুবসমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে।

বেকারত্ব দারিদ্র্যেরই আর এক রূপ। সাম্প্রতিক[১] এক সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো আছে এমন বেকারদের সংখ্যা এক কোটি বাষট্টি লক্ষ। তাদের মধ্যে তিয়াত্তর লক্ষ স্কুলফাইন্যাল পাশ। পল্লী অঞ্চলের আধাবেকারদের এমন কোন সঠিক হিসাব খাতাপত্রে না থাকলেও তাদের সংখ্যা বারো কোটির কম হবে না। একমাত্র পশ্চিম-বঙ্গেই ত্রিশ লক্ষ তরুণ-তরুণী এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়ে কর্মহীন জীবন যাপন করছে। গ্রামাঞ্চলে যেখানে শিক্ষার আলো প্রবেশ করেনি, সেখানকার অবস্থা আরও ভয়াবহ। সে-সব অঞ্চলের ছেলে-মেয়েদের বাধ্য হয়ে অল্প বয়সেই কম মজুরিতে কায়িক পরিশ্রমের কাজে লেগে যেতে হয়। মজুরি কম হওয়ার কারণ বেকারদের সংখ্যাধিক্য। কাজেই যাদের কর্ম-সংস্থান আছে তারাও অনেকে দরিদ্র, আর যাদের কর্মসংস্থান নেই তাদের কথা বলাই বাহুল্য। এই দারিদ্র্য হতেই আসে নৈরাশ্য, ক্ষোভ ও ক্রোধ। এ সময় তাদের প্রতি কেউ সহানুভূতি দেখালে তারা নির্বিচারে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। যাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে তারা বেশির ভাগই ছলনাকারী কোন না কোন প্রতিক্রিয়াশীল দলের লোক। অর্থোপার্জনের

১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : মূলধন ও প্রযুক্তিবিদ্যা, অমিয়কুমার সেন, দেশ ৫৩ বর্ষ, ১০ সংখ্যা।

লোভ দেখিয়ে এ-সব স্বার্থান্বেষীর দল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে এ-সব যুবকদের ব্যবহার করে। ফলে যুবকরা যে শুধু প্রতারিত হয় তা নয়, তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথও চিরকালের মতো রুদ্ধ হয়ে যায়।

তাছাড়া আছে সেই চিরন্তন নবীন-প্রবীণ সংঘাত। নবীনরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী। তাই সবকিছু যাচাই করে গ্রহণ করতে চায়। বড়রা বলেছেন বলেই কিছু মানতে বা গ্রহণ করতে নারাজ। প্রশ্ন করে—কি, কেন ইত্যাদি। সেজন্য প্রবীণদের চোখে নবীনরা অনেক সময় দুর্বিনীত, উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত। যুবজীবনের গতিবেগ প্রচণ্ড। তাদের এই গতিবেগ প্রবীণদের শঙ্কিত করে তোলে। তাদের আশঙ্কা নবীনদের এই গতিশীলতা পুরাতন ভাল সব-কিছুকে ভেঙেচুরে ধ্বংস করে ফেলবে। তাই উৎসাহের পরিবর্তে প্রবীণদের কাছ থেকে তারা পায় নিরুৎসাহ, অবহেলা। কথায় কথায় শুনতে হয়: 'আজকালকার ছোঁড়ারা যা হয়েছে না'। যেন যুবসমাজ অতীতে কখনও এরূপ ছিল না!

যুবসমস্যার মৌল দিকটির আওতায় পড়ে প্রধানত—অফুরন্ত প্রাণশক্তি সুনিয়ন্ত্রণের এবং সুস্পষ্ট আদর্শ ও জীবনের লক্ষ্যের অভাব। যদিও প্রাণময় জীবনীশক্তিতে সমৃদ্ধ যুবমন, তথাপি অপরিণত বুদ্ধির জন্য সে বুঝতে পারে না কিভাবে সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করলে এই শক্তিকে কার্যকরী করা যায়। আর যদিও বা কিছুটা বুঝতে পারে, প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কারণে তা কার্যকরী করতে পারে না। সে দেখে সমাজ প্রতিপদে তার স্বাধীনতা খর্ব করছে। তার প্রতিভার বিকাশ বা প্রকাশের সুযোগ তো নেই-ই, তদুপরি পাচ্ছে শুধু বাধা। আর বাধা থেকে আসছে ক্ষোভ, আর এই ক্ষোভই পরিণামে ধ্বংসের রূপ নেয়। যেমন 'প্রবল জলের স্রোত পেলে তবেই জল-শক্তির সাহায্যে খনির কাজ করা যেতে পারে,'[২] অপরপক্ষে বাধা পেলে বাঁধ ভেঙে প্লাবনের সৃষ্টি করে মানুষের অশেষ দুর্গতির কারণ হয়। যুবশক্তি সম্বন্ধেও সেরূপ। সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত হলে গঠনমূলক কাজে লাগে, নতুবা শক্তি ধ্বংসের রূপ নেয়।

তাছাড়া যুবজীবনে আছে আদর্শের বিলাস, কিন্তু নেই আদর্শ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা। তাই সমাজের সকল অবিচার বা অনাচার দূর করবার আন্তরিক ইচ্ছা এবং অফুরন্ত জীবনীশক্তির জন্য মনে অদম্য উৎসাহ থাকলেও বাস্তবে শক্তি-প্রয়োগের ক্ষেত্রে করে ফেলে বাড়াবাড়ি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত করাই তার স্বভাব। বুঝতে পারে না এটা তার দুর্বলতা, কাজে অসফলতার কারণ। তাতে আরব্ধ কাজ তো শেষ হয়ই না, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কতকটা পথহারা পথিকের মতো এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করতে থাকে। ফল, ইতোনষ্ট ততো ভ্রষ্ট।

যুবজীবনের গৌণ বা বাহ্যিক সমস্যাগুলি সাময়িক, যদিও সমস্যাগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে দেখা দেয়। তথাপি সকলের সম্মিলিত চেষ্টায়, যৌথ সামাজিক প্রয়াসে ঐগুলির মোটা-মুটি সমাধান সম্ভব। কিন্তু মৌল বা আন্তর সমস্যার সমাধানের চেষ্টা না করে শুধু বাহ্য সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করলে ফল দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। আর এটাও ঠিক যে, বাহ্য সমস্যার সমাধান যতটা সহজ, আন্তর সমস্যার সমাধান ততোধিক কঠিন। প্রথমটির সমাধান অনেকটা যৌথ সামাজিক প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল, অপর পক্ষে দ্বিতীয়টির সমাধান ব্যক্তিগত চেষ্টার উপরই বেশি নির্ভরশীল। যৌথ সামাজিক প্রচেষ্টা এখানে সহায়ক মাত্র।

২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৪র্থ খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ২৮৩

সমস্যা যেমন দ্বিবিধ, তার সমাধানের উপায়ও দ্বিবিধ। একটি প্রতিষেধ, অপরটি নিরাময়। নিরাময় অপেক্ষা প্রতিষেধ-পদ্ধতি যে ভাল তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রতিষেধকে কিছু ভাঙতে হয় না। সমস্যার সম্ভাবনা আঁচ করে প্রতিষেধের ব্যবস্থা নিতে পারলে সমস্যা আর রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না, অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। অপর পক্ষে, নিরাময়ের পদ্ধতিতে যা আছে তাকে ভাঙতে হয়। স্বামীজীও evolution (অভি-ব্যক্তিবাদ)-এর পক্ষপাতী ছিলেন, revolution (বিপ্লববাদ)-এর নয়।

যুবসমস্যার সমাধানের জন্য সর্বাগ্রে চাই আরও ব্যাপক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন যাতে গ্রামে-গঞ্জে—সর্বত্র শিক্ষার আলো পৌঁছতে পারে। আর শিক্ষা পদ্ধতিতেও এমন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন যাতে চাকরি না করেও অন্য উপায়ে যুবকরা অর্থোপার্জন করে স্বনির্ভর হতে পারে। এ-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন : 'আমাদের চাই কি জানিস?—স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর science (বিজ্ঞান) পড়ানো, চাই technical education (কারিগরি শিক্ষা), চাই যাতে industry (শিল্প) বাড়ে; লোকে চাকরি না করে দু-পয়সা করে খেতে পারে।'[৩] 'পাশ্চাত্যবিজ্ঞান সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর্—চাকরি গুখুরি করে নয়, নিজের চেষ্টায়—পাশ্চাত্যবিজ্ঞানসহায়ে নিত্য-নূতন পন্থা আবিষ্কার করে।'[৪] তাই দেখা যাচ্ছে স্বামীজী যুবকদের শুধু চাকরি করে দারিদ্র্য-মোচনের পক্ষপাতী ছিলেন না। পরন্তু বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষি ও কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা করে দারিদ্র্যমোচনের জন্য অপরের দ্বারস্থ না হয়ে যুবকরা যাতে স্বনির্ভর হতে পারে, তার উপর বেশি জোর দিয়েছেন।

দেশের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন শিল্প ও অন্যান্য প্রকল্পে যুবকরা যাতে কর্মসংস্থানের অধিক সুযোগ পায় তার জন্য সরকারকে তদনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। কর্মসংস্থান না থাকলে অফুরন্ত অবসর সময় পাওয়ার জন্যও যুবকদের অনেক সময় বিপথগামী হয়ে নানা অসামাজিক কর্মে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তৎপরিবর্তে এই শক্তিকে গঠনমূলক প্রণালীতে প্রবাহিত করতে পারলে শুধু যে সম্পদের অপচয় বন্ধ হবে তা নয়, সদ্ব্যবহারও হবে। সরকারী, বেসরকারী এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষের সমবেত চেষ্টা থাকলে এটা কার্যকরী করা সম্ভব।

তারপর আছে প্রবীণদের ভূমিকা। যুবকদের প্রবীণদের অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার যথাযথ সম্মান দেওয়া শিখতে হবে। অপরপক্ষে, প্রবীণদেরও আরও উদার মনোভাব নিয়ে দেশোন্নয়ন-প্রকল্পের প্রতিটি স্তরে যুবসমাজকে যুক্ত রেখে দেশ গঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব তাদের হাতে অর্পণ করতে হবে। স্নেহশীল পিতা সর্বদা পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তিনি যেমন তাঁর আদর্শ ও জীবনের অভিজ্ঞতাসকল পুত্রকে সানন্দে দান করবেন, পুত্রও সেরূপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে সেগুলি আত্মগত করে জীবনে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করবে। সমাজজীবনেও সেরূপ। প্রবীণ যেন শরীরের মাথা, আর নবীন তার হাত। যদি মাথার চিন্তাসকল হাতের দ্বারাই বাস্তবে রূপায়িত হয়, তাহলে সংঘাতের পরিবর্তে আসবে সম্প্রীতি, সুদৃঢ় হবে জাতীয়-সংহতির ভিত্তি।

তাছাড়া শিক্ষা পদ্ধতিতে এমন ব্যবস্থা থাকবে যাতে দেশের ভাবী নাগরিক যুবসম্প্রদায় আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির আদর্শগুলি আত্ম গত

৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৪০৩

৪ ঐ, ঐ, পৃঃ ১৬৪

করে প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক হতে পারে। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে সেরূপ ব্যবস্থা নেই বলেই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে আজকের যুবসমাজ দূরে সরে যাচ্ছে। ফলে জাতীয়-সংহতির ভিত্তিও দুর্বল হচ্ছে।

যুবজীবনের মৌল সমস্যা সমাধানে আদর্শ শিক্ষার ভূমিকা সর্বাধিক। স্বামীজী বলেছেন: 'এমন একটিও সমস্যা নাই, "শিক্ষা" এই মন্ত্রবলে যাহার সমাধান না হইতে পারে।'[৫] শিক্ষার মূল কথা শ্রদ্ধা ও চরিত্রগঠন। আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য, দেশ থেকে এই শ্রদ্ধা এখন বিলুপ্তপ্রায়। আর শ্রদ্ধা ছাড়া চরিত্রগঠন কখনই সম্ভবপর নয়। স্বামীজীর কথায়: 'ছোটবেলা থেকে আমরা negative education (নেতিমূলক শিক্ষা) পেয়ে আসছি। আমরা কিছু নই—এ-শিক্ষাই পেয়ে এসেছি। আমাদের দেশে যে বড়লোক কখন জন্মেছে, তা আমরা জানতেই পাই না। Positive (ইতিমূলক) কিছু শেখানো হয়নি। হাত-পায়ের ব্যবহার তো জানিইনি। ইংরেজদের সাতগুষ্টির খবর জানি, নিজেদের বাপ-দাদার খবর রাখি না। শিখেছি কেবল দুর্বলতা। এতে আর শ্রদ্ধা নষ্ট হবে না কেন?'[৬] আস্তিক্যবুদ্ধি, আত্মবিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সমার্থক। আত্মবিশ্বাস থাকলে মানুষ যে-কোন সমস্যার সমাধান নিজেই করতে পারে। কাজেই যুবকদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে যাতে তাদের জীবনে এই শ্রদ্ধার ভাবটির বিকাশ ঘটে। স্বামীজীর মতে: 'শিক্ষা বলিতে আমি বুঝি যথার্থ কার্যকরী জ্ঞান-অর্জন; বর্তমান পদ্ধতিতে যাহা পরিবেশন করে, তাহা নয়। শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় চলিবে না। আমাদের প্রয়োজন সেই শিক্ষার যাহা দ্বারা চরিত্র গঠন হয়, মনের বল বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয় এবং মানুষ স্বাবলম্বী হইতে পারে। চাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত বেদান্তের সমন্বয়—ব্রহ্মচর্য শ্রদ্ধা এবং আত্মবিশ্বাস হইবে যাহার মূলমন্ত্র।'[৭] 'যেদিন ভারতবাসী এই আত্মশ্রদ্ধা হারাইয়াছে, সেইদিন হইতে শুরু হইয়াছে ভারতের জাতীয় জীবনে অবনতির পালা। তাই ব্যষ্টির জ্বলন্ত আত্মবিশ্বাসের উপর যে জাতির অগ্রগতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে, এই সুমহান্, প্রাণপ্রদ চমৎকার তত্ত্বটি তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে আশৈশব শিখাইতে হইবে।'[৮] তাছাড়া 'শিক্ষা দিবার সময় আর একটি বিষয় আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে—তাহারাও (শিক্ষার্থীরাও) যাহাতে নিজেরা চিন্তা করিতে শিখে, সেই বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে হইবে। এই মৌলিক চিন্তার অভাবই ভারতের বর্তমান হীনাবস্থার কারণ। যদি এইভাবে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে তাহারা মানুষ হইবে এবং জীবন সংগ্রামে নিজেদের সমস্যা সমাধান করিতে সমর্থ হইবে।'[৯]

চরিত্রই জাতির ভিত্তি, ব্যক্তি-চরিত্র ভাল হলে জাতীয়-চরিত্র ভাল হতে বাধ্য। চরিত্রবান্ ব্যক্তি যে-কাজে হাত দেবে তাতেই সাফল্য লাভ করবে, সন্দেহ নেই। জাতি সম্বন্ধেও সে-রূপ। তাই 'এখন আমাদের প্রয়োজন চরিত্র-গঠন, অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তিকে প্রবল করা। পুনঃপুনঃ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিলেই জীবনের ঊর্ধ্বায়ন

৫ ঐ, পৃঃ ৪৮৯

৬ ঐ, পৃঃ ৪৯৯

৭ ভারত-কল্যাণ, ৮ম সংস্করণ, পৃঃ ৫৯

৮ ঐ, পৃঃ ৬৩

৯ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৩৪২

ঘটে। বাস্তবিক, ইচ্ছাশক্তির প্রভাব অপরিসীম। একমাত্র চরিত্র বা ইচ্ছাশক্তিই বাধাবিপত্তির বজ্রদৃঢ় প্রাচীর বিদীর্ণ করিতে পারে।'[১০] কাজেই যুবকদের শুধু অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করলেই চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক চরিত্র দৃঢ় করবার শিক্ষায়ও তাদের শিক্ষিত হতে হবে যাতে তারা যথার্থ মানুষ হতে পারে। আগে মানুষ, তারপর অন্য সবকিছু। তাই স্বামীজী বলেছেন: 'মানুষ চাই, মানুষ চাই, আর সব হইয়া যাইবে।'[১১]

এ প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ে। একটি ছোট ছেলে বালসুলভ ঔৎসুক্যবশতঃ তার বাবাকে একটার পর একটা প্রশ্ন করে যাচ্ছে—এটা কি? পাখিটার রঙ্ হলুদ কেন? ঐ দূরে আকাশের গায়ে কিসের দাগ? ইত্যাদি। বাবা দেখলেন ছেলেটির সব প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে তাঁর আর নিশ্চিন্ত হয়ে কোন কাজ করা চলবে না। তাই ছেলেটিকে চুপ রাখবার জন্য তিনি এক কৌশল বের করলেন। তাঁর হাতের কাছে ছিল কাগজে-আঁকা পৃথিবীর একখানি মানচিত্র। বাবা মানচিত্রখানিকে ছিঁড়ে কয়েক টুকরো করে টুকরোগুলি ছেলের হাতে দিয়ে বললেন: এই টুকরোগুলি নিয়ে যাও এবং ঐগুলিকে এমনভাবে জোড়া লাগিয়ে আমাকে ফেরত দাও যাতে মানচিত্রখানি আগে যেরূপ ছিল ঠিক সেরূপ হয়। বাবার ধারণা ছিল ছেলের পক্ষে একাজ সম্ভব হবে না, কেন না ছেলেটি আগে কখনও পৃথিবীর মানচিত্র দেখেনি। তবে ছেঁড়া কাগজের টুকরোগুলি ঠিকমত জোড়া দেওয়ার চেষ্টায় সে অনেক সময় কাটাবে। ততক্ষণ তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কয়েক মিনিট পরই ছেলেটি টুকরোগুলি জোড়া লাগিয়ে কাগজখানি বাবার হাতে ফেরত দিল। এখানেই শেষ নয়। দেখে বাবা বিস্মিত হলেন, মানচিত্রখানি যেমন ছিল ঠিক তেমন করেই ফেরত দিয়েছে। কিভাবে সম্ভব হল প্রশ্ন করলে ছেলেটি বলল: কেন? এতো খুব সহজ। কাগজখানির এক পিঠে ছিল মানচিত্র, আর অপর পিঠে ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের ছবি। মানুষের ছবির সঙ্গে আমি পরিচিত, তার কোথায় হাত, কোথায় পা, কোথায় কান থাকে আমি সব জানি। সেভাবে কাগজের টুকরোগুলি জোড়া দিতে মানুষের ছবিটি যেই ঠিক হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে অপর পৃষ্ঠার মানচিত্রখানিও আপনা-আপনি ঠিক হয়ে গেল। কাজেই ঠিক ঠিক 'মানুষ' হতে পারলে বাকী সব আপনা-আপনিই হবে।

১০ ভারত-কল্যাণ, ৮ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৩

১১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১১৩

আজ নারী-জাগরণে শ্রীমা সারদাদেবীকে কেন প্রয়োজন

শ্রীমতী কণা বসু মিত্র

আজ পৃথিবীর চারদিকে Women's Liberation Movement চলছে, অর্থাৎ নারী স্বাধীনতার আন্দোলন। মেয়েরা শিক্ষায়, দীক্ষায়, যোগ্যতায় কোনদিক থেকেই পুরুষের চেয়ে কম নন। তবু পুরুষ-শাসিত সমাজ তাঁদের নিজেদের অধীনে রেখে, নারীদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন—এই বিদ্রোহী মনোভাবই Women's Liberation Movement-এর আসল কারণ। যদিও কয়েক বছর ধরে এই সংগ্রামের ফলে, মেয়েরা আইনগতভাবে পুরুষের মতো প্রায় সব অধিকারই পেয়েছেন। কিন্তু কজন মেয়ে সেই অধিকার দাবি করতে চান এবং কজনই বা পুরুষ-শাসিত সমাজে তিনি একজন অসহায় ভেবে এই হীনতাবোধের যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পান? সব থেকে বড় কথা হল, মেয়েরা নিজেরাই অনেকে পছন্দ করেন না পুরুষের প্রতি এই বিদ্রোহী মনোভাব। নারী আর পুরুষ তো একে অন্যের পরিপূরক। তাঁরা দুই শত্রু শিবিরের বাসিন্দা হবেন কেন? পুরুষেরাও এই বিদ্রোহী মনোভাবকে স্ত্রীজাতীয় বলে মনে করেন না। অতএব আজ আমাদের ভাববার দিন এসেছে। নারীর মুক্তি আসবে, পুরুষ সেজে নয়। পুরুষের বিরুদ্ধে ঘৃণা পোষণ করেও নয়। আর আইন আদালত কিছু অধিকার দিতে পারলেও নারীকে কি সেই মহিমায় ভূষিত করতে পারবে, আমাদের ভারতবর্ষের চিরন্তন নারীর যে আদর্শ, সেই ত্যাগ, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি, মাতৃত্বের মহিমায়?

তাই আজ নারীর মুক্তি আসবে নারীর ব্যক্তিত্ব গঠনের মধ্যে দিয়ে। সে ব্যক্তিত্ব কঠিন, কোমল, মধুর। তিনি যে মা। পুরুষ-শাসিত সমাজে তিনি হীন হবেন কেন? শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্য সহধর্মিণী শ্রীসারদাদেবীর মধ্যে দেখি সেই বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের উদাহরণ। তিনিই হতে পারেন আজ আধুনিক নারীসমাজের আদর্শ। নারী স্বাধীনতার জাগরণে আজ তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

শ্রীসারদা মায়ের দেহত্যাগের পর জোসেফিন ম্যাকলাউড বা জয়া স্বামী সারদানন্দকে লিখেছিলেন: "আধুনিক হিন্দুনারীর কাছে তিনি রেখে গেলেন আগামী তিনহাজার বছরে নারীকে যে মহিমময় অবস্থায় উন্নীত হতে হবে, তারই আদর্শ।" স্বামী বিবেকানন্দও আমেরিকা থেকে স্বামী শিবানন্দকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: "ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন? শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।"

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের মেয়েদের সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী করলেও সারা বিশ্বের নারীসমাজের কাছেই তিনি আজ পরম উদাহরণ। শ্রীসারদাদেবীর মধ্যে ছিল ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন রূপ। তিনি কখন জননী, কখন স্ত্রী, কখন সন্ন্যাসিসংঘের সংঘনেত্রী—যখন যে রূপেই তাঁকে দেখি না কেন সেই কঠিন কোমল ব্যক্তিত্বের সমন্বয় আমাদের সর্বদাই চোখে পড়ে। ব্যক্তিত্ব তো চোখে দেখা যায় না।

ব্যক্তিত্ব ধরা পড়ে মানুষের আচার-ব্যবহারে চাল-চলনে। শ্রীসারদাদেবীর ব্যক্তিত্ব ছিল ধীর, স্থির পবিত্রতা ও উদার মা তৃত্বে মণ্ডিত। তিনি যেন মঙ্গল প্রদীপ জ্বেলে রেখেছেন সব জায়গায়, সবার মধ্যে। ঈশ্বরের মানবীরূপের সার্থক প্রকাশ তিনি। দেবীত্বের চোখধাঁধানো আলো নিয়ে তিনি আসেননি। এসেছেন আমাদেরই ঘরের মেয়ে, বউ হয়ে। তাই তাঁর ভক্তরা কেউ কেউ যখন জগন্মাতা, মহামায়া ইত্যাদি বলে তাঁকে স্তুতি করেছেন, তখনও তিনি বিচলিত হননি। তিনি বলেছেন: "ঠাকুরই তো সব। আমি কে?" তাঁর চরিত্রের বিনয়, স্বামীর প্রতি ভক্তি, নিজের ক্ষমতার প্রতি এই যে ঔদাসীন্য এও তো ব্যক্তিত্বেরই আর এক রূপ।

আজকের আধুনিক সমাজের মেয়েরা পর্দানশিন জীবন থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের জগতে পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমান তালে লড়াই করতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রেই ঘর-সংসারকে উপেক্ষা করে থাকেন। এই মনোভাবের মধ্যে দাসসুলভ অনুকরণ ছাড়া স্বাধীন ব্যক্তিত্বের কোন পরিচয় নেই। শ্রীসারদাদেবী বলেছেন: "যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন।" তিনি শুধু এই উপদেশ দিয়েই থেমে থাকেননি। তাঁর দিব্য জীবনে এই নির্দেশ প্রতিফলিত। দক্ষিণেশ্বরের নহবতে থাকাকালীন জীবনে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সংসার করেছেন। ঘোমটার আড়ালে থেকে, নহবতের দরমার বেড়ার আড়ালে বসে, ঠাকুরের ভক্তসেবায় সদা নিরত ছিলেন। কিন্তু মুখে কোন প্রতিবাদ নেই। আবার এই শ্রীসারদাই ঠাকুরের দেহত্যাগের পর ঘোমটা সরিয়ে সন্ন্যাসিসংঘের সংঘনেত্রী হয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে স্বয়ং স্বামীজী বন্ত মাথা নত করেছেন। ঠাকুরের শিষ্যরা কোন সমস্যার সম্মুখীন হলেই শ্রীশ্রীমায়ের কাছে ছুটেছেন। শ্রীসারদা মায়ের মতামতকে 'হাই-কোর্টে'র রায় বলে মেনে নিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের শিষ্যরা কি শুধু গুরুপত্নী মনে করে শ্রীশ্রী-মাকে এতটা শ্রদ্ধা করেছেন? নাকি শ্রীসারদার কথা শুনে চলার জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণ কোন আদেশ দিয়ে গেছিলেন তাঁদের? তাও তো নয়। তিনি তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্বের জোরেই এই অধিকার পেয়েছিলেন। যে ব্যক্তিত্ব ক্ষমাসুন্দর অথচ বজ্রকঠিন। স্বামীজী বলেছিলেন: "রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন, যা হয় বলো, দাদা। কিন্তু যার মায়ের উপরে ভক্তি নাই, তাকে ধিক্কার দিও।"

আজকের যুগে বাইরের জগতে পুরুষের পাশাপাশি কাজ করতে গিয়ে মেয়েরা অনেক সময় তাঁদের ব্যক্তিত্ব বা সত্তাত্ব হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু শ্রীসারদার মধ্যে কতখানি আত্মবিশ্বাস ছিল যার বলে বিধবা যুবতী ঠাকুরের অল্পবয়সী শিষ্যদের সঙ্গে থাকার কথা নিজেই চিন্তা করেছেন! যদিও সন্ন্যাসিসংঘের ভার শ্রীশ্রীমায়ের ওপর প্রত্যক্ষভাবে না থাকলেও আত্মিক ও আধ্যাত্মিকভাবে ছিল। স্বামীজী এবং তাঁর গুরুভাইরাই এই সংঘ পরিচালনা করেছিলেন, তবু শ্রীসারদাদেবীই ছিলেন তার কেন্দ্রবিন্দু। সুতরাং আজকের যুগের মেয়েদের আদর্শ নেত্রী হবার পথও শ্রীশ্রীমা দেখিয়ে গেছেন। দেখিয়ে গেছেন বাইরের জগতে বেরিয়ে মেয়েরা কি করে পুরুষকে সামলাবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিশ্চয় গর্জে উঠতে হবে। যেমন হরিশের পাগলামীতে শ্রীসারদাদেবীও ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করেছিলেন। পুলিশ গর্ভবতী রমণীকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়ায় তিনি কি ভীষণ প্রতিবাদ করেছিলেন, তা আমরা জানি। আমরা তাঁর চরিত্রে দেখেছি, প্রতি-বাদের আরও কত বলিষ্ঠ রূপ। স্ত্রীকে মারধোর

করায় স্বামীকে ভৎ'সনা করছেন। আমরা কিছুতেই ভাবতে পারি না, একজন তথাকথিত গ্রাম্য মেয়ের চরিত্রে এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ কিভাবে হল! নারী স্বাধীনতার কিংবা নারীমুক্তির এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কি হতে পারে? তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে ছিল দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। কোন পুরুষের ওপরে নির্ভর করার প্রয়োজন হয়নি। আজ সারা পৃথিবীর নারীসমাজ অবাক হয়ে দেখছেন এই মহীয়সী নারীকে যিনি গ্রাম্য, সাধারণ অর্থে অশিক্ষিতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীহীন, তিনিই আমাদের সামনে আজ নারী-মুক্তির দরজা খুলে দিয়েছেন।

আজকের এই Women's Liberation Movement-এর যুগে মেয়েরা নিজেদের মুক্তির কথা ঘোষণা করছেন, পুরুষ-শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে। কিন্তু এই পুরুষ-শাসিত সমাজের পুরুষেরা কারা? তাঁরা তো এই মেয়েদেরই হাতের তৈরি সন্তান। ছোটবেলায় মায়ের শিক্ষাতেই সন্তান মানুষ হয়। মেয়েরা যিনি যেমন মানসিকতায় তাঁর সন্তানকে শিক্ষা দেবেন, সন্তানও মায়ের সেই আদর্শ গ্রহণ করবে। মেয়েরা নিজেরাই যে পুরুষের অধীন হতে পছন্দ করেন। মায়ের সেই মনোভাবই সন্তান পরবর্তিকালে বুঝে নেয়। তাই মেয়েরা আপাতদৃষ্টিতে সমাজের সবক্ষেত্রে স্বাধীনতা আজ পেলেও পরোক্ষে পরাধীনই। কিন্তু একে কি আমরা পরাধীনতা বলব? এই পরাধীনতায় মুক্তি নেই? পিতার স্নেহ, স্বামীর ভালবাসা, সন্তানের অধিকার—এর মধ্যে কি মুক্তি নেই? রাজনৈতিক অধিকার, শিক্ষার অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার—মেয়েরা সব অধিকারই পেয়েছেন। তবুও আজ মেয়েরা কি যেন হারিয়ে চলেছেন, যার নাম স্নেহ, প্রেম, শান্তি। নারীর নারীত্বের মহিমায় পুরুষ যে নতি স্বীকার করে, সে-বোধই আজ মেয়েদের হারিয়ে যাচ্ছে। সেখানেও ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন। শ্রীসারদাদেবী কি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সব অভিমতই মেনে নিতেন? তিনিও তো ঠাকুরের কাছে কখন কখন তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন যখন ঠাকুরের কোন মত তাঁর পছন্দ হয়নি। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের আপত্তি সত্ত্বেও চরিত্রহীনা স্ত্রীলোককে কাছে টেনে বলতে পেরেছেন: "এসো মা ঘরে এসো।" বলতে পেরেছেন: "শরণাগতকে রক্ষা না করলে ঈশ্বরেরই মহাপাপ হবে।" ঠাকুরের অসম্মত জেনেও উকিলকে সাহস দিয়েছেন: "ওকালতি ব্যবসা বই তো নয়।" আজকের আধুনিক যুগের নারীসমাজের অনেকেই স্বামীর ইচ্ছার পুতুল হয়ে নিজেদের ধ্বংস করছেন বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা নিশ্চয় অভিভূত হবেন শ্রীসারদার এই আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের উদাহরণে।

আজকের তথাকথিত শিক্ষিতা মহিলারা বাইরের চাল-চলনে প্রগতিশীল হলেও মনের মুক্তির ব্যাপারে সেই মধ্যযুগীয় কু-সংস্কারেই আবদ্ধ রয়েছেন। অথচ শ্রীসারদাদেবী আচার-আচরণে মধ্যযুগীয় হয়েও অন্ধ কুসংস্কারকে কখনই প্রশ্রয় দেননি। আজ থেকে ৬০।৭০ বছর পূর্বে জয়রামবাটীতে একদিন মুসলমান ডাকাত আমজদের এঁটো পাতা তুলে, সেই উচ্ছিষ্ট স্থানটি শ্রীশ্রীমা জল ঢেলে ধুয়ে দিলেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী "ও পিসিমা, তোমার জাত গেল" বলে চিৎকার করে উঠেছিল। এই কাজের জন্য সে তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। আমাদের মনে রাখা দরকার তিনি ছিলেন আচারনিষ্ঠ বিধবা ব্রাহ্মণী। তবু তিনি তাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন: "আমার শরৎ (সারদানন্দজী) যেমন ছেলে, এই আমজদও তেমনি ছেলে।" বর্তমানে আধুনিকযুগে নারীসমাজ এই উদার মানসিকতার কথা ভাবতে পারেন? ভারতবর্ষে আজও জাত-পাতের অন্ত

নেই। বিদেশেও সাদা-কালোর জাত-পাত। মানুষ মানুষের কাছ থেকে কতদূরে চলে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিদ্যায় সমৃদ্ধ দেশগুলি আজও এই সংকীর্ণ মানসিকতা থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

শ্রীসারদাদেবী আধুনিক রমণী না হয়েও প্রগতিশীল মনের পরিচয় দিয়েছেন আক্ষরিক অর্থে। তিনি মেয়েদের মুক্তির পথ দেখিয়েছেন ত্যাগের মধ্য দিয়ে। সেবার মধ্য দিয়ে। এই ত্যাগ তখনই আসবে, যখন মেয়েরা কল্যাণধর্মে দীক্ষিত হবে। সংসারের আর পাঁচটা মানুষের সুখ-দুঃখের শরীক হবে। শ্রীসারদাদেবী জয়রামবাটীতে ছুটে গেছেন ভাইদের সংসারের গোলমাল থামাতে। আবার রাধুর মাও হয়েছেন, নলিনীদিদির সঙ্গে বসে রুটিও বেলেছেন, আবার অসংখ্য ভক্তদের হাজার সমস্যার সুরাহাও করেছেন। কখনও তিনি নিজের কথা ভাবেননি। নিজেকে পরের জন্যে বিলিয়ে দিয়ে তিনি তো ফতুর হননি। পরন্তু তিনি যে সকলের কাছে পেয়েছেন অপরিসীম ভালবাসা, শ্রদ্ধা। তিনি আজ সারা বিশ্বের মা। এই মা হওয়া তো সহজ কথা নয়। গর্ভধারিণী কোন সন্তানের জননী না হয়েও যিনি ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ সকলের জন্যে তাঁর স্নেহের আঁচল পেতে দিয়েছেন, সেই মাতৃত্বের কাছে কে না মাথা নত করবে?

আজ নারী স্বাধীনতার জাগরণে মেয়েদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব—আদর্শ মা হওয়া। সন্তানকে সৎশিক্ষা দিলেই সে সৎ নাগরিক হবে। সন্তান কু-পথে গেলেও তাকে সৎ-পথে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব মায়েরই। শ্রীসারদাদেবী সেই মা হতে পেরেছিলেন। সারা বিশ্বের নারীসমাজকেই আজ তাঁরই অনুসরণে মূলতঃ মাতৃত্বের ভূমিকা নিতে হবে। শাসন, ক্ষমা, ধৈর্য, ভালবাসা দিয়ে নিজের সন্তানকে গড়তে পারলেই ঘরে ঘরে সুস্থ সন্তান তৈরি হবে। গোটা সমাজের রূপ বদলে যাবে, তৈরি হবে নতুন পৃথিবী।

নারী-নিধন যজ্ঞও তাহলে বন্ধ হবে। গৃহবধূর ওপরে অত্যাচার, পণের লোভে বলি কিংবা হত্যা—এ-সবকিছুর বিরুদ্ধেই মেয়েদের প্রতিবাদ করতে হবে। ক্লেয়ার র‍্যানডল (Clair Randall) তাঁর "Women—our-own worst Enemies" রচনায় বলেছেন, নারীরা নিজেরাই নিজেদের শত্রু। কথাটি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মেয়েদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের পেছনে, মেয়েদেরই অনেক ক্ষেত্রে চক্রান্ত থাকে। এ-কথা অস্বীকার করার নয়। পণের জন্য মেয়েরাই বেশি লোভী হন। পুরুষকে প্রায়ই তাঁরা প্ররোচিত করেন। এবং তা থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনা পৌঁছোয় মৃত্যুতে। শ্রীসারদাদেবীর মধ্যে কোন লোভ ছিল না, তাই তিনি ঠাকুরের জনৈক ভক্তের দেওয়া দশ হাজার টাকা নিতে অস্বীকার করেছিলেন। আজকের ভোগসর্বস্ব আধুনিক সমাজকে এই উদাহরণ নিতে হবে। লোভ নয়, সংযমই বাঁচবার পথ। শ্রীশ্রীসারদা মায়ের দিব্য জীবনই হবে আজকের নারী জাগরণের হাতিয়ার। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাই তো বলেছিলেন: "ও সারদা,—সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।"

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত

শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায়

আমি কে জানবার আগ্রহ প্রতিটি মানুষের।
এই জানতে প্রথমে সে আকাশের দিকে চায়,
বাতাস থেকে নিঃশ্বাস নিতে নিতে ভাবে
এ কার সৃষ্টি ?
এই মানুষের গড়া সমাজে বাস করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায়।
এমনি করে দিন কাটতে কাটতে দিন ফুরিয়ে যায়,
সে আকাশের গায়ে হারিয়ে যায়।

কেউ কেউ থেমে থাকে না।
নিরলস সংগ্রাম করে যায় নিজেকে জানার,
এ সংগ্রাম বিজয়ীর সংগ্রাম।
এরা আসে, পথ দেখায়, চলে যায়।
এমনি যদি কোনও মানুষের মধ্যে দেখি
রয়েছে সন্ন্যাসের আত্মত্যাগ, সর্বাত্মক বিপ্লবের বীজ,
যার ধর্ম 'অভীঃ' ;
যিনি বলছেন : চাই বীর্য, চাই মনুষ্যত্ব, চাই ব্রহ্মতেজ,
ঈশ্বরকে খুঁজতে কোথাও যাবার দরকার নেই ;
যারা পদদলিত, অজ্ঞ—এরাই তোমার ঈশ্বর—
এদের সেবা কর—এদের মানুষ কর ;
জগতে এসেছ—দাতার আসন গ্রহণ কর ;
সর্বস্ব দিয়ে দাও, ফিরে চেও না ;
ভালবাসা দাও, সাহায্য দাও, সেবা দাও,
বিনিময়ে কিছু চেয়ো না ;
সবল হও ; দুর্বলতাই পাপ, দুর্বলতাই মৃত্যু ;
আসলে প্রেম—প্রেমই জ্ঞান, প্রেমই মুক্তি ;
প্রেম দিয়ে তুমি জগৎ জয় করতে পারো।

এই হিংসার যুগে, যখন মানুষ লাল গোলাপ ফেলে দিয়ে

লাল রক্তে হাত রাঙাচ্ছে,
এই মূল্যবোধের ক্ষয়িষ্ণুতার যুগে
একটু নিজেদের দিকে তাকাই।
দেখতে পাব এক বিরাট মানুষকে—দেখব এক মহৎ জীবন
যার নাম বিবেকানন্দ।
প্রত্যেক মানুষের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি—
এরা বিবেকানন্দের মন্ত্রে দীক্ষিত হোক :
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—ওঠ, জাগো, সুপ্ত ব্রহ্মশক্তি জাগরিত কর।

লোকমাতা নিবেদিতা

ডক্টর কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

স্নেহে লোকমাতা তুমি, ত্যাগে বৈরাগিনী
দেহ-গেহ-উপেক্ষিতা যৌবনে যোগিনী।
নিঃস্ব সন্ন্যাসিনী তুমি বিশ্বের বন্দিতা
বিবেকানন্দের শিষ্যা আত্মনিবেদিতা।

শ্বেত মর্মরের মূর্তি সুশুভ্র অন্তর
বক্ষে রুদ্রাক্ষের মালা দোলে কি সুন্দর
ব্রহ্মচর্য-ব্রতনিষ্ঠা আদর্শ মহান্
ভারতের তরে তব আত্মবলিদান!

সংকল্প-সাধন-ব্রতে নব যাজ্ঞসেনী
সংশয় সঙ্কোচ ভয় কিছুই পারেনি
পরাজিতে তব শক্তি,—আশ্চর্য-চরিতা
আর্তে শিবসেবা-ব্রতে আত্মসমর্পিতা।

ব্যবচ্ছিন্ন দেশে 'বঙ্গ-ভঙ্গ-আন্দোলন'
বিদ্বিষ্ট ব্রিটিশ শক্তি ব্যর্থ আস্ফালন,—
দৃঢ়তর করিয়াছে প্রতিজ্ঞা তোমার
ভারতের মুক্তি লাগি শক্তি সাধনার।

কবি রবি জগদীশ সহ স্ত্রী অবলা
গোখেল, হ্যাভেল, মাতা সারদা মঙ্গলা।

তোমারে মাঙ্গল্য সূত্রে বাঁধি লন টানি
'শিখাময়ী' আখ্যা দেন অরবিন্দ জানি।

জাগাইলে যুবশক্তি যুগসন্ধিক্ষণে
ব্রহ্মবান্ধবাদি বন্ধু তদনুশীলনে
ডন-সোসাইটি পটে আজও যায় দেখা
'সন্ধ্যা'-'যুগান্তর'-পত্রে অগ্নিগর্ভ লেখা।

প্রস্তরে ভাস্কর্যে চিত্রে নিবিষ্ট সংবিৎ
অবনীন্দ্র নন্দলালে করি উৎসাহিত,—
ইলোরা-অজন্তা-তীর্থে কর পরিক্রমা
মনোরম বৃত্তিময়ী লোক-মনোরমা।

জীবনের সিকৃথ-বর্তি দুই প্রান্তে জ্বালি'
অকালে কাল-কবলে গেলে অংশুমালী
আত্মার মুক্তির মন্ত্রে নিজে দীক্ষা নিয়া
দাসত্ব-মুক্তির মন্ত্র গেলে শিক্ষা দিয়া।

শ্রান্তি নাই ক্লান্তি নাই আলস্যের লেশ
ত্যজিলে সুখের স্বর্গ সহি তপঃক্লেশ।
ভারত কৃতজ্ঞ-নত শ্রদ্ধাপ্লুত মন
'লোকমাতা' বলি' তাই করে সম্বোধন।

যুবসম্মেলন : দর্শকের ভূমিকায়

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উদয়শৈল শিখরে কখন দেখা দেবেন সপ্ততুরগ রবি সেজন্য যেমন নিঃশব্দে, সাগ্রহে এবং প্রার্থনারত হয়ে অপেক্ষা করেন তীর্থযাত্রীরা তেমনই প্রতীক্ষারত ছিলাম আমরা। রামকৃষ্ণ-বেদান্তের অনুরাগীরা। যাদের ধ্যান-ধারণা, জীবন-মরণ শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন (সংঘ) ঘিরে আবর্তিত। এই চার যাদের কাছে একাকার। আর সেই একের প্রতি যারা অঙ্গীকারবদ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণ যাদের প্রথম প্রেম। সর্বশেষ প্রেম তাও তিনিই।

আমরা প্রতীক্ষায় ছিলাম বেলুড় মঠে। যে বেলুড় মঠ আমাদের অযোধ্যা, আমাদের বৃন্দাবন, আমাদের কাশী, আমাদের একাম্র মহাপীঠ—একত্রে, একাধারে, একক্ষেত্রে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন অবতারবরিষ্ঠ, বেলুড় মঠ তেমনই তীর্থবরিষ্ঠ।

আর আমরা যার প্রতীক্ষায় ছিলাম তা হল রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন 'ইয়ুথ কনভেনশন' (যুবসম্মেলন)। ২৪ ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর ১৯৮৫, এই সাতটি দিন যেন সপ্তাশ্বের মতো বহন করে আনল একটি আলোকরথ। সেই রথে আরূঢ় ছিলেন মহাদ্যুতি সূর্যপ্রতিম স্বামী বিবেকানন্দ। যৌবনের চিরন্তন প্রতীক। আর সেই নিযুতকিরণমালীর দিব্য আলোকের কণার মতো মঠময় ছড়িয়ে পড়েছিলেন মহাভারতের প্রতি প্রান্ত থেকে আগত প্রায় বারো হাজার তরুণ-তরুণী। আর কিছু বয়স্ক নরনারী। মঠের সঙ্গে আবাল্য যুক্ত এই প্রতিবেদকের সুযোগ ঘটেছিল ওই সম্মেলনকালে এবং তার কিছু আগে-পরে একটানা মঠবাসের। আলোকের এই ঝরনাধারায় স্নান করার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল তাঁদের সকলের আন্তরিক ও অবিস্মরণীয় অনুভব : ধন্য হল অঙ্গ মম, পুণ্য হল অন্তর।

কিন্তু কী দেখলাম, কী পেলাম এবং কী হলাম আমরা এই সম্মেলনে উপস্থিত থেকে? তা সেই উপস্থিতি যেমনই হোক না কেন। এখানে কেউ ছিলেন সন্ন্যাসী, কেউ প্রতিনিধি, কেউ পর্যবেক্ষক, কেউ স্বেচ্ছাসেবক বা স্বেচ্ছাসেবিকা, কেউ কর্মী, কেউ আলোচনা বা বক্তৃতা দিতে আগত। আমি ছিলাম নিতান্তই এক নিষ্কর্মা দর্শকের ভূমিকায়। তবু ওই প্রশ্নটির মুখোমুখি দাঁড়ানো সকলের কর্তব্য। জানি এতে অস্বস্তি আছে। কারণ ধরা পড়ে যাবে আধারের ক্ষুদ্রতা। তবু সততার দাবি, এই ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হিসাবে আমার জবানবন্দি রেখে যাওয়া।

এই কয়দিন আমরা বেলুড় মঠের অপার্থিব সৌন্দর্য পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন করেছি। এই মঠের সৌন্দর্য-মাধুর্য এমনিতেই অপরিসীম। এই কয়দিন তাতে যেন জোয়ার জেগেছিল। ফলে এই তীর্থবাসের প্রতিমুহূর্ত ছিল পরম রমণীয়। স্বাদু স্বাদু পদে পদে। কেমন করে বোঝাব শ্রীরামকৃষ্ণসনাথ এই দিব্যভূমিতে, আকাশ-গঙ্গা যখন অন্ধকারে আবৃত সেই ব্রাহ্মমুহূর্তের ধ্যান-গম্ভীর রূপ। তারপর আকাশ জুড়ে হালকা নীলবেগুনী রঙের খেলা। যখন আকাশ ও গঙ্গা ছায়া-ছায়া আলাদা রূপ নিচ্ছে। ওদিকে শেষ হচ্ছে মন্দিরে মঙ্গলারতি। তারপর অরুণোদয়। আকাশ-গঙ্গায় আবীর খেলা। তারপর সূর্যোদয়। ঠাকুরের উপমা, অরুণোদয় যেন

ব্যাকুলতা আর সূর্যোদয় ঈশ্বরদর্শন। তারপর মন্দিরগুলিতে দর্শন ও প্রণাম। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমাকে এক এক দিন এক এক বেশে ও ফুলসাজে দর্শন ও প্রণাম। সেই ছবিটি হৃদয়ের পটে এঁকে নেওয়া। সঞ্চয় করে নেওয়া সারা দিনের, সারা জীবনের পথচলার আনন্দ-সম্বল। প্রণাম স্বামীজীকে, রাজা মহারাজকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), ঠাকুরের সন্তানদের, ঠাকুরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি সংঘগুরু শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজকে।

দিনান্তে আবার সন্ধ্যার সৌন্দর্য পলে পলে, তিলে তিলে দেখা ও অনুভব করা। গঙ্গার এপার-ওপার জুড়ে সন্ধ্যার আকাশের মায়াবী আলো। ওপারে হাজার আলোর নানা রঙের প্রতিফলন গঙ্গার জলে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে সেই আলোর চঞ্চলতা। মন্দিরে সন্ধ্যারতি ও ভজন। তারপর চন্দ্রোদয়। সারারাত ধরে আকাশে-গঙ্গায় চন্দ্রালোকগীতিকা। আবার ভোরে সূর্যের উদয়কে প্রণাম জানিয়ে চন্দ্রের বিলয়। এক আলোয় সব আলো তখন একাকার। এ যেন এক মহাসাগরে সব নদীর আত্মসমর্পণ। পরমাত্মায় সব জীবাত্মার মিশে যাওয়া। এই তো সব সাধনার মর্মকথা। 'আমার আমির ধারা মিশে যাবে ক্রমে/পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর-সঙ্গমে।' এ তো নিজেকে হারিয়ে ফেলা নয়, নিজেকে সত্য করে পাওয়া। পাওয়া স্বরূপকে। যে স্বরূপ সৎ-চিৎ-আনন্দ। সাধক তো সেই অনন্ত আনন্দের অভিসারী।

বেলুড় মঠ আবার শুধু ধর্মক্ষেত্র নয়। কুরুক্ষেত্রও। অর্থাৎ কর্মক্ষেত্র। ধ্যান ভজন যেমন এখানে দেখার এবং শেখার, কর্মও তাই। এ কর্ম মানবিক নয়। এমন কি শুধু ঈশ্বরকেন্দ্রিক নয়। এখানকার কর্মকর্তা স্বয়ং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। কাজ তিনি করেন। অন্যরা সব তাঁর হাতের যন্ত্র। তাই এখানে উপাসনা ও কর্ম একই বস্তুর এপিঠ-ওপিঠ। এই উপলব্ধিটি এই তীর্থবাসের একটি পরমপ্রাপ্তি।

অঘটন বা মিরাকল ঘটবে না কেন, অবশ্যই ঘটে বা ঘটতে পারে—বলেছেন এক রসিক গুণী, তারপর যোগ করেছেন—তবে কিনা তার জন্য দরকার হাড়ভাঙা পরিশ্রম। সাধনার ক্ষেত্রে এবং জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে এর মতো সত্য আর নেই। অনেক কষ্টে ফুটিয়ে তুলতে হয় একটি ফুল। অনেক সাধনায় কণ্ঠে বা বীণায় বেজে ওঠে একটি নিখুঁত সুর। বহুদিন অন্ধকারে বহুদিন বেদনায় হৃদয়ের উদ্‌ঘাটন হয়। কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। ব্যক্তিগত সাধনার ক্ষেত্রে একথা যেমন সত্য, তেমনই সত্য সমবেত বা প্রাতিষ্ঠানিক সাধনার ক্ষেত্রেও।

রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন নামক দিব্য যন্ত্রটি যে মসৃণভাবে চলে, এই সংঘ যে কাজেই হাত দেন তা সুসম্পন্ন হয়—একথা সবাই জানেন ও মানেন।

সাত দিন ধরে সম্মেলন। প্রায় বারো হাজার লোক নিয়ে কারবার। তার অধিকাংশই তরুণ-তরুণী। সারা ভারতের এবং ভারতের বাইরে থেকেও তাঁরা এসেছেন। এত জনকে ঠিক সময়ে ঠিকভাবে নিয়ে আসা, থাকা খাওয়া স্নান ইত্যাদির ব্যবস্থা এবং আবার প্রত্যেককে আস্ত-সুস্থভাবে যথা সময়ে যথাস্থানে ফেরত পাঠানো—কাজটি যে কী কঠিন, তা আমরা কি অনুমানও করতে পারি? অথচ চোখের সামনে এটা ঘটতে দেখলাম। এ অভিজ্ঞতা কি ভোলবার? এটি দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা।

দুবেলা মিলিয়ে খাওয়ার পাতাই পড়েছে ষোল হাজার। পাঁচ জায়গায় পরিবেশন। এক-দল আসছেন, বসছেন, প্রসাদ পাচ্ছেন পেটরেপু

ও পরিতৃপ্তি সহকারে। তারপর উঠে যাচ্ছেন। পনের মিনিটের মধ্যে পাতা তোলা, ধোয়া, মোছা, খটখটে করে সাফসুফ সারা। পাতা, খুরি, আসন পরিপাটি করে ফের সাজানো। পরের দল প্রবেশ করছেন সারিবদ্ধ হয়ে, সুশৃঙ্খলভাবে। প্রতিবার ঘড়ি ধরে দেখেছি। কোনবারই ওই পনের মিনিটের বেশি লাগেনি। ভাবা যায়?

এত তরুণ-তরুণীর দেখভাল, পুছতাছ (অনুসন্ধান অফিস), ডাকঘর, ফোনবুথ, ছোটখাটো হাসপাতাল; তিনটি ক্যান্টিন, দুটি মিল্কবার, বিজলি, জল, পুলিশ, দমকল এবং কী নয়—সব ব্যবস্থা চলেছে মসৃণভাবে।

তারপর তিন তিনটি মণ্ডপে সভা,* সেমিনার, গান-বাজনা-নাচ, যাত্রা-নাটক, ব্যায়াম প্রদর্শনী ইত্যাদি—সেও কি চাট্টিখানি কথা! তারপর তীর্থপরিক্রমা, পদযাত্রা। স্মারক পুস্তক, ফোল্ডার ইত্যাদি প্রকাশ। এক ঝাঁক গাড়ি সর্বদা প্রস্তুত রাখা। ভাবতে পারা যায় এই সব কিছু ঠিক ঠিক ভাবে পরিকল্পনা ও রূপায়ণের জন্য কত চিন্তা, বিচার-বিবেচনা, সমন্বয়সাধন এবং কার্যনির্বাহী দক্ষতার প্রয়োজন?

একটি কনভেনশন কমিটি যার সভাপতি স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, সম্পাদক স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এবং একটি রিসেপশন সাব কমিটি যার চেয়ারম্যান স্বামী আত্মস্থানন্দ। গোলপার্কে কমিটির সদর দফতর। বেলুড়ে কনভেনশন অফিস বা কন্ট্রোল রুম। এঁদের সঙ্গে ছিলেন বহু সাধু, ব্রহ্মচারী, কর্মী এবং কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা। এই নিয়ে এত বৃহৎ ও জটিল একটি কর্মকাণ্ড সুসম্পন্ন হয়েছে।

আর এই দক্ষতা ও শৃঙ্খলা একটা আরোপিত ব্যাপার ছিল না। ছিল ভালবাসা দিয়ে গড়া। স্বতঃস্ফূর্ত একটা ব্যাপার। ফুলের ফুটে ওঠার মতো।

সাধু-ব্রহ্মচারীদের ব্যাপার তবু কিছুটা বুঝতে পারি। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ-পদাশ্রিত। বিশেষভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত। কিন্তু কর্মীরা? স্বেচ্ছাসেবক-স্বেচ্ছাসেবিকারা? তাঁরা তো প্রত্যেকে এক একটি জীবন্ত মিরাকল। দেখেছি আর অবাক হয়েছি। অবাক হয়েছি আর দেখেছি। কয়লা কী ময়লা ছুটে যব আগ করে পরবেশ। অগ্নিস্পর্শে অঙ্গার প্রদীপ্ত হয়। আদর্শবাদের স্পর্শে, আদর্শ মানুষের সঙ্গলাভে সাধারণ মানুষ হয়ে ওঠে অসাধারণ। মানুষ হয় দেবতা। তন-মন-ধন হয়ে যায় অর্ঘ্য। কাজ হয়ে যায় পূজা। স্বামীজীর স্পর্শে শুদ্ধ-যৌবনের যে অভিরাম রূপ সাতটি দিন ধরে দেখেছি তাকে বারবার প্রণাম করি।

'যৌবনেরই পরশমণি
করাও তবে স্পর্শ।
দীপক-তানে উঠুক ধ্বনি'
দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।'

তৃতীয় অভিজ্ঞতাটি হল—একটি নতুন প্রজন্মকে খুব কাছ থেকে দেখার। তাঁদের

* আলোচনার বিষয়বস্তু :

১। জনসাধারণের উন্নতিসাধনে স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পনা।
২। জাতীয়-সংহতি দৃঢ়ীকরণে যুব-নেতৃত্বের ভূমিকা।
৩। পল্লী-পুনর্গঠনে যুবসমাজের ভূমিকা
৫। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে মূল্যবোধের উপকারিতা।
৫। বর্তমান যুবসমাজের সমস্যা ও তার সমাধানের পথ।
৬। নিরক্ষরতা, বর্ণবৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে যুবসমাজের কর্তব্য।

প্রতিনিধিদের আলোচনার মাধ্যম—ইংরেজী. হিন্দী ও বাংলা। —সঃ

ভাবনা-চিন্তা, আনন্দ-বেদনা, অভীপ্সা-সমস্যার কথা তাঁদেরই কাছ থেকে, তাঁদের মুখ থেকে শোনার। আর শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামীজীকে তাঁরা কেন চাইছেন তা জানার।

এই প্রজন্মের জন্ম স্বাধীন ভারতে এ দেশ তাঁদের গর্ব। এ মাটি তাঁদের চোখে সোনা। যৌবন মানেই চোখে স্বপ্ন, হৃদয়ে ভালবাসা আর দেহে শক্তির জোয়ার। কিন্তু কী দেখছেন তাঁরা? দেখছেন দেশ স্বাধীন কিন্তু পরিবেশ দূষিত। স্বপ্ন যাচ্ছে ভেঙে। হৃদয় হচ্ছে পীড়িত। শক্তির ঘটছে অপচয়। দেখছেন চারদিকে পরিব্যাপ্ত দুর্নীতি। দেখছেন দেশকে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত করে দেওয়ার জন্য অশুভ শক্তিগুলি প্রবলভাবে সক্রিয়। সুস্থ পরিবেশে মানুষ হওয়ার পথে হাজারো বাধা। শান্ত পরিবেশে শিক্ষা অর্জনের পথে বাধা। সৎভাবে স্বাবলম্বী হয়ে জীবিকা সংগ্রহের পথে বাধা। ভ্রান্ত নীতি আজকের যুবশক্তিকে এক অন্ধকারায় নিক্ষেপ করতে উদ্যত। পাথরের দেওয়ালে নিষ্ফল মাথা কুটে যন্ত্রণা ভোগ ছাড়া যেখানে আর করবার কিছু নেই।

এই অন্ধকার-সমুদ্রে তাঁদের কাছে আলোক-স্তম্ভের মতো দেখা দিয়েছেন স্বামীজী। স্বামীজী তাঁদের কাছে আসছেন দোসর ও দিশারি হয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের কাছে প্রতিভাত হয়েছেন একই সঙ্গে সত্য ও পন্থারূপে। স্বামীজী তাঁদের দিচ্ছেন জীবনের পরিপূর্ণ একটি আদর্শ। জীবনদর্শন ও জীবনচর্যা। দিচ্ছেন ভারতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চেতনা। সেই চেতনার ভিত্তিতে দাঁড় করিয়ে তাঁদের শেখাচ্ছেন প্রকৃত আন্তর্জাতিকতা। শেখাচ্ছেন সব মানুষকে ভালবাসতে। পূজা করতে শেখাচ্ছেন দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের। দিচ্ছেন পবিত্রতা-ত্যাগ-সেবার মহামন্ত্র। শেখাচ্ছেন নিজে মানুষ হয়ে অন্যদের মানুষ হতে সাহায্য করতে।

কতভাবে জানালেন এই তরুণ-তরুণীরা শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা-স্বামীজীকে ধরে চলতে চান। শপথ ঘোষণা করলেন: স্বামীজী তোমার স্বপ্ন আমরা সফল করব। বললেন; এখানে এসে নিজেদের প্রজন্মকেই আমরা আরও ভালভাবে চিনতে শিখলাম। ভালবাসতে শিখলাম দেশকে ও দেশের সংহতিকে। চেষ্টা করব নিজেদের আরও ভালভাবে গড়ে তুলতে। যতটুকু হোক, এখন থেকে কিছু কিছু পাঠ ও সেবার কাজ করতে। এখানে এসে তো জানলাম, আমরা একা নই। আমাদের মতো হাজার হাজার ছেলেমেয়ে আছে দেশ জুড়ে। সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী যারা হবে তাদের ওপর ঠাকুর-মা-স্বামীজীর অশেষ আশীর্বাদ চাই। তা হতে পারি ভালই না হলে সুনাগরিক হতে তো বাধা নেই। সেটা হতেই হবে।

আজকের ভারত যদি হয় এক আঁধার পারাবার তাহলে তাতে অন্তত বারো হাজার আলোর শতদল ফুটে উঠতে দেখলাম চোখের সামনে।

কী পেলাম তা সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করেছি। এবার সম্মুখীন হই, নিজেরই তোলা আর একটি প্রশ্নের—কী হলাম? স্পষ্ট ও অকপট উত্তর: অমর হলাম।

জানি এই স্পর্ধিত ও অহংকৃত উক্তি ব্যাখ্যার বা কৈফিয়তের অপেক্ষা রাখে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মানুষ মাত্রেই সন্ধান করছে—সত্যের, আলোকের ও অমৃতের। তার স্বরূপ যে সত্য, জ্যোতির্ময় ও অমৃতময়। আর মানুষ ভালবাসে। প্রেমে পড়ে। সে পড়া আসলে ওঠা। পরম প্রেমস্বরূপ যিনি তিনিই প্রেমের একটি কণা রেখে দিয়েছেন প্রতি মানুষের হৃদয়ে।

বেলুড়মঠ-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় যুবসম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ।

সম্মেলনে উপস্থিত যুবক প্রতিনিধিবৃন্দের একাংশ।

যুবসম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনের বক্তাবৃন্দ : (ডান দিক থেকে) স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, অধ্যাপক এ. এল. ব্যাসম, রাজা রামান্না, মিঃ কেনেথ কার্ল উইমেল, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী (সভাপতি), অধ্যাপক দানিলচুক, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ ও স্বামী গহনানন্দ।

সম্মেলনে উপস্থিত যুবতী প্রতিনিধিবৃন্দের একাংশ।

তারপর আর কি। চুম্বকের পাহাড় আকর্ষণ করছে সেই লৌহ কণিকাটিকে। অন্তরের একটু প্রেমকে দুর্নিবার আকর্ষণে টানছেন পরম প্রেমময়। প্রেমস্বরূপ। এই হল কৃষ্ণের বাঁশি। যা বনে নয় মনে বাজে। যা কারও কাছে কথার কথা। কারও কাছে অন্তরের ব্যথা। এই হল অমৃতের অভিসার। অমর হওয়ার রহস্য।

মানুষ এটা বুঝেও বোঝে না। কেউ ভাবেন এই কাব্য আমি রচনা করলাম। কাল নিরবধি। পৃথ্বী বিপুলা। আমার সমানধর্মা কেউ না কেউ, কোন না কোন স্থানে জন্মাবেন। তাঁর রসাস্বাদনের মাধ্যমে আমি বেঁচে থাকব। কেউ তাঁর অশ্রান্ত ক্রন্দনকে চিরমৌনজাল দিয়ে কঠিন বন্ধনে বেঁধে রেখে যান। কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল তাজমহলরূপে। ভাবেন এর মধ্যে বেঁচে থাকব আমি। বেঁচে থাকবে আমার প্রেম। সাধারণ মানুষ ভাবেন, রইল আমার সন্তান। এর মধ্যে আমি বেঁচে থাকব। আমার বংশধারার মধ্যে আমি অমর হয়ে থাকব। কোন মহৎ কারণের জন্য যাঁরা প্রাণ উৎসর্গ করেন তাঁরা তা করেন এই বিশ্বাসে যে সেই উৎসর্গ তাঁদের আদর্শকে দৃঢ়তর করবে, বাঁচিয়ে রাখবে এবং তাঁকেও অমর করবে।

আমি এক তুচ্ছ মানুষ। আমার একটি প্রেম আছে। সেই প্রেমের নাম শ্রীরামকৃষ্ণ। যে কেউ তাঁকে ভালবাসে তার সেই ভালবাসায় আমার ভালবাসা, আমার প্রণাম মিশে থাকবে। যে তরুণ-তরুণীরা ভালবাসবেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে তারাই এই প্রেমের উত্তর সাধক ও উত্তরাধিকারী। সাতদিন ধরে এই বারো হাজার তরুণ-তরুণীর সম্মেলন, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি তাঁদের ভালবাসা নতুন করে আমায় জানিয়ে দিল আমার প্রেম অমর। এই প্রেম আমার জীবনকে মধুময় করেছে। মৃত্যুকে করবে অমৃতময়। এ উপলব্ধি তো শুধু পাওয়া নয়। হওয়া। জানি না কোন্ ভাষায়, কীভাবে এজন্য কৃতজ্ঞতা নিবেদন করব রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন যুবসম্মেলন-এর উদ্যোক্তাদের এবং এই সম্মেলনে যোগ দিতে আসা তরুণ-তরুণীদের, এর কাজে নিযুক্ত কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকাদের।

'আমার দেবতা নিল
তোমাদের সকলের নাম;
রহিল পূজায় মোর
তোমাদের সবারে প্রণাম॥'

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম ভারতের সর্বত্র কোটি কোটি লোকের নিকট পরিচিত। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার শক্তি ভারতের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছে; যদি আমি জগতের কোথাও সত্য ও ধর্ম সম্বন্ধে একটি কথাও বলিয়া থাকি, তাহা আমার গুরুদেবের—আর ভুলভ্রান্তিগুলি আমার।

এইরূপ ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল—এই যুগে এইরূপ ত্যাগ আবশ্যক। আধুনিক নরনারীগণ তোমাদের মধ্যে যদি এরূপ পবিত্র অনাঘ্রাত পুষ্পের মতো কেহ থাকে, উহা ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করা উচিত। যদি তোমাদের মধ্যে এমন কেহ থাকে, যাহাদের সংসারে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা নাই, যাহাদের বয়স বেশী হয় নাই, তাহারা সংসার ত্যাগ কর। ধর্মলাভের ইহাই রহস্য -ত্যাগ কর। প্রত্যেক নারীকে জননী বলিয়া চিন্তা কর, আর কাঞ্চন পরিত্যাগ কর। ভয় কি? যেখানেই থাকো না কেন, প্রভু তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। প্রভু নিজ সন্তানগণের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন।

—স্বামী বিবেকানন্দ

পথ ও পথিক
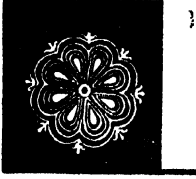
স্বামী চৈতন্যানন্দ

ধর্মহীন মানুষ

ধর্মের কথা শুনলে অনেকেই নাসিকা কুঞ্চিত করেন। তরুণ-তরুণীরা মনে করে ধর্ম তো বুড়ো-বুড়ীদের ব্যাপার। তাদের বয়সে ধর্ম করার কোন মানে হয় না। এই বয়েসটা আনন্দ-ফূর্তির সময়। খাও-দাও, নাচো-কোঁদো—ফূর্তির ফোয়ারা ছোটাও। হঠাৎ কোন তরুণ-তরুণী যদি স্বেচ্ছায় ধর্ম অনুশীলনের চেষ্টা করে সমবয়সী অনেকে তাদের সেকেলে বলে ঠাট্টা করে। অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাও তাদের বলেন, এখন কি ধর্ম করার সময় হয়েছে? আগে আমাদের মতো বুড়ো-বুড়ী হও তারপর ধর্মকর্ম করবে। এ বয়স তোমাদের ভোগ করার সময়। জগৎটা ভাল করে উপভোগ কর। নইলে পরে অনুশোচনা করবে। প্রত্যেকে এমনভাবে কথা বলেন, যেন তাঁরা সব জেনে ফেলেছেন, জানার আর কিছু নেই। জগৎসৃষ্টির রহস্য তাঁদের জানা, যেন হাতের মুঠোর মধ্যে!

এই ধর্ম জিনিসটি যে কি তা আমাদের অনেকেই জানেন না। অথচ ধর্ম নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, মারামারি, কাটাকাটি হয়। ধার্মিকতার ছদ্মবেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানো হয়। ধর্মের নাম নিয়ে মানুষকে অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য বলে দূরে ঠেলা হয়। ধর্মের নামে দলাদলি করাটা যেন ধর্মের মূল লক্ষ্য। ধর্ম বলতে যেন এটাই বোঝায় যে, কোন ধর্মে আস্থা রেখে, তার কিছু আচার-অনুষ্ঠান করা এবং সেই ধর্মের পুস্তকাবলী পড়ে ভাল বক্তৃতা করতে পারা। এটা করতে পারলেই অনেকের কাছে ধার্মিক বলে পরিচিত হওয়া যায় এবং সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিশেষ কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করা যায়। এটাই যেন ধর্মের মূল লক্ষ্য।

আচার-অনুষ্ঠান, শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ প্রভৃতি প্রত্যেক ধর্মের বহিরঙ্গ রূপ। ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের সঙ্গে ওগুলির কোন সম্পর্কই নেই। অনুভূতিহীন অনধিকারী ব্যক্তির হাতে পড়ে ধর্মের এক-একটি সম্প্রদায়ের মূল ভাব হারিয়ে যায়। তার ফলে ধর্মের বহিরঙ্গ আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি হয়। ধর্মের নামে এমন সব ভাব সম্প্রদায়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে, যার ফলে জগতের মহা ক্ষতি হয়। ধর্মের এই সব বিকটরূপ দেখে অনেক সুধী ব্যক্তি ধর্মকে পরিহার করে চলেন। তাঁরা ভাবেন, ধর্ম যদি জগতের ক্ষতির কারণ হয়, ধ্বংস ডেকে আনে, তা অনুসরণ করার কোন প্রয়োজন নেই আমাদের। তাঁরা ধর্মের বিরুদ্ধে নানাভাবে প্রচারের দ্বারা সাধারণ মানুষকে সাবধান করে দেন, যাতে তারা ধর্ম থেকে দূরে থাকে, ধর্মকে পরিহার করে চলে।

আবার অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন যাঁরা ধর্মের মধ্যে কি আছে, ধর্ম বলতে কি বোঝায় তা অনুধাবন করেন এবং ধর্মের সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক জিনিসটি কি তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। তাঁরা অনুভূতিহীন অনধিকারী ধর্ম-প্রচারকদের এবং পুরোহিতদের ধর্মের নামে নানা ভড়ং-এ ভোলেন না। তাদের কথায় কর্ণপাতও করেন না। তাঁরা সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ধর্মকে বিশ্লেষণ করেন এবং যা অনুভব করেন, তা জগতের সামনে সগর্বে প্রচার করেন। জগতে

এই ধরনের সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তির সংখ্যা মুষ্টিমেয়। এই সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তিরাই জগতের ধর্মসম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তাঁরা ধর্মের নতুন নতুন পথের আবিষ্কারক। তাঁরা শাস্ত্রানুযায়ী পবিত্র জীবনযাপন করেন এবং একনিষ্ঠ অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ধর্মের সূক্ষ্মগতি উপলব্ধি করেন। সেটাই তাঁরা জগতের কল্যাণের জন্য প্রচার করেন। এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখা, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম, মুসলমানধর্ম প্রভৃতি। মানুষের প্রয়োজনে জগতে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, জনের জামা হেনরির গায়ে লাগানো যায় না। তাই প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে তার প্রকৃতি অনুযায়ী একটি ধর্ম-পথ অবলম্বন করে মনুষ্যজীবনের চরম গন্তব্যস্থানে সহজে পৌঁছতে পারে, সেজন্যই বিভিন্ন ধর্ম-পথ আবিষ্কৃত হয়েছে। ধর্মের প্রতিটি পথ প্রবর্তিত হয়েছে উপলব্ধিবান ব্যক্তির দ্বারাই। তাই প্রতিটি পথই সত্য। এই ধর্মসম্প্রদায়গুলি রক্ষার জন্যও প্রয়োজন উপলব্ধিবান ব্যক্তির। যাঁরা সাধারণ মানুষকে প্রেরণা দেবেন মনুষ্যজীবনের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য। কিন্তু সম্প্রদায়গুলি অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে পড়ে কলুষিত হয়। ফলে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়। তারা ধর্মকেই জগতে রক্তারক্তি মারামারির কারণ বলে দোষারোপ করে বসে। পথ ও গন্তব্যস্থান যে এক নয়---তা তারা তখন ভুলে যায়।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের লক্ষ্য—ধর্মলাভ। এই ধর্মের অর্থ গভীর এবং ব্যাপক। 'ধৃ' ধাতু থেকে ধর্ম শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। এই 'ধৃ' ধাতুর অর্থ—যা ধরে থাকে। যার প্রভাবে কোন বস্তুর অস্তিত্ব রক্ষা হয় তাকেই ধর্ম বলে। জগতের প্রত্যেকটি বস্তুরই একটি ধর্ম আছে। কারণ কোন কিছুর উপর তার অস্তিত্ব নির্ভর করে। প্রত্যেক বস্তুর সত্তা নির্ভর করে তার মূল স্বভাবের উপর। মূল স্বভাবটিকে বাদ দিলে সে-বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। যেমন—অগ্নির ধর্ম দাহিকা শক্তি, জড়ের ধর্ম স্থাবরত্ব। মানুষেরও তেমনি একটি মূল স্বভাব আছে, যা জগতের সবকিছুর মধ্য থেকে তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। মানুষের এই মূল স্বভাবটি হল তার ধর্ম। একেই মানবধর্ম বলা হয়।

মানুষের এই মূল স্বভাব—মানবধর্ম কি? হিন্দুরা বলেন: মানুষের ঈশ্বরীয়ভাবে পূর্ণ হওয়ার এক অনন্যসাধারণ সামর্থ্য আছে। এই সামর্থ্যই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক্ করে। কারণ প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই বস্তুত ঈশ্বরীয়ভাব রূপ চিরন্তন সত্তাটি আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ঈশ্বরীয়ভাবে পূর্ণ হওয়ার সামর্থ্য নেই। কাজেই মানুষের এই বিশেষ সামর্থ্যকেই মানবধর্ম বলে।

মানুষের এই বিবর্তন সম্ভব, কারণ মানুষের মধ্যেই নিহিত আছে তার দেবত্ব। দেবত্ব—পবিত্রতা, প্রেম ও আনন্দ। এই ঈশ্বরীয়ভাবে পূর্ণ হওয়ার সামর্থ্য মানুষের আছে। তাই মানুষ অন্যান্য সব প্রাণী থেকে উচ্চতর, মহত্তর। এটাই মানুষের ধর্ম, মানুষের মনুষ্যত্ব। মানুষের এই বোধই—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'মান-হুঁশ'। এটাকে বাদ দিলে মানুষ আর মানুষ পদবাচ্য হয় না। যীশু বলছেন: 'Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men.' [Matthew, 5/13]—তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু লবণের স্বাদ যদি চলে যায়, তবে তাকে কি প্রকারে লবণের গুণবিশিষ্ট করা যায়? তা আর কোন কাজে লাগে না, কেবল

বাইরে ফেলে দেওয়ার ও লোকের পদতলে দলিত হওয়ার যোগ্য হয়।

পবিত্রতা, প্রেম ও আনন্দরূপ ঈশ্বরীয়ভাব সর্বদা মানুষের অন্তরতম প্রদেশে নিহিত আছে। কিন্তু কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, দ্বেষ, অহংকার স্বার্থপরতা প্রভৃতি মলিনতার দ্বারাই সেগুলি আবৃত। যতদিন মানুষের মন এইগুলির অধীনে থাকে ততদিন তার ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে এবং আচরণ হয় পশুর মতো। এই মানসিক দুর্বলতাই মানুষের দুঃখের বোঝা দুর্বহ করে তোলে এবং আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী প্রভৃতি বহু ব্যক্তির মনে অশান্তি সৃষ্টি করে। মনের মলিনতাকে দূর করে এই ঈশ্বরীয়ভাবে পূর্ণ হওয়াই মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য। পবিত্রতা-প্রেম-আনন্দই ঈশ্বর। শ্রীরামকৃষ্ণ এই ঈশ্বর লাভ করাকেই বলেছেন: 'মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ।'

পশুর স্বভাব—আহার, মৈথুন ও নিদ্রা। এছাড়া পশু আর কিছু ভাবতে পারে না। আহারের জন্য তাকে যে-কোন উপায় অবলম্বন এবং অবিরাম সংগ্রাম করতে হয়। মৈথুনের জন্য তার ইন্দ্রিয়গুলি সদা উদ্‌গ্রীব থাকে। তারপর পরিশ্রান্ত হলে সে নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ে। এইভাবে পশুর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কাটে। আহার, মৈথুন ও নিদ্রার মধ্যেই তাদের জীবন আবর্তমান। মানুষের জীবন কিন্তু সেরকম নয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের ক্রমবিকাশ হয়,—অবশ্য যদি সে মলিনতা থেকে মনকে উন্নত করার চেষ্টা করে। মানুষের মনকে জৈবিক স্তর থেকে উত্তরণের জন্যই স্বামীজী বলছেন: 'I want to preach a man-making religion.'—আমি এমন ধর্ম প্রচার করতে চাই, যাতে মানুষ তৈরি হয়। মনকে জৈবিক স্তর থেকে উন্নীত করতে না পারলে মন আহার, মৈথুন ও নিদ্রার মধ্যে আবর্তিত হয়। সবকিছুই দেহকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। সুন্দর দেহধারী, সুন্দর পোশাকে সুসজ্জিত হয়েও সে তখন পশুর মতো আচরণ করে। তখন সে আর মানুষ পদবাচ্য হয় না। যে-দেশ, যে-সমাজ, যে-জাতি শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে যত উন্নতিই করুক না কেন, সে যদি এই ঈশ্বরীয়ভাবে পূর্ণ হওয়ার চেষ্টা না করে তাকে পশুবিচরণকারী দেশ, সমাজ বা জাতি ছাড়া সভ্য দেশ বলা যায় না। মনীষী কার্লাইল তাঁর 'হিরোস্ অ্যাণ্ড হিরো-ওয়ার্শিপ' গ্রন্থে লিখেছেন: '"যেখানে মানুষ জন্মে না, সে দেশ মৃত, সে সমাজ মৃত, সে রাজ্য মৃত—যে সংহতি বা Organisation-এর ফলে মানুষ জন্মে না, সে Organisation কোন কাজের নহে, যে অনুষ্ঠানের ফলে মানুষ জন্মে না, সে অনুষ্ঠানের জীবন গিয়াছে"—যেমন আত্মার অভাবে দেহ জড়পিণ্ড মাত্র, তদ্রূপ মানুষের অভাবে লোকের সর্ববিধ অনুষ্ঠান ও প্রচেষ্টাই ব্যর্থ।' তাই স্বামীজী বলছেন: 'কোন্ বিষয়ে ভগবানের কতটা প্রকাশ তাহা জানিয়াই প্রত্যেক বিষয়ের মূল্য বা সারবত্তা নির্ধারণ করিতে হইবে। মানুষের মধ্যে দেবত্ব প্রকাশই সভ্যতা।'

[বাণী ও রচনা, পৃঃ ২।৪৬৪—৬৫]
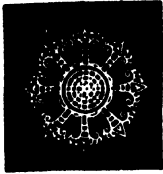
পুস্তক সমালোচনা

বিবেকানন্দ চরিত—স্বামী অমৃতত্বানন্দ। প্রকাশক : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম. দিনাজপুর, বাংলাদেশ। পৃঃ ৪ + ২১২. মূল্য : ষোল টাকা (বোর্ড বাঁধাই), চৌদ্দ টাকা (সাধারণ বাঁধাই)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একান্ন বছরের জীবনে ভারতবর্ষের পাঁচ হাজার বছরের আধ্যাত্মিক সম্পদ মূর্ত। এই কথা বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বিতীয় বিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ—যিনি ছিলেন সেই মহিমময় দেবমানবের বাণীর জীবন্ত ভাষ্য-স্বরূপ। একান্ত উচ্চস্তরে নিয়ন্ত্রিত, অনন্তভাবময় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী উপলব্ধি করতে হলে জানতে হয় স্বামীজীকে—দৈনন্দিন জীবনে যিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী প্রতিফলিত করার পথটি দেখিয়ে দিয়েছেন। স্বামীজীকে জানব কেমন করে? তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে অবশ্যই। কিন্তু তারও আগে অধ্যয়ন করতে হয় তাঁর অসাধারণ জীবনের কাহিনী—যে-জীবনে প্রতিষ্ঠিত যোগ-চতুষ্টয়; যে-জীবন বুদ্ধের করুণা, আচার্য শঙ্করের জ্ঞান, খ্রীষ্টের পবিত্রতা আর সত্যস্বরূপ শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের সমন্বয়ভাবের সমাহার।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে বাংলা ভাষায় স্বামীজীর উৎকৃষ্ট জীবনচরিত আছে একাধিক। এই প্রসঙ্গে স্বামী গম্ভীরানন্দের 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান জীবনচরিতটি, মনে রাখা দরকার, বিশেষ একটি অঞ্চলের—বাংলাদেশের—পাঠকদের জন্য রচিত। লেখক ভূমিকায় জানিয়েছেন, বাংলাদেশে স্বামীজীর জীবনী-গ্রন্থ 'নেই বললেই চলে'। আলোচ্য বইটি সেই অভাব পূর্ণ করবে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদে বিস্তারিত এই বিবেকানন্দ-জীবনী রচনায় লেখক মুখ্যত নির্ভর করেছেন পূর্বোক্ত 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' এবং শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'সমকালীন ভারতবর্ষ ও বিবেকানন্দ' গ্রন্থ-গুচ্ছের উপর। তথ্যের দিক দিয়ে বইটির প্রামাণিকতা সম্পর্কে তাই কোনও প্রশ্ন উঠবে না। স্বামীজীর উনচল্লিশ বছরের জীবনে ঘটনা অনেক; আবার এই জীবনের তাৎপর্যও নানা-স্তরে বিচার বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। দুইশত পৃষ্ঠার কিঞ্চিদধিক পরিসরে বিশ্লেষণমূলক আলোচনাসহ এই মহাজীবনের সম্পূর্ণ বিবরণ উপস্থিত করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে লেখকের পরিকল্পনাও অনুরূপ ছিল না। তাঁর বিবরণ তাই, মোটামুটি সংক্ষিপ্ত। তা হোক, শৈশব থেকে মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত স্বামীজীর জীবনের প্রধান প্রধান সব কয়টি পর্যায় এখানে উপস্থাপিত। তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর অধিকাংশই গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত। স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবন, পাশ্চাত্য অঞ্চলে তাঁর অভিজ্ঞতা, ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন ও দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য তাঁর প্রয়াস—বর্তমান বইটিতে এই কয়েকটি বিষয়ের বিবরণ ও আলোচনা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। লেখক বস্তুনিষ্ঠ, ভাষার উপর তাঁর অধিকার সংশয়াতীত। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি যেন একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণনা করে গিয়েছেন—সহজ, সাবলীল ভঙ্গীতে; অনাবশ্যক উচ্ছ্বাসের আশ্রয় না নিয়ে।

স্বামীজীর জীবনের সঙ্গে পাঠকদের একটি পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং তাঁর সম্বন্ধে পাঠকদের অধিকতর জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তোলা যদি গ্রন্থটির উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে সেটি সিদ্ধ হয়েছে বলা যায়। গ্রন্থটির প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিচ্ছন্ন।

—শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায়

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

সর্বভারতীয় যুবসম্মেলন

গত ২৪ থেকে ৩০ ডিসেম্বর বেলুড়মঠে সাড়ম্বরে যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ বছরের অনূর্ধ্বে ৮০০০ যুবক-যুবতী প্রতিনিধি ১,৪০০ দর্শক এবং ১,৬০০ যুব স্বেচ্ছাসেবক-স্বেচ্ছাসেবিকা,—সর্বসাকুল্যে ১১,০০০ জন ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং ভারতেতর দু-একটি দেশ থেকেও এসে এই সম্মেলনে যোগদান করেন। ২৪ তারিখ সকালে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ সম্মেলনের শুভ-উদ্বোধন করেন এবং একটি স্মারক-পত্রিকার প্রকাশ ঘোষণা করেন। প্রায় প্রতিদিনই প্রতিনিধিগণ কর্তৃক আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর সভা, বিশিষ্ট কলাবিদ্‌দের কুশলতা প্রদর্শন, সন্ন্যাসী ও বিদ্বদ্‌মণ্ডলীর বক্তৃতাদি হয়। এ. এল. ব্যাসম, রাজা রামান্না, দানিলচুক, ডক্টর নিমাইসাধন বসু প্রভৃতি বিদগ্ধ ব্যক্তিরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের যুবসমাজের উন্নতিকল্পে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। ২৬ তারিখ সন্ধ্যায় বিখ্যাত সরোদ-বাদক আমজাদ আলি খাঁ সরোদ বাজিয়ে সকলকে আনন্দ দান করেন। ২৭ তারিখ সন্ধ্যায় বিশ্বশ্রী মনতোষ রায় তাঁর গোষ্ঠী নিয়ে আসন ও শারীরিক কলা-কৌশল প্রদর্শন করেন। ২৫ ডিসেম্বর প্রায় ৩,০০০ যুবপ্রতিনিধি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন, রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটুট অব কালচার প্রভৃতি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শাখাকেন্দ্রগুলি ও কালীঘাট পরিভ্রমণ করেন। ২৯ ডিসেম্বর যুবপ্রতিনিধিরা বর্ণাঢ্য পথশোভাযাত্রা করে থেকে দাক্ষিণেশ্বরে যান। সম্মেলন চলাকালীন এক সপ্তাহ সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য মঠের প্রবেশ দ্বার বন্ধ রাখা হয়েছিল। প্রায় ৫০০০ যুবপ্রতিনিধির থাকবার ব্যবস্থা ও প্রায় ৮০০০ যুবপ্রতিনিধির খাওয়ানোর আয়োজন করা হয়েছিল। বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের এলাকার মধ্যে একটি প্রদর্শনী ও সম্মেলন উপলক্ষে যুবমেলার ব্যবস্থা করা হয়। ৩০ তারিখে সপ্তাহব্যাপী আনন্দ-মেলার সমাপ্তি হয়। এবার সবার ফেরার পালা। ৩১ ডিসেম্বর যুবপ্রতিনিধিদের ফেরার জন্য দিল্লী, বম্বে, গুয়াহাটি, মাদ্রাজগামী বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়।

জাতীয় যুবদিবস

১২ জানুআরি ১৯৮৬, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রগুলিতে বিশেষ সমারোহে জাতীয় যুবদিবস পালিত হয়ঃ **কলিকাতা** অদ্বৈত আশ্রম, **বাঙ্গালোর** রামকৃষ্ণ আশ্রম, **ভুবনেশ্বর** রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, **ইটানগর** রামকৃষ্ণ মিশন, **জামশেদপুর** রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি, **কাঞ্চী-পুরম্‌** রামকৃষ্ণ মঠ, **মাদ্রাজ** রামকৃষ্ণ মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, **নিউদিল্লী** রামকৃষ্ণ মিশন, **পুরী** রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, **রায়পুর** রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ আশ্রম, **রামহরিপুর** রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, **শিলং** রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, **টাকি** রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, **ত্রিবান্দ্রম্‌** রামকৃষ্ণ আশ্রম, **বারাণসী** রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম,

জয়রামবাটী মাতৃমন্দির ও রামকৃষ্ণ মিশন সারদা সেবাশ্রম, **আগরতলা** রামকৃষ্ণ মিশন, **আলং** রামকৃষ্ণ মিশন, **দেওঘর** রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, **দিনাজপুর** রামকৃষ্ণ আশ্রম, **নরোত্তমনগর** রামকৃষ্ণ মিশন, **পোন্নামপেট্‌** রামকৃষ্ণ সারদাশ্রম, **কুইলাণ্ডি** রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, **বৃন্দাবন** রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

জাতীয় যুবদিবস : গত ১২ জানুআরি ১৯৮৬, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে 'সারদানন্দ হলে' এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে সাড়ম্বরে জাতীয় যুবদিবস পালিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি পুষ্পাদির দ্বারা সুন্দর করে সাজানো হয়। এই উপলক্ষে ৩০ বছরের অনূর্ধ্ব তরুণ-তরুণীদের জন্য আবৃত্তি, সঙ্গীত, বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়। সভা শুরু হয় ৩-১৫ মিনিটে। প্রথম অধিবেশনের আলোচনার বিষয় ছিল—'শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ'। স্বামী শান্তরূপানন্দের স্বাগত ভাষণের পর প্রধান অতিথি ডঃ সুজিৎকুমার ঘোষ আলোচনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে তরুণ-তরুণীদের পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর প্রারম্ভিক ভাষণ দান করেন স্বামী প্রমেয়ানন্দ। ২০ বছরের অনূর্ধ্ব ১৬ জন তরুণ ও তরুণী এই অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করে। অধিবেশনের শেষে স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা ও বর্তমান যুবসমাজ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ডঃ ঘোষ। দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় ৫-৩০ মিনিটে আলোচনার বিষয় —'স্বামী বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা'। এই অধিবেশনে যোগদান করে ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ১০ জন তরুণ-তরুণী। অধিবেশনের শেষে স্বামীজীর সমাজচিন্তা ও যুব-সমস্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন স্বামী শান্তরূপানন্দ। মোট ৬৩ জন তরুণ-তরুণী প্রতিনিধি ও ২৫০ জন অন্যান্য শ্রোতা উপস্থিত থেকে এই অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তোলেন। সভান্তে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী সত্যব্রতানন্দ।

গত ১০, ১২ ও ২৪ ফেব্রুআরি ১৯৮৬, যথাক্রমে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী মহারাজ ও স্বামী অদ্ভুতানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর স্বামী সত্যব্রতানন্দ তাঁদের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা : সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী বিকাশানন্দ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

দেহত্যাগ

স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ (রামময় মহারাজ), গত ২২ ফেব্রুআরি ১৯৮৬, রাত্রি ৯ ২০ মিনিটে কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে নরদেহ ত্যাগ করেন। দেহত্যাগের কারণ, পূর্ব থেকেই তাঁর ফুসফুসের রক্ত চলাচল ব্যাহত থাকায় হৃৎপিণ্ড বর্ধিত হয়েছিল এবং হঠাৎ ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে। দেহত্যাগকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯। গত কয়েক বছর ধরে তিনি ভুগছিলেন।

মেদিনীপুর জেলার জগন্নাথপুরে তাঁর আদি নিবাস ছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের পূতসঙ্গ ও সেবা করার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের সেবাকালে স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের পবিত্র সান্নিধ্যও তিনি লাভ করেছিলেন। তাঁর শ্রীশ্রীমা ও স্বামী সারদানন্দজী

মহারাজের স্মৃতিকথা 'উদ্বোধনে' বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জয়রামবাটীতে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষালাভ করেন। তিনি বি. এ. চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত পড়েন। শ্রীশ্রীমায়ের শরীর ত্যাগের পর ১৯২০-তে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। এর দুবছর পরে তিনি জয়রামবাটী মাতৃমন্দির ও রামকৃষ্ণ মিশন সারদা সেবাশ্রমে যোগদান করেন। ১৯২৪-এ তিনি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে ব্রহ্মচর্য এবং ১৯২৮-এ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কাছে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। দেওঘর, মহীশূর, বম্বে ও আলমোড়া আশ্রমে তিনি বিভিন্ন সময়ে কর্মিরূপে ছিলেন। তিনি ১৯৫২ থেকে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লখ্‌নৌ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের এবং ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন। ফুলের চাষ, বিশেষতঃ গোলাপ, ডালিয়া ও অন্যান্য ঋতুজাত ফুলচাষের প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। এ-বিষয়ে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতার জন্য প্রতি বছর বিভিন্ন স্থানে ফুলের প্রতিযোগিতায় তিনি বিচারক হিসাবে আমন্ত্রিত হতেন। তিনি অত্যন্ত কঠোর সাধুজীবন যাপন করতেন। তাঁর সরল, মধুর ও প্রেমপূর্ণ ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

তাঁর দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করুক, এই আমাদের প্রার্থনা।

বিবিধ সংবাদ

ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান—আন্তর্জাতিক তীর্থভূমি

রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগে ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থানে একটি আন্তর্জাতিক তীর্থস্থান ও পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। নেপাল সরকার তাঁর নিজস্ব টাকাতেই এর প্রাথমিক কাজগুলি প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এর কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়। এই মহতী কার্যের জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন রাষ্ট্রসঙ্ঘ, ভারত সরকার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের একটি বৌদ্ধ সংগঠন।

যুবসম্মেলন

নিম্নলিখিত সংস্থাগুলি থেকে, সঙ্গীত, বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর সভা ইত্যাদির মাধ্যমে যুবসম্মেলন অনুষ্ঠানের সংবাদ পাওয়া গিয়েছে: **এগরা** (মেদিনীপুর) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিলন-মন্দির (৪ ও ৫ জানুআরি ১৯৮৬), **গুড়াপ** (হুগলী) শ্রীরামকৃষ্ণ বিশুদ্ধানন্দ আশ্রম ও সেবাকেন্দ্র (৫ জানুআরি), **টালিগঞ্জ** (কলিকাতা) পল্লী-সংস্থা (১২ জানুআরি), **বঙ্গাইগাঁ** (আসাম) রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (১ ফেব্রুআরি), **বসিরহাট** (২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ (২ ফেব্রুআরি)।

পরলোকে

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্যা **ঊষাবালা দত্ত** গত ৪ জানুআরি ১৯৮৬, রাত্রি ১-৩০ মিনিটে প্রায় ৯৩ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ কালে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ ও স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ তাঁর ময়মনসিংহস্থ বাড়িতে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন।

তাঁর পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি লাভ হোক—এই আমাদের প্রার্থনা।

উদ্বোধন : বৈশাখ ১৩৯৩

সূচীপত্র

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংকলিত
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ
সাধারণ বাঁধাই ৩'০০, বোর্ড ৩'৫০

স্বামী ভূতেশানন্দ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ (তিন ভাগে)
১ম ভাগ ১০'০০, ২য় ভাগ ১২'৫০, ৩য় ভাগ ১০'০০

স্বামী নির্বেদানন্দ
(অনুবাদ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)
শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ ১২'৫

স্বামী প্রভানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা ১৫'০

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা (দুই ভাগে)
১ম ভাগ ১৫'০০, ২য় ভাগ ১৫'০০

স্বামী গম্ভীরানন্দ
শ্রীমা সারদাদেবী ২৭'০০

স্বামী সারদেশানন্দ
শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা ১০'০০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
শিশুদের মা সারদাদেবী (সচিত্র) ৭'০

স্বামী বুধানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ বিভাসিতা মা সারদা ৭'০

স্বামী ঈশানানন্দ
মাতৃসান্নিধ্যে ৯'০

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

স্বামী গম্ভীরানন্দ
যুগনায়ক বিবেকানন্দ (তিন খণ্ডে)
১ম খণ্ড ৩০'০০, ২য় খণ্ড (যন্ত্রস্থ)
৩য় খণ্ড ১৮'০০

ভগিনী নিবেদিতা (অনুবাদ : স্বামী মাধবানন্দ)
স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি ১৬'০০

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ১০'০০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
স্বামী বিবেকানন্দ ৭'০০
শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র) ৫'৫০

স্বামী নিরাময়ানন্দ
ছোটদের বিবেকানন্দ ২'৫০

শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য
স্বামী বিবেকানন্দ ২'৫০

স্বামী বুধানন্দ
ওঠ, জাগো, এগিয়ে চল ৪'২৫
ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর ১'৫০
স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা ৩'৫০

ভগিনী নিবেদিতা
স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ৫'০০

প্রমথনাথ বসু
স্বামী বিবেকানন্দ
১ম খণ্ড ২০'০০, ২য় খণ্ড ২০'০০

বিবিধ

মহাপুরুষজীর পত্রাবলী ৭'৫০
স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র ৭'৮০
স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী ৪'৫০
আরতি-স্তব ও রামনাম ১'৫০
ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ৬'০০

স্বামী গম্ভীরানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা (দুই ভাগে)
১ম ভাগ ২৫'০০, ২য় ভাগ ২৫'০০

স্বামী সারদানন্দ
ভারতে শক্তিপূজা ৪'০০

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ
শ্রীরামানুজ চরিত ১৭'৫০

স্বামী প্রেমেশানন্দ
রামানুজ চরিত ৬'৫০

ভগিনী নিবেদিতা
শিব ও বুদ্ধ ৩'৭৫

স্বামী অপূর্বানন্দ
আচার্য শঙ্কর ৮'০০
শিবানন্দ-বাণী (সঙ্কলিত)
১ম ভাগ ৯'০০, ২য় ভাগ ৫'০০

স্বামী সুন্দরানন্দ
যোগ চতুষ্টয় ৭'৫০

গোপালের মা ২.২৫
গীতাতত্ত্ব ৭.০০
পত্রমালা ৪.০০
বিবিধ-প্রসঙ্গ ৩.৫০

স্বামী অখণ্ডানন্দ
তিব্বতের পথে হিমালয়ে ৬.৫০
স্মৃতি-কথা ১০.০০

শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়
লাটুমহারাজের স্মৃতিকথা ২০.০০

স্বামী সিদ্ধানন্দ সংগৃহীত
সৎকথা ১০.০০
অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ ৭.৫০

স্বামী বিরজানন্দ
পরমার্থ-প্রসঙ্গ ৪.৫০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
মহাভারতের গল্প ৪.৫০

স্বামী দেবানন্দ
ব্রহ্মানন্দ স্মৃতিকণা ১.৭৫

স্বামী বামদেবানন্দ
সাধক রামপ্রসাদ ৬.০০

স্বামী পরমানন্দ
প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা ২৪.০০

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
সাধু নাগমহাশয় ৬.০০

স্বামী নিরাময়ানন্দ-সম্পাদিত
স্বামী শুদ্ধানন্দ : জীবনী ও রচনা ১৫.০০

শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য
শঙ্কর-চরিত ৩.০০
দশাবতার চরিত ৫.০০

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ
দিব্যপ্রসঙ্গে ৬.৩৫

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ
পুণ্যস্মৃতি ৩.০০

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ
অতীতের স্মৃতি ২০.০০
বাঁধি তোমায় ১০.০০

স্বামী নরোত্তমানন্দ
রাজা মহারাজ ৭.০০

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
ভগবানলাভের পথ ১.৫০
মাতৃভূমির প্রতি আমাদের কর্তব্য ৩.০০

স্বামী প্রভানন্দ
ব্রহ্মানন্দচরিত ৩০.০০

স্বামী অন্নদানন্দ
স্বামী অখণ্ডানন্দ ১৬.০০

স্বামী নিরাময়ানন্দ
স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয় ৩.৩০

স্বামী ধ্যানানন্দ
ধ্যান ৩.৫০

স্বামী তেজসানন্দ
ভগিনী নিবেদিতা ৪.৪০

স্বামী অপূর্বানন্দ
মহাপুরুষ শিবানন্দ ১৫.০০

সংস্কৃত

শ্রীরামকৃষ্ণপূজাপদ্ধতি ৫.০০

স্বামী গম্ভীরানন্দ-অনূদিত ও সম্পাদিত
উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (তিন ভাগে)
১ম ভাগ ১৮.০০, ২য় ভাগ ১৮.০০,
৩য় ভাগ ১৮.০০
স্তবকুসুমাঞ্জলি ১৫.০০

স্বামী রঘুবরানন্দ-অনূদিত ও সম্পাদিত
গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা ৩.০০

স্বামী ধীরেশানন্দ-অনূদিত ও সম্পাদিত
যোগবাসিষ্ঠসারঃ ১২.৫০
বৈরাগ্যশতকম্ ১১.০০
বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা ৯.৫০

স্বামী জগদানন্দ অনূদিত
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ ১৭.৫০

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত ও সম্পাদিত
শ্রীশ্রীচণ্ডী ১৪.০০
গীতা ১৫.৫০

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত
বেদান্তদর্শন
১ম অধ্যায়ের ১ম খণ্ড ১৪.০০; ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ খণ্ড ৩.০০; ৩য় অধ্যায় ১৩.০০; ৪র্থ অধ্যায় ৯.০০

স্বামী প্রভবানন্দ
নারদীয় ভক্তিসূত্র ১১.০০

উদ্বোধনের গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের প্রতি

স্বামীজী চেয়েছিলেন : উদ্বোধনের মাধ্যমে 'ঠাকুরের ভাব তো সব্বাইকে দিতে হবেই, অধিকন্তু বাঙলা ভাষায় নূতন ওজস্বিতা আনতে হবে।—ঠাকুরের ইচ্ছায় টাকার জোগাড় হলে এটাকে পরে দৈনিক করা যেতে পারে। রোজ লক্ষ কপি ছেপে কলকাতার গলিতে গলিতে free distribution (বিনামূল্যে বিতরণ) করা যেতে পারে।'

'উদ্বোধন' ৮৭ বর্ষ অতিক্রম করে ৮৮ বর্ষে পদার্পণ করেছে, তবু আজও স্বামীজীর ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। বিবেকানন্দ-অনুরাগী গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের কাছে আহ্বান জানানো হচ্ছে, স্বামীজীর এই মহতী ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য 'উদ্বোধন' পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা বৃদ্ধিতে তাঁরা যেন নিজেদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রকাশ ও প্রচারে সহায়তা-প্রসঙ্গে স্বামীজী আরও বলেছিলেন : '...তোরা প্রত্যেকে যতটা পারবি,...সাহায্য করিস ওতে ঠাকুরের কাজই করা হবে।'

৮৮তম বর্ষের উদ্বোধন পত্রিকার বার্ষিক মূল্য সডাক	২৫·০০ টাকা
ভারতের বাইরে সি-মেল-এ	৮৮·০০ টাকা
বাংলাদেশ	৪৩·০০ টাকা
এয়ার-মেল-এ	২০৩·০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা	২·৫০ টাকা

আজীবন গ্রাহক (৩০বৎসরান্তে পুনরায় নবীকরণ সাপেক্ষ) ৪০০·০০ টাকা

মাঘ হতে বৎসর আরম্ভ। যে-কোন মাস হতে গ্রাহক হওয়া যায়।

৮৮তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা বৈশাখ, ১৩৯৩

দিব্য বাণী

ভক্ত বলেন: সবই তাঁহার, তিনি আমার প্রিয়তম, আমি তাঁহাকে ভালবাসি। এইরূপ ভক্তের নিকট ক্রমশঃ সবই পবিত্র বলিয়া বোধ হয়, কারণ সবই তাঁহার। সকলেই তাঁহার সন্তান, তাঁহার অঙ্গস্বরূপ, তাঁহারই প্রকাশ। তখন কিভাবে অপরকে আঘাত করিতে পারি? কিরূপেই বা অপরকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি? ভগবৎপ্রেম আসিলেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিশ্চিত ফলস্বরূপ সর্বভূতে প্রেম আসিবে। আমরা যতই ভগবানের দিকে অগ্রসর হই, ততই সমুদয় বস্তুকে তাঁহার ভিতর দেখিতে পাই। যখন সাধক এই পরা ভক্তিলাভে সমর্থ হন, তখন ঈশ্বরকে সর্বভূতে দর্শন করিতে আরম্ভ করেন, এইরূপে আমাদের হৃদয় প্রেমের এক অনন্ত প্রস্রবণ হইয়া দাঁড়ায়। যখন আমরা এই প্রেমের আরও উচ্চস্তরে উপনীত হই, তখন এই জগতের সকল পদার্থের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা একেবারে দূরীভূত হয়। মানুষকে তখন আর মানুষ বলিয়া বোধ হয় না, ভগবান্ বলিয়াই বোধ হয়; অপরাপর জীবজন্তুও আর জীবজন্তু বলিয়া বোধ হয় না, ঈশ্বর বলিয়াই বোধ হয়। এমন কি ব্যাঘ্রকেও ব্যাঘ্র বলিয়া বোধ হইবে না, ভগবানেরই এক প্রকাশ বলিয়া বোধ হইবে। 'এইরূপে এই প্রগাঢ় ভক্তির অবস্থায় সর্বপ্রাণীই আমাদের উপাস্য হইয়া পড়ে। সর্বভূতে হরিকে অবস্থিত জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি সকলকে অবিচলিত ভাবে ভালবাসেন।'

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬৬]

কথাপ্রসঙ্গে

'যে যাকে চিন্তা করে, সে তার সত্তা পায়'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন: "যে যাকে চিন্তা করে, সে তার সত্তা পায়।" "শিবনাথ বলেছিল, বেশী ঈশ্বর চিন্তা করলে বেহেড্ হয়ে যায়। আমি বল্লুম কি!—চৈতন্যকে চিন্তা করে কি কেউ অচৈতন্য হয়ে যায়? তিনি নিত্যশুদ্ধবোধরূপ। যাঁর বোধে সব বোধ ক'চ্ছে, যাঁর চৈতন্যে সব চৈতন্যময়!" "শ্রীমতী শ্যামকে ভেবে ভেবে সমস্ত শ্যামময় দেখলে, আর নিজেকেও শ্যাম বোধ হল। পারার হ্রদে সীসে অনেকদিন থাকলে সেটাও পারা হয়ে যায়। কুমুরে পোকা ভেবে ভেবে আরশোলা নিশ্চল হয়ে যায়। নড়ে না; শেষে কুমুরে পোকাই হয়ে যায়। ভক্তও তাঁকে ভেবে ভেবে অহংশূন্য হয়ে যায়। আবার দেখে 'তিনিই আমি', 'আমিই তিনি'। আরশোলা যখন কুমুরে পোকা হয়ে যায়, তখন সব হয়ে গেল। তখনই মুক্তি।"

"আমাদের বেদান্ত শাস্ত্রের শিক্ষা—মানবের মন তাহার শরীরকে বর্তমান আকারে পরিণত করিয়াছে—'মন সৃষ্টি করে এ শরীর' এবং তীব্র ইচ্ছা বা বাসনা সহায়ে তাহার জীবনের প্রতি মুহূর্তে উহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতনভাবে গঠিত করিতেছে।" বলা নিষ্প্রয়োজন, 'তীব্র ইচ্ছা' বা 'বাসনা' চিন্তারই অভিব্যক্তির এক রূপ।

প্রত্যেক মানুষ তাহার চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। সে যে-কাজটি করে, তাহার পশ্চাতে থাকে তাহার চিন্তা। অন্যভাবে বলিতে গেলে, মানুষ যাহা চিন্তা করে, তাহাই তাহার কর্মের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়। তাহার বাহ্যিক চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, এমনকি শারীরিক গঠন পর্যন্ত তাহার চিন্তার অনুসারী হয়। একজন মানুষকে অপর একজন মানুষ হইতে চিনিয়া লইতে অসুবিধা হয় না। কারণ তাহার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। আর এই বৈশিষ্ট্যের পশ্চাতে চিন্তার প্রভাবই সর্বাপেক্ষা অধিক। যদিও জাতিগত, বংশগত এবং পরিবেশগত ইত্যাদি প্রভাবের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

চিন্তার প্রভাব অপরিসীম। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, বরং বিষয়টি বুঝিতে সুবিধা হইবে। তিনি বলিতেছেন: "তোমাদের যাত্রাওয়ালাদের ভিতর যারা কেবল মেয়ে সাজে তাদের প্রকৃতি ভাব হয়ে যায়। মেয়েকে চিন্তা করে মেয়ের মত হাবভাব সব হয়। সেইরূপ ঈশ্বরকে রাতদিন চিন্তা করলে তাঁরই সত্তা পেয়ে যায়।" লক্ষ্যও করা গিয়াছে, যদি কোন এক ব্যক্তি, অপর কোন এক ব্যক্তির চিন্তায় নিরন্তর রত থাকে, চিন্তার তন্ময়তা যত বৃদ্ধি পায়, তাহার হাব-ভাব, চাল-চলন, হাস্য-কৌতুক, কটাক্ষ, অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি বাহ্য আচরণ সকল তো বটেই, এমনকি তাহার মানসিক চিন্তাপ্রণালীও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া অপর ব্যক্তির অনুরূপ হইতে থাকে। ভালবাসার ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে, ভালবাসার গভীরতা যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে,

প্রেমাস্পদের স্বভাব-আচরণও প্রেমিককে তত প্রভাবিত করিতে থাকে। স্বামী সারদানন্দজীর কথায়: "প্রত্যক্ষও দেখিয়াছি, মনুষ্যবিশেষে প্রযুক্ত ভালবাসা ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে মানুষকে তাহার প্রেমাস্পদের অনুরূপ করিয়া তুলিয়াছে; তাহার বাহ্যিক হাবভাব চালচলনাদি এবং মানসিক চিন্তাপ্রণালীও সমূলে পরিবর্তিত হইয়া তৎসারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছে।" ঈশ্বরে প্রযুক্ত ভালবাসাও সেইরূপ সাধককে ধীরে ধীরে ঈশ্বরের অনুরূপ করিয়া তোলে।

শঙ্করাচার্যের বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে আছে: সতি সক্তো নরো যাতি সদ্ভাবং হ্যেকনিষ্ঠয়া।/ কীটকো ভ্রমরং ধ্যায়ন্ ভ্রমরত্বায় কল্পতে॥ অর্থাৎ—সৎস্বরূপব্রহ্মবিচারে তৎপর মানব এক-নিষ্ঠার ফলে অবশ্যই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন; কাচ-পোকার দ্বারা ধৃত তেলাপোকা যেমন কাচ-পোকার চিন্তা করিতে করিতে কাচপোকা হইয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়: "শুনেছ, কুমুরে পোকা চিন্তা করে করে আরশোলা কুমুরে পোকা হয়ে যায়।" ভ্রমর-কীটের এই জাতীয় দৃষ্টান্ত শঙ্করাচার্যের অপরোক্ষানুভূতি এবং শ্রীমদ্-ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থেও আছে। অপরোক্ষানু-ভূতি গ্রন্থে আছে: ভাবিতং তীব্রবেগেন যদ্বস্তু নিশ্চয়াত্মনা।/ পুমাংস্তদ্ধি ভবেচ্ছীঘ্রং জ্ঞেয়ং ভ্রমর-কীটবৎ॥ অর্থাৎ—যে-বস্তু নিশ্চয়পূর্বক তীব্র-বেগে ভাবিত হয়; মানুষ শীঘ্রই সেই বস্তু হইয়া যায়—ইহা ভ্রমর ও কীটের দৃষ্টান্ত হইতে জানিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে: কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্।/ সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্॥ অর্থাৎ—ভ্রমর কর্তৃক গর্তে অবরুদ্ধ কীট দ্বেষ ও ভয়হেতু ভ্রমরকে স্মরণ করিতে করিতে ভ্রমরেরই স্বরূপতা লাভ করে। কাচপোকার চিন্তা করিতে করিতে যদি তেলা-পোকা কাচপোকায় এবং কুমুরে পোকার চিন্তা করিতে করিতে যদি আরশোলা কুমুরে পোকায় রূপান্তরিত হয়, তাহা হইলে মানুষের ক্ষেত্রেও ঈশ্বরের চিন্তা করিতে করিতে মানুষের ঈশ্বরে রূপান্তরিত না হওয়ার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। পরন্তু ঈশ্বরের চিন্তা করিতে করিতে সাধক ঈশ্বর-স্বরূপতা লাভ করিবেন—ইহাই যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন হইতে পারে, সকল মানুষই কি তাহা হইলে ঈশ্বর হইতে সক্ষম? একজনের সম্পূর্ণ-রূপে অবিকলভাবে অন্যজনের মতো হওয়া কি সম্ভব? "উত্তরে আমরা বলি, সম্পূর্ণ একরূপ না হইলেও এক ছাঁচে গঠিত পদার্থনিচয়ের ন্যায় নিশ্চিত হইতে পারে। ধর্মজগতে প্রত্যেক মহা-পুরুষের জীবনই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচসদৃশ। …ভাগ্যক্রমে কেহ কখন কোন একটি ছাঁচের যথার্থ অনুরূপ হইলে আমরা তাহাকে সিদ্ধ বলিয়া সম্মান করিয়া থাকি। সিদ্ধমানবের চালচলন, ভাষা, চিন্তা প্রভৃতি শারীরিক এবং মানসিক সকল বৃত্তিই সেই ছাঁচ-প্রবর্তক মহাপুরুষের সদৃশ হইয়া থাকে।" ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্যবান। যে সাধক যে-পরিমাণে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত, যে-পরিমাণে তন্ময়, সেই পরিমাণেই তিনি ঐশ্বরিক গুণাবলীর অধিকারী হন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর একটি উপদেশ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন: "ঠাকুরকে ডাকার মানে কিনা—ঠাকুরের গুণের কতকাংশের অধিকারী হওয়া। যে যাঁর চিন্তা করে সে তাঁর গুণ পায়। ঈশ্বরের প্রথম গুণ প্রভুত্ব। তাঁর চিন্তা করে আমাদের ইন্দ্রিয়াদির উপর পূর্ণ প্রভুত্ব পাওয়া চাই। আমরা নিজেদের প্রভু হব। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বরের ইচ্ছা-মাত্রই কার্য হয়। আমাদেরও যা ইচ্ছা করব, তা কার্যে পরিণত করতে হবে। তৃতীয়তঃ, ঈশ্বরের ভালবাসা। তাঁর মত সকল প্রাণীকে ভালবাসতে হবে। এ প্রকার তাঁর গুণে যে যত

অধিকারী হয়েছে, সে তত ঠিক ঠিক ঠাকুরকে ডেকেছে।"

পতঞ্জলি বলেন: জাত্যন্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ। অর্থাৎ—প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা এক জাতি অপর জাতিতে পরিণত হয়। প্রত্যেক জীবের প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা তার শরীর এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে পরিণত হয়। 'জাত্যন্তর পরিণাম' সম্বন্ধে স্বামীজী বলিয়াছেন: "মনে কর, একজন হনুমানের মতো ভক্তিভাবে ঈশ্বরের সাধনা করছে। ভাবের যত গাঢ়তা হতে থাকবে, ঐ সাধকের চলন-বলন, ভাবভঙ্গী, এমনকি শারীরিক গঠনাদিও ঐরূপ হয়ে আসবে। 'জাত্যন্তর পরিণাম' ঐরূপেই হয়।" দাস্যভক্তিতে সিদ্ধ হইবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ এক সময় "আপনাতে মহাবীরের ভাবারোপ করিয়া কিছুদিনের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নিরন্তর মহাবীরের চিন্তা করিতে করিতে এই সময়ে তিনি ঐ আদর্শে এতদূর তন্ময় হইয়াছিলেন যে, আপনার পৃথক্ অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের কথা কিছুকালের জন্য একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন: 'ঐ সময় আহারাদি সকল কার্য হনুমানের ন্যায় করিতে হইত—ইচ্ছা করিয়া যে করিতাম তাহা নহে, আপনা আপনিই হইয়া পড়িত।…আশ্চর্যের বিষয় মেরুদণ্ডের শেষ ভাগটা ঐ সময় প্রায় এক ইঞ্চি বাড়িয়া গিয়াছিল।'"

ভাগবতে আছে: সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। সালোক্য—অভীষ্ট দেবতার সহিত একই লোকে—বিষ্ণুলোক হউক, শিবলোক হউক—চিরকাল বাস করা। অভীষ্ট দেবতার সঙ্গে এক লোকে বাস করা অতি সৌভাগ্যের কথা। সার্ষ্টি—অভীষ্ট দেবতার ন্যায় সমান ঐশ্বর্য। সামীপ্য—পার্ষদাদিরূপে অভীষ্ট দেবতার সমীপে বাস। ইহাও কম সৌভাগ্যের কথা নয়। সারূপ্য—অভীষ্ট দেবতার সহিত সমানরূপতা। শুধু সমীপে বাস নয়, তাঁহার মতো রূপ, ঐশ্বর্য ইত্যাদি সব গুণ পাওয়া। একত্ব—অভীষ্ট দেবতার সহিত একাত্মতা, সর্বদা যুক্ত থাকা। তাঁহার সহিত অঙ্গীভূত হইয়া নিত্যযুক্ত থাকা। নিয়ত ঈশ্বরের চিন্তার ফলে সাধক এইসব ঐশ্বরিক গুণের অধিকারী হন। উপরি-উক্ত ঐশ্বরিক গুণগুলির মধ্যে একাত্মতা—অভীষ্ট দেবতার সহিত নিত্যযুক্ত থাকা গুণটি চরম পর্যায়ের। সাধক যখন সাধনার এই পর্যায়ে উপনীত হন, তখন উপাস্য ও উপাসক, প্রেমাস্পদ ও প্রেমিকের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর চিন্তার ফলে শ্রীমতী রাধিকা এবং অন্যান্য গোপীদের যে এই অবস্থা হইত—ভক্তিগ্রন্থের পাঠকদের নিকট তাহা সুবিদিত। শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় তন্ময় হইয়া সময়ে সময়ে তাঁহারা নিজেদের অস্তিত্বজ্ঞান পর্যন্ত হারাইয়া ফেলিতেন। ভাগবতে আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন: "মুনিগণ সমাধিকালে যেমন নামরূপ বিস্মৃত হন, নদনদী সকল সমুদ্রে মিলিত হইয়া যেমন নিজেদের সত্তা হারাইয়া ফেলে, গোপীরাও সেইরূপ পরমপ্রেমের বশে আমাতে এমন তন্ময় হইয়াছিল যে তাহাদের নিজেদের শরীর, প্রিয় পতিপুত্রাদি ও সংসারের সকল কিছু বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল।" "শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থপাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রজগোপিকাগণ ঐরূপ আপনাদিগের অস্তিত্বজ্ঞান কেবলমাত্র বিস্মৃত হইতেন না, পরন্তু সময়ে সময়ে আপনাদিগের নিজ প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াও উপলব্ধি করিয়া বসিতেন। জীব-কল্যাণার্থে শরীরত্যাগকালে ঈশাকে যে উৎকট দুঃখভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহার কথা চিন্তা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া কোন কোন সাধক-সাধিকার অঙ্গসংস্থান হইতে রক্ত নির্গমনের

কথা। খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ভক্তিগ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় উপসংহার করিয়া বলি: "যে যাকে চিন্তা করে, সে তার সত্তা পায়।" "কুমুরে পোকা চিন্তা করে করে আরশোলা কুমুরে পোকা হয়ে যায়।" "অহর্নিশি ঈশ্বরচিন্তা করলে ঈশ্বরেরই সত্তা লাভ হয়। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে তাহা হয়ে গেল।" আরশোলা যখন 'কুমুরে পোকা হয়ে যায়', নুনের পুতুল যখন 'তাহা হয়ে গেল'—"তখন সব হয়ে গেল। তখনই মুক্তি।"

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষকে লিখিত]

শ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Ramakrishna Math
Belur Math
24/12/29.

শ্রীমান্ অতুল,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। ঠাকুরের নাম করিয়া গয়া যাত্রা করিও। গয়া আমাদের প্রধান তীর্থ। বিষ্ণুর পাদপদ্ম দর্শন করিতে গিয়াই ঠাকুরের পিতা তাঁহাকে প্রথম প্রাপ্ত হন। তাঁর কৃপায় তোমারও ভক্তি বিশ্বাস লাভ হইবে কোন সন্দেহ নাই। ফিরিবার সময় দেখা না হয়ত আর কি হইবে। ঠাকুর তোমার হৃদয়ে আছেন—তাঁর স্মরণেই তোমার সব লাভ হইবে। আমার শরীর ভাল নয়। তুমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি।

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীপ্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

উদয়পুর
8 June '94

পূজ্যপাদ মহাশয়েষু—

গতকল্য আপনার একখানি পত্র পাইলাম। তাহাতে আপনি বাত-পীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন জানিয়া অতীব দুঃখিত হইলাম। সৎ বৈদ্যের চিকিৎসায় শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবেন। আরোগ্য হইলে আর একস্থানে বসিয়া থাকিবেন না। অল্প অল্প চলা ফেরা করিবেন। পরে শীঘ্রই আবার কুশল সংবাদ দিবেন। আপনার পুত্র পৌত্রেরা ভাল আছেন ত? উপেন্দ্র বাবু ও মোক্ষদা বাবু কেমন আছেন? তাঁহারা আমাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। এখনও কি তাঁহারা আমাকে মনে করেন? বোধ করি ভুলিয়া গিয়া থাকিবেন। অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সকলকে আমার ভালবাসা জানাইবেন।

এতাবৎ আমি গুর্জ্জর, কাথিয়াবার, কচ্ছ ও রাজপুতানায় ভ্রমণ করিয়াছি। তন্মধ্যে ভ্রমণ অপেক্ষা স্থানে স্থানে অধিককাল বাস করিয়াছি। এমন কোন মহাপুরুষ সমাগম ঘটে নাই, যাহার কথা লিখি। আর গঙ্গাতীরবাসী ভিন্ন ভারতের অন্য কোন দেশবাসীর সদাচারও নাই বলিয়া বোধ হয়। যদি চ বেদোক্ত সংস্কার ও ক্রিয়া কর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গীণ কোথাও দৃষ্ট হয় না, তথাপি অদ্যাপি স্মার্ত্ত পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়া কর্ম্ম যাহা কিছু বঙ্গদেশে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা আর ভারতের কুত্রাপি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যদি চ আমি দাক্ষিণাত্যে যাই নাই তথাপি অনুমান করি যে বঙ্গদেশের মত সুমার্জ্জিত ও শাস্ত্রোক্ত আচার ব্যবহার ও সংস্কার সে দেশেও নাই। দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ লোকেই বেদ পাঠ করেন—সত্য। কিন্তু উদরের চিন্তায় অথবা সংসারের চিন্তায় অতিরিক্ত ব্যতিব্যস্ত হওয়ায় আর তাঁহারা তাহার অর্থচিন্তায় মনোনিবেশ করিতে অবকাশ পান না। যে অতি অল্প সংখ্যক লোক এ কষ্টকর সংসার নির্ব্বাহের চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন—তাঁহারাও এমনই ইন্দ্রিয়পরায়ণ, বিলাস ও ভোগমত্ত এবং তমোঽভিভূত যে তাঁহাদের এ বিষয়ে মনোযোগ হয় না ও তাঁহারা স্বীয় কল্যাণ ও কর্ত্তব্যের কথা একবারও ভাবেন না। অথচ তাঁহারাই যদি সুখ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক চক্ষুরুন্মীলন করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যের পথে ক্রমে অল্প অল্প অগ্রসর হন, ত আর এ দুঃখ অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে না।

বাস্তবিক আমাদের যাহা কিছু ধর্ম্ম ও সংস্কার ও ঈশ্বরপ্রবণ বুদ্ধি এবং

জ্ঞান আছে সে সমস্তই বেদ হইতে; বেদ না থাকিলে কেবল আমরা কেন, জগতের কোন সভ্য জাতিই প্রকৃত ধর্ম্ম রহস্য জানিতে পারিত না। অতএব ভাবুন দেখি সে পৈতৃক সম্পত্তি বেদরূপ অমূল্য ধন হইতে কালের অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে আমরা কত দূর গিয়া পড়িয়াছি—তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। মহাশয়, এ সকল কথাই ত আপনি জানেন তথাপি আশা করি আমার এরূপ লেখার জন্য আপনি বিরক্ত হইবেন না। আমরা সকলেই বাল্যকাল হইতে আমাদের সামবেদের কৌথুমী শাখা বলিয়া জ্ঞাত আছি। পরন্তু বাস্তবিক তাহা যে কি তাহা প্রায় কেহই জানে না। সেই জন্যই আমরা সকল বিষয়ে এতাদৃশ হীন হইয়া পড়িয়াছি। নচেৎ শাস্ত্রকাররাই বা এরূপ লিখিবেন কেন—যথা "যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদান্ অন্যত্র কুরুতে শ্রমম্, স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়।"—একথা সত্য হইলে ভারতে অল্প সংখ্যক লোকই দ্বিজপদবাচ্য হইতে পারেন। বেদ-অধ্যয়নের জন্য বা শাস্ত্রে এরূপ কঠোর শাসন থাকিবার কারণ কি? অবশ্যই বেদ ভিন্ন ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে না, এবং সেই বেদপাঠ-বিহীন হওয়ায় দ্বিজদিগের যে শূদ্রত্ব তাহা ত প্রত্যক্ষই দেখিতেছি। যে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ প্রায় সকলেই দীর্ঘকাল হইতে দাসত্ব করিয়া জীবন যাপন করিতেছেন, এজন্য আমি তাঁহাদের দোষ দিই না, কিন্তু রাজা মহারাজা ও ধনাঢ্য ব্যক্তি মাত্রেই আলস্য পরিত্যাগ করিয়া "সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ"—ইত্যাদি ভগবৎ বাক্য স্মরণ করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্যে প্রাণপণ যত্ন করিতে হইবে। আপনি বোধ হয় পড়িয়া থাকিবেন 'মোক্ষমূলার' সাহেব তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে বেদের কিরূপ অতুল মাহাত্ম্য খ্যাপন করিয়াছেন ও স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে বেদ না জানিলে কিছুই জানা যায় না। অতএব মহাশয় সবিনয়ে নিবেদন করি যে অন্ততঃ আপনার প্রজা যাহাতে স্বচ্ছন্দ সংসার নির্ব্বাহ করিয়া বেদপাঠপূর্ব্বক স্ব স্ব ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হন তদ্বিষয়ে মনোযোগ করুন। আপনারা কর্ম্মী—আর আপনি ইহাও জানেন যে আর্য্যজাতির কোন কর্ম্মই কেবল স্বার্থ সাধনের জন্য নহে; এমন কি তাঁহাদের অন্ন পর্য্যন্ত একাকী খাইতে নাই। এমন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন যাহাতে দেশের কল্যাণ হয়।

My nation first and second myself একথাটি সদা মনে রাখিবেন। আপনার দেশ—আপনার সংসার ও আপনি সংসারের। অতএব আপনার ওরূপ দেশ ছাড়া কথা বলিলে চলিবে কেন? তবে যাহাতে দেশের কল্যাণ হয় তাহার চেষ্টা করুন। বাস্তবিক ইহাই আপনাদের ধর্ম্ম; প্রজাবৎসল জনক রাজার যত্নেই এদেশে ব্রহ্মজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ হইয়াছিল। পুনর্ব্বার তাঁহার মত উদার প্রজাপালক

জ্ঞানী রাজা হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানের পুনরভ্যুত্থান হইবে। নচেৎ নহে। নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্লোক আপনাদের মনে রাখা উচিত :—

প্রজানাং বিনয়াধানাৎ রক্ষণাদ্ ভরণাদপি। স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ॥ প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ। সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ॥ তং বেধা বিদধে নূনং মহাভূত-সমাধিনা। তথা হি সর্ব্বে তস্যা হসন্ পরার্থে বাঃ ফলা পুনঃ॥ (রঘুবংশ)

মহাশয় আমার বাচালতা ক্ষমা করিবেন। আপনাদের ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া জানিয়াছি।

আপনার
গঙ্গাধর

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষকে লিখিত]

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

৺কাশী
১২।৭।২০

শ্রীমান্ অতুল,

তোমার ৯ই তারিখের পত্র পাইয়া প্রীতিলাভ করিলাম। মধ্যে ২ তোমার সংবাদ আমাদেরই কাহার না কাহারো নিকট হইতে পাইয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। তোমার প্রেরিত লিচুগুলি বেশ ভাল অবস্থায় আসিয়া গিয়াছে। মাত্র দশ বারটি খারাপ হইয়া ছিল। উভয় আশ্রমের সকলেই উহা খাইয়াছে ও বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে। কি সুন্দর লিচু! তুমি পত্রে অত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছ কেন? ঠাকুরের শরণাগতদের কোনও ভয় নাই জানিবে। তিনিই সকল দুর্ব্বলতা সকল ভয় ভাবনা ঠিক করিয়া লইবেন। তাঁহাকেই সর্ব্বদা আত্মনিবেদন করিবার চেষ্টা করিবে। অন্তর্য্যামী তিনি সকল জানিয়া যাহাতে কল্যাণ হয় সেইরূপই বিধান করিবেন। আমার শরীর বেশ ভাল নাই। এবার মরিয়া গিয়াছিলাম। ঠাকুর আবার ফিরাইয়া আনিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা তিনিই জানেন। শ্রীশ্রীমার শরীর খুব পীড়িত। অনেক চেষ্টা চরিত্র চিকিৎসাদি হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু উপশম হইতেছে না। প্রভুর কৃপায় যদি এবার তাঁহার শরীর রক্ষা হয় আমাদের মহাভাগ্য বলিতে হইবে। ৺ভুবনেশ্বরে মহারাজ ভাল আছেন। মহাপুরুষ বহুদিন হইতে বেলুড় মঠেই আছেন। তাঁহার শরীর ভাল আছে। এখানকার উভয় আশ্রমের সব কুশলে আছে। তুমি আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীতুরীয়ানন্দ

সোভিয়েত রাশিয়ায় কয়েকদিন

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

বুলগেরিয়ায় শান্তি-সম্মেলনে যাচ্ছিলাম, পথে মস্কো। বুলগেরিয়ার কথা আগেই বলেছি (উদ্বোধন, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৯২ দ্রষ্টব্য)। এবার সোভিয়েত রাশিয়ার কথা বলব। বুলগেরিয়ায় একটা আন্তর্জাতিক শান্তি-সম্মেলন হবার কথা। তাতে যোগ দেবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। ভারতবর্ষ থেকে বুলগেরিয়ায় সরাসরি প্লেনে যাওয়া যায় না—হয় মস্কো হয়ে যেতে হয়, নয় রোম হয়ে যেতে হয়। আমার কাছে ওরা দুরকম টিকিটই পাঠিয়েছিল। আমি রোম হয়ে যাবার টিকিটটা ফেরত পাঠিয়েছিলাম, কারণ রোম এর আগে একবার গেছি। ভাবলাম মস্কো হয়ে যাব। এই সুযোগে রাশিয়াটা একটু দেখা হয়ে যাবে।

রাশিয়াতে আমার পরিচিত কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব আছে। কলকাতার যে রুশ দূতাবাস, তার সঙ্গেও আমার এবং এই প্রতিষ্ঠানের* ভাল যোগাযোগ আছে। রাশিয়ায় কয়েকজনকে চিঠি লিখেছিলাম যে, আমি যাচ্ছি। কিন্তু আমি রওনা হবার আগে পর্যন্ত কোন উত্তর পাইনি। আসলে রাশিয়ার সঙ্গে বাইরের কোন দেশ থেকে যোগাযোগ করা খুব কঠিন ব্যাপার। অনেক চিঠিই পৌঁছয় না, পৌঁছলেও খুব দেরিতে পৌঁছয়। চিঠি না পাওয়ায় মনে মনে একটু দুর্ভাবনা নিয়েই রওনা হতে হল। আমি কলকাতা থেকে দিল্লীতে এসেছিলাম। দিল্লী থেকে এয়ার-ইণ্ডিয়ার প্লেনে মস্কো রওনা হলাম ১৯ অক্টোবর, ১৯৮৪। প্লেন ছাড়ল দশটা পনেরো মিনিটে।

প্লেনে প্রায় সবাই রাশিয়ান। কেবল একজন দক্ষিণ ভারতীয় মহিলাকে দেখলাম। সঙ্গে দুটি ছোট ছোট ছেলে। তাদের নিয়ে তিনি যাচ্ছেন মস্কোতে। তাঁর স্বামী এয়ার-ইণ্ডিয়াতে কাজ করেন। যে রাশিয়ানরা প্লেনে আছে তারা সবাই খুব হৈ-চৈ দাপাদাপি করছে। তাদের পোশাক দেখে মনে হল তারা একটু গ্রাম্য। আর অবস্থাও খুব ভাল নয়। দল বেঁধে ভারতে এসেছিল, এখন দেশে ফিরছে বলে তাদের এত আনন্দ। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখলাম সব চুপ-চাপ। ভাবলাম, এর মধ্যেই সবাই ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? আমার টয়লেট যাবার দরকার ছিল। টয়লেট প্লেনের আর এক মাথায়, আর আমার সীটটা এমাথায়। টয়লেট যাবার পথে দেখলাম যে, না, ঘুমোয়নি। জায়গা বদল করে মেয়েরা উল বুনছে, আর ছেলেরা তাস খেলছে। আমাদের দেশেও যেমন দেখা যায়।

মনে নানারকম চিন্তা। এয়ারপোর্টে কেউ আসবে তো আমায় নিতে? না এলে অপরিচিত জায়গায় কি করব? আর মস্কো এয়ারপোর্টের কড়াকড়ি সম্বন্ধে নানারকম গল্প এদেশে শুনেছি। তাতে আরও ভয় করছিল। ঘুমানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু এইসব ভাবনাচিন্তায় ঘুম আর হল না। সারা রাস্তাটা জেগেই কাটালাম। ভারতীয় সময় অনুযায়ী দিল্লী থেকে প্লেনে চড়েছিলাম রাত সোয়া দশটা। মস্কোয় যখন পৌঁছলাম, তখন রাত চারটে। প্রায় ছ-ঘণ্টা লাগল। মস্কোর ঘড়িতে তখন অবশ্য বাজে একটা-পঞ্চাশ। মস্কোর সময় আর দিল্লীর সময়ের তফাত দু-ঘণ্টা দশ মিনিট।

আমি মানসিকভাবে প্রস্তুতই ছিলাম যে, আমায় এয়ারপোর্টেই রাত কাটাতে হবে, আমাকে নিতে কেউ আসবে না। যাইহোক, নির্দিষ্ট জায়গায় আমার পাশপোর্ট দেখালাম।

* রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার।

যে-লোক সেখানে বসে ছিল—একজন সামরিক অফিসার—সে একবার আমার ছবির দিকে তাকাচ্ছে, আর একবার আমার দিকে। অর্থাৎ ছবির সঙ্গে আমার চেহারা মিলছে না। আমি তো প্রমাদ গণলাম। কি হবে এখন? এমন সময় কে একজন ঐ অফিসারটিকে পাশ থেকে কিছু বললেন। ওঁদের ভাষায় বললেন, তাই কি বললেন বুঝলাম না। কে তিনি তাও বুঝলাম না—কারণ আগাগোড়া তাঁর শীতের পোশাকে মোড়া, আর যে-জায়গায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সে-জায়গাটা অন্ধকার। তবে 'ডিপ্লোম্যাট' কথাটা কানে এল। অর্থাৎ তিনি বোধ হয় বললেন: 'এই লোকটিকে সরকার থেকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে, একে নিয়ে হাঙ্গামা করো না, তাড়াতাড়ি ছেড়ে দাও।' এরপরেও কিন্তু ঐ সামরিক অফিসারটি ফোন করে যেন কার সঙ্গে পরামর্শ করলেন। কোথায় ফোন করলেন জানি না, ওদিক থেকে কি বলল তাও জানি না—তবে আর ঝামেলা না করে একটা সীল মেরে পাশপোর্টটা আমায় ফেরত দিলেন। অর্থাৎ এখন আমি সোভিয়েত রাশিয়ায় ঢুকতে পারি। এর পরেও কিছু কাগজে সই করার ছিল, তবে তা এমন ভয়ঙ্কর কিছু নয়।

আমি পাশপোর্টের বেড়া পেরিয়ে এগুতেই যে মূর্তিটি আমার হয়ে বলেছিলেন, 'ডিপ্লোম্যাট ছেড়ে দাও' তিনি এগিয়ে এসে আমাকে বললেন—'মহারাজ, আমি মীরা, আপনাকে নিতে এসেছি।' 'মহারাজ' আর 'মীরা' শুনে আমি চমকে উঠলাম। কথা হচ্ছিল ইংরেজীতে কিন্তু চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ভারতীয় নন। ঠিক চিনতে পারছি না কে হতে পারেন। তখন তিনি নিজেই বললেন: 'মহারাজ, আমাকে ভুলে গেলেন? মাত্র কয়েকমাস আগে আপনাদের ইনস্টিটিউটে গিয়েছিলাম, তখন আমাকে আর আমার সঙ্গীদের আপনারা কত যত্ন করেছিলেন,' ইত্যাদি। এবার আমার সব মনে পড়ল। রাশিয়ার রাইটার্স ইউনিয়নের কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে ইনি ইনস্টিটিউটে এসেছিলেন। রাইটার্স ইউনিয়নের ইনি একজন সিনিয়ার অফিসার। খুব করিতকর্মা এবং বিদুষী। ইনি তখন দোভাষীর কাজ করেছিলেন। এঁর ভারত সম্বন্ধে জ্ঞান ও বিনয় তখন আমাদের মুগ্ধ করেছিল। ওঁর আসল নাম—মারিয়ানা সাল্‌গনিক্, কিন্তু ভারতবর্ষে তিনি 'মীরা'। রাধাকৃষ্ণণ যখন রাশিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন, তখন ইনি তাঁর দোভাষীর কাজ করতেন। ইন্দিরা গান্ধী এঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। আরও অনেক বিশিষ্ট ভারতীয়ের ইনি স্নেহভাজন। হিন্দুদর্শন ভাল জানেন। ইংরেজী ভাষা খুব ভাল জানেন। হিন্দী ও পাঞ্জাবীও বলতে পারেন। বাংলা বোঝেন কিন্তু বলতে পারেন না। কাজে-কর্মে সব দিকে এমন চৌকস মেয়ে খুব কম দেখা যায়। ওদেশে গিয়ে কোন ব্যাপারে আটকে গেলে, ইনি ঠিক উপায় করে দিতে পারবেন। অবশ্য এঁর এত গুণের কথা আমি আগে জানতাম না। মস্কোয় থাকতে থাকতে জেনেছি।

মীরাকে ওখানে পেয়ে সব দুর্ভাবনা কেটে গেল। মীরা বলল: 'আমরা আপনাকে সোভিয়েত রাইটার্স ইউনিয়ন এবং অ্যাকাডেমী অব্ সায়েন্সেস-এর পক্ষ থেকে নিতে এসেছি। আপনি এখানে তাঁদের সম্মানিত অতিথি। আপনি সোফিয়া যাচ্ছেন, আমরা খবর পেয়েছি। সোফিয়া যাবার আগে আপনি আমাদের অতিথি হিসাবে এখানে থাকবেন। আবার ফেরার পথে আপনাকে দিল্লীর প্লেনের জন্য এখানে যে-কদিন অপেক্ষা করতে হবে তখনও আপনি আমাদের অতিথি হিসাবে এখানে থাকবেন। আপনাকে

সব ঘুরিয়ে দেখাব, বক্তৃতার ব্যবস্থাও হয়েছে।'

মীরার সঙ্গে একটি যুবক ছিল। মীরা আমাকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। নাম অ্যাণ্ড্রু। এও রাইটার্স ইউনিয়নের একজন কর্মী। সম্ভবত মীরার অধীনে কাজ করে। মীরা বললেঃ 'রাশিয়ায় অ্যাণ্ড্রুই আপনার দোভাষীর কাজ করবে।' আমি কথাবার্তার সময় অ্যাণ্ড্রুর সাহায্যেই করতাম, কিন্তু বক্তৃতার সময় মীরাকে বলতাম দোভাষীর কাজ করতে। কারণ, অ্যাণ্ড্রু যদিও ইংরেজী খুব ভাল জানে, কিন্তু মীরার সুবিধে হচ্ছে, সে ভারতীয় ধর্মদর্শন ইত্যাদিও খুব ভালভাবে পড়েছে। তাই আমার বক্তৃতার সময় আমি মীরাকেই বলতাম দোভাষীর কাজ করতে।

মস্কোয় কোথায় উঠব জানতাম না। টুরিস্ট এজেন্সীর লোকেরা বলেছিল হোটেল কসমস-এ আমার থাকার ব্যবস্থা করে দেবে। সেখানে নাকি অনেক ভারতীয় ওঠে। তারা কলকাতা থেকে চিঠি লিখেছিল, টেলিগ্রামও পাঠিয়েছিল জানতে যে আমার জন্যে জায়গা দিতে পারবে কিনা। কিন্তু কোন জবাব মেলেনি। কাজেই মস্কোয় পৌছানো পর্যন্ত জানতাম না কোথায় উঠব। মীরার কাছে জানলাম, ওদের অতিথি, তাই আমার থাকার ব্যবস্থা ওরা করে রেখেছে হোটেল রোশিয়াতে। সেটাই রাশিয়ার সবচেয়ে বড় হোটেল। এবং সবচেয়ে আধুনিক। অলিম্পিকের সময় এই হোটেল তৈরি হয়। এর প্রত্যেক ঘরে টেলিফোন, রেডিও, টিভি ও ফ্রিজ।

হোটেলে গিয়ে জিনিসপত্র রাখলাম। মীরা একটা প্রকাণ্ড ফ্লাস্কে করে আমার জন্য চা এনেছিল। বলল: আপনার জন্য 'ইণ্ডিয়ান টি' এনেছি। ইণ্ডিয়ান টি অর্থাৎ দুধ-চিনি মেশানো চা। আমরা তিনজনে ভাগ করে খেলাম। তারপর ওরা বিদায় নিল। অ্যাণ্ড্রু বলে গেল: পরদিন সকাল দশটার সময় সে আসবে। তখন ঘড়িতে বাজে পাঁচটা, কিন্তু গভীর রাত। আমি শুয়ে পড়লাম, কিন্তু ঘুম আর আসে না। কত কি চিন্তা। নিজেরই ভাবতে অবাক লাগছে, কি করে মস্কো এলাম। শুধু আসা নয়, এরকম রাজকীয় অভ্যর্থনা ও আরাম। কি করে এসব সম্ভব হল? ভাবতে-ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম জানি না। পরদিন (২০ অক্টোবর) যখন ঘুম ভাঙল তখন সকাল আটটা। অ্যাণ্ড্রুর আসবার কথা দশটায়। ওর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

রাশিয়ায় যে-কদিন ছিলাম, অ্যাণ্ড্রুই আমার চোখ, কান, মুখ—সবই। অ্যাণ্ড্রু এম.এ. পাশ করেছে। বৌদ্ধধর্ম নিয়ে কাজ করবার ইচ্ছা। বৌদ্ধধর্মের প্রতি কি করে তার এতটা আগ্রহ হল? সে জাপানে ছিল দু-বছর। জাপানী-ভাষা কিছু কিছু শিখেছে। সেখানেই বৌদ্ধধর্মের কথা কিছু কিছু শুনে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আগ্রহী হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম নিয়ে গবেষণা করবে বলে সে দরখাস্ত করেছে। ওদের দেশে গবেষণা করার অনুমতি পাওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার। আমাদের দেশে যেমন যে-কেউ গবেষণা করতে পারে, যে-কেউ এম. এ. পড়তে পারে—পয়সা থাকলেই হল—ওদের দেশে তা নয়। স্কুল পর্যন্ত সবাই পড়তে পারে, কোন কড়াকড়ি নেই। স্কুলে বহুমুখী শিক্ষা দেওয়া হয় এবং হাতের কাজ শেখানো হয়। নানারকমের হাতের কাজ শেখানো হয়, যার ফলে সবাই কিছু না কিছু করে খেতে পারে। ওদের দেশে সেইজন্য বেকার-সমস্যা প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার সময় প্রচণ্ড কড়াকড়ি। পরীক্ষায় বসতে হয়, সেই পরীক্ষায় যারা উপরের দিকে থাকে, তাদেরই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার অনুমতি দেওয়া হয়; এবং তাদেরকে বৃত্তি দেওয়া

হয়। গবেষণার ক্ষেত্রেও এইরকম কড়াকড়ি। অ্যাণ্ড্রু বলল: আমার খুব ইচ্ছে বৌদ্ধধর্ম নিয়ে গবেষণা করব। দরখাস্ত করেছি, জানি না বৃত্তি পাব কিনা। আমি বললাম: 'যদি বৌদ্ধধর্ম নিয়ে কর, তাহলে ঐসঙ্গে একটু বেদান্ত নিয়ে কর। দুটো পাশাপাশি নিয়ে পড়লে আরও ভাল হবে।' যাঁরা ওদের গবেষণার জন্য বৃত্তি মঞ্জুর করেন, তাঁদের সঙ্গে ওখানে থাকতে থাকতে আমার বিশেষ পরিচয় হয়ে গেল। তাঁদের কাছে পরে শুনলাম: অ্যাণ্ড্রুর বৃত্তি মঞ্জুর হয়েছে। তার মানে ও গবেষণা করতে পারবে। তখন আমি তাকে বললাম: 'তুমি যদি বেদান্ত ও বৌদ্ধধর্ম নিয়ে ভাল করে গবেষণা করতে চাও, তাহলে তুমি ভারতবর্ষে কলকাতায় এসো। আমাদের ওখানে থাকবে। কোন খরচ লাগবে না। একবছর-দুবছর থেকে তুমি ভালভাবে পড়াশুনা কর, আমি তোমাকে ভাল পণ্ডিতের ব্যবস্থা করে দেব।' শুনে ও খুব খুশি। যারা ওর অভিভাবক-স্থানীয় তারাও খুশি। তবে ওর আসা সম্ভব হবে কিনা সেটা আলাদা কথা।

যখন ৮-৩০ তখন টেলিফোন বাজছে। টেলিফোন এল কোথা থেকে? ধরলাম। ওপাশ থেকে হিন্দীতে কথা ভেসে এল: 'স্বামীজী, মস্কো আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে। এতদিন আকাশ মেঘলা ছিল, রোজ বরফ পড়ছিল, আজ দেখুন, ঝলমলে পরিষ্কার আকাশ। এ আপনার জন্যই হয়েছে। আমরা সবাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।' চেলিশেভ্ কথা বলছেন। ইনি ভারতে গেছিলেন, ইনস্টিটিউটেই ছিলেন। ওখানকার রাইটার্স ইউনিয়ন এবং অ্যাকাডেমী অব্ সায়েন্সেস—দুয়েরই ইনি সদস্য। স্বামীজী সম্বন্ধে খুব পড়াশুনো করেছেন। এঁর স্বামীজী সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী স্মারক সংখ্যায় বেরিয়েছিল। উদ্বোধন পত্রিকাতেও এঁর একটা সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে লিখেছিলেন আমাদের একজন সন্ন্যাসী। তা থেকে বোঝা যায় স্বামী বিবেকানন্দকে ইনি কত সম্মান করেন। চেলিশেভের কণ্ঠস্বর শুনে আমার খুব ভাল লাগল। বললাম: 'কখন দেখা হবে'? বললেন: 'সন্ধ্যা বেলা।'

অ্যাণ্ড্রু এল সাড়ে দশটায়। বলল: 'চলুন মহারাজ, ব্রেকফাস্ট খেতে যাই।' দেখলাম যে, অ্যাণ্ড্রুও মীরার দেখাদেখি আমাকে 'মহারাজ' বলে ডাকতে শিখেছে। হোটেলে খাবার ব্যবস্থা 'বুফে' (Buffet) অর্থাৎ খাবার সাজানো আছে, আপনি ইচ্ছামতো তুলে নিন। এরকম 'বুফে' প্রত্যেক তলায় দুটো করে আছে। ছোট-ছোট টেবিল সাজানো আছে, প্রত্যেক টেবিলে চারজন করে বসতে পারে। বুফেতে যেমন খাবার সাজানো আছে, তেমনি ছুরি, কাঁটা, চামচ, কাপ ইত্যাদিও সাজানো আছে, আপনি নিজে গিয়ে যা যা দরকার নিয়ে আসুন। কেউ টেবিলে দিয়ে যাবে না। চা বা কফি যা খাবেন, তাও নিজে করে নিতে হবে। কেবল গরম জলটা তৈরি পাবেন।

অ্যাণ্ড্রু আমাকে জিজ্ঞাসা করল: 'আপনি কি আমিষ খাবেন?' আমি বললাম: 'মাছ খেতে পারি, অন্য কিছু না।' আমার জন্যে স্যামন্ (Salmon) নিয়ে এল। স্যামন্, এর আগেরবার ইউরোপে খেয়েছি, ভাবলাম এবারও খেতে পারব, কিন্তু এমন দুর্গন্ধ যে খেতে পারলাম না। তখনই ঠিক করে ফেললাম মাছ বা মাংস কোনটাই খাব না। রাশিয়ায় যতদিন ছিলাম ততদিন রুটি আর চিজ্ই ছিল আমার প্রধান খাদ্য। কখন কখন youghurt অর্থাৎ দই পেলে খেতাম। কিন্তু সব দিন পাইনি। শেষের দিকে রুটি আর চিজ্ খেতে খেতে গলা দিয়ে

নামতে চাইত না। একদিন অ্যান্ড্রু আমাকে জিজ্ঞাসা করল: আমি স্যুপ্ খাব কিনা? আমি বললাম: নিরামিষ হবে তো? সে বলল: 'মাংস দিয়ে রান্না, তবে মাংসগুলো উঠিয়ে নেওয়া হবে।' আমি বললাম: 'না'। কারণ, মাংস হয়তো শুয়োর অথবা গরুর। বাস্তবিক, ওখানে খাওয়া-দাওয়ার বড় কষ্ট হয় ভারতীয়দের। আমিষ খেলে শুয়োর-গরু কিছুই বাদ দেওয়া চলবে না, আর নিরামিষ খেলে খাওয়ার প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। মীরা আর অ্যান্ড্রু চেষ্টা করে আমার জন্য দুদিন নিরামিষ স্টু-র ব্যবস্থা করেছিল। স্টু মানে এক গামলা জল, আর তার মধ্যে আধ-সিদ্ধ আলু, টম্যাটো আর গাজর। আমি একটু খেয়ে আর খেতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত আমার খাবার গিয়ে দাঁড়াল—চীজ্ আর রুটি, রুটি আর চীজ। মাঝে মাঝে মীরা ঘরে ফল দিয়ে যেত। ফল মানে আপেল ও আঙুর। আঙুর টক, তবু খেতাম। একদিন অ্যান্ড্রুর মা আমার জন্য ডিমের অমলেট্ করে পাঠিয়েছিলেন, খেয়েছিলাম। বুফেতে অমলেট্ পাওয়া যায় না, তবে সিদ্ধ ডিম পাওয়া যায়। দু-একদিন খেয়েছিলাম। [ক্রমশঃ]

শ্রীবুদ্ধাবদান

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর

অবদাত দিব্যজীবনের প্রথম ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব

শাক্যসিংহ সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধই মানবীয় পূর্ণতার প্রথম ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। ভারতীয় বৈদিক এবং ঔপনিষদ গ্রন্থে ব্রহ্মদ্রষ্টা, তীর্ণাসব, লব্ধানন্দী, পরিপূর্ণ জীবনের দৃষ্টান্ত প্রচুর। এই সকল সত্যদ্রষ্টা স্বয়ং-সিদ্ধদের জীবন কাহিনী আমাদের বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে সন্দেহ নেই। কিন্তু এঁদের জীবন-জিজ্ঞাসা এবং সাধন-সিদ্ধি আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং শ্রুতি-শ্রুত। শ্রীবুদ্ধের ব্যক্তিজীবনের জিজ্ঞাসা, তাঁর মহত্তর জীবনের সাধনা—এবং পূর্ণতালাভের কাহিনী পরম্পরা, আমাদের কাছে সুপরিজ্ঞাত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্মসংঘ-পরম্পরা, তাঁর বাণী এবং তাঁকে অবলম্বন ও অনুসরণ করে ধর্মসাধনার ধারা আমাদের কাছে আজও প্রত্যক্ষ। ভারতেতর ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের উপকরণ শ্রীবুদ্ধকে পুরোধা করেই আজও ভারতে এবং ভারতেতর দেশে সজীব রয়েছে।

যুক্তিগ্রাহ্য বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যাত্ম সাধনার সার্বিক অধিকার

শ্রীবুদ্ধ সম্পর্কে স্বামীজী বলেছেন: 'তিনি পূর্ণ করতে এসেছেন,—ধ্বংস করতে নয়।' ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার নির্যাস শ্রীবুদ্ধে বিধৃত। শ্রীবুদ্ধপূর্ব ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার মত এবং পথকে বিচিত্রতার বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য শ্রীবুদ্ধের কর্মফলভিত্তিক, ব্যক্তিস্বতন্ত্র, ঈশ্বর-নিরপেক্ষ,—বাহ্যানুষ্ঠানবর্জিত, সর্বজনসাধ্য এবং প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদায়ী—ধর্মচক্র প্রবর্তনের তৎকালিক বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসার প্রথম ক্ষেত্র তাঁর ব্যক্তিগত জীবন। প্রতিটি মানুষের জীবনের প্রত্যক্ষ দুঃখানুভব থেকেই তাঁর জীবন জিজ্ঞাসা;—জীবন 'দর্শনের' অতি-বাস্তব অনুভূতি 'দুঃখ' থেকেই দুঃখোত্তীর্ণ হওয়ার প্রেরণা ও প্ররোচনা। দুঃখ আমাদের সকলেরই 'উত্তরাধিকার',—আমরা সকলেই জন্মলগ্ন থেকেই দুঃখের অনুভবে ভুক্তভোগী! সুতরাং সকলকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে এই দুঃখানুভবের

পারে যেতে হবে। শ্রীবুদ্ধ শূদ্র, নারী, হীন বা পতিত বলে কাউকে অধ্যাত্মসাধনার অনধিকারী মনে করেননি। 'মানুষ নিজ কর্মের ফলেই দুঃখী—নিজ কর্ম দ্বারাই তাকে দুঃখের পারে যেতে হবে।' ভারতের পূর্বাগত এই কর্মফল-বাদ প্রতিষ্ঠাই শ্রীবুদ্ধের নব অবদান। কর্মফল-বাদই ধর্মসাধনার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। প্রাগ্‌বুদ্ধ উপনিষদের সাধনায় এই কর্মফলবাদের কথাই বলা আছে। কিন্তু শ্রীবুদ্ধের সমসাময়িক কালের ধর্মের আচার-সর্বস্বতা এবং কর্মফলবিস্মৃতিকে ভারতীয় ধর্মবিপর্যয়ই বলা চলে। এই বিপর্যয় থেকে শ্রীবুদ্ধ ভারতীয় ধর্মচেতনাকে প্রবুদ্ধ করে,—আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে সমান ধর্মাধিকার দিয়ে 'এহি পস্সিক'—ধর্মাচরণের জন্য স্বাগত জানালেন। যাগযজ্ঞের আচারমূলক ধর্মাচারীর কাছে কর্মফলবাদে বিশ্বাসী সর্বজনীন ধর্মের আহ্বান প্রথমতঃ কিছুটা সংশয়কর মনে করেই শ্রীবুদ্ধ বলেছেন: 'এহি, পস্স'।—'এস, এসে নিজে পরীক্ষা করে দেখ,—মধ্যপন্থার অষ্টাঙ্গ সাধন পদ্ধতি তোমার আত্যন্তিক শান্তির কারণ হয় কিনা!' ধর্মের উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের পরিশুদ্ধি,—শ্রীবুদ্ধ এর প্রেরণা।

শ্রীবুদ্ধপন্থা প্রাচীন ভারতীয় পন্থারই নবরূপ

কর্মফলবাদে বিশ্বাসী হয়ে,—আত্মদীপ, আত্মশরণ, ও অনন্য-শরণ হয়ে নির্বাণ সিদ্ধি ভারতীয় সনাতন অধ্যাত্মসাধনারই রূপান্তর মাত্র। শ্রীবুদ্ধ নিজেই বলেছেন: 'আমিও এই প্রকার এক পুরাতন পন্থা, পুরাতন মার্গ আবিষ্কার করেছি। প্রাচীনকালের সম্যক্‌সম্বুদ্ধগণ এই পথেই বিচরণ করেছেন।'

'আমি চক্ষুলাভ করেছি, জ্ঞানলাভ করেছি, প্রজ্ঞালাভ করেছি, বিদ্যালাভ ও আলোকলাভ করেছি।' (সং-নিকায় ১২।৬৫, ১৯-২০) কোন স্বর্গ বা ভোগ সুখের প্রলোভন না দেখিয়ে শ্রীবুদ্ধ যথার্থ অধ্যাত্মসাধনার ফলশ্রুতি কি তা স্পষ্ট-ভাষায় বলেছেন: 'হে ভিক্ষুগণ! তথাগত এই মধ্যমপন্থা আবিষ্কার করেছেন; এই পথে দৃষ্টি-লাভ হয়, জ্ঞানলাভ হয়, প্রাণ প্রশান্ত হয়, অভিজ্ঞা সম্বোধ ও নির্বাণ লাভ করা যায়।' (সং-নিকায় ৫৬।১১।১—৪, বিনয় মহাবগ্গ ১।৬।১৭—১৮)।

বৌদ্ধদর্শনের আরম্ভ 'দুঃখ' থেকে হলেও শ্রীবুদ্ধ কখনও দুঃখবাদী ছিলেন না। সাধারণ মানুষ জীবন থেকে দুঃখকে 'বাদ' দিতে পারে না। অথচ দুঃখের পরপারে (সুখদুঃখ উভয়েরই) যাওয়াই আধ্যাত্মিকতার অভিযান। সাধারণ সাধকের অনিবার্য দুঃখানুভব থেকেই যাত্রা আরম্ভ—এবং নির্বাণ সিদ্ধিতে তার পরিসমাপ্তি।

দুঃখ-জয়ের—এই জীবনাশ্রয়ী, যুক্তিনির্ভর-আত্মপ্রত্যয়ী ধর্মচেতনাই সর্বকালের সর্বমানবের স্বচ্ছ জীবনদর্শন। শ্রীবুদ্ধে তার এক অভূতপূর্ব অভিব্যক্তি। এজন্যই স্বামীজী বলেছেন: 'শ্রীবুদ্ধ ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার শ্রেষ্ঠ পরিণতি।'—শ্রীবুদ্ধের আহ্বানে সকল মানুষই অবিরুদ্ধ ধর্মপথের যাত্রী হতে পারে।

কাল থেকে কালান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে শ্রীবুদ্ধের আহ্বান।

ব্যক্তিগত নির্বাণ সিদ্ধির পর লোকানুকম্পায় শ্রীবুদ্ধের সারনাথে ধর্মচক্র প্রবর্তন। শ্রীবুদ্ধের ধর্মপ্রচারের সংঘবদ্ধ প্রয়াস পৃথিবীর আধ্যাত্মিক-তার ইতিহাসে এক অভিনব বস্তু। 'গুহ্য' বা 'রহস্য' অধ্যাত্মসাধনাকে সর্বজনীন করার প্রেরণা শ্রীবুদ্ধের করুণাসঞ্জাত। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীবুদ্ধের সংঘসৃষ্টির মূলে এই করুণা-প্রেরণার কারণটিকে যথার্থভাবেই ধরতে পেরেছেন। কারণ তাঁর গুরু 'করুণাপাথার' শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণাই বিবেকানন্দকে সংঘসৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল; আর

তাঁর সম্মুখে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত ছিলেন শ্রীবুদ্ধ ও তাঁর সংঘ।—এই সম্পর্কে স্বামীজী বলেছেন :

'শাক্যমুনি স্বয়ং সন্ন্যাসী ছিলেন, এবং তাঁহার হৃদয় এত উদার ছিল যে লুকানো বেদের মধ্য হইতে সত্যকে বাহির করিয়া তিনি সেগুলি সমগ্র পৃথিবীর লোকের মধ্যে ছড়াইয়া দিলেন—ইহাই তাঁহার গৌরব। পৃথিবীতে ধর্মপ্রচারের তিনিই প্রথম প্রবর্তক; শুধু তাহাই নয়, ধর্মান্তরিত-করণের ভাব তাঁহারই মনে প্রথম উদিত হইয়াছে।' (বাণী ও রচনা ১।৩১)

শুদ্ধ পরিশীলিত জীবন-চর্যার মহিমায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, বহুজনের হিত এবং বহুজনের সুখের নিমিত্ত ভিক্ষুগণকে তিনি দেশে দেশে সর্বথা কল্যাণকর ধর্মদেশনার নির্দেশ দেন :

'চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজনহিতায়, বহুজন-সুখায়, লোকানুকম্পায়, অত্থায়, হিতায়, সুখায় দেব মনুস্সানং। দেসেথ ভিক্খবে! ধম্মং আদি-কল্যাণং মজ্ঝেকল্যাণং সাত্থং সব্যঞ্জনং কেবল-পরিপুন্নং পরিশুদ্ধং ব্রহ্মচরিযং পকাসেথ।' (মহাবগ্গ)

শ্রীবুদ্ধ প্রণোদিত পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যাসম্পন্ন ভিক্ষুগণের সম্মেলিত ও ব্যক্তিগত জীবনের আলোকেই শ্রীবুদ্ধের বাণী দেশে দেশে এখনও উদ্ভাসিত। বৌদ্ধধর্মের নীতি এবং শীলই আধুনিক যুক্তিবাদী মানুষের কাছে পারস্পরিক সহাবস্থান এবং উন্নততর জীবনযাত্রার সহজগ্রাহ্য অনুপ্রেরণা। বৌদ্ধ না হয়েও—বুদ্ধনীতির অনুসরণে চিন্তাশীল মানুষমাত্রেরই সশ্রদ্ধ প্রয়াস।

'বহুজনহিত, বহুজনসুখ'—বর্তমান রাষ্ট্রগত প্রতিশ্রুতি

মৌলিক বা রূপান্তরিত বৌদ্ধধর্মের পরিস্থিতি যাই হোক না কেন,—কোন দেশ শ্রীবুদ্ধের নির্বাণ-সিদ্ধির অনুগামী হোক্ বা না হোক্—'বহুজনের হিত, এবং বহুজনের সুখের'—ব্যবস্থাপনাই আধুনিক প্রগতিশীল রাষ্ট্রমাত্রেরই আদর্শ। যে সব বৃহৎ রাষ্ট্রকে আমরা ধর্মহীন বলে আশংকা করি—তাদের মধ্যেই মানুষের দুঃখদারিদ্র্য-লাঘবের কথা,—জনগণের হিত ও সুখের কথা বিশেষভাবে উচ্চারিত—এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় কার্যে পরিণত। রাষ্ট্রনায়ক এবং রাজনীতির চিন্তাবিদ্‌দের 'হিত' এবং 'সুখ' সম্পর্কে ধারণা শ্রীবুদ্ধের প্রবচনের সঙ্গে মিলে কিনা তা বিবেচ্য। কল্যাণ-রাষ্ট্রের (ওয়েলফেয়ার স্টেট্) উদ্দেশ্য প্রত্যেকের আহার বাসস্থানাদি দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা। পার্থিব প্রয়োজনের চাহিদাকে পূরণ করাই আধুনিক রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। অপার্থিব বা আধ্যাত্মিক শান্তির ব্যবস্থা রাষ্ট্রব্যবস্থায় দুর্লভ। শ্রীবুদ্ধের 'হিত' প্রবচনে নির্বাণ শান্তির লক্ষ্যই উদ্দিষ্ট। এইজন্য এই দায়িত্ব ছিল শীলসম্পন্ন ধৃত চরিত্র ভিক্ষুদের উপর।

সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রগত হিত ও সুখ ব্যবস্থার কিছুটা ত্রুটি লক্ষিত হচ্ছে। এই ত্রুটির সংশোধন করতে হলে শ্রীবুদ্ধের লোক-হিতের সূত্রটিকে বের করতে হবে,—এবং তাঁর হৃদয়বত্তা ও মহাকরুণার ধারায় নিস্নাত হতে হবে। তাহলেই রাষ্ট্রব্যবস্থার 'হিত এবং সুখ' যথার্থ কার্যকর হবে।

বর্তমান বিশ্বে সুখের উপাদান প্রচুর, —কিন্তু 'হিতের' অভাব

বহুজনের বা সর্বজনের হিত এবং সুখকে প্রতিশ্রুতিতে রেখেই বর্তমান রাজনীতির জয়-যাত্রা। কম্যুনিজম্ এবং সোশ্যালিজম্ জাতীয় রাজনৈতিক মতবাদ আজকাল বিশ্বে খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু সাম্যবাদী রাষ্ট্রেও মানুষে মানুষে ভোগবৈষম্য বর্তমান। বৈষম্য থেকেই অসন্তোষ এবং দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বই অশান্তি। আবার দুই সাম্যবাদী রাষ্ট্রের মধ্যেও দ্বন্দ্ব এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা! রাষ্ট্রের

ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই সকলের সুখের ব্যবস্থা করা দুঃসাধ্য,—পররাষ্ট্রের মানুষের প্রতি সুখ বিধানের কথা তো চিন্তাই করা যায় না।

যখন আমরা সবাই বহুজনের হিত এবং সুখের জন্য বদ্ধপরিকর,—তখন কেন আমাদের অসুখ এবং অশান্তি থাকবে? বুদ্ধিতে আমরা বুঝি যে, পৃথিবীর সার্বিক উৎপন্ন ভোগ্যপণ্য সমানভাবে বণ্টিত হলে কোন মানুষেরই আপাত সুখের অভাব হওয়ার কথা নয়। কিন্তু কার্যতঃ আমাদের ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রগত স্বার্থ-বুদ্ধি, আমাদের পশু-সুলভ লালসা অপরকে বঞ্চিত করাতেই নিজেকে সুখী মনে করে। সমস্যাটা ঠিক অভাবের নয়, সমস্যাটা লালসার,—তৃষ্ণার। শ্রীবুদ্ধের ভাষায় 'তন্হার'।

এই তৃষ্ণা জয়ের যাত্রাই বুদ্ধ-উপদিষ্ট হিতবাদ

তৃষ্ণা-ই মানুষের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত অশান্তির ও দুঃখের কারণ। তৃষ্ণাবাদী মানুষই দুঃখবাদী হতে বাধ্য। তৃষ্ণার জয়েই শান্তি। তৃষ্ণার বর্ধনে অশান্তির বৃদ্ধি। বর্তমান রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ভোগ্য উপাদানের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য আমাদের অন্নবস্ত্র-আবাসাদির প্রাথমিক চাহিদার সাময়িক নিবৃত্তি যদিও করেছে,—তেমনি বৃদ্ধি করেছে আমাদের তৃষ্ণাগ্নিকে। বর্তমান মানব-কল্যাণের কর্মসূচীতে নূতন উৎপাদনের ব্যবস্থা অপেক্ষা উৎপন্ন দ্রব্যের সমবণ্টনের মাধ্যমে মানুষের ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণের মানবিক পদ্ধতির আবিষ্কার এবং তা কার্যকর করার ব্যবস্থা-ই অধিকতর প্রয়োজন।

শ্রীবুদ্ধের মহাকরুণা ও মৈত্রীর মধ্যেই যথার্থ 'হিত'

আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক হিতবাদই যথার্থ সুখ এবং শান্তির হেতু। বস্তুতন্ত্রের ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনে বিশ্ব চরমশীর্ষে আরোহণ করেছে। সুস্থ দেহে দীর্ঘ-জীবন বাঁচার মতো উপাদান বর্তমান বিশ্বে প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই যথেষ্ট,—যদি রাজনীতির সাম্যবাদ এই সাধারণ সমবণ্টন কার্যটি সম্পন্ন করে দিতে পারে। কিন্তু স্বভাবতঃ স্বার্থপর মানুষের মধ্যে সমবণ্টনের স্পৃহা আসবে কেন?—হয় মানুষকে করুণায় বিগলিত হয়ে,—মৈত্রীর স্নেহবন্ধনে প্রণোদিত হয়ে নিজের ভোগ্যকে অপরের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে,—নতুবা ক্ষুধিত এবং বঞ্চিত বলপূর্বক তার ভোগ্যকে কেড়ে নেবেই। অসাম্যের রাজ্যে—যার প্রচুর আছে তারও ভয়,—যার নেই তারও ভয়। উভয় ভয়ের ফলশ্রুতি—আতঙ্ক এবং অশান্তি। বর্তমান রাজনীতি মানুষকে এই আতঙ্ক এবং অশান্তির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এর থেকে মুক্তির পন্থা মানুষ বের করে নিতে না পারলে 'মহতী বিনষ্টি' অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীবুদ্ধ জানতেন নির্বাণ-শান্তিই মানুষের চরম লক্ষ্য। স্বয়ং রাজপুত্র হয়েও তিনি যৌবনেই ভোগের অসারতাকে বুঝে নিয়ে তৃষ্ণা নির্বাণের পথের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন। নিজে সেই নির্বাণ-শান্তির অধিকারী হয়েও তিনি বিশ্বহিতের জন্য সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। ত্যাগ এবং মৈত্রীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে,—গৃহী এবং ভিক্ষু উভয় শ্রেণীকেই নির্বাণ-শান্তির পথে পরিচালিত করার জন্য শ্রীবুদ্ধ শীলব্রতের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়

স্বামী চেতনানন্দ

[মাঘ, ১৩৯২ সংখ্যার পর]

ব্রহ্মজ্ঞানীকে ব্রহ্মজ্ঞানী চেনে। দক্ষিণেশ্বরে একবার এল এক জ্ঞানোন্মাদ। দেখতে পিশাচের মতো—উলঙ্গ, গায়ে মাথায় ধুলো, বড় বড় নখ, চুল, গায়ে মড়ার কাঁথার মতো একখানা কাঁথা। কালীঘরের সামনে দাঁড়িয়ে এমন স্তব পড়ল যে, মন্দিরটা যেন কাঁপতে লাগল। কাঙালীদের সঙ্গে বসে খেতে গেলে তারা সবাই ঐ সাধুকে তাড়িয়ে দিল। সে তখন কুকুরদের সঙ্গে উচ্ছিষ্ট অন্নগুলো পাতা থেকে খেতে লাগল। দেখে এসে ঠাকুর হৃদয়কে বললেন: "হৃদু, এ যে-সে উন্মাদ নয়—জ্ঞানোন্মাদ।" কৌতূহলী হৃদয় তখনই সাধু দেখতে ছুটলেন। সাধুটি তখন বাগান থেকে চলে যাচ্ছে। হৃদয় পিছু নিলেন এবং বললেন: "মহারাজ! ভগবানকে কেমন করে পাব, কিছু উপদেশ দিন।" প্রথমে সে কিছুই বললে না; শেষে নর্দমার জল দেখিয়ে বলল: "এই নর্দমার জল আর ঐ গঙ্গার জল যখন এক বোধ হবে, সমান পবিত্র জ্ঞান হবে, তখন পাবি।" নাছোড়বান্দা হৃদয় তখন বললেন: "মহারাজ, আমাকে চেলা করে সঙ্গে নিন।" তাতে সে কোন জবাব দিল না। শেষে ইট তুলে হৃদয়কে তাড়া করল। হৃদয় পালালে সে পথ ছেড়ে সরে পড়ল। আর তাকে দেখা গেল না।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয় ও ভৈরবীর সঙ্গে কামারপুকুরে যান। ভৈরবী ক্রমে অহংকারী হয়ে ওঠেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে নিজের অধীনে রাখতে চেষ্টা করেন। ঠাকুর ভৈরবীর দুটি উপদেশ পালন করেননি—প্রথম, তিনি ঠাকুরকে তোতাপুরীর কাছে বেদান্ত শিখতে নিষেধ করেছিলেন, এবং দ্বিতীয়, তিনি ঠাকুরকে সারদাদেবীর সঙ্গে মিশতে নিষেধ করেছিলেন। ভৈরবী ঠাকুরের বাড়ির মেয়েদের প্রতি কখন কখন অসন্তুষ্ট হয়ে তিরস্কার করতেন। শেষে তিনি অব্রাহ্মণদের পাতা পরিষ্কার করে সমাজ-প্রথার নিয়মভঙ্গ করে গণ্ডগোল সৃষ্টি করেন। ফলে হৃদয় ও ব্রাহ্মণীর মধ্যে তুমুল ঝগড়া শুরু হয়। পরে ব্রাহ্মণী নিজের ভুল বুঝে ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চেয়ে কাশীবাসিনী হয়েছিলেন।

কামারপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুর শিহড়ে যান। হৃদয় অনেক বৈষ্ণবভক্তদের আমন্ত্রণ করে ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন, এবং তাঁদের মধ্যে অনেক ধর্মালাপ হয়। হৃদয়ের মা হেমাঙ্গিনীদেবী শ্রীরামকৃষ্ণকে ইষ্টদেবতারূপে ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করতেন। একদিন তিনি ঠাকুরের কাছে একটা বর চান যাতে তাঁর কাশীতে মৃত্যু হয়। ঠাকুর তাঁকে আশীর্বাদ করেন এবং পরে সত্যই কাশীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয় ও মথুরের পরিবারবর্গের সঙ্গে দেওঘর, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থদর্শনে যান। কাশীতে ঠাকুর হৃদয়কে নিয়ে ত্রৈলঙ্গ-স্বামীকে দেখতে যান এবং বলেন: "দেখিলাম সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ তাঁহার শরীরটা আশ্রয় করে প্রকাশিত রয়েছেন···! একেই ঠিক ঠিক পরমহংস অবস্থা বলে।" স্বামীজী তখন মণিকর্ণিকার পাশে একটা ঘাট বাঁধাবার সংকল্প করেছিলেন। ঠাকুরের অনুরোধে হৃদয় কয়েক কোদাল মাটি কেটে তাতে সাহায্য করেন। আর একদিন মণিকর্ণিকার কাছে নৌকা ভ্রমণকালে শ্রীরামকৃষ্ণের শিবদর্শন হয়। তিনি নৌকার ধারে দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ হন। মাঝিরা হৃদয়কে চেঁচিয়ে বললে: "ধর, ধর।" হৃদয় ও মথুর তখন দুপাশে দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে

রক্ষা করেন। বৃন্দাবনে হৃদয় ঠাকুরের সঙ্গে গোবর্ধন, শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড দর্শন করেন। নিধুবনের কাছে গঙ্গামায়ীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় হয়। সাধিকা গঙ্গামায়ী ঠাকুরকে চিনে বলেছিলেন: "ইনি সাক্ষাৎ রাধা, দেহ ধারণ করে এসেছেন।" তিনি চেয়েছিলেন ঠাকুরকে বৃন্দাবনে রাখতে। ঠাকুর একটু রাজীও হয়েছিলেন। কিন্তু শেষে হৃদয় ঠাকুরের হাত ধরে টানতে শুরু করেন; আবার গঙ্গামায়ীও ঠাকুরের আর এক হাত ধরে টানেন। এরূপ হুলস্থুল কাণ্ডের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের মায়ের কথা মনে পড়ল। তিনি তখন বৃন্দাবন ছেড়ে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুর হৃদয় ও মথুরের সঙ্গে নবদ্বীপ ও কালনা দর্শন করেন।

তীর্থ থেকে ফেরার অল্পকাল পরে হৃদয়ের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ফলে তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি পূর্বাপেক্ষা নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় মনোনিবেশ করেন। কাপড় ও পৈতা খুলে রেখে মধ্যে মধ্যে মামার মতো ধ্যান শুরু করলেন। এবং ঠাকুরকে ধরে বসলেন, তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি করিয়ে দেবার জন্য। ঠাকুর বললেন, তার ওসবের প্রয়োজন নেই, তাঁর সেবা করলেই তার সকল ফল লাভ হবে। অবশেষে হৃদয়ের কাকুতিমিনতি দেখে ঠাকুর বললেন: "মার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক, আমার ইচ্ছায় কি কিছু হয় রে!—মা-ই আমার বুদ্ধি পাল্টাইয়া দিয়া আমাকে এইরূপ অবস্থায় আনিয়া অদ্ভুত উপলব্ধিসকল করাইয়া দিয়াছেন। মার ইচ্ছা হয় যদি তোরও হইবে।"

এর কয়েকদিন পরে পূজা ও ধ্যানকালে হৃদয়ের জ্যোতির্ময় দেবমূর্তিদর্শন ও অর্ধবাহ্যভাব হতে আরম্ভ হল। মথুর হৃদয়ের ভাব দেখে ঠাকুরকে বললেন: "হৃদুর আবার একি অবস্থা হইল, বাবা?" ঠাকুর উত্তরে বললেন:" হৃদয় ঢং করিয়া ঐরূপ করিতেছে না—একটু-আধটু দর্শনের জন্য সে মাকে ব্যাকুল হইয়া ধরিয়াছিল, তাই ঐরূপ হইতেছে। ঐরূপ, দেখাইয়া বুঝাইয়া মা আবার তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিবেন।" মথুর বললেন: "বাবা, এসব তোমারই খেলা, তুমিই হৃদয়কে ঐরূপ অবস্থা করিয়া দিয়াছ, তুমিই এখন তাহার মন ঠাণ্ডা করিয়া দাও—আমরা উভয়ে নন্দীভৃঙ্গীর মতো তোমার কাছে থাকিব, সেবা করিব, আমাদের ঐরূপ অবস্থা কেন?"

একদিন রাতে ঠাকুর পঞ্চবটীর দিকে যাচ্ছেন দেখে হৃদয় ভাবলেন যে, ঠাকুর শৌচে যাচ্ছেন, তাই তিনি গামছা-গাড়ু নিয়ে পশ্চাতে চললেন। যেতে যেতে তাঁর এক অপূর্ব দর্শন হল। তিনি দেখলেন—ঠাকুর স্থূল রক্ত-মাংসের দেহধারী মানুষ নন, তাঁর দেহনিঃসৃত অপূর্ব জ্যোতিতে পঞ্চবটী আলোকিত হয়ে উঠেছে, এবং চলবার কালে তাঁর জ্যোতির্ময় পদযুগল মাটি ছেড়ে আকাশপথে চলেছে। তিনি বারবার চোখ রগড়াতে লাগলেন। তারপর তিনি নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তিনিও দিব্যদেহধারী জ্যোতির্ময় দেবানুচর সাক্ষাৎ দেবতার সঙ্গে থেকে চিরকাল তাঁর সেবা করছেন। তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উন্মত্তের মতো চীৎকার করে বলতে লাগলেন: "ও রামকৃষ্ণ, আমরা তো মানুষ নহি, আমরা এখানে কেন? চল দেশে দেশে যাই, জীবোদ্ধার করি! তুমি যাহা আমিও তাহাই!"

ঠাকুর: "ওরে থাম্ থাম্! অমন বলিতেছিস কেন কি একটা হইয়াছে ভাবিয়া এখুনি লোকজন সব ছুটিয়া আসিবে।" কিন্তু কে সে কথা শোনে! তখন ঠাকুর তাড়াতাড়ি তাঁর বুক স্পর্শ করে বললেন: "দে মা, শালাকে জড় করে দে।" অমনি হৃদয়ের সেই আনন্দের উচ্ছ্বাস লুপ্ত হল। দুঃখিত হৃদয়ে তিনি বললেন:

"মামা, তুমি কেন অমন করিলে? কেন জড় হইতে বলিলে, ঐরূপ দর্শনানন্দ আমার আর হইবে না?" ঠাকুর সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: "আমি কি তোকে একেবারে জড় হইতে বলিয়াছি? তুই এখন স্থির হইয়া থাক্—এই কথা বলিয়াছি। সামান্য দর্শনলাভ করিয়া তুই যে গোল করিলি, তাহাতেই তো আমাকে ঐরূপ বলিতে হইল। আমি যে চব্বিশ ঘণ্টা কত কি দেখি, আমি কি ঐরূপ গোল করি? তোর এখনও ঐরূপ দর্শন করিবার সময় হয় নাই···।"

ঠাকুরের কথায় হৃদয়ের মন সাময়িক ঠাণ্ডা হলেও, ঐ দর্শনের বাসনা আবার জাগ্রত হল। তিনি ধ্যানজপের মাত্রা বাড়ালেন, এবং গভীর নিশীথে পঞ্চবটীতে যে-স্থানে ঠাকুর বসতেন, সে-স্থানে বসে ধ্যান করবার সংকল্প করলেন। এক রাতে তিনি সংকল্পানুযায়ী ধ্যানে বসলেন। ঠাকুরও সে রাতে পঞ্চবটীর দিকে আপনমনে বেড়াতে গেলেন। হঠাৎ হৃদয়ের চীৎকার শুনলেন: "মামা গো, পুড়িয়া মরিলাম, পুড়িয়া মরিলাম!" "কিরে কি হইয়াছে?" বলে ঠাকুর উপস্থিত হলেন। "মামা, এইখানে ধ্যান করিতে বসিবামাত্র কে যেন এক মালসা আগুন গায়ে ঢালিয়া দিল, অসহ্য দাহ-যন্ত্রণা হইতেছে।" ঠাকুর তাঁর অঙ্গে হাত বুলিয়ে বললেন: "যা, ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, তুই কেন এরূপ করিস্ বল দেখি? তোকে বলিয়াছি আমার সেবা করিলেই তোর সব হইবে।" ঠাকুরের স্পর্শে হৃদয়ের জ্বলুনি শান্ত হল এবং সেই থেকে তিনি কখনও পঞ্চবটীতে ধ্যান করতে যেতেন না।

রাজসিক স্বভাবের হৃদয় সব সময় একটা উত্তেজনা ও উন্মাদনা নিয়ে থাকতে ভালবাসতেন। একঘেয়ে জীবন তাঁর মোটেই রুচিকর ছিল না। তিনি নবোল্লাস লাভ করবার জন্য শিহড়ে দুর্গাপূজা করবার মতলব করেন। মথুর অর্থসাহায্য করলেন এবং ঠাকুরও মত দিলেন। হৃদয় ঠাকুরকে সঙ্গে নিতে চাইলে মথুর বাধা দিলেন, কারণ তিনি পূজার সময় ঠাকুরকে জানবাজারের বাড়িতে চাইলেন। ক্ষুণ্ণমনে হৃদয়ের দেশে যাবার কালে ঠাকুর বললেন: "তুই দুঃখ করিতেছিস কেন? আমি নিত্য সূক্ষ্ম শরীরে তোর পূজা দেখিতে যাইব, আমাকে অপর কেহ দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তুই পাইবি। তুই অপর একজন ব্রাহ্মণকে তন্ত্রধারক রাখিয়া নিজে আপনভাবে পূজা করিস্, এবং একেবারে উপবাস না করিয়া মধ্যাহ্নে দুগ্ধ, গঙ্গাজল ও মিছরির শরবত পান করিস্। ঐরূপে পূজা করিলে ৺জগদম্বা তোর পূজা নিশ্চয় গ্রহণ করিবেন।"

খুশি মনে হৃদয় বাড়িতে ফিরে ঠাকুরের কথা মতো যথারীতি পূজা শুরু করেন। সপ্তমী পূজার পর সন্ধ্যারতির সময় তিনি দেখেন ঠাকুরের জ্যোতির্ময় শরীর ভাবাবিষ্ট হয়ে প্রতিমার পাশে বিদ্যমান। ঐরূপ সন্ধিপূজাকালে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যারতির সময় তিনি ঠাকুরকে দেখেছেন। পূজার পর দক্ষিণেশ্বর ফিরে তিনি ঠাকুরকে ঐ দর্শনের কথা বলায়, ঠাকুর বলেন: "আরতি ও সন্ধিপূজার সময় তোর পূজা দেখিবার জন্য বাস্তবিকই আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া আমার ভাব হইয়া গিয়াছিল এবং অনুভব করেছিলাম যেন জ্যোতির্ময় শরীরে জ্যোতির্ময় পথ দিয়া তোর চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছি।" এইকালে ঠাকুর একদিন ভাবাবিষ্ট হয়ে হৃদয়কে বলেন: "তুই তিন বৎসর পূজা করিবি।" হৃদয় চতুর্থবার পূজা করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফলকাম হননি। প্রথমবার দুর্গাপূজার পর হৃদয় আবার দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন।

দিব্যদর্শন ও ঠাকুরের কৃপালাভ করা সত্ত্বেও হৃদয় ছিলেন ঘোরতর বিষয়াসক্ত গৃহী।

দক্ষিণেশ্বরে পূজারীর কাজ করার মধ্যেও তাঁর মন পড়ে থাকত স্ত্রী ও সংসারের উপর। মায়া কি করে মানুষকে অজ্ঞানে ঢেকে রাখে, সে-প্রসঙ্গে ঠাকুর একদিন বলেন: "হৃদে একটা এঁড়ে বাছুর এনেছিল। একদিন দেখি সেটিকে বাগানে বেঁধে দিয়েছে, ঘাস খাওয়াবার জন্য। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হৃদে, ওটাকে রোজ ওখানে বেঁধে রাখিস্ কেন?' হৃদে বললে, 'মামা, এঁড়েটিকে দেশে পাঠিয়ে দিব। বড় হলে লাঙ্গল টানিবে।' যাই এই কথা বলেছে আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম। মনে হয়েছিল—কি মায়ার খেলা! কোথায় কামারপুকুর শিহড়, কোথায় কলকাতা! এই বাছুরটি যাবে, ওই পথ! সেখানে বড় হবে। তারপর কতদিন পরে লাঙ্গল টানবে। এরই নাম সংসার—এরই নাম মায়া!"

কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। মায়াধীশ শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেও হৃদয় ঐ মায়ার মোহ কাটাতে পারেননি। এ-সবই অবতারের খেলা। তিনি একদিকে যেমন নিত্যমুক্তদের সঙ্গে দেবলীলা করেন, আবার অন্যদিকে সংসারাসক্তদের সঙ্গে মানুষলীলাও করেন। মামার "টাকা মাটি ও মাটি টাকা" মন্ত্র হৃদয়ের ভাল লাগেনি। তাঁর ছিল প্রচণ্ড অর্থাসক্তি। ঠাকুরের ধনী ভক্তদের হৃদয় বিশেষ খাতির করতেন এবং তাঁদের কাছ থেকে টাকা যোগাড় করতেন। হৃদয় জানতেন, বৈরাগ্যবান শ্রীরামকৃষ্ণের নামে যদি কেউ সম্পত্তি ও টাকা দেয় তবে তা সেই পাবে। মথুর হৃদয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠাকুরের নামে সম্পত্তি লিখে দিতে চাইলেন, তিনি ঘোরতর আপত্তি করেন। শুধু তাই নয় বকুনি দেন এবং তাঁর মুখ দর্শন করবেন না বলেন। তারপর লক্ষ্মী-নারায়ণ মারোয়াড়ী ঠাকুরকে দশহাজার টাকা দিতে চাইলেন, ঠাকুর অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। পরে বিরক্ত হয়ে বলেন: "তুমি অমন কথা যদি আর মুখে বলো, তাহলে এখানে আর এসো না; ...লক্ষ্মীনারায়ণ তখন হৃদের কাছে দিতে চাইলে, আমি বললাম, তাহলে আমায় বলতে হবে—'একে দে, ওকে দে'; না দিলে রাগ হবে! টাকা কাছে থাকাই খারাপ! সে সব হবে না!"

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন কথা প্রসঙ্গে ভক্তদের বলেন: "হৃদে শম্ভু মল্লিককে বলেছিল, আমায় কিছু টাকা দাও। শম্ভু মল্লিকের ইংরাজী মত, সে বললে, তোমায় কেন টাকা দিতে যাব? তুমি খেটে খেতে পার, তুমি যাহোক কিছু রোজগার করছো। তবে খুব গরীব হয় সে এক কথা, কি কানা, খোঁড়া, পঙ্গু—এদের দিলে কাজ হয়। তখন হৃদে বললে, মহাশয়! আপনি উটি বলবেন না। আমার টাকায় কাজ নাই। ঈশ্বর করুন যেন আমায় কানা, খোঁড়া অতি দারিদ্র্যীর, এসব না হতে হয়। আপনারও দিয়ে কাজ নাই, আমারও নিয়ে কাজ নাই।"

প্রলোভন সাধকজীবনে বিঘ্ন, আবার এটাই বৈরাগ্যকে যাচাই করবার কষ্টিপাথর। পৃথিবীর সকল অবতার ও মহাপুরুষদের এই প্রলোভনের সম্মুখীন হতে হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণকে ধনী মথুর পরীক্ষা করেছেন সুন্দরী বারবনিতা দিয়ে, অর্থ দিয়ে, সম্মান দিয়ে,কিন্তু তাঁর মনকে শ্রীশ্রীজগদম্বার পাদপদ্ম থেকে টলাতে পারেননি। এ-সব পরীক্ষার সাক্ষী ছিলেন হৃদয় স্বয়ং। ঠাকুর একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেন: "যারা হীনবুদ্ধি তারা সিদ্ধাই চায়। ব্যারাম ভাল করা, মোকদ্দমা জিতানো, জলে হেঁটে চলে যাওয়া—এইসব! যারা শুদ্ধ ভক্ত তারা ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুই চায় না। হৃদে একদিন বললে, 'মামা, মার কাছে কিছু শক্তি চাও, কিছু সিদ্ধাই চাও।' আমার বালকের স্বভাব—কালীঘরে জপ করবার সময় মাকে বললাম, মা হৃদে বলছে কিছু শক্তি চাইতে, কিছু সিদ্ধাই চাইতে।" ঠাকুর দেখলেন

বিষ্ঠা। বুঝলেন—মা দেখিয়ে দিলেন সিন্নাই আর বিষ্ঠা এক। ঠাকুর তখন হৃদয়কে গিয়ে বকলেন: "তুই কেন আমায় এরূপ কথা শিখিয়ে দিলি। তোর জন্যই তো আমার এরূপ হলো!"

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়ের সঙ্গে বেলঘরিয়ার বাগানে কেশব সেনের সঙ্গে দেখা করতে যান। একা একা কোথাও যাওয়া ঠাকুরের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ তিনি যে কখন ও কোথায় সমাধিস্থ হয়ে পড়বেন তার ঠিক ছিল না। হৃদয় ছিলেন ঠাকুরের সঙ্গী, বন্ধু, রক্ষী। যাহোক, গাড়ি থেকে নেমে হৃদয় একা কেশবের কাছে গিয়ে বললেন: "আমার মামা হরিকথা ও হরিগুণগান শুনতে বড় ভালবাসেন এবং উহা শুনতে শুনতে মহাভাবে তাঁর সমাধি হয়ে থাকে। আপনার নাম শুনে আপনার মুখে ঈশ্বরের গুণানুকীর্তন শুনতে তিনি এখানে এসেছেন, আদেশ পেলে তাঁকে এখানে নিয়ে আসব।" কেশব অবশ্য সম্মত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে আনতে বলেন। প্রথম দর্শনে কেশব ও ব্রাহ্মরা ঠাকুরকে সাধারণ মানুষ বলে সাব্যস্ত করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে বলেন: "বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন করে থাক। ঐ দর্শন কিরূপ, তা জানতে বাসনা, সেজন্য তোমাদের কাছে এসেছি।" ক্রমে নানাবিধ সৎপ্রসঙ্গ শুরু হল। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর "কে জানে কালী কেমন—ষড় দর্শনে না পায় দেখন" গানটি গাহিতে গাহিতে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। ব্রাহ্মরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। কারণ তাঁরা কোনদিন সমাধি দেখেননি। উপরন্ত তাঁরা ভাবলেন—এটা মিথ্যা ভান বা মস্তিষ্কের বিকারপ্রসূত। সে যাহোক হৃদয় ঠাকুরের কর্ণে প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ করার পর তিনি আবার বাহ্যদশায় এসে কেশবের সঙ্গে চমৎকার ধর্মপ্রসঙ্গ করেন। হৃদয়ের আর যত দোষই থাকুক, তিনি মামাকে কি করে সমাধি থেকে নিচুভূমিতে আনতে হয় সেটা ভালভাবে রপ্ত করেছিলেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর, শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের কলকাতার বাড়িতে গিয়ে কীর্তনানন্দে দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। কেশব একজন ফটোগ্রাফারকে দিয়ে ঐ ছবি তুলে রাখেন। তাতে দেখা যায় হৃদয় ঠাকুরকে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

একবার ঠাকুর কলকাতায় কালীঘাটে যান হৃদয়ের সঙ্গে। শ্রীমন্দিরের পূর্বদিকে যে পুকুর আছে, তার উত্তর পাড়ে বিস্তর কচুবন ছিল। ঠাকুর দেখলেন, সেখানে মা-কালী একখানা লালপেড়ে কাপড় পরে কুমারীবেশে কতকগুলি কুমারীর সঙ্গে ফড়িং ধরে খেলা করছেন। দেখেই ঠাকুর 'মা, মা' বলে সমাধিস্থ হলেন, এবং সমাধিভঙ্গের পর শ্রীমন্দিরে গিয়ে দেখেন—যে কাপড় পরে মা কুমারীবেশে খেলা করছিলেন, শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে সেই শাড়ী শোভা পাচ্ছে। ঠাকুরের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে হৃদয় বলেন: "মামা, তখনই বলতে হয়; মাকে গিয়ে দৌড়ে ধরে ফেলতুম।" ঠাকুর হেসে বললেন: "তা কি হয় রে! মা ধরা না দিলে কার সাধ্য যে তাঁকে ধরতে পারে! তাঁর কৃপা না হলে কেউ তাঁর দর্শন পায় না।"

আর একবার কলকাতায় এক বিরাট প্রদর্শনী হয়। তাতে বিভিন্ন মহারাজারা তাদের সব মূল্যবান সামগ্রী পাঠান—এমন কি সোনার খাট পর্যন্ত। ভক্তদের কাছ থেকে শুনে ঠাকুর হেসে বলেছিলেন: "হ্যাঁ, গেলে একটা বেশ লাভ হয়। ঐ সব সোনার জিনিস, রাজরাজড়ার জিনিস দেখে সব ছ্যা হয়ে যায়। সেটাও অনেক লাভ। হৃদে, কলকাতায় যখন আমি আসতাম, লাট সাহেবের বাড়ি আমাকে দেখাত—মামা,

ঐ দেখ, লাট সাহেবের বাড়ী, বড় বড় থাম। মা দেখিয়ে দিলেন, কতকগুলি মাটির ইট উঁচু করে সাজান। ভগবান ও তাঁর ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য দুদিনের জন্য, ভগবানই সত্য।" শোভনবুদ্ধি ঠাকুরকে বিমোহিত করতে পারল না।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুর শেষবার কামারপুকুর ও শিহড় যান। হৃদয় ঠাকুরকে ফুলুই শ্যামবাজার বৈষ্ণবদের উৎসবে নিয়ে যান। সেখানে ঠাকুর অনুভব করেন যোগমায়ার আকর্ষণ অর্থাৎ ভগবান যখন মানুষরূপে আসেন তখন বহু-লোককে আকর্ষণ করেন। ঠাকুরের কথায়: "এমনি আকর্ষণ—সাত দিন সাত রাত লোকের ভিড়। কেবল কীর্তন ও নৃত্য। পাঁচিলে লোক! গাছে লোক।…রব উঠে গেল—সাতবার মরে, সাতবার বাঁচে, এমন লোক এসেছে! পাছে আমার সর্দিগর্মি হয়, হৃদে মাঠে টেনে নিয়ে যেত; সেখানে আবার পিঁপড়ের সার! আবার খোল করতাল। তাকুটী! তাকুটী! হৃদে বকলে, আর বললে, আমরা কি কখনও কীর্তন শুনি নাই?" তারপর রাতের অন্ধকারে হৃদয় ঠাকুরকে নিয়ে শিহড়ে পালিয়ে আসেন।

ঠাকুর যখন কামারপুকুরে থাকতেন, গাঁয়ের মেয়ে-পুরুষ তাঁর কাছে দিবারাত্র আসত। মেয়েরা ফল, মিষ্টি, নানাবিধ খাবার নিয়ে ঠাকুরের কথা শুনতে আসত। কেউ তাড়াতাড়ি সংসারের কাজ সেরে হালদারপুকুরে স্নান বা জল নেবার অছিলায় ঠাকুরের কাছে বসে সময় কাটাত। ঠাকুর তাদের সঙ্গে গল্পগুজব, ঠাট্টা করতেন, গান গেয়ে শোনাতেন। পুরুষরা আসত সন্ধ্যার পর সব কাজ সেরে। মথুর যতদিন বেঁচে ছিলেন ঠাকুরের সেবার জন্য হৃদয়ের হাতে টাকা পাঠাতেন। ঠাকুর আবার তা থেকে গ্রামের গরীবদের দান করতেন।

একবার ঠাকুর পালকিতে জয়রামবাটী যেতে প্রস্তুত হলেন। আহারান্তে পান খেয়ে, লাল চেলি পরে হাতে সোনার ইষ্ট কবচ ধারণ করে পালকির কাছে এসে দেখেন প্রচুর ভিড়। আশ্চর্য হয়ে তিনি হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করলেন: "হৃদু, এত ভিড় কিসের রে?" হৃদয়: "কিসের আর? এই তুমি আজ ওখানে যাবে, (লোকদের দেখিয়ে) এরা এখন আর তোমাকে কিছুদিন দেখতে পাবে না, তাই সব তোমায় দেখতে এসেছে।" ঠাকুর: "আমাকে তো রোজ দেখে। আজ আবার কি নূতন দেখবে?" হৃদয়: "এই চেলি পরে সাজলে গুজলে, পান খেয়ে তোমার ঠোঁট দুখানি লাল টুকটুকে হলে খুব সুন্দর দেখায়। তাই সব দেখবে আর কি?" রূপাকৃষ্ট মানুষদের প্রতি ঠাকুরের মন বিরক্তিতে ভরে উঠল। তিনি ভাবলেন—হায় হায়! এরা সব এই দুদিনের বাইরের রূপটা নিয়েই ব্যস্ত। ভিতরে যিনি রয়েছেন, তাঁকে কেউ দেখতে চায় না। তারপর তিনি বললেন: "কি? একটা মানুষকে মানুষ দেখবার জন্য এত ভিড় করবে? যাঃ, আমি কোথাও যাব না। যেখানে যাব, সেখানেই তো লোকে এ-রকম ভিড় করবে?" এই বলে নিজের ঘরে ঢুকে কাপড়চোপড় খুলে ক্ষোভে দুঃখে চুপ করে বসে রইলেন। হৃদয় ও বাড়ির সকলে কত বোঝালেন, কিন্তু সেদিন তিনি কোথাও গেলেন না। পরে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন। [ক্রমশঃ]

শুকদেব চরিত

ডক্টর রণজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পণ্ডিতগণ ব্যাস-পুত্র শুকদেবকে পরমহংসের আদর্শ বলেন। বৈষ্ণবগণ আদর করে তাঁর আখ্যা দেন 'শুকদেব গোঁসাই'। তিনি পরমহংসশ্রেষ্ঠও বটে, গোস্বামিশ্রেষ্ঠও বটে। বাস্তবিক, অন্ত কাউকে দিয়ে শ্রীমদ্ভাগবত-প্রচার করা সম্ভব হত না। ব্যাসদেবও নিজপুত্র শুকদেব ভিন্ন অন্য কাউকে ভাগবত-পুরাণ প্রচারের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করেননি। তিনি 'লোমহর্ষণ' নামক সূতকে অন্যান্য (ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি) পুরাণ শিখিয়ে নৈমিষারণ্যে মুনিসমাজে পাঠ করতে পাঠালেন বটে, কিন্তু 'ভাগবত' পুরাণটি তপস্যা-নিরত নিজ পুত্র শুকদেবকে তপস্যা থেকে আনিয়ে, তাঁকে শিখিয়ে প্রচার করতে আদেশ দেন। কেন?

এর দুটো কারণ আছে। তখনও পর্যন্ত মুনি-ঋষিদের মধ্যে ব্রহ্মোপাসনাই মোক্ষের পথরূপে প্রচলিত ছিল। 'ন পুনরাবর্ত্ততে ইতি শ্রুতেঃ'। বেদের যাগযজ্ঞাদি কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করার পর, তার ফল অস্থায়ী জেনে[১] বৈরাগ্য নিয়ে অরণ্যে গিয়ে ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট বেদান্ত (উপনিষদ্) শ্রবণ ও মনন এবং 'শাণ্ডিল্যবিদ্যা'-অভ্যাস দ্বারা সগুণ ব্রহ্মজ্যোতির ধ্যান, পরে তা পরিপক্ব হলে নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান দ্বারা ব্রহ্ম-নির্বাণ লাভ,—এই ছিল তখনকার যুগের প্রচলিত সাধনার ধারা।

কিন্তু বেদব্যাস যুগের প্রয়োজন উপলব্ধি করে, প্রকৃতিরও পরিবর্তনে মানুষের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির হ্রাস ও আয়ুর স্বল্পতা উপলব্ধি করে[২] ভাগবতোক্ত—

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ।
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ॥

(ভাগবত, ১।২।২৮,)

—এই মতবাদ দ্বারা সমস্ত তপস্যাকে, নির্গুণ উপাসনাকেও 'বাসুদেব' দিয়ে যেন মুড়ে দিতে চাইলেন। যা কিছু যোগ-ধ্যান-তপস্যা সব বাসুদেবেই 'ধারণা স্থির' কর, সংক্ষেপিত করে নাও, ইনিই সেই পরব্রহ্ম—সগুণ ও নির্গুণ, এঁকে ভক্তি করলে নির্গুণব্রহ্মের জ্ঞানও পেতে পারবে—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যদ্ ব্রহ্মদর্শনম্॥

(ভাগবত, ৩।৩২।২৩)

—ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ সমর্পিত হইলে তাহা আশু বৈরাগ্য ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারক জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়।'

কিন্তু ব্রহ্মবাদী মুনি-ঋষিদের সমাজে এই ভগবদ্‌বাদ ও ভক্তিবাদ প্রচার করতে গেলে তাঁদের মনে সংশয়, বিতর্ক, বিরক্তি ও বর্জনের ভাব আসতে পারে ও তখন ব্যাসকে প্রতিবাদ ও নিন্দাবাদের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু যদি এই মতটি তাঁর শুদ্ধ, মুক্ত ও নির্গুণের ধ্যানে পরাকাষ্ঠালব্ধ পুত্র শুক দ্বারা প্রচার করানো যায়, তাহলে আর অতটা সংশয় উঠবে না। কারণ সকলে দেখবেন যিনি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, যিনি ব্রহ্মতত্ত্বদর্শী, তিনিই ভগবানের তত্ত্ব ও ভক্তিযোগ ব্যাখ্যা করছেন। আর যদি সংশয় ওঠেও,

১ গীতা, ৯।২১

২ ভাগবত, ১।৪।১৬—১৭

তাহলেও তাঁর সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ও তত্ত্বদ্রষ্টা পুত্রই তার নিরসন করতে পারবে। আর, শুকদেব পরীক্ষিতের যে সভায় ভাগবত শুনিয়েছিলেন সে-সভায় উপস্থিত ছিলেন (ভাগবতে উল্লিখিত)—অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান্, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, সুবাহু, মেধাতিথি, দেবল, আর্ষ্টিষেণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব, কবষ, অগস্ত্য, বেদব্যাস, নারদ এবং অন্যান্য দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণ। সুতরাং এরূপ সভায় কোন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে একমাত্র তাঁর পুত্র শুকদেবই পারত। শুকদেব সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্র ঋষিরা যেভাবে সকলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন, তার থেকেই তাঁর গুরুত্ব বোঝা যায়—

"প্রত্যুত্থিতাস্তে মুনয়ঃ স্বাসনেভ্য-
স্তল্লক্ষণজ্ঞা অপি গূঢ়বর্চসম্।"
(ভাগবত, ১।১৯।২৮)

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, ভাগবতের কৃষ্ণলীলার প্রচার করা সহজ কার্য ছিল না, একে 'গোপবেশ বেণুকর', তাতে শৃঙ্গারলীলাপর। মাধুর্য ভাব ও রাসলীলা উৎকৃষ্ট বলে প্রচার করে পার পাওয়া মুশকিল! নিষ্কাম, স্বার্থ-বাসনাদিহীন, নিত্যশুদ্ধ আধার ভিন্ন এই কামগন্ধহীন অপ্রাকৃত প্রেমলীলা কেউই বর্ণনা করতে পারবে না। সেজন্যও তিনি শুকদেবকেই নির্বাচন করলেন।

কিন্তু তিনি শুকদেবকে দিয়ে প্রচার করাবেন কোথা থেকে? সে তো ঐ বৈরাগ্য নিয়ে সংসার ছেড়ে পালাল! এত তপস্যা করে ব্যাসদেব শিবের কাছ থেকে একটি পুত্র লাভ করলেন, আর অযোনি-সম্ভব সেই পুত্র তাঁকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে! ব্যাসদেব পুত্রস্নেহে আকুল হয়ে পিছন পিছন ধাওয়া করলেন,—'হা পুত্র! হা পুত্র!' করে ডাকতে ডাকতে। আর বৃক্ষসকল 'ভোঃ!' এই প্রতিধ্বনি করে উত্তর দিতে লাগল।[৩]

কিন্তু শুকদেব বায়ুবেগে ধাবিত হলেন, ব্যাসদেব তাঁকে ধরতে পারলেন না।[৩] শুকদেব যেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেখানে এক জায়গায় মন্দাকিনী নদীজলে অপ্সরাগণ তীরে বস্ত্র রেখে জলক্রীড়া করছিল। তারা শুকদেবকে দেখে কিছুমাত্র লজ্জিত হল না, কারণ শুকদেবের চিত্তে স্ত্রী-পুরুষ-লিঙ্গভেদের জ্ঞান ছিল না, বিন্দুমাত্র কামভাব ছিল না। কিন্তু শুক চলে গেলে ব্যাসদেব যখন সেখানে এলেন, তখন সেই অপ্সরাগণ অতিমাত্র লজ্জিত হয়ে বসন পরিধানে ব্যগ্র হল। তার কারণ তাঁর পুত্র ছিল মুক্ত পুরুষ, কিন্তু ব্যাসদেব সেরূপ শুদ্ধচিত্ত ও নিষ্কাম হতে পারেননি।[৪]

ব্যাসদেব শেষে পুত্রের অনুসরণে নিবৃত্ত হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। তিনি পুত্রকে ফিরিয়ে আনার উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। এ বিষয়ে একটি কাহিনী আছে।[৫]

ব্যাসদেব কতকগুলি কাষ্ঠ-পত্র-আহরণকারিণী রমণীদের ডাকলেন। বললেন, 'এই, তোরা কাঠ ভাঙতে খুব দূরে দূরে পাহাড়ে জঙ্গলে যাস?' তারা বলল, 'যাই মুনিঠাকুর!' ব্যাস বললেন, 'তোরা আমার একটা কাজ করিস তো। যেখানে যেখানে গিয়ে কাঠ ভাঙতে থাকবি, সেখানে সেখানে এই গানটা করতে থাকিস।' এই বলে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শিখিয়ে দিলেন,—

'বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।

৩ এ বিষয়টি ভাগবতে (১।২।২) শুকদেব-বন্দনায় সূত উগ্রশ্রবা ব্যক্ত করেছেন। এ বিষয়ে মহাভারতের প্রমাণ, যথা—মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৩৩ অধ্যায়, ২২—২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৪ মহাভারত ৩৩৩ অধ্যায়, শ্লোক ১৬ এবং ২৮—৩১ দ্রষ্টব্য।

৫ কাহিনীটি আমার পিতার কাছ থেকে ও ভাগবত-পাঠকদের মুখ থেকে শোনা। এটি কোন্ গ্রন্থে আছে বলতে অক্ষম।

রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদ-রমণং প্রাবিশদ্-গীত-কীর্তিঃ ॥
(ভাগবত, ১০।২১।৬)

—মনোহর ময়ূরপুচ্ছ যাঁর শিরোভূষণ, নটশ্রেষ্ঠের ন্যায় সুন্দর যাঁর বপু, যাঁর কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার কুসুম শোভা পাচ্ছে, পরিধানে স্বর্ণের ন্যায় পীতবসন, গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা ; বেণুর ছিদ্রগুলিতে যিনি অধরোষ্ঠদ্বারা ফুৎকার দিয়ে ধ্বনিত করছেন, গোপবৃন্দদ্বারা যাঁর কীর্তি গীত হচ্ছিল, তিনি নিজ পদাঙ্কদ্বারা যেস্থান মনোহর করেছেন, সেই বৃন্দাবনে তিনি প্রবেশ করলেন।

তারপর ব্যাস বললেন, 'এই গান শুনে যদি কেউ এসে জিজ্ঞাসা করে,—এই গান তোরা কোথায় শিখলি ? তোরা আমার নাম করিসনে, শুধু বলবি,—তুমি তাকে দেখবে ? সে যদি বলে, —হাঁ, তবে সঙ্গে করে একেবারে আমার কাছে নিয়ে আসিস্।'

কাঠুরিয়া রমণীরা দূর অরণ্যে গিয়ে সেইরকম গান করতে থাকলে, ধ্যান থেকে ব্যুত্থিত শুকদেবের কর্ণকুহরে সেই মনোহর গীতধ্বনি প্রবেশ করল। শুকদেব মুগ্ধ হলেন। ব্যাকুলভাবে এসে বললেন, 'ওগো, এই গান তোমাদের কে শিখাল ?' তারা বলল, 'তুমি তাকে দেখবে ?' শুকদেব বললেন, 'হাঁ'। তারা তখন তাঁকে সঙ্গে করে একেবারে ব্যাসদেব-সকাশে নিয়ে এসে হাজির করল। শুকদেব ব্যাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা, এ গানের বিষয় কে ?' ব্যাসদেব বললেন, 'সে হল পরব্রহ্মেরই এক পরম মাধুর্যমণ্ডিত নটবর মূর্তি। ইনি হলেন লীলাময় ব্রহ্ম, ভগবান্ শব্দ-বাচ্য। যিনি জ্ঞানীদের ব্রহ্ম, তিনিই যোগিগণের পরমাত্মা ও ভক্তদের ভগবান্[৬]। আমি এই ভগবানের বিষয় নিয়ে একটি বেদতুল্য পুরাণ রচনা করেছি, তা হল "ভাগবত"। তুই এটা আমার কাছে শেখ্, শিখে জগতে প্রচার কর্।' শুকদেব নির্গুণ ব্রহ্মে নিষ্ঠাযুক্ত হলেও আকৃষ্টচিত্ত হয়ে তিনি উত্তমশ্লোক হরির লীলা বিষয়ক আখ্যান অধ্যয়ন করলেন[৭]।

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ পড়েছে, —তিনি সপ্তাহান্তে মহাসর্প তক্ষকের দংশনে প্রাণ হারাবেন। রাজা বললেন, ভালই হয়েছে, আমি বিষয়াসক্ত ছিলাম, ভগবান্ বোধ হয় আমার আসক্তি ছাড়িয়ে দিতে চাইছেন অভিশাপের মাধ্যমে। এ সর্পবিষ তো আমার ওষুধ ![৮]

রাজার আগেই এ বোধ জন্মেছিল যে, ইহলোক ও পরলোকের (স্বর্গাদির) সুখ সবই নশ্বর ও হেয়। অতএব উভয়কে পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দের সেবাকে সার মনে করে গঙ্গাতীরে গিয়ে প্রায়োপবেশন করে বসে রইলেন। রাজার এই আচরণে স্বর্গে দেবতারা সাধুবাদ দিলেন। ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি প্রভৃতি মুনি-ঋষিরা দেখতে এলেন, তাঁরা রাজাকে ঘিরে বসে রইলেন। রাজা পরীক্ষিৎ তখন সমাগত মুনি-ঋষিদের বললেন, 'হে বিপ্রগণ, আমি বিশ্বস্তচিত্তে আপনাদের নিকট একটি প্রশ্ন উপস্থাপিত করছি, তা এই যে মুমূর্ষু ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা শ্রেয় কার্য কি ?'[৯] রাজার এই প্রশ্ন শুনে ঋষিরা নানাজনে নানা মত জ্ঞাপন করতে লাগলেন, কেউ বললেন যাগ-যজ্ঞ, কেউ বললেন যোগ, কেউ বললেন দান, কেউ বললেন তপস্যা। এইসব বলে ঋষিরা পরস্পর বিতর্ক আরম্ভ করলেন।

৬ ভাগবত, ১।২।১১
৭ ঐ, ২।১।৯
৮ ঐ, ১।১৯।৪
৯ ঐ, ১।১৯।২২

এমন সময় অদূরে একটা কলকোলাহল শোনা গেল, কতকগুলি বালক একটা উন্মাদকে ঘিরে কৌতুক করতে করতে আসছে, কতকগুলি মেয়েও তাঁর অদ্ভুত সুন্দর চেহারা দেখে পিছন পিছন আসছিল। সেই উন্মাদের অবধূত বেশ, দীর্ঘ, গভীর অথচ উজ্জ্বল চক্ষুঃ, ঋষিরা দেখেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন; রাজা এগিয়ে গিয়ে সেই অবধূতের চরণে প্রণিপাত করলেন। তাই দেখে বালকগুলো ভয়ে পালিয়ে গেল। ইনিই ব্রহ্মজ্ঞানী শুকদেব, বালকবৎ, উন্মাদবৎ আচরণ করতে করতে আসছিলেন। ভাগবতকার তাঁর যা বর্ণনা দিয়েছেন, তা এখানে তুলে ধরার লোভ সংবরণ করতে পারছি না—

'এমত সময়ে ভগবান ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব নিরপেক্ষ হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবী পর্যটন করিতে করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দেহে কোন আশ্রমের চিহ্ন ছিল না, তিনি কেবল আত্মলাভেই সন্তুষ্ট ছিলেন। কতকগুলি বালক চারিদিকে ঘিরিয়া কৌতুক করিতেছিল এবং বেশ দ্বারা বোধ হইল যেন লোকেরা তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে।

'কিন্তু তাঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসরমাত্র, হস্ত, পদ, উরু, বাহু, স্কন্ধ, কপোল এবং গাত্র অতিশয় কোমল, চক্ষুর্দ্বয় সুদীর্ঘ ও মনোহর, নাসিকা উন্নত, কর্ণদ্বয় পরস্পরের সমান, আননটি শোভন ভ্রূদ্বয়ে অতিশয় মনোহর এবং কণ্ঠদেশ কম্বুর ন্যায় শোভনীয় রেখাত্রয়ে অঙ্কিত ছিল।'

'যদিও তাঁহার তেজ গূঢ়রূপে ছিল, তথাপি মুনিগণ তাঁহার লক্ষণ জানিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্র স্ব-স্ব আসন হইতে উত্থান পূর্বক প্রত্যুদ্গমন করিলেন।···মহারাজ পরীক্ষিত আপনার মস্তকদ্বারা সপর্যা (পূজার উপকরণ) আহরণ করিলেন (আনিয়া উপহার দিলেন)। অনন্তর যে সকল অবোধ অবলা কন্দর্পজ্ঞানে এবং বালকসকল উন্মত্তবোধে সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা তাঁহার ঐ প্রকার গৌরব দেখিয়া মুনিগণের ভয়ে পলায়ন করিল। অনন্তর তিনি পূজা গ্রহণপূর্বক আসনে উপবিষ্ট হইলেন।'[১০] (শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত ভাগবতের অনুবাদ থেকে)। মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব সকাশে পূর্ব প্রশ্ন 'মুমুক্ষুর কি শ্রেষ্ঠ কর্তব্য' তা উপস্থাপিত করলে শুকদেব বললেন,—'অন্তে নারায়ণ-স্মৃতিঃ' জীবের অন্তকালে নারায়ণ স্মরণ পরম লাভ, তাঁর মহিমা বলে শেষ করা যায় না।

তস্মাদ্ভারত সর্বাত্মা ভগবান্ ঈশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥

(ভাগবত, ২।১।৫)

—অতএব হে ভারতশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহার পক্ষে সর্বাত্মা ভগবান্ এবং ঈশ্বর হরির শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

মহারাজ! আপনি আমার কাছে ভগবানের লীলাগাথা শ্রবণ করুন। আমি আমার পিতার কাছে 'ভাগবত' নামে বেদতুল্য একটি পুরাণ শিক্ষা করেছি,[১১] আপনার কল্যাণের জন্য আমি সেটি আপনাকে শোনাচ্ছি।

তারপর তিনি রাজা পরীক্ষিৎকে 'শ্রীমদ্ভাগবত' পুরাণটি শোনালেন। পরীক্ষিতের যেখানে যেখানে সংশয় হয়েছে, তিনি প্রশ্ন করেছেন ও শুকদেব তার উত্তর দিয়ে সন্দেহ ভঞ্জন করেছেন। যেমন, পরীক্ষিতের রাসলীলায় সংশয়হেতু প্রশ্ন—

'কৃষ্ণ ভগবান্ জগদীশ্বর, তিনি ধর্মসেতুর স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তা। তিনি আপ্তকাম হয়ে পরস্ত্রীসহ

১০ ঐ, ১।১৯।২৩, ২৪, ২৬, ২৭
১১ ঐ, ২।১।৮

রাসলীলারূপ জুগুপ্সিত (ঘৃণিত) কর্ম করলেন কি কারণে?'

তাতে শুকদেব যে উত্তর দিয়েছেন তার জন্য ভাগবতের ১০।৩৩।২৬ থেকে ১০।৩৩।৩৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য। এই দশটি শ্লোকে ঐ প্রশ্ন ও উত্তর উল্লিখিত হয়েছে, রচনার কলেবর বৃদ্ধি-ভয়ে এখানে তার উল্লেখ করা হল না। তাছাড়া, এই উত্তরের যাথার্থ্য উদ্ধব-সংবাদে গোপীদের নিকট কৃষ্ণপ্রেরিত উদ্ধবের বচনেও পাওয়া যাবে।

শুকদেবকে পুত্ররূপে লাভ করতে ব্যাসদেব শিবের তপস্যা করেছিলেন। তিনি ইন্দ্রিয়-নিরোধ পূর্বক বায়ুমাত্র ভক্ষণ করে ঘোরতর তপস্যা করতে লাগলেন। শতবৎসর তপস্যার পর ভগবান্ মহেশ্বর তাঁকে বর দিলেন, তুমি অচিরেই অগ্নি, বায়ু, ভূমি, সলিল ও আকাশের ন্যায় বিশুদ্ধ পুত্র লাভ করবে, ঐ পুত্র ব্রহ্মপরায়ণ হয়ে মন, প্রাণ ও বুদ্ধি সমস্তই ব্রহ্মে সমর্পণ করবে। তার যশঃসৌরভে ত্রিলোক পরিপূর্ণ হবে।[১২]

ব্যাসদেব হোম করার সময় অরণিকাষ্ঠ মন্থন করছিলেন আগুন জ্বালতে, সেই সময় দৃষ্টিপথে ঘৃতাচী নামক অপ্সরার আবির্ভাবে তাঁর শুক্র স্খলিত হয়ে অরণিদ্বয়-মধ্যে পড়ে। তথাপি তিনি সংযত হবার চেষ্টা করে কাষ্ঠ মন্থন করে যাচ্ছিলেন। তারপর ঐ কাষ্ঠদ্বয় মধ্য থেকে তেজঃপুঞ্জ কলেবর শুকদেব বহির্গত হয়ে যজ্ঞ-স্থানের অগ্নির ন্যায় শোভা পেতে লাগলেন। তখন আকাশ থেকে ঐ মহাত্মার জন্য কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম ও দণ্ড পতিত হল। স্বয়ং হরপার্বতী এসে বালকের উপনয়নক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র কমণ্ডলু ও দিব্যবস্ত্র দিলেন। তিনি ব্রহ্মচারী হয়ে সমাহিতভাবে কাল যাপন করতে লাগলেন। সরহস্য (উপনিষদ্ সহ) বেদ ও বেদাঙ্গ সমুদায় অচিরে তাঁর হৃদয়ে জাগরূক হল। তাছাড়া, তিনি বৃহস্পতির নিকট, বেদ-বেদাঙ্গ ইতিহাস ও রাজনীতি শিক্ষা করলেন।

অতঃপর শুকদেব পিতার নিকট প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গের তারতম্য জানতে চাইলেন। পিতা তাঁকে সংশয় নিরসনের জন্য রাজর্ষি জনকের কাছে পাঠালেন। জনকের নিকট উপস্থিত হলে তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য জনকের নির্দেশে রাজ-মন্ত্রী তাঁর সেবার জন্য সুন্দরী যুবতী নারীগণকে নিযুক্ত করেন। উত্তম কক্ষে তাঁর জন্য উত্তম আসন ও শয্যা দেওয়া হয়। সুন্দরীগণই তাঁকে আহার প্রদান করে, তাঁকে নিয়ে উদ্যানে ভ্রমণ করায় ও নৃত্যগীত করে, তাঁর শয়নকালে ও ধ্যানকালেও তাঁকে ঘিরে থাকে। কিন্তু জিতেন্দ্রিয়, ক্রোধ-বিজয়ী বিশুদ্ধাত্মা দ্বৈপায়ন-তনয় কিছুতেই হৃষ্ট, ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হলেন না।[১৩] প্রথম রাত্রে তিনি ধ্যান-নিরত হয়ে কাটালেন। মধ্যরাত্রিতে নিদ্রা গেলেন ও শেষ রাত্রে গাত্রোত্থান করে প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্বক ধ্যানে নিমগ্ন হন। তাঁর ধ্যানসময়েও যুবতী ললনাগণ তাঁকে বেষ্টন করে বসে ছিল। কিন্তু কোনক্রমেই তাঁর মনকে বিচলিত করতে পারেনি।

শুকদেব নিবৃত্তিমার্গের অনুরাগী, প্রথম থেকেই তাঁর প্রবৃত্তিমার্গে (যজ্ঞাদিকর্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্মপালন) সংশয় ছিল। সেই সংশয় নিরসনের জন্যই ব্যাস তাঁকে জনকের কাছে পাঠিয়েছিলেন। জনকের ব্রাহ্মণের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশকালে শুকদেব হঠাৎ যে প্রশ্ন করে ওঠেন, তা করতে শুধু শুকই পারেন, আর কেউ পারেননা মনে হয়। জনক বলছিলেন যে, ব্রহ্মচর্য পালন দ্বারা দেবঋণ পরিশোধ করে, গুরুগৃহ থেকে সমাবর্তন করে,

১২ মহাভারত
১৩ ঐ

দারপরিগ্রহ করে পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করতে হয় এবং বর্ণাশ্রমধর্মে নিরত থাকতে হয়, তখন শুকদেব হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলেন—

উৎপন্নে জ্ঞান-বিজ্ঞানে নির্দ্বন্দ্বে হৃদি শাশ্বতে।
কিমবশ্যং নিবস্তব্যমাশ্রমেষু ভবেৎ ত্রিষু॥

—মহারাজ, যদি ব্রহ্মচর্য গ্রহণের পূর্ব হতেই হৃদয়ে মোক্ষধর্মের মূল সনাতন জ্ঞান ও অনুভব উৎপন্ন হয়, তাহলেও কি ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য প্রভৃতি আশ্রমত্রয়ে বাস করা কর্তব্য? জন্ম-শুদ্ধ শুকদেবেরই উপযুক্ত প্রশ্ন! তাতে জনক উত্তর দেন, 'যে ব্যক্তি বহু জন্মের সাধনার দ্বারা ইন্দ্রিয় সমুদয় বশীভূত ও বুদ্ধিকে পরিশোধিত করতে পারেন, তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমেই মোক্ষলাভ হয়ে থাকে, তাঁর আর গার্হস্থ্যাদি আশ্রমগ্রহণের প্রয়োজন নেই।'

এই উত্তরই শুকদেব চাইছিলেন। পরে পিতার আশ্রমে নারদ এসে উপদেশ দিলে তিনি বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে যোগবলে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করেন। তিনি আর প্রবৃত্তিমার্গ গ্রহণ করেননি, কারণ তাঁর ভিতরে সমস্ত যোগ ও ব্রহ্মজ্ঞান জাগরিত ছিল। এজন্যই একটি কথা যথার্থই প্রসিদ্ধ আছে—

'শুকোমুক্তঃ, নারদো বা'

—শুকদেব নিত্যমুক্ত, নারদ তা হলেও হতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে মৃত্যুশোক এবং 'দুঃখ'

অধ্যাপিকা বিজয়া চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের জীবনে ১৯০১-১৯১০ খ্রীঃ এই দশবছর কাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্বেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তাঁকে নিভৃত জীবনের আবেষ্টনী থেকে বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে আহ্বান করেছিল এবং তিনি তাতে যথোচিত সাড়া দিয়েছিলেন এ তথ্য সকলেরই জানা। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের জীবনের বাহির মহলের দিকে নয় তাঁর জীবনের অন্দরমহলের দিকে। আরও গভীরে তাঁর 'অন্তরের অন্তঃপুরে' দৃষ্টিপাত করলে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের এক দুর্লভ পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়। এই পর্বে সংসারী মানুষ রবীন্দ্রনাথকে যত মৃত্যু-ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এমন আগে বা পরে কখনও হয়নি। মাত্র চারপাঁচ বছরেই তাঁর জীবনের সবচেয়ে অন্তরঙ্গজনেরা বিদায় নিয়েছিলেন। এই মৃত্যুশোক তাঁকে বিষণ্ণ অবসন্ন বা খিন্ন করেনি, তাঁর স্বাভাবিক সৃষ্টিকর্মও অবরুদ্ধ হয়নি। বরং এই পৌনঃপুনিক স্বজনবিয়োগের অভিজ্ঞতা থেকে জন্মলাভ করেছিল একটি অসামান্য রচনা—যার নাম 'দুঃখ' (ফাল্গুন ১৩১৬)। রচনাটি তাঁর 'ধর্ম' গ্রন্থে গৃহীত। শুধু মৃত্যু নয়—সংসারের যাবতীয় বিঘ্ন-বিপদ-ক্ষোভ-গ্লানি-দুর্গতি-ভয়-দারিদ্র্য—যে কোন প্রতিকূলতাকে পরাভূত করার দুর্জয় শক্তির উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠা হয়েছে এ রচনায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘজীবনে মৃত্যুশোক অনেক পেয়েছেন। অত্যন্ত কৈশোরেই তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। তখন তাঁর বয়স প্রায় চোদ্দ বছর। কিন্তু জীবনের এই প্রথম মৃত্যুশোক তাঁর মনে গভীর দাগ কাটতে পারেনি। 'যে ক্ষতি পূরণ হইবে না, যে বিচ্ছেদের প্রতিকার নাই; তাহাকে ভুলিবার শক্তি প্রাণশক্তিরই একটা প্রধান অঙ্গ; শিশুকালে সেই প্রাণশক্তি নবীন ও প্রবল থাকে, তখন সে কোনো আঘাতকে গভীরভাবে গ্রহণ করে না, স্থায়ী রেখায় আঁকিয়া রাখে না। এইজন্য জীবনে প্রথম যে মৃত্যু কালোছায়া ফেলিয়া প্রবেশ করিল তাহা আপনার কালিমাকে চিরন্তন না করিয়া

ছায়ার মতোই একদিন নিঃশব্দপদে চলিয়া গেল।'[১]

রবীন্দ্রনাথের জীবনে দ্বিতীয় মৃত্যুশোক তাঁর নতুন বৌঠাকুরানী কাদম্বরীদেবীর মৃত্যু। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন তেইশ বছর। এই মৃত্যুশোক সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: 'কিন্তু আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশু-বয়সের লঘুজীবন বড়ো বড়ো মৃত্যুকেও অনায়াসে পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়, কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।'[২] যৌবনের প্রারম্ভেই এই অতিপ্রিয় ও অন্তরঙ্গজনের মৃত্যুর 'দুঃসহ আঘাত'কে 'বুকপেতে' বহন করে যে মানসিক শক্তি তিনি সঞ্চয় করলেন—পরবর্তী দীর্ঘ জীবনের প্রতিটি মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর সেই অবিচল মানসিক ধৈর্য ও শোকসহনক্ষমতার অভ্রান্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

মৃত্যুশোককে স্তব্ধহৃদয়ে ও স্থৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করতে তিনি দেখেছিলেন পিতা দেবেন্দ্রনাথকে। পিতার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: 'আমার অভিজ্ঞতার মধ্যেই দেখেছি, অনেক শোকাবহ ব্যাপারে আত্মীয়স্বজনের বিয়োগবিচ্ছেদে তিনি তাঁর সেই তেতালার ঘরে আত্মসমাহিত হয়ে একা বসে আছেন। কেউ সাহস করত না তাঁকে সান্ত্বনা দিতে।'[৩] শোকের ঘটনায় পিতার এই ধ্যানস্তব্ধ মৌনভাবটি রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে শ্রদ্ধানত—অভিভূত এবং বিস্মিত করত। তাঁর জীবনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় শোকের ঘটনায় কখনও তিনি ধৈর্যহীন বা অস্থির হয়ে পড়েননি। সর্বদাই স্তব্ধসমাহিত ভাবটি রক্ষা করেছেন। সমসাময়িক-কালের অনেক চিঠিপত্রে কবির অন্তরের এই পরিচয় ফুটে উঠেছে।

১৮৯৯ খ্রীঃ রবীন্দ্রনাথের চতুর্থভ্রাতা বীরেন্দ্র-নাথের একমাত্র পুত্র বলেন্দ্রনাথের অত্যন্ত তরুণ-বয়সে মৃত্যু ঘটে। বলেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ এবং মৃণালিনীদেবীর অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। তাঁর সাহিত্যিক সম্ভাবনা তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ-উপদেশ তাঁর সাহিত্য-জীবনে গভীর অনুপ্রেরণা ছিল। ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যুতে তিনি গভীর আঘাত পান। কিন্তু পত্নী মৃণালিনীদেবী শোকে একেবারে ভেঙে পড়েন। তিনি তখন শিলাইদহে এবং রবীন্দ্রনাথ কলকাতায়। এই সময়ে মৃণালিনীদেবীকে লেখা একটি চিঠিতে দেখি, শোকবিচলিত স্ত্রীকে তিনি মৃদু ভর্ৎসনা করছেন: 'তুমি করছ কি? যদি নিজের দুর্ভাবনার কাছে তুমি এমন করে আত্ম-সমর্পণ কর তাহলে এ সংসারে তোমার কি গতি হবে বল দেখি? বেঁচে থাকতে গেলেই মৃত্যু কতবার আমাদের দ্বারে এসে কত জায়গায় আঘাত করবে—মৃত্যুর চেয়ে নিশ্চিত ঘটনা ত নেই—শোকের বিপদের মুখে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ বন্ধু জেনে যদি নির্ভর করতে না শেখ তাহলে তোমার শোকের অন্ত নেই।'[৪] ঐ চিঠিতেই এক জায়গায় তিনি বলেছেন: 'আজকাল মৃত্যুর কোন মূর্তিকেই তেমন ভয় করিনে।' বস্তুত এ শুধু কথার কথা ছিল না। জীবনের প্রতিটি মৃত্যু-

১ জীবনস্মৃতি, পৃঃ ১১৮, শতবার্ষিকী রবীন্দ্ররচনাবলী (১০ম)
২ ঐ
৩ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৫৯
৪ চিঠিপত্র (১ম খণ্ড)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৪২

ঘটনার আঘাতকে তিনি এইভাবেই গ্রহণ করেছেন। ১৯০০ খ্রীঃ নভেম্বরে লিখিত এই চিঠিতে দেখি মৃত্যুর রূপ যত ভয়াল ও ভয়ংকর হোক না কেন তিনি সেই ভয়কে অতিক্রম করেছেন। আশ্চর্যের কথা এই যে এই মানসিক উত্তুঙ্গ অবস্থায় তিনি পৌঁছেছিলেন তাঁর সংসারের সবচেয়ে প্রিয়জনদের মৃত্যুর অনেক আগেই। সেজন্য এরপর একে একে পত্নী-কন্যা-পিতা-পুত্র কারুর মৃত্যুতেই তিনি সেই অবিচল স্থৈর্যের এবং আত্মসংবরণের উচ্চতম শিখর থেকে বিচ্যুত হননি।

১৩০৮ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ (২২ ডিসেম্বর ১৯০১) শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শ্রাবণ মাসে মৃণালিনীদেবী অসুস্থ হয়ে পড়েন। শান্তিনিকেতনে চিকিৎসায় কোন ফল না পাওয়ায় তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীকন্যাদের পীড়ায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। মৃণালিনীদেবী ছাড়াও দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকা এবং কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দুজনেই তখন অসুস্থ ছিলেন। মৃণালিনীদেবীর আরোগ্যের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। কয়েকমাস রোগ-ভোগের পর ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ৭ অগ্রহায়ণ (১৯০২ নভেম্বর) কবিপত্নীর মৃত্যু ঘটে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন একচল্লিশ বছরের কিছু বেশি।

ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্নেহ-প্রবণ ও কর্তব্যপরায়ণ স্বামী ছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি গভীর আঘাত পেলেন। বিশেষতঃ, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বিদ্যালয়ের নানাদিকে মৃণালিনীদেবী কবির ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। বিদ্যালয়ের জন্য তাঁর ত্যাগ কম নয়। তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বাভাবিক স্থৈর্য ও গাম্ভীর্য হারাননি। এই কঠিন ও দুঃসহ আঘাতকে তিনি শান্তভাবেই বহন করলেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'সমবেদনা জানাবার জন্যে সেদিন রাত পর্যন্ত লোকের ভিড়। বাবা সকলের সঙ্গেই শান্তভাবে অসম্ভব ধৈর্যের সঙ্গে কথা বলে গেলেন, কিন্তু কী কষ্টে যে আত্মসংবরণ করে তিনি ছিলেন তা আমরা বুঝতে পারছিলুম।'[৫]

রবীন্দ্রনাথ শোকে কখনও উদ্বেল হননি। স্ত্রীর মৃত্যুর মাত্র এগারো দিন পরে দীনেশচন্দ্র সেনকে একটি চিঠিতে লিখেছেন: 'ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন তাহা যদি নিরর্থক হয় তবে এমন বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে? ইহা আমি মাথা নীচু করিয়া গ্রহণ করিলাম। যিনি আপন জীবনের দ্বারা আমাকে নিয়ত সহায়বান করিয়াছিলেন, তিনি মৃত্যুর দ্বারাও আমার জীবনের অবশিষ্টকালকে সার্থক করিবেন।'[৬]

চব্বিশবছর বয়সের মৃত্যুশোক থেকে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, জীবন ও সংসারকে সম্পূর্ণ করে দেখায় মৃত্যু কোন বাধা নয়: 'জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে দূরত্বের প্রয়োজন, মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা মনোহর।'[৭]

সাংসারিক জীবনে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা নির্লিপ্ত ছিলেন—অত্যন্ত বেশি করে সংসক্ত ছিলেন না। ১৮৯৫ খ্রীঃ ইন্দিরাদেবীকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: 'ব্যক্তিগত হিসাবে দেখতে গেলে মৃত্যুটা উৎকট এবং তার মধ্যে কোন সান্ত্বনা

৫ পিতৃস্মৃতি—শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৮৯
৬ চিঠিপত্র (১০ম খণ্ড), পৃঃ ১০
৭ জীবনস্মৃতি, পৃঃ ১১৯

নেই। কিন্তু বিশ্বজগতের হিসাবে দেখতে গেলে মৃত্যুটা অতিসুন্দর এবং মানবাত্মার যথার্থ সান্ত্বনাস্থল।'[৮] এমনকি কর্মই মানুষকে শোকের বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে পারে, শিলাইদহ থেকে ইন্দিরাদেবীকে লেখা অপর একটি চিঠিতে সেকথা তিনি বলেছেন। এই চিঠিতে তিনি লিখেছেন: 'মনে আছে সাজাদপুরে থাকতে সেখানকার খানসামা একদিন সকালে দেরি করে আসাতে ভারী রাগ করেছিলুম; সে এসে তার নিত্য-নিয়মিত সেলামটি করে ঈষৎ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, "কাল রাত্রে আমার আট বছরের মেয়েটি মারা গেছে" এই বলে সে ঝাড়নটি কাঁধে করে আমার বিছানাপত্র ঝাড়পোঁচ করতে গেল। আমার ভারী কষ্ট হল—কঠিন কর্মক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ শোকেরও অবসর নেই। কিন্তু সে অবসরটা নিয়ে ফল কি? কর্ম যদি মানুষকে বৃথা অনুশোচনার বন্ধন থেকে মুক্ত করে সম্মুখে প্রবাহিত করে নিয়ে যেতে পারে তবে তার চেয়ে ভালো শিক্ষা আর কী আছে।'[৯] 'কঠিন কর্মক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ শোকেরও অবসর নেই' —তাই মৃণালিনীদেবীর মৃত্যুর সেই অন্তরঙ্গ শোকের অনুশোচনায় তিনি দিনাতিপাত করেননি —কর্মকেই আশ্রয় করলেন। এ সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'মায়ের মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই আমরা শান্তিনিকেতনে চলে এলুম। বাবা বিদ্যালয়ের কাজে আরো যেন মন ঢেলে দিলেন।'[১০]

মৃণালিনীদেবীর মৃত্যুর আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা রানী (রেণুকা) রোগাক্রান্ত ছিলেন। কয়েকমাস রোগভোগের পর ভাদ্রের শেষে তাঁর মৃত্যু ঘটে। মাত্র ন মাস আগে রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে—এবার কন্যাবিয়োগ। এই প্রথম তাঁর সন্তানশোক। আমরা অনুমান করতে পারি এই মৃত্যুকেও তিনি অবিচলিতচিত্তে জয় করেছিলেন। কবির এই কন্যাটির প্রতি একটু বিশেষ ধরনের স্নেহ ছিল। এবং তাঁর মৃত্যুসময়ের স্মৃতিটি অনেকদিন ধরে খুব স্পষ্ট ছিল। দীর্ঘদিন বাদে তিনি নির্মলকুমারী মহলানবিশের কাছে রানীর মৃত্যুপ্রসঙ্গের স্মৃতিচারণা করেছিলেন।

মাত্র কয়েকমাস পরেই ১৩১০ বঙ্গাব্দের মাঘীপূর্ণিমার দিন রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত স্নেহভাজন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যুতে তিনি গভীর আঘাত পান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই তরুণ বন্ধুটিকে গভীর স্নেহ ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। সতীশচন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কল্পিত আদর্শ শিক্ষক।

সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর একবছরের মধ্যেই ১৩১১ বঙ্গাব্দের ৬ মাঘ (১৯০৫—১৯ জানুআরি) রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথের দেহাবসান ঘটে। পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে এবং তাঁর মৃত্যুর ঠিক পরেই যে মাঘোৎসব অনুষ্ঠিত হয়— রবীন্দ্রনাথ সেখানে পিতার জীবনকর্ম ও তাঁর আধ্যাত্মভাবনার—তাঁর জীবনের নানাদিক নিয়ে ভাষণ দেন। পিতার মৃত্যুকে তিনি যে কেবল নির্লিপ্ত ও অনাসক্তভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন তাই নয়—মৃত্যুরও স্রষ্টা তিনিই যিনি জীবনের স্রষ্টা —এ সময়ে তাঁর এই উপলব্ধিও ঘটেছিল। দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পাঁচদিন পরে অনুষ্ঠিত মাঘোৎসবের ভাষণে তিনি বলেন: 'আমরা জীবনকে ও মৃত্যুকে খণ্ডিত করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া দেখি—সেইজন্য জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে

৮ ছিন্নপত্রাবলী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৩১৭

৯ ঐ, পৃঃ ৩১১

১০ পিতৃস্মৃতি, পৃঃ ৮৪

আমরা একটা বিভীষিকার ব্যবধান গড়িয়া তুলি। কিন্তু জীবন যাঁহার মৃত্যুও তাঁহারই প্রসাদ; এই কথা অদ্য বিশেষভাবে স্মরণ করিয়া সেই জীবন ও মৃত্যুর অধীশ্বরকে আমরা পূজা করিব।' ১৩০৮ বঙ্গাব্দের চৈত্রে রচিত একটি প্রবন্ধে দেখা যায় তিনি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই পরম একেশ্বরের কাছেই আত্মনিবেদন করেছেন। তিনি 'বর্ষশেষ' প্রবন্ধে বলেছেন: 'গতবৎসর যদি তাহার উড্ডীন পক্ষপুটে আমাদের কোন প্রিয়জনকে হরণ করিয়া যায়, তবে হে পরিণামের আশ্রয় করজোড়ে সমস্ত হৃদয়ের সহিত তোমার প্রতি তাহাকে সমর্পণ করিলাম। জীবনে যে তোমার ছিল মৃত্যুতেও সে তোমারই। আমি তাহাকে আমার বলিয়া যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলাম তাহা ক্ষণকালের, তাহা ছিন্ন হইয়াছে।'[১১] এর কিছুদিন আগেই প্রিয়নাথ সেনকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: 'যত রকম দুঃখ ও অপ্রিয় সংসারে সম্ভবপর আমি সমস্তই মাঝে মাঝে প্রত্যাশা করিয়া মনকে সকল অবস্থার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাখিতে চেষ্টা করি।'[১২]

কয়েক বছরের উপর্যুপরি মৃত্যুঘটনা রবীন্দ্রনাথ অসামান্য ধৈর্যের সঙ্গেই বহন করেন। সাংসারিক কোন ঘটনা বা শোক তাঁর সমাহিত আত্মস্থতাকে ভগ্ন করতে পারেনি। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে আর একটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত-অভাবিত মৃত্যুর কঠিন আঘাত তাঁকে বিমূঢ় ও স্তব্ধ করে দিল। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের পূজার অবকাশে তাঁর কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথ বন্ধুর সঙ্গে মুঙ্গেরে বন্ধুর মাতুলালয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর কলেরায় মৃত্যু ঘটে। শমীন্দ্রনাথ তখন এগারো বছরের বালক। রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম পেয়ে মুঙ্গেরে যান, কিন্তু সেখানে তিনি পুত্রকে জীবিত দেখতে পাননি। সেদিনই তিনি মুঙ্গের থেকে শান্তিনিকেতনে যাত্রা করেন। এর আগে রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী ও কন্যার মৃত্যু ঘটেছে। এবং উভয়েরই মৃত্যু ঘটে দীর্ঘ রোগভোগের পর। রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী ও কন্যার যথাসাধ্য চিকিৎসা এবং সেবাও করেছিলেন—তাঁদের মৃত্যুর মুহূর্তেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন পীড়িত থাকায় তাঁদের মৃত্যুসম্ভাবনার একটা মানসিক প্রস্তুতিও কবির ঘটেছিল বলে মনে হয়। কিন্তু শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের কাছে যেমন আকস্মিক তেমনি মর্মান্তিক। সুস্থ পুত্রকে তিনি পাঠালেন—তার আর ফিরে আসা হল না। মৃত্যু সময়ে তিনি কাছে ছিলেন না এটাও কবির পক্ষে নিদারুণ আঘাত। মাতৃহীন বালক শমীন্দ্রনাথ পিতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। পাঁচবছর আগে ঠিক এই দিনটিতে (৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৯) তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। তখন শমীন্দ্রনাথ ছ বছরের শিশুমাত্র। স্ত্রীর মৃত্যুর পর এই শিশুপুত্রটিকে স্বাভাবিকভাবেই অনেক কাছে টেনেছিলেন তিনি। জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথও এ সময়ে পিতার পাশে থাকতে পারেননি। তিনি তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত।

এই পর্যায়ের মৃত্যু-আঘাতের মধ্যে প্রিয়পুত্রের অকাল মৃত্যুর আঘাতই তাঁর চিত্তকে বিদীর্ণ করেছিল সবচেয়ে বেশি। যিনি 'আরো আঘাত সইবে আমার' গানের স্রষ্টা তিনি তাঁর স্বাভাবিক সংযম ও স্থৈর্যে অচঞ্চলই ছিলেন। শোক যত গভীর, স্তব্ধতাও তত অতলস্পর্শী। শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর বারোদিন পরে কাদম্বিনীদেবীকে লিখিত একটি চিঠিতে মাত্র কয়েকটি কথায় তাঁর সুগভীর পুত্রশোক সকরুণ গাম্ভীর্যে প্রকাশিত হয়েছে: 'মাতঃ, ঈশ্বর আমাকে বেদনা দিয়াছেন,

১১ বর্ষশেষ (ধর্ম)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৮৮

১২ চিঠিপত্র (৮ম খণ্ড), পৃঃ ১০৭

কিন্তু তিনি তো আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই—তিনি হরণও করিয়াছেন পূরণও করিবেন। আমি শোক করিব না—আমার জন্য শোক করিয়ো না।'[১৩] শোকে আত্মস্থতার এমন দৃষ্টান্ত প্রায় বিরল। এই মৃত্যুপ্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'অন্তরে যতই আঘাত পান—বাইরে তা কখনো বাবা প্রকাশ করতেন না। শমীর মৃত্যুর সময় সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সকলেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন কী শান্তভাবে বাবা তাঁর এই ব্যক্তিগত দুঃখকষ্ট সংবরণ করেছিলেন। এই বিষয়ে মহর্ষির মতোই তাঁর আত্মসংযম ছিল। কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে যাঁরা প্রিয় তাঁদের একে একে হারালেন। তাঁর জীবনব্যাপী সুতীব্র দুঃখতাপের মধ্যেও তিনি বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাস স্থির রাখতে পেরেছিলেন, সংসারের নানান অভিঘাতেও নিজেকে অবসাদগ্রস্ত হতে দেননি।'[১৪]

দীর্ঘদিন বাদে রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্র—কনিষ্ঠা কন্যা মীরাদেবীর একমাত্র পুত্র নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তিনি মীরাদেবীকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তাঁর তৎকালীন মানসিক অবস্থার বর্ণনা করেছিলেন। এই চিঠিতে তিনি লিখছেন: 'ব্যক্তিগত জীবনটাকেই অন্যসব কিছুর উপরে প্রত্যক্ষ করে তোলাই সবচেয়ে আত্মাবমাননা।...যে রাত্রে শমী গিয়েছিল সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধগতি হোক, আমার শোক তাকে একটুও যেন পিছনে না টানে। তেমনি নীতুর চলে যাওয়ার খবর যখন শুনলুম তখন অনেকদিন ধরে বারবার করে বলেচি, আর তো আমার কোন কর্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি এরপরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি সেখানে তার কল্যাণ হোক। শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েচে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়েনি—সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারই মধ্যে।'[১৫] 'গীতাঞ্জলি'র ৬নং কবিতায় এই আশ্চর্য অনুভবের পরিচয় আছে: 'প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে/প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক-ভূলোকে/তোমার অমল অমৃত প'ড়িছে ঝরিয়া।' এটি রচিত হয়েছিল ১৩১৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণের একেবারে শেষে আর শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছিল ৭ অগ্রহায়ণ, ১৩১৪।

শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে শিলাইদহে চলে গেলেন—সঙ্গে নিলেন দুই কন্যাকে। সে বছর তিনি ৭ পৌষের উৎসবে শান্তিনিকেতনে যোগদান করেননি। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনে স্বদেশে থেকেও মাত্র দুবার পোষ উৎসবে যোগ দিতে পারেননি।

পৌষ উৎসবের সময় শিলাইদহে কাটালেও মাঘোৎসবে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যোগ দিলেন। মাঘোৎসবের প্রাতে তিনি যে ভাষণ দেন তার নাম 'দুঃখ'।[১৬] 'দুঃখ' একটি অনন্যসাধারণ ও দীর্ঘ রচনা। ছেচল্লিশ বছরের জীবনে রবীন্দ্রনাথ যত নিন্দা-বিদ্রূপ-আঘাত-অপমান-অবমান-শোক ও দুঃখ পেয়েছেন—বিশেষত

১৩ চিঠিপত্র (৭ম খণ্ড), পৃঃ ১১
১৪ পিতৃস্মৃতি, পৃঃ ৮৯
১৫ চিঠিপত্র (৪র্থ খণ্ড), পৃঃ ১৫১।৫২।৫৩
১৬ রবীন্দ্রজীবনী (২য় খণ্ড)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২১৭
এই উৎসবে সম্ভবত তিনি খসড়া রচনাটি পড়েছিলেন। কারণ রচনাটির তারিখ পাওয়া যায় ফাল্গুন, ১৩১৪।

১৮৯৯—১৯০৭-০৮ খ্রীঃ পর্যন্ত—একটানা এই আট-ন'বছরে নানাদিক থেকে যে নিদারুণ আঘাত পেয়েছেন সমস্তই তাঁর গভীর বিশ্বাস ও ঈশ্বর-চেতনার সঙ্গে মিলেমিশে এক আস্বাদনযোগ্য অপূর্ব উপলব্ধির জন্ম দিল যার নাম দুঃখ—যে দুঃখ পরিণামে 'আনন্দরূপমমৃতম্'।

'দুঃখ' রচনার পশ্চাৎপটে আছে রবীন্দ্রনাথের ছেচল্লিশ বছরের জীবনের অনেক বিঘ্ন-অপমান-অবমানের ইতিহাস এবং অন্তরঙ্গজনের অনেকগুলি মৃত্যুঘটনা। কিন্তু শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুকেই এই রচনার প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত কারণ বলে মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত নয়। মৃত্যুর আঘাত থেকে যে রচনা জন্মলাভ করে সাধারণভাবে তার অভ্যন্তরে বিলাপ-অনুশোচনা ও শোকোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা থেকে যায়। 'দুঃখ' প্রবন্ধটি সম্পূর্ণভাবে শোকজনিত আবেগ পরিতাপ থেকে মুক্ত। ১৮৯৯—১৯০৮ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে এবং মৃত্যুঘটনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে তাঁর মনের যে পরিচয় ফুটে উঠেছে তাকে এক জায়গায় জড়ো করলে 'দুঃখ' প্রবন্ধ রচনার মানস-প্রস্তুতিকে প্রত্যক্ষ করা যাবে। এই প্রবন্ধে 'দুঃখ' কথাটি রবীন্দ্রনাথ খুব ব্যাপক ও গভীর অর্থে প্রয়োগ করেছেন। বিঘ্ন-বিপদ-ভয়-দারিদ্র্য-হতাশা-গ্লানি-ক্ষোভ-অপমান-অবমান-শোক-পরিতাপ- অবসাদ —সর্বপ্রকার পার্থিব প্রতিকূলতা অর্থাৎ সাংসারিক জগতের সর্বপ্রকার দুঃখই এর অন্তর্ভুক্ত। মানুষের ব্যক্তিগত দুঃখ থেকে আধিভৌতিক-আধিদৈবিক-আধ্যাত্মিক ক্ষুদ্রতম-বৃহত্তম সমস্ত দুঃখই এই দুঃখের অভিধার অন্তর্গত। রবীন্দ্র-ভাবনার বৈশিষ্ট্য এখানে যে তিনি এই দুঃখকে পরিহার করতে চাননি বা দুঃখ থেকে মুক্তি চাননি। দুঃখের একটি আশ্চর্য মহিমা তিনি আবিষ্কার করেছেন। পার্থিব জগতে আমরা সর্বতোভাবে দুঃখকে এড়িয়ে চলতে চাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বললেন: দুঃখই আমাদের কাম্য—আমাদের যাবতীয় সার্থকতার মূলেই দুঃখ—তাই 'মানুষের পক্ষে দুঃখের অভাবের মতো এতবড়ো অভাব আর কিছু হইতেই পারে না।'

মনুষ্যত্ব অর্জনের পক্ষে দুঃখ অত্যাবশ্যক—তা আরামে-ভোগে বিলাসে-ঐশ্বর্যে অর্জিত হতে পারে না: 'মানুষ সত্যপদার্থ যাহা কিছু পায় তাহা দুঃখের দ্বারাই পায় বলিয়াই তাহার মনুষ্যত্ব। তাহার ক্ষমতা অল্প বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে ভিক্ষুক করেন নাই। সে শুধু চাহিয়াই কিছু পায় না, দুঃখ করিয়া পায়।' পূর্ণতার অভিলাষী মানুষ দুঃখের মূল্যেই তার অধিকারী হতে পারে—পূর্ণতার মূল্য এই দুঃখ—'সেই দুঃখই সাধনা সেই দুঃখই তপস্যা।' দুঃখের মহনীয়রূপ উদ্ঘাটন করে তিনি বললেন: 'মানুষের ইতিহাসে যত বীরত্ব, যত মহত্ত্ব, সমস্তই দুঃখের আসনে প্রতিষ্ঠিত। মাতৃস্নেহের মূল্য দুঃখে, পাতিব্রত্যের মূল্য দুঃখে, বীর্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে।'

কিন্তু দুঃখের আরও গভীর তাৎপর্য এইখানে যে, তা আমাদের মানসিক বলের সঞ্চার করে। জীবনে ক্রমাগত দুঃখের অভিজ্ঞতা এবং অভিঘাত সাধারণত মানুষকে নির্বীর্য করে—অবসন্ন করে। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করলেন দুঃখই আমাদের আত্মিক শক্তির উদ্বোধন ঘটায়: 'মানুষের এই দুঃখকে আমরা ক্ষুদ্র করিয়া বা দুর্বলভাবে দেখিব না। আমরা বক্ষ বিস্ফারিত ও মস্তক উন্নত করিয়াই ইহাকে স্বীকার করিব। এই দুঃখের শক্তির দ্বারা নিজেকে ভস্ম করিব না, নিজেকে কঠিন করিয়া গড়িয়া তুলিব।' এবং তাই 'মানুষের এই যে দুঃখ ইহা কেবল কোমল অশ্রু-বাষ্পে আচ্ছন্ন নহে, ইহা রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত। বিশ্বজগতে তেজঃপদার্থ যেমন, মানুষের চিত্তে

দুঃখ সেইরূপ ; তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ…।' দুঃখের দ্বারা যেমন মানুষ আত্মিক বীর্য লাভ করে তেমনি আত্মার গৌরবও প্রকাশিত হয় দুঃখের মধ্য দিয়েই—এখানেই দুঃখের পরম মহিমা : 'দুঃখ ছাড়া আর কোন উপায়েই আপন শক্তিকে আমরা জানিতে পারি না। এবং আপন শক্তিকে যতই কম করিয়া জানি আত্মার গৌরবও তত কম করিয়া বুঝি, যথার্থ আনন্দও তত অগভীর হইয়া থাকে।' এবং সেজন্যই তিনি বলেন : 'দুঃখের দ্বারা আত্মাকে অবজ্ঞা না করি, দুঃখের দ্বারাই যেন আত্মার সম্মান উপলব্ধি করিতে পারি। দুঃখ ছাড়া সে সম্মান বুঝিবার আর কোন পন্থা নাই।'

শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের দুঃখের নিবিড় উপলব্ধি ঈশ্বরের উপলব্ধিতে একাত্ম হয়ে গেছে। তিনি দুঃখের অধিদেবতাকে আহ্বান করে বলেন : 'হে রুদ্র, তোমারই দুঃখরূপ, তোমারই মৃত্যুরূপ দেখিলে আমরা দুঃখ ও মৃত্যুর মোহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তোমাকেই লাভ করি। নতুবা ভয়ে ভয়ে তোমার বিশ্বজগতে কাপুরুষের মত সংকুচিত হইয়া বেড়াইতে হয়—সত্যের নিকট নিঃসংশয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পারি না।'

প্রবন্ধের অন্তিম কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতেও দুঃখের দ্বারা আত্মার অপরাজেয় শক্তি লাভের কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ—দুঃখের মধ্য দিয়েই আত্মা সেই বলবীর্য লাভ করুক : 'দুঃখ আমাদের শক্তির কারণ হউক, শোক আমাদের মুক্তির কারণ হউক, এবং লোকভয় রাজভয় ও মৃত্যুভয় আমাদের জয়ের কারণ হউক।'

জীবনে দুঃখ অনিবার্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে জীবনে দুঃখ কাম্য। সমস্ত প্রবন্ধটিতে দুঃখ যে মানবজীবনে কেন কাম্য এবং দুঃখের কি ভূমিকা তাই তিনি গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে ব্যক্ত ও বিশ্লেষণ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত বিঘ্ন-বিপদ-দুর্যোগ প্রতিকূলতা ও মৃত্যুশোক থেকে উত্তীর্ণ হয়ে রবীন্দ্রনাথ এসময়ে যে আধ্যাত্মিক স্থিরলোকে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন—'দুঃখ' সেই লোকোত্তর অনুভূতির বিস্ময়কর প্রকাশ। এই রচনাটিকে সমগ্র 'গীতাঞ্জলি' পর্বের ভূমিকা বলা চলে। 'দুঃখ' প্রবন্ধটি রচনার আগে 'গীতাঞ্জলি'র মাত্র প্রথম সাতটি গান রচিত হয়েছিল। গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালিতে ইতস্ততঃ যে উজ্জ্বল মণিরত্নের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—'দুঃখ' সেই মণিরত্নের খনি।

জীবনের কোন দুঃখ, কোন আঘাত, কোন মৃত্যুই রবীন্দ্রনাথের কাছে নিষ্ফল হয়নি। তাই এ পর্বে এতগুলি মৃত্যুশোকের অভিজ্ঞতা থেকেও তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর অমৃতমন্ত্র। 'দুঃখ' সেই মন্ত্র—শুধু প্রবন্ধের আকারে ব্যক্ত।

ভ্রমসংশোধন

বিগত ১৩৯১-র আশ্বিন সংখ্যার ৪০৬ পৃষ্ঠার ২য় ও ৩য় পঙ্‌ক্তির 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টারে' স্থলে 'বেদান্ত সোসাইটিতে' পড়তে হবে। —সঃ
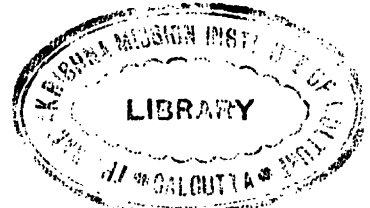
লহ প্রণাম

শ্রীসুধাংশুভূষণ নায়ক

শ্রীচৈতন্য নদের নিমাই শ্রীগৌরাঙ্গ তুমি।
তোমারে লভিয়া ধন্য হয়েছে জননী ভারতভূমি॥
বিশ্ব-ভুবনে তোমার মহিমা গাহে সহস্র জন।
যুগে যুগে আছ থাকিবে নিয়ত তুমি নরনারায়ণ॥
কঠোর কঠিন সন্ন্যাসী তুমি বিশ্বের বিস্ময়।
তোমার জীবনচরিতে তাহার মিলে কিছু পরিচয়॥
সন্ন্যাসিব্রতে শিথিলতা হেরি রাখনি তোমার পাশে।
লোকশিক্ষায় পরম ভক্তে তেয়াগিলে অনায়াসে॥
কৃষ্ণপ্রেমেতে অশ্রুবন্যা বহে যেন সুরধুনী।
পাঁচশো বছর হয়েছে অতীত আজো সে রোদন শুনি॥
শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ মাত্র মহাভাব তব জাগে।
ছুটিলে শ্রীধাম কোথা ব্রজভূম আর্তি ও অনুরাগে॥
সারাটা ভারত করিলে ভ্রমণ ত্রাণের মন্ত্র দিলে।
নামই কলিতে পরম ব্রহ্ম সার কথা জানাইলে॥
সর্বশাস্ত্র মন্থন করি পেলে সে পরম-ধন।
নামরসামৃতে সে কারণ তুমি ডুব দিতে সারাক্ষণ॥
শ্রীকৃষ্ণনাম কৃষ্ণের গান কৃষ্ণের কথা কও।
কোথা হা কৃষ্ণ এই ধ্যান রূপে নিয়ত মগ্ন রও॥
বিলাস-ব্যসন-আহার-নিদ্রা কিছুতেই নেই রুচি।
দীন-হীন-নীচ তোমার নিকট সবাই শুদ্ধ-শুচি॥
ভবযন্ত্রণা লাঘব করিতে জীবেরে করিতে ত্রাণ।
তোমার প্রকাশ মর্ত্য ভূমেতে বিতরিলে নাম গান॥
আনন্দ রস সঞ্চার হত চরণ পড়িত যেথা।
সে মধু পানের তীব্র আশায় ভক্ত ছুটিত সেথা॥
আচণ্ডালেরে নাম ধন দিলে আর্তেরে দিলে কোল।
নাচালে নাচিলে বাজিল ছন্দে করতাল ও শ্রীখোল॥
ঊর্ধ্ব বাহু গৌর তনিমা নয়নে অশ্রুধার।
অধরেতে নাম ভাবেতে বিভোর চিনিবে সাধ্য কার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তুমি ত্রেতায় পূজিত রাম।
দ্বাপরে কৃষ্ণ ভগবান লহ চরণে মোর প্রণাম॥

হ্যালির ধূমকেতু

ডক্টর ধ্রুব মার্জিত

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের একজন বিশেষজ্ঞ জ্যোতির্বিজ্ঞানীর হাতে যে-ধরনের উন্নত মানের দূরবীন পাওয়া সম্ভবপর হত, বিজ্ঞানের কল্যাণে আজকের ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের কোন একজন সাধারণ মানুষের পক্ষেও তার চেয়ে অনেক উন্নতমানের যন্ত্রপাতি জোগাড় করা সম্ভব। অবশ্য এবার ধূমকেতুটিকে খালি চোখেও দেখা গিয়েছে ১৯৮৬-র জানুআরি হতে এপ্রিল মাসের বিশেষ কয়েকটি দিনে এবং মে মাসের মধ্যে কিছুদিনের জন্য দেখা যাবে। বিশেষভাবে যে-সকল তারিখের সকাল ও সন্ধ্যায় আকাশে হ্যালির ধূমকেতুটিকে আমরা উজ্জ্বল রূপে দেখেছি এবং দেখব সে তারিখগুলি হল ১২ ডিসেম্বর (১৯৮৫), ১০ জানুআরি, ৯ ফেব্রুআরি, ১১ মার্চ, ৩ থেকে ১০ এপ্রিল এবং ৯ মে (১৯৮৬)। নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত হ্যালির ধূমকেতুটি পৃথিবীর আকাশে দশ ঘণ্টার জন্য উদিত হয়েছে এবং হবে। যতদিন যাবে ততই এই সময়ের পরিমাণ কমে আসতে শুরু করবে। তবে এবার এটি উত্তর ভারতের চেয়ে দক্ষিণ ভারতের আকাশেই বেশি করে প্রকটিত হবে। তাই স্বাভাবিক কারণেই এবার দক্ষিণ ভারতের লোকেরাই বেশি ভালভাবে এটিকে দেখবার সুযোগ পাবে বলে মনে হয়।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় হ্যালির ধূমকেতুর ঔজ্জ্বল্য এবার কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, যদিও এবার সে এসেছে পৃথিবীর অনেক কাছাকাছি। এবার পৃথিবী হতে তার সর্বনিম্ন দূরত্ব মাত্র ৩ কোটি কিলোমিটার। পৃথিবীর বেশি কাছে মানেই কিন্তু আবার সূর্য হতে বেশি দূর, তাই স্বাভাবিক কারণেই সূর্যের আলোকে আলোকিত ধূমকেতুর ঔজ্জ্বল্য অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে।

ধূমকেতুর আগমনের আকস্মিকতা এবং তার দর্শনবৈচিত্র্য মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করে। পুরাকাল থেকেই মানুষ ধূমকেতুকে অমঙ্গল ও দুর্ঘটনার অগ্রদূত বলে মনে করত। এখনও সে মনোভাব একেবারে যে কেটে গিয়েছে তা বলা যায় না। মহাভারতের 'ভীষ্মপর্বে' পাওয়া যায়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলাকালীন তখনকার আকাশে ধূমকেতু উদিত হয়েছিল এবং পণ্ডিতগণ ঐ ধূমকেতু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। "যে মহাঘোর ধূমকেতু পুষ্যা নক্ষত্র আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতেছে উহা পাণ্ডব এবং কৌরব পক্ষের সমূহ ক্ষতি করিবে।" বাঙালী জ্যোতির্বিজ্ঞানী রাধাগোবিন্দ চন্দ্র প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আকাশে দৃশ্যমান ঐ মহাঘোর ধূমকেতুটি অন্য কোন ধূমকেতু নয় সেটি সম্ভবত হ্যালির ধূমকেতু।

গ্রহ, উপগ্রহ বা নক্ষত্রদের মতো প্রতি নিয়ত কোন ধূমকেতু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না— এর দেখা পাওয়া যায় মাঝে মাঝে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে। এর কারণ হল ধূমকেতুদের সূর্য প্রদক্ষিণ করার কক্ষপথগুলি অত্যন্ত বেশি উপবৃত্তাকার (Elliptical)। কারুর উপবৃত্তটি দৈর্ঘ্যে ছোট, কারুর আবার খুবই দীর্ঘ। এই কারণেই কোন কোন ধূমকেতুর সূর্যপরিক্রমা করতে কয়েক বছর লাগে, কারুর বা লেগে যায় শতাব্দীর পর শতাব্দী। গ্রহগণ যে অভিমুখে সূর্যপরিক্রমা করে ধূমকেতুরা সূর্যপরিক্রম করে তার বিপরীত দিকে। আগে মনে করা হত ধূমকেতুরা বহির্বিশ্ব থেকে এসে সৌরজগতে প্রবেশ করে এবং ছুটতে ছুটতে আবার সৌরজগৎ পেরিয়ে যায়। পরে বুঝতে পারা যায় এ-ধারণা ভিত্তিহীন। বিজ্ঞানীরা এখন নিঃসন্দেহ যে,

ধূমকেতু মাত্রেই সৌরজগতের স্থায়ী বাসিন্দা, তারা কেউ বহির্বিশ্ব থেকে আসা কোন আগন্তুক নয়। আকাশে নৈসর্গিক বৈচিত্র্য আছে অনেক, কিন্তু উজ্জ্বল একটি ধূমকেতুর দৃশ্য যেমন মনোহর ও রোমাঞ্চকর তেমন আর কিছুই নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় নগ্ন চক্ষুতে দেখা যায় যে-সব ধূমকেতু তাদের আবির্ভাব পৃথিবীর আকাশে একান্তভাবেই বিরল। ব্যক্তিজীবনে একবার কি দুবার এ-ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভবপর বললে অত্যুক্তি হবে না। যদিও সৌরজগতে ধূমকেতুর সংখ্যা তা বলে কিছু কম নয়। আমরা জানি, সৌরজগতে একটি সূর্য ও ১০টি গ্রহ ছাড়াও আছে ৩১টি উপগ্রহ, ৩০ হাজার গ্রহাণু, ১০ হাজার ধূমকেতু ও অসংখ্য উল্কাপিণ্ড।

ধূমকেতুর উৎপত্তি বা জন্মরহস্য সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। এইবারের পথপরিক্রমার সময় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ধূমকেতুর জন্মরহস্য উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছেন কিনা আমার জানা নেই। এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ধূমকেতুর জন্মরহস্য সম্পর্কে যেটুকু জেনেছেন তাতে তিনটি কারণকে যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করা হচ্ছে: (এক) ধূমকেতুরা বৃহস্পতি, শনি ইত্যাদি বৃহৎ গ্রহগুলির দেহ হতে কোন কারণে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। (দুই) সূর্যপৃষ্ঠের বিক্ষোভের সময় এরা বিচ্ছুরিত হয়েছিল এবং (তিন) অন্য কোন নক্ষত্রের সূর্য সন্নিধানে আসার ফলে তাদের বিচ্ছিন্ন দেহাবশেষ থেকে ধূমকেতুদের উৎপত্তি। তবে সৌরজগতের বাইরে কোথাও এদের উৎপত্তি হওয়াও যে একেবারে অস্বাভাবিক নয় একথাও ইদানীং কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করছেন। পাঁচশো কোটি বছর আগে সৌরমণ্ডলের সংকোচন বা অন্য কোন সূর্যের সঙ্গে সংঘাতের সময় যেমন গ্রহাদি উৎপন্ন হয়েছিল—তেমনি ঐ সময়েই যে-সকল বস্তুপিণ্ড টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছিল তারাই বিভিন্ন আকারের ধূমকেতুর রূপ নেয় পরবর্তী কালে। বাতাস ও জল পৃথিবীর বুকে অবস্থিত পদার্থ সমূহের নানান পরিবর্তন এনেছে, কিন্তু ধূমকেতুতে জলীয় ও নানান ধরনের হাইড্রোকার্বন অণু থাকা সত্ত্বেও তার শরীরের মধ্যে থাকা অন্যান্য পদার্থসমূহের কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। তার সৃষ্টির দিনে সে যেমন ছিল আজও সে তেমনি আছে। ধূমকেতুর দেহগঠনকে তিনভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে: (এক) ধূমকেতুর মুণ্ড (Head) যেখানে থাকে তার নিউক্লিয়াস (Nucleus), (দুই) বহিরাবরণ (Body) যেখানে থাকে তার কোমা (Coma) এবং (তিন) এর পুচ্ছ (Tail)।

মুণ্ডটি একটি মাত্র পিণ্ড নয়। অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণা থেকে ২০-২৫ মিটার ব্যাস বিশিষ্ট সব-ধরনের আকারের লক্ষ লক্ষ শিলাখণ্ড একত্রে জড়ো হয়ে ধূমকেতুর মুণ্ডটি সৃষ্ট হয়। মুণ্ডের দৈর্ঘ্য হয় মাত্র কয়েক কিলোমিটার। হ্যালির ধূমকেতুর মুণ্ড তথা নিউক্লিয়াসের দৈর্ঘ্য খুবই কম—মাত্র ৫ কিলোমিটার। মুণ্ডটি ঘিরে থাকে, অত্যন্ত হাল্কা গ্যাস—সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণিকার বাষ্পীভূত হাইড্রোকার্বন দ্বারা গঠিত একটি নীহার আবরণ। হিসাব অনুযায়ী হ্যালির ধূমকেতুর মুণ্ডের ভর (mass) হল তিন কোটি টন। মুণ্ডের ঘনত্ব (density) হল এক গ্রাম প্রতি ঘন সেন্টি-মিটারে। সূর্য থেকে বহু দূরে ধূমকেতুকে বহু বছর যাবৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকতে হয় বলে সেখানকার নিদারুণ ঠাণ্ডায় তার দেহের অভ্যন্তরের বিভিন্ন গ্যাসীয় বস্তুগুলি যেমন জলীয় কণিকা (H_2O), সাইনাইড গ্রুপের হাইড্রোকার্বন যৌগগুলি (HCN, CH_3CN) ইত্যাদি অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় জমে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে কক্ষপথের স্বাভাবিক পরিক্রমায় ঐ ধূমকেতু যখন

সূর্যের কাছাকাছি এসে পৌঁছায় অর্থাৎ তিন A. U. (এক A. U.=১৫০,০০০,০০০ কিলোমিটার) দূরত্বের মধ্যে এসে পৌঁছায় তখন তার দেহের অভ্যন্তরের জমাট বাঁধা কঠিন বরফের স্তূপ বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। যদিও আমরা জানি উত্তাপের সাহায্যে বরফকে জলে পরিণত করার পর সেই জলকে আরও উত্তাপ দিলে তা ক্রমশ বাষ্পে রূপান্তরিত হয়; কিন্তু হ্যালির ধূমকেতুর ক্ষেত্রে একাদিক্রমে ৭৪ বছরের বেশি সময় দারুণ শৈত্যের মধ্যে কাটিয়ে হঠাৎ করে ৪ বা ৫ মাসের জন্ম তীব্র গতিতে সূর্য সান্নিধ্যে এসে পড়ে সূর্যের দারুণ উষ্ণতার মুখোমুখি হওয়ায় তার দেহের ঘনীভূত কঠিন বরফ জলে রূপান্তরিত হবার আর সুযোগ পায় না—সরাসরি বরফগুলি বাষ্পে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকে রসায়নবিদ্‌গণ 'সাবলিমেশন' (Sublimation) বলে থাকেন। আইওডিন (Iodine) কণিকাগুলিকে কঠিন অবস্থায় সামান্য উত্তপ্ত করলেই সেগুলি তরল আইওডিন না হয়েই সরাসরি আইওডিনের বাষ্পে রূপান্তরিত হয়—এটা রসায়নাগারে নবীন বিজ্ঞানিগণ সহজেই পরীক্ষা করে দেখাতে পারবেন। ধূমকেতুর দেহের সেই বাষ্প পরবর্তী পর্যায়ে সূর্যের আরও কাছাকাছি এসে পড়লে তা আয়নে রূপান্তরিত হয়। বিভিন্ন যৌগের এই আয়নিত (Ionised) অণুগুলির উপর সূর্যের আলোক এসে পড়লে ধূমকেতুর পুচ্ছের দিকটা দৃশ্যমান হয় এবং বৈচিত্র্যময় এক জ্যোতিষ্করূপে আমাদের আকাশে প্রকটিত হয়।

ধূমকেতুর বহিরাবরণ (Body) ঘনত্বের দিক থেকে তার মুণ্ডের ঘনত্বের চেয়ে অনেক কম। এই অংশে কঠিন বস্তুর অস্তিত্ব প্রায় থাকে না বললেই চলে। ঘনীভূত নানান শ্রেণীর গ্যাসীয় পদার্থ দিয়েই এটি তৈরি। বৈচিত্র্যের দিক থেকে গ্যাসগুলিও উল্লেখযোগ্য, যেমন—কার্বন মনোঅক্সাইড্ (CO), কার্বনডাইঅক্সাইড্ (CO_2), জলীয় কণিকা (H_2O), নাইট্রোজেন (N_2), হাইড্রোঅক্সাইড্ (OH) যৌগ এবং সাইনোজেন হাইড্রোকার্বন (HCN_2 CH_3CN) ইত্যাদি। ধূমকেতুর বহিরাবরণে দুইটি স্তর থাকে, একটি ইমিগ্রেটর স্তর (Imigrator layer) ও অপরটি ছিদ্রযুক্ত বাইরের স্তর (Porous Outer layer)। ধূমকেতুর কোমা সন্নিবিষ্ট এই অংশটির দৈর্ঘ্য সাধারণত হয় বেশ কয়েক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত।

ধূমকেতুর পুচ্ছ (Tail) হল তার সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় অংশ। এর দৈর্ঘ্য কয়েক কোটি কিলোমিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। সবচেয়ে বড় অবস্থায় ধূমকেতুর লেজটির দৈর্ঘ্য ৭·৫ কোটি কিলোমিটার। ধূমকেতু যত সূর্য থেকে দূরে চলে যাবে ততই তার পুচ্ছটির দৈর্ঘ্য ছোট হয়ে আসবে এবং সেই কারণে সূর্য হতে ধূমকেতুর সর্বোচ্চ দূরত্বে তার আকার প্রায় গোলাকার—লেজের অস্তিত্ব মাত্র থাকে না। অনুরূপভাবে ধূমকেতু যত সূর্যের কাছে আসতে থাকবে তার পুচ্ছের দৈর্ঘ্যও ততই বৃদ্ধি পাবে এবং সবচেয়ে সূর্যের কাছাকাছি অঞ্চলে থাকার সময় তার পুচ্ছটি অনেক সময় দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—একটি ধূলিকণা অধ্যুষিত পুচ্ছ যেটির আকার বাঁকা তরবারির মতো অনেকটা এবং অপরটি প্লাজমা আয়ন দ্বারা গঠিত পুচ্ছ যেটির আকার সোজা পিছনদিকে প্রসারিত। পৃথিবীর আকাশ হতে ধূলিকণা সম্বলিত (Dust Tail) এবং প্লাজমা আয়ন দ্বারা গঠিত (Plasma Ion Tail) এই দুটিকেই দেখা যায়। সূর্যের কাছাকাছি এলেও দেখা গেছে সকল ধূমকেতুর পুচ্ছ নাও থাকতে পারে। মুণ্ডের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণিকাগুলি ও গ্যাসীয় অণুগুলি সূর্যরশ্মির তাপে এবং চাপে ধূমকেতুর গাত্র থেকে পুচ্ছরূপে বেরিয়ে আসে

এবং সেই সকল কণিকার উপর প্রখর সূর্যালোক প্রতিফলিত হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ মে তারিখে পৃথিবী তার কক্ষপথে ভ্রমণ করা কালীন একবার হ্যালির ধূমকেতুর পুচ্ছ ভেদ করে চলে গিয়েছিল, কিন্তু তাতে ভূপৃষ্ঠের কোন ক্ষতি হয়নি। বস্তুত ধূমকেতুর পুচ্ছের এবং গাত্রের পদার্থ এতই বিরল যে, কয়েক লক্ষ মাইল দীর্ঘ পুচ্ছের ভর (mass বা weight) মাত্র কয়েক গ্রাম হয়ে থাকে। তবে ধূমকেতুর মুণ্ডের সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষ হলে অবশ্যই কিছু ধ্বংসের চিহ্ন পৃথিবীগাত্রে থেকে যাবে। আমরা জানি ধূমকেতুর পুচ্ছ সর্বদাই সূর্যের বিপরীত দিকে প্রলম্বিত থাকে এবং তার মুণ্ডটি সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে। এই বিচিত্র ভঙ্গিতেই সর্বদা থেকে ধূমকেতু তার ঘূর্ণনের কার্যটি সমাধা করে থাকে। হ্যালির ধূমকেতুর ঘূর্ণনের গড় সময় ১০·৩ ঘণ্টা। ধূমকেতুকে সর্বদা পৃথিবীর আকাশে পূর্ব বা পশ্চিম দিগন্তে সূর্যের সহযাত্রী হিসাবে দেখা যায় এবং সূর্যের যত কাছে আসবে এটির গতিবেগও তত বৃদ্ধি পাবে, আর সূর্য থেকে যত দূরে চলে যাবে ততই এর কক্ষপথে চলার গতি ধীর হয়ে আসবে। এই সকল কারণের জন্যই বিজ্ঞানীরা তাঁদের পর্যবেক্ষণকালে দেখতে পান—হ্যালির ধূমকেতু তার প্রকাণ্ড পুচ্ছটিকে নিয়ে প্রাণপণ ছুটতে ছুটতে পৃথিবীর আকাশে কিছুদিন উদিত হয়ে সূর্যকে একটি চক্কর দিয়ে আবার তীব্রবেগে প্রস্থান করার কালে তার পুচ্ছটিকে গুটিয়ে নিচ্ছে।

ধূমকেতুর পুচ্ছ সম্পর্কে সম্প্রতিকালে বিজ্ঞানীরা নতুন কয়েকটি তথ্য পাচ্ছেন, যার ফলে তাঁরা মনে করছেন, সৌরমণ্ডলের জন্মের সময়কার বিবর্তনের বিবরণ হয়তো দিতে পারবে এই ধূমকেতু। অনেকের বিশ্বাস পৃথিবীর আবহমণ্ডল সৃষ্টি আর পৃথিবীর প্রথম জীবনের স্ফুরণের জন্য প্রয়োজনীয় জটিল অণু সৃষ্টির মূলেও ধূমকেতুর প্রত্যক্ষ অবদান আছে। ধূমকেতুর পুচ্ছদেশ এত দীর্ঘ যে, তার প্রান্তসীমা বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহের সংস্পর্শে আসতে সক্ষম এবং প্রান্তসীমার বস্তু কণিকার উত্তাপ, চাপ, ঘনত্ব ইত্যাদি জীবনগঠনের উপাদান হিসাবে অনুকূল। এইজন্য আজকাল বিজ্ঞানীরা এও ভাবছেন যে, ধূমকেতুর পুচ্ছদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। কাকতালীয় হলেও এটি পরিসংখ্যানগতভাবে সিদ্ধ যে, ধূমকেতু যে বছর যে গোলার্ধের উপর দিয়ে অথবা ঐ গোলার্ধের যে-সকল দেশের উপর দিয়ে খুব কম দূরত্বের ব্যবধানে অতিক্রম করে গেছে সে বছর সেই সকল দেশে কোন না কোন রোগ মহামারীরূপে প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্যে প্লেগ, কালাজ্বর, কলেরা ইত্যাদি মারাত্মক রোগগুলির প্রকোপ ধূমকেতু দেখা দেওয়ার বছরগুলিতে বারবার দেখা গেছে। প্রথম যিনি ধূমকেতুটিকে পর্যবেক্ষণ করে তাকে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে মানুষের কাছে প্রকাশিত করেন—সাধারণত তাঁর নামেই ধূমকেতুর নামকরণ হয়। বিজ্ঞানীদের নামানুসারে ধূমকেতুর নামকরণের কয়েকটি উদাহরণ হল—এঙ্কি (Enkee), হল্মস্ (Hallmos), ব্রারসেন (Brarsen), হ্যালী (Halley), ব্যায়েলা (Biella), হুইপল্ (Whipple), অবার্স (Albers), ককগিয়া (Coggia) ইত্যাদি। এমন অনেক ধূমকেতুও আছে যাদের পৃথিবী হতে প্রথম দেখা গিয়েছিল তিন হাজার বছর আগে এবং দ্বিতীয়বার ঐ একই ব্যবধানে আবার দেখা যাবে। ধূমকেতুর উপবৃত্তাকার গতিপথে চলাচল করার সময় সর্বদাই তার দেহের কিছুটা ক্ষয় বা অবলুপ্তি ঘটছে—ফলে যখন কোন ধূমকেতু তার যাত্রাপথ দিয়ে চলে যায় তখন তার পিছনে কক্ষপথ

জুড়ে রেখে যায় বিস্তৃত উল্কাপিণ্ড। পৃথিবী প্রতি বছর এপ্রিলের শেষে ও মে মাসের প্রথমে হ্যালির ধূমকেতুর কক্ষপথ অতিক্রম করে বলে তার পৃষ্ঠে বহু উল্কাপাত হয়। কুম্ভরাশির পঞ্চম তারকার নিকট থেকে সাধারণত ঐ উল্কাপাত ঘটে থাকে বলে ঐ উল্কাগুলিকে কুম্ভিক উল্কা (Agunarids) বলা হয়।

হ্যালির ধূমকেতুর নামকরণ যাঁর নামে সেই প্রখ্যাত বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার এডমণ্ড হ্যালি (Sir Edmound Halley, 1656—1742) সম্পর্কে কিছু জানা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। হ্যালি অত্যন্ত ধনীপুত্র এবং মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ও মহান আইজ্যাক্ নিউটন দুজনে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। হ্যালি ইংল্যাণ্ডের Royal Grenwich Observatory-র দ্বিতীয় "রাজকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী"র (2nd Astronomer Royal) পদ অলংকৃত করেন এবং ঐ পদে থাকাকালীন তিনি ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে দৃষ্ট একটি উজ্জ্বল ও বৈচিত্র্যময় ধূমকেতুকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পান। তিনি গাণিতিক উপায়ে তখনই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ঐ ধূমকেতুটি আবার ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে পৃথিবীর আকাশে দৃষ্টিগোচর হবে। বলাবাহুল্য তাঁর সে ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল—তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ হ্যালি তার ১৬ বছর আগেই ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁর সফল গাণিতিক গণনাকে সম্মান জানিয়ে তাঁর নামে ঐ ধূমকেতুর নাম করা হয়েছিল।

ধূমকেতুদেরও মৃত্যু হয়। তার কক্ষপথ পরিক্রমা করা কালীন তার দেহ হতে নানান ধরনের বস্তু বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। এইভাবে দেহের ক্ষয় হতে হতে এক সময় তাকে আর ধূমকেতুরূপে চেনা যায় না—মনে হয় উল্কাপিণ্ড যেন। এ ব্যাপারে অস্ট্রেলীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ব্যায়েলা (Biella) কর্তৃক আবিষ্কৃত—ব্যায়েলা ধূমকেতুর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এর সূর্য-প্রদক্ষিণ কাল হল ৬ বছর ৯ মাস। পূর্ণাবয়বে অর্থাৎ মুণ্ড হতে পুচ্ছ পর্যন্ত সবটুকু নিয়ে তাকে আকাশে দেখা যায় ১৮৩২ ও ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। পুনরায় ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সে যখন সূর্য সকাশে এল তখন তার আর পুচ্ছ নেই—আকৃতি তখন তার অনেকটা মোচার মতো হয়ে গেছে; তখনই এটি প্রকৃতপক্ষে ভেঙে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। এরপর ১৮৫২-তে সে যখন আবার ফিরে এল তখন তার একটি মাত্র খণ্ডকে প্রথম দেখা গেল এবং অপর খণ্ডটিকে দেখা গেল বহু পিছনে পিছনে আসতে ঐ একই কক্ষপথ ধরে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ঐ দুটি খণ্ডের কোনটিকেই আর দেখা গেল না। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দেও আর দেখা গেল না —পরে ১৮৭২-এর ২৭ নভেম্বর তারিখে তার ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে পৃথিবীর দেখা হল তার পূর্ব কক্ষপথে উল্কাপাতের মাধ্যমে। সেই থেকে ব্যায়েলার মৃত ধূমকেতুর কক্ষপথ দিয়ে যখনই পৃথিবী তার কক্ষপথে অতিক্রম করে তখন প্রতি বছরই ঐ তারিখে উল্কারূপে আমরা তার সাক্ষাৎ লাভ করে আসছি। এইভাবেই নানান জটিল মহাজাগতিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে একটি ধূমকেতুর মৃত্যু হয়—এবং জন্ম নেয় নতুন নতুন হাজার হাজার উল্কাপিণ্ড।

সূর্যের আকার এতই বিশাল যে, পার্থিব জ্ঞান নিয়ে, তার আকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করা প্রায় দুঃসাধ্য। তার গঠনপ্রণালীও খুব জটিল। এর উপরিভাগের তাপমাত্রা ৪৫০০° সেন্টিগ্রেড হতে ৬০০০° সেন্টিগ্রেড। এর ওজন এতই বেশি যে, ৫০০ কোটি বছর যাবৎ প্রতি সেকেণ্ডে ৫৬ কোটি টন করে তার দেহের ওজন কমলেও সে আরও ৫০০ কোটি বছর ধরে অবলীলাক্রমে একই রকম তেজ ও দীপ্তি নিয়ে ভাস্বর থাকবে। এই এত

বড় একটি তেজোদীপ্ত জ্যোতিষ্ক তীব্রগতিতে তার নিজের অক্ষের চারপাশে ঘুরছে—আর তার এই আহ্নিক গতি সমাপ্ত করতে সময় লাগে মাত্র ২৬টি পার্থিব দিন। এই তীব্রগতিতে সূর্য ঘুরবার ফলে সূর্যকে কেন্দ্র করে এক বিশাল ও তীব্রগতিময় কুণ্ডলী আকারের সৌর হাওয়ার (Spiral Solar Wind) সৃষ্টি হয়। এই সৌর হাওয়া প্রকৃতপক্ষে আয়নিত কণিকাদের স্রোত (Stream of charged particles) যা প্রতি সেকেণ্ডে ৪০০ কিলোমিটার গতিতে কুণ্ডলী (Spiral) আকারে সূর্যকে ঘিরে ক্রমবর্ধমান ব্যাসে বৃদ্ধি পেতে পেতে সূর্য থেকে ক্রমশ দূরের দিকে প্রসারিত হতে থাকে। সৌর হাওয়া ধূমকেতুর পুচ্ছদেশে অবস্থিত আয়ন কণিকাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে যদিও এই সৌর হাওয়ার ঘনত্ব অত্যন্ত কম, মাত্র ৫টি থেকে ১০টি ইলেকট্রন ও প্রোটন প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে।

এ পর্যন্ত হ্যালির ধূমকেতুকে নথিবদ্ধভাবে দেখা গেছে মোট ২৯ বার। সর্বপ্রথম দেখা গেছে ২৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। হ্যালির ধূমকেতুকে খুব কম সময়ের মধ্যে ঘুরে এসে পৃথিবীর আকাশে উদিত হতে দেখা গেছে ১৮৩৫ ও ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময় ৭৪.৪ বছর ব্যবধানে। সবচেয়ে বেশি সময়ের ব্যবধানে ঘুরে এসে আবার পৃথিবীর আকাশে দৃশ্যমান হয়েছিল ৪৫১ ও ৫৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ ৭৯·২৫ বছর বাদে। এ পর্যন্ত হ্যালির ধূমকেতু পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে যে দূরত্বে এসেছিল তা হল ০·৩৩ AV অর্থাৎ প্রায় ৪৯৫০০০০ কিলোমিটারের কাছাকাছি ৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ এপ্রিল তারিখে। সবচেয়ে উজ্জ্বল অবয়বে তাকে দেখা গিয়েছিল ঐ ৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দেই এবং তখন তার ঔজ্জ্বল্যের মাত্রা ছিল ৩·৫ দীপ্তি-মাত্রা।

এ পর্যন্ত হ্যালির ধূমকেতুকে যে ২৯বার পৃথিবীর আকাশে লক্ষ্য করা গেছে সে বছরগুলি হল :

২৪০	খ্রীঃ পূঃ	চৈনিক বিজ্ঞানিগণ কর্তৃক পরিলক্ষিত।
১৬২	„	দেখার কোন নথিপত্র পাওয়া যায়নি
৮৭	„	চৈনিক বিজ্ঞানিগণ কর্তৃক পরিলক্ষিত।
১১	„	ঐ
৬৬	খ্রীষ্টাব্দ	জেরুজালেম ও রোমের জ্যোতির্বিজ্ঞানিগণ কর্তৃক পরিলক্ষিত।
১৪১	„	পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভয়াবহ প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল।
২১৮	„	চীনে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল।
২৯৫	„	চৈনিক বিজ্ঞানিগণ কর্তৃক পরিলক্ষিত।
৩৭৪	„	ঐ
৪৫১	„	ইউরোপে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু।
৫৩০	„	ইউরোপে ভয়াবহ প্লেগরোগে বহু লোকের মৃত্যু।
৬০৭	„	যুদ্ধে ইউরোপে স্লাভিকদের জয়লাভ। স্লাভিকদের রাজত্ব কায়েম।
৬৮৪	„	চীনে প্লেগ রোগের মহামারী।
৭৬০	„	বিশ্বজুড়ে নিদারুণ শৈত্য প্রবাহ বইতে থাকে।
৮৩৭	„	ফরাসী সম্রাট লুই-এর মৃত্যু।
৯১২	„	জাপানী বিজ্ঞানিগণ দ্বারা পরিলক্ষিত। ইউরোপে যুদ্ধ।
৯৮৯	„	চৈনিক বিজ্ঞানিগণ লক্ষ্য করে।
১০৬৬	„	হেস্টিংসের যুদ্ধে উইলিয়াম স্যাক্সনদের পরাজিত করেন।
১১৪৫	„	ভ্যাটিকান থেকে পোপ ইউজিনস্ (৩য়) মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে যুদ্ধে আহ্বান করেন।

১২২২	খ্রীষ্টাব্দ	চেঙ্গিস খানের অভ্যুদয়—যার হাতে দশ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়
১৩০১	„	ইউরোপের ভয়াবহ যুদ্ধে প্রচুর জীবন নাশ।
১৩৭৮	„	ইউরোপের এবং চৈনিক বিজ্ঞানী দ্বারা পরিলক্ষিত।
১৪৫৬	„	খ্রীস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে দারুণ সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ।
১৫৩১	„	ইউরোপের বিজ্ঞানিগণ অনেক তথ্য পান ধূমকেতুটি সম্পর্কে।
১৬০৭	„	প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী কেপলার দ্বারা পরিলক্ষিত।
১৬৮২	„	বৃটিশ বিজ্ঞানী এডমণ্ড হ্যালি (১৬৫৬—১৭৪২) দ্বারা পরিলক্ষিত।
১৭৫৮	„	হ্যালীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যথা সময়ে ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ করা হয়। এবং ধূমকেতুর নামকরণ করা হয় বিজ্ঞানী হ্যালির নামে।
১৮৩৫	„	মিশরে কালো মৃত্যুর (Black Death) কবলে বহু প্রাণ নাশ হয়।
১৯১০	„	এই প্রথম হ্যালির ধূমকেতুর আলোকচিত্র গ্রহণ করা সম্ভব হয়।
১৯৮৫	„	বিংশ শতাব্দীতে দ্বিতীয়বার পৃথিবীর আকাশে দৃশ্যমান হয়েছে। বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানীরা তাঁদের সর্বশক্তি দিয়ে এর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

মন্দিরময় এই উপত্যকা

ডক্টর শান্তিকুমার ঘোষ

চির সবুজ পাহাড়ের কোলে
মন্দিরময় এই উপত্যকা
আমার চেনা তরু নারকেল পাম ঝাউ
প্রিয় ফুল জবা করবী গুলঞ্চ
হলুদ ঠোঁটের পাখি, ময়ূর, রঙ্গিল মাছ।

রেনট্রি ঘন হয়ে ঘিরেছে এই কিনার
ছড়িয়ে দিয়েছে আঁকাবাঁকা তার ডালপালা
মেঘ ঝুঁকে রইল পাহাড়ের মাথায়
এখুনি ভেঙে পড়বে বৃষ্টিধারায়
তার আগে নিথর হিল্লোল য়ুক্যালিপ্টাস পাতার ফাঁক দিয়ে
হরিৎ ঘাসের উপর টুপটাপ খসে পড়ছে কুসুম।

আগ্নেয় গিরি উৎক্ষেপ করেছে কবে এই উর্বর মাটি
পারিজাত মন্দার ফুটিয়েছে দিগন্ত ঢেকে
আনারস কদলী আম নুয়ে পড়ে ভারে ভারে
দেবতা দেবেন তাঁর দৃষ্টি
মানুষ করবে গ্রহণ
কৃতজ্ঞতার সঙ্গে।

তীর্থক্ষেত্র ঃ সহস্রদ্বীপোদ্যান

স্বামী অলোকানন্দ

'সহস্রদ্বীপোদ্যান' ও 'দেববাণী' শব্দ দুটি স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীপাঠকমাত্রেরই জানা আছে। কি কাব্যিক সুসমামণ্ডিত শব্দ দুটি! এই শব্দ দুটির মধ্যে জড়িয়ে আছে বিবেকানন্দ-জীবনের বহু স্মৃতি, যে-স্মৃতি আজকের পৃথিবীর মানুষকেও দেবভাবে উদ্দীপিত করে।

নেতা, বক্তা বিবেকানন্দকে আমরা বহুতর ক্ষেত্রে দেখি, কিন্তু সহস্রদ্বীপোদ্যানে বিবেকানন্দের রূপ অতীব মাধুর্যমণ্ডিত, স্নিগ্ধ চন্দ্রের ন্যায় শীতল, নীরব শিশির বিন্দুর মতো নবজীবনের উন্মেষ ঘটানোয় রত। নবজীবন গঠনের জন্য শিষ্য-শিষ্যাদের যে উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন তা-ই পরবর্তিকালে 'দেববাণী' গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। এ-ছাড়া তিনি এখানে ভারতীয় কাজের ভাবী পরিকল্পনা ও সন্ন্যাসজীবনের অমূল্য সম্পদ 'সন্ন্যাসীর গীতি' রচনা করেন। ডঃ ম্যালকম উইলিস লিখেছেন: "আমেরিকা বাসকালের মধ্যে নিউইয়র্কের এই সহস্র-দ্বীপোদ্যানেই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। বিখ্যাত আমেরিকান শিষ্যা সিস্টার ক্রিস্টিনকে শিক্ষাদান ও ভারতীয় কাজের ভাবী পরিকল্পনাও এখানেই তাঁর মনে উদিত হয়। এখানকার সেণ্ট লরেন্স নদীর তীরে তিনি কাশীপুর-জীবনের ন্যায় নির্বিকল্প সমাধির আনন্দ লাভ করেছিলেন। 'সন্ন্যাসীর গীতি' রচনা ও 'দেববাণী' রূপে প্রাপ্ত উপদেশাবলীও এখানেই প্রদত্ত হয়।"[১] সুতরাং এই সহস্রদ্বীপোদ্যান বিবেকানন্দজীবনের যে এক বিশেষ অধ্যায় এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শিকাগো বক্তৃতার পর থেকেই পাশ্চাত্য সমাজে স্বামীজীর নাম বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়ে। নানা পত্র-পত্রিকা, প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতি প্রভৃতি থেকে আমরা এ-বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ জানতে পারি। এইভাবে ১৮৯৪-র শেষভাগে স্বামীজী যখন ব্রুকলিন-এ 'হিন্দুধর্ম' সম্পর্কে বক্তৃতা দেন তা শ্রোতৃবর্গকে এতই মুগ্ধ করে যে, তাঁরা সেখানে একটি নিয়মিত ক্লাসের আবেদন করেন। তাঁদের অনুরোধে স্বামীজী সেখানে কতকগুলি ক্লাস করেন। অবশেষে স্বামীজী সেখান থেকে ফিরে যখন নিউইয়র্কে একটি লজ বাড়িতে বাস করতে থাকেন তখন ব্রুকলিনের শ্রোতাদের কেউ কেউ তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য সেখানে আসেন। ছোট লজ বাড়িতে স্থান সংকুলান না হলেও উৎসুক ছাত্রেরা তাঁর মুখ থেকে উপদেশ শুনবার জন্য কত কষ্ট সহ্য করতেন তার বর্ণনা আমরা পাই এস. ই. ওয়াল্ডোর লেখায়। তিনি লিখছেন: "লজ বাড়ির ত্রিতলের একটি অতি সাধারণ কক্ষ। যখন ক্লাসের সদস্যসংখ্যা বেড়ে চেয়ার ও একটি লাউঞ্জকে ছাড়িয়ে গেল তখন ছাত্রেরা কেউ কেউ তরকারি কাটার টেবিলে, কেউ ঘরের কোণের মার্বেল পাথরের ওয়াশবেসিনে এবং অনেকে মেঝেতে বসত।"[২]

স্বামীজী যখন এমন একটি উৎসাহী ছাত্রছাত্রীর দল পেলেন যাঁরা ভারতীয় সনাতন সত্যকে জানতে চান, তখন তিনিও শারীরিক কষ্ট সত্ত্বেও ভারতীয় বৈদিক সত্যকে একান্তে শিষ্যদের মনে গেঁথে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হলেন। এমন কি এজন্য যখন আর্থিক অনটন দেখা দিল তখন

১ Historical Sketch of Vivekananda Cottage at Thousand Island Park, New York—Dr. Malcom Willis, *Vedanta Keshari*, August 1963.

২ *Inspired Talks*-এর Introductory Narration, (3rd edition), P. 7

স্বামীজী কতকগুলি ঐহিক বিষয়ের উপর বক্তৃতা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতেন ও সেই অর্থে ধর্মীয় ক্লাসটির ব্যয় নির্বাহ করেন।

পুরো দুটি মাস এইভাবে কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত স্বামীজীর বিশ্রামের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু অনুরাগী ছাত্রবৃন্দ পরবর্তী গ্রীষ্ম ঋতুতেও ক্লাস চান। এই গ্রীষ্মের সময়ে অনেকেই শহর ছেড়ে চলে যাবেন—এ আশঙ্কা কেউ কেউ তুললেন। অবশেষে সব সমস্যার সমাধানকল্পে যে মহীয়সী মহিলা এগিয়ে এলেন তাঁর নাম মিস এম. এলিজাবেথ ডাচার। সেন্ট্ লরেন্স নদীর মধ্যে সহস্রদ্বীপোদ্যানে মিস ডাচারের ছোট একটি বাড়ি ছিল। এই নির্জন বাড়িতেই স্বামীজী ১৮৯৫-র ১৫ জুন থেকে ৬ অগস্ট পর্যন্ত বাস করেন।

সেন্ট্ লরেন্স নদীর উপত্যকায় এই বিশাল দ্বীপটি অবস্থিত। মনোরম দ্বীপটি হরিৎবর্ণের বৃক্ষরাজি দ্বারা ঘেরা। দ্বীপটির বর্ণনাপ্রসঙ্গে ম্যালকম উইলিস বলেছেন :

"গ্রেট লেক থেকে কুইবেকের দিকে উত্তর-বাহিনী সেন্ট লরেন্স নদী যেখানে আটলান্টিকে মিশেছে সেখানেই তুষারযুগে সহস্রাধিক (যা ছিল প্রকৃতপক্ষে সতেরশ-র বেশি) দ্বীপ নিয়ে একটি দ্বীপপুঞ্জ গড়ে উঠেছিল। লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে কিভাবে এই হিমবাহসমষ্টি পৃথিবীর অন্তস্তল আলোড়িত করেছিল, কারণ এখনও বহু শিলাখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে। বিবেকানন্দ যে বাড়িতে থাকতেন তার পশ্চাদ্‌ভাগেও ঐরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে। সহস্রদ্বীপপুঞ্জের প্রাকৃতিক দৃশ্য এত সুন্দর ছিল যে, স্মরণাতীতকাল থেকেই রেডইণ্ডিয়ানরা তাদের মৃতদেহ সংকারের জন্য এখানে আসত। তারা এই স্থানটিকে বলত মহান্ আত্মার উদ্যান।"•

এমন সুন্দর নির্জন উপত্যকাপ্রদেশে স্বামী বিবেকানন্দ পেয়েছিলেন বিশ্রাম ও ধ্যানের উপযুক্ত পরিবেশ। লোকজনের ভিড় নেই। সম্পূর্ণ জনকোলাহল মুক্ত হিমালয়ের নির্জনতায় তাঁর মন সর্বদা অন্তর্মুখীন হয়ে থাকত। অধ্যাত্ম-ভাবে সর্বদা ভরপুর হয়ে থাকতেন তিনি।

মিস্ মেরী এলিজাবেথ ডাচার ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্কের Oswego-তে এক দরিদ্র কৃষক-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও আবাল্য চিত্রাঙ্কনের ঝোঁক ছিল তাঁর। তিনি নিউইয়র্কের 'আর্ট স্টুডেন্টস লীগ' ও 'অ্যাকাডেমি অব ডিজাইন'-এ আর্ট-বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সহস্রদ্বীপোদ্যানে মা ও বোনকে নিয়ে ডাচার আসেন ও একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। এই বাড়িটিই ১০ বৎসরের ব্যবধানে স্বামীজীর বাসের ফলে তীর্থত্ব লাভ করে। কে জানত এখানে একদিন ভারতীয় অধ্যাত্ম মেঘমালা স্নিগ্ধ শীতল ভাব-বর্ষণ করবে! ধন্য ডাচার!

ডাচার আচার্যের সুবিধার জন্য পুরানো বাড়িটির পাশে সমপরিমাণে একটি পৃথক কক্ষ সংযোজন করেন, যা স্বামীজীর জন্যই নির্মিত হয়েছিল। পুরানো কক্ষটি ছিল উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের আবাসগৃহ। পাহাড়ের উপর নির্মিত এই বাড়িটি স্বামীজীর খুব পছন্দ হয়েছিল। মাত্র ১২ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে স্বামীজীর এই নির্জনবাস ও 'শৈলোপদেশ' দান। এত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এই দ্বাদশজন ভাগ্যবানের নাম নিরূপণ করা শক্ত। আবার দ্বাদশজনের মধ্যে এককালে ক্লাসে দশজনের বেশি কখনও থাকতেন না বলে মিস্ ওয়াল্ডোর বিবরণ থেকে জানা

• Historical Sketch of Vivekananda Cottage at Thousand Island Park, New York—Dr. Malcom Willis, *Vedanta Keshari*, August 1963

যায়। তবুও যা জানা যায় তা হল: মিস্ ডাচার, মিস্ ওয়াল্ডো, মিসেস ফাঙ্কে, মিস্ ক্রিস্টিন গ্রীনস্টাইডেল, মিস্ রুথ এলিস্, ডক্টর উইট্, মিষ্টার লিওঁ ল্যাণ্ডস্‌বার্গ, স্টেলা (একজন অভিনেত্রী), একজন ফরাসী মহিলা, এবং মেরী লুই। ম্যালকম উইলিস-এর লেখা থেকে আরও জানা যায় যে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর রাইটও ছিলেন।"[৪]

যাই হোক মিস্ ডাচারের এই পুণ্যনিকেতনে সাত সপ্তাহব্যাপী অধ্যাত্মতত্ত্বের ধারা বয়ে চলে। সেখানে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপরে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। ধ্যানোত্থিত স্বামীজী যেদিন যেভাবে পূর্ণ থাকতেন সেই বিষয়ে বলে যেতেন। আবার ঐ বলার মাঝে মাঝেই ভাবস্থ হয়ে যেতেন। গীতা, উপনিষদ্, ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী, নারদীয় ভক্তিসূত্র, বাইবেল —এই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থের কোন একটি থেকে বিষয় নির্বাচন করে চলত ক্লাস। এই ক্লাসের সময় যদিও দুঘণ্টা নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু ভাবগাম্ভীর্যে কখন কখন তা ছাড়িয়ে যেত। আর তা শুধু ক্লাস ছিল না, যেন ডুবুরীর মুক্তাসংগ্রহের মতো ধ্যানলব্ধ সত্যগুলিকে অধ্যাত্মদেবতার অন্তরের গভীরদেশ থেকে আহরণ করে তাপিত উন্মুখ জীবকে বিতরণ করত। এই কালের অবস্থা মিস্ ওয়াল্ডোর লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি:

"এই অপূর্ব মায়া-রাজ্যে আমরা আচার্যদেবের সহিত সাতটি সপ্তাহ দিব্যানন্দে তাঁহার অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বার্তাসমন্বিত অপূর্ব রচনাবলী শ্রবণ করিতে করিতে অতিবাহিত করিয়াছিলাম —তখন আমরা জগৎকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, জগৎও আমাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে প্রতিদিন সান্ধ্যভোজন-সমাপনান্তে আমরা সকলে উপরকার বারান্দায় গিয়া আচার্যদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতাম।...এক অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী রজনীতে (সেদিন নিশানাথ প্রায় পূর্ণাবয়ব ছিলেন) কথা কহিতে কহিতে চন্দ্র অস্ত গেল; আমরাও যেমন কালক্ষেপের বিষয় কিছুই জানিতে পারি নাই, স্বামীজীও মনে হয় ঠিক তেমনি কিছুই জানিতে পারেন নাই।"[৫]

'দেববাণী' গ্রন্থের ভূমিকায় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ লিখেছেন: "সেখানে স্বামীজী বসিয়াছিলেন স্বকীয় দেদীপ্যমান উপলব্ধির মহিমায়, মধুর ও সুকণ্ঠস্বরে নিজের অন্তর্জ্যোতির শান্ত কিরণরাশি ভক্ত-অনুরাগীদের মধ্যে বিকিরণ করিয়া এবং তাঁহাদের হৃদয়-পদ্ম ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত করিয়া। তাঁহার চারিদিকে বিরাজ করিত শান্তি। যে কয়েকজন ভাগ্যবান শিষ্য এরূপ মহান ঋষি ও গুরুর পাদমূলে বসিবার দুর্লভ অধিকার পাইয়াছিলেন, তাঁহারা বাস্তবিকই ধন্য।...বাগ্মী বিবেকানন্দ সেখানে ঝঞ্ঝার মতো আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া সকলের হৃদয় জয় করেন নাই; প্রশান্ত ঋষির মতো কয়েকজন যথার্থ অনুরাগী ভক্তের নিকট তিনি শান্তি ও আনন্দের বাণী বিতরণ করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখের মধুর বাণীগুলি কী আলোকপ্রদ ও সান্ত্বনাদায়ক! মনে হয়—যেন হাস্যময়ী ও মৃদুমন্দ সমীরণ-সঞ্চারিণী ঊষা রক্তিম পূর্বাকাশের ক্রোড় হইতে আবির্ভূত হইয়া অন্ধকার দূর করিতেছেন।"[৬]

শহরের স্থানে স্থানে বক্তৃতারত বিবেকানন্দের একটা আকর্ষণ ছিল ঠিকই, কিন্তু এই নির্জনবাসকালে আচার্যরূপটি ছিল সবার কাছে মধুরতম। তাঁর এখানকার ক্লাসগুলি বড়ই

৪ *Ibid.*
৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১১০
৬ ঐ পৃঃ ১৮৫

আকর্ষণীয় ছিল। যদিও আমরা এগুলিকে 'ক্লাস' আখ্যা দিচ্ছি কিন্তু এগুলি কোন বিধিবদ্ধ ক্লাসের নিয়মে যে পড়ে না তা ওয়াল্ডোর বর্ণনাতেই আমরা দেখেছি। যখন ১৯ জুন ১৮৯৫ এই নির্জনপ্রদেশে ক্লাস শুরু হয় তখন ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র তিন-চারজন। স্বামীজী সেদিন বাইবেল থেকে শুরু করেন। প্রত্যেকের ভাব রক্ষার জন্যই যেন এই ব্যবস্থা, কারণ স্বামীজী বলছেন: "তোমরা যখন সকলেই খ্রীষ্টান, তখন খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র দিয়া আরম্ভ করাই ভাল।" তিনি জনের গ্রন্থের আদি সূত্র থেকেই শুরু করলেন : "আদিতে শব্দ-মাত্র ছিল, সেই শব্দ ব্রহ্মের সহিতই ছিল, আর সেই শব্দই ব্রহ্ম।" আর ৬ অগস্ট ১৮৯৫, সমাপ্তি বাক্যটি হল : "অতএব সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তা কর, ঐ চিন্তার দ্বারা তুমি পবিত্র হয়ে যাবে।" এর মাঝেই হয়ে গেল 'দিব্যবাণীর প্রতিধ্বনি'। যুগ যুগ ধরে ভারতের ঋষিমুনিগণ জগতের ধর্মাচার্য-গণ যে তত্ত্ব দিয়ে গেছেন তাই পুনর্বার উচ্চারিত হল স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, সাত সপ্তাহব্যাপী নির্জনবাসের আদি ও অন্তিমে বাক্য দুটি। আদি বাক্যে সৃষ্টির উৎস, তথা জীবের স্বরূপের কথা বলা হয়েছে। যেখান থেকে মায়াবশে বিচ্যুত হয়ে আমরা নিঃশ্য দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে চলেছি, সংসারচক্রে পিষ্ট হয়ে চলেছি, যেন স্রোতে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডের মতো একবার একূল একবার ওকূল, এইভাবে ধাক্কা খেতে খেতে চলেছি—সেই উৎসে ফিরে যাওয়াই হবে চিরশান্তি। আর সেই চিরশান্তি-লাভের উপায় হল স্বরূপের চিন্তন। ঈশ্বরত্বই হল জীবের স্বাভাবিক পরিণতি। তাই দিব্য-বাণীর শেষ বাক্য হল সেই স্বরূপচিন্তনের নির্দেশ। সে দিনগুলিতে গুটিকয়েক চিহ্নিত মানুষকে তথা তাঁদের মাধ্যমে স্বরূপের চিন্তনকে গ্রথিত করার জন্য সহস্রদ্বীপোত্থানের সেই পুণ্যনিকেতনে আচার্য বিবেকানন্দ-কণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'দেববাণী'।

শুধুমাত্র 'দেববাণী'টুকুই উপহার দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি এই সহস্রদ্বীপোত্থান, সেই সঙ্গে দিয়েছে দেব সবায় উৎসর্গীকৃত কতকগুলি প্রাণকে। আমেরিকার সুপরিসর কর্মক্ষেত্রে বহুতর মানুষ এসেছিলেন বিবেকানন্দ-সংস্পর্শে। কিন্তু যাঁরা এই সাতসপ্তাহ নির্জন দেশে স্বামীজীর সান্নিধ্যে বাস করার সুযোগ লাভ করেছিলেন তাঁরা তাঁদের লেখনীর মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ মানুষের জন্য রেখে গেছেন অপরূপ ভাব, সমাধি, ধ্যান-তন্ময়, অধ্যাত্ম-চিন্তনে ভরপুর-চিত্ত বিবেকানন্দকে।

ম্যালকম উইলিস-এর পূর্বোক্ত লেখায় আমরা পাই যে, স্বামীজীর ভবিষ্যৎ ভারতীয় কর্মপন্থা এখানে আকার নিতে থাকে। সে-কাজ কিভাবে ঘটেছিল আমরা তা জানি না। তবে সিস্টার ক্রিস্টিনের মতো রত্নকে তিনি এখানে শিক্ষা দিয়েছিলেন। ক্রিস্টিন পরে নিবেদিতার সঙ্গে একযোগে ভারতীয় কর্মে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন এ-কথা নিবেদিতা-জীবনী পাঠকমাত্রেই জানেন। সহস্রদ্বীপো-ত্থানের ক্লাস সম্পর্কে ক্রিস্টিন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

"আমরা সকলেই আমাদের ক্লাসের বক্তৃতা-গুলিতে উপস্থিত থাকতাম। একজন হিন্দুর কাছে হয়তো পড়ানোর বিষয়টি সুপরিচিত হতে পারে, কিন্তু এটি যখন তেজস্বিতা, প্রামাণিকতা ও অনুভূতির মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হত তখন তা সম্পূর্ণ একটি নতুন জিনিস বলে মনে হত। তিনিও 'একজন আপ্তপুরুষের মতো কথা বলতেন'। আমাদের পাশ্চাত্যবাসীদের কাছে এগুলি ছিল সম্পূর্ণ নতুন। তাদের কাছে তিনি জীবন্ত বিগ্রহরূপে এসেছিলেন কোন এক জ্যোতির্ময় লোক থেকে আশা, আনন্দ ও

জীবনের দিব্যবাণী নিয়ে।"[৭]

সহস্রদ্বীপোদ্যানই দান করেছিল দেবকণ্ঠে 'সন্ন্যাসীর গীতি'কে। 'সন্ন্যাসীর গীতি' হল চির-মুক্তের গান। মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের জন্য সন্ন্যাসীর গীতিতে ফুটে উঠেছে কী আকুতি আহ্বান! জগতের প্রত্যেকটি মানুষের মুক্তির জন্য স্বামীজী ঘোষণা করেছেন এই সন্ন্যাসীর গীতিকে। ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথায় আছে:

"সকলের মুক্তি হোক তাঁর একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। যদিও তিনি তাঁর নিকট সম্বন্ধীয়দের জ্ঞানালোক দান করে মায়ার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছিলেন তবুও তিনি আত্মমুক্তির চেয়ে সার্বিক মুক্তি চাইতেন:

'ভেঙে ফেলো শীঘ্র চরণ-শৃঙ্খল—
সোনার নির্মিত হলে কি দুর্বল;
হে ধীমান, তারা তোমার বন্ধনে?
ভাঙো শীঘ্র তাই ভাঙো প্রাণপণে।...
ওঁতৎসৎ-ওঁ।'"[৮]

এখানে স্বামীজী শুধুমাত্র তত্ত্বতেই ক্ষান্ত ছিলেন না, আচার্যের ভাবে স্বামীজী ভারতীয় পবিত্র সন্ন্যাসও দিয়েছিলেন দুজন ছাত্রকে, সেই সঙ্গে পাঁচজনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন। সন্ন্যাস লাভ করেন যে দুজন তাঁরা হলেন—লিওঁ ল্যাণ্ডস্‌বার্গ—স্বামী কৃপানন্দ এবং মেরী লুইস্—স্বামী অভয়ানন্দ।

এইরূপে অধ্যাত্মভাবে ভরপুর সাত সপ্তাহ শেষ হয় ৬ অগস্ট ১৮৯৫। এরপর স্বামীজী নিউইয়র্কে ফিরে যান, ছাত্রেরাও নিজ নিজ আবাসে। সঙ্গে নিয়ে যান 'দেববাণীর' ভাণ্ডার যা তাঁদের জীবনের এক অক্ষয় সম্পদ। এবং "এই বাণীগুলির অপেক্ষা আর কিছুই মানব-জাতির নিকট অধিক হিতকর বন্ধু ও মহত্তর পথ-প্রদর্শক হইতে পারে না।" অধ্যাত্ম আনন্দময় দিনগুলির স্মৃতি তাঁদের দীর্ঘকালের ব্যবধানেও আনন্দ দিত। সেই দলের মিস্ এস. ই. ওয়াল্ডো ভবিষ্যতের মানুষের জন্য সেই সব অধ্যাত্মতত্ত্বের কিঞ্চিৎ তুলে ধরেছেন 'দেববাণী' গ্রন্থে। প্রত্যাবর্তনকালে স্বামীজী দ্বীপটির উদ্দেশে বলেছিলেন: 'আমি এই সহস্রদ্বীপোদ্যানকে আশীর্বাদ করি।"[৯]

স্বামীজীর চরণস্পর্শে সহস্রদ্বীপোদ্যানের তীর্থত্ব সম্পাদন ঐতিহাসিক সত্য। ধন্য সহস্র-দ্বীপোদ্যান, ধন্য মিস্ ডাচার, ধন্য সেই সব ছাত্র-ছাত্রীরা যাঁদের নিঘর্ষণে বিবেকানন্দরূপী ভাব-মেঘ স্নিগ্ধ অধ্যাত্মবারি বর্ষণ করেছিল; আর ধন্য ওয়াল্ডো যাঁর লেখনীমুখে বিধৃত হয়েছিল 'দেব-বাণী'র প্রতিটি ছত্র। পরিশেষে ম্যালকম উইলিস-এর ভাষায় বলি:

"এইভাবে তিনি [স্বামী বিবেকানন্দ] যুক্ত-রাষ্ট্রকে একটি খাঁটি তীর্থক্ষেত্রে রূপান্তরিত করেছিলেন।"[১০]

৭ *Reminiscences of Swami Vivekananda*, P. 173

৮ *Ibid.*, P. 180

৯, ১০ Historical Sketch of Vivekananda Cottage Thousand Island Park, New York-r. Malcom Willis, *Vedanta Keshari*, August 1963
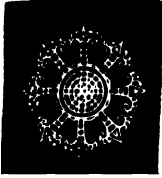
পথ ও পথিক

স্বামী চৈতন্যানন্দ

ব্যক্তিত্ব

প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব একটি ব্যক্তিত্ব আছে। ফলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে স্বতন্ত্র। কেউ নিজের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলতে চায় না। এটাকে ধরে রাখার জন্য সারা জীবন ধরে অবিরাম সংগ্রাম করে।

এখন এই ব্যক্তিত্ব বস্তুটি কি? ব্যক্তিত্ব বলতে সাধারণত আমরা বুঝি, 'ব্যক্তির কতকগুলি অসাধারণ গুণ যা তাকে অপর ব্যক্তির কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে।' কিন্তু দেখা যায় অসাধারণ গুণ না থাকলেও ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের জন্য প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে স্বতন্ত্র। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব একটি সর্বান্তভাবী স্বভাব। ব্যক্তির এমন কোন ধর্ম বা প্রকাশ নেই যা ব্যক্তিত্বের মধ্যে পড়ে না। তাই ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সংজ্ঞা নিরূপণ করা খুবই দুরূহ ব্যাপার।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে ব্যক্তিত্ব একটি নিষ্ক্রিয় সত্তা মাত্র নয়। ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির আচরণ বা ক্রিয়ার মধ্যে প্রকাশিত হয়। সে কি করে, কিভাবে সক্রিয় হয় তা-ই ব্যক্তিত্বের জ্ঞাপক। 'ব্যক্তিত্ব যে-সকল ক্রিয়ায় বা গুণে প্রকাশিত হয় তাদের সমষ্টিই ব্যক্তিত্ব।' মনোবিদ্ জি. অলপোর্ট (Allport) ব্যক্তিত্বের প্রায় পঞ্চাশটি সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীরা নানাভাবে ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন।

মনোবিদ্ রবার্ট এস. উডওয়ার্থ এবং ডোনাল্ড জি. মার্কুইস ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 'সাইকলজি' গ্রন্থে (পৃঃ ৮৭) বলেছেন: 'ব্যক্তির আচরণের সমগ্র রূপটিই তার ব্যক্তিত্ব।' 'ফাউণ্ডেশন অব সাইকলজি' গ্রন্থে (পৃঃ ৪৮৮) বোরিং ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দিয়েছেন: 'ব্যক্তিত্ব হল পরিবেশের সঙ্গে বিশেষ ধরনের সঙ্গতিপূর্ণ উপযোজন (adjustment)।' 'গ্রেট এক্সপেরিমেণ্ট ইন্ সাইকলজি' গ্রন্থে (পৃঃ ১৭১) হেনরি ই. গ্যারেট বলেছেন: 'ব্যক্তিত্ব হল আচরণের বিশেষ রীতি বা পদ্ধতি।' মান্ (Munn)-এর মতে 'বিশেষ করে সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ব্যক্তির গঠন, আচরণের ধরন, আগ্রহ, ভাবভঙ্গি, ক্ষমতা, সামর্থ্য এবং প্রবণতার বিশেষ সংহতি বা ঐক্য হল ব্যক্তিত্ব।' বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা নানাভাবে নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন। কোন সংজ্ঞাই সম্পূর্ণ নয়। ব্যক্তিত্ব বিষয়টি অতি জটিল ব্যাপার। তাই স্টেনার তাঁর 'সাইকলজি অব পার্সোনালিটি' গ্রন্থে বলেছেন: 'Personality is intrinsically complex. We can offer no simple formula for reducing its rich variety to a dry definition.'—'ব্যক্তিত্ব জটিল বিষয় এবং ব্যক্তিত্বের নিখুঁত সংজ্ঞা নির্দেশ করা অত্যন্ত কঠিন।'

জি. অলপোর্ট, বোরিং প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা দার্শনিকদের দেওয়া ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা গ্রহণ করতে চান না। তাঁরা মনে করেন, দার্শনিকদের ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য

নয়। দার্শনিকদের মতে ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা হল 'অপরিবর্তনশীল আত্মাই ব্যক্তিত্ব'। ব্যক্তিত্ব কখনও পরিবর্তনশীল হতে পারে না। ব্যক্তিত্ব অখণ্ড, তাকে খণ্ডিত করা যায় না। স্বামীজী বলছেন: 'ব্যক্তিত্ব শব্দের অর্থ—যাহা আর ভাগ করা যায় না।' [বাণী ও রচনা, ২।৪৮২]।

মানুষের মন প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। সেই অনুযায়ী তার ক্রিয়াও পরিবর্তিত হয়। সে অনুসারে তার ব্যক্তিত্বও পরিবর্তিত হয়। এই যদি হয় তাহলে ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা নিরূপণ করা কঠিন। কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা কেউ কখনও নিরূপণ করতে পারবে না। ক্ষণস্থায়ী ব্যক্তিত্ব ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব। আপাতদৃষ্টিতে জগৎকে যেমন সত্য বলে মনে হয় তেমনি ক্ষণস্থায়ী ব্যক্তিত্বকে সত্যকারের ব্যক্তিত্ব বলে মনে হতে পারে। আসলে খণ্ডিত ব্যক্তিত্ব ভ্রান্ত।

প্রত্যেক মানুষ জ্ঞানত বা অজ্ঞানত সেই অখণ্ড ব্যক্তিত্বের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মানুষ যখন নিঃস্বার্থপর হয়, পরের দুঃখে দুঃখ অনুভব করে, পরের সুখে সুখ অনুভব করে তখন তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের গণ্ডি পেরিয়ে অপরের ব্যক্তিত্বের এলাকার মধ্যে প্রবেশ করে। এমনি ভাবে মানুষ নিজের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব অপরের ব্যক্তিত্বের মধ্যে হারিয়ে ফেলে এবং ক্রমে ক্রমে সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিলিত হয়। যখন কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিরাট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিশে যায় তখন তাঁকে ঈশ্বর বলে। ঈশ্বরই সেই বিরাট ব্যক্তিত্ব। ব্যষ্টিমনের সমষ্টি বিরাট মন। ব্যষ্টি ব্যক্তিত্বের সমষ্টিই হল বিরাট ব্যক্তিত্ব—ঈশ্বর।

প্রত্যেক মানুষের লক্ষ্যই এই অখণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া। ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বকে বিস্তার করে অখণ্ড ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিলিত হওয়া—মনুষ্য-জীবনের লক্ষ্য। স্বামীজী বলছেন: 'এই ক্ষুদ্র দেহের চেতনা উপভোগ যদি সুখের হয়, তবে দুইটি দেহের চেতনা উপভোগ আরও বেশী সুখের হইবে। এইরূপে দেহসংখ্যা যতই বাড়িবে, আমার সুখও ততই বাড়িবে। এইরূপে যখন এই নিখিল বিশ্বে আমার আত্মবোধ হইবে, তখনই আমি আনন্দের পরাকাষ্ঠায়—লক্ষ্যে উপনীত হইব।' [বাণী ও রচনা, ১।২২]। এই লক্ষ্যই হল আত্মা—ঈশ্বর। স্বামীজী বলেছেন: 'ব্যক্তি-সত্তা হইল আদর্শে পৌঁছানো। তুমি এখন পুরুষ বা নারী। তোমার পরিবর্তন ঘটিবেই। তোমরা কি থামিয়া থাকিতে পার? …কোথাও তোমরা থামিতে পার না…যতদিন না জয়লাভ সম্পূর্ণ হয়, যতদিন না তোমরা পবিত্র এবং পূর্ণ হও।…যে জীবনের শেষ নাই, সেখানে না পৌঁছানো পর্যন্ত তুমি থামিতে পার না। অসীম জীবন! সেইখানে তুমি থামিবে। …জীবনের সঙ্গে একাত্ম যতদিন না হইবে, ততদিন কোথাও থামিবে না।…মাতা, পিতা, সন্তান, স্ত্রী, দেহ, সম্পদ—সব আমি হারাইতে পারি, শুধু হারাইতে পারি না আমার আত্মাকে …আত্মাই আনন্দ।…ইহাই ব্যক্তিত্ব। ইহার পরিবর্তন নাই; ইহাই পূর্ণ।' [বাণী ও রচনা, ২।৩৬৬-৬৭]।

সাধারণ মানুষ সারা জীবন তার ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বকে ধরে রাখবার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে। যখন সে মারা যায়, তার কয়েক দিন পরেই তার অতি নিকট আত্মীয়-স্বজনও তাকে ভুলে যায়। জগতে সে যে একসময় ছিল, তখন আর তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেউ মনে রাখে না বা রাখবার প্রয়োজনও মনে করে না। সে তখন জগতের আর পাঁচটা প্রাণীর মতো কালের গহ্বরে বিলীন হয়ে যায়।

কিন্তু যখন একজন নিজের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বকে পরিত্যাগ করে, বিরাট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিলিত হয়ে পূর্ণ হতে পারেন তখন আর তাঁকে কেউ

কখনও ভুলতে পারে না। শ্রদ্ধার সঙ্গে সকলে তাঁকে স্মরণ করে। এবং ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিকে বেঁচে থাকার জন্য তাঁর শরণ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আড়াই হাজার বছর পূর্বে বুদ্ধ নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এমনই এক বিরাট ব্যক্তিত্ব ছিল যে, তাঁর দেহত্যাগের তিনশত বছর পরে অর্ধ পৃথিবী তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। আজ তাঁর প্রভাব সারা পৃথিবী-ব্যাপী। তাঁকে পৃথিবীর মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। আজও পৃথিবীর বহু ব্যক্তি তাঁর প্রবর্তিত মত অনুসরণ করে ধর্মজীবন যাপন করছেন। যিশু ছিলেন এমনি আর একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর জন্ম হয়েছিল প্রায় দু হাজার বছর পূর্বে। তাঁরও দেহত্যাগের তিনশত বছর পরে ধীরে ধীরে তাঁর ব্যক্তিত্ব সারা পৃথিবীকে প্রভাবিত করে। আজও তা অক্ষুণ্ণ। মহম্মদও তেমনি এক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি। বর্তমান যুগেও আর এক বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ। দেড়শত বছর পূর্বে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল বাংলার এক অখ্যাত গ্রামে। তাঁর মহাপ্রয়াণের মাত্র ৯।১০ বছরের মধ্যে তাঁর সর্বগ্রাসী ব্যক্তিত্ব সারা পৃথিবীকে প্রভাবিত করে। ধীরে ধীরে সেই ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর বুকে গভীর থেকে গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করছে। এইরকম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিরাই পৃথিবীকে পরিচালনা করেন। তাঁদের জীবনাদর্শ নিয়েই পৃথিবীর পণ্ডিতরা নানা ব্যাখ্যা করেন। তা থেকেই জীবনসমস্যার সমাধানের নানা তত্ত্বের সন্ধান পান।

ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বকে পরিত্যাগ করতে মানুষ ভয় পায়। কিন্তু ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সীমিত গণ্ডির মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বকে ধরে রাখা বোকামি ছাড়া আর কিছু না। যে-ব্যক্তিত্বের কোন পরিবর্তন নেই সেই ব্যক্তিত্ব অর্জনের জন্য আমাদের অনুশীলন করতে হবে। বিশ্বজনীন ব্যক্তিত্ব অর্জন করাই মনুষ্য সমাজের লক্ষ্য। যেমন করেছিলেন বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি। ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব। স্বামীজী বলছেন: 'এই অনন্ত বিশ্বজনীন ব্যক্তিত্ব লাভ করিতে গেলে এই দুঃখপূর্ণ ক্ষুদ্র দেহাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে। যখন আমি প্রাণস্বরূপ হইয়া যাইব, তখনই মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পাইব, যখন আনন্দস্বরূপ হইয়া যাইব, তখনই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব, যখন জ্ঞানস্বরূপ হইয়া যাইব, তখনই ভ্রমের নিবৃত্তি। ইহাই যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। বিজ্ঞানের প্রমাণে জানিয়াছি—দেহগত ব্যক্তিত্ব ভ্রান্তিমাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমার শরীর এই নিরবচ্ছিন্ন জড়সমুদ্রে অবিরাম পরিবর্তিত হইতেছে; সুতরাং আমার চৈতন্যাংশ সম্বন্ধে এই অদ্বৈত (একত্ব)-জ্ঞানই কেবল যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত।' [বাণী ও রচনা, ১।২২]

পুস্তক সমালোচনা

স্বামীজীর হিন্দুরাষ্ট্রচিন্তা—সংকলক : শ্রীএকনাথ রানাডে। অনুবাদক : শ্রীসীতানাথ গোস্বামী। প্রকাশক : বিবেকানন্দ সাহিত্যকেন্দ্র, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩। পৃঃ ১১৪, মূল্য ঃ ১০'০০ টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দের সশ্রদ্ধ অনুরাগীদের কাছেও সাধারণতঃ তিনি ইনিগ্‌ম্যা (রহস্যময়)। তাঁর বাণীতে যে সার্বজনীনতা, তার সঙ্গে তাঁর হিন্দুধর্মের আক্রমণাত্মক ভূমিকা (aggressive **Hinduism**) পালনের জন্য আহ্বানকে অনেকে মেলাতে পারেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা থেকে স্বামীজীর শিক্ষার অন্যতম পার্থক্য এটি বলে অনেকে নির্দেশ করেন।

এই ব্যাপারে মিল কোথায় কিভাবে হতে পারে সে সম্পর্কে বহু বছর আগে প্রবুদ্ধ ভারতে যে সম্পাদকের মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল (**Expansion of Hindusim : A Defence, Probuddha Bharata, April 1929**), অনেকেরই বিশ্বাস সেটি চূড়ান্ত এবং পর্যাপ্ত মীমাংসা। আমরাও তাই মনে করি। কিন্তু 'স্বামীজীর হিন্দুরাষ্ট্রচিন্তা'-তে স্বামীজীর যে ভাব-মূর্তি ফুটে উঠেছে, সেটি হচ্ছে যে তিনি ওজস্বী, প্রতিভাধর এবং স্বধর্মের (অর্থাৎ হিন্দুধর্মের) কারণে অক্লান্তকর্মা চিন্তাবীর তথা নেতৃত্বশালী বাগ্মী; তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সার্বজনীনতার প্রসঙ্গ কিন্তু যা আছে, সেটি সম্যক পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি সামগ্রিক বিচারে। ফলে "যে আদর্শের পূর্তির উদ্দেশ্যে [তিনি] জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন" (১ম পৃষ্ঠা) তার সুষ্ঠু প্রকাশ ঐ বিশেষ tilt-এর জন্য বিশেষভাবেই ব্যাহত হয়ে পড়েছে। 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র সম্পাদকের রচিত প্রবন্ধটির কথা বারবার এই প্রসঙ্গে স্মরণ হচ্ছে। অনেক অনেক বলিষ্ঠ সেই উপস্থাপনা। ভারত, হিন্দু, রাষ্ট্রীয় জীবন, জাতীয় জীবন—এ-কথাগুলি সমার্থক হিসেবে যত্র তত্র একটার পরিবর্তে আরেকটা ব্যবহৃত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। এ-কথাগুলির ব্যঞ্জনায় যে ব্যবধান রয়েছে, তাকে অস্বীকার করলে স্বামীজীর বহু উক্তিকে অনেকেই অনেকভাবে কাজে লাগাতে পারেন। যেমন, 'ইউরোপীয় সংস্কার'—এই উপ-শিরোনামে (৫২ পৃষ্ঠা) বলা হয়েছে : "আজকাল আমাদের মধ্যে কিছু সমাজ-সংস্কারক দেখা দিয়াছেন যাঁহারা হিন্দুরাষ্ট্রের পুনরভ্যুত্থানের জন্য আমাদের ধর্মের সংস্কার করিতে চান।" কিন্তু ইংরেজীনবীশ একজন ভারতীয়ও গত শতাব্দীতে 'হিন্দুরাষ্ট্র'-এর পুনরভ্যুত্থানের স্বপ্ন দেখেননি, এটা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কথা। চতুর্থ খণ্ডে উপ-শিরোনাম একটি রয়েছে 'হিন্দু সংগঠন' (১৫০ পৃষ্ঠা); ভারতবর্ষের উপযোগী সংগঠন আর 'হিন্দু সংগঠন' এক কথা নয়। হিন্দু বলতে নিজেকে স্বামীজী অগৌরবের ব্যাপার মনে করতেন না, বরং গর্ববোধ করতেন। কিন্তু তিনি এও জানতেন যে, সর্বজনবরণীয় অভিধা হিসেবে 'হিন্দু' থেকে 'বেদান্ত' শ্রেয়। আবার ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী মুসলমানদের সামাজিক ঐক্যকে তিনি সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখতেন। 'ঐস্লামিক দেহ ও বৈদান্তিক মস্তিষ্ক' সমন্বিত অনাগত মাতৃভূমির স্বপ্ন তো স্বামীজীই দেখেছিলেন; সমগ্র গ্রন্থে স্বামীজীর বহু-উদ্ধৃত এই ধারণাটি উহ্য থেকে

গেছে। সেইজন্যই বলছিলাম যে, স্বামীজীর সমগ্র-মূর্তিটির কিঞ্চিৎ যেন অন্তরালে চলে গেছে বইটিতে।

বইটি সংকলন-গ্রন্থের অনুবাদ। অনুবাদক বইয়ের শুরুতে স্বীকার করেছেন সাধু ভাষা এবং চলিত ভাষা—দুই-ই ব্যবহৃত হয়েছে। একই অধ্যায়ে এরকম ব্যবহার সমীচীন নয়। আবার সহসা কোথাও কোথাও 'তুমি' থেকে 'তুই'-এ উত্তরণ (১২ পৃঃ)। স্বামীজীর বাণীর নানাবিধ সার-সংকলন এর আগেও প্রকাশিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রকাশকেরা অনুরূপ বাধা অন্য উপায়ে অতিক্রম করেছেন বইটিতে প্রচুর বানান ভুল আর মুদ্রণ-প্রমাদ।

কিন্তু যে বিশেষ অভিমুখ সামনে রেখে বইটি সংকলিত হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হয়েছে। রচনায়, বক্তৃতায়, কথোপকথনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবগুলিকে গ্রন্থনা করা (যদিও একটি বিশেষ প্রসঙ্গে) সহজ কথা নয়। গ্রন্থনায় সংকলকের আকুতি এবং নিষ্ঠা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্বদেশের উন্নয়নে স্বামীজীর মৌল চিন্তার প্রায় সবটাই বিধৃত হয়ে আছে চারখণ্ডে বিন্যস্ত কথা রাশির মধ্যে। যে কয়েকটি চিন্তা মোটামুটি অনুক্ত থেকে গেছে সেগুলি হচ্ছে: ভোগাধিকারের অসাম্য নিরসন, অতি নিকট রক্ত-সম্পর্কিত মানুষের মধ্যে বিবাহের প্রথা দূরীকরণ, অন্নাগমের বিচিত্র উপায় উদ্ভাবন। এই তিনটি স্বামীজীর স্বদেশ-উন্নয়নের প্রধান চিন্তাগুলির অন্যতম।

প্রথম খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায় থেকে সপ্তম অধ্যায়ে পুনর্জাগরণের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। এক অর্থে বইটির সারাংশ যেন এই চারটি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। বহু বিচিত্র ভাবকে যেভাবে এই চারটি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে একটি বড় কাজ। শিক্ষিত দেশবাসিমাত্রেরই এই বইটি পড়া উচিত। এতে তাঁদের চিন্তা ও চেষ্টা দেশের জাগরণের কাজে নিযুক্ত হবার প্রেরণা পাবে। প্রেরণা অন্যত্র লাভ হয়তো করা যায়, কিন্তু সেই প্রেরণার উৎসে মহানুভবতার সঙ্গে বিভ্রান্তি জড়িত থাকার সম্ভাবনা। কারণ দেশের অধিকাংশ সংস্কারক নিজের ধর্ম ভালভাবে অনুশীলন করেননি এবং তাঁদের মধ্যে একজনও পর্যাপ্ত সাধনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হননি, কিন্তু স্বামীজী হয়েছেন (৪৬ পৃষ্ঠা)। পরিশেষে পুনশ্চ পাঠকদের কাছে সানুনয় নিবেদন যে, তাঁরা যেন আকর গ্রন্থগুলি থেকে এইটি অনুধাবন করার চেষ্টা করেন—স্বামীজী অভিহিত পুরুষসিংহ হিন্দুধর্মকে এবং স্বদেশকে ভালবাসতেন, কিন্তু সেই ভালবাসার ভিত্তি পশুসুলভ যূথপ্রীতি নয়; স্বামীজীর চিন্তার তথা উত্তমের মধ্যে যে সংব্যাপ্ত বিশ্ববোধ তাকে বাদ দেওয়া বা লঘু করা ঠিক নয়।

—স্বামী অমরানন্দ

ধূমকেতুর রহস্য ও হ্যালি—অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা—৯, পৃষ্ঠা ৮৭+৮; মূল্য: ১২ টাকা।

প্রায় ৭৬ বছর পর পর হ্যালির ধূমকেতুকে পৃথিবীর আকাশে দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে হ্যালির আগমনকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবীতে একটা দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। এই উপলক্ষে সাধারণ মানুষ ও ছাত্রছাত্রীর মনে নানারকমের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে—ধূমকেতু কি? কোথা থেকে এরা আসে? কোথায় আবার চলে যায়? এদের লেজের উৎপত্তি হয় কেমন করে? হ্যালির ধূমকেতু নাম হল কেমন করে? ধূমকেতু কি সত্যিই অমঙ্গলের প্রতীক? ধূমকেতুর মধ্যে

কি আছে? আলোচ্য বইখানিতে লেখক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অতি সহজ ও সুন্দরভাবে এইসব নানারকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

প্রথম সাতটি অধ্যায়ে লেখক আলোকপাত করেছেন ধূমকেতু সম্পর্কে সাধারণ যে প্রশ্নগুলো জাগে তার উপর, যেমন ধূমকেতুর চলার পথ কেমন, এদের আকৃতি ও দেহগঠন কেমন, এদের আবিষ্কার করা হয় কেমন করে, এদের উৎপত্তি সম্পর্কে কি কি তত্ত্ব আছে আর স্মরণীয় উজ্জ্বল ধূমকেতু যাদের পৃথিবীর আকাশে দেখা গেছে তাদের বর্ণনা। ধূমকেতু আবিষ্কার প্রসঙ্গে লেখক কয়েকজন ধূমকেতু সন্ধানীর পরিচয় দিয়েছেন, এই বৃত্তান্ত যে কোন ছাত্রছাত্রীকে যথেষ্ট উৎসাহ যোগাবে ধূমকেতু আবিষ্কারের জন্যে। কেমন করে ফ্রান্সের মানমন্দিরের দ্বাররক্ষক পরিশেষে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ ধূমকেতু সন্ধানী হয়ে উঠলেন, তার বর্ণনা যেমন চমকপ্রদ তেমন বড়ই সুনির্বাচিত বলা যেতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়ে লেখক হ্যালির ধূমকেতু কেমন করে নাম হল তার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। আর তারপরে আলোচনা করেছেন হ্যালির ধূমকেতুর এত গুরুত্ব কেন, সেই নিয়ে। তবে সাধারণ মানুষের সবচেয়ে ভাল লাগবে এর পরের অধ্যায়ে যেখানে লেখক বিশদভাবে আলোচনা করেছেন হ্যালির ধূমকেতুকে এবারের আগমনে কোথায় এবং কখন খালি চোখে দেখা যাবে। এই অধ্যায়ে লেখকের কিছু গবেষণালব্ধ তথ্যও লিপিবদ্ধ হয়েছে—বিগত ৩০ বছরের সারা ভারতের আবহাওয়ার রেকর্ড বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে, ভারতের কোন্ কোন্ স্থান থেকে হ্যালির ধূমকেতুকে সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত আকাশে দেখার সম্ভাবনা আছে—কারণ আকাশে মেঘ থাকলে কোন কিছুই আকাশে দেখা সম্ভবপর হবে না।

এরপরে লেখক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যে-সব মহাকাশযান পাঠানো হচ্ছে, তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। এই অধ্যায়ে সবচেয়ে ভাল লাগে যেখানে লেখক ব্যাখ্যা করেছেন যে, মহাকাশযান পাঠিয়ে হ্যালিকে নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করার সার্থকতা কোথায়। এর পরে একটি অধ্যায়ে লেখক ধূমকেতুর সঙ্গে যে অমঙ্গল বা অশুভ ঘটনার সংযোগের ইঙ্গিত যুগ যুগ ধরে মানুষের মনে জড়িয়ে আছে, তার যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন এবং স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এই কুসংস্কার সম্পূর্ণ অমূলক। এই স্পষ্ট আভাস মানুষের মন থেকে নিশ্চয়ই একটা কুসংস্কারের ভয় দূর করতে সমর্থ হবে। পরের অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয়স্তরে হ্যালি পর্যবেক্ষণের কি ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

বইটির প্রচ্ছদ অতি সুন্দর হয়েছে, ছাপার কাজও বেশ ভাল। একটির বেশি মুদ্রণ-প্রমাদ চোখে পড়েনি। তবে এই বইয়ে দু-একখানি রঙিন ধূমকেতুর আলোকচিত্র দিলে, সেটা আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠত—এইটা একটা ত্রুটি বলে মনে হয়েছে। বইটার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল এর সহজ ও সুন্দর ব্যাখ্যা—যাতে যিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান জানেন না, তিনিও বইখানি পড়ে বিষয়বস্তু বুঝতে সমর্থ হন। বইটি যেমন তথ্যসমৃদ্ধ, তেমনি চিত্তাকর্ষক, আর নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান গ্রন্থ।

এই বইখানি, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ মানুষের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করবে, বলে আশা রাখি।

—ডক্টর জ্যোতিরঞ্জন দাশগুপ্ত

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা

রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী গম্ভীরানন্দের সভাপতিত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের ৭৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার ২৩ ফেব্রুআরি ১৯৮৬, বিকাল ৩-৩০ মিনিটে। সভায় প্রদত্ত ১৯৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পরিচালক সমিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নরূপ :

এ সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ভারত সরকার কর্তৃক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনকে (১২ জানুআরি) 'জাতীয় যুব দিবস' হিসাবে ঘোষণা। বিপুল সমারোহপূর্ণ ও প্রবল উদ্দীপনার সঙ্গে প্রথম 'যুব দিবস' বেলুড় মঠে ও অন্যান্য সকল শাখা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

মিশন সারা দেশে ত্রাণ ও পুনর্বাসন সেবা-কাজে ব্যয়িত করেছে ৩১ লক্ষ ১৫ হাজার ৫৩৭ টাকা। সংগৃহীত বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী বিতরিত হয়েছে ১৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ৮৪১ টাকার। ঘূর্ণিবাত্যা, ভূমিকম্প, অগ্নিসংযোগ ও বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় পীড়িত প্রায় এক হাজার গ্রামের মধ্যে প্রায় চার লক্ষ মানুষের সেবা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে রামকৃষ্ণ মঠও পিছিয়ে নেই। গুজরাটে মঠ পুনর্বাসন-প্রকল্পে ব্যয় করেছে ২৮ লক্ষ ৩৫ হাজার ৭৯২ টাকা।

মঠ ও মিশনের কয়েকটি শাখাকেন্দ্রে অনেক পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে পল্লীমঙ্গল অর্থাৎ সার্বিক গ্রামোন্নয়ন-প্রকল্পে। কৃষি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কুটিরশিল্প, মৎস্য চাষ প্রভৃতি এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য বেলুড় মঠের প্রধান কার্যালয় নিজেই প্রায় ছয় লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করেছে।

বেলুড় মঠের সারদাপীঠে গ্রামের উন্নয়নমূলক সেবাকাজের জন্য 'সমাজ সেবক শিক্ষণ মন্দির' নামে একটি শিক্ষণ কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এবং মাদ্রাজের ত্যাগরাজনগরের মিশন আশ্রমে কম্পিউটর বিভাগের উদ্বোধন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের পর্ষদ বা সংসদের শেষ পরীক্ষার ফল প্রতিবারের ন্যায় খুবই কৃতিত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের মিশনের কতিপয় বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ১৯৮৪-র মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। ভারত সরকারের সমাজ-উন্নয়ন বিভাগ অরুণাচলপ্রদেশের আলং মিশন বিদ্যালয়কে ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দের শিশু উন্নয়নের জন্য শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হিসাবে 'জাতীয় পুরস্কারে' সম্মানিত করেছে।

এ সময়ে কাঁথি মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের উদ্বোধন এবং বারাসত (২৪ পরগনা, প. ব.), পুনা ও জাপানের তিনটি প্রাইভেট সেণ্টারের অন্তর্ভুক্তি রামকৃষ্ণ মঠের বিশেষ উল্লেখযোগ্য উন্নতি।

মিশন ৪১,১৩,২৯৩ জন রোগীকে সেবা করেছে ৮টি হাসপাতাল, ৬২টি চিকিৎসালয় এবং ১২টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে। ৩০টি চিকিৎসালয় ও ৬টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র গ্রাম্য ও উপজাতি এলাকায় অবস্থিত।

মঠের অধীন ৫টি হাসপাতাল, ১৯টি দাতব্য

চিকিৎসালয় ও ৩টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রে ৭,৩২,৭২৭ জন রোগীর সেবা করা হয়েছে। গ্রামীণ ও পার্বত্য প্রদেশে আছে ৩টি হাসপাতাল ও ৯টি চিকিৎসালয়।

মিশনের মোট ১০৭৪টি শিক্ষালয়ের ছাত্র সংখ্যা ১,১৯,৪৮৪ জন এবং মঠের অধীন ৯৪টি শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্র সংখ্যা ৯,৭২৪ জন। গ্রামে ও পাহাড়ী এলাকায় রয়েছে ৬৩৩টি বিধিমুক্ত শিক্ষাকেন্দ্র সহ ৯৭৪টি শিক্ষালয়।

'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব প্রচার কমিটি'র উদ্যোগে অনেকগুলি যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রে।

'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের সঠিক মূল্যায়ন কমিটি'র (Committee for Comprehensive Study of the Ramakrishna Vivekananda Movement) নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক সেমিনারের আয়োজন করেছেন বিভিন্ন কেন্দ্র। এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন প্রখ্যাত পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ্‌গণ।

মঠ ও মিশনের বিদেশী কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষা, চিকিৎসা, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক সেবাকাজ অব্যাহত আছে। বেলুড় মঠের প্রধান কার্যালয় ব্যতীত সারা পৃথিবীতে মঠ ও মিশনের শাখাকেন্দ্রের সংখ্যা যথাক্রমে ৭০ এবং ৭৪।

বিবিধ সংবাদ

অখিলভারত বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডলের উনবিংশ বার্ষিক যুব-শিক্ষণ শিবির

গত ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৫ থেকে ৫ জানুআরি ১৯৮৬, কোন্নগরে অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব-মহামণ্ডলের উনবিংশ বার্ষিক যুব-শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে আসাম, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লী, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানা বৃত্তি অবলম্বনকারী মোট ৫২৬ জন যুবক এই শিবিরে যোগদান করেন। ৩১ ডিসেম্বর, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ মহামণ্ডলের পতাকা উত্তোলন করে এই শিবির উদ্বোধন করেন। ছয়দিনই নানা কর্মসূচী ও বিশিষ্ট বক্তাগণের বক্তৃতাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরের উদ্দেশ্য প্রত্যেক যুবককে চরিত্রগঠন, জাতীয় সংহতি, ধর্মসমন্বয়, জনসেবা প্রভৃতি বিষয়ে স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা। মহামণ্ডলের কর্মধারার উপর এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী-বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। ১২৮ জন শিবিরবাসী যুবক কেন্দ্রীয় ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দান করেন।

উৎসব

পূজা-পাঠ, ভজন-কীর্তনাদির মাধ্যমে নিম্নলিখিত স্থানগুলি থেকে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবের সংবাদ পাওয়া গিয়েছে: **ঝরিয়া** (ধানবাদ) গোস্বামী ভবন (১ ফেব্রুআরি ১৯৮৬), **ডুমডুমা** (আসাম) বঙ্গীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় (৮ ও ৯ ফেব্রুআরি), **কলিকাতা** অখিল ভারত রামকৃষ্ণ পরিষদ (১৫ ফেব্রুআরি), **সাগুেলারবিল** (২৪ পরগনা) বিবেকানন্দ পাঠচক্র (২৩ ফেব্রুআরি)।

চকপাড়া (হাওড়া) প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘে গত ৯ ফেব্রুআরি ১৯৮৬, প্রভাত ফেরি, সঙ্গীত, বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে সারদা দেবীর জন্মোৎসব পালিত হয়।

সূচিপত্র

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংকলিত
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ
সাধারণ বাঁধাই ৩'০০, বোর্ড ৩'৫০

স্বামী ভূতেশানন্দ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ (তিন ভাগে)
১ম ভাগ ১০'০০, ২য় ভাগ ১২'৫০, ৩য় ভাগ ১০'০০

স্বামী নির্বেদানন্দ
(অনুবাদ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)
শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ ১২'৫০

স্বামী প্রভানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা ১৫'০০

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা (দুই ভাগে)
১ম ভাগ ১৫'০০, ২য় ভাগ ১৪'০০

স্বামী গম্ভীরানন্দ
শ্রীমা সারদাদেবী ২৭'০০

স্বামী সারদেশানন্দ
শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা ১০'০০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
শিশুদের মা সারদাদেবী (সচিত্র) ৭'০০

স্বামী বুধানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ বিভাসিতা মা সারদা ৭'০০

স্বামী ঈশানানন্দ
মাতৃসান্নিধ্যে ৯'৫০

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

স্বামী গম্ভীরানন্দ
যুগনায়ক বিবেকানন্দ (তিন খণ্ডে)
১ম খণ্ড ৩০'০০, ২য় খণ্ড (যন্ত্রস্থ)
৩য় খণ্ড ১৮'০০

ভগিনী নিবেদিতা (অনুবাদ : স্বামী মাধবানন্দ)
স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি ১৬'০০

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ১০'০০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
স্বামী বিবেকানন্দ ৭'০০
শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র) ৫'৫০

স্বামী নিরাময়ানন্দ
ছোটদের বিবেকানন্দ ২'৫০

শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য
স্বামী বিবেকানন্দ ২'৫০

স্বামী বুধানন্দ
ওঠ, জাগো, এগিয়ে চল ৪'২৫
ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর ১'৫০
স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা ৩'৫০

ভগিনী নিবেদিতা
স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ৫'০০

প্রমথনাথ বসু
স্বামী বিবেকানন্দ
১ম খণ্ড ২০'০০, ২য় খণ্ড ২০'০০

বিবিধ

মহাপুরুষজীর পত্রাবলী ৭'৫০
স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র ৭'৮০
স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী ৪'৫০
আরতি-স্তব ও রামনাম ১'৫০
ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ৬'০০

স্বামী গম্ভীরানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা (দুই ভাগে)
১ম ভাগ ২৫'০০, ২য় ভাগ ২৫'০০

স্বামী সারদানন্দ
ভারতে শক্তিপূজা ৪'০০

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ
শ্রীরামানুজ চরিত ১৭'৫০

স্বামী প্রেমেশানন্দ
রামানুজ চরিত ৩'৫০

ভগিনী নিবেদিতা
শিব ও বুদ্ধ ৩'৭৫

স্বামী অপূর্বানন্দ
আচার্য শঙ্কর ৮'০০
শিবানন্দ-বাণী (সংকলিত)
১ম ভাগ ৯'০০, ২য় ভাগ ৫'০০

স্বামী সুন্দরানন্দ
যোগ চতুষ্টয় ৭'৫০

গোপালের মা ২.২৫
গীতাতত্ত্ব ৭.০০
পত্রমালা ৪.০০
বিবিধ-প্রসঙ্গ ৩.৫০
স্বামী অখণ্ডানন্দ
তিব্বতের পথে হিমালয়ে ৬.৫০
স্মৃতি-কথা ১০.০০
শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়
লাটুমহারাজের স্মৃতিকথা ২০.০০
স্বামী সিদ্ধানন্দ সংগৃহীত
সৎকথা ১০.০০
অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ ৭.৫০
স্বামী বিরজানন্দ
পরমার্থ-প্রসঙ্গ ৪.৫০
স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
মহাভারতের গল্প ৪.৫০
স্বামী দেবানন্দ
ব্রহ্মানন্দ স্মৃতিকণা ১.৭৫
স্বামী বামদেবানন্দ
সাধক রামপ্রসাদ ৬.০০
স্বামী পরমানন্দ
প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা ২৪.০০
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
সাধু নাগমহাশয় ৬.০০
স্বামী নিরাময়ানন্দ-সম্পাদিত
স্বামী শুদ্ধানন্দ : জীবনী ও রচনা ১৫.০০
শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য
শঙ্কর-চরিত ৩.০০
দশাবতার চরিত ৫.০০
স্বামী দিব্যাত্মানন্দ
দিব্যপ্রসঙ্গে ৬.৩৫
স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ
পুণ্যস্মৃতি ৩.০০
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ
অতীতের স্মৃতি ২০.০০
বন্দি তোমায় ১০.০০
স্বামী নরোত্তমানন্দ
রাজা মহারাজ ৭.০০
স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
ভগবানলাভের পথ ২.০০
মাতৃভূমির প্রতি আমাদের কর্তব্য ৩.০০
স্বামী প্রভানন্দ
ব্রহ্মানন্দচরিত ৩০.০০
স্বামী অন্নদানন্দ
স্বামী অখণ্ডানন্দ ১৬.০০
স্বামী নিরাময়ানন্দ
স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয় ৩.৩০
স্বামী ধ্যানানন্দ
ধ্যান ৩.৫০
স্বামী তেজসানন্দ
ভগিনী নিবেদিতা ৪.৪০
স্বামী অপূর্বানন্দ
মহাপুরুষ শিবানন্দ ১৫.০০

সংস্কৃত

শ্রীরামকৃষ্ণপূজাপদ্ধতি ৫.০০
স্বামী গম্ভীরানন্দ-অনূদিত ও সম্পাদিত
উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (তিন ভাগে)
১ম ভাগ ১৮.০০, ২য় ভাগ ১৮.০০,
৩য় ভাগ ১৮.০০
স্তবকুসুমাঞ্জলি ১৫.০০
স্বামী রঘুবরানন্দ-অনূদিত ও সম্পাদিত
গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা ৩.০০
স্বামী ধীরেশানন্দ-অনূদিত ও সম্পাদিত
যোগবাসিষ্ঠসারঃ ১২.৫০
বৈরাগ্যশতকম্ ১১.০০
বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা ৯.৫০
স্বামী জগদানন্দ অনূদিত
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ ১৭.৫০
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত ও সম্পাদিত
শ্রীশ্রীচণ্ডী ১৪.০০
গীতা ১৫.৫০
স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত
বেদান্তদর্শন
১ম অধ্যায়ের ১ম খণ্ড ১৪.০০; ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ খণ্ড ৩.০০; ৩য় অধ্যায় ১৩.০০; ৪র্থ অধ্যায় ৯.০০
স্বামী প্রভবানন্দ
নারদীয় ভক্তিসূত্র ১১.০০

উদ্বোধনের গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের প্রতি

স্বামীজী চেয়েছিলেন : উদ্বোধনের মাধ্যমে '**ঠাকুরের ভাব তো সব্বাইকে দিতে হবেই, অধিকন্তু বাঙলা ভাষায় নূতন ওজস্বিতা আনতে হবে।—ঠাকুরের ইচ্ছায় টাকার জোগাড় হলে এটাকে পরে দৈনিক করা যেতে পারে। রোজ লক্ষ কপি ছেপে কলকাতার গলিতে গলিতে free distribution (বিনামূল্যে বিতরণ) করা যেতে পারে।**'

'উদ্বোধন' ৮৭ বর্ষ অতিক্রম করে ৮৮ বর্ষে পদার্পণ করেছে, তবু আজও স্বামীজীর ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। বিবেকানন্দ-অনুরাগী গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের কাছে আহ্বান জানানো হচ্ছে, স্বামীজীর এই মহতী ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য 'উদ্বোধন' পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা বৃদ্ধিতে তাঁরা যেন নিজেদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রকাশ ও প্রচারে সহায়তা-প্রসঙ্গে স্বামীজী আরও বলেছিলেন : '**...তোরা প্রত্যেকে যতটা পারবি, সাহায্য করিস ওতে ঠাকুরের কাজই করা হবে।**'

৮৮তম বর্ষের উদ্বোধন পত্রিকার বার্ষিক মূল্য সডাক	২৫'০০ টাকা
ভারতের বাইরে সি-মেল-এ	৮৮'০০ টাকা
বাংলাদেশে	৪৩'০০ টাকা
এয়ার-মেল-এ	২৩৩'০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা	২'৫০ টাকা

আজীবন গ্রাহক (৩০ বৎসরান্তে পুনরায় নবীকরণ সাপেক্ষ) ৪০০'০০ টাকা

মাঘ হতে বৎসর আরম্ভ। যে-কোন মাস হতে গ্রাহক হওয়া যায়।

৮৮তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৩

দিব্য বাণী

পুরুষকার কি জানিস? আত্মজ্ঞান লাভ করবই ক'রব, এতে যে বাধাবিপদ সামনে পড়ে, তা কাটাবই কাটাব—এইরূপ দৃঢ় সংকল্প। মা-বাপ, ভাই-বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র মরে মরুক, এ দেহ থাকে থাক, যায় যাক, আমি কিছুতেই ফিরে চাইব না, যতক্ষণ না আমার আত্মদর্শন ঘটে—এইরূপে সকল বিষয় উপেক্ষা ক'রে একমনে নিজের goal (লক্ষ্য)-এর দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টার নামই পুরুষকার। নতুবা অন্য পুরুষকার তো পশু-পক্ষীরাও করছে। মানুষ এ দেহ পেয়েছে কেবলমাত্র সেই আত্মজ্ঞানলাভের জন্য। সংসারে সকলে যে-পথে যাচ্ছে, তুইও কি সেই স্রোতে গা ঢেলে চলে যাবি? তবে আর তোর পুরুষকার কি? সকলে তো মরতে বসেছে! তুই যে মৃত্যু জয় করতে এসেছিস। মহাবীরের মতো অগ্রসর হ। কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করবিনি। ক-দিনের জন্যই বা শরীর? ক-দিনের জন্যই বা সুখ-দুঃখ? যদি মানবদেহই পেয়েছিস, তবে ভেতরের আত্মাকে জাগা আর বল্—আমি অভয়-পদ পেয়েছি। বল্—আমি সেই আত্মা, যাতে আমার কাঁচা আমিত্ব ডুবে গেছে। এই ভাবে সিদ্ধ হয়ে যা; তারপর যতদিন দেহ থাকে, ততদিন অপরকে এই মহাবীর্য-প্রদ নির্ভয় বাণী শোনা—'তত্ত্বমসি', 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' এটি হ'লে তবে জানব যে তুই যথার্থই একগুঁয়ে বাঙাল।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৯৮]
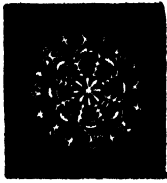
কথাপ্রসঙ্গে

'এগিয়ে পড়'

যাহার জীবন আছে তাহারই গতি আছে। কারণ জীবনের ধর্মই গতি। একটি গানে আছে: ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে। বল কোথায় তোমার দেশ তোমার নাই কি চলার শেষ···।

নদীর স্রোত উদ্দাম বেগে বহিয়া চলিয়াছে। পথিমধ্যে কোথাও তাহার থামিবার বা বিশ্রাম লইবার অবকাশ নাই। অবিরাম গতিতে বহিয়া চলাই যে তাহার ধর্ম, জীবনের চিহ্ন।

নদীর 'দেশ', তাহার লক্ষ্য—সমুদ্র। সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হওয়াতেই তাহার চলার শেষ। তাই যতদিন পর্যন্ত না সে তাহার লক্ষ্যে পৌছিতে পারিয়াছে, সমুদ্রের সহিত মিলিত হইতে পারিয়াছে, ততদিন তাহার চলারও শেষ নাই। বিশ্রামের কোন প্রশ্নই আসে না। চলিতে চলিতে পথিমধ্যে থামিয়া যাওয়া, গতি রুদ্ধ হইয়া যাওয়া—তাহার মৃত্যুরই সামিল। তাই দুই কূলের সৌন্দর্য নদীকে প্রতারিত করিতে পারে না। সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তাহা উপভোগ করিবার জন্য পথিমধ্যে সে থামিয়া যায় না। বরং ঐগুলিকে উপেক্ষা করিয়া নদী তাহার লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উদ্দাম গতিতে আরও জোরে সম্মুখের দিকে ছুটিতে থাকে। কোন প্রকারে একবার সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হইতে পারিলেই হইল। তাহা হইলেই তাহার চলার শেষ, বিশ্রামও অফুরন্ত।

মানুষের জীবনেও সেইরূপ। তাহাকেও যো সো করিয়া একবার তাহার 'দেশে', জীবনের লক্ষ্যে পৌছিতে পারিলেই হইল। তাহা হইলে তাহারও চলার শেষ, বিশ্রাম অফুরন্ত। নদীর 'দেশ', লক্ষ্য—সমুদ্র, এবং সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হওয়াতেই তাহার চলার পরিসমাপ্তি। কিন্তু মানুষের? একটি ব্রাহ্মসঙ্গীতে আছে: ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম অপূর্ব শোভন ভব-জলধির পারে জ্যোতির্ময়। শোক-তাপিত জন সবে চল সকল দুঃখ হবে মোচন। মানুষের 'দেশ', তাহার জীবনের লক্ষ্য—ঐ 'অপূর্ব শোভন' জ্যোতির্ময় 'আনন্দধাম'। ঐ 'আনন্দধাম'-এ একবার পৌছিতে পারিলেই হইল। তাহা হইলেই তাহার সকল দুঃখের পরিসমাপ্তি এবং চলারও শেষ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন: "যো সো করে বড়বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর, তা ধাক্কা খেয়েই হোক, আর বেড়া ডিঙ্গিয়েই হোক।"

'আনন্দধাম'-এ তো যাইব। কিন্তু সেই 'আনন্দধাম' কোথায়? শাস্ত্র বলেন, ইহা সংসারের মধ্যে নাই, জাগতিক বিষয়-বস্তুর মধ্যে নাই, আছে সংসার কোলাহল হইতে বহুদূরে—'ভব-জলধির পারে'। সেখানে পৌছিতে হইলে মানুষকেও নদীর মতো অবিরাম গতিতে সম্মুখের দিকে চলিতে হইবে। পশ্চাতের দিকে তাকাইলে চলিবে না। তাই উপনিষদের ঋষি বলিতেছেন: চরৈবেতি—এগিয়ে চল। স্বামীজীও বলিয়াছেন: "Arise, awake and stop not till the goal is reached—উঠ, জাগো, অভীষ্ট লাভ না হওয়া পর্যন্ত

এগিয়ে চল।" এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি গল্পের কথা মনে পড়ে। "একজন কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে গিছিলো। হঠাৎ এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হলো। ব্রহ্মচারী বললেন, 'ওহে এগিয়ে পড়'। কাঠুরে বাড়ীতে ফিরে এসে ভাবতে লাগলো ব্রহ্মচারী এগিয়ে যেতে বললেন কেন? এই রকম কিছুদিন যায়। একদিন সে বসে আছে, এমন সময় এই ব্রহ্মচারীর কথাগুলি মনে পড়লো। তখন সে মনে মনে ভাবলে, আজ আমি আরো এগিয়ে যাবো। বনে গিয়ে আরো এগিয়ে গিয়ে দেখে যে, অসংখ্য চন্দনের গাছ। তখন আনন্দে গাড়ি গাড়ি চন্দনের কাঠ নিয়ে এলো; আর বাজারে বেচে খুব বড় মানুষ হয়ে গেল। এই রকম কিছুদিন যায়। আর একদিন মনে পড়লো, ব্রহ্মচারী বলেছেন, 'এগিয়ে পড়'। তখন আবার বনে গিয়ে দেখে, নদীর ধারে রূপোর খনি। একথা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। তখন খনি থেকে কেবল রূপো নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতে লাগলো। এত টাকা হল, যে আণ্ডিল হয়ে গেল। আবার কিছুদিন যায়। একদিন বসে ভাবছে, ব্রহ্মচারী তো আমাকে রূপোর খনি পর্যন্ত যেতে বলেন নাই—তিনি যে আমাকে এগিয়ে যেতে বলেছেন। এবার নদীর পারে গিয়ে দেখে, সোনার খনি! তখন সে ভাবলে ওহো! তাই ব্রহ্মচারী বলেছিলেন, 'এগিয়ে পড়।' আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে দেখে, হীরে, মাণিক রাশিকৃত পড়ে আছে। তখন তার কুবেরের মতো ঐশ্বর্য হলো। তাই বলছি যে, যা কিছু করনা কেন, এগিয়ে গেলে আরো ভাল জিনিস পাবে।...আরো এগিয়ে গেলে ঈশ্বর লাভ হবে। তাঁর দর্শন হবে। ক্রমে তাঁর সঙ্গে আলাপ কথাবার্তা হবে।" স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বলিতেন: "যুগের হাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে হুহু করে এগিয়ে যাও। তিনি অপেক্ষা করছেন, পাল তুলে ধরলেই নৌকা ঠিকানায় পৌঁছে যাবে। পাল তোল, পাল তোল। শক্তি তোমাদের যথেষ্ট রয়েছে। নিজের উপর বিশ্বাস রাখ—তাঁর নাম শুনেছি, আমাতে ভয় দুর্বলতা থাকতে পারে না; তাঁর কৃপায় আমি তাঁকে লাভ করবই এ জীবনে। পিছনে তাকিও না। এগিয়ে যাও—তাঁর দর্শন পেয়ে ধন্য হয়ে যাবে, মনুষ্যজন্ম সার্থক হবে। অপার আনন্দের অধিকারী হবে।"

মহাজন-বাক্য হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, গতিই জীবনের উন্নতির চিহ্ন, আর গতিময়তাই তাহার লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায়স্বরূপ। কাজেই এই গতিময়তাকে বজায় রাখাই সাধকের সাধনা।

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যই বা কি এবং 'দেশ'-ই বা কোথায় তাহা আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই। আমাদের চলার পথের উভয়পার্শ্বে রহিয়াছে অপরূপ সৌন্দর্যরাশি—রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শরূপ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুসকল। এই সব বস্তু প্রতি মুহূর্তে আমাদিগকে প্রলোভিত করিতেছে আর অহরহ পশ্চাতে টানিতেছে। এইসব বস্তুর আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া তাহা উপভোগ করিতে গিয়া আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, চলার কথা—সব ভুল হইয়া যায়। এবং পথিপার্শ্বেই আমরা আস্তানা গাড়িয়া ফেলি। ফলে চলার গতি চিরকালের মতো রুদ্ধ হইয়া যায়, লক্ষ্যে আর পৌঁছানো হয় না। যাঁহারা পথিপার্শ্বের ঐসব আপাতমধুর বস্তুসকলের প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া ঐগুলিকে পশ্চাতে ফেলিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া যাওয়ার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করেন—তাঁহারাই পরিণামে লক্ষ্যে পৌঁছিতে সমর্থ হন। বিষয়াসক্তি না কমিলে ঐদিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন: "বিষয়াসক্তি যত কমবে, ঈশ্বরের প্রতি মতি তত বাড়বে।"

উপনিষদ্ বলেন: আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি

ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। অর্থাৎ, আনন্দ হইতেই এই ভূতবর্গ জাত হয়, আনন্দের দ্বারাই তাহারা বর্ধিত হয় এবং অবশেষে আনন্দাভিমুখে প্রতিগমন করে; এবং আনন্দেই বিলীন হয়। তাই শোক-তাপিত, সংসার-অনলে-দগ্ধ মানুষকে সেই আনন্দধামের দিকে যাওয়ার জন্য এই আহ্বান। গীতাতে আছে: যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ অর্থাৎ যাহা লাভ করিলে সাধক অন্য কোন লাভই অধিক মনে করেন না, এবং যাহাতে অবস্থিত হইলে তিনি মহাদুঃখেও বিচলিত হন না। সাধনার এই অবস্থায় উপনীত হইলে সাধকের তখন সর্বপ্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে, তিনি অমৃতত্ব লাভে কৃতার্থ হন। এই অমৃতত্ব লাভের পথে মানুষ যত অগ্রসর হয়, সংসার তাহার নিকট তত পশ্চাতে পড়িতে থাকে।

শাস্ত্রে দুইটি পথের কথা আছে—শ্রেয় আর প্রেয়; নিবৃত্তিমার্গ আর প্রবৃত্তিমার্গ। প্রেয়ের পথে, প্রবৃত্তির পথে আনন্দধামে যাওয়া যায় না। তাহার জন্য শ্রেয়ের পথ, নিবৃত্তির পথ ধরিয়া চলিতে হয়। যাঁহারা শ্রেয়ের পথ ধরিয়া চলিতে চান তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। গীতাতে আছে: (৭।৩) 'মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে' —হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কেহ আত্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রযত্ন করে। তাই আত্ম-তত্ত্ব জানিবার জন্য নচিকেতা যখন যমরাজকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, যমরাজ তখন নচিকেতাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন: এই পৃথিবীতে যাহা যাহা কাম্য এবং দুর্লভ, তৎসমস্ত কাম্যবস্তুই তুমি আমার নিকট প্রার্থনা কর। শতায়ু পুত্র-পৌত্রসমূহ, বহুমূল্যবান স্বর্ণাদি এবং এই পৃথিবীতে বিশাল রাজ্য প্রার্থনা কর। অধিকন্তু তুমি নিজে যত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর তত বৎসর জীবিত থাক। এই যে সুখদায়িনী অপ্সরাগণ বাদ্যযন্ত্র লইয়া তোমার সম্মুখে রহিয়াছে, এইসব অপ্সরা মানুষের লভ্য নয়। ইহাদিগকে আমি তোমার সুখবিধানার্থ দিতেছি। কিন্তু মৃত্যুতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিও না। যমরাজের কোন প্রলোভনই কিন্তু নচিকেতাকে তাহার সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না। তাই যমরাজকে নচিকেতার নিকট আত্মতত্ত্বরহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে হইল।

উপনিষদ্ আরও বলিতেছেন: পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ (কঠ ২।১।১)—আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ বহির্মুখী, তাই বাহিরের জিনিসই সে ভালবাসে। সেই দিকেই সে ধাবিত হয়। তাই আমরা বাহিরের চাকচিক্য দেখি আর তাহাতে মুগ্ধ হইয়া পড়ি। কিন্তু তাহার মধ্যেও কোন কোন শান্ত ব্যক্তি আছেন যাঁহারা আবৃত্তচক্ষু হইয়া 'অমৃতত্বমিচ্ছন্'—অমৃতের অধিকারী হওয়ার বাসনা করেন। তাঁহারা বহির্মুখী ইন্দ্রিয়সকলকে অন্তর্মুখী করিয়া আত্মদর্শন করেন। বহির্মুখী ইন্দ্রিয়সকলকে অন্তর্মুখী করিবার জন্য চাই নিরন্তর সাধনা। যীশুখ্রীষ্টের উপদেশে আছে: 'Seek and ye shall find', 'Knock and the door will be opened unto you'—খোঁজ, তবেই পাইবে, ধাক্কা দাও, তবেই দরজা খুলিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না দরজা খুলিয়াছে ততক্ষণ ধাক্কা দিয়া যাইতে হইবে। যতক্ষণ না পালে হাওয়া লাগে ততক্ষণ কষ্ট করিয়া দাঁড় টানিয়া যাইতে হয়। কৃপা-বাতাস উঠিলে আর দাঁড় টানিতে হয় না, পাল তুলিলেই হয়। খানদানী চাষা যেমন বৃষ্টি-বাদলা হইলেও নিত্য হাল নিয়া মাঠে যায়,

সাধকেরও তাঁহার কৃপা অনুভব করা ব্যতিরেকেও নিত্য তাঁহাকে ডাকিয়া যাইতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন রোক্ চাই। "এক দেশে অনাবৃষ্টি হয়েছে। চাষারা সব খানা কেটে দূর থেকে জল আনছে। একজন চাষার খুব রোক্ আছে; সে একদিন প্রতিজ্ঞা করলে যতক্ষণ না জল আসে, খানার সঙ্গে আর নদীর সঙ্গে এক হয়, ততক্ষণ খানা খুঁড়ে যাবে। এদিকে স্নান করবার বেলা হলো। গৃহিণী মেয়ের হাতে তেল পাঠিয়ে দিল। মেয়ে বল্লে—'বাবা! বেলা হয়েছে, তেল মেখে নেয়ে ফেল।' সে বল্লে, 'তুই যা আমার এখন কাজ আছে।' বেলা দুই প্রহর একটা হলো, তখনও চাষা মাঠে কাজ করছে। স্নান করবার নামটি নাই।—তার স্ত্রী তখন মাঠে এসে বললে, 'এখনও নাও নাই কেন? ভাত জুড়িয়ে গেল, তোমার যে সবই বাড়াবাড়ি। না হয় কাল করবে। কি খেয়ে দেয়েই করবে।' গালাগালি দিয়ে চাষা কোদাল হাতে করে তাড়া করলে; আর বললে, 'তোর আক্কেল নাই? বৃষ্টি হয় নাই। চাষবাস কিছু হলো না। এবার ছেলেপুলে কি খাবে? না খেয়ে সব মারা যাবি! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, মাঠে জল আনবো, তবে আজ নাওয়া খাওয়ার কথা কবো।' স্ত্রী গতিক দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল। চাষা সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সন্ধ্যার সময় খানার সঙ্গে নদীর যোগ করে দিলে। তখন একধারে বসে দেখতে লাগলো যে, নদীর জল কুল কুল করে আসছে। তার মন তখন শান্ত আর আনন্দে পূর্ণ হলো। বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে বললে, 'নে এখন তেল দে আর একটু তামাক সাজ। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে নেয়ে খেয়ে ভোঁস ভোঁস করে নিদ্রা যেতে লাগলো।...খুব রোক্ না হলে, চাষার যেমন জল আসে না, সেইরূপ মানুষের ঈশ্বর লাভ হয় না।"

নদীর যখন সমুদ্রের সঙ্গে যোগ হইয়া গেল, তখনই তাহার চলার শেষ হইল। চাষা যখন 'খানার সঙ্গে নদীর যোগ করে দিলে', তাহার 'মন তখন শান্ত আর আনন্দে পূর্ণ হলো।' সেইরূপ সাধক যখন সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইতে ঈশ্বর-রূপ 'আনন্দধাম'-এ পৌঁছিয়া গেলেন, তখনই তাঁহার চলার শেষ, সাধনার পরিসমাপ্তি।

বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু, জয় প্রভু। তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু। অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে। এইরূপেই আমরা অগ্রগামী হইব,—একজন পড়িবে, আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীগুরুদেব / শ্রীচরণভরসা

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়, হাওড়া

শ্রীমান সতীন্দ্রনাথ ১০।১১।২২

তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। তুমি ঢাকা হইতে আসিয়া আমার সহিত তো দেখা করিয়াছিলে পুনরায় আবার একবার দেখা হয় নাই বলিয়া দুঃখিত হইয়াছ। দুঃখের কোন কারণ নাই আমি তোমায় সর্ব্বদাই স্নেহ করি! তুমি সুবিধামত যথাসাধ্য প্রভুর পুতপাবন নাম জপ কর, কোন চিন্তা নাই, প্রভু বড় দয়াল; তিনি সময়মত তোমার সব সুবিধা করিয়া দিবেন। এখন যে কায শিখিতেছ মনোনিবেশ করিয়া তাহা শিখিতে থাক। ভয় নাই, প্রভু তোমায় বিপথে লইয়া ফেলিবেন না। তিনি তোমায় ঠিক ঠিক পথে চালাইবেন। প্রার্থনা করিও যে, প্রভু, আমি দুর্ব্বল, আমাকে বল দাও, আমাকে ঠিক ঠিক পথে চালাও, আমি অজ্ঞ বালক, আমাকে জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস দাও। আমাকে উপদেশ দিবার লোক এখানে কেহই নাই, প্রভু তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। এইরূপ প্রার্থনা করিলেই প্রভু তোমায় ঠিক চালাইবেন। তিনি জীবন্ত জাগ্রত দেবতা, যুগধর্ম সংস্থাপক, ভগবানের অবতার। এ যুগে যে তাঁর শরণ লইবে তার আর কোন ভয় নাই। তুমি তাঁর সন্তানের কাছে তাঁর পতিতপাবন অনন্ত নামে দীক্ষিত হইয়াছ, তোমার ভয় কি? কোন ভয় নাই। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহ আশীর্ব্বাদ জানিবে। আমার শরীর তত মন্দ নয়।

ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীপ্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জয়তি

মঠ, ১৮।৯।৯৬

প্রেমাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়েষু—

গতকল্য আপনার প্রেরিত পত্র ও নামাবলী পাইয়া পরম প্রীত হইলাম। আপনার পত্রখানি বিশেষ ভক্তিপূর্ব্বক লিখিত হইয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আপনার এরূপ ভক্তিপূর্ব্বক লিখিবার কি অভিপ্রায় এই যে তাঁহাকে ব্যাকুল হইয়া ডাকিতে পারিলেই কর্ম্মফল তাঁহার কৃপায় আপনি ক্ষয় পাইবে?

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ বোধকরি আজকাল সুইজারল্যাণ্ডে আছেন। তিনি যে ইয়োরোপে কেবল মাত্র বেদান্ত মতই প্রচার করিতেছেন তাহা নহে। কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ এবং জ্ঞানযোগ ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিমিত্ত তিনি এই চারিটি শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন, তবে তিনি সকলকেই সেই এক লক্ষ্য দেখাইয়া দিতেছেন। উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মলাভই সকল সাধকের চরম সীমা ও লক্ষ্য, একই সত্য; আর সকলই মিথ্যা তিনি ভিন্ন আর যাহা কিছু দৃশ্যমান তাহা কেবল অস্তিত্বের ভাণ মাত্র ও কল্পিত। সেই এক সত্তায়ই সকল বিদ্যমান। সেই এক

প্রকাশেই সকল প্রকাশমান এবং সেই এক আনন্দই ব্রহ্মানন্দ, যাহা হইতে অধিক সূক্ষ্ম মহৎ শাস্তিকর ও পরম উৎকৃষ্ট রহস্য ইতিপূর্ব্বে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই বা পরে হইবেও না। কি ব্রহ্মবিদ্ দেবগণ, ইহাদিগের অপেক্ষাও যদি কেহ অধিক শক্তিসম্পন্ন ও অধিক ধীমান থাকেন ত তাহাদিগকেও এক বাক্যে গললগ্ন কৃতবাসে জলদগম্ভীর স্বরে বলিতে হইবে যে "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়"—ইহাকে অতিক্রম করেন এমন অনন্ত জগতে হন নাই ও পরেও হইবেনও না। যে পরম সিদ্ধান্তে সমস্ত শঙ্কা নিরস্ত হইয়াছে, সকল সংশয় অপগত হইয়াছে সকল ভ্রম বিদূরিত হইয়াছে এবং সকল দুঃখ নিবৃত্ত হইয়াছে সেই নিঃশ্রেয়স্‌পর সিদ্ধান্ত শিরোমণির প্রচার করিয়া কি স্বামী বিবেকানন্দ কোন প্রকার শাস্ত্রমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন? আমেরিকায় ইউরোপে যে সকল লোক আজ ৪ বৎসর অবধি স্বামী বিবেকানন্দের সেবা করিয়া তাঁর উপদেশ সকল হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন তাঁহাদিগকে অবশ্যই আমাদের জিজ্ঞাসু বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। ব্যবহার দশায় পক্ব না হইলে তাঁহারা কথনই পরমার্থের জন্য লালায়িত হইতে পারিতেন না, অবশ্যই আমাদিগকে তাঁহাদের এই জিজ্ঞাসা সত্ত্বগুণের আধিক্য বশতঃই স্বীকার করিতে হইবে। বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন শঙ্কর বিজয়ে অদ্বৈতগত প্রাণ ভগবান শঙ্করাচার্য্য স্বীয় মাতা কর্ত্তৃক শাস্ত্রোদিত সংস্কার দ্বারা সদ্‌গতির জন্য আদিষ্ট হইলে তিনি প্রথমেই তাঁহাকে সেই নিঃশ্রেয়স্‌পর ব্রহ্ম উপদেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। যথা—তস্মৈ সুখরূপমেকং মায়ামায়াশেষ বিশেষ শূন্যং মানাতিগং স্বপ্রভমপ্রমেয়ম্ উপনিষদ্ ব্রহ্ম পরং সনাতনম্ ইত্যাদি—তাঁহার মাতার এই নির্গুণ ব্রহ্মে বুদ্ধি আরূঢ় না হওয়ায় পরে তাঁহাকে অন্য সগুণ সাকার-দেবতার উপদেশ করিতে হইয়াছিল। এখানে একটি কথা স্মরণ হইল, ইহা বড় আশ্চর্য্যের কথা যে আচার্য্য-জননী সতী আজন্ম শিবারাধনা করিয়া অন্তে কেন শিবলোকে যাইতে সম্মত না হইয়া বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করিলেন।

শঙ্কর বিজয়ের পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবিধ মতাবলম্বীদিগের মত সকল নিরস্ত করিয়া সকলকেই তিনি—ব্রহ্মাহমিতি রূপায়াং মুক্তোভবথ নান্যথা ইত্যাকারে কেবল অদ্বৈতকে বড় করিতে দেখা যায়। তিনিই আবার অন্য একস্থানে বলিয়াছেন "সাধনচতুষ্টয়সম্পনাভাবেঽপি গৃহস্থানামাত্মানাত্ম-বিচারে ক্রিয়মাণে সতি প্রত্যবায়ো নাস্তি কিন্তু বিশ্রেয়ো ভবতি।"—যাহা হোক আমরা ইহা বিশেষরূপে অবগত আছি যে অনেকগুলি সাহেব বিবি স্বামী বিবেকানন্দের নিকট উপদিষ্ট হইয়া সবিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে সাধন ভজন করিতেছেন। তাঁহাদিগের কাহারও কাহারও ভক্তিপূর্ণ পত্রও আমরা পাইয়া থাকি। তাঁহারা বিভিন্ন দেশবাসী ও বিভিন্ন ভাষাভাষী বলিয়া যে সদসদ্ বিচারের অধিকারী পর্য্যন্ত হইতে পারেন না—তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। মানুষ কল্যাণ কামনা করিয়া টিয়া পাখিকেও শ্রীরাধা কৃষ্ণ প্রভৃতি নাম পড়াইয়া থাকে। মণ্ডন মিশ্রের দ্বারে যদি বীরাঙ্গনারা পর্য্যন্ত 'স্বতঃ প্রমাণং পরতঃ প্রমাণম্' ইত্যাকার বেদ বিচারে সমর্থ হইত ত আজ সভ্য জগতের লোক কেন না সে বিষয়ের বিচারে সমর্থ হইবে।…লক্ষের মধ্যে যদি সকলেই সেই একজন হয় তাহা হইলে আর কাহাকে কাহা হইতে ভিন্ন করি?…'মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে'…লক্ষ মনুষ্য এককালে উপদিষ্ট হইলে বোধ করি এক জনের তন্মধ্যে প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্ হইবার সম্ভাবনা। যদি লক্ষ মনুষ্য রণ করিতে যায় ত সকলেই কি অক্ষত শরীরে বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসে? অতি অল্প সংখ্যকই বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিবে। যাহারা

রণে [হত] হয় তাহারা কি বিজয়ীদিগের বিজয়ী হইবার অন্যতম কারণ নহে? তাহারা রণে প্রাণ বিসর্জন না করিলে কি কেহ বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিত? সেইরূপ সহস্র সহস্র লোক সাধন করিতে আরম্ভ করিলেই যে সকলেই এই জন্মে সিদ্ধ হইবে তাহার কোন কারণ নাই, তবে অগ্রপশ্চাৎ সকলেই সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। ইতি

আমার সপ্রেম আলিঙ্গন ও শ্রদ্ধা সম্মান জানিবেন। বাড়ীর অন্যান্য সকলকে আমার ভালবাসা জানাইবেন। শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ স্বামীর সহিত কি আপনার সাক্ষাৎ হয়? উপেন্দ্র-বাবু আজকাল কি করিতেছেন? আমি এক্ষণে ভাল আছি জানিবেন। এবার পূজার পরে ৺কাশী যাইবার ইচ্ছা আছে—তবে বলিতে পারি না অদৃষ্টে কি আছে। ইতি

আপনার
গঙ্গাধর

সাধ্বী সীতা

শ্রীপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায়

তমসা নদীর তীরে বসি নিজ ধ্যাননীড়ে
মনের তমসা দূর করিবারে
রচেছিলে রামায়ণে মজি রামনাম গানে
প্রচারিলে ভবে রাম অবতারে।
মনের কল্পলোকে যবে চলেছিলে এঁকে
সীতার করুণ জীবনের ছবি,
গতি রুধি লেখনীর মোছনি কি অশ্রুনীর
ক্ষণে ক্ষণে, হে বিশ্বের আদিকবি।
বৈদেহ-পালিতা সুতা ভূমিলক্ষ্মী নামে সীতা
রাম-পরিণীতা হ'ল সাধ্বীসতী,
অযোধ্যার যুবরানী গৃহ হ'ল অরণ্যানী
অদৃষ্টের পরিহাস রূঢ় অতি।
শান্তি নহে তাঁর তরে দুঃখ জীবন ভ'রে
আরো কত ছিল কপাল লিখন,
পতির সেবায় ব্রতা অরণ্যে ছিল সীতা
আসিয়া রাবণ করিল হরণ।
চেড়ীগণ পরিবৃতা অশোক কাননে সীতা
বলে সরমাকে দুখের কাহিনী।
রাবণ বধের শেষে রাম রাজা ফিরে দেশে
কদিন বা থাকে সীতা রাজরানী।

প্রজাগণ সাধে বাদ মিছে আনি অপবাদ
ঘটায় রাজার মনেতে বিকার
রাজা তুষি প্রজাগণে পাঠায় রানীকে বনে
বাল্মীকি আশ্রমে হ'ল বাস তার।
বাল্মীকি আশ্রমে জাত লবকুশ সীতাসুত
লালিত সেথায় মুনির রক্ষণে,
তাদের কল্যাণ বুঝে শিখাইল মুনি নিজে
গাহিতে রামগান মধুর স্বনে।
চিরদুখী তবু সীতা মূর্তিমতী সহিষ্ণুতা
স্মরিল শেষে ধরিত্রী মাতায়,
সর্বংসহা সে মাতা হারাইয়ে সহিষ্ণুতা
টেনে নিল কোলে বিধুরা সুতায়।
হেন সীতাকে প্রশস্তি জানালেন মহামতি
স্বামীজী এক অপরূপ ভাষণে—
শুদ্ধা হতে শুদ্ধতরা আদর্শ নারীর সেরা
কে এঁকেছে হেন ছবি কোন্‌খানে।
যদিবা বেদের লোপ হয় পুরাণ বিলোপ
সংস্কৃত কালস্রোতে ভেসে যায়,
পাঁচজন হিন্দু নামে যতদিন রবে গ্রামে
গ্রাম্যভাষে তারা স্মরিবে সীতায়।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনে কাশীপুর উদ্যানবাটীর ঐতিহাসিক তাৎপর্য

স্বামী প্রভানন্দ

কাশীপুর-বরাহনগর-আলমবাজার অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল বেশ কিছু সংখ্যক বাগান-বাড়ি। এমন একটি বাগানবাড়ি ছিল মতিঝিলের উল্টোদিকে কাশীপুর রোডের উপর। বাগান-বাড়ির মালিক রানী কাত্যায়নীর জামাই গোপাল চন্দ্র ঘোষ। এগারো বিঘা চারকাঠার কিছু বেশি জমির উপর বাগানবাড়ি। জমির চার-দিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। গাছ-পাতা-ঘাস দিয়ে সাজানো সুন্দর একটি বাগানবাড়ি। শ্রীরামকৃষ্ণ এই বাগানবাড়িতে এসে উঠেছিলেন ১১ ডিসেম্বর ১৮৮৫। পুঁথিকার লিখেছেন, 'ভারি খুশি হৈলা রায় দেখিয়া বাগান।' এখানে তিনি চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার জন্য এক নাগাড়ে ১৬ অগস্ট ১৮৮৬ পর্যন্ত ২৪৮ দিন বাস করে-ছিলেন। এখানেই তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেছিলেন। শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, 'কাশীপুর বাগান তাঁর অন্ত্যলীলার স্থান। কত তপস্যা, ধ্যান, সমাধি! তাঁর মহাসমাধির স্থান—সিদ্ধ-স্থান। ওখানে ধ্যান করলে সিদ্ধ হয়।' (শ্রীশ্রীমায়ের কথা ২/১৫৪)

সে-সময়ে কাশীপুর একটি নির্জন পল্লী। কাশীপুর-চিৎপুর অঞ্চল ছিল দক্ষিণ সুবারবন পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত। স্বতন্ত্র পৌরসভা 'কাশীপুর-চিৎপুর' গঠিত হয়েছিল ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। কাশীপুর অঞ্চলে কেনাবেচার প্রধান কেন্দ্র ছিল ভেরীতলা ও বিবিবাজার। আর নর্থ সুবারবন হাসপাতালই ছিল এ-অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য চিকিৎসা-কেন্দ্র।

বাগানের উত্তর-পূর্বদিকে একটি বড় পুষ্করিণী, তার উত্তর-পশ্চিম কোণে কয়েকটি একতলা ঘর। বাগানের পশ্চিমে একটি ছোট পুষ্করিণী, যার পূর্বদিকে ছিল একটি প্রশস্ত শানবাঁধানো ঘাট। বড় পুষ্করিণীটি ছোটটির প্রায় চারগুণ বড়। দুই পুষ্করিণীর মধ্যে ইটে বাঁধানো প্রায় গোলাকার বাগান-পথ পরিবৃত একটি দোতলা বাড়ি। উপরে দুখানা ঘর। বড় ঘরটিতে বাস করতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। নিচেকার হলঘর ছিল ভক্তদের বৈঠকখানা, হলঘরের দক্ষিণ-পশ্চিমের ঘরটি ছিল সেবক-ভক্তদের থাকার ঘর। এবং কাঠের সিঁড়ির পাশের ছোট ঘরটি ছিল শ্রীশ্রীমায়ের জন্য নির্দিষ্ট।

স্বামী বিবেকানন্দ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতারবরিষ্ঠ' বলে ঘোষণা করেছেন। এটা ভক্তিবিনম্র শিষ্যের গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিমাত্র মনে করলে ভুল হবে। স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক প্রজ্ঞালোকে ধরা পড়েছিল অবতারপুরুষ সকলের মধ্যে অবতীর্ণ ঈশশক্তির প্রগতিমূলক উদ্ভাস। তিনি লিখেছেন, 'সর্ব-ভূতান্তর্যামী প্রভুও প্রত্যেক অবতারে আত্মস্বরূপ সমধিক ব্যক্ত করিতেছেন।'[১] এবং শ্রীরাম-কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধে তিনি অন্যত্র মন্তব্য করেছেন, 'শ্রীভগবান পরম কারুণিক, সর্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্বভাব-সমন্বিত, সর্ববিদ্যা-সহায়।'[২] সে-কারণেই তাঁর মূল্যায়নে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার-বরিষ্ঠ। আরও কথা। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-সাধনার মধ্যে ঈশশক্তি সর্বাধিক বিকশিত হওয়ার

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ খণ্ড, পৃঃ ৫

২ তদেব, ৬ খণ্ড, পৃঃ ৬

ফলে, স্বামী বিবেকানন্দের মতে, 'মহাযুগচক্র' প্রবর্তিত হয়েছে, এক 'নবযুগধর্ম' সংস্থাপিত হয়েছে, 'সত্যযুগের' আরম্ভ হয়েছে। এর ফল-শ্রুতি—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগীদের মধ্যে নতুন চেতনার সঞ্চার হয়েছে, যুগান্তকারী রাম-কৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের উদ্ভব হয়েছে। যদিও শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা-সম্বরণের পূর্বে এই আন্দোলন ছিল ক্ষীণালোকিত, তবু তার অনিবার্য আকর্ষণ অনুভব করেছেন অনেকেই।

শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্য ঐতিহাসিক ভূমিকাটি বুঝতে হলে তাঁর জীবনসাধনার প্রবাহ ও তাঁর অববাহিকার কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন, সে-সঙ্গে প্রয়োজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক আরনল্ড টয়েনবির মূল্যবান মন্তব্যটি স্মরণ করা। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনসাধনা সম্পর্কে লিখেছেন, 'তাঁর ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ ও উপলব্ধির অন্তর্ভুক্ত এত সব কিছু রয়েছে যা ইতোপূর্বে ভারতবর্ষে বা অন্যত্র কোন ধর্মীয় প্রতিভা আয়ত্ত করতে পারেননি।' তাঁর জীবন-কাহিনীর প্রতিটি অংশ স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল, কিন্তু বর্তমানে তাঁর জীবন-নদীর মোহনা বা অন্ত্যলীলা বলে চিহ্নিত অংশটির প্রতি আমরা মনোনিবেশ করব। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করে কলকাতায় চলে এসেছিলেন ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫। সে-সময় থেকে কাশীপুর বাগানবাড়িতে ১৬ অগস্ট ১৮৮৬ তাঁর মানব-লীলা সম্বরণ করা পর্যন্ত কাল তাঁর অন্ত্যলীলার অন্তর্ভুক্ত। আবার অন্ত্যলীলার অন্তর্গত কাশীপুর-পর্বটাই বৃহৎ পরিমাপের ও সর্বশেষের; এবং ভাবৈশ্বর্যের দিক থেকেও তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বলরামভবনে ও শ্যামপুকুরবাটীতে যে ভাবগুচ্ছের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল, সেই ভাবগুচ্ছ অনেকটা স্পষ্টরূপ ধারণ করেছিল কাশীপুর-পর্বেই। দেখা যায়, এই ভাবগুচ্ছ থেকেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন জন্মলাভ করেছিল, পুষ্টিলাভ করেছিল। এ-কারণেও আট মাসাধিক কালের কাশীপুর-পর্ব মাধুর্যঘন ভাবে সমৃদ্ধ।

কাশীপুর বাগানবাড়িতে সংঘটিত এ-কালের ঘটনাবলীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা আমরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশটি অবধারণ করতে পারি, ভাবান্দোলনের ভবিষ্য-ভূমিকারও ইঙ্গিত পাই। তাছাড়াও এই ভাবান্দোলনের প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের ঐতিহাসিক মিশনটিও এই পর্বেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আলোচ্য ঘটনাবলীতে অনুস্যূত ধারাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিম্নলিখিত কয়েকটি:

প্রথম, আলোচ্য ভাবান্দোলনের প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ এইকালের মধ্যেই তাঁর স্বরূপ-পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন, 'হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে' দিয়েছিলেন, আত্মপ্রকাশ করে সকলকে অভয়-দান করেছিলেন। তিনি এইকালে ভাবমুখ আশ্রয় করে দিব্যভাবে মাতোয়ারা হয়ে থাকতেন, উপস্থিত সকলকে মাতিয়ে মাচিয়ে রাখতেন। ক্যানসারে পর্যুদস্ত তাঁর শরীরখানি সম্বন্ধে তিনি বলতেন, 'কি দেখছি জান? শরীরটা যেন বাঁখারি সাজানো কাপড়মোড়া, সেইটে নড়ছে। ভিতরে একজন আছে বলে নড়ছে।' তিনি প্রতিনিয়ত অনুভব করতেন যে, তাঁকে আশ্রয় করে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হচ্ছে ভগবান ও ভক্তের ভূমিকায় দুটি ধারা। সর্বোপরি তিনি উপলব্ধি করেছেন যে জগজ্জননী তাঁর দেহমন আশ্রয় করে 'মহাযুগচক্র' প্রবর্তনের প্রস্তুতি করছেন। অবশ্য আর কেউ এ-বিষয়ে আঁচ করতে পেরেছিল কিনা সন্দেহ।

দ্বিতীয়, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাঁরা যাতায়াত করতেন তাঁরা এইকালেই অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ এ-দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ—যেমন নাটমন্দিরের ভিতরের থাম ও

বাইরের থাম। যাঁরা বাগানবাড়িতে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের একটু খোঁজখবর মাত্র নিতেন তাঁরা বহিরঙ্গ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ব্যাধির একটি পরোক্ষ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, 'এতে আগাছা পালায়। যারা শুদ্ধ ভক্ত তারাই কেবল থাকবে। এই ব্যারাম হয়েছে কেন? এর মানে ঐ। যাদের সকাম ভক্তি, তারা ব্যারাম অবস্থা দেখে চলে যাবে।' এভাবে আপনা থেকেই বাছাই হয়ে যাবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

তৃতীয়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গদের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছিলেন আশিষ্ট, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ কয়েকটি তাজা প্রাণীকে। তাঁদের জীবন ত্যাগ ও বৈরাগ্যের দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন পথ ধরে অগ্রসর করিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাদানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লীলা-প্রসঙ্গকার লিখেছেন, 'ঠাকুর তাহাদিগকে নিজ স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের ভাব রক্ষা-পূর্বক সামান্য বা গুরুতর সকল বিষয়ে তাহাদিগের সহিত এমন ব্যবহার করিতেন যে, তাহারা প্রত্যেকেই অনুমান করিত তিনি সকল ধর্মমতে পারদর্শী হইলেও সে যে পথে অগ্রসর হইতেছে তাহাতেই অধিকতর প্রীতিসম্পন্ন।'[৩] লীলা-প্রসঙ্গকার আরও লিখেছেন, 'সে যে ভাবের ভাবুক তাঁহার মনে তখন সেই ভাব প্রবল হইয়া অন্য সকল ভাবকে কিছুক্ষণের জন্য প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত এবং উক্ত ভাবে সিদ্ধি লাভ করিবার দিকে ঐ ব্যক্তি কতদূর যাইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না তাহা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়া তিনি তাহার পথের বাধা সকল সরাইয়া তাহাকে উচ্চতর ভাবভূমিতে আরূঢ় করাইতেন।'[৪] এভাবে কাশীপুরের আরোগ্য-নিকেতন ধর্মশিক্ষণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। অধ্যাত্মভাব বিকশিত হয়ে সাধকদের জীবন মধুময় করে তুলেছিল। শ্রীরাম-কৃষ্ণের পরিচালনাধীনে কাশীপুর-সাধনক্ষেত্র যেন পুরাণকথিত নৈমিষারণ্যে পরিণত হয়েছিল।

চতুর্থ, একদিকে তরুণ তাপসদের ব্যক্তি-জীবনে অধ্যাত্মভাবের বিকাশ ঘটেছিল, অপর-দিকে সকলের অজ্ঞাতসারে তাদের সমষ্টিজীবনে সংহতির ভাব দানা বেঁধে উঠেছিল। অন্যতম তাপস শরৎচন্দ্র পরবর্তিকালে লিখেছিলেন, 'একদিকে ঠাকুরের শুদ্ধ নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রবল আকর্ষণ, অন্যদিকে নরেন্দ্রনাথের অপূর্ব সখ্যভাব ও উন্নত সঙ্গ একত্র মিলিত হইয়া তাহাদিগকে ললিত-কর্কশ এমন এক মধুর বন্ধনে আবদ্ধ করিল যে, এক পরিবার-মধ্যগত ব্যক্তি-সকল অপেক্ষাও তাহারা পরস্পরকে আপনার বলিয়া সত্য সত্য জ্ঞান করিতে লাগিল।'[৫] ভগবৎ-চরণে সমর্পিত-প্রাণ ষোল-সতের জন ত্যাগী যুবক সংঘবদ্ধ হয়ে নিটোল একটি গোষ্ঠীতে পরিণত হলেন। ব্রাহ্ম নেতাদের কেউ কেউ অভিযোগ তুলেছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের Organising faculty-র অভাব, কিন্তু এই সংগঠন ও তার উজ্জ্বল ভূমিকা তাঁর কুশল নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচয় সন্দেহ নাই। অপরপক্ষে ঐ-সকল দক্ষ ব্রাহ্ম নেতাদের সংগঠিত সম্প্রদায় ইতোমধ্যেই কালের হাওয়ায় বিলীনপ্রায়। যাহোক, এভাবে ত্যাগী ভক্তদের সংঘ গড়ে তুলবার মুখেই তিনি তাদের এগারোজনকে গেরুয়া বস্ত্র দান করে-ছিলেন। সে-দিনটি ছিল সম্ভবতঃ ৯ জানুআরি ১৮৮৬। তাছাড়াও তিনি ত্যাগী তাপসদের

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫ খণ্ড, পৃঃ ২০২-৩

৪ তদেব, ৫ খণ্ড, পৃঃ ২৬৫

৫ তদেব, ৫ খণ্ড, পৃঃ ৩৫১-২

পাঠিয়েছিলেন ঘরে ঘরে গিয়ে ভিক্ষা করে আনবার জন্য। এবং তাদের উৎসাহিত করবার জন্য তিনি নিজেও পবিত্র ভিক্ষান্ন মণ্ড করে খেয়েছিলেন। এভাবে কাশীপুরেই রামকৃষ্ণ সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কাশীপুরই প্রথম রামকৃষ্ণ মঠ।

পঞ্চম, শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগী যুবকদের সংঘবদ্ধ করেছিলেন তাপস নরেন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে। স্বয়ং নরঋষি তাঁর সাদর আহ্বানে সাড়া দিয়ে নরেন্দ্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'অতসব লোক এখানে আসিল, নরেন্দ্রের মত একজনও কিন্তু আর আসিল না।'[৬] সেই নরেন্দ্রনাথকে তিনি মনের মতো গড়ে তুললেন। সকলের সামনে ঘোষণা করলেন, 'আমার নরেন্দ্রর ভিতর এতটুকু মেকি নেই; বাজিয়ে দেখ টং টং করছে।' আবার ১১ ফেব্রুআরি, শনিবার সন্ধ্যাবেলায় এক টুকরো কাগজে তিনি চাপরাস লিখে দিলেন, 'জয় রাধে প্রেমময়ী, নরেন শিক্ষে দিবে, যখন ঘরে-বাইরে হাঁক দিবে, জয় রাধে।' নরেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করে বলেন, 'আমি ও-সব পারব না।' শ্রীরামকৃষ্ণ জোর দিয়ে বলেন 'তোর হাড় করবে।' এদিকে নরেন্দ্রনাথের নির্বিকল্প সমাধি-সুখ লাভের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়ে গেল মে-মাসের এক সন্ধ্যাবেলা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'কেমন, মা তো আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলেন? চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে তখন আবার চাবি খুলব।' তাঁর মহাসমাধির কয়েকদিন পূর্বে তিনি অলৌকিক উপায়ে নরেন্দ্রনাথের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে দিয়ে বললেন, 'আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের কাজ করবি।' তাছাড়াও নরেন্দ্রনাথকে বারংবার বললেন, 'দেখ নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি, কারণ তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালবেসে, যাতে আর ঘরে ফিরে না গিয়ে একস্থানে খুব সাধন-ভজনে মন দেয়, তার ব্যবস্থা করবি।' তাছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে নরেন্দ্রনাথকে বলে দিয়েছিলেন: 'রাখালের রয়েছে রাজবুদ্ধি,' 'শরতের রয়েছে ভার বইবার শক্তি,' ইত্যাদি। এভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর-পর্বেই নরেন্দ্রনাথকে ত্যাগী ভক্তদের নেতার ভূমিকায় সংস্থাপিত করেছিলেন।

ষষ্ঠ, ভক্তদের সকলেই জানতেন যে, শ্রীশ্রীমা কাশীপুর বাগানবাড়িতে যোগদান করেছিলেন মুখ্যতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের পথ্য তৈরি করে দেবার জন্য, তাঁর কিছু সেবা-শুশ্রূষা করবার জন্য। কিন্তু সকলের অগোচরে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে তিনি এক বৃহত্তর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন এইকালেই। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে অনুযোগ করে বললেন, 'হ্যাঁ গা, তুমি কি কিছু করবে না? (নিজের দেহ দেখিয়ে) এই সব করবে?' শ্রীশ্রীমা মৃদুস্বরে বলেন, 'আমি কি করতে পারি?' শ্রীরামকৃষ্ণ তার উত্তরে বলেন, 'না, না, তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে।' অপর একদিনের ঘটনা। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের ঘরে খাবার নিয়ে গিয়ে দেখেন তিনি চোখ বুজে শুয়ে আছেন। শ্রীশ্রীমা বলেন, 'এখন খাবে যে, ওঠ।' শ্রীরামকৃষ্ণ যেন কোন দূর দেশ থেকে ফিরে এসে ভাবের ঘোরে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ছাখ, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।' শ্রীশ্রীমা আক্ষেপ করে বলেন, 'আমি মেয়ে-মানুষ! তা কি করে হবে?' শ্রীরামকৃষ্ণ তখন নিজের শরীর দেখিয়ে আপন-

৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫ খণ্ড, পৃঃ ২০৯

ভাবেই বলতে থাকেন, 'এ আর কি করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশী করতে হবে।' কালক্রমে দেখা গেল শ্রীশ্রীমা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করতে অগ্রসর হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর শ্রীশ্রীমা তাঁর দুরপনেয় অভাব অনেকাংশে দূর করেছিলেন তাই নয়, তিনি স্বমহিমায় 'জননীং জগতাম্' ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর অপর এক ভূমিকার স্বীকৃতি জানিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'এমন কেউ ছিল না, যে একটু সহানুভূতি জানাবে আমাকে। শুধু একজন ছাড়া। সেই একজনের সহানুভূতিই আশা ও আশীর্বাদ বহন করে এনেছিল।...একমাত্র তিনিই আমাদের আদর্শের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করতেন।'[৭] ফলতঃ তিনি একাধারে 'জগৎ-জননী' ও 'সঙ্ঘজননী'-রূপে সমাদৃত হয়েছিলেন।

আরও স্মরণ করা যেতে পারে যে, স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে নারীজাতির পুনর্জাগরণ ঘটবে। এ-বিষয়েও শ্রীশ্রীমায়ের ভূমিকা গৌরবময়। তাঁর আদর্শবোধ, ত্যাগ, সেবা, ক্ষমা, ধৈর্য, স্নেহ ভারতের নারীজাতির চলার পথের পাথেয়। শ্রীশ্রীমায়ের মহাপ্রয়াণের পর জোসেফিন ম্যাকলাউড যথার্থই লিখেছিলেন, 'সেই নির্ভীক, শান্ত, তেজস্বী জীবনের দীপটি তাহলে নির্বাপিত হল,—আধুনিক হিন্দুনারীর কাছে রেখে গেল আগামী তিন হাজার বছরে নারীকে যে মহিমময় অবস্থায় উন্নীত হতে হবে, তারই আদর্শ।'[৮]

সপ্তম, এই কাশীপুর-অধ্যায়েই প্রত্যেক গৃহীভক্ত পরম আকাঙ্ক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণ-কৃপা লাভ করেছিলেন। এই কালের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অমৃত-স্পর্শ দিয়ে বা ইচ্ছামাত্রে গৃহীভক্তদের অধিকাংশকে নিজ নিজ ইষ্ট দর্শন করিয়ে দিয়েছিলেন; সর্বোপরি তিনি আত্মপ্রকাশ করে প্রত্যেককে চিরকালের জন্য অভয়দান করেছিলেন। কৃপাধন্য গিরিশচন্দ্র বলে বেড়াতেন যে, তিনি কাউকে বা কিছুকে আর ভয় করেন না। তাঁর এই কৃপা ও অভয়দানের ফলশ্রুতি এই যে, তাঁরা প্রত্যেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্দেশিত 'গৃহস্থ-সন্ন্যাসীর' আদর্শ নিজ নিজ জীবনে বিকশিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁদের সমবেত চর্যায় ত্যাগ ও সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় গৃহীর আদর্শ পুনরায় সমাজের সামনে সংস্থাপিত হয়েছিল।

অষ্টম, শ্রীরামকৃষ্ণের ও কাশীপুর বাগানবাড়ির খরচপত্র বহন করতেন গৃহী ভক্তগণ। হিসাবের তদারকি করতেন রামচন্দ্র, দানাকালী প্রমুখ কয়েকজন। একবার ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে মহেন্দ্রমাস্টার কয়েক আনা পয়সা দিয়েছিলেন, তরুণ সেবকেরা তা দিয়ে পাঁঠার মাংস কিনে খেয়ে আনন্দ করেছিলেন। মুরুব্বী গৃহীভক্তদের সন্দেহ হয় সেবকগণ তাঁদের কষ্টার্জিত অর্থের অপব্যয় করছে। গৃহী ও ত্যাগীদের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা লেগে যায়, তাঁদের সম্পর্ক বিচ্ছেদ হবার উপক্রম হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ নেন ত্যাগীদের পক্ষ। অবশ্য, কয়েকদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণের চেষ্টায় তাঁদের মনোমালিন্য মিটমাট হয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শী অক্ষয়কুমার সেন মন্তব্য করেছেন, 'গৃহী সন্ন্যাসীতে দুয়ে সমান আদর।/মধ্যে বাধাইয়া দ্বন্দ্ব করিলা রগড়॥/এই দ্বন্দ্ব ভবিষ্যতে প্রচারে পোষ্টাই।/প্রভুর মতন চক্রী ত্রিভুবনে নাই॥'[৯] এ-ঘটনার তাৎপর্য হাস্যরস সঞ্চারণের মধ্যেই সীমিত মনে করলে ভুল হবে। রামকৃষ্ণ-

৭ The Complete Works of Swami Vivekananda (1959), Vol. III, pp. 81-82

৮ উদ্বোধন, ৭১ বর্ষ, পৃঃ ৩৪৪

৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, পৃঃ ৬২০

বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন পক্ষীর দুই পক্ষ, ত্যাগী ভক্ত ও গৃহী ভক্ত। উভয়েই নিজ নিজ ভাবাদর্শ ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখবে, এই হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন' যে, ভগবানের পাঁচ ফুলের সাজি, সেখানে নানান প্রকার ভক্তের সমাবেশ। ত্যাগী ভক্ত ও গৃহী ভক্ত সকলকে নিয়ে ভক্তসংঘ। পরবর্তিকালে এই ভক্তসঙ্ঘই শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূল-দেহরূপে গৃহীত হয়েছে।

নবম, শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসম্বরণের পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে সুপ্রমাণিত সত্যগুলি সুস্পষ্ট আকার ধারণ করেছিল। বিশেষতঃ আলোচ্য-কালে শ্রীরামকৃষ্ণ দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ভাবমুখে যে-সকল কথা বলে গেছেন, সেগুলির তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত পরবর্তিকালে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিধৃত সত্যগুলি মোদ্দা কথায়: ঈশ্বর সৎ স্বপ্রকাশ; নিজ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত অনিত্য এই জগৎ-সংসার। ঈশ্বর অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বস্তু নন। মানুষ এ-জীবনেই ঈশ্বর-উপলব্ধি করতে সক্ষম এবং ঈশ্বরলাভ বা স্বস্বরূপ উপলব্ধিই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। বিষয়ভোগসর্বস্ব আধুনিক মানুষকে শ্রীরামকৃষ্ণ এই মহান্ আধ্যাত্মিক আদর্শ দেখিয়ে মানব-জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্য আহ্বান করেছেন।

দ্বিতীয় সত্য, ঈশ্বর-উপলব্ধির জন্য রয়েছে নানান পথ। ঈশ্বর-উপলব্ধিতে কোন বিশেষ ধর্মেরই একচেটিয়া অধিকার নেই। এ-ব্যাপারে কোন সাধনপথই অদ্বিতীয়ত্বের দাবী করতে পারে না। মানুষের রুচি ও সামর্থ্যের বৈচিত্র্যের জন্য পথের বিভিন্নতা। যত মত তত পথ। ধর্মের সার্বভৌমিকতার এই তত্ত্বটির ব্যাখ্যা করে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর একটি ভাষণে বলেছেন, 'জগতের ধর্মসমূহ পরস্পর-বিরোধী নহে। এগুলি এক সনাতন ধর্মেরই বিভিন্ন ভাবমাত্র। এক সনাতন ধর্ম চিরকাল ধরিয়া রহিয়াছে, চিরকালই থাকিবে, আর এই ধর্মই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন-ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। অতএব আমাদের সকল ধর্মকে সম্মান করিতে হইবে, আর যতদূর সম্ভব সবগুলিকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।'[১০] অসংখ্য মতপথে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়গুলিকে শ্রীরামকৃষ্ণ আহ্বান করেছেন পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য, সংহতির মাধ্যমে সংস্কৃতির অখণ্ডবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য।

তৃতীয় সত্য, কাশীপুর-পর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনুভূতি ব্যাখ্যা করে বলছেন, এখন দেখছি, তিনিই এক এক রূপে বেড়াচ্ছেন। কখনও সাধু-রূপে, কখনও ছলরূপে,—কোথাও বা খল-রূপে।'[১১] 'একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা' ইত্যাদি উপনিষদ্-মন্ত্রে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত এই সত্য যুগ যুগ ধরে পণ্ডিতদের বিচার ও সাধকদের মননের মধ্যেই সীমিত ছিল। মানুষের দিনচর্যার মধ্যে এই মহান্ সত্যকে প্রয়োগের পথ করে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন যে জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা করতে হবে। এবং এই মহান্ সূত্র ধরেই স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তন করেন 'কর্মে পরিণত বেদান্ত।' এর ফলে উন্মোচিত হয়েছে ধর্মকে আশ্রয় করে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের বিভিন্ন সমস্যা-সমাধানের একটি প্রশস্ত পথ।

উপরি-উক্ত ঐতিহাসিক উপাদানগুলির অন্তরালে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে একটি স্বর্ণসম্ভব ভাবাদর্শ। কল্পনায়, দার্শনিকতায়, উপযোগিতায়

১০ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৪

১১ কথামৃত, ২।১৩।২

অতুলনীয় এই ভাবাদর্শ। অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবন-সাধনা দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন এই ভাবাদর্শ এবং মুখ্যতঃ সে-কারণে তিনি আজ বিশ্ববন্দিত ও সর্বজনপূজিত। এই ভাবাদর্শটির একটি রূপকল্প দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তুলে ধরেছেন তাঁর একটি ভাষণে। তিনি বলেছেন, 'ধর্মবিধি, ধর্মবিশ্বাস ও মতবাদ মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে। কিন্তু আমরা সবাই ধর্মের মধ্যে খুঁজে থাকি সমগ্র মানবসমাজের একটি মিলনভূমি। রামমোহন প্রথমদিকে যে বিশ্বজনীন ধর্মের বিশুদ্ধ সারাংশ উপস্থাপিত করেছিলেন অথবা কেশবচন্দ্র বিভিন্ন ধর্মের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি একত্রীভূত করে যে সারধর্ম খুঁজেছিলেন শুধুমাত্র এদের কোনটিই আমাদের চাহিদা মেটাতে পারে না। আমরা চাই সেই সামগ্রিক অভিজ্ঞতা যা মানুষের ইতিহাসের মধ্যে উন্মোচিত হয়েছে এবং যা রামকৃষ্ণের শিক্ষানুসারে আমরা আয়ত্ত করতে পারি। ধর্মের সমন্বয় সাধনের দ্বারা আমরা হব হিন্দুর কাছে হিন্দু, মুসলমানের কাছে মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ানের কাছে খ্রীষ্টিয়ান, বিশ্বজনীন মতবাদীর কাছে বিশ্বজনীন এবং আমরা এই সাধনার দ্বারা পরিণামে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের এবং ঈশ্বরের মধ্যে মানবত্বের চরম উপলব্ধি করতে সমর্থ হব।'[১২] মূলতঃ এই ভাবাদর্শের আলোকে উদ্ভূত হয়েছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন কাশীপুর বাগানবাড়িতে। এই ভাবান্দোলনই রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও নব্যবঙ্গের নেতাদের ভ্রান্তধারণা খণ্ডন করে ভারতীয়তার প্রাণশক্তি বেদান্তধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং বনের বেদান্তকে ঘরে নিয়ে এসেছিল এই ভাবাদর্শের আলোকে। বর্তমানেও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন এই ভাবাদর্শ আশ্রয় করেই 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' নিযুক্ত। এই ভাবাদর্শই ঐতিহাসিক টয়েনবির মতে সাম্প্রতিককালের আণবিক যুদ্ধাতঙ্ক থেকে মানব-সভ্যতাকে রক্ষা করতে সমর্থ। এই ভাবাদর্শই মহিমময় এক ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবহ।

চোখের সামনে ভেসে উঠছে একটি দৃশ্য। দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটিতে বসে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। 'শ্রীম' তাঁর মনের গোপনে সংরক্ষিত একটি আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, 'এখান থেকে একটা স্রোত যদি বয়, তাহলে বেশ হয়। সে-স্রোতের টানেতে সব ভেসে যাবে। এখান থেকে যা হবে, সে তো আর একঘেয়ে হবে না।' ভক্তের আকুতিতে ভাবনিধি শ্রীরামকৃষ্ণ নীরব সম্মতি জানান। সুধী ভক্তের আকুতি, একটি স্রোত—একটি ভাবস্রোত শ্রীরামকৃষ্ণ-গোমুখী থেকে উৎসারিত হয়ে মানবকল্যাণে প্রবাহিত হয়, যা সব কিছুকে পরিপ্লুত করবে, যা তার প্রাণরস দিয়ে মানবসমাজকে সঞ্জীবিত করবে, যা মহাযুগ প্রবর্তন করবে,—অথচ যা নবীনতায় সজীব থাকবে। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেও কোন কোন ভক্তকে এই ভাবস্রোতটি চিনিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। একবার তিনি যোগীন-মাকে বলেছিলেন, 'ওগো, এই যে সব দেখছ, এত হরিসভা-টরিসভা এসব জানবে (নিজের শরীর দেখিয়ে) এইটের জন্য। এসব কি ছিল ? কেমন একরকম সব হয়ে গিয়েছিল ! (পুনরায় নিজেকে দেখিয়ে) এইটে আসার পর থেকে এসব এত হয়েছে, ভিতরে ভিতরে একটা ধর্মের স্রোত বয়ে যাচ্ছে।' অবশ্য এই ভাবস্রোতের ভগীরথ স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, এই ভাবস্রোত তথা ভাবান্দোলন সক্রিয় কল্যাণপ্রদ ভূমিকা পালন করবে আগামী পনের শ' বছর ধরে। তিনি আরও বলেছেন যে, এই

১২ The Religions of the world (1938), p. 114

ভাবস্রোতই 'মহাপ্লাবনের ন্যায়···সমগ্র মানব-জাতিকে উচ্ছ্বসিত করিয়া মুক্তিমুখে লইয়া যাইবে।' এই ভাবস্রোত কাশীপুর বাগানবাড়ির পাদমূল স্পর্শ করে প্রবাহিত। শতবর্ষের প্রান্তে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক কাশীপুর-তীর্থকে বন্দনা করি।*

* গত ১ মার্চ ১৯৮৬, উদ্বোধন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে লেখক-কর্তৃক পঠিত ভাষণ।

শ্রীচৈতন্যকীর্তন

শেখ সদরউদ্দীন

পূবের আকাশ উঠল রেঙে, দেখো পূর্ণ চন্দ্রোদয়।
আলোর ধারায় বসুন্ধরায় মানব-প্রেমের বন্যা বয়॥···

আকাশ থেকে সুধা ঝরে, সেই সুধারই ধারা বেয়ে
নদের নিমাই নেমে এলেন, মন-বিহগা উঠল গেয়ে।
হরিনামের কীর্তনেতে জানত কেবা এত মধু—
দু'হাত তুলে নাচে প্রবীণ, নবীন-যুবা-কুলবধূ!
নাচে জগাই, নাচে মাধাই, গোরার প্রেমে বিভোর হয়।
পূবের আকাশ উঠল রেঙে, দেখো পূর্ণ চন্দ্রোদয়॥···

হিংসা-ঘৃণার আগুন জ্বেলে এসেছিল ছুটে যারা—
শ্রীচৈতন্যদেবের লীলায় হল তারা আত্মহারা।

ধুয়ে গেল হৃদয় থেকে হিংসা-দ্বেষের যত কালি—
অন্তরেতে প্রেমের দীপে নিল তারা আলো জ্বালি'।
বিশ্বজনে ভালোবেসে প্রেম বিলায়ে ধরাতলে
প্রেমের ঠাকুর মহাপ্রভু গেলেন চলে নীলাচলে।
হিন্দু-মুসলিম সকলজনে বক্ষে নিলেন জগন্ময়।
পূবের আকাশ উঠল রেঙে, দেখো পূর্ণ চন্দ্রোদয়॥···

সোভিয়েত রাশিয়ায় কয়েকদিন

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ব্রেকফাস্টের পর সিডোরোফ্ এলেন। সিডোরোফ্ একজন বিখ্যাত কবি। স্বামীজীর উপরেও তিনি কবিতা লিখেছেন। তাঁর বিশেষ খ্যাতি—'হিমালয়ে সাত দিন' এই বইটির জন্যে। তাঁর সঙ্গে আরও দু-একজন ছিলেন। তাঁরা বললেন, আজকে আমাদের প্রোগ্রাম হচ্ছে জাগোরস্ক্ (Zagorosk)। জাগোরস্ক্ রওনা হলাম। জাগোরস্ক্ যাওয়ার পথে ওঁরা বললেন: আমার সোভিয়েত সফরের সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন রাইটার্স ইউনিয়ন এবং অ্যাকাডেমি অব্ সায়েন্সেস্। অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এই দুটো। ভয়ানক এদের প্রভাব। এদের সভ্যরা রাশিয়ার সর্বত্র কতটা সম্মান এবং সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন, তা বুঝেছিলাম লেনিনের সমাধি স্থান দেখতে গিয়ে। সে-কথা পরে বলব। আমার যাতে এতটুকুও অসুবিধা না হয়, তার জন্য সব সময় এঁরা সতর্ক ছিলেন। অ্যান্ড্রু যেমন সব সময় আমার তত্ত্বাবধান করত, তেমনি একটা গাড়িও আমার জন্য সব সময় থাকত। গাড়িতেই চলাফেরা করতাম। একদিন শুধু শখ করে মেট্রোরেলে চেপেছিলাম। মস্কোর মেট্রোরেলের খুব নাম। পরিষ্কার ঝকঝকে, দু-এক মিনিট অন্তর আসে আর খুব দ্রুত চলে। সবচেয়ে সুবিধা—সস্তা। পাঁচ কোপেকে (৭৫ পয়সায়) যেখানে খুশি যাওয়া যায় এবং যতবার খুশি। ঐ ভাড়াই সবচেয়ে কম এবং সবচেয়ে বেশি। স্টেশনের গায়ে নানা রকমের কারুকার্য। বিপ্লবের চিত্রই নানা মূর্তির মধ্যে দিয়ে দেখানো হয়েছে।

জাগোরস্ক্, মস্কো থেকে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে। ওখানে একটা মঠ আছে, ৬৭৫ বছরের পুরনো। কয়েকশ একর জুড়ে এই মঠ। কত গির্জা, কত বাড়ি, আবার কত গাছ-পালা। মঠের উপযুক্ত পরিবেশ। কিন্তু প্রচণ্ড ভিড়। শত শত মানুষ এসেছে দেখতে। বিশেষ কোন উপলক্ষে নয়—এমনি এসেছে। এরকম ভিড় নাকি রোজই হয়। রাশিয়ান আছে আবার বিদেশীরাও আছে। বিদেশী মানে সব পাশ্চাত্য-দেশের মানুষ। সবাই শ্বেতকায়। এই বিদেশী পর্যটকদের কাছ থেকে রাশিয়া প্রচুর বিদেশী মুদ্রা উপার্জন করে। জাগোরস্কের খ্যাতি এর প্রতিষ্ঠাতার জন্য। এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন—সেন্ট সার্গি (Saint Sergei)। জায়গাটি ছিল একটা জঙ্গল। সার্গি সেখানে তপস্যা করতেন। সার্গিকে কেউ চিনত না; কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর অসাধারণ জীবন ও অলৌকিক ক্ষমতার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তখন রাশিয়ার জার্ ছিলেন Ivan, the terrible (নিষ্ঠুর ইভান)। নিজের হাতে ছেলেকে হত্যা করেছিলেন। পরে তাঁর খুব অনুশোচনা হয়। সার্গির কাছে গিয়ে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চান। সার্গি তাঁকে ক্ষমা করেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তিনি সার্গিকে ঐ মঠ গড়ে দেন। তবে একবারেই মঠ অত বড় হয়নি। বহু বছর ধরে ধীরে ধীরে হয়েছে। প্রত্যেক জার্ এবং যাঁরা ধনী, তাঁরা এই মঠ গড়তে অর্থ ঢেলে দিয়েছেন। সবই কিন্তু সার্গির স্মরণে। অনেক অলৌকিক ঘটনা নাকি এখানে ঘটে গেছে। এখনও নাকি ঘটে সেখানে।

ওখানে যাঁরা ধর্মপ্রচার করেন, priest, তাঁরা বিবাহিত। সবাই খুব জমকালো পোশাক-পরিচ্ছদ পরে আছেন দেখলাম। দাড়ি রাখেন প্রত্যেকে। ওখানে সেমিনারী আছে, সেখানে এই priest-দের শিক্ষা দেওয়া হয়। আমার

সঙ্গীদের একজন বলল। 'কিছুদিন আগে দালাই লামা এখানে এসে ঘুরে গেছেন।' আর একজন তাঁকে সংশোধন করে বললেন : 'দালাই লামা নন, তাঁরই ঘনিষ্ঠ একজন।' আমার ইচ্ছা ছিল, সাধুদের সাথে একটু কথাবার্তা বলি, ভাববিনিময় করি, ধর্মপ্রসঙ্গ করি। কিন্তু ওঁদের দিক থেকে বিশেষ আগ্রহ দেখলাম না। শুধু ওঁদের যিনি প্রধান, তাঁর সঙ্গে বসে কিছুক্ষণ কথা হল। সাধারণ কথা, তাত্ত্বিক কথা কিছু নয়। তবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কথা বেশ জানেন, দেখলাম। ওঁরা মদ খেলেন। আমি জল আর একটা আপেল খেলাম। ওদের দেশে মদ, সিগারেট আর মাংস সবাই খায়। ঠাণ্ডার দেশ বলেই বোধ হয়। মেয়েদের হাতেও বড় বড় সিগারেট। আমার চোখে মেয়েদের সিগারেট খাওয়াটা খুব দৃষ্টিকটু লাগত—কিন্তু ওদের দেশে এটা স্বাভাবিক দৃশ্য।

জাগোরস্ক্ মঠে দেখলাম কিছুক্ষণ অন্তর যখন বহুলোক জমে যাচ্ছে তখন একজন এসে বাইবেল থেকে একটু পড়ছে আর ব্যাখ্যা করছে। এর জন্য বিভিন্ন জায়গায় মাইকের ব্যবস্থা করা আছে—সবাই যাতে শুনতে পায়। এই ব্যাখ্যার আগে টেপে একটু ভজনও শোনানো হয়। ভজন ও ব্যাখ্যার সময় অনেকে স্থির হয়ে মাথা নিচু করে শোনে। বহু লোক, কেউ বাইবেল-ব্যাখ্যা শুনছে, কেউ ঘুরে-ফিরে দেখছে, কেউ আবার প্রার্থনা করছে। একজন বৃদ্ধাকে দেখলাম এক-মনে প্রার্থনা করছেন। কী তাঁর আকৃতি, কী ভক্তি! আমি এক দৃষ্টিতে তাঁকে লক্ষ্য করলাম বহুক্ষণ।

ওখানে একটা জলের প্রস্রবণ আছে। সেই জলের নাকি অলৌকিক ক্ষমতা। শত শত বছর ধরে সেই জল বয়ে আসছে। কোথা থেকে জল আসছে বোঝা যাচ্ছে না। তবে একটা পাইপ দিয়ে জলটা বের হচ্ছে। দলে দলে লোক সেই জল খাচ্ছে। অনেকে আবার খাচ্ছেও না। যাঁরা খাচ্ছেন না তাঁরা যে অ-বিশ্বাসী বলে খাচ্ছেন না, তা আমার মনে হল না। চক্ষুলজ্জার জন্যেই তাঁরা খাচ্ছেন না। অন্ততঃ আমার সেই-রকম মনে হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম : আমি ঐ জল খেতে পারি কি না। খেতে পারি শুনে একটু খেলাম। কিছুই বিশেষত্ব বুঝলাম না। মজা হচ্ছে : আমার সঙ্গে ছিলেন রাইটার্স ইউনিয়নের কর্মকর্তারা। তাঁরা তো মার্কস্‌বাদী, ধর্মে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু আমার দেখাদেখি তাঁরাও খেলেন, আমার সব সঙ্গীরাই খেলেন। আমার বেশ মজা লাগল এঁদের কাণ্ড দেখে।

জাগোরস্ক্ মঠ থেকে ফেরবার পর সাতটার সময় আমাকে ওঁরা নিয়ে গেলেন রাইটার্স ইউনিয়নে। সেখানে একটা ভোজসভার আয়োজন হয়েছে, আমাকে সেখানে স্বাগত জানানো হবে। ওদের দেশে কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে, সে প্রতিভাবান লেখক বা লেখবার প্রতিভা তার মধ্যে সুপ্ত আছে—তবে এই রাইটার্স ইউনিয়ন তার লেখবার সব সুযোগ করে দেবে। তাকে আর চাকরি-বাকরি করতে হবে না। রাইটার্স ইউনিয়নের প্রকাণ্ড বাড়ি। কত ঘর, লাইব্রেরী, হল ইত্যাদি। সেখানে এসে লেখকরা থাকে, লাইব্রেরী ব্যবহার করে, লেখে। এমনকি কোন লেখক যদি মনে করে নির্জনে গিয়ে কোন জায়গায় থাকবে, সে-ব্যবস্থাও ওরা করে দেবে।

রাইটার্স ইউনিয়নের কর্মকর্তারা সব সেই ভোজসভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে ওদের তরফ থেকে একজন আমার পরিচয় দিলেন, বললেন : আমরা অনেকে ইনস্টিটিউট অব কালচারে গেছি। তোমার সঙ্গেও আমাদের দু-একজনের পরিচয় আছে। আমরা শুনেছি, রামকৃষ্ণ মিশন খুব বড় প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি

তারপর তাঁরা বললেন: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তোমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই। আমি মোটামুটি এই কথাগুলো বললাম: রামকৃষ্ণ মিশন মোটেই বড় প্রতিষ্ঠান নয়। আমাদের লোকবল, অর্থবল দুই-ই কম। তবে আমরা একটা আদর্শকে ধরে আছি। এই আদর্শ হচ্ছে আমাদের শক্তির উৎস। এই যে লোকে আমাদের ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, সে ঐ আদর্শের জন্য। আর সেই আদর্শ আমরা পেয়েছি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কাছ থেকে। এরপর সংক্ষেপে বললাম ঠাকুর-স্বামীজীর কথা। আমার বলা শেষ হলে তাঁরা নানারকম প্রশ্ন করতে শুরু করলেন: বেদান্ত কি? যোগ কি? ইত্যাদি। আমি সাধ্যমত উত্তর দিলাম। ওঁরা তারপর প্রস্তাব করলেন: ওঁরা এবং আমরা মিলে ইনস্টিটিউটে একটা সেমিনার পরের বছর করতে পারি কিনা। আলোচনা হল কিছুক্ষণ, তবে কোন সিদ্ধান্ত হল না। এরপর খাওয়া-দাওয়া। খাওয়া-দাওয়া সেরে হোটেলে যখন ফিরলাম, তখন রাত দশটা বেজে গেছে। আমি ভীষণ ক্লান্ত! শুয়ে পড়লাম; আর প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন (২১ অক্টোবর) যখন ঘুম ভাঙল, কোন ক্লান্তি নেই, ভাল বিশ্রাম হয়েছে রাত্রে। ব্রেকফাস্ট সেরে অ্যান্ড্রুর সঙ্গে বের হলাম কাছাকাছি জায়গাগুলো ঘুরে দেখতে। এই প্রসঙ্গে বলি, আমরা 'মস্কো' শব্দটি ইংরেজীতে লিখি **M-O-S-C-O-W**। ওরা কিন্তু উচ্চারণ করে অনেকটা 'মস্কোয়া'। ইংরেজীতে এই উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান করলে লিখতে হবে —**M-O-G-H-K-V-A**। ওখানে একটা নদী আছে, যার নাম মস্কো নদী। ছোট নদী, সরু খালের মতো। সেই নদীর উপর ঐ শহরটি। সেইজন্য নাম হয়েছে মস্কো বা মস্কোয়া।

অ্যান্ড্রুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে রেড স্কোয়ার, ক্রেমলিন এসব দেখলাম। সেদিন রোববার। আবহাওয়াও খুব ভাল। পরিষ্কার নীল আকাশ আর ঝলমলে রোদ। তাই ভিড় খুব। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এক ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে। নাম অনিল ঝা। বোধ হয় উড়িষ্যার লোক—কিন্তু বাঙালী হয়ে গেছেন, বাংলায়ই কথা বলেন। এঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি, কিন্তু কখনও এঁকে চোখে দেখিনি। লণ্ডনে টেলিফোনে কাজ করেন। মাঝে মাঝেই তিনি আমাদের সাধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন—কেউ হয়তো আমেরিকায়, কেউ হয়তো ফ্রান্স বা জার্মানীতে। মাঝে মাঝেই এঁদের সঙ্গে কথা বলেন—এঁদের খবরাখবর অন্য জায়গায় পাঠিয়ে সাহায্য করেন।

আমি এর আগে যখন ইউরোপ গিয়েছিলাম, উনি কি করে যেন সে-খবর জানতে পেরেছিলেন। আমি প্রথম গেছলাম পশ্চিম জার্মানী। যেদিন পৌঁছেছি তার পরদিনই হঠাৎ এঁর ফোন: 'মহারাজ আমি লণ্ডন থেকে অনিল বলছি। আমার প্রণাম নেবেন। বলুন, কোথায় আপনার কী খবর পাঠাতে হবে?' আমি বললাম: 'আপনি যদি কলকাতায় ইনস্টিটিউট অব কালচারে এই খবরটা দিয়ে দেন যে, আমি ভালমতো পৌঁছেছি এবং ভাল আছি!' উনি বললেন: 'মহারাজ দয়া করে ঐটি বলবেন না। ওখানকার লাইন পাওয়া ভীষণ শক্ত। কলকাতা বাদে পৃথিবীর অন্য যে-কোন জায়গার কথা বলুন, এক্ষুণি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। কলকাতার কথা বলবেন না। ওটা পৃথিবীর বাইরে!' কিন্তু মস্কো আসার আগে কলকাতাতেই হঠাৎ একদিন এই ভদ্রলোকের ফোন: 'মহারাজ, প্রণাম। কী ব্যাপার, আর এদিকে আসছেন না?' আমি বললাম: 'আমি কয়েকদিনের মধ্যেই মস্কো

যাচ্ছি।' উনি বলছেন: 'আমিও তো যাচ্ছি। আমি কুড়ি তারিখে যাচ্ছি। আপনি কবে যাচ্ছেন?' আমি বললাম: 'আমি যাচ্ছি উনিশে।' আমার তখন কথা ছিল হোটেল কস্‌মস্-এ উঠব। ওঁকে বললাম সে কথা। উনি বললেন: 'ভালই হল। আমারও হোটেল কস্‌মস্-এ ওঠার কথা আপনি গিয়ে আমার একটু খোঁজ করবেন।'

কিন্তু মস্কোয় এসে আমার থাকবার জায়গা হল হোটেল রোশিয়াতে। আগেই তা বলেছি। তা ছাড়া প্রথম দিনটা এমন ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে যে ওঁর কথা একদম ভুলেই গেছি। ক্রেমলিনে এসে ঘুরে ঘুরে সব দেখবার পর ক্লান্ত হয়ে যখন একজায়গায় বসে পড়েছি, হঠাৎ দূরে দেখি একদল ইংরেজের সঙ্গে একটি ভারতীয় খুব ঘুরছে ফিরছে কথা বলছে। আমি ভাবলাম: এই কি তাহলে অনিল ঝা? ইতিমধ্যে ওনারও চোখ পড়েছে আমার দিকে। গেরুয়া পোশাক দেখেই আমাকে চিনতে পেরেছেন। তখন ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে প্রণাম করলেন, বললেন: 'স্বামীজী, আপনাকে আমি কত খুঁজেছি হোটেল কস্‌মস্-এ'। আমি বললাম: 'ওখানে আমি উঠিনি, উঠেছি হোটেল রোশিয়াতে।' তারপর অনেক কথাবার্তা হল অনেক ছবিও তুললেন। তারপর প্রণাম করে বিদায় নিলেন। প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন, আবার ফিরে এলেন। জিজ্ঞাসা করছেন: 'মহারাজ খেতে পারছেন?' আমি হেসে বললাম: 'কি জানতে চাচ্ছেন? খেতে পারছি, না পাচ্ছি?' বললেন: 'পাচ্ছেন?' আমি বললাম: 'খাচ্ছি না।' উনি হেসে উঠলেন। বুঝলাম, ওঁরও অবস্থা আমারই মতো—খাওয়া-দাওয়ার খুব কষ্ট হচ্ছে। রাশিয়াতে ভারতীয়দের এই একটা বিরাট অসুবিধে।

ঘুরে ফিরে হোটেলে ফিরে এলাম যখন তখন লাঞ্চের সময় হয়েছে। লাঞ্চ করলাম চেলিশেভ্, রিবাকভ্ এঁদের সাথে। রিবাকভ্ বেশ পণ্ডিত ব্যক্তি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার প্রতি খুব শ্রদ্ধাবান্। খেতে খেতে আবার কথা হল সেই সেমিনার সম্বন্ধে। লাঞ্চের পর আমাকে নিয়ে যাওয়া হল লিওনিড্ লিওনোভের কাছে।

লিওনিড্ লিওনোভ্ (Leonid Leonov) রাশিয়ার সবচেয়ে বর্ষীয়ান্ ও সম্মানিত সাহিত্যিক। গোর্কীর স্নেহভাজন ছিলেন; লেনিনও তাঁকে খুব পছন্দ করতেন। তাঁর বহু বই। তিনি রাশিয়ার প্রকৃতির কথা অনেক লিখেছেন, আর রাশিয়ার যে প্রাচীন মূল্যবোধ তা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকেও সকলকে দৃষ্টি দিতে বলেছেন। তাঁর বয়স ৮৪ বৎসর, একা থাকেন, বোধ হয় বিপত্নীক। আমার সঙ্গে তিনি আলাপ করতে চেয়েছিলেন, তাই একদিন বিকেলে তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। আমার সঙ্গে অ্যান্ড্রু ছাড়া দু-একজন সাহিত্যিকও ছিলেন। গেটে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন আমাদের জন্যে। কে তিনি জানি না—পরিচারিকা হবেন হয়তো। তিনি পথ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে গেলেন লিওনোভের কাছে। লিওনোভ উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন তাঁর প্রথম প্রশ্ন হল—'ঈশ্বর কি একজন ব্যক্তি, না তিনি নৈর্ব্যক্তিক?' আমি তখনও বসিনি, বসার আগেই এই প্রশ্ন শুনে বেশ একটু অবাক হলাম। অবাক হলাম, আবার খুশিও হলাম। খুশি হলাম এই ভেবে যে, আমি তাহলে এমন একজনের কাছে এসেছি যিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে অনেক ভেবেছেন, বোধহয় অনেক পড়াশোনাও করেছেন। আমি বললাম—'যতক্ষণ আমি একজন ব্যক্তি ততক্ষণ তিনিও একজন ব্যক্তি, কিন্তু যদি আমি কখনও "আমি একজন

ব্যক্তি" এই বোধ কাটিয়ে উঠতে পারি, তখন তিনি একজন ব্যক্তি এই বোধ আর থাকবে না।' আমার এই উত্তর শুনে তিনি বোধ হয় খুশি হলেন। এরপর বিভিন্ন ধর্মে ঈশ্বর সম্বন্ধে যা ধারণা, তা নিয়ে অনেক আলোচনা হল। পাপ-পুণ্য, ধর্মে অলৌকিকতা, ধর্ম কি এবং অনেক ধর্ম কেন, আত্মার স্বরূপ, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হল। আবার ইদানীং কালে ভারতবর্ষে যে-সব ধর্মগুরুর আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁদের সম্বন্ধে কথাবার্তা হল। লিওনোভের ধর্মে গভীর বিশ্বাস আছে, কিন্তু ধর্মের যে-সব বাইরের অনুষ্ঠান সেগুলিতে কোন আস্থা আছে বলে মনে হল না। দেখতে দেখতে দু-ঘণ্টা কেটে গেল; অধিকাংশ সময় কথা হচ্ছিল চায়ের টেবিলে। কত কি খাবার আয়োজন করে রেখেছেন বৃদ্ধ। প্রচুর খেলাম। নিজে গিয়ে চা করে নিয়ে এলেন। লিওনোভের সঙ্গে কথা বলে খুবই আনন্দ পেয়েছিলাম। তাঁরও খুব আনন্দ হয়েছে, বিদায় নেবার সময় একথা বার বার বললেন। লিওনোভ্ ইংরেজী ভাল জানেন, কিন্তু বলার অভ্যেস নেই, তাই অ্যাণ্ড্রুকে দিয়ে তাঁর কথা বুঝাচ্ছিলেন।

পরদিন (২২ অক্টোবর) সকালে আমি বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া রওনা হলাম। সোফিয়া থেকে মস্কোয় ফিরে এলাম ২৬ অক্টোবর সকালে। এয়ারপোর্টে আমাকে নিতে এসেছিল অ্যাণ্ড্রু। এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে যেতে যেতে অ্যাণ্ড্রু আমাকে বলল: 'Maharaj, you created a stir at the Writers' Union meeting.' আমি বললাম: 'কেন বলতো?' অ্যাণ্ড্রু বলল: 'They have started to say that you did not speak but preached'—ওরা বলছে, তুমি নাকি বক্তৃতা করনি, আসলে তুমি ধর্মপ্রচার করেছ। আমি বললাম: 'দেখ, আমাদের যা বিশ্বাস, সেটা আমি খোলাখুলি-ভাবে বলেছি। তাকে যদি তোমরা প্রচার বল, বলতে পার।'

এবার ওরা আমাকে নিয়ে গেল অন্য আর একটা হোটেলে—হোটেল ইউক্রেরিয়া। বিরাট হোটেল। বিপ্লবের আগে জারের আমলে তৈরি। সেকেলে বাড়ি। বিরাট কারুকার্য। বারান্দাতে নানারকম মূর্তি। জারের আমলের সমস্ত মূর্তি। কিন্তু সেই হোটেলে ঢুকতে আমার ভয় করত। কারণ, ঢোকার দরজাটা সাধারণ দরজা যেমন হয়, সেরকম না। বিরাট বড় একটা কাঠের ব্লেড চরকির মতো ঘুরছে। ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ বুঝে ঐ ফাঁকের মধ্যে ঢুকে পড়তে হবে। একটু দেরী হয়ে গেলে পেছনের ব্লেড এসে ঠকাস্ করে মাথায় লাগবে। আমার ভয় করত। আমার সঙ্গে অ্যাণ্ড্রু থাকত, সে-ই আমাকে তাড়াতাড়ি ঢুকিয়ে দিত

সোফিয়া থেকে যেদিন ফিরলাম, তার পরদিন (২৭ অক্টোবর) সকালবেলা দুজন পণ্ডিত এলেন। একজন হলেন Sergei Serebirony। ইনি গোর্কি ইনস্টিটিউট অব্ ওয়ার্লড্ লিটারেচারের অধ্যাপক। এঁর পাণ্ডিত্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আর অদ্ভুত এঁর ভারত-প্রীতি। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সব খবর তিনি রাখেন। বিশেষত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন সম্বন্ধে তিনি এত জানেন, এবং এত আগ্রহ এ-বিষয়ে যে, আমি অবাক হয়ে গেলাম। আর একজনের নাম—Alexander Malinovosky। ইনিও পণ্ডিত; তার চেয়েও বড় কথা ইনি একজন ভক্ত—ঠাকুর-স্বামীজীর ভক্ত। দুজনেই বললেন: এখানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বই পাওয়া যায় না, যদি কিছু বই পাঠান। আমার কাছে 'The Master as I Saw Him' ছিল। আমি সেটা ওঁদের দিলাম। ওঁরা খুব খুশি হলেন।

এঁরা চলে যাবার পরেই এলেন আর একজন অধ্যাপক। অধ্যাপক মকলস্কি। ইনিও একজন অ্যাকাডেমিসিয়ান্ অর্থাৎ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর একজন সভ্য; অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর ইনস্টিটিউট অব মলিক্যুলার জেনেটিক্স-এর ডাইরেক্টর ইনি। ইনিও আর একজন ভারতপ্রেমিক। ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান—এসব সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ আগ্রহ। সারাদিন আমার এঁদের সঙ্গে কথা বলে বলে খুব ভালভাবেই কেটে গেল।

যে-কদিন রাশিয়ায় ছিলাম, প্রতিদিনই অনেক ফোন আসত। অনেকেই দেখা করতে চাইতেন। দেখা করতে আসতেনও। উপরে যাঁদের কথা বললাম তাঁরা ছাড়াও অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর আরও অনেকে আসতেন। অন্যান্য বিশিষ্ট লোকেরাও এসেছেন। তাঁরা পৃথক পৃথকভাবে বা ছোট ছোট দলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতেন এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করতেন। তাঁরা ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে বেশ পরিচিত, আর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান্। দেখলাম যে, রাশিয়ার অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে খুব খোঁজ-খবর রাখেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এঁদের জ্ঞানের উৎস কয়েকজনের লেখা বই—ম্যাক্সমুলার, ওলডেনবুর্গ, লিও টলস্টয়, রমাঁ রলাঁ, রোরিথ ইত্যাদি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের কিছু অংশের রুশ ভাষায় অনুবাদও হয়েছে। এখন অবশ্য এসব বই রুশ ভাষায় পাওয়া যায় না; তবু টাইপ করে বা হাতে লিখে নকল করেও অনেকে পড়েন। ইদানীং আবার অনেকে নতুন করে বিবেকানন্দ-চর্চা করছেন। বই না থাকায় তাঁদের খুব অসুবিধে। আমি যে-কদিন মস্কোতে ছিলাম, প্রত্যেকদিন এসব পণ্ডিতরা আসতেন, আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভারততত্ত্ব নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতেন। এঁদের উৎসাহ ও জ্ঞান দেখে মুগ্ধ হয়েছি। সমস্ত দিন এভাবে কথা বলতাম বলে রাত্রে অনেকদিন ভাল করে ঘুম হত না। তবু এ আলোচনা করে আনন্দ পেয়েছি।

২৮ তারিখ সকাল ১১টার সময় অধ্যাপক ভানিলচুক্ এলেন। ইনি খুব ভাল বাংলা জানেন। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পড়ান। উনি রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ এসব নিয়ে পড়াশুনো করেছেন। কলকাতায় যখন আসেন, ইনস্টিটিউটে ওঠেন। সুন্দর বাংলা বলেন। ইনস্টিটিউটে, নরেন্দ্রপুরে, বেলুড় বিদ্যামন্দিরে স্বামীজীর সম্বন্ধে বাংলায় বক্তৃতা করেছেন। রাশিয়াতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সম্বন্ধে কি কি সম্ভাব্য বই প্রকাশ করা যেতে পারে, সে নিয়ে আমাদের আলোচনা হল। উনি বিশেষ করে রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের উপরে একটা বই প্রকাশ করতে চান। তার জন্য উনি উপাদান চান। আমি তাঁকে বললাম কি কি বই পড়তে হবে, কার কার সাথে যোগাযোগ করতে হবে। কলকাতায় এলে সাহায্য করতে পারব, সেকথাও বললাম।

বিকেলে সেদিন চেলিশেভের সঙ্গে চা খেলাম। তারপর অ্যান্ড্রু আমাকে নিয়ে গেল বলশয় থিয়েটারে। [ক্রমশঃ]
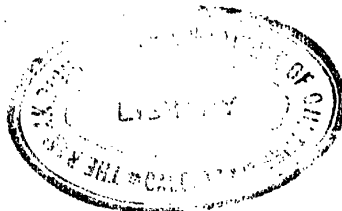
কোন্ পাঁজি মেনে চলব?

ডক্টর অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকের মানুষের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবন-ধারায় পঞ্জিকার ব্যবহার যে অপরিহার্য, সেকথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। কী সামাজিক জীবন, কী ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান, সব কাজেই মানুষের পঞ্জিকা ছাড়া চলে না। যাঁরা স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবহার পদে পদে মেনে চলেন, তাঁদের তাগিদ তো আরও বেশি। তাছাড়া ফলিত জ্যোতিষে আস্থা আছে এমন মানুষ ও গণৎকার-জ্যোতিষীর কাছে পঞ্জিকা এক মহা-মূল্যবান পুস্তিকা। আজকাল অনেক রাজনীতি-বিদ্‌কেও দেখা যায় পঞ্জিকার দেওয়া শুভাশুভ সময় মেনে চলতে। এমন কিছু সংখ্যক মানুষ আছেন যাঁরা ধর্মানুষ্ঠানাদির জন্য শুভাশুভ সময় বা দিন ইত্যাদির ধার ধারেন না, তাঁদের কাছে অবশ্য এই পঞ্জিকার কোন মূল্যই নেই—তবে আমাদের দেশে এখনও এমন মানুষের সংখ্যা খুবই নগণ্য। তাছাড়া একথা ভুললে চলবে না যে, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই পঞ্জিকা শুধু বৈষয়িক ও ধর্মীয় ব্যাপারে সীমাবদ্ধ নয়। দেশের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও পঞ্জিকা অপরিহার্য—কেন না পঞ্জিকার দেওয়া পূজো পার্বণের তারিখ অনুযায়ী সরকারকে কতকগুলো ছুটি আগের থেকে ঘোষণা করতে হয়। তাই, পঞ্জিকার আর একটি উদ্দেশ্য হল জাতির ধর্ম ও সামাজিক জীবনকে অপ্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করা। কিন্তু যে সব তথ্যাদির উপর নির্ভর করে পঞ্জিকা তৈরি হচ্ছে, তা কি নির্ভুল এবং শাস্ত্রসম্মত? এই বিষয়ে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার দিন এসেছে।

একেবারে সৃষ্টির প্রথমে আদিম মানুষ আকাশের দিকে তাকিয়ে কয়েকটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন—(১) দিনের আকাশে সূর্যের অবস্থান, সূর্য অস্ত গেলে রাতের আবির্ভাব, এবং রাত্রের আকাশে চন্দ্র ও নক্ষত্রের অবস্থান। এইভাবে দিনের পর রাত এবং রাতের পর দিনের আবির্ভাব। (২) চন্দ্র আকাশে ক্ষয় হতে হতে একেবারে লুপ্ত হল, তার মানে অমাবস্যা। তারপর একটু একটু করে বড় হতে হতে আবার পূর্ণচন্দ্রের আকার নিল, তার মানে পূর্ণিমা—এইভাবে অমাবস্যার পর পূর্ণিমা, আবার পূর্ণিমার পর অমাবস্যা। (৩) সূর্যের একটা বার্ষিক গতি প্রতীয়মান হয়, আর তারই দরুন ঋতুর পর ঋতু অতিক্রম করে নির্দিষ্ট সময় পরে পরে সূর্য একই জায়গায় ফিরে আসে। এই তিনটির উপর ভিত্তি করেই ক্রমশ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে—সময়কে মাপব কেমন করে? এর জন্যে তো একটা মাপকাঠি দরকার। সত্যি বলতে কি, মনুষ্য সভ্যতার ইতিহাসে এই হল জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের একেবারে গোড়ার কথা। কাল নিরবধি চলেছে। তাকে মাপবার জন্যে মানুষ অনেকগুলি মাপকাঠি তৈরি করল। আকাশে যে তিনটি মূল ব্যাপার লক্ষ্য করার কথা বলা হল, তারই ওপর ভিত্তি করে আগের কালের জ্যোতির্বিদ্‌রা আমাদের দেশে পঞ্জিকা প্রণয়ন করেছিলেন। তাই পঞ্জিকার মাধ্যমেই আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের কাছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিচয় শুরু হয়।

পঞ্জিকা প্রণয়নের তাগিদ আগেকার মানুষের মনে আর একটা বিশেষ কারণেও এসেছিল। অনেক আগের থেকেই প্রাচীন মানুষের নজরে এসেছিল যে, কৃষি নির্ভর করে বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন জলবায়ুর ওপর। আর তার সঙ্গেই গড়ে ওঠে

মানুষের নানারকম পর্ব ও ধর্মানুষ্ঠান, যেগুলো সংস্কৃতির উন্নয়নে যথেষ্ট সাহায্য করে। মানুষ আগের থেকেই জানতে উৎসুক হল, অমাবস্যা কবে হবে, পূর্ণিমা কবে হবে—তার কারণ প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠানগুলো ঐসব কোন না কোন দিনের সঙ্গেই বেশির ভাগ জড়িয়ে থাকত। তারা জানতে চাইত, বর্ষা শুরু হওয়ার আর কতদিন বাকি, শীতের প্রকোপ কতদিন পরে পড়বে, কখন বীজ বপন করতে হবে, কখন শস্য কাটতে হবে—এইসব নানারকম জিজ্ঞাসার তাগিদেই প্রাচীন মানুষের মনে বোধ হয় পঞ্জিকা প্রণয়নের একটা পরিকল্পনা দেখা দেয়।

এখন কথা হল, পঞ্জিকা নামটি এল কেমন করে? পঞ্জিকা নামটি এসেছে পঞ্চাঙ্গ থেকে। পঞ্চাঙ্গ মানে হল এইসব পুস্তিকার পাঁচটি প্রধান অঙ্গ, যেমন—বার, তিথি, নক্ষত্র, করণ ও যোগ। এছাড়া আমাদের দেশের প্রচলিত পঞ্জিকায় দেওয়া থাকে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহের অবস্থান, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ বিষয়ক তথ্য প্রভৃতি। আর দেওয়া থাকে এইসব তথ্যের ওপর নির্ভর করে গণনা-করা—বিবাহ, উপনয়ন ও নানান্ পূজাপার্বণের তারিখ ও সময়।

এখন পাঁচটি প্রধান অঙ্গের সঙ্গে পরিচয় করানো যাক। প্রথমেই হল বার। পঞ্জিকার কোনও তারিখ খুললেই সেটি কি বার অর্থাৎ সোমবার থেকে রবিবারের মধ্যে কোন্‌টি তা দেওয়া থাকে। এর পরেই আসে তিথি। তিথির জায়গায় সেই তারিখে লেখা থাকে শুক্লপক্ষের প্রতিপদ অথবা কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া ইত্যাদির কতক্ষণ পর্যন্ত সময়। তিথি কি? সূর্যের সঙ্গে সংযোগের হিসেবে চান্দ্রমাসের গড় মান হল ২৯·৫৩ দিন। এখন চান্দ্রমাস কাকে বলা হয়? এক অমাবস্যা থেকে ঠিক পরের অমাবস্যা পর্যন্ত সময়কে সাধারণত এক চান্দ্রমাস বলা হয়। চান্দ্রমাসের নাম কিভাবে দেওয়া হয়? আমরা জানি ১২টি সৌরমাস, যেমন বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ইত্যাদি। এখন সৌর বৈশাখ মাসের মধ্যে সাধারণত কোন না কোন দিনে অমাবস্যা পড়বে, সেই অমাবস্যা থেকে যে চান্দ্রমাস শুরু হবে তার নাম হবে চান্দ্র বৈশাখ। এইরকম করে ১২টি চান্দ্রমাস পাওয়া যায়। এই চান্দ্রমাসের গড় মান ২৯·৫৩ দিনকে একটা পুরো সংখ্যা ৩০ ধরা হয়, আর এই চান্দ্রমাসকে যদি ৩০টা সমান অংশে ভাগ করা যায়, তাহলে এরই এক একটা অংশ হল তিথি। তার মানে তিথিকে বলা যেতে পারে চান্দ্রদিন। অমাবস্যাকে আদি তিথি হিসেবে ধরা হয়, যখন চন্দ্র ও সূর্যের একত্র অবস্থান হয়। তারপরই শুরু হয় শুক্লপক্ষের প্রতিপদ। চন্দ্র সূর্যের সাপেক্ষে ১২ ডিগ্রী কৌণিক দূরত্ব অতিক্রম করলেই প্রতিপদের শেষ এবং শুক্লা দ্বিতীয়া তিথির আরম্ভ। এইরকম করে একটি চান্দ্রমাসে ৩০টি তিথি হয়—১৫টি শুক্লপক্ষীয় আর ১৫টি কৃষ্ণপক্ষীয়। তিথি কোন তারিখের যেকোন সময়ে শুরু হতে পারে, দিনে অথবা রাত্রিতে। সাধারণত হিন্দু পঞ্জিকার যে কোন তারিখে সূর্যোদয়ের সময় যে তিথি চলছে সেইটাই সেই সৌরদিনের তিথি বলে গণ্য হবে। তিথির মান ২০ ঘণ্টা থেকে প্রায় ২৭ ঘণ্টা পর্যন্ত হতে পারে। তার কারণ হল চন্দ্রের জটিল গতি—চন্দ্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করে এক কক্ষপথে ঘুরে চলেছে, কিন্তু সেই কক্ষপথে তার গতি সব জায়গায় সমান নয়, কখন ধীরে কখন জোরে—আর সেইজন্যেই তিথির মানের এত তফাত। পঞ্জিকাতে যেসব তথ্য দেওয়া থাকে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তিথি, এবং তারপরেই নক্ষত্র।

যে কোনও তারিখে নক্ষত্র স্থানে লেখা থাকে সেই তারিখে অশ্বিনী, ভরণী অথবা কৃত্তিকা

ইত্যাদি নক্ষত্র কত সময় পর্যন্ত থাকবে। এখন নক্ষত্র বলতে কি বুঝব ? মূলত ২৭ দিনে চন্দ্র রাশিচক্রের (প্রকৃত পক্ষে চান্দ্র মার্গের) ৩৬০ ডিগ্রী ঘুরে আসে। এই চান্দ্ররাশিচক্রকে সমান ২৭টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—প্রত্যেকের ব্যবধান হল ১৩ ডিগ্রী ২০ মিনিট। এই চান্দ্র-রাশিচক্রের এক একটি ভাগকে এক একটি নক্ষত্র বলা হয়। প্রতি নক্ষত্রের প্রধান উজ্জ্বল তারাকে 'যোগতারা' বলা হয় এবং এই যোগতারার নাম অনুসারেই সেই নক্ষত্রের নামকরণ। এইভাবে ২৭টি নক্ষত্র। কোন্ দিন কোন্ নক্ষত্র বললে বুঝতে হবে চন্দ্রের অবস্থান সেই দিন কোন নক্ষত্রের ১৩ ডিগ্রী ২০ মিনিট সীমানার মধ্যে।

এরপর আসে করণ। করণ হল তিথির অর্ধাংশ। যে কোন তিথির প্রথম অর্ধাংশ একটি করণ, আর দ্বিতীয় অর্ধাংশ অন্য একটি করণ। তাই একটি চান্দ্রমাসের ৩০টি তিথিতে ৬০টি করণ—এগুলোর আলাদা আলাদা নাম নেই। মোট ১১টি নাম আছে। এর মধ্যে ৭টি সাধারণ, যেমন, বব, বালব, কৌলব ইত্যাদি, আর বাকি ৪টি করণের নাম হল শকুনি, চতুষ্পাদ, নাগ ও কিস্তুঘ্ন। এই চারটি বিশেষ বিশেষ তিথির বিশেষ বিশেষ অর্ধাংশে প্রযোজ্য। কৃষ্ণ চতুর্দশীতে একটি, অমাবস্যায় দুটি এবং শুক্ল প্রতিপদের প্রত্যেকটিতে একটি বিশেষ করণ আছে—বাকি ৫৬টি করণ প্রথম ৭টি সাধারণ করণের পৌনঃপুনিক ক্রম মাত্র।

পঞ্জিকার শেষের অঙ্গটি হল যোগ। সূর্য ও চন্দ্র দুইয়ের নিরয়ন স্ফুট (Longitude) যা দেওয়া থাকে তাদের যোগফলকে ১৩⅓ দিয়ে ভাগ করলে যা বাকি থাকবে তাই যোগ। যোগ মোট ২৭টি, যেমন—বিষ্কুম্ভ, প্রীতি, আয়ুষ্মান, সৌভাগ্য ইত্যাদি। পঞ্জিকাতে তারিখ অনুযায়ী প্রত্যেক দিন তিথি নক্ষত্রের মতো যোগেরও অন্তকাল দেওয়া থাকে।

পঞ্জিকার মূল পাঁচটি অঙ্গ সম্পর্কে যে পরিচয় দেওয়া হল তা থেকে একটা কথা বুঝতে কারো বিশেষ অসুবিধা হবে না যে, এই পুস্তিকার মূল তথ্যাদি গণনার ভিত্তি হল জ্যোতির্বিজ্ঞান। তাছাড়া সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়, চন্দ্রোদয় ও চন্দ্রাস্তের সময়, সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগুলির দৈনন্দিন আকাশের অবস্থান এবং গ্রহণের সমস্ত তথ্যাদির গণনাও নির্ভর করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্রাবলীর ওপরে। আর এটাও জেনে রাখা দরকার যে, আমাদের সমস্ত উৎসব ও পূজা পার্বণের তারিখ ও সময় যা পঞ্জিকাতে দেওয়া থাকে তার গণনা একান্তভাবে নির্ভর করে তিথি, নক্ষত্র ও যোগের অন্তকালের ওপর। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তিথি, নক্ষত্র, যোগ প্রভৃতির গণনা ভূ-কেন্দ্রিক ভিত্তিতে হয়ে থাকে—তার অর্থ হল এইসব তথ্য গণনার সময় মহাকাশের পটভূমিকায় আমাদের পৃথিবীকে একটা বিন্দু বলে পরিগণিত করা হয়। এর ফলে তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ গণনা করে যে সময় পাওয়া যায়, সেগুলো পৃথিবীর ওপরে অবস্থিত সমস্ত স্থানের পক্ষেই প্রযোজ্য অর্থাৎ কলকাতা, দিল্লী, মস্কো অথবা টোকিও, সমস্ত শহরের জন্যেই ঐ একই সময় নির্দিষ্ট হবে। কিন্তু কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত বিভিন্ন পঞ্জিকায় দেওয়া তিথির সময়ের পার্থক্য তাহলে কেন ? এরকম তো হওয়ার কথা নয়। বর্তমানে এর কারণ বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন আছে।

আমাদের দেশে বর্তমানে দুরকম পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে—দৃক্‌সিদ্ধ এবং অদৃক্‌সিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গে বহুল প্রচলিত পঞ্জিকা বলতে গেলে দুটি—গুপ্তপ্রেস এবং পি. এম. বাগচী। এই দুই

পঞ্জিকাই অদৃক্‌সিদ্ধ বা প্রাচীনপন্থী। ভারত সরকারের "রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ" কে (বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পঞ্জিকা) বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত একমাত্র দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা হল বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা। এখন, এই দুরকম পঞ্জিকার মধ্যে কোন্‌টি বিজ্ঞানভিত্তিক তা ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

তাহলে দেখা দরকার, দুরকম পঞ্জিকার গণনা পদ্ধতি কার কিরকম। অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকার গণনার ভিত্তি হল "সূর্যসিদ্ধান্ত" গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি আনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে এই ভারতেই রচিত হয়েছিল। যে প্রাচীন সময়ে সূর্যসিদ্ধান্ত রচিত হয়েছিল তখন দূরবীনের আবিষ্কার হয়নি (দূরবীন এসেছে সপ্তদশ শতাব্দীতে), মানমন্দির বলে বিশেষ কিছুই গড়ে ওঠেনি—তাই তখনকার ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্‌রা যা রচনা করেছিলেন তা আজও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থটিকেই ভারতে পঞ্জিকা গণনার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই সময়ের মধ্যে এদেশে জ্যোতির্বিদ্যার অনেক উন্নতি সাধিত হয়। বিশেষ করে ভাস্করাচার্য ১২ শতকে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে যখন দেখা গেল যে, সূর্যসিদ্ধান্তের গণনা মহাকাশের গ্রহের অবস্থান আর ঠিকমত নির্ণয় করতে সক্ষম হচ্ছে না, তখন সারা ভারতে আবার নতুন করে সূর্যসিদ্ধান্তের সূত্রাবলীর ওপর ভিত্তি করে এক নতুন সারণী (table) তৈরি করে, এতে কিছু সংস্কার করা হয়। বাংলাদেশে রাঘবানন্দ চক্রবর্তী নামে এক গণিতবিদ্‌ সূর্যসিদ্ধান্তের গ্রহ-গতিতে কিছু বীজ (correction) প্রয়োগ করে এক সারণীগ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থ অনুসারেই পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রচলিত অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকাগুলির গণনা চলছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকাগুলির অশুদ্ধ গণনার কারণ এই যে, ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে যে পঞ্জিকা সংস্কার করা হয়, তারপরে এদিকে সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থের সূত্রাবলীর সংস্কারে আর কেউই নজর দেননি। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থান নির্ণয়ের জন্যে এই সকল পঞ্জিকাকারের ব্যবহৃত সূত্রাবলী বহুলাংশে ভ্রমপূর্ণ। তাছাড়া সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে অয়নচলনের (Precession of equinoxes) কোন উল্লেখ পর্যন্ত নেই। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে অয়নচলনের আবিষ্কার মহাকাশে গ্রহগুলির অবস্থান নির্ভুলভাবে নির্ণয় করার ব্যাপারে একটা বিরাট পদক্ষেপ। তাই বর্তমানে সূর্যসিদ্ধান্তের সূত্রাবলী দিয়ে গ্রহ অবস্থান গণনা করলে তা আকাশের প্রকৃত গ্রহ অবস্থানের সঙ্গে আদৌ মিলতে পারে না, যথেষ্ট পার্থক্য হয়। প্রতি বৎসর এই পার্থক্য বেড়েই চলেছে।

এই হল অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকার গণনা পদ্ধতি। তাহলে দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকার গণনা পদ্ধতিই বা কেমন, সে সম্পর্কেও কিছু জানা দরকার। সারা বিশ্বে মাত্র আটটি দেশ থেকে অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ইফেমারিস (Astronomical Ephemeris) প্রকাশিত হয়ে থাকে—ভারত এদের অন্যতম। এই রকম গ্রন্থে সূর্য, চন্দ্র, ও গ্রহগুলির দৈনন্দিন অবস্থান সর্বাধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্রাবলী অনুযায়ী ইলেকট্রনিক কমপিউটারের সাহায্যে গণনা করা হয়। সারা বিশ্বে যত মানমন্দির (Observatory) আছে, সেইসব মানমন্দির থেকে দূরবীন দিয়ে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করে জ্যোতিষ্কদের গণিত অবস্থান মিলিয়ে দেখা হয়। যদি কখন কোন গ্রহের ক্ষেত্রে, গণিত অবস্থানের সঙ্গে নিরীক্ষিত (Observed) অবস্থানের কোনও পার্থক্য দেখা যায়, তখন কেন এই পার্থক্য হল সে সম্বন্ধে গবেষণা শুরু

হয়ে যায় এবং প্রয়োজনে প্রচলিত গণনার সূত্রাবলীর সংস্কার করা হয়। এর জন্যে রয়েছে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা—ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ইউনিয়ন (International Astronomical Union)। এই ইউনিয়নের কাছে বিশ্বের যে কোন মানমন্দির থেকে এই ব্যাপারে কোনও ত্রুটি লক্ষ্য করা গেলে সেটা জানানো হয়। তখন প্রচলিত সূত্রাবলীর কোথায় কতটুকু সংস্কার করতে হবে তার নির্দেশ দিয়ে থাকেন এই ইউনিয়ন। তাছাড়া আটটি দেশের ইফেমারিস সেণ্টার, যেখানে এইসব গণনার কাজ করা হয়, তার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একই সূত্রাবলীর সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের এইসব তথ্যাদি কমপিউটার যন্ত্রে গণিত হয়ে থাকে বলে এদের তথ্যের মধ্যে কোনও পার্থক্য বা ভ্রান্তি থাকে না। দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহগুলির অবস্থান সম্পর্কে তথ্য এবং আরও নানারকম প্রয়োজনীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্যাদি এইসব অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ইফেমারিস গ্রন্থ থেকে নিয়ে থাকেন। তাই দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকার তথ্যাদি সম্পূর্ণ জ্যোতির্বিজ্ঞানভিত্তিক।

আগেই বলা হয়েছে যে পঞ্জিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল তিথি। অদৃক্‌সিদ্ধ বা সাধারণ পঞ্জিকায় যে তিথি নক্ষত্রের সময় দেওয়া থাকে তাতে ৫-৬ ঘণ্টা পর্যন্ত ভুল হয়ে যাচ্ছে এবং গ্রহস্ফুটে অর্থাৎ গ্রহ অবস্থানে ১১ ডিগ্রী পর্যন্ত পার্থক্য নজরে পড়ছে। এসম্বন্ধে অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকার পণ্ডিতদের একটিই বক্তব্য—সেটা হল "বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়"—এর মানে হল তিথি বৃদ্ধি ৬৫ দণ্ডের অধিক হবে না, আর তিথি হ্রাস ৫৪ দণ্ডের কম হবে না। বর্তমান বিজ্ঞানভিত্তিক গণনায় দেখা যায় যে তিথির সময়ের সীমা বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়ের সংজ্ঞা মেনে চলতে পারে না। এখানে একটা কথা ভেবে দেখুন যে পূর্ণিমা তিথির সময় সারা পৃথিবীর সমস্ত স্থান থেকে একরকমই তো হবে, তার মধ্যে পার্থক্য থাকবে কেন? অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকার পণ্ডিতদের কাছ থেকে এ-কথাটির যুক্তিযুক্ত কোন উত্তর পাওয়া যায় না।

আজকের দিনে শুধুমাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির সুযোগ নিয়ে যখন পৃথিবী থেকে প্রক্ষিপ্ত বস্তুকে চন্দ্রপৃষ্ঠের বিশেষ স্থানে সংস্থাপিত করা সম্ভবপর হয়েছে, ২০০ ইঞ্চি দূরবীন দিয়ে নিরীক্ষণ করার সুযোগ এসেছে, তখন ভুল গণনা পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে গণনা না করার পক্ষে কি যুক্তি থাকতে পারে? এটা একটা জিজ্ঞাসা। অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকার পণ্ডিতদের আর একটি কথা—পাশ্চাত্যের জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্রাবলী দিয়ে তিথিনক্ষত্র গণনা করলে হিন্দুর ধর্মকর্ম একেবারে লোপ পেয়ে যাবে। বিজ্ঞান কি কখনও কোন দেশে বা কোন মনুষ্যগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে? এ-কথা এখানে উল্লেখ করার একটা কারণ আছে। সমস্ত অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকার সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ গণনার তথ্যাদির জন্য নির্ভর করতে হয় পাশ্চাত্যের জ্যোতির্বিজ্ঞান-সূত্রাবলীর ওপর। কারণ, অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকার সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থানের ভিত্তিতে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের যে সময় পাওয়া যায়, তার সঙ্গে প্রকৃত সময়ের বিস্তর ব্যবধান ঘটে। এখন সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কখন লাগবে বা কখন ছাড়বে তার সময় যদি পঞ্জিকায় ভুল প্রকাশিত হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ আকাশের দিকে তাকিয়ে ও নিজের ঘড়ির দিকে লক্ষ্য করে সহজেই গলদটি ধরে ফেলতে পারবেন। তিথি বা নক্ষত্রের সময় যা দেওয়া থাকে তা তো আকাশের দিকে তাকিয়ে বোঝা যাবে না যে শুদ্ধ হল বা অশুদ্ধ হল।

একমাত্র গ্রহণের সময় দিয়েই পঞ্জিকার

শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই করা যায়। সেইজন্যে বোধহয় প্রচলিত অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকার পণ্ডিতরা তাঁদের পঞ্জিকার অন্যান্য অংশ যথাপূর্ব সূর্যসিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণনার তথ্য লিপিবদ্ধ করে, মাত্র গ্রহণ অংশটি আধুনিক অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ইফেমারিস গ্রন্থ থেকে নিয়ে থাকেন। গ্রহণ-গণনার বেলায় আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্রাবলী, আর তিথিনক্ষত্র গণনার ক্ষেত্রে প্রাচীন আমলের সূর্যসিদ্ধান্তের সূত্রাবলী—এ কেমন শাস্ত্রসম্মত বিধি? তাছাড়া সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে কোথাও বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়ের উল্লেখ নেই; আর প্রাচীন শাস্ত্রকাররা কোথাও লেখেননি যে দৃক্‌সিদ্ধমত অগ্রাহ্য। তবুও এমন চলছে কেন? এটা এক বিরাট প্রশ্ন।

আর একটা জিনিস এই পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ্য করার মতো যে বেশ সুশিক্ষিত মানুষও এই অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকাই বংশপরম্পরা ব্যবহার করে চলেছেন। এটা ঠিক যে সাধারণ পুরোহিতদের মধ্যে অনেকেই হয়তো বা এ বিষয়ে তেমন আলোকপ্রাপ্ত নন, আর তাই তাঁদের নির্দেশমতই শিক্ষিত মানুষও আমাদের সমাজে আজও অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা ব্যবহার করে চলেছেন। কিন্তু এরকম হবে কেন? কিছু একটা বহুদিন ধরে চলে আসলেই কি তা ন্যায্য হতে পারে? এটা অবশ্য ঠিক যে, লোকে যে পঞ্জিকা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তার রদবদল করতে বিচলিত হয়—কিন্তু তা সত্ত্বেও ভেতরের যথার্থ ভ্রমটুকু জানার পর অন্তত সুশিক্ষিত লোকের কাছ থেকে আশা করা যেতে পারে সেই ভ্রম সংশোধনের। বলা যেতে পারে সতীদাহ প্রথাও অনেকদিন এদেশে প্রচলিত ছিল, কিন্তু রাজা রামমোহনের চেষ্টায় এই অভিশাপ সমাজের বুক থেকে আস্তে আস্তে দূরীভূত হওয়ার প্রয়াস পেয়েছে। এ ব্যাপারে আর একটা জিনিস ভেবে দেখার মতো। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের ওপর আমাদের দেশের হিন্দুসমাজের অধিকাংশ মানুষের প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা আজও অটুট আছে এবং সেই হিসেবে রামকৃষ্ণ মিশনের ওপরও যথেষ্ট আস্থা আছে। রামকৃষ্ণ মিশন তো তাঁদের পূজাপার্বণের জন্যে অনেকদিন আগে থেকেই অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা বর্জন করে দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা গ্রহণ করে ফেলেছেন। ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে এক মাস অন্তর দুবার দুর্গাপুজোর কথা অনেকেরই নিশ্চয় এখনও মনে আছে। রামকৃষ্ণ মিশন দৃক্‌সিদ্ধ মতে যথারীতি দুর্গাপুজো করেছিলেন, এবং বেলুড় মঠে লাখ লাখ মানুষের ভিড় হয়েছিল সে পুজো দেখার জন্যে। তবে কেন আমরা পারব না? এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা নিশ্চয়ই যেতে পারে। পুরোহিতদের কাছে নিবেদন যে তাঁরা যেন ভেবে দেখেন আমাদের পঞ্জিকার নির্দেশগুলি তখনই শাস্ত্রসম্মত হয়ে উঠবে যখন তার ভিত্তি হবে শুদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্য। সাধারণ বয়স্ক মানুষ যাঁরা অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা বহুদিন ধরে ব্যবহার করে আসছেন, তাঁদের কাছে অনুরোধ যে অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকার ভ্রমপূর্ণ তথ্যের পূর্ণ আলেখ্যটি পাওয়ার পরে তাঁরা কোন্ পঞ্জিকা অনুসরণ করে চলবেন তা যেন ভালভাবে ভেবে দেখেন। সবশেষে আমার অভিমত হল—পঞ্জিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য গণনার ভার সম্পূর্ণরূপে এ দেশের বিজ্ঞানীদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হোক, আর পঞ্জিকা-পণ্ডিতরা সেই বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য নির্ভর করে পঞ্জিকায় ধর্মানুষ্ঠান, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও পূজাপার্বণের তারিখ ও সময় নির্দেশ করার ভারটুকু গ্রহণ করুন। তাহলেই সবদিক থেকে মঙ্গল হবে।

একদিন জগদ্বিখ্যাত বাঙালী বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা পঞ্জিকায় অশুদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্য

প্রকাশনা বন্ধ করার জন্যে যে আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করে গিয়েছিলেন, শুধুমাত্র দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ তাঁর পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ নিশ্চয়ই করতে পারেন। বঙ্গাব্দের হিসাবে এই নববর্ষে আমরা একটা কাজ করতে পারি—পঞ্জিকাকারদের বলতে পারি, ভারত সরকারের পজিসন্যাল অ্যাস্ট্রনমি সেণ্টার থেকে যে নির্ভুল জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে, তাই কাজে লাগান। আর সাধারণ মানুষকে বলতে পারি—আপনারা দাবি করুন যে, পঞ্জিকায় প্রকাশিত তিথি, নক্ষত্রের তথ্য যেন সম্পূর্ণ নির্ভুল হয়। যিনি যে মতাবলম্বীই হোন না কেন, ভুল তথ্য কারুর কোনও যথার্থ উপকারে আসতে পারে না।

একটি মহাজীবন

স্বামী পরাশরানন্দ

সপ্তম শতাব্দীর কথা। ভারতবর্ষের সুদূর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে মালাবার প্রদেশে (বর্তমান কেরালা) কুলু-কুলু রবে সুন্দর ছোট্ট আলোয়াই নদী বয়ে চলেছে। নদীর উত্তরে কলা-নারকেল-সুপারী ও আমগাছে ঘেরা মনোরম গ্রাম কালাডি। গ্রামে বৈদিক ধর্মমার্গী নম্বুরি ব্রাহ্মণদের অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাস,—তাঁরা প্রাচীন বেদাচার নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করে আসছেন। এই নম্বুরি বংশেরই দম্পতি শিবগুরু ও বিশিষ্টাদেবী। দুজনেই ধর্মপরায়ণ ও আদর্শ গৃহীর জীবন যাপন করেন। সবকিছু থেকেও স্বামী-স্ত্রীর মনে শুধু একটা চাপা ক্ষোভ,—তাঁদের কোনও পুত্র-কন্যা নাই। পুত্রলাভের আশায় তাঁরা গ্রামের কাছেই জাগ্রত দেবতা চন্দ্রমৌলীশ্বর শিবের শরণাপন্ন হলেন। ব্রতধারণ করে শিবের পূজা-অর্চনা ও কৃচ্ছ্রাদি সাধনে তাঁরা মন প্রাণ ঢেলে দিলেন। বছর শেষ হওয়ার আগেই তাঁদের তপস্যা-প্রার্থনা ও ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব স্বপ্নে শিবগুরুকে দেখা দিলেন। বললেন: তিনি নিজেই তাঁদের সর্বজ্ঞ পুত্ররূপে অবতীর্ণ হবেন। হৃষ্টচিত্তে ও রোমাঞ্চিত কলেবরে দুজনে ঘরে ফিরে এলেন। যথাসময়ে ৭০৮ শকাব্দের (৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের) ১২ বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে মধ্যাহ্নকালে আচার্য শঙ্কর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন। মহাদেবের আশীর্বাদে পুত্র জন্মলাভ করেছে বলে বাবা-মা নাম রাখলেন শঙ্কর।

মহাদেব স্বয়ং যখন পৃথিবীতে মানবশরীর নিয়ে এসেছেন, তাঁর সকল প্রচেষ্টাই নিশ্চয়ই অসাধারণ হবে। শৈশব অবস্থা থেকেই শঙ্করের অলৌকিক বুদ্ধি-মেধা ও শ্রুতিধরত্বে সকলে বিস্মিত হতে লাগল। শিশু তিন বছর বয়সেই মাতৃভাষা মালয়ালমে লেখা বই পড়তে শুরু করলেন। যা পড়তেন তাই তাঁর মনে থাকত এবং অবিকল তিনি তা আবৃত্তি করতে পারতেন। এই সময়েই শিবগুরুর মৃত্যু ঘটে। বিশিষ্টাদেবী পাঁচ বছর বয়সে শঙ্করের উপনয়ন কাজ শেষ করে তাঁকে গুরুগৃহে পাঠালেন। শঙ্করের অসামান্য বিদ্যানুরাগ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে শাস্ত্রগুরু খুবই খুশি হলেন। অবশ্য শঙ্করকে গুরুগৃহে বেশি-দিন থাকতে হয়নি। যে বিদ্যা অর্জন করতে শিষ্যকে কমপক্ষে ষোল বছর গুরুগৃহে থাকতে হয়, তা দু-বছরে শেষ করে শঙ্কর বাড়িতে ফিরে এলেন। গুরুগৃহে থাকার সময়েই তাঁর ঐশী শক্তির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। বালক

ব্রহ্মচারী ভিক্ষার জন্য এক দরিদ্রা ব্রাহ্মণীর ঘরে এলে দেবার মতো একমুঠো চালও ব্রাহ্মণীর ছিল না। তিনি একটি আমলকি ফল শঙ্করকে দিয়ে নিজের আর্থিক দুরবস্থার কথা করুণভাবে বলতে লাগলেন। ব্রহ্মতেজে দীপ্তিময় ব্রহ্মচারীর হৃদয়ে অপার করুণার উদয় হল,—তিনি কাতরভাবে ধনদাত্রী লক্ষ্মীদেবীকে প্রার্থনা করলেন ব্রাহ্মণীকে ধনদানের জন্য। যাবার আগে ব্রাহ্মণীকে ধন-প্রাপ্তির আশ্বাসও দিলেন। পরের দিন সকালে ব্রাহ্মণী অবাক,—ঘরের চারদিকে সোনার আমলকি, যেন আমলকির বৃষ্টি হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণীর অভাব চিরকালের জন্য চলে গেল। তিনি সরলভাবে ব্রহ্মচারীর আশীর্বাদের কথা সকলকেই বলতে লাগলেন।

বাড়িতে ফিরে এসে শঙ্করের প্রধান কর্তব্য হল শাস্ত্রাধ্যয়ন ও মাতৃসেবা। তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে গ্রামের যুবক-বৃদ্ধ সকলেই তাঁর কাছে শাস্ত্রের সরল ব্যাখ্যা শুনতে আসতেন। গ্রাম থেকে একটু দূরে আলোয়াই নদী বয়ে চলেছে। একদিন সেখান থেকে স্নান করে বাড়ি ফিরছিলেন বিশিষ্টাদেবী। প্রচণ্ড গরমে তিনি অবসন্ন হয়ে মূর্ছিতা হয়ে পড়েন। মায়ের এই কষ্ট দেখে বালক ব্রহ্মচারী শ্রীভগবানের নিকট আকুল প্রার্থনা জানালেন নদীর গতিপথ পরি-বর্তনের জন্য। আশ্চর্যের ব্যাপার, কিছুদিন পরে নদীর পাড় ভাঙতে ভাঙতে তাঁদের বাড়ির পাশ দিয়েই সেই নদী বইতে শুরু করল। কেরলের রাজা চন্দ্রশেখর শঙ্করের পাণ্ডিত্য ও অধ্যাপনার প্রশংসা আগেই শুনেছিলেন। এখন তাঁরই প্রার্থনায় নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়েছে শুনে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। রাজা বিস্মিত হয়ে দেখলেন জলন্ত অগ্নিশিখাসম বালক ব্রাহ্মণ কৃষ্ণাজিন-মুঞ্জমেখলা-উপবীত-শোভিত হয়ে চারদিকে উপবিষ্ট বয়স্ক ব্রাহ্মণদের অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অসাধারণ বিচারশক্তিতে রাজা অবাক হয়ে গেলেন। গুণমুগ্ধ রাজা তাঁর পদতলে অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা রেখে তা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু অপরিগ্রহে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সকল দৈবীগুণে বিভূষিত শঙ্কর সে-দান বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। ঘটনাটি রাজার মনে গভীর রেখাপাত করে এবং বালকের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাও বহুগুণে বেড়ে যায়। তিনি শঙ্করের কাছে আসা-যাওয়া শুরু করেন; স্বরচিত দুটি সংস্কৃত নাটক 'বালরামায়ণ' ও 'বালভারত' রাজা তাঁকে শোনান ও তাঁর নির্দেশানুসারে কিছু কিছু সংশোধনও করে নেন।

এরপর শঙ্করের জীবনে এল সেই শুভলগ্ন। দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হয়ে পত-নোন্মুখ বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক সভ্যতাকে যিনি পুনরায় উজ্জীবিত করবেন, ঐশীবলে বলীয়ান যে ব্রহ্মজ্ঞানোজ্জ্বল মনীষার কাছে বৌদ্ধধর্মের ধারক ও বাহকগণ, এবং বহুধা-বিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম-সম্প্রদায়ের রক্ষকগণ মাথা নত করবেন, যাঁর প্রবর্তিত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের দুইজন পরবর্তী ঈশ্বর-অবতারের সন্ন্যাসগুরু হবেন—তাঁর নিজের সন্ন্যাস-অনুষ্ঠানের পুণ্যকাল। এদেশে তখন বৈদিক সন্ন্যাসীর অভাব। তাই সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত আট বছরের শঙ্কর নিজের ঘরেরই সংলগ্ন বাগানে আত্মশ্রাদ্ধ ও বিরজা হোম করে নিজেই যথাবিধি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। বিশিষ্টাদেবী পুত্রের সন্ন্যাসে প্রথমে খুবই আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু শেষের দিকে প্রসন্নমনে ও উৎসাহের সঙ্গে তিনি নিজে পুত্রের কাপড় গেরুয়া করে দেন, দণ্ড-কমণ্ডলু যোগাড় করেন ও হোমেরও সব ব্যবস্থা করে দেন। প্রভাতের অরুণোদয়ে জগতের আঁধার তখন বিলীনপ্রায়; মানুষের হৃদয়গুহার আঁধারবিদূরণকারী পবিত্র অগ্নিশিখাসম তেজোময়

নবীন সন্ন্যাসী ধীর-গম্ভীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন অভীষ্টলাভের সন্ধানে।

গুরুগৃহে শাস্ত্র পড়ার সময়েই তিনি শুনেছিলেন মহর্ষি পতঞ্জলি যোগীর নাম, যিনি গোবিন্দপাদ নামে নর্মদাতীরে কোনও গুহায় হাজার বছর ধরে সমাধিস্থ হয়ে আছেন। যোগসাধনার প্রবল ইচ্ছা হৃদয়ে নিয়ে বালক সন্ন্যাসী কেরল থেকে রওনা হলেন নর্মদা অভিমুখে। দীর্ঘ দু-মাস পথ চলার শেষে সন্ধান পেলেন যোগিবরের, নর্মদা-তীরে ওঙ্কারনাথে,—বিস্মিত হয়ে দেখলেন পদ্মাসনে উপবিষ্ট নিশ্চল সমাধিস্থ পাথরের মূর্তির মতো জ্যোতির্ময় এক মানবদেহ। বিনম্র শ্রদ্ধায় ও আবেগপূর্ণ হৃদয়ে শঙ্কর সুললিত স্তবগান শুরু করলেন। সেই স্তবগানের ঝঙ্কারে ও মূর্ছনায় হাজার বছরের ধ্যানস্তব্ধ মৃতপ্রায় জীবনে ফিরে এল প্রাণের লক্ষণ,—মহাযোগী একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে চোখ খুললেন। মহাদেবের অংশে জাত বালক সন্ন্যাসীকে অদ্বৈত-ব্রহ্মবিজ্ঞান দেবার জন্যই তো গুরু গৌড়পাদের আদেশে হাজার বছর সমাধিস্থ থেকে তাঁর শরীর রক্ষা। গুরু হল শিষ্যকে শেখানোর সাধনা,—গুরু-শিষ্য দুই-ই এখানে অপূর্ব,—'আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা' —তাই ফলও আসে অতি সত্বর। এক এ সাধন শেখানোর সাথে সাথে শিষ্যের হয়ে যায় অপরোক্ষানুভূতি। এভাবে প্রথম বছরে হঠযোগ, দ্বিতীয় বছরে রাজযোগ আর তৃতীয় বছরে জ্ঞান-যোগের সাধনশিক্ষা শেষ। তৃতীয় বছরের শেষেই শঙ্কর শ্রবণ-মনন নিদিধ্যাসনের চরম লক্ষ্য জীব-ব্রহ্মৈক্য জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তাঁর মনের স্বাভাবিক গতিই হল সমাধির দিকে। গোবিন্দ-পাদ দেখলেন শঙ্করের সাধনা ও শিক্ষা সমাপ্ত; আদেশ করলেন তাঁকে কাশীধামে গিয়ে স্বয়ং বিশ্বনাথের নির্দেশ নিয়ে পরের কার্যক্রমে এগিয়ে যেতে।

বারো বছরের সৌম্যদর্শন প্রতিভাদীপ্ত বালক সন্ন্যাসীকে এরপর কাশীর মণিকর্ণিকারই নিকটস্থ স্থানে অদ্বৈত-ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের উপদেশ করতে দেখা গেল। বিভিন্ন মতের অগণিত সাধক ও পণ্ডিত সেখানে আসছেন আর তাঁর অপূর্ব মেধা ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনে বিস্মিত হয়ে যাচ্ছেন। স্মরণাতীত কাল থেকে আর্যসভ্যতা ও বৈদিক সংস্কৃতির পীঠভূমি বারাণসী ধাম অগণিত সাধু-মহাত্মা-ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের চরণরেণু ধারণ করে মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে; মহাদেব ও অন্নপূর্ণার নগরী কাশী আজ শঙ্কর-সূর্যোদয়ে যেন নূতন শোভা ধারণ করল। শঙ্করের নির্দেশিত পথ অবলম্বনে তাঁর প্রথম শিষ্য হলেন চোলদেশের ব্রাহ্মণ যুবক সনন্দন। আচার্যের বেদোজ্জ্বল জীবন দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি; উপযুক্ত শিষ্য পেয়ে গুরুও আনন্দিত। এক শুভদিনে তিনি সনন্দনকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা দিলেন। এই সনন্দনই পরে পদ্মপাদ নামে আচার্যের প্রধান চার শিষ্যের মধ্যে অন্যতম বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলেও শঙ্কর দেশগত ও জাতিগত সংস্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সর্ববস্তুতে ব্রহ্মদর্শনে তখনও অভ্যস্ত হন নাই। ব্রাহ্মণত্বের সংস্কার অনুযায়ী নীচজাতি ও চণ্ডালদের এড়িয়েই চলতেন। তাঁর এই ব্যবহারের ত্রুটি দূর করার জন্য স্বয়ং মহাদেব এক লীলা অবলম্বন করলেন। সশিষ্য শঙ্কর মণিকর্ণিকায় গঙ্গাস্নানে চলেছেন; উল্টোদিক থেকে দেবাদিদেব এক চণ্ডালের বেশ ধারণ করে শিকলি দিয়ে বাঁধা চারটি উচ্ছৃঙ্খল কুকুর নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। আচার্য এই দৃশ্য দেখে চণ্ডালকে কুকুরদের সংযত করে একটু সরে যেতে বললেন। চণ্ডালের কিন্তু কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। দ্বিতীয়বার আচার্য একই

অনুরোধ করলে চণ্ডাল আচার্যের সামনে দাঁড়িয়ে জোরে হেসে বললেন, "আপনি কাকে সরে যেতে বলছেন? আত্মাকে, কি এই দেহকে? আত্মা তো সর্বব্যাপী, নিষ্ক্রিয় ও সদা শুদ্ধস্বভাব। সে কোথায় কি করে সরবে। আর তা অপবিত্রই বা কি করে হবে? গঙ্গাজলে প্রতিফলিত চাঁদ আর সুরায় প্রতিফলিত চাঁদ কি পৃথক? আর যদি দেহকে সরে যেতে বলেন, তবে দেহ তো জড়, তাই বা সরবে কি করে? আপনি সন্ন্যাসী সেজে লোক-বঞ্চনা করছেন দেখছি।" চণ্ডালের এই কথা শুনে আচার্য বিস্মিত হলেন; নিজের ত্রুটি বুঝতে পেরে লজ্জিতও হলেন। কিন্তু প্রজ্ঞাবলে তাঁর মনে হল, এ নিশ্চয়ই দৈবলীলা। ভক্তিবিনম্র হৃদয়ে তিনি চণ্ডালকে প্রণাম করে সংস্কৃত শ্লোকেই তাঁর স্তুতিগান করে উঠলেন, "সর্ববস্তুতে যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান এবং সেরূপ ব্যবহারেও যিনি পারদর্শী, তিনি চণ্ডালই হন আর ব্রাহ্মণই হন, তিনি আমার গুরু; তাঁর চরণে শতকোটি প্রণাম।" ব্যবহারিক জীবনে শঙ্করকে অদ্বৈতের প্রয়োগ শেখানোই ছিল বিশ্বনাথের উদ্দেশ্য; সেই উদ্দেশ্য শেষ হলে তিনি চণ্ডালের বেশ ত্যাগ করে স্বরূপে আবির্ভূত হয়ে শঙ্করকে আশীর্বাদ করলেন আর বললেন ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করে বেদান্তের মুখ্য তাৎপর্য যে অদ্বৈত-ব্রহ্মাত্মজ্ঞান, তা জগতে প্রচার করতে। আচার্যের মনে পড়ে গেল গুরু গোবিন্দপাদের কথা,—এখন দেবাদিদেবের নির্দেশও পেলেন। ভাষ্যরচনার উপযোগী স্থান হিসাবে হিমালয়ের কোলে অবস্থিত নির্জন বদরিকাশ্রমকে তিনি বেছে নিলেন।

গঙ্গার তীর ধরে হিমালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হল। পথচারীরা অবাক হয়ে দেখতে লাগল এক চমকপ্রদ দৃশ্য,—বার বছরের বালক সন্ন্যাসী হচ্ছেন গুরু, আর সাথে শিষ্যমণ্ডলী হচ্ছেন বিভিন্ন বয়সের যুবক-বৃদ্ধ সব সন্ন্যাসী। বহু দুর্গম রাস্তা অতিক্রম করে অবশেষে তাঁরা পৌঁছালেন তীর্থশ্রেষ্ঠ বদরিকাশ্রমে। বদরিবিশালজীর মন্দিরের দুপাশে নর ও নারায়ণ পর্বত, পিছনে অভ্রভেদী নীলকণ্ঠ আর সামনে দেবলোক থেকে মর্ত্যবাসীর উদ্দেশ্যে অমৃতবারি বিতরণ করতে করতে তীরবেগে বয়ে চলেছে অলকানন্দা।

মন্দিরের অদূরে ব্যাসগুহাকে আচার্যদেব ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনার স্থান হিসাবে বেছে নিলেন। কথিত আছে, এই গুহাতেই ব্যাসদেব লক্ষশ্লোকী মহাভারত রচনা করেন। লোককোলাহল থেকে বহুদূরে নির্জন পর্বতগুহায় রচিত হয়ে যেতে লাগল ভাষ্য। রচনার সাথে সাথে আচার্য শিষ্যদের ভাষ্যের অধ্যাপনাও করতে লাগলেন। আচার্যদেব ব্যাসগুহায় আছেন, এ-খবর জানতে পেরে শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, পাশুপত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, জৈন, বৌদ্ধ ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের সাধু মহাত্মাগণই তাঁর কাছে আসতে লাগলেন। আচার্যের সাথে আলোচনা করে তাঁরা তাঁদের জ্ঞানভাণ্ডার বাড়িয়ে তুলতেন আর আচার্যদেবও সব মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হতে লাগলেন। এটি তাঁর পক্ষে পরের জীবনে খুবই সাহায্য করেছিল। যুগের আচার্যপুরুষের সব মতবাদ ও ভাবধারার সঙ্গে পরিচিতি থাকলেই সেগুলির ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে ঠিকপথে চালনা করা সম্ভব। চার বছরের মধ্যে ব্রহ্মসূত্র, দশটি উপনিষদ্ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্যরচনা আচার্যদেব করে ফেললেন। বদরিকাশ্রম থেকে শিবক্ষেত্র কেদারনাথ ও গঙ্গার উৎস গোমুখী দর্শন করে তাঁরা তখন উত্তরকাশীতে আছেন। আচার্যদেবের বয়স ষোল বছর পূর্ণ হয়েছে; শিষ্যদের ভাষ্য অধ্যাপনার কাজও খুব ঐকান্তিকতার সঙ্গে করে যাচ্ছেন। এ-সময়ে আবার এক দৈবলীলার অনুষ্ঠান ঘটে। স্বয়ং ব্যাসদেব বৃদ্ধ

ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য নিয়ে শঙ্করের সাথে দীর্ঘ আটদিন প্রবল বিচার করেন। দুজনের গম্ভীর আলোচনা, বিচারপটুতা ও পরিমিত-ভাষিতা দেখে শিষ্যরা বিস্মিত। শেষদিনে ব্রাহ্মণ নিজের পরিচয় দেন ও আচার্যের প্রস্থান-ত্রয়ের ভাষ্য দেখে খুবই আনন্দ প্রকাশ করেন। আচার্যের এই বয়সে যে লীলা-সংবরণের ইচ্ছা ও মৃত্যুযোগ ছিল ব্যাসদেব তা কাটিয়ে দিলেন। তাঁকে আরও ষোল বছর আয়ু দান করলেন এবং আদেশ করলেন কুমারিল ভট্ট ও অন্যান্য দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতদের বিচারে পরাজিত করে স্বমতে আনয়ন করতে। বললেন, এই জয়ের ফলেই তাঁর প্রচারিত অদ্বৈতমত পুনরায় ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, তাঁর রচিত ভাষ্যাদিও পণ্ডিত-মহলে সমাদৃত হবে।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের সব বিখ্যাত পণ্ডিতদের বিচারে পরাস্ত করে কুমারিল ভট্ট এদেশে বৈদিক ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন বেদের কর্মকাণ্ডের অনুগামী; জনসাধারণকে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা ফল প্রদর্শন করে তিনি তাদের বৈদিকধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করতেন। তাঁর প্রণীত গ্রন্থাদি বেদের মীমাংসা মতের এখনও পর্যন্ত প্রধান অবলম্বন। সে-সময় তিনি ত্রিবেণী-তীর্থ প্রয়াগে অবস্থান করছিলেন। সশিষ্য আচার্য প্রয়াগে এসে শুনলেন যে কুমারিল নিজ-কৃত মহৎ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে তুষানলে প্রবেশ করছেন। আচার্য দ্রুতপদে ভট্টপাদের কাছে এলেন। তুষস্তূপের উপর শায়িত অন্তগামী সূর্যসদৃশ অদ্বিতীয় কর্মবাদী, আর সামনে মধ্য-দিবাকরের দ্যুতিসম যুবক সন্ন্যাসী। আচার্যদেব ভট্টপাদকে তুষস্তূপ থেকে নেমে বিচারে আহ্বান করলেন; বললেন, মন্ত্রপূত জল দিয়ে তিনি অগ্নি নিভিয়ে দেবেন। ম্লান হাসি হেসে কুমারিল উত্তর দিলেন, তুষানলে আত্মাহুতিতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তবে মাহিষ্মতী নগরে তাঁর প্রিয় বিচারপটু শিষ্য মণ্ডন মিশ্র থাকেন,—আচার্যদেব মণ্ডনের সাথে বিচার করুন; মণ্ডনের পরাজয় তাঁরই পরাজয় বলে গণ্য হবে। আস্তে আস্তে অগ্নি ভট্টপাদের শরীর স্পর্শ করল, আচার্যদেব তারকব্রহ্ম নাম করতে লাগলেন আর এক মহা-প্রাণ হিন্দু সনাতন ধর্মের বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করলেন।

কুমারিলের নির্দেশ মেনে নিয়ে আচার্যদেব নর্মদা তীরে মাহিষ্মতী নগরেতে এলেন। শঙ্করের অভিপ্রায় জেনে মণ্ডন বিচারে রাজী হলেন। মধ্যস্থ করা হল মণ্ডনপত্নী উভয়ভারতীকে,—শাস্ত্রবুদ্ধি ও মেধার জন্য তাঁর অপর নাম ছিল সরস্বতীদেবী। এই বিচার খুবই চিত্তাকর্ষক, বিচারে পণ থাকল যে, পরাজিত ব্যক্তি বিজেতার মত ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন। বিচারে আচার্যদেবের বক্তব্য হল, একমাত্র অদ্বৈতব্রহ্মা-ত্মজ্ঞানই বেদের তাৎপর্য, কর্ম বা উপাসনা চিত্তশুদ্ধির উপায় মাত্র,—জ্ঞানকর্ম বা জ্ঞান-উপাসনার সমুচ্চয় অস্বীকার্য, কর্ম বা উপাসনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হলে জীবব্রহ্মৈক্যজ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয়। মণ্ডন এর বিপরীতপক্ষ অবলম্বন করে বক্তব্য রাখলেন, কর্মই বেদের তাৎপর্য; কর্মের ফলে অনন্তস্বর্গরূপ মুক্তি হয়। ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার অভেদভাবনার যে উপদেশ বেদে রয়েছে, তা কর্মেরই পূর্ণতাসাধনের জন্য, অনন্তকাল কর্ম করলে হবে অনন্ত স্বর্গ। দু-পক্ষের বিচার শুরু হল,—উভয়েই শ্রুতি-যুক্তি-অনুভব এই ত্রিবিধ প্রমাণ দিয়ে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিচার করে যেতে লাগলেন। প্রভাত থেকে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত বিচার চলল,—কিন্তু দু-পক্ষই সমান বলীয়ান,—কেউ কাউকে পরাজিত করতে পারলেন না। মধ্যস্থ বিচার পরের দিন সকাল পর্যন্ত মুলতুবি রাখলেন। দ্বিতীয় দিন আবার বিচার, আবার

বিরতি। আঠার দিন এভাবে তুমুল বিচারের পর মণ্ডন আর আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারলেন না,—তিনি ক্রমেই বিচলিত হয়ে পড়তে লাগলেন। উভয়ভারতী এটি লক্ষ্য করলেন,—ন্যায় ও সত্যের মর্যাদা রক্ষা করে তিনি স্বামীর পরাজয় ও শঙ্করের জয় ঘোষণা করলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে, স্ত্রী হচ্ছেন স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী, সুতরাং তিনি পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত শঙ্করের ঠিক ঠিক জয় হয়েছে বলা যাবে না। আচার্যদেব উভয়ভারতীর সঙ্গে বিচারে সম্মত হলেন; কিন্তু বিচারে উভয়ভারতী হঠাৎ সন্ন্যাসীকে কামকলা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করে বসেন। বিস্মিত আচার্যদেব বিচারের প্রথানুযায়ী একমাস সময় চেয়ে নেন। ইতিমধ্যে তিনি রাজা অমরকের মৃতশরীরে যোগবলে প্রবেশ করে উভয়ভারতীর প্রশ্নের সব উত্তরগুলি জেনে নেন,—তারপর সেগুলির লিখিত উত্তর দেবীকে দিলে তিনি পরাজয় স্বীকার করেন। বিচারের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী মণ্ডন মিশ্র সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করলেন,—নাম হল সুরেশ্বরাচার্য।

মণ্ডন-বিজয়ের পর থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আচার্যের ভূমিকা ছিল প্রকৃত বেদধর্মের সংস্থাপনা। এদেশে সেকালে আচরিত বহু মতবাদকে বেদমূলক ও বেদানুগামী করে তিনি সনাতন বৈদিক ধর্মের মহত্তর রূপটি তুলে ধরলেন সকলের সামনে। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অনেক সময় তিনি কৃপাদৃষ্টি বা স্পর্শের দ্বারা অনেককেই অদ্বৈত-তত্ত্ব বোধ করার শক্তি দান করেন,—উপযুক্ত অধিকারী তাঁর এই শক্তিবলে সমাধিস্থ হয়ে অদ্বৈত-তত্ত্ব প্রত্যক্ষ অনুভব করেন। সহজ ভাষায় সুন্দর ধর্মব্যাখ্যার দ্বারা অধ্যাত্মজগতের জিজ্ঞাসুদের ও পিপাসুদের তিনি নূতন আলোকের সন্ধান দেন।

আচার্যের চার প্রধান শিষ্যের মধ্যে পদ্মপাদ ও সুরেশ্বর আচার্যের কাছে এসে গেছেন। এরপর আসেন হস্তামলক ও তোটকাচার্য। হস্তামলক দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণপ্রধান নগরী শ্রীবেলীর এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, বালকের তের বছর বয়স হলেও সে কথা বলে না, কোন কাজও করে না,—অনেকটা জীবিত মাংসপিণ্ডের মতো। পিতা প্রভাকর পুত্রকে শঙ্করের কাছে নিয়ে এলেন। শঙ্কর বালককে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে বালক, তুমি কে, কার পুত্র, তোমার নাম কি? কোথা হতে এসেছ?" সকলের বিস্ময় সৃষ্টি করে সেই হাবা ও বোবা বালক মধুরকণ্ঠে সংস্কৃত ভাষায় আত্মস্বরূপপ্রকাশক শ্লোক একটার পর একটা বলে যেতে লাগল। আচার্য খুব খুশি হলেন, বুঝতে পারলেন যে এই বালক ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। হাতে রাখা আমলকি ফলের মতোই ব্রহ্মজ্ঞান তার অধিগত হওয়ায় নাম দিলেন হস্তামলক আর প্রভাকরকে বললেন, "ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত এই বালককে দিয়ে পরিবারের কোনও প্রিয় কাজ করানো যাবে না, একে আমার কাছে রেখে যান।"

তোটকাচার্যের আগের নাম ছিল গিরি; শঙ্করের শৃঙ্গেরী মঠে অবস্থানকালে গিরি আচার্যের শিষ্য হয়। আচার্যের সেবা করে খুব মন দিয়ে। নিরক্ষর হলেও আচার্যের অধ্যাপনা প্রতিদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনে; প্রিয়দর্শী, বিনীত মিষ্টভাষী সেবককে আচার্যও স্নেহ করেন সমধিক। প্রতিদিনের মতো একদিন সকালে মঙ্গলাচরণ ও গুরুবন্দনা করে পাঠ শুরু করতে গিয়ে আচার্য চুপ করে গেলেন। বিস্মিত হয়ে পদ্মপাদ নিবেদন করলেন, "ভগবান, পাঠ শুরু করুন।" আচার্যদেব উত্তর দিলেন, "কৈ তোমাদের সকলকে তো দেখছি না; গিরি কৈ, সে আসুক।" পদ্মপাদ বললেন, "ভগবান, গিরি কি কিছু বোঝে? সে তো নিরক্ষর।" আচার্যদেব উত্তর দিলেন, "না

বুঝলেও সে কিন্তু প্রতিদিন বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনে।" এদিকে আচার্যদেব গুরুভক্তির মাহাত্ম্য বোঝানোর জন্য আর অন্যান্য শিষ্যদের বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যাভিমান দূর করার ইচ্ছায় গিরিকে মনে মনে আশীর্বাদ করে সর্ববিদ্যা দান করলেন। একনিষ্ঠ অব্যভিচারী গুরুভক্তিরূপ শ্রদ্ধা দ্বারা গিরির বুদ্ধিতে বৈদিক উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করার সামর্থ্য আগেই জন্মেছিল। এখন গুরুর আশীর্বাদে তার হৃদয়ের অজ্ঞান-অন্ধকার চিরকালের জন্য চলে গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানে ভাস্বর হয়ে উঠল। সে সদ্য সদ্য তোটকছন্দে গুরুমাহাত্ম্যসূচক একটি সুন্দর স্তোত্র রচনা করে আচার্যের কাছে এল। শিষ্যরা বিস্ময়ে নির্বাক ও হতবুদ্ধি; গুরুকৃপার বলেই যে গিরি আজ দুর্লভ জ্ঞানের অধিকারী হয়েছে এটি বুঝে তাদের বিদ্যার গর্ব চলে গেল। গিরিকে উদ্দেশ করে আচার্যদেব বললেন, "গিরি, তুমি অসীম গুরুভক্তিবলে আজ সর্ববিদ্যার আধার হলে। তোমার গুরুভক্তি জগতে আদর্শ হয়ে থাকবে।" গিরির সন্ন্যাস নাম হল তোটকাচার্য।

আচার্যদেবের দিগ্বিজয়ের সময় বহু বিচিত্র ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে কাশ্মীরের শারদাপীঠের ঘটনাটি খুবই উল্লেখযোগ্য। আচার্যদেব অদ্বৈত-মত প্রচারে কাশ্মীরে এলে সকলে বলতে লাগল যে শারদাপীঠের পণ্ডিতমণ্ডলীকে তর্কে পরাজিত না করা পর্যন্ত, আর দেবী সরস্বতী তাঁর মতকে নির্দোষ ঘোষণা না করা পর্যন্ত ঐ মত গ্রহণযোগ্য নয়। শিষ্যদের অনুরোধে আচার্যদেব কৃষ্ণগঙ্গার তীর ধরে আস্তে আস্তে শারদাপীঠে পৌঁছালেন। শারদাপীঠের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়,—চারদিকে সাতটি চিরতুষারে ঢাকা পর্বত আর দু-দিক থেকে আসা কৃষ্ণগঙ্গা ও মধুমতীর মিলনস্থলে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি; এই বিশাল সমতলভূমিই শারদাক্ষেত্র। ক্ষেত্রের মধ্যে পরিষ্কার জলের ছোট ছোট কুণ্ড। এ-সকল জলকুণ্ডের মধ্যে একটি কুণ্ডেই শারদাদেবী বা সরস্বতীদেবী অধিষ্ঠিতা। ভক্তদের প্রতি দেবীর এতই দয়া যে মাঝে মাঝে তিনি তাদের দেখা দেন বা ভক্তেরা তাঁর অশরীরী বাণী শুনতে পায়। শারদাপীঠ কাশীরই ন্যায় ভারতবর্ষের সকল পণ্ডিতের আবাসস্থল; দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পণ্ডিতরা এখানে বিদ্যার পরীক্ষা দিয়ে দেবীর কাছ থেকে "সর্বজ্ঞ" উপাধি লাভ করতে আসেন। এই উপাধি নিতে হলে প্রথমে মন্দিরের দ্বারে চার শ্রেণীতে বিভক্ত সকল সম্প্রদায়ের পণ্ডিতদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। পণ্ডিতদের সম্মতি পেলে মন্দিরে প্রবেশাধিকার হয় আর তখন সরস্বতীদেবী অলক্ষিত থেকে স্বয়ংই প্রশ্ন করেন। এই প্রশ্নের উত্তরে দেবী সন্তুষ্ট হলে স্বয়ং তাঁকে সর্বজ্ঞ উপাধি দেন এবং তাঁকে তখন কুণ্ডের জল স্পর্শ করতে দেওয়া হয়।

আচার্যদেব পদ্মপাদ-সুরেশ্বর-হস্তামলক-আনন্দগিরি প্রমুখ প্রধান শিষ্যদের নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে প্রথম দ্বারে তাঁদের ন্যায় ও বৈশেষিক মতাবলম্বী পণ্ডিতদের সভায় আহ্বান করা হল। সেখানে তাঁদের খুশি করে দ্বিতীয় দ্বারে সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতাবলম্বী পণ্ডিতদের সভায় তাঁরা এলেন। আচার্যের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় পরিতুষ্টি লাভ করে তাঁরা মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তৃতীয় দ্বারে মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক—এই চার বৌদ্ধ সম্প্রদায়, আর দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর জৈনদের সভা। আর চতুর্থদ্বারে জৈমিনীয় মতাবলম্বী মীমাংসকরা ছিলেন। সব দ্বারের পণ্ডিতরাই আচার্যের বিদ্যাবত্তা, প্রজ্ঞা ও শাস্ত্রের গভীরতা দেখে খুশি হয়ে তাঁদের শারদাসদনে নিয়ে গেলেন, সেখানে দেবীর একটি মনোরম স্তোত্র রচনা করে আচার্য কুণ্ডের জল স্পর্শ করতে গেলে অলক্ষিতভাবে দেবী বললেন; শঙ্কর সর্বজ্ঞ

হলেও সে অপবিত্র ; কেন না মণ্ডনপত্নীর কাম-কলার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় রাজা অমরকের দেহে প্রবেশ করে কামচিন্তা করায় তাঁর সূক্ষ্মদেহ অপবিত্র হয়েছে। অতএব দেবীর অধিষ্ঠানভূত এই কুণ্ডবারি যেন শঙ্কর অপবিত্র না করে। সঙ্গে সঙ্গে আচার্যদেব উত্তর দিলেন যে অসঙ্গ আত্মস্বরূপ বোধের পর প্রারব্ধবশতঃ যে-সব মনোবৃত্তি উদিত হয় তাতে কোনও সংস্কার উৎপন্ন হয় না এবং তাতে জ্ঞানী ব্যক্তি আবদ্ধও হন না, ইত্যাদি। শারদাদেবী খুশি হয়ে বললেন ঃ "বৎস শঙ্কর! আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি আনন্দের সঙ্গে আমার কুণ্ডের জল পান কর। তোমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র যতিদের আদর্শ হবে। আমার দেওয়া সর্বজ্ঞ উপাধি নিয়ে তুমি জগতে আরও কিছুকাল বিরাজ কর।" ভক্তি-নম্রচিত্তে আচার্য দেবীকে প্রণাম করলেন; "শঙ্করাচার্যের জয়" ধ্বনিতে শারদামন্দির মুহুর্মুহুঃ মুখরিত হতে লাগল।

আচার্যদেবের দিগ্বিজয়ের মধ্যে দু-বার তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা হয়। প্রথম ঘটনাটি ঘটে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার সঙ্গমস্থলের নিকটে শ্রীশৈল নামক প্রসিদ্ধ তীর্থে। আচার্যের অদ্বৈতব্রহ্মবাদের কাছে সকলে বিচারে পরাজিত হচ্ছে দেখে কাপালিক রাজা 'ক্রকচ' কাপালিক প্রধান উগ্র-ভৈরবকে কৌশলে তাঁকে বধ করার নির্দেশ দিলেন। চতুর উগ্রভৈরব আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করলেন। এরপর একদিন একান্তে আচার্যকে কাতর প্রার্থনা জানালেন যে, আচার্যের মতো একজন সর্বজ্ঞের মাথা দিয়ে যদি তিনি রুদ্রের হোম করতে পারেন তবে শিবলোকে অনন্তকাল বাস করতে পারবেন। আচার্য সর্বজ্ঞ ও সকলের প্রতি করুণাশীল, অতএব এতে রাজী হলে উগ্রভৈরবের এতদিনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। সর্বজীবে অভয়দানকারী আচার্য এ-প্রস্তাবে খুশি মনে রাজী হলেন। অমাবস্যার রাত্রে গভীর অরণ্যে নির্জনে ভৈরবের এক স্থানে সব আয়োজন শেষ,—শঙ্কর পদ্মাসনে সমাধিস্থ, —উগ্রভৈরব শাণিত খড়্গ নিয়ে শিরশ্ছেদ করতে উদ্যত। এমন সময়ে নৃসিংহদেব-আশ্রিত পদ্মপাদ নৃসিংহের আবেশে ভীষণ গর্জন করতে করতে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং সেই খড়্গ নিয়ে উগ্রভৈরবেরই মস্তক ছিন্ন করে দিলেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে কামরূপে (বর্তমান আসাম)। কামরূপে তখন তন্ত্রের খুব প্রভাব ; তান্ত্রিকনেতা অভিনব গুপ্ত আচার্যের কাছে বিচারে পরাজিত হয়ে খুব মর্মাহত ও অপমানিত হলেন। তিনি বুঝলেন যে এই সর্বজ্ঞ অদ্বিতীয় পণ্ডিতকে বিচারে পরাজিত করা যাবে না, ইনি বেঁচে থাকলে তন্ত্র-মতের সমূলে বিনাশ অনিবার্য ; অতএব এঁকে কৌশলে বধ করতে হবে। তিনি আচার্যের প্রাণনাশের জন্য গোপনে অভিচার-ক্রিয়ানুষ্ঠান শুরু করলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই আচার্যের শরীরে দুরারোগ্য ভগন্দররোগের সূত্রপাত হল। রোগ বেড়ে বেড়ে শরীর এত ক্ষীণ হল যে, তিনি উত্থানশক্তিরহিত হয়ে শয্যা গ্রহণ করলেন। আচার্য কিন্তু নির্বিকার ব্রাহ্মী-স্থিতি অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে সকলকে ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন। এবারেও শিষ্য পদ্মপাদ আচার্যের জীবনরক্ষা করেন। তিনি দৃঢ়চিত্ত হয়ে আচার্যের কাছে অনুমতি আদায় করেন প্রত্যভিচার ক্রিয়ানুষ্ঠানের এবং এই ক্রিয়ার ফলে আচার্য সুস্থ হয়ে ওঠেন ও অভিনব গুপ্তের মৃত্যু ঘটে।

সমগ্র ভারতবর্ষে অদ্বৈতবাদের বিজয়পতাকা উড়িয়ে আচার্যদেব কেদারক্ষেত্রে এসেছেন, বয়স বত্রিশ বছর অতীত হয়েছে,—ব্যাসের আশীর্বাদ-প্রাপ্ত আয়ুও শেষ। তাঁর অন্তরে শরীরত্যাগের ইচ্ছা প্রবলভাবে দেখা দিল। ভাবলেন বেদ-বিরোধী সকলেই তো অদ্বৈতমতের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার

করে নিয়েছে, শিষ্যগণও কৃতকৃত্য,—তাদের পাবার আর কিছুই বাকি নাই। শিষ্যদের সব ডেকে ভবিষ্যতের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে বিস্তৃত নির্দেশ দিয়ে যোগাবলম্বনে তিনি পাঞ্চভৌতিক শরীর ত্যাগ করলেন।

বত্রিশ বছরের এক স্বল্পায়ু জীবনে এই মহাপুরুষের অলৌকিক কার্যাবলী ও ভারত তথা সমগ্র জগতের ধর্মেতিহাসে তাঁর অবদান সম্পর্কে একটু আলোচনা করে আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করব। শঙ্করাচার্যের সর্বপ্রধান কীর্তি হচ্ছে বিভিন্ন মতবাদ ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত এই পবিত্র ভারতভূমিকে এক বৈদিক ধর্মের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসা আর রাজানুকূল্যে পরিপুষ্ট, কদর্য ব্যভিচারে লিপ্ত বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সূক্ষ্ম কূটবিচারে পরাজিত করে পুনরায় বৈদিকধর্মের বিজয়পতাকা ভারতে ওড়ানো। এই কাজের জন্য আজ পর্যন্ত তিনি প্রতি ভারতবাসীর অন্তরের প্রণাম, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে আসছেন। তাঁর পরবর্তী জীবনের মহত্তম অবদান হচ্ছে প্রধান উপনিষদাবলী, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্যরচনা। এই ভাষ্যগুলিতে তিনি তাঁর প্রচারিত যে মতবাদ, সেই অদ্বৈতবাদ বা ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানকেই শ্রুতি-যুক্তি-অনুভবের দ্বারা স্থাপিত করেছেন। এই তিন গ্রন্থকে প্রস্থানত্রয়ের মর্যাদা দিয়ে আর এদের সকল শাস্ত্রের শিরোদেশে স্থাপন করে সনাতন ধর্মের মূল শাস্ত্রগ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি লোকের বিভ্রান্তিকর ধারণা ও কল্পনার অবসান ঘটান; ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করে তিনি বৈদিক ধর্মের পরম্পরা ও ভাবধারার ঐতিহ্য রক্ষা করেন। দ্বারকায় শারদা মঠ, পুরীধামে গোবর্ধন মঠ, বদরিকাশ্রমের নিকট জ্যোতির্মঠ ও রামেশ্বরক্ষেত্রের অন্তর্গত তুঙ্গভদ্রাতীরে শৃঙ্গেরী মঠ স্থাপন করে তিনি পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, হস্তামলক ও তোটককে যথাক্রমে এদের আচার্য করে যান। এই চারটি মঠের অধীনে থাকে দশটি সম্প্রদায় (শারদা মঠের অধীনে তীর্থ ও আশ্রম সম্প্রদায়, গোবর্ধন মঠের অধীনে বন ও অরণ্য সম্প্রদায়, জ্যোতির্মঠের অধীনে গিরি, পর্বত ও সাগর সম্প্রদায় এবং শৃঙ্গেরী মঠের অধীনে সরস্বতী, ভারতী ও পুরী সম্প্রদায়)। এভাবে তিনি জীবব্রহ্মৈক্যজ্ঞানরূপ যে ব্রহ্মবিদ্যা তা শিষ্য ও সম্প্রদায়ানুগতরূপে আয়ত্ত করা এবং প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এই চারটি মঠের মঠাধীশ নির্বাচন ও দশনামী সম্প্রদায় প্রবর্তন করে তাদের ব্যবস্থাপনা ও নিয়মাবলী এত নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর করে যান যে, আজ পর্যন্ত ভারতের সন্ন্যাসী-মহলে এই দশনামী সন্ন্যাসীরাই সকলের শীর্ষে অবস্থান করছেন। আচার্যদেবের আর একটি মহৎ কীর্তি হল লুপ্তবিগ্রহ উদ্ধার ও দেবতা-প্রতিষ্ঠা। অনেক বিখ্যাত তীর্থের হারিয়ে যাওয়া বিগ্রহ তিনি উদ্ধার করেন এবং পুনরায় অভিষেকাদি করে পূজা চালু করেন। বদরিকাশ্রমে এসে তিনি দেখেন যে বিগ্রহের পরিবর্তে নারায়ণ শিলায় পূজা হচ্ছে,—এর কারণ হিসাবে জানতে পারলেন যে চীন-অভিযানের সময় বর্তমান পুরোহিতদের পূর্বপুরুষরা বিগ্রহটিকে কোনও এক কুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করেন; কিন্তু পরে আর উদ্ধার করতে পারেননি। আচার্যদেব ধ্যানে বিগ্রহের স্থান জেনে নারদকুণ্ড থেকে শিলাফলক উদ্ধার করে নিয়ে এলেন,—ফলকে পদ্মাসনাবদ্ধ চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি। অভিষেকাদি করে তিনি এই মূর্তির পূজা প্রবর্তন করেন। পুরীধামে জগন্নাথদেবের বিগ্রহও তিনি উদ্ধার করেন। নূতন মূর্তি প্রতিষ্ঠার মধ্যে গঙ্গোত্রীতে গঙ্গাদেবী, কাঞ্চীতে কামাক্ষীদেবী ও শৃঙ্গেরী মঠে সরস্বতীদেবী অন্যতম। আচার্যদেব জানতেন তাঁর প্রবর্তিত জীবব্রহ্মৈক্যজ্ঞানের অধিকারী খুবই কম। সকলের জন্য তাই ছিল নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনার

বিধান। কিন্তু আচার্যদেবের এই মতের পরবর্তী ধারক ও বাহকগণ পথের বা তত্ত্বের চরম অবস্থাটি নিয়েই শুধু আলাপ-আলোচনা করলেন; কিন্তু পথের নির্দেশ বা উপায় নিয়ে আলোচনা না করায় সর্বসাধারণের কাছে অদ্বৈতবাদ শুষ্ক, ভীতিপ্রদ, শুধুমাত্র বৌদ্ধিক চর্চায় পরিণত হয়,—উপলব্ধির বদলে তর্ক-বিচারে জয় এবং বৌদ্ধিক আনন্দেই যেন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। আচার্যদেব তাঁর জীবনে প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যরচনা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে আর নির্বিকল্প সমাধিলাভের দ্বারা জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা; গঙ্গাস্তোত্র, অন্নপূর্ণাস্তোত্র, সৌন্দর্যলহরী ও বিভিন্ন দেবদেবীর স্তুতি রচনা ও পূজা প্রবর্তন করে অন্তরের ভক্তিরও পরিচয়; সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে সব পণ্ডিতদের বিচারে পরাজিত করে ও মঠস্থাপনা ইত্যাদির দ্বারা কর্মযোগীর দৃষ্টান্ত—জগদ্বাসীর সামনে রেখে গেছেন। অদ্বিতীয় মেধাসম্পন্ন, অলৌকিক বিচারশীল দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত যাঁর মূল সিদ্ধান্ত হল 'ব্রহ্ম সত্যং, জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'—তিনিই কিন্তু জগজ্জননীর কাছে শিশুমাত্র, যেন মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে একটি ছোট্ট বালক,—মায়ের কৃপা-ভালবাসা ও করুণাই তার একমাত্র আশা-ভরসা। এই প্রসঙ্গে তাঁর রচিত 'ভবান্যষ্টকম্'-এর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে আলোচনার উপসংহার করছি,—

> ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং
> ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্।
> ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং
> গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

—আমি দান ও ধ্যানযোগ জানি না; তন্ত্র, মন্ত্র, স্তোত্র এবং পূজা জানি না; সন্ন্যাসযোগও জানি না; হে ভবানি, তুমিই আমার গতি, একমাত্র তুমিই আমার গতি।

বন্দনা

কল্পনা ঘোষ

করুণারূপিণী সারদাজননী
তুমি মা ভক্তবৎসলা।
মাতা ব্রহ্মময়ী জ্ঞান প্রদায়িনী
রামকৃষ্ণপ্রাণা সারদা॥

তুমি আদ্যাশক্তি সর্বাণী ষোড়শী
জননী তুমি গো বরদা।
ভক্তি-মুক্তি দাত্রী তুমি বিশ্ব পালয়িত্রী
তুমি যে গো অয়ি শুভদা॥

মূর্তিমতী বাণী ধৈর্য স্বরূপিণী
ক্ষমার আধার তুমি মা।
তব নাম স্মরি ওগো নারায়ণি
দূর হয় মোহ কালিমা॥

সুভাষচন্দ্রের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

[ফাল্গুন, ১৩৯২ সংখ্যার পর]

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নাম করে বা না করে, সুভাষচন্দ্র কেবলই সমন্বয়তত্ত্ব উপস্থিত করে গেছেন। তাঁর এইসকল বক্তব্যের রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা ছিলই—কেন না ভারতবর্ষ বহু ধর্ম, ভাষা ও আচারের দেশ—সেখানে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার জন্য বহুর মধ্যে ঐক্যসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করতে হয়ই।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমন্বয় ও তার দ্বারা ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তিস্থাপন প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের উৎকৃষ্ট মন্তব্য আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। এখানে স্বল্পাকারে আরও কিছু কথা উপস্থিত করা যায়।

সুভাষচন্দ্র এক ও বহুর সমন্বয়তত্ত্বকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা থেকেই প্রচার-বিষয় করেছিলেন; ডিসেম্বর ১৯২২, নিখিল বঙ্গ যুব-সম্মিলনীতে তাঁর ভাষণের আলোচনায় সেকথা বলেছি। ১৮ জুন, ১৯২৮, নিখিল বঙ্গ যুবক সমিতির সভায় তিনি "একের সহিত বহুর মিলন বাংলার বৈশিষ্ট্য"—এই প্রসঙ্গে বলেন:

"পরমহংস রামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ এই সত্যই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজী বলিয়াছেন—মানুষ কখনও অসত্য হইতে সত্যের দিকে অগ্রসর হয় না—সে উচ্চ সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে পৌঁছায়; সত্যের কোনও স্তরকেই সে অস্বীকার করে না। এক সত্য যেমন সত্য, বহুও তেমনি সত্য। একের সহিত বহুর মিলন—ইহাই সাধকের ধারণা। এই সম্মিলনই বাংলার বৈশিষ্ট্য।"

বাংলার এই বৈশিষ্ট্য কিভাবে ভারতীয় জাতীয়তার তত্ত্ব দান করেছে, সে সম্বন্ধে একই ভাষণে তিনি বলেন:

"একের সহিত বহুর সমন্বয়—ইহাই আমাদের জাতীয় জীবনের গোড়ার কথা। ভারতীয় জাতীয়তার আদর্শের মধ্যেও এই ভাব রহিয়াছে। আমরা কিছুই ধ্বংস করিতে চাহি না। সমস্তই সত্য, শুধু স্তরভেদ। একও সত্য, বহুও সত্য। ইহাই জীবনের তত্ত্ব। যাহা আমাদের জীবনের তত্ত্ব, তাহা আমাদের জাতীয়তার তত্ত্ব। যাহা আমাদের জীবনের ধর্ম, তাহা আমাদের জাতীয়তারও ধর্ম।" [১—২০৫-৭]

১৬ জুলাই ১৯২৮, অ্যালবার্ট হলে ছাত্র সংগঠন সমিতির সভায়, এই সমন্বয়তত্ত্বে বিশ্বাসী ভারতবর্ষে কিভাবে বহু সভ্যতা, সংস্কৃতির মিশ্রণ যুগে-যুগে ঘটেছে, এবং রক্ত মিশ্রণ—তার প্রসঙ্গ তোলেন। সংঘর্ষমুখে বহিরাগত ভাবকে গ্রহণের, ও তার শক্তিতে সৃষ্টিশীল হবার ক্ষমতা ভারতবর্ষের আছে। "আজ আমাদের শিল্প-সাহিত্য, ধর্ম এবং রাষ্ট্রনীতিতে নূতন নূতন সৃষ্টি হইতেছে। যে জাতির মধ্যে রামমোহন, বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন, সে জাতির যে নিত্য নূতন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আছে, তাহা সহজেই বোঝা যায়। সৃজনীশক্তি না থাকিলে কোন জাতিই এইরূপ মনীষীর জন্ম দিতে পারে না।" "আমাদের দেশে ইংরাজ আগমনকালে আমাদের প্রাচীন পদ্ধতির বিরুদ্ধে একটা প্রবল বিদ্রোহ ঘোষিত হয়। দেশের প্রচলিত ধর্ম ও সমাজব্যবস্থায় একটা পরিবর্তন ঘটে। তারপর পরমহংস রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের নূতন ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করেন। ফলে সমন্বয় সাধিত হয়।" [১—২২২, ২২৪]।

সুভাষচন্দ্র ১৩ মার্চ ১৯২৯ সবুজ সংঘের সভায় যে-ভাষণ দেন তার বিষয়বস্তুই ছিল 'প্রাচ্য ও

পাশ্চাত্যের সমন্বয়।' এবং সেই ভাষণ যে-সকল উপ-শিরোনামা-সহ ছাপা হয়েছিল তার অনেকগুলিই স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা থেকে আহৃত। যথা, 'অশান্তি জীবনের লক্ষণ,' 'সৃষ্টি ও ধ্বংস পাশাপাশি চলিয়াছে', 'জীবনের লক্ষণ—সৃষ্টির ক্ষমতা', 'অসন্তোষ-জ্ঞান ও আত্ম-বিশ্বাস', 'আমূল পরিবর্তন চাই', 'নূতন মনোভাবের সৃষ্টি চাই', 'সমাজের ভিত্তি নড়াইতে হইবে', 'অতীতের চেয়ে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ', 'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার।'

এর মধ্যে 'বাঁচার সার্থকতা' বলেও একটি উপ-শিরোনামা ছিল। তাতে আছে :

"আমরা যে এখনো বাঁচিয়া আছি, মরি নাই, তার মানে আমাদের একটা মিশন আছে। এই মিশন-এর অর্থ অতীতের মধ্যে ডুবিয়া থাকা নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় করিবার শক্তি আমাদের আছে। স্বামীজী সেই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আমরা নানাদিক দিয়া বাদী হইলেও এখনো জগৎকে অনেক নূতন জিনিস দান করিতেছি।" [২—৫৯] ,

গোটা বক্তৃতাটি স্বামীজীর চিন্তাসূত্রেই রচিত, সুভাষচন্দ্রই তা জানিয়েছেন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ জন্মতিথি সভায় সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন :

"শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের সহিত এক-যোগে না দেখিলে স্বামীজীকে যথার্থ-ভাবে বিচার করা যাইবে না। স্বামীজীর বাণীর মধ্য দিয়াই বর্তমানের মুক্তি-আন্দোলনের ভিত্তি গঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীন হইতে হয়, তবে তাহাকে হিন্দুধর্ম বা ইসলামের বিশেষ আবাসভূমি হইলে চলিবে না—তাহাকে জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যে-বাণী—ধর্মসমন্বয়—তাহা ভারতবাসীকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে হইবে।..."

"স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, ধর্ম ও বিজ্ঞানের, অতীত ও বর্তমানের সমন্বয় করিয়াছিলেন।" [বিশ্ববিবেক, ১৮৮]।

৮ জানুআরি, ১৯৩১, চন্দননগর বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে আয়োজিত, শ্রীঅরবিন্দ-শিষ্য মতিলাল রায়ের প্রবর্তক সংঘের সভায়—"দেশবন্ধু ও শ্রীঅরবিন্দ, এই দুইজন মনস্বী পুরুষই স্বামী বিবেকানন্দের অনুসারী"—একথা বলার পরে সুভাষচন্দ্র যোগ করেন—রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সমন্বয়কে পরবর্তী যুগজীবনের জটিলতার উপযোগী করে ঐ দুইজন 'নিজস্ব রীতিতে' দেশের সামনে তুলে ধরেছেন। [৩—৫৪]।

১৪ মে, ১৯৩১, নোয়াখালি দেবালয় প্রাঙ্গণে প্রদত্ত ভাষণে সমন্বয়তত্ত্বের উপর স্থাপিত অখণ্ড স্বাধীনতা-তত্ত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

"আমরা জীবনের সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা চাই।...পূর্ণ স্বাধীনতা মানুষে-মানুষে সাম্যের সমাজতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। রাশিয়া একটা মতবাদ গ্রহণ করিয়াছে, আজকের ইটালি আর একটি এবং ভারতবর্ষও সাম্য ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্বন্ধে তার নিজের ভাষ্য গ্রহণ করিবে। ভারতীয় দর্শন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের শিক্ষা দেয়। উপনিষদ হইতে শুরু করিয়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পর্যন্ত ইহাই ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের ভিত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আমাদের জীবনের আদর্শ। আমাদের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ঘটিবে। আমাদের সম্মিলিত সভ্যতাকে আমরা বিচিত্র সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্যে ভারতীয় পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত করিব।" [৩—৮৮]।

১২ জুলাই ১৯৩১ যশোর জেলা রাষ্ট্রনৈতিক সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতার যথার্থ রূপ কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় ও বাণীতে প্রকাশিত, তা চমৎকারভাবে বর্ণনা করেন—

"রাজা রামমোহন রায় জোরের সঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, ইংরেজি ভাষা না শিখিলে আমাদের কোনো বিকাশ বা উন্নতি হইবে না; খাস পাশ্চাত্ত্যদেশীয়দের নিকট হইতে পাশ্চাত্ত্য-ধারা না শিক্ষা করিলে আমরা নিজেদের রক্ষা করিতে পারিব না। যথা সময়ে [তার বিরুদ্ধে] প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। জাতি আত্মসচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বাধীনতার জন্য আকুল হইল। কিন্তু সঠিক পথের সন্ধানে অন্ধকারে হাতড়াইতে লাগিল। সমস্যা দাঁড়াইল, দেশে অবস্থিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, জাতিগত এবং ধর্মগত গোষ্ঠীগুলির সমন্বয় সাধিত হইবে কিভাবে? ভারতবর্ষের এই নানাত্ব এবং বৈচিত্র্যের পশ্চাতে কোনো মূলগত ঐক্য আছে কি না, ইহাই প্রশ্ন।

"এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া সর্বকালের জন্য সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, সকল ধর্মই একই সর্বশক্তিমান বিধাতার চরণতলে সম্মিলিত হয়। সর্বজনীন পরমতসহিষ্ণুতা এবং প্রেমের ভিত্তিতে ভারতে সকল ধর্মের সমন্বয়—ভারতীয় জাতীয়ত্ববোধ বিকাশের স্থায়ী ভিত্তিমূল গড়িয়া তুলিবে।

"এই মূলগত সত্যটি উপলব্ধি করিবার পর জনসাধারণ বুঝিল যে, সময় উপস্থিত হইয়াছে যখন কেবলমাত্র সকল ধর্মে নহে, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও—ধর্ম ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্য হইতে একটি জাতি সৃষ্টি হইতে পারে। বহুর মধ্যে এক—এই সত্যটি উপলব্ধি করিতে না পারিলে আমরা ধর্মীয়, সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিব না। এই সকল আপাত বৈচিত্র্যের অন্তরালে একটি ঐক্যসূত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। দৃশ্যত বৈচিত্র্যে প্রতিহত না হইয়া তাহার অন্তরালবর্তী মূলগত ঐক্যের সন্ধান করিতে হইবে, এবং আমাদের ব্যক্তিগত ও যৌথজীবন সেই নিরাপদ ভিত্তির উপর গড়িয়া তুলিতে হইবে।" [৩—১৩০-৩১]

(ঙ) "পৃথিবীতে ভারতের একটা মিশন আছে…"

এই বিষয়ে এই পর্বে সুভাষচন্দ্র বারংবার একই কথা বলেছেন, এবং সেগুলি বিবেকানন্দের বক্তব্যের সরলীকৃত রূপ, তা পাশাপাশি উভয়ের উক্তি তুলে স্বচ্ছন্দে দেখিয়ে দেওয়া যায়—তার প্রয়োজন নেই।

॥ ৮ ॥

১৯৩৩-৪০ পর্বের প্রথম দিকে কিছু-বেশি চার বৎসর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সুভাষচন্দ্র ইউরোপ-বাসী; পরবর্তী কয়েক বৎসরে তিনি ভারতস্থ, যদিও তারও কিছু সময় কারান্তরালে কেটেছে। গুরুতর অসুস্থ হয়ে তিনি ইউরোপে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অপরাজেয় চিত্তশক্তি শারীরিক অপটু-তাকে লঙ্ঘন করে ইউরোপে ভারতের স্বাধীন-তার জন্য যথাকর্মে তাঁকে নিয়োজিত রেখেছিল। এইকালেই তিনি বিশ্বরাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন, এবং প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক যোগাযোগ স্থাপন করেন। আলোচ্য পর্বের দ্বিতীয় অংশে তিনি ভারতীয় রাজনীতির এক প্রধান পুরুষ। গান্ধীজীর ইচ্ছামতো প্রথমবার জাতীয় কংগ্রেসের সর্বসম্মতিতে বৃত সভাপতি, দ্বিতীয়বার গান্ধীজীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নির্বাচিত সভাপতি। তারপর দক্ষিণপন্থীদের বিরোধিতায় এবং বামপন্থীদের একাংশের পশ্চাদপসরণে তাঁর পদত্যাগ, ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন, ক্রমে কংগ্রেস

থেকে বিতাড়ন, আপসহীন সংগ্রামের ঝঞ্ঝাপ্রবাহ সৃষ্টি, এবং দেশত্যাগ—দেশের মুক্তির সন্ধানে। এই পর্বের দ্বিতীয়াংশের যে-চরিত্র তাতে স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলার বিশেষ সুযোগ আসবার কথা নয়। বলা যায়, স্বামীজীকে শিরায়-শিরায় গ্রহণ করেই তখন তিনি ছুটছেন।

সুভাষচন্দ্র তাঁর এই পর্বের ইউরোপ-বাসের শেষাংশে [অসমাপ্ত] আত্মজীবনীটি লেখেন—'অ্যান ইণ্ডিয়ান পিলগ্রিম' (ভারত পথিক)—যার ভিতরে তাঁর জীবনগঠনে বিবেকানন্দের ভূমিকার কথা সবিস্তারে বলেছেন—এবং সে বক্তব্য আমরা আগেই উপস্থিত করেছি। ঐ গ্রন্থ থেকে জেনেছি—বিবেকানন্দই তাঁর জীবনগঠনে প্রবলতম শক্তি। স্মর্তব্য, পরিণত বয়সে, নিজের জীবন পর্যালোচনায় নিয়োজিত সুভাষচন্দ্র ঐ সকল কথা লিখেছিলেন।

'ভারত পথিক' রচনার কয়েক বৎসর আগে ইউরোপ প্রবাসেই সুভাষচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল্' লেখেন, যে-গ্রন্থটি ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক পর্ব সম্বন্ধে সর্বোত্তম সৃষ্টির মধ্যে পড়ে। এই গ্রন্থের স্বচ্ছ, গতিশীল, আকর্ষক রচনারীতি, মুক্ত দৃষ্টি, বিশ্বাসের দৃঢ়তা, অথচ তথ্যভিত্তিক নিরপেক্ষতা—সর্বোচ্চ মনীষী-মহলে প্রশংসা অর্জন করেছে। এর ভূমিকা-অধ্যায়ে তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামের মানসভূমি রচনাকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের বিষয়ে সংক্ষেপে মন্তব্য করেছেন। সেখানে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব, বলা উচিত সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

"নবযুগের বার্তাবহ" রামমোহন রায়, তাঁর অনুবর্তী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, ব্রাহ্মসমাজ, সংস্কার আন্দোলন, ব্রাহ্মদের মূর্তি-পূজা বিরোধিতা, ইত্যাদি কথার পরে সুভাষচন্দ্র বলেন: একদিকে ইংরেজী-শিক্ষিত ভারতীয়দের উপর ব্রাহ্মসমাজের যেমন যথেষ্ট প্রভাব ছিল, অন্যদিকে তেমনি তাঁদের অত্যাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষণশীলদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, এবং রক্ষণশীলরা হিন্দুধর্মের সবকিছুকে অন্ধভাবে সমর্থন করতে থাকেন। তবে নতুন প্রজন্মের মানুষদের এই রক্ষণশীলরা তেমন আকর্ষণ করতে পারেননি।

"প্রায় এই সময়ে, গত শতাব্দীর আশির দশকে জনসাধারণের মধ্যে আবির্ভূত হন দুই প্রখ্যাত ধর্মপুরুষ, যাঁরা নবজাগরণের পরবর্তী পর্যায়গুলিতে বিরাট প্রভাব বিস্তারের নির্ধারিত চরিত্র। তাঁরা হলেন—ঋষি রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। গুরু রামকৃষ্ণ প্রাচীন হিন্দু ধারাতে বর্ধিত, কিন্তু তাঁর তরুণ শিষ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত, গুরুর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে অজ্ঞেয়বাদী। রামকৃষ্ণ সর্বধর্মের ঐক্যতত্ত্ব প্রচার করেছেন—সকলকে প্রণোদিত করেছেন ধর্মসংঘাতের বিরোধিতা করতে। যথার্থ অধ্যাত্মজীবন যাপনের জন্য ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য ও কৃচ্ছ্রসাধনার উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্রাহ্মসমাজের বিরোধিতা করে তিনি ধর্মার্চনার কালে প্রতীক উপাসনার পক্ষ সমর্থন করেছেন, ব্রাহ্মসমাজের অত্যাধুনিক অনুকরণস্পৃহার সমালোচনাও করেছেন। দেহত্যাগের পূর্বে তিনি তাঁর শিষ্যের উপরে তাঁর প্রদর্শিত ধর্মাদর্শ ভারতে ও বহির্ভারতে প্রচারের ভারার্পণ করে যান—স্বদেশবাসীর জাগরণ ঘটানোর দায়ভারও দান করেন। স্বামী বিবেকানন্দ তদনুযায়ী রামকৃষ্ণ মিশন নামক সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ স্থাপন করেন—ভারতে ও ভারতের বাইরে, বিশেষত আমেরিকায়, হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধ রূপ জীবনে ও বাণীতে প্রকাশ করবার জন্য। সেইসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ সকল প্রকার সুস্থ ও

বলিষ্ঠ জাতীয় কর্মপ্রচেষ্টাকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য সক্রিয় চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর কাছে ধর্ম জাতীয়তার উদ্বোধক। নতুন প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে তিনি ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে গর্ববোধ, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশ্বাসবোধ জাগাতে চেষ্টা করেছেন এবং আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ। স্বামীজী কোন রাজনৈতিক বাণী না দিয়ে গেলেও, যে-কেউ তাঁর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসেছেন, কিংবা তাঁর রচনার পরিচয়লাভ করেছেন—সকলের মধ্যে দেশপ্রেম জাগরিত হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক চেতনার। বাংলার ক্ষেত্রে অন্তত স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আধ্যাত্মিক পিতা। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে খুব অল্প বয়সে তাঁর দেহান্ত হয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর থেকে তাঁর প্রভাব ক্রমেই বেড়েছে।"

'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' রচনাকালেই সুভাষচন্দ্র তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অমিয়নাথ বসুকে এক পত্রে (২১. ২. ১৯৩৪) জেনিভা থেকে লিখেছিলেন:

"চরিত্রের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করতে হলে—বিবেকানন্দের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।"

এই চিঠিতে বাঙালীর চরিত্রের দোষের বিষয়ে তিনি বলেছেন—তার প্রধান দোষ একাগ্রতার অভাব, সেইসঙ্গে নাছোড়-ভাব না থাকা। একটা আদর্শকে গ্রহণ করে তার জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করতে বাঙালী পারে না। এই দোষগুলিকে বাদ দিলে বাঙালীর মধ্যে অনেক গুণ আছে। এইকালে সুভাষচন্দ্র নিজ জীবনে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করেছেন, তুলে ধরেছেন কর্মসন্ন্যাসের আদর্শ, যদিও কেউ যদি যথার্থ ব্রহ্মচর্য পালন করতে চায়, সে কোন্ পথ নেবে, তাও জানিয়েছেন। তিনি এক্ষেত্রে মাতৃরূপে নারীর চিন্তা করতে বিশেষভাবে বলেছেন, 'চণ্ডী' উদ্ধৃত করে প্রভাতে ও রাত্রে দুর্গামূর্তির ধ্যানের নির্দেশও দিয়েছেন। [ক্রমশঃ]

তাঁর নামে ভরা এ-মন

শ্রীদীপ্তিকুমার শীল

কেদার-বদ্রীতে, কামাখ্যা কৈলাসে
　যেখানে আছেন যিনি,
মম অন্তরে, হৃদয়-মন্দিরে
　সদা-ই পূজিত তিনি।
নিত্য স্মরণে নিত্য পূজা
　অন্তরে তাঁর আরতি,
অশ্রু জলে হয় অভিষেক
　প্রেমেই জানাই প্রণতি।

মনের মাঝে সদাই জপি
　"তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র"
আমার 'আমি' তাঁরে সঁপি,
　তাঁর নাম মোর মন্ত্র।
রাজার রাজা গুরু মহারাজ
　আমি তো তাঁর দাস;
তাঁর-ই নামে ভরা এ-মন,
　এ-ধরাতেই স্বর্গবাস॥

পথ ও পথিক
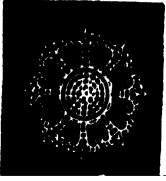
স্বামী জয়দেবানন্দ

ব্যবহারকুশলতা

এক প্রাচীন সাধুর মুখে ঘটনাটি শুনেছিলাম। পূজনীয় তুরীয়ানন্দজী মহারাজ ৺কাশীধামে অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন, সনৎ মহারাজ তাঁর সেবক। সনৎ মহারাজের একবার ইচ্ছা হল যে, কিছুদিন মাধুকরী করে তপস্যাদি করেন। কিন্তু যান কি করে? পূজনীয় মহারাজের সেবার ভার কে নেবে? একদিন কথায় কথায় মহারাজের নিকট কথাটি বললেন। পূজনীয় তুরীয়ানন্দজী নিজে ছিলেন মহাতপস্বী, তাই প্রসন্নমনে সনৎ মহারাজকে ছুটি দিতে রাজী হয়ে গেলেন। কিন্তু সেবার ভার কাকে দেন—এই হল সমস্যা।

পূজনীয় মহারাজ নিজেই একদিন বললেন—ওই যে নূতন ব্রহ্মচারী এসেছে, ওকে বল না! সনৎ মহারাজ তাকে বলতে সে বললে—না, আমার দ্বারা মহারাজের সেবা হবে না। সনৎ মহারাজ গিয়ে পূজনীয় মহারাজকে সে কথা জানালেন। পূজনীয় মহারাজ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—কেন? সনৎ মহারাজ বলেন—তা তো জানি না।

—ডাক তো ওকে।

ব্রহ্মচারীটি আসতে মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন।

—কিরে তুই নাকি আমার সেবার ভার নিতে চাচ্ছিস্ না?

—হ্যাঁ, মহারাজ।

—কেন তোর আপত্তি কোথায়?

—মহারাজ, আপনার সেবা করতে হলে রান্নাবান্নাও করতে হবে।

—তাতে কি হয়েছে? আমার রান্না তো খুবই সহজ।

—আমি যে মসলা-ফসলা কিছুই চিনি না। রাঁধব কি করে?

—তুই মসলা চিনিস্ না, তবে ভগবানকে চিনবি কি করে?

কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণ লোকের ধারণা, যাঁরা আধ্যাত্মিক সাধনা করেন তাঁরা জাগতিক ব্যাপারে খুব উদাসীন হন। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ যখন মঠের ম্যানেজার তখন এক ব্রহ্মচারী খড় কাটতে গিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল কেটে ফেলেছে। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ তো তাকে কোন সহানুভূতি ও সমবেদনা দেখালেনই না, বরং অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন—তোমাকে খড় কাটতে বলা হয়েছিল, আঙুল কাটতে নয়। তুমি সাধু হবার অনুপযুক্ত। দেখ বাবা, যে খড় কাটতে গিয়ে আঙুল কাটে, এত অন্যমনস্ক, সে তার সেই মন দিয়ে তাঁকে ধ্যান করবে কী করে? কোন কাজে অমনোযোগিতাবশতঃ ভুল হলে বলতেন—বাবারা, খুব হয়েছে, এখন ঘরে ফিরে যাও। ও গোবিন্দ, এদের এক আনা করে পয়সা দে, গঙ্গা পার হবার জন্য।

লীলাপ্রসঙ্গকার এক জায়গায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যবহারকুশলতা সম্বন্ধে লিখেছেন—"শরীর, বস্ত্র, বিছানা প্রভৃতি অতি পরিষ্কার রাখা তাঁহার অভ্যাস ছিল। যে জিনিসটি যেখানে

রাখা উচিত, সে জিনিসটি ঠিক সেইখানে নিজে রাখিতে এবং অপরকেও রাখিতে শিখাইতে ভালবাসিতেন, কেহ অন্যরূপ করিলে বিরক্ত হইতেন। কোনস্থানে যাইতে হইলে গামছা, বেটুয়া প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যাদি ঠিক ঠিক লওয়া হইয়াছে কিনা, তাহার অনুসন্ধান করিতেন এবং সেখান হইতে ফিরিবার কালেও কোন জিনিস লইয়া আসিতে ভুল না হয়, সেজন্য সঙ্গী শিষ্যকে স্মরণ করাইয়া দিতেন।"

"শৈশবকাল হইতে তিনি তাঁহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কতদূর সম্পূর্ণ ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন ; ঐ শিক্ষাই যে পরে মনুষ্য চরিত্র গঠনে তাঁহার বিশেষ সহায় হইয়াছিল—তাহাতে সন্দেহ নাই।"[১]

যোগীন মহারাজ বাজার থেকে একখানা ফাটা কড়াই নিয়ে এলে ঠাকুর তাঁকে তিরস্কার-পূর্বক বলেছিলেন—"ভক্ত হতে হবে বলে কি বোকা হতে হবে? দোকানী কি দোকান ফেঁদে ধর্ম করতে বসেছে, যে তুই তার কথায় বিশ্বাস করে কড়াখানা একবার না দেখেই নিয়ে চলে এলি? আর কখনও ওরূপ করিস না। কোন দ্রব্য কিনতে হলে পাঁচ দোকান ঘুরে তার উচিত মূল্য জানবি, দ্রব্যটি নেবার কালে বিশেষ করে পরীক্ষা করবি, আর যে-সব দ্রব্যের ফাউ পাওয়া যায় তার ফাউটি পর্যন্ত না গ্রহণ করে চলে আসবি না।"[২]

ঠাকুর সর্বদা অন্তর্মুখে অবস্থান করলেও বহির্বিষয়ে তাঁর লক্ষ্য করবার শক্তি অতি তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁর ছোট ছোট আচরণে বেশ বোঝা যায় শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির যথাযথ ব্যবহার জানলে তবে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি করা সম্ভব। কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে এই ধরনের উপদেশ দিয়েছেন। সুসংযত ইন্দ্রিয়, সমাহিত মন, বিবেকযুক্ত বুদ্ধি মানুষকে বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্তিতে সাহায্য করতে সক্ষম।[৩] কাজেই পূজনীয় তুরীয়ানন্দজী মহারাজের উক্তির তাৎপর্য এই যে সাংসারিক সামান্য বিষয়ে যদি আমরা দক্ষ না হতে পারি পারমার্থিক ব্যাপারে উন্নতি কখনই সম্ভব নয়। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতিতে আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক (subjective) ব্যবহারকুশলতার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হত। উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রদত্ত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির যথাযথ ব্যবহার করে জ্ঞানলাভ করা। অন্যদিকে ব্যবহারকুশলতার সামাজিক দিকটি (objective) দেখাও প্রয়োজন।

অধর সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ইংরেজীতে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন—"কি গো! আপনারা ইংরেজীতে কি কথাবার্তা করছ?

অধর—আজ্ঞে এই বিষয় একটু কথা হচ্ছিল, কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যার কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, সকলের প্রতি)—একটা কথা মনে পড়ে আমার হাসি পাচ্ছে। শুন, একটা গল্প বলি। একজন নাপিত কামাতে গিয়েছিল। একজন ভদ্রলোককে কামাচ্ছিল। এখন কামাতে কামাতে তার একটু লেগেছিল। আর সে লোকটি ড্যাম্ বলে উঠেছিল। নাপিত কিন্তু ড্যামের মানে জানে না। তখন সে ক্ষুরটুর সব সেখানে রেখে, শীতকাল, জামার আস্তিন গুটিয়ে বলে; তুমি আমায় ড্যাম্ বললে, এর মানে কি, এখন বল। সে লোকটি বললে, আরে

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩২৭—৩২৯
২ ভক্তমালিকা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৮
৩ বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ (কঠ উঃ ১।৩।৯)

তুই কামা না ; ওর মানে এমন কিছু নয়, তবে একটু সাবধানে কামাস্। নাপিত সে ছাড়বার নয়, সে বলতে লাগল, ড্যাম্ মানে যদি ভাল হয়, তা হলে আমি ড্যাম্, আমার বাপ ড্যাম্ আমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম্। (সকলের হাস্য) আর ড্যাম্ মানে যদি খারাপ হয়, তা হলে তুমি ড্যাম্, তোমার বাবা ড্যাম্, তোমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম্।"[৪]

"কোনো বিশেষ ভাষায় অনভিজ্ঞ কেউ সামনে থাকলে, তার সামনে সর্বজনবোধ্য ভাষায় কথা বলাই শিষ্টাচার। সে কথা আমাদের ইংরেজী নবীশদের সব সময় মনে থাকে না।"[৫] শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্কিমবাবুর মতো প্রখ্যাত সাহিত্যিককে একটি ছোট গল্প বলে শিষ্টাচার শিক্ষা দিচ্ছেন। হাস্যরসের অবতারণা করে শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি ব্যবহারকুশলতার অপূর্ব দৃষ্টান্ত। আরেকটি অনুরূপ দৃষ্টান্ত কেশব-বিজয়ের প্রসঙ্গে: "দেখ, ভগবান শিব এবং রামচন্দ্রের মধ্যে এক সময়ে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়া ভীষণ যুদ্ধের অবতারণা হইয়াছিল। শিবের গুরু রাম এবং রামের গুরু শিব একথা প্রসিদ্ধ। সুতরাং যুদ্ধান্তে তাঁহাদিগের পরস্পরে মিলন হইতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু শিবের চেলা ভূত-প্রেতাদির সঙ্গে রামের চেলা বাঁদরগণের আর কখন মিলন হইল না। ভূতে-বাঁদরে লড়াই সর্বক্ষণ চলিতে লাগিল। (কেশব ও বিজয়কে সম্বোধন করিয়া) যাহা হইবার হইয়া গিয়'ছে, তোমাদিগের পরস্পরে এখন আর মনোমালিন্য রাখা উচিত নহে, উহা ভূত ও বাঁদরগণের মধ্যেই থাকুক।"[৬] এরপর কেশব ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মধ্যে মনোমালিন্য দূর হয়ে পুনরায় কথাবার্তা চলেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লোকব্যবহারের নজির তুলনাবিহীন। কারও মনে আঘাত না দিয়ে তৎকালীন প্রখ্যাত দুই ব্রাহ্ম নেতার মধ্যে পুনর্মিলন ঘটিয়ে দিলেন ব্যবহার-কুশলতার গুণে।

শ্রীশ্রীমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের শিক্ষা প্রসঙ্গে শ্রীমা সারদাদেবী গ্রন্থে আছে—"যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন—এই নীতিকে ভিত্তি করিয়া লোক ব্যবহার, পরিবারে প্রত্যেকের রুচি, স্বভাব ও প্রয়োজন অনুযায়ী তাহার সহিত আদান-প্রদান, নৌকায় বা গাড়িতে যাইবার সময় দ্রব্যাদি সম্বন্ধে সতর্কতা, এমন কি, প্রদীপের পলিতাটি কেমন করিয়া রাখিতে হয়, ইত্যাদি কিছুই সে অপূর্ব শিক্ষা হইতে বাদ পড়িল না।..."[৭]

শ্রীশ্রীঠাকুর যাঁর মুহুর্মুহুঃ সমাধি হত, তিনিও ব্যবহারিক জগতে ছিলেন অত্যন্ত ব্যবহার-কুশল। তাতেই বোঝা যায়, ব্যবহারিক জগতের সকলক্ষেত্রেই ব্যবহারকুশলতার কত প্রয়োজন।

৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—৫ম ভাগ, পৃঃ ২৫০—২৫১
৫ উদ্বোধন—চৈত্র, ১০৮১, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ইংরেজী ভাষা, পৃঃ ১১৪
৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—৫ম খণ্ড, পৃঃ ২১
৭ শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত, পৃঃ ৩৭ (৬ষ্ঠ সংস্করণ)
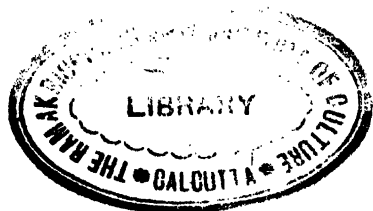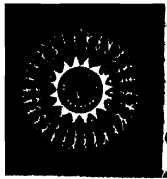
পুরাতনী

পরোপকারই ধর্ম

ব্যাসদেব বলেছেন—পরোপকারস্ত পুণ্যায়, পাপায় পরপীড়নম্।—অপরের উপকার করাই পুণ্য, অপরকে পীড়ন করাই পাপ। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যও বলেছেন—'বসন্তবৎ লোকহিতং চরন্তঃ'—বসন্তকাল যেমন অপরের কাছ থেকে কোন কিছুর প্রত্যাশা না করে চতুর্দিকে নৈসর্গিক শোভা বিস্তার করে, মহৎ ব্যক্তিরাও সেইরকম কিছু প্রত্যাশা না রেখে অপরের হিত সাধন করে যান। এই জগতে যাঁরা মহৎ, মানুষের বেশে যাঁরা দেবতার পরিচয় দিয়ে যান, তাঁদের সকলেরই জীবন-ব্রত—পরের হিত-সাধন।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে রন্তিদেব নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন রাজা ভরতের বংশধর। রাজা ভরতের নাম থেকেই আমাদের দেশের নাম হয়েছে ভারতবর্ষ।

প্রৌঢ়ত্বে রন্তিদেব ও তাঁর সতী সাধ্বী স্ত্রী বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন। যেদিন যা আহার্য জোটে তাই খেয়ে আর শ্রীহরির পাদপদ্ম চিন্তা করে আনন্দেই তাঁদের দিন কাটছিল।

এক সময় দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। রন্তিদেব ও তাঁর স্ত্রী একনাগাড়ে আটচল্লিশ দিন উপবাসে কাটালেন। উনপঞ্চাশতম দিনে এক ব্যক্তি রন্তিদেবকে দান করলেন—ভাত-ডাল-তরকারি-পায়েস ও এক কুঁজো ঠাণ্ডা জল। রন্তিদেব ও তাঁর স্ত্রী সেই খাবার শ্রীহরিকে নিবেদন করে খেতে উদ্যত হয়েছেন, এমন সময় সেখানে এক ব্রাহ্মণ অতিথি এসে হাজির হলেন। ব্রাহ্মণ বললেন, 'আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। সারাদিন কিছুই খেতে পাইনি। আমায় কিছু খেতে দিন।' রন্তিদেব যত্ন-সহকারে তাঁকে বসিয়ে সেই আহার্যের কিয়দংশ তাঁকে দিলেন। ব্রাহ্মণ খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে চলে গেলেন। তখন রন্তিদেব ও তাঁর স্ত্রী পুনরায় খাওয়ার উদ্যোগ করছিলেন। ঠিক সেই সময় এক ক্ষুধাতুর ব্যক্তি এসে তাঁদের কাছে কিছু অন্ন-ভিক্ষা চাইল। রন্তিদেব একেও সানন্দে খাইয়ে পরিতৃপ্ত করলেন। অতিথিদের দেওয়ার পর অবশিষ্ট খাদ্যভাগ তাঁরা খাওয়ার আয়োজন করছেন। এবারেও বাধা পড়ল। একজন শিকারী, তার কয়েকটি কুকুর নিয়ে রন্তিদেবের কাছে জানাল করুণ আর্তি—'অনাহারে আমি ও এই কুকুর-গুলো মরতে বসেছি। অনুগ্রহ করে কিছু খাবার দিয়ে আমাদের বাঁচান'। দয়ায় রন্তিদেবের হৃদয় হল বিগলিত। তিনি শেষ খাদ্যকণিকাটুকু পর্যন্ত শিকারী ও তার কুকুরগুলিকে দিয়ে দিলেন। রন্তিদেব ও তাঁর স্ত্রী ভাবলেন—এইবার শেষ সম্বল ঠাণ্ডা জলটুকু পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করা যাক্। কিন্তু হায়! এমন সময় সেখানে এসে দাঁড়াল এক চণ্ডাল। সে বলল—'আমি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত। চণ্ডাল—নীচু জাতি বলে আমাকে কেউ জল দিতে চায় না। দয়া করে জল দিয়ে আমাকে প্রাণে বাঁচান।' চণ্ডালের কথা শুনে রন্তিদেব মনে মনে ভগবানকে বললেন—'হে প্রভু, আমি মুক্তি বা অষ্টসিদ্ধি কিছুই চাই না। আমি চাই—যেন দীন-দুঃখী জনের আর্তি-ভার এতটুকুও লাঘব করতে পারি।' চণ্ডালকে রন্তিদেব বললেন,

'তোমার কোন ভয় নেই। পানের জন্ম শীতল জল আমি তোমাকে দেব।' চণ্ডালকে পরিতোষ-সহকারে সেই ঠাণ্ডা জল তিনি পান করালেন।

কিন্তু এ কী! সেই ব্রাহ্মণ, অতিথি, শিকারী ও চণ্ডাল, যাঁরা পর পর রন্তিদেবের কাছে এসে অন্ন-পানীয় ভিক্ষা করলেন, তাঁরা কোথায়? পরিবর্তে, রন্তিদেব দেখলেন, দেবতারা তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাহলে এতক্ষণ এঁরাই ছদ্মবেশে রন্তিদেবকে পরীক্ষা করছিলেন! রন্তিদেব দেবতাদের প্রণাম করলেন। দেবতারা বর দিতে চাইলেন। কিন্তু রন্তিদেব তা নিলেন না। শ্রীহরিকেই যিনি একমাত্র সারবস্তুরূপে জেনেছেন; তাঁর কাছে অন্য বরের কী প্রয়োজন!

পরোপকারের চেয়ে বড় ধর্ম আর কিছু নেই —উপরি-উক্ত গল্পে এইটিই শিক্ষণীয়।

[শ্রীমদ্ভাগবত, নবম স্কন্ধ অবলম্বনে]

পুস্তক সমালোচনা

Sadhana of Service—Eknath Ranade. Published by Vivekananda Kendra Prakashan. 3 Singarachari Street, Madras 600005, 1982. pp. viii+135. Rs. 15.

আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা একনাথ রাণাডে (১৯. ১১. ১৯১৪—২২. ৮. ১৯৮২) স্বনামধন্য দেশপ্রেমিক ও সমাজসেবী। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক-রূপে তিনি এক সময় দেশসেবার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁর অবদান আরও উল্লেখযোগ্য। কন্যাকুমারীতে সাগরবক্ষে শিলার উপর বিবেকানন্দের মূর্তি স্থাপনার উদ্যোগে তাঁর ছিল অগ্রণীর ভূমিকা। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ-স্মারক-শিলা একনাথজীর অক্ষয়কীর্তি। এর দুই বছর পরে তাঁর উৎসাহে 'বিবেকানন্দ কেন্দ্র' নামে যে-সমাজসেবী সংস্থা গঠিত হয় প্রথমে তিনি তার সম্পাদক ও পরে সভাপতি হয়েছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের সেবাব্রতী সদস্যদের তিনি ছিলেন অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস, তাঁর কাছ থেকেই এঁরা ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হন। এঁদের উদ্দেশে প্রদত্ত চল্লিশটি ভাষণের সংকলন এই 'সেবার সাধনা' নামের বহুমূল্য গ্রন্থ।

ভাষণগুলির মর্মবাণী 'সেবা'। শঙ্করাচার্য বলেছেন, 'যে অন্যদের মঙ্গলের জন্য নিজের আত্মাকে উৎসর্গ করে না সে যথার্থই জীবন্ত মৃতদেহ।' স্বামীজীর উক্তিতে এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়, 'যারা অন্যদের জন্য বাঁচে তারাই শুধু বেঁচে থাকে; বাকী সকলে জীবিত যতটা মৃত তার চেয়ে বেশী।' রাণাডে সেবার আদর্শ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, তিন ধরনের সেবা করা যায়। প্রথমত, যারা বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে পারছে না, অর্থাৎ অন্ন-বস্ত্রের ও আশ্রয়ের সংস্থান নেই, তাদের এই সব ব্যাপারে সাহায্য করা। দ্বিতীয়ত, এর চেয়ে উন্নততর সেবা, যাতে আমরা মানুষের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করি যার ফলে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, নিজের জীবিকা অর্জন করতে শেখে। কিন্তু তৃতীয় ধরনের সেবা আরও উন্নত মানের। যখন আমরা কারুকে এমন জ্ঞান দান করি যাতে তার আধ্যাত্মিক বিকাশ হয় ও অন্তর্দৃষ্টি উন্মীলিত হয় তখন সেটাই হয় সর্বোৎকৃষ্ট সেবা। আবার সেবার পিছনে নানা প্রকারের উদ্দেশ্য, এবং কখন কখন স্বার্থও থাকে। এই উদ্দেশ্য অনুসারেও সেবার উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার হয়।

সংগঠন-পরিচালনা কিভাবে সুষ্ঠুভাবে করা

যায় এই ভাবণগুলি থেকে তা স্পষ্ট। কর্মযোগের আদর্শে রাণাডে নিজে অনুপ্রাণিত এবং তাঁর ভাষণগুলিতে এই আদর্শই দৃপ্তস্বরে উচ্চারিত। সংসারকে সাধারণ লোক মনে করে ভোগভূমি, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সংসার কর্মভূমি। এই শিক্ষাতেই রাণাডে তাঁর স্বেচ্ছাসেবীদের শিক্ষিত করতে চেয়েছেন। যদি কোন মহদুদ্দেশ্য না থাকে তা হলে শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি বিবমিষার উদ্রেক করবে,' যযাতির ক্ষেত্রে যেরকম ঘটেছিল। যারা আদর্শহীন জীবন যাপন করে তাদের সম্বন্ধে তাই রাণাডে বলেছেন: 'These are vegetating people, plodding on in life because they have failed to find the meaning and charm of life···They are deprived of the real charm of life, which one finds only after the mission of life has been discovered.' (পৃঃ ৩৩-৩৪) পরোপকার করাই হচ্ছে এই 'mission' বা আদর্শ যেটা জীবনের উষর ভূমিতে মরূদ্যানের রস সঞ্চারিত করে। আপনাকে নিয়ে বিব্রত থাকার জন্য আমরা পৃথিবীতে আসিনি, অন্যদের ভার লাঘব করার জন্য এসেছি। আন্তর্জাতিক যুববর্ষে এই গ্রন্থ প্রতিটি যুবকের জন্য অবশ্যপাঠ্য গণ্য হওয়া উচিত।

পূর্ণের প্রাঙ্গণে—নচিকেতা ভরদ্বাজ। সাহিত্য ভারতী প্রকাশনী, ২৮এ রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট, কলিকাতা-৩। (১৯৮৩), পৃষ্ঠা ৮+১০৪। মূল্য: আট টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটিকে অনুবাদক 'ঈশ ও কঠোপনিষদের কাব্যে ভাষ্যানুবাদ' বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য সাধু ও প্রশংসনীয়, কিন্তু সেটা কতটা সফল হয়েছে? অনুবাদ, বিশেষত কাব্যের অনুবাদ যে খুব কঠিন কাজ সেটা তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। এই কঠিন কাজকে সহজ করার জন্য কিনা জানি না, শ্রীভরদ্বাজ উপনিষদের সোজাসুজি অনুবাদ না করে নিজের মতো ব্যাখ্যা করেছেন। সে ব্যাখ্যাকে 'ভাষ্যানুবাদ' বলা সমীচীন হবে কিনা সন্দেহ। গ্রন্থের ভূমিকা পড়লে ধারণা হয়, এর উদ্দেশ্য 'একালের কণ্ঠস্বরে একালের ভাষায় ভঙ্গিতে ও রূপরীতিতে' উপনিষদ্ একালের ছেলেমেয়েদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। গ্রন্থকার কিন্তু অনেক সময় যে সংস্কৃতবহুল আভিধানিক ভাষা ব্যবহার করেছেন তা বিদ্যাসাগরী বা বঙ্কিমী ভাষার কিছুটা হয়তো কাছাকাছি, কিন্তু সমকালীন কখনই নয়। প্রথম পাতা থেকেই এর দৃষ্টান্ত দেখা যেতে পারে: 'একক অদ্বয় নিরুপাধি, তবু পরিপূর্ণতার/শেষ নেই—শেষ নেই জীবনযাত্রীর ···সীমাহীন: নামরূপ হয়েও পরিজ্ঞাত/নির্বি-কল্প···।' এ ছাড়া প্রায় প্রতি পাতাতেই এই ধরনের শব্দ রয়েছে—'চৌতিশা' (পৃঃ ২), 'সন্নিধি', 'উৎসেক' (পৃঃ ৩), 'নৈষ্কর্ম্য', 'বিবিক্তি', 'কর্মিষ্ঠ' (পৃঃ ৪), 'আত্মহা' 'অন্ত্য' (পৃঃ ৫), 'প্রজ্ঞান', 'প্রতি-ভাস', 'উৎসার', 'বীতশোক' (পৃঃ ৮), 'বিবর্জিত', 'সাযুজ্য', 'ভোগৈশ্বর্য-প্রসক্ত' (পৃঃ ১১), 'সম্ভূতি', 'অসম্ভূতি' (পৃঃ ১৫), 'মাতরিশ্বা', 'সারথ্য', 'প্রাশন', 'নিয়ন্তা' (পৃঃ ২০)। কঠোপনিষদের প্রথম বল্লীর তৃতীয় স্তবকে আছে—'পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ'। শ্রীভরদ্বাজ এর 'অনুবাদ' করেছেন, 'পীতোদকা, জগ্ধতৃণা, দুগ্ধদোহা আর নিরিন্দ্রিয়া' (পৃঃ ২৬)। অর্থাৎ তিনি এখানে তর্জমা বা ভাষান্তরের কোন চেষ্টাই করেননি। এ-রকম উদাহরণ আরও পাওয়া যাবে।

ঈশোপনিষদের পঞ্চম শ্লোকের টীকায় অনুবাদক লিখেছেন, 'অজ্ঞানের অন্ধকারে—প্রত্যহের ক্লান্ত অভিমানে/আবৃত—জানি না

তাঁকে, দায়ভাগী তমসার তীরে/সে আলো আসে না কাছে চেতনার ঘরে।' ভাষা এখানে যথেষ্ট আধুনিক হলেও বক্তব্য একেবারেই স্পষ্ট নয়। 'দায়ভাগী' না হয় তমসাবৃতই থাক, কিন্তু 'ক্লান্ত অভিমানে'র অর্থ কি? 'অভিমান' কি সংস্কৃত 'অহংকার' অর্থে, না বাঙ্‌লার চলিত ভাবালু অর্থে? এ-সবের অর্থোদ্ধার করতে গিয়ে অনেক পাঠকেরই 'বিপন্ন বিস্ময়ে'র বোধ হবে।

বেশ কিছু মুদ্রণ প্রমাদ গ্রন্থের অঙ্গহানি ঘটিয়েছে। কিছু কিছু অশুদ্ধি কালি দিয়ে শুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় পাতাতেই 'মণীষা' ও 'নিরূপম' দৃষ্টিকটু। 'মৌনতা', 'মহদাচার্য' ইত্যাদি শব্দ সম্বন্ধেও লেখক আর একটু সতর্ক হতে পারতেন। 'নিদিধ্যাসনা'-প্রভৃতি শব্দ কি 'ভূমিকা'তে অপরিহার্য?

লেখক যথেষ্ট কবিত্বশক্তির অধিকারী এবং অনেক সময় তিনি অনেক সুন্দর পঙ্‌ক্তি আমাদের উপহার দিয়েছেন। এই গ্রন্থকে তিনি যদি 'ভাষ্যানুবাদ' না বলে 'উপনিষদ্‌ভিত্তিক কাব্য' বা এই ধরনের কোন আখ্যা দিতেন তা হলে ভাল হত। যে-রচনায় মূলের 'অনু'সরণ অপেক্ষা সেই সম্পর্কিত 'বাদ'বিস্তার বেশি, তাকে কি অনুবাদ বলা চলে? শ্রীভরদ্বাজের 'অনুবাদ' ভাল লেখা হয়েছে কিন্তু এখানে উপনিষদ্‌ 'অনুপস্থিত'।

—ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

অমৃতায়ন—গঙ্গাগনা দেবী। প্রকাশক: চন্দ্রাদিত্য দে. ১১ শরৎচন্দ্র আটা লেন, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া। পৃঃ ১২০+৯; মূল্য ১৪·০০ টাকা।

লেখিকা পূজনীয় স্বামী নির্বাণানন্দজীর (সূর্য মহারাজ) ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন প্রায় দশ বৎসর। তাঁর সহিত নানা কথাবার্তা, উপদেশ ও আলোচনা তারিখ সহ লেখিকা ডায়েরিতে লিখে রাখতেন; সেই ডায়েরি হতে সংকলন করে লেখা হয়েছে এই বইটি। প্রকাশ করার আগে পাণ্ডুলিপি সূর্য মহারাজের সেবক জ্ঞান মহারাজ (স্বামী নিত্যরূপানন্দ)-কে দেখিয়ে অনুমোদন লাভ করার পর বইটি প্রকাশ করা হয়েছে। সেই হিসাবে পুস্তকের মতামতগুলি সূর্য মহারাজের মতামত বলে ধরে নেওয়া যায়।

লেখিকা সংসারের নানা ঝামেলার মধ্যে থেকে ভগবানকে ডাকা সম্বন্ধে খুশিমত নানা প্রশ্ন করেছেন মহারাজজীকে, যে সব প্রশ্নের অনেকগুলিই অন্যান্যদেরও মনে জাগে। সেই জন্য পাঠকদের মধ্যে অনেকেই খুশি হবেন সেই সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে। অনেক সময় প্রশ্নগুলির বিষয়বস্তু সহজ ছিল না; যেমন 'শরণাগতি'র প্রকৃত অর্থ, মৃত্যুকে কি অর্থে স্বামী বিবেকানন্দ 'সুখ বনমালী' বলেছিলেন, প্রভৃতি। সূর্য মহারাজ অতি সহজভাবে ও সহজ ভাষায় এগুলির উত্তর দিয়েছেন। সূর্য মহারাজ দীর্ঘকাল রাজা মহারাজের সেবক থাকায় তাঁর মুখ হতে শোনা শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ এবং বাবুরাম মহারাজ সম্বন্ধে নানা তথ্য পরিবেশন করেছেন লেখিকার কাছে, যার অনেকগুলিই সাধারণ বইয়ে পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ সূর্য মহারাজ কালিঘাট যাবেন শুনে বাবুরাম মহারাজ তাঁকে আগে 'আসল জগদম্বা'কে প্রণাম করে যেতে বলছেন; পরিব্রাজক অবস্থায় টিহিরীর জঙ্গলে বাঘ আসতে দেখে ক্ষুধার্ত স্বামীজীর ভাবা 'আমি ক্ষুধার্ত, খাবার জন্য ছট্‌ফট্ করছি। বাঘটাও ক্ষুধার্ত হয়ে আমায় খেতে আসছে। আমাকে খেয়ে যদি ওর ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় ত ভালই' প্রভৃতি।

পুস্তকের কয়েক জায়গায় পাঠকের মনে খটকা লাগবে। রাজা মহারাজকে শ্রীরামকৃষ্ণ কি 'রাজা

বলতেন' (পৃঃ ৫১)? অবশ্য 'রাখাল একটা রাজত্ব চালাতে পারে' একথা বলেছিলেন। আঠাশ পৃষ্ঠায় আছে 'যোগ তিন রকমের। ভক্তি-যোগ, কর্মযোগ, মনোযোগ'—এখানে জ্ঞানযোগের কথা নেই। 'সাধুসঙ্গ তিন রকমের' বলে তার একটি 'সদাচার' বলা হয়েছে (পৃঃ ৪৪)। স্বামীজী শ্রীশ্রীমাকে 'জ্যান্ত দুর্গা' বলেছিলেন, কিন্তু তা স্বামী শিবানন্দকে লেখা চিঠিতে, বাবুরাম মহারাজকে লেখা চিঠিতে নয়। কথোপকথনের বিষয়বস্তু পুস্তকাকারে প্রকাশ করার আগে যথাযথ সত্যাখ্যান করা বাঞ্ছনীয়। তা ছাড়া কিছু কিছু বানান ভুলও আছে। আশা করা যায় যে পরবর্তী সংস্করণে লেখিকা এগুলির প্রতি মনোযোগ দেবেন।

মোট কথা সাধারণ কর্মব্যস্ত সংসারীর পক্ষে ধর্মের প্রকৃত অর্থ জানা এবং ভক্তিপথে থাকার পথ নির্দেশ সম্বন্ধে অনেক কিছু আছে ছোট্ট এই বইটিতে। সূর্য মহারাজকে বোঝবার পক্ষেও এটি একটি মূল্যবান গ্রন্থ।

—ডক্টর জলধিকুমার সরকার

প্রাপ্তি-স্বীকার

The Ten Sutras or Cardinal Principles of Hinduism : লেখক ও প্রকাশক : Swami Mukhyananda, Ramakrishna Math and Mission, H. Q. Belur Math (Calcutta) pp. 22, Price Rs. 5·00 (Rs. 2·00 for students).

উত্তরাখণ্ডের পথে প্রান্তরে (২য় সংস্করণ : জুন ১৯৮৫) : লেখক : শ্রীসুকুমার বর্ধন, প্রকাশক : কলিকাতা পুস্তকালয়, ৩ শ্যামা-চরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১০০০৭৩, মূল্য : ১৪ টাকা।

রঙ্গরসে সারদা-রামকৃষ্ণ : লেখক ও প্রকাশক : শ্রীহিরন্ময় ঘোষ, ১সি, রামনারায়ণ মতিলাল লেন, কলিকাতা-১৪, পৃঃ ৪৬, মূল্য : তিন টাকা।

সাহিত্য তীর্থ, অষ্টবিংশ বার্ষিকী ১৩৮৮ : সম্পাদক ও প্রকাশক : শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক, ৬১ পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

বিবেকানন্দ ইন্‌স্টিটিউশন পত্রিকা : বিদ্যালয়ের হীরক-জয়ন্তী সংখ্যা, চৈত্র ১৩৮৮ : সম্পাদক ও প্রকাশক : শ্রীব্রজমোহন মজুমদার, প্রধান শিক্ষক, হাওড়া বিবেকানন্দ ইন্‌স্টিটিউশন, ৭৫ ও ৭৭ স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওড়া-৪, পৃঃ ৭৮।

উপনিষদের সরল তত্ত্ব-কথা : লেখক : দাশরথি সোম, প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, পৃঃ ১০৩, মূল্য : ছয় টাকা।

কাব্যে-উপনিষদ্ (প্রথম খণ্ড) : লেখক : শ্রীসুধীরকুমার দত্ত, প্রকাশক : শ্রীমতী শান্তিসুধা দত্ত, "শ্রীপঞ্চমী", প্রসাদপুর, বারাসাত, পৃঃ ৯৪, মূল্য : ৮ টাকা।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠে উৎসব

গত ১২ মার্চ ১৯৮৬, বুধবার বেলুড় মঠে রের ১৫১তম জন্মোৎসব বিপুল সমারোহের সঙ্গে পালিত হয়। পূজা, হোম, ভজন-কীর্তনাদির মাধ্যমে মঠভূমি সারাদিনই আনন্দমুখর থাকে। সমাগত প্রায় ২০,০০০ ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে মঠ-প্রাঙ্গণে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ। পরবর্তী রবিবার, ১৬ মার্চ, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাধারণ উৎসবও পালিত হয়।

গত ২২ থেকে ২৬ মার্চ ১৯৮৬, শ্রীচৈতন্যদেবের ৫০০তম জন্মোৎসব উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান, বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ ও নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম-এর ব্যবস্থাপনায় নবদ্বীপে একটি চিকিৎসাকেন্দ্র (১,১১০ জন চিকিৎসিত হয়), একটি পুস্তক-বিপণী, শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-সম্পর্কিত একটি চিত্র-প্রদর্শনী ও সবাক্ চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়।

উৎসব

টাকি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২২ ও ২৩ মার্চ ১৯৮৬, দুইদিনব্যাপী প্রভাত ফেরী, পুরস্কার বিতরণ, ভজন-কীর্তন, প্রসাদ বিতরণ বক্তৃতা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের ১৫১তম আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

শ্রীলঙ্কা শরণার্থিত্রাণঃ মাদ্রাজ ত্যাগরাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম কর্তৃক মন্দাপম্ ও তিরুচি শিবিরে আগত শরণার্থীদের মধ্যে কলা, মুড়ি এবং মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। এছাড়া শিবির দুটিতে ৩৪, ২৯২ ও ২১, ৩০২ জনকে দুধ ও স্ন্যাকস্ দেওয়া হয়। কয়েকজন ডাক্তার নিয়মিতভাবে মন্দাপম্ ও কোটাপট্টু শিবিরস্থ শরণার্থিরোগীদের দেখাশুনা করেন।

সৌরাষ্ট্র অনাবৃষ্টিত্রাণ: রাজকোট জেলার লোধিকা তালুকে ক্ষীরসার, রাতাইয়া ও ডাউনগাউম গ্রামে ১৭৬টি দুর্গত পরিবারের মধ্যে ৩০০০ কেজি গম ও ১০৪ কেজি তালের গুড় বিতরণ করা হয়। রাজকোট শহরে অত্যন্ত জলাভাব হওয়ায় এই শহরের ১৯০০টি পরিবারের মধ্যে ৬০,০০০ লিটার জলও বিতরিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন: গত ১৮ মার্চ ১৯৮৬, নবনির্মিত সারদামণি ভবনের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানায় ১৯৮৩-র ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত ঠাকুরনগর বালিকা বিদ্যালয়-ভবনের পুনর্নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হয়।

পরিদর্শন

প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধী গত ৭ মার্চ ১৯৮৬, শ্রীমতী গান্ধী, অরুণাচল প্রদেশের লেফ্টেন্যান্ট গভর্নর ও মুখ্যমন্ত্রী সহ আলং রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

গত ৮ মার্চ প্রধান মন্ত্রী সদলবলে ইটানগরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতাল পরিদর্শন করেন এবং হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করেন। ২৫ ফেব্রুআরি তারিখে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল কুমার মোহান্ত উক্ত হাসপাতাল পরিদর্শন করেন।

আবির্ভাব-তিথি ও পূজাদির সূচী

বাংলা ১৩৯৩ সাল ইংরেজী ১৯৮৬-৮৭ খ্রীঃ

তিথি-কৃত্য

১	শ্রীরামচন্দ্র	রাম নবমী	৪ বৈশাখ	শুক্রবার	১৮ এপ্রিল ১৯৮৬
২	শ্রীশঙ্করাচার্য	বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী	৩০ বৈশাখ	বুধবার	১৪ মে „
৩	শ্রীবুদ্ধদেব	বৈশাখ পূর্ণিমা	৮ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	২৩ মে „
৪	স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী	১৮ শ্রাবণ	রবিবার	৩ অগস্ট „
৫	স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	২ ভাদ্র	মঙ্গলবার	১৯ অগস্ট „
৬		শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	১০ ভাদ্র	বুধবার	২৭ অগস্ট „
৭	স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী	১৭ ভাদ্র	বুধবার	৩ সেপ্টেম্বর „
৮	স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী	১০ আশ্বিন	শনিবার	২৭ সেপ্টেম্বর „
৯	স্বামী অখণ্ডানন্দ	ভাদ্র অমাবস্যা	১৬ আশ্বিন	শুক্রবার	৩ অক্টোবর „
১০	স্বামী সুবোধানন্দ	কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী	২৭ কার্তিক	বৃহস্পতিবার	১৩ নভেম্বর „
১১	স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী	২৯ কার্তিক	শনিবার	১৫ নভেম্বর „
১২	স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী	২৩ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	৯ ডিসেম্বর „
১৩	শ্রীশ্রীমা		৭ পৌষ	মঙ্গলবার	২৩ ডিসেম্বর „
১৪	শ্রীযীশুখৃষ্ট	—	৮ পৌষ	বুধবার	২৪ ডিসেম্বর „
১৫	স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী	১১ পৌষ	শনিবার	২৭ ডিসেম্বর „
১৬	স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী	২০ পৌষ	সোমবার	৫ জানুআরি ১৯৮৭
১৭	স্বামী তুরীয়ানন্দ	পৌষ শুক্লা চতুর্দশী	২৮ পৌষ	মঙ্গলবার	১৩ জানুআরি „
১৮		পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী	৮ মাঘ	বৃহস্পতিবার	২২ জানুআরি „
১৯	স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া	১৭ মাঘ	শনিবার	৩১ জানুআরি „
২০	স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লা চতুর্থী	১৯ মাঘ	সোমবার	২ ফেব্রুআরি „
২১।	স্বামী অদ্ভুতানন্দ	মাঘী পূর্ণিমা	৩০ মাঘ	শুক্রবার	১৩ ফেব্রুআরি „
২২।	শ্রীশ্রীঠাকুর	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	১৬ ফাল্গুন	রবিবার	১ মার্চ „
	(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব)		২৩ ফাল্গুন	রবিবার	৮ মার্চ „
২৩।	শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু	দোল পূর্ণিমা	৩০ ফাল্গুন	রবিবার	১৫ মার্চ „
২৪।	স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী	৪ চৈত্র	বৃহস্পতিবার	১৯ মার্চ „
২৫।	শ্রীরামচন্দ্র	রাম নবমী	২৩ চৈত্র	মঙ্গলবার	৭ এপ্রিল „

পূজা-কৃত্য

১।	শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা	বৈশাখ অমাবস্যা	২২ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	৬ জুন ১৯৮৬
২।	স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	৭ আষাঢ়	রবিবার	২২ জুন „
৩।	শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা	আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী	২৩ আশ্বিন	শুক্রবার	১০ অক্টোবর „
৪।	শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	১৫ কার্তিক	শনিবার	১ নভেম্বর „
৫।	শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা	মাঘ শুক্লা পঞ্চমী	১৯ মাঘ	সোমবার	২ ফেব্রুআরি ১৯৮৭
	শ্রীশ্রীশিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী	১৩ ফাল্গুন	বৃহস্পতিবার	২৬ ফেব্রুআরি „

দ্বারোদ্ঘাটন

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ গত ৩০ মার্চ নরোত্তমনগর রামকৃষ্ণ মিশনের নবনির্মিত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

ছাত্রকৃতিত্ব

মেঘালয় বোর্ডের অধীনে মাধ্যমিক পরীক্ষার সাধারণ তালিকায় চেরাপুঞ্জী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র প্রথম স্থান এবং উপজাতি-তালিকায় একজন ছাত্র পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে।

দেহত্যাগ

স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ (নৃপেন মহারাজ) গত ২৬ মার্চ ১৯৮৬ সন্ধ্যা ৬-১০ মিনিটে, ডায়াবেটিস ও রক্তচাপবৃদ্ধির জন্য হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় ৮০ বৎসর বয়সে বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরদিন সকালে তাঁর মরদেহ বেলুড়মঠে এনে সৎকার করা হয়।

স্বামী ধ্যানাত্মানন্দজী ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমে যোগদান করে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সেখানেই কাটান। সন্ন্যাসজীবনের প্রথম দিকে বেশ কয়েক বৎসর তিনি বিদ্যামন্দির মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। তিনি আরাকান (বর্মা) বন্যাত্রাণ (১৯৩৬), নারায়ণগঞ্জ দাঙ্গাত্রাণ(১৯৪২), বর্মা শরণার্থিত্রাণ ও মেদিনীপুর বন্যাত্রাণ কার্যেও (১৯৪৩) অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজে বিদ্যার্থী ভবনের একজন ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর সাধুজীবনের সুদীর্ঘকাল এই পুরানো ও ঐতিহ্যময় প্রতিষ্ঠানটির সেবায় অতিবাহিত করেন। যথেষ্ট যত্ন ও বোঝাপড়ার সঙ্গে তিনি 'বিদ্যার্থী' আশ্রমের ছাত্রদের দেখাশুনা করতেন। পূজা-পার্বণ সম্বন্ধে তাঁর অগাধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল। এ-ব্যাপারে অনেকেই তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ ও নির্দেশ গ্রহণ করতেন। তাঁর সহৃদয় ও মধুর ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের ভালবাসার ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁর দেহত্যাগে সঙ্ঘ একজন যথার্থ বিদ্বান, অধ্যাত্মপথের পথিক ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মীকে হারাল।

তাঁর দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে শান্তি লাভ করুক—এই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

গত ৮ মার্চ ১৯৮৬, শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে শিবরাত্রি অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৬ মার্চ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর স্বামী সত্যব্রতানন্দ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গত ২৯ মার্চ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর স্বামী বিকাশানন্দ তাঁর জীবনী আলোচনা করেন।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত; স্বামী বিকাশানন্দ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

আলং (অরুণাচল প্রদেশ) রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ১৯৮৫-৮৬-র কার্য বিবরণী।

১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জুলাই মাত্র ৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে এই বিদ্যালয়ের সূচনা।

ভারতের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনা করেন।

বর্তমানে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ৯৭৭। এদের মধ্যে হস্টেলের ২০০ জন উপজাতীয় ছেলেও আছে। ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস থেকে বিদ্যালয়টি, বিজ্ঞান ও কলা—এই দুই বিভাগে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত হয়।

১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সর্বভারতীয় বিদ্যালয় পরীক্ষায় ছাত্রদের পাঠানো হচ্ছে। পরীক্ষার ফল নিম্নরূপ :

(ক) ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের পাশের হার শতকরা ১০০।

(খ) রাজ্য উপজাতীয় ছাত্রদের সি. বি. এস. ই. মেরিট লিস্টে উপর্যুপরি ছয় বৎসর এবং রাজ্য সাধারণ ছাত্রদের সি. বি. এস. ই. মেরিট লিস্টে পাঁচ বৎসর প্রথম স্থান পেয়ে আসছে।

(গ) মার্চ ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছয় বৎসরে সি. বি. এস. ই-র দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় ১০৯ জন পরীক্ষা দেয়। তার মধ্যে ৮৯ জন প্রথম বিভাগে ও ২০ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। গড়ে ৮১'৬৫% প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়।

ছাত্রদের কৃতিত্ব

সর্বভারতীয় স্তরে :

(১) সর্বভারতীয় সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষায় চারজন উপজাতীয় বালক ৩য়, ৪র্থ ও সংযুক্ত ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

(২) সর্বভারতীয় বিদ্যালয়ের মেধা প্রতিযোগিতায় ২ জন ছাত্রী ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

(৩) বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর একটি ছাত্র উদয়পুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়-স্তরে শিশুদের বিজ্ঞান প্রদর্শনী, ১৯৮৫-তে অরুণাচল প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করে।

জাতীয় স্তরে :

(১) জাতীয় স্তর বিজ্ঞান সেমিনারে অষ্টম শ্রেণীর একজন ছাত্র দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

(২) জাতীয় স্তর যুব সেমিনারে ২ জন ছাত্র বক্তৃতা ও প্রবন্ধ-লেখায় প্রথম স্থান অধিকার করে।

জেলা স্তরে :

বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে ৫ জন ছাত্র ১ম ও ২ জন ছাত্র ২য় পুরস্কার পায়।

জাতীয় স্বীকৃতি

(১) বিদ্যালয়টি ১৯৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শিশু-কল্যাণ কার্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখানোর জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে জাতীয় পুরস্কার পায়।

(২) সি. বি. এস. ই., নিউ দিল্লী, বিদ্যালয়টিকে আদর্শ বিদ্যালয় বলে ঘোষণা করে।

(৩) একজন উপজাতীয় শিক্ষক ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হন।

সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও টাইপ রাইটিং, দর্জির কাজ, মুরগী-পালন, গো-পালন, রন্ধন, বাগান-করা, ছাপাখানার কাজ, কাঠের কাজ, মৌমাছি পালন, ভারতীয় সঙ্গীত, নৃত্য, সেলাই-এর কাজ, গাড়ি মেরামত ইত্যাদি শেখানো হয়। সম্প্রতি একাদশ শ্রেণীতে স্টেনোগ্রাফি শেখানো শুরু হয়েছে।

বিবিধ সংবাদ

পুতুলের জাদুঘর

কার্টুনিস্ট কে. শঙ্কর পিল্লাই নয়াদিল্লীর বাহাদুর শাহ জাফর মার্গে এক কাচ-ঘরে পুতুলের একটি জাদুঘর করেছেন। ৩১ বছর আগে, হাঙ্গেরির এক কূটনীতিক শঙ্কর পিল্লাইকে একটি পুতুল উপহার দেন। তার থেকেই এই জাদুঘরের সূচনা। শ্রীপিল্লাই এখানে ৮৮টি বিভিন্ন রাষ্ট্রের পুতুল সংগ্রহ করেছেন। পুতুল তৈরির একটি বিভাগও এখানে আছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৫০০টি পুতুল এখানে পাওয়া যাবে। এছাড়াও বিভিন্ন নৃত্যভঙ্গিমায় ১৭৫টি পুতুল সাজানো রয়েছে। দেশ-বিদেশের অনেক কাহিনী এদের কাছে শোনা যাবে।

উৎসব

আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনে (কলিকাতা) আনন্দবাজার কর্মী-ইউনিয়নের উদ্যোগে গত ১৩ জানুআরি ১৯৮৬, স্বামী বিবেকানন্দের ১২৪তম জন্মোৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এখানে সমবেত হন। প্রদীপ-জ্বালানো ও শঙ্খ-ধ্বনির মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির শুভ সূচনা করা হয়। সঙ্গীত, বক্তৃতা, প্রবন্ধপাঠ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়। স্বামী গহনানন্দ বলেন: স্বামী বিবেকানন্দ তরুণ সমাজকে জাগাতে চেয়েছিলেন। স্বামীজী ছিলেন নারী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আজ আমাদের স্বামীজীর আদর্শ ও ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে। স্বামী সত্যরূপানন্দ হিন্দীতে ভাষণ দেন।

স্কটিশচার্চ কলেজে (কলিকাতা) পত্তত্রি সাহিত্য সংস্থার উদ্যোগে গত ৬ ফেব্রুআরি ১৯৮৬ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে 'স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায় গণজাগরণ ও মূল্যবোধের বিকাশ' বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা হয়। সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

মন্দির প্রতিষ্ঠা

বিক্রমপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘের (আসাম) উদ্যোগে গত ১২ থেকে ১৫ মার্চ, ১৯৮৬ পর্যন্ত বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পরমহংসদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। কাছাড় জেলার গ্রামাঞ্চলে এটাই সর্বপ্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির।

মোককচাং শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি (নাগাল্যাণ্ড) গত ১৬ মার্চ ১৯৮৬, হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল-মিষ্টান্নাদি বিতরণ, পূজা, হোম, সমাগত ভক্ত নরনারীদের প্রসাদ বিতরণ, বক্তৃতাদির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব পালন করে।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **কনকপ্রভা দাশগুপ্ত**, গত ২৯ মার্চ ১৯৮৬, ৭৭ বছর বয়সে তাঁর কলকাতার বাসভবনে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির দিন তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর কৃপা লাভ করেন। তাঁর স্বামী ৺বিমলেন্দু দাশগুপ্তও পূজনীয় শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

তাঁর দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে শান্তি লাভ করুক—এই-ই প্রার্থনা।

উদ্বোধন : আষাঢ় ১৩৯৩

সূচীপত্র

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

[উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন]

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

কর্মযোগ	৫·৭
ভক্তিযোগ	৪·৫
ভক্তি-রহস্য	৫·০
জ্ঞানযোগ	১৭·০
জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে	১০·০
	১০·০
সরল রাজযোগ	১·৮
সন্ন্যাসীর গীতি	০·৮০
ঈশদূত যীশুখৃষ্ট	১·০০
পত্রাবলী। (সমগ্র পত্র একত্রে, নির্দেশিকাদি সহ) রেক্সিন বাঁধাই	৩০·০০
পওহারী বাবা	১·২৫
স্বামীজীর আহ্বান	১·২৫
বাণী-সঞ্চয়ন	১২·০০
জাগো, যুবশক্তি	৫·০০
ধর্ম-সমীক্ষা	৫·০০
ধর্মবিজ্ঞান	৫·৫০
বেদান্তের আলোকে	৪·৫০
কথোপকথন	৫·০০
ভারতে বিবেকানন্দ	২০·০০
দেববাণী	৮·০০
মদীয় আচার্যদেব	২·৫০
চিকাগো বক্তৃতা	২·২১
মহাপুরুষপ্রসঙ্গ	১২·০০
ভারতীয় নারী	৫·০০
ভারতের পুনর্গঠন	২·৫০
শিক্ষা (অনূদিত)	৪·২০
শিক্ষাপ্রসঙ্গ	৮·০০
এসো মানুষ হও	৬·০০

স্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচনা

পরিব্রাজক	৪·২৫
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য	৫·০০
ভাববার কথা	২·৩০
বর্তমান ভারত	২·৫০

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণ। প্রতি খণ্ড—২৫৲ টাকা। সম্পূর্ণ সেট ২৫০৲ টাকা

সাধারণ বাঁধাই সুলভ সংস্করণ। প্রতি খণ্ড—১৭·৫০ টাকা। সম্পূর্ণ সেট ১৭৫৲ টাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

স্বামী সারদানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (দুই ভাগে)

রেক্সিন-বাঁধাই। ১ম ভাগ ৩৫·০০, ২য় ভাগ ৩০·০০

সাধারণ (পাঁচ খণ্ডে)

১ম খণ্ড ৬·০০, ২য় খণ্ড ১৩·৫০, ৩য় খণ্ড ৯·৫০,

৪র্থ খণ্ড ৯·৫০, ৫ম খণ্ড ১৪·৫০

অক্ষয়কুমার সেন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি	৪৫·০০
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা	৫·৫০

স্বামী প্রেমঘনানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প	৪·০০

শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ	১·৫০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)	৫·৫০

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বাণী	·৭৫

স্বামী তেজসানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী	৯·০০

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংকলিত
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ ৩'৫০

স্বামী ভূতেশানন্দ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ (তিন ভাগে)
১ম ভাগ ১০'০০, ২য় ভাগ ১২'৫০, ৩য় ভাগ ১০'০০

স্বামী নির্বেদানন্দ
(অনুবাদ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)
শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ ১২'৫০

স্বামী প্রভানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা ১৫'০০

-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা (দুই ভাগে)
১ম ভাগ ১৫'০০, ২য় ভাগ ১৫'০০

স্বামী গম্ভীরানন্দ
শ্রীমা সারদাদেবী ২৭'০০

স্বামী সারদেশানন্দ
শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা ১০'০০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
শিশুদের মা সারদাদেবী (সচিত্র) ৭'০০

স্বামী বুধানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ বিভাসিতা মা সারদা ৭'০০

স্বামী ঈশানানন্দ
মাতৃসান্নিধ্যে ৯'৫০

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

স্বামী গম্ভীরানন্দ
যুগনায়ক বিবেকানন্দ (তিন খণ্ডে)
১ম খণ্ড ৩০'০০, ২য় খণ্ড ৩০'০০
৩য় খণ্ড ৩০'০০

ভগিনী নিবেদিতা (অনুবাদ : স্বামী মাধবানন্দ)
স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি ১৬'০০

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ১০'০০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
স্বামী বিবেকানন্দ ৭'০০
শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র) ৫'৫০

স্বামী নিরাময়ানন্দ
ছোটদের বিবেকানন্দ ২'৫০

শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য
স্বামী বিবেকানন্দ ২'৪০

স্বামী বুধানন্দ
ওঠ, জাগো, এগিয়ে চল ৪'২৫
ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর ১'৫০
স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা ৩'৫০

ভগিনী নিবেদিতা
স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ৫'০০

প্রমথনাথ বসু
স্বামী বিবেকানন্দ
১ম খণ্ড ২০'০০, ২য় খণ্ড ২০'০০

বিবিধ

মহাপুরুষজীর পত্রাবলী ৭'৫০
স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র ৭'৮০
স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী ৪'৫০
আরতি-স্তব ও রামনাম ১'৫০
ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ৬'০০

স্বামী গম্ভীরানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা (দুই ভাগে)
১ম ভাগ ২৫'০০, ২য় ভাগ ২৫'০০

স্বামী সারদানন্দ
ভারতে শক্তিপূজা ৪'০০

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ
শ্রীরামানুজ চরিত ১৭'৫০

স্বামী প্রেমেশানন্দ
রামানুজ চরিত ৩'৫০

ভগিনী নিবেদিতা
শিব ও বুদ্ধ ৩'৭৫

স্বামী অপূর্বানন্দ
আচার্য শঙ্কর ৮'০০
শিবানন্দ-বাণী (সংকলিত)
১ম ভাগ ৯'০০, ২য় ভাগ ৫'০

স্বামী সুন্দরানন্দ
যোগ চতুষ্টয় ৭'৫০

গোপালের মা ২'২৫
গীতাতত্ত্ব ৭'০০
পত্রমালা ৪'০০
বিবিধ-প্রসঙ্গ ৩'৫০

স্বামী অখণ্ডানন্দ
তিব্বতের পথে হিমালয়ে ৬'৫০
স্মৃতি-কথা ১০'০০

শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়
লাটুমহারাজের স্মৃতিকথা ২০'০০

স্বামী সিদ্ধানন্দ সংগৃহীত
সৎকথা ১০'০০
অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ ৭'৫০

স্বামী বিরজানন্দ
পরমার্থ-প্রসঙ্গ ৪'৫০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
মহাভারতের গল্প ৪'৫০

স্বামী দেবানন্দ
ব্রহ্মানন্দ স্মৃতিকণা ১'৭৫

স্বামী বামদেবানন্দ
সাধক রামপ্রসাদ ৬'০০

স্বামী পরমানন্দ
প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা ২৪'০০

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
সাধু নাগমহাশয় ৬'০০

স্বামী নিরাময়ানন্দ-সম্পাদিত
স্বামী শুদ্ধানন্দ : জীবনী ও রচনা ১৫'০০

শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য
শঙ্কর-চরিত ৩'০০
দশাবতার চরিত ৫'০০

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ
দিব্যপ্রসঙ্গে [illegible]

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ
পুণ্যস্মৃতি ৩'০০

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ
অতীতের স্মৃতি ২০'০০
বন্দি তোমায় ১০'০০

স্বামী নরোত্তমানন্দ
রাজা মহারাজ ৭'০০

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
ভগবানলাভের পথ ২'০০
মাতৃভূমির প্রতি আমাদের কর্তব্য ৩'০০

স্বামী প্রভানন্দ
ব্রহ্মানন্দচরিত ৩০'০০

স্বামী অন্নদানন্দ
স্বামী অখণ্ডানন্দ ১৬'০০

স্বামী নিরাময়ানন্দ
স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয় ৩'৩০

স্বামী ধ্যানানন্দ
ধ্যান ৩'৫০

স্বামী তেজসানন্দ
ভগিনী নিবেদিতা ৪'৪০

স্বামী অপূর্বানন্দ
মহাপুরুষ শিবানন্দ ১৫'০০

সংস্কৃত

শ্রীরামকৃষ্ণপূজাপদ্ধতি ৫'০০

স্বামী গম্ভীরানন্দ-অনূদিত ও সম্পাদিত
উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (তিন ভাগে)
১ম ভাগ ১৮'০০, ২য় ভাগ ১৮'০০,
৩য় ভাগ ১৮'০০
স্তবকুসুমাঞ্জলি ১৫'০০

স্বামী রঘুবরানন্দ-অনূদিত ও সম্পাদিত
গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা ৩'০০

স্বামী ধীরেশানন্দ-অনূদিত ও সম্পাদিত
যোগবাসিষ্ঠসারঃ ১২'৫০
বৈরাগ্যশতকম্ ১১'০০
বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা ৯'৫০

স্বামী জগদানন্দ অনূদিত
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ ১৭'৫০

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত ও সম্পাদিত
শ্রীশ্রীচণ্ডী ১৪'০০
গীতা ১৫'৫০

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত
বেদান্তদর্শন
১ম অধ্যায়ের ১ম খণ্ড ১৪'০০; ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ খণ্ড ৩'০০; ৩য় অধ্যায় ১৩'০০; ৪র্থ অধ্যায় ৯'০০

স্বামী প্রভবানন্দ
নারদীয় ভক্তিসূত্র ১১'০০

৮৮তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা আষাঢ়, ১৩৯৩

দিব্য বাণী

প্রভুকে যে চায় সেই পায়। তবে ঠিক ঠিক চাওয়া চাই। ডাকার মত ডাকতে হবে, তবেই তিনি দর্শন দিবেন। ঠাকুর বলতেন, 'ভগবান যেন চাঁদামামা, সকলেরই মামা। যে চায় সেই পায়।' প্রভুর বিরহে তাঁকে না পাবার দরুন কাঁদতে কেউ কাউকে শেখাতে পারে না; সময়ে উহা আপনা আপনিই আসে।··· তাঁর জন্য প্রাণে যখন ঠিক ঠিক অভাব অনুভব হবে, ভগবানলাভ হচ্ছে না বলে যখন প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করবে, তাঁর বিরহে যখন জগৎ শূন্য দেখবে, তখনই বুক ফেটে কান্না আসবে। সে সৌভাগ্য কখন আসবে তা কেউ জানে না। তাঁর কৃপা হলেই সে অবস্থা হবে এবং তুমি হৃদয়েই তা অনুভব করবে। খুব ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাক, খুব প্রার্থনা কর—প্রভু, কৃপা কর, কৃপা কর বলে। তিনি তোমার প্রার্থনা শুনবেন—আমি বলছি।

—স্বামী শিবানন্দ

[শিবানন্দ-বাণী, দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৭২—৭৩]

কথাপ্রসঙ্গে

ঈশ্বর-দর্শনের উপায়—ব্যাকুলতা

ভগবান লাভের জন্য ব্যাকুলতার বিশেষ প্রয়োজন। "শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমন করে ভগবানকে পাবো। গুরু বললেন, আমার সঙ্গে এসো,—এই বলে একটা পুকুরে লয়ে গিয়ে তাকে চুবিয়ে ধরলেন। খানিক পরে জল থেকে উঠিয়ে আনলেন ও বললেন, তোমার জলের ভিতর কি রকম হয়েছিল? শিষ্য বললে, প্রাণ আটুবাটু করছিল—যেন প্রাণ যায়। গুরু বললেন দেখ, এইরূপ ভগবানের জন্য যদি তোমার প্রাণ আটুবাটু করে তবেই তাঁকে লাভ করবে।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।১১।৩) শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত উপরি-উক্ত গল্পটি হইতে বোঝা যায় ভগবান লাভের জন্য ব্যাকুলতার উপর তিনি কত জোর দিতেন। তাঁহার নিজের জীবনে আমরা দেখি, জগন্মাতার দর্শনের জন্য তাঁহার প্রাণ কিভাবে আটুবাটু করিত। তিনি বলিতেছেন—"মা-র দেখা পাইলাম না বলিয়া তখন হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা, জলশূন্য করিবার জন্য লোক যেমন সজোরে গামছা নিঙ্ড়াইয়া থাকে, মনে হইল হৃদয়কে ধরিয়া কে যেন তদ্রূপ করিতেছে। মার দেখা বোধ হয় কোন কালেই পাইব না ভাবিয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম। অস্থির হইয়া ভাবিলাম, তবে আর এ জীবনে আবশ্যক নাই। মার ঘরে যে অসি ছিল দৃষ্টি সহসা তাহার উপর পড়িল। এই দণ্ডেই জীবন অবসান করিব ভাবিয়া উন্মত্তপ্রায় ছুটিয়া উহা ধরিতেছি, এমন সময় সহসা মা-র অদ্ভুত দর্শন পাই· ...ম ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১।৬।১১৩—৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের এক জায়গায় (১।১।১৫) আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন: "খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়।...ডাকার মত ডাকতে হয়।...ব্যাকুলতা হলেই অরুণ উদয় হল। তারপর সূর্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর দর্শন।"

কয়টিই বা কথা। কথাগুলি আপাতদৃষ্টিতে অতি সহজ, সরল ও সর্বজনবোধগম্য। মনে হয়, ঈশ্বর-দর্শন—সে তো অতি সহজ ব্যাপার। কিন্তু আপাতপ্রতীয়মান সহজ সরল এই কথাগুলি লইয়া যত চিন্তা করা যায়, ততই বোঝা যায় কথাগুলির অর্থ কত গভীর, জীবনে প্রতিফলিত করা কত কঠিন।

বেদান্তসার গ্রন্থে (১২) আছে: যে-ব্যক্তির মাথায় আগুন লাগে, অগ্নি-নির্বাপণের জন্য সে যেমন কেবলমাত্র জলের দিকে বেগে ধাবিত হয়, সেইরূপ সংসারানলে সন্দগ্ধ মানুষও সংসারাগ্নি-নির্বাপণের জন্য সদ্‌গুরু-সমীপে উপনীত হয়। মাথায় আগুন-লাগা ব্যক্তির ব্যাকুলতা তাহার মাথার অগ্নি-নির্বাপণের জন্য, আর সংসারানলে দগ্ধ-ব্যক্তির ব্যাকুলতা তাহার সংসারাগ্নি-নির্বাপণের জন্য, তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য। জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি ও সাধনার ফলে যদি কোন ব্যক্তির হৃদয়ে ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতার উদয় হয়, তাহা হইলে তিনি যে সার্থক-জন্মা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

'খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়'। বিষয়-ভোগের প্রতি তীব্র বিরাগ না আসা পর্যন্ত ঈশ্বরলাভের জন্য কেহ ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে

পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন: "লোকে ছেলের জন্য, স্ত্রীর জন্য, টাকার জন্য, এক ঘটি কাঁদে। কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে? যতক্ষণ ছেলে চুষি নিয়ে ভুলে থাকে, মা রান্নাবান্না বাড়ীর সব কাজ করে। ছেলের যখন চুষি আর ভাল লাগে না—চুষি ফেলে চিৎকার করে কাঁদে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে দুড়দুড় করে এসে ছেলেকে কোলে লয়।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ১।৩।৫) আসলে যাহা পাইবার জন্য মানুষ কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করে পরিণামে সে তাহাই পায়। সংসারের বেশির ভাগ মানুষই ভোগ-বিলাসরূপ চুষিই কামনা করে, এবং তাহা লাভ করিবার জন্য সর্বদা তাহারই পশ্চাতে ধাবিত হয়। আর যতক্ষণ সে ভোগ-বিলাসরূপ চুষি নিয়া মত্ত থাকে, ততক্ষণ ঈশ্বরের কথা তাহার মনেও আসে না, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হওয়া তো দূরের কথা। নিরন্তর সদসৎ বিচার ও ঈশ্বরের কৃপায় ভোগ-বাসনায় যদি কাহারও বিতৃষ্ণা আসে, এবং 'মা যাব' বলিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে, মায়ের কোলে উঠিতে তাহার আর বিলম্ব নাই বুঝিতে হইবে। ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া শান্ত করা ছাড়া মায়ের আর গত্যন্তর থাকিবে না। বিষয়ে বিরাগ এবং ঈশ্বরে অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য সাধককে কঠোর সংগ্রাম করিতে হয়। তবেই তাঁহাকে পাওয়ার জন্য মন ব্যাকুল হয়।

'ডাকার মত ডাকিতে হয়'। যাহারা ব্যাকুল হইয়া শুধু ঈশ্বরকেই ডাকে, তাঁহার দর্শন-লাভের জন্য কাতরভাবে সতত প্রার্থনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই তাঁহাকে লাভ করে। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনকালে দেখা যায়, জগন্মাতার দর্শন পাইতেছেন না বলিয়া হৃদয়ে কী যন্ত্রণা, প্রাণে কী ব্যাকুলতা! তাঁহার ঐ সময়কার মনের অবস্থার কথা বর্ণনা করিতে গিয়া পরবর্তিকালে তিনি বলিতেন 'মা'-কে ডাকিতে ডাকিতে "কখন সূর্য উদিত হইল, কখন বা অস্ত গেল, তাহা জানিতে পারিতাম না।" স্বামীজী তাঁহার 'মদীয় আচার্যদেব' সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় (বাণী ও রচনা, ৮।৩৯০—৯১) বলিয়াছেন: "মনুষ্যহৃদয়ে ঐরূপ তীব্র ব্যাকুলতা আসিয়া থাকে। শেষ অবস্থায় তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) আমাকে বলিয়াছিলেন 'বৎস, মনে কর একটা ঘরে এক থলি মোহর রহিয়াছে, আর তার পাশের ঘরে একটি চোর রহিয়াছে, তুমি কি মনে কর সেই চোরের নিদ্রা হইবে? সে নিদ্রা যাইতে পারে না। তাহার মনে ক্রমাগত এই চিন্তার উদয় হইবে যে, কি করিয়া সে ঐ ঘরে ঢুকিয়া মোহরের থলিটি লইবে। তাই যদি হয়, তবে তুমি কি মনে কর, যাহার এই ধারণা হইয়াছে যে, এই সকল আপাতপ্রতীয়মান বস্তুর পশ্চাতে সত্য রহিয়াছে, ঈশ্বর বলিয়া একজন আছেন, একজন অবিনশ্বর অনন্ত আনন্দস্বরূপ আছেন, যে আনন্দের সহিত তুলনা করিলে ইন্দ্রিয়-সুখ ছেলেখেলা বলিয়া বোধ হয়, সে কি তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা না করিয়া স্থির থাকিতে পারে? এক মুহূর্তের জন্যও কি সে এই চেষ্টা পরিত্যাগ করিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। সে উহা লাভের জন্য উন্মত্ত হইবে।'" জগন্মাতার দর্শনের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা শ্রীরামকৃষ্ণকে এক সময় উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে 'মা'-কে বলিতেছেন: "মা, এত যে ডাকছি তার কিছুই তুই কি শুনিস্ না? রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস্, আমাকে দেখা দিবি না?" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২।৬।১১০) তাঁহার এই 'ডাকার মত' ডাকে সাড়া না দিয়া জগন্মাতা থাকিতে পারেন নাই, তাঁহাকে দর্শন দিতে হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী পাঠকদের নিকট ইহা সুবিদিত।

একবার ঈশ্বর-দর্শন হইয়া থাকিলেও তাঁহার অবিরাম দর্শনের জন্য সাধকের মনে সর্বদা একটা আকুতি থাকে। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাষ্টকে (শ্লোক ৭) আছে তিনি বলিতেছেন: যুগায়িতং নিমেষেন চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং। শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেন মে।—গোবিন্দের বিরহ আমার সকাশে নিমেষ যুগান্তরের ন্যায় মনে হয়, নয়নে বর্ষাধারার ন্যায় অশ্রুর সমাগম হয়, এবং নিখিল-বিশ্ব শূন্যে মিলাইয়া যায়। নারদীয়ভক্তিসূত্রেও (সূত্র ১৯) আছে: তদ্‌বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি। ক্ষণিকের জন্যও ইষ্টবিস্মরণ ঘটিলে সাধক ইষ্ট-দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। ভক্ত সকল কার্যের মধ্যে নিত্য তাঁহাকে স্মরণ করিবেন, তাঁহাকে দর্শন করিবেন। ক্ষণিকের জন্যও তাঁহার অদর্শন হইলে অন্তরে তীব্র যাতনা অনুভব করিবেন। এই যাতনা, এই ব্যাকুলতাই পরিণামে সাধকের নিকট তাঁহার ইষ্টের অবিরাম দর্শনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে দেখা যায়, জগন্মাতার প্রথম দর্শনের পর হইতে তাঁহার চিন্ময়ী মূর্তির অবিরাম দর্শনলাভের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণে এক অবিশ্রান্ত ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল। এই ভাব কখন কখন এত প্রবল হইত যে, "আর চাপিতে না পারিয়া ভূমিতে লুটাইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে 'মা, আমায় কৃপা কর, দেখা দে'—বলিয়া এমন ক্রন্দন করিতেন যে, চারিপার্শ্বে লোক দাঁড়াইয়া যাইত।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১।৬।১১৫)

বিরহ-যাতনা ব্যাকুলতারই আর এক রূপ। বিরহ শুধু যাতনাই নয়, তাহার সঙ্গে মিশ্রিত থাকে ভগবদ্-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষারূপ এক প্রকার আনন্দ। অত্যন্ত ক্ষুধাতুর ব্যক্তিকে অন্ন দিলে সে যেমন পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করে, এমন সে আর কখনও করে না। অমারাত্রির অবসানে প্রভাতের আলো আমাদের যত আনন্দ দান করে, এমন আর কিছুতে করে না। সেইরূপ বিরহের পরে মিলনের যে আনন্দ, সেই আনন্দের সঙ্গে অন্য কোন আনন্দের তুলনা হয় না। আর মিলনের যথার্থ তাৎপর্য ও মহিমা আমরা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিব না, যদি না আমরা বিরহের যাতনা ভোগ করি। ভগবদ্-ভক্তির ব্যাপারেও একই কথা। বিরহের তথা ব্যাকুলতার আগুনে পুড়িয়া আমাদের মন যখন শুদ্ধ, পবিত্র ও অহংশূন্য হইবে, তখনই আমরা ভগবানের সহিত মিলনের আনন্দ অনুভব করিতে পারিব।

ভক্তির প্রকাশভেদ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া স্বামীজী (বাণী ও রচনা, ৪।৬৩-৬৪) বলিয়াছেন: "মধুরতম যন্ত্রণা 'বিরহ'—প্রেমাস্পদের অভাব-জনিত মহাদুঃখ। এই দুঃখ জগতে সকল দুঃখের মধ্যে মধুর—অতি মধুর। 'ভগবানকে লাভ করিতে পারিলাম না, জীবনে একমাত্র প্রাপ্যবস্তু পাইলাম না' বলিয়া মানুষ যখন অতিশয় ব্যাকুল হয় এবং সেজন্য যন্ত্রণায় অস্থির ও উন্মত্ত হইয়া উঠে, তখনই বুঝিতে হইবে ভক্তের বিরহ অবস্থা। মনের এই অবস্থা হইলে প্রেমাস্পদ ব্যতীত আর কিছু ভাল লাগে না (ইতর-বিচিকিৎসা)।... তখন ভগবান ব্যতীত অন্য বিষয়ে কথা বলাও ভক্তের পক্ষে বিরক্তিকর হইয়া পড়ে। 'তাঁহার বিষয়ে, কেবল তাঁহার বিষয়ে চিন্তা কর, অন্য সকল কথা ত্যাগ কর।' যাঁহারা শুধু ঈশ্বর সম্বন্ধে কথা বলেন, ভক্ত তাঁহাদিগকেই বন্ধু বলিয়া মনে করেন; কিন্তু যাঁহারা অন্য বিষয়ে কথা বলেন, তাঁহাদিগকে শত্রু বলিয়া মনে হয়।"

আগেই বলা হইয়াছে, বিরহ মিলনেরই পূর্বাভাস। পূর্বদিগন্ত রাঙা হইয়া উঠিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, অরুণোদয়ের আর দেরী নাই। সেইরূপ কাহারও হৃদয়ে ঈশ্বরের অদর্শনজনিত বিরহ-যাতনা উপস্থিত হইলে বুঝিতে

হইবে যে, ঈশ্বরের সহিত তাঁহারও মিলনের আর দেরী নাই। বিরহের মধ্যে আছে এক ধরনের আনন্দ যাহার পরিসমাপ্তি হয় মিলনে। রাসলীলা চলাকালীন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ অন্তর্হিত হইলেন। তাহাতে গোপীদের মনে বিরহাগ্নি জলিয়া উঠিল। তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল গোপিগণ বৃক্ষলতা—যাহা কিছু তাহাদের সম্মুখে পাইল তাহাদিগকেই ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল শ্রীকৃষ্ণকে তাহারা কোথাও দেখিয়াছে কি না। শ্রীকৃষ্ণের বিরহকালীন গোপীদের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে তাহা অতি মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। বিরহের পর মিলন অবশ্যম্ভাবী। তাই এই বিরহের পর 'যত গোপী তত কৃষ্ণ'। সুতরাং এই রাসোৎসব শুধু ভগবান ও ভক্তের মিলনোৎসবই নয়, ভগবান ও ভক্তের বিরহানন্দেরও প্রতীক।

উপরের আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, ঈশ্বর-দর্শনের জন্য ব্যাকুলতার একান্ত প্রয়োজন। সাধকহৃদয়ে এই ব্যাকুলতা তখনই আসা সম্ভব যখন বিষয়-ভোগের প্রতি তাঁহার তীব্র বিরাগ আসিবে। নিরন্তর সদসৎ বিচারের ফলে সাধকের মনে বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে এবং ভগবান লাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতার উদয় হয়। ফলে তিনি তাঁহাকে লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হন।

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[জনৈকা ভক্ত মহিলাকে লিখিত]

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

The Ramakrishna Math
Belur P.O.—Howrah
10/1/29

তোমার একখানি পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। তোমার মাতাঠাকুরাণীর পত্রও পাইয়াছিলাম। তার উত্তর দিয়াছি। মহারাজের দেহত্যাগে মনটা অতিশয় দুঃখিত হইয়া রহিয়াছে। যদিও জানি তিনি দিব্যধামে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে দিব্য শরীরে বিরাজ করিতেছেন, তথাপি আমরা স্থূলদেহধারী মানব তাঁর স্থূল দেহ না দেখিতে পাইয়া অনেক সময় মন অতিশয় দুঃখিত হয়। অবশ্য সবই প্রভুর ইচ্ছা—তার আর সন্দেহ নাই।

তুমি তাঁর নাম তাঁর স্মরণ মনন সদা সর্ব্বদা করিতে চেষ্টা করিবে এবং সংসারে কায সকল যথাসাধ্য করিয়া তোমার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণীর সাহায্য করিবে। তিনি খুব উন্নতমনা। তাঁর পবিত্রগর্ভে জন্ম লইয়া তোমার ধর্ম্মবুদ্ধি হইয়াছে—তুমি নিশ্চয় ভাগ্যবতী। শৈলেশ খুব ভাল ছেলে [,] তোমার সৌভাগ্য-ফলে তুমি এরূপ ধর্ম্মপ্রাণ পবিত্র বিদ্বান জ্ঞানবান পতি পাইয়াছ। তুমি নিশ্চয় প্রভুকে লাভ করিবে। তিনি পরম দয়াল, ঈশ্বরাবতার [,] তাঁর নাম জপ, তাঁর ধ্যান

তাঁর ভজন প্রেমের সহিত করিলে জীবের পরম মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে [।] অতএব তোমাকে প্রভুর নাম দিয়াছি। খুব নাম কর, ধ্যান কর। তোমার মনোবাঞ্ছা তিনি নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন, তুমি শান্তি পাইবে। আমার আন্তরিক স্নেহ আশীর্ব্বাদ তুমি জানিবে। তোমার মাকে জানাবে। কুন্তলা ও গুরুদাসীকে আমার কথা বলিবে। তারা আমাকে ভুলে যায় নাই তো? কুন্তলা একটু একটু পড়ে তো? ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীপ্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জয়তি

Etawah
17 Sept. '91

পূজনীয় মহাশয়েষু,

উপর্য্যুপরি আপনার তিন খানি পত্র পাইয়া অতিশয় অনুগৃহীত হইলাম। আপনার লিখিত পত্রগুলিতে আমার যথার্থই বিশেষ উপকার হইয়াছে। শ্রুতি স্মৃত্যুক্ত উদ্ধৃত কয়েকটি শ্লোকের প্রকৃত অর্থ বোধে ও আপনার শাস্ত্রার্থ বিচারে পত্র কয়খানি কেবল আমার নহে, উহা সার্ব্বজনীন সদর্থ যুক্ত হইয়াছে। এবং বারংবার প্রার্থনা করি (যদি আপনার কখনও অবকাশ হয়) কৃপাপূর্ব্বক ঐরূপ শ্রুত্যর্থযুক্ত পত্র লিখিলে আমার মহৎ উপকার হইবে। কারণ প্রতি পত্রে যদি উপনিষদ্ উক্ত দুইটি মন্ত্রেরও প্রকৃত অর্থ বোধ হয়, ত তাহা পাঠে আমি চরিতার্থ হইব। সত্য সত্যই যথার্থ আপনার শিক্ষাপূর্ণ পত্র পাঠে আমার অতিশয় প্রীতি জানিবেন।··· আমার পত্র পাঠে কিজন্য আপনি অতিশয় দুর্ভাবনায় ব্যাকুল হইলেন বুঝিতে পারি না। বোধ করি উহা আমারই দুর্ভাগ্য অথবা মূর্খতা···আপনাকে প্রণাম করিবার যোগ্য বলায় যদি আপনি দুঃখিত হইয়া থাকেন ত সে বিপরীত ভাবনা দূর করুন। আপনি নিশ্চয়ই শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপা পাত্র। নতুবা তাঁহার প্রিয়তম ভক্তবৃন্দের চরণরজে আজ আপনার গৃহ রঞ্জিত ও তাঁহাদের পবিত্র সমাগম কিরূপে সম্ভাবিত? আপনি আমার প্রণম্য নহেন ত কে? যিনি পুত্রকলত্রাদির সহিত একত্র বাস করিয়াও সতত তৎগুণকীর্তন ও শ্রবণে নিতান্ত অনুরক্ত এবং অনুক্ষণ তৎচিন্তনে নিরত (তাহাকে তিনি বীর সাধক বলিয়াছেন) অতএব তিনি যদি আমার প্রণম্য না হন ত আর কে প্রণামের যোগ্য? তাহা নিবেদন করিয়া দিলে বাধিত হইব। যাঁহার নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করিলেও আমি যাঁহাকে আমার প্রণম্য জ্ঞান করি আপনি ত সেই বিশ্বম্ভর বিজ্ঞানপীযূষনিমগ্নমূর্ত্তি দয়ার আধার রামকৃষ্ণের

শরণাগত ও তাঁহার প্রসাদভাজন হইয়াছেন। অতএব আপনি আমার জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা হইলেন। মহাশয়, বালকের লিখিত পত্রাদির ভাষাজনিত দোষ গুণ ক্ষমা করিবেন।

আপনি যে লিখিয়াছেন শাস্ত্রীয় তর্ক করা ত বিষম-সংসার ও ভগবৎ ধ্যানের প্রতিবন্ধক। পণ্ডিত মুমুক্ষুজনের নিমিত্ত ইহার তুল্য হিতকর বাক্য আর নাই। এবং এবাক্য নতশিরে একবাক্যে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ তত্ত্বজ্ঞান দুর্লভ। আচার্য্য বলিয়াছেন "বাগবৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্[।] বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্‌বদ্‌ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে" [॥] (বিবেকচূড়ামণি)—সাংসারিক কার্য্য হইতে অবকাশ পাইয়া একাগ্রতাসাধনের নিমিত্ত আপনি যে অত্যল্পকাল সময় পান সেই সময়েই আপনি আমাকে পত্র লিখেন জানিলে পূর্ব্বে কখনই আপনাকে ঐরূপ শান্তিকর পত্র লিখিতাম না। মহাশয় আমার অজ্ঞানজনিত অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

আপনি সত্য লিখিয়াছেন যে একাগ্রতাসাধনার কালে শুদ্ধজ্ঞান ও ভক্তি লিখিতে হইলে বা সম্ভাষণ করিলেও নির্ম্মল সুখলাভের ব্যাঘাত হয় ইহা সাধক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। আমার ও নির্ম্মলানন্দ স্বামীর বহু বহু প্রণাম জানিবেন। বাটীস্থ সকলকে আমার যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাইবেন। এখানে একখানি শঙ্করানন্দীটীকা পাইয়াছি। কিন্তু তাহা সম্যক্ বোধগম্য হইতেছে না (ন্যায়ের বিচার থাকায়)।

To P. D. Mitra
Benares City

দাস গঙ্গাধর

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীহরিঃ শরণম্

৺কাশী
১০।৪।২০

প্রিয় নির্ম্মল,

তোমার ৭ই তারিখের পত্র গতকল্য পাইয়াছি।* তোমরা সকলে ভাল আছ জানিয়া প্রীত হইয়াছি। ভরত এখানে আসিয়া চার পাঁচ দিন ছিল। গতকল্য মায়াবতী যাত্রা করিয়াছে। জিতেন বোধ হয় মায়াবতী ফিরিয়া থাকিবে। তাহাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছাদি জানাইবে [।] তুমি এখানে থাকায় রোজ বেশ ভাল কথাবার্ত্তায় আনন্দ হইত। [...] মহারাজ বা অন্য কেহ কিছুরই কারণ নহে সকলের মূলে তিনি বিদ্যমান। তাঁহা হইতেই সকল প্রসৃত হইতেছে। "যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী" তাঁহাকে ভুলিবে না। তাঁহাতেই দৃষ্টি রাখিবে। তিনি সন্তুষ্ট থাকিলে আর কাহারও অসন্তোষের ভয় ভাবনা থাকে না। বাহিরের

কারণাদি বড় দেখিবে না; ভিতরে সমস্ত দেখিতে অভ্যাস করিবে। "তেরা প্রীতম তুঝ্‌মে দুসমন ভি-তুঝমাহি" আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুঃ আত্মৈব হ্যাত্মনো রিপুঃ। "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"। এসব খালি পুস্তকে থাকিলে চলিবে না। সব আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। এখনই করিতে হইবে। Now or never

আমার শরীর যেমন দেখিয়া গিয়াছ সেইরূপই আছে। বরং তাহার চেয়ে আরও খারাপই হইয়াছে [।] এখন আর ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে পারিনা। অতিশয় দুর্ব্বল বোধ করিতেছি। গরম এখনও তত বেশি হয় নাই। কিন্তু আর দেরি নাই। শীঘ্রই খুব গরম পড়িবে। কল্যাণ অত্যন্ত আগ্রহ করিতেছে। শরৎ মহারাজ ভুবনেশ্বরে আসিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। কেদার বাবা প্রভৃতির ইচ্ছা আমি এইখানেই থাকি। প্রভুর ইচ্ছা যাহা তাহাই পূর্ণ হইবে। সকলে আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানিবে ইতি শুভানুধ্যায়ী।

শ্রীতুরীয়ানন্দ

হে সম্বুদ্ধ, শাক্যসিংহ স্মরিয়া তোমায়

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর

ভূমার স্বরূপ বলে' স্বল্পে তুষ্টি নাই,
এই বিশ্বে যাহা কিছু, সব মোর চাই।
চাই রাজ্য, চাই ধন, রূপ ও যৌবন,—
সীমাহীন পরমায়ু! কাম্য অগণন
তৃপ্তি নাহি দেয় মোরে। অতৃপ্ত হৃদয়,
সব পেয়ে তবু যেন রিক্ত মনে হয়!
তৃষার তাড়না-ক্লান্ত অবসন্ন প্রাণ
অন্তহীন যাত্রা হতে চাহে পরিত্রাণ।

রাজপুত্র! রাজ্য সুখ ছাড়ি পুত্র ভার্যা,
লভিলে নির্বাণ-শান্তি ধরি শীলচর্যা।
মধ্যপন্থা, অষ্টমার্গ কর্মবাদ মানি'—
দেখাইলে মুক্তি পথ হরি' জীবগ্লানি।
হে সম্বুদ্ধ, শাক্যসিংহ! স্মরিয়া তোমায়
কাম-ক্লান্তাহতচিত্ত শান্তি যেন পায়॥

যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী ভূতেশানন্দ

স্বামীজী বলেছেন, 'রামকৃষ্ণাবতারের জন্মদিন হইতেই সত্যযুগের উৎপত্তি হইয়াছে।' কথাটি বিশেষ করে ভাববার মতো। কাকে সত্যযুগ বলে, বিভিন্ন যুগের তাৎপর্য কি, এবং কেন সত্যযুগের আরম্ভ বললেন—এগুলি আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে।

একটি বিশিষ্ট চিন্তার ধারা যখন প্রধানভাবে মানুষের ভিতর চলতে থাকে তখন তাকে একটি যুগ বলে। সেই ধারার যখন পরিবর্তন ঘটে তখন তাকে বলে যুগ-পরিবর্তন। এইরকম করে একটির পর একটি যুগ জগতের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে সত্যযুগে ধর্ম চতুষ্পাদ অর্থাৎ পরিপূর্ণ। ত্রেতাযুগে তা তিন পাদ, এক পাদ বা এক চতুর্থাংশ কমে যায়। দ্বাপরে তা দ্বিপাদ, অর্ধেক কমে যায়, আর কলিযুগে তা একপাদ, অর্থাৎ ধর্ম খুব স্তিমিত হয়ে যায়। আবার আর একভাবে যুগবিভাগের ব্যাখ্যা করে বলা হয়, সত্যযুগ জ্ঞানপ্রধান, মানুষের মন তখন সূক্ষ্ম বিষয়ের ধারণা করতে বেশি সমর্থ থাকে। ত্রেতাযুগ কর্মপ্রধান; কর্ম বলতে যাগযজ্ঞাদি কর্ম।

ক্রমে মানুষের যাগযজ্ঞাদি করবার সামর্থ্য এবং মনের উপর তার প্রভাবও কমে আসে। দ্বাপর যুগ তপশ্চর্যা প্রধান। ত্যাগ, তিতিক্ষা, তপস্যা দ্বারা সাধকেরা আধ্যাত্মিক জীবনকে উন্নত করতে চেষ্টা করেন। কলিযুগে মানুষের জ্ঞানপথের অনুসরণ করা সম্ভব নয়, তার মন অত উচ্চ সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণা করতে পারে না। মানুষের বৈরাগ্যও অত তীব্র থাকে না। দ্বাপর যুগের মতো বহু ব্যয় এবং বহু সময়সাধ্য যাগযজ্ঞাদি করার সামর্থ্যও কলিতে নেই। এই জন্য কলিযুগ হল ভক্তিপ্রধান। নামের সাহায্যে, ভক্তির সাহায্যে মানুষ দুর্বল, অসমর্থ হয়েও পরমতত্ত্বকে লাভ করতে পারে। ভাগবতে একটি জায়গায় বলা আছে—"কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্"—১১/৫/৩৮। যারা সত্যযুগের মানুষ তারাও এসে এই কলিযুগে জন্মগ্রহণ করার ইচ্ছা করে। কারণ এ যুগে ভক্তি আশ্রয় করে অনায়াসে ভগবৎ-কৃপা লাভ করা যায়। তীব্র বৈরাগ্য বা সূক্ষ্ম জ্ঞানের দরকার হয় না। যাগযজ্ঞ করবার বৈভব, ঐশ্বর্যের প্রয়োজন নেই।

ঠাকুরও বলেছেন, কলিতে নারদীয় ভক্তি অর্থাৎ অহৈতুকী, নিষ্কাম ভক্তি—যাতে ভক্ত ভগবানের কাছে কোন প্রতিদান চায় না, কেবল তাঁকে তার হৃদয়ের ভালবাসা দিয়েই চরিতার্থ বোধ করে। কলিতে নাম-মাহাত্ম্যের কথাও আছে।

'কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।
হরের্নামৈব হরের্নামৈব হরের্নামৈব কেবলম্॥'

—কলিতে একমাত্র ভগবানের নাম করা—এ ছাড়া অন্য গতি নেই। ভগবানের নাম করাই কলিযুগের একমাত্র তপস্যা। ঠাকুর আরও একটি কথা বলেছেন, কলিতে সত্য কথাই তপস্যা। সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকলে অন্য তপস্যা না করলেও চলবে। তাহলে কলিযুগ সম্বন্ধে দুটি কথা পাওয়া গেল, এক—ভগবানের নাম গুণগান, দুই—সত্যের প্রতি নিষ্ঠা। এ তো হল আর এক দিক্ দিয়ে কলিযুগের ব্যাখ্যা।

এখন স্বামীজী যে কেন বললেন ঠাকুরের আগমনে সত্যযুগের আরম্ভ হয়েছে—এই কথাটি একটু বিচার করে দেখতে হবে। আমরা সত্যযুগ

বলতে এখানে এই বুঝব, যে-যুগে মানুষের ভিতরে পরিপূর্ণ ধর্মভাব প্রকটিত হয়। সেই সত্যযুগের আরম্ভ হচ্ছে ঠাকুরের আগমন থেকে। যুগপরিবর্তন অকস্মাৎ হয় না। একটি যুগ থেকে অন্য যুগে যে সংক্রমণ সেটি ক্রমিক বিবর্তন। শাস্ত্রমতে ধর্ম যখন প্রায় নিঃশেষিত তখন কলিকাল। ধর্মকে ধরে মানুষ বেঁচে থাকে, সেই ধর্ম থেকে যখন মানুষ ভ্রষ্ট হয় তখন তার রক্ষার কোন উপায় থাকে না। নিরুপায় হয়ে মানুষ ভগবানের কাছে এই দুরবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য প্রার্থনা করে, ভগবানের আবির্ভাবের যেন সেই যোগ্য সময়। যেমন গীতায় বলেছেন, যখন ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্ম প্রবল হয় তখন আমি অবতীর্ণ হই আবার ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য।

ঠাকুরের আগমনের প্রাক্কালে এই রকমভাবে ঘোর কলি আমাদের হতাশামগ্ন করেছে, মানুষ সনাতন ধর্মে আস্থা হারিয়েছে কিন্তু নতুন একটা কিছু অবলম্বন করতে পেরেছে তাও নয়। নানা ধর্ম-সংস্কৃতির একত্র সংঘাতের ফলে মানুষ যেন দিশাহারা। এমনি সময়ে যে ভগবান অবতীর্ণ হবেন এটা ভগবানেরই প্রতিশ্রুতি। তাই স্বামীজী বলছেন, তাঁর থেকে কলিযুগের শেষ এবং সত্য-যুগের আরম্ভ। কেন সত্যযুগের আরম্ভ বলছেন? না, মানুষের ধর্ম বিষয়ে যে বিভ্রান্তি ছিল ঠাকুর এসে সে বিভ্রান্তি দূর করে তাদের দিগ্‌দর্শন করালেন, তাদের মৃতপ্রায় দেহে প্রাণ সঞ্চার করলেন। মানুষ আবার নিজের উপর আস্থা ফিরে পেল। ঠাকুরের আবির্ভাবকাল থেকে এই পরিবর্তন কিভাবে ধীরে ধীরে ঘটছে যাঁরা চিন্তাশীল তাঁরা ভেবে দেখলে বুঝতে পারবেন।

ঠাকুর যখন এসেছিলেন ঠিক সেই সময় কজনই বা তাঁকে চিনেছিলেন? গীতায় ভগবান বলেছেন, "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥" গীতা ৯।১১—মোহগ্রস্ত ব্যক্তিরা আমাকে দেহধারী মানব মনে করে অবজ্ঞা করে। আমার যে পরমতত্ত্ব তা তারা জানে না। তাই কংসের কারাগারে তাঁর জন্ম। যেখানে যেখানে অবতার অবতীর্ণ হয়েছেন দেখা যায় সেগুলি অখ্যাত, অজ্ঞাত স্থান, বিপরীত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাঁদের জন্ম হয়। রামচন্দ্র রাজার ঘরে জন্মেছিলেন কিন্তু রাজ্যভোগ করা তাঁর হয়নি। রাজপদে অভিষিক্ত হবার মুহূর্তে সব ছেড়ে তাঁকে বনবাসে যেতে হল। ভগবান বুদ্ধ রাজা না হলেও সম্ভ্রান্তকুলে জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন। তারপরে তিনি এই জগতের অবস্থা বিচার করে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সর্বত্যাগ করে চলে গেলেন সত্যের সন্ধানে। এইরকম অবতারদের সকলের জীবনেই একটা বিপুল পরিবর্তন আসে, যে পরিবর্তন সমগ্র জগতের পরিবর্তনকে সূচিত করে। এইজন্যে তাঁকে আমরা যুগপ্রবর্তক বলি। ভগবান এসে মানুষের মধ্যে এমন একটি প্রেরণা সঞ্চার করেন তাঁর জন্ম এবং কর্মের দ্বারা, যার ফলে জগতের পরিবর্তন আরম্ভ হয় এবং সেই পরিবর্তনের ধারা দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে।

ঠাকুর বলেছেন, আমি ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু জানি না। তিনি এসেছেন সকলকে ঈশ্বরতত্ত্বে অবহিত করাতে। অন্য কিছু জানবার অবকাশ তাঁর নেই। কোন বিদ্যা তিনি শিখলেন না। সাধারণ বিদ্যা আমরা যাকে বলি, তাকে চাল-কলাবাঁধা বিদ্যা বলে স্বেচ্ছায় পরিহার করলেন। আর অন্য প্রকারের পাণ্ডিত্যকে অহংকারের কারণ বলে তিনি সেগুলিকেও পরিত্যাগ করলেন। কাজেই সেদিক দিয়ে তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্য কিছু নেই। অন্য ঐশ্বর্যও নেই। ধনীর ঘরে জন্মাননি। যে শারীরিক সৌন্দর্য নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন বলে জানা যায় তাও তিনি

ধীরে ধীরে মায়ের কাছে প্রার্থনা করে গোপন করলেন। আমাদের খুব নিকট হবার জন্য তিনি এগুলি করলেন। ভগবান সর্বঐশ্বর্যপূর্ণ, কিন্তু তিনি আমাদের নাগালের বহুদূরে, আমাদের বুদ্ধির অগম্য। কাজেই তাঁকে আমরা ধরতে পারি না, চিনতে পারি না। ভাগবতে একটি উপমা দেওয়া হয়। চাঁদ জলের উপরে প্রতিবিম্বিত হয়। মাছগুলি সেই প্রতিবিম্ব-চাঁদকে দেখে তার সঙ্গে খেলা করে। ভাবে এ আমাদেরই সঙ্গী। ঠিক এইরকম ভগবান আবির্ভূত হলে মানুষ তাঁকে তাদেরই মতো মনে করে, তাঁর সঙ্গে সাধারণভাবে ব্যবহার করে, এমন কি তাঁকে উপহাস অবজ্ঞাও করে। যেমন গীতায় অর্জুন বলছেন, 'আমি তোমাকে সাধারণ মানুষের মতো অবজ্ঞা করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।' এ কথা কখন বলছেন? না, যখন তিনি বিশ্বরূপ দেখিয়ে অর্জুনকে অভিভূত করেছেন। অর্জুন তখন আর সখা নয়, তাঁর ভক্ত, তাঁর আশ্রিত, শরণাগত। আমরা যখন ভগবানকে এইরকম করে কাছে পাই তখন সহজে তাঁকে ভগবানরূপে বুঝতে পারি না, কেবল মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানেরা বুঝতে পারেন।

ঠাকুর যেমন বলেছেন যে, রামচন্দ্র যখন অবতীর্ণ হয়েছিলেন মাত্র বারোজন ঋষি তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন অবতার বলে। পুরাণাদিতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। ঠিক সেইরকম শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময়েও যাঁরা তাঁর কাছে সর্বদা থেকেছেন তাঁরাও তাঁর স্বরূপকে বুঝতে পারেননি, বুঝতে চেষ্টাও করেননি। ঠাকুরেরই কথা, 'লণ্ঠনের নীচে অন্ধকার।' যে আলো বিশ্বকে আলোকিত করবে সেই আলোকের পাশে যারা থাকে তারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই সম্বন্ধে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। প্রথমবার কামারপুকুরে গিয়েছি। সেখানে পৌঁছে গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করেছি 'রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাড়ি কোথায়?' তারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। তখন আমাদের খেয়াল হল। বললাম, রামলাল চাটুজ্জের বাড়ি কোথায়? তখন দেখিয়ে দিল। সেখানে লোকে রামলাল চাটুজ্জেকে চেনে, শ্রীরামকৃষ্ণকে চেনে না। সর্বত্রই এই হয়। যে কংসের কারাগারে ভগবান জন্ম নিলেন সেই কংস কি তাঁকে ভগবানের অবতার বলে বুঝেছিল? না তার আশেপাশের লোকেরা তাঁকে বুঝেছিল? দেবকী ও বসুদেবকে তিনি চতুর্ভুজরূপে দর্শন দিলেন, তাঁরা দেখে বললেন, তোমার এই রূপ সম্বরণ কর। এখুনি কংসের চরেরা এসে দেখে ফেলবে আর কংস তোমার বিনাশ করবে। একথা মনে হল না যে, যিনি ভগবান তাঁকে কংস বিনাশ করবে এ সাধ্য তার কোথায়? তাঁরা অপত্যস্নেহে মুগ্ধ। ভগবানের ঐশ্বর্য তাঁরা বোঝেন না। ভগবানকে ভগবানরূপে দেখেন না, সন্তানরূপে দেখেন। যেমন একজন প্রতিপত্তিশালী জর্জ-ম্যাজিস্ট্রেটের বাবা মা কি তাকে জজ-ম্যাজিস্ট্রেটরূপে দেখবে, না, তাদের খোকাকে খোকা রূপেই দেখবে? বাপমায়ের কাছে খোকাত্ব কখনও ঘোচে না। ঠিক সেইরকম ভগবান যখন অবতীর্ণ হন, তাঁর সবচেয়ে কাছে যারা থাকে তারা তাঁর পরিচয় বিশেষ পায় না।

একবার উদ্বোধনে স্বামী সারদানন্দ মহারাজের কাছে একটি নবাগত ভক্ত বললেন, সাধুসঙ্গ করতে এসেছি। সারদানন্দ মহারাজ বললেন, তোমরা তো বাপু সাধুসঙ্গ করতে এসেছ। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বাস করতেন, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের চাকর, বামুন তারা বা দক্ষিণেশ্বরের প্রতিবেশী যাঁরা বছরের পর বছর শ্রীরামকৃষ্ণকে নিত্য দেখেছেন, তাঁদের কারো জীবনে কি

তাঁর কোন প্রভাব দেখা গিয়েছে? কাজেই অবতারের কাছাকাছি যে সেই প্রভাব অনুভূত হবে, তা নয়। যারা দূরে, তাঁকে দেখেনি তাদের ভিতরে প্রভাব কি করে প্রসারিত হচ্ছে তা আমরা আজ প্রত্যক্ষ করছি। অবতারদের লীলা এইরকমই হয়। যুগের প্রবর্তন যখন করেন তখন সেই যুগের প্রভাব কেবল আশপাশের লোকদের ভিতরেই আবদ্ধ থাকে না, সমস্ত জগৎ জুড়ে সেই প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়। কি করে হয়, কোন সূত্র দিয়ে যায় তা আমরা জানি না। তাঁর কার্যের ধারা বুঝবার আমাদের সাধ্য কোথায়? কাজেই আমরা যতটুকু পারি সেই-টুকুই ধারণা করার চেষ্টা দরকার।

স্বামীজীর উক্তি আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝতে না পারলেও এটা দেখছি শ্রীরামকৃষ্ণ আজ মাত্র দুচার জনের কৌতূহলের বিষয় বা দুচারটি ভক্তের কাছে ঈশ্বর অবতার বলে পূজার পাত্র নন, আজ শ্রীরামকৃষ্ণ কেবল দক্ষিণেশ্বরের বা কেবল বাংলার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নন, তিনি এখন সমগ্র বিশ্বের। চিন্তাশীল মানুষ তাঁকে নিয়ে চিন্তা করছেন। কত লোক তাদের জীবনে তাঁর ভাবধারায় নিষ্ণাত হয়ে ধন্য। দিন দিন এই ভাবের প্রসার হচ্ছে। এই জিনিসটি আমরা আমাদের আশেপাশের দিকে চেয়ে বুঝতে পারব না। ধর্মজগৎ লোকচক্ষুর অন্তরালে গড়ে ওঠে এবং তার প্রভাব বিস্তার করে। আমরা সাধারণ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে ধরতে পারব না, সত্যযুগের সঙ্গে আমাদের বর্তমান যুগের পরিস্থিতির তুলনা করলে অসমঞ্জস বলে মনে হবে। কিন্তু সত্য-যুগেও সব মানুষ ধর্মভাবে ভাবিত ছিল বলে মনে হয় না। বেদে উপনিষদে পুরাণে বলা হয়েছে যে, মানুষের ভিতরে কচিৎ কেউ সেই ভগবানকে জানতে চেষ্টা করেন, তাঁদের ভিতরেও দৈবাৎ কেউ তাঁকে জানতে পারেন। গীতায় বলেছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥
(৭।৩)

আমরা সকলেই ভগবানের ভাবেতে মগ্ন হয়ে থাকব এ কোন যুগে হয়নি। সত্য যুগেও হয়নি এবং কোন যুগে হবার নয়। 'আমরা এইটুকু জানি যে, জীবনে ভগবানের প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে, তাঁর ভাব নিয়ে জীবনকে উন্নত করতে পারে এরকম লোকের সংখ্যা সর্বদাই সীমিত। কিন্তু সীমিত কয়েকটি ব্যক্তিই জগৎকে ধরে আছেন। তাঁরা যদি না থাকতেন জগতের কোন সত্তা থাকত না। তাঁদের সাধনা, উপলব্ধি এখনও জগৎকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে এবং জগৎ যত সংকটের ভিতরেই আসুক যদি তাঁদের উপলব্ধিগুলিকে তারা চিন্তা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবার চেষ্টা করে তাহলে আর তাদের কোন ভয় নেই। 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'। অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥' ৯।৩১—হে অর্জুন, তুমি জগতের সকলকে ঘোষণা করে বল যে, আমার ভক্তের বিনাশ নেই। সুতরাং আমরা জানি বা নাই জানি এই মুষ্টিমেয় কয়েকটি ব্যক্তি তাঁদের প্রভাব দ্বারা আমাদের জীবনকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং চিরকাল রাখবেন। অনেক সময় বাহ্য জগতের প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখে চিন্তাশীল মানুষের মধ্যেও হতাশার ভাব আসে। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এর পশ্চাতে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো যে আধ্যাত্মিক স্রোতের ধারা অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত তাকে বুঝবার মতো সূক্ষ্মদৃষ্টি মাত্র কয়েকজনের থাকে।

কাজেই জগতে যত দুর্নীতি, দুর্দশাই দেখি না কেন আমাদের হতাশ হবার কোন কারণ নেই। আমাদের বিচার করে দেখতে হবে

—ঠাকুরের ভাবকে যে বিপুলভাবে পরিব্যাপ্ত দেখছি এর কি কোন সার্থকতা নেই? এত লোক যে তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়ে আসছে— সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে চিন্তাশীল মনীষীরা পর্যন্ত—এর কি কোন তাৎপর্য নেই? আমরা সবটুকু বুঝতে না পারলেও খানিকটা ধারণা করতে পারি যে নিশ্চয়ই এর সার্থকতা আছে। এই যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ আসছে তারা সকলেই কি কেবল কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে আসছে? হয়তো অনেকে তাই, কিন্তু কিছু মানুষ আন্তরিক ধর্মপিপাসাকে পরিতৃপ্ত করবার জন্যই আসছেন এবং তাঁরাই ধর্মকে সর্বদা বাঁচিয়ে রাখেন। আশা করি এই ভাব দিন দিন প্রসারিত হবে যা দেখে পরে ঐতিহাসিকরা এই প্রভাবের মূল্যায়ন করবেন।

যখন যখন অবতার আসেন তাঁকে তখনই বিচার করে কেউ অবতার বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি এবং পারবেও না। শ্রীরামকৃষ্ণকে দুচারজন যখন অবতার বলতে আরম্ভ করলেন, তিনি বিরক্ত হতেন। বলতেন, 'কেউ থিয়েটার করে, কেউ ডাক্তার, আর বলে অবতার। এরা অবতারের বোঝে কি? কত বড় বড় পণ্ডিত অবতার বলে গেছে, অবতার কথায় ঘেন্না হয়ে গেছে।' তাঁর এই অবতার কথাতে রুচি নেই। কারণ তিনি জানেন যে, আমরা যারা অবতার বলছি তারা তাঁকে কিছুই বুঝি না।

একবার একটি ছেলে স্বামী বিবেকানন্দের কাছে একখানি ছবি নিয়ে এসে বলছে, বলুন তো ইনি অবতার কি না। স্বামীজী হেসে বললেন ; বাবা, না খেয়ে তোমার মাথাটা শুকিয়ে গেছে। তুমি একটু ভাল করে খাওয়া দাওয়া কর। অবতারকে মুনিঋষিরা পর্যন্ত বোঝেন না, আমরা ছবি দেখে তাঁকে বুঝব অবতার! অবতারকে এইভাবে বোঝা যায় না। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে, সমষ্টি জীবনকে বিচার করে তারপর অবতারকে অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং তিনি তাঁকে প্রতিষ্ঠিত না করলে মানুষের সাধ্য নেই যে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে।

'স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।'
(গীতা ১০।১৫)

—হে ভগবান, তুমি স্বয়ং নিজের জ্ঞানের দ্বারা নিজেকে জান, তোমার স্বরূপ সম্বন্ধে আর কেউ জানে না। সত্যই তো তাঁকে আর কে জানবে? সীমিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আধার তাঁকে ধারণা করবে এ কল্পনা একেবারে অবাস্তব কল্পনা। যখন অবতার বলি তখন তা কথার কথা মাত্র। ঠাকুর বলছেন, যেমন ছেলেপুলেরা ঝগড়ার সময় বলে ঈশ্বরের দিব্যি। ঈশ্বর তাদের কাছে শব্দ মাত্র। তার চেয়ে বেশি তারা বোঝে না। আমাদের এই ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আমরা যদি অবতার সম্বন্ধে ধারণা করতে যাই তাহলে অবতার আমাদের কাছে সেইরকম শব্দমাত্র হবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা আমাদের সীমিত বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারব না, সে চেষ্টাও বাতুলতা। তবে আমরা তাঁকে বুঝতে পারি বা না পারি যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর জীবন আলোচনা করি, তাঁর কথা ভাবি, তাহলে ধীরে ধীরে আমাদের অন্তর স্বচ্ছ হবে, পবিত্র হবে। তখন সেখানে তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা তাঁকে ধীরে ধীরে বুঝতে চেষ্টা করব এবং তার দ্বারা আমাদের জীবন কৃতার্থ হবে। তা দুদিনের ব্যাপার নয়, দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করতে হবে। আজ যে ঠাকুরকে আমরা অবতার বলছি তা তাঁর আবির্ভাবের কত বছর পরে। এখনও তার ধারা ক্রমশঃ প্রসারিত হয়ে চলছে তা আমরা দেখতে এবং বুঝতে পারছি এবং স্বামীজী বলেছেন, দীর্ঘকাল ধরে এই প্রসার চলবে। কত

দীর্ঘকাল চলবে তা বছরের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হবে। মানুষের ধারণাশক্তি বাড়তে বাড়তে যতদিন না তাকে পরিপূর্ণ ভাবে বুঝতে পারবে ততদিন চলবে। তারপর? তারপরের কথা আমাদের অজ্ঞাত।

আমরা যে যুগে জন্মেছি তা কতদিন চলবে তা জানি না। কিন্তু আমাদের বিশেষ করে সচেতন হতে হবে যে একটা অসাধারণ যুগে আমরা জন্মেছি। এর সুযোগ আমরা কতটুকু নিচ্ছি তা আমাদের অন্তরকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। শুধু মুখে 'শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ' বললে এ যুগে জন্মানোর সার্থকতা পুরোপুরি হবে না। আমাদের দেখতে হবে সেই ভাব আমরা জীবনচর্যায় কতখানি গ্রহণ করেছি।

ঠাকুর বলেছেন, যে এখানে আসবে তার শেষ জন্ম। এখানে মানে কি কামারপুকুরে বা দক্ষিণেশ্বরে? এখানে মানে কি ঠাকুরের স্থূল-দেহের কাছে? তা নয়। ঠাকুর সত্যস্বরূপ, তাঁর কথা মিথ্যা হবে না। তাঁর কাছে যাঁরা আসবেন তাঁদের শেষ জন্ম। কারা তাঁরা? যাঁরা তাঁর ভাবকে হৃদয়ে ধারণ করবার জন্য আন্তরিকভাবে তাঁর শরণাগত হবেন তাঁরা। আমরাও যদি সেই আদর্শকে আমাদের ভিতরে যতটুকু সম্ভব প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করি, তাহলে তাঁর কৃপায় আমাদের জীবন ধন্য হবে।

আমরা যে সকলেই এক একটি রামকৃষ্ণ পরমহংস হব তা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অবহিত স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুভাইদের বলেছেন,—তোরা কি ভেবেছিস তোরা সবাই এক একটা রামকৃষ্ণ হবি? সে সাত মন তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। অর্থাৎ সেটা অবাস্তব কল্পনা।

ভগবান অতুলনীয়, অপরিমেয়, তাঁকে আমরা ভাবতেও পারি না। বলছেন, ন তস্য প্রতিমা অস্তি—যিনি মহান্ পুরুষ তাঁর প্রতিমা নেই। তাঁর মতো আর একটি নেই যে তাঁর সঙ্গে তুলনা করা যাবে। তিনি এক, অদ্বিতীয়। আমরা সেই অদ্বিতীয় বস্তুর থেকে যতদূরেই থাকি আমাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে যদি তার একটি কিরণকেও গ্রহণ করতে পারি, লক্ষ লক্ষ জন্মের অন্ধকার অপসারিত হবে। এটি আমাদের বিশেষ করে চিন্তা করবার বিষয়, শুধু দীর্ঘ আলোচনা করে যে জানতে পারব তা নয়। জীবনকে সেইভাবে প্রভাবিত, সেই উদ্দেশ্যে পরিচালিত করবার চেষ্টা করলে হয়তো ধীরে ধীরে সেই আদর্শ আমাদের পরিবর্তন ঘটাবে, ক্রমশঃ তাঁর ভাবে ভাবিত হব। তিনি ভাস্বর সূর্যস্বরূপ, তাঁর একটি ছোট্ট কিরণ যা সূর্যের তুলনায় জোনাকির আলোর মতো—সেটুকুও যদি আমাদের জীবনে গ্রহণ করতে পারি, আমাদের জীবন আলোকিত ও মধুময় হবে, জন্ম সার্থক হবে।*

* মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৩০ মে, ১৯৮৫ তারিখে প্রদত্ত ভাষণের সংক্ষিপ্ত অনুলিপি।

বাংলার যুগল চাঁদ

স্বামী প্রভানন্দ

ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি। ভারতবর্ষের বাইরের ভৌগোলিক রূপের অতিরিক্ত রয়েছে একটি আধ্যাত্মিক ভাবরূপ। এই আধ্যাত্মিক ভাবের প্রেরণায় ভারতবাসী তার জীবন-যৌবন-ধন-মান —সমস্ত সমর্পণ করেও খুঁজেছে সত্যকে, ছুটেছে ভূমার পশ্চাতে, অনুসন্ধান করেছে বহুত্ব ও বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বকে। সেই উচ্চভাবে উদ্দীপ্ত হয়েই সে সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অতীত পরমসত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছে— অমৃতের সন্ধানে সে নিজেকে সন্ধান করে ফিরেছে। এবং পরিণতিতে আবিষ্কার করেছে যে সেই পরমসত্য বস্তুতঃ তার নিজ সত্তারই সারাৎসার। সানন্দে সগৌরবে তাই ঋষিকণ্ঠ ঘোষণা করেছে 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্'। এভাবে গড়ে উঠেছে ভারতবাসীর জীবনদর্শন। জাতির উত্থান-পতনের বন্ধুর পথে এই জীবন-দর্শনই তাকে পালন ও পুষ্ট করেছে, বলীয়ান করে তুলেছে নব নব শক্তিতে। তাছাড়াও কালের সোপান বেয়ে নেমে আসতে আসতে এই জীবনদর্শন বহিরাগত বহু বিচিত্র ভাবধারাকে আত্মস্থ করে নিয়ে নতুন ঐশ্বর্যে সংবিন্যস্ত ও সমন্বিত হয়ে উঠেছে।

এই জীবনদর্শন আশ্রয় করে ভারতবাসী তার চলার পথে দেখতে পেয়েছে তার জীবন-অভীপ্সার লক্ষ্য স্থির করে দেবার জন্য, শ্রীভগবান মানুষের সাজে কখন কখন তাদের মধ্যে উপস্থিত হন। শ্রীভগবানের এই অবতরণ ভারতবাসীর চির-প্রিয়। কারণ ব্যাখ্যা করে স্বামী বিবেকানন্দ একটি ভাষণে বলেছিলেন, 'আমরা জানি··· মহত্তর জীবন্ত ঈশ্বরসকল এই পৃথিবীতে সময়ে সময়ে আমাদের মধ্যেই আবির্ভূত হইয়া বাস করিয়া থাকেন।···ঈশ্বর সম্বন্ধে তুমি আমি যতটা ধারণা করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ অনেক বড়। আমরা আমাদের মনে যতদূর উচ্চ আদর্শের চিন্তা করিতে পারি, বুদ্ধ তদপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ—জীবন্ত আদর্শ। সেই জন্যই সর্ব-প্রকার কাল্পনিক দেবতাকেও অতিক্রম করিয়া তাঁহারা চিরকাল মানবের পূজা পাইয়া আসিতেছেন।'[১]

বিগত পাঁচশ বছরের মধ্যে তিনি দু-দুবার আবির্ভূত হয়েছেন—আবির্ভূত হয়েছেন শ্রী-চৈতন্যবপুতে ও শ্রীরামকৃষ্ণবপুতে। ভগবান শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম জন মর্ত-দেহে ছিলেন প্রায় আটচল্লিশ বছর, দ্বিতীয় জন প্রায় একান্ন বছর। প্রেমোন্মত্ত শ্রীচৈতন্য প্রেম-যমুনার প্লাবনে সমাজের পুঞ্জীভূত গ্লানি ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, দেশবাসীকে ভক্তিরসে সিক্ত করে-ছিলেন। আর সাড়ে তিনশ বছর পরে ভারতের যাবতীয় অধ্যাত্ম-সাধনা ঘনীভূত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপ পরিগ্রহ করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে জ্ঞান-গঙ্গা ও প্রেমযমুনা বইয়ে দিয়েছিলেন এবং শিষ্য বিবেকানন্দকে আশ্রয় করে কর্মসরস্বতীকে এর-সঙ্গে মিলিত করে দিয়েছিলেন। এই তিনধারার মিলনে ভারতবর্ষে নবজাগরণের উন্মেষ সম্ভবপর হয়েছিল।

এই দুজনেই সোনার বাংলার উর্বর ভূমির শ্রেষ্ঠ ফসল। বাঙালী কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যথার্থই লিখেছেন, 'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।' ভাবপ্রবণ, কোমলহৃদয়,

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড (৫ম সং), পৃঃ ১৪৩-৪।

আদর্শবাদী বাঙালী জাতির হৃদয়সুধা মন্থন করে উদ্ভূত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। প্রায় অনুরূপ ভাব থেকেই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লিখেছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে, 'রামকৃষ্ণ কে? কে তা জানি না। এই পর্যন্ত জানি যে এই সোনার বাংলায় এমন সোনার চাঁদ—গোরাচাঁদের পর আর উদয় হয় নাই। চাঁদেও কলঙ্ক আছে—কিন্তু রামকৃষ্ণ-চাঁদে কলঙ্ক-রেখাটুকুও নাই।' এই যুগল চাঁদের দীপ্তিতে ও ভাস্বরতায় ভারতবর্ষের ধর্ম ও সংস্কৃতি সমুজ্জ্বল।

দুজনেই ধর্মজগতের দুই শ্রেষ্ঠ তারকা। উভয়েরই নিজ নিজ জীবনসাধনার ফসলস্বরূপ সেই সেইকালে দেখা দিয়েছে ধর্মের পুনরভ্যুত্থান এবং সে-সঙ্গে জাতির সামগ্রিকভাবে জাগরণ। এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করছি টি. এস. এলিয়টের একটি মন্তব্য। তিনি ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্পর্ক নির্দেশ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, 'প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হচ্ছে কোন ধর্মের সাহায্য ভিন্ন কোনও সংস্কৃতিরই উদ্ভব বা উৎকর্ষ ঘটেনি। পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করছে, সংস্কৃতির জন্ম হয় ধর্ম থেকে অথবা সংস্কৃতির অন্তরলোক থেকেই জন্মলাভ করে ধর্ম।'[২] বস্তুতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম ও সংস্কৃতি বিশেষ এক সম্পর্কে পরস্পর সম্বদ্ধ। এদেশের সংস্কৃতির প্রাণরস ধর্ম। একারণে দেখা যায় চৈতন্যোত্তর-কালে নবপ্রচারিত ধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতির উপর ব্যাপকভাবে তার কল্যাণ প্রভাব বিস্তার করে-ছিল। প্রাক্ চৈতন্যযুগে সাধারণ হিন্দু ও বুদ্ধি-জীবীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতা, নব্য ন্যায়, স্মৃতি ও ব্যাকরণ চর্চায় আবদ্ধ হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য, হিন্দুসমাজে ক্রিয়াকাণ্ডবিধির বাড়াবাড়ি, জাতিভেদের অক্টোপাশের পেষণ, নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উপর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের উৎপীড়ন, ধনী হিন্দুদের মধ্যে সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা ও মূল্যবোধের অভাব, সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে নানাধরনের অপধর্ম ও গোপন ক্রিয়াকর্মের প্রসার সমাজকে অত্যন্ত দুর্বল করে ফেলেছিল। হিন্দু-সমাজ বহিরাগত ধর্ম ও সংস্কৃতির নিকট আত্ম-সমর্পণ করতে উদ্যত হয়েছিল। এই সংকট উত্তরণের জন্য শ্রীচৈতন্য আচার-বিচারে চাপা-পড়া মহৎ ভাবগুলি পুনরুজ্জীবিত করলেন। তার সঙ্গে সংযোজন করলেন আপন সম্পদ—প্রেম ও ভক্তি। বাস্তব অর্থেই যেন শান্তিপুর ডুবু ডুবু হল, নবদ্বীপ ভেসে গেল। জনসাধারণের মধ্যে জাগরণ দেখা দিল, নতুন প্রাণের সঞ্চার হল। শ্রীচৈতন্যের ব্যাপক প্রভাব সম্বন্ধে যদুনাথ সরকার লিখেছেন, 'বাংলা, ত্রিহুত, উড়িষ্যা ও আসামে শ্রীচৈতন্য ও শঙ্করদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম হিন্দু জনসমষ্টির অধিকাংশের হৃদয় জয় করেছিল। শ্রীচৈতন্যের নবধর্ম উপরি-উক্ত অঞ্চলের অনেক স্থানে বহু-প্রচলিত তান্ত্রিক উপাসনার অমার্জিত পুরুষোচিত বর্বরতা ও সর্বপ্রাণবাদকে পোষ মানিয়ে একটি অনভ্যস্ত নম্রতা ও বিপুল প্রাণোল্লাস আনয়ন করেছিল। সপ্তদশ শতক এই নববৈষ্ণবধর্ম সম্প্রসারণের স্বর্ণযুগ—এই সময়ে সাগ্রহে শ্রীভগবানের ব্যক্তিপূজা, শিশু ও দুর্বলদের প্রতি দরদী ব্যবহার, সাহিত্যচর্চার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। তাছাড়াও দরিদ্রতম ব্যক্তির দিন-চর্যার মধ্যেও সঙ্গীত, নৃত্য ও সূক্ষ্ম অনুভূতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এই নবযুগধর্ম সামাজিক বিভেদ দূর করে দিয়েছিল এবং আত্মিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে তুলেছিল ভ্রাতৃত্বের বন্ধন।'[৩]

২ T. S. Eliot: Notes towards the definition of Culture, Published by Faber & Faber Ltd., London, p. 15.

৩ Sir Jadunath Sarkar: Chaitanya's life & teachings, 1932, 3rd Ed., p. 12.

মাদ্রাজ অভিনন্দনের উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন, 'সমুদয় ভারতেই শ্রীচৈতন্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেখানেই লোকে ভক্তিমার্গ জানে, সেইখানেই তাঁহার বিষয় লোকে আদর-পূর্বক চর্চা করিয়া থাকে ও তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকে।' শ্রীচৈতন্যের প্রভাবের ক্ষেত্র প্রত্যক্ষ-ভাবে উত্তর-পূর্ব ভারতবর্ষ, গৌণভাবে সমগ্র ভারতবর্ষ। চরিতামৃতকারের দাবী—'এইমত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈল / কৃষ্ণনামামৃত বন্যায় দেশ ভাসাইল।' এর মধ্যে কিঞ্চিৎ অতিশয়োক্তি দোষ থাকলেও বৈষ্ণবধর্মের ক্রমবর্ধমান প্রসার অস্বীকার করা যায় না। ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন, 'রাজপুতানার বৈষ্ণবদের উপরও চৈতন্যমতের বেশ প্রভাব লক্ষিত হয়। সুরত জেলায় বলসার প্রভৃতি স্থানের বানিয়াদের মধ্যে, সুদূর পাঞ্জাবে ডেরা-ইসমাইল-খাঁ-বাসীদের মধ্যেও গৌড়ভাবের বৈষ্ণব দেখিয়াছি।'[৪] শ্রীচৈতন্যের প্রভাবের অপর একটি দিক সম্বন্ধে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, 'শ্রীচৈতন্য ব্যতীত পঞ্চদশ শতাব্দীতে বা তাহার পূর্বে পৃথিবীর কোথাও এমন কোনো ধর্মপ্রচারক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, শিল্পী বা দার্শনিক জন্ম-গ্রহণ করেন নাই যাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার পরলোক-গমনের সওয়া দুইশত বৎসরের মধ্যে শতাধিক লেখক গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন।'[৫] নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ বাংলা সাহিত্যকে এমন সৃষ্টি প্রেরণায় প্রাণবন্ত করে তুলতে সক্ষম হননি। প্রকৃতপক্ষে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত ভাবান্দোলন দেশের সাহিত্য, শিল্প, দর্শন ও সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখাকে সঞ্জীবিত করে তুলেছিল।

ইসলামের আগ্রাসী অভিঘাত সামলিয়ে ওঠার পূর্বেই হিন্দুসমাজের উপর আছড়ে পড়েছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল তরঙ্গাভিঘাত। ইংরেজ-আধিপত্য সহায়ে খ্রীষ্টান ধর্ম নিম্নবর্ণের হিন্দু-গণের মধ্যে ধর্মান্তরকরণের প্লাবন বইয়ে দিয়ে-ছিল। কুসংস্কারে জর্জরিত হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ ঘটেছিল ব্রাহ্মধর্মের আত্মপ্রকাশের মধ্যে। রাজধানী কলকাতায় 'ইয়ংবেঙ্গল' ধর্ম ও প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। ইংরেজী শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্তদের মধ্যে রাজা রামমোহন, দেবেন্দ্র ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ভারতবাসীর জীবনচর্যা থেকে ভারতীয় জীবনদর্শনের সার অদ্বৈতবেদান্তকে বিদায় দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। জাতির এই সংকটকালে আবির্ভূত হন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি ভারতবাসীর জীবনদর্শনকে পুনরুজ্জীবিত করেন, ধর্মভিত্তিক ভারতীয় জীবনের সার্থকতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন, বিবদমান বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন, জনসাধারণের মধ্যে কর্মে পরিণত বেদান্তকে প্রবর্তিত করেন। শ্রীচৈতন্যের তুলনায় শ্রীরামকৃষ্ণ সাম্প্রতিককালের হলেও স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁর ব্যাপক প্রভাব ও ভবিষ্যতে তাঁর ক্রমঃপ্রসারমান ভূমিকার অন্তহীন সম্ভাবনা লক্ষ্য করবার মতো। ৩ মার্চ ১৯৩৭ তারিখের অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'পরমহংসদেবকে আমি শ্রদ্ধা করি কারণ তিনি ধর্মীয় নৈরাজ্যের শুষ্ককালে আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সত্যতা নিজ উপলব্ধির দ্বারা প্রমাণ করেছেন, কারণ তাঁর মহান সত্তা আপাতবিরোধী সাধনসমূহকে নিজ সত্তার অন্তর্ভুক্ত করতে পেরে-ছিল, কারণ তাঁর চিত্তের সারল্য চিরদিনের জন্য ম্লান করেছে পুরোহিত ও পণ্ডিতদের আড়ম্বর

৪ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা—ক্ষিতিমোহন সেন, পৃঃ ৪৯

৫ শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, ১৩৩৯, পৃঃ ২

ও বিত্তাভিমানকে।'[৬] ঐ বছরই ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ লিখেছিলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বুদ্ধিজীবিমহলে তত অনুপ্রবেশ করতে না পারলেও যে-সকল ব্যক্তি ভোগ ও স্বার্থপরতার পিছনে পিছনে ছুটতে গিয়ে অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছে তাদের নিঃসঙ্গ হৃদয়ে স্থানলাভ করেছে। এই মহান আচার্যের অনুপ্রাণনায় সামাজিক সমবেদনার এক শক্তিশালী পুনরভ্যুত্থান ঘটেছে। ...ধূলায় অবলুণ্ঠিত হিন্দুধর্মকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তিনি সাহায্য করেছেন, শুধু কথায় নয়, কাজেও।'[৭] এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্য-ভূমিকার দিঙ্‌নির্দেশ করে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী বলেছিলেন, 'যতপ্রকার রাজনীতি আছে সবকিছুর মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে, দেশের যত দুঃখকষ্ট আছে তা দেখবার পরে, আমাদের দেশের দুঃখকষ্ট সম্বন্ধে অপরের মুখে সব কিছু শোনবার পরে, আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি—এদেশের ভাগ্যের উন্নতি করা সম্ভব নয় যদি না আমরা হিন্দুরা উত্তম হিন্দু হই—মুসলমান এবং খ্রীষ্টিয়ানরা উত্তম মুসলমান এবং খ্রীষ্টিয়ান হন—আর উত্তম হিন্দু মুসলমান এবং খ্রীষ্টিয়ান হতে গেলে, দেশকে বাঁচাতে হলে, শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ অনুসরণ করার চেয়ে শ্রেয়তর পথ কিছু নেই।'[৮]

এককথায় ভারতীয় জীবনদর্শনের ভাবৈশ্বর্যে সম্পৃক্ত এই দুই মহামানবের জীবন-সাধনা ভারতবাসীর ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য সবকিছুর উপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যের উত্তরসূরী। তাঁদের উভয়ের ব্যক্তিত্ব ও ভূমিকা স্বতন্ত্র হলেও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবলোকে স্বাভাবিক কারণেই পূর্বগ অবতারপুরুষগণের, বিশেষতঃ কালের হিসাবে নিকটতম অগ্রজ শ্রীচৈতন্যের প্রভাব প্রচুর পরিমাণে। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ও আধ্যাত্মিক ভাবরাজ্যের সাদৃশ্যের জন্যও শ্রীরামকৃষ্ণের উপর শ্রীচৈতন্যের প্রচ্ছায়া অনেকখানি। এ সকল কারণে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবলোকে চৈতন্য-বীজ অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়ে ফুলে ফলে ভরে উঠেছে এবং তাঁর মননালোকে বিস্ফুরিত হয়েছে শ্রীচৈতন্যের অনিন্দ্যসুন্দর একটি ভাবমূর্তি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মননে মাত্র নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ও তাঁর দিনচর্যার মধ্যেও শ্রীচৈতন্য বিভাসিত।

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েই ঈশ্বরাবতাররূপে সমাদৃত। এর তাৎপর্য একটু তলিয়ে দেখতে হবে। শ্রীমদ্ভাগবতের 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' অংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে টীকাকার শ্রীধরস্বামী লিখেছেন 'কৃষ্ণ কিন্তু সাক্ষাৎ নারায়ণই, কারণ কৃষ্ণে সর্বশক্তিমত্তা প্রকট।' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণেরই পূর্ণাবতার। বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবতে' শ্রীচৈতন্যকে নারায়ণের অবতার বলে অনেকবার উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে কৃষ্ণকে বলেছেন অবতারী এবং নারায়ণকে অবতার। অর্থাৎ তাঁর মতে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন মূল-নারায়ণ—প্রসিদ্ধ চতুর্ভুজ নারায়ণ মূল-নারায়ণ নন, তিনি মূল-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের অংশ। এই মতানুসারে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দুই প্রকাশে—ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে এবং নবদ্বীপে শচীনন্দনরূপে—লীলারস আস্বাদন করেছেন। অনুরূপভাবে রামকৃষ্ণ-পুঁথিকার দাবী করেছেন। 'যাবতীয়

৬ The Religions of the World, published by Ramakrishna Mission Institute of Culture, 1938, p. 124

৭ Dr. S. Radhakrishnan : Introduction to 'The Cultural Heritage of India', Vol. I, p. 36.

৮ Vedanta Keshari, May 1947

দেবদেবী অবতারগণ। / স্থূল সূক্ষ্ম ভূতাদি ইন্দ্রিয় সহ মন ॥ /জগৎ-কারণরূপে শাস্ত্রে ব্যাখ্যা যাঁর। তিনি প্রভু রামকৃষ্ণ জননী সবার ॥' স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণও নিজমুখে বলেছেন, 'দেখছি—এর ভিতর থেকেই যা কিছু।'[৯] পণ্ডিত গৌরীকান্তও শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে শুনে বলেছিলেন, 'তুমি মানুষ নও। অবতার সকলের যা থেকে উৎপত্তি হয়, সেই বস্তু তোমার ভিতরে রয়েছে।'[১০]

পৌরাণিক যুগের জাতীয় মানসের প্রতিফলন দেখা যায় পুরাণ-সাহিত্যের মধ্যে। পুরাণ-সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুসরণ করে এই দুই মহাপুরুষের জীবনীকারগণ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে পূর্বে যিনি শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণরূপে লীলাবিলাস করেছিলেন, তিনিই বিগত পাঁচশ বছরের মধ্যে একবার শ্রীচৈতন্যরূপে, আর একবার শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। জনপ্রিয় চৈতন্যভাগবতের দৃষ্টিতে যিনি রাম, তিনিই কৃষ্ণ এবং তিনিই কৃষ্ণচৈতন্য। চৈতন্যভাগবতকার লিখেছেন, 'সর্বলোক-চূড়ামণি বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর। / লক্ষ্মীকান্ত সীতাকান্ত শ্রীগৌরসুন্দর ॥ / ত্রেতাযুগে হইয়া যে শ্রীরামলক্ষ্মণ। / নানামতে লীলা করি বধিলা রাবণ ॥ / হইয়া দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ। / নানামতে করিলেন ভূভার-খণ্ডন ॥ /মুকুন্দ অনন্ত যারে সর্ববেদে কহে। /শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ সেই সুনিশ্চয়ে ॥' শ্রীচৈতন্যও একদিন ভাবাবেশে বলেছিলেন, 'মুঞি কলিযুগে কৃষ্ণ, মুঞি নারায়ণ। মুঞি রামরূপে কৈনু সাগর বন্ধন ॥' প্রকারান্তরে শ্রীরামকৃষ্ণও একথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ঈশ্বর নরলীলা করেন। মানুষে তিনি অবতীর্ণ হন, যেমন শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, চৈতন্যদেব।'

অনুরূপভাবে দেখি জনপ্রিয় রামকৃষ্ণকথামৃত একটি চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। কথামৃতকার লিখেছেন, 'কাশীপুর উদ্যানে ঠাকুর যখন ক্যানসার রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছেন, ভাতের তরল মণ্ড পর্যন্ত গলাধঃকরণ হইতেছে না, তখন একদিন নরেন্দ্র ঠাকুরের নিকট বসিয়া ভাবিতেছেন, এই যন্ত্রণামধ্যে যদি বলেন যে, আমি সেই ঈশ্বরের অবতার, তাহলে বিশ্বাস হয়। চকিতের মধ্যে ঠাকুর বলিতেছেন, "যে রাম, যে কৃষ্ণ, ইদানীং সেই রামকৃষ্ণরূপে ভক্তের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।"' লীলাপ্রসঙ্গকারও লিখছেন, 'পূর্ব পূর্ব যুগে যিনি শ্রীরাম এবং শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া লোককল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন, তিনিই বর্তমানকালে পুনরায় শরীর পরিগ্রহপূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।'[১১]

আসিসির সন্ত ফ্রান্সিসের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করতে গিয়ে জি. কে. চেস্টারটন তিনটি সম্ভাব্য পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। প্রথম পদ্ধতি, আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সন্তের নিসর্গ-প্রীতি, পশুপ্রীতি, সামাজিক উন্নতির পরিকল্পনা ইত্যাদির আলোচনা; দ্বিতীয় পদ্ধতি, সন্তের ভক্তশিষ্য ও অনুরাগিগণ কর্তৃক তাদের ভক্তি-বিশ্বাসের নিরিখে সন্তের দেবমানব জীবন ও অলৌকিক কার্যকলাপের আলোচনা এবং তৃতীয় পদ্ধতি, ঐতিহাসিক ও মনস্তত্ত্ববিদের দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যযুগের ভাবধারা সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করে সেই পটভূমিতে সন্তের জীবনালেখ্য পরিবেশন করা। অল্পবিস্তর এই তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করেই শ্রীচৈতন্যের অনেক জীবনী রচিত হয়েছে। এর অতিরিক্ত চতুর্থ একটি পন্থা অনুসরণ করেও শ্রীচৈতন্যের জীবন ও বাণীর রসাস্বাদন

৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।২৪।৩

১০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, (১৩৮৯), ২ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৯

১১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২ খণ্ড, পৃঃ ৩০৫

করা সম্ভব। এই পন্থাটি হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে উদ্ভাসিত শ্রীচৈতন্যের ভাবমূর্তির আলোচনা।

* * *

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব সমপর্যায়ের। উভয়ের ব্যক্তিত্বে সমজাতীয় ভাব, ভাষা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও দুর্বার জীবনীশক্তি। উভয়েই ঈশাবতাররূপে সমাদৃত। উভয়েরই জীবন ও 'মিশন' অনেকাংশে সমজাতীয়। শ্রীচৈতন্য বলতেন, 'প্রভু কহে দুগ্ধে ঘৃত আছে গুপ্তভাবে।/ সে পাবে আস্বাদ তার যে-জন মথিবে॥'[১২] শ্রীরামকৃষ্ণ চৈতন্যসুধা আহরণ করে আস্বাদন করেছিলেন। তাছাড়াও অপর একটি বিষয় লক্ষ্য করবার মতো। 'ভাবমুখ' আশ্রয়কারী শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন, 'ঠাকুর ঐ বিশ্বব্যাপী "আমিকে" আশ্রয় করিয়া অনুক্ষণ থাকিতে পারিতেন বলিয়াই বিশ্বমনে যত ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে, সকলই ধরিতে ও বুঝিতে সক্ষম হইতেন।'[১৩] এ-কারণে চৈতন্যলীলার সবকিছু ভাবতরঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতির পর্দায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সার্বিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, রামকৃষ্ণদর্পণে প্রতিবিম্বিত শ্রীচৈতন্যের ভাবমূর্তি অপূর্ব সুন্দর এবং সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। বলা বাহুল্য, এই চতুর্থ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত শ্রীচৈতন্যের জীবনালেখ্যের সাহিত্যরস সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের। একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক। 'হরিনাম মূর্তি' শ্রীচৈতন্য জীবকে প্রেম শিক্ষা দিয়েছিলেন, জনসমাজে হরিনামের প্লাবন বইয়ে দিয়েছিলেন। 'চির-উন্মাদ প্রেম-পাথার' শ্রীরামকৃষ্ণ যুক্তিবাদী বিজ্ঞান-সচেতন আধুনিক মানুষকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রেমধর্ম শেখালেন। সমকালীন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ধারণা হয়েছিল যে শ্রদ্ধায় অশ্রদ্ধায় যে-কোন ভাবেই হোক নাম করলেই হয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, তাও কি হয়? তোতাপাখীকে নাম শেখালে সে নামগান করতে থাকে, কিন্তু তাতে তার অগ্রগতি হয় কি? শ্রীরামকৃষ্ণ শেখালেন, 'নামের খুব মাহাত্ম্য আছে বটে। তবে অনুরাগ না থাকলে কি হয়? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া দরকার।' চরিতামৃতকারও বলেছেন, 'যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে।'

আমাদের প্রস্তাবিত পদ্ধতি আলোচনা করার পূর্বেই স্মরণ করা যেতে পারে যে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনাকারীদের মধ্যে কথামৃতকারই কতকটা যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই শ্রীচৈতন্যের জীবনালোকে উপস্থাপিত করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। কথামৃতের নিবিষ্ট পাঠকমাত্রই লক্ষ্য করবেন যে কথামৃতকার শ্রীচৈতন্যের জীবন ও ভাবধারার সঙ্গে সুপরিচিত বাঙালী পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। আমরা বিপরীতমুখে আধুনিক শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে শ্রীচৈতন্যলীলা আস্বাদনের চেষ্টা করব।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ভাবে অভিষিঞ্চিত বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে এবং লালিত-পালিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বভাবতই শ্রীচৈতন্যকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতেন। কিন্তু তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ মনে শ্রীচৈতন্য শুধু একজন মহাপুরুষরূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন, তদতিরিক্ত কিছু নন। অবশ্য, অনুসন্ধিৎসু শ্রীরামকৃষ্ণের চেতনালোকে শ্রীচৈতন্যের ভাবমূর্তিখানি ক্রমে বিবর্তিত হতে থাকে। ক্রম-বিবর্তনের সে-কাহিনী বিচিত্র। প্রথম জীবনে

১২ গোবিন্দদাসের কড়চা—সত্যেন্দ্রনাথের গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিত ও বাণী', পৃঃ ১১৮-তে উদ্ধৃত।

১৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৭

শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব সম্বন্ধে স্বাধীনচেতা মননশীল শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল সন্দেহ ও সংশয়। এবং সত্যবাক্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরবর্তিকালে শিক্ষিত তরুণদের কাছে নিজের পূর্বেকার মনোভাব ব্যক্ত করে বলেছিলেন, 'আমারও তখন তখন ঐ রকম মনে হত রে, ভাবতুম পুরাণ ভাগবত কোথাও কোন নামগন্ধ নেই—চৈতন্য আবার অবতার! ন্যাড়া-নেড়ীরা টেনে-বুনে একটা বানিয়েছে আর কি! কিছুতেই ওকথা বিশ্বাস হত না।'

বৈজ্ঞানিক মানসিকতা নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দিনচর্যা। তাই মনের সংশয় নিরাকরণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কিছুতেই শান্ত হতে পারতেন না। তিনি তাঁর পরিশীলিত ও জিজ্ঞাসু মন নিয়ে শ্রীচৈতন্যের লীলাভূমি নবদ্বীপে গেলেন সত্য নির্ণয়ের জন্য। পরবর্তিকালে তিনি তাঁর এই অনুসন্ধানের ফলাফল সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'মথুরের সঙ্গে নবদ্বীপ গেলুম। ভাবলুম, যদি অবতারই হয় তো সেখানে কিছু না কিছু প্রকাশ থাকবে, দেখলে বুঝতে পারব। একটু প্রকাশ দেখবার জন্য এখানে, ওখানে, বড় গোঁসাইয়ের বাড়ী, ছোট গোঁসাইয়ের বাড়ী, ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখে বেড়ালুম—কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না! সব জায়গাতেই এক এক কাঠের মুরদ হাত তুলে খাড়া হয়ে রয়েছে দেখলুম! দেখে প্রাণটা খারাপ হয়ে গেল, ভাবলুম, কেনই বা এখানে এলুম। তারপর, ফিরে আসব বলে নৌকায় উঠছি এমন সময় দেখতে পেলুম। অদ্ভুত দর্শন! দুটি সুন্দর ছেলে—এমন রূপ কখনও দেখিনি, তপ্ত কাঞ্চনের মতো রং, কিশোর বয়স, মাথায় একটা করে জ্যোতির মণ্ডল, হাত তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে আকাশ-পথ দিয়ে ছুটে আসচে। অমনি "ঐ এলো রে, এলো রে" বলে চেঁচিয়ে উঠলুম। ঐ কথাগুলি বলতে না বলতে তারা নিকটে এসে (নিজের শরীর দেখিয়ে) এর ভেতর ঢুকে গেল, আর বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম! জলেই পড়তুম, হৃদে নিকটে ছিল, ধরে ফেলে।' শ্রীরামকৃষ্ণের এই অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত হয় যে শ্রীচৈতন্যের ঐতিহাসিক জন্মভূমি ও বাল্য-লীলাভূমি সে-সময়ে গঙ্গাগর্ভে লীন হয়ে গিয়ে-ছিল। ইদানীংকালের গবেষণালব্ধ তথ্যাদিও এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে।

শুধুমাত্র এই একটি অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেই নয়, বিবিধ বিচিত্র অভিজ্ঞতার নিরিখে বিচার করে শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বেকার ধারণার পরিবর্তন ঘটে। শেষপর্যন্ত তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করেন যে শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরাবতার। তিনি স্বমুখে বলেছিলেন, 'এই রকম এই রকম ঢের সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে—বাস্তবিকই অবতার, ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ।'

[ক্রমশঃ]

আত্মা যে সকলেরই প্রেমাস্পদ তাহা শ্রুতি, স্মৃতি, প্রত্যক্ষ সর্বপ্রকার প্রমাণ দ্বারাই জানা যাইতেছে। এই জন্যই ভগবান্ শ্রীচৈতন্য যে ঈশ্বরে প্রেম ও জীবে দয়া করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিযুক্ত। দ্বৈতবাদী ছিলেন বলিয়া তাঁহার এই সিদ্ধান্ত—যাহা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সূচনা করে—তাহা সমীচীনই হইয়াছে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

সোভিয়েত রাশিয়ায় কয়েকদিন

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

অ্যান্ড্রুকে জিজ্ঞাসা করলাম 'বলশয়' কথার অর্থ কি। অ্যান্ড্রু বললে 'বড়'। সত্যিই বলশয় থিয়েটার যে কত বড়, তা না দেখলে ধারণা করা যায় না। আর কি তার ঐশ্বর্য! আমি যেদিন গিয়েছিলাম, সেদিন প্লিসেটস্কায়া (Plisetskaya) অভিনয় করছিলেন। ইনি এখন রাশিয়ার সবচেয়ে বড় ব্যালেরিনা। ইনি যখনই স্টেজে নামেন, তখনই হল ভর্তি হয়ে যায়। এঁর বয়স এখন ৬২, কিন্তু দেখলে মনে হবে ২০/২২। অভিনয় দেড় ঘণ্টা ধরে দেখলাম, কিন্তু সত্যি বলতে কি, বিশেষ কিছু বুঝতে পারলাম না। গানের অংশ ভাল লাগছিল; কিন্তু অভিনয় বা নৃত্য এমন কিছু লাগছিল না। নৃত্য মানে পায়ের আঙুলের উপর দাঁড়িয়ে ঘুরপাক খাওয়া; না হলে চারিদিকে পা ছোঁড়া। এ আবার কোন দেশী নৃত্য! কিন্তু এ দেখেই দর্শকরা মুহুর্মুহুঃ হাততালি দিচ্ছেন। মাঝে মাঝে আবার যিনি নায়ক, তিনি নায়িকার কোমর ধরে শূন্যে তুলে ঘুরপাক খাচ্ছেন। তিনি কতটা বলবান, আর নায়িকা কতটা হাল্কা, তাই কি দেখাচ্ছেন? এর মধ্যে শিল্পকলা কোথায় আছে? আমি একেবারে আনাড়ি, হয়তো এই ধরনের অভিনয় প্রথম দেখ'ছি বলেই কিছু বুঝতে পারলাম না। তবে দর্শকরা যে অভিনয় দেখে মুগ্ধ, তা বুঝলাম হাততালির বহর দেখে। হাততালি আর ফুল। এক-এক দৃশ্য শেষ হয় আর হাততালি চলতে থাকে। হাততালি চলতে থাকলে নিয়ম হচ্ছে নায়ক বা নায়িকা, যিনি প্রধান আকর্ষণ, তিনি পর্দার সামনে এসে এই অভিনন্দন গ্রহণ করবেন এবং বার বার কুর্নিশ করবেন। হয়তো কয়েকবার তাঁকে এভাবে আসতে হবে। দর্শকরা যেমন হাততালি দেন, তেমনি ফুল উপহার পাঠান। বড় বড় ফুলের মালা বা তোড়া, তার সঙ্গে হয়তো যাঁরা পাঠাচ্ছেন, তাঁদের নামও লিখে পাঠাচ্ছেন। এঁরা সম্ভবত আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে আসেন ফুলটুল নিয়ে।

তারপর দিন ওরা আমাকে নিয়ে গেল এক সঙ্গীত-শিল্পীর কাছে। নাম জানা বিচেভস্কায়া। জানা রাশিয়ার একজন খ্যাতনামা সঙ্গীত-শিল্পী। লোক-সঙ্গীতে তিনি অদ্বিতীয়া। বাজারে তাঁর রেকর্ড পাওয়া কঠিন, কারণ বেরোবার সঙ্গে-সঙ্গে বিক্রি হয়ে যায়—এমন চাহিদা। তিনি যেমন ভাল গান করেন, তাঁর স্বামী ভ্যালেন্টিনও (Valentin) তেমন নানা রকমের যন্ত্র বাজান তাঁর গানের সঙ্গে সঙ্গে। জানা শুধু লোক-সঙ্গীত গান না, লোক-সঙ্গীত নিয়ে অনেক গবেষণাও করেন। অনেক পুরানো লোক-সঙ্গীত তিনি উদ্ধার করেছেন। বহু পুরানো গান, রাশিয়ার দূর দূর প্রান্তরের গান, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের গান—এসব তিনি সংগ্রহ করেছেন এবং লোককে শোনাচ্ছেন। যেমন তাঁর গলার জোর, তেমনি গলার কাজ। কি করে জানি না, তিনি শুনেছেন ভারত থেকে একজন সন্ন্যাসী এসেছেন, তাই তাঁর বড্ড ইচ্ছা তাঁকে দেখেন। তখন জানতাম না ভারতকে এবং ভারতের ধর্মকে তিনি কতটা ভালবাসেন। ভারতের হিমালয় ও গঙ্গা দেখার জন্যে তাঁর প্রাণ ছটফট করে। তাঁর সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, সুতরাং আমার বন্ধুরা বললেন—'আপনি যদি একবার জানার কাছে যান, খুব ভাল হয়,' আমি অনিচ্ছার সঙ্গে যেতে রাজী হলাম। কিন্তু জানাদের বাড়ি গিয়ে কি আনন্দ পেয়েছিলাম, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। জানার

ব্যবহার পাঁচ বছরের মেয়ের মতো। আমাকে পেয়ে তিনি যে কি করবেন ঠিক করতে পারছেন না। কি আনন্দ তাঁর! তিনি ইংরেজী জানেন না, কিন্তু ভাষা কোন অন্তরায় হল না। তাঁর চোখ-মুখ ভাষার কাজ করছে। তাঁর স্বামীরও তাই। অত উচ্ছ্বাস নেই, কিন্তু আমাকে পেয়ে যে কৃতার্থ তা বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছেন। চায়ের টেবিলে নিয়ে গেলেন, থরে-থরে সাজানো কতরকমের খাবার। মাংস থেকে আরম্ভ করে সব আছে। পানীয়ও তাই। আমি চা আর কেক খেলাম। খাব কি করে, কথাই বলে চলেছি। টেবিলে জানাদের (Zhanna-র উচ্চারণ অনেকটা 'ৎসান্না'র মতো) বন্ধু দু-তিনজন ছিলেন। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁদের অনেক প্রশ্ন। উত্তর দিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে ভ্যালেন্টিনও প্রশ্ন করছেন। জানা সকলের খাওয়ার তদারকি করছেন। এর মধ্যে ভ্যালেন্টিন হঠাৎ কি এক জানোয়ারকে কোলে করে নিয়ে উপস্থিত। ছোট্ট ভালুকের বাচ্চার মতো দেখতে। সাধারণতঃ গাছে থাকে। যতদূর মনে পড়ছে, জানোয়ারটিকে লরিস্ (Loris) বলে। ওরা থাইল্যাণ্ড থেকে ওটিকে এনেছেন। সব সময় কোলে-পিঠে করে রাখেন। ভ্যালেন্টিন বল্লেন—'আমাদের সন্তান।' ওঁদের কোন সন্তান নেই।

চা খাবার পর জানা রেকর্ড চালিয়ে তাঁর গান শোনালেন। দু-একটা গান ঠিক আমাদের পল্লী-গীতির মতো। আমি একথা বললাম এবং এও বললাম যে সব দেশের পল্লী-গীতির মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে জানা আমাকে বললেন যে, একজন আমেরিকান—প্রথম নাম পিটার—জন্তু-জানোয়ারেরাও গান গায়, এটা প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন। তিনি তাদের গানের রেকর্ড তুলেছেন এবং ঐসব রেকর্ডে তাদের গানের সঙ্গে নাকি মানুষের গানের অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়। আমি বললাম—'শুনেছি ডল্‌ফিন্‌রা নাকি মানুষের গলার নকল করতে পারে, শুনলে মনে হবে তারা যেন ভ্যাঙ্‌চাচ্ছে।' জানা বললেন—'পিটার, তিমি মাছ ও নেকড়ে বাঘের গলার রেকর্ড করেছে যা ঠিক মানুষের মতো।' আমি বললাম—'আমাদের দেশের নেকড়ে (লক্কড়) বাঘের ডাক রাত্রে শুনেছি, ঠিক যেন চীৎকার করে কেউ হাসছে, কিন্তু সেই হাসি শুনলে ভয়ে রক্ত জম'ট বেঁধে যাবে।'

এবার বিদায় নেবার পালা। জানাকে বললাম—'তুমি একবার ভারতবর্ষে এস।' জানা বিমর্ষ হয়ে গেলেন। বললেন—'তুমি আর আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না।' এটা ইংরেজীতে বললে আমরা বলি—'Do not add insult to an injury'. কিন্তু অ্যাণ্ড্রু এর ইংরেজী করে বললে—'Do not put salt into my wound'। আমি চমকে উঠলাম। অ্যাণ্ড্রুকে জিজ্ঞাসা করলাম, জানা রাশিয়ান ভাষায় যা বলেছেন, ও ইংরেজীতে ঠিক তার আক্ষরিক অনুবাদ করে বলেছে কিনা। অ্যাণ্ড্রু বললে—'হ্যাঁ'। ওদের প্রকাশভঙ্গীর সাথে আমাদের প্রকাশভঙ্গীর মিল দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ঐখানে এও আবিষ্কার করলাম—আগুনকে ওরা 'আগুন'ই বলে। জানা ভারতবর্ষকে ভালবাসেন, তাঁর চিরকালের স্বপ্ন হিমালয় ও গঙ্গাকে দেখবেন। তা দেখতে পাচ্ছেন না বলে আমাকে বলেছিলেন—'আমার কাটা ঘায়ে তুমি আর নুনের ছিটে দিও না।' জানাকে বললাম—'তোমার একখানা রেকর্ড আমাকে দাও।' তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনখানা রেকর্ড দিলেন। আমি বললাম—'তোমার নাম সই করে দাও।' তিনি নাম সই করে দিলেন। তাঁর স্বামীকেও বললাম নাম সই করে দিতে। তিনি অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই কাগজে দাগ পড়ল না। জানা

করে রেকর্ডটা ওঁর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বললেন—'বেশ হয়েছে, আমার রেকর্ডে ওর নাম নাই থাকবে কেন?' তারপর ওঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললেন—'না, না, আমার সব কিছুতেই ওর অনেক অবদান।'

তারপর দিন (৩০. ১০. ৮৪) দুপুরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল Institute of Ethnography-তে। নৃ-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠান। সেখানেও প্রচুর সমাদর পেলাম। ওঁদের অধ্যক্ষ এসে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং পরে একটা ঘরে নিয়ে বসালেন। তাঁর সহকর্মীরা সেখানে এসে একে-একে জুটলেন। এঁরা সবাই ভারতের বিভিন্ন আদিম জাতি সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করেছেন। অধ্যক্ষ স্বয়ং চীনে বহুদিন কাটিয়েছেন, চীনা-ভাষা জানেন এবং চীনের বিভিন্ন আদিম জাতি সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেছেন। ভারতের আদিম জাতি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে করতে যাযাবর জাতিদের কথা উঠল। আমি মেদিনীপুরের লোধাদের কথা বললাম। তারা কোন জায়গায় স্থায়িভাবে বসবাস করতে চায় না। সরকার থেকে তাদের বাড়ি করে দেওয়া হয়, চাষের জমি দেওয়া হয়, তারা পশুপক্ষী পালন করে; সেজন্য তাদের হয় অর্থ দেওয়া হয়, না হয় গরু, ছাগল, মুরগী ইত্যাদি কিনে দেওয়া হয়; কিন্তু কোন চেষ্টাই এখনও পর্যন্ত সফল হয়নি। তারা ভবঘুরে হয়ে থাকতে ভালবাসে। তারা সাধারণতঃ গ্রামের বা শহরের বাইরে কোন মাঠে ছাউনি ফেলে থাকে, স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে জিনিস কেনাবেচা করে, তারপর একদিন উধাও হয়ে যায়। কোথা থেকে আসে, কোথায় যায় কেউ বলতে পারে না। গ্রামে কারোর কিছু চুরি গেলে লোকে তখন তাদেরই সন্দেহ করে। বস্তুতঃ পুলিশের খাতায় তাদের সমস্ত জাতটাই দাগী আসামী হয়ে আছে, অর্থাৎ তাদের বলা হয় ক্রিমিন্যাল ট্রাইব (Criminal Tribe)। আশ্চর্য এই যে, এই প্রতিষ্ঠানের অনেক বিজ্ঞানী লোধাদের কথা ভালভাবেই জানেন। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা সাঁওতালদের সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশুনো করেছেন। তিনি সাঁওতালদের গ্রামে থেকেছেন এবং তাদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করেছেন। আমি যখন বললাম, সাঁওতালরা ধীর-স্থির, তাদের সমাজ-বন্ধন দৃঢ়, জীবনযাত্রা সুসংহত, তিনি আমার সঙ্গে একমত হলেন। তিনি শান্তিনিকেতনে গেছেন এবং থেকেছেন, শ্রীনিকেতনে যে কর্মকাণ্ড চলেছে, তাও দেখেছেন। তিনি বললেন—'আমি লক্ষ্য করেছি ঐ অঞ্চলের সাঁওতালরা বেশ উন্নত, কিন্তু তবু তারা বাঙালীদের সঙ্গে একেবারে মিশে যায়নি, তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছে।' আমি বললাম—'তাতে কিছু দোষ নেই, তারা একেবারে বাঙালী হয়ে যায়, এও বাঞ্ছনীয় নয়।' তিনি মন্তব্য করলেন—'তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করুক আপত্তি নেই, কিন্তু তারা যদি সমাজ-বন্ধন একটু শিথিল না করে, তাহলে তাদের অগ্রগতি ব্যাহত হবে। অগ্রগতির জন্যে একটা মুক্ত সমাজ চাই।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বাঙালী ও সাঁওতালের মধ্যে বিবাহ হয়েছে, এমন নজির আছে কিনা। আমি বললাম—'হ্যাঁ, আছে, অন্ততঃ একটা নজিরের কথা আমার জানা আছে।' তিনি তাদের পরিচয় জানতে চাইলেন, আমি বললাম। আমি বললাম—'কোন কিছু গোপনে হয়নি, সামাজিক রীতিনীতি মেনেই এটা হয়েছে। সমস্ত সাঁওতাল সমাজ এই বিবাহকে স্বাগত করেছে। বাঙালী মেয়েটি বহুদিন থেকে সাঁওতালদের মধ্যে কাজ করছিল। আগে থেকেই সে খুব জনপ্রিয় ছিল। সুতরাং সাঁওতাল সমাজের যাঁরা প্রধান, তাঁরা এই বিবাহ একটা ঐতিহাসিক ব্যতিক্রম হলেও সানন্দে এতে সম্মতি দিয়েছেন।'

কথায় কথায় জিপ্‌সিদের কথা উঠল। এই প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা বললেন, সরকার থেকে বহু চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু তবু তাদের এক জায়গায় ধরে রাখা যাচ্ছে না। তাদের জীবনযাত্রাও বদলাচ্ছে না। তারা আগের মতোই চুরি করে, গণৎকারের কাজ করে, ওষুধ বা মাদুলি বিক্রি করে, গান গায়, নাচে আর ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়। তাদের মধ্যে সংক্রামক অসুখ মাঝে মাঝে দেখা দেয়, সেজন্যে টীকা নিতে তাদের বলা হত, কিন্তু তারা নিত না। এখন অবশ্য সরকার তাদের টীকা নিতে বাধ্য করেন। যখন এইসব কথা হচ্ছে তখন তাঁদের মধ্য থেকে একজন অধ্যাপিকা বললেন—'তবে একটি জিপ সি মেয়েকে আমরা এতদিন পরে সমাজভুক্ত করতে পেরেছি।' আমি বললাম—'কি রকম?' তখন তিনি বললেন—'এই মেয়েটি এখন আমাদের এখানেই আছে, সেও কিছু-কিছু গবেষণার কাজ করছে, আর আমাদের একজন গবেষকের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে। সে জিপ্‌সিদের কাছ থেকে একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।' আমি বললাম—'তাকে একটু দেখাতে পারেন? আমি শুনেছি জিপ্‌সিরা নাকি ভারত থেকে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা দেখতে কি রকম আমার দেখতে খুব ইচ্ছা করে।' তাঁরা বললেন—'সে এখন অফিসে আছে কিনা জানি না, যদি থাকে দেখাতে চেষ্টা করব।' এরপর হিন্দুদের মধ্যে মূর্তিপূজার কথা উঠল। যে-মহিলা সাঁওতালদের সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেছেন তিনি বললেন—'যে-সব হিন্দু অনুন্নত এবং অশিক্ষিত, তারাই মূর্তিপূজা করে।' শুনে চমকে উঠলাম। অতি পরিচিত কথা। কতদিন থেকে হিন্দুরা এই অপবাদ শুনে আসছে। কিন্তু এখানেও, এইসব পণ্ডিতদের মুখেও শুনতে হবে আশা করিনি। নিশ্চয়ই কেউ এই মহিলাকে মূর্তিপূজার অপব্যাখ্যা শুনিয়েছেন এবং তিনি ভারতীয়ই হবেন। যাহোক আমার যথাসাধ্য তাঁকে বুঝিয়ে বললাম, কেউ মূর্তির পূজা করে না, পূজা করে ঈশ্বরেরই, কিন্তু নিরাকার ঈশ্বরকে ধারণা করতে পারা যায় না বলে একটা প্রতীকের সাহায্য নিতে হয়। প্রতীক ঈশ্বর নয়, যেমন ফটো মানুষ নয়, তবু ফটো দেখলে মানুষটির কথা মনে পড়ে। দু-চারটি প্রশ্নের পর মহিলা চুপ করে গেলেন, মনে হয় বুঝলেন।

এতসব কথার পর যখন চলে আসছি তখন হঠাৎ কে একজন প্রায় টানতে টানতে একটি মেয়েকে আমার সামনে এনে হাজির করে বললেন—'এই নিন আপনার দেশের একটি মেয়েকে, এরই কথা বলছিলাম, এই সেই জিপ্‌সি মেয়ে।' মেয়েটি খুব হাসছে, বোধহয় খুব লজ্জাও পাচ্ছে যে, সে এভাবে একটা দর্শনীয় বস্তু হয়েছে। সবাই বলতে লাগলেন—'দেখুন, ঠিক আপনাদের দেশের মেয়েদের মতো কালো চোখ ও কালো চুল। গায়ের রংও প্রায় আপনাদের মেয়েদের মতো।' কালো চোখ ও কালো চুল ঠিকই, গায়ের রং ফর্সা হলেও একটু লালচে আভা আছে। তাকে অনায়াসে কাশ্মীরী ও পাঞ্জাবী মেয়ে বলে চালানো যায়। একজন বললেন, তার নামও ভারতীয়—'আশা'। মেয়েটিকে বললাম—'চল, দেশে ফিরে চল। অনেকদিন বিদেশে আছ, এবার দেশে চল।' সে খুব হাসতে লাগল, জবাব দিল না।

সেদিন বিকেলে আমার অ্যাকাডেমী অব্ সায়েন্সেস্-এর ইনস্টিটিউট্ অব্ মলিকুলার জেনেটিক্সে বক্তৃতা দেওয়ার কথা। মক্‌লস্কি এখানকার প্রধান। নিয়ে গেলেন আমাকে। বক্তৃতার বিষয়বস্তু রামকৃষ্ণ-আন্দোলন। বক্তৃতার পরে চলল প্রশ্নোত্তর। আমার মনে পড়ে না

আমাদের দেশের কোন বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানে এত সমাদর পেয়েছি অথবা ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে এতটা কৌতূহল দেখেছি।

বুলগেরিয়া থেকে ফেরার পর আমি হোটেল ইউক্রেরিয়াতে ছিলাম। এই হোটেলটা পুরনো হোটেল। ১০০ বছর হবে। হোটেল রোশিয়া সবচেয়ে ভাল হোটেল। সেটার তুলনায় এটা নিচু মানের। তাছাড়া এখানে আরও নানারকম অসুবিধে হচ্ছিল। একদিনের কথা বলি। রাত বারটা। ঘুমোচ্ছি। হঠাৎ দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে—India, India? আমি ভাবলাম, কি হল? ইন্‌স্টিটিউট থেকে কোন খবর এসেছে নাকি? আমি ভেতর থেকে 'yes' বলে দরজা খুলছি। দরজা খুলতে সময় লাগল—কারণ, দরজায় একটা প্রকাণ্ড চাবি, কোনমতে ভেতর থেকে ঘুরিয়ে দরজাটা বন্ধ করে রেখেছিলাম; সেটা ঘুরিয়ে দরজা খোলা বেশ কষ্ট। যাই হোক, খুললাম। খুলে দেখলাম—একটা লোক, চীন কিংবা কোরিয়ার। জিজ্ঞেস করল—India? আমি বললাম—yes, I am from India. তারপর সে 'sorry' বলে চলে গেল। কি ব্যাপার কিছুই বুঝলাম না। শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরে শুনি, ফোন বাজছে। ধরলাম। একটি মেয়ে রাশিয়ান ভাষায় কি বলছে! আমি বললাম—ইংরেজীতে বল, আমি রাশিয়ান বুঝি না। বোধ হয় ইংরেজী জানে না, বলেই যাচ্ছে। আমি টেলিফোনটা রেখে দিলাম। কিছুক্ষণ বাদে আবার ফোন, আবার সেই গলা। আমি বললাম—আমি শুধু ইংরেজী জানি, ইংরেজীতে বল। তখন একজন পুরুষ ইংরেজীতে বলছে—What do you want? আমি বললাম—I don't want anything, you rang me. তখন বলছে—sorry, wrong number. আমি মনে মনে ভাবলাম—এখানেও তাহলে ভুল নম্বরে টেলিফোন চলে গেছে। পরদিন মীরা আমার কাছে এসব শুনে বলল—মহারাজ, আপনার এখানে থাকা চলবে না, অন্য হোটেল দেখতে হবে।

৩০ তারিখে ইনস্টিটিউট্ অব্ মলিক্যুলার জেনেটিক্সে বক্তৃতা দেওয়ার পর আমাকে আবার হোটেল রোশিয়াতে নিয়ে যাওয়া হল।

৩১ অক্টোবর আমার লেনিনগ্রাড যাবার কথা। রাত এগারোটায় ট্রেন। তার আগে সন্ধ্যাবেলা International House of Friendship-এ বক্তৃতা করবার কথা। আবার অ্যাণ্ড্রুকে জানা বিশেষভাবে বলে রেখেছে, আমি যেন রাত্রে তাদের বাড়িতে খেয়ে তারপর ট্রেন ধরি। কিন্তু তার আগেই অনেক কিছু ঘটে গেল।

দশটা বেজে কুড়ি মিনিট। অ্যাণ্ড্রু এসে বললে—'মহারাজ, খুব খারাপ খবর। মিসেস গান্ধী তাঁর দেহরক্ষীদের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, অবস্থা আশঙ্কাজনক।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'তুমি কোথা থেকে খবর পেলে?' সে বললে—'আপনি মীরাকে ফোন করুন। মীরাই সব বলবে।' মীরার কাছে জানলাম, সে বি. বি. সি. থেকে খবর পেয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম—'উনি বেঁচে আছেন তো?' বলল—'অবস্থা খুব খারাপ।' আমার এখন মনে হয় যে, মীরা তখনই জানত ইন্দিরা গান্ধী বেঁচে নেই, কিন্তু আমাকে তা বলতে চাইল না। কি করি, ছট্‌ফট্ করছি, কিছুই ভাল লাগছে না। দেখতে দেখতে বারোটা বেজে গেল। তখন ভারতীয় দূতাবাসে ফোন করলাম। ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী মিঃ মাধবনের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। মিঃ মাধবন বললেন—'সব শেষ হয়ে গেছে, প্রধানমন্ত্রী আর নেই।' পরে মীরা এসেও একই কথা জানাল।

মিঃ মাধবন পরে হোটেলে আমার কাছে এলেন। তখন আমাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ওদেশে ছিলেন। মাধবনের কাছে শুনলাম, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ দেশে ফিরে যাচ্ছেন, উনিও তাঁর সাথে যাচ্ছেন। আমি মীরাকে বললাম, আজ আমি আর বক্তৃতা করতে পারব না। House of Friendship-এ তুমি এটা জানিয়ে দাও। মাধবন অবশ্য আমাকে বলেছিলেন বক্তৃতাটা করতে, কিন্তু আমি আর আমার সিদ্ধান্ত পাল্টালাম না। পরে শুনেছি, অনেকে সেদিন House of Friendship-এ উপস্থিত হয়েছিলেন, বক্তৃতা-সভা শোক-সভায় পরিণত হয়েছিল।

মীরা জানাল রাশিয়ার সমস্ত সরকারী দপ্তর বন্ধ হয়ে গেছে, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত হয়ে আছে। নানা জায়গা থেকে আমার কাছে ঘন ঘন ফোন আসতে লাগল—সবাই ভারতের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছেন।

রাত এগারোটায় আমার লেনিনগ্রাড রওনা হবার কথা। তার আগে যেতে হবে জানার বাড়িতে। পথে কত লোক আমার কাছে এসে বলছে—India? Very sorry, একজন ভদ্রলোক রাশিয়ান ভাষায় অনেকক্ষণ কি বলে গেলেন। শুধু দুটি পরিচিত শব্দ শুনলাম—'জওহরলাল নেহরু' ও 'ইন্দিরা গান্ধী'। কি বললেন জানি না, কিন্তু বুঝতে পারলাম, শোক প্রকাশ করছেন। [ক্রমশঃ]

আকুতি

শ্রীরামজীবন আচার্য

কি এক সুষুপ্তি ঘোরে সমাচ্ছন্ন বিশ্বলোক, রামকৃষ্ণ
তারে তুমি জাগাইবে কবে।
তোমার সাধনা বুঝি চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যায়, গদাধর
তারে তুমি কবে বা রাখিবে।
তব কথামৃতরাশি বাস্তবের হলাহলে
নিঃশেষিত হয় পলে পলে
অবিশ্বাসতমো মাঝে এখনো তোমার প্রতি
বিশ্বাসের দীপশিখা জ্বলে,
এই বুঝি নিভে যায় মোহঘূর্ণী-ঝড়ের দাপটে
তারে তুমি বাঁচাবে কী বলে।
তুমি ছিলে তুমি আছো, তুমি রবে জগতের কাছে
যুগ যুগ ধরি
এ বিশ্বাস নিয়ে থাকি গোপন হৃদয়তলে
তারে তুমি নিয়ো নাকো হরি।

কথামৃতে না-বলা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ

ডক্টর জলধিকুমার সরকার

পাঁচ ভাগে বিভক্ত কথামৃতের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মিলন একটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ উপভোগ্য অধ্যায়। অসাধারণ পণ্ডিতের সত্ত্বগুণাধার মনকে ভগবন্মুখী করার প্রচেষ্টার মধ্যে মধ্যে হাস্য-বিচ্ছুরিত কথার আদান-প্রদান পাঠককে আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত করে। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা মাস্টার মহাশয় বা মাস্টার বা শ্রীম, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আরও বই বা পত্রিকায় লিখে গেছেন। তার মধ্যে একখানি হচ্ছে শ্রীম-লিখিত 'গসপেল অফ শ্রীরামকৃষ্ণ'। তা থেকে জানা যায় যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগরের কথোপকথনের পরিধি, কথামৃতে যা পাওয়া যায় তা থেকে আরও বিস্তৃত ছিল। কিন্তু সেই বিষয়ে আসতে গেলে একটু ভূমিকা দিলে পাঠকের বোঝবার সুবিধা হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেহ রাখেন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। শ্রীম ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দুখানি ছোট পুস্তিকা বা 'প্যাম্ফলেট' প্রকাশ করেন, যে দুটি ওই বৎসরেই শ্রীশ্রীমার ও স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহবাণী ও অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে। এই প্যাম্ফলেট দুটিতে যথাক্রমে—প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সহিত এবং শশধর তর্কচূড়ামণির সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের যে-সকল আলোচনা হয়েছিল, প্রধানতঃ তারই বর্ণনা ছিল[১]। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'তত্ত্ব-মঞ্জরী' পত্রিকার মাধ্যমে ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত মাস্টার মহাশয়কে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ বাংলায় লিখতে অনুরোধ করলে[২] মাস্টার মহাশয় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' শিরোনামায় 'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকার এবং উদ্বোধনে (১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা হতে) ধারাবাহিক-ভাবে লিখতে আরম্ভ করেন। কথামৃতের প্রথম ভাগ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয় ভাগ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে, তৃতীয় ভাগ ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে, চতুর্থ ভাগ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে, এবং পঞ্চম ভাগ ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। শ্রীম'র দেহত্যাগ হয় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে মহেন্দ্রনাথ তাঁর ডায়েরির ভিত্তিতে আলাদাভাবে (অর্থাৎ কোন ভাগের আক্ষরিক তর্জমা না করে) পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন ইংরেজী গ্রন্থ 'গসপেল অফ শ্রীরামকৃষ্ণ', মাদ্রাজের 'ব্রহ্মবাদিন্' অফিস হতে। যৎসামান্য পরিমার্জিত করে এর ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পর পর এর সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী নিখিলানন্দ কর্তৃক কথামৃতের ইংরেজী তর্জমা 'গসপেল অফ শ্রীরামকৃষ্ণ' আমেরিকায় প্রকাশিত হলে, অপ্রয়োজনীয় বোধে মাদ্রাজ হতে প্রকাশিত শ্রীম'র ইংরেজী গ্রন্থটির ছাপা বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে শেষোক্ত বইটির প্রামাণিকতা বিবেচনা করে এবং বইটিতে শ্রীম'র নিজস্ব চিন্তা-ধারা সংযোজিত থাকায়, ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এটির পুনঃপ্রকাশ করা হয়। বোধ হয় স্বামী নিখিলানন্দ-কৃত ইংরেজী বইয়ের সঙ্গে তফাৎ করার জন্য পুনঃপ্রকাশিত এই বইটির নামকরণ হয়েছে 'কন্ডেন্সড গসপেল অফ শ্রীরামকৃষ্ণ'—যেটি বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এই প্রবন্ধে এটি 'গসপেল' নামে অভিহিত হবে। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে গসপেল খণ্ডাকারে আরও বের করবার ইচ্ছা ছিল শ্রীম'র, কারণ প্রথম সংস্করণ (১৯০৭)

১ সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, পৃঃ ১২৭

২ তদেব

গসপেলের শুরুতে লেখা ছিল 'পার্ট ওয়ান' এবং শেষে 'এন. বি.' দিয়ে লেখা ছিল 'ঈশ্বরের দয়া হলে, লেখকের এইরূপ বর্ণনা পর পর খণ্ডে লেখার অভিলাষ আছে'—যেগুলি পরের সংস্করণগুলিতে তিনিই বাদ দিয়েছিলেন। হয়তো কথামৃত পর পর ভাগে বের হওয়ায় লেখক গসপেলের পরের খণ্ডগুলি বের করার বাসনা পরিত্যাগ করেছিলেন।

সকলেই জানেন যে শ্রীম তাঁর গুরুর সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে যা কিছু লিখেছেন, তা তাঁর ডায়েরিতে স্বল্পকথায় লিখিত ঘটনাবলীর উপর নিদিধ্যাসনের পর। এর ফলে বিভিন্ন গ্রন্থে বা পত্রিকায় তাঁর লেখার মধ্যে ঘটনাবলী মোটামুটি এক হলেও, তাদের বর্ণনায় বা ঘটনাবলীর উপর লেখকের মন্তব্যের মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষ্য পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়যে দ্বিতীয় ভাগ কথামৃতে কেশবের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের নৌকাবিহারের শেষে আছে 'ভীড় হইয়াছে, ঠাকুরকে নামাইবার জন্য কেশব ব্যস্ত হইলেন'। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'তত্ত্বমঞ্জরী'তে[৩] ঠিক এর পরে আড়াই পৃষ্ঠা ব্যাপী শ্রীম'র নিজস্ব চিন্তাধারা লেখা আছে, 'কেশব! তুমি দাঁড়াইয়া নৌকার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছ···তুমি কি ভাবিতেছ যে সংসারে বড় ভয় "নির্লিপ্ত হওয়া বড় কঠিন"···', যা কথামৃতে নাই। উদ্বোধন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে যে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' বের হয়েছিল তাতে বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ[৪] ছিল তিন পৃষ্ঠাব্যাপী; কথামৃত তৃতীয় ভাগে এই প্রসঙ্গ আছে, বড় হরফে বাইশ পৃষ্ঠায়; আর গসপেলে আছে অপেক্ষাকৃত ছোট হরফে লেখা ছত্রিশ পৃষ্ঠায়। অর্থাৎ গসপেলে বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ কথামৃতের বর্ণনা অপেক্ষা আরও বিস্তৃতভাবে দেওয়া আছে। গসপেল হতে জানা যায় যে দুজনার মিলনকাল বিকাল পাঁচটা হতে রাত্রি আটটা পর্যন্ত। তিন ঘণ্টার আলোচনার বর্ণনা বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগরের মিলন বর্ণনা কথামৃতে নাই, অথচ গসপেলে আছে—এরূপ তথ্যের সন্ধান দেওয়া। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গসপেলের অন্যান্য অধ্যায়ে সামান্য সামান্য নূতন তথ্য থাকলেও, এর বিদ্যাসাগর সংক্রান্ত অধ্যায়ে বেশি নূতন তথ্য পাওয়া যায়। গসপেলের ভূমিকায় স্বামী তপস্যানন্দ লিখেছেন 'কতকগুলি অধ্যায়ে (যেমন দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্থাৎ বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে) গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় আছে যা শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবাণী "আমার উপলব্ধি বেদ বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে"-এর উপর আলোকপাত করে।'

একই বৎসরে প্রকাশিত কথামৃতের এবং গসপেলের বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত অংশগুলি মিলালে যে বিভিন্নতা লক্ষ্য পড়ে তা মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

(ক) কথামৃতে সংক্ষেপে আছে, কিন্তু গসপেলে তার অনেক বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে দেওয়া আছে। হয়তো অবাঙালী পাঠককে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার বলে শ্রীম এরূপ করেছেন। উদাহরণস্বরূপঃ কথামৃতে, 'কিন্তু একটি জিনিষ কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিষটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারে নাই।' গসপেলে (পৃঃ ৬২) আছে যে শ্রীরামকৃষ্ণ একথার পর আরও বলেছিলেন, 'যখন কেউ বেদ বা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পড়ে; তাকে মুখ ব্যবহার করতে হয় এবং তা করতে গেলেই এই ধর্মগ্রন্থগুলিতে মুখের স্পর্শ আসে। সেজন্য খাদ্যের উচ্ছিষ্ট দ্রব্যের মতো এগুলিকেও উচ্ছিষ্ট

৩ তত্ত্বমঞ্জরী, ১৩০৭, পৃঃ ২২১

৪ উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩০৬, পৃঃ ১৬১

বলা যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ জগতে কেউ ব্রহ্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট সঠিক বর্ণনা দিতে পারে নাই। ব্রহ্ম অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অনন্থমেয়।' গসপেলে বিস্তৃত অর্থ করে দেওয়া আছে এইগুলি সম্বন্ধেও—ব্রহ্ম বিদ্যা ও অবিদ্যার পার, (পৃঃ ৬১), পিঁপড়ের চিনির পাহাড় নিয়ে যাওয়া (পৃঃ ৬৩), দুই ছেলের ব্রহ্মবিদ্যা শিখে আসার পর বাপের পরীক্ষা নেওয়া (পৃঃ ৬৫), লবণ পুত্তলিকার সমুদ্র মাপতে যাওয়া (পৃঃ ৬৩) ইত্যাদি। এটা স্বীকার্য যে, গসপেলে উপমাগুলি বিস্তৃতভাবে বোঝানোর জন্য আরও উপভোগ্য হয়েছে।

(খ) গসপেলে আছে, কথামৃতে বিদ্যাসাগর-সংক্রান্ত অংশে নাই, কিন্তু অন্যত্র আছে; কিংবা কথামৃতের বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে আছে, কিন্তু গসপেলে নাই। 'পাঁজিতে বিশ আড়া জল', 'জল ভক্তি হিমে বরফ হওয়া' প্রভৃতি গসপেলের বিদ্যাসাগর অংশে আছে, কথামৃতের এই অংশে নাই। এ সম্বন্ধে উদ্বোধনে৬ আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, অনুমান করা যেতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণ যে সব কথা বা উপমা বহু বার বহু জায়গায় বলেছেন, তা তিনি প্রয়োজন মতো জায়গায় ব্যবহার করেছেন, সব জায়গায় দেন নাই।

(গ) গসপেলে আছে, কিন্তু কথামৃতের কোন খণ্ডে নাই, অন্ততঃ এই ভাষায় ও ভাবে। 'কে জানে কালী কেমন' গানের পর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন 'পাণ্ডিত্যে তাঁকে পাওয়া যায় না'। কিন্তু গসপেলে (পৃঃ ৭৩, ৭৪) এই গানের পর কালী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের বলা আছে—'হাঁ, আমার মা ব্রহ্ম ছাড়া আর কেউ নয়। ষড়দর্শন বা সেগুলির যারা তাঁর খেই পাওয়া যায় না। মা যখন অহং নিয়ে নেন, তখন সমাধিতে নির্গুণ ব্রহ্মের অনুভূতি হয়; তখন জীবাত্মার পৃথক সত্তা থাকে না, শুধু পরমাত্মাই থাকেন। যখন অহং বিশুদ্ধ হয়ে থেকে যায়, তখন মায়ের কৃপাতেই কালী বা তাঁর অন্যরূপ যেমন—কৃষ্ণ, চৈতন্য বা অন্যান্য অবতারের দর্শন লাভ হয়; অথবা নর, নারী, শিশু বা যে কোন জীবিত প্রাণীরূপে, এমন কি চতুর্বিংশতিতত্ত্বরূপেও দর্শন হতে পারে।

'নির্বিকল্প সমাধিতে মা-ই কৃপা করে অহংকে মুছে দেন। তার ফলে নিরাকার ব্রহ্মের অনুভূতি হয়। কখনও তিনি দয়া করে ভক্তের মধ্যে অহং রেখে দেন, এবং তারপর নিজে এসে ভক্তকে দর্শন দেন ও কথা বলেন।

'উপনিষদের সগুণ ব্রহ্ম বা ভক্তের ভগবানের মাধ্যমেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যেতে পারে। দার্শনিকরা যে বিচারশক্তির উপর নির্ভর করে, তাও সেই জগন্মাতার কাছ হতে আসে। প্রার্থনা, ধ্যান, শরণাগতি—এসবও আসে আমার সর্বশক্তিময়ী মার কাছ হতে।

'আবার ঋষিকে কখনও তিনি সমাধিতে রেখে দেন কখনও বা ঐ অবস্থায় রাখেন না। কে তাকে আনন্দভূমিতে রাখেন? কে তাকে সমাধি হতে ফিরিয়ে আনেন নিম্ন ইন্দ্রিয় রাজ্যে? তিনি হচ্ছেন কালী বা আমার মা।

'তিনি কখনও অবাস্তব বা অলীক হতে পারেন না। একই ব্রহ্ম সত্তার অপর রূপ হল সগুণ ঈশ্বর। মূর্তি তিনি। হাঁ, আমার মা তাঁর নিজের সন্তানদের কাছে ঘোষণা করেছেন: "আমি জগতের জননী", "আমি বেদান্তের ব্রহ্ম", "আমি উপনিষদের আত্মা"। এভাবে জগজ্জননী নিজেকে প্রকাশ করেন। এই প্রকাশই তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ। আবার ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম, নিরাকার ব্রহ্মকে প্রকাশিত করে। সমাধি অবস্থায় ঋষি ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছুই বলতে

৬ উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৮৯, পৃঃ ১৭৭

পারে না। সে লবণের পুতুলের মতো বিশাল সমুদ্রের স্পর্শে এসে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। সমাধি হতে নেমে এসেও ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারে না। সমাধি হতে নেমে এসে ব্রহ্ম সম্বন্ধে সে বোবা হয়ে যায়। জীবজগতে আসার পরে নির্গুণ-ব্রহ্ম সম্বন্ধে তার মুখ বন্ধ হয়ে যায়।

'আমার মা (সগুণ ব্রহ্ম) বলেন "আমি নিরাকার" (উপনিষদের নির্গুণ ব্রহ্ম)।

'এভাবে দেখলেও নিরাকার ব্রহ্মের একমাত্র প্রমাণ আসে উপলব্ধি হতে।...

'(পৃঃ ৭৬, ৭৭) ভক্তের (দ্বৈতবাদীর) কাছে ভগবান নানারূপে দর্শন দেন। আমার মার দয়ায় যে সমাধিতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, তার কাছে তিনি নিরাকার ব্রহ্ম। এইভাবে জ্ঞান-পথের ও ভক্তিপথের উপলব্ধির সমন্বয় পাওয়া যায়। যার এরূপ সগুণব্রহ্ম-নির্গুণব্রহ্মের জ্ঞান হয়েছে তার কাছেই ধরা পড়ে যে চব্বিশতত্ত্ব মার কাছ হতেই এসেছে।

'মনে রেখো, মা কালী এক এবং বহু, ব্রহ্ম দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত। তিনি যে শুধু মানুষের মধ্যে অহং হয়ে আছেন তা নয়, অন্যান্য বহু তত্ত্বও হয়েছেন।

'ব্রহ্ম নির্গুণ ঈশ্বর—অদ্বৈতবাদীর এই মতকে সামগ্রিকভাবে নিতে হবে। তার কারণ, প্রথমতঃ সমাধির মাধ্যমেই ব্রহ্মের অনুভূতি হয়; দ্বিতীয়তঃ আমার মা-ই ব্রহ্মকে কেবলমাত্র সমাধির মাধ্যমেই স্বীয় নির্গুণরূপে অনুভূত করান। কেউ যেন না বলে যে "আমার মতই ঠিক, যুক্তিপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য, সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসীরা ভুল, সগুণ ঈশ্বর কাল্পনিক এবং তা মুক্তি দিতে পারে না", ইত্যাদি।

'দার্শনিক অদ্বৈতবাদী তার যুক্তির উপর নির্ভর করে, পরমাত্মা মায়ার প্রভাবে কিভাবে জীবাত্মায় পরিণত হয়, সে তত্ত্ব বলতে পারে না। কিন্তু উপলব্ধির দ্বারা যা জানা যায় তা সন্দেহাতীত। আমার মা (ব্রহ্মের সগুণরূপ) বলেন "যে আমি বেদান্তের ব্রহ্ম, সেই আমিই এই বিভেদ করেছি। যতক্ষণ তুমি বল আমি জানি বা আমি জানি না, ততক্ষণ তুমি নিজেকে দেহী বলে বিবেচনা কর। দেহধারী হয়ে, এই বিভেদকে সত্যকার ঘটনা বলেই ধরবে, অলীক বলবে না"।

'আমার কালী আরও বলেন "যখন আমি সমস্ত অহংভাব মুছে দিই, তখন ব্রহ্ম (আমার নির্গুণরূপ) সমাধিতে উপলব্ধি হয়"। তখন ভ্রম বা ভ্রম নয়, বাস্তব বা বাস্তব নয়, জ্ঞান ও অজ্ঞান—এসব প্রশ্ন নীরব হয়ে যায়। একেই বলে ব্রহ্মজ্ঞান।'

এই প্রসঙ্গে আরও আছে—(পৃঃ ৭৯, ৮০) 'দার্শনিক বলে, এই জন্মে বা পূর্ব জন্মে কৃত কর্ম-ফল ঋষিকে সমাধি হতে নিম্নভূমিতে নিয়ে আসে। এটা ঠিক যে যতদিন অহংবোধ থাকে, ততদিন কর্তা ও কর্ম থাকে; কর্মের কারণ ও কর্মফল থাকে। শুধু তাই নয়। লক্ষ লক্ষ প্রাণী, চব্বিশ-তত্ত্ব নিয়ে সৃষ্টি, বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ, পূর্বজন্ম, পরজন্ম এবং অন্যান্য ভেদাভেদ—এগুলিও থাকে। কিন্তু এইসব ভেদাভেদকে যদি বাস্তব ঘটনা বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে সর্বশক্তিমান ভেদাভেদকারী কালী বা সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্বও মানতে হবে। প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা আরও ভাল করে বুঝা যায়। আমার কালী বলেন "আমিই এই বিভিন্নতাকে সৃষ্টি করেছি। ভাল কাজ ও মন্দ কাজ, সবই আমার অধীন। এটা সত্য যে কর্ম-ফল আছে, কিন্তু সে আইন আমার সৃষ্টি। আইন গড়া ও ভাঙা আমার হাতে। সৎ ও অসৎ কর্ম আমিই করাই। সেজন্য প্রেম, ভক্তি, উপাসনা, শরণাগতি, জ্ঞান—যেটি তোমার খুশি তার মাধ্যমে আমার কাছে এস। কিংবা সৎকর্মের মাধ্যমে ঈশ্বর অভিমুখে আসতে পার। আমি তোমায় ভবপারে, কর্ম-সমুদ্রের অপর পারে নিয়ে

যাব। তুমি যদি চাওতো তোমায়—ব্রহ্মজ্ঞানও দেব। যদি সমাধির পরেও কর্ম করার থাকে, শরীর ও অহংবোধ থাকে, তা হলে মনে রেখো যে সে কর্ম, সেই অহং এবং সেই শরীর আমার কাজের জন্যই আমার আদেশেই রেখে দেওয়া হয়।"'

এইরূপ নূতন আলোকপাত আছে মায়া ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে (পৃঃ ৬৭, ৬৮), এবং আরও অন্যান্য কিছু কিছু বিষয়েও।

গসপেলে ছোট ছোট নূতন খবরও কিছু কিছু লক্ষ্য করা যায়। কথামৃতে আছে যে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে পৌছানোর পর শ্রীরামকৃষ্ণকে বর্ধমান হতে আনা মিষ্টান্ন খেতে দেওয়া হয়। শ্রীমকে দেবার প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন 'ও ঘরের ছেলে, ওর জন্য আটকাচ্ছে না।' গসপেল হতে জানা যায় যে, এর পরে যে ছেলের সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন যে ছেলেটি সৎ, অন্তঃসার যেন ফল্গুনদীর মতো, সেই ছেলেটি মাস্টার মহাশয় নিজে। আবার কিছু কিছু উপমা কথামৃত-বর্ণিত হতে ভিন্ন পটভূমিকায় পাওয়া যায় গসপেলে। বড় মানুষের বাগানের সরকারকে ছাড়িয়ে দেওয়ার পরে সে কাঠের সিন্দুকটা নিয়ে যেতে পারে না—এই ঘটনাটি কথামৃতে বলা হয়েছে 'মৃত্যুকে সর্বদা মনে রাখা উচিত'—এর ব্যাখ্যায়। কিন্তু গসপেলে (পৃঃ ৮৬) এটি বলা হয়েছে 'আমি ও আমার কথাটি অজ্ঞানতা থেকে হয়' এই পরিপ্রেক্ষিতে।

গসপেল সম্বন্ধে অনেকেই, বিশেষতঃ ইংরেজী না-জানা ভক্তরা, অবহিত নন। প্রয়োজনও বোধ করেন না তাঁরা, কারণ কথামৃতই তাঁদের সব তৃষ্ণা মিটিয়ে দিয়েছে। তবুও উদ্বোধনে৬ প্রকাশিত গসপেলের সমালোচকের ভাষাতেই বলি 'শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যদি সামান্য নতুন তথ্য পাওয়া যায়, বিশেষতঃ শ্রীম'র কাছ হতে, তার মূল্য কি কম ?'

৬ উদ্বোধন বৈশাখ, ১৩৮৯, পৃঃ ১৭৭

প্রার্থনা

শ্রীপ্রদোষকুমার পাল

অরুণ রবির সোনার আলোয়
রাঙা হোল যে দিগন্ত
সীমার মাঝে অসীম তুমি
তুমিই মহা অনন্ত ॥
ভানুশশীর কিরণ আভায়
ভাসাও তুমি বনান্ত
তোমার আশিস ধারায় মোরা
হই যে সবাই প্রশান্ত ॥
তোমার আশীর্বাদে প্রভু
হয় যে শরৎ হেমন্ত ॥
তোমার প্রেমের রস ধারায়
মানব জনম বসন্ত ॥

জীবন মাঝে চলার পথে
হই যে মোরা অশান্ত
তখন তোমার ডাকের মাঝেই
আমরা যে হই সুশান্ত ॥
বিপদ কালে সঙ্কটেতে
যখন হই দিগ্‌ভ্রান্ত
তোমার নামে তোমার ধ্যানে
মন বলে তুমি জীবন্ত ॥
স্মরণ করি তোমায় প্রভু
যখন ঘটে কল্পান্ত
তোমার চরণ লাভেই হবে
সব মানবের নিষ্ক্রান্ত ॥

হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়

স্বামী চেতনানন্দ

[বৈশাখ, ১৩৯৩ সংখ্যার পর]

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে গোটা যৌবনকাল হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কাটান। একালে তিনি মামার অনুগত হয়ে ভালবাসার সঙ্গে তাঁকে সেবা করেছেন। কিন্তু যখন তিনি চল্লিশে পড়লেন, তখন তাঁর চরিত্রে পরিবর্তন দেখা দিল। ক্রমশ: তিনি স্বেচ্ছাচারী, হিংসুক, ক্ষমতাপ্রিয় হয়ে উঠলেন। তাই ঠাকুরের প্রতি তাঁর ব্যবহারেরও পরিবর্তন হতে লাগল। কেউ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে হৃদয় তার কাছে টাকা চাইতেন। ঠাকুর যখন তা জানতে পারলেন, তখন তিনি হৃদয়কে তীব্র ভৎ'সনা করলেন। হৃদয় ঠাকুরকে গ্রাহ্য না করে নিজের খেয়ালমত চলতে লাগলেন। ভক্তদের কাছে তিনি প্রতিপন্ন করতে চাইলেন যে ঠাকুর তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সকলের সামনেই ঠাকুরের ওপর তিনি রূঢ় আচরণ শুরু করলেন। সময় সময় তিনি ঠাকুরের অনুকরণ করে লোকদের কাছে সমাধির অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদিও দেখাতেন।

একবার শ্রীরামকৃষ্ণ জ্বরে শয্যাশায়ী। কলকাতার একজন ভক্ত ঠাকুরের জন্য একটা ফুলকপি আনলেন। ঠাকুর ভক্তটিকে কপিটি লুকিয়ে রাখতে বলেন, কারণ হৃদয় দেখলে তাঁকে বকুনি দেবেন। তারপর তিনি হৃদয়ের বিষয় বলতে লাগলেন: "হৃদে যেমন আমার সেবা করিয়াছে, মা কালী তার আশাতীত ফলও দিয়াছেন। দেশে বিলক্ষণ জমিজমা করিয়াছে; লোককে টাকা ধার দেয়, এই মন্দিরে কর্তার ন্যায় হইয়া রহিয়াছে এবং এত লোকে উহার সম্মান করিয়া থাকে।" এমন সময় হৃদয় সেখানে হাজির হয়ে কপি দেখে ঠাকুরকে ভৎ'সনা করতে লাগলেন। ঠাকুর অনুনয় করে বললেন, "ত্যাখ, আমি ইহাদের কপি আনিতে বলি নাই, উহারা আপনারা আনিয়াছে, মাইরি বলিতেছি, আমি উহাদের কিছুই বলি নাই।" শেষে তিনি কেঁদে মা কালীকে বলতে লাগলেন, "মা, তুই আমার সংসার-বন্ধন কাটিয়া দিলি, পিতা গেল, মাতা গেল, ভাই গেল, স্ত্রী গেল, জাতি গেল—শেষে কিনা হৃদয়ের হাতে আমার এই দুর্গতি হইতে লাগিল।" তারপর আবার ভক্তদের মনে কষ্ট হবে ভেবে চোখের জল মুছে হেসে বললেন, "ও আমায় বড় ভালবাসে। ভালবাসে বলিয়াই বকে, ছেলেমানুষ, উহার বোধ হয় নাই। উহার কথায় কি রাগ করিতে হয়, মা?" এরূপ বলতে বলতে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

অহংকারীর পতন অবশ্যম্ভাবী। মন্দিরের কর্মচারীরা হৃদয়ের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে তাঁর পতনের অপেক্ষা করতে লাগল। ঠাকুর সব জেনে হৃদয়কে সাবধান হতে বললেন। হৃদয় ঠাকুরের মুখের উপর স্পর্ধা করে বললেন, "রাসমণির অন্ন ব্যতীত তোমার গতি নাই। তুমি সকলকে ভয় করিবে, আমি কাহাকে গ্রাহ্য করি? না হয় চলিয়া যাইব।" ১৮৮১-এর মার্চ মাসে শ্রীসারদাদেবী তাঁর মা ও কয়েকজন প্রতিবেশীকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে আসেন। দুর্মুখ হৃদয় তাঁদের প্রতি অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করেন এবং শ্রীশ্রীমাকে বলেন যে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। চোখের জল ফেলতে ফেলতে তাঁরা সেই দিনই দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অসহায় ভাবে সব লক্ষ্য করলেন। হৃদয় এত উদ্ধত ও গর্বোন্মত্ত হলেন যে ঠাকুর তাঁকে কিছু বলতে ভয় পেতেন। শেষে তিনি হৃদয়কে ডেকে শেষবারের মতো সাবধান করে
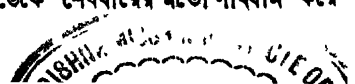
দিলেন, "ওরে হৃদে, (নিজ শরীর দেখিয়ে) একে তুই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলিস বলে ওকে (শ্রীমাকে) আর কখনও এমন কথা বলিসনি। এর ভিতর যে আছে, সে ফোঁস করলে হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে পারিস; কিন্তু ওর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে তোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবেন না।"

এই ঘটনার অল্পকালের মধ্যে হৃদয় তাঁর নিজের পতন ডেকে আনলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের স্নানযাত্রা; দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন। মথুরের পুত্র ত্রৈলোক্য স্ত্রী-কন্যা সহ মন্দিরে উৎসব উপলক্ষে কলকাতা থেকে এসেছেন। তাঁদের আট বছরের মেয়ে একা মন্দিরের ভেতর পূজা দেখতে গেল। তখন হৃদয় মা কালীর পূজা করছেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল চাপল ঐ মেয়েটিকে তিনি কুমারী পূজা করবেন। যেমন খেয়াল তেমনি কাজ, মেয়েটির পায়ে ফুল-চন্দন দিয়ে হৃদয় তাকে পূজা করলেন। ত্রৈলোক্যের স্ত্রী মেয়ের পায়ে চন্দনের দাগ দেখে জিজ্ঞাসা করে জানলেন হৃদয় তাঁর মেয়েকে পূজা করেছেন। শুনে মহিলা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কথিত আছে, ব্রাহ্মণ যদি অব্রাহ্মণ কন্যাকে পূজা করে তবে সে কন্যা বিবাহের পর বিধবা হবে। ত্রৈলোক্যও সব শুনে ও স্ত্রীর চোখে জল দেখে রেগে দারোয়ানকে দিয়ে হৃদয়কে এক বস্ত্রে মন্দির-উদ্যান থেকে তখনি চলে যেতে আদেশ দিলেন।

হৃদয় ছুটলেন ঠাকুরের কাছে এবং কি ঘটেছে বললেন। শুনে ঠাকুর বললেন: তুই ওসব কেন করতে গেলি? এখন কি করবি? উত্তরে হৃদয় বললেন: মামা, তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না। তুমি আমার সঙ্গে চলে এস। এখানে থেকে আর কাজ নেই। একদিন এরা তোমাকেও অপমান করবে। ঠাকুর বললেন: না, আমি যাব না। হৃদয় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মন্দির-উদ্যান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হৃদয় দক্ষিণেশ্বর মন্দির-সংলগ্ন যদু মল্লিকের বাগানে আস্তানা নিলেন ঠাকুর নিজের আহারের অংশ থেকে হৃদয়ের জন্য অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পাঠাতেন এবং নিজেও কখন কখন দেখে আসতেন। সুযোগসন্ধানী হৃদয় ঠাকুরকে বলতেন যে, তাঁরা অন্যত্র কালী-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে দুজনে একত্রে থাকবেন। ঠাকুর বলতেন, "তুই কি আমায় লইয়া দ্বারে দ্বারে ফেরি করিয়া বেড়াইবি?" তারপর হৃদয় দেশে ফিরে গিয়ে চাষবাস দেখতে লাগলেন। ঠাকুর একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেন, "হৃদে এখনও জমি জমি করছে। যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিল তখন ওদের বলেছিল, শাল দাও, না হলে নালিশ করবো। মা তাকে সরিয়ে দিলেন। লোকজন গেলে কেবল টাকা টাকা করতো। সে যদি থাকত এ-সব লোক যেত না। মা সরিয়ে দিলেন।"

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ অগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়ের কাছ থেকে একখানি চিঠি পেয়ে শ্রীমকে বলেন: "দেখ, আমার মনটা বড় খারাপ হয়েছে। হৃদে চিঠি লিখেছে, তার বড় অসুখ। একি মায়া, না দয়া? মায়া কাকে বলে জান? বাপ-মা, ভাই-ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র, ভাগিনা-ভাগিনী, ভাইপো-ভাইঝি, এই সব আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসা। আর দয়া মানে—সর্বভূতে ভালবাসা। আমার এটা কি হলো, মায়া না দয়া? হৃদে কিন্তু আমার অনেক করেছিল—অনেক সেবা করেছিল।—হাতে করে গু পরিষ্কার করতো। তেমনি শেষে শাস্তিও দিয়েছিল। এত শাস্তি দিত যে, পোস্তার উপর গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ করতে গিছিলাম। কিন্তু আমার অনেক করেছিল—এখন সে কিছু (টাকা) পেলে মনটা স্থির হয়।

কিন্তু কোন্ বাবুকে আবার বলতে যাব। কে বলে বেড়ায়?" আর একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন: "হৃদে যখন বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে, তখন এখান থেকে কাশী চলে যাবো মতলব হল। ভাবলুম কাপড় লব—কিন্তু টাকা কেমন করে লব? আর কাশী যাওয়া হল না।"

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ অক্টোবর হৃদয় শিহড় থেকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখতে এলেন। কথামৃতের বর্ণনা:

"একটি লোক আসিয়া বলিল, 'মহাশয়, হৃদয় যদু মল্লিকের বাগানে এসেছেন, ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।' শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলিতেছেন, 'হৃদের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি তোমরা বসো।' এই বলিয়া কালো বার্নিস করা চটি জুতাটি পরে পূর্বদিকের ফটক অভিমুখে চলিলেন। সঙ্গে কেবল মাস্টার।...

হৃদয় কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান। দর্শনমাত্র রাজপথের উপর দণ্ডের ন্যায় নিপতিত হইলেন। ঠাকুর উঠিতে বলিলেন। হৃদয় আবার হাত জোড় করিয়া বালকের মতো কাঁদিতেছেন। কি আশ্চর্য! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও কাঁদিতেছেন! তিনি অশ্রুবারি হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন—যেন চক্ষে জল পড়ে নাই। একি! যে হৃদয় তাঁকে কত যন্ত্রণা দিয়াছিল তাঁর জন্য ছুটে এসেছেন! আর কাঁদছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখন যে এলি?

হৃদয় (কাঁদিতে কাঁদিতে)—তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। আমার দুঃখ আর কার কাছে বলব?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সান্ত্বনার্থ সহাস্যে)—সংসারে এইরূপ দুঃখ আছে। সংসার করতে গেলেই সুখ দুঃখ আছে। (মাস্টারকে দেখাইয়া) এঁরা এক-একবার তাই আসে। এসে ঈশ্বরীয় কথা দুটো শুনলে মনে শান্তি হয়। তোর কিসের দুঃখ?

হৃদয় (কাঁদিতে কাঁদিতে)—আপনার সঙ্গ ছাড়া, তাই দুঃখ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুই তো বলেছিলি, 'তোমার ভাব তোমাতে থাক্, আমার ভাব আমাতে থাক্।'

হৃদয়—হ্যাঁ, তাতো বলেছিলাম—আমি কি জানি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আজ এখন তবে আয়, আর একদিন তখন বসে কথা কহিব। আজ রবিবার অনেক লোক এসেছে, তারা বসে রয়েছে। এবার দেশে ধান-টান কেমন হয়েছে?

হৃদয়—হাঁ, তা একরকম মন্দ হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আজ তবে আয়, আবার একদিন আসিস।

হৃদয় আবার সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিল। ঠাকুর সেই পথ দিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। সঙ্গে মাস্টার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—আমার সেবাও যত করেছে, যন্ত্রণাও তেমনি দিয়েছে! আমি যখন পেটের ব্যারামে দুখানা হাড় হয়ে গেছি—কিছু খেতে পারতুম না, তখন আমায় বললে, 'এই দেখ আমি কেমন খাই, তোমার মনের গুণে খেতে পার না।' আবার বলতো, 'বোকা—আমি না থাকলে তোমার সাধুগিরি বেরিয়ে যেতো।'

মাস্টার শুনিয়া অবাক্। বোধহয় ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য! এমন লোকের জন্য ইনি অশ্রুবারি বিসর্জন করিতেছিলেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—আচ্ছা, অত সেবা করতো—তবে কেন ওর এমন হলো? ছেলেকে যেমন মানুষ করে, সেই রকম করে আমাকে দেখেছে। আমি তো রাতদিন বেহুঁশ

হয়ে থাকতুম, তার উপর আবার অনেক দিন ধরে ব্যামোয় ভুগেছি। ও যে রকম করে আমায় রাখতো, সেই রকম আমি থাকতুম।"

হৃদয়-চরিত্র শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলানাট্যে হৃদয়ের ভূমিকা অবহেলিত বা তুচ্ছ নয়। দোষেগুণে মানুষ। হৃদয়ের গুণ ছিল আবার দোষও ছিল। ঠাকুর বলেছেন—কেউ যদি মানুষের ৯৯টি উপকার এবং ১টি অপকার করে, সে ঐ অপকারটিই মনে রাখে। আর কেউ যদি ভগবানের কাছে ৯৯টি অপরাধ এবং ১টি প্রীতির কাজ করে, তিনি তার সব অপরাধ ক্ষমা করেন। মানুষে আর ভগবানের ভালবাসায় এই তফাৎ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এই কথার সাক্ষ্য নিজ জীবনে দিয়েছেন। কেউ যেন মনে না করেন যে ঠাকুর কেবল ভক্তদের পূজা, সেবা এবং প্রশংসাই পেয়েছেন। তাঁকে বিস্তর রোগশোক, জ্বালাযন্ত্রণা, লাঞ্ছনা-গঞ্জনাও সইতে হয়েছে। হৃদয়ের রূঢ় ব্যবহার শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রকে মহান্ করে তুলেছে। হৃদয় না থাকলে আমরা ঠাকুরের দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য ও সহনশীলতার এত বিশদ পরিচয় পেতুম না। তিনি দেখিয়ে গেলেন সংসারে কি ভাবে সহ্য করে থাকতে হয়।

যতদূর মনে হয়, পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারই ঠাকুরের সঙ্গে হৃদয়ের শেষ সাক্ষাৎ। হৃদয় অবশ্যই ঠাকুরের ক্যান্সারের কথা শুনে থাকবেন এবং তাঁকে যে কলকাতায় ও পরে কাশীপুরে চিকিৎসার জন্য যেতে হয়েছে—তাও তিনি জেনে থাকবেন। কিন্তু হৃদয় মামাকে আর দেখতে আসেননি। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর হৃদয় কলকাতায় কাজের জন্য বেকার হয়ে যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, ভক্ত রামদত্ত তাঁকে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে পূজারীর কাজে নিয়োগ করেন। খাওয়া, থাকা ও মাহিনার বিনিময়ে হৃদয় কাজ শুরু করেন। এখানেও তিনি দৌরাত্ম্য আরম্ভ করেন।

রামচন্দ্র বলেন, "সকালে ঠাকুরের জন্যে যখন মাখম-মিছরি আনা হতো, হৃদু মাঝপথে গিয়ে হাত বেঁকিয়ে, কোমর বেঁকিয়ে ঢং করে বলতো, আমাকে মাখম-মিছরি দাও—বলে, আগেই খেয়ে ফেলতো। পরে, ঠাকুরের জন্যে আবার মাখম মিছরি আনা হতো। রাত্তিরে ঠাকুরের লুচিভোগ দেওয়ার সময় সে আগে এসে খেয়ে ফেলতো, ফের ঠাকুরের জন্যে লুচি তৈরী করা হতো। ঠাকুরের সাধনকালে যে ভাব হয়েছিল সে তার অনুকরণ করতো। এইরকম, নানা-রকমে বিরক্ত করায় তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।" তবুও হৃদয় যখন রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তিনি তাঁকে অর্থসাহায্য করতেন।

তারপর হৃদয় ফেরিওয়ালা হয়ে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় কাপড় বিক্রি করে বেড়াতেন। কখন কখন তিনি আলমবাজার মঠে ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যদের কাছেও আসতেন। তাঁরা হৃদয়কে খুব সমাদর করে খাওয়াতেন এবং ঠাকুরের কথা জিজ্ঞাসা করে তাঁর পূর্বস্মৃতিকে জাগিয়ে তুলতেন। হৃদয় তখন ঠাকুরের কামার-পুকুরের জীবনকথা, দক্ষিণেশ্বরের পুরনো দিন-গুলি, ঠাকুরের সাধন-জীবন, তীর্থভ্রমণ, বিশিষ্ট-ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, রাসমণি-মথুর প্রভৃতির বহু কাহিনী বলে যেতেন। এসব কথা স্বামী সারদানন্দকে ঠাকুরের জীবনী লিখতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। ঠাকুরের ভক্ত ও ত্যাগী সন্তানগণ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে তাঁর কাছে এসেছেন। সুতরাং হৃদয়ের সাক্ষ্য না পেলে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের অনেকাংশ আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যেত।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময় সুরেশচন্দ্র

দত্ত ও শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে নিয়ে ভক্ত নাগমহাশয় দক্ষিণেশ্বর দর্শনে যান। ইহা ছিল শরৎবাবুর প্রথম দক্ষিণেশ্বর দর্শন। তিনি 'সাধু নাগ-মহাশয়' গ্রন্থে লিখেছেন: "আজ ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় মুখোপাধ্যায়ও দক্ষিণেশ্বর আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে একটি কাপড়ের মোট ছিল, চেহারা অতি মলিন। নাগমহাশয় বলিলেন, 'হৃদয় এখন ফেরি করিয়া কাপড় বেচিয়া জীবিকানির্বাহ করেন।' তাঁহার সহিত নাগ-মহাশয়ের পরিচয় ছিল, দুজনে শ্রীরামকৃষ্ণকথা কহিতে লাগিলেন। ঠাকুরের কক্ষের সম্মুখে বসিয়া হৃদয় তিন-চারটি শ্যামাবিষয়ক গান করিলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, 'ঠাকুর ঐ গানগুলি গাহিতেন।' অনেক কথার পর হৃদয় বলিতে লাগিলেন, 'তোমরা তাঁহার কৃপায় সব কেমন হইয়া গেলে, আমাকে এখনও ফেরি-করিয়া উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়! মামা আমাকে কৃপা করিলেন না।' এই বলিয়া তিনি বালকের ন্যায় অশান্ত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।"

পূর্ণিমার রাতে চাঁদের কিরণ যখন অগভীর জলে প্রতিফলিত হয়, তখন ছোট ছোট মাছগুলো আনন্দে লাফালাফি করে। তারা মনে করে চাঁদ তাদের সঙ্গী। যেই চাঁদ অস্ত যায়; অমনি তারা দুঃখে অভিভূত হয়। হৃদয় ঠাকুরের দিব্য-সঙ্গ ত্যাগের পর, খুবই অভাব বোধ করতেন। তাঁর শরীর সংসারে আবদ্ধ হলেও মনটা দক্ষিণেশ্বরে মামার কাছে পড়ে থাকত। তাই পরবর্তিকালে যখনই সময় পেতেন, ছুটে ছুটে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরাম-কৃষ্ণের জন্মতিথি উৎসবে হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত ছিলেন এবং ঠাকুরের জীবনের নানা কাহিনী ভক্তদের কাছে বলেছিলেন। শেষে দুঃখ করে বলেছিলেন: "যখন কেউ আসেনি তখন আমি মামার এত করে সেবা করেছিলুম, কিন্তু এখন আমায় কেউ পোঁছে না। বেড়ালটা একবার দুধে মুখ দিয়েছে বলে তাকে কি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়?" তাঁর কথা শুনে কোন কোন ভক্ত হৃদয়কে অর্থ সাহায্য করতেন।

হৃদয় যখন ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, তখন তিনি বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও সুপুরুষ ছিলেন। কিন্তু অহংকার, স্বেচ্ছাচার ইত্যাদি তাঁর সুখের জীবনটাকে ছন্নছাড়া করে দিল। মানুষের যখন পতন শুরু হয় তখন ক্রমাগত গোত্তা খেতে থাকে। একদিন আলম-বাজার মঠে স্বামী ব্রহ্মানন্দ হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করেন, "হাঁ মুখুজ্যে, তুমি জোয়ান বয়সে খুব বলবান ছিলে, বেশ ষণ্ডাগুণ্ডা ছিলে, এমন পট্‌কে গেলে কেমন করে?" হৃদয় উত্তরে বললেন, "আরে দাদা, ছয় ছটা ভৈরবীচক্রে রাত্রে ঘুরতুম। রাত্রে পাঁচ-ছটা চক্রে ঘুরলে আর কি শরীর থাকে?" তা ছাড়া ফেরিওয়ালার জীবন দুঃখের জীবন। রোদ-বৃষ্টিতে পথে পথে ঘোরা। এসব ঠাকুরকে ছাড়ার ফল। ভগ্ন শরীরে, ভগ্ন হৃদয়ে ক্লান্ত হৃদয় শিহড়ে ফিরে মারা গেলেন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে (বৈশাখ ১৩০৬)।

দেশে ফিরবার আগে হৃদয় শেষবারের মতন আলমবাজার মঠে ঠাকুর-ঘরে গিয়ে রামকৃষ্ণের ছবিকে প্রণাম করেছিলেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করেন, "কি মুখুজ্যে, কেমন আছ?" দুঃখভারে ভারাক্রান্ত হৃদয় বললেন, "আরে দাদা—মরে আছি। আর কি সেদিন আছে? মামা গেছেন, তার সঙ্গে আমার প্রাণও চলে গেছে। খালি দেহটা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

প্রশ্ন উঠবে—হৃদয় ভাগ্যহীন না ভাগ্যবান? পাঠক ভেবে দেখুন।

ভারত সন্ধানে বিবেকানন্দ

শ্রীনারায়ণচন্দ্র রাণা

পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত যুবক নরেন্দ্রনাথের মনে এক দুর্দমনীয় জিজ্ঞাসা, ভারত আত্মার শাশ্বত সম্পদ সেই উপনিষদের বাণীগুলি সত্য, না নিছক কল্পনাবিলাস? কে দেবে তার উত্তর? কে দেবে তার প্রমাণ? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তদানীন্তন ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম কর্ণধার, তিনিও পারলেন না নরেন্দ্রনাথের মনঃপূত উত্তর দিতে। অখণ্ডের ঘর থেকে নেমে আসা এই নরঋষি শ্রীনরেন্দ্রনাথের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তখন সাগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন ভারতের যুগন্ধর বেদমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছে বেদ-বেদান্ত-গীতা-উপনিষদ্, সব কিছুই। সর্বধর্মের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে নরেন্দ্রনাথ সন্ধান পেলেন ভারত-আত্মার সনাতন মহিমময় রূপটিকে। শ্রীগুরুর সান্নিধ্যে সমস্ত সত্যগুলিকে তিলে তিলে যাচাই করে নিলেন। হাজার হাজার বৎসর আগে ভারতভূখণ্ডে পরম সত্যের সন্ধানে যেমন ব্যাপক ও গভীর অধ্যাত্ম চর্চা হয়েছে, বিশ্বের ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই। ভারত সেই প্রাচীনতম কাল থেকে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে আসছে—'ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুঃ।' বলে আসছে—'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।' পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে স্বামীজী বললেন "জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা কর—যেখানেই কোন সুমহান আদর্শের সন্ধান মিলিবে, দেখিতে পাইবে উহার জন্ম ভারতবর্ষে। ...স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় উচ্চভাবরাশি আহরণ করিয়া সে সারা জগতে মুক্তহস্তে ঐগুলি বিলাইয়া দিয়াছে।...আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে যদি কোন ধর্মে সুষ্ঠু ধারণা থাকে, তাহা হইলে উহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারত হইতেই গৃহীত।... যুগযুগান্তের সাধনায় ভারতবাসীর অন্তরে সঞ্চিত হইয়াছে পরলোকে দৃঢ় আস্থা, বৈষয়িক ভোগে একান্ত বিতৃষ্ণা, ত্যাগের অসাধারণ তেজ, ঈশ্বর ও অবিনাশী আত্মায় জলন্ত বিশ্বাস।...স্বার্থত্যাগ ও সেবা আমাদের জাতীয় আদর্শ।...বিশ্ব সভ্যতার ভাণ্ডারে ভারতের কিছু দিবার আছে বলিয়াই এদেশ এখনও বাঁচিয়া আছে।"

জগদ্গুরুর অপার দাক্ষিণ্যে অল্পকাল মধ্যে নরেন্দ্রনাথ অধ্যাত্মরাজ্যের সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করলেন, চাইলেন জনারণ্যের অন্তরালে নির্বিকল্প সমাধিতে চির নিমগ্ন থাকতে। কিন্তু যন্ত্রীর ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। ঈশপ্রেম সংবহনের এই উৎকৃষ্ট যন্ত্রটির মধ্যে অনুস্যূত হয়ে তিনি হয়ে গেলেন 'ফকির', আর বিবেকানন্দরূপে নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন সারা বিশ্বময়। শুরু হল ভারত সন্ধানের দ্বিতীয় পর্ব। ধূলিধূসরিত পথে, দরিদ্র জনপদে, রাজপ্রাসাদে, নির্জন অরণ্যগুহায় ভারতবর্ষের আধুনিক রূপটিকে স্বামীজী জানলেন নতুন করে। অতীত ভারতের এ যে কলঙ্কময় অবস্থা! সেই প্রাচীন ঐতিহ্য, সেই সনাতন গরিমা আজ কোথায়? ব্রহ্মজ্ঞানীর গণ্ডদেশে প্রেমাশ্রুর প্লাবন বইতে লাগল। ঈশ্বর আজ ঘটি-বাটি কিংবা সহস্রার পদ্ম ছেড়ে দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসীর মধ্যে প্রতিবিম্বিত হলেন।

বৈদান্তিক ভারতবর্ষের বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণগুলি সম্পর্কে স্বামীজী পরে নানা বক্তৃতা ও লেখায় বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "এদেশের সামাজিক বিধানগুলি কোনকালেই অনড় ছিল না, বরং

হিন্দুসমাজের কাঠামোটি বরাবরই যুগোপযোগী পরিবর্তনসাপেক্ষ রহিয়াছে, এই বিধানগুলির মূলে আছে এক বিশাল পরিকল্পনা, যাহা কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বাস্তবে রূপায়িত হইতেছে ও হইবে।...বস্তুত এই অপূর্ব পরিকল্পনাটির পূর্ণ তাৎপর্য আর্য-ঋষিদের বর্তমান বংশধরগণও গ্রহণ করিতে পারেন নাই, এবং ইহাই তাঁহাদের বর্তমান অধোগতির প্রধান কারণ।"

/ "ভারতের এই অবনতির অন্যতম কারণ আমাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ও কর্মক্ষেত্রের সঙ্কোচন।.. বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ভারত শুক্তির মত নিজেকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছিল এবং তাহার গর্ভস্থিত অমূল্য রত্ন-ভাণ্ডার প্রাণপ্রদ সত্যসম্পদের ভাগ অপর কোন সত্যপিপাসু মানব-গোষ্ঠীকে দেয় নাই,...তাই বিধর্মীর প্রতি বিজাতীয় ঘৃণাকে ভিত্তি করিয়া হিন্দু সমাজের চতুর্দিকে লোকাচারের যে অলঙ্ঘ্য প্রাচীরটি গড়া হইয়াছিল, উহাই ভারতের বর্তমান অবনতির মূল কারণ বলিয়া আমি মনে করি।" "আমাদের ধর্ম রান্নাঘরে গণ্ডীবদ্ধ। ভাতের হাঁড়ি আমাদের উপাস্য দেবতা, আর মন্ত্র—'আমাকে ছুঁইও না, আমি শুচি।'...ভাবিয়া দেখ, এই দুর্গতদের পরিশ্রমই আমাদের শিক্ষার খরচ যোগায়, আমাদের মন্দির গড়িয়া তুলে, কিন্তু প্রতিদানে তাহারা আমাদের কাছে পায় শুধু পদাঘাত।...যতদিন না ভারতের অনভিজাত জনসমাজ সমাদৃত হইতেছে, যতদিন না তাহাদের জন্য উপযুক্ত খাদ্য, শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা হইতেছে, ততদিন আমাদের যাবতীয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিষ্ফল হইবে, এদেশের উন্নতি সম্ভব হইবে না।"

প্রাচীন স্মৃতিকার মনু বলেছেন—নারীর সম্মানে দেবতারা তৃপ্ত হন। "অথচ আমাদের চিন্তাধারা এতই কলুষিত যে, আমরা স্ত্রী জাতিকে বলি ঘৃণ্যকীট, নরকের দ্বার ইত্যাদি। এই জন্যই আমাদের অধঃপতন।"

"ভারতের বহুবিধ বিপদ দেখিতে পাইতেছি, ইহাদের মধ্যে দুইটি—নিছক জড়বাদ ও উহারই ঠিক বিপরীত ঘোর কুসংস্কার—বিশেষভাবে বর্জনীয়।...আমাদের উপনিষদের মহিমা সত্ত্বেও, ঋষিকুলোদ্ভব বলিয়া আমাদের বংশগৌরব সত্ত্বেও একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, অন্যান্য জাতির তুলনায় আমরা দুর্বল, খুবই ক্ষীণজীবী। প্রথমেই আমাদের দৈহিক দুর্বলতা, ইহাই আমাদের দুর্দশার জন্য অনেকাংশে দায়ী।...আমরা আত্ম-বিশ্বাস হারাইয়াছি। বস্তুতঃ যে কোন ইংরেজ পুরুষ বা নারীর যে আত্মপ্রত্যয় আছে তাহার হাজার ভাগের এক ভাগও আমাদের নাই।... গাম্ভীর্যের একান্ত অভাব—গুরু বা লঘু যে কোনও বিষয় হাসিয়া উড়াইয়া দিবার এক হাল্‌কা পরিহাস-চপল প্রবৃত্তি—আমাদের সমাজে অলক্ষিতে একটা উৎকট মানসিক ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইতেছে।"

"বর্তমানে শিশুর মতো একটি অসহায় পর-প্রত্যাশী ভাব যেন আমাদের গোটা জাতীয় চরিত্রকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।...স্বাবলম্বী না হইতে পারিলে কেহই বাঁচিয়া থাকার যোগ্য হয় না।...সকলেই চায় হুকুম করিতে, আদেশ মানিতে কেহই প্রস্তুত নহে। প্রাচীন কালে সেই যে আশ্চর্য ব্রহ্মচর্য প্রথা ছিল উহার অভাবেই আজ এই পরিণাম।...সংগঠন ক্ষমতা আমাদের ধাতে একবারেই নাই। চার কোটি ইংরাজ কি করিয়া এদেশে ত্রিশকোটি লোককে শাসন করিতেছে? ...বস্তুতঃ আমরা অলস, কর্মবিমুখ, সংহতি-সাধনে অক্ষম, ভ্রাতৃপ্রেম-বর্জিত স্বার্থান্ধ মানুষ।"

নৈরাশ্যপীড়িত, ক্লান্ত পরিব্রাজক পরিক্রমা সমাপ্ত করে সমাধানের আশায় ভারতের শেষ

শিলাখণ্ডের উপর ধ্যান-নিমগ্ন হলেন। অন্তর্দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হল ভবিষ্যৎ ভারতের আবিলতাহীন, উজ্জ্বল এবং ভাস্বর রূপটি, কয়েকশত বৎসরের ইতিহাসের ভাবী রূপরেখা ভেসে উঠল মনের পর্দায়। যুগ যুগ সঞ্চিত সমস্ত জাতির পুঞ্জীভূত ত্রুটিগুলির জন্য নিজেই প্রায়শ্চিত্ত করবার মনস্থ করলেন। তাই শান্ত সৌম্য ঋষি উচ্ছল সমুদ্রের বুক চিরে ভেসে চললেন আমেরিকায়। ওদেশ জানল, গঙ্গায় সন্তান নিক্ষেপকারী, বাধ্যতামূলক সহমরণের দেশ থেকে এক ঋজুদেহ সন্ন্যাসী নাকি শিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধিত্ব করবেন। বিবেকানন্দের ভারত, বৈদান্তিক ভারত—অধঃপাতিত, বিজিত, মোহগ্রস্ত হিন্দুজাতির একমাত্র শাশ্বত শ্লাঘার উপকরণ। বিস্মিত বিশ্ববাসী অকুণ্ঠ স্বাগত জানাল ত্রিকালজয়ী ভারতাত্মাকে, বেদান্তের বাণী পৌঁছল পাশ্চাত্যের দ্বারে দ্বারে, অখণ্ড ধ্যানরাজ্য সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে খণ্ডের ঘরে নেমে এসে বিবেকানন্দ ভারতের যে রূপ এতদিন সন্ধান করে ফিরছিলেন—আজ তা পরিপূর্ণভাবে সার্থক হল। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে তিনি ব্যাখ্যা করলেন এক এক করে সমস্ত বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ, দর্শন, মহাকাব্য এবং অগণিত যোগী, ঋষি, দেবতা ও অবতারের মাহাত্ম্য। বিবেকানন্দের কৃতিত্ব এখানেই, সর্বধর্মের সমন্বয় কেবলমাত্র ভারত ভূখণ্ডেই সম্ভব হয়েছিল। প্রকৃত যোগী এবং ঋষিরা কেউই গোঁড়া ছিলেন না। সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলছে তাঁদের বিশ্লেষণ। ভারতের রাজশক্তি চিরকালই ব্রাহ্মণ মহিমার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়ে তাদের পোষণ করেছে। যুগে যুগে জনসাধারণের সম্মুখে ঘটেছে অধ্যাত্ম কংগ্রেস। ভারতীয় অধ্যাত্মজ্ঞানের ভিত্তিভূমি এত দৃঢ় ও সবল হওয়ার প্রধান কারণ—বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রতিটি ধাপে সূক্ষ্ম নৈয়ায়িক বিশ্লেষণ এবং যোগজশক্তি সহায়ে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ অনুভূতির রূপান্তর (transformation) দ্বারা পরীক্ষা প্রদর্শন। আধুনিক পাশ্চাত্য ঘোর যুক্তিবাদী, তাদের বোঝানোর এই একমাত্র পথ। স্বামীজীর ভারততত্ত্ব যুগে যুগে অবতীর্ণ অবতার পুরুষগণের পরস্পর অবিরোধী সামান্যীকৃত প্রবচন। ভারতবর্ষে 'এক' না 'দুই' এই নিয়ে বহু বাগ্‌বিতণ্ডা হয়েছে। স্বামীজী এদের মধ্যেও পরিয়ে দিলেন একটা সাধারণ যোগসূত্র। দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং বিশুদ্ধ অদ্বৈত এরা হয়ে গেল অদ্বৈতানুভূতির এক একটি ঊর্ধ্বক্রম সোপান মাত্র, যতক্ষণ 'দুই' ততক্ষণ তর্ক, ততক্ষণ মুখবাদ্য, ততক্ষণ সংঘাত (বিজ্ঞানের ভাষায়—interaction)। শাশ্বত আনন্দানুভূতিই যদি আমাদের স্বরূপ হয়, সর্ববাদিসম্মত একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহলে 'অদ্বৈত' হল সেই নির্বিকার, নির্গুণ, অবাঙ্‌মনসোগোচর, তর্কাতীত পরম সত্য লাভের অবস্থা। পাশ্চাত্যমনের উপযোগী করে এই পথগুলির সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিলেন স্বামীজী, কতিপয় আর্যঋষির মস্তিষ্ক থেকে মুক্ত হয়ে বেদান্ত এতদিন শিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে কিংবা ব্রাহ্মণের ভূর্জপত্রে আবদ্ধ ছিল। সেই অমৃত এবার ছড়িয়ে পড়ল জড়বাদী বিশ্বমানবের অনুসন্ধানী মস্তিষ্কে, সভ্যতার বিষবাষ্পে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে, এবং সহানুভূতিহীন, উদ্দেশ্যবিহীন কর্মচাঞ্চল্যে।

স্বামীজী ওদেশের দুগ্ধফেননিভ সুকোমল বিছানায় ঘুমোতে পারেননি, অধঃপাতিত ভারতের জন্য সে কী ব্যাথা, সে কী কান্না! তাঁর মনে হল, ভারতকে জাগাতে হলে বিদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন আছে, হাজার বৎসরের নিদ্রার তন্দ্রাচ্ছন্নভাব এক মুহূর্তে কাটবার নয়। তবে ভারতের জাগরণ সবেমাত্র শুরু হয়েছে

ভবিষ্যৎ ভারতের পথরেখার নির্দেশ তিনি দিয়ে গেছেন। এইটিই হল তাঁর ভারতদর্শনের তৃতীয় পর্ব।

ভারতকে জাগাতে হলে চাই খাঁটি দেশ সেবক। "পৃথিবীর সমস্ত ধনসম্পদের অপেক্ষা খাঁটি মানুষের মূল্য অনেক বেশী।…যখন তোমাদের মধ্যে এমন সব খাঁটি মানুষ উঠিবে, যাহারা দেশের জন্য সর্বস্বত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তখনই ভারত সবদিক দিয়া মহিমান্বিত হইবে। …পতিত, নিপীড়িত সর্বহারাদের সমবেদনায় সিংহবিক্রমে প্রচার করিয়া বেড়াইতে হইবে মুক্তির , সেবার বাণী, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের ।" স্বামীজী বারে বারে বলেছেন, "ভারতে যে কোন বিষয়ে উন্নতি করিতে গেলে প্রথমেই চাই ধর্মের অভ্যুত্থান। সমাজতান্ত্রিক অথবা রাজনৈতিক কোন মতবাদের আলোড়ন তুলিবার পূর্বে আধ্যাত্মিক ভাবের বন্যায় দেশ ভাসাইয়া দাও।…উপনিষদের সত্যগুলি তোমাদের সম্মুখে রহিয়াছে; ঐগুলি গ্রহণ কর, বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত কর……তোমার অন্তরদেবতাকে অস্বীকার না করিয়া তাঁহার অস্তিত্বে আস্থাবান্ হও।"

"হিন্দু সমাজে কালক্রমে বহু কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছে। আজ যদি উহাদিগকে বর্জন করিতেই হয়, তবে অবজ্ঞাভরে করিতে যাইও না।" কারণ এককালে এই জাতির সংরক্ষণে এদের বিশিষ্ট অবদান ছিল। "জবরদস্তি সমাজসংস্কারে আমার আস্থা নাই। আমার বিশ্বাস, স্বাভাবিক ক্রমোন্নতির প্রচেষ্টাই সঙ্গত।…ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, অধিকাংশ আধুনিক সংস্কার আন্দোলন শুধু পাশ্চাত্য ভাব ও কর্মপদ্ধতির নির্বিবেক অনুকরণ। নিশ্চয়ই উহা ভারতে চলিতে পারে না।…যদি যথার্থ সংস্কারক হইতে চাও, তবে তিনটি শর্ত পূরণ করিতে হইবে, সর্বাগ্রে সহানুভূতি। তারপর দেখিতে হইবে, তুমি প্রতিকারের কোন সন্ধান পাইয়াছ কিনা। সর্বশেষ দেখিতে হইবে, তোমার উদ্দেশ্যটি যথার্থ মহৎ কিনা। অর্থ, মান, যশ, প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতিতে প্রলুব্ধ হইয়া তুমি সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হও নাইত?"

স্বামীজী যে ধরনের লৌহ-মানব ও দেশ-সেবক চান তাদের তৈরি করবার জন্য চাই বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি শুধু কেরানী সৃষ্টির নিখুঁত একটি যন্ত্রবিশেষ। এর কু-প্রভাবে মানুষের শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাসহীনতা অবশ্যম্ভাবী।…"আমাদের প্রয়োজন সেই শিক্ষার, যাহা দ্বারা চরিত্র গঠন হয়, মনের বল বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয় এবং মানুষ স্বাবলম্বী হইতে পারে। চাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত বেদান্তের সমন্বয়—ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা এবং আত্মবিশ্বাস হইবে যাহার মূলমন্ত্র।…উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য জীবনের সমস্যাগুলি সমাধান করিবার সামর্থ্যলাভ। বস্তুতঃ এই প্রচেষ্টাতেই বর্তমান সভ্যজগতের গভীর অভিনিবেশ, অথচ আমাদের দেশে হাজার হাজার বৎসর পূর্বে এই সমাধান আবিষ্কৃত হইয়াছে।"

জ্ঞান আহরণের একটি মাত্র উপায় আছে। একাগ্রতাই সেই উপায়। মনকে যুক্ত এবং বিযুক্ত করবার ক্ষমতা সমভাবে পরিপুষ্ট হওয়া চাই। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে চাই ব্রহ্মচর্য যা অমিত তেজ, বিপুল ইচ্ছাশক্তি ও অটুট স্মৃতি-শক্তির একমাত্র কারণ, চাই শ্রদ্ধা, আত্মবিশ্বাস, চাই ভূমার সাধনা এবং সর্বোপরি পবিত্র চরিত্র।

স্বামীজী বলেন, "শিক্ষা বলিতে আমি বুঝি গুরুগৃহ-বাস। আচার্যের ব্যক্তিগত জীবনের সংস্পর্শ ছাড়া শিক্ষা হয় না। ছাত্রের সম্মুখে থাকা চাই সর্বোচ্চ শিক্ষার একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত। বিদ্যাদানের ভার ত্যাগীদেরই লইতে হইবে।"

…স্বামীজীর পরিকল্পিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রথমেই

প্রয়োজন একটি অসাম্প্রদায়িক মন্দির। "এই মন্দিরে আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়সম্মত অভিন্ন তত্ত্বগুলি শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই মন্দিরের সঙ্গে থাকিবে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে জনগণের মধ্যে ধর্মীয় এবং লৌকিক বিদ্যা (বিজ্ঞান, কারিগরীবিদ্যা প্রভৃতি) বিস্তার করিবার জন্ম উপযুক্ত শিক্ষকের দল গড়িয়া তুলা হইবে।"

"শিক্ষা বিস্তারই বর্তমান দুর্দশার প্রতিকার, তাই ভারতের ভিতরে ও বাহিরে মানবজাতি যে সকল মহান্ ভাবরাশি আবিষ্কার ও লালন করিয়াছে সেইগুলি দরিদ্রতম এবং দীনতম লোকের সম্মুখে হাজির করিতে হইবে, এবং তারপর নিজেদের সমস্যা পূরণের জন্ম তাহাদিগকে স্বাধীন চিন্তার অবসর দিতে হইবে। ...তোমরা এইসব ম্লান, মূক জনসাধারণকে তোমাদের আরাধ্য দেবতা মনে করিয়া অবিরত তাহাদের কথা ভাব, তাহাদের সেবা কর এবং তাহাদের কল্যাণের জন্ম প্রার্থনা করিয়া যাও—প্রভুই তোমাদের পথ দেখাইয়া দিবেন।"

ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথা প্রকৃত পক্ষে এক উচ্চ আদর্শের উপর অবস্থিত। সমগ্র মানব সমাজকে ধীরে ধীরে স্থির, শান্ত, পবিত্র, অহিংস, ধ্যাননিষ্ঠ ও ভক্তিপরায়ণ, আদর্শ দেবমানবের পর্যায়ে অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করাই এই বর্ণ বিভাগের উদ্দেশ্য "জাতিভেদ প্রথা লোপ পাইলে চলিবে না; অবশ্য ইহাতে যুগোপযোগী পরিবর্তন কখনও কখনও করিতে হইবে।...বস্তুতঃ বর্ণ-বিভাগ একরকম প্রাকৃতিক বিন্যাস! তবে শ্রেণী-গত অধিকার বৈষম্য থাকিলে চলিবে না। আমার দৃঢ় প্রত্যয়, প্রত্যেক হিন্দুই অপর সব হিন্দুর ভাই; আমরাই ছুঁইওনা ছুঁইওনা রবে কোটী কোটী হিন্দুকে অধঃপাতিত করিয়া ফেলিয়াছি। উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের অবনমিত করিয়া, অথবা পানাহারে স্বেচ্ছাচারিতা দেখাইয়া, অথবা অধিকতর ভোগের জন্ম নিজেদের সামাজিক গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আমাদের জাতি সমস্যার সমাধান হইতে পারে না, যদি আমরা প্রত্যেকে আমাদের বৈদান্তিক ধর্মের অনুশাসনগুলি পালন করিয়া আত্মিক বলে বলীয়ান্ আদর্শ ব্রাহ্মণ হইতে পারি, তবেই হইবে এই সমস্যার সমাধান।...যে শিক্ষা, যে সংস্কৃতি উচ্চবর্ণের ক্ষমতার উৎস, তাহা নিম্নবর্ণীয়দের আত্মসাৎ করিতে হইবে, ইহাই বর্ণসাম্য প্রতিষ্ঠিত করিবার একমাত্র উপায়।"

বেদের যুগে দেখা যায়, মহীয়সী রমণীদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভে অধিকার ছিল। তাছাড়া নারীর প্রতি ন্যায্য সম্মান দিয়েই সবজাতি বড় হয়েছে। কারণ, সুশিক্ষিতা এবং ধর্মপ্রাণা জননীর ঘরেই মহাপুরুষের জন্ম হয়। স্বামীজীর পরি-কল্পনামত ব্রহ্মচর্যাভ্যাস এবং স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটালে শত শত গার্গী, মৈত্রেয়ী, মীরা-বাঈকে ফিরে পাওয়া অসম্ভব হবে না।

পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান ব্যতীত সম বেদনা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক স্থাপিত হয় না, বহু শতাব্দী ধরে জগৎকে বিলানোর মতো আমাদের কাছে মজুত রয়েছে প্রচুর জ্ঞানের খোরাক। পাশ্চাত্য মনীষা পৃথিবীর সর্বত্র অবিশ্রান্তভাবে অন্বেষণ করেও পায়নি শান্তির সন্ধান, তারা সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করে বুঝতে পেরেছে যে, ঐ ক্ষণস্থায়ী সুখ একেবারেই শূন্যগর্ভ, তাই তাদের অন্তরে ভারতের অধ্যাত্মভাব গভীরভাবে প্রবিষ্ট করানোর এখনই প্রকৃষ্ট সময়। "তোমরা ধর্মে বিশ্বাস কর আর নাই কর, যদি জাতীয় জীবনকে অব্যাহত রাখিতে চাও, তবে একনিষ্ঠ-ভাবে অধ্যাত্মবিদ্যাটি দখল করিয়া থাকিতে হইবে। একহাতে উহা ধরিয়া থাক, অন্য হাত বাড়াইয়া অপরাপর জাতির নিকট হইতে শিক্ষণীয় যাহা কিছু আছে তাহা আহরণ করিয়া যাও;

অবশ্য লক্ষ্য রাখিও সেইসব আহৃত বিদ্যা যেন হিন্দুর মূল জীবনাদর্শের অনুগত থাকে। এরূপ করিতে পারিলে ভাবী ভারত এমনই মহিমায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে যেরূপ পূর্বে কোনকালেই ছিল না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, সেই শুভ দিন আসিতে আর বিলম্ব নাই, তখন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাচীন মহাপুরুষদের অপেক্ষাও অধিকতর প্রভাবশালী মহর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি এদেশে জন্ম গ্রহণ করিবেন। এইরূপ ভাবী ভারত প্রস্তুত হইয়া জাগরণের প্রতীক্ষা করিতেছে মাত্র।…কুম্ভকর্ণের মতো অমিতবিক্রম এক বিরাট দৈত্য সুপ্তোত্থিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেছে—বাহিরের কোন শক্তিই আর তাহাকে দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না।…প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস কর, শ্রীভগবানের অলঙ্ঘ্য আদেশে এবার ভারতের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী, দেশের দুর্গত জনগণের সুখসমৃদ্ধির দিন সমাগত।…উঠ, তাহাকে জাগাইয়া দেখ, নবজীবন লাভ করিয়া আমাদের দেশজননী পূর্ব পূর্ব যুগ অপেক্ষা অধিকতর মহিমায় তাঁহার শাশ্বত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।"*

* এই প্রবন্ধে উল্লিখিত উক্তিগুলি স্বামীজীর "ভারত কল্যাণ" (অনুবাদ ও সংকলন) স্বামী নির্বেদানন্দ, সপ্তম সংস্করণ, প্রকাশক—রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, বেলঘরিয়া, কলিকাতা-৫৬ থেকে নেওয়া হয়েছে।—লেখক

সংস্কৃতঃ ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার ধারক ও বাহক

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

সমাজ ও সংস্কৃতি রূপ পরিগ্রহ করে তার সাহিত্যের মাধ্যমে। চিন্তাশীল দার্শনিক ও সাহিত্যিকগণ যেভাবে চিন্তা করিয়াছেন সেই চিন্তার ধারাই সাহিত্যে রূপায়িত হইয়া কালজয়ী সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব ইহা তিন ভাগে বিভক্ত—বৈদিক সংস্কৃত, পৌরাণিক সংস্কৃত ও আধুনিক সংস্কৃত। এই ভাগত্রয় অবলম্বনে সংস্কৃতভাষা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় সমাজের নানাদিক বিবেচনা করিয়া দেশের ও দশের কল্যাণ বিধান করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে।

বৈদিক ও ঔপনিষদিক সাহিত্য, তদানীন্তন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়াবলম্বনে বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই বিষয়গুলি জানিতে হইলে সংস্কৃতভাষায় জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। রাজা প্রজাগণের প্রতি, প্রজাগণ রাজার প্রতি, শিষ্য গুরুর প্রতি, গুরু শিষ্যগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন তাহা অতি সুনিপুণভাবে সেই প্রাচীনযুগে বেদে ও উপনিষদে বর্ণিত দেখিয়া চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দ বিস্মিত, স্তম্ভিত ও আশ্চর্যান্বিত হইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়েন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভাকাঙ্ক্ষী ঋষিগণ ও প্রতিভাসম্পন্ন প্রজাবৃন্দ যেভাবে কুশহস্তে বিনীতভাবে ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুসমীপে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব মনোভাব তাঁহার নিকট নিবেদন করিতেন তাহা সেকালে, একালে ও চিরকালে—সর্বজনগণের হৃদয়ে চিরস্থায়িভাবে স্থান পাইবার দাবী রাখে। বৈদিক যুগে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিবৃন্দ জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, সূর্য আমাদের কত উপকার করিতেছে তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বৈদিক ঋষিগণ জলকে আবাহন করিয়া বলিয়াছেন "হে জল! তুমি আমাদের রোগ বিদূরিত কর, তুমি আমাদিগকে অন্নদান কর এবং

দেহাবসানে পরব্রহ্ম সমীপে যাইতে সাহায্য করিও।" বায়ুকে বলিয়াছেন, "হে বায়ু! তোমার মধ্যে যে দৈবশক্তি বিদ্যমান উহাদ্বারা আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ জাগতিক কার্য করিতে সাহায্য করিও।" অগ্নিকে বলিয়াছেন, "হে অগ্নি! তুমি আমাদের সমস্ত পাপ বিদূরিত করিয়া অন্নগ্রহণে সাহায্য করিও।" সেই বৈদিক যুগে ঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন এই সমস্ত নানাগুণ-সমন্বিত জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির উপকারিতা প্রাণিগণের দেহধারণের জন্য কত বেশি। বৈদিক কৃষ্টি ও সভ্যতা আমাদিগকে চিরদিন সুপথে পরিচালিত করিয়াছে ও করিবে। বেদোক্ত কৃষ্টি ও সভ্যতা সংস্কৃতে লেখা, সুতরাং সংস্কৃতের সহিত বৈদিক সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। আজকালকার বৈজ্ঞানিকগণ সূর্যকিরণের মধ্যে যে সপ্তপ্রকার বর্ণের কথা বলিয়াছেন উহা বৈদিক ঋষিগণের অবিদিত ছিল না। তাঁহারা সূর্যকে বলিয়াছেন "সপ্তাশ্ববাহনঃ" অর্থাৎ সপ্তপ্রকার বর্ণবিশিষ্ট সূর্য। তাঁহারা বলিয়াছেন, "হৃদ্‌রোগং নাশয়" অর্থাৎ হে সূর্য! তুমি আমাদের হৃদয়স্থিত ব্যাধি দূর কর। "সূর্যঃ আত্মাজগতঃ তস্থুষশ্চ" প্রকাশস্বরূপ সমস্ত দেবতার সমষ্টি স্থাবর ও জঙ্গমের অন্তর্যামী সূর্য আশ্চর্যরূপে উদিত হইয়াছেন।

ঐ বৈদিক কৃষ্টি ও সভ্যতা উপনিষদেও দেখিতে পাওয়া যায়। "ঈশোপনিষদের" শেষ শ্লোকটি সমস্ত উপনিষদ্‌কে আলোকিত করিয়া উদ্ভাসিত করিয়াছে, "অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।/যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম॥" —হে অগ্নি! সমস্ত প্রকাশিত কর্ম সমূহ জানিয়া আমাদিগকে সুপথে পরিচালিত কর। আমাদের বঞ্চনাত্মক কর্মসকল বিনাশ কর। আমরা কায়মনোবাক্যে তোমাকেই নিজাত্মা সমর্পণ করিলাম। তোমাকে প্রণাম করি। এই জগৎ ত্যাগ করিয়া মানব কিভাবে অমৃতের অধিকারী হইতে পারে সেই সম্বন্ধে "কেন উপনিষদ্" দ্বিতীয় খণ্ডে যাহা বলিয়াছেন তাহা ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার চরম উৎকর্ষ।

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥"

—যিনি সেই জ্ঞানময় পুরুষকে জানিয়াছেন তিনিই সত্যকে জানিয়াছেন। যদি সেই জ্ঞানময় পুরুষকে জানা না হয়, তাহা হইলে সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি জগৎ ও জগদতীত সম্বন্ধে সুনিপুণভাবে পার্থক্য বুঝিতে সক্ষম হইয়া থাকেন; সুতরাং মরণের পরেও তাঁহারা অমর হইয়া সকলের হৃদয়-মন্দিরে চিরপূজিত হইয়া থাকেন। সেই যুগে ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা কতদূর উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল এই শ্লোকটি তাহারই যেন দিগ্‌দর্শন। কঠোপনিষদে নচিকেতা যমকে যেভাবে জগতের নশ্বরতার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন তাহা ভারতীয় সভ্যতার বিজয়-বৈজয়ন্তীমালারূপে জগদ্বাসিগণকে চিরদিন অমরত্বের আকাঙ্ক্ষার প্রতি অনুপ্রেরণা যোগাইবে।

"শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্বেন্দ্রিয়াণাং
জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব, তবৈব বাহাস্তব
নৃত্যগীতে॥" ১।১।২৬

হে কালপুরুষ যম! মরণশীল মানবের এই ঐশ্বর্যসকল আগামী কল্য পর্যন্ত স্থায়িরূপে বিদ্যমান। ইন্দ্রিয়সকলের তেজোদ্দীপ্ত ঔজ্জ্বল্য সমস্তই ধ্বংস হইয়া যায়। জীবন ক্ষণবিধ্বংসী। তোমার এই শকট-বাহন ও নৃত্যপরায়ণা নারী এবং তাহাদের মধুর সঙ্গীতসমূহও অচিরে কোথায় যেন বিলীন

হইয়া যাইবে। ভারতীয় সভ্যতার ধারক ও বাহকরূপে এই শ্লোকটি জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করে না কি ?

জগৎস্রষ্টা যে আছেন, তাহা নচিকেতাকে যম যেন প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়া দিতেছেন এই বিখ্যাত শ্লোকটি দ্বারা—

"ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥"

—সেখানে সূর্য কিরণ দান করে না, চন্দ্র ও তারকা যেন ম্লান হইয়া বিদ্যমান, বিদ্যুৎ সেখানে চমকায় না, পার্থিব অগ্নি নিষ্প্রভ। সমস্ত উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট পদার্থই সেই মহানের মহিমোজ্জ্বল মহিমার অনুসরণ করিতেছে। তাঁহার উজ্জ্বলতায় সমস্ত কিছুই উজ্জ্বল। পূর্বোক্ত বেদ ও উপনিষদের চিন্তাসমূহ ও ভাবধারা ভারতের সংস্কৃতিরই মূল উৎস। এই সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ, সুতরাং সংস্কৃতভাষায় জ্ঞান না থাকিলে ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ কি করিয়া হইবে ? গ্রন্থে বর্ণিত ভাবধারার উৎসে যাইতে হইলে, সেই গ্রন্থের মূল ভাষা জানিতে হইবে, কারণ অনূদিত ভাষার মাধ্যমে তা সম্ভব হইবে না। সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের সহিত ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত।

বাংলা, হিন্দি প্রভৃতি এযুগের প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষাগুলি পুষ্টি লাভ করে তাহাদের জননী সংস্কৃত ভাষা হইতে।

পৌরাণিক যুগের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে শ্রীব্যাসদেবের কথা। তিনি কে ছিলেন, কোথায় কিভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা লইয়া মস্তিষ্ক পরিচালনা করিবার প্রয়োজনীয়তা আপাতত: স্থগিত রাখিয়া শুধু এইটুকু বলিলেই বোধ হয় চলিবে যে তাঁহার ন্যায় এত বড় বিচক্ষণ কবি ও লেখক এই জগতে আজ পর্যন্ত আবির্ভূত হন নাই। সমস্ত অষ্টাদশ পুরাণ, উপপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত এবং অন্যান্য স্তোত্রাদি যদি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসেরই রচিত বলিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তবে বলিতে হইবে এত বেশি গ্রন্থ এই জগতে অন্য কেহ রচনা করিতে সক্ষম হন নাই। কি কবিত্ব শক্তির প্রতিভায়, কি দার্শনিকতায়, কি বিষয় বস্তুর বর্ণনা ক্ষমতায়, কি মনস্তত্ত্ব বিষয়ের গভীর দৃষ্টিভঙ্গিমায় শ্রীব্যাসদেবের অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যে ও চিন্তা-বিদগ্ধতায় সকলেই মুগ্ধ ও বিমূঢ়চিত্তে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া পারে না। আমাদের বর্তমান সমাজের শিক্ষার, কৃষ্টির, সভ্যতার, ও মননশীলতার সবকিছুরই মূল উৎস শ্রীব্যাসদেবের গ্রন্থাবলী। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে শ্রীব্যাসদেবের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি অপরিহার্য। আমাদের দেশের বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ কথায় কথায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কথা উল্লেখ করেন, সেই গীতাও শ্রীব্যাসদেবের রচিত মহাভারতের ভীষ্মপর্ব হইতে আমরা পাইয়াছি। এ-সমস্তই সংস্কৃতে লেখা, সুতরাং এদের পূর্ণ রসাস্বাদন করিতে হইলে তাহা মূল ভাষাতেই করিতে হইবে। সংস্কৃত না পড়িয়া না জানিয়া কেহই পুরাণাদি পাঠে সক্ষম হইবে না। গৃহীর, ব্রহ্মচারীর, সন্ন্যাসীর ও সাধারণ মানুষের কিভাবে জীবনযাপন করিতে হইবে সমস্তই আমরা শ্রীব্যাসদেবের রচিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে পাইতে সক্ষম হই। কেবলমাত্র পুরাণগুলি পাঠ করিলেই কাহারও পক্ষে পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হওয়া যায়। শ্রীব্যাসদেবের পরেই মনে পড়ে মহর্ষি বাল্মীকির কথা। ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক মহর্ষি বাল্মীকি। মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের চরিত্রসকল আসমুদ্র-হিমাচল ভারতীয় নরনারীগণের সুপরিচিত। রাম, সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ, হনুমান, বিভীষণ, রাবণ

কে ছিলেন, তাঁহাদের চরিত্র কিরূপ ছিল তাহা সকলেরই জ্ঞাতব্য। শ্রীরামচন্দ্রের বীরত্ব, মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব, ভরত ও লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, সীতার পাতিব্রত্য, হনুমানের ভক্তি ও বিশ্বাস, রাবণের যুদ্ধস্পৃহা, বিভীষণের কর্তব্যপরায়ণতা—শিশু, বালক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলকেই একটা নূতন অনুপ্রেরণা দান করে। এই অপূর্ব গ্রন্থখানি মহর্ষি বাল্মীকি রচনা করিয়া সমস্ত ভারতীয় জনগণের নিকট চিরপূজ্য হইয়াছেন এবং "মহর্ষি" এই আখ্যায় বিভূষিত হইয়া প্রতি ভারতীয়গণের হৃদয়াসনে অমর হইয়া রহিয়াছেন। এই যুগের মানবগণ যদি রামায়ণের চরিত্রসমূহের অনুকরণ করিতে চান তাহা হইলে সংস্কৃতভাষায় জ্ঞানার্জনান্তে রামায়ণে বর্ণিত চরিত্রগুলি অনুধাবন করিয়া ধীরস্থিরভাবে তাঁহাদের অগ্রসর হইতে হইবে, অন্যথা ভুল পথে পরিচালিত হইবার সম্ভাবনাই বেশি।

বেদব্যাস ও বাল্মীকির পরেই বলিতে হয় বশিষ্ঠ, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের কথা। ইঁহারা সকলেই ভারতীয় নরনারীকে শুদ্ধভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া চরিত্রবান হইয়া "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জননী ও জন্মভূমিকে সেবা করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। আমাদের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা, পূজা, পাঠ, ধ্যান, ধারণার জন্য ইঁহাদের অবদান অবিস্মরণীয়। ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, মনু, যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায়, পুরাণবর্ণিত স্ত্রী চরিত্রগুলিও আমাদের দৈনন্দিন কার্যে আমাদিগকে অনুপ্রেরণা যোগায়। প্রাতঃস্মরণীয়া লোপামুদ্রা, অরুন্ধতী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর পূতচরিত্রসকলের চিন্তা আমাদিগকে নব নব ভাবে উৎসাহ দান করে। আমাদের শিক্ষা ও সভ্যতার মূল উৎস অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থগুলি সংস্কৃতভাষায় রচিত বলিয়া সংস্কৃত আমাদের জাতীয় জীবনের মূল মেরুদণ্ড স্বরূপে বিদ্যমান। আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি, তাই সংস্কৃতকে বাদ দিয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করিতেছি, ইহার পরিণাম ভয়াবহ। আমাদের জাতীয় জীবনকে দৃঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও মেধাসম্পন্ন করিতে হইলে রামায়ণে, মহাভারতে ও পুরাণাদিতে বর্ণিত চরিত্রসমূহের পঠনপাঠন ও অনুকরণ যে একান্ত প্রয়োজনীয় ইহা সমস্ত সুধীজন কর্তৃক স্বীকৃত। বেদ ও উপনিষদুক্ত ভরদ্বাজ, সত্যকাম, কাত্যায়ন ও পিপ্পলাদের চরিত্রসমূহ এবং রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে বর্ণিত সাধক ও ভক্তজনগণের চিন্তাধারা, ভারতের মনীষিবৃন্দের সুচিন্তিত ভাবধারাকে চিরদিন অনুপ্রাণিত করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে।

আধুনিক যুগের ধারক ও বাহক রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতির গ্রন্থনিচয় ভালভাবে পড়িলে দেখা যাইবে সংস্কৃতশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কত বেশি। সংস্কৃত না জানিয়া ও তদ্ভাবে ভাবান্বিত না হইয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে কোন কথা বলা বৃথাশ্রমে পর্যবসিত হইবে।

ভ্রম-সংশোধন

১৩৯২-এর চৈত্র সংখ্যার ১৯৮ পৃষ্ঠায় 'শ্রীমতী কনা বন্দ্যোপাধ্যায়' স্থলে 'শ্রীমতী কনা বন্দ্যোপাধ্যায়' পড়তে হবে।—সঃ

পুরাতনী

বকরূপী ধর্ম ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন

বনবাসের দিনগুলি ছিল পাণ্ডবদের কাছে বহুবৈচিত্র্যময় ঘটনায় পরিপূর্ণ। একবার একজন ব্রাহ্মণ পাণ্ডবদের কাছে একটি প্রার্থনা নিয়ে হাজির হলেন। তাঁর অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অরণি ও মন্থ (প্রাচীনকালে যজ্ঞাদিতে একটি কাষ্ঠ-খণ্ডের উপর অপর আর একটি দণ্ডাকার কাষ্ঠখণ্ড রেখে আগুন জ্বালাবার বিধি ছিল। নিচের কাঠটিকে বলা হত অরণি আর উপরেরটিকে বলা হত মন্থ) একটি হরিণ শিং-এ করে নিয়ে পালিয়ে গেছে। সেই অরণি ও মন্থ তাঁদের উদ্ধার করে দিতে হবে। পঞ্চপাণ্ডবের প্রত্যেকেরই ছিল বিশাল হৃদয়। অপরের সামান্য উপকারও করতে পারলে তাঁদের আনন্দের অবধি থাকত না। তাঁরা তখনই বেরিয়ে পড়লেন সেই হরিণটির খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে তাঁরা একটি বটগাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছেন, এমন সময় যুধিষ্ঠির নকুলকে বললেন—ভাই নকুল, বটগাছের উপরে উঠে দেখ তো, কাছে কোথাও কোন জলাশয় আছে কিনা। নকুল গাছের উপরে উঠে, শুধু জলের ধারেই জন্মায় এমন কতকগুলো গাছ দেখে এবং সারস পাখীর ডাক শুনে অনুমান করলেন—নিকটে নিশ্চয়ই কোন সরোবর আছে। তাঁর এই অনুমানের কথা যুধিষ্ঠিরকে জানালে তিনি তাঁকে তূণে করে জল নিয়ে আসবার জন্য বললেন। সেই অনুযায়ী ওখানে গিয়ে নকুল দেখলেন তাঁর অনুমান ঠিক। এটি অজস্র পদ্মফুল-শোভিত একটি সরোবর। সেই সরোবর দেখে নকুলের খুব আনন্দ হল। তৃষ্ণা নিবারণার্থ সরোবরে নেমে জলপান করতে যাচ্ছেন, এমন সময় নকুল শুনতে পেলেন এক অদৃশ্য ব্যক্তির কণ্ঠস্বর—বৎস, আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তারপর জলপান কর। নকুল সে-কথা গ্রাহ্য না করে জলপানে অগ্রসর হলেন, ফলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। নকুলের ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে যুধিষ্ঠির সহদেবকে পাঠালেন নকুলের খোঁজে। সেই অদৃশ্য ব্যক্তির নির্দেশ অগ্রাহ্য করায় সহদেবও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হলেন, এবং একইভাবে ভীম ও অর্জুনেরও সরোবরের তীরে এসে একই দশা হল। তখন যুধিষ্ঠির সেই স্থানে এসে চার ভাই-এর মৃতদেহ দেখে বিলাপ করতে লাগলেন। তারপর তৃষ্ণা মেটাবার জন্য তিনিও যখন জলে নামলেন, ঠিক সেই সময় যুধিষ্ঠিরও শুনতে পেলেন, কে যেন বলছে—আমি বকরূপধারী যক্ষ। তোমার ভাইদের আমিই বধ করেছি। আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে না পারলে তোমারও ঐ দশা হবে। শুনে যুধিষ্ঠির তখন তাঁকে প্রশ্ন করতে বললেন এবং প্রত্যেক প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে যেতে লাগলেন। প্রশ্নোত্তরগুলির কয়েকটা এরূপ :

যক্ষ। কি ত্যাগ করলে লোকপ্রিয় হওয়া যায়? কি ত্যাগ করলে চিত্তসন্তাপ ভোগ করে

না? কি ত্যাগ করলে মানুষ ধনী হয়? কি ত্যাগ করলে সুখী হয়?

যুধিষ্ঠির। মানং হিত্বা প্রিয়ো ভবতি ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি। / কামং হিত্বা অর্থবান ভবতি লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ॥—মানুষ গর্ব পরিত্যাগ করে লোকের প্রিয় হয়, ক্রোধ পরিত্যাগ করলে চিত্তসন্তাপ ভোগ করে না, আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করলে ধনী হয় এবং লোভ পরিত্যাগ করলে সুখী হয়।

যক্ষ। বার্তা কি?

যুধিষ্ঠির। অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে সূর্যাগ্নিনা রাত্রিদিনেন্ধনেন। / মাসর্তুদর্বী পরিঘট্টনেন ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা॥—সূর্য যার অগ্নি, দিবারাত্র যার জ্বালানি, আর মাস-ঋতু যার হাতা—কাল সেই মহামোহরূপ কড়াই-এ প্রাণিগণকে অনবরত রাঁধছে—এই বার্তা। সমস্ত প্রাণীই কালে বিনাশপ্রাপ্ত হয়,—এটি স্মরণে রেখে বৈরাগ্য অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়—এটিই বার্তা।

যক্ষ। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য কি?

যুধিষ্ঠির। অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।/শেষাঃ স্থিরত্বম্ ইচ্ছন্তি কিম্ আশ্চর্যম্ অতঃপরম্॥—প্রতিদিনই অসংখ্য প্রাণী মারা যাচ্ছে। কিন্তু যারা বেঁচে আছে, তারা এগুলি দেখেও মনে করছে, চিরদিন তারা বেঁচে থাকবে—এর চেয়ে আশ্চর্যজনক জিনিস আর কি আছে!

যক্ষ। পন্থা কি?

যুধিষ্ঠির। বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।/ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥—বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, এমন মুনি নেই যাঁর মত ভিন্ন নয়। ধর্মের তত্ত্ব অত্যন্ত গূঢ়। সুতরাং মহৎ ব্যক্তিরা যে পথ দেখিয়ে গেছেন, সেটিই যথার্থ পথ। সর্বসাধারণের সেই পথই অনুসরণ করা কর্তব্য।

যক্ষ। সুখী কে?

যুধিষ্ঠির। দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।/অনৃণী চ অপ্রবাসী চ স বারিচর! মোদতে॥—হে জলচর বক! যে ব্যক্তি ঋণী ও প্রবাসী না হয়ে সন্ধ্যাকালে শাকান্নমাত্র ভোজনেই তৃপ্ত হন, অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অল্পেই সন্তুষ্ট হন, তিনিই সুখী।

যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে সবগুলি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেয়ে যক্ষ খুব খুশি হলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন—চারজনের মধ্যে তুমি একজনের নাম কর, যাকে আমি প্রাণদান করব। যুধিষ্ঠির বললেন—আপনি নকুলের প্রাণদান করুন। তাহলে আমাদের দুই মাতা—কুন্তী ও মাদ্রী—উভয়েরই সন্তান জীবিত থাকবে। যুধিষ্ঠিরের উত্তর শুনে বকরূপী যক্ষ আরও সন্তুষ্ট হলেন। তিনি চারজনকেই প্রাণদান করলেন আর বললেন—আমি তোমার পিতা ধর্ম। বকরূপ ধারণ করে তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম মাত্র। পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। এখন ইচ্ছামতো বর প্রার্থনা কর। যুধিষ্ঠির তখন, পূর্ব-বর্ণিত অগ্নিহোত্রকারী ব্রাহ্মণের জন্য—অরণি ও মন্থ এবং নিজেদের জন্য (পঞ্চপাণ্ডবের)—অজ্ঞাতবাসের এক বছর যাতে তাঁদের কেউ চিনতে না পারে—এই বর প্রার্থনা করলেন। বকরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরের প্রার্থিত বর মঞ্জুর করে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করলেন।

[মহাভারত, বনপর্ব অবলম্বনে]

পুস্তক সমালোচনা

অমৃতধারার ত্রিবেণী তীর্থে—লেখক : ধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন। প্রকাশক : হাওড়া শ্রীরামকৃষ্ণ ধে, ১।বি/২ ওলাবিবিতলা লেন, হাওড়া-৭১১১০৪। : ১৬০. মূল্য : ২০ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারে বর্তমান বইটি একজন সুযোগ্য লেখকের সময়োচিত নিবেদন। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সংযোজিত ভূমিকা একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের জানবার তৃষ্ণা বৃদ্ধি করে, অপরদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ-গবেষকদের হৃদয়ে গভীর তৃপ্তি প্রদান করে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন ঠাকুরের এক-একটি কথা নিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শন লেখা যায়। অধ্যাপক সেনের বর্তমান সংকলনটি ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জীবনকে কত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে দর্শন করা সম্ভব—তারই একটি অতি মধুর প্রয়াস।

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণের সমন্বয়বাণী "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" বর্তমান যুগে "যতমত ততপথ"-রূপে শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ধর্মক্ষেত্রে সমন্বয়-সাধন ছাড়াও বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদের অগ্নি-পরীক্ষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী উত্তীর্ণ ও বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ছে সমগ্র বিশ্বে।

বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের স্বমতে আনয়নের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান অস্ত্র ছিল জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবার প্রতি অলৌকিক প্রেম। স্কটিশচার্চ কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ উইলিয়াম হেষ্টি হিন্দুধর্মের উপর অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন বটে, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথম নরেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধান দেন। একদা যে কেশব সেন Farewell to Vedanta লিখেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সংস্পর্শে এসে তাঁকেই আবার লিখতে হয়েছিল—Our Return to Vedanta. শুধু তাই নয় ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পর ব্রাহ্মপত্রিকা "ধর্মতত্ত্ব" লিখেছিল—"বঙ্গভূমি একটি সাধুরত্ন হারাইল··· ১লা ভাদ্র সোমবার অপরাহ্ন ৫টার সময় কাশীপুরস্থ গোপালবাবুর বাগানবাটি হইতে পরমহংসদেবের দেহ বরাহ-নগরের শবদাহ ঘাটে নীত হয়! কলিকাতা হইতে একশত-দেড়শত লোক যাইয়া অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন। ···হিন্দু ধর্মের ত্রিশূল ও ওঁকার, বৌদ্ধ ধর্মের খুন্তি, মোহাম্মদীয় ধর্মের অর্ধচন্দ্র, খৃষ্ট ধর্মের ক্রস্-চিহ্নিত পতাকা সর্বাগ্রে বাহিত হইয়াছিল।···" মানবমৈত্রীর অকলঙ্ক আদর্শ ও তার সার্থকতম বাস্তব রূপায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছিল।

সেবার মধ্য দিয়ে মানুষের স্বার্থপরতা, অহমিকা সহজে দূর হয় এবং সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনের যোগ্যতা সহজসাধ্য হয়। কাজেই "শিবজ্ঞানে জীবসেবা" মানুষে মানুষে মৈত্রী-রচনার শ্রেষ্ঠতম ও আধুনিকতম উপায়। জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের পক্ষে ইহা গ্রহণযোগ্য—এমন কি নাস্তিকেরও পর্যন্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রামের হাটের ও মাঠের ভাষাকে কলকাতার শিক্ষিত সমাজে ধর্ম ও দর্শনের প্রচারের জীবন্ততম বাহনে পরিণত করেছিলেন। লোকজীবনের পরিচিত ঘটনা ও দৃষ্টান্ত সমূহ ছিল তার মাধ্যম।

আক্ষরিক অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাজ সংস্কারক ছিলেন না, কিন্তু বৈপ্লবিক চিন্তায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ধনী কামারনীর হাতে ভিক্ষা গ্রহণ, চালকলা-বাঁধা বিদ্যা বর্জন, ভক্তের জাতিভেদ অস্বীকার, স্বীয় পত্নীকে ষোড়শীরূপে উপাসনা প্রভৃতি কার্য সমাজোন্নয়নের পথে বিরাট পদক্ষেপ।

শ্রীমাকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন—"তুমি কি

আমাকে সংসার পথে টেনে নিতে এসেছ ?" উত্তরে সহধর্মিণী বলেন, "না, আমি তোমায় সংসারের মধ্যে টেনে আনতে আসিনি, আমি তোমায় ইষ্টলাভে সহায়তা করতে এসেছি।" এতে বোঝা যায় শ্রীমা যে ভক্তজনের পুষ্পাঞ্জলি পেয়েছেন তার কারণ এই নয় যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই তাঁর জীবন ছিল অপরিসীম পুণ্যদীপ্তিতে জ্যোতির্ময়। যখন তিনি বলেন, "শরৎ (সারদানন্দ) যেমন আমার ছেলে, আমজাদও তেমনি আমার ছেলে"—তাঁর বিশ্বজননীর রূপ আমাদের চোখে প্রকটিত হয়।

ভগবান বুদ্ধের আড়াই হাজার বৎসর পর যে বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে শিক্ষাগুরুর আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন—তিনি মাকে প্রণাম করে বলেছিলেন, "মা এইটুকু জানি, তোমার আশীর্বাদে আমার মতো তোমার অনেক নরেনের উদ্ভব হবে, শত শত বিবেকানন্দ উদ্ভূত হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও জানি, তোমার মত মা জগতে ঐ একটিই আর দ্বিতীয় নেই।"

হিন্দুধর্ম, সাহিত্য, সমাজ ও ইতিহাসের পটভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দের চিত্র গ্রন্থকার অতি সুন্দর ও যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে বর্ণনা করেছেন। সমন্বয়ের আচার্যরূপে স্বামী বিবেকানন্দ রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাসতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্মকথা পর্যালোচনা দ্বারা মানুষ যে স্বরূপতঃ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব তা প্রমাণিত করেছেন। হোন তিনি সাম্যবাদী, কি গণতন্ত্রী, ব্যক্তিস্বাধীনতার পূজারী, কি রাষ্ট্রের সর্বময় প্রভুত্বে বিশ্বাসী—এতে কিছু আসে যায় না। মানুষ যে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম এই পরম প্রজ্ঞায় মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

ভগ্নী নিবেদিতার মতে স্বামীজীর চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল তাঁর শক্তিমত্তা। ভগ্নী ক্রিস্টিনের দৃষ্টিতে স্বামীজীর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রেম। প্রকৃতপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে দুইটি আপাতবিরোধী গুণের অপূর্ব সামঞ্জস্য ঘটেছিল। তাঁর তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা যেমন তুলনাহীন ছিল, তেমনি সীমাহীন ছিল তাঁর প্রেম।

অপর দিকে দেখা যায় যে, ই. টি. স্টার্ডি স্বামীজীকে একদা গুরুরূপে গ্রহণ করে পরে তাঁর তীব্র বিরোধিতা করেন। স্বামীজীর জীবদ্দশায় আর স্টার্ডির সঙ্গে যোগসূত্র পুনঃস্থাপিত হয়নি। এমন কি স্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদ জেনেও স্টার্ডি একটি কথাও উচ্চারণ করেননি। দীর্ঘ ৩৫ বৎসর পরে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে বিবেকানন্দ-স্মৃতিসভায় স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে স্টার্ডি উদ্যোক্তাকে একটি পত্রে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রেরণ করেন। এই দীর্ঘসময়ের মধ্যে তাঁর মত পরিবর্তনের জন্য কোনরূপ যুক্তি, তর্ক, অনুরোধ, উপরোধ কিছুরই প্রয়োজন হয়নি। শুধু স্টার্ডির ক্ষেত্রেই নয়—গ্রন্থকার ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী সরলাদেবীর দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, বিবেকানন্দ-ভাবধারা অপ্রতিরোধ্য। এই অমৃতধারার উৎস—শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের মাধ্যমে বেগবতী এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর দ্বারা প্রসার লাভ করে। এই ত্রিবেণীসঙ্গমে অবগাহন বর্তমান যুগে কারও পক্ষে এড়ানো সম্ভব নয়।

শেষ তিনটি প্রবন্ধ "ধুনির পবিত্র আলোকে", "লোক কল্যাণের জীবন্ত বিগ্রহ স্বামী প্রেমানন্দ" এবং "ধর্মপ্রসঙ্গ"—পূর্বোল্লিখিত ত্রিবেণী তীর্থের ফলশ্রুতি মাত্র এবং লেখকের গভীর মননশীলতার পরিচয় প্রদান করে। পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

—স্বামী জয়দেবানন্দ

ছোটদের অভেদানন্দ—স্বামী অমিতানন্দ। প্রকাশক : শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণিক, ১৫৩/৪, বি. টি. রোড, কলকাতা-৭০০০৩৫। পৃঃ ৪+১৫২ ; মূল্য : বারো টাকা।

গ্রন্থটি সুলিখিত। মাত্র ১৫২ পৃষ্ঠার স্বল্প পরিসরে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দের সুদীর্ঘ তিয়াত্তর বৎসরের জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী লেখক অতি সাবলীল ভঙ্গীতে তুলে ধরেছেন বাংলার তরুণ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছ, বর্ণন-শৈলী সহজ ও সুন্দর। গ্রন্থে স্বামী অভেদানন্দের অপরূপ জীবনের স্মরণীয় ঘটনাগুলি বিশদভাবে আলোচিত হলেও তাঁর বক্তৃতা ও বাণী এই ক্ষুদ্রায়তন পুস্তিকায় বিশেষ স্থান পায়নি। একটি ছোট্ট পরিশিষ্টে ও দুটি পাদটীকায় কয়েকটি মাত্র বাণী স্বতন্ত্রভাবে সন্নিবেশিত এবং ভারতে প্রদত্ত দু-একটি ভাষণের মূল কথা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্বামী অভেদানন্দের প্রথম বক্তৃতা যা তাঁকে লণ্ডনে খ্রীষ্ট-থিয়সফিক্যাল সোসাইটি হলে দিতে হয়েছিল এবং যার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'আমি যদি এই জগৎ থেকে চলেও যাই আমার বাণী আমার প্রিয় গুরুভাই-এর সুমধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হবে। বিশ্ববাসী তাই শুনবে উৎসুক হয়ে', সেটি গ্রন্থে সংযোজিত হলে পাঠকের স্বাভাবিক কৌতূহল চরিতার্থ হত এবং বইটির সৌষ্ঠব আরও বৃদ্ধি পেত।

বই-এর বাঁধাই সুন্দর এবং প্রচ্ছদ মনোরম। প্রচ্ছদপটে স্বামী অভেদানন্দজীর তরুণ বয়সের ধ্যানমগ্ন মূর্তি তরুণ পাঠক-পাঠিকার মন শ্রদ্ধায় অভিভূত করবে এবং তাদের জীবন আদর্শময় করে তুলতে প্রেরণা যোগাবে। তাছাড়া, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যাদের উপযোগী করে লেখক জীবনচরিতখানি গল্প বলার ভঙ্গীতে লিখেছেন তারা বইটি থেকে চিত্ত বিনোদনের প্রচুর খোরাক পাবে—বিশেষ করে বিশ্বপর্যটক স্বামী অভেদানন্দের রোমাঞ্চকর ও দুঃসাহসিক ভ্রমণ-কাহিনী তাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবে। সর্বোপরি এই পুস্তক পাঠ করে তারা নিজেদের চরিত্রগঠনে ও পবিত্র জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত হবে।

এই জীবন-আলেখ্য রচনায় গ্রন্থকার কোন্ কোন্ নির্ভরযোগ্য আকর-গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন তা উল্লেখ করেননি। বইটির সূচনায় সন্নিবিষ্ট 'প্রাঞ্জলি' শীর্ষক নিবেদনে তিনি বলেছেন, 'অপ্রকাশিত অনেক নতুন তথ্যের সমাবেশ এতে করা হয়েছে।' এই নতুন তথ্য-গুলিরও সংগ্রহ-উৎস পুস্তিকায় অপ্রকাশিত। তথ্যগুলির সংগ্রহ-উৎসের উল্লেখ থাকলে বই-খানির গৌরব আরও বৃদ্ধি পেত।

বানান ভুল ও মুদ্রণপ্রমাদের আধিক্য বইটির সৌন্দর্যের ক্ষতি করেছে। আশা করি, প্রথম প্রকাশের এইসব ত্রুটি বিচ্যুতি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত হবে এবং বইটি সর্বাঙ্গসুন্দর হবে।

বইখানি যাদের জন্য লেখা তারা এই বই পড়ে যে উপকৃত হবে, তাতে সন্দেহ নেই। বই-খানির বহুল প্রচার কামনা করি।

—শ্রীপ্রভাতকুমার বিশ্বাস

সঙ্গীতময় শ্রীরামকৃষ্ণ—নির্মলকুমার রায়। জানুআরি, ১৯৮৫, নবভারতী প্রকাশনী, ৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯। পৃষ্ঠা ৩+২+৪+১৫৫ +৪৮। মূল্য : কুড়ি টাকা।

গ্রন্থের পুরোভাগে 'উদ্বোধন' মঠের প্রয়াত অধ্যক্ষ স্বামী নিরাময়ানন্দ মহারাজের 'শুভেচ্ছা'র প্রথম অনুচ্ছেদ : 'শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবনের সঙ্গে সঙ্গীত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সমগ্র সঙ্গীত সংগ্রহটির বিষয়বিভাজন ও বিন্যাস পারিপাট্য দেখে হৃদয়ঙ্গম করলাম, এরূপ একটি

গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সংকলক শ্রীরামকৃষ্ণভক্তদের একটি বহুদিনের অভাব দূর করলেন।'

লেখক বিশেষভাবে যে শ্রীরামকৃষ্ণভক্তদের একটি অভাব দূর করলেন তা নয়। ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সংস্কৃতির অনুরাগী যে কোন ব্যক্তিই, এই গ্রন্থের প্রকাশে যে একটি অভাবমোচন হল, তা অনুভব করবেন। তবে এই অভাবমোচন সম্পূর্ণভাবে হয়নি, আংশিকভাবে হয়েছে। গ্রন্থটি পাঠ করার সময় বোধ হয়—বিষয়টি বিরাট; আরও বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য অদম্য আগ্রহ জাগে। শ্রীরামকৃষ্ণভাবনায় এক বিশাল দিক নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করে লেখক সংস্কৃতির অনুরাগী সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিভাবের প্রকাশ বা পরিপুষ্টির জন্য গান গাইতেন—মুখ্যত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত থেকে দৃষ্টান্ত চয়ন করে লেখক এটি সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। কথামৃতের বিস্তৃততর পরিবেশে অবশ্য বিশেষ বিশেষ গানের পটভূমিকার পরিচয় পাওয়া যায় বলে সেগুলির আবেদন বা তাৎপর্য আরও বেশি করে অনুভব করা যায়। লেখক কীর্তন-গানে, মাতৃ-সংগীতে, ভজন-গানে, বাউল-গানে এমন কি কৌতুক-গীতিতেও শ্রীরামকৃষ্ণের অধিকার আর বিশিষ্ট ভূমিকার পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন প্রকারের গানের প্রথম ছত্রের তালিকাও সংযোজিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সকাশে বিভিন্ন ভক্তগায়কের বিশেষত নরেন্দ্রনাথের গাওয়া গানেরও কিছু কিছু বিবরণ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সংগীতানুরাগের পরিধি বিস্তৃততর করা হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সংগীত (এবং নৃত্য) আধ্যাত্মিক ভাবের উদ্দীপক। ভারতীয় সংগীতের এটি যে বৈশিষ্ট্য লেখক এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সংগীত-শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা বা নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে (তখন বিবেকানন্দ নন) মিলনের বর্ণনাও আকর্ষণীয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সংগীতে নিষ্ঠা ও রুচিবোধ, সংগীতের উপমা বা সংগীত সম্পর্কে মন্তব্যের সংকলনও উল্লেখযোগ্য। লেখক কথামৃত বা বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি চয়ন করেছেন, মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রসঙ্গ নির্দেশ করা হয়েছে। যথাসম্ভব আকর নির্দেশ এ-জাতীয় গ্রন্থে আবশ্যিক কর্তব্য।

পরিশেষে লেখক 'শ্রীরামকৃষ্ণসান্নিধ্যে সংগীত-গুণী ও শ্রোতৃবৃন্দ' নামে একটি বিবরণাত্মক তালিকা দিয়েছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তির রচিত একশটি গান সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ দুটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

লেখকের ভাষা বা বর্ণনাভঙ্গি সাবলীল। মুদ্রণে (সম্পাদনায়?) সবচেয়ে বড় ত্রুটি অনেক ক্ষেত্রে সমাসবদ্ধ-পদকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখানো। সংস্কৃত উদ্ধৃতি প্রায়ই অশুদ্ধ। যেমন, 'ন বিদ্যা সঙ্গীতাদ্ পরা', 'ত্রয় সঙ্গীতমুচ্যতে'। বাঁধাই ভাল। প্রচ্ছদপটে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব-সমাহিত অবস্থার ছবিটি সুন্দর।

—ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

বিশ্বলীলার প্রাঙ্গণে স্বামী অভেদানন্দ —সুবলচন্দ্র দাস। প্রকাশক: বিবেক সমিতি, মনোহরপুর, ডানকুনি, হুগলী। পৃঃ ১০৭। মূল্য: ৮ টাকা।

যুগপ্রয়োজনে ধর্মের গ্লানি দূরীকরণার্থ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তাঁর সঙ্গে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন লীলাপুষ্টির সহায়ক পার্ষদবর্গ। শ্রীরামকৃষ্ণগোমুখী হতে নির্গত সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শ, মানবকল্যাণের আদর্শ দিকে দিকে প্রচারিত হয়েছে ওই সব লীলা-সহচরদের মাধ্যমে। স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন অন্তরঙ্গ পার্ষদদের অন্যতম। তাঁর ঘটনাবহুল পুণ্যজীবন

অনেক অধ্যাত্ম-পিপাসুর কাছে প্রেরণাস্থল। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ সম্যক্‌রূপে বুঝতে হলে তাঁর পার্ষদবর্গের জীবনচরিতের অনুধ্যান অবশ্য-কর্তব্য।

ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় স্বামী অভেদানন্দের জীবনীগ্রন্থ আগেও বেরিয়েছে। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য হল সংক্ষিপ্ত আকারে সহজ, সরল সাধুগদ্যে সাধারণের উপযোগী করে লেখা। 'আবির্ভাবের পূর্বাভাস' থেকে আরম্ভ করে 'পিতৃপরিচয় ও জন্মকথা,' 'শৈশব ও পাঠ্য-কাল,' 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন,' 'পরিব্রাজক অভেদানন্দ,' 'স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে পাশ্চাত্যগমন', 'বেদান্ত আশ্রম স্থাপন,' 'মহা-প্রয়াণের পথে' পর্যন্ত ন্যূনাধিক পঞ্চাশটি অধ্যায়ে লেখক স্বামী অভেদানন্দের জীবনকথা বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থের শেষের দিকে স্বামী অভেদানন্দের কিছু সারগর্ভ বাণী সন্নিবিষ্ট হওয়াতে বইয়ের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

লেখকের স্বরচিত দুটি শ্লোক ও নটি গানের সংযোজন বইয়ের বাড়তি আকর্ষণ।

গ্রন্থকারের তথ্য পরিবেশনার ভঙ্গিটি সুবোধ্য। কিন্তু বাঁধুনিটি একটু ঢিলেঢালা। যেমন পৃঃ ৬২-তে আছে 'আঁটপুরে স্বামী প্রেমেশানন্দের ভ্রাতা।' হবে 'আঁটপুরে স্বামী প্রেমানন্দের ভ্রাতা···।' ওই পৃষ্ঠাতেই উল্লেখ করেছেন '···সারদামণির আজ্ঞানুসারে বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ কামার-পুকুরে চলিলেন।' এ তথ্য কোথা থেকে পেয়েছেন জানি না। পৃঃ ৯৩-এ '···২৩শে ফেব্রুয়ারী'র জায়গায় হবে '২০শে ফেব্রুয়ারী'।

আকরগ্রন্থের উল্লেখ ছাড়াই লেখক বহু উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এটা খুবই বিভ্রান্তিকর। মনে রাখতে হবে, আকর উপাদানগুলির নির্দেশ দেওয়া লেখকের উৎকর্ষের পরিচায়ক।

বইটিতে ছাপার ভুল প্রায় নেই। এতে আছে মুদ্রণ পারিপাট্য, চমৎকার কাগজ ও ছিমছাম প্রচ্ছদ। সাধারণ পাঠক গ্রন্থকারের এই প্রয়াসকে অভিনন্দিত করবে এ বিশ্বাস রাখি।

—স্বামী শান্তরূপানন্দ

প্রাপ্তি-স্বীকার

প্রেমাঞ্জলি: লেখিকা: শ্রীমতী সুরীতি রায়, প্রকাশিকা: শ্রীমতী শীলা ঘোষ, ১৯বি, তারক দত্ত রোড, কলিকাতা-১৯, পৃষ্ঠা ৮৫, মূল্য: আট টাকা।

গল্পে অসুরনিধন: লেখক: শ্রীউৎপল সেনগুপ্ত, প্রকাশিকা: শ্রীমতী সুকৃতি সেনগুপ্তা, নীলাচল, ডাকঘর: নাটাগড়, ২৪ পরগনা, পৃষ্ঠা ৫০, মূল্য: চার টাকা।

অস্তিত্ববাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ: লেখক: শ্রীসত্যনারায়ণ লাহিড়ি, প্রকাশক: শ্রীঅমল কুমার লাহিড়ি, ১/এইচ/৩২, রাজা জনমেজয় রোড, কলিকাতা-১০, পৃষ্ঠা ৬৮; মূল্য: সাত টাকা।

আত্মার সন্ধানে: সঙ্গীত ও আলাপনে: লেখক: শ্রীতরুণ কুমার দত্ত, প্রকাশিকা: শ্রীমতী যূথিকা ভৌমিক, ১৫১, গোস্বামী পাড়া রোড, বালী, হাওড়া, পৃষ্ঠা ৪৩, প্রণামী: তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।
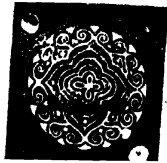
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব

গত ১২ মার্চ থেকে ১০ এপ্রিল ১৯৮৬ পর্যন্ত মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পরিচালনায় আশ্রমে এবং জেলার গ্রামাঞ্চলের ১৪টি স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মজয়ন্তী সমারোহের সঙ্গে পালিত হয়। সর্বত্রই পূজা, হোম, বেদপাঠ, ভজন, নর-নারায়ণ সেবা, ধর্মসভা প্রভৃতি ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। অনেক সন্ন্যাসী ও বিদ্বান্ ব্যক্তি এই ধর্মসভাগুলিতে অংশ গ্রহণ করেন।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

শ্রীলঙ্কা শরণার্থিত্রাণ: মাদ্রাজ ত্যাগরাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম কর্তৃক মন্দাপম্ ও তিরুচি শিবিরে আগত শরণার্থীদের মধ্যে পুনরায় মিষ্টি ও পুরানো কাপড়, এবং ৩৭,০৬২ জনকে দুধ বিতরণ করা হয়।

সৌরাষ্ট্র অনাবৃষ্টিত্রাণ: রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক সুরেন্দ্রনগর এবং রাজকোট জেলার ১৬০টি গ্রামে এবার ১৬,২১৪টি দুর্গত পরিবারের মধ্যে গম, মুগ ডাল এবং গুড় বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া ১২টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩,৫০০টি পরিবারের মধ্যে প্রতিদিন ১,২০,০০০ লিটার জল সরবরাহ করা হয় এবং গো-মহিষাদির খাবারের জন্য ৮ ট্রাক ভর্তি শুকনো তৃণও বিতরণ করা হয়।

আঞ্চলিক সেমিনার

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের সঠিক মূল্যায়ন-প্রসঙ্গে গত ৮ ও ৯ মার্চ ১৯৮৬, এলাহাবাদ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এ. এন. রায় এই সেমিনারের উদ্বোধন করেন এবং সভাপতির আসন অলংকৃত করেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এইচ. এন. শেঠ। বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও বিদ্বান্ ব্যক্তির অংশগ্রহণে এবং সুধী শ্রোতার উপস্থিতিতে এই সেমিনারটি সফল ও সার্থক হয়।

দেহত্যাগ

স্বামী স্থিরানন্দ (গোষ্ঠ মহারাজ) গত ৮ এপ্রিল ১৯৮৬, বিকাল ৪-৩০ মিনিটে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে ৯২ বছর বয়সে বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রক্তে প্রোটিনের ভাগ কমে যাওয়ার ফলে দুর্বলতা ও পা-ফোলা অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

স্বামী স্থিরানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কনখল রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর গুরুর কাছ থেকে ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যোগদানের কেন্দ্র ছাড়াও তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দিনাজপুর, মালদা ও কাটিহার শাখাকেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন সময়ে কর্মী ছিলেন। বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি বারাণসী রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে অবসর জীবন যাপন করছিলেন। অনাড়ম্বর ও কৃচ্ছ্র জীবনের জন্য তিনি বহু লোকের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

তাঁর দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

গত ১৮ এপ্রিল ১৯৮৬, শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে রাম নবমী উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ও রামনাম সংকীর্তন হয়। গত ১৪ মে ১৯৮৬, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের জন্মদিন উপলক্ষে স্বামী শাস্তরূপানন্দ সন্ধ্যারতির পর তাঁর জীবনী ও উপদেশ আলোচনা করেন।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী বিকাশানন্দ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

বিবিধ সংবাদ

একটি ভয়াবহ নূতন রোগ—এড্স (AIDS)

১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের আগে যে রোগের কেউ নাম জানত না, সেই রোগই এখন সারা পৃথিবীর বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভীষিকার প্রধান কারণ: রোগটির দ্রুত বিস্তার, এবং রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাবার পর ৩-৫ বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ রোগীর প্রায়-চিকিৎসাহীন অবস্থায় মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া। বিখ্যাত আমেরিকান চিত্রাভিনেতা পল হাড্সনের এই রোগে মৃত্যু জনসাধারণকে যেন হঠাৎ আরও আতঙ্কিত করে তুলেছে।

অসুখের পুরা নাম 'এ্যাকোয়ার্ড ইমিউন ডিফিসিয়েন্সি সিনড্রোম' (Acquired Immune Deficiency Syndrome), সংক্ষেপে 'এড্স' (AIDS)। বাংলায় নামটির অর্থ করা যায়, 'রোগনিবারণ ক্ষমতার অভাব জনিত অসুখ, যা জন্মগত নয়।' জীবাণুঘটিত (Microbial) অধিকাংশ রোগের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতার সৃষ্টি হয় প্রধানতঃ দুই ভাবে: (ক) শরীরে এ্যান্টিবডি (antibody) নামক একধরনের প্রোটিন তৈরি হয়ে রক্তে মিশে থাকে (humoral immunity); এবং (খ) জীবকোষ প্রত্যক্ষভাবে এই জীবাণু-ধ্বংসী কাজে ব্রতী হয় (cellular immunity.)। এই শেষোক্ত (খ) কাজে প্রধান ভূমিকা নেয় শ্বেত রক্তকণিকার এক বিশেষ গোষ্ঠী—'টি ফোর' লিম্ফোসাইট (T 4 Lymphocytes)। এড্স একটি ভাইরাস (জীবপরমাণু) ঘটিত রোগ এবং এই ভাইরাস রক্তে ঢুকেই 'টি ফোর' লিম্ফোসাইটের মধ্যে বংশবৃদ্ধি করার ফলে, লিম্ফোসাইটগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এইভাবে রোগীর রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা নষ্ট হওয়ার জন্য, যেসব কম ক্ষতিকর জীবাণু সাধারণ লোকের শরীরে কোন অনিষ্ট করতে পারে না, তারাও এড্স রোগীর পক্ষে মারাত্মক হয়ে পড়ে। এইরকমভাবে অনেক এড্স রোগী অন্য কমক্ষতিকর জীবাণুকৃত (এড্সভাইরাস-জনিত নয়) নিউমোনিয়া হয়ে মারা যায়। আমেরিকায় অনেক এড্স রোগী মারা যায়, একধরনের টিউমার (Kaposi's Sarcoma) হওয়ার ফলে, যে টিউমার সাধারণ লোকের পক্ষে খুব মারাত্মক নয়।

এড্স অসুখের ভাইরাস প্রধানতঃ যৌন-মিলনের মাধ্যমে শরীরে ঢোকে। পাশ্চাত্য-সমাজে অবাধ যৌনমিলন ও যৌনবিকৃতি (যেমন সমরতি বা Homosex) চালু থাকায় এবং তরুণতরুণীদের মধ্যে পরস্পর ইনজেকসনের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য ব্যবহার প্রচলিত থাকায়, অসুখটি খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ছে। আফ্রিকার
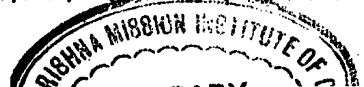
কয়েকটি দেশে প্রধানতঃ বারবনিতাদের মাধ্যমে রোগ ছড়ানো প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ রোগ ছড়ায়, ভাইরাস-দূষিত রক্তদানের মাধ্যমে অথবা জ্ঞাত বা অজ্ঞাত রোগাক্রান্তকে ইন্‌জেক্‌সন্‌ দেওয়ার পর সেই সূচটি যথাযথ পরিশোধিত না করে তার দ্বারা অন্যকে ইন্‌জেক্‌সন্‌ দিলে। এ ছাড়া, রোগাক্রান্ত মা হতে গর্ভজাত সন্তান এই রোগের ভাইরাস পেতে পারে। রোগীর প্রস্রাব, থুতু, চোখের জল প্রভৃতিতেও ভাইরাস থাকে, তবে রোগবিস্তার যে চুম্বনের মাধ্যমে হয় তা প্রমাণিত হয়েছে। স্পর্শের দ্বারা, সাধারণ মেলামেশায় বা খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে রোগ বিস্তার হয় না।

শরীরে ভাইরাস ঢোকার পর রোগের লক্ষণ প্রকাশ হতে সময় (Incubation period) লাগে এক থেকে কয়েক বৎসর। অবশ্য রক্তদানের মাধ্যমে ভাইরাস ঢুকলে দুইমাসের মধ্যেই অসুখ দেখা দিতে পারে। প্রথম দিকে শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, শরীরের ওজন হ্রাস,সামান্য জ্বর ও লিম্ফগ্রন্থি (lymph gland)-গুলি বড় হয়। অবশ্য শরীরে ভাইরাস ঢুকলেই যে সকলের এড্‌স রোগ হবে তা নয়। তা ছাড়া, কোন কোন ব্যক্তির শরীরে ভাইরাস ঢুকলেও, তারা বাহ্যতঃ সুস্থ থাকে, কিন্তু তাদের রক্তে ভাইরাস থেকে যাওয়ার জন্য সারাজীবন ভাইরাস-বাহক (Carrier) হয়ে রোগ ছড়াতে থাকে। সেইজন্য রক্তদানকারীরা (Blood donors) ভাইরাস-বাহক কি না জানা খুব প্রয়োজন। ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস পর্যন্ত পৃথিবীর ৭১টি দেশে ১৭০৮৬ (আমেরিকাতে ১৫৫১২) জন এড্‌স-রোগাক্রান্ত হয়েছে।[১] অনুমান করা হয় যে আমেরিকাতেই প্রায় ১০ লক্ষ লোক ভাইরাস-বাহক হয়ে আছে। সম্প্রতি মাদ্রাজ অঞ্চলে কয়েকজন বারবনিতা যে পূর্বে এড্‌স ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তার অর্থ এই নয় যে ভারতের অন্যত্র এই রোগ খুঁজলে পাওয়া যাবে না। রোগ পরীক্ষার জন্য বর্তমানে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনতে হয় আমেরিকা হতে। তা খরচসাপেক্ষ (একজনের রক্তপরীক্ষা করতে প্রায় ২০০ টাকা খরচ পড়ে) এবং আমাদের দেশে খুব কম ল্যাবরেটরিতেই এই পরীক্ষার সুযোগ আছে।

১ Media Service, WHO/December 1985

এড্‌স রোগ নিয়ে সমস্ত উন্নত দেশে বিপুল-ভাবে গবেষণা আরম্ভ হয়েছে, একদিকে ভাইরাস-নাশক ওষুধ তৈরি করার, অন্যদিকে প্রতিরোধক টিকা তৈরির ব্যাপার। মুশকিল হচ্ছে যে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মতো এই ভাইরাসের ঘন ঘন শারীরিক গঠন পরিবর্তন (Antigenic Variation) করার প্রবণতা থাকায় এই রোগের প্রতিরোধক টিকা তৈরি করা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু গবেষকরা সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **শৈলেন্দ্রনাথ পাল** গত ১৯ মার্চ ১৯৮৬, প্রত্যুষে ৪ ঘটিকায় পি. জি. হাসপাতালে ৭৩ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

অতি শৈশবকাল থেকেই তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের বেশ কয়েকজন পার্ষদের পূত সান্নিধ্যে আসেন এবং উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের কোলে উঠবারও দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেন। যে কয়েক জন ছাত্র নিয়ে দেওঘর বিদ্যাপীঠ শুরু হয়, শৈলবাবু ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। শৈলবাবু বারাসাত রামকৃষ্ণ শিবানন্দ আশ্রমের কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি থাকাকালীন ঐ আশ্রম বেলুড় মঠের অন্তর্ভুক্ত হয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আঁটপুরস্থিত রামকৃষ্ণ প্রেমানন্দ আশ্রমের উন্নতি-কল্পে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে তিনি তার সেবা করেন।

তাঁর পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি লাভ হোক—এই প্রার্থনা।

উদ্বোধন : শ্রাবণ ১৩৯৩

সূচীপত্র

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

[উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন]

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

গ্রন্থ	মূল্য
কর্মযোগ	৫·৯০
ভক্তিযোগ	৪·৫০
ভক্তি-রহস্য	৫·০০
জ্ঞানযোগ	১৪·০
জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে	১০·০
রাজযোগ	১০·০
সরল রাজযোগ	১·৮
সন্ন্যাসীর গীতি	০·৮০
ঈশদূত যীশুখৃষ্ট	১·০০
পত্রাবলী। (সমগ্র পত্র একত্রে, নির্দেশিকাদি সহ) রেক্সিন বাঁধাই	৪০·০০
পওহারী বাবা	১·২৫
স্বামীজীর আহ্বান	১·২৫
বাণী-সঞ্চয়ন	১২·০০
জাগো, যুবশক্তি	৫·০০
গীতা প্রসঙ্গ	৪·৫০
ধর্ম-সমীক্ষা	৫·০০
ধর্মবিজ্ঞান	৫·৫০
বেদান্তের আলোকে	৪·৫০
কথোপকথন	৫·০০
ভারতে বিবেকানন্দ	২০·০০
দেববাণী	৮·০০
মদীয় আচার্যদেব	২·৫০
চিকাগো বক্তৃতা	২·২৫
মহাপুরুষপ্রসঙ্গ	১২·০০
ভারতীয় নারী	৫·০০
ভারতের পুনর্গঠন	২·৫০
শিক্ষা (অনূদিত)	৪·২০
শিক্ষাপ্রসঙ্গ	৮·০০
এসো মানুষ হও	৬·০০

স্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচনা

গ্রন্থ	মূল্য
পরিব্রাজক	৪·২৫
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য	৫·০০
ভাববার কথা	২·৩০
বর্তমান ভারত	২·৫০

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণ। প্রতি খণ্ড—২৫৲ টাকা। সম্পূর্ণ সেট ২৫০৲ টাকা
সাধারণ বাঁধাই সুলভ সংস্করণ। প্রতি খণ্ড—১৭·৫০ টাকা। সম্পূর্ণ সেট ১৭৫৲ টাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

স্বামী সারদানন্দ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (দুই ভাগে)
রেক্সিন-বাঁধাই : ১ম ভাগ ৩৫·০০, ২য় ভাগ ৩০·০০
সাধারণ (পাঁচ খণ্ডে)
১ম খণ্ড ৬·০০, ২য় খণ্ড ১৩·৫০, ৩য় খণ্ড ৯·৫০,
৪র্থ খণ্ড ৯·৫০, ৫ম খণ্ড ১৪·৫০

অক্ষয়কুমার সেন
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি ৪৫·০০
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা ৫·৫০

স্বামী প্রেমঘনানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প ৪·০০

শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ১·৫০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র) ৫·৫০

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বাণী ·৭৫

স্বামী তেজসানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী ৯·০০

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংকলিত
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ ৩.৫০

স্বামী ভূতেশানন্দ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ (তিন ভাগে)
১ম ভাগ ১২.৫০, ২য় ভাগ ১২.৫০, ৩য় ভাগ ১২.৫০

স্বামী নির্বেদানন্দ
(অনুবাদ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)
শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ ১২.৫০

স্বামী প্রভানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা ১৫.০০

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা (দুই ভাগে)
১ম ভাগ ১৫.০০, ২য় ভাগ ১৫.০০

স্বামী গম্ভীরানন্দ
শ্রীমা সারদাদেবী ২৭.০০

স্বামী সারদেশানন্দ
শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা ১০.০০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
শিশুদের মা সারদাদেবী (সচিত্র) ৭.০০

স্বামী বুধানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ বিত্তাসিত্তা মা সারদা ৭.০০

স্বামী ঈশানানন্দ
মাতৃসান্নিধ্যে ৯.৫০

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

স্বামী গম্ভীরানন্দ
যুগনায়ক বিবেকানন্দ (তিন খণ্ডে)
১ম খণ্ড ৩০.০০, ২য় খণ্ড ৩০.০০
৩য় খণ্ড ৩০.০০

ভগিনী নিবেদিতা (অনুবাদ : স্বামী মাধবানন্দ)
স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি ১৬.০০

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ১০.০০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
স্বামী বিবেকানন্দ ৭.০০
শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র) ৫.৫০

স্বামী নিরাময়ানন্দ
ছোটদের বিবেকানন্দ ২.৫০

শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য
স্বামী বিবেকানন্দ ২.৫০

স্বামী বুধানন্দ
ওঠ, জাগো, এগিয়ে চল ৪.২৫
ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর ১.৫০
স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা ৩.৫০

ভগিনী নিবেদিতা
স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ৫.০০

প্রমথনাথ বসু
স্বামী বিবেকানন্দ
১ম খণ্ড ২০.০০, ২য় খণ্ড ২০.০০

বিবিধ

মহাপুরুষজীর পত্রাবলী ৭.৫০
স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র ৭.৮০
স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী ৪.৫০
আরতি-স্তব ও রামনাম ১.৫০
ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ৬.০০

স্বামী গম্ভীরানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা (দুই ভাগে)
১ম ভাগ ২৫.০০, ২য় ভাগ ২৫.০০

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ
ভারতের সাধনা ১৫.০০

স্বামী সারদানন্দ
ভারতে শক্তিপূজা ৪.০০

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ
শ্রীরামানুজ চরিত ১৭.৫০

স্বামী প্রেমেশানন্দ
রামানুজ চরিত ৩.৫০

ভগিনী নিবেদিতা
শিব ও বুদ্ধ ৩.৭৫

স্বামী অপূর্বানন্দ
আচার্য শঙ্কর ৮.০০
শিবানন্দ-বাণী (সংকলিত)
১ম ভাগ ৯.০০, ২য় ভাগ ৫.০০

স্বামী সুন্দরানন্দ
যোগ চতুষ্টয় ৭.৫০

৮৮তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা   শ্রাবণ, ১৩৯৩

দিব্য বাণী

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধশ্চ যঃ পুমান্ ।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥

(ভাগবত, ১১।২০।৮)

—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন ঃ কোনরূপ সৌভাগ্যবশে যে ব্যক্তির আমার কথাদিতে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, কিন্তু তীব্র বৈরাগ্য জন্মে নাই, অথচ বিষয়েও তেমন আসক্তি নাই—ভক্তিযোগ আশ্রয় করিলে সেইরূপ ব্যক্তিরও সিদ্ধিলাভ হইবে ।
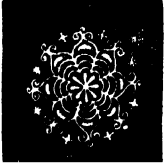
কথাপ্রসঙ্গে

'ভক্তিযোগই যুগধর্ম'

ঈশ্বর-লাভই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। লক্ষ্য এক হইলেও এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথ অনেক। সকল সাধকের রুচি ও বোধসামর্থ্য সমান নয়। তাই রুচি ও বোধসামর্থ্য অনুযায়ী শাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন সাধককে ভিন্ন ভিন্ন পথের নির্দেশ দিয়া থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় 'রুচি ভেদ আর অধিকারী ভেদ আছে'। 'বাড়ীতে মাছ এসেছে। মা যার পেটে যা সয় তাই রান্না করছেন'। জটিল তত্ত্বটির কত সহজ-সরল ব্যাখ্যা! মা যেমন 'যার পেটে যা সয়' সেই অনুযায়ী রান্না করেন, সেইরূপ যে সাধক যে পথের অধিকারী শাস্ত্রও তাঁহার জন্য সেই পথটিই নির্দিষ্ট করিয়া দেন। তাই শাস্ত্র ও গুরুবাক্য হইতে কোন্ পথে এবং কিভাবে চলিতে হইবে তাহা জানিয়া লইয়া সেই পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সাধককে সাধনায় অগ্রসর হইতে হয়। তবেই তাঁহার পক্ষে লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব। মনে রাখিতে হইবে যে, পথই আসল নয়, লক্ষ্যে পৌঁছাই আসল এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছা নিয়াই কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন: 'অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ। যে কোন প্রকারে হউক এ সাগরে পড়তে পারলেই হল।' (কথামৃত, ১।১১।৪)

সহস্রদ্বীপোদ্যানে অবস্থানকালে ধর্ম-প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী একদিন বলিয়াছিলেন: 'গুরুদেব (শ্রীরামকৃষ্ণ) বলতেন, "এই জগৎটা একটা মস্ত পাগলা-গারদ। এখানে সবাই পাগল, কেউ টাকার জন্য পাগল, কেউ মেয়েমানুষের জন্য পাগল, কেউ নাম-যশের জন্য পাগল, আর জনকতক ঈশ্বরের জন্য পাগল। অন্যান্য জিনিসের জন্য পাগল না হয়ে ঈশ্বরের জন্য পাগল হওয়াই ভাল নয় কি? ঈশ্বর হচ্ছেন পরশমণি। তাঁর স্পর্শে মানুষ এক মুহূর্তে সোনা হয়ে যায়।"' (বাণী ও রচনা, ৪/২০৫-৬)। তাই যো সো করিয়া একবার ঈশ্বররূপ অমৃত-সাগরে পড়িতে পারিলেই, কোন প্রকারে একবার পরশমণিকে স্পর্শ করিতে পারিলেই হইল। এই অমৃত-সাগরে পড়িবার জন্য, পরশমণিকে স্পর্শ করিয়া সোনা হইবার জন্যই সাধকের জীবনব্যাপী সাধনা, এবং এই সাধনার সিদ্ধিতেই তাঁহার জীবনের সার্থকতা।

আগেই বলা হইয়াছে, জীবনের লক্ষ্য এক হইলেও সেখানে যাওয়ার পথ অনেক। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের এক জায়গায় (১।১১।৪) পাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন: 'অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ।...তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি—যে পথ দিয়া যাও আন্তরিক হলে ঈশ্বরকে পাবে।' এই বলিয়াই আবার বলিতেছেন: 'কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ সহজ পথ। ভক্তিযোগই যুগধর্ম।' এখন প্রশ্ন, জ্ঞান, কর্ম, যোগ ও ভক্তি—এই চারিটি পথের মধ্যে যেকোন একটি পথ অবলম্বন করিলেই যখন সাধক পরিণামে পরমানন্দের অধিকারী হন, তখন ভক্তিযোগকেই 'যুগধর্ম' বলিলেন কেন? বিশেষত্বটা কোথায়? উত্তরে বলিতে পারা যায়, কলিযুগের মানুষের পক্ষে জ্ঞান-পথ অনুসরণ করা খুব শক্ত। কারণ তীব্র বৈরাগ্যের ও উচ্চ সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণা-শক্তির—উভয়েরই অভাব। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ

প্রভৃতিকে সর্বতোভাবে বশীভূত করিয়া রাজ-যোগের সাধনাও কলিযুগের মানুষের সাধ্যাতীত। কর্মযোগও তাহাদের পক্ষে কঠিন। কেননা, শাস্ত্রে যে-সব যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম করিবার নির্দেশ আছে, তাহার জন্য যে সময় ও সামর্থ্যের প্রয়োজন তাহার কোনটাই কলিযুগের মানুষের নাই। সেইসব দিক দিয়া বিচার করিলে ভক্তিযোগ সহজ। ভগবানের নাম-গুণকীর্তনাদির দ্বারা তাঁহাতে মন রাখাই ভক্তিযোগের সাধনা। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়ও আছে: 'কর্মযোগ বড় কঠিন—প্রথমতঃ,...সময় কৈ? শাস্ত্রে যে সব কর্ম করতে ব'লেছে, তার সময় কৈ? কলিতে আয়ু কম। তারপর অনাসক্ত হ'য়ে, ফল কামনা না ক'রে, কর্ম করা ভারী কঠিন।...জ্ঞানযোগও—এ যুগে ভারী কঠিন। জীবের একে অন্নগত প্রাণ; তাতে আয়ু কম। আবার দেহবুদ্ধি কোন মতে যায় না। এদিকে দেহবুদ্ধি না গেলে একেবারে জ্ঞানই হবে না।...কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর ক'রে রক্ত পড়ছে, খুব লাগ্‌ছে—অথচ বলছে, কৈ হাত তো কাটে নাই! আমার কি হয়েছে? তাই এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়।' (কথামৃত, ১।১১।৪) ভাগবতের এক জায়গায় (১১।৫।৩৮) আছে, যাঁহারা সত্য-যুগের মানুষ তাঁহারাও এই কলিযুগে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিবার ইচ্ছা করেন। কারণ তীব্র বৈরাগ্য, সূক্ষ্ম জ্ঞান বা ব্যয় ও সময়-বহুল যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে শুধুমাত্র ভক্তি আশ্রয়-পূর্বক অনায়াসে তাঁহারা ভগবৎ-কৃপা লাভ করিতে পারেন। সুতরাং দেখা গেল যে, সকল স্তরের সাধকই—যাঁহার যতটুকু সামর্থ্য-সম্বল আছে তাহা লইয়াই তিনি ভক্তি পথে অগ্রসর হইতে পারেন। প্রবর্তক সকাম ভক্তও সাধনার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া পরিণামে ঈশ্বর লাভে ধন্য হন। কলিযুগের পক্ষে ভক্তি-যোগকে কেন যে সহজ পথ এবং 'যুগধর্ম' বলা হইয়াছে ভাগবত ও শ্রীরামকৃষ্ণের উপরি-উক্ত কথাগুলি হইতে তাহা সুস্পষ্ট।

'ভক্তিপথেই তাঁকে সহজে পাওয়া যায়' বলিয়া আবার বলিতেছেন: 'ভক্তি অমনি ক'রলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেমাভক্তি না হ'লে ঈশ্বর লাভ হয় না। প্রেমাভক্তির আর একটি নাম রাগভক্তি। প্রেম, অনুরাগ, না হ'লে ভগবান লাভ হয় না।...আর এক রকম ভক্তি আছে। তার নাম বৈধী ভক্তি। এত জপ ক'রতে হবে, উপোস করতে হবে, তীর্থে যেতে হবে; এত উপচারে পূজা ক'রতে হবে, এতো-গুলি বলিদান দিতে হবে—এ সব বৈধী ভক্তি। এসব অনেক করতে করতে ক্রমে রাগভক্তি আসে। কিন্তু রাগভক্তি যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ ঈশ্বর লাভ হবে না।' (কথামৃত, ১।৪।৭) সৌভাগ্যক্রমে কাহারও হৃদয়ে যদি এই রাগভক্তির, এই প্রেমাভক্তির উদয় হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর তাঁহার নিকট বাঁধা পড়েন। 'প্রেম রজ্জুর স্বরূপ। প্রেম হ'লে ভক্তের কাছে ঈশ্বর বাঁধা পড়েন আর পালাতে পারেন না।' (কথামৃত, ৩।১১।৩) প্রেমাভক্তির আর একটি লক্ষণ—অনুরাগ। ব্রাহ্ম-সমাজের একটি গানে আছে—'প্রভু বিনে অনু-রাগ, করে যজ্ঞ যাগ, তোমাকে কি যায় জানা।' 'শ্রীমতী (রাধিকা) যখন বললেন, আমি কৃষ্ণময় দেখছি। সখীরা বললে, কৈ আমরা ত তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি কি প্রলাপ বোক্‌চো? শ্রীমতী বললেন, সখি! অনুরাগ-অঞ্জন চক্ষে মাখো, তাঁকে দেখতে পাবে।' (কথামৃত, ১।৪।৭) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর এই অনুরাগের—এই ভালবাসার রজ্জুতেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট বাঁধা পড়িয়াছিলেন। তাই শ্রীমতী সব কিছুর মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণেরই উপস্থিতি অনুভব করিতেছিলেন।

তাঁহার নিকট তখন—সর্বং কৃষ্ণময়ং জগৎ। ভক্তির অন্য লক্ষণ—'আমার জ্ঞান', 'মমতাবোধ'। 'যশোদা ভাবতেন, আমি না দেখলে গোপালকে কে দেখ্‌বে, তাহলে গোপালের অসুখ ক'রবে। কৃষ্ণকে ভগবান ব'লে যশোদার বোধ ছিল না। আর "মমতা"—আমার জ্ঞান, আমার গোপাল। উদ্ধব বল্‌লেন, "মা! তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি জগৎ চিন্তামণি। তিনি সামান্য নন।" যশোদা বল্‌লেন, "ওরে তোদের চিন্তামণি নয়, আমার গোপাল কেমন আছে জিজ্ঞাসা করছি।—চিন্তামণি না, আমার গোপাল।"' (কথামৃত, ২।৫।১)

ভক্ত ভগবানকে ভালবাসেন, কারণ তিনি তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন না। আবার তিনি তাঁহাকে ভালবাসেন বটে, কিন্তু পরিবর্তে কিছু পাওয়ারও অপেক্ষা রাখেন না। ঈশ্বরের প্রতি এই ভালবাসা, এই ভক্তি—অহৈতুকী। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাষ্টকে (শ্লোক ৪) আছে তিনি বলিতেছেন :

'ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা
জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভগবদ্ভক্তিরহৈতুকী ॥'

—হে জগদীশ, আমি ধন, জন, সুন্দরী বা সর্বজ্ঞত্ব কামনা করি না ; হে ভগবান ; তোমাতে যেন জন্মে জন্মে আমার অহৈতুকী ভক্তি হয়। শ্রীরামকৃষ্ণও বলিতেন : 'তুমি বড়লোকের কাছে কিছু চাও না—কিন্তু রোজ আসো—তাকে দেখতে ভালবাসো। জিজ্ঞাসা করলে বল "আজ্ঞা, দরকার কিছু নাই—আপনাকে দেখতে এসেছি।" এর নাম অহৈতুকী ভক্তি। তুমি ঈশ্বরের কাছে কিছু চাও না—কেবল ভালবাসো।' (কথামৃত, ৪।২।১)

নারদীয়ভক্তিসূত্রে (সূত্র ২) পরা ভক্তির সংজ্ঞায় আছে : 'সা তস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা'।—কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রতি পরমপ্রেমই ভক্তি। ভক্তি ভালবাসারই একটা বিশেষ রূপ। শ্রদ্ধা, প্রীতি ও পূজাভাবমিশ্রিত ভালবাসাই ভক্তি। আর একমাত্র ভগবানের ক্ষেত্রেই ভক্তির প্রয়োগ হয়। বিষ্ণুপুরাণে (১।২০।১৯) আছে ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বলিতেছেন :

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥

—বিবেকহীন ব্যক্তিদের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহের প্রতি যেমন প্রগাঢ় প্রীতি, তোমার জন্য ব্যাকুল আমার হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রীতি যেন কখনও দূর না হয়। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলিয়াছেন : 'প্রহ্লাদের এই উক্তিটিই ভক্তির সর্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞা বলিয়া মনে হয়। আমরা দেখিতে পাই, যাহারা উচ্চতর কিছু জানে না, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে—টাকাকড়ি, বেশভূষা, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব ও সম্পত্তিতে—তাহাদের কি দারুণ প্রীতি, কি প্রচণ্ড আসক্তি! তাই ভক্তরাজ প্রহ্লাদ পূর্বোক্ত শ্লোকে বলিতেছেন, "আমি কেবল তোমার প্রতি ঐরূপ প্রবলভাবে অনুরক্ত হইব, কেবল তোমাকে ঐরূপ প্রাণের সহিত ভালবাসিব আর কাহাকেও নয়।" এই প্রীতি, এই আসক্তি ঈশ্বরে প্রযুক্ত হইলেই তাহা "ভক্তি" আখ্যা লাভ করে'। (বাণী ও রচনা, ৪।৯১)

যে আসক্তির আকর্ষণে মানুষ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুসমূহের পশ্চাতে ধাবিত হয় এবং ফলে এই আসক্তি তাহার বন্ধনের কারণ হয়, এই আসক্তিই ঈশ্বরে প্রযুক্ত হইলে তাহা মুক্তির হেতুতে পরিবর্তিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই মোড় ফিরাইয়া দেওয়ার কথা বলিতেন। আমাদের স্বাভাবিক টান সংসারের দিকে। যদি এই টান ঈশ্বরের দিকে ফিরাইয়া দিতে পারি, তবে আমরাও এই 'অনপায়িনী' ভক্তি লাভ করিতে পারিব, ঈশ্বরকে দর্শন করিতে সমর্থ হইব। এই আসক্তির মোড়

ফিরাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বিষয়াসক্ত তুলসীদাস, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি সাধকগণ ঘোর বিষয়াসক্ত হইতে ঈশ্বরাসক্ত সার্থক সিদ্ধ মহাপুরুষে রূপান্তরিত হইতে পারিয়াছিলেন। গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 'ময্যাসক্ত'—আমার প্রতি আসক্ত হও, আমাকে ভালবাস—এই উপদেশ দিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন: 'তিন টান হলে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর, আর সতীর পতির উপর, টান। এই তিন টান যদি কারও একসঙ্গে হয়, সেই টানের জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে।' (কথামৃত, ১।১।৫)

ঈশ্বরের প্রতি প্রেমাভক্তি লাভের জন্য সাধনার প্রয়োজন। সাধনার ফলে সাধকের হৃদয়ে যখন ঈশ্বরে অনুরাগ, প্রেম আসে, তখন জপ-ব্রত-উপাসনাদি বৈধী কর্ম আপনা আপনিই ত্যাগ হইয়া যায়, জোর করিয়া ত্যাগ করিতে হয় না। তখন বৈধী কর্ম কে করিবে? কারণ ঈশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা সাধক তখন অনুভব করেন 'যে ঈশ্বরকে প্রথমে কোন এক স্থানে অবস্থিত পুরুষবিশেষ মনে হইত, তিনিই তখন যেন অনন্তপ্রেমে পরিণত হইলেন। সাধক নিজেই তখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যান, ঈশ্বর-সামীপ্য লাভ করিতে থাকেন, পূর্বে তাঁহার যে-সব বৃথা বাসনা ছিল, তখন তিনি সে-গুলি পরিত্যাগ করিতে থাকেন। বাসনা দূর হইলেই স্বার্থপরতা দূর হয়, এবং প্রেমের চরমশিখরে আরোহণ করিয়া সাধক দেখিতে পান—প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ এক ও অভিন্ন।' (বাণী ও রচনা, ৪।১৮৩-৮৪)

আগে যেমন বলা হইয়াছে, সাধনার প্রথম অবস্থায় বৈধীভক্তি, শেষে রাগভক্তি। বৈধীভক্তি হইতে যখন রাগভক্তি আসে তখন সাধকের পথ সুগম হইয়া যায়। যেমন 'বন্যা এলে আর বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয় না। তখন মাঠের উপর এক বাঁশ জল, সোজা নৌকা চালিয়ে দিলেই হল।' সেইরূপ সাধক-হৃদয়ে যখন রাগভক্তির, প্রেমাভক্তির বন্যা আসে, তখন তাঁহাকেও 'আর বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয় না', প্রেমের টানে তিনি সোজা ঈশ্বররূপ অমৃত-সাগরে পতিত হন, তাঁহার সহিত মিলিত হন, অমৃতত্ব-লাভে কৃতার্থ হন।

দেখছিস তো বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্মকে 'সচ্চিদানন্দ' বলে। ঐ সচ্চিদানন্দ শব্দের মানে হচ্ছে,—'সৎ' অর্থাৎ অস্তিত্ব, 'চিৎ' অর্থাৎ চৈতন্য বা জ্ঞান, আর 'আনন্দ'ই প্রেম। ভগবানের সৎ-ভাবটি নিয়ে ভক্ত ও জ্ঞানীর মধ্যে কোন বিবাদ-বিসংবাদ নেই। কিন্তু জ্ঞানমার্গী ব্রহ্মের চিৎ বা চৈতন্য-সত্তাটির ওপরেই সর্বদা বেশী ঝোঁক দেয়, আর ভক্তগণ আনন্দ-সত্তাটিই সর্বক্ষণ নজরে রাখে। কিন্তু চিৎস্বরূপ অনুভূতি হবামাত্র আনন্দস্বরূপেরও উপলব্ধি হয়। কারণ যা চিৎ, তা-ই যে আনন্দ।

—স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীসুকুমার সেনগুপ্তকে লিখিত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Belur Math P.O.
Dt. Howrah
13/5/32

শ্রীমান্ সুকুমার,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে তোমার যখন ভাল লাগে—এ ত খুব ভাল কথা। তুমি তাঁদের চরিত চিন্তা করিও—তাঁদের বিষয়ে যে সব লেখা বাহিব হইয়াছে তাহা পাঠ করিও তাহা হইলেই তোমার হইবে। মন্ত্র তন্ত্রর কোন প্রয়োজন নাই।

মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের দিকে সহজেই ধাবিত হইতে চায়। কারণ উহা সহজে পাওয়া যায় ও ভোগ করা যায়। কামও তাহাদেরই একটা অঙ্গ। কিন্তু ঐ মন, ভগবৎ কৃপা ও সৎ সঙ্গ গুণে অতীন্দ্রিয় বস্তুর সন্ধান পায়—যে বিষয়ের আনন্দ চিরস্থায়ী [।] তখন মন ক্ষণিক আনন্দ যুক্ত বাসনা বা বিষয় ভোগের দিকে যেতে চায় না। তাই ঐ সকল পরিহার করিবার একমাত্র উপায় অতীন্দ্রিয় বস্তু ভগবৎ তত্ত্ব লাভের জন্য অভ্যাস ও প্রচেষ্টা। বিচার বুদ্ধি ও অনুশীলন দ্বারা ঐ ভাব মনে যত দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইবে ততই মন ঐ সকল বিষয় ত্যাগ করিয়া একাগ্র হইবে।

প্রার্থনা করি ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন। আমার আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি।

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীপ্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

আলমবাজার মঠ
14th Apl. 96

প্রিয় মহাশয়,

গতকল্য আপনার এক পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। আমি আপনার পূর্ব্ব পত্রের উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিলাম, ইতিমধ্যে আপনার আর এক পত্র পাইলাম।

রাজপুতানায় কেবল খেতড়িতে আমি একটি বৈদিক সংস্কৃত বিদ্যালয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন আর কোথাও কিছু করিতে পারি নাই। খেতড়ির বিদ্যালয়ে বারাণসীর সংস্কৃত বিদ্যালয়ের আচার্য্য পরীক্ষা, মধ্যম পরীক্ষা এবং উত্তম পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট পুস্তকাদির সহিত অধিকন্তু সংহিতার অধ্যাপনা আরম্ভ করা গিয়াছে। আমার বোধ হয় বৈদিক বিদ্যার বিশেষ প্রচার ভিন্ন আমাদের দেশের বাস্তব কল্যাণ কিছুতেই হওয়া সম্ভব নহে। আমাদের ত্রৈবর্ণিক বালকদিগকে বেদ-বেদান্তাদির সহিত অল্প অল্প ইংরেজী Science এবং অন্যান্য উপযোগী গ্রন্থসকল

পড়ানো হয় ত দেশের প্রকৃত কল্যাণ হওয়াতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। এ-সকল কার্য্য বিশেষ অর্থ সাপেক্ষ এবং সৎ নিঃস্বার্থপর দেশহিতৈষী মনুষ্যের দ্বারা পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বকালে ভারতে যত বিদ্বান ও তত্ত্বদর্শী লোক জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তদানীন্তন ভারতীয় রাজা মহারাজা ও ধনাঢ্য লোকদিগের বিশেষ সাহায্য ও সহানুভূতি পাইতেন। গ্রীক্‌দূত মিগস্‌থিনিসের গল্পে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহার সময়ে এদেশের ব্রাহ্মণদিগের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং গ্রন্থ রচনা ভিন্ন সংসার নির্ব্বাহের জন্য বিন্দুমাত্রও চিন্তা করিতে হইত না। তাঁহাদের যাহা কিছু আবশ্যক হইত সে সকলই তাঁহারা অনায়াসে পাইতেন। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে যদি এখনও ভারতের নানা স্থানে এরূপ পাঠশালা করা যায় কি যথায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাতীয় শত শত বালক্‌দিগকে একত্র করিয়া এবং তাহাদিগের সকল প্রকার সাংসারিক চিন্তা হইতে অব্যাহতি দিয়া ও স্বাস্থ্যকর অন্নাচ্ছাদনের সহিত এবং ব্যায়ামাদি শিক্ষার সহিত বেদ-বেদান্তাদি হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় সংস্কৃত শাস্ত্রের শিক্ষা দিয়া অন্যান্য দেশীয় ব্যবহারিক বিদ্যারও শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তাহারা কৃতবিদ্য হইলে পরে তাহাদিগকে নূতন চিন্তাপ্রসূত গ্রন্থাদি রচনা করিবার জন্য অবকাশ দেওয়া হয় ত আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে দশ বিশ বৎসরের মধ্যেই পুনঃ ভারতে নবীন এবং সমধিক উন্নত কপিলের, সেইরূপই গৌতমের, ব্যাসের, আর্য্যভট্টের এবং অন্যান্য মহাকবিদের উত্থান অবশ্যম্ভাবী। তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে মহা উদ্যমশীল বৈজ্ঞানিকদিগের আবির্ভাব হওয়া প্রার্থনীয়। এই মহান উদ্যমের জন্য কেবল অর্থ এবং নানা দেশীয় বেদবিৎ নানা ভাষাভিজ্ঞ সৎ চরিত্র পণ্ডিতদিগের বিশেষ আবশ্যক। এইরূপে সহস্রাধিক বালককে যদি এককালীন কোন স্থানে বদ্ধ রাখিয়া নিয়মিতরূপে শিক্ষা দেওয়া হয় ত তাহাদের মধ্যে কয়েকজন বালকও সুপারগ হইলে পরে তাহাদের দ্বারা দেশের ভাবী উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইতে পারে। এ বিষয়ে আপনার কোন সংশয় আছে কি?

শ্রীযুক্ত শিবানন্দ স্বামীর আপনার প্রতি বিশেষ প্রীতি ও কৃপা আছে জানিবেন। তবে যে তিনি আপনাকে চিত্ত দৌর্ব্বল্যের কথা লিখিয়াছিলেন—তাহা কেবল বন্ধুভাবে আপনাকে আরও অধিক সবল হইবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এতদ্‌ভিন্ন তিনি কোনও নিমিত্ত উপলক্ষ্য করিয়া আপনাকে কোন কথা লিখেন নাই জানিবেন। আপনি আর ওকথার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিবেন না। ইতি আমাদের সকলের সপ্রেম আলিঙ্গন জানিবেন। শ্রীমদ্‌ স্বামী বিবেকানন্দের পুস্তক সকল নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাইবেন।

For Sale at Brentano's, 31 Union Sq. New York U. S. A.

আপনার চির শুভাকাঙ্ক্ষী
গঙ্গাধর

নর-নারায়ণ

স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ

শ্রীভগবান্ লোক কল্যাণের জন্য যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। তাঁর সঙ্গেও যাঁরা আসেন, তাঁরা তাঁরই লীলার ধারক ও বাহক। এই কথাই তিনি অর্জুনকে বলেছিলেন—"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন" (শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা)। আরও মজা আছে। অবতার পুরুষেরা দৃষ্টিমাত্রেই লীলা সহচরদের চিনতে পারেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনে আমরা দেখি—তাঁর প্রধান লীলাসহচরের সঙ্গে একটি উৎসব প্রাঙ্গণে দেখা। সিমুলিয়ার সুরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর অন্যতম চিহ্নিত ভক্ত। তাঁর বাড়িতে উৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের আগমন হয়েছে। সুকণ্ঠ গায়ক বলে নরেন্দ্রনাথের নাম ছিল। গানের জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয়। এই সহস্রদল পদ্মটিকে ঠাকুর কিন্তু দেখেই চিনে-ছিলেন। বুঝেছিলেন যেন "ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি"। বহু যুগপূর্বে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনকে দেখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও মনে হয়েছিল—"অগ্নি অংশু যেন পাংশুজালে আচ্ছাদিত"। (কাশীরাম দাস) ব্যাসদেবের ভাষায়—

"দৃষ্ট্বা তু তান্ মত্তগজেন্দ্ররূপান্
পঞ্চাভিপদ্মানিব বারণেন্দ্রান্।
ভস্মাবৃতাঙ্গানিব হব্যবাহান্
কৃষ্ণঃ প্রদধ্যৌ যদুবীরমুখ্যঃ॥"

(মহাভারত, আদিপর্ব, ১৮০/৯)

—মত্ত হস্তীর ন্যায় সবল দেহ, ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় নিগূঢ়মূর্তি এবং একটি পদ্মকে লক্ষ্য করে অবস্থিত পাঁচটি হস্তীর ন্যায় পঞ্চপাণ্ডবকে দেখেই কৃষ্ণ চিনতে পারলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, অর্জুন এই পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম। দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রনাথের প্রথম আগমন হয় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর এই চিহ্নিত সেবককে ঠাকুর কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন—একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। করজোড়ে বলছেন—"জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীর ধারণ করিয়াছ!" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, দিব্য-ভাব ও নরেন্দ্রনাথ)। হিমালয়ে তপস্যানিরত মহাবীর অর্জুনের কাছে ভগবান্ ভূতপতি মহাদেব ঠিক ঐ কথাই বলেছিলেন—

"নরস্ত্বং পূর্বদেহে বৈ নারায়ণ সহায়বান্।
বদর্য্যাং তপ্তবানুগ্রং তপো বর্ষাযুতান্ বহূন্॥

(মহাভারত, বনপর্ব, ৩৫/৮৫)

অথবা, "নারায়ণসহ তুমি নরঋষিরূপে।
সংসার ধরিলে অতিশয় উগ্রতপে॥"

(কাশীরাম দাস)

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, কলমির দল—একটাকে ধরে টানলেই বাকীটা আসে। এইভাবেই নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ সকলের আবির্ভাব।

নরেন্দ্রনাথ তপস্যা করছেন, কঠোর তপস্যা! ঠিক যেন অর্জুন। তাঁকে গভীর অমানিশার অবসান ঘটাতে হবে, এজন্যই তাঁর ভূতলে আসা। এর প্রস্তুতি চাই তো! তিনি হিমালয় থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষ পরিক্রমা করলেন এবং "রাক্ষসীর" প্রাণপাখি কোথায় আছে তা দেখলেন।

যুদ্ধের প্রাক্‌কালে ভগবান্ অর্জুনকে বললেন—

"শুচির্ভূত্বা মহাবাহো! সংগ্রামাভিমুখে স্থিতঃ।
পরাজয়ায় শত্রূণাং দুর্গাস্তোত্রমুদীরয়॥"

(মহাভারত, ভীষ্ম পর্ব, ২৩/২)

"মহাবাহু অর্জুন! তুমি পবিত্রচিত্ত হয়ে যুদ্ধের

অভিমুখে থেকে শত্রুগণের পরাজয়ের জন্য দুর্গাস্তব পাঠ কর।"

শুরুকে আমরা বলি, "তৎপদং দর্শিতং যেন।" এখানেও দেখছি তাই। স্তোত্রমাত্রেই দেবীর আবির্ভাব ঘটছে। অন্তরিক্ষগত বাক্ উত্থিত হল—

"স্বল্পেনৈব তু কালেন শত্রূন্ জেষ্যসি পাণ্ডব।
নরস্ত্বমসি দুর্দ্ধর্ষ! নারায়ণ সহায়বান্॥"

(ঐ, ২৩।১৮)

—দুর্ধর্ষ পাণ্ডুনন্দন! তুমি অত্যন্ত অল্প-কালের মধ্যেই শত্রুগণকে জয় করতে পারবে। কারণ স্বয়ং নারায়ণ তোমার সহায় এবং তুমিও মহর্ষি নরের অবতার।

ডাক্তাররা বলেন—যে ওষুধে ভাল কাজ হয়—সেটি আবার লাগাতে হয়। এই অবতারেও নরেন্দ্রনাথকে মা কালীর কাছে পাঠালেন। তিনি গিয়ে দেখলেন, অনন্ত করুণা, অনন্ত মাধুর্য, জ্যোতির্ময়ী, সহাস্যবদনা চিন্ময়ী মা! "সংসারৈকসারা" জগন্মাতা।

পাশ্চাত্যগমনের সংকল্প উঠছে—কিন্তু স্থির সিদ্ধান্ত হচ্ছে না। এই সময়ে স্বামীজীর একটি দর্শন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি দেখলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর সমুদ্রের ওপর দিয়ে পশ্চিমে যাচ্ছেন এবং তাঁকে ডাকছেন। এ যেন, বিশ্বরূপ দেখানোর পর শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান—"ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।" (গীতা,১১।৩৩) তবু ধর্মমহাসভার প্রারম্ভে স্বামীজী কিঞ্চিৎ বিহ্বল হয়েছিলেন। পূর্বাহ্নে কিছু বলতেই পারলেন না। অপরাহ্নে কিন্তু জয়জয়কার। অর্জুনও যুদ্ধের পূর্বে কিঞ্চিৎ মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন "ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ।" (গীতা, ২/৯) কিন্তু ছাড়ে কে? তাঁকে যে করতেই হবে। সেজন্যই সমগ্র গীতা শ্রবণের পরে বললেন, "স্থিতোঽস্মি গত সন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।" (গীতা, ১৮।৭৩) এ অবতারেও দেখি একই বাণী—

"শুনি সসম্ভ্রমে
দাস তব প্রস্তুত সতত
সাধিতে তোমার কাজ।"

(চাই গীত শুনাতে তোমায়—স্বামীজী)

নর-নারায়ণের এই লীলাবিলাসের কথা মহামতি ভীষ্মও দুর্যোধনকে বলেছিলেন—

"নরনারায়ণৌ যৌ তৌ পুরাণাবৃষিসত্তমৌ।
সহিতৌ মানুষে লোকে সম্ভূতাবমিতদ্যুতী॥

(মহাভারত; ভীষ্মপর্ব, ৬৫/১১)

—"নর ও নারায়ণ" নামে যে দুইজন প্রাচীন মহাতেজা ঋষিশ্রেষ্ঠ আছেন, তাঁরাই মিলিত হয়ে মনুষ্যলোকে গিয়ে উৎপন্ন হবেন।

মহারথ অর্জুনকে কাবু করার জন্য দুর্যোধন অনেক কাণ্ড করেছিলেন। অষ্টবসুর অন্যতম ভীষ্মদেব বাণবৃষ্টি করে অর্জুনকে আচ্ছন্ন করলেন। কৌরবেরা ভাবল—এবারে কাজ ফতে। কিন্তু তিনি সর্বত্র বিজয়ী—

"কৌরবের দলে সবে করে মার মার।
গাণ্ডীবে টঙ্কার দেন ইন্দ্রের কুমার॥
… … …
রেণুর প্রমাণ করি সব উড়াইল।
সুরাসুর নাগ নরে বিস্ময় মানিল॥"

(কাশীরাম দাস)

ডেট্রয়েটেও অনুরূপ ঘটনা দেখি। দুষ্টরা স্বামীজীর নামে অনেক মিথ্যা রটনা করে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফলকাম হয়নি।

"অচ্ছেদ্য, অভেদ্য ধনু দেবের নির্মাণ।
কি করিতে পারে তাহা মানুষ পরাণ?"

(কাশীরাম দাস)

শ্রীরামকৃষ্ণ ধ্যানে দেখছেন—তিনি স্বয়ং একটি বালকের বেশে অখণ্ডের ঘরে ধ্যানস্তিমিত সপ্তর্ষির অন্যতমের কাছে আবির্ভূত। তাঁকে প্রেমবাহুতে জড়িয়ে বীণানিন্দিত কণ্ঠে বলছেন, "আমি

যাইতেছি তোমাকেও আমার সহিত যাইতে হইবে।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ)। ধ্যানস্থ ঋষি কিঞ্চিৎ তাকালেন, "ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি" (কুমারসম্ভব)। তাঁর দৃষ্টিতেই তিনি যে আসছেন—একথা বোঝা গেল। "বিস্মিত হইয়া দেখি, তাঁহারই শরীর মনের একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতির আকারে পরিণত হইয়া বিলোমমার্গে ধরাধামে অবতীর্ণ।" (লীলা-প্রসঙ্গ) এই ব্যক্তিই নরেন্দ্রনাথ। ঠাকুর নিজমুখে বলেছেন।

এই নররূপী নারায়ণের অবতার শ্রীবিবেকানন্দই, রামকৃষ্ণরূপ বেদের অপ্রতিম ভাষ্য। অর্ধবাহ্যদশায় ঠাকুর বললেন, "শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।" আর আপামর জনে স্বামীজী শোনালেন—"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?/ জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" মহাযুগসন্ধিক্ষণ সমাগত। তাঁদের কৃপায় এই বস্তু সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করে জীবসেবারূপ মহান্ কর্মযোগে সকলে সিদ্ধি লাভ করে জীবন ধন্য করুন—এই প্রার্থনা। "সম্মুখে দাঁড়াও নর, সম্মুখে দাঁড়াও নারায়ণ !" (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ)

পরতত্ত্বে সদা লীনো রামকৃষ্ণসমাশ্রয়ঃ।
যো ধর্মস্থাপনরতো বীরেশং তং নমাম্যহম্ ॥

—যিনি সর্বদা পরব্রহ্মতত্ত্বে লীন হয়ে আছেন এবং রামকৃষ্ণকে যথার্থরূপে যিনি জেনেছেন, যিনি ধর্মস্থাপনে রত, সেই বীরেশ্বর বিবেকানন্দকে প্রণাম করি।

জয় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ !*

* গত ২৬ মার্চ ১৯৮৬-তে স্বামী ধ্যানাত্মানন্দজীর দেহত্যাগ হয়। দেহত্যাগের অল্প কয়দিন পূর্বে, ১৪ মার্চ এই লেখাটি তিনি 'উদ্বোধন'-এর জন্য পাঠান।—সঃ

সোভিয়েত রাশিয়ায় কয়েকদিন

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

জানার বাড়ি থেকে রেলস্টেশনে গেলাম। সঙ্গে অ্যান্ড্রু, যে ট্রেনে চাপলাম, তার নাম—'রেড অ্যারো'। বিখ্যাত ট্রেন। ঘণ্টায় গড়ে ১৫০ কি. মি. বেগে যায়। মস্কো থেকে লেনিন-গ্রাডে ন-ঘণ্টায় যায়। পথে দু-তিনটে স্টেশনে থামে। রাত এগারোটায় ছাড়ে, সকাল আটটায় লেনিনগ্রাডে পৌঁছে দেয়। রাশিয়ার সব ট্রেনে মাত্র একটা ক্লাস, প্রথম দ্বিতীয় এসব নেই। অন্য ট্রেনে চাপিনি, কিন্তু এ ট্রেনটা খুব আরামের। প্রত্যেক কামরায় দুজন করে যাত্রী। মেঝেতে কার্পেট, বার্থে পরিষ্কার বিছানা। পয়লা নভেম্বর সকালে লেনিনগ্রাডে পৌঁছলাম। নামবার আগে চা খেয়ে নিলাম। বৃষ্টি হচ্ছে। ট্যাক্সি করে হোটেল 'য়ুরোপা'তে উঠলাম। বিরাট হোটেল, জারের সময় তৈরি, একটু সেকেলে। ভাস্কর্যের প্রাচুর্য। প্রত্যেক তলায় বহু রকমের ইতালিয়ান মূর্তি। ইউরোপ আমেরিকার যারা সবচেয়ে ধনী, তারা এক সময়ে এই হোটেলে উঠত।

অ্যান্ড্রুর ইচ্ছা আমি লেনিনগ্রাড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যাই, অধ্যাপকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করি, আর ছাত্রদের কাছে কিছু বলি। আমার কোন উৎসাহ নেই, কারণ ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু-সংবাদে মন খারাপ হয়ে আছে, আর বৃষ্টিতে ভিজে শরীরটাও ভাল লাগছে না। অ্যান্ড্রু ফিরে এসে বলল, অধ্যাপকদের খুব ইচ্ছে আমার সঙ্গে দেখা করার, তাঁরা হোটেলে আসতেও প্রস্তুত। কিন্তু তাঁদের একজন 'ডীন' না কে

বাধা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ওপর থেকে হুকুমনামা না পেলে কোন ধর্মপ্রচারককে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে সভা করতে দিতে পারেন না। অ্যান্ড্রুর মন খারাপ ; কিন্তু আমি স্বস্তি পেলাম।

পরদিন (২ নভেম্বর) খুব ভাল করে লেনিনগ্রাড দেখলাম। লেনিনগ্রাডের রাস্তাগুলি সোজা ও চওড়া, বাড়িগুলি নূতন ধাঁচের। আর অসংখ্য গির্জা, আর অসংখ্য মিউজিয়াম। একটা মিউজিয়াম আছে যার নাম—Museum of Religion and Atheism। এখানে ধর্মের কতরকমের প্রকাশ, আবার ধর্মের নামে কত রকমে লোক ঠকানোর ব্যবস্থা—দেখানো হয়েছে। মাদার মেরী কাঁদছেন, কিন্তু কি করে কাঁদছেন? এসব পাণ্ডাদের বুজরুকি। দেখা যাবে, পাম্প করে তাঁর চোখ দিয়ে জল বের করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যে মিউজিয়ামটি সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয়, তা হচ্ছে—The Hermitage। এই শব্দটির বাংলা করলে বলতে হয় সাধুভবন। বস্তুতঃ এটি জারের বাস-ভবন। শীতকালে জার এখানে থাকতেন, তাই এর অপর নাম—The Winter Palace। জারের ঘর, তাঁর পরিবারের আর সবার ঘর, আসবাব পত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জা, ব্যবহৃত যত জিনিস, সব এখানে আছে। জারেরা শিল্পকলা ভালবাসতেন। মহামূল্য ছবি তাঁরা সংগ্রহ করতেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে। কত হীরা মণি-মুক্তা এখানে আছে। বিস্ময়কর! না দেখলে বিশ্বাস হবে না। লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা এই রাজপ্রাসাদ দখল করে নেন। রাজপ্রাসাদ বিপ্লবীরা দখল করলে জারের পতন ঘটল। যে গেট দিয়ে বিপ্লবীরা ঢুকেছিলেন, তা দেখলাম। নেপোলিয়ান ও হিটলার লেনিনগ্রাডে ঢুকেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শীতের তাণ্ডবে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। বলা হয় 'General Winter' নেপোলিয়নকে তাড়িয়ে দেন। তাঁদের সময়কার কামানগুলি এখনও পড়ে আছে।

মিউজিয়ামে অনেক লোক। কত দেশ-দেশান্তর থেকে লোক এসেছে। কানাডা থেকে শিল্পের ছাত্ররা এসেছে, এখানে বড়-বড় শিল্পীদের যে-সব ছবি আছে, তার নকল করে নিয়ে যাবে। তাদের ঢুকতে পয়সা দিতে হয়নি। অত লোকের মধ্যে ভারতীয় আমি একা। শুনলাম লেনিনগ্রাডে অনেক ভারতীয় ছাত্র পড়াশুনা করে, আমি অবশ্য তাদের কাউকেই দেখিনি। রেস্তোরায় কিন্তু আফ্রিকার ছাত্র দেখেছি। সকালে প্রাতরাশের সময় দেখেছি, তাড়াতাড়ি খেয়ে ক্লাস করতে যাচ্ছে। মিউজিয়ামে ঘোরা ফেরা করছি, আর দেখছি অনেকের চোখ আমার ওপর। পোশাক-পরিচ্ছদের জন্যে। আবার অনেকে জিজ্ঞাসা করছে আমি ভারত থেকে কিনা। 'হ্যাঁ' বললে সমবেদনা জানাচ্ছে।

আর হাঁটতে পারছি না, কাজেই অ্যান্ড্রুকে বললাম—'চল, এবার ফিরে যাই।' অ্যান্ড্রু বললে—'গাড়িতে আর একটু ঘুরবেন?' আমি বললাম—'হ্যাঁ, চল, গাড়িতে ঘুরি'। নিভা (Niva) নদী এঁকে-বেঁকে লেনিনগ্রাড শহরের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে। সব সমেত বারোটা সেতু এর ওপর। যাতে জাহাজ-চলাচলের অসুবিধে না হয়, সেজন্যে এই সেতুগুলি দুভাগে ভাগ করে পথ করে দেওয়া যায়। হাওড়ার ওপরও এক সময় এরকম সেতু ছিল।

সন্ধ্যাবেলায় হোটেলে ফিরে এলাম। অ্যান্ড্রু আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বললে—'যদি কিছু না মনে করেন, তাহলে কিছুক্ষণের জন্যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম —'কেন?' সে বললে—'লেনিনগ্রাডের লোকের ভাষা খুব মার্জিত, আমি রাস্তায় চলতে-চলতে

সেই তাবা শুনতে চাই।' আমি বললাম—'বেশ, এখন তো বৃষ্টি হচ্ছে?' বস্তুতঃ যতক্ষণ লেনিনগ্রাডে ছিলাম, ততক্ষণ বৃষ্টি হয়েছে। অ্যাণ্ড্রু বললে—'ও কিছু না, বৃষ্টিতে ভিজতে আমি অভ্যস্ত।' ঘণ্টা কয়েক পরে অ্যাণ্ড্রু ফিরল, ততক্ষণে 'রেড অ্যারো' ধরবার সময় হয়ে গেছে। আমরা তাড়াতাড়ি কিছু মুখে দিয়ে ট্রেন ধরলাম।

তারপর দিন (৩ নভেম্বর ১৯৮৪) যথাসময়ে মস্কোতে পৌঁছলাম। মস্কো শহরে ঢুকতে রেল লাইনের দুপাশে কাঠের তৈরি অনেক ছোট ছোট বাড়ি দেখলাম। জিজ্ঞাসা করে জানলাম এ বাড়িগুলি 'প্রাইভেট'। অর্থাৎ জমি সরকারের, কিন্তু বিভিন্ন লোককে দেওয়া হয়েছে, তারা বাড়ি তৈরি করে এখানে বাস করতে পারে। অনেকে দেখলাম শাক-সব্জী করছে, হাঁস-মুরগি পালছে। তারা হয়তো শহরে থাকে ও কাজ করে, কিন্তু ছুটির দিন এখানে এসে কাটিয়ে যায়। মস্কো শহরে বাড়ির সমস্যা বেশ আছে। সব বাড়িই তো ফ্ল্যাট বাড়ি। এক-এক পরিবারকে এক-একটা ফ্ল্যাট দেওয়া আছে, কিন্তু তার আয়তন খুব ছোট। আমি তিনটে ফ্ল্যাট দেখেছি, এই তিনটে ফ্ল্যাটই উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের। শুনেছি যাঁর যেমন পদমর্যাদা, তাঁর তেমন ফ্ল্যাট। তা যদি হয়, তাহলে সাধারণ, লোককে বেশ কষ্ট করে থাকতে হয়। খুব নামমাত্র ভাড়া দিয়ে এই ফ্ল্যাট পাওয়া যায়। এই ফ্ল্যাটে যাঁরা থাকেন তাঁদের জীবনস্বত্ব আছে, কিন্তু মালিকানা স্বত্ব নেই। অর্থাৎ ফ্ল্যাট তাঁরা বিক্রি করতে পারবেন না; কিন্তু সারাজীবন থাকতে পারবেন।

এবার মস্কোয় ফিরে এই হোটেল রোশিয়াতেই উঠলাম। কিন্তু ঘরটা আগের চেয়েও বড়, সুযোগ-সুবিধা আরও বেশি। এগুলি সব মীরার ব্যবস্থা।

সেদিন বিকেল পাঁচটার সময় দুজন ভদ্রলোক এলেন। তাঁরা পরিচয় দিলেন: আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। পকেট থেকে একটা ছবি বের করে দেখালেন এঁদের একজন। দেখলাম: শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি। ফ্রাঙ্ক ডোরাকের আঁকা সেই ছবিটি। খুব পুরনো। কালো হয়ে এসেছে। এঁদের সব কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এঁদের একটা দল আছে, একজন গুরুও আছেন—রাশিয়ান। মাঝে মাঝে তাঁরা একসাথে মিলিত হন, গোপনে। সেখানে সবাই মিলে কথামৃত পড়েন, ঠাকুর-স্বামীজীর কথা আলোচনা করেন, আর বললেন, 'Social yoga' অভ্যাস করেন। 'Social yoga'টা কি? না, স্বামীজীর কর্মযোগ। এঁদেরও সেই একই অভিযোগ: বই পাওয়া যায় না। কিন্তু এত এঁদের আগ্রহ যে, কোথায় কোন একটা বই পেয়েছেন ঠাকুর-স্বামীজীর, তা-ই Xerox করে নিয়ে সবাই মিলে পড়েন। ঠাকুর-স্বামীজীর প্রতি এঁদের ভক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এঁরা আমার অনেক ফটো তুললেন।

এঁরা চলে যাবার পরে মীরা এসে আমার একটা ইণ্টারভিউ নিল। রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের উপর। রাইটার্স ইউনিয়ন থেকে তাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমার সাথে যা কথাবার্তা হল, টেপ করে নিল। তার ভিত্তিতে পরে রাইটার্স ইউনিয়নের কোন একটা জার্নালে মীরা একটা প্রবন্ধ লিখবে।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় রাইটার্স ইউনিয়নে আমাকে একটা বিদায় ভোজ দেওয়া হল। সুপ্রিম সোভিয়েটের মেম্বার এবং রাইটার্স ইউনিয়নের সেক্রেটারী ফেলিকস্ কুজ্‌নেট্‌সভ্ সভাপতিত্ব করলেন। মকুলস্কিও উপস্থিত ছিলেন। চেলিশেভ ছিলেন না। রাইটার্স ইউনিয়নের যাঁরা কর্মকর্তা এবং তাঁদের স্ত্রীরা

শুধু উপস্থিত ছিলেন। মীরা এবং অ্যাণ্ড্রু অবশ্য ছিল। অনেক টোস্ট ও অনেক বক্তৃতা হল। টোস্ট হচ্ছে, দুজনে গ্লাসে গ্লাস নিয়ে ঠেকানো। ওদের সব হাতে হাতে মদের গ্লাস, আমার হাতে জলের গ্লাস। একজন উঠে একটু ছোট বক্তৃতা করল, আমিও হয়তো একটু বললাম। তারপর যিনি বললেন তিনি তাঁর গ্লাসটা আমার গ্লাসের সঙ্গে ঠেকালেন। টুং করে একটা শব্দ হল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা কিছু কামনা করা হল। এইরকম টোস্ট অনেকবার হল—'আপনার দীর্ঘজীবন কামনা করি', 'আপনার মিশনের উন্নতি কামনা করি', 'ভারতের উন্নতি কামনা করি।' ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেক বক্তৃতা হল—সব আবেগপূর্ণ বক্তৃতা। এইদিন খুব ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁরা। সবচেয়ে বড় কথা 'Indian rice' জোগাড় করেছিলেন। অনেকদিন পরে ভাত খেতে পেরেছিলাম, সেই জন্যই মনে আছে খাবার কথা।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি—যেটা শুনতে অনেকেরই চমক লাগবে। আমরা মনে করি, কম্যুনিস্ট দেশ, অতএব সেখানে সবাই সমান, কোন শ্রেণী-বৈষম্য নেই। কিন্তু আমি দেখলাম, ওখানে Class-consciousness খুব বেশি। সরকারী পদ-মর্যাদা যার বেশি, তার তত বেশি প্রভাব। সরকারী পদমর্যাদা যার কম, সামাজিক ক্ষেত্রেও তার মর্যাদা কম। বিশেষ করে রাইটার্স' ইউনিয়ন এবং অ্যাকাডেমী অব্ সায়েন্সেস্-এর কর্মকর্তাদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। এঁরা অনেক সুযোগ-সুবিধা পান, যা সাধারণ লোক কল্পনাও করতে পারে না। যেদিন আমার বিদায়-ভোজ দেওয়া হল সেদিনকার কথাই বলি। আমাদের খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে, আমার কিন্তু কেবলই মনটা খুঁত খুঁত করছে ড্রাইভারের জন্য। আমি অ্যাণ্ড্রুকে বললাম: দেখ, ড্রাইভারকে এনে একটু খাইয়ে দাও। অ্যাণ্ড্রু প্রথমে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করল, তারপর বলল: ও বাইরে কোথাও খেয়ে নেবে। আমি তাতেও জোর করাতে সে গেল ড্রাইভারকে বলতে কিন্তু ড্রাইভার নিজেই আপত্তি করল আসতে। অর্থাৎ এত বড় বড় সব লোক, এখানে আসতে সে লজ্জা পাচ্ছে। তার মানে এই Class-consciousnessটা আছে। আমাদের দেশে কিন্তু তা নয়। আমি যে টেবিলে খেলাম, সেই টেবিলে বসেই ড্রাইভারও খেতে পারে।

তা, বিদায়-ভোজ-এ আমি বললাম: দেখ, ধর্ম তোমাদের মজ্জায় মজ্জায় মিশে আছে, একে তোমরা অস্বীকার করতে পার না। ধর্মের নামে যে অলৌকিকতা, তাকে তোমরা মানতে চাও না। আমরাও অলৌকিকতাকে ধর্ম বলি না। তবে ধর্মজগতে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যেগুলোর ব্যাখ্যা চলে না। তবে কেউ যদি সেগুলো না মানে তাতে কি যায় আসে? কিছুই যায় আসে না। ধর্মের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, ধর্মের সবচেয়ে বড় অলৌকিকত্ব বা যাদু এখানেই যে, ধর্ম মানুষের পরিবর্তন ঘটায়। আজ যে মানুষটি খারাপ, ধর্মের প্রভাবে সে মানুষটি ভাল হয়ে যেতে পারে। একটা কথা আছে: No saint without a past, no sinner without a future—আজ যে সাধু, অতীতে একসময় সে হয়তো খারাপ ছিল। আর, আজ যে পাপী, তারও একটা ভবিষ্যৎ আছে। ভবিষ্যতে সে হয়তো ভাল হতে পারে। ধর্ম এই পরিবর্তন ঘটায়। পরিবর্তন ঘটাতে পারে বলেই ধর্মের এত প্রয়োজন। তোমাদের দেশ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, এত সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি পথঘাট। কিন্তু এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য একেই যদি তোমরা সব মনে কর, তবে ভুল করবে। যেটা সবচেয়ে

প্রয়োজন সেটা হচ্ছে—human materials; মানুষ যদি ঠিক ঠিক 'মানুষ' না হয়, তাহলে সব বৃথা। সেখানেই ধর্মের প্রয়োজন। No saint without a past, no sinner without a future—এই কথাটা ওঁদের খুব ভাল লেগেছে। ওঁরা অনেকে আমার কাছে এসে ঐ কথাটা লিখিয়ে নিলেন। ওঁদের সেক্রেটারী কুজ্‌নেট্‌সভ্‌ বক্তৃতায় বললেন: 'আমরা কোন "Consumeristic Society" চাই না। আমরা এখন দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান করেছি, আমরা এখন চাই আমাদের সমাজের একটা আধ্যাত্মিক ভিত্তি হোক (a spiritual basis of society)। এই ব্যাপারে আপনারা আমাদের সাহায্য করুন।'

ঐ সভাতেই ঠিক হল ১৯৮৬-র জানুআরি মাসে দু-দেশের সহযোগিতায় আমাদের দেশে একটা সেমিনার হবে; তার বিষয় হচ্ছে, 'Peace, prospects and possibilities' (এখন অবশ্য ঠিক হয়েছে, এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ইনস্টিটিউট অব্‌ কালচারের সহযোগিতায় আগামী শীতে কোন এক সময়ে ঐ সেমিনারটি হবে।)

আমি যখন বিদায় নেব, তখন দেখছি একজন বৃদ্ধা এসে মীরার কানে কানে কি যেন বলছেন। মীরা এসে আমাকে বলছে: মহারাজ, ইনি আপনার আশীর্বাদ চাচ্ছেন। বৃদ্ধা এসে ততক্ষণে আমার সামনে হাঁটুগেড়ে বসেছেন। আমি আর কি বলব। বললাম: God bless you। তারপর যে যেখানে আছে, ছুটে আসছে। বলছে: Please bless me। আমি বলছি: God bless you। এখন, কুট্‌নেট্‌সভ্‌-এর স্ত্রী যিনি, তিনি খুব সুন্দরী এবং একটু অহংকারীও মনে হল। খুব সেজেগুজে আছেন। সবাই—বিশেষ করে মহিলারা কেউই বাদ গেলেন না,—আশীর্বাদ চাইলেন। কিন্তু তিনি চাইলেন না, লক্ষ্য করলাম। মজা হচ্ছে: আমি যখন গাড়িতে চড়ছি, তখন তিনি কানে কানে এসে বলছেন: Please, bless my daughter.

তারপর দিন (৪ নভেম্বর, ১৯৮৪) বিদায়। সকালে ৯।১০টার সময় চেলিশেভের কাছ থেকে ফোন এল। বললেন যে, দশটার সময় তিনি দেখা করতে আসবেন। দশটার সময় চেলিশেভ হোটেলে এলেন, ডানিলচুক্‌ও এলেন। অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হল। বিশেষ করে ডানিলচুকের সঙ্গে। ডানিলচুক্‌ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও টলস্টয় নিয়ে একটা বই লিখছেন। সেই সম্পর্কে আমার সঙ্গে কথা বললেন। এর মধ্যে আমি একবার জানা আর তাঁর স্বামীকে ফোন করে বিদায় চেয়ে নিলাম। ওঁরা খুব খুশি হলেন, খুব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন।

মস্কোতে লেনিনের সমাধিস্থান আছে শুনেছি। লেনিনের মরদেহটাকে এমনভাবে রাখা হয়েছে যে, একটুও বিকৃত হয়নি। আমাকে ওরা নিয়ে যাবে যাবে করছিল, কিন্তু হয়নি। এইদিন চেলিশেভ যখন শুনলেন লেনিনের সমাধিস্থান আমার দেখা হয়নি, তখন বললেন: 'আজই তাহলে চলুন।' আমি বললাম: 'শুনেছি নাকি লম্বা লাইন পড়ে, সকাল আটটায় দাঁড়ালে বিকেল তিনটের হয়তো পৌছতে পারব।' চেলিশেভ্‌ বললেন: 'চলুন না, দেখা যাক কি হয়।' বেরিয়ে পড়লাম আমরা। সেদিন একটু বরফ পড়েছিল। রাস্তাঘাট সব ভিজে রয়েছে। খুব শীত। ওভারকোট-টোট সব পরে আছি। সমাধিস্থানে গিয়ে দেখলাম বিরাট লাইন। আর সেখানে সব মিলিটারি দাঁড়িয়ে আছে, যাতে বিশৃঙ্খলা না হয়। আমরা গিয়ে যখন পৌছলাম, তখন প্রকাণ্ড লাইন পড়ে গেছে। সব শেষে যদি দাঁড়াই, তাহলে আর আমার দেখা হবে না। চেলিশেভ্‌ বললেন: আচ্ছা দেখি স্বামীজী, কি

করতে পারি। উনি এগিয়ে গিয়ে পকেট থেকে আইডেনটিটি কার্ড দেখালেন গার্ডের কাছে—আর তখনই বুঝতে পারলাম সোভিয়েত রাশিয়ায় রাইটার্স ইউনিয়নের আর অ্যাকাডেমী অব্ সায়েন্সেস্-এর কি ক্ষমতা (চেলিশেভ এই দুটো সংস্থারই সভ্য)। ঐ কার্ড দেখা মাত্র তারা 'স্যার', 'স্যার' করতে লাগল। বলল : আপনাদের পেছনে দাঁড়াতে হবে না, সামনে চলুন। একেবারে সামনেই নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাত, কিন্তু একেবারে সামনে সেদিন কয়েকজন শিশু ছিল। তাদেরকে টপকে যাওয়া ভাল দেখায় না। তাই শিশুদের ঠিক পরেই আমাদের দাঁড় করিয়ে দিল। আমাদের আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। লেনিনের মরদেহ দেখলাম, যেন মানুষটি ঘুমিয়ে আছেন। এতটুকুও দাগ পড়েনি তাঁর শরীরে। এ দেখা সম্ভব হল শুধুমাত্র চেলিশেভের জন্যে।

সমাধিস্থান থেকে ফিরে আসবার পর দেখলাম অধ্যাপক মকুলস্কি এসেছেন। সঙ্গে দুজন সহকর্মী। টেপরেকর্ডার নিয়ে এসেছেন সাথে। দু-ঘণ্টা ধরে প্রশ্নোত্তর চলল। বিষয় হল : হিন্দুদের সৃষ্টিতত্ত্ব; জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি। মকুলস্কির বিদায় নেবার পরে মীরার পালা। সেও কিছুক্ষণ ধরে প্রশ্ন করল আর টেপ করল—তাঁকে যে প্রবন্ধ লিখতে হবে সেইজন্য। এরপরে সার্গেই এলেন। এঁর কথাও আগেই বলেছি। এঁর সঙ্গে কথা বলে খুবই আনন্দ পেয়েছি। প্রকৃত অর্থেই পণ্ডিত। ভারতীয় দর্শন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, বেদান্ত খুবই ভাল জানেন। আর বড় ভাল মানুষ। আমি এয়ারপোর্ট রওনা হওয়া পর্যন্ত ইনি ছিলেন। এঁরা ছাড়াও অনেকে এলেন; অনেক কথাবার্তা হল। সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সবার মুখে এক কথা—'আবার আসবেন'। এত আন্তরিকতা, উদারতা এবং সমাদর কম জায়গাতেই পেয়েছি। সবাইকে বললাম, আমার একবারও মনে হয়নি যে, আমি বিদেশে অপরিচিতদের মধ্যে আছি।

এয়ারপোর্ট রওনা হলাম রাত সাড়ে আটটার সময়। সঙ্গে মীরা আর অ্যান্ড্রু। আমি সিকিউরিটি চেকের জন্য এগিয়ে যাওয়া পর্যন্ত দুজনে আমার সঙ্গে ছিলেন। হয়তো প্লেন ছাড়া পর্যন্তই ছিলেন। প্লেন ছাড়ল রাত সোয়া বারোটার সময়। এসেছিলাম এয়ারইণ্ডিয়ায়, ফিরছি এয়ারোফ্লোটে। প্লেনে আসতে আসতে শুধু এই কথাই ভাবছিলাম যে, কী অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল! রাশিয়ানদের সম্বন্ধে শুনেছিলাম যে, এঁরা একটু রুক্ষ, অমার্জিত, মুখ খুলতে চান না; মনে মনে সব চেপে রাখেন। কিন্তু দেখলাম যে, এঁরা, যেমন সহৃদয়, তেমনি হাসিখুশি; যেমন মিশুকে, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর তেমনি ধর্মপ্রাণ। আর দেখলাম ঠাকুর-স্বামীজীর লীলা। আমরা ঠাকুর-স্বামীজীকে কি প্রচার করব—এঁরা নিজেদের প্রচার নিজেরাই করছেন। বিশ্বজয় করতে এঁরা যাত্রা শুরু করেছেন। রাশিয়ার 'লৌহ-যবনিকা'ও এঁদের সেই দিগ্বিজয়-অভিযানকে প্রতিহত করতে পারেনি।

৫ নভেম্বর সকাল আটটা চল্লিশ মিনিটে দিল্লী এসে পৌঁছলাম।

'মাং ত্রাহি সংসার-ভুজঙ্গদষ্টম্'

শ্রীসূর্যকান্ত মাহাতো

মহাভারতের মহাক্ষত্রিয় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অকপট শরণ নিয়ে হৃদয়ের আর্তি প্রকাশ করে ভক্তিনম্রচিত্তে প্রার্থনা করছেন :

"শ্রীরাম নারায়ণ বাসুদেব !/গোবিন্দ বৈকুণ্ঠ মুকুন্দ কৃষ্ণ '/শ্রীকেশবানন্ত নৃসিংহ বিষ্ণো !/মাং ত্রাহি সংসার-ভুজঙ্গদষ্টম্ ।"[১] —অর্থাৎ, রাম! বাসুদেব! কৃষ্ণ! বিষ্ণু! নারায়ণ !/গোবিন্দ! মুকুন্দ! হরি! বৈকুণ্ঠ-রমণ !/হে অনন্ত! হে কেশব! ওহে ভগবান !/দংশেছে সংসার সর্পে, কর মোরে ত্রাণ।

এই প্রার্থনা কি শুধু ধৃষ্টদ্যুম্নেরই? ভক্ত-আর্তিহারী শ্রীভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই তো জানাচ্ছে সংসার-তাপে তাপিত প্রতিটি ভক্তহৃদয়!

সংসার হল দুঃখের আগার। শোক-দুঃখ জরা ব্যাধি এবং পরিশেষে মৃত্যু—এই তো সংসার। বৌদ্ধদর্শনের আর্য-চতুষ্টয়ের প্রথম সত্যই হল "এ জগৎ দুঃখময়।" ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, "সংসারে আছে কি? আমড়ার অম্বল; খেতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমড়াতে আছে কি? আঁটি আর চামড়া খেলে অম্লশূল হয়।" মানবশিশু মাতৃগর্ভ থেকে এ সংসারে ভূমিষ্ঠ হয়েই কেঁদে ওঠে—এটাই প্রমাণ করে এ জগৎ কাঁদবারই স্থান। এবিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের "সখার প্রতি" কবিতার সেই অবিস্মরণীয় লাইনটি আরও স্পষ্ট অর্থবাহী, "প্রাণ সাক্ষী শিশুর ক্রন্দন হেথা সুখ ইচ্ছ মতিমান?"

ভোগ করব বলে কত আশা নিয়ে আমরা সংসারে ঘর বাঁধি। টাকাকড়ি স্ত্রী-পুত্র—কত কি আমরা চাই। সকলের ভাগ্যে অবশ্য সবকিছু জোটে না। তবে এগুলি যে পূর্ণমাত্রায় পেয়েছে সেও কি বলতে পারে যে সে অনাবিল শান্তিতে বিরাজ করছে? না। কারণ? এ জগৎ অনিত্য। কোনকিছুই এখানকার স্থায়ী নয়। ঠাকুর বলছেন, "যদি বুঝতাম জগৎটা নিত্য, তাহলে কামারপুকুরকে সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়ে যেতাম। কিন্তু দেখছি, জগৎটা অনিত্য।"[২] ভগবান বুদ্ধের সংসারজীবনে কি না ছিল? বিরাট রাজ্য, সুশোভন রাজপ্রাসাদ, মনোহর উদ্যান, পরমা-সুন্দরী স্ত্রী—সবকিছুই তো তাঁর ছিল। কিন্তু সব কিছু ছেড়ে তিনি ত্যাগের পথে পা বাড়ালেন। কেন? কারণ, তিনি বুঝেছিলেন সংসার-সর্পের দংশনে কত জ্বালা, আর এই বিষ কত মারাত্মক। এই কালবিষের মারাত্মক পরিণতি তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন বলেই সুন্দরী স্ত্রীর সুকোমল মুখশ্রী, শিশুপুত্রের ক্রন্দন—কোন-কিছুই ত্যাগের সঙ্কল্প থেকে তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেনি। পার্থিব সম্পদ ভোগ করে শান্তি পাব বলে আমরা তার পেছনে মরিয়া হয়ে ছুটছি। অথচ পার্থিব সম্পদ-ভোগে শান্তি কোনদিন পাওয়া যাবে না। তাই-তো দেখি ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য যখন তাঁর পার্থিব সম্পদ দুই স্ত্রীর মধ্যে ভাগ করে দিতে চাইছেন তখন মহাবিদুষী মৈত্রেয়ী বলছেন, "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্?"—"যা আমাকে অমৃতের আস্বাদন দেবে না তা নিয়ে আমি কি করব?"

আবার বালক নচিকেতাকে যখন যমরাজ

১ পঞ্চামৃতম্—ভক্তগীতা, প্রকাশক—ডঃ গোবর্ধন ঘোষ, এলাহাবাদ, ৩য় সং, পৃঃ ৬৮

২ ভগবান-লাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, ৩য় সং, পৃঃ ১-২

স্বর্গের পরমাসুন্দরী অপ্সরাদের দেখিয়ে প্রলুব্ধ করে বলছেন: নচিকেতা! পৃথিবীতে যা যা কাম্য এবং দুর্লভ, সে-সব কাম্যবস্তুই যথেচ্ছ প্রার্থনা কর। এই যে সুন্দরী অপ্সরাদের তোমার সামনে দেখছ, তুমি ওদের ভোগ কর। তোমায় চিরজীবন এবং কাম্যবস্তু সমূহ যথেচ্ছ ভোগের ক্ষমতা প্রদান করছি। তবু তুমি আমায় মৃত্যুর প্রশ্ন করো না। নচিকেতা বুঝেছিলেন জীবন যৌবন দুদিনের। "কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন।" তাই যমরাজের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে নচিকেতা বলছেন, "তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে"। ঐ সুন্দরী অপ্সরাদের উন্মত্ত যৌবন এবং তাদের নৃত্যগীত তোমারই থাকুক। আমাকে আত্মজ্ঞান দান কর।

উপনিষদ বলছেন, "ন ধনেন, ন প্রজয়া। ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব মানশু"। ধন বা প্রজোৎপাদনের দ্বারা নয়, ত্যাগের দ্বারাই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। অথচ ভোগের পেছনেই আমরা অন্ধের মতো মরিয়া হয়ে ছুটছি! কাঁটাঘাস খেতে উটের মুখ দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে, মুখে ভীষণ যন্ত্রণাও হচ্ছে, তবুও কাঁটাঘাস খাওয়ার কত লোভ!

আর এই তো সেদিন পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে এক হাতে টাকা অন্য হাতে মাটি নিয়ে, "টাকা মাটি, মাটি টাকা" বলে টাকা ও মাটি দুটিকেই গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করে ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখালেন "ত্যাগীর বাদশা" ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব! ঈশ্বর লাভের পথে টাকা ও মাটি দুটিই অন্তরায় বলে ঠাকুর দুটিকেই ত্যাগ করলেন। শুধু তাই নয়, পরমভক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ মারোয়াড়ী ঠাকুরকে অর্থদান-প্রার্থনা করলে বিষম বিরক্ত হয়ে তিনি বলেছিলেন:

কণ্টকস্বরূপ অর্থ পরমার্থ-পথে।/কোন প্রয়োজন মম নাহি হেন অর্থে॥/চিত্তে যার তিলমাত্র অর্থ-ভাব থাকে।/মহানন্দময়ী শ্যামা নাহি মিলে তাকে॥/এমত অর্থের কথা না কহিবে আর।/সর্বনাশী অর্থে কাজ নাহিক আমার।[৩]

কিন্তু আমরা তো সব সাধারণ সংসারী জীব! অর্থ না হলে আমাদের চলে না! অর্থকে অনর্থ বলে আমরা তো তাকে পা মাড়িয়ে দূরে সরিয়ে দিতে পারি না! আমাদের তো সেরকম হৃদয়-নিংড়ানো ত্যাগ নেই। ভগবান বাসুদেব বলছেন: ভয় নেই। "অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।"[৪] —অনিত্য সংসারে জন্মেছ, আমাকে ভজনা কর। তোমরাও আমাকে পাবে। "ভজস্ব মাম্"। কেন? "অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"[৫] —শোক করো না, আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করব।

আর এটা তো আমাদের স্বীকার করতে হবে সংসারে আমরা যে দুঃখকষ্ট পাচ্ছি এটা আমাদেরই কৃতকর্মের ফল! এর জন্য তো আর ভগবানকে দোষ দেওয়া যায় না! "স্বখাত-সলিলে" আমরা ডুবে মরছি।

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন, কোন ভয় নেই, নিরাশ হয়ো না।

"নরকে পচ্যমানানাং,/নরাণাং পাপকর্মণাম্/মুক্তি সঞ্জায়তে সদ্যো/নাম সংকীর্তনাদ্ধরেঃ॥"[৬]

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন, ৩য় সং, পৃঃ ২৩৪
৪ গীতা—৯।৩৩
৫ ঐ—১৮।৬৬
৬ পদ্যামৃতম্—ভক্তগীতা, প্রকাশক—ডাঃ গোবর্ধন ঘোষ, এলাহাবাদ, ৩য় সং, পৃঃ ১০

—অর্থাৎ, আপন পাপেতে হায়! হয়ে জ্ঞান-হারা,/ সংসার-নরকে ডুবি পচিতেছে যারা;/তারা যদি হরিনাম করে সংকীর্তন,/সকল যাতনা সদ্য হয় বিমোচন।

হরিনাম করতে বলছেন মহাপ্রভু! হরিনাম কীর্তন করলে সকল যাতনা সদ্য সদ্য বিমোচন হয়। সেই জন্যই বোধ হয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে হরিনাম গুণগানকারী ব্যক্তিকে চতুর বলা হয়েছে। "হরিনাম কৃষ্ণনাম বড়ই মধুর।/যেই ভজে কৃষ্ণনাম সে বড় চতুর।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণেরও ঐ একই কথা। "কলিযুগে অন্নগত প্রাণ—দেহাত্মবুদ্ধি, অহংবুদ্ধি যায় না। তাই কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। ভক্তিপথ সহজ পথ। আন্তরিক ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর নাম গুণগান কর, প্রার্থনা কর ভগবানকে লাভ করবে, কোন সন্দেহ নাই।"

ঠাকুর বলছেন, "সত্য বলছি, তোমরা সংসার করছো এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হ'লে হবে না। এক হাতে কর্ম করো, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো। কর্ম শেষ হ'লে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধ'রবে।"

আমিত্ব ভাবটা দূর করতে বলছেন ঠাকুর। এই "আমি" "আমার" ভাবটাই যত দুঃখের গোড়া। ঠাকুর বলছেন, "দেখ, অহঙ্কার না গেলে জ্ঞান হয় না। 'মুক্ত হ'ব কবে', 'আমি' যাবে যবে।' 'আমি' ও 'আমার' এই দুইটি অজ্ঞান। 'তুমি' ও 'তোমার' এই দুইটি জ্ঞান। যে ঠিক ভক্ত, সে বলে—হে ঈশ্বর! তুমিই কর্তা, তুমিই সব ক'রছো, আমি কেবল যন্ত্র, আমাকে যেমন করাও তেমনি করি। আর এ-সব তোমার ধন, তোমার ঐশ্বর্য, তোমার জগৎ। তোমারই গৃহ পরিজন, আমার কিছু নয়। আমি দাস। তোমার যেমন হুকুম, সেইরূপ সেবা করবার আমার অধিকার।" আরও বলছেন, "যখন জীব বলে, 'নাহং' 'নাহং' আমি কেহ নই, হে ঈশ্বর! তুমি কর্তা; আমি দাস তুমি প্রভু—তখন নিস্তার; তখনই মুক্তি।"

নির্লিপ্তভাবে সংসারে থাকতে বলছেন ঠাকুর। বলছেন, "কিন্তু সংসারে নির্লিপ্তভাবে থাকতে গেলে কিছু সাধন করা চাই।—নির্জনে ঈশ্বর চিন্তা করতে হয়। সর্বদা তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে ভক্তির জন্য প্রার্থনা করতে হয়। আর মনে মনে বলতে হয়, 'আমার এ-সংসারে কেউ নাই, যাদের আপনার বলি, তারা দু'দিনের জন্য। ভগবান আমার একমাত্র আপনার লোক, তিনিই আমার সর্বস্ব, হায়! কেমন ক'রে তাঁকে পাব!' "

আর সর্বোপরি চাই তাঁর কৃপা। তাঁর কৃপা পেলে সবই সম্ভব। "মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং"—তাঁর কৃপায় বোবাও ভাল বক্তা হয়, পঙ্গুও পর্বতলঙ্ঘনে সমর্থ হয়। ঠাকুর বলছেন, "...হাজার চেষ্টা কর, তাঁর কৃপা না হ'লে কিছু হয় না। তাঁর কৃপা না হ'লে তাঁর দর্শন হয় না। কৃপা কি সহজে হয়? অহঙ্কার একেবারে ত্যাগ করতে হবে। 'আমি কর্তা' এ-বোধ থাকলে ঈশ্বর দর্শন হয় না।" "কৃপা হ'লেই দর্শন হয়।" "ঈশ্বরকে প্রার্থনা করতে হয়, ঠাকুর কৃপা ক'রে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি।"

আবার বলছেন, "তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর আন্তরিক হ'লে তিনি শুনবেনই শুনবেন।" তিনি যে অন্তর্যামী, দীনবন্ধু, অহেতুক কৃপাসিন্ধু! ভক্ত যে তাঁর আপনজন! ভক্তের হৃদয় যে তাঁর বৈঠকখানা!

তাই শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অকপট শরণ নিয়ে একান্তভাবে প্রার্থনা করি; হে প্রভু!

তুমি তো আমার দুর্বলতা সবই জানো। আমি সাধনহীন, ভজনহীন অতি নগণ্য ব্যক্তি! তবুও তোমার চরণে আমি শরণ নিচ্ছি! কৃপা করে তোমার শ্রীচরণে আমাকে ঠাঁই দাও প্রভু!

ভক্তিনম্রচিত্তে আরও প্রার্থনা জানাই—

"মুকুন্দ মূর্দ্ধ্না প্রণিপত্য যাচে ভবন্তমেকান্ত-মিয়ন্তমর্থম্। / অবিস্মৃতিস্ত্বচ্চরণারবিন্দে ভবে ভবে মেঽস্তু তব প্রসাদাৎ॥"[৭]

—অর্থাৎ, হে মুকুন্দ! তোমার চরণপ্রান্তে মস্তক অবনত করে কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করছি, যেন জন্মে জন্মে তোমার কৃপাবলে তোমার শ্রীচরণপদ্ম কখনও বিস্মৃত না হই, প্রভু!

৭ উদ্বোধন—৭৪তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৭৮, শ্রীশ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্—৩নং শ্লোক, পৃঃ ১১০

জয় মা সারদামণি

শ্রীমোক্ষদারঞ্জন সেনগুপ্ত

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ-জননী
দেবী-মানবী সারদামণি
জয়মা-জয়মা।
বাঁকুড়ার জয়রামবাটীতে
রামচন্দ্র মুখার্জ্জি গৃহেতে
জন্মিলে কন্যারূপে—ওমা।
পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী।
তুমি পরমা প্রকৃতি করুণারূপিণী।
শ্রীরামকৃষ্ণ আদর্শের প্রয়োগ প্রতিমা
বিশ্বজননী সারদা-অনুপমা।
যেমতি পূর্ণাবতার শ্রীরামচন্দ্রের
শ্রী—সীতাসতী
সত্যবান-গৃহিণী—সাবিত্রী;
শ্রীকৃষ্ণ-শক্তি—রাধা
তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তি
রামকৃষ্ণগতপ্রাণা—মা সারদা।
একাধারে আদর্শ কন্যা, গৃহিণী
আদর্শ জননী, আবার জন্ম সন্ন্যাসিনী
হতাশ সন্তানদের বলতে "ভয় কি,
আমি তোমাদের মা আছি না?"
যেমন ভক্ত গৃহীদের
তেমনি নেশাখোর পদ্মবিনোদের,
নাট্যকার পানাসক্ত সন্তান গিরীশের,
আবার ভক্ত ডাকাত আমজাদের
সবার তুমি ক্ষমাময়ী, প্রেমময়ী মা,
ঠাকুর তখন অপ্রকট;
তাঁর কাছে একদিন তব প্রার্থনা:
"আমার সন্ন্যাসী সন্তানদের
মোটাভাত কাপড়ের—
মাথা গোঁজার একটু স্থানের
অভাব না হয় তুমি দেখো—
তাদের প্রতি তব কৃপা রেখো।"
সবার প্রতি এ মায়ের উপদেশ:
"কখনো কারো দোষ দেখোনা।"
জয় মা সারদামণি—জয় মা।

বাংলার যুগল চাঁদ

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব নিরূপণ করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি চৈতন্যভাবে সাধনা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি ভাবসায়রে সন্তরণ করতে করতে বিভিন্ন স্থানে ও কালে চৈতন্যভাবের রসাস্বাদন করেছিলেন। কথামৃতসূত্রে জানা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ স্বমুখে বলছেন, 'কখনও মা এমন অবস্থা ক'রে দিতেন যে, নিত্য থেকে মন লীলায় নেমে আস্‌তো। আবার কখনও লীলা থেকে নিত্যে মন উঠে যেতো। যখন লীলায় মন নেমে আসতো, কখনও সীতারামকে রাতদিন চিন্তা করতাম। আর সীতারামের রূপ সর্বদা দর্শন হ'তো··· আবার কখনও রাধাকৃষ্ণের ভাবে থাকতাম। ঐ রূপ সর্বদা দর্শন হ'তো। আবার কখনও গৌরাঙ্গের ভাবে থাকতাম, দুই ভাবের মিলন —পুরুষ ও প্রকৃতি ভাবের মিলন। এ অবস্থায় সর্বদাই গৌরাঙ্গের রূপ দর্শন হতো।'[১৪] পরবর্তিকালেও শ্রীরামকৃষ্ণ যখন গৌরাঙ্গভাবসুধা আস্বাদন করেছেন তখন তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনলাভ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। শিহড়ে হৃদয়ের বাড়িতে থাকাকালীন শ্রীরামকৃষ্ণ দেখতে পান নবনটবরবেশে শ্রীগৌরাঙ্গকে, তিনি কালপেড়ে কাপড় পরেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের গৌরাঙ্গভাবসাধনার অন্যতম ফলশ্রুতি হিসাবেই বলা যেতে পারে তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতিভাবের সম্মিলন ঘটেছিল। রামকৃষ্ণজীবনীর ভাষ্যকার স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, 'ঠাকুরের ভিতর আজীবন পুরুষ ও স্ত্রী, উভয়বিধ প্রকৃতির অদৃষ্টপূর্ব সম্মিলন দেখা যাইত। উহাদিগের একের প্রভাবে তিনি সিংহপ্রতিম নির্ভীক, বিক্রমশালী, সর্ববিষয়ে কারণান্বেষী, কঠোর পুরুষপ্রবররূপে প্রতিভাত হইতেন এবং অন্যের প্রকাশে ললনাজনসুলভ কোমল-কঠোর-স্বভাববিশিষ্ট হইয়া হৃদয় দিয়া জগতের যাবতীয় বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখিতেছেন এবং পরিমাপ করিতেছেন, এইরূপ দেখা যাইত।'[১৫] শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষভাবের সহাবস্থান তাঁর প্রত্যেক অন্তরঙ্গ ভক্তই কিছু-না-কিছু উপলব্ধি করেছিলেন। ভক্ত গিরিশচন্দ্র তো একদিন তাঁকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেই বসলেন, 'মশায়, আপনি পুরুষ না প্রকৃতি?' শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে উত্তর দেন, 'জানি না।'[১৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণের গৌরাঙ্গভাবসুধার আস্বাদন একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। ভাবরাজ্যের তথ্যাদি অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণলীলার ঐতিহাসিকত্ব সম্পাদন এবং কৃষ্ণলীলাবিজড়িত ব্রজের বিভিন্ন স্থানের সনাক্তকরণ শ্রীচৈতন্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কয়েকশ বছর পরে ব্রজধামে শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন ভাবদর্শন শ্রীচৈতন্যকৃত কৃষ্ণলীলাস্থানগুলির সনাক্তকরণের সমর্থন করেছিল। এর ফলে শ্রীচৈতন্য-আবিষ্কৃত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাভূমি বৃন্দাবন ভক্তগণের নিকট অধিকতর গুরুত্বলাভ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণের গৌরাঙ্গভাবসুধা আস্বাদনের অপর একটি প্রয়াসও কম মাধুর্যমণ্ডিত নয়।

১৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।১৪।১

১৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২ খণ্ড, পৃঃ ২২০

১৬ ঐ ৩ খণ্ড, পৃঃ ৩৭

মধুরকণ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব ও সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করে নিজে গৌরাঙ্গভাবসুধা আস্বাদন করতেন, অপর ব্যক্তিদের মধ্যে সেই ভাবসুধা বিতরণ করতেন। বলাবাহুল্য, সুকণ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তিরসাশ্রিত গৌরগাথা এক অনিন্দ্য দিব্যভাবের পরিবেশ রচনা করত। কথামৃত থেকে দুটি ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক। কলুটোলা নবীন সেনের বাড়িতে সংকীর্তনের আসর বসেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ গাইছেন, 'গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়। / হুঙ্কারে পাষণ্ড-দলন এ-ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়॥' ইত্যাদি। গানের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ মধুর নৃত্য করতে থাকেন। ব্রাহ্ম ভক্তগণ নৃত্যে যোগদান করেন। অননুভূত আনন্দরস উপস্থিত সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। অপর একটি দৃশ্য। ভক্ত অধর সেনের বাড়িতে কীর্তনের আসর বসেছে। কীর্তনীয়া আখর দিচ্ছেন, 'হরিপ্রেমের বন্যে ভেসে যায়।' ভাবাবেগে শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে পড়েন, নৃত্য করতে শুরু করেন। তিনি আখর দিতে দিতে একসময়ে গভীর ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। তাকিয়াটি সম্মুখে। তার উপর শ্রীরামকৃষ্ণের মাথা ঢলে পড়েছে। কীর্তনীয়া গাইছেন, 'হরি বলে আমার গৌর নাচে। / নাচে রে গৌরাঙ্গ আমার হেমগিরির মাঝে।' ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার উঠে দাঁড়ান, আখর দিতে দিতে নাচতে থাকেন। তাঁর অপূর্ব নৃত্য দেখে ভক্তগণ আর স্থির থাকতে পারেন না। নরেন্দ্র প্রভৃতি সকলে নৃত্য করতে থাকেন। নৃত্য করতে করতে শ্রীরামকৃষ্ণ এক-একবার সমাধিস্থ হচ্ছেন। অন্তর্দশা, মুখে একটি কথা নাই। শরীর স্থির নিশ্চল। ভক্তেরা তাঁকে বেড়ে বেড়ে নাচছেন। কিছুক্ষণ পরে অর্ধবাহ্যদশা, অমনি শ্রীরামকৃষ্ণ সিংহবিক্রমে নৃত্য করতে থাকেন। তখনও মুখে কথা নেই, প্রেমে উন্মত্তপ্রায়। যখন আবার প্রকৃতিস্থ হচ্ছেন, অমনি আখর দিচ্ছেন। এই দৃশ্য উপস্থাপিত করে কথামৃতকার মন্তব্য করছেন, 'আজ অধরের বৈঠকখানা ঘর শ্রীবাসের আঙ্গিনা হইয়াছে।' শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব কল্পনা করে ভক্তগণ নিজেদের ধন্য ধন্য করেন। এভাবে গৌরাঙ্গভাব আস্বাদন করে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন হয়ে উঠেছিল মাধুর্যমণ্ডিত। এবিষয়ে রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেন, 'তিনি বৈষ্ণব-সঙ্গীতের রসধারায় লালিত হইয়াছিলেন। আর, একথা বলিলেও অসংগত হইবে না, তিনি নিজেও ছিলেন এই সঙ্গীতের সুন্দরতম প্রকাশ—তাঁহার জীবন ছিল ইহার সুন্দরতম কবিতা।'

শ্রীচৈতন্যের এক অনবদ্য সৃষ্টি নাম-সংকীর্তন। সংকীর্তনের সাম্যক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য সমাজের সকল স্তরের মানুষকে ডাক দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশুদ্ধ মনে একবার বাসনা হল তিনি শ্রীচৈতন্যের সংকীর্তন করতে করতে নগর প্রদক্ষিণ করা দেখবেন। দক্ষিণেশ্বরে একদিন নিজের ঘরের বাইরে উত্তরের বারাণ্ডায় দাঁড়িয়েছিলেন। অকস্মাৎ তাঁর চোখের সামনে থেকে যেন পর্দা উঠে গেল। তিনি ভাবচক্ষে দেখতে পান যে পঞ্চবটীর দিক থেকে একটি বিরাট সংকীর্তনতরঙ্গ তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বাঁক নিয়ে কালীবাড়ির প্রধান ফটকের দিকে চলে যাচ্ছে। অসীম জনতা হরিনামে উদ্দাম—উন্মত্তপ্রায় হয়ে উঠেছে। সংকীর্তন-প্রবাহের মধ্যভাগে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য। শ্রীচৈতন্য হরিপ্রেমে মাতোয়ারা। তাঁর প্রেমানন্দ বিচ্ছুরিত হয়ে চারিদিকে অপর সকলকে অভিভূত করছে। লোকসমাবেশ দেখে মনে হচ্ছিল যেন জনসমুদ্র। এই জনসমুদ্রের মধ্যে তিনি দেখতে পান তাঁর দুজন চিহ্নিত অন্তরঙ্গ ভক্তকে—বলরাম বসু ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে। তাঁর প্রত্যয় হয় শ্রীচৈতন্যের দুইজন লীলাসহচরই তাঁর পার্ষদরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

খাঁটি হরি-সংকীর্তনে প্রেমের বিচ্ছুরণ ঘটে। সংকীর্তনের তীব্র আকর্ষণ। এই আকর্ষণ নিজে আস্বাদন করবার জন্য ও বৈষ্ণব সমাজের নেতৃ-স্থানীয় গোস্বামীদের সামনে প্রদর্শন করবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ সাতদিনব্যাপী এক বিচিত্র হরি-সংকীর্তনের নেতৃত্ব দান করেন। পুঁথিকার লিখেছেন, 'হেন কীর্তনের কথা কোথাও না শুনি।/মহাসংকীর্তন নামে ইহারে বাখানি॥' ফুলুই শ্যামবাজারে নটবর গোস্বামীর আমন্ত্রণে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে কীর্তনানন্দ দান করবার জন্য নটবর রামজীবনপুরের প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া ধনঞ্জয় দে ও কৃষ্ণগঞ্জের খোলবাদক রাইচরণ দাসকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন। রাইচরণের খোলবাজনা আরম্ভ হতেই শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হন, কীর্তন শুরু হতেই তিনি ভাবতরঙ্গে ভাসতে থাকেন। তাঁকে কেন্দ্র করে চারিদিকে বসে যায় আনন্দের হাট। পরবর্তিকালে তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন, 'ওদেশে যখন হৃদের বাড়িতে ছিলাম, তখন শ্যামবাজারে নিয়ে গেল। বুঝলাম গৌরাঙ্গ-ভক্ত। গাঁয়ে ঢোকবার আগে দেখিয়ে দিলে। দেখলাম গৌরাঙ্গ! এমনি আকর্ষণ—সাতদিন সাতরাত লোকের ভীড়! কেবল কীর্তন আর নৃত্য। পাঁচিলে লোক। গাছে লোক।

'নটবর গোস্বামীর বাড়ীতে ছিলাম। সেখানে রাতদিন লোকের ভীড়। আমি আবার পালিয়ে গিয়ে এক তাঁতীর ঘরে সকালে গিয়ে বসতাম। সেখানে আবার দেখি, খানিক পরে সব গিয়েছে। সব খোল করতাল নিয়ে গেছে।—আবার "তাকুটী! তাকুটী।" করছে। খাওয়া-দাওয়া বেলা তিনটার সময় হতো!

'রব উঠে গেল—সাতবার মরে, সাতবার বাঁচে, এমন এক লোক এসেছে! পাছে আমার সর্দিগর্মি হয়, হৃদে মাঠে টেনে নিয়ে যেতো; সেখানে আবার পিঁপড়ের সার! আবার খোল করতাল।—তাকুটী! তাকুটী! হৃদে বকলে, আর বল্লে, "আমরা কি কখনও কীর্তন শুনি নাই?"

'সেখানকার গোঁসাইরা ঝগড়া করতে এসে-ছিল। মনে করেছিল, আমরা বুঝি তাদের পাওনা-গণ্ডা নিতে এসেছি। দেখলে, আমি একখানা কাপড় কি একগাছা সুতাও লই নাই। কে বলেছিল, "ব্রহ্মজ্ঞানী"। তাই গোঁসাইরা বিড়তে এসেছিল। একজন জিজ্ঞাসা করলে, "এঁর মালা-তিলক নাই কেন?" তারাই একজন বল্লে, "নারকেলের বেল্লো আপনা-আপনি খসে গেছে।"...দূর গাঁ থেকে লোক এসে জমা হোতো। তারা রাত্রে থাকতো।...'

তাঁর এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেছিলেন, 'আকর্ষণ কাকে বলে, ঐখানেই বুঝলাম। হরিলীলায় যোগমায়ার সাহায্যে আকর্ষণ হয়, যেন ভেল্কী লেগে যায়।'[১৭]

গৌরাঙ্গভাবলীলায় অনুপ্রাণিত শ্রীরামকৃষ্ণ হরিলীলার ভাবে ভাসতেন, রসে ডুবতেন এটা খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু কত সামান্য ইঙ্গিতে তাঁর মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবের উদ্দীপন হত সেটা ছিল দেখবার মতো। একবার ভক্ত অধর সেনের বন্ধু সারদাচরণ পুত্রশোকে অভিভূত হয়ে শ্রীরাম-কৃষ্ণের নিকট এসেছেন সান্ত্বনালাভের জন্য। সারদাচরণ গৌরাঙ্গভক্ত। তাঁকে দেখেই শ্রীরাম-কৃষ্ণের গৌরাঙ্গভাবের উদ্দীপন হয়। তিনি তাঁর সুধামাখাকণ্ঠে একের পর এক গৌর সংকীর্তন গাইতে থাকেন। মধুময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সারদাবাবুর দুঃখের গ্লানি ধুয়ে মুছে যায়। গৌরাঙ্গভাবসুধা সেবন করে তাঁর মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে।

১৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।২০।২

শ্রীরামকৃষ্ণ গৌরভাবসুধা নিজে রসাস্বাদন করেই তৃপ্ত হতে পারেননি, যোগ্য ভক্তজনের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করে গৌরভাবসুধা আস্বাদন করিয়ে দিয়েছেন। ভক্তিমতী গৌরদাসীর আকাঙ্ক্ষা, শ্রীরামকৃষ্ণ গৌরাঙ্গরূপে নদীয়াতে যে লীলারঙ্গ করেছিলেন তা দর্শন করেন। এক রবিবার। দক্ষিণেশ্বরে অনেক ভক্ত সমবেত হয়েছেন। গৌরদাসী রান্না করেছেন। বেলা দুপ্রহরের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ঘরে খেতে বসেছেন। চারিদিকে বসে দাঁড়িয়ে ভক্তগণ। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত কেদার চাটুজ্যেকে গৌরদাসীর পরিচয় করিয়ে দেন, তাঁর ভক্তি-বিশ্বাস, অনুরাগ ও তপস্যার কথা বলেন। এরপরেই ঘটনা দ্রুতগতিতে বিচিত্রধারায় এগিয়ে চলে। পুঁথিকার লিখেছেন, 'শুনিয়া কেদারচন্দ্র মাতা সম্বোধিয়া।/প্রণমিলা গৌরমায় শির নামাইয়া॥/কেদারে করিতে মাই প্রতি নমস্কার।/চারিচোখে দেখাদেখি হইল দোঁহার॥/প্রেমাবেশে বিহ্বল কাঁদেন দুই জনে।/আহা আহা বলেন শ্রীপ্রভু বদনে॥/আপনে আপনি প্রভু হইয়া মগন।/উঠিলেন পরিহরি নিজের আসন॥/কে আর আহার করে কেবা খায় ভাত।/পাখলিয়া দিল ভক্তে অন্নমাখা হাত॥/কেহ দিল সম্মুখেতে তাম্বূল ধরিয়া।/কেহ দিল হাতে হুঁকা তামাক সাজিয়া॥' তখনও ভাবের ঘোর কাটেনি। শ্রীরামকৃষ্ণ হুঁকা হাতে উত্তরদিকের বারাণ্ডায় দাঁড়িয়েছেন। এদিকে ভক্তগণ আনন্দে বিহ্বল। ভাবে মাতোয়ারা বিষ্ণুভক্ত 'ভূমিতে পড়িল জড় যষ্টির মতন।' ভক্ত মনোমোহন হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়েন শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ে। আনন্দের ঝোড়ো-হাওয়া উপস্থিত সকলকেই বেসামাল করে তোলে। পুঁথিকার লিখেছেন, 'কেহ অর্ধবক্র ঠিক ধনুকের প্রায়।/কেহ বা পতিত ভূমে বাহ্য নাই গায়॥/কেহ বা ঢলিয়া অঙ্গে পড়য়ে কাহার।/কেহ অনিমিখ আঁখি শবের আকার॥/নিকটে দণ্ডায়মান বুদ্ধি আলথাল।/হাতেতে প্রভুর হুঁকা কাঁপেন রাখাল॥' যেন ক্ষ্যাপার হাটবাজার বসেছে। এর মধ্যে ভক্ত রামচন্দ্র রামকৃষ্ণনামের জয়ধ্বনি করতে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ হাত দিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্পর্শ করবার পর এই ভাবের খেলা বন্ধ হয়। গৌরদাসী শ্রীরামকৃষ্ণবপুতে গৌরাঙ্গ-লীলারঙ্গ দেখে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-আঙিনায় শ্রীচৈতন্যের প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়ার আলো-আভাসের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের গৌরাঙ্গভাবের আস্বাদন, চিহ্নিত ভক্তদের মধ্যে সেই ভাবরস সঞ্চারণ এবং স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবে আবিষ্ট হয়ে ভক্তি-প্রার্থীদের কৃপা-বিতরণ। প্রথম দুটি আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এখন তৃতীয়টি আলোচনা করা যাবে লীলাপ্রসঙ্গ-সূত্রে প্রাপ্ত একটি ঘটনার উল্লেখ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বাগবাজারে বলরামভবনে অবস্থান করছেন। শরতের অপরাহ্ণ। দোতলার বড় ঘরখানি লোকে পরিপূর্ণ। গিরিশচন্দ্র ও কালীপদ যৌথকণ্ঠে গান ধরেছেন, 'আমায় ধর নিতাই।/আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন।' ইত্যাদি। লীলাপ্রসঙ্গকার (তখনকার শরচ্চন্দ্র) কোনওরূপে ঘরে ঢুকে দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ। তাঁর মুখ প্রসন্নতা ও আনন্দের আলোকে ঝলমল করছে। তাঁর ডান পা-খানি প্রসারিত। সম্মুখে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি পরম প্রেমের সঙ্গে ঐ চরণখানি সন্তর্পণে নিজের বুকে ধরে রয়েছেন। ভক্তটির চক্ষু নিমীলিত, নয়নধারায় তাঁর মুখ ও বুক সিক্ত। ঘরটি একটি দিব্যভাবের আবেশে জমজম্ করছে। এদিকে কৈতসঙ্গীত চলতে থাকে, 'আমার প্রাণ যে আজ করে রে কেমন,/আমায় ধর নিতাই।'

গান সাঙ্গ হয়। ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ অর্ধবাহ্যদশায় নেমে আসেন। তিনি সম্মুখস্থ ভক্তটিকে বললেন, 'বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।' ভক্তটির তিনবার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' উচ্চারণের পর শ্রীরামকৃষ্ণ ক্রমে বাহ্যদশা প্রাপ্ত হন। এই কৃপাধন্য ব্যক্তিটি হলেন নিত্যগোপাল গোস্বামী, ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক। এঁর পিতা বড় গোঁসাই নামে খ্যাত কৃষ্ণগোপাল গোস্বামীই পূর্ববঙ্গে বৈষ্ণব ভাবধারাকে জনপ্রিয় করেছিলেন।

প্রায় অনুরূপ একটি কাহিনী জানতে পারা যায় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' ও 'শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা' গ্রন্থ থেকে। এক্ষেত্রে কৃপাধন্য ব্যক্তি মুর্শিদাবাদ থেকে আগত এক বৈষ্ণব বাবাজী।

পূর্বোক্ত চৈতন্যপ্রভাবের আলো-আভাসের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে চৈতন্যভাবনা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই ভাবনার মধ্যে রয়েছে এমন এক সম্পদ যা মানুষকে কেবল তথ্য দেয় না, সত্যের সন্ধান দেয়; যা কেবল ইন্ধন জোগায় না, অগ্নি দেয়; যা কেবল উন্মাদনা আনে না, হৃদয়দীপ জেলে অন্ধকার দূর করে। সে-সকল মণিমাণিক্যের সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলে ধরা যেতে পারে।

শ্রীচৈতন্যের হরিনাম-প্রচার প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'যিনি পাপ হরণ করেন তিনিই হরি। হরি ত্রিতাপ হরণ করেন। চৈতন্যদেব হরিনাম প্রচার করেছিলেন—অতএব ভাল। ভাখ চৈতন্যদেব কত বড় পণ্ডিত—আর তিনি অবতার। তিনি যে-কালে এই নাম প্রচার করেছিলেন এ অবশ্য ভাল।'

হরিনামের ভারি মাহাত্ম্য। শ্রীচৈতন্যপ্রচারিত হরিনামের মাহাত্ম্য কীর্তন করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'সংসারী লোকেদের যদি বল যে সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও, তা তারা কখনও শুনবে না। তাই বিষয়ী লোকদের টানবার জন্য গৌর-নিতাই দুই ভাই মিলে পরামর্শ করে এই ব্যবস্থা করেছিলেন, "মাগুর মাছের ঝোল/যুবতী মেয়ের কোল,/বোল হরি বোল।" অপর দুটির লোভে অনেকে হরিবোল বলতে যেত। হরিনাম সুধার একটু আস্বাদ পেলে বুঝতে পারতো যে "মাগুর মাছের ঝোল" আর কিছুই নয়, হরিপ্রেমে যে অশ্রু পড়ে তাই, "যুবতী মেয়ে" কিনা পৃথিবী। যুবতী মেয়ের কোল কিনা (পৃথিবীর) ধূলায় হরিপ্রেমে গড়াগড়ি। নিতাই কোনরকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন। চৈতন্যদেব বলেছিলেন, ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য। শীঘ্র ফল না হতে পারে কিন্তু কখনও না কখনও এর ফল হবেই হবে। কেউ বাড়ীর কার্নিসের উপর বীজ রেখে গিয়েছিল, অনেকদিন পরে বাড়ী ভূমিসাৎ হয়ে গেল, তখন সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হল ও তার ফলও হল। যাদের ভোগ বাকী আছে তারা সংসারে থেকেই ডাকবে।'

সন্ন্যাসী সর্বাবস্থায় কামিনী থেকে সাবধান থাকবে। শ্রীচৈতন্য প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে বলেছিলেন, 'আমি ত সন্ন্যাসী আপনারে বিরক্ত করি মানি/দর্শন দূরে প্রকৃতির নাম যদি শুনি ॥/এবহিঁ বিকার পায় মোর তনু মন ।/প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন জন ?' একই ভাব ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ত্যাগী সন্তানদের বলতেন, 'সোনার মেয়েমানুষ ভক্তিতে গড়াগড়ি গেলেও সেদিকে ফিরেও তাকাবি না।' শ্রীচৈতন্য-প্রদর্শিত সন্ন্যাসীর এই সুকঠিন আদর্শ তুলে ধরতে শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও বিরত হতেন না।

জাতিভেদ-পীড়িত হিন্দু সমাজের সমস্যা লাঘব করবার জন্য শ্রীচৈতন্য যে অভিনব সমাধান দিয়েছিলেন তার উল্লেখ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'গৌর-নিতাই হরিনাম দিয়ে আচণ্ডালে কোল

দিলেন। এই এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। এই উপায় ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই। ভক্তি হলেই দেহ মন আত্মা সব শুদ্ধ হয়। ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়, ভক্তি থাকলে চণ্ডাল চণ্ডাল নয়।' শ্রীচৈতন্য-প্রদর্শিত এই পন্থা অনুসরণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ সকল শ্রেণীর মধ্যে একাত্মবোধ জাগ্রত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তিনি বলতেন, 'ভক্তের কোন জাত নেই।'

শ্রীচৈতন্যের সামান্যতেই ভাবোদ্দীপন সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন সময়ে বলেছেন। একবার বলেছেন, 'চৈতন্যদেব মেড়গাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শুনলেন, এ-গাঁয়ের মাটিতে খোল তৈয়ার হয়। অমনি ভাবে বিহ্বল হলেন—কেন না হরিনামের কীর্তনের সময় খোল বাজে।' আরেকবার বলেছেন, 'ভেকের আদর করতে হয়। ভেক দেখলে সত্য বস্তুর উদ্দীপন হয়। চৈতন্যদেব গাধাকে ভেক পরিয়ে সাষ্টাঙ্গ হয়েছিলেন।' ভক্তহৃদয়ে ভগবৎপ্রেম উদ্দীপিত হয় বিভাবের দ্বারা। বিভাব দুপ্রকার, আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব। আলম্বন বিভাব আবার দুপ্রকার, বিষয়ালম্বন এবং আশ্রয় আলম্বন। ভগবান প্রেমের বিষয় অতএব বিষয়ালম্বন। শ্রীচৈতন্য মাটি দেখে প্রেমের বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ হওয়াতে ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন। আশ্রয়ালম্বন ভেক দেখে সত্য-বস্তুর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণানুরাগ উদ্দীপ্ত হওয়াতে তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্য তত্ত্ব, ধ্যান, স্তুতি ও চর্যা বিষয়ে আটটি সংস্কৃত শ্লোক উপদেশ করেছিলেন। 'শিক্ষাষ্টক' নামে এগুলি সাধারণ্যে পরিচিত। 'শিক্ষাষ্টকে'র প্রতিপাদ্য আটটি প্রসঙ্গ : সংকীর্তন মাহাত্ম্য, নামে রুচি, বিনয় ও সহিষ্ণুতা, ভক্তি, কৃষ্ণ-শরণ, নাম কীর্তন, কৃষ্ণবিরহবোধ এবং প্রেমৈক নিষ্ঠা। এই আটটি প্রসঙ্গ আশ্রয় করে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ আকীর্ণ হয়ে রয়েছে নানা গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়।

এভাবে আমরা দেখতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের পটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শ্রীচৈতন্য সম্পর্কিত বহু বিচিত্র ভাবনা। সেই ভাবনাগুলি সামগ্রিকভাবে দেখবার চেষ্টা করলে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে শ্রীরামকৃষ্ণমানসে বিভাসিত শ্রীচৈতন্যের আনন্দঘন মূর্তিখানি।

সুপণ্ডিত ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর 'Chaitanya and his companions' গ্রন্থে সঙ্গতকারণেই প্রশ্ন তুলেছেন, শ্রীচৈতন্যকে সমগ্র দেশে সর্বজনীন জনপ্রিয়তার কেন্দ্রবিন্দুতে দেখতে পাই কেন?[১৮] চৈতন্যচরিত্রে এমন কি যাদু ছিল যা তাঁর দিকপাল পরিকরদের মধ্যে অবর্তমান? শ্রীচৈতন্য রঘুনাথ দাসের মতো তীব্র কৃচ্ছ্রতা করেননি। রূপ, সনাতন, রঘুনাথ এঁরা প্রত্যেকেই ভগবানলাভের জন্য বিরাট বৈভব ত্যাগ করেছিলেন, শ্রীচৈতন্যকে সে-রকম বড় কিছু ত্যাগ করতে হয়নি। সন্ন্যাসী হিসাবেও তিনি যথেষ্ট কঠোরতা করতেন না—এ-অভিযোগ দামোদর পণ্ডিতের। শ্রীচৈতন্য নিজমুখে বলেছেন যে স্বরূপের মতো তিনি বৈষ্ণবতত্ত্বের খুঁটিনাটি জানতেন না। নিত্যানন্দের মতো বৈষ্ণবসমাজকে তিনি সংগঠিত করতেও পারেননি। তিনি বড় পণ্ডিত হলেও তেমন কিছু অসাধারণত্ব তাঁর ছিল না। তাছাড়া তিনি কোন বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেও যাননি। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের জীবন মধ্য-পথেই প্রস্ফুটিত শতদলের ন্যায় সৌন্দর্য ও গন্ধ বিকিরণ করেছিল এবং ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে বিদ্বান কবি সাধক তপস্বী সবাই তাঁর নিকট ছুটে এসেছিল আনন্দমধু সংগ্রহের জন্য। তাঁর দিব্য

১৮ Rai Sahib Dinesh Chandra Sen : Chaitanya and his Companions, 1917, p. 151-53

চরিত্রের মাধুর্য ও মহত্ব এমন এক আনন্দ-পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল যা অন্যত্র দুর্লভ। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের প্রশ্নের বোধ করি অধিকতর সন্তোষজনক উত্তর পাব শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে উদ্ভাসিত শ্রীচৈতন্যের অসাধারণ ভাবমূর্তিটির দিকে দৃষ্টিপাত করলে। সেখানে শ্রীচৈতন্য তাঁর পরিপূর্ণ আনন্দঘন ও বিপুল শক্তিধর রূপখানি নিয়ে আবির্ভূত। সেখানে শ্রীচৈতন্য তেজোদ্দীপ্ত বৈরাগ্যোজ্জ্বল ঈশপ্রেমে নিষিক্ত এক মহামানব। তাঁর মহান্ চরিত্রের মধ্যে দেখতে পাই বিপুল পাণ্ডিত্য ও অসীম হৃদয়বত্তা, অদ্বৈতজ্ঞান ও রাধাপ্রেম, অন্তরে ভক্তি রসাস্বাদন ও বাইরে পরহিতাকাঙ্ক্ষার সমাবেশ। শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্যের নাম সংকীর্তন এবং নৃত্যে এমন এক প্রবল উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল যাতে সব সঙ্কীর্ণতার বাঁধন ভেঙে পড়েছিল, সমাজের মধ্যে জাগরণ উপস্থিত হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে উদ্ভাসিত এই চৈতন্যচরিত কি ঐতিহাসিকত্ব, কি দার্শনিক তত্ত্ববিচার, সবদিক থেকে অতুলনীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের মননালোকে শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরাবতার। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, 'তিনি ঈশ্বরের অবতার। তাঁর সঙ্গে জীবের অনেক তফাৎ।… সর্বদাই সমাধিস্থ। কত বড় কামজয়ী।' তিনি আচণ্ডালদ্বিজকে প্রেম বিতরণ করে মানুষকে নতুন সহজ অথচ মর্মস্পর্শী এক ধর্মপথ দেখিয়েছিলেন। এখানে সাধকের মূল সম্পদ ভক্তি ও নিষ্ঠা, এবং আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতা আশ্রয় করলে ভক্তি গভীর হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'যার কাঁচা ভক্তি, সে ঈশ্বরের কথা, উপদেশ, ধারণা করতে পারে না। পাকা ভক্তি হলে ধারণা করতে পারে। ফটোগ্রাফের কাচে যদি কালি (silver nitrate) মাখানো থাকে, তাহলে যা ছবি পড়ে তা রয়ে যায়। কিন্তু শুধু কাচের উপর হাজার ছবি পড়ুক একটাও থাকে না—একটু সরে গেলেই যেমন কাচ তেমনি কাচ। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না থাকলে উপদেশ ধারণা হয় না।' শ্রীচৈতন্য সাধকের হৃদয়কে ভগবৎ-প্রেমে প্লাবিত করবার উপর জোর দিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণমানসে বিধৃত শ্রীচৈতন্য ত্যাগ-বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা। তাঁর দেহাত্মবোধ চলে গিয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'তাঁর এমন বৈরাগ্য যে, সার্বভৌম যখন জিহ্বায় চিনি ঢেলে দিলে, চিনি হাওয়াতে ফর্‌ফর্ করে উড়ে গেল, ভিজলো না।' শ্রীচৈতন্যের সংসারত্যাগ লোকশিক্ষার জন্য। এ-বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণমুখে শুনি শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে বলেছেন, 'নিতাই, আমি যদি সংসার ত্যাগ না করি, তাহলে লোকের ভাল হবে না। সকলেই আমার দেখাদেখি সংসার করতে চাইবে। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করে হরিপাদপদ্মে সমস্ত মন দিতে কেউ চেষ্টা করবে না।' তিনি সন্ন্যাসীর জন্য কঠিন আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। ভক্ত ছোট হরিদাস এক ভক্ত মহিলার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। এই অপরাধে শ্রীচৈতন্য হরিদাসকে বর্জন করেছিলেন। অবশ্য গৃহস্থ রামানন্দ রায় দেবদাসীর সঙ্গ করলেও শ্রীচৈতন্য তাঁকে বর্জন করেননি। গৃহস্থের আদর্শের প্রতি কিঞ্চিৎ শিথিলতা দেখালেও তাঁর নির্ধারিত সন্ন্যাসীর আদর্শ ছিল সুকঠিন। এদিকে দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ কোমলপ্রাণ শ্রীচৈতন্যের মাতৃভক্তির প্রশংসা পঞ্চমুখে করছেন। শ্রীচৈতন্য প্রতি বৎসর নবদ্বীপে তাঁর মার কাছে পাঠাতেন পণ্ডিত জগদানন্দকে। মাকে নিবেদন করবার জন্য তিনি অন্যান্য কথার সঙ্গে জগদানন্দকে বলে দিতেন, 'যেদিনে তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন। /সেই দিনে আসি অবশ্য করিয়ে ভক্ষণ॥' এ-কথা শুনে শচীমাতার স্নেহ উদ্বেল হয়ে উঠত। এভাবে

দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিধৃত শ্রীচৈতন্য একদিকে কুসুমের চাইতেও কোমল, অপরদিকে বজ্রের চাইতেও কঠিন।

শ্রীচৈতন্যের অবস্থাত্রয় সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু মুখে বলেননি, নিজের জীবন দিয়েও প্রদর্শন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য তিন অবস্থায় থাকতেন। অন্তর্দশায় ভগবান দর্শন করে সমাধিস্থ হতেন—ভগবদ্ভাবে একাত্ম হয়ে থাকতেন। অর্ধবাহ্যদশায় তাঁর একটু বাইরের হুঁশ থাকত। বাহ্যদশায় নামগুণ কীর্তন করতেন। সমাধির পর শ্রীচৈতন্য 'বিদ্যার আমি', 'ভক্তের আমি' আশ্রয় করে নেমে আসতেন। এই 'আমি' দিয়ে শ্রীচৈতন্য ভক্তি আস্বাদন করতেন, ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকতেন, ঈশ্বরীয় কথা কইতেন, নাম-সংকীর্তন করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিচারে শ্রীচৈতন্যের মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির সুষ্ঠু মিলন ঘটেছিল। শ্রীচৈতন্যের জ্ঞান সূর্যের সঙ্গে তুলনীয়, তাঁর ভক্তি চন্দ্রের সঙ্গে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সৌর জ্ঞান ও চান্দ্র ভক্তিকে হাতীর ভিতরের দাঁত ও বাইরের দাঁতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীচৈতন্যের মধুর ভাব সাধনের মধ্যে সগুণ নির্গুণ ঈশ্বরবাদের সুষ্ঠু সমন্বয় দেখতে পেয়েছিলেন।

অবতারপুরুষ শ্রীচৈতন্য মহাশক্তিধর। কিন্তু তাঁর উপদেশ ধারণ করবার যোগ্য অধিকারী কজন? ঊর্ধ্বরেতা না হলে সাধক প্রেমভক্তির উপদেশ সঠিকভাবে ধারণ করতে পারে না। এতৎসত্ত্বেও তাঁর অসাধারণ চরিত্রবলে ও দিব্য-শক্তিতে সর্বত্র দেশব্যাপী জাগরণের জোয়ার উপস্থিত হয়েছিল। সর্বস্তরের মানুষের জীবনে এক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল।

শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ, ঈশ্বরনির্দিষ্ট লোকশিক্ষক, তবুও সাড়ে তিনশ বছর পরে কালের ধূসরতায় তাঁর শেখানো অনেক কিছু বিলীন হয়ে যেতে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেছিলেন, 'চৈতন্যদেব অবতার। তিনিই যা করে গেলেন তারই কি রয়েছে বল দেখি?' শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে এই চরিত্রচিত্র ভক্তি ও ভাবৈতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন মাধুর্যমণ্ডিত, বাহ্য-ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে তেমনি নির্ভরযোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের এই মূল্যায়ন যেমন ভাবগম্ভীর, তেমনি বাস্তব-ভিত্তিক। [ক্রমশঃ]

বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল 'জগন্নাথক্ষেত্র'—সেখানে মন্দিরের গায়ে খোদা বীভৎস মূর্তিগুলি একবার গিয়ে দেখে এলেই ঐকথা জানতে পারবি। রামানুজ ও শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর সময় থেকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রটা বৈষ্ণবদের দখলে এসেছে। এখন উহা ঐ-সকল মহাপুরুষের শক্তিসহায়ে অন্য এক মূর্তি ধারণ করেছে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

মাতৃ-অভিষেক

স্বামী অমলেশানন্দ

সূর্যরশ্মির স্নিগ্ধ করস্পর্শে মায়াময় পৃথিবী রূপে রঙে আর আনন্দে প্রকাশিত হয় মনোরম ভঙ্গীতে। যা ছিল সুপ্ত, শান্ত, সমাহিত, অবগুণ্ঠনের অন্তরালে গুপ্ত, ভোরের আলোকে ধীরে ধীরে তা হয় উন্মোচিত, উদ্ভাসিত। রূপকথার রাজপুত্র তার সপ্তরঙের অশ্ব টগবগিয়ে আসে ঘুমন্ত রাজকন্যার ঘুম ভাঙাতে। তার হাতের সোনার কাঠির স্পর্শে রাজকুমারী হয় জাগরিতা, নিদ্রিত স্বপ্নপুরীতে জাগে প্রাণের স্পন্দন।

রামকৃষ্ণ স্পর্শে মাতৃশক্তি হয়েছেন উদ্বোধিতা। "সে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্ত-ব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা।" এতো স্বপ্ন নয়, নয় ভাবুক মনের অলীক কল্পনা। এ যে পরম সত্য ঘটনা।

"ব্রহ্ম ও শক্তি যেমন অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি"—বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শক্তির সহায়তা ভিন্ন ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। ব্রহ্ম—শাস্ত্র বলে সে তো "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্"। তিনি সর্বোপাধি বিবর্জিত। সেই নিরুপাধিক ব্রহ্মই শক্তি সমন্বিত হয়ে প্রকাশিত হন এই মায়াময় জগৎরূপে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই ব্রহ্ম আর শক্তির সমন্বিত ফল। রামকৃষ্ণ ও সারদা—একে দুই, দুইয়ে এক। এককে ছেড়ে অপরকে ভাববার জো নেই। "যেন হাঁড়ি আর তার মুখের সরা"—আলাদা করবার উপায় নেই। "ও আমার শক্তি", সারদার উদ্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণের সাঙ্কেতিক উক্তি। "ও সারদা, সরস্বতী", "ও জ্ঞানদায়িনী, ও কি যে সে?"—শ্রীরামকৃষ্ণের প্রজ্ঞাদৃষ্টি অবগুণ্ঠনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন সারদার আসল রূপ প্রকাশিত করেছেন জগৎসমক্ষে। মহামায়া নিজেই যখন আবরণ রচনা করেন তাঁর স্ব-রূপের পরে তখন সাধ্য কি তাঁকে বুঝতে পারা! শ্রীরামকৃষ্ণ যে মায়াধীশ তিনি তো মায়াধীন নন, তাই কৈশোরেই নির্দিষ্ট করেছিলেন তাঁর শক্তিকে—সারদাকে, জয়রামবাটী গ্রামের পাঁচবছরের ছোট্ট সারুকে।

সারু—সারদা। বাংলার শান্ত নিরুদ্বিগ্ন গ্রাম্যজীবনের স্নিগ্ধ ছায়াময় গৃহকোণে নিতান্ত সাধারণ এক পল্লীবালা। বাপ মায়ের একমাত্র স্নেহের দুলালী আপন ছন্দে আপন বেগে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে বিশাল এই বিশ্বের একান্তে, অখ্যাত এক পল্লীগ্রামে। তার জানা নেই ছোট্ট গ্রামটুকুর বাইরের দুনিয়া, তার শোনা নেই অগণিত আর্ত মানুষের ব্যাকুল হাহাকার। কিন্তু তা হলে কি হবে, ছোট্ট সারদার হৃদয়টুকু এত-খানি! সে হৃদয় স্পন্দিত হয় আর্তজীবের গোপন ক্রন্দনে, সে হৃদয় আবেগে কম্পিত হয় জগতের সীমাহীন দুঃখের সূক্ষ্ম তরঙ্গাঘাতে। ঘাসের ডগায় ভোরের শিশির বিন্দুতে কি প্রতিফলিত হয় না অসীম অনন্ত সুনীল আকাশ! ক্ষুদ্র শঙ্খের গম্ভীর সুরে কি প্রতিধ্বনিত হয় না বিশাল সমুদ্রের দুরন্ত আহ্বান! পাঁচবছরের সারদার গভীর অনুভূতিতে ধরা পড়ে বিশ্বের পুঞ্জীভূত বেদনার উত্তাল তরঙ্গ। মাতৃস্নেহের পীযূষধারা স্বতঃ উৎসারিত হয় সন্তানের প্রতি পরম মমতায়।

জয়রামবাটী গ্রামের ফ্রেমে আঁটা এক নিখুঁত ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। সেই সাদা-মাঠা আপাততুচ্ছ ছবিটুকুর অপার সৌন্দর্যের তুলনা দিলে বুঝি বলতে হয় র‍্যাফেলের আঁকা ম্যাডোনার অপূর্ব শিল্পকীর্তি! দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে দিশেহারা বুভুক্ষু কটি মানুষ দুটি অন্নের

আশায় হাজির হয়েছে সারদার পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহাঙ্গনে। ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত মানুষের উপোসী মুখগুলো দেখে গৃহস্বামী হয়েছেন বিচলিত। উদার হৃদয়ে তিনি খুলে দিয়েছেন তাঁর সঞ্চিত ধানের গোলা। বসিয়েছেন অন্নসত্র। উষ্ণ সুবাসিত খিচুড়ি পরিবেশিত হয় ক্ষুধাতুর অধৈর্য মানুষগুলোর পাতে। পাঁচ বছরের ছোট্ট সারু ক্ষুধার্ত মানুষগুলোর ব্যগ্রতা দেখে ছুটে গিয়ে নিয়ে আসে এক তালপাতার পাখা। ক্ষুদ্র দুহাতের আয়ত্তে পাখা নিয়ে প্রবল শক্তিতে হাওয়া করে জুড়োতে চেষ্টা করে তপ্ত অন্ন। স্নেহময়ী মাতৃরূপের সে এক অপূর্ব উন্মোচন! বিশ্বমাতৃত্বের প্রতীক সারদা সেই শৈশবেই ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁর ভাবীকালের জগদ্ধাত্রীরূপের।

কবি হলেন তিনি যিনি ক্রান্তদর্শী। কবি যদি ক্রান্তদর্শী হন, তাঁর রচিত মহাকাব্য মহাসত্যেরই তো ছন্দোময়রূপ! ঈশ্বর কবি আর তাঁর রচিত এই সৃষ্টি মহাকাব্য। কামারপুকুরে শ্রীমান গদাধর চট্টোপাধ্যায়, কিশোর গদাই স্বপ্নময় চোখদুটি মেলে অবাক বিস্ময়ে দেখে মহাকবির এই জগৎকাব্য। অপার বিস্ময়ে আনন্দঘন পুলকে ভাবতন্ময়তায় হারিয়ে ফেলে চৈতন্য। আপন মনে মাটি দিয়ে রচনা করে দেবী প্রতিমা। অপরূপ শিল্প-নৈপুণ্যে অবাক মানে যে দেখে সে-ই। বেশি দিন অবশ্য মাটির প্রতিমা নিয়ে তাকে খেলা করতে হল না। যৌবনের প্রারম্ভেই তার হাতে এল এক জীবন্ত প্রতিমা। জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্জের কন্যা সারদার সঙ্গে শুভ পরিণয় হল ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের। কিন্তু এ পরিণয় ঈশ্বর সন্ধানে ব্যাকুল গদাধরকে ভোগমুখী করল না। বিবাহ হল না বন্ধনের কারণ। সারদাও স্বামীকে আকর্ষণ করলে না ভোগের পথে। দুটি সমান্তরাল সরলরেখার ন্যায় তাঁরা পরস্পর অগ্রসর হলেন এক মহাঅসীমের অভিমুখে। "কি গো তুমি কি আমায় সংসার পথে টেনে নিতে এসেছ?" দক্ষিণেশ্বরের সাধনভূমিতে নির্জন-রাতে এক দম্পতির গূঢ় সংলাপ। "না, আমি তোমাকে সংসার পথে কেন টানতে যাব? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।" পত্নীর দৃঢ় ও সংযত উত্তর। ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণের এইদিনের স্মৃতিচারণ—"ও যদি এত ভাল না হত, আত্মহারা হয়ে তখন আমাকে আক্রমণ করত তাহলে (আমার) সংযমের বাঁধ ভেঙে দেহবুদ্ধি আসত কি, না,কে বলতে পারে? বিয়ের পরে মাকে (৺ জগদম্বাকে) ব্যাকুল হয়ে ধরেছিলাম, 'মা আমার পত্নীর ভেতর থেকে কামভাব এককালে দূর করে দে।' ওর সঙ্গে একত্রে বাস করে এইকালে বুঝেছিলাম মা সে কথা সত্যসত্যই শুনেছিলেন।" এই হল দুটি মানব-মানবীর অদ্ভুত বৈবাহিক সম্পর্ক। হলেনই বা তাঁরা অতি-মানবিক স্তরের, কিন্তু সে তো অপার্থিব জগতের ক্ষেত্রে। পার্থিব জগতে তাঁরা সেই আদি ও অকৃত্রিম মানব মানবীর বংশধর। শরীর ধারণ করলেই "ট্যাক্সো" দিতে হয়। সেখানেও আছে কাম, ক্রোধ, লোভ আদি রিপুর দুর্দম অত্যাচার।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্ত্রীকে তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী করে গড়ে তুলতে সযত্নে প্রয়াসী হন। সংসার ও ঈশ্বর দুটি যে আলাদা নয়—তাই প্রমাণ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বিবাহ করলে স্ত্রীকে নিয়ে ঈশ্বর লাভ করা যায় না, এই অপবাদ আর কি কেউ দিতে পারবে তাঁর পরবর্তিকালে? স্বামীর যোগ্য দায়িত্ব নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সাংসারিক যাবতীয় খুঁটিনাটির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দিতে থাকেন সারদাকে ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব। "প্রদীপের সলতেটা কিভাবে রাখতে হবে, বাড়ীর প্রত্যেকে কে কেমন লোক ও কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করতে হবে প্রভৃতি সাংসারিক সকল কথা হইতে

ভজন কীর্তন, ধ্যান সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পর্যন্ত সকল বিষয়ে ঠাকুর তাঁহাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।" শ্রীমা উত্তরকালে ভক্তদের নিকট ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে স্বামী-সান্নিধ্যে অপূর্ব শিক্ষা গ্রহণের কথা।

দক্ষিণেশ্বরের শিল্পগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিমা-গঠন প্রায় সমাপ্ত। সারদামূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক স্নেহস্পর্শে, শিল্পনৈপুণ্যে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠছে। অথবা বলা যায় রামকৃষ্ণ করস্পর্শে নিমীলিত পদ্মকোরক ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হচ্ছে রানী রাসমণির কুসুম কাননে। তার ফুটে ওঠা সার্থক হবে, ধন্য হবে যখন পৌঁছাবে দেবতার পায়ে।

প্রতিমা প্রথমে হয় একমেটে, তারপর দোমেটে। তারপর আছে তাকে মনের মাধুরী দিয়ে রাঙানো। এবং সর্বশেষে আছে প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠার পালা। দেবীর বোধন না হলে তাঁকে পূজা নিবেদন করা যায় কি? সারদা-মূর্তিতে পূর্ণ মাতৃসত্তার উদ্বোধন ঘটাতে, জগৎ-বাসীর উদ্দেশে উৎসর্গ করতে এক ফলহারিণী কালীপূজার পুণ্যতিথিতে পূর্ণ যুবতী সারদাকে শ্রীশ্রীজগদম্বার ৺ষোড়শী মূর্তিরূপে কল্পনা করে পূজার আয়োজন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। পূজার পাদপীঠে দেবী সারদার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে প্রার্থনামন্ত্র ধ্বনিত হল শ্রীরাম-কৃষ্ণ কণ্ঠে—"হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরি মাতঃ ত্রিপুরসুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর; ইহার শরীর মনকে পবিত্র করে ইহাতে আবির্ভূত হয়ে সর্বকল্যাণ সাধন কর।" অবশেষে পূজা সমাপনান্তে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের সাধনায় অর্জিত সাধনফল নিঃশেষে সমর্পিত হল দেবী পাদপদ্মে। প্রণামমন্ত্র উচ্চারিত হল—"হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপে, হে সর্বকর্মনিষ্পন্নকারিণি, হে শরণদায়িনি, ত্রিনয়নি, শিবগেহিনি গৌরি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম করি।"

"মাতৃভাব সাধনার শেষ কথা"—বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই তো তাঁর স্ত্রীগুরুগ্রহণ, তাই তো তাঁর মাতৃভাবে সাধন। শ্রীমাকে উত্তরকালে প্রশ্ন করেছেন এক ভক্ত, "মা, অন্যান্য অবতারগণ নিজ নিজ শক্তির পরে দেহরক্ষা করেছেন; কিন্তু এবার আপনাকে রেখে ঠাকুর চলে গেলেন কেন?" মায়ের উত্তর, "বাবা, জান তো, ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।" যে সারদাতে শৈশবে দেখেছি প্রসন্ন সুন্দর মাতৃমূর্তির অস্ফুট প্রকাশ, কালে সেই মূর্তিতে অলৌকিক স্পর্শে ঘটেছে জগজ্জননীরূপের পূর্ণ বিকাশ। সারদা আর নারী নন; নন তিনি কন্যা অথবা বধূ; নন গুরু বা শিষ্যা, তিনি কেবল জননী। জননী তিনি সকলের। পশুটি পক্ষীটি, সকল চেতন জড়—বিশ্বের সকলের তিনি জননী। যিনি জনন করেন তিনিই তো জননী। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের প্রসবিনী তো স্বয়ং আদ্যাশক্তি। সারদা সেই আদ্যাশক্তি, ব্রহ্মস্বরূপিণী। ঈশ্বরকে মাতৃ-রূপে আরাধনা করি আমরা শক্তির বিকাশ ঘটাতে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই এই মাতৃমূর্তি রচনা করেছেন স্বহস্তে। প্রতিমাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে মাতৃসত্তার পূর্ণ স্ফুরণ ঘটিয়ে উৎসর্গ করেছেন জগৎবাসীর উদ্দেশে। তাঁকে লৌকিক শিক্ষা দিয়েছেন, দিয়েছেন আধ্যাত্মিক দীক্ষা। তাঁকে পত্নী রূপে শিক্ষা দিয়েছেন। আবার মাতৃরূপে পূজাও করেছেন। তাঁকে কায়জ সন্তান দেননি কিন্তু দিয়েছেন অনন্ত কোটি মানস সন্তান।

এক নবযুগ প্রবর্তনের জন্য, ভবিষ্যতে তাঁর ভাবপুষ্টির জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়োজন ছিল সারদাকে। সেই সারদার পূর্ণ মাতৃসত্তার জাগরণ ঘটিয়ে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন তিনি

জগতের কল্যাণভার। কিন্তু মায়াস্বরূপিণী সারদা অত সহজে ভার গ্রহণ করেননি। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকাই তাঁর লীলা। তাই একদিন অনুযোগের সুরেই বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, "হ্যাগা, তুমি কি কিছুই করবে না? এই (নিজ দেহ দেখাইয়া) সব করবে?" লীলাময়ীর অসহায় প্রশ্ন, "আমি মেয়েমানুষ, আমি কি করতে পারি?" শ্রীরামকৃষ্ণের চকিত উত্তর "না, না, তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে।" তাঁকে সজাগ করে বলেছেন, "শুধু কি আমারই দায়? তোমারও দায়।" সারদা স্বীকার করেছিলেন সে দায়িত্ব। গ্রহণ করেছিলেন নীরবে অগণিত স্নেহবুভুক্ষু সন্তানের নিঃশর্ত দায়। সেখানে বাছ বিচার নেই, নেই উচ্চ-নীচের প্রশ্ন। শুধু মা বলে এসে দাঁড়ালেই হল। তিনি স্বয়ং দিয়েছেন পরম অভয়বাণী, "মা বলে এসে দাঁড়ালে তাকে ফেরাতে পারব না।"

গিরিকন্যা উমা হাজার বছর কঠোর তপস্যা করেছিলেন হিমালয়ের দুর্গম বুকে মহেশ্বরকে পতিরূপে লাভ করতে। আত্মভোলা শ্মশানচারী শিব তাপসী পার্বতীর ঐকান্তিক সাধনায় তুষ্ট হয়ে গ্রহণ করেছিলেন তাঁকে পত্নীরূপে। শিব ও শক্তি সম্মিলিত হয়েছিলেন জগতের কল্যাণকল্পে। সেই ধারাই যুগ হতে যুগান্তরে বহমান। কখনও তিনি এসেছেন শ্রীরামচন্দ্ররূপে, সঙ্গে এনেছেন অপাপবিদ্ধা সীতাকে; কখনও এসেছেন শ্রীকৃষ্ণরূপে, সঙ্গী করেছেন হ্লাদিনী শক্তি রাধাকে, আর এ-যুগে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপে সঙ্গে তাঁর শক্তি সারদা। সেই মহামায়া সারদা যখন স্বীয় মায়া প্রভাবে অবগুণ্ঠিতা, আপন শক্তি প্রকাশে হয়তো বা কুণ্ঠিতা, শ্রীরামকৃষ্ণ এক মহাযুগ প্রবর্তনকল্পে সেই গুপ্ত শক্তিকে করলেন উন্মোচিতা। এক নারীর অন্তরালে সুপ্ত জগৎপ্লাবনকারী মাতৃসত্তার পূর্ণ স্ফুরণ ঘটল, জগৎবাসী সেই মাতৃস্নেহের পীযূষধারায় হল পরিতৃপ্ত, পরিপুষ্ট। এই জগদ্ধাত্রীরূপের পরিপূর্ণ প্রকাশ বুঝি এখনও বাকী! আজ তার উন্মেষমাত্রেই জগৎ স্তম্ভিত। এই মহাশক্তির "পূর্ণাবস্থা" মানসচক্ষে কল্পনীয়।

প্রার্থনা

শ্রীরতিকান্ত ভট্টাচার্য

সকলের মূলে আছ প্রভু তুমি
　তোমার মূলে আর কেহ নাই।
তুমি যে সবই সবই যে তোমার
　সবারে আজিকে তাহাই জানাই॥
নিখিল জ্যোতির জ্যোতি যে তুমি
　নিখিলের মাঝে তোমার প্রকাশ।
নিখিল প্রাণের প্রাণ যে তুমি
　নিখিলের তুমি পরম নিবাস॥
সকল পাওয়ার শেষ যে তুমি
　সকল চাওয়ার শেষ।
সকল দেখার শেষ যে তুমি
　সকল জানার শেষ॥

সবারই শেষ আছে গো প্রভু!
　তোমার শেষ যে নাই।
তাইতো তোমায় সবার মাঝে
　সদাই দেখিতে পাই॥
তুমি ছাড়া এ-জগতে আর কিছু নাই।
তাইতো তোমার চরণ দুটি
　সদাই পূজিতে চাই॥
দয়া করে শোনো প্রভু!
　শুধু এইটুকু চাই।
শেষের দিনে তোমার দেখা
　(যেন) নয়ন ভরিয়া পাই॥

মালদহের গম্ভীরা এবং পুরুলিয়ার ছৌ-নাচ

ডক্টর রাধাগোবিন্দ ঘোষ

পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে পাহাড় এবং শ্যামল বনানী-শোভিত ছোট্ট একটি জেলা। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ নভেম্বর মানভূম জেলার কিয়দংশ পুরুলিয়া জেলায় রূপান্তরিত হয়েছে। মালদহ জলপাইগুড়ি ডিভিশনের জেলা পঞ্চকের অন্যতম। উভয় জেলার মধ্যে স্থানগত দূরত্বই শুধু নয়, সংস্কৃতিগত বৈসাদৃশ্যও আছে প্রচুর। পুরুলিয়ায় পাহাড়ী এলাকার সৌন্দ', মালদহে ঘন-সন্নিবিষ্ট আম্রকাননের স্নিগ্ধ প্রশান্তি। পুরুলিয়ার বাসিন্দা —মাহাতো, বাগদী, মাল, মাহলী, বাউরী, মালো। মালদহের বাসিন্দা চাঁইমণ্ডল, নাগরমণ্ডল, বিন্দ, কাহার, দোষাদ, রাজবংশী, মুসাহার, পুণ্ড্রক্ষত্রিয়। উভয় জেলার ভৌগোলিক পরিবেশ, জনগণ এবং ভাষাব্যবহারের বৈচিত্র্যই শুধু ভিন্ন নয়—এদের রক্তের সঙ্গে মিশে থাকা সংস্কৃতিও ভিন্ন। পুরুলিয়া সংস্কৃতির দেবতা—বড়পাহাড়ী, সাতবহিন, দুয়ারশিনি, কুদরাশিনি, বাসুলী। মালদহ সংস্কৃতির দেবতা—জহুরা, সোনারায়, কঙ্কালী, ঝাপরী। করম, ইঁদ, বাঁধনা, টুসু—পুরুলিয়ার উৎসব। অপরপক্ষে স্নানঝা, করমাধরমা, ভাজৈ, চাঁচর মালদহের লৌকিক উৎসব। তবুও একই আলোচনায় দুটিকে আনা হয়েছে, কারণ দুটিই পল্লীনৃত্যভিত্তিক, দুটিরই মূল কেন্দ্র গাজন উৎসব এবং দুটির মধ্যে মিলও যথেষ্ট আছে।

পুরুলিয়ার গ্রামীণ মানুষের চিত্তবিনোদনের অন্যতম মাধ্যম ছৌ-নৃত্য। মালদহের নিরাভরণ গ্রাম্য মানুষদের চিত্তহারী আনন্দের মাধ্যম গম্ভীরা। উভয় জেলারই লোকায়ত উৎসব গাজন এবং লোকায়ত উৎসবের মূলভিত্তি সূর্যোৎসব। উষা সমাগমে ধরিত্রীর সঙ্গে হয় সূর্যের প্রণয়। বৈদিক যুগের পরে পৌরাণিক ধ্যানধারণায় সূর্যের প্রতিনিধি হন শিব এবং ধরিত্রীর প্রতিনিধি হন পার্বতী। উভয় জেলাতেই গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে শিব-পার্বতীর নৃত্যের অনুষ্ঠান হতে দেখা যায়।

মালদহে গম্ভীরা উৎসব চারদিন ধরে হয়। প্রথম দিনে হয় ঘটভরা, দ্বিতীয় দিনে ছোট-তামাসা, তৃতীয় দিনে বড়-তামাসা, চতুর্থ দিন বোলাই। এই বোলাইয়ের দিনে গম্ভীরার গান হয়। বোলাইয়ের পরদিন আহারা। বড়-তামাসার পাঁচদিন পর হয় ব্রহ্মাপূজা। নিকটবর্তী নদী অথবা পুষ্করিণী থেকে [পবিত্র দেহে পবিত্র মনে] ঢাকের বাদ্য সহকারে ঘটে জলভর্তি করে শিবের মন্দিরে নিয়ে আসার অনুষ্ঠানটি জলভরা অনুষ্ঠান নামে পরিচিত। অনুষ্ঠানটিতে পূজকদের সাত্ত্বিক মনোভাবের দিকটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ছোট-তামাসা এবং বড়-তামাসায় নানারকম অঙ্গভঙ্গীসহকারে নৃত্য হয়। সঙ্গে বাজে ঢাক এবং কাঁসি। বড়-তামাসা শুধু মালদহের গ্রামাঞ্চলেই নয় শহরাঞ্চলেরও একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব। এই সময় মুখোশ সহকারে ভূত-নৃত্য, প্রেত-নৃত্য, ঘোড়া-নৃত্য, পরী-নৃত্য ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের নৃত্য হয়ে থাকে। এইসব নৃত্যে অংশগ্রহণ করে নৃত্যপাগল গম্ভীরা নৃত্যের কুশলী শিল্পীবৃন্দ।

ছৌ এবং গম্ভীরা উভয় লোকনৃত্যেই মুখোশ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পুরুলিয়ায় শিব, দুর্গা, গণেশ, কার্তিক, অর্জুন, কর্ণ, অভিমন্যু, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, হনুমান, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতি সাজার জন্য যেমন বিভিন্ন রকমের দৃষ্টি-আকর্ষক মুখোশ ব্যবহৃত হয়, মালদহের ছোট-

তামাসা এবং বড়-তামাসার দিনেও ভূত, প্রেত, জেলে, কুকুর, বিড়াল, সিংহ, রাম, লক্ষ্মণ, বিশ্বামিত্র, নৃসিংহ প্রভৃতি সাজার জন্যও অনুরূপ মুখোশ নিয়ে নৃত্য করার রীতি প্রচলিত। মুখোশ তৈরির উপকরণ দুই স্থানে ভিন্ন। পুরুলিয়ায় যে মুখোশ তৈরি হয় তাতে ব্যবহৃত হয় কাপড়, আঠা, রং, রং মেশানোর জন্য শিরীষের আঠা, ময়ূরের পালক, পাটের চুল, বিভিন্ন ধরনের রঙিন জরি, প্লাস্টিকের ফুল, মালা, জামের পাতা, কাঠি, উল, গোখরী, বকপাখা, চুমকি, সাইকেলের ফুল, নানাধরনের রঙিন কাগজ এবং বার্নিশ। মালদহের গম্ভীরা নৃত্যে মাটির তৈরি মুখোশই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দুর্গা, কালী, গণেশ কিম্বা কার্তিকের মুখোশ তৈরির ক্ষেত্রে যেমন ভিতরে কারুকার্য করতে হয়, গম্ভীরা নাচে ব্যবহৃত মুখোশে সেরকম ভিতরে কোন কারুকার্য করা হয় না। শিল্পী প্রয়োজনবোধে বহিরংশেই ইচ্ছেমত কারুকার্য করেন।

মুখোশ তৈরি পুরুলিয়ার একটি বিশেষ লোকশিল্প। বাঁকুড়ার ঘোড়া যেমন লোকশিল্পের অন্যতম আকর্ষণ, পুরুলিয়ার মুখোশেরও তেমনি যথেষ্ট সমাদর। শুধু ভারতেই নয় বিদেশের মাটিতেও পুরুলিয়ার লোকশিল্পের যথেষ্ট কদর বেড়েছে। পুরুলিয়া জেলার চড়িদা গ্রামে উন্নত ধরনের মুখোশ পাওয়া যায়। পুরুলিয়া শহরের নামোপাড়ায় মুখোশের যথেষ্ট হাঁকডাক আছে। মালদহের হবিবপুর থানার আইহোর মুখোশও খুব উন্নতমানের।

ছৌ এবং গম্ভীরা—উভয় নৃত্যই পুরুষ প্রধান। নারীদের এতে কোন সক্রিয় ভূমিকা থাকে না। উভয়ক্ষেত্রেই নারী-চরিত্রগুলি পুরুষেরা রূপায়িত করে। পুরুলিয়ায় ছৌ-নৃত্য পরিবেশিত হয় উচ্চকিত তানবাদ্য সহযোগে। ছৌ-নৃত্য তাণ্ডবধর্মী। এতে ব্যবহৃত হয় বৃহদাকার ধামসা, ঢোল, সানাই, মেরাকশ, বাঁশী এবং করতাল। গম্ভীরা নৃত্যে ধামসা ব্যবহারের কোন প্রচলন নেই। সাধারণতঃ ঢাক এবং কাঁসিই গম্ভীরা নৃত্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঢাকের বাজনায় ২২ রকমের বিশাল আছে। যেমন গিধনী বিশাল, আলা বিশাল, খেমটা বিশাল প্রভৃতি।

মালদহে ঘটভরা, ছোট-তামাসা, বড়-তামাসা এবং আহারা উৎসবের অনুষ্ঠান চৈত্রসংক্রান্তির আগেই অনুষ্ঠিত হয়। পুরুলিয়াতেও ছৌ-নৃত্যের শুরু ৩ চৈত্র থেকে। চলে ১৩ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত। মালদহের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন তারিখে গম্ভীরা গানের অনুষ্ঠান হয়। জোত আড়াপুর, টিপাজানী, ধানতলা, গনিপুর, মহদিপুর, অমৃতি এবং পরানপুরে ২৯ চৈত্র, বাচামারীতে ২ বৈশাখ, সদর ইংরেজবাজারে ১৬ বৈশাখ, মকদুমপুরে ২৫ বৈশাখ, সাহাপুরে ২০ বৈশাখ, ফুলবাড়িতে ৮ জ্যৈষ্ঠ, মহেশপুরে ১৫ জ্যৈষ্ঠ, এবং মধুঘাটে ৩০ জ্যৈষ্ঠ গম্ভীরা গানের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ৩০ জ্যৈষ্ঠের পর গম্ভীরা গানের অনুষ্ঠান আর কোথাও হয় না।

পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্যের অনুষ্ঠান খুবই আকর্ষণীয়। পুরুলিয়ায় প্রায় প্রতিটি গ্রামেই ছৌ-নৃত্যের দল আছে। গাজন উৎসব উপলক্ষে পুরুলিয়ায় পুরো বৈশাখ মাস ধরেই কোন না কোন গ্রামে মেলা হয়ে থাকে। ছৌ-নৃত্যে সারা রাত ধরে চলে "জাগরণ"। পুজোর পূর্বদিন উপোস করতে হয়। দিনটিকে বলা হয় ফলার। যারা ফলার করে তাদের বলে ভক্ত্যা। উপবাসীরা রাত্রিতে নাচে। একেই বলে ভক্ত্যা নাচ। উপোস করার দিন উপবাসীরা ছোলা এবং গুড় মিশিয়ে খায়। একে বলে ফলার ভোগ। সন্ধ্যে-বেলা পুজোর পর হয় ফলার। ভক্ত্যা নাচে কালিন্দী (ডোম), নাটুয়া (এদের হাতে থাকে ঢাল এবং তরোয়াল, মাথায় থাকে পুরানো ন্যাকড়া

এবং পাঞ্জাবীদের মতো পাগড়ী।) এবং ভক্ত্যাগণ একসঙ্গে নৃত্যে অংশগ্রহণ করে। ফলারের পরের রাতে জাগরণ। জাগরণের দিন শিবের জন্য মালা গাঁথা হয়। সকালবেলা সূর্য একটু উঠলে পাটনী ভক্ত্যা, ঠাকুর, কামার এবং নাপিতকে নিয়ে বাদ্যসহকারে প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে ঘোরে। বিকেল বেলা সূর্যাস্তের পূর্বে প্রত্যেক ভক্ত্যা ঘি, গুড়, আতপ চাল এবং মধু নিয়ে শিব-মন্দিরে আসে। এরপর ভক্ত্যারা ঠাকুর এবং কালিন্দীদের নিয়ে বাঁধকে (পুকুরে) যায়। পুকুরে ভক্ত্যারা স্নান করে এবং পুরোহিতরা বালি দিয়ে শিবলিঙ্গ স্থাপন করে। এইসময় ভক্ত্যারা শিবের নাম স্মরণ করে শিবের মাথায় জল দেয়। সঙ্গে পাঠ করে নিম্নলিখিত মন্ত্র :

> "বুধপুরের বুদ্ধেশ্বর/চিরকার গৌরীনাথ/
> জলাডিয়ের জলেশ্বর/বৈদ্যনাথ ধামের বুড়াবাবা/
> আনাড়ার বানেশ্বর/তেলকুপির কালভৈরব/
> কাশীতে বিশ্বনাথ/মানাড়ার বুড়াবাবা।"

মন্ত্রোচ্চারণের পর ভক্ত্যারা বাঁধের ঘাট থেকে নাচতে নাচতে গ্রামের একপ্রান্তে এসে মিলিত হয়। মুরা [একপ্রান্ত] থেকে শিবমন্দির পর্যন্ত প্রত্যেক ভক্ত্যার লোটন করে যেতে হয়। চিৎ হয়ে শুয়ে হাতজোড় করে যাওয়াকে বলে লোটন করে যাওয়া। ভক্ত্যারা শিবের মন্দিরে এসে শুয়ে থাকে। এই সময় পুরোহিত শিবের কৃপাপ্রার্থী ভক্ত্যাদের উপর "শ্যামজল" (শান্তি-জল) ছিটিয়ে দেন। এরপর প্রত্যেক ভক্ত্যা সারিবদ্ধভাবে একটি পংক্তিতে বসে এবং পুরোহিত শিবমন্দির থেকে শুরু করে পংক্তির শেষ ভক্ত্যার কাঁধে পা দিয়ে দিয়ে তিনবার যাতায়াত করেন। এরপর পুরোহিত মন্দিরে "সামায়ে যায়" (প্রবেশ করে)। প্রত্যেক ভক্ত্যার হাতে থাকে একটি করে বেত। প্রত্যেকে প্রত্যেকের বেতের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করে। এরপর প্রত্যেক ভক্ত্যা পুনরায় স্নান করার জন্য বাঁধকে [পুকুরে] যায় এবং স্নানান্তে বাড়ি ফেরে। টকি (নূতন বাঁশের ডালা), জাগর (ধূপবাতি), দিয়া (পলতে), ফুলের মালা নিয়ে ভক্ত্যারা শিবমন্দিরে গিয়ে "বাবাকে" প্রণাম করে। সঙ্গে থাকে চারটি মালা। একটি "বুড়া বাবার", একটি পূজারী ঠাকুরের, জাগরণের জন্য একটি এবং ভক্ত্যার জন্য একটি—এই চারটি মালা তৈরি করা হয়। পুরোহিত মারফত নিজের নাম, গোত্র, প্রভৃতি বলে প্রদীপ উৎসর্গ করা হয়। প্রদীপ উৎসর্গের পর প্রত্যেক ভক্ত্যা "বুড়া বাবা" এবং পুরোহিতকে প্রণাম করে বাড়ি চলে যায়। উপবাসী মহিলাদের বেলাতেও একই নিয়ম। ঈপ্সিত মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য ভক্ত্যারা মানসিক করে। সাধারণতঃ রূপোর ছাতা, সোনার ছাতা, ঘন্টি, ঝারোল (কাঁসা), শাঁখ, মোর (বরের মুকুট) মানসিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শিবমন্দিরের সামনে ভক্ত্যারা "চড়কি ডাঙ্গ" (লম্বা বাঁশ) ধরে মন্দিরের চারদিক প্রদক্ষিণ করে। এই সময় ঢাক, ধামসা, সানাই, মেরাকশ প্রভৃতি বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য হতে থাকে। এরপর শুরু হয় নাটুয়া নাচ। নাটুয়া নাচে ভক্ত্যারা অংশগ্রহণ করে না। নাটুয়া নাচে কোন গানও গাওয়া হয় না। কালিন্দীরা নৃত্যে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন রকমের নয়নাভিরাম নৃত্যকৌশল দেখায়। নাটুয়া এবং কালিন্দীদের নাচের সময় থেকেই ছৌ-নৃত্যের দল প্রস্তুতি নিতে থাকে।

ছৌ-নাচের পরদিন ভক্ত্যা ঘুরান হয়। ঐ-দিনই চড়ক পূজা। চড়ক পূজার পরদিন "তেল হলদা"—তেল এবং হলুদ শিবলিঙ্গে মাখানো হয়। ঐদিন ভক্ত্যারাও তেলহলুদ মাখে।

ছৌ-নৃত্য বীররসাত্মক, গম্ভীরা হাস্যরসাত্মক। ছৌ-নৃত্য সংলাপহীন। গম্ভীরা-নৃত্যের ছোট-তামাসা এবং বড়-তামাসায়ও কোন সংলাপ থাকে

না। ছৌ-নৃত্য পরিবেশনের মূলভিত্তি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যানভাগ। গম্ভীরা গানে থাকে সামাজিক, পারিবারিক কিম্বা রাজনৈতিক ঘটনার সমাবেশ। গম্ভীরা গান বিশেষভাবে সমসাময়িক ঘটনা বা বিষয়কে নিয়েই রচিত। কালিক ইতিহাসের স্বরূপ বর্ণনায় গম্ভীরাকে প্রামাণ্য দলিলের স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে। গম্ভীরা গানে থাকে বন্দনা, ঠুংরি, চার ইয়ারী এবং রিপোর্ট। নৃসিংহ অবতার, সীতার বিবাহ, মহীরাবণ বধ, কিরাত-অর্জুনের যুদ্ধ প্রভৃতি পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে যেমন ছৌ-নৃত্য পরিবেশিত হয়, গম্ভীরা গানে এরকম কোন পৌরাণিক ঘটনার উল্লেখ প্রাধান্য পায় না।

মালদহের গম্ভীরা মূলতঃ শিবেরই আরাধনা। নববর্ষের শুভ আগমনে দেবাদিদেব মহাদেবের অমেয় আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে মণ্ডপে মণ্ডপে গম্ভীরা গানের আয়োজন করে শৈবপন্থী মালদহের মানুষ। গম্ভীরা গানের শুরুতেই তাই দেখি শিবের বন্দনা। কৈলাসবাসী শিব গম্ভীরা গায়কদের অতি আপন জন—"নানা"। আপন-জনের কাছে সুখদুঃখের জ্বালা বলতে দ্বিধা নেই। শত বেদনায় জর্জরিত দুঃস্থ সাধারণ মানুষ তাই নানাকে জানায় অন্তর্দাহ বেদনার কথা। প্রতিকার প্রার্থনা করে নৈরাশ্যপীড়িত জীবনের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য। শত অভিযোগে জীবনের মর্মন্তুদ বেদনায় বিমথিত করুণ দিকটি সঙ্গীতের মাধ্যমে তুলে ধরে তাদের চিরপ্রিয় ভস্মাচ্ছাদিত ব্যাঘ্রচর্মধারী "নানা"র কাছে।

ছৌ এবং গম্ভীরা—গাজন উৎসবেরই দুইটি ভিন্ন দিক। গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে গ্রামে-গঞ্জের মণ্ডপে মণ্ডপে যে উতরোল আনন্দের ঢেউ ওঠে তাতে দলে দলে সাড়া দেয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। সাংসারিক জীবনের শত জ্বালা ভুলে গিয়ে গাজনোৎসবে মত্ত হয়ে দারিদ্র্য-পীড়িত অসহায় মানুষ কিছুদিনের জন্য অপার আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হয়ে অনাবিল তৃপ্তির স্বাদ খুঁজে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ফেরে।

ধর্মমহাসম্মেলন

(পার্লামেণ্ট অব্ রিলিজিয়ানস্)

মারি লুইস্ বার্ক

১

বিশ্বকলম্বীয় প্রদর্শনীর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল, মানুষের বৈষয়িক অগ্রগতির বিচিত্র ফলাফল-গুলিকে একত্রে সংগ্রহ করে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করা। পাশ্চাত্য সভ্যতার অগ্রগতিতে লব্ধবস্তুই শুধু নয়, সেই সঙ্গে জগতের পশ্চাৎপদ সংস্কৃতির পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি উপস্থিত করে নবলব্ধবস্তুর মহিমা ঘোষণা—এক কথায় যা কিছু বাস্তবে সম্ভব সমস্ত উপস্থাপিত করাই ছিল উদ্দেশ্য। জগতের বিভিন্ন চিন্তারাজির উপস্থাপনা ছাড়া সে পরিচয় সম্পূর্ণ হত না। নীলির (Neely) "বিশ্বধর্ম সম্মেলনের ইতিহাস" থেকে জানা যায়, "মানব-সমাজ যে মহৎ বিষয়গুলিতে আগ্রহান্বিত সেগুলি সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত করার জন্য জগতের বিভিন্নপ্রান্তের প্রতিনিধিদের যোগদানের ভাবনাটা প্রথম আসে চার্লস ক্যারল বোনীর (Charles Carrol Bonney) মাথায়, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মে[১]। বোনী ছিলেন সমকালের একজন খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী এবং নানা গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের জনক।

১ ওয়াল্টার আর হাউটন—(সভাপতি) দি পার্লামেণ্ট অব্ রিলিজিয়ানস্ এ্যাণ্ড রিলিজিয়াস কংগ্রেস এ্যাট দি ওয়ার্ল্ড'স্ কলম্বিয়ান এক্সপোজিসন—১৫

তাঁর বক্তব্যের যথেষ্ট মূল্য থাকায় বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে সাধারণের স্বীকৃতি লাভ করে। একটি কমিটি তৈরি হয় এবং ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ বোনীর সভাপতিত্বে "ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অক্সিলিয়ারি অব্ কলাম্বিয়ান এক্সপোজিসন" গঠন করা হয়। পরবর্তী আড়াই বছরে রচিত হয় ব্যাপক ও জটিল পরিকল্পনা। চিঠিপত্রের আদানপ্রদান চলতে থাকে সারা পৃথিবীর সঙ্গে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ মে থেকে ২৮ অক্টোবরের মধ্যে যখন শেষ পর্যন্ত সম্মেলনের অধিবেশন হল তখন সর্বমোট ২০টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়, যথা—নারী প্রগতি, সাধারণ সংবাদপত্র, ঔষধ ও অস্ত্রোপচার, মিতাচার, বাণিজ্য ও অর্থনীতি, সংগীত, সরকার ও আইনসংস্কার, আর্থনীতিক বাণিজ্য, রবিবারের বিশ্রাম এবং "দৈবীবিশ্বাস যেহেতু বৌদ্ধিক ও নৈতিক উন্নতিতে সূর্যালোক বিকিরণকারী"[২] সেই কারণে ধর্মও। হাউটন (Houghton) লিখেছেন, "এত রকমের সম্মেলন এবং এত বিচিত্র তাদের কার্যবিবরণী যে তার কর্মসূচি সন্নিবেশ করতেই ১৬০ পাতার এক কৌতূহলোদ্দীপক গ্রন্থ তৈরি হয়েছিল।"[৩]

এইসব সম্মেলনের মধ্যে বিশ্বধর্মসভা অবশ্যই সবচেয়ে খ্যাতিসম্পন্ন ও সুপ্রচারিত। রেভাঃ জন বারোজ তাঁর "দি ওয়ার্ল্ড'স্ পার্লামেন্ট অব্ রিলিজিয়ানস্" পুস্তকে লিখেছেন, "এর আগে আর কখনও কোন সম্মেলন এত উৎসুক প্রতীক্ষার সৃষ্টি করতে পারেনি।"[৪] ধর্মমহাসম্মেলন সত্যই এক অভিনব অনুষ্ঠান। সত্য বটে, ভারতের ইতিহাসে ধর্মের জন্য সভা সংগঠিত হয়েছে এবং এটাও সত্য যে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের আগেও খ্রীষ্টীয় গীর্জার গোষ্ঠীগত ঐক্য সম্মেলন হয়েছে, মুসলমানদের মধ্যেও অনুরূপ সম্মেলন হয়েছে কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এর আগে কখনও জগতের প্রধান প্রধান ধর্মগুলির প্রতিনিধিরা একত্র সমাবিষ্ট হয়ে হাজার হাজার মানুষের সামনে অকুতোভয়ে তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কথা এভাবে শোনাতে পারেননি। এ এক অভূতপূর্ব সম্মেলন!—সেই অ-সহনশীলতা ও বৈষয়িকতার যুগে এই সম্মেলনের প্রস্তাব প্রথমে অনেকের কাছেই অবাস্তব কল্পনা বলে মনে হয়েছিল। আকস্মিকভাবে উপস্থিত কোন পর্যবেক্ষকের মনে হত যেন এর পশ্চাতে রয়েছে এক অলৌকিক শক্তি যা একে অগ্রসর করে নিয়ে যাচ্ছে। বিস্ময়ের কিছু নেই, স্বামীজী আমেরিকা যাত্রার পূর্বে তুরীয়ানন্দকে বলেছিলেন "আমার মন বলছে, ধর্মমহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এরই (নিজের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে) জন্যে। অল্পদিনের মধ্যে তুমি এটা মিলিয়ে দেখে নিতে পারবে।"[৫]

যাঁরা সভার ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁরা অবশ্য একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলির একত্র সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। দৈবী উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন সংগঠকদের মনোভাব ছিল মিশ্রিত। স্বামীজী পরবর্তিকালে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন "ধর্মসভার ব্যবস্থা হয়েছিল খ্রীষ্টধর্মকে অন্যধর্মের চেয়ে মহীয়ান্ করে দেখাবার উদ্দেশ্য নিয়ে।"[৬] পুনশ্চ একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, "আমার বোধ হয়, বিশ্বের সামনে 'একটা পৌত্তলিক প্রদর্শনী'

২ জন হেনরি বারোজ—(সভাপতি) দি ওয়ার্ল্ড'স্ পার্লামেন্ট অব্ রিলিজিয়ানস্—৩
৩ হাউটন—পূর্বোক্ত—১৫ ৪ বারোজ—পূর্বোক্ত—৫৯
৫ স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্পিরিচুয়াল টক্‌স গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম ভক্তগণ রচিত।
৬ স্বামীজীর রচনাবলী (ইংরেজী)—৫ম খণ্ড, ৬৪

করার ইচ্ছাতেই ধর্মসম্মেলন আহূত হয়েছিল।"[৭] হয়তো মনে হতে পারে, যে-বিশ্বধর্মমহাসম্মেলন স্বামীজীকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করেছিল তার সম্পর্কে স্বামীজীর এই বিচার ন্যায়সঙ্গত নয়, কিন্তু সংগঠকদের ব্যবস্থাপনা এবং কার্যবিবরণী দেখলে কারও মনে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে সভাসংগঠনে খ্রীষ্টীয় সংস্কারই ছিল প্রবল। খ্রীষ্টধর্ম অন্যধর্মের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আপন জয় ঘোষণা করবে—অনেক সংগঠকের মনেই এই পূর্বসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল।

অন্যদিকে আর একদল মানুষ ছিলেন যাঁদের কোন ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা ছিল না, তাঁদের মতবাদ কোন ধর্মীয় আয়ুধে মাপসই করাও ছিল না। তাঁরা এই সভার কথা চিন্তা করেছিলেন উদার ও বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। তাঁদের কাছে ধর্মসম্মেলন ছিল জগতের সত্যানুসন্ধানী মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও মতবিনিময়ের এক অভূতপূর্ব সুযোগ। এঁদেরই একজন ছিলেন সভাপতি বোনী—যাঁর সম্পর্কে স্বামীজী লিখেছেন, "সেই বিরাট কর্মোদ্যোগ ও তাকে বিপুলভাবে সাফল্যমণ্ডিত করতে যে মানুষটি পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁর কথা ভেবে দেখ। তিনি কোন ধর্মযাজক নন, একজন ব্যবহারজীবী, যিনি সমস্ত চার্চের সম্মানিত ব্যক্তিদের সভায় সভাপতিত্ব করেছেন। সেই অমায়িক, সুবিদ্বান, ধৈর্যশীল মিঃ বোনী—যাঁর চোখ দুটির মধ্যে যেন সমস্ত আত্মা ভাস্বর।"[৮] ধর্মসভা কি কি কাজ করবে বলে তাঁর স্বপ্ন ছিল, বোনী নিজেই তা বর্ণনা করেছেন, "যৌবনে আমি সকল ধর্ম সম্পর্কেই জ্ঞান অর্জন করেছিলাম এবং পরিণত বয়সে বহু চার্চের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছি। এর ফলে আমার বিশ্বাস জন্মেছিল যে মহৎ ধর্মগুলিকে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ আদানপ্রদান সম্পর্কের মধ্যে আনা সম্ভব হলে সহমর্মিতা ও ঐক্যের নানাসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে, যাতে মানবমণ্ডলীর ঈশ্বর-প্রেম ও কল্যাণমূলক কাজের সুবিধা ঘটবে।"[৯] কিন্তু ধর্মসম্মেলন সংগঠনে বোনীর প্রেরণা প্রধান হলেও কার্যক্ষেত্রে তিনি নন, সভাপতি হলেন চিকাগোর প্রথম প্রেসবিটেরিয়ান্ চার্চের আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা জন হেনরি বারোজ, যিনি সাধারণ কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে বিরাট ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন।

কমিটির কাজের আয়তন ছিল বিপুল। ১০ হাজারের বেশি চিঠি এবং ৪০ হাজার নথিপত্র গোলার্ধের বিভিন্নপ্রান্তে প্রেরিত হয়েছিল এবং সেগুলির জবাবও গৃহীত হয়েছিল। বারোজ সগর্বে লিখেছেন, "৩০ মাস পৃথিবীর সমস্ত রেল ও ডাকঘর তাদের অজ্ঞাতসারেই ধর্মসম্মেলনের জন্য কাজ করেছে। চিকাগোর ডাকঘরের কেরানীরা মাদ্রাজ, বোম্বাই, টোকিওর কেরানীকুলের পীত অঙ্গুলি স্পৃষ্ট বড় বড় চিঠির বাণ্ডিল নিয়ে কাজ করেছেন।"[১০] উপদেষ্টামণ্ডলী মনোনীত হয়েছিল পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের সংখ্যা গিয়ে পৌছায় তিন হাজারে। ভারত থেকে মনোনীতদের মধ্যে ছিলেন মাদ্রাজের হিন্দুপত্রিকার সম্পাদক জি. এস. আয়ার, বম্বের বি. বি. নাগরকর এবং কলকাতার পি. সি. মজুমদার। শেষোক্ত দুজন ধর্মমহাসম্মেলনে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিত্বও করেছিলেন। কমিটি কলকাতার মহাবোধি সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক এইচ. ধর্মপালের

৭ স্বামীজীর রচনাবলী (ইংরেজী)—৫ম খণ্ড, ২১১
৮ ঐ —৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৫০
৯ বারোজ—প:বে'স—১৮৫
১০ ঐ—৫১

সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন জৈন সম্প্রদায়ের প্রধান পুরোহিত মুনি আত্মারামজীর সঙ্গেও কমিটির সংযোগ ছিল।

শুধু চিঠিপত্রের আয়তনবাহুল্যেই নয়, ধর্ম-মহাসম্মেলন সম্পর্কে প্রকাশিত হয়েছিল নানা-রচনা—প্রবন্ধ, বক্তৃতা, উপদেশাবলী এবং সম্পাদকীয়। সেগুলিতে যেমন ছিল ঐক্য সমাবেশ প্রচেষ্টার বাড়াবাড়িরকম প্রশংসা তেমনি আবার তীব্র নিন্দাও। জি. এস. আয়ারের সম্পাদকীয়-গুলি থেকেই ভারতে সাধারণভাবে এই পরি-কল্পনার কথা প্রচারিত হয় এবং সম্ভবত সেই সূত্র থেকেই স্বামীজী, যিনি কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, সংবাদ পান আমেরিকায় কি ঘটতে চলেছে।

এই অভূতপূর্ব সমাবেশের কতকগুলি স্পর্শ-কাতর এবং ঝঞ্ঝাটের দিক ছিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে প্রাথমিক কমিটি নিযুক্ত হল। বেশির ভাগ উৎসাহী প্রোটেস্টাণ্ট যাজকদের নিয়ে গঠিত এই কমিটির কাজ ছিল ধর্মীয় নেতাদের সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরামর্শ দান। সংক্ষেপে সম্মেলনের উদ্দেশ্য হল: (১) ইতিহাসে এই প্রথম ধর্মমহাসম্মেলনে বিশ্বের প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ধর্মগুলির নেতৃবৃন্দকে একত্র সমাবিষ্ট করা, (২) কতখানি এবং কি গুরুত্বপূর্ণ সত্য বিভিন্নধর্মে আছে এবং শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে কতখানি সাদৃশ্য বর্তমান তা মনোগ্রাহী রূপে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা,...(৪) প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে এবং খ্রীষ্টধর্মের শাখাগুলিতে সত্য ও শিক্ষার বিশিষ্টতা যোগ্য বক্তাদের মাধ্যমে উপস্থিত করা,...(৭) এক ধর্ম অন্য ধর্মকে কতখানি আলোকিত করেছে বা করতে পারে সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করা,...(৯) বর্তমান যুগের বৃহৎ সমস্যাগুলির, বিশেষ করে মিতাচার, শ্রম, শিক্ষা, প্রাচুর্য ও দারিদ্র্য সম্পর্কিত প্রশ্নগুলির উপর ধর্ম কি আলোকপাত করতে পারে, যোগ্য-ব্যক্তিদের উপস্থাপনায় তার সূত্র সন্ধান করা, (১০) বিশ্বশান্তির ও মৈত্রীস্থাপনার উদ্দেশ্যে বিশ্বের জাতিগুলিকে একত্র সমাবিষ্ট করা।[১১]

প্রথম প্রথম মোটামুটি বেশ উৎসাহসূচক ও অনুকূল সাড়াই পাওয়া গিয়েছিল। ভারতের প্রেসবিটেরিয়ান্ বোর্ডের জনৈক সদস্যের উক্তিতে প্রকাশ পায়, কিছু "ত্রুটিতে ভয় পাওয়া গিয়েছিল —যে বিশ্বাস আমাদের প্রিয় এবং যে ত্রাণকর্তার প্রচারণা আমরা করি সম্মেলনে হয়তো তা মর্যাদা লাভ করবে না"[১২] এই রকম আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু পরিকল্পনার পরবর্তী পরিচয়ে সে সন্দেহের অবসান ঘটে এবং তাঁর আন্তরিক সমর্থন পাওয়া যায়।

এই "পরবর্তী পরিচয়" ব্যাপারটা কি ছিল সেটা বোঝা যাবে বারোজের বই থেকে একটি উদ্ধৃতি দিলে। বারোজ লিখেছেন "ধর্মমহা-সম্মেলনের আগে এই সম্মেলন সম্পর্কে খ্রীষ্টীয় ধারণা কি ছিল তা যথার্থভাবে প্রকাশ পেয়েছে 'কণ্টেমপোরারি' পত্রিকার জুলাই ১৮৯২ সংখ্যায় পিয়ের হিয়াসিন্থ-এর রচনায়, যেখানে তিনি বলেছেন, 'সব ধর্মই সমান ভাল এইরকম ধারণা যেমন ঠিক নয়, তেমনি এ ধারণাও ভুল যে সব-গুলির মধ্যে একটি বিশেষ ধর্মই ভাল। ভবিষ্যতের খ্রীষ্টধর্ম হবে অতীতের তুলনায় অনেক ন্যায়বিচার-শীল। ধর্মীয় প্রচারকাণ্ডের ক্ষেত্রে তা প্রতিটি ধর্মের যথার্থ অবস্থানটি নির্ণয় করবে। চার্চের প্রবীণ ব্যবস্থাপকেরা শুধু পৌত্তলিকতার মধ্যেই এগুলিকে দেখেছিলেন—তাই কাজটা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।'"[১৩]

এই প্রতিশ্রুতিও সব ত্রুটি অপনোদন করতে পারেনি। পরিকল্পিত বিষয়বস্তু যখন প্রচারিত

১১ বারোজ—পূর্বোক্ত—১৮ ১২ ঐ—১৪ ১৩ ঐ—১৯-২০

হল তখন প্রতিবাদও তীব্র ও সরব হয়ে উঠল। আমেরিকার অনেক খ্রীষ্টীয় পত্রিকা প্রকাশ্যেই-এর বিরোধিতা করল প্রধানত সেই একটিই ক্ষেত্রে যা প্রেসবিটেরিয়ান্ মিশনারীদের বিরক্তির কারণ হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে যুক্ত হল এই আশঙ্কা যে এই সম্মেলন অনৈক্যই তীব্রতর করে তুলবে। সব থেকে বড় আঘাত এল ক্যান্টারবেরির আর্ক বিশপের কাছ থেকে। তিনি উপযুক্ত বিচারবিবেচনার পর, শেষ পর্যন্ত কমিটির কাছে একটি পত্রে লিখলেন—"আমার কাছে যে অন্তরায় দেখা দিচ্ছে তা দূরত্ব বা সুযোগসুবিধা-সংক্রান্ত নয়—তা হল, খ্রীষ্টধর্মকে অন্যতম ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করার বাস্তব অবস্থার। অন্যান্য সম্ভাব্য সদস্যধর্মগুলির সমপঙ্‌ক্তিভুক্তি ও সম-অধিকার স্বীকার করে না নিলে খ্রীষ্টধর্মকে ধর্ম-মহাসম্মেলনের অন্যতম সদস্য হিসাবে চিন্তা করা কেমন করে সম্ভব সেটা আমি বুঝতে পারছি না।"[১৪]

এর প্রতিধ্বনিও শোনা গেল। উদাহরণ স্বরূপ হংকং-এর জনৈক যাজকের পত্র—"আপনি নিজে বিভ্রান্ত হলেও অন্যদের বিভ্রান্ত করবেন না এবং সত্যের সঙ্গে এভাবে অতিক্রান্ত ও তরল ছেলেখেলায় এবং মিথ্যাধর্মের সঙ্গে প্রেম-প্রেম-খেলায় নিজের আধ্যাত্মিক জীবনকে বিপন্ন করবেন না।…আপনি সজ্ঞানে খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন।"[১৫]

যদিও আর্ক বিশপ এবং সমমতাবলম্বীদের এই মনোভাবের সমালোচনা অনেকেই করেছিলেন কিন্তু বেশির ভাগ বিরোধী ধারণার ভিত্তি ছিল, এই সম্মেলনে খ্রীষ্টধর্মের ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। আমেরিকার একজন বিশপ লিখেছিলেন, "আমার মতে কোন খ্রীষ্টধর্ম-বিশ্বাসী কখনই খ্রীষ্টধর্মকে মহান্ ও হৃদয়গ্রাহী রূপে উপস্থাপনায় বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হবেন না। সুতরাং সম্মেলনের ফলে অন্যধর্মগুলির তুলনায় খ্রীষ্টধর্মের শক্তি গভীরতরভাবে অনুভূত হবে…কে বলতে পারে, হয়তো একজন প্রধান ধর্মযাজক, ঈশ্বর-কৃপায়, এই মহৎ সত্যের জয়যাত্রায় বিশাল জনসমাবেশকে কাজে লাগাতে পারবেন যাতে খ্রীষ্টের নামে সকলেই নতজানু হবেন।"[১৬]

অন্য আর একজন ধর্মযাজক লিখেছেন, "একটা ফলাফল অবশ্যই দেখা যাবে, তা হল, খ্রীষ্টীয় ধর্মমত এর আগে এত ব্যাপক ও বুদ্ধি-গ্রাহ্যভাবে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। সভ্যতা নিখিলবিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং বিশ্বধর্মকে তার প্রকৃত কেন্দ্রে সমবেত করার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে—সেই প্রকৃত কেন্দ্রটি হল যীশুখ্রীষ্ট।"[১৭]

এরকম ডজন ডজন চিঠি আসতে লাগল, যাতে খ্রীষ্টীয় কারণে ধর্মমহাসম্মেনের সমর্থন দেখা যাবে। এ চিঠিগুলি যে ধর্মমহাসম্মেলনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের অনুকূল নয় সে কথা বুঝেই বারোজ এর সঙ্গে নিজেকে স্পষ্টতই জড়িয়ে ফেলেছিলেন। তিনি সম্মেলনের বিরোধিতার জবাবে ও অনুষ্ঠানের সমর্থনে খ্রীষ্টীয় ও শাস্ত্রীয় কারণগুলি উপস্থিত করে প্রবন্ধ রচনা এবং ব্যাখ্যা করতে লাগলেন, যেমন তিনি দেখালেন—সেণ্টপল্ এথেন্সে গ্রীক নিরীক্ষকদের কাছে খ্রীষ্ট ও তাঁর পুনর্জীবন বিষয়ক আলোচনার আগে কিভাবে একটা সাধারণ ভিত্তিভূমির সন্ধান করেছিলেন। বারোজ লিখলেন, "যখন খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে সকল সারসত্যই বর্তমান, তদুপরি ত্রাণকর্তা যীশুর মত ঈশ্বরের আবির্ভাব সেই ধর্মে ঘটেছে তখন খ্রীষ্টধর্ম অন্যধর্মকে উচ্ছিন্ন করে দিতে পারে।" উদ্ভাসিত ভ্রাতৃত্ববোধ পৃষ্ঠপোষকতার চেহারা নিয়ে দেখা

১৪ বারোজ—পূর্বোক্ত—২০-২২
১৫ ঐ—২৪-২৫
১৬ ঐ—২৬
১৭ ঐ—২৫

দিল। "আলোর সৌভ্রাতৃত্ব উষার স্বল্পালোকের সঙ্গে—অন্ধকারের সঙ্গে নয়। ঈশ্বর-স্পর্শ-প্রত্যক্ষ প্রমাণ বর্জিত নয়, তাই যাঁরা পূর্ণ আলোকের সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের উচিত অন্ধকারে দিশাহারা মানুষের প্রতি নিজেদের ভ্রাতৃহৃদয় প্রসারিত করে দেওয়া।"[১৮]

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন খ্রীষ্টান মিশনারীর পক্ষে যতখানি উদারতা থাকা সম্ভব এগুলিতে সেটুকু পাওয়া যায়। অবশ্য আরও উন্মুক্ত মনের পরিচয়বাহী চিঠি ও প্রবন্ধও কিছু ছিল, কিন্তু বারোজের ইতিহাস থেকে জানা যায়, তা ছিল সংখ্যায় কম এবং তার বেশির-ভাগই এসেছিল সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। এরই একটি উদাহরণ ব্রুসেলসের কাউন্ট গবলেট ড আমিভিয়ার কাছ থেকে পাওয়া পত্রের নিম্নোদ্ধৃতাংশটি: "এই ধরনের প্রচেষ্টার মূল্য সম্পর্কে বেশি কিছু বলার নেই। ধর্মের সঙ্গে যাঁরা এক বা অন্যধরনের পদ্ধতির কথা চিন্তা করেন তাঁদের প্রতিবাদস্বরূপ বলা যায়: (১) ধর্মীয় ভাবালুতার মধ্যে একটা সাধারণ রূপ আছে যা কোন নির্দিষ্ট ঈশ্বরতত্ত্ব ছাড়াই কার্যকরী হতে পারে, (২) মানুষ বহুবিচিত্র উপাসনালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থেকেও একটা পারস্পরিক বোঝাপড়ায় আসতে পারে যাতে সকল ধর্মের মধ্যে সর্বজনীন কার্যক্রমটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।"[১৯]

এরকম অভিমত মোটামুটি একটা ভাল অংশের প্রতিনিধিস্বরূপ হলেও এঁরা কিন্তু সাধারণ কমিটির চিন্তাধারার মূলসূত্রটি ধরতে পারেননি। "সত্য যাতে জনসমক্ষে উপনীত হতে পারে, সে জন্য সমস্ত মতধারাই প্রবাহিত হোক পৃথিবীতে। তাতে সত্যের ক্ষতি হতে পারে—এরকম ধারণার অর্থ সত্যের শক্তিকে ছোট করে দেখা। শক্তি পরীক্ষা হোক সত্য ও মিথ্যার। উন্মুক্ত বাধা-হীন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সত্য পরাজিত হয়েছে এমন অভিজ্ঞতা কারও আছে কি?" মিল্টনের এই উক্তি উল্লেখ করে বারোজ লিখেছেন "এর মর্মার্থই ছিল ধর্মমহাসম্মেলনের ভিত্তি।"[২০] মিল্টনের বাক্যে অবশ্যই "সত্য" বলতে খ্রীষ্টধর্ম এবং "মিথ্যা" বলতে অন্যান্য ধর্মমতকে বোঝানো হয়েছে।

এটা খ্রীষ্টীয় চার্চের গোঁড়া অংশের আশঙ্কা দূর করলেও (অবশ্য আর্ক বিশপ অব ক্যান্টারবেরির নয়) অন্যান্য ধর্মমতের নেতাদের সংশয়ী করে তুলেছিল। তার জন্যে আবার বারোজের সত্বর আশ্বাস দিতে হয়েছিল কিছু বিদেশী প্রতিনিধিদের, "ধর্মসম্মেলনে সহৃদয়তা ও সৌভ্রাতৃত্ব ক্ষুণ্ণ হবে না।"[২১]

সাধারণ কমিটি কিছু জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, তার মধ্যে কিছু ছিল তার আয়ত্তের বাইরে। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, ব্যাপটিস্ট সম্প্রদায় এবং খ্রীষ্টান এন্‌ডেভার সোসাইটি বিশ্বমেলার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক প্রত্যাহার করে নেয় কারণ সুদীর্ঘ আলোচনার পর মেলার ব্যবস্থাপকেরা রবিবার মেলা খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেন। তাদের মতে, সে সিদ্ধান্ত খাঁটি শয়তানের কাজ। "অন্য কারণে কংগ্রেস অব্ দি অ্যাংলিকান চার্চেস-ও সরে দাঁড়ায়।"[২২] রাশিয়া প্রতিনিধি পাঠাতে অস্বীকার করে—অস্বীকৃতি জানায় তুরস্কও।

তবু শেষ পর্যন্ত সব পরিকল্পনাই সম্পূর্ণ হল এবং ১১ অগস্ট ১৮৯৩ সাধারণ কমিটি "আধ্যাত্মিক প্রবৃদ্ধির জন্য, সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব-বোধের বিস্তৃতি ও গভীরতার জন্য"[২৩] সর্বজাতিক প্রার্থনার অনুরোধ জানায়।

১৮ বারোজ পূর্বোক্ত—২৬-২৮ ১৯ ঐ—৫৬ ২০ ঐ—৩০
২১ ঐ—৬১ ২২ ঐ—৫৮ ২৩ ঐ—৫৭

খ্রীষ্টান পুরোহিতদের একটা বৃহৎ অংশের স্পষ্ট ও তীব্র সংস্কার এবং সমকালে জড়বাদের প্রবল প্রতাপ সত্ত্বেও সাধারণ কমিটি প্রথম ও উদার উদ্দেশ্য সাধনের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাতে হাজার হাজার নরনারী উৎসুক আগ্রহে এই সম্মেলনের অপেক্ষায় ছিল। উদ্বোধনী দিবসে 'চিকাগো ইভনিং পোস্ট'-এ যে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়—তাতে এই আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন দেখি :

"আমরা এই বিশাল সমাবেশের কাছে বিরাট ফলাফলই প্রত্যাশা করি। তবে এই মুহূর্তেই তা আশা করি না—আশা করি অদূর ভবিষ্যতে। সকল ধর্মমত যাঁকে উপাসনা করে বলে ঘোষণা করে সেই বিধাতার ইচ্ছা ধীর কিন্তু অমোঘ। যে শক্তি এখানে পুঞ্জীভূত হয়েছে তা অবশ্যই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে এবং তার কার্যকারিতা দেখা যাবে ঐক্যবদ্ধতায় ও সমুন্নতিতে।"[২৪]

নিঃসংশয়ে বলা যায়, আমেরিকাবাসীর মুক্ত মনে ঘনিষ্ঠভাবে আধ্যাত্মিক সত্যের জন্য প্রকৃত অনুসন্ধিৎসা ছিল এবং সে সত্য যেখান থেকেই আসুক না কেন তাকে বরণ করে নেবার আগ্রহও বর্তমান ছিল। এই প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও সে সময় ধর্মযাজক ও সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে সত্যকার উদার মনোভাব গড়ে ওঠেনি। ভাগ্যের পরিহাস বলতে হবে, যে ধর্মসম্মেলন আহূত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় চার্চের মানসিকতার প্রভাবে সেই সম্মেলনই গোঁড়ামির বিনষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াল।*

২৪ চিকাগো ইভনিং পোস্ট, সেপ্টেম্বর ১১, ১৮৯৩

* Swami Vivekananda in the West : New Discoveries, Part One (3rd Edition, 1983) গ্রন্থের The Parliament of Religions পরিচ্ছেদের অংশবিশেষ (পৃঃ ৬৬-৭৪) অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত। সম্পূর্ণ অনুবাদ 'উদ্বোধন কার্যালয়' থেকে গ্রন্থাকারে যথাসময়ে প্রকাশ করা হবে।—সঃ

ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের পটভূমিকায় 'বর্তমান ভারত'

ডক্টর অনিলবরণ রায়

১

স্বামী বিবেকানন্দ-রচিত 'বর্তমান ভারত' প্রচলিত অর্থে ভারতবর্ষের ইতিহাস নয়। প্রচলিত অর্থে ইতিহাস বলতে রাজনৈতিক বা শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস বোঝায়। স্বামীজী রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজের প্রতি অধিক দৃষ্টি দিয়েছেন। ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসের ধারাটি যে মৌলিক তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন তার অসাধারণত্ব এইখানে যে, তা শুধু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই সত্য তা নয়, সমগ্র পৃথিবীর মানবসমাজের সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। এই অর্থে 'বর্তমান ভারত'-এ ভারতবর্ষের যে ইতিহাস বিবৃত হয়েছে তাকে প্রচলিত অর্থে ইতিহাস না বলে 'ভাব ইতিহাস' বা ইতিহাসের দর্শন বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

যে মৌলিক তত্ত্বটি স্বামীজীর সমগ্র রচনাটির মধ্যে ঐক্যসূত্র রচনা করেছে তা এই যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারবর্ণ যথাক্রমে প্রাকৃতিক নিয়মে পৃথিবীতে আধিপত্য করবে। প্রথমযুগে ব্রাহ্মণ আধিপত্য করবে বিদ্যাবলে। দ্বিতীয় যুগে ক্ষত্রিয় আধিপত্য করবে অস্ত্র বা বাহুবলে। তৃতীয় যুগে বৈশ্য আধিপত্য করবে

ধনবলে। এবং সবশেষে শূদ্র আধিপত্য করবে শ্রমবলে। এই তত্ত্বটি স্বামীজী ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ হতে ব্রিটিশযুগ পর্যন্ত জাতিসমূহ ও সামাজিক নেতৃত্ব কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন।

স্বামীজীর আর একটি তাত্ত্বিক অবদানের সঙ্গে আমাদের পরিচিত হতে হবে। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন ব্যক্তি, জাতি বা শ্রেণীর আসল কল্যাণ সংঘটিত হতে পারে তখনই যখন ব্যক্তি বা জাতি বা শ্রেণী তার সঞ্চয় সমষ্টি, সমাজ বা জনকল্যাণে ব্যবহার করে। অর্থাৎ যে কোন রকমের সঞ্চয়ই হচ্ছে বণ্টনের জন্য, কেন্দ্রীভূত থাকার জন্য নয়। এই সিদ্ধান্তটির আলোকে আমাদের স্বামীজী-লিখিত সমাজ বিবর্তনের তাৎপর্যটি উপলব্ধি করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে জাতি শব্দটির যে কর্ম বা গুণগত অর্থ স্বামীজী করেছেন তা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রচলিত অর্থে জাতি বলতে জন্ম বা উত্তরাধিকারগত সামাজিক গোষ্ঠী বুঝায়। প্রচলিত এই অর্থ যে জাতি শব্দের আদি অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তা স্বামীজী দেখিয়েছেন।[১] সংস্কৃতে জাতি শব্দের অর্থ সৃষ্টি। সৃষ্টির প্রকাশ বিচিত্রতায়। সুতরাং জাতি শব্দের আদি অর্থ হল ব্যক্তিকে তার প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়া যাতে বিচিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে সে তার সামর্থ্যের পূর্ণবিকাশ ঘটাতে পারে। জন্মভিত্তিক যে জাতিপ্রথা পরবর্তিকালে প্রচলিত হয় (যার প্রকাশ দেখা যায় অসবর্ণ বিবাহ ইত্যাদির নিষিদ্ধকরণে) তা জাতির আদি উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তো নয়ই, বরঞ্চ পরিপন্থী। স্বামীজী দেখিয়েছেন সামাজিক অবনতি বা সামাজিক অগ্রগতির প্রতিবন্ধকতার কারণ নিহিত ছিল জাতিপ্রথার যে আদি উদ্দেশ্য বা আদর্শ তার থেকে বিচ্যুত হওয়ার মধ্যে। যখনই কোন জাতি আদর্শ পরিত্যাগ করে নিজেকে গণ্ডীবদ্ধ অভিজাত শ্রেণী (frozen aristocracy) বা সুবিধাভোগী শ্রেণীতে (privileged class) পরিণত করেছেন তখনই নিজের পতন ডেকে এনেছেন এবং অন্যজাতির হাতে সামাজিক নেতৃত্ব হারিয়েছেন। এই ধরনের বিকৃতির প্রমাণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে বারবার লক্ষ্য করা যায়—সর্বপ্রথম বৈদিকযুগে, তারপর যথাক্রমে বৌদ্ধযুগ, মুসলমানযুগ এবং সবশেষে বর্তমান অর্থাৎ স্বামীজীর সমসাময়িক ব্রিটিশ যুগে।

২

বৈদিক যুগে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতের হাতে। মন্ত্রবলে বলীয়ান্ পুরোহিত-শক্তির অধীন ছিল রাজশক্তি। পুরোহিতের প্রসাদ এবং লেখনীর উপর অনেকখানি নির্ভর করত রাজার নাম-যশ। ফলে রাজা সর্বদাই চেষ্টিত থাকতেন পুরোহিতের তুষ্টির জন্য আর সেই সঙ্গে নিজের সর্বাঙ্গীন পুষ্টির জন্য। পুরোহিত-তুষ্টি এবং রাজ-পুষ্টির শিকার হতেন বেচারা প্রজাগণ। প্রজাবর্গের শোষণ ভিন্ন 'তুষ্টি' ও 'পুষ্টির' রসদ সংগ্রহ করা রাজার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। কাজে কাজেই মাশুল গুণতে হত হতভাগ্য ও শোষিত প্রজাদের। শোষণের মাশুল প্রজাবর্গকে গুণতে হত ঠিকই, কিন্তু তার জন্য শাসনকার্যে তাদের মতামতের কোন মূল্য ছিল না। এর মানে এই নয় যে শাসনকার্যে কোন নিয়ম ছিল না। নিয়ম ছিল, তবে তার মূলে ছিল "ঋষির আদেশ, দৈবশক্তি, ঈশ্বরাবেশ। তাহার স্থিতিস্থাপকত্ব একেবারেই নাই বলিলেই হয় এবং তাহাতে প্রজাবর্গের সাধারণ মঙ্গলকর

১ দ্রষ্টব্য স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী (ইং', ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৭২ ও ৬ ; স্বামীবিবেকানন্দ —ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, (কলিকাতা ঃ নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮০), পৃঃ ২২০

কার্য-সাধনোদ্দেশে সহমতি হইবার বা সমবেত বুদ্ধিযোগে রাজগৃহীত প্রজার ধনে সাধারণ স্বত্ববুদ্ধি ও তাহার আয়-ব্যয়-নিয়মনের শক্তি-লাভেচ্ছার কোন শিক্ষার সম্ভাবনা নাই।"[২]

প্রজাদের শক্তি-সমবায় করার বা ঐক্যবদ্ধ হবার কোন অধিকার বৈদিকযুগে ছিল না। প্রজা-মঙ্গলকারী রাজা যে ছিলেন না তা নয়। কিন্তু মঙ্গলসাধন করা এবং স্বায়ত্তশাসন শক্তির বিকাশ ঘটানোর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। যাকে সবসময় হাত ধরে চলতে সাহায্য করা হয়, সে কখনও কি নিজে হাঁটতে শেখে? তার কি আত্মশক্তির বিকাশ ঘটে? "দেবতুল্য রাজা দ্বারা সর্বতোভাবে পালিত প্রজাও কখন স্বায়ত্তশাসন শিখে না; রাজমুখাপেক্ষী হইয়া ক্রমে নির্বীর্য ও নিঃশক্তি হইয়া যায়।"[৩] অথচ প্রাচীন ভারতবর্ষে যে প্রজানুমোদিত শাসন পদ্ধতির বীজ গ্রাম্য পঞ্চায়েতে বর্তমান ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিদেশী পরিব্রাজকদের ভ্রমণ-কাহিনীতে এবং বৌদ্ধদের গল্পেও। এক কথায়, বৈদিকযুগে প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত-শক্তির কাছে রাজশক্তি হীনবল ছিল এবং অপ্রণালীবদ্ধ প্রজাশক্তির কোন অধিকার ছিল না এবং সে অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হবার কোন অবকাশও ছিল না।

প্রবলপ্রতাপান্বিত পুরোহিতশক্তিকে ক্ষত্রিয় বা রাজশক্তির কাছে বৌদ্ধযুগে আসন হারাতে হল কেন? 'বুদ্ধত্বে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার' বৌদ্ধ-ধর্মের এই যে মূল কথা তা নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণ্য-শক্তিকে অনেকখানি টলিয়ে দিয়ে রাজশক্তির একচ্ছত্র বিকাশ ঘটিয়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যশক্তির পতনের জন্য তাঁর নিজের দোষ কি অধিকতর পরিমাণে ছিল না? প্রাণহীন আচার-আচরণের অনুষ্ঠান, পূর্বের যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়ার মিথ্যা অনুকরণ ইত্যাদি কি তার পতনকে অনিবার্য করেনি? এককথায়, "যাহা কুসংস্কার ও অনাচারের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সারহীন ও অতি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, পশ্চিম হইতে সমুত্থিত মুসলমানাক্রমণরূপ প্রবল বায়ুর স্পর্শ-মাত্রেই তাহা শতধা ভগ্ন হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হইল।"[৪]

মুসলমান-রাজত্বে ব্রাহ্মণ্যশক্তির অবস্থা সব থেকে শোচনীয় হল। মুসলমান রাজত্বে রাজাই প্রধান পুরোহিত। মূর্তিপূজাকারী কাফের হিন্দু পুরোহিতবর্গকে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী রাজা কোন ক্রমে বিবাহাদি রীতিনীতি পরিচালনে অস্তিত্ব রক্ষা করতে দিল বটে, কিন্তু সমাজ-শাসনাধিকার হতে সর্বতোভাবে বিচ্যুত করল। কয়েকশ বছর ধরে এরূপ চলার পর মুসলমানযুগের শেষভাগে ভারত-ইতিহাসে একটা অভিনব ঘটনা ঘটল। এই অভিনব ঘটনা হচ্ছে ইংলণ্ডের ভারতাধিকার। ঘটনাটি অভিনব এই জন্য যে ভারতবর্ষ এতদিন ছিল ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় শাসিত। এখন সে লক্ষ্য করল বৈশ্য-শক্তি-সম্পন্ন ইংরেজের শাসন।

একদা ব্রাহ্মণ ছিল শক্তির কেন্দ্রে। অতঃপর কেন্দ্রে এল ক্ষত্রিয়। তারপর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হল বৈশ্যে। সবশেষে শূদ্রের ক্ষমতায় আগমন ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এ ইতিহাস শুধু ভারতবর্ষের নয় "সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বৈষম্য-তারতম্যে প্রসূত ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ সনাতন কাল হইতেই সকল সভ্য সমাজে বিদ্যমান আছে। কালপ্রভাবে আবার দেশভেদে ঐ চতুর্বর্ণের কোন

২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (কলিকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৬৯), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২২৩

৩ ঐ, পৃঃ ২২৪

৪ ঐ, পৃঃ ২২৬

কোনটির সংখ্যাধিক্য বা প্রতাপাধিক্য ঘটিতে থাকে।"[৫]

৩

এই চতুর্বর্ণের প্রত্যেকের শাসনের ভালমন্দ বিচার করতে হবে লোকহিতকারিতা বা অহিতকারিতার মানদণ্ডে। পুরোহিত প্রাধান্যের সব থেকে ভাল দিক হচ্ছে প্রথম বিদ্যার উন্মেষ, "সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব, পশুত্বের উপর দেবত্বের প্রথম বিজয়, জড়ের উপর চেতনের প্রথম অধিকার-বিস্তার, প্রকৃতির ক্রীতদাস জড়পিণ্ডবৎ মনুষ্যদেহের মধ্যে অস্ফুটভাবে যে অধীশ্বরত্ব লুক্কায়িত, তাহার প্রথম বিকাশ। পুরোহিত জড়-চৈতন্যের প্রথম বিভাজক ইহ-পরলোকের সংযোগ সহায়, দেব-মনুষ্যের বার্তাবহ, রাজা-প্রজার মধ্যবর্তী সেতু।"[৬] এতসব গুণ সত্ত্বেও পুরোহিত শক্তিকে প্রাধান্য ও নেতৃত্ব হারাতে হয় ক্ষত্রিয় শক্তির কাছে যে কারণে তা হচ্ছে তার ক্ষমতা, জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য বিতরণে অনিচ্ছা। তার হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ও অনুদার ভাব এতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল যে সে বেদশ্রবণকারী শূদ্রের "জিহ্বাচ্ছেদ শরীর-ভেদাদি"[৭] দণ্ডের আদেশ জারি করতেও পিছুপা হয়নি। গণ্ডীবদ্ধ সুবিধাভোগী অভিজাত শ্রেণীতে পরিণত হয়ে সে ভুলে গিয়েছিল: "শক্তিসঞ্চয় যে প্রকার আবশ্যক, তাহার বিকিরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। হৃৎপিণ্ডে রুধিরসঞ্চয় অত্যাবশ্যক, তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলে মৃত্যু। কুলবিশেষে বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া এককালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্বতঃ সঞ্চারের জন্য পুঞ্জীকৃত। যদি তাহা না হইতে পায়, সে সমাজ-শরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"[৮]

জরাজীর্ণ ব্রাহ্মণ্যশক্তির উপর নবীন প্রাণের প্রতীক ক্ষত্রিয় শক্তি স্বাভাবিক কারণেই বিজয়ী হল। ক্ষত্রিয় শক্তির প্রাণকেন্দ্র রাজা যিনি সমাজ কর্তৃক কেন্দ্রে স্থাপিত হন সর্বসাধারণের সম-অধিকার রক্ষার জন্য এবং প্রজাকল্যাণের জন্য। ব্রাহ্মণ্যশক্তির সুপ্রকাশ যেমন জ্ঞানেচ্ছার প্রথম উদ্বোধনে সেইরূপ ক্ষত্রিয় শক্তির অবদান ভোগেচ্ছার এবং তৎসহায়ক বিদ্যানিচয়ের উন্মেষে, ফল—পরিশ্রমসাধ্য কৃষিকার্যের অনাদর এবং অল্পশ্রমসাধ্য নানা সূক্ষ্মকলা সৃষ্টি অর্থাৎ গ্রামের গৌরব বিলুপ্তি এবং নগরের আবির্ভাব। ব্রাহ্মণ্যশক্তির ন্যায় ক্ষত্রিয় শক্তির সর্বনাশের সূত্রপাত তার আত্মাদরে, তার স্বার্থসর্বস্ব প্রজাপীড়ক আত্মভোগেচ্ছায়। সে ভুলে গেল—"সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি।"[৯] জগতের মূলভিত্তি হতে বিচ্যুত হয়ে পুরোহিত যেমন সর্ববিদ্যাকে কেন্দ্রীভূত করতে চেষ্টা করেছিলেন রাজাও সেইরকম সমস্ত পার্থিব শক্তি কেন্দ্রীভূত রাখতে চাইলেন এবং ফলে হয়ে উঠলেন প্রজাপালকের জায়গায় প্রজাপীড়ক এবং প্রজারক্ষকের বদলে প্রজাভক্ষক। শৈশবাবস্থায় সমাজ এ বিকৃতি সহ্য করলেও যৌবনাবস্থায় সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ল। ক্রমে রাজমহিমা ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে পড়লে আবির্ভাব ঘটল বৈশ্য-শক্তির।

ব্রাহ্মণ আধিপত্যে যেমন বিদ্যার উন্নতি, ক্ষত্রিয় আধিপত্যে সভ্যতা ও কলার, বৈশ্য আধিপত্যে তেমন ধনের উন্নতি হয়। বৈশ্য তার ধনবলের দ্বারা রাজশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং সেই শক্তি যাতে তার ধনসঞ্চয়ের পক্ষে বাধাস্বরূপ

৫ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২২৯ ৬ ঐ, পৃঃ ২৩২ ৭ ঐ, পৃঃ ২৪০
৮ ঐ, পৃঃ ২৩৫ ৯ ঐ, পৃঃ ২৩৮

না হয় তা নিশ্চিত করে। কিন্তু যে ধনবলের উপর বৈশ্যের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত সেই বল বা শক্তির কোনরকম সঞ্চার যাতে শূদ্রকুলে না হয় সে বিষয়ে বৈশ্য সদাজাগ্রত ও প্রহরারত। তার "একথা মনে থাকে না—গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনিই সর্বনাশের সূত্রপাত।"[১০]

যে শূদ্রজাতির প্রাণপাত পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য এবং বৈশ্যের ধন-ধান্য, সেই শ্রমজীবী শূদ্রজাতি কি চিরকাল 'ভারবাহী পশু' হয়ে থাকবে? ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে তা সম্ভব নয়—স্বামীজীর ভাষায়, "এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে…শূদ্রধর্মকর্ম সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।"[১১] ইংরেজ শাসনে শূদ্রত্বে অবনমিত তমসাচ্ছন্ন ভারতবাসীর তাই আশাহত হবার কারণ নাই। তাকে বুঝতে হবে সমস্ত শক্তির আধার সে নিজে। স্বামীজীর ভাষায়: "সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ।…পৌরোহিত্যশক্তি কালক্রমে শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাৎকালিক প্রজাসহায় রাজশক্তির নিকট পরাভূত হইল; রাজশক্তিও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার করিয়া, প্রজাকুল ও আপনার মধ্যে দুস্তর পরিখা খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সাধারণ-প্রজাসহায় বৈশ্যকুলের হস্তে নিহত বা ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া গেল। এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে; এই স্থানে এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।"[১২]

ইংরেজরূপ বৈশ্যের মৃত্যুবীজকে পূর্ণ পরিণতি দান করতে হলে ভারতবাসীকে ঐক্যসচেতন ও তৎসঞ্জাত ঐক্যের অধিকারী হতে হবে, সেই ঐক্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে বিদেশী শাসকদের উপর ঘৃণা ও জনসাধারণের প্রীতির উপর। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় "একান্ত স্বজাতি-বাৎসল্য ও একান্ত ইরান-বিদ্বেষ গ্রীকজাতির, কার্থেজ-বিদ্বেষ রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরব-জাতির, মুর-বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিদ্বেষ ইংলণ্ড ও জার্মানির এবং ইংলণ্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির"[১৩] কারণ হয়েছিল। খ্রীষ্টজন্মের ছয়শ বছর পূর্ব হতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে আটটি ঐতিহাসিক উদাহরণ স্বামীজী দিয়েছেন তা শুধু তাঁর ইতিহাস-জ্ঞানের ব্যাপ্তিই সূচিত করে না, তাঁর প্রকাশ কুশলতারও পরিচয় বহন করে। স্বামীজী এখানে কোথাও স্পষ্ট করে বলেননি যে ভারত-বাসীকে ইংরেজবিদ্বেষী হতে হবে—কিন্তু ইঙ্গিতটুকু পরিষ্কার যে স্বজাতিপ্রীতি ও ইংরেজ-বিদ্বেষের ভিত্তিভূমিতে ভারতবাসীকে নিজ স্বায়ত্তশাসন অধিকার অর্জন করতে হবে। স্বামীজীর রচনাবলী যে ভারতবর্ষীয় বিপ্লববাদীদের কাছে এত প্রিয় হয়েছিল তার একটি কারণ নিঃসন্দেহে এই ইঙ্গিতময়তা।[১৪]

ইংরেজশাসনের গুণের দিকটি স্বামীজী অবজ্ঞা করেননি: "সর্বাপেক্ষা কল্যাণ এই যে, পাটালিপুত্র-সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতে বর্তমান-

১০ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৩৮
১১ ঐ, পৃঃ ২৪১
১২ ঐ, পৃঃ ২৪২-৪৩
১৩ ঐ, পৃঃ ২৪৩
১৪ মিলিট্যান্ট ন্যাশনালিজম্‌ ইন্ ইণ্ডিয়া—বিমানবিহারী মজুমদার, (কলিকাতা: জেনারেল প্রিণ্টার্স ও পাবলিশার্স, ১৯৬৬)

কাল পর্যন্ত, এ প্রকার শক্তিমান্ ও সর্বব্যাপী শাসনযন্ত্র অস্মদ্দেশে পরিচালিত হয় নাই।"[১৫] এই রাজত্বের সর্বাপেক্ষা দোষের হচ্ছে প্রজাকল্যাণ উপেক্ষা করে 'যেন তেন প্রকারেণ' ভারতে ইংলণ্ডাধিকার বজায় রাখার চেষ্টা।

ইংরেজের মাধ্যমে ভারতবাসীর পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে যে যোগাযোগ ও সংঘর্ষ স্থাপিত হচ্ছে তার একটি ভাল দিক হচ্ছে যে তা ভারতবাসীর নিদ্রা কিছু পরিমাণে ভঙ্গ করছে। স্বামীজীর ভাষায়—"একদিকে পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্যসমাজের কঠোর আত্ম-বলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে—তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ।"[১৬] ভারতবাসীকে বুঝতে হবে যা কিছু পাশ্চাত্যদেশীয় তাই ভাল এরূপ মনে করা মূর্খতা। ভাল যা তা গ্রহণে বাধা নেই, কিন্তু অন্ধ অনুকরণ কখনও মহত্ত্ব আনতে পারে না। প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্ম আদর্শের অনুসরণে সমাজের সার্বজনীন কল্যাণ যাতে তাই ভারতবাসীর কাছে গ্রহণীয়। "স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ।"[১৭] এই বীজমন্ত্র ভারতবাসীকে অন্তরে গ্রহণ করতে হবে, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীকে ভাই বলে গ্রহণ করলে, ভারতের মাটি ও সমাজকে স্বর্গ হিসাবে গ্রহণ করলে এবং সর্বোপায়ে কাপুরুষতা পরিহার করলে ভারতবাসীর মানুষ হবার, স্বাধীন হবার সাধনা সফল হবে।

৪

'বর্তমান ভারত' রচনাটি স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে।* ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তার ভিত্তিতে স্বাধীনতা লাভের আশা, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞানের পরিচায়ক স্বামীজীর এই রচনাটি নিম্নলিখিত চোদ্দটি অংশে বিভক্ত: বৈদিক পুরোহিতের শক্তি, রাজা ও প্রজার শক্তি, স্বায়ত্তশাসন, বৌদ্ধবিপ্লব ও তাহার ফল, মুসলমান অধিকার, ইংলণ্ডের ভারতাধিকার, বৈশ্যশক্তির অভ্যুদয়, পুরোহিত শক্তি, ক্ষত্রিয় শক্তি, ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবন, বৈশ্যশক্তি, শূদ্র-জাগরণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যসংঘর্ষ, ও স্বদেশমন্ত্র। উল্লেখিত প্রবন্ধাংশগুলির শিরোনাম লক্ষ্য করলে প্রজ্ঞাবান পাঠক উপলব্ধি করবেন স্বামীজী যে দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় সমাজের বিবর্তন বিশ্লেষণ করেছেন তা হচ্ছে—বিভিন্ন জাতি (Caste) কর্তৃক শক্তি ও তার ব্যবহার ও অপব্যবহার। সর্বসাধারণের স্বার্থে লোকহিতকর কার্যে নিয়োজিত শক্তি জীবনদায়িনী, শ্রী ও সমৃদ্ধির কারক। অপরপক্ষে আত্মস্বার্থে এই শক্তির ব্যবহার বিভিন্নজাতির পক্ষে মৃত্যুর সমান হয়েছে।[১৮] স্বামীজীর এই যে সিদ্ধান্ত এটি সর্বদেশে সর্বকালে সমানভাবে প্রযোজ্য। তত্ত্বজ্ঞান ছাড়াও এই উক্তি স্বামীজীর অসাধারণ দূরদৃষ্টির পরিচয় বহন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তিকালে 'শক্তি' বা 'ক্ষমতা'র ভিত্তিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় রাজনীতি বিশ্লেষণের ধারা বহুল প্রচলিত হয়েছে। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী এই পদ্ধতিতে সমাজ ও

১৫ পূর্বে উল্লিখিত 'বর্তমান ভারত', পৃঃ ২৪৪ ১৬ ঐ, পৃঃ ২৪৬ ১৭ ঐ, পৃঃ ২৪০

১৮ "পাঞ্জীকৃত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনিই সর্বনাশের সূত্রপাত" 'বর্তমান ভারত', পৃঃ ২০৮

* রচনাটির সম্পূর্ণ প্রকাশ উদ্বোধনের ১ম এবং ২য় বর্ষের ৭টি সংখ্যায় শেষ হয়।—সঃ

রাজনীতি বিশ্লেষণ করেছেন। সেদিক থেকে তাঁকে নিঃসন্দেহে সমাজ বিজ্ঞানে 'ক্ষমতা'-ভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির একজন পথপ্রদর্শক বলা যায়।

দ্বিতীয়ত, জাতির ভিত্তিতে দেশের ইতিহাস বিশ্লেষণ স্বামীজীর আগে আর কেউ অন্ততঃ ভারতবর্ষে করেছেন বলে আমার জানা নাই। জাতি বা caste বলতে ব্যক্তির 'প্রকৃতি' প্রকাশের স্বাধীনতা বোঝায়, এই অর্থে জাতি কোন অপরিবর্তনীয় গণ্ডীবদ্ধ সামাজিক গোষ্ঠী হতে পারে না। গণ্ডীবদ্ধতার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে এসেছিল গোষ্ঠীস্বার্থ-সর্বস্বতা যা আবার এনেছিল সেই জিনিষ যাকে স্বামীজী বলেছেন 'Touch-me-not-ism'।

জাতিব্যবস্থার আসল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফল ব্রাহ্মণাদি চারজাতির পক্ষে কি রকম বিষময় হয়েছিল 'বর্তমান ভারত' রচনায় তা দেখিয়ে স্বামীজী বৃহৎ ও ক্ষুদ্র অর্থে জাতির অভ্যুদয়, পুনরুজ্জীবন ও সঠিক চলার পথটি নির্দেশ করেছেন।

আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বামীজীর জ্ঞান যে কী গভীর ও প্রগাঢ় ছিল তা স্বামীজীর 'বর্তমান ভারত' রচনা থেকে উদ্ধৃতি সহকারে দেখানো যায়। যখন তিনি লেখেন "সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব" কিংবা "বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল, বীর্য—যাহা কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করে, তাহা পুনর্বার সঞ্চারের জন্য;"[১৯] তখন তাঁর কাছ থেকে আমরা যা পাই তা হচ্ছে সোসালিজম্ বা সমাজবাদের শেষ কথা।

"যদি কালে দুই-একটি অসাধারণ পুরুষ শূদ্রকুলে উৎপন্ন হন, অভিজাত সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উপাধিমণ্ডিত করিয়া আপনাদের মণ্ডলীতে তুলিয়া লন।"[২০] স্বামীজীর এই সমাজ বিশ্লেষণ প্রকাশ করে সেই circulation of elite তত্ত্ব যা ইটালিয়ান সমাজতত্ত্ববিদ্ Vilfredo Pareto-র অবদান বলে পরিচিত। লক্ষণীয় যে, পারেটোর এই মত, প্রকাশিত হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে। তার প্রায় চার দশক আগেই স্বামীজী এ বিষয়ে তাঁর অবদান রেখেছিলেন।

বেদান্তবাদী হিসাবে স্বামীজী ছিলেন সর্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। ঈশ্বরের প্রকাশরূপে সকল মানুষের সমত্বে (essential equality) তিনি বিশ্বাস করতেন, ভিতরে যে ঈশ্বরত্ব ও অনন্ত ক্ষমতা রয়েছে তা উপলব্ধি করে ব্যক্তিকে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন জাতি, সমাজ ও দেশের সেবায় তার সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করতে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায়, ব্যক্তিবাদ ও সমাজবাদের এই মহান্ সমন্বয় চিন্তা স্বামীজীকে চিহ্নিত করেছে তাঁর সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানীরূপে এবং নিঃসন্দেহে বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার হিসাবে।*

১৯ পূর্বে উল্লিখিত 'বর্তমান ভারত', পৃঃ ২০৮ ২০ ঐ, পৃঃ ২৪২

* গত ২ মার্চ ১৯৮৬, উদ্বোধন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে লেখক-কর্তৃক পঠিত ভাষণ সংক্ষেপিত আকারে প্রকাশিত।—সঃ
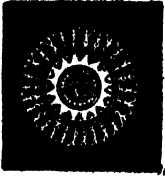
পুরাতনী

ঋভু-নিদাঘ-সংবাদ

[বিষ্ণুপুরাণ অবলম্বনে]

ঋভু গুরু, নিদাঘ শিষ্য—গৃহী। গুরু শিষ্যবাড়ী গিয়া হাজির। আজ কাল যেমন কুলগুরুকে বাড়ী আসিতে দেখিলে শিষ্য অর্থ দিবার ভয়ে জড় সড় হন, নিদাঘ তা হইলেন না। কারণ, ইনি অতিথি সাজিয়া ছদ্মবেশে গিয়াছিলেন। আরও অন্য কারণ ছিল; তা পরে প্রকাশ পাইবে।

অতিথি ত অর্ঘ্য নিয়ে হাত পা ধুয়ে আসনে বসুন। নিদাঘ বল্লেন, তবে আর কি? কিছু উপযোগ করুন।

অতিথি। খাবো তো বোল্‌ছো বাপু। কি খাব বল দিকি? বলি, ভাল থ্যাট ট্যাট আছে কিছু? ডাল চচ্চড়ি খেয়ে খেয়ে ত বাবা, অরুচি জন্মে গেছে।

নিদাঘ। মশায়, সুন্দর আতপ চালের ভাত, গব্য ঘৃত, ডাল, কপির তরকারী, পিটে, পায়েস প্রভৃতি আছে। যা ভাল লাগে, আহার করুন।

ঋভু। না বাবা, ও সব চল্‌বে না। মাংসের পোলাও কালিয়ে, পুরী, রাব্‌ড়ী, কচুরী, বরফী খাওয়াতে পার,—তবে তোমার অতিথি হই। না হলে বাপু চল্লুম।

এখনকার গৃহস্থ হলে অতিথির এতটা বেয়াদবি সহ্য করা দূরে থাক্, অতিথির—একেবারে অপরিচিত অতিথির—ও কথাগুলো মুখে আন্‌বারই ভরসা হোতো না। কিন্তু নিদাঘ একজন অতিশয় ধর্মপরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি অমনি গিন্নিকে ডেকে অতিথি যা ফরমাজ কোর্‌লেন, সব যত শীঘ্র সম্ভব তৈয়ার করাইয়া অতিথির তৃপ্তি সাধন কোর্‌লেন। আহারান্তে তাম্বূল-চর্ব্বণ, তামাকুসেবন প্রভৃতি যথারীতি হইল। তখন ভক্তরাজ নিদাঘ হাত জোড় করে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু, বেশ তৃপ্তি হয়েচে ত? আপনার বাড়ী কোথা? কোথায় যাচ্ছেন কোত্থেকেই বা আস্‌ছেন?

তখন ঋভুকে একটু খানি গম্ভীর দেখা গেল—যেন সে মানুষ নয়—তিনি এক দিব্যি লেক্‌চার জুড়ে দিলেন,—"ওহে ব্রাহ্মণ, তুমি আমাকে তৃপ্তির কথা কি বল্‌চো? যার খিদে হয়, তারই খেলে তৃপ্তি হয়। আমার খিদেই হয়নি, তৃপ্তি আবার হবে কি? ক্ষুধা তৃষ্ণা ত দেহের ধর্ম; তা ত আমার কখন নেই। খিদে আমার মোটেই হয় না। তাইতে আমার সদাই তৃপ্তি রয়েছে—আনন্দের ত কম্‌তি দেখ্‌তে পাইনি। তুষ্টি, শান্তি এগুলো চিত্তের ধর্ম। অতএব তুমি তৃপ্তি হয়েচে কি না, চিত্তকেই জিজ্ঞাসা করতে পার। তুমি জিজ্ঞাসা কোরছিলে, আমার বাড়ী কোথা, কোথা যাব, কোত্থেকে আস্‌ছি,—এসব কথার আর জবাব কি দোবো? আমি ত সেই আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী পুরুষ—তোমার প্রশ্নগুলোই যে ভুল হচ্চে। আমি ত কোথাও যাই না—কোত্থেকেও আসিও না—এক জায়গায় বসে আছি, তাও নয়। আরও দেখ, তুমি বা অপর কেউও এরকম ক্ষুদ্র নও, তোমরা সর্ব্বব্যাপী। তুমি যে ক্ষুদ্র দেহ, ক্ষুদ্র মন বোলে আপনাকে জ্ঞান কোর্‌চো, তা ত তোমায় সাজে না—তুমি সর্ব্বব্যাপী, আপনাকে ব্রহ্ম বলে জ্ঞান কর। যদি বল মশায়, আপনি বেশ এখন পেটটি ঠাণ্ডা করে লেক্‌চার ঝাড়্‌ছেন, নিজের ত দিব্যি পোলাও কালিয়ে না হলে খাওয়া হয় না। তা বাপু,

আমি সত্য বল্‌চি, আমি ভাল খাবার দাবার বড় তোয়াক্কা রাখি না। ভাল খাওয়ার কথা বল্লে তুমি ভাল মন্দর যে কোন ভেদ নেই, একথা বল কিনা, তাই তোমার জ্ঞান জান্‌বার জন্যে তোমাকে পোলাও কালিয়ের কথা বলেছিলুম। আমি তোমাকে ভাল জিনিষ খেতে বারণ কচ্চি না। কিন্তু ভাল খাবার জন্যে যে একটা ছট্‌-ফটানি, সেটা ছেড়ে দিতে হবে। দেখনা, পেট যখন আকণ্ঠ পূর্ণ হয়েছে, সে সময় যদি খুব ভাল জিনিস নিয়ে এসো, তাতে বমি আসে। আবার যখন বড্ড খিদে পেয়েছে, তখন দুটী ভাত পেলেই অমৃত জ্ঞান হয়। খাবার জিনিসগুলো আর কি? কতকগুলো পরমাণুর সমষ্টি মাত্র তো। এই রকম মনে করে সব বিষয়ে সমতা ভাব অবলম্বন করা দরকার। সমতা ভাব এলেই মুক্তি। 'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।' "

এরকম লেক্‌চার শুন্‌লে আমরা লাটি নিয়ে তাড়া কর্‌তুম, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমাদের উপাখ্যান বল্‌চেন, ইনি এই জ্ঞানের উপদেশ শুনে করজোড়ে প্রণাম কোরে জিজ্ঞাসিলেন, আপনি কে, আমাকে বল্‌তেই হবে। তখন গুরু আত্ম-পরিচয় দিয়ে শিষ্যকে জ্ঞানাভ্যাস কর্‌তে উপদেশ দিয়ে সরে পড়্‌লেন।

এ দফায় গুরু শিষ্যের কাছে তোফা খ্যাঁট মেরেছিলেন, কিন্তু আর একবারের ঘটনা শুনুন। এক্ষেত্রে শিষ্য গুরুর ঘাড়ে চড়েছিলেন। অনেক দিন বাদে আবার গুরু শিষ্যে দেখা। নিদাঘ ফুল দূর্ব্বাদি পূজার উপকরণ যোগাড় করে বাড়ী ফির্‌চেন, এমন সময় ঐ দেশের রাজা বেরিয়েচেন। আর রাজ্যের লোক রাজাকে দেখ্‌বার জন্যে ঝুঁকে পড়েচে। নিদাঘ ব্রাহ্মণ, ভাল মানুষ বেচারা। এক ধারে সরে দাঁড়িয়ে রয়েচেন, রাজা চলে গেলে ভিড় কম্‌লে বাড়ী যাবেন। এমন সময়ে ঋভু ছদ্মবেশে হাজির। ঋভু নিদাঘের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম কোরে বোল্লেন, বামুন ঠাকুর, এ রকম একান্তে এক ধারে দাঁড়িয়ে যে? নিদাঘ বোল্লেন,—দেখ্‌চেন না, রাজা আস্‌চেন—লোকের বেজায় ভিড়।

ঋভু। কোন্‌টা রাজা, আমাকে দেখিয়ে দেবেন কি?

নিদাঘ। ওই যে পাহাড়ের মতন হাতী দেখ্‌চেন, ওরই উপর যিনি বসে আছেন, তিনি রাজা।

ঋভু। কোন্‌টা হাতী, কোনটাই বা রাজা, আমাকে ভাল কোরে বুঝিয়ে দিন না।

নিদাঘ। হাতীর পিটে মানুষ চড়ে থাকে, এ কথাটা কে না জানে, মশায়? ওই নীচে যেটা, সেটা হাতী, আর ওর উপরেই রাজা বসে আছেন।

ঋভু। বামুন ঠাকুর, রাগ কর্‌বেন না। আমি আপনার কথা এখনও বুঝ্‌তে পাচ্চি না। নীচু উপর কাকে বলে, ঠাকুর?

ঋভুর এই কথা বলা আর নিদাঘের তাঁর ঘাড়ে চোড়ে বসা। বোল্‌তে লাগ্‌লেন—এইবারে বুঝ্‌তে পাচ্চেন,—আপনি যেন হাতী, আপনি নীচে রয়েচেন আর আমি আপনার উপর চড়ে বসে রয়েচি, আমি যেন রাজা।

ঋভু। তাই যদি হয়, তবে আপনিই বা কে আর আমিই বা কে? বুঝিয়ে দেবেন কি?

তখন নিদাঘের সন্দেহ হোলো—লোকটা কে? তাড়াতাড়ি নেবে গুরুর পা ধরে বল্লেন—ক্ষমা কর্‌বেন—আপনি নিশ্চয় আমার গুরু। আর কাহারও মন এমন অদ্বৈতবিচারপরায়ণ নয়।

এইবারে গুরূপদেশে নিদাঘ বিশেষরূপে তত্ত্ব-চিন্তা কোর্‌তে লাগ্‌লেন। শেষে সমস্ত ভূতকে তিনি আত্মার সহিত অভেদ দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর কোন ভেদজ্ঞান রইল না।

আমাদের গুরুরা শিষ্যের জ্ঞান বা ভক্তি উৎপাদনের জন্য কি যত্ন কোর্‌ছেন?*

* উদ্বোধনের ষষ্ঠ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

পুস্তক সমালোচনা

শতরূপে সারদা—সম্পাদক : স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অব্‌ কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা-৭০০০২৯। পৃষ্ঠা : ক—চ+১—৮৪৮, মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

মা—চিরকরুণাময়ী মাতৃরূপই সাধারণ মানুষের কাছে যাঁর একমাত্র পরিচয় সেই রামকৃষ্ণগতপ্রাণা সারদামণি দেবীর আপাত সরল নিরাভরণ জীবনযাপনের অন্তরালে ফল্গুস্রোতের মতো লুকিয়ে আছে এক কঠোর কঠিন তপস্যার আদর্শ, যে আদর্শ মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে। অজস্ররূপে প্রত্যহ যাঁর অনন্ত প্রকাশ তাঁর মর্ত্যজীবনলীলার বহু বিচিত্র দিক আজও আমাদের অজ্ঞাত। তাই তাঁকে জানবার জন্য একখানি ভাষ্যগ্রন্থের প্রয়োজন অপরিসীম। স্বামী-লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত 'শতরূপে সারদা' গ্রন্থখানি যেন দীর্ঘদিনের সেই অবিকল্প প্রয়োজন মিটিয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকায় সন্ন্যাসী সম্পাদক জানিয়েছেন এই ভাষ্যের প্রয়োজন এই কারণে যে, সারদাদেবী চরিত্রটি আমাদের কাছে রহস্যাবৃত। কারও স্তুতিতে তিনি বড় নন, তাঁর মহিমা স্বোপার্জিত। 'শতরূপে সারদা' সেই মহিমার কয়েকটি দিক।

প্রধানতঃ পাঁচটি অংশে এই বিশাল গ্রন্থখানিকে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমাংশে আছে 'সারদা : দর্শনে ও স্মরণে'—বারোটি সুনির্বাচিত প্রবন্ধ। শ্রীমা সারদামণি দেবীকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছিলেন 'ও আমার শক্তি'। এই কথার প্রকৃত অর্থ শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদামণি একই শক্তি, 'বাইরে মাত্র পৃথক্ সত্তা, অন্তরে তাঁরা এক অভিন্ন একাত্মা।' 'শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি' প্রবন্ধে স্বামী অপূর্বানন্দ ঠাকুর ও মায়ের দিব্যদাম্পত্যজীবনলীলার কথা বিস্তৃতভাবে জানিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলী ও পাঠকেরা যে এসব বৃত্তান্ত জানেন না, তা নয়, তবুও সমস্ত ঘটনার পারম্পর্য রক্ষিত করে সুসংহতভাবে প্রবন্ধটি রচিত হওয়ায় শক্তিরূপা সারদাদেবীর একটি রূপ এ অংশে আপনাআপনিই ধরা পড়েছে। এর পরের পর্যায়ে একদিকে তিনি জীবমাত্রের কল্যাণবিধায়িনী সঙ্ঘজননী, অপরদিকে লজ্জাপটাবৃতা করুণাময়ী জননী।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সন্তানদের চোখে শ্রীমা ছিলেন সনাতন ভারতবর্ষের প্রতিমূর্তি। স্বামীজী তাঁকে বলতেন 'জ্যান্ত দুর্গা'। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে তিনি ছিলেন শক্তিরূপা ব্রহ্মময়ী 'সাক্ষাৎ জগদম্বা'। লাটু মহারাজের দৃষ্টিতে তিনি স্বয়ং 'লক্ষ্মী'। মায়ের দুই সেবক স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ মায়ের মধ্যে দেখতেন দেহধারিণী আদ্যাশক্তিকে। 'দর্শনে ও স্মরণে'র অধ্যায়টি তাই বিশেষভাবে মনকে নাড়া দেয়। এই অংশের সঙ্গে যোগ আছে পরিশিষ্ট অংশের স্মৃতিসংকলনের। স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী নির্বাণানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ প্রমুখ সন্তানদের স্মৃতিতে শ্রীমার জীবনের দু-চারটি ছবি যেভাবে ধরা পড়েছে তার তুলনা মেলে না।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের 'মাতা ঠাকুরানী : স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের দৃষ্টিতে', এবং শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায়ের 'শ্রীমা : শ্রীরামকৃষ্ণের দশজন সন্ন্যাসী শিষ্যের দৃষ্টিতে' প্রবন্ধদ্বয়ে সারদামণির জননী ও সঙ্ঘজননীর দ্বৈতরূপ ফুটে উঠেছে। ভগিনী নিবেদিতার কাছে মা পরিণত

হয়েছিলেন মাতা মেরীতে। খ্রীষ্টীয় সংস্কারে যিনি সর্বোচ্চ মাতৃত্বের প্রতীক, সেই মানব-পুত্রের জননীর সঙ্গে নিবেদিতা সারদামাতার সাদৃশ্য দর্শন করেছেন। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'নিবেদিতার ধ্রুবমন্দির' ও বন্দিতা ভট্টাচার্যের 'শ্রীশ্রীমা ও সাধিকা চতুষ্টয়' প্রবন্ধদুটিও আপাত-ভাবে সন্ন্যাসিনীদের দৃষ্টিতে দেখা শ্রীমায়ের জীবনভাষ্য। কিন্তু গৃহী ভক্তরাও মাকে পেয়েছিলেন। মা যে সকলেরই আপন, তিনি সতেরও মা, অসতেরও মা। ছেলের গায়ে ধুলোবালি লাগলে তাকে ঝেড়ে মুছে কোলে তুলে নেবার দায়িত্বও যে মায়েরই। সারদামণি সেই কর্তব্যই পালন করেছেন। সন্তানহারা শোকার্তা জননী ইন্দুবালা যন্ত্রণা বেদনা নিবেদন করতে এসেছেন মায়ের কাছে। মায়ের সঙ্গিনী তিরস্কার করলেন, 'এসময় কি মাকে ছুঁতে আছে?' সঙ্গে সঙ্গে মা অভয় দিলেন, 'এমন দুঃখের সময় আমার কাছে আসবে না তো কোথায় যাবে?' আবার যে অক্ষম সন্তান সসঙ্কোচে মাকে বলছেন, 'মা সাধন-ভজন কিছু হয়ে উঠছে না', মা তাঁকেও আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, 'তোমাকে কিছু করতে হবে না, যা করতে হয় আমি করবো।' এই যে অহৈতুকী কৃপার মূর্ত বিগ্রহ তাঁকে সাধারণ মানুষ সবসময় জেনেছে আপন মা বলেই।

'শতরূপে সারদা'র দ্বিতীয় পর্যায়টি হল 'সারদা : রূপে রূপান্তরে'। এই পর্যায়ে আছে আটটি প্রবন্ধ—লীলাসঙ্গিনী, আনন্দরূপিণী, তপস্বিনী, লোকজননী, সহধর্মিণী, জ্ঞানদায়িনী, শ্রীরূপিণী ও সঙ্ঘজননী। একই মায়ের বিভিন্ন রূপ, আপাত-কঠিন বিষয় হলেও ভাবের গভীরতায় প্রত্যেক প্রাবন্ধিকের বক্তব্যই মর্ম-স্পর্শী। এই অধ্যায়ের 'তপস্বিনী' প্রবন্ধটি পড়ে বোঝা যায় শ্রীমার সাধনার কথা। তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই তপস্যা, নীরব স্নেহস্নিগ্ধ সেবারূপ তপস্যা দিয়ে তিনি পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার মতো উদ্ধার করেছেন তাঁর সন্তানদের। মায়ের বাড়িতে যে ভক্তরা আসতেন তাঁদের খাওয়া হয়ে গেলে মা সেই উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করতেন নিজের হাতে। ছত্রিশ জাতের এঁটো কুড়ানোর কথা শুনে বলতেন, 'সব যে আমার, ছত্রিশ কোথা?' সন্ন্যাসী সন্তান শরৎ ও জেলফেরত ডাকাত আমজাদকে মা সমান স্নেহে গ্রহণ করে বলেছেন, 'আমার শরৎ যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে।' এই অপার স্নেহই সারদামণিকে লোকজননীত্বে প্রতিষ্ঠা করেছিল।

সঙ্ঘজননী সারদাদেবীর কথা লিখেছেন সম্পাদক স্বয়ং। নিভৃতচারিণী সরলা পল্লীবধূর মতো সারদামণির জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে; তাঁর সঙ্ঘজননী হয়ে ওঠার অত্যাশ্চর্য ইতিহাস স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সযত্নে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। দেখা গেছে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে 'স্বামীজীর অভিমতও চূড়ান্ত বলে গৃহীত হচ্ছে না, যতক্ষণ না তা শ্রীশ্রীমায়ের সমর্থন লাভ করছে।' দুর্বলকে তিনি ক্ষমা করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, কিন্তু স্নেহান্ধ হয়ে দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেননি।

'শতরূপে সারদা'র তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে 'সারদা : মননে ও বিশ্লেষণে'—উনিশটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রাবন্ধিকেরা শ্রীমাকে দেখতে চেয়েছেন বিশ্লেষণের দৃষ্টি দিয়ে। মঠাধ্যক্ষ স্বামী গম্ভীরানন্দ বিশ্লেষণ করেছেন সারদাদেবীর আবির্ভাবের তাৎপর্য। 'ভোগলোলুপ ও ইহলোক-সর্বস্ব মানবসমাজকে উচ্চতর অনুভূতি-রাজ্যে উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য শ্রীভগবতীর এই যুগে মাতৃমূর্তিতে অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন ছিল, আর সেই প্রয়োজন সাধন করলেন শ্রীমা। লোকশিক্ষা দিতে এসে এই ভালবাসাহীন রুক্ষ-শুষ্ক জগৎকে

দেখালেন ভালবাসার অপরিসীম শক্তি। ভালবাসা-হীনতার অভিশাপ ঘোচাতে চেয়েছিলেন শ্রীমা একটি সহজ মন্ত্র শিখিয়ে 'কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো। কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।' শেখালেন 'সকলের ওপর সমান ভালবাসা হয় কি করে জানো? যাকে ভালবাসবে তার কাছে প্রতিদান কিছু চাইবে না'। দুজন মহিলা সাহিত্যিক বিশ্লেষণের সাহায্যে সারদামণির এক একটি ব্যাপার ব্যাখ্যা করেছেন। প্রবীণা লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী ও অপেক্ষাকৃত নবীনা লেখিকা কণা বসুমিশ্র দুজনেই দেখিয়েছেন আমাদের জটিল জীবনে শ্রীমা কিভাবে পথের দিশারী হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

'শতরূপে সারদা'র চতুর্থ পর্যায় হল 'সারদা: তত্ত্বে ও স্বরূপে'—পাঁচটি প্রবন্ধে সারদামণির স্বরূপ সন্ধান করা হয়েছে—শক্তি, সীতা, রাধা ও অন্যান্য অবতারের লীলাসঙ্গিনীদের অবতার-লীলার মধ্যে। কিন্তু স্বামী হিরন্ময়ানন্দ তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ 'স্বে মহিম্নি'র মধ্যে প্রমাণ করেছেন অন্যান্যদের তুলনায় শ্রীমার ভূমিকা অনেক বড়, বিশেষ করে ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর তিনিই মুখ্য ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে জনসাধারণকে অধ্যাত্ম পথ দেখিয়েছেন, 'অবতার-বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত এই জগতে আদ্যাশক্তির যেরূপ অবতরণ ঘটিয়াছিল—সেরূপ অবতরণ পৃথিবীতে আর কখনও ঘটে নাই।'

অধ্যাপিকা বেলারানী দে-র লেখা 'স্বয়ংবাদিনী' প্রবন্ধটিতে মাতৃস্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে তাঁর নিজের কথায়, কখনও স্বগত কখনও ভক্তের প্রশ্নের উত্তর দেবার সময়। মর্ত্যধাম ছেড়ে মহাপ্রয়াণের পূর্বলগ্নে বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীমা রেখে গেলেন অফুরন্ত ভালবাসা ও আশীর্বাদ 'যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা, আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে।'

গ্রন্থের পঞ্চম পর্যায়ে বা পরিশিষ্টে শ্রীমা সারদাদেবীর বিস্তারিত জীবনপঞ্জী সংকলিত হয়েছে, সংকলন করেছেন রেণুকা চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া আছে শ্রীমার আলোকচিত্র গ্রহণ ও ফ্রাঙ্ক ডোরাক অঙ্কিত শ্রীমার তৈলচিত্র অঙ্কনের বিবরণ। সব মিলে গ্রন্থটি এত বিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যা সামান্য পরিচয় দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। সর্বোপরি লক্ষণীয় গ্রন্থখানির অসামান্য সম্পাদনা। বিভিন্ন লেখকের রচনা, যা বিভিন্ন মানের হওয়াই স্বাভাবিক ছিল তা হয়নি, প্রতিটি প্রবন্ধ এত সুনির্বাচিত, সুসংহত যে পড়তে পড়তে মনে হয় যেন একই ব্যক্তির রচনা। স্থানাভাবে যে প্রবন্ধগুলির উল্লেখ এখানে করা গেল না তাদেরও গুণগত মান ও উৎকর্ষ কোন অংশে কম নয়। গ্রন্থটির নাম 'শতরূপে সারদা'—কিন্তু আসলে গ্রন্থটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা, শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাস ও সারদামণি দেবীর জীবনভাষ্য রচনা করা হয়েছে। যে কোন পাঠক গ্রন্থখানি পাঠ করে লাভ করবেন অপরিসীম আনন্দ ও অপার সন্তোষ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম। মুদ্রণ পারিপাট্য ত্রুটিহীন। গ্রন্থপঞ্জী, নির্দেশিকা, সহায়ক-গ্রন্থ ও টীকাটিপ্পনী গ্রন্থটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

—ডক্টর চিত্রা দেব

শ্রীশ্রীহেমচন্দ্র জীবনগাথা—সব্যসাচী। প্রকাশক—শ্রীদেবকুমার মুখোপাধ্যায়, ১, সুরথ বসু লেন, কোন্নগর—৭১২২৩৫ (১৯৮৬)। পৃষ্ঠা ৭+৯৩। মূল্য : পাঁচ টাকা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীশ্রীহেমচন্দ্র রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা আলোচ্য গ্রন্থটি সুললিত পয়ার ছন্দে রচিত। গুরু-শিষ্যের মধুর সম্পর্ক রসিক পাঠককে অভিভূত করিবে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে উল্লিখিত সংসারে জ্ঞানী ও সাত্ত্বিক ভক্তের লক্ষণগুলি শ্রীশ্রীহেমচন্দ্রের জীবনে উজ্জ্বল-ভাবে প্রকাশিত। "আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধাশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ"।—আত্মতত্ত্ব বিষয়ের বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই আশ্চর্য; কারণ সুনিপুণ আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট আত্মতত্ত্ব সুনিপুণ শ্রোতাই অনুধাবন করতে সমর্থ হয়। পরবর্তিকালে শ্রীশ্রীহেমচন্দ্রের জীবনে যে গুরুশক্তির প্রকাশ দেখা যায়, তাহা তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সুলিখিত গ্রন্থাবলীর ('গীতাতত্ত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ', 'ভগবৎ প্রসঙ্গ', 'শরণাগতের আদর্শ ও সাধনা' প্রভৃতি) মাধ্যমে পাঠক অবগত হইতে পারেন।

ঈশ্বরলাভের জন্য প্রেরণাদায়ী তত্ত্বসমৃদ্ধ বর্তমান গ্রন্থটির বহুল প্রচার আমরা কামনা করি।

—স্বামী বিকাশানন্দ

প্রাপ্তি-স্বীকার

অমৃতস্য পুত্রাঃ লেখক : শ্রীনন্দলাল ভট্টাচার্য, প্রকাশক : বি. চক্রবর্তী, ৩০/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯, পৃঃ ১৪৬, মূল্য : ষোল টাকা।

Jagajjyoti-Buddha Jayanti Annual 1985 : Published by : Ven. Prof. Dharmapal Mahathera, General Secretary, Buddha Dharmankur Sabha, 1 Buddhist Temple Street, Calcutta-700012, Price : Rs. 10.00.

স্মৃতিপুজা : লেখক : শ্রীগোকুলদাস দে, প্রকাশিকা : শ্রীমতী সমীরা দে (বেলা), ৬, শ্যামলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪, পৃঃ ৪৮, মূল্য : ৬'০০।

পুণ্যতীর্থ গঙ্গাসাগর : লেখক : শ্রীজগন্নাথ মাইতি, প্রকাশক : শ্রীঅশোককুমার মাইতি, গ্রাম+পোঃ—মনসাদ্বীপ, সাগর, ২৪ পরগনা, পৃঃ ৫০, মূল্য : তিন টাকা।

অমিয় বচন : সংকলক : শ্রীঅলোককুমার মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক : শ্রীপ্রণব মাইতি, অস্তাচল, প্রমথ ব্যানার্জী রোড, কাঁথি, পৃঃ ৪৫, দাম : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সহস্রনাম স্তোত্রম্ : সংকলক : স্বামী অপূর্বানন্দ, প্রকাশক : শ্রীরাম-কৃষ্ণ আশ্রম, ইন্দোর, মধ্যপ্রদেশ, মূল্য : তিন টাকা।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

সৌরাষ্ট্রে খরাত্রাণ : রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক রাজকোট ও সুরেন্দ্রনগর জেলার ২৫৭টি গ্রামে ৩২,৬৯০ জনের মধ্যে গম, ডাল এবং গুড় বিতরণ করা হয়। এছাড়া ২৬টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫১০৭টি পরিবারের মধ্যে প্রতিদিন ২,০০,০০০ লিটার জল সরবরাহ করা হচ্ছে। রাজকোট শহরে গো-মহিষাদির খাবারের জন্য তৃণ (কচি ও শুকনো) এবং ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে পানীয় জল বিতরিত হয়। বেশ কিছু পরিমাণ গম ও শুকনো তৃণও অর্ধেক মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

মহারাষ্ট্রে খরাত্রাণ : বম্বে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, পুণে রামকৃষ্ণ মঠের সহ-যোগিতায় পুণে এবং আহ্‌মেদনগর জেলার ১৬টি গ্রামে খরা-পীড়িত গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রতিদিন ৩০,০০০ লিটার পানীয় জল সরবরাহ করছে।

কর্ণাটকে খরাত্রাণ : খরা থেকে গো-মহিষাদি বাঁচানোর জন্য বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রমের তত্ত্বাবধানে টুমকুর জেলার পাভগাদা তালুকে ৬০০ গো-মহিষাদি-সমন্বিত একটি পশু-পালন কেন্দ্র শুরু করা হয়েছে।

অরুণাচল প্রদেশে অগ্নিত্রাণ : পশ্চিম সিয়াং জেলার কাম্বিং এলাকায় অন্তর্গত ইয়াকি টাটো গ্রামে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ১১টি পরিবারের মধ্যে আলং রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্রাদি, লণ্ঠন, কম্বল, জামা-কাপড়, বিস্কুট প্রভৃতি দেওয়া হয়।

তামিলনাড়ু অগ্নিত্রাণ : নট্টরামপল্লীর নিকটবর্তী একটি অগ্নি-বিধ্বস্ত হরিজন কলোনিতে নট্টরামপল্লী রামকৃষ্ণ মঠ কেন্দ্র কর্তৃক প্রাথমিক ত্রাণ-কার্য শুরু হয়েছে।

শ্রীলঙ্কা শরণার্থিত্রাণ : মাদ্রাজ ত্যাগ-রাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম কর্তৃক মন্দাপম্‌ ও তিরুচি শিবিরে আগত শরণার্থীদের মধ্যে পুনরায় পুরানো কাপড়, এবং দুধ বিতরণ করা হয়।

কুম্ভমেলা

গত এপ্রিল মাসে হরিদ্বারে কুম্ভ-স্নান উপলক্ষে **কনখল** রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, সঙ্ঘের ১৩৪ জন সাধু সমেত মোট ২২৫০ জন তীর্থযাত্রীর স্বচ্ছন্দে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে। শিবিরটি খোলা ছিল ৬ থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত। ৭ থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত আশ্রম-প্রাঙ্গণে ধর্মসভা ও ধর্মীয় আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল, যাতে কয়েকজন মহামণ্ডলেশ্বরও অংশগ্রহণ করেছিলেন। উৎসবের দিনগুলিতে হাসপাতালের বহির্বিভাগকে ২৪ ঘণ্টা সক্রিয় রাখা হয়েছিল এবং ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়েরও বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। এই আনন্দ মেলাটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এই আশ্রম থেকে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়।

সুবর্ণ-জয়ন্তী

গত ১১ থেকে ১৪ মে ১৯৮৬ পর্যন্ত চারদিন-ব্যাপী **কালাডি** রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কেরালার রাজ্যপাল শ্রীপি. রামচন্দ্রন এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন

করেন এবং সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী তপস্যানন্দজী। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী ১৩ ও ১৪ তারিখের অনুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করেন। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ডাক-বিভাগ এই উপলক্ষে একটি বিশেষ খাম (Special Postal Cover) প্রকাশ করে।

দ্বারোদ্ঘাটন

গত ১০ ফেব্রুআরি ১৯৮৬, **কালাডি** রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে ব্রহ্মানন্দোদয়ম্ উচ্চ বিদ্যালয়ের ত্রিতল ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী।

গত ১৯ মে ১৯৮৬, অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগেগাং আপাং **নরোত্তম নগর** রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে নবনির্মিত নার্শারী বিদ্যালয় ভবনের এবং গত ২৩ মে ১৯৮৬, অরুণাচল প্রদেশের লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর শ্রীশিব-স্বরূপ নতুন পাঠ-কক্ষের উদ্বোধন করেন।

শিলান্যাস

গত ২৬ মে ১৯৮৬, **মাদ্রাজ** ছাত্রনিবাস প্রাঙ্গণে নতুন রান্নাঘর ও পাঠাগারের শিলান্যাস করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী তপস্যানন্দজী।

প্রতিষ্ঠা দিবস

বরানগর (কলিকাতা) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১২ মে ১৯৮৬, বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম, ভজন প্রভৃতির মাধ্যমে উক্ত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। দেড়-শতাধিক ভক্ত নরনারী মধ্যাহ্নে বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

গত ১ মে ১৯৮৬, **বাগবাজার** (কলিকাতা) বলরাম মন্দিরে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস পূজার্চনা, সঙ্গীত, আলোচনাসভা ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়। সভাপতি স্বামী আত্মস্থানন্দ, প্রধান অতিথি স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এবং ডক্টর অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ শিবশঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখ বক্তাগণ তাঁদের বক্তৃতায় এই দিনের তাৎপর্য এবং বর্তমান যুগে সমাজে ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবধারার উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতি-আলেখ্য পরিবেশনের পর উৎসবের সমাপ্তি হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

গত ২৩ মে ১৯৮৬, বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী অমরানন্দ বুদ্ধদেবের জীবনী ও উপদেশ আলোচনা করেন। গত ৬ জুন ১৯৮৬, রাত্রিতে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে ফল-হারিণী কালীপূজা এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনাঃ সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত; স্বামী বিকাশা-নন্দ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

দেহত্যাগ

স্বামী মুক্তিদানন্দ (শ্যামল মহারাজ) গত ৪ মে ১৯৮৬, বিকাল ৪-৩০ মিনিটে হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার জন্য মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আগের দিন বুকে যন্ত্রণা এবং বাঁ হাত নাড়তে-চাড়তে অসুবিধা বোধ করলেও তিনি যথারীতি অফিসে আসেন। দুপুরে আহারের সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

স্বামী মুক্তিদানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নতুন দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নিজের গুরুর কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যোগদানের কেন্দ্র ছাড়াও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শাখাকেন্দ্র নরেন্দ্রপুর, দেওঘর ও আসানসোলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে তিনি কর্মীরূপে ছিলেন। গত ৯ বৎসর যাবৎ তিনি আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ করছিলেন। প্রাত্যহিক জীবনে তিনি কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত ছিলেন। স্থানীয় লোকদের কাছে তিনি ছিলেন অতি পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

তাঁর দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে শান্তিলাভ করুক—এই প্রার্থনা।

বিবিধ সংবাদ

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাব প্রচার পরিষদের সভা

গত ১৬, ১৭ ও ১৮ মে ১৯৮৬, তেজপুর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে পূজা, সঙ্গীত, আলোচনা প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাব প্রচার পরিষদের সভা হয়। সভায় স্বামী গহনানন্দজী সভাপতিত্ব করেন। তৃতীয় দিনে সকালে প্রায় ৫০০০ ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতিসহ, ভজন-সঙ্গীত গেয়ে শহর পরিক্রমা করেন। বিকালে বিদ্যালয়ের ২০০ জন ছেলে-মেয়ের মধ্যে আবৃত্তি, অঙ্কন, কুইজ প্রতিযোগিতা হয়। কলিকাতা করুণাময়ী আশ্রমের লীলা-গীতির পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

লক্ষ্মীনিবাসে সাধু-সম্মেলন

গত ১৭ এপ্রিল ১৯৮৬, **বাগবাজার** (কলিকাতা) 'লক্ষ্মীনিবাসে' শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বাটীতে অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের নিজহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পটপূজার পঁচাত্তর বৎসর পূর্তি-উৎসব পালিত হয়। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে দত্ত পরিবারে অন্নপূর্ণাপূজা শুরু হয়। উৎসবে সঙ্ঘের ৪২জন সাধু ও বহু ভক্তের সমাগম হয়। এই উপলক্ষে দত্ত পরিবারের সঙ্গে সঙ্ঘের সম্পর্কের ইতিহাস-সম্বলিত একটি স্মরণিকা পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্ষদদের অনেকেই বহুবার এবং শ্রীশ্রীমা ১৯০৪, ১৯০৯ এবং ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে এই গৃহে শুভাগমন করেছিলেন।

মন্দির প্রতিষ্ঠা

গত ২২ মার্চ ১৯৮৬, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ ডিব্রুগড় (আসাম) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতির নতুন মন্দিরের উদ্বোধন করেন। ধর্মসভা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়ে এই প্রতিষ্ঠা-উৎসব চলে ২৮ মার্চ ১৯৮৬ পর্যন্ত।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **বীণাপাণি কুমার** গত ২১ ফেব্রুআরি ১৯৮৬, ৮৩ বছর বয়সে মরদেহ ত্যাগ করেন। তাঁর স্বামীও ছিলেন পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। শ্রীশ্রীমা ও মঠের বহু প্রাচীন সাধুর পূতসঙ্গ লাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ডাঃ ধীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত গত ১৮ মার্চ ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ৬৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সোনামুড়া (ত্রিপুরা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠ-চক্রের গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে আজীবন তিনি তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী হিসাবে ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে তিনি শৌর্যচক্র পেয়েছিলেন।

এঁদের দেহনির্মুক্ত আত্মার শান্তিলাভ হোক—এই আমাদের প্রার্থনা।

উদ্বোধন : ভাদ্র ১৩৯৩

সূচীপত্র

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংকলিত
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ ৩'৫০

স্বামী ভূতেশানন্দ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ (চার ভাগে)
১ম ভাগ ১৫'০০, ২য় ভাগ ১৫'০০, ৩য় ভাগ ১৫'০০
৪র্থ ভাগ ১৫'০০

স্বামী নির্বেদানন্দ
(অনুবাদ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)
শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ ১২'৫০

স্বামী প্রভানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা ১৫'০০

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা (দুই ভাগে)
১ম ভাগ ১৫'০০, ২য় ভাগ ১৫'০০

স্বামী গম্ভীরানন্দ
শ্রীমা সারদাদেবী ২৭'০০

স্বামী সারদেশানন্দ
শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা ১০'০০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
শিশুদের মা সারদাদেবী (সচিত্র) ৭'০০

স্বামী বুধানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ বিভাসিতা মা সারদা ৭'০০

স্বামী ঈশানানন্দ
মাতৃসান্নিধ্যে ৯'৫০

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

স্বামী গম্ভীরানন্দ
যুগনায়ক বিবেকানন্দ (তিন খণ্ডে)
১ম খণ্ড ৩০'০০, ২য় খণ্ড ৩০'০০
৩য় খণ্ড ৩০'০০

ভগিনী নিবেদিতা (অনুবাদ : স্বামী মাধবানন্দ)
স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি ১৬'০০

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ১০'০০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
স্বামী বিবেকানন্দ ৭'০০
শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র) ৫'৫০

স্বামী নিরাময়ানন্দ
ছোটদের বিবেকানন্দ ২'৪০

শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য
স্বামী বিবেকানন্দ ২'৫০

স্বামী বুধানন্দ
ওঠ, জাগো, এগিয়ে চল ৪'২৫
ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর ১'৫০
স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা ৩'৫০

ভগিনী নিবেদিতা
স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ৫'০০

প্রমথনাথ বসু
স্বামী বিবেকানন্দ
১ম খণ্ড ২০'০০, ২য় খণ্ড ২০'

বিবিধ

মহাপুরুষজীর পত্রাবলী ৭'৫০
স্বামী তুরীয়ানন্দ ১৫'০০
স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী ৪'৫০
আরতি-স্তব ও রামনাম ১'৫০
ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ৬'০০

স্বামী গম্ভীরানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা (দুই ভাগে)
১ম ভাগ ২৫'০০, ২য় ভাগ ২৫'০০

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ
ভারতের সাধনা ১৫'০০

স্বামী সারদানন্দ
ভারতে শক্তিপূজা ৪'০০

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ
শ্রীরামানুজ চরিত ১৭'৫০

স্বামী প্রেমেশানন্দ
রামানুজ চরিত ৩'৫০

ভগিনী নিবেদিতা
শিব ও বুদ্ধ ৩'৭৫

স্বামী অপূর্বানন্দ
আচার্য শঙ্কর ৮'০০
শিবানন্দ-বাণী (সংকলিত)
১ম ভাগ ৯'০০, ২য় ভাগ ৫'০০

স্বামী সুন্দরানন্দ
যোগ চতুষ্টয় ৭'৫০

শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগোদ্যান ২০·০০
গোপালের মা ২·২৫
গীতাতত্ত্ব ৭·০০
পত্রমালা ৪·০০
বিবিধ-প্রসঙ্গ ৩·৫০
স্বামী অখণ্ডানন্দ
তিব্বতের পথে হিমালয়ে ৬·৫০
স্মৃতি-কথা ১০·০০
শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়
লাটুমহারাজের স্মৃতিকথা ২০·০০
স্বামী সিদ্ধানন্দ সংগৃহীত
সৎকথা ১০·০০
অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ ৭·৫০
স্বামী বিরজানন্দ
পরমার্থ-প্রসঙ্গ ৭·০০
স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
মহাভারতের গল্প ৪·৫০
স্বামী দেবানন্দ
ব্রহ্মানন্দ স্মৃতিকণা ১·৭৫
স্বামী বামদেবানন্দ
সাধক রামপ্রসাদ ১০·০০
স্বামী পরমানন্দ
প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা ২৪·০০
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
সাধু নাগমহাশয় ৬·০০
স্বামী নিরাময়ানন্দ-সম্পাদিত
স্বামী শুদ্ধানন্দ : জীবনী ও রচনা ১৫·০০

শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য
শঙ্কর-চরিত ৩·০০
দশাবতার চরিত ৫·০০
স্বামী দিব্যাত্মানন্দ
দিব্যপ্রসঙ্গে ৬·৩৫
স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ
পুণ্যস্মৃতি ৩·০০
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ
অতীতের স্মৃতি ২০·০০
বন্দি তোমায় ১০·০০
স্বামী নরোত্তমানন্দ
রাজা মহারাজ ৭·০০
স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
ভগবানলাভের পথ ২·০০
মাতৃভূমির প্রতি আমাদের কর্তব্য ৩·০০
স্বামী প্রভানন্দ
ব্রহ্মানন্দচরিত ৩০·০০
স্বামী অন্নদানন্দ
স্বামী অখণ্ডানন্দ ১৬·০০
স্বামী নিরাময়ানন্দ
স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয় ৩·৩০
স্বামী ধ্যানানন্দ
ধ্যান ৫·০০
স্বামী তেজসানন্দ
ভগিনী নিবেদিতা ৪·৪০
স্বামী অপূর্বানন্দ
মহাপুরুষ শিবানন্দ ১৫·০০

সংস্কৃত

শ্রীরামকৃষ্ণপূজাপদ্ধতি ৫·০০
স্বামী গম্ভীরানন্দ-অনূদিত ও সম্পাদিত
উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (তিন ভাগে)
১ম ভাগ ২৫·০০, ২য় ভাগ ২৫·০০,
৩য় ভাগ ২৫·০০
স্তবকুসুমাঞ্জলি ২৫·০০
স্বামী রঘুবরানন্দ-অনূদিত ও সম্পাদিত
গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা ৩·০০
স্বামী ধীরেশানন্দ-অনূদিত ও সম্পাদিত
যোগবাসিষ্ঠসারঃ ১২·৫০
বৈরাগ্যশতকম্ ১১·০০
বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা ৯·৫০

স্বামী জগদানন্দ অনূদিত
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ ১৭·৫০
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত ও সম্পাদিত
শ্রীশ্রীচণ্ডী ১৪·০০
গীতা ১৫·৫০
স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত
বেদান্তদর্শন
১ম অধ্যায়ের ১ম খণ্ড ১৪·০০; ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ খণ্ড ৩·০০ ; ৩য় অধ্যায় ১৩·০০ ; ৪র্থ অধ্যায় ৯·০০
স্বামী প্রভবানন্দ
নারদীয় ভক্তিসূত্র ১১·০০

৮৮তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ভাদ্র, ১৩৯৩

দিব্য বাণী

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেশী শাস্ত্র পড়াতে আরও হানি হয়।

"শাস্ত্রের সার জেনে নিতে হয়। তার পর আর গ্রন্থের কি দরকার।

"সারটুকু জেনে ডুব মারতে হয়—ঈশ্বর লাভের জন্য।

"আমায় মা জানিয়ে দিয়েছেন বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। গীতার সার, দশবার গীতা বল্লে যা হয়, অর্থাৎ 'ত্যাগী, ত্যাগী'।"

... ...

"গীতার সার মানে—হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে পাবার জন্য সাধন কর।"

নবদ্বীপ—ত্যাগ করবার মন কই হচ্ছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—"তোমাদের সংসার ত্যাগ করলে চলবে না। তিনিই লোক-শিক্ষার জন্য তোমাদের সংসারে রেখেছেন—তুমি হাজার মনে করো, ত্যাগ করতে পারবে না—তিনি এমন প্রকৃতি তোমায় দিয়েছেন যে তোমার সংসারের কাজই করতে হবে।"

"শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন—তুমি যুদ্ধ করবে না, কি বলছো?—তুমি ইচ্ছা করলেই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে পার্‌বে না। তোমার প্রকৃতিতে তোমায় যুদ্ধ করাবে।"

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।৬।২]

কথাপ্রসঙ্গে

'গীতা সুগীতা কর্তব্যা'

গীতা-প্রশস্তিতে আছে : গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মবিনিঃসৃতা॥—গীতা, যাহা সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম হইতে বিনির্গত হইয়াছে, তাহা উত্তমরূপে অধ্যয়ন করা কর্তব্য। অন্য বহু শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রয়োজন কি? শ্রীরামকৃষ্ণও বলিতেন 'গীতা সব শাস্ত্রের সার।' (কথামৃত ৩।১৫।২)। তিনি আরও বলতেন : 'সারটুকু জেনে ডুব মারতে হয়—ঈশ্বর লাভের জন্য!' (কথামৃত, ৪।৬।২)

এই সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির এক অমূল্য সম্পদ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় উত্তম গুরুর এবং অর্জুনের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন সুযোগ্য শিষ্যের—আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা—একত্র মিলন হইয়াছিল বলিয়াই গীতারূপ অমূল্য এই তত্ত্বোপদেশ আমরা পাইয়াছি।

এখানে প্রশ্ন আসে গীতা যদি কেবলমাত্র অর্জুনের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন সুযোগ্য শিষ্যের জন্যই বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষের নিকট গীতোক্ত উপদেশের কী প্রয়োজন? গীতা-আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দজীও এই প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়া তাহার একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় : 'আমরা বলতে পারি, গীতা কেবল অর্জুনের জন্য বলা হয়েছিল। তাতে আমাদের কি হবে? আমরা তো আর যুদ্ধে যাচ্ছি না, অথবা মহাবীর অর্জুনের জীবনের সঙ্গে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র লোকের জীবনের কোন অংশের সাদৃশ্যও নেই। অতএব মহৎ অধিকারীর উদ্দেশ্যে উপদিষ্ট শাস্ত্র আমাদের কিরূপে লাগবে? উত্তরে বলা যেতে পারে, অর্জুন আমাদের চাইতে শতগুণে বড় হলেও মানুষ ছিলেন। আমরাও মানুষ। তাঁর জীবনে যেমন মোহ কখন কখন হয়েছিল, আমাদেরও তেমন মোহ প্রতিপদে হয়, আমাদেরও তাঁর মতো সত্যের জন্যে নানা বিঘ্নবাধার বিপক্ষে দাঁড়াতে হয়। আমাদেরও তাঁর মতো ভিতরে বাইরে জীবন-সংগ্রাম চলছে। তাই আমরাও গীতা পড়লে শিক্ষা পাই, জীবন-সমস্যার এক অপূর্ব সমাধান পাই। দেখা গিয়েছে, কত পাপী-তাপীর গীতা পাঠ করে অনুতাপের অশ্রু পড়েছে এবং উচ্চ-দিকে জীবনপ্রবাহ চালিত হয়েছে।' (গীতাতত্ত্ব, পৃঃ ৬-৭)

গীতা শ্রীকৃষ্ণের রচনা বিশেষ নয়, আত্মযোগ-সমাহিত অবস্থায় উচ্চারিত তাঁহার বাণী। সমাধিস্থ অবস্থা হইতে বাহ্য জগতে লইয়া আসা ভগবানের কথা। অর্জুনকে ভগবান সাক্ষাৎ অনুভূতির কথাই বলিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর এক সময়ে অর্জুন গীতার উপদেশ পুনরায় শ্রবণ করিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রারম্ভকালে তুমি ছিলে বিষাদগ্রস্ত, আর আমি ছিলাম আত্ম-সমাহিত, পরমাত্মার সহিত যুক্ত। তাই ঐ সময় গীতার উপদেশ আমার মুখ হইতে বাহির

হইয়াছিল। এখন তোমার এবং আমার কাহারও সেই অবস্থা নাই। সুতরাং পুনরায় আমার পক্ষে সেই উপদেশ দেওয়া এখন আর সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণের এই কথা হইতেই বোঝা যায় গীতার প্রত্যেকটি কথাই অনুভূতির, সাক্ষাৎ দর্শনের কথা।

গীতার পটভূমিও খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রথমে লক্ষ্য করা যায় গীতার উদ্ভবস্থল। গীতার উদ্ভবস্থল কোন শান্ত নির্জন তপোবন বা গিরিগুহা নয়, কোন ধর্মসভা-সমিতিও নয়, যেখান হইতে হাঁকডাক করিয়া গীতার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। গীতার উদ্ভবস্থল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্র। বাস্তব পরিবেশে দাঁড়াইয়া গুরু শিষ্যের সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। তাহা হইতে ইহাই সুস্পষ্ট হয় যে, ধর্ম-জীবন এবং ব্যবহারিক বাস্তব-জীবন—দুইটি পৃথক বস্তু নয়, পরন্তু ধর্ম বাস্তব-জীবনকে পরিপুষ্ট ও পরিপূর্ণ করে। দ্বিতীয়ত, গীতার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে দুই সেনাদলের মধ্যস্থলে নিরপেক্ষ ভূমিতে দাঁড়াইয়া। তাহাতে কি বোঝা যায়? বোঝা যায়, মনকে রাগদ্বেষ, অহংতা ও মমতাশূন্য করিয়া নিরপেক্ষ করিতে পারিলে তবেই তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করা সার্থক হইবে। চিত্তে সর্বপ্রকার সাংসারিক সম্বন্ধ ও ব্যবহারের প্রতি উদাসীন ভাব আনয়ন করিতে না পারিলে অন্তরে ধর্মভাব বিকশিত হয় না, আত্মস্ফুরণ ঘটে না। অর্জুন যখন আসক্তি-রহিত হইয়া নিরপেক্ষ হইয়াছিলেন, তখনই গীতাতত্ত্ব তাঁহার চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাঁহার মোহ ধীরে ধীরে কাটিয়া গিয়া আত্মস্মৃতি জাগরিত হইয়াছিল। অপরপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ যোগসমাহিত চিত্তে আসঙ্গ নিরপেক্ষ আত্মস্থ হইয়া গীতার উপদেশ করিয়াছিলেন। গীতার সবই মহত্বপূর্ণ।

যুদ্ধকামী বিবদমান দুই পক্ষ—কুরু ও পাণ্ডব পক্ষ সামনাসামনি দণ্ডায়মান। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার আর দেরি নাই। সকলেই শুধু সঙ্কেতের অপেক্ষায় আছেন। ঠিক সেই সময় অর্জুন তাঁহার রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন: 'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত'—উভয়-পক্ষীয় সেনাদলের মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন করুন। অর্জুনের এই কথা হইতেই বোঝা যায়, যখন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন, তখন যুদ্ধে তাঁহার কোনরূপ অনাস্থা তো ছিলই না, বরং সেনাপতিসুলভ শৌর্যে, বীর্যে ও তেজে ভরপুর হইয়াই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। উভয়পক্ষীয় সেনাদলের মধ্যস্থলে রথস্থাপন করিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার প্রতিপক্ষে কোন কোন যোদ্ধা আছেন, তাঁহার সমকক্ষ যোদ্ধাই বা কাহারা—যুদ্ধের আগেই তাঁহাদের একবার নিরীক্ষণ করিয়া লওয়া। অর্জুনের ইচ্ছানুযায়ী যথা-নির্দিষ্ট স্থানে রথ স্থাপন করা হইলে অর্জুন দেখিলেন তাঁহার পিতৃতুল্য আচার্যগণ, পিতৃব্য, মাতুল ও ভ্রাতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব—সকলেই প্রতিপক্ষরূপে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। এই দৃশ্য দেখিয়া অর্জুনের মনে বিপরীত ভাবের উদয় হইল। তিনি বলিলেন: প্রতিপক্ষরূপে আমার সম্মুখে যাঁহারা দণ্ডায়মান তাঁহারা অনেকেই আমার পিতৃতুল্য গুরুজন, অন্যরাও আমার আত্মীয়-স্বজন; বন্ধু-বান্ধব। তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাঁহাদিগকে বধ করিয়া আমি রাজ্যসুখ ভোগ করিব? না, তাহা কখনও হইতে পারে না। আমি যুদ্ধে জয়লাভও চাহি না এবং রাজ্যসুখ উপভোগও কামনা করি না। তৎপরিবর্তে বরং ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিব, তথাপি এই যুদ্ধ করিয়া পাপের ভাগী হইতে পারিব না। (গীতা, ১।৩১-৩৫ এবং ২।৫)

আপাতদৃষ্টিতে অর্জুনের কথাগুলি খুবই যুক্তি-যুক্ত বলিয়া মনে হয়। গুরুজন, আত্মীয়-স্বজন

ও বন্ধু-বান্ধবকে বধ করিয়া কে-ই বা রাজ্যসুখ উপভোগ করিতে চায়, আর তাহা করিবার সার্থকতাই বা কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু অর্জুনের এই যুক্তি মানিয়া লইতে পারিলেন না। পরন্তু যুদ্ধ করিবার জন্যই তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। বলিলেন: 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'—তোমার এই ক্লীবভাব ত্যাগ কর, এইরূপ কাপুরুষতা তোমার শোভা পায় না। হে শত্রুতাপন, হৃদয়ের এই দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ উত্থিত হও।

'এইস্থানে অর্জুনকে ভগবান যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিতেছেন কেন? অর্জুনের বাস্তবিক সত্বগুণ উদ্রিক্ত হইয়া যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি হয় নাই; তমোগুণ হইতেই যুদ্ধে অনিচ্ছা হইয়াছিল। সত্বগুণী ব্যক্তিদের স্বভাব এই যে, তাঁহারা অন্য সময়ে যেরূপ শান্ত, বিপদের সময়ও সেরূপ বীর। অর্জুনের ভয় আসিয়াছিল। আর তাঁহার ভিতরে যে যুদ্ধ প্রবৃত্তি ছিল, তাহার প্রমাণ এই—তিনি যুদ্ধ করিতেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। সচরাচর আমাদের জীবনেও এইরূপ দেখা যায়।' (বাণী ও রচনা, ৫।২৫২) 'পৃথিবীতে আমাদের সকলেরই জীবন এক বিরামহীন সংগ্রাম। অনেক সময় আমরা আমাদের দুর্বলতা ও কাপুরুষতাকে ক্ষমা ও ত্যাগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাই। কিন্তু ভিক্ষুকের ত্যাগে কোন কৃতিত্ব নাই। আঘাত করিতে সমর্থ কোন মানুষ যদি সহিয়া যায়, তবে তাহাতে কৃতিত্ব আছে; যাহার কিছু আছে, সে যদি ত্যাগ করে, তবে তাহাতে মহত্ব আছে। আমরা তো জানি আমাদের জীবনেই কতবার আমরা অলসতা ও ভীরুতার জন্য সংগ্রাম ত্যাগ করিয়াছি। আর আমরা সাহসী—এই মিথ্যা বিশ্বাসে নিজেদের মনকে সম্মোহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।' (বাণী ও রচনা, ৮।৪৩০) অর্জুনের ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন যে হৃদয়দৌর্বল্য হইতেই অর্জুন বিচার-বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়াছেন; কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। অর্জুন যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন ইহা তাঁহার পরস্পর বিরোধী দুইটি উক্তি হইতেই সুস্পষ্ট। প্রথমে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন: শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ (গীতা, ২।৭)—আমি আপনার শরণাগত শিষ্য, আমাকে আমার কর্তব্য নির্দেশ করুন। কিন্তু পরেই আবার বলিতেছেন: ন যোৎস্যে (গীতা, ২।৯)—আমি যুদ্ধ করিব না। যুদ্ধ না করিবার সিদ্ধান্ত নিজেই গ্রহণ করিয়া বসিলেন। আর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িবার জন্য বুঝিতে পারিতেছিলেন না যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, না করা বরং কাপুরুষতা, অধর্ম। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে স্বধর্ম পালন করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিতেছেন।

অর্জুন এখানে শোকগ্রস্ত। ভগবান তাঁহাকে এই শোকাকুল অবস্থা হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় বলিয়া দিতেছেন। বলিতেছেন: যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নয়, তাহাদের জন্য তুমি শোক করিতেছ, অথচ জ্ঞানীর মতো, প্রাজ্ঞের মতো কথা বলিতেছ। জ্ঞানবান মৃত বা জীবিত—কাহারও জন্য শোক করেন না (গীতা ২।১১) কারণ তাঁহারা জানেন, জাত ব্যক্তির মৃত্যু এবং স্বীয় কর্মানুসারে মৃত ব্যক্তির জন্ম অবশ্যম্ভাবী। সেই হেতু, এই অপরিহার্য বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নয়।

তারপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্মযোগের উপদেশ দিলেন। বলিলেন: ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ। কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ (গীতা, ৩।৫)—কর্ম না করিয়া কেহই ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না। সকলেই মায়াজাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের

বশীভূত হইয়া কর্ম করিতে বাধ্য হয়। কাজেই তুমি যে বলিতেছ কর্ম করিব না, তাহাও সম্ভব নয়। তোমার সংস্কারই তোমাকে কর্মে নিযুক্ত করিবে।

সংসার কর্মক্ষেত্র। এই কর্মক্ষেত্রে থাকিয়া কিভাবে কর্ম করিলে তাহা বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তির হেতু হইবে, ভগবান তাহাই অর্জুনকে বলিতেছেন। সংসাররূপ যুদ্ধক্ষেত্রে তুমুল কর্মোদ্যমের মধ্যেও, সংসারের যাবতীয় কর্তব্য পালন করিয়াও মনকে সংসারের উর্ধ্বে রাখিতে পারাই অনাসক্তিযোগ। এই অনাসক্তি-যোগের নামই কর্মযোগ। অনাসক্তিযোগ অভ্যাসের ফলে, শত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও মানুষ অবিচলিত থাকিতে পারেন, সাংসারিক কাজকর্ম করিয়াও অন্তরে নিঃস্পৃহ, শান্ত ও সমাহিত থাকিতে পারেন। কর্মে সিদ্ধি-অসিদ্ধিজনিত কোন সুখ-দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আরও কথা, কর্ম ও উপাসনা একসঙ্গে অনুষ্ঠেয়। তাই ভগবান অর্জুনকে বলিতেছেন : তস্মাৎ সর্বেষু-কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ। (গীতা, ৮।৭) অতএব হে অর্জুন তুমি সর্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং নিজ কর্তব্য অনলসভাবে পালন করিয়া যাও। আরও বলিতেছেন : যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ (গীতা, ৯।২৭)—হে কৌন্তেয়, যাহা অনুষ্ঠান কর, যাহা আহার কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর এবং যে তপস্যা কর—সেই সমস্তই আমাকে অর্পণ করিবে। অনুরূপভাবে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগ সম্বন্ধেও উপদেশ দিলেন; এবং ধাপে ধাপে উপদেশ দিতে দিতে সর্বশেষে বলিলেন : সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (গীতা, ১৮।৬৬)—সকল ধর্মাধর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর, আমার স্মরণ লও, আমি আমার স্বরূপ প্রকটিত করিয়া ধর্মাধর্মরূপ সর্বপ্রকার পাপ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব।

গীতোক্ত উপদেশ শ্রবণের পর অর্জুন বলিয়া-ছিলেন : নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়া-চ্যুত। স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ (গীতা, ১৮।৭৩)—হে অচ্যুত, আপনার কৃপায় আমার অজ্ঞানজনিত মোহ নষ্ট হইয়াছে, আমার আত্মস্মৃতি জাগ্রত হইয়াছে। এখন আমি ছিন্ন-সংশয়। আমি আপনার উপদেশ মতো চলিব, নিঃসংশয়চিত্তে নিজ কর্তব্য করিয়া যাইব। কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে অর্জুন যে সন্দেহমুক্ত হইয়াছিলেন, গীতোক্ত উপদেশ শ্রবণের পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগদানই তাহার প্রমাণ।

গীতা অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইলেও আমাদের সকলের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ ইহা বলিয়াছিলেন; আমাদের সকলেরই সমস্যার সমাধানকল্পে ইহা উক্ত হইয়াছে। সংসারচক্রে নিষ্পেষিত সাধারণ মানুষ সর্বদাই শোকে মুহ্যমান, দুঃখে ক্রন্দনরত। অর্জুনের মতো তাহাদেরও জীবনে বহুবার হৃদয়-দৌর্বল্যের সম্মুখীন হইতে হয়, শোকগ্রস্ত হইতে হয়। এই শোক-দুঃখপূর্ণ ও কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে সন্দেহাকুল ঘূর্ণাবর্তরূপ সংসারনদী পাড়ি দিতে হইলে গীতারূপ তরণীই উৎকৃষ্ট যান। এই যানারোহণে অর্জুন যেমন এই সংসার-নদী অনায়াসে পাড়ি দিয়াছিলেন তেমনি সাধারণ মানুষও যাহারা এই সংসারনদী পাড়ি দিতে ইচ্ছুক, তাহারাও অনায়াসে তাহা পারিবে। সেইহেতু সংসার-শোক নিবৃত্তির জন্য গীতোপদেশ অনুষ্ঠান অপরিহার্য।

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীহরিঃ শরণম্

৺ কাশী

১৭।৭।২০

প্রিয় নির্মল,

তোমার ১৩ই তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। মতিরাম সেদিন আমাকে একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিল। তাহাতে তাহার ভাব কিছু ভাল হইয়াছে বুঝিয়াছিলাম। এবার তাহাকে আমি উত্তরও দিয়াছি। শুধু Struggle করলেই শান্তি হয় না। Surrender and submit করিতে হয়। প্রভুর কৃপায় ক্রমে সব ঠিক হইয়া যাইবে, ভরতও কৈলাস যাত্রা করিয়াছে? তোমাদের অসুবিধা হইবে না ত? তোমরা সকলে ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। Kapadia ও Reps কে আমার সাদর-সম্ভাসনাদি জানাইবে। Complete Works এর 6th part তৈয়ার হইতেছে জানিয়া প্রীতি লাভ করিলাম। সাধন ভজন সর্ব্বদা চলা চাই। অবশ্য সময় করিয়া করাও আবশ্যক। কিন্তু উহার ভাব নিরন্তর করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। প্রথমে Theory Practice আলাদা কিন্তু পরে এক হইয়া যায় Theoryই Practice হইয়া বসে। তাহা হইলেই উহা Easy going হইয়া পড়ে। ইহারই নাম সহজাবস্থা। যত্ন করে আর আনতে হয় না। আপনা হইতেই সর্ব্বদা লেগে থাকে। নিজের মনকে সাধু করতে না পারলে বড়ই মুস্কিল বটে। অব্যাকৃত ভজনে মন সাধু হয়ে যায় ও মন আর বাহিরের সাধুসঙ্গের তত অভাব বোধ হয় না। সর্ব্বদা ভগবানের সঙ্গ হয় কিনা? আমার শরীর সেই পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে তবে গরমের দরুন যে অতিরিক্ত কষ্ট হচ্ছিল বৃষ্টি হওয়ায় সেটা অনেকটা কমেছে। বর্ষা খুব না হলেও এখানে কিছু হয়েছে। আরও হবে বলে আশাও হচ্ছে। জোঁকের উপদ্রব তোমাদের ওখানে এক মহা আপদ। ফল বেশ ভালরূপ হইয়াছে জানিয়া আনন্দ হচ্ছে। মহারাজ কি সত্যেনকে কায ছাড়িয়া দিয়া ভজন করিতে বলিয়াছেন না কি? তাহলে ত তোমাদের কাযের খুব ক্ষতি হবে। তুমি মহারাজকে এ সম্বন্ধে লিখে দেখো। কাযের মধ্যেই যথাসাধ্য সাধন ভজন করিলেই ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। আর সত্যেন পুরানো লোক। উহার দ্বারা ইহা অসম্ভব হবে না। এখানকার সকলে ভাল আছে। তোমরা আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীতুরীয়ানন্দ

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[প্রাপক : শ্রীসুকুমার সেনগুপ্ত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
সারগাছি, মহুলা পোঃ আঃ
জেলা—মুর্শিদাবাদ
তারিখ—৩১শে শ্রাবণ, ১৩৪১

কল্যাণবরেষু—

তোমার ৭।৮।৩৪ তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। আমার শরীর ভাল নয় বলিয়া প্রত্যুত্তর দিতে কয়েক দিন বিলম্ব হইল তজ্জন্য দুঃখিত হইও না।

আমি আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমার সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ হউক। তুমি কোন ভয় পাইও না। এই রোগ-শোক-জরা-ব্যাধি-সমাকুল সংসারে নানা প্রকার দুঃখ ও ভয় আছে বটে কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহারই মধ্যে শ্রীভগবানের চরণ আশ্রয় করিয়া সৎসঙ্গে আনন্দে জীবন অতিবাহিত করেন। তোমাকে যেমন বলিয়াছি খুব আন্তরিক শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম নিয়মনিষ্ঠাপূর্ব্বক করিয়া যাও এবং তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা করিও। তিনি দয়াময়, তোমাকে শান্তি দিবেন। তোমার কিছুই করিতে হইবে না। ·· ··· ··· তুমি ক্ষুণ্ণ হইও না। এখন এই ভাবেই চলুক। মাঝে২ সাধুসঙ্গ খুব দরকার। সুবিধা পাইলে এখানে আসিয়া মাঝে ২ থাকিবে। দীক্ষার জন্য এখন ব্যস্ত হইও না আমার শরীর সুস্থ হউক, তার পর ঠাকুরের ইচ্ছায় সব হইয়া যাইবে। মাঝে ২ আমার নিকট পত্রাদি দিও। অধিক কি লিখিব। আশা করি তুমি ভাল আছ। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন

ইতি
শুভানুধ্যায়ী
অখণ্ডানন্দ

পুনশ্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা

পড়িয়াছ ত? বিবাহ করিলেও ২।১টী ছেলপুলে হওয়ার পর স্বামীস্ত্রী ভাইভগ্নির মত থাকিবে। যে ভগবানের শরণাগত হয় তাহাকে সর্ব্বাবস্থায় তিনি রক্ষা করেন। ভয় কি?

শশী মহারাজ

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

পরবর্তিকালে শশী মহারাজ নামে পরিচিত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী জন্মেছিলেন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং মহাসমাধিলাভ করেছিলেন ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময়ে। তিনি এই পৃথিবীতে আমাদের মধ্যে বাস করেছিলেন মাত্র ৪৮ কি ৪৯ বছর। কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যে তিনি এমন সুগভীর ছাপ রেখে গেছেন, এমন কিছু করে গেছেন যা চিরস্থায়ী এবং চিরন্তন হয়ে থাকবে। জনসেবায় সমর্পিত তাঁর মহৎ জীবন দক্ষিণ ভারতে যে প্রভাব বিস্তার করেছে তার সুদূরপ্রসারী ফলশ্রুতি আজও সমানভাবে অনুভূত।

তাঁর ঐকান্তিক গুরুভক্তি, আদর্শের প্রতি আনুগত্য, ঈশ্বরে অনুরাগ এবং সর্বজনের প্রতি সেবার ভাব তাঁকে জনপ্রিয় করেছিল। যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে তাঁদের আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বিদ্বান, একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং সুসংস্কৃতজ্ঞ। শাস্ত্রের উপর ছিল তাঁর অসাধারণ অধিকার। আবার অন্যদিকে তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল এবং হৃদয়বান প্রেমনিষ্ঠ পুরুষ। এই সব কারণেই অনেক মুমুক্ষু ব্যক্তি সান্ত্বনা ও মহৎশান্তির প্রত্যাশায় তাঁর কাছে চলে আসতেন।

শশী মহারাজ কলেজে পাঠ্যাবস্থায় প্রতিদিন প্রার্থনার পর বাইবেল বা চৈতন্যচরিতামৃত নিয়মিত পাঠ করতেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা ও প্রার্থনাসভায় যোগদান করতেন। এ থেকেই তাঁর অধ্যাত্ম-বিকাশ এবং এই জীবনেই ভগবানলাভ করার জন্য আকুলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং এর ফলেই তিনি শেষ পর্যন্ত ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের শেষ তিন বছর, বিশেষ করে তাঁর কাশীপুরে বাসকালে গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় আত্মনিবেদন করেছিলেন। তিনি কলেজের লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কাশীপুরে চলে আসেন এবং দিবারাত্র গুরুদেবের সেবাশুশ্রূষায় যুক্ত হন। যখনই প্রয়োজন তখনই শ্রীরামকৃষ্ণকে সেবা করার জন্য তিনি সদা প্রস্তুত থাকতেন। গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের পরও তিনি পুনরায় এমন নিষ্ঠার সঙ্গে গুরুসেবা শুরু করে দিলেন যে মনে হত শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝি তখনও জীবন্ত। বস্তুত: তাঁর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তর্হিত হননি। তিনি তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ সেবার দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন্ত উপস্থিতি মঠবাসীদের সামনে তুলে ধরতেন। তিনি পূজাদি নিখুঁতভাবে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করতেন। বেলুড় মঠ ও মাদ্রাজ মঠে এখনও যে শ্রীরামকৃষ্ণপূজা হচ্ছে তার সব কিছুর প্রবর্তনা তিনিই করেছিলেন। এই সেবাপূজা দেখলে বোঝা যেত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিতকালে তিনি কি ধরনের সেবাযত্ন করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিতকালেও তিনি যেভাবে গুরুসেবা করতেন, তাঁর তিরোধানের পরেও সেই একই ধারায় সেবাদি সম্পন্ন করে যেতেন। একবার ভেবে দেখ। বেলুড় মঠে প্রতি প্রত্যূষে (এখন অবশ্য আর করা হয় না) তিনি নিম বা বাবলার ডাল থেকে একটি দাঁতন তৈরি করে দিতেন যেমনটি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবিতকালে ব্যবহার করতেন, দাঁতনটি থেঁতলে ঠিক তেমনি নরম করে দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবিতকালে যা যা পছন্দ করতেন তিনি সে সকল দ্রব্যই গুরুসেবায় নিবেদন করতেন। অনেক রকমের ফুল দেওয়া

হত। শ্রীরামকৃষ্ণ চাঁপা, কেতকী প্রভৃতি কড়া গন্ধের ফুল পছন্দ করতেন না। তিনি পছন্দ করতেন কোমল গন্ধের ফুল। সুতরাং চাঁপা, কেতকী প্রভৃতি কড়া গন্ধের ফুল নিবেদন করলেও তিনি সেগুলিকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি থেকে দূরে রাখতেন, যাতে কড়া গন্ধের ঝাঁঝ অনেকটা কমে যায়। সকালবেলা স্নানের পর শ্রীরামকৃষ্ণ গতরাতে ভেজানো ছোলা খোসা ছাড়িয়ে আদা নুন দিয়ে খেতেন। আজ পর্যন্ত এই ভোগ বেলুড় ও মাদ্রাজে নিবেদন করা হয়, কিন্তু বৃহস্পতিবার তিনি আদা খেতেন না, কারণ বাংলাদেশে ঐরূপ রীতির প্রচলন ছিল। সেকারণে সেদিন আদার বদলে গোলমরিচ দেওয়া হত। এখনও ঐ নিয়ম অনুসরণ করা হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবনের প্রায় অন্তে গলায় ক্যান্সার রোগের জন্য কোন শক্ত খাবার খেতে পারতেন না। তিনি সুজির পায়েস জাতীয় তরল পথ্য খেতেন। তাই বেলুড়ে মাদ্রাজে ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আরও কয়েকটি কেন্দ্রে আজও সুজির পায়েস ভোগ দেওয়া হয়। এই সমস্ত পূজাপদ্ধতির সব কিছুরই প্রবর্তক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। তিনি নিজে কাশীপুর বাগানে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে যেভাবে সেবা করতেন সেই সেবা-ধারারই অনুসরণ করতেন পরবর্তিকালেও। তিনি সদা সজাগ থাকতেন এবং সারাদিনে শ্রীরামকৃষ্ণের যখনই প্রয়োজন হত তখনই তিনি গুরুর কাছে গিয়ে হাজির হতেন।

তিনি ঠাকুরের ভোগ রান্না করতেন। প্রথমে তৈরি করতেন চাটনি, পায়েস প্রভৃতি যেগুলি খুব ঠাণ্ডা অবস্থায় নিবেদন করতে হয়। আর ভাত, ডাল, তরকারী যেগুলি গরম গরম পরিবেশন করতে হয়, সেগুলি শেষকালে রান্না করতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভোগ নিবেদন করতেন। তিনি একসঙ্গে সব লুচি তৈরি করতেন না। এখন দেখি ভোগ নিবেদন করে পূজারী মন্দিরের বাইরে চলে আসেন। কিন্তু শশী মহারাজ মন্দিরের ভিতরেই থাকতেন এবং একটি একটি করে লুচি ভেজে ঠাকুরকে গরম গরম লুচি খাওয়াতেন। এভাবে একটির পর একটি লুচি তিনি ঠাকুরকে নিবেদন করতেন। তিনি এমনি আন্তরিকভাবেই ঠাকুরের সেবা করেছিলেন।

গভীর রাতে যখন তিনি গরম অনুভব করতেন, তৃষ্ণার্ত বোধ করতেন, তিনি ঠাকুরের ঘরে চলে যেতেন, শয়ন ঘরের জানালা খুলে দিতেন, এক গ্লাস জল খেতে দিতেন এবং সারা-রাত ধরে ঠাকুরকে পাখার বাতাস করতেন। তিনি এভাবেই ঠাকুরের পূজা করতেন। তাঁর পূজানুষ্ঠানে বিধি কিছু ছিল না, কিন্তু তা ছিল অনন্যস্বতন্ত্র। এখন তোমরা যখন পূজা করতে বস, তোমরা কিছুক্ষণ আসনে বসে ধ্যান কর তারপর পূজাদি শুরু কর। কিন্তু রামকৃষ্ণানন্দজীর এ সকলের প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনি সর্বক্ষণই অনুভব করতেন শ্রীরামকৃষ্ণের অপার্থিব উপস্থিতি এবং সেকারণে পূজার পূর্বে ধ্যান জপ ইত্যাদির প্রয়োজন বোধ করতেন না। কি সকালে কি সন্ধ্যায় তিনি সরাসরি পূজা আরম্ভ করতেন। তিনি এভাবেই পূজানুষ্ঠান করতেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী আদর্শের ব্যাপারে কঠোর নিয়মানুবর্তী ছিলেন। জীবনে তিনি কখনও শ্রদ্ধার অভাব এবং আদর্শের উদ্‌যাপনে ও অনুবর্তনে কোন প্রকার শিথিলতা পছন্দ করতেন না। সুতরাং তাঁর কাছে ব্রহ্মচারীদের শিক্ষা হত সুচারু ও সর্বাঙ্গসুন্দর।

একদিন জনৈক ব্রহ্মচারী ঠাকুরের ভোগ নিবেদন করেই জরুরী একটি কাজে পোস্টাফিসে ছুটে যায়। তখনকার দিনে মঠে রামকৃষ্ণানন্দজী ও সেই ব্রহ্মচারী ছাড়া আর কেউ ছিলেন না।

সেজন্য বাধ্য হয়েই তাকে জরুরী একটা কাজ দায়তে পোস্টাফিসে যেতে হয়েছিল। কিন্তু যা হোক, রামকৃষ্ণানন্দজী জানতে পারলেন যে ব্রহ্মচারী ভোগ নিবেদন করে বেরিয়ে গেছে। তিনি বুঝতে পারলেন যে, ব্রহ্মচারী পোস্টাফিসে গেছে। তিনি পোস্টাফিসে গিয়ে ব্রহ্মচারীকে ধরলেন। তিনি ব্রহ্মচারীর কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে রাস্তা দিয়ে নিয়ে এসে মঠে পৌছালেন এবং ব্রহ্মচারীকে বুঝিয়ে দিলেন যে, গুরু মহারাজের যে কোন জিনিসের প্রয়োজন হতে পারে, সুতরাং ব্রহ্মচারীর সেজন্য প্রস্তুত থাকা উচিত ছিল।

১৯০৭ খ্রীঃ বাংলাদেশে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছিল। ব্রিটিশ রাজশক্তি অথবা ইংরেজরা বাঙালী মাত্রকেই সন্দেহ করত এবং তাদের অনেককেই পুলিস-নজরে থাকতে হচ্ছিল। মাদ্রাজ মঠের সাধুরাও যেহেতু বাংলা দেশ থেকে আগত, সেজন্য তাদেরকেও সন্দেহের চোখে দেখা হত। একবার একজন সি. আই. ডি. (গোয়েন্দা) অফিসার কলকাতা থেকে এসে লক্ষ্য করতে থাকলেন শশী মহারাজ ও অন্যান্যরা কি করেন। শশী মহারাজ বুঝতে পারলেন লোকটি গোয়েন্দা অফিসার। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভোগ হয়ে গেলে ডাল ও ভাতের সঙ্গে বেশ কিছু পাথর কুচি মিশিয়ে দিলেন। গোয়েন্দা অফিসার খেতে বসে দেখেন প্রতি গরাসে ডালভাতের মধ্যে একটি দুটি পাথর। তাঁর কাছে এটা অসহ্য মনে হল। তিনি বললেন: "ব্যাপার কি স্বামীজী, ডাল ভাতের মধ্যে দেখছি অনেক পাথরকুচি!" শশী মহারাজ উত্তর দেন: "হ্যাঁ, আপনি যা বলছেন তা সত্য। আমাদের অন্য কোন উপায় নেই, কোন মতে আমরা খাওয়া দাওয়া করি।" এর-পরেই গোয়েন্দা অফিসার দু-একদিনের মধ্যেই সরে পড়েন। তিনি এই কৌশলে গোয়েন্দার হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন।

তাঁর গুরুভ্রাতাদের প্রতি, বিশেষতঃ যাঁরা ছিলেন ঈশ্বরকোটি—তাঁদের প্রতি তাঁর ছিল গভীর ভক্তি। তিনি তাঁদেরকে প্রায় শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। বর্তমান মাদ্রাজ মঠের প্রবেশপথের বাগানে ছিল মঠের প্রথম বাড়ি। সেখানে চারটি বাস করবার ঘর ও একটি হলঘর ছিল। তিনি বলতেন, "একখানা ঘর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য, আরেকটি স্বামীজীর জন্য, তৃতীয়টি রাজা মহারাজের জন্য, চতুর্থটি প্রেমানন্দজীর জন্য এবং হলঘরটি হল ভক্তদের জন্য।" একজন এগিয়ে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, "স্বামীজী, তাহলে আপনি থাকবেন কোথায়?" তিনি উত্তর করেন: "বারান্দায়।" এইটি ছিল তাঁর মুক্ত মনের চেহারা।

রাজা মহারাজের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। রাজা মহারাজ যখন ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ মঠে বাস করছিলেন, সে সময়ে তিনি একবার পেটের অসুখে ভুগছিলেন। তাঁর পথ্য ছিল সাগুজল। হঠাৎ এক ভক্ত একটি থালা ভর্তি নানারকমের মিষ্টি নিয়ে উপস্থিত হন। শশী মহারাজ মিষ্টির থালা নিয়ে রাজা মহারাজের সামনে ধরেন এবং বলেন: "রাজা, তুমি খাও।"

রাজা মহারাজ: "বল কী শশী? আমার পেটের অবস্থা ভাল নয়। আমি সাগু খাচ্ছি।"

শশী মহারাজ: "তাতে কি হয়েছে? তুমি তো আর খেতে যাচ্ছ না, তোমার মধ্য দিয়ে গুরু মহারাজই গ্রহণ করবেন।"

একথার পর মহারাজ বেশ কিছু পরিমাণ মিষ্টি খেয়ে নিলেন এবং তাতে কোন অসুবিধাও দেখা দিল না।

আরেকদিন স্বামীজীর "Inspired talks" (দেববাণী) প্রকাশনার পরেই বইটির সমালোচনার

ব্যবস্থা নিয়ে শশী মহারাজের সঙ্গে রাজা মহারাজের মত পার্থক্য হয়। মহারাজ শশী মহারাজকে বলেছিলেন Bombay Chronicle-এ একখানা বই সমালোচনার উদ্দেশ্যে পাঠাবার জন্য। শশী মহারাজ বলেন: "কে Bombay Chronicle পড়তে যাচ্ছে? 'হিন্দু' পত্রিকাতে এর সমালোচনা বের হলেই যথেষ্ট।" একথা বলে তিনি আর বোম্বেতে কোন বই পাঠাননি। মহারাজ কিছু বললেন না। কিন্তু খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। এমন কি শশী মহারাজ যখন তাঁকে নিত্যকার প্রণাম করতে গেলেন, তখনও মহারাজ নীরব ও নির্বিকার। শশী মহারাজ বুঝতে পারলেন যে তাঁর মন্তব্যে মহারাজ খুবই বিচলিত। কিন্তু এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর ছিল একটা বিচিত্র পদ্ধতি। তিনি রাজা মহারাজের কাছে গিয়ে বলেন: "রাজা, তোমার এরকম ছোট মন? শশী কি তোমার সমান যে, তার সঙ্গে তুমি মান অভিমান করছ? তুমি ইচ্ছা করলে আমার মতো শত শত শশী তৈরি করতে পার। তোমার লজ্জা করছে না যে, তুমি আমাকে তোমার সমজাতীয় মনে করেছ?" মহারাজ শুনে লজ্জা পেয়ে যান এবং বলেন: "না, না, শশী, কিছুই হয় নি।" শশী মহারাজের ভক্তি ছিল এমন গভীর।

একবার শশী মহারাজ মাদ্রাজ থেকে বেলুড় মঠে সকাল দশটার সময় উপস্থিত হন। তিনি রাজা মহারাজকে প্রণাম করতে গিয়ে দেখেন যে, মহারাজ ধ্যান করছেন। সে সময়ে তাঁকে ডাকা বা তাঁর ধ্যানে বাধা দেবার স্পর্ধা কারুরই ছিল না। কিন্তু শশী মহারাজ সোজা মহারাজের কাছে হাজির হলেন, মহারাজকে সামান্য ধাক্কা দিয়ে বললেন: "রাজা, এ তুমি কি করছ? তুমি আবার কি ধ্যান করছ? আচ্ছা, তোমার এতক্ষণ ধরে ধ্যান করবার কি প্রয়োজন? উঠে পড়।" তাঁর মহারাজের প্রতি ছিল এই ধরনের গভীর শ্রদ্ধা। প্রেমানন্দজীর প্রতিও ছিল তাঁর আর এক ধরনের ভক্তি। আর স্বামীজীর প্রতি তো ছিল অপরিসীম ভক্তি। স্বামীজীর প্রতি তাঁর যে গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা তা বিস্ফুরিত হয়েছে তাঁর রচিত "অনিত্যাদ্‌দৃশ্যেষু বিবিচ্য নিত্যং" স্তোত্রে, সেই স্তোত্র আর তোমাদেরকে শোনাবার নিশ্চয়ই প্রয়োজন নাই।

রাজা মহারাজ যখন মাদ্রাজ মঠে গিয়েছিলেন সে সময়ে স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী খাজাঞ্চির কাজ করতেন। মহারাজ ও তাঁর সঙ্গীদের খরচপত্র মেটাবার জন্য শশী মহারাজ প্রায়ই তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন অঙ্কের টাকা নিতেন। রাজা মহারাজ এটা লক্ষ্য করে বিশুদ্ধানন্দজীকে আদেশ করলেন, "শোন, শশী যখনই টাকা নেবে তার কাছ থেকে একটা রসিদ লিখিয়ে নেবে।" এর-পরের বার শশী মহারাজ বিশুদ্ধানন্দজীর কাছে টাকা নিতে আসতেই তিনি টাকার একটি রসিদ লিখে শশী মহারাজকে সই করতে দেন। শশী মহারাজ তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেন, "ব্যাপার কি? তুমি কোনদিন তো রসিদ চাও নি? আজ চাইছ কেন?" তখন বিশুদ্ধানন্দজী বলেন: "মহারাজ আদেশ করেছেন টাকা দেবার সময় আপনার কাছ থেকে রসিদ নেবার জন্য।"

শশী মহারাজ হেসে বললেন: "বেশ, বেশ।" তিনি রসিদ সই করে দিলেন। এরপর থেকে যখনই বিশুদ্ধানন্দজী টাকা দিতেন রসিদ নিয়ে নিতেন। রাজা মহারাজ মাদ্রাজ থেকে চলে যাবার পর শশী মহারাজ বিশুদ্ধানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করেন: "তোমার থেকে এ পর্যন্ত কত টাকা নিয়েছি?"

বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ: "একহাজার পঞ্চাশ টাকা।"

শশী মহারাজ: "কি? একহাজার পঞ্চাশ! হতেই পারে না।"

তখন বিশুদ্ধানন্দজী সব রসিদ বের করে তাঁর হাতে দিলেন। শশী মহারাজ হাসতে হাসতে বললেন: "দেখেছ, কিভাবে রাজা তোমাকে রক্ষা করলেন। তাঁর বুদ্ধি পরামর্শ না পেলে আজ তুমি সমস্যায় পড়ে যেতে।" এই সকল ঘটনা থেকেই বোঝা যায় রাজা মহারাজের প্রতি তাঁর কি গভীর শ্রদ্ধাই না ছিল!

একদিন তিনি মহারাজকে নিয়ে যান মাদুরাইতে মীনাক্ষি মন্দিরে। ওখানে কাউকেই গর্ভমন্দিরের ভিতরে যেতে দেওয়া হত না। কিন্তু শশী মহারাজের বাসনা হল মহারাজকে নিয়ে সেখানে যাবেন। তিনি অদ্ভুত এক কৌশল অবলম্বন করলেন। মহারাজ ও শশী মহারাজ দুজনেই চেহারায় ভারিক্কী ও বলিষ্ঠ ছিলেন। শশী মহারাজ তারস্বরে বললেন, "আলওয়ার! আলওয়ার!" এবং মহারাজকে ধরে নিয়ে গিয়ে দেবীমূর্তির সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিলেন। মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। তিনি নিস্পন্দ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। শশী মহারাজ লক্ষ্য রাখছিলেন যাতে মহারাজ পড়ে না যান। উপস্থিত পুরোহিতদের কারুর কিছু বলার বা তাঁদের জাত নিয়ে কিছু প্রশ্ন করার সাহসও ছিল না। ঐ অবস্থায় রাজা মহারাজ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

এরপর ১৯১০ খ্রীঃ শ্রীশ্রীমা দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে গিয়েছিলেন। শশী মহারাজ মাকে দক্ষিণ ভারতে রামেশ্বর তীর্থে যাবার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। শ্রীশ্রীমাও আমন্ত্রণ গ্রহণ করে রামেশ্বর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। রামেশ্বরে শশী মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে দিয়ে ১০৮টি স্বর্ণ বিল্বপত্র নিবেদন করে রামেশ্বর শিবের পূজা করিয়েছিলেন। রামেশ্বরের শিবলিঙ্গ শক্ত গ্রানাইট পাথরের নয়। সম্ভবতঃ নরম বালু পাথরের গড়া। সেকারণে পূজার সময় অভিষেকের জল শিবলিঙ্গের উপর ঢালা হয় না। শিবলিঙ্গটি একটি ধাতুর আচ্ছাদকে ঢেকে জল ঢালা হয়। মনে হয় সর্বদাই শিবলিঙ্গকে ঐভাবে ঢেকে রাখা হয়। কিন্তু শ্রীশ্রীমা যখন পূজা করছিলেন সে সময়ে ঢাকনা সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং শ্রীশ্রীমা শিবলিঙ্গটি দেখতে পেয়েছিলেন। দেখে তিনি মন্তব্য করেছিলেন: "যেমনটি রেখে গেছিলাম তেমনটিই আছে।" দলের একজন ভক্তমহিলা জিজ্ঞাসা করেন: "মা, আপনি কি বললেন?" শ্রীশ্রীমা কোন উত্তর দেন না।

দাক্ষিণাত্য থেকে শ্রীশ্রীমায়ের প্রত্যাবর্তনের পর শশী মহারাজ বলেন: "দক্ষিণ ভারতে আমার কাজ শেষ হল। মহারাজকে নিয়ে এসে তাঁকে দক্ষিণ ভারতের তীর্থস্থানগুলি দেখিয়েছি। এবার মাকেও আনা গেল, মাও সেসকল তীর্থ ঘুরে দেখলেন। এখন দক্ষিণে আমার কাজ শেষ হল।" বাস্তবিকই এরপরই তাঁর কাজের সমাপ্তি ঘটেছিল।

এর কয়েকমাস পরেই তিনি রোগাক্রান্ত হন। বায়ু পরিবর্তনের জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বাঙ্গালোরে। সেখানে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হল না। তাঁর গুরুভাইয়েরা তাঁকে অনুরোধ করেন কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসার জন্য। তিনি কলকাতা যাওয়ার পথে রাজা মহারাজ,—তিনি সে সময়ে পুরীতে বাস করছিলেন—তাঁকে দেখবার জন্য খুরদা স্টেশনে উপস্থিত হন। শশী মহারাজের শীর্ণ স্বাস্থ্য দেখে তিনি আতঙ্কিত হন। শশী মহারাজ কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসকদের কাছে জানতে পারেন যে, তিনি যক্ষ্মারোগাক্রান্ত। রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। তখনকার দিনের যাবতীয় সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেও নিরাময়ের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না।

একদিন শশী মহারাজ বলেন : "আমার কেন এই মারাত্মক ব্যাধি? আমি জীবনে সজ্ঞানে কোন পাপকর্ম করিনি।" তিনি কিছুক্ষণ নীরবে থেকে নিজেই বলেন : "একদিন স্বামীজীর পিঠে একটা কিল মেরেছিলাম। স্বামীজী স্বয়ং মহাদেব। ঐ পাপেই আমার এই ভোগান্তি।"

ঘটনাটি হচ্ছে এরকম। বরাহনগর মঠে একদিন স্বামীজীর খুব খিদে পেয়েছিল। তখন মঠের খুব সঙ্গীন অবস্থা। মঠবাসীরা প্রতিদিন খেতে পেতেন না। ক্ষুধায় খুব কাতর হয়ে স্বামীজী ভাঁড়ারে গেলেন, কিন্তু কিছুই পেলেন না। তিনি ঠাকুরঘরে এসে দেখলেন সেখানে একটি পাকা কলা রয়েছে। ঠাকুরের সামনে হাঁটু গেড়ে স্বামীজী বললেন, "কলা খাও, কলা খাও!" ঠিক সেই সময়ে শশী মহারাজ সেই ঘরে ঢুকে দেখেন স্বামীজী ঐভাবে ঠাকুরের সঙ্গে মস্করা করছেন। তিনি খুবই চটে যান এবং স্বামীজীর পিঠে একটা ঘুসি মারেন, স্বামীজীকে হাত ধরে টেনে ঠাকুরঘরের বাইরে নিয়ে যান। স্বামীজী শশী মহারাজের মনের ভাব বুঝে চুপচাপ ঠাকুরঘর থেকে চলে যান। শশী মহারাজ তখনও ঠাকুর ও স্বামীজীর মধ্যে যে গভীর অভেদ সম্পর্ক তা সঠিকভাবে অবধারণ করতে পারেননি। পরবর্তিকালে এ ধারণা তাঁর স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল। তিনি বলতেন, "ঐ অপরাধেই আমি আজ ভুগছি।"

এভাবে শশী মহারাজ কিছুকাল ভুগে শেষে মহাসমাধিযোগে দেহত্যাগ করেন। তাঁর শেষ মুহূর্তের বিভিন্ন আচরণ দেখে তাঁর গুরুভাইরা এর মর্ম বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর শবদেহ বেলুড় মঠে নিয়ে যাওয়া হয় এবং স্বামীজীর মন্দিরের দক্ষিণদিকের চত্বরের শেষপ্রান্তে দাহ করা হয়। সেই চত্বরটি এখন লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা। তিনি ও তাঁর অন্যান্য গুরুভাইরা যাঁদের শবদেহ সেখানে দাহ করা হয়েছিল তাঁদের নামের তালিকা দেওয়া আছে। এই হল সংক্ষেপে শশী মহারাজের জীবনকথা।

আমরা প্রশ্ন করতে পারি, তিনি এই পৃথিবীতে তাঁর উনপঞ্চাশ বছরের জীবনে কি লাভ করেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেব স্বামী সারদানন্দের একটি উক্তি উদ্ধৃত করে। স্বামী সারদানন্দ বলেছিলেন : "দক্ষিণ ভারতে গিয়ে ভক্তদের কাছে গিয়ে খোঁজ কর, জানতে পারবে স্বামীজীর তিরোধানে তাঁরা কিরূপ মর্মাহত হয়েছিলেন এবং শশী মহারাজের স্নেহ স্মরণ করে তাঁরা কিভাবে অশ্রুবিসর্জন করেন। আজ খুব সহজেই বলতে পারি—চারদিকে তাকিয়ে দেখ তাহলেই বুঝতে পারবে শশী মহারাজ দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র কি করে গেছেন।" দক্ষিণ ভারতে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আওতায় যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেগুলি সবই এই মহাত্যাগীর জীবনের স্মৃতিস্তম্ভ বৈ তো নয়।*

* ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষে প্রদত্ত ইংরেজী ভাষণের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক : স্বামী প্রভানন্দ। মূল ভাষণটি Vedanta Kesari পত্রিকার সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।—সঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ: এক নূতন ধর্মের প্রবক্তা

স্বামী আত্মস্থানন্দ

'এসেছে এক নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে'। এই গান আমরা অনেক সময়ে গাই, বিশেষ করে ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে নগর সংকীর্তনে। বাস্তবিক শ্রীরামকৃষ্ণ 'এক নূতন মানুষ'। আমাদের আলোচ্য বিষয়—'শ্রীরামকৃষ্ণ: এক নূতন ধর্মের প্রবক্তা'। এ সম্পর্কে আলোচনার আগে সর্বপ্রথম জানা প্রয়োজন ধর্ম কি? ধর্ম যদি না বুঝি, ধর্মের স্বরূপ যদি জানা না থাকে, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ নূতন ধর্মের প্রবক্তা, কি প্রাচীন ধর্মের প্রবক্তা—এ বোঝা দুঃসাধ্য।

মানুষের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক ওতপ্রোত। কেমন ওতপ্রোত? কতদিনের সম্পর্ক? উত্তরে যদি বলা যায়—যতদিন মানুষ ততদিন ধর্ম, তবে খুব ভুল হবে না। Encyclopaedia Britannica বলছে: "Man, it has been said, is incurably religious."[১] সংজ্ঞাটি বেশ মজার। এ এমন একটি ব্যাধি যে ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। আমরা যদি ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব যে, ধর্মের রূপের পরিবর্তন হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন যুগে, ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে। ফলে তার চেহারা পাল্টেছে ঠিকই, কিন্তু স্বরূপ বদলায়নি। এমন কোন যুগ দেখা যায় না যেখানে মানুষ আছে অথচ ধর্ম নেই। তার কারণ কি?

ধর্মের কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী ভারী সুন্দর উদাহরণ দিয়ে আরম্ভ করেছেন।[২] একটা মস্তবড় রেলগাড়ি আর একটা পিঁপড়ে রেল লাইনের উপর, পিঁপড়েটি একটা সামান্য জীব। রেলগাড়িটা দ্রুত বেগে আসছে। পিঁপড়েটা সরে গেল। একটা হয়তো পাখী বসে ছিল, রেলগাড়িটা দেখে সে উড়ে গেল। স্বামীজী ব্যাখ্যা করে দেখাচ্ছেন, একটি প্রাণী সে যত ক্ষুদ্রই হোক, তার এই নিজস্ব শক্তিটুকু আছে। কিন্তু এই যে বিরাট যন্ত্র, যার এত বেশি শক্তি, সে ছুটে চলেছে। কিন্তু ছুটে চলার পিছনে তার নিজস্ব কোন শক্তি নেই। সে সঞ্চালিত। তাকে কেউ চালাচ্ছে, তবেই সে চলেছে। কারণ অতবড় একটা যন্ত্রদানব হলেও, সে কিন্তু জড়। আর এই যে সামান্য প্রাণী—সে চেতন। আবার মানুষের দিকে যখন তাকাই, তখন দেখি—সে রেলগাড়ি তৈরি করেছে, রেল ইঞ্জিন তৈরি করেছে। তার ভিতরে আরও অনেক বেশি শক্তির প্রকাশ। মানুষ দুর্বার গতিতে অনন্তকালের প্রবাহে ছুটে চলেছে। কত রকম প্রচেষ্টা, কত সংগ্রাম,—যুগ যুগ ধরে মানুষ করেই চলেছে। কিসের জন্য তার এই সংগ্রাম?

মানুষ যখন এই বিষয়ে চিন্তা করতে শুরু করে, তখন সে কি দেখতে পায়? দেখতে পায় যে, তাকে যেন কত বন্ধনে আটকে রাখা হয়েছে। কালের বন্ধন, ব্যবধানের বন্ধন এবং আরও কত রকমের বন্ধন। তার অনেক কিছু সে বুঝতেও পারে না, জানতেও পারে না। কিন্তু সে বুঝতে চায়, জানতে চায়। মানুষের বুদ্ধি যত সূক্ষ্ম হয়, যত তার ভিতরের আত্মশক্তির প্রকাশ হয়, তত সে সমস্ত বন্ধনকে ভেঙে ফেলতে চায়। সে নিজে অনন্ত হতে চায়, স্বাধীন মুক্ত হতে চায়। কিন্তু একসময় সে দেখে যে, সে অসহায়। আর এগুতে পারছে না।

১ Encylopaedia Britannica, Vol. 19, (1966) p. 108

২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড (১৩৭০), পৃঃ ১০৫

আর কিছু ধরতে পারছে না, মনে হয় যেন থেমে যাচ্ছে। তবুও সে সংগ্রাম করছে। সে দেখছে যে আমি চেষ্টা করছি, বুঝতে পারছি যে আমি যা চাই, তা আমার হল না। আমি যা চাই তা পেলাম না। এত রূপ-রসে ভরা এই সুন্দর জগৎ। কিন্তু তবু মনে হচ্ছে—না, না, তাতে আমার পেট ভরছে না। বুঝতে পারছি—আরও যেন কিছু আছে। আরও বড়, আরও মহৎ, আরও সুন্দর। সে জানে তার জীবন ক্ষণিক। তার যত কিছু খেলা, যত কিছু গড়া, সব এক নিমেষে স্বপ্ন হয়ে যাবে। এই রকম ভেবে তখন তার একটা নৈরাশ্য আসে। সে তখন খোঁজে এমন একটা কিছু শক্তি, এমন একজন কারুর সাহায্য, যা তার নিজের এবং অন্য সকলের চেয়ে বড়। সে নিজে সসীম। কিন্তু তার ভিতরে ইঙ্গিত আসছে, আভাস আসছে অসীমের। তখন সে বুঝতে পারছে যে, এই সীমার মাঝে অসীমকে ধরা যাবে না। এই সীমিত শক্তি দিয়ে অসীমকে আমি বাঁধতে পারব না। ভিন্ন ভিন্ন যুগে তাই আমরা দেখি মানুষের এই সমস্ত প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে সে নানারকমভাবে একটা বাইরের শক্তির কাছে সাহায্য চায়। এ যুগের ভাষায় বলতে গেলে, আমরা যেমন যুদ্ধ বিগ্রহের সময় বহির্দেশীয় শক্তির কাছে সাহায্য চাই। মানুষও সেই রকম যায় কোন বাইরের শক্তির কাছে। কোথাও একটু বুঝি অলৌকিকতার স্পর্শ পাবে, কেউ ছুঁয়ে দেবেন, কেউ ভস্ম দেবেন, কেউ একটা কিছু করে দেবেন। এই যে অজানার প্রতি একটা আকর্ষণ, অসীম শক্তির অধিকারী হবার জন্যে একটা আকাঙ্ক্ষা—এই ভাবটি মানুষের মধ্যে এক এক সময় আসে।

তাই অবস্থা বিশেষে দেখেছি মানুষ কখনও ভূত-প্রেতের পুজো করেছে, কখনও সাপের পুজো করেছে, পাথরের পুজো করেছে, গাছের পুজো করেছে, আরও অনেক রকম পুজো করেছে। এবং এই সব ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে মনে করেছে যে তারা নূতন কিছু শক্তি পেয়েছে। আর এমন্তু সাময়িকভাবে তারা আনন্দিতও হয়েছে। পাশ্চাত্য ধর্মগ্রন্থ, পাশ্চাত্য ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতিতে—ঐরকম বর্ণনা বিশেষ করে চোখে পড়ে। কিন্তু ভারতের এসব ছাড়াও যা আছে তাকে বলা হয় সনাতন ধর্ম। সেই সনাতন ধর্মকে কি আমরা ঐতিহাসিক বলব? ঋগ্‌বেদের যুগ, অর্থাৎ বৈদিক যুগকে তো প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলতে হবে। সেখানে কিন্তু আমরা এর একটু ভিন্ন পরিচয় পাই। সেই যুগের ভারতের মানুষ তার গবেষণা, তার সাধনা, তার সংগ্রাম, তার তপস্যার মধ্য দিয়ে এক তত্ত্বকে পেয়েছিল, যে তত্ত্বটি বেদে বার বার বলা হয়েছে—'আমি তিনিই', 'আমি সেই পূর্ণ', 'আমি সেই অনন্ত'—'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। এই সব মহাতত্ত্ব তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন—উপলব্ধির নিগড়ে বেঁধেছিলেন। এই পথ, এই পাওয়াই পাওয়া, এই পূর্ণতাই প্রকৃত পূর্ণতা, এই তৃপ্তি পরম তৃপ্তি। এর উপরে, এর বাইরে আর কিছুই নেই। এ কথা বৈদিক যুগ থেকে আমরা শুনতে পাচ্ছি এবং ভারতবর্ষে এই সুর এখনও বাজছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এসে সেই সুর উঁচুতে তুলে ধরে বলে গেলেন মানুষ 'মানহুঁশ'।

আলোচনা শুরু হয়েছিল ধর্ম নিয়ে। এই ধর্ম মানুষের সঙ্গে রয়েছে কেন? তার কারণ সব জিনিসেরই, সব বস্তুরই একটা 'স্বধর্ম' থাকে। মানুষের স্বধর্ম কি? মানুষের স্বধর্ম নিজেকে জানা, ঠিক ঠিক নিজেকে বুঝতে পারা এবং নিজের যে লক্ষ্য, চরম লক্ষ্য—'পরমার্থ'—সেই পরমার্থকে পাওয়া। এইটি হল মনুষ্য-ধর্ম, মানুষের স্বধর্ম। এই স্বধর্ম প্রাপ্তি না হলে

মানুষের কখনও তৃপ্তি হতে পারে না, মানুষ চরিতার্থ বোধ করে না। আমরা সেই যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী সংবাদের কথা জানি। সেখানে মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করেছিলেন: 'হে পতিদেব, তুমি যে উদ্দেশ্যে বনে যাচ্ছ, সমস্ত বিত্ত, সম্পত্তি আমাকে দিয়ে, এগুলির মধ্যে আমি সেই উদ্দেশ্য, সেই তৃপ্তি খুঁজে পাব তো?' তখন উত্তরে তাঁকে বলতে হয়েছিল—'না, তা হবে না। এইটি অন্য জিনিস।' এটি এমন একটি জিনিস—'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।' (বৃঃ ১।৪।৮)। অর্থাৎ, 'এই আত্মা পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর, অপর সকল হইতেই প্রিয়তর; কারণ এই যে আত্মা, ইনি অন্তরতম।' আর অন্য যাদের প্রিয় বলা হচ্ছে—তারা কারা জান? 'প্রমায়ুকং ভবতি, যদা শ্রোস্যতি'—এই সব প্রমায়ুক, আজ আছে কাল নেই, আজ থাকবে—কাল থাকবে না। বৈদিক যুগেই এই পরম সত্য আমরা লাভ করেছি। ধর্ম বলতে ভারতের সনাতন ধর্মের এই যে নির্দেশনা—এই নির্দেশনাই আমাদের ঠিক ঠিক পথের নিশানা। আর এরই যে 'হংস'—শ্রীঠাকুর যাকে বললেন 'মানহংস'—এই হল মানব ধর্ম, যেটি সর্বদা থাকবে।

কিন্তু পরে ধর্মের ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের অনেক রূপ লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আচার্য এসেছেন, সত্যদ্রষ্টা ঋষি এসেছেন, তাঁরা সত্য যেমন যেমন উপলব্ধি করেছেন, তেমন তেমন তাঁরা বলেছেন। তাঁদের অনুগামী যাঁরা, তাঁরা আবার নিজেদের গুরুর কাছে যা শুনেছেন এবং নিজেদের মনে যেটি ভাল লেগেছে, তাকে কেন্দ্র করে এক একটি গোষ্ঠী তৈরি করেছেন। এভাবে স্বতন্ত্র দল তৈরি হয়েছে, নানা মত তৈরি হয়েছে, স্বতন্ত্র নানা পথ তৈরি হয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই, ভারতে সনাতন ধর্মে প্রধানতঃ দুটি ভাগ, 'শ্রুতি' ও 'স্মৃতি'। শ্রুতিতে পাওয়া যায় 'এষ ধর্মঃ সনাতনঃ'। শ্রুতিতে যে সত্য বলা আছে, সে সত্য এমনই সত্য, যে সে সত্য কখনও পরিবর্তিত হয় না। স্মৃতি পাল্টে যায়। দেশ, যুগ এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী সেগুলি পরিবর্তিত হয়। মানুষ তার বুদ্ধির দ্বারা, তার বিবেচনার দ্বারা স্মৃতি তৈরি করেন, রচনা করেন এবং তার নির্দেশনাও দিয়ে থাকেন। কিন্তু শ্রুতিতে যা পাওয়া যায়, সে বিষয়ে কখনও ভাবলে চলবে না যে, সেটি মানুষ চিন্তা করে তৈরি করেছে। শ্রুতি দ্বারা যে সত্য অনুভূত হয় তাকে বলা হয় 'Revelation'। সেই সত্য 'প্রকাশিত' হয় পবিত্র, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ মনে। ঠাকুর বলেছেন—'শুদ্ধ মনবুদ্ধির গোচর'। 'মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন'। (কঠ: ২।১।১১)।—মনের দ্বারাই এই ব্রহ্ম উপলভ্য; এই ব্রহ্মে অণুমাত্রও ভেদ নাই। ঠাকুর এসে আরও পরিষ্কার করে এখানে ধরিয়ে দিচ্ছেন: 'এই শুদ্ধ মন-বুদ্ধি দিয়েই হয়'। 'মন তোর' মন্ত্র বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এই 'মন তোর' হয়ে মন যখন শুদ্ধ হয়, তখন সেই সত্য শুদ্ধ মন বুদ্ধির গোচর হয়। শ্রুতিতে শুধু যা প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি শ্রুতির কথা। আর স্মৃতি পরিবর্তনীয়। কিন্তু স্মৃতি অনুসরণ করে, স্মৃতিকে ধরে আমাদের কত রকম বাদানুবাদ। এই নিয়ে মোটা মোটা বই লেখা হচ্ছে, ব্যাখ্যা হচ্ছে, ভাষ্য হচ্ছে, চলছে নিরন্তর তর্ক-বিতর্ক। গোড়ায় যে ধর্মের কথা আলোচিত হল মানুষের স্বধর্ম ইত্যাদি সব প্রসঙ্গ, সব ভুলে গিয়ে আমরা তর্কজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। তখন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, ধর্ম 'একটা বুদ্ধিগত বিশ্বাস মাত্র।'*

৫ * Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. IV (9th Edn. 1966), p. 34

অনেকের ধারণা, দৈনন্দিন জীবনে ধর্ম যথার্থ প্রযুক্ত হয় না। কিন্তু ঠাকুর বলেছেন—স্বামীজী বলেছেন, এটা অনুভূতি সিদ্ধ, এটা জীবনে পেতে হবে, জীবনে প্রতিফলিত করতে হবে—"It is a practical affair". এই দিকটায় যখন কোন খেয়াল থাকে না, তখন নানারকম গোঁড়ামি, অনুষ্ঠান, আড়ম্বর, বাহ্যাড়ম্বর—এইগুলো জাঁকিয়ে বসে। প্রকৃত ধর্মাচরণ, ধর্মবোধ এবং তারই সূত্র ধরে আত্মবোধের জাগরণ ঘটাতে আমরা ব্রতী হই না। যদিও এ বিষয়ে বার বার করে সমস্ত ধর্মগুরু ধর্মশাস্ত্র সর্বদেশে সর্বকালে খুব স্পষ্ট করে বলে গেছেন এবং স্মৃতিতেও তার ব্যবহারিক দিকের কথাও বলা হয়েছে। শ্রুতিও একই কথা বলে। সর্ব শাস্ত্রের মূলতত্ত্বে, সকল ধর্মগুরুর অনুভূতিতে কখনও দেখা যায় না যে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে। ফলতঃ আমরা অনেক দর্শন, অনেক পুরাণ, অনেক তন্ত্র, 'পঞ্চরাত্র সংহিতা', 'শৈব আগম', ইত্যাদি অনেক কিছু পেয়েছি। ভিন্ন ভিন্ন পথও পেয়েছি। প্রবৃত্তি মার্গ, নিবৃত্তি মার্গ—এই সব পেয়েছি। শ্রেয়ের পথ, প্রেয়ের পথ এই সমস্তর কথা উপনিষদ্ বলেছেন, পুরাণ ইত্যাদিতে সর্বত্র এই সব কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সনাতন ধর্ম বলতে মনে রাখতে হবে দুটি তত্ত্ব। একটি 'Divinity of man'—'অহং ব্রহ্মাস্মি'। আমি যে সেই পূর্ণ, আমি যে আত্মা এবং অপরটি 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং' (ঈশ উঃ ১), 'Immanence of God' ঈশ্বর সর্বত্র আছেন। ব্রহ্ম বলুন, আত্মা বলুন, ঈশ্বর বলুন, যা মনে লাগে। কিন্তু পরমার্থ যে সত্য, সেটি সর্বানুস্যূত। এই সত্যকে ধরতে হবে। যাঁদের আমরা অবতারকল্প মনে করি, ঈশদূত মনে করি, সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করি বা সমাধিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলি বা স্থিতপ্রজ্ঞ বলি, তাঁরাই এই তত্ত্ব জেনেছেন এবং জানিয়েছেন। সনাতন ধর্ম হিসেবে এই যে মহৎ তত্ত্ব আমরা পেয়েছিলাম, সেই তত্ত্বে এক লাফে যাওয়া যাবে না। সেই তত্ত্বকে অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করতে হবে। কত রকম মলিন সত্তা রয়েছে, মলিন ভাব রয়েছে—সেগুলিকে দূর করতে হবে। আমরা মুক্ত হতে চাই, অমর হতে চাই। আমরা সদানন্দময় হতে চাই, আমরা সর্বদা চেতন হতে চাই। আমাদের এর চেতনা কখনও ব্যাহত না হয়—এটা আমরা চাই। এর জন্য আমাদের কি করতে হবে? আমি এখন যেখানে আছি সেখান থেকে আমাকে সোপান আরোহণের ন্যায় একটু একটু করে এগিয়ে যেতে হবে। এর যে মূল্য, সে মূল্য আমাকে দিতে হবে, এবং সেজন্য এই সাধন, ভজন, ত্যাগ, তপস্যা ইত্যাদির কথা সমস্ত শাস্ত্রে বলা আছে।

আমাদের আলোচ্য বিষয় যেহেতু "শ্রীরামকৃষ্ণ : এক নূতন ধর্মের প্রবক্তা", সেহেতু প্রথমেই আমাদের ঠিক করে বুঝতে হবে 'ধর্ম' কি? কাউকে যদি ধর্মনিষ্ঠ বলে আমাকে চিনতে হয়,—আমি কি দেখে চিনব? একজন অনেক টাকা দিয়েছেন, একজন পট্টবস্ত্র পরেছেন, তিলক কেটেছেন, ধর্মশালা করে দিয়েছেন, সাধুদের ভাণ্ডারা দিয়েছেন, তাই দিয়ে কি পরিচয় হবে তিনি খুব ধর্মপ্রাণ? নিশ্চয়ই নয়। এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে গেলে সনাতন ধর্মের উদ্ধৃতি দেওয়া প্রয়োজন।

মনু বলেছেন :

"এক এব সুহৃদ্ধর্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি॥"

(মনুস্মৃতি, ৮।১৭)

'এক এব সুহৃদ্‌ধর্মো'—এই একটি সুহৃদ, এই একজন থাকবে। সে কে? আমার যেটি স্বাভাবিক ধর্ম, যেটি আমার স্ব-ধর্ম, সেইটি আমার সঙ্গে থাকবে। সেই—'এক এব সুহৃদ্ধর্মো

নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ', মরে গেলেও আমার যেটি নিজস্ব ধর্ম, সেটি আমার সঙ্গে যাবে। আর কেউ থাকে না। এটি মনুর কথা। মনু আরও পরিচয় দিচ্ছেন, ধর্মের অভ্যাসে দেখা যাবে—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্ ॥"

(মনুস্মৃতি, ৬।৯২)

স্বামীজী বলেছেন: ধর্ম—জীবনে পরিণত করবার বস্তু, ধর্ম অনুভূতির বস্তু।[8]

আবার শ্রীমা এই প্রসঙ্গে বলেছেন: 'শিং বেরুবে না, কি হবে?' আবার শ্রীঠাকুরের কথা: 'মানহুঁস' হবে। আমার সঙ্গে অন্যান্য জীবের কি তারতম্য? যদি না ধৃতিঃ, ক্ষমা, দমঃ, অস্তেয়ম্, শৌচম্, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ না থাকে, আমার যদি ইন্দ্রিয়-সংযম না থাকে, আমার অন্তঃ-ইন্দ্রিয়, বহিঃ-ইন্দ্রিয়ের উপর যদি সংযম না থাকে, যদি সত্যনিষ্ঠা না থাকে, আমি যদি ক্রোধে চণ্ডাল হয়ে যাই, আমার যদি ঠিক ঠিক বিদ্যা—"সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে"—মুক্তির দ্বার যে খুলে দেয়, সেই বিদ্যার সঙ্গে যদি সম্পর্ক না থাকে, আমার যদি (ধী) বুদ্ধি না থাকে, তবে আমি আর কিসের মানুষ? মানুষের মধ্যে যখন শক্তি জাগরিত হবে, যখন তার ভিতর দেবত্ব প্রকাশিত হবে, তখন সেই মানুষই দেবতা, ভগবান হয়ে যাবে। তখন সে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'।

মহাভারত এই ধর্মের পরিচয় দিয়েছেন:

"প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্।
যঃ স্যাৎ প্রভবসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥"

(মহাভারত, শান্তিপর্ব, ১০৬।১০)

'প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্' যাতে 'স্যাৎ প্রভবসংযুক্তং' সে ধর্ম প্রভবার্থায় হবে, অভ্যুদয় হবে। আর—

"ধারণাদ্ ধর্মমিত্যাহুঃ ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥"

(মহাভারত, কর্ণপর্ব, ৫১।৫৭)

এই যে চারদিকে এত অশান্তি, তার কারণ 'ন তু প্রভবসংযুক্তং, ন তু ধর্মসংযুক্তং।' মানুষের যে মনুষ্যত্ব, মানুষের যে হুঁস, সেই মানুষ তার স্বধর্মের মূল্য হারিয়ে ফেলেছে। নোঙরটা ছিঁড়ে গেছে। সে অন্য দিকে দৌড়াচ্ছে। বিরাট বিরাট যন্ত্র তৈরি হচ্ছে। আর মানুষও সেই যন্ত্রের পিছনে ছুটে যন্ত্রবৎ হয়ে পড়েছে। এর ফলে এত অভাব, এত অসংগতি। কিন্তু ধর্ম যদি তাকে ধরে রাখে—'ধর্মো রক্ষতি রক্ষত'—তবে সে রক্ষা পাবে।

ভাগবতেও একই কথা সুন্দর ভাবে বলা হয়েছে। নারদ বলেছেন:

"নত্বা ভগবতেঽজায় লোকানাং ধর্মসেতবে।
বক্ষ্যে সনাতনং ধর্মং নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্ ॥"

(ভাগবত, ৭।১১।৫)

সনাতন ধর্মের কথা বলছি, শোন। কোথা থেকে শুনেছি? নারায়ণ-মুখাৎ শ্রুতম্—নারায়ণের কাছ থেকে শুনেছি। তিরিশটি ধর্মের লক্ষণ বললেন তিনি। তার মধ্যে ঐ পট্টবস্ত্র, তিলক, ভাণ্ডারা, দান ইত্যাদির কথা কিন্তু নেই।

ভাগবতের গোড়ার কথা—'সত্যং পরং ধীমহি'। মানুষের ধর্মে সবচেয়ে বড় কথা সত্য। ঠাকুরের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, ঠাকুর মার পাদপদ্মে সব অর্পণ করেও সত্যকে দিতে পারেননি। ওটি পারা গেল না। সত্যকে ছাড়া গেল না।

"সত্যং দয়া তপঃ শৌচং তিতিক্ষেক্ষা শমো দমঃ।
অহিংসা ব্রহ্মচর্যং চ ত্যাগঃ স্বাধ্যায় আর্জবম্ ॥"

(ভাগবত, ৭।১১।৮)

8 Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. II (11th Edn. 1968), p. 396

"নরমাত্রের সাধারণ ধর্ম কি? সত্য, দয়া, তপস্যা, শৌচ, তিতিক্ষা, যুক্তাযুক্ত বিবেক, শম, দম, দান, স্বাধ্যায় ও আর্জব।"

এটা করে ওটা পাব। ওটা করে এটা পাব —এই যে বিকিকিনি—স্বামীজীর ভাষায়— 'Trade'। এক জোড়া পাঁঠা দেব কালীঘাটে, মামলায় ঠিক জিতব। এ তো আমরা হরদম করছি। এটা ধর্ম হচ্ছে না। ভাগবতকার মনস্তাত্ত্বিক ছিলেন, মনোবিজ্ঞান জানতেন। তাই বলেছেন—'গ্রাম্যেহোপরমঃ শনৈঃ'—এই যে গ্রাম্য 'ঈহা' ত্যাগ করবে, আমরা এখন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদের কথা বলি। ভাগবতকারও সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্রের কথা বলেছেন: অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ। (ভাগবত, ৭।১১।১০) একলা একলা খাব, তা নয়। 'যথাযোগ্য' 'যথার্হতঃ' যেমন প্রয়োজন সে রকম বণ্টনাদি করে আমরা গ্রহণ করব।

এবার চৈতন্যচরিতামৃতের কথা উল্লেখ করব। চৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীমদ্‌ভাগবত-উক্ত তিরিশটি লক্ষণ না বলে একটু কম করে বলেছেন। চারটি বোধ হয় বাদ দিয়েছেন। কিন্তু মোটামুটি সব এসে গেছে। চৈতন্যচরিতামৃত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলছি:

"কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম,
নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন।
সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ;
অকাম, অনীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ।
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী,
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥"

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, জগদীশ গুপ্ত সম্পাদিত — মধ্যলীলা, ২২শ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা—৫৫২) [ক্রমশঃ]

চারিটি দিব্যবাণী

জ্যোতির্ময়ী দেবী

তুমি-বিশ্ব-বিশ্বময়—বিশ্বলোক, আবার সালোক্য কোথায় মিলে?
সর্বময়-সর্বাশ্রয়-সর্বযুক্ত সর্বরূপ—অখিল নিখিলে।
সালোক্য-সাযুজ্য-সারূপ্য সার্ষ্টি চারি দিব্য বাণী।
সার্ষ্টি রূপ মহিমায় মুগ্ধ ত্রিভুবনখানি।
আনন্দ-বিস্ময়ে মুগ্ধ জীব মেলে আর মুদে দু'নয়ন?
তবু মূঢ় ক্ষুদ্র চিত্ত যাচে পরমার্থ ধন
মহাবাণী মুগ্ধ ঝলসিত দু'নয়ন
বরণ-স্মরণ দিব্য-পরমশরণ। শরণ, শরণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের আলোতে 'গীতা'

ডক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তী

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের কাছে যে সত্য প্রতিভাত হয় —উপনিষদ্ তা প্রকাশ করে বলে মনে করা হয়। উপনিষদের অনেক বাক্যই অতি সংক্ষিপ্ত এবং নানারকম ব্যাখ্যা বা ভাষ্যে নানা অর্থের প্রকাশক। 'তত্ত্বমসি' বাক্য শঙ্করাচার্য যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, রামানুজ সে ভাবে করেননি, একথা অনেকেরই জানা। উপনিষদের মূল সূত্রগুলির এই রকম বিভিন্ন ব্যাখ্যার ফলে বিভিন্ন দর্শন-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্বদ্রষ্টা। তিনি বই পড়ে শাস্ত্র শেখেননি। শাস্ত্রের কথা তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছিল। তাঁর মা (জগজ্জননী) সব তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। একথা তিনি নানা সময়ে বলেছেন। সেজন্যই লক্ষ্য করি, শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও কখনও বিভিন্ন শাস্ত্রের সার অতি সংক্ষেপে অথচ অত্যন্ত গভীর তাৎপর্য-সমন্বিত ভাবে প্রকাশ করেছেন। 'লীলাপ্রসঙ্গ' বা 'কথামৃত' যিনি মনোযোগের সঙ্গে পড়েছেন তিনিই একথা স্বীকার করবেন। উপনিষদ্ বাক্যের যেমন বিভিন্ন ব্যাখ্যা সম্ভব, শ্রীরামকৃষ্ণের কথারও তেমনি নানা ব্যাখ্যা সম্ভব এবং তাতে দার্শনিকতার বীজ নিহিত।

আমরা এই প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের আলোতে গীতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করব। উপনিষদের বাক্যের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যেমন মতভেদ আছে, শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিগুলির ব্যাখ্যা নিয়েও মতভেদ থাকা সম্ভব।

গীতার ধ্যানে বলা হয়েছে—

'সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥'

—উপনিষদাবলী গাভী সমূহ, সেই সকল গাভীর দোগ্ধা শ্রীকৃষ্ণ, বৎস অর্জুন, দুগ্ধ অমৃতময়ী গীতা এবং সুধীজন এই দুগ্ধের পানকর্তা। এখানে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, উপনিষদ্রূপ গাভীর দুগ্ধ বা সার গীতা। বেদান্ত দর্শনের স্মৃতি প্রস্থান বলতে গীতাকেই বোঝায়। অর্থাৎ, গীতা বেদান্তদর্শনের একটি ভিত্তিস্তম্ভ।

সমগ্র মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ সূরী তাঁর গীতা ব্যাখ্যার প্রারম্ভে বলেছেন—

ভারতে সর্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা ॥—

—মহাভারতে সকল বেদের সারার্থ সংগৃহীত। আর সমগ্র মহাভারতের সারতত্ত্ব গীতায় বর্তমান। সেজন্য গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী। সকল শাস্ত্রের সার গীতায় নিহিত।

কেশব কাশ্মীরী সত্যই বলেছেন, 'শ্রীভগবান্ করুণাপূর্বক ভবসাগর পার হইবার জন্য গীতারূপ নৌকা সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার সাহায্যে ভগবদ্ভক্তগণ অনায়াসে সংসার-সমুদ্র অতিক্রম করিতে পারিবেন।' গীতা ধর্মশাস্ত্র এবং এই শাস্ত্র পাঠ করে কেউ যদি সে-ভাবে জীবন যাপন করেন তবে ঈশ্বর-লাভ, শ্রীরামকৃষ্ণের মতে যা মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—তা সম্ভব হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—'শাস্ত্রের দুই রকম অর্থ —শব্দার্থ ও মর্মার্থ। মর্মার্থটুকু ল'তে হয়; যে অর্থ ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে মিলে।'[১] গীতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের কথা অনুসরণ করে বলা যায়, গীতা শুধু শাস্ত্রগ্রন্থ নয়, ভগবানের বাণী বলে মর্মার্থ প্রকাশক।

মণি শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছেন, '(আপনার) সব কথা শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে। নবদ্বীপ গোস্বামীও সেদিন পেনেটিতে সেই কথা বলেছিলেন। আপনি

১ কথামৃত. ৩।৫।২

বললেন যে, 'গীতা' 'গীতা' বলতে বলতে 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' হয়ে যায়। বস্তুতঃ তাগী হয়। কিন্তু নবদ্বীপ গোস্বামী বললেন, 'তাগী' মানেও যা 'ত্যাগী' মানেও তা। তগ্ ধাতু একটা আছে তাই থেকে 'তাগী' হয়।'[২]

গীতা শব্দের বর্ণগুলোকে উল্টে দিলে 'তাগী' হয়, তাগী কথার অর্থ ত্যাগী। ত্যাগী হওয়ার নির্দেশই আছে গীতায়। শ্রীরামকৃষ্ণ এ-বিষয়ে স্পষ্ট করে বলেছেন—'গীতার অর্থ কি? দশবার বললে যা হয়। "গীতা" "গীতা" দশবার বলতে গেলে "ত্যাগী" "ত্যাগী" হয়ে যায়। গীতায় এই শিক্ষা,—হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা কর। সাধুই হোক্, সংসারীই হোক্, মন থেকে সব আসক্তি ত্যাগ করতে হয়।'[৩]

শ্রীরামকৃষ্ণের মতে মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। আসক্তি ত্যাগ না করতে পারলে ঈশ্বরলাভ সম্ভব নয়। গীতায় এই ত্যাগেরই জয়গান।

এবার আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারি। ভারতীয় দর্শনে সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, কোন গ্রন্থের তাৎপর্য নিরূপণের জন্য সেই গ্রন্থের উপক্রমণিকা ও উপসংহার আলোচনা করতে হয়। উপক্রমণিকা ও উপসংহারে যা বলা হয় তা-ই গ্রন্থের মর্মার্থ।

গীতার প্রথম অধ্যায় বিষাদযোগকে উপক্রমণিকা এবং শেষ অধ্যায় বা অষ্টাদশ অধ্যায় মোক্ষযোগকে উপসংহার বলে গ্রহণ করলে দেখা যাবে ত্যাগেই গীতার তাৎপর্য নিহিত। প্রথম অধ্যায়ের শেষে দেখি অর্জুন আত্মীয়-স্বজন ও গুরুজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পরাঙ্মুখ। তাই অস্ত্র ত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্রেই বসে পড়লেন। কিন্তু অর্জুনের এই অস্ত্রত্যাগ প্রকৃত অর্থে ত্যাগ নয়, কারণ অর্জুন এখানে মোহবশতঃ অস্ত্র ত্যাগ করেছেন। তাই ভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্থাৎ উপসংহারে প্রকৃত ত্যাগ কি—তা প্রতিপাদন করেছেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে (শ্লোক—৬৬) ভগবান বলছেন—'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।'—সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে আমাকে শরণ কর, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। এখানে ধর্ম-ত্যাগের কথা। শ্রীমধুসূদন সরস্বতী গূঢ়ার্থ টীকায়, সর্বধর্মের অর্থ করেছেন: বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, সামান্য ধর্ম প্রভৃতি। ভগবান এখানে শরণাগত হতে বলছেন। ভক্ত যদি ভগবানের শরণাগত হন, তবে ভগবান তাঁকে রক্ষা করেন। চণ্ডীতেও 'শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে...'বলে প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'আচ্ছা, তাঁকে (ঈশ্বরকে) আম্মোক্তারি দাও। ভাল লোকের উপর যদি কেউ ভার দেয়, সে লোক কি তার মন্দ করে? তাঁর উপর আন্তরিক সব ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক।' তারপর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ কি করে করা যায় তার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বিড়াল ছানার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। বলেছেন—'বিড়াল ছানার পাটোয়ারি বুদ্ধি নাই। মা মা করে। মা যদি হেঁসেলে রাখে সেইখানে পড়ে থাকে। কেবল মিউ মিউ করে ডাকে। মা যখন গৃহস্থের বিছানায় রাখে, তখনও সেই ভাব। মা মা করে।'[৪] এই প্রসঙ্গে গিরিশ ঘোষের ঠাকুরকে আম্মোক্তারি দেবার কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

অনেকে বলেন, নিষ্কাম কর্মের আদর্শ প্রচার

২ কথামৃত, ৩।১।৪

৩ তদেব, ৩।১।৪

৪ কথামৃত, ১।১২।৫

করাই গীতার উদ্দেশ্য। নিষ্কাম কর্ম করতে হলে কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করতে হয়, ত্যাগ করতে হয় কর্মফল ঈশ্বরের চরণে ঈশ্বর যন্ত্রী আর আমরা যন্ত্র এই ভাবে কাজ করতে হয়। সুতরাং কর্মযোগ যে ত্যাগভিত্তিক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু, গীতা শুধু কর্মযোগ প্রচার করে এ-মতের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'Essays on the Gita' গ্রন্থে। তিনি বলেছেন যে, গীতা শুধু নিষ্কাম কর্মের আদর্শ চরম এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ—এ-কথা প্রচার করে বললে ভুল হবে। গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি সব যোগেরই কথা আছে। শ্রীঅরবিন্দের মতে গীতার বাণী সমন্বয়ের বাণী; জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি সমস্ত কিছুর সমন্বয়েই তার তাৎপর্য।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে (শ্লোক—১৯) বলা হয়েছে—'তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর। অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥'—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—সেহেতু সদা অনাসক্ত হয়ে কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান কর। মানুষ অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। এই শ্লোকে ভগবান স্পষ্টই বলেছেন, নিষ্কাম কর্মের দ্বারা মোক্ষলাভ হয়।

জ্ঞানযোগের দ্বারাও যে মোক্ষলাভ হয় তা গীতার দ্বাদশ অধ্যায় (শ্লোক—৩ এবং ৪) থেকে জানা যায়।

'যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।/ সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥/সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়-গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।/তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥'

—যাঁরা ইন্দ্রিয় সমূহ সংযত করে এবং সর্বত্র সমবুদ্ধি ও সদা সর্বভূতের হিতে রত হয়ে অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন।

ভক্তি থেকে যে মুক্তি হয় একাদশ অধ্যায়ে (শ্লোক—৫৪) তা বলা হয়েছে।

'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥'

—ভগবান বলছেন, কেবলমাত্র অনন্যা ভক্তি দ্বারাই আমাকে স্বরূপতঃ জানতে, প্রত্যক্ষ করতে এবং আমাতে বিলয়রূপ মুক্তি লাভ করতে ভক্তেরা সমর্থ হয়।

রাজযোগের দ্বারা যে মুক্তিলাভ হয় তা জানা যায় পঞ্চম অধ্যায় (শ্লোক—২৭ এবং ২৮) থেকে। সেখানে বলা হয়েছে—

'স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥'

—বাহ্যবিষয় মন থেকে বের করে দৃষ্টি ভ্রূযুগলের মধ্যে স্থির করে নাসিকার মধ্যে বিচরণশীল প্রাণ ও অপান বায়ুর ঊর্ধ্ব ও অধোগতি রোধ করে এবং ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযমপূর্বক ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধশূন্য হয়ে যে মুনি সর্বদা বিরাজ করেন তিনি মুক্ত।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও কর্মযোগ প্রত্যেকটি অন্যনিরপেক্ষ মোক্ষলাভের পথ। গীতা এভাবেই বিভিন্ন যোগের সমন্বয় করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছেন—'অনন্ত পথ—তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি—যে পথ দিয়া যাও, আন্তরিক হলে ঈশ্বরকে পাবে।'[৫]

তবে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ লোকের পক্ষে ভক্তিপথই ভাল, একথা স্পষ্ট করেই বলেছেন। তাঁর কথা—'ভক্তিপথ তোমাদের পথ। এ খুব

৫ কথামৃত, ১।১১।৪

ভাল—এ সহজ পথ। অনন্ত ঈশ্বরকে কি জানা যায়? আর তাঁকে জানবারই বা কি দরকার? এই দুর্লভ মানুষ-জনম পেয়ে আমার দরকার তাঁর পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়। যদি আমার এক ঘটি জলে তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে, এ মাপবার আমার কি দরকার? আমি আধ বোতল মদে মাতাল হয়ে যাই, শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসাবে আমার কি দরকার?'[৬]

শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলেছেন, 'কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ সহজপথ। ভক্তিযোগই যুগধর্ম।'[৭]

এই ক্ষেত্রে লক্ষণীয় এই যে, শ্রীঅরবিন্দ গীতায় যোগ সমন্বয়ের কথা বলেও গীতার মহাবাক্য যে ভক্তিযোগের নির্দেশক তা স্বীকার করেন। তিনি বলেন: গীতার মহাবাক্য—চরম উপদেশ কি, তা আমাদের খুঁজে বের করতে হয় না। কারণ শ্রীভগবানের মুখ দিয়ে তাঁর সর্বশেষ উক্তি হিসাবে 'প্রভুকে হৃদয়ে রেখে সর্বান্তঃকরণে তাঁর শরণ লও। তাহলে তাঁর কৃপায় পরম ও চিরন্তন শান্তি লাভ করবে।'[৮]—বাণীই উচ্চারিত হয়েছে, আর এটিই যেন সমস্ত স্বরগ্রামের মধ্যে উচ্চতম ধ্বনিরূপে ঝঙ্কৃত।

গীতার নবম অধ্যায়ে (শ্লোক—৩৪) বলা হয়েছে:

'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥'

তুমি মদ্গত চিত্ত হও; আমার ভজনশীল ও পূজনশীল হও। কায়মনোবাক্যে আমাকে প্রণাম কর। এরূপে মৎপরায়ণ হয়ে আমাতে মন ও বুদ্ধি সমাহিত করলে আমাকে লাভ করবে।

আবার অষ্টাদশ অধ্যায়ে (শ্লোক—৬৫) বলা হয়েছে—'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।/ মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥'

তুমি আমাতে চিত্ত স্থির কর। আমার ভজনশীল ও পূজনশীল হও এবং আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এজন্য আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি, এরূপেই তুমি আমাকে লাভ করবে।

শ্রীঅরবিন্দ গীতার এই সব মহাবাক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেই বলেছেন, সত্যিকারের যে ভক্ত সে ভগবানের প্রিয় এবং ভগবান তার কাছে ধরা দেবেনই।

আমরা পূর্বে কর্মযোগে কি ভাবে ত্যাগ থাকে, তা আলোচনা করেছি। এখন দেখাব যে, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এবং রাজযোগও ত্যাগ ছাড়া অসম্ভব। তাতেই প্রমাণিত হবে যে, গীতার মূল কথা ত্যাগ, আর শ্রীরামকৃষ্ণ তো তাই বলেছেন।

জ্ঞানযোগে বিবেক ও বৈরাগ্য অপরিহার্য। নিত্য ও অনিত্য বস্তুর পার্থক্য করাকে বিবেক বলে। জ্ঞানী জানেন, একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য, আর সবই অনিত্য। যা অনিত্য তিনি তা ত্যাগ করেন, গ্রহণ করেন যা নিত্য। সেজন্যই ইহামুত্রার্থ ফল-ভোগ-বিরাগ তাঁর হয়। অর্থাৎ, তিনি এই জগতে বা পর জগতে যে কর্মফল ভোগ হবে সে বিষয়ে নিস্পৃহ থাকেন। ফলভোগ অনিত্য। অনিত্য বলেই জ্ঞানযোগীর এ বিষয়ে বৈরাগ্য বা নিস্পৃহতা। বৈরাগ্য ত্যাগেরই নামান্তর। সুতরাং ত্যাগ ছাড়া জ্ঞানযোগ হয় না।

রাজযোগী যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগে বিশ্বাসী। এদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি যোগের বহিরঙ্গ এবং শেষের তিনটি অন্তরঙ্গ। অর্থাৎ, প্রথম পাঁচটি শেষের তিনটির প্রস্তুতিপর্ব প্রকাশ করে এবং শেষের তিনটির সাহায্যেই যথার্থতঃ চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। বহিরঙ্গের শেষ অধ্যায় প্রত্যাহার। প্রত্যাহার না হলে যোগের

৬ কথামৃত, ১।৩।৫ ৭ তদেব, ১।১১।৪ ৮ Essays on the Gita, p. 46

খাসমহলে প্রবেশ করা যায় না। প্রত্যাহার বলতে ইন্দ্রিয়দের তাদের বিষয় থেকে প্রতিনিবৃত্ত করা বোঝায়। চক্ষুর বিষয় রূপ থেকে চক্ষুকে সরিয়ে নিতে হবে, কর্ণের বিষয় শব্দ থেকে কর্ণকে সরিয়ে আনতে হবে, এমনি করে জিহ্বা স্বাদ গ্রহণ করবে না, নাসিকা ঘ্রাণ নেবে না, ত্বক্ স্পর্শ পাবে না। অর্থাৎ, সমস্ত ইন্দ্রিয় তাদের বিষয় ত্যাগ করবে। নইলে যোগ অসম্ভব।

যে ভক্তিযোগ শ্রীরামকৃষ্ণের মতে যুগধর্ম এবং শ্রীঅরবিন্দের মতে গীতার মহাবাক্যের নিহিতার্থ, তাও ত্যাগসাপেক্ষ। ঈশ্বরমনা হতে হলে অন্য বস্তুতে আকৃষ্ট থাকলে চলবে কেন? তা ছাড়া ভক্তিযোগের শেষ কথা—শরণাগতি। স্বয়ং ভগবান বলেছেন—'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ; অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ' (১৮।৬৬)। সব কিছু পরিত্যাগ করে একমাত্র ঈশ্বরের আশ্রয় নিতে হবে। সুতরাং ত্যাগী না হলে তো ভক্ত হওয়া যাবে না। গীতাতে যে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাতে 'বীতরাগ ভয় ক্রোধঃ' আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ ত্যাগের কথা বলা হয়েছে। এসব যারা ত্যাগ করতে না পারেন, তাঁরা স্থিতপ্রজ্ঞ হতে পারেন না। শান্তিলাভের জন্য কামনা ত্যাগ (বিহায় কামান্) এবং নিস্পৃহ হতে বলা হয়েছে।

গীতায় অন্নগ্রহণের সময়ও তা প্রথমে ঋষি, ভূত, পিতৃপুরুষ, মানুষ ও দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদনের কথা বলা হয়েছে। যারা তা করে না তারা পাপান্ন ভোজন করে।

'যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥'
(৩।১৩)

যে ব্যক্তি স্বার্থপরের মত শুধু নিজের জন্য রান্না করে সে ব্যক্তি এখানে নিন্দিত হয়েছে। সবাইকে দিয়ে তবে খেতে হবে। এখানে অন্যের জন্য অন্ন ত্যাগ করেই অন্ন ভোগের বিধান।

নারদ মুনির মতে ভক্তি পরমপ্রেমরূপা। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছাকে কাম বলে, আর কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছার নাম প্রেম। যতক্ষণ স্বার্থ ততক্ষণ প্রেম নেই, যখন স্বার্থত্যাগ তখনই প্রেম। বিষয়ানন্দে স্বার্থসিদ্ধি হয়; কিন্তু স্বার্থত্যাগ না হলে ভূমানন্দ লাভ হয় না।

আসল কথা জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি বা রাজযোগ কোনটাই ত্যাগ ছাড়া হতে পারে না। ত্যাগ না করলে সাংসারিক ভোগ হতে পারে, ভোগ যোগ নয়। যোগ যাকে আধ্যাত্মিক সাধন বা সাধ্য বলা যায় তা ত্যাগের পথেই লভ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—আমার ধর্ম ভালো, আর অন্যের ধর্ম খারাপ, এর নাম মতুয়ার বুদ্ধি। এই বুদ্ধি ভালো নয়। বিভিন্ন ধর্ম ঈশ্বরলাভের বিভিন্ন উপায়। যত মত তত পথ। মতুয়ার বুদ্ধি ত্যাগের মধ্য দিয়েই এই সত্য লাভ করা যায়। গীতাতে স্বয়ং ভগবান বলেছেন—

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥' (৪।১১)

যারা যে ভাবে আমার প্রতি প্রপত্তি স্বীকার করে আমি তাদের সেভাবেই ভজন করি। হে পার্থ, মানবগণ সর্বপ্রকারে আমার ভজনমার্গ অনুসরণ করে।

আমরা একথা মনে রাখি না বলেই ধর্মের নামে নানা অশান্তির সৃষ্টি করি। গীতা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত ধর্মপথেই ইষ্টলাভের সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন।

•

পুরাতনকে ত্যাগ না করলে নূতনকে গ্রহণ করা যায় না। সাংসারিক জীবনের বিষয়ীভাব ত্যাগ না করলেও আধ্যাত্মিক জীবনের আস্বাদন লাভ সম্ভব নয়। গীতা বার বার এ-কথাই বলেছেন।

বাংলার যুগল চাঁদ

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবলোকে চৈতন্য-বৈভব যেমন চমকপ্রদ তেমনি মনোহর, যা দেখে-শুনে অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে শ্রীচৈতন্যলীলার পুনরভিনয় কল্পনা করেছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ কি সত্যসত্যই শ্রীচৈতন্যের পুনরাবির্ভাব?

শ্রীরামকৃষ্ণের সমকালীন ব্যক্তিদের কয়েকজন ও পরবর্তিকালেরও কেউ কেউ বিশ্বাস করতেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই সাড়ে তিনশ বছর পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেহে লীলাবিলাস করে গেছেন। এর পিছনে তাঁদের উদ্ধৃত শাস্ত্রপ্রমাণ ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের সমর্থন লক্ষ্য করবার মতো। চৈতন্য-ভাগবতে দেখা যায়, শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে জননী শচীদেবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'আরো দুই জন্ম এই সংকীর্তনারম্ভে। / হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে।'[১৮] এর ফলে 'শুনিয়া শচীর কিছু স্থির হইল মন।' নবদ্বীপের শোকাকুল ভক্তগণকেও তাঁর আরও দুবার পুনরাবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন, 'এই জন্মে যেন তুমি-সব আমা-সঙ্গে।/নিরবধি আছ সংকীর্তন-সুখ-রঙ্গে ॥/এইমত আরো আছে দুই অবতার।/কীর্তন-আনন্দ রূপ হইব আমার ॥/ তাহাতেও তুমি-সব এই মত রঙ্গে। / কীর্তন করিবা মহাসুখে আমা-সঙ্গে॥'[১৯] আনন্দঘন শ্রীরামকৃষ্ণের 'কীর্তন-আনন্দ রূপ' এবং তাঁর মধ্যে অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা ও বাহ্যদশার বিস্ফুরণ দেখে কেউ কেউ, বিশেষ করে বৈষ্ণবশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রে পারঙ্গমা বিদুষী সাধিকা ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীরাম-কৃষ্ণের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন শ্রীচৈতন্যের পুনরাবির্ভাবের লক্ষণসমূহ। শ্রীচৈতন্যের মতো শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবেশে স্পর্শ করে অপরের মধ্যে ধর্মভাব উদ্দীপ্ত করে দিতেন। দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বর-বিরহ-বিধুর শ্রীচৈতন্যের গাত্রদাহ প্রশমিত হত স্রক্‌চন্দনাদি ব্যবহার করে। ঈশ্বরানুরাগের প্রাবল্যে শ্রীরামকৃষ্ণের গাত্রদাহ দেখা দিলে ব্রাহ্মণীর নির্দেশে তাঁর শরীরে চন্দনের প্রলেপ ও ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হলে তিনদিন পরেই তাঁর শরীরের জ্বালা একেবারে দূর হল। তৃতীয়তঃ ব্রাহ্মণী শ্রীচৈতন্যের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণবপুতে উনিশটি ভাবের সম্মিলন যে মহাভাব—তার অভিস্ফুরণ সনাক্ত করলেন। চতুর্থতঃ ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শুনলেন তাঁর দেড় বছর পূর্বের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। শ্রীরামকৃষ্ণ পালকিতে চড়ে কামার-পুকুর থেকে শিহড়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ লক্ষ্য করেন তাঁর দেহের মধ্য থেকে দুটি কিশোর সুন্দর বালক বেরিয়ে এসে মাঠে ছোটাছুটি করছে—কখনও ফুলের খোঁজে দূরে চলে যাচ্ছে, কখনও বা পালকির নিকটে এসে তাঁর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করছে, কথাবার্তা বলতে বলতে চলেছে। অনেক-ক্ষণ পর্যন্ত আনন্দে বিহার করে তারা দুজনেই শ্রীরামকৃষ্ণদেহে প্রবেশ করে। এই ভাবদর্শনের কাহিনী শুনে ব্রাহ্মণী বলেন, 'বাবা, তুমি ঠিক দেখেছ; এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য এবার এক-সঙ্গে একাধারে এসে তোমার ভিতরে রয়েছেন।' ব্রাহ্মণী তাঁর দাবির সমর্থনে চৈতন্যভাগবত থেকে শ্লোক উদ্ধার করে বলেন, 'অদ্বৈতের গলা ধরি

১৮ শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত, রাধানাথ কাবাসী সম্পাদিত, ২।২৬।২১

১৯ ঐ, ২।২৬।৫—৬

কহেন বারংবার/পুনঃ যে করিব লীলা মোর চমৎকার।/কীর্তনে আনন্দরূপ হইবে আমার॥/ অদ্যাবধি গৌরলীলা করেন গৌররায়।/কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥' কিন্তু ব্রাহ্মণীর সিদ্ধান্ত মথুরানাথ-প্রমুখ অনেকেই মেনে নিতে পারলেন না। অতএব পণ্ডিতদের সভা ডাকা হল। বিচারে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন পণ্ডিত সাধক বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী। বৈষ্ণবচরণ তাঁর সাধনপ্রসূত সূক্ষ্মদৃষ্টিসহায়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ব্রাহ্মণীর অভিমতই সমর্থন করলেন। এ-সকল সিদ্ধান্ত শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগিগণের মন বিস্ময়ে গর্বে ভরপুর হয়ে ওঠে।

আরও একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটে যায় অতঃপর। বৈষ্ণবচরণের আমন্ত্রণে শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়েছিলেন কলুটোলার হরিসভাতে। শ্রীরামকৃষ্ণ একপাশে বসে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শুনছিলেন। সম্মুখেই পুষ্পমালায় সুসজ্জিত ভগবান শ্রীচৈতন্যের উদ্দেশে রচিত আসন। পাঠ শুনতে শুনতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাববিহ্বল হয়ে পড়েন এবং সম্মুখে রাখা চৈতন্যাসনের উপর দাঁড়িয়ে গভীর সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর জ্যোতির্ময় মুখে প্রেমপূর্ণ হাসির দীপ্তি দেখে এবং তাঁর দিব্য ভাবপ্রবাহের প্রভাবে উপস্থিত সকলে হরিধ্বনি করে নাম-সংকীর্তন আরম্ভ করে। নাম শুনতে শুনতে শ্রীরামকৃষ্ণ অর্ধবাহ্যদশায় নেমে আসেন এবং কীর্তনের দলে মিলে মিশে উদ্দাম নৃত্য করতে থাকেন। সেদিনকার অভূতপূর্ব আনন্দোৎসারের স্মৃতি নিয়ে ভাগ্যবান সকলে ঘরে ফিরে যায়। এদিকে চৈতন্যাসন অধিগ্রহণের খবর বৈষ্ণব-সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কালনার ভগবান-দাস বাবাজী শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণকে গর্হিত মনে করে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে কটূকাটব্য করেন। কিছুদিনের মধ্যেই একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত হন কালনাতে ভগবানদাস বাবাজীর নামব্রহ্ম আশ্রমে। সাধনসিদ্ধ বাবাজী সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবোজ্জ্বল দেহ দেখে, তাঁর তেজঃপূর্ণ কথাবার্তা শুনে মুগ্ধ হন। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়। বাবাজী জানতে পারেন ইনিই দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস যিনি কলুটোলায় চৈতন্যাসন গ্রহণ করেছিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। চৈতন্যাসন গ্রহণের যোগ্য অধিকারী বিবেচনা করে তাঁকে সভক্তি প্রণাম করেন।

শেষোক্ত ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণের খ্যাতি বৈষ্ণব-সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়াও ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে পরিচয়ের কিছুকাল পর থেকেই ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন আসরে এবং অন্যত্রও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধি ও হরি-কীর্তনের কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। সমকালীন কলকাতার সমাজে অপর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র রচিত 'চৈতন্যলীলা' অভিনয়। অভিনয় দেখেশুনে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেন তিনি আসল নকল এক দেখেছেন। শ্রীচৈতন্যের ভূমিকায় নটী বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করে বলেন, 'চৈতন্য হোক।' শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশংসা লাভ করে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র তাঁর নাট্যসাধনা সার্থক জ্ঞান করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনচর্যাতে শ্রীচৈতন্যের প্রচ্ছায়া লক্ষ্য করে কেশবচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন, 'আপনি **nineteenth century**-র চৈতন্য।' রোমাঁ রোলাঁও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'চৈতন্যতরুর একটি কুসুমিত শাখা।'

এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তদের বৃহৎ একাংশের মধ্যে একটি অভিমত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তাঁরা প্রচার করতেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যেরই পুনরাবির্ভাব। এ-দলের অগ্রণী মেডিকেল কলেজের অ্যাসিস্টান্ট কেমিকেল

একজামিনর রামচন্দ্র দত্ত। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করবার কিছুকাল পূর্বে রামচন্দ্র চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্তের পরিচয়লাভ করে, তাঁর আচরণ-বিচরণ লক্ষ্য করে তিনি সিদ্ধান্ত করে বসেছিলেন যে চৈতন্যচরিতামৃত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত বৈ তো নয়। তাঁর মতে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্বে রচিত হয়ে গিয়েছিল তাঁর জীবনগাথা, যেমন হয়েছিল রাম না জন্মাতেই রামায়ণ। রামচন্দ্র দত্তের দলে যোগদান করেছিলেন মনোমোহন মিত্র, নবাইচৈতন্য মিত্র, নবগোপাল ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত-প্রমুখ প্রভাবশালী ভক্তগণ। আবার এই গোষ্ঠীর ভক্তগণের বিশ্বাস আরও গভীরে প্রবেশ করেছিল যখন তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শুনতে পেয়েছিলেন, 'আমিই অদ্বৈত—চৈতন্য—নিত্যানন্দ, একাধারে তিন।' এর ফলে রামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীর একাংশের মধ্যে ও বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল একটি কথা, 'পুনরায় গৌরচন্দ্র উদয় ধরায়।'

রামচন্দ্রের নেতৃত্বে এই ভক্তগোষ্ঠী শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে নিত্যনূতন একরূপতা আবিষ্কার করে নিজেদের বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করে তুলছিলেন। তাঁরা লক্ষ্য করেন শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ দুজনেই দিব্যশক্তিধর পুরুষ। বিশ্বম্ভর ও গদাধর নামের মধ্যেও অর্থগত সাদৃশ্য তাঁরা লক্ষ্য করেন। শিশু নিমাই ও শিশু গদাই উভয়ের প্রতি প্রতিবেশিনীগণের তীব্র আকর্ষণ দেখা গিয়েছিল। শিশু নিমাই সম্বন্ধে চৈতন্যভাগবত লিখেছেন, 'যে করয়ে কোলে সেই এড়িতে না জানে।/দেবের দুর্লভ কোলে করে নারীগণে॥' তেমনি শিশু গদাই সম্বন্ধে প্রতিবেশিনীগণ চন্দ্রাদেবীকে বলতেন, 'তোমার ছেলেটিকে সর্বদা দেখতে ইচ্ছা করে, তা কি করি বল, রোজই আসতে হয়।' নিমাইয়ের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শ্রুতিধরত্ব যেমন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তেমনি গদাইয়ের শ্রুতিধরত্ব ও সকলের সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহার তাঁকে গ্রামবাসীদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। শিশু নিমাইয়ের প্রিয় খেলা ছিল সঙ্গীদের নিয়ে তালে তালে হাততালি দিয়ে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে নৃত্য করা। আর গদাইয়ের প্রিয় খেলা সম্বন্ধে পুঁথিকার লিখেছেন, 'প্রান্তরে অন্তর হয়ে কোন বৃক্ষমূলে।/মনোমত খেলা লয়ে যতেক রাখালে॥/ব্রজ-খেলা গদায়ের হয় যেন মনে।/সেই সেই মত খেলা হয় সঙ্গীগণে॥' চৈতন্যভাগবত সবিস্তারে লিখেছেন একটি চমৎকার ঘটনা। এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ মিশ্রবাড়িতে অতিথি হয়ে উঠেছেন। ব্রাহ্মণ নিজের হাতে রান্না করে তাঁর ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করছেন। এমন সময় 'ধূলাময় সর্ব অঙ্গ, মূর্তি দিগম্বর' নিমাই সেখানে উপস্থিত। 'হাসিয়া বিপ্রের অন্ন লইয়া শ্রীকরে।/এক গ্রাস খাইলেন দেখে বিপ্রবরে॥' বার বার তিনবার ব্রাহ্মণের একই অভিজ্ঞতা হয়। শেষকালে ব্রাহ্মণ ধ্যানযোগে 'জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন।' অনুরূপভাবে দেখি পিতা ক্ষুদিরাম একদিন পূজোপকরণ সাজিয়ে রঘুবীরের ধ্যান করছিলেন। সে-সময়ে গদাই এসে পিতার যত্নে গাঁথা মালা নিজের গলায় পরলেন, নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চন্দনে চর্চিত করলেন এবং পিতাকে ডেকে বললেন, 'আমি সেই রঘুবীর দেখনা গো চেয়ে।/কেমন সেজেছি মালা-চন্দন পরিয়ে॥'

পরবর্তী অধ্যায়ে দেখি নবদ্বীপের বিদ্যামদগর্বিত, প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক ও প্রেমিক গৃহস্থ নিমাইয়ের জীবনে এক আকস্মিক পরিবর্তন। নিমাই দিব্য ভাবোন্মত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে পরিণত হয়েছিলেন। আর অজ পাড়াগাঁয়ে লালিত-পালিত লৌকিক বিদ্যা প্রায়-বর্জিত পুরোহিত কবি শিল্পী প্রেমিক গদাধরের জীবনে স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত ভগবৎদর্শনের ব্যাকুলতা তাঁর জীবনে

আমূল এক পরিবর্তন এনেছিল। গদাধর রূপান্তরিত হয়েছিলেন 'ভাবমুখে' স্থিত লোক-শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণে।

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েরই সাধন-জীবনের প্রারম্ভে ব্যাকুলতার একটি ঝড় যেন বয়ে গিয়েছিল। গয়াধামে ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্র-দীক্ষালাভের পর শ্রীচৈতন্যের যে ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছিল, তা ক্রমে অনুরাগের প্রবল বিক্ষোভের রূপ ধারণ করে। তাঁর অবস্থা বর্ণনা করে মুরারি গুপ্ত লিখেছেন,

'রোদিতি স দিনং প্রাপ্য প্রবুধ্য রজনীমুখে।/ দিবসোঽয়মিতি প্রাহ জনা ঊচুরিয়ং ক্ষপা॥/এবং রজন্যাং প্রেমার্দ্রঃ সর্বাং রাত্রিং প্ররোদিতি।/ প্রহরৈকং দিবা যাতে ততোঽসৌ বুবুধে হরিঃ॥/ ততঃ প্রাহ কিয়দ্রাত্রির্বর্ততে প্রাহ তং জনঃ।/ দিবসোঽয়মতিপ্রেম্না ন জানাতি দিনং ক্ষপাম্॥/ কচিচ্ছ্রুত্বা হরের্নাম গীতং বা বিহ্বলঃ ক্ষিতৌ।/ পততি শ্রুতিমাত্রেণ দণ্ডবৎ-কম্পতে কচিৎ॥'[২০]

অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ কাঁদতে কাঁদতে সমস্ত দিন অতিক্রান্ত হলে সন্ধ্যায় কিছুটা বাহ্যজ্ঞান লাভ করে জিজ্ঞাসা করতেন, এখন কি দিন? লোকে তাঁকে বলত, এখন রাত্রি। এরূপে প্রেমার্দ্র হয়ে তিনি সমস্ত রাত্রি কেঁদে কেঁদে অতিবাহিত করতেন। দিনের এক প্রহর অতিক্রান্ত হলে কিছুটা বাহ্যজ্ঞান লাভ করে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, রাত্রি আর কত বাকি? লোকে তাঁকে বলত, এখন তো দিন। এভাবে প্রেমাতিশয্যে তাঁর দিনরাত্রির হুঁশ থাকত না। কখনও শ্রীহরির নাম ও গান শোনামাত্র তিনি বিহ্বল হয়ে দণ্ডবৎ আছড়িয়ে পড়তেন, কখনও বা কাঁপতে থাকতেন।

অনুরূপ অনুরাগ ও ব্যাকুলতার ঝড় শ্রীরাম-কৃষ্ণের জীবনবৃক্ষে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সে-সময়কার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি নিজ-মুখে বলেছিলেন, 'সময়ে সময়ে ভগবদ্বিরহে অধীর হইয়া ভূমিতে এমন মুখঘর্ষণ করিতাম যে কাটিয়া যাইয়া স্থানে স্থানে রক্ত বাহির হইত। ঐরূপে ধ্যান, ভজন, প্রার্থনা, আত্মনিবেদনাদিতে সমস্ত দিন যে কোথা দিয়া এ-সময় চলিয়া যাইত তাহার হুঁশ থাকিত না! পরে সন্ধ্যাসমাগমে যখন চারিদিকে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি হইতে থাকিত তখন মনে পড়িত—দিবা অবসান হইল, আর একটা দিন বৃথা চলিয়া গেল, মার দেখা পাইলাম না। তখন তীব্র আক্ষেপ আসিয়া প্রাণ এমন ব্যাকুল করিয়া তুলিত যে, আর স্থির থাকিতে পারিতাম না, আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িয়া "মা, এখনও দেখা দিলি না" বলিয়া চীৎকার ক্রন্দনে দিক্ পূর্ণ করিতাম ও যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতাম। লোকে বলিত, "পেটে শূলব্যথা ধরিয়াছে তাই অত কাঁদিতেছে।"'[২১]

শুধু কি তাই? তীব্র ব্যাকুলতার ফলস্বরূপ উভয়ের মধ্যেই যোগজ বিকার দেখা দিয়েছিল। উভয়ের ক্ষেত্রেই তাঁদের আত্মীয়স্বজন ও আশ-পাশের লোকজন ঐ ঐশী প্রেমার্তিকে ব্যাধি বলে ভুল ধারণা করেছিল। স্বাভাবিক কারণেই এই রোগ নিরাময়ের জন্য তাদের নানাপ্রকারের চিকিৎসার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু জহুরী জহর চেনে। নবদ্বীপে শ্রীবাসপণ্ডিত শ্রীচৈতন্যের ভাবোন্মাদ অবস্থা দেখে বলেছিলেন, 'মহাভক্তি-যোগ দেখি তোমার শরীরে।/শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে॥' তেমনিভাবে শাস্ত্রজ্ঞা সাধিকা যোগেশ্বরী ব্রাহ্মণী ও বৈষ্ণবাচার্য বৈষ্ণবচরণ ভাবোন্মত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে মহাভাবের বিকাশ দেখতে পেয়ে তাঁর স্তবস্তুতি করেছিলেন।

অবতারপুরুষের সাধনজীবনে দেখা যায়

২০ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্—মুরারি গুপ্ত (৩য় সং) ২।১।২২—২৫

২১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (১৩৮৯), ২ খণ্ড, পৃঃ ১৪১

আগে ফল তারপর ফুল। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়ে ভক্তিশতদল প্রস্ফুটিত হওয়ার পর তাঁরা উভয়েই অনেকরকমের সাধন-ভজন করেছিলেন। উভয়েই শক্তির উপাসনা করেছিলেন। উপরন্তু উভয়েই শিবের ভজনা করেছিলেন। চৈতন্যভাগবত সূত্রে জানা যায় নবদ্বীপে নিমাই-পণ্ডিতের বাড়িতে এক গায়েন ডমরু বাজিয়ে শিবগাথা গাইছিল। শুনতে শুনতে নিমাই ভাবাবিষ্ট হয়ে নাচতে থাকেন, গায়কের কাঁধে চেপে 'হুঙ্কার করিয়া বোলে মুঞি সে-শঙ্কর।' পুরীর পথে তিনি জলেশ্বর, কপোতেশ্বর, ভুবনেশ্বর এবং দাক্ষিণাত্যে শিবকাঞ্চী, সেতুবন্ধ ও অন্যান্য স্থানে শিবদর্শন করেছিলেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণের কৈশোরে শিবের ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে বাহ্যজ্ঞান হারানো, দক্ষিণেশ্বরে 'শিবমহিম্নঃস্তোত্র' পাঠ করতে করতে ভাবে অভিভূত হয়ে পড়া, কাশী মণিকর্ণিকাঘাটে বিশ্বেশ্বরের দর্শনলাভ ইত্যাদি তাঁর শিবারাধনার প্রমাণ। আবার উভয়েই শ্রীরামচন্দ্রের ভজনাও করেছিলেন। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য যে নাম-সংকীর্তন প্রবর্তন করেছিলেন, তার প্রত্যেক পদেই কৃষ্ণনামের সঙ্গে রামনাম পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যের শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ছিল মহাবীরের ভাবানুগা দাস্যভক্তি। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর একটি সুন্দর ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। 'বিজয়াদশমী—লঙ্কা-বিজয়ের দিনে।/ বানর-সৈন্য কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণে॥/হনুমান-আবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লঞা। লঙ্কা-গড়ে চড়ি' ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া॥/"কাহাঁ রে রাবণি।" প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।/"জগন্মাতা হরে পাপী, মারিমু সবংশে॥"/গোসাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার।/সর্বলোক "জয় জয়" বলে বার বার॥'[২২] এদিকে আমরা জানি উপনয়নের পর শ্রীরামকৃষ্ণ অনেককাল রঘুবীরের পূজা করেছিলেন। সাধনকালে মহাবীরের ভাব আরোপ করে কঠোর সাধনা করেছিলেন, সে-সময়ে খাদা-চোখে সীতাদেবীর দর্শনলাভ করেছিলেন।

উভয়েরই অসাধারণ গঙ্গাপ্রীতি ও মাতৃভক্তির অনেক ঘটনা রয়েছে। উভয়েই ত্যাগ, বৈরাগ্য ও তিতিক্ষার আদর্শমূর্তি। উভয়েরই ঈশপ্রেম ভক্তি সাধনার ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। শ্রীচৈতন্য-জীবনের শেষ বারো বছর দিব্যোন্মাদনায় ভরপুর। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের শেষ বারো বছরে দেখা যায় দিব্যভাবের নিরন্তর প্রবাহ। আবার উভয়েরই জীবনচর্যা নিজ নিজ প্রচারিত শিক্ষা ও আদর্শের দৃষ্টান্তস্থল।

ভক্তি-প্রস্রবণের দ্বার উন্মোচিত হলে আনন্দ-চিন্ময়-রসের উৎসার যে মাধুর্য পরিবেশন করে তার গাঢ়তা ও স্বাদ শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুরভাবের উপর নির্ভর করে। এর মধ্যে বাৎসল্য ও মধুরভাবই ভক্তিজগতের শীর্ষস্থানীয়। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েরই জীবন-অঙ্গন দাস্য, বাৎসল্য ও মধুরভাব দ্বারা অভিষিঞ্চিত। শ্রীচৈতন্যের বাৎসল্যভাবের একটি বর্ণনা দিয়েছেন চৈতন্য-ভাগবতকার। একদিন গয়াধামে শ্রীচৈতন্য নিভৃতে বসে গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করছিলেন। এমন সময় তিনি 'কৃষ্ণরে! বাপরে! মোর জীবন শ্রীহরি।/ কোন্ দিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি॥' বলে চীৎকার করে মূর্চ্ছা গেলেন। কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, 'কৃষ্ণ বাপ! আমার প্রাণ! আমি তোমা বিনে আর জীবনধারণ করতে পারছি না। অতিকষ্টে ধৈর্য ধরেছিলাম; কিন্তু আর পারি না, তুমি আর লুকিয়ে থেকো না। তুমি দয়াময়, দর্শন দিয়ে আমার প্রাণ রক্ষা কর।' এরূপ কাতর চীৎকার করে তিনি ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। আর চন্দ্রশেখর-প্রমুখ

২২ শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত, ১।১৫।৩০—৩৬ শ্লোক

সঙ্গীদের বলেন 'তোমরা বাড়ী ফিরে যাও। আমি কৃষ্ণের উদ্দেশে বৃন্দাবন চললাম।' একথা বলে তিনি পাগলের মতো ছুটতে শুরু করেন বৃন্দাবনের উদ্দেশে। শেষপর্যন্ত সঙ্গিগণ তাঁকে অতিকষ্টে নবদ্বীপে ফিরিয়ে আনেন। এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য, শ্রীচৈতন্যের বাৎসল্য বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল ভক্ত পুণ্ডরীকের প্রতি। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও দেখা যায় অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি, তবে অধিকতর উজ্জ্বলাকারে। জটাধারী নামে এক রামাৎ সাধু বাৎসল্যভাবে রামলালা বা রামচন্দ্রের বালমূর্তির সেবা করতেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধ বাবাজীর নিকট রামমন্ত্র গ্রহণ করে বাৎসল্যভাবের সাধনা শুরু করেন। সাধনায় যত অগ্রসর হতে লাগলেন, রামলালার প্রীতিও ক্রমে বাবাজীর চাইতে শ্রীরামকৃষ্ণের উপরেই অধিক দেখা গেল। শেষকালে একদিন বাবাজী সজলনয়নে শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেন, 'রামলালা আমাকে প্রাণের পিপাসা মিটিয়ে দেখা দিয়েছে ও বলেছে, সে তোমার নিকটেই থাকবে। রামলালার যাতে সুখ আমারও তাতেই সুখ। তোমার কাছে সে সুখে আছে ভেবে, সে-ধ্যান করেই আমার আনন্দ হবে।' জটাধারী শ্রীরামকৃষ্ণকে রামলালা বিগ্রহ দান করে বিদায় নিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বাৎসল্যরসের সম্ভোগে ডুবে যান। অল্পকালের মধ্যেই তিনি শ্রীরামচন্দ্রের বালবিগ্রহের অবিচ্ছিন্ন দিব্যদর্শন লাভ করেন। এমনি ভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের বালগোপাল মূর্তিতেও বাৎসল্যভাবের সাধন করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

পঞ্চভাবের সর্বোত্তমভাব—মধুরভাব। মধুরভাবে প্রেমভাবনার মূল থেকে আত্মকেন্দ্রিকতার শেষ অঙ্কুরটুকু উপড়ে ফেলতে হয়। মধুরভাবের সাধন ও আস্বাদন বিষয়ে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েই শীর্ষস্থান অধিকার করে রয়েছেন। গৌড়ীয় গোস্বামিপাদগণ বলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ মধুরভাবের প্রেমাদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃগৌররূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন। যাহোক, চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গলের বিবরণ থেকে অনুমান হয় শ্রীচৈতন্য মধুরভাবের সাধন করেছিলেন। অপরপক্ষে চৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায় তাঁর মধুরভাব আস্বাদনের কাহিনী। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে একদিন শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রশ্নোত্তরে কলিযুগে নাম-সংকীর্তনের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি রাধাভাবে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। লোচনদাস তাঁর 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে' লিখেছেন :

'কতি গেলা আরে মোর ললিতাদি রাধা।/কতি গেলা আরে মোর এ-নন্দ, যশোদা॥/ক্ষণে দন্তে তৃণ করে করুণা করিয়া।/ফুকরি ফুকরি কান্দে চৌদিগে চাহিয়া॥/এ ভব-সংসার-কাল কেমনে ছাড়িব।/সে নন্দ-নন্দন পদ কোথা গেলে পাব॥/ইহা বলি' ছিণ্ডিল গলার উপবীত।/কৃষ্ণের বিরহে দুঃখ ভেল বিপরীত॥/হরি হরি বলি ডাকে—ছাড়য়ে নিঃশ্বাস।/অশ্রুধারা গলে—কিছু না কহে বিশেষ॥/পুলকে পূরিত অঙ্গ অরুণবরণ।'[২৩]

অবশ্য, চৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্যের মধুরভাবে সাধনের ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট। নবদ্বীপে একদিনের ঘটনাংশ বর্ণনা করে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন, 'একদিন গোপীভাবে জগত-ঈশ্বর।/"বৃন্দাবন" "গোপী" "গোপী" বলে নিরন্তর॥/কোন যোগে তঁহি এক পড়ুয়া আছিল।/ভাবমর্ম না জানিঞা সে উত্তর দিল॥/"গোপী গোপী কেনে বোল নিমাঞি পণ্ডিত।/গোপী গোপী ছাড়ি কৃষ্ণ বোলহ ত্বরিত॥/কি পুণ্য জন্মিব গোপী গোপী নাম লৈলে।/কৃষ্ণনাম লইলে সে পুণ্য—বেদে বোলে॥"/ভিন্ন ভাব প্রভুর সে অজ্ঞে নাহি বুঝে।/প্রভু

২৩ শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল—লোচনদাস ঠাকুর পৃঃ ১৩৬

বোলে "দস্যু কৃষ্ণ কোন জনে ভজে ॥/কৃতঘ্ন হইয়া বালি মারে দোষ বিনে ।/স্ত্রীজিত হইয়া কাটে স্ত্রীর নাক কানে ॥/সর্বস্ব লইয়া বলি পাঠায় পাতালে ।/ কি হইব আমার তাঁহার নাম লৈলে ॥"/এত বলি মহাপ্রভু স্তম্ভ হাতে লইয়া ।/পড়ুয়া মারিতে যায় ভাবাবিষ্ট হৈয়া ॥'[২৪] পড়ুয়া পালিয়ে আত্মরক্ষা করে।

আর মধুরভাব আস্বাদনের মাধুর্যমণ্ডিত কাহিনী শ্রীচৈতন্যের জীবনের শেষ কয়েক বছরকে অধ্যাত্মজগতে বিস্ময়কর করে তুলেছে। এই-কালে তাঁর মন-প্রাণ-আত্মা শ্রীকৃষ্ণেই লীন হয়ে থাকত; যদিও অভ্যাসবশে পূর্বের বেগেই তিনি মন্দিরে গমন, শ্রীজগন্নাথদর্শন, সমুদ্রস্নান, ভিক্ষা, ভগবৎপ্রসঙ্গ, কীর্তনাদি করতেন। চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনা, 'উন্মত্তের প্রায় প্রভু করে গান নৃত্য ।/দেহের স্বভাবে করে স্নান ভোজন কৃত্য ॥/রাত্রি হৈলে স্বরূপ রামানন্দে লইয়া ।/আপন মনের ভাব কহে উঘাড়িয়া ॥' কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী গোপীর কিঙ্করী অভিমানে শ্রীচৈতন্যের সর্বত্র কৃষ্ণলীলাদর্শনের একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন। 'একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র-তীরে যাইতে ।/পুষ্পের উদ্যান তথা দেখেন আচম্বিতে ॥/বৃন্দাবন-ভ্রমে তাঁহা পশিলা ধাঞা ।/প্রেমাবেশে বুলে তাঁহা কৃষ্ণ অন্বেষিয়া ॥/রাসে রাধা লঞা কৃষ্ণ অন্তর্ধান কৈলা ।/পাছে সখীগণ যৈছে চাহি' বেড়াইলা ॥/ সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি তরুলতা ।/শ্লোক পড়ি পড়ি চাহি' বুলে যথা তথা ॥ বিরহিণী গোপীগণের উক্তিসকল পাঠ করতে করতে শ্রীচৈতন্য তরুলতাদেরকে শ্রীকৃষ্ণের খবর জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। কারু কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান না পাওয়াতে তাঁর চিত্ত অত্যন্ত কাতর হল। ইতি-মধ্যে অন্তরে যমুনাতটের স্ফুরণ হওয়াতে তিনি যমুনাতটের উদ্দেশে ছুটে চললেন। চরিতামৃতকার লিখছেন,'এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে ।/দেখে তাহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের মূলে ॥/কোটি মন্মথমোহন মুরলীবদন ।/অপার সৌন্দর্য হরে জগৎ নেত্র-মন ॥/ সৌন্দর্য দেখিয়া ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা পাঞা ।/হেন-কালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া ॥' ভূলুণ্ঠিত শ্রীচৈতন্যের দেহে দেখা দিল সাত্ত্বিক বিকারসমূহ। 'পূর্ববৎ সর্বাঙ্গে সাত্ত্বিক সকল ।/অন্তরে আনন্দ আস্বাদ বাহিরে বিহ্বল ॥' কিছুক্ষণ পরে তাঁর বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসে। তিনি চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন। কোথাও শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পান না। তিনি কেঁদে কেঁদে বলেন, 'কাঁহা গেল কৃষ্ণ এখনি পাইনু দর্শন ।/যাঁহার সৌন্দর্য হেরিল নেত্র-মন ॥' তিনি শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরী বর্ণনা করতে থাকেন। তৃপ্তি হয় না। তাঁর আদেশে রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণের রূপের মাধুর্যপূর্ণ শ্লোক বলতে থাকেন। আর তিনি নিজে ব্যাখ্যা করে রসের বিস্তার করতে থাকেন; তাতেও তৃপ্তি হয় না। তাঁর আদেশে রসবেত্তা স্বরূপ সময়োপযোগী একটি জয়দেবের প্রসিদ্ধ গীত গাইলেন, 'রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্ ।/স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥' শ্রীচৈতন্যের প্রেমসমুদ্র উথলে উঠল। তিনি প্রেমাবেশে নৃত্য করতে থাকেন। আনন্দরসের ভাবে জমজম করতে থাকে। অনেকক্ষণ নৃত্য করেও তাঁর সাধ মেটে না। স্বরূপ গান বন্ধ করে দেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের নৃত্য থামে না। তিনি 'বোল' 'বোল' বলে স্বরূপকে গান গাইতে অনুরোধ করেন। ভাবের আতিশয্য বুঝে স্বরূপ সে-অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন।[২৫]

শ্রীরামকৃষ্ণের মধুরভাবের সাধনা ও আস্বাদনের কাহিনী বোধ করি বিচিত্রতর। মধুর-ভাব সাধনের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ নিরন্তর ছয়মাস মেয়েদের মতো বেশভূষা করেছিলেন। ব্রজগোপীর ভাবে তিনি এতই তন্ময় হয়ে থাকতেন যে,

২৪ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, ২।২৫।৮৯—৯২ শ্লোক

২৫ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ৩।১৫।২৮—৯০ শ্লোক

তাঁর পুরুষসত্তার অনুভূতি তখনকার মতো লোপ পেয়েছিল। তাঁর চলন, বলন, হাসি, অঙ্গভঙ্গী সব নারীদের মতো হয়ে গিয়েছিল। ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁকে বাগানে ফুল তুলতে দেখে এক-একদিন সাক্ষাৎ শ্রীমতী রাধারাণী মনে করে বলতেন। শ্রীরাধার কৃপা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন কঠিন জেনে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমতীর স্মরণ মনন ও ধ্যানে তন্ময় হয়ে তাঁর পাদপদ্মে হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা নিবেদন করতে করতে একদিন দেখতে পেলেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সর্বস্বহারা, নাগকেশরপুষ্পের কেশরসকলের ন্যায় গৌরবর্ণা শ্রীরাধিকাকে। শ্রীরাধিকা তাঁকে দর্শন দিয়ে তাঁর শরীরে মিলিয়ে গেলেন। এরপর থেকে তিনি নিজেকে শ্রীমতী বলে জ্ঞান করতে থাকেন। ক্রমে শ্রীমতীর মতো তাঁর দেহেও মহাভাবের লক্ষণসমূহ দেখা দিল। প্রতীক্ষার উৎকণ্ঠায় তিনি উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করতে থাকেন। আহার নিদ্রা বন্ধ হল। বিরহের উত্তাপ শরীরে তীব্র জ্বালার সৃষ্টি করল, শরীরে রোমকূপ দিয়ে সময়ে সময়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরতে লাগল। শ্রীরামকৃষ্ণ পরবর্তিকালে নিজের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছিলেন, 'ঈশ্বরের বিরহ-অগ্নি সামান্য নয়।···আমি এই অবস্থায় তিন দিন অজ্ঞান হয়েছিলাম।···হুঁশ হলে বামনী আমায় ধরে স্নান করাতে নিয়ে গেল। কিন্তু হাত দিয়ে গা ছোঁবার জো ছিল না। গা মোটা চাদর দিয়ে ঢাকা। বামনী সেই চাদরের উপরে হাত দিয়ে আমায় ধরে নিয়ে গিছল।···যখন সেই অবস্থা আসতো, শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে ফাল চালিয়ে যেত! "প্রাণ যায়", "প্রাণ যায়" এই করতা'ম।' অবশেষে তাঁর দীর্ঘপ্রতীক্ষার অবসান ঘটে। 'নীলবর্ণ ঘাসফুলের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট' শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দেখা দিয়ে তাঁর শ্রীঅঙ্গে মিলিয়ে গেলেন। পুঁথিকার লিখেছেন, 'আপনে আপনি প্রভু দেখেন এখন।/তিনিই শ্রীকৃষ্ণ নিজে রাধিকারমণ।' এবং তিনি কখনও বা নিজ পৃথক অস্তিত্ববোধ হারিয়ে নিজেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলে বোধ করছিলেন, আবার কখনও আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সব কিছুকেই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহরূপে দর্শন করছিলেন।

অনুরূপভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের মধুরভাব আস্বাদনের অনেক কাহিনী বিভিন্ন জীবনীকারের লেখনীতে ধরা পড়েছে। 'শ্রীম' অঙ্কিত একটি চিত্র। সুরেন্দ্রের বাগানে সংকীর্তন চলেছে। কীর্তনীয়াগণ মাথুর গাইছে। শ্রীমতীর বিরহ অবস্থা বর্ণনা করে গাইছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট। হঠাৎ দাঁড়িয়ে অতি করুণস্বরে আখর দিচ্ছেন, 'সখি! হয় প্রাণবল্লভকে আমার কাছে নিয়ে আয়, নয় আমাকে সেখানে রেখে আয়।' শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীরাধিকার ভাব হয়েছে। কথাগুলি বলতে বলতেই নির্বাক হলেন; দেহ স্পন্দহীন, অর্ধনিমীলিত নেত্র। সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিস্থ। অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হলেন। আবার সেই করুণস্বরে বলছেন, 'সখি! তাঁর কাছে লয়ে গিয়ে তুই আমাকে কিনে নে। আমি তোদের দাসী হ'ব। তুই তো কৃষ্ণপ্রেম শিখিয়েছিলি—প্রাণবল্লভ!' কীর্তনীয়াদের গান চলতে থাকে।···মথুরায় শ্রীমতীর সখী দূতী হয়ে গেছেন। দূতী ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে ডাকছেন, 'কোথায় হরি হে, গোপীজনজীবন! প্রাণবল্লভ! রাধাবল্লভ! লজ্জা নিবারণ হরি! একবার দেখা দাও।' 'কোথায় গোপীজনজীবন প্রাণবল্লভ!' এ-কথা শুনেই শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন। কীর্তনীয়াগণ উচ্চস্বরে সংকীর্তন করতে থাকেন। কতকটা সংজ্ঞা লাভ করে শ্রীরামকৃষ্ণ অস্ফুটস্বরে বলছেন, 'কিট্ন কিট্ন'। তিনি ভাবে নিমগ্ন। নাম সম্পূর্ণ উচ্চারণ করতে অপারগ।

শ্রীম-কথিত অপর একটি ঘটনা। ভাবাবস্থায় রেলের উপর পড়ে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বাঁ হাত ভেঙে গেছিল। এ-ঘটনার উল্লেখ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'তোমাদের অতি গুহ্যকথা বলচি —···জগন্নাথের সঙ্গে মধুরভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত ভেঙ্গে গেল। জানিয়ে দিলে, "তুমি শরীর ধারণ করেচ—এখন নররূপের সঙ্গে সখ্য, বাৎসল্য এইসব ভাব লয়ে থাকো।"' [ক্রমশঃ]

সুভাষচন্দ্রের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

[১৩৯৩ সংখ্যার পর]

যদি মনে করা হয়—বিবেকানন্দকে কেবল কৈশোরে যৌবনে নৈতিক চরিত্রগঠনের নীতি-নির্দেশক বলে সুভাষচন্দ্র মনে করতেন—তাহলে নিতান্তই ভুল করব। বস্তুত বিবেকানন্দ ব্রহ্মচর্যের উপর জোর দিলেও তার পালনের জন্য গতানুগতিক পদ্ধতি নির্দেশ অপেক্ষা সংযমের দ্বারা শক্তির সংহরণ এবং সেই শক্তি মহৎ আদর্শে উন্মোচনের উপরই বেশি জোর দিয়েছেন। সুভাষচন্দ্রের কাছে বিবেকানন্দ কেবল চরিত্র-নীতি-নির্দেশক নন—পূর্ণ পরিণত চরিত্রের—বলা যায়, পূর্ণ মানবের প্রতীক। বিবেকানন্দের মধ্যে সুভাষচন্দ্র তাঁর কল্পনার পরম মানবকে দর্শন করেছিলেন—এবং সেই মানবের অনবদ্য রূপায়ণও করেছেন। ৬ মে, ১৯৩২, মধ্যপ্রদেশের সিওনি জেল থেকে 'মরাঠা' পত্রিকার সম্পাদককে স্বামীজী সম্বন্ধে যে নাতিদীর্ঘ রচনাটি পাঠিয়েছিলেন (যার কিছু উল্লেখ আগেই করেছি)—তার মধ্যে স্বামীজী সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের সামগ্রিক ধারণার রূপরেখা মিলবে।

এই লেখায় স্বামীজীর চিন্তাবস্তুর উল্লেখ অল্প-স্বল্প আছে, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল বিবেকানন্দের ব্যক্তিরূপের অর্চনা করা। 'ভারত-পথিক' পড়ে মনে হতে পারে, বিবেকানন্দের চিন্তার দ্বারাই তিনি কেবল প্রভাবিত ছিলেন। বস্তুত তা নয়—তাঁকে বেঁধে রেখেছিল ঐ চিন্তাগ্নির আধারপুরুষই। রচনাটির প্রথম বাক্যেই তিনি বলেছেন, "বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলেই আমি আত্মহারা হয়ে যাই।" তারপরেই বলেছেন, "খুব কম লোকের পক্ষেই, এমনকি তাঁর সংস্পর্শে থাকার সুবিধা যাদের হয়েছিল তাদের পক্ষেও, তাঁর সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা বা তাঁকে গভীর-ভাবে বুঝতে পারা অসম্ভব বলেই মনে করি। সমুচ্চ, সুগভীর ও জটিল তাঁর ব্যক্তিত্ব।... এই ব্যক্তিত্বই দেশবাসীর, বিশেষত বাঙালীদের উপর তাঁর অপূর্ব প্রভাবের মূলে। এই প্রকারের পুরুষবীর বাঙালীর মনকে যেমন আকৃষ্ট করে এমন আর কিছু নয়।"

এর পরেই স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের অনবদ্য রূপাঙ্কন:

"ত্যাগে বেহিসেবী, কর্মে বিরামহীন, প্রেমে সীমাহীন, জ্ঞানে গভীর ও বহুমুখী, আবেগে আত্মহারা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণে নির্মম, অথচ শিশুর মতোই সরল—আমাদের এই জগতে সত্যই বিরল ব্যক্তিত্ব তিনি।"

স্বামীজীর নিত্য-বিচ্ছুরিত, সর্বদিকে আলোক-সম্পাতী ব্যক্তিত্বের রূপ ফোটাতে সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর জীবনের কিছু ঘটনা ও তাঁর অসামান্য কিছু উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। প্রধানত নিবেদিতার লেখা থেকেই দৃষ্টান্ত তুলেছেন। বুদ্ধের ও খ্রীষ্টের কাছে প্রণত বিবেকানন্দের কথা বলেছেন, অবনমিতের প্রতি প্রেমে বিহ্বল বিবেকানন্দের কথাও। বলেছেন শক্তির উপাসক সংগ্রামী বিবেকানন্দের কথা, জ্ঞান ও প্রেমের সম্মিলনে ব্রতী বিবেকানন্দের কথা। "আধ্যাত্মিক সাধনের উচ্চতম স্তরের মানুষ—সত্যের সঙ্গে যাঁর প্রত্যক্ষ যোগ—স্বজাতি ও মানবসমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধানে উৎসর্গীকৃত যিনি—সেই বিবেকানন্দের কথাও জেনেছি। জেনেছি সেই অপূর্ব আত্মবিলয়ের রূপ—যিনি পৃথিবী থেকে শীঘ্র বিদায় নিতে উৎসুক ছিলেন, কারণ পরবর্তিদের

স্থান করে দিতে হবে।” এই সকল ও আরও কথা বলার পরেও বিবেকানন্দের মহিমা উন্মোচনের ব্যাপারে স্বীয় অসামর্থ্য জ্ঞাপন করে তিনি বলেছেন, “আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে গেলেও সেই মহাপুরুষের বিষয়ে কিছুই বলা হবে না—এমনই তিনি মহান, এমনই তাঁর বিরাট জটিল চরিত্র।”

যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মনোভাব নিবেদিতার রচনাংশ উদ্ধার করে সুভাষচন্দ্র উপস্থিত করেছেন :

“একদিন তিনি [বিবেকানন্দ] এইভাবে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা করছিলেন। একজন তাঁকে যীশুর বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং মধুর কণ্ঠে উত্তর দিলেন—‘যীশু-খ্রীষ্টের সময়ে আমি জীবিত থাকলে চোখের জলে নয়—বুকের রক্ত দিয়ে তাঁর পা ধুইয়ে দিতাম’।”

এই কথাগুলি লেখার সময়ে সুভাষচন্দ্র কি বিবেকানন্দের সামনে নিজেকে কল্পনার চোখে উপস্থিত দেখছিলেন না—ভাবছিলেন না কি, তিনিও বিবেকানন্দের পা বুকের রক্তে ধুইয়ে দিতেন ?

অবশ্যই ভাবছিলেন, কারণ এই রচনাতেই তিনি বলেছেন :

“আজ তিনি জীবিত থাকলে আমি তাঁর চরণেই আশ্রয় নিতাম।”

গুরু বিবেকানন্দের প্রতি শিষ্যের আনুগত্য সুভাষচন্দ্র কয়েক বৎসর পরে জানিয়েছেন। ৬-৩-১৯৩৬, উদ্বোধন-সম্পাদককে পত্রে লিখেছিলেন :

“শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী, তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব ? তাঁহাদের পুণ্য প্রভাবে আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ। নিবেদিতার মতো আমিও মনে করি যে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্বের দুই রূপ। **আজ যদি স্বামীজী জীবিত থাকিতেন তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন**—অর্থাৎ তাঁকে নিশ্চয়ই আমি গুরুপদে বরণ করিতাম। যাহা হউক, যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের একান্ত অনুগত থাকিব, একথা বলাই বাহুল্য।”

[বিশ্ববিবেক, ১৯২]

৯

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে কোন একদিন সুভাষচন্দ্র গোপনে গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন, আর ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসের কোন একদিন তিনি লোকলোচনের অন্তরালে চলে গেলেন। সুভাষচন্দ্র বেরিয়েছিলেন দেশের মুক্তির সন্ধানে। দেশের মুক্তি বহুলাংশে সম্ভব হয়েছিল তাঁরই সাধনায়। তাঁর নিজের মুক্তি ? অনন্ত মুক্তি ? ইতিহাস এখানে নিরুত্তর।

সুভাষচন্দ্র যখন বেরিয়েছিলেন তখন তাঁর সঙ্গী কে ছিলেন ? নিজের সঙ্গী তিনি নিজেই—যাঁকে নির্মাণ করেছেন বিবেকানন্দ। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসের শেষের দিকে যখন তাঁর জন্ম—ঠিক তার কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর জন্মপত্রিকা পাঠ করছিলেন বিবেকানন্দ—দক্ষিণ-ভারতে দাঁড়িয়ে :

“হে স্বদেশহিতৈষিগণ! তোমরা হৃদয়বান হও, প্রেমিক হও! তোমরা কি অনুভব করছ—কোটি কোটি মানুষ অনাহারে রয়েছে, যুগ যুগ ধরে অনাহারে রয়েছে। অনুভব করছ কি অজ্ঞানের কালো মেঘ ভারতকে আচ্ছন্ন করেছে ? এই চিন্তা কি তোমাদের অস্থির করেছে, তোমাদের চোখের নিদ্রা কেড়ে নিয়েছে ? তা কি তোমাদের রক্তের মধ্যে প্রবেশ করেছে, শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়েছে, হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সঙ্গে মিশে গেছে, এই ভাবনা কি

তোমাদের পাগল করে তুলেছে? দেশের দুর্দশার চিন্তায় কি তোমরা নামযশ, বিষয়সম্পত্তি, স্ত্রীপুত্র, এমনকি শরীর পর্যন্ত ভুলেছ…”

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ও তার পরে সুভাষচন্দ্র একাকী চলেছেন পথে—বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে—আফগানিস্থানে বরফের ঝড়ের মধ্যে—মাইন-বিস্ফোরিত মহাসমুদ্রের অন্তর্দেশ ভেদ করে—ব্রহ্মের দুর্গম অরণ্য-পর্বতে, কর্দমাক্ত পথে। তখন তাঁর আত্মার সহযাত্রী স্বামীজীর এই কথাগুলি:

“আমি অনাহারে শীতে মরতে পারি, কিন্তু হে যুবকগণ! আমি তোমাদের নিকট এই গরিব, অজ্ঞ, অত্যাচারপীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ প্রয়াস—দায়স্বরূপ অর্পণ করছি।”

সুভাষচন্দ্রের সন্তানদল—ভারতের মুক্তি-সৈনিকেরা—সংগ্রাম করছিল। বিবেকানন্দের বাণীতে ছিল তাদের জন্য আগ্নেয় আশীর্বাদ:

“যুদ্ধে নেমে পড়ো। পিছু হটো না। আকাশ থেকে নক্ষত্র খসে পড়তে পারে, জগৎ বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে—তবু যুদ্ধ করতে হবে।”

“সংগ্রাম সংগ্রাম। যতক্ষণ না আলো দেখছ ততক্ষণ সংগ্রাম। এগিয়ে যাও।”

“যুদ্ধে যদি লক্ষ-লক্ষ লোকের পতন হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি, যদি জয়ী হয়ে দু’একজন ফিরে আসে? যে লক্ষ লক্ষ সৈন্যের মৃত্যু হল তারা ধন্য, কারণ তাদের রক্তমূল্যেই জয় হয়েছে।”

“জীবন বিসর্জন দিয়ে তোমরা মানবদেহের শৃঙ্খলের সাহায্যে এমন একটি সেতুবন্ধন করো, যার উপর দিয়ে লক্ষ-লক্ষ লোক জীবনসমুদ্র পার হয়ে যাবে।”

বিবেকানন্দের বিষাণ কণ্ঠ ধেয়ে চলেছে মানুষের মধ্যে চেতনার ঝড় তুলে:

“আমরা সিদ্ধিলাভ করবই করব। শতশত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করবে, আবার শতশত লোক উঠবে। বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানু-ভূতি। অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। এগিয়ে যাও, প্রভু আমাদের নেতা। কে পড়ল ফিরে দেখো না। একজন পড়বে, আর একজন তার স্থান গ্রহণ করবে।”

কোথায় বিবেকানন্দ? কোথায় রামকৃষ্ণ? হৃদয়ে। সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্বরানন্দকে অস্থায়ী আজাদ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান, আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টানের প্রাণের থেকে প্রিয় নেতাজী বললেন—“মহারাজ, আপনার কাছে সেই ছবিটি আছে যাতে মা-কালীর পায়ের কাছে বসে আছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ?” নানা ধর্মমতের সৈনিকদের মন থেকে যিনি সাম্প্রদায়িকতার সকল চিহ্ন মুছে ফেলতে পেরেছিলেন, তাঁর জামার ভিতরে বুক ছুঁয়ে থাকতই গীতা।

এবং তিনি চলেছেন সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মন্দিরে, গহন রাত্রে। সেখানে ধ্যানে নিশ্চল, প্রহরের পর প্রহর। বাইরে প্রলয়ের অট্টরোল—ভিতরে নির্বাক নিষ্কম্প ধ্যানসমাহিতি!

ঐকালে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সঙ্গে কোন্ বার্তা বিনিময় করেছিলেন সুভাষচন্দ্র—আমরা জানি না। যখন সাগরে নদী মেশে, তার ধ্বনির রহস্য পৃথিবীর পক্ষে অনির্ণেয় অনির্বচনীয়—আমরা এইটুকুই জানি।

স্বামীজী মানুষকে যেভাবে ভালবেসেছেন

ডক্টর পরশুরাম চক্রবর্তী

সত্যান্বিদৃক্ষু নরেন্দ্রনাথ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এলেন। বর্তমান যুগের জিজ্ঞাসার প্রতীক নরেন্দ্রনাথ সরাসরি শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ঈশ্বরকে আপনি দেখেছেন?" সহজভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ, দেখেছি, যেমন করে তোমাকে দেখছি ঠিক তেমনি করেই তাঁকে দেখেছি।" শুধু তাই নয়, আরও বললেন, "তোমাকেও তা দেখাতে পারি।"

ঠাকুরের কথা শুনে নরেন্দ্রনাথ তো অবাক্‌ তাঁর সকল দ্বিধা, সকল সংশয় দূর হল। জীবনে ঘটল রূপান্তর। পরশপাথরের স্পর্শে সোনা হয়ে গেলেন তিনি। ঠাকুর তাঁকে অনেক কিছু শেখালেন—আধ্যাত্মিকতা, ভগবান পূজার সার্থকতা, সমাজকল্যাণ, দেশসেবা, মানবকল্যাণ ইত্যাদি। তিনি সব শিখলেন। ঈশ্বরের সন্ধান করতে করতে তিনি বুঝেছিলেন যুক্তি দিয়ে বা বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরলাভ করা যায় না। তাঁকে পাওয়া যায় হৃদয় দিয়ে, অন্তরের অনুভূতি দিয়ে। প্রতিটি কর্মের মধ্যে ঈশ্বরের দর্শন মেলে ও তাঁকে উপলব্ধি করা যায়।

একসময় স্বামীজী ঠাকুরের কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন—তিনি ভাবসমাধিতে থাকতে চান; অহরহ ধ্যানে নিরত থাকতে চান জাগতিক আশা আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে। তখন ঠাকুর তাঁকে নিজের মুক্তির জন্য লালায়িত না হয়ে বিশাল বটবৃক্ষের মতো সকলের আশ্রয়দাতা হতে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, একাজ তো স্বার্থপরতা। নিজের মুক্তি অতি নগণ্য বিষয়। শিব তো সর্বত্র ব্যাপ্ত। চারদিকে দেখ—দেশের কত দুর্দশা! লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে নিরাশ্রয়ে মরে যাচ্ছে। আজ থেকে এদের সেবাই তোমার কাজ। ঠাকুরের এই উপদেশ স্বামীজীর মনে আনল পরিবর্তন। ঠাকুরের পদাঙ্গুলি স্পর্শে স্বামীজীর যেমন 'বিশ্বরূপ দর্শন' হয়েছিল তেমনি এই উপদেশে স্বামীজীর 'দিব্যদৃষ্টি' লাভ হল। তিনি ঈশ্বরসেবার মোড় ফিরিয়ে দিলেন নর-সেবায়। নরসেবার মধ্যে ঈশ্বরসেবার ব্রত তিনি নিজে পালন করলেন ও মানুষকে শেখালেন। ঠাকুরের কাছ থেকে দিব্যদৃষ্টি পাবার পর তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হল এ-যুগের পূজার মন্ত্র—"জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" জীবই শিব। জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা। ঠাকুরের কাছ থেকে যে নবধর্ম স্বামীজী লাভ করলেন তা হল 'মানবধর্ম'। ধ্যানের জীবনের সঙ্গে মানব-সেবার জীবনের কোনও বিরোধ নেই—আছে বরং নৈকট্য।

স্বামীজী দরিদ্রজনসাধারণ এবং নিজের মধ্যে একই ব্রহ্ম, একই শক্তি উপলব্ধি করে বলেছেন, "আমি দিব্যচোখে দেখছি, এদের ও আমার ভেতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র।" স্বামীজী অনুন্নত দুঃখী দরিদ্রদের সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞান করতেন এবং তাঁদের সর্বপ্রকার দুঃখ মোচনের জন্য আত্ম-নিয়োগ করতে বলতেন। নিজে অনুষ্ঠান করে দেখিয়েও গেছেন দরিদ্রনারায়ণ সেবা। একটা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। তখন বেলুড়-মঠের জমির জঙ্গল পরিষ্কার করতে ও মাটি কাটতে প্রতিবছরই কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষ সাঁওতাল আসত। স্বামীজী তাদের সুখদুঃখের কথা শুনতেন। সাঁওতালদের মধ্যে একজনের নাম ছিল কেষ্টা। একদিন স্বামীজী কেষ্টাকে ডেকে

বললেন, "ওরে, তোরা আমাদের এখানে খাবি।" কেষ্টা বলল—"আমরা যে তোদের ছোঁয়া এখন আর খাই না; এখন যে বিয়ে হয়েছে, তোদের ছোঁয়া নুন খেলে জাত যাবেরে বাপ।" স্বামীজী বললেন,—"নুন কেন খাবি? নুন না দিয়ে তরকারি রেঁধে দেবো। তাহলে তো খাবি?" কেষ্টা ঐ কথায় সম্মত হল। তারপর স্বামীজীর আদেশে ঐ সাঁওতালদের জন্য লুচি, তরকারি, মেঠাই-মোণ্ডা, দই ইত্যাদি যোগাড় করা হল। তিনি তাদের বসিয়ে পরিতোষ সহকারে খাওয়াতে লাগলেন। খেতে খেতে কেষ্টা বলল, "হ্যাঁরে স্বামী বাপ, তোরা এমন জিনিসটা কোথা পেলি? হামরা এমনটা কখনো খাইনি।" স্বামীজী তাদের পরিতৃপ্ত করে খাইয়ে বললেন, "তোরা যে নারায়ণ; আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হল।" কী অপূর্ব এই মহাভাব স্বামীজীর!

ভারতের দুর্গতির অন্যতম কারণ দারিদ্র্য—এ-বিষয় উপলব্ধি করেছিলেন স্বামীজী পরিব্রাজক হয়ে সমগ্র-ভারত ভ্রমণকালে। কন্যাকুমারীতে ভারতের শেষ শিলাখণ্ডে ধ্যাননিমগ্ন স্বামীজী ভারতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দারিদ্র্য-দূরীকরণের উপায়ও তাঁর মনে এসেছিল। তাঁর সংকল্প হল—বিদেশে গিয়ে ভারতের অমূল্য জ্ঞান ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দান করবেন, প্রতিদানে চাইবেন দারিদ্র্য-দূরীকরণের বিদ্যা—শিল্প বিজ্ঞান।

আমেরিকায় প্রথমে স্বামীজীকে অনেক বঞ্চনা—অনেক বিদ্রূপ ও দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে হয়েছিল। পরে চিকাগো ধর্ম-সম্মেলনে সনাতন হিন্দুধর্মের মহিমা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যখন তিনি জগদ্বিখ্যাত হয়েছিলেন—তখন জুটেছিল অনেক সম্মান—আদর ও অভ্যর্থনা। চিকাগো শহরের এক ধনী ব্যক্তি তাঁর প্রাসাদোপম অট্টালিকায় নিয়ে গিয়ে স্বামীজীর অনেক আদর-আপ্যায়ন করেন। প্রাসাদের দুগ্ধফেননিভ শয্যায় তাঁর শয়নের ব্যবস্থা হয়। সেই সুখশয্যা ও দ্রব্যাদির প্রাচুর্য দেখে অগণিত দারিদ্র্য-পীড়িত ভারতবাসীর দুরবস্থার কথা তাঁর মনে পড়ে। সুখশয্যা কণ্টকশয্যায় পরিণত হয়। তিনি সারারাত্রি ঘুমুতে পারেননি। চিন্তা-পীড়িত স্বামীজী অশ্রুবিসর্জন করতে করতে ঘরের মেঝেতে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন, আর সেইসঙ্গে চিন্তা করতে থাকেন—"হা আমার দুখিনী মাতৃভূমি! তোমার এত দুর্দশা, আর আমার অদৃষ্টে এই সুখভোগ। আমি এই সৌভাগ্য ও নামযশ নিয়ে কি করব?" স্বদেশে প্রত্যাগমন করে দরিদ্রনারায়ণ সেবায় জীবন কাটাতে স্বামীজী ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন,—"দেশের লোকে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না দেখে এক এক সময় মনে হয়—ফেলে দিই তোর শাঁখবাজানো, ঘণ্টানাড়া, ফেলে দিই তোর লেখাপড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা—সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে ঘুরে চরিত্র ও সাধনাবলে বড় লোকদের বুঝিয়ে কড়িপাতি যোগাড় করে নিয়ে আসি ও দরিদ্রনারায়ণের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দিই।"

স্বামীজীর কাছে ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছিল তুচ্ছ, সর্বাবস্থায় তিনি ছিলেন দরিদ্রদের জন্য চিন্তাকুল। তিনি বলেছিলেন—"যখন সন্ন্যাসী হই, তখন বুঝেসুঝেই এপথ বেছে নিয়েছিলাম, অনাহারে মরতে হবে। তাতে কি হয়েছে? আমি তো ভিখারী; আমার বন্ধুরা সব গরীব; গরীবদের আমি ভালবাসি; দারিদ্র্যকে সাদরে বরণ করি।" তিনি আরও বলেছেন, "আমার ভগবানকে, আমার ধর্মকে, আমার দেশকে—সর্বোপরি দরিদ্র ভিক্ষুককে আমি ভালবাসি। নিপীড়িত, অশিক্ষিত ও দীনহীনকে আমি

ভালবাসি, তাদের বেদনা অন্তরে অনুভব করি, কত তীব্রভাবে অনুভব করি, তা প্রভুই জানেন।" "আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, মানুষকে বিশ্বাস করি; দুঃখী দরিদ্রকে সাহায্য, পরের সেবার জন্য নরকে যেতে প্রস্তুত হওয়া—আমি খুব বড় কাজ বলে বিশ্বাস করি।"

দরিদ্রনারায়ণদের জন্য কি ব্যবস্থা তিনি চেয়েছেন, তা তাঁর নিজের ভাষায়: "গরীব দুঃখীদের জন্য well ventilated (বায়ুচলাচলের পথযুক্ত) ছোট ছোট ঘর তৈরী করতে হবে। এক এক ঘরে তাদের দুজন কি তিনজন মাত্র থাকবে। তাদের ভালো বিছানা, পরিষ্কার কাপড়-চোপড় সব দিতে হবে। তাদের জন্য...ডাক্তার থাকবেন। হপ্তায় একবার কি দুবার সুবিধামত দেখে যাবেন।" দরিদ্রদের জন্য শিক্ষাদান বিষয়ে স্বামীজীর গভীর চিন্তার কথা তাঁর পত্রাবলীতে আছে। এক জায়গায় তিনি বলেছেন—"যদি পর্বত মহম্মদের নিকট নাই আসে, তবে মহম্মদকেই পর্বতের নিকট যেতে হবে। দরিদ্র-লোকেরা যদি শিক্ষার নিকট পৌঁছতে না পারে (অর্থাৎ নিজেরা শিক্ষালাভে তৎপর না হয়), তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙ্গলের কাছে মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সব স্থানে যেতে হবে।"

ভারতের শ্রমজীবিগণ চির অবহেলিত—অথচ তাদেরই পরিশ্রমের ফলেই দেশীয় ও বিদেশীয়-গণের অন্নসংস্থান ও সম্পদবৃদ্ধি। তারা চিরকাল নীরবে অত্যাচার সহ্য করেছে। তাদের নিঃস্বার্থ কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান স্বামীজী উপলব্ধি করেছেন—তাদের মধ্যে সেই নারায়ণকে দেখেছেন এবং তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করেছেন। তিনি বলেছেন—"বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থপরতা, কর্তব্য-পরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য—সে তোমরা ভারতের চির-পদদলিত শ্রমজীবি!...তোমাদের প্রণাম করি।" শ্রমজীবীদের উদ্দেশ্যে এরূপ শ্রদ্ধা আর কেউ জানিয়েছেন কিনা আমাদের অজ্ঞাত। শ্রমজীবীরাই সংখ্যায় বিপুল। তাদের উন্নতিতেই ভারতের উন্নতি—তাদের জাগরণেই ভারতের সুষুপ্তিভঙ্গ—এই হল স্বামীজীর উপলব্ধি। ভারতের পুনর্জাগরণ যে ঘটবে স্বামীজী তা মনে মনে প্রত্যক্ষ করেছেন। ভারতের নব উদ্বোধনে শ্রমজীবীদেরই প্রাধান্য; তাই তাদের উদ্দেশ্যেই স্বামীজীর আহ্বান— "...নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে-মালা মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।"

স্বামীজীর দরিদ্রনারায়ণ সেবা "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সেবাকর্মে দরিদ্র হল উপাস্য, মানুষ উপাসক। পূজার উপকরণ একটি দ্বিপত্র পুষ্প। সে পুষ্পের একটি পত্র শিক্ষা; অপর পত্রটি সেবা। দরিদ্রের আত্মোপলব্ধিতে তথা নিজ পায়ে দাঁড় করানোর প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া উপাসকের কাজ। এই নরনারায়ণ সেবাই মুখ্য ধর্মাচরণ। সমাজে সর্বত্র আজ দারিদ্র্য, অশিক্ষা, বেকারত্ব ও অপরিসীম দুঃখ। এরই মধ্যে দরিদ্রের শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া, মানুষের মতো বাঁচার সুযোগ করে দেওয়া, তাদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার চেয়ে বড় ধর্ম আর হতে পারে না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায়

'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পিতামহ' হিসেবে চিহ্নিত ঋষিকল্প রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র ও বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর গুরু সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন মেদিনীপুরে বিপ্লব আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠক। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে গীতা ও তরবারি স্পর্শ করে তিনি একদিন মেদিনীপুর গুপ্তসমিতিতে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন।[১] ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হলে মেদিনীপুর শহরে এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। আলিপুর কারাভ্যন্তরে নরেন গোঁসাইকে হত্যা করার মূল পরিকল্পক ছিলেন তিনিই। গীতাধ্যায়ী সত্যেন্দ্রনাথ জানতেন যে, এ কাজের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, কিন্তু এসত্ত্বেও তিনি একাজে ব্রতী হয়েছিলেন। নরেন গোঁসাইকে তিনি জানান যে, তিনি রাজসাক্ষী হবেন। পদস্থ পুলিশ কর্মচারী এবং সহবিপ্লবীদের মধ্যেও এখবর প্রচারিত হয়েছিল—তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা দু-একজন বিপ্লবী ছাড়া আর কেউ জানতেন না। মান-অপমান, জয়-পরাজয়, এবং জীবন-মৃত্যুর ঊর্ধ্বে উঠে সেদিন তিনি নিজ লক্ষ্য সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন—মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও ঝাঁপ দিয়েছিলেন এই দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডে।

নরেন গোঁসাইয়ের মৃত্যুতে প্রফুল্ল হয়ে বন্ধুদের তিনি অনেক কথাই বলেছিলেন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের একটি গানের[২] ভাব নিয়ে তিনি একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। যার মূল বক্তব্য ছিল—অচিরে নিশ্চয় ভারতের 'বন্ধন-মোচন' হবে, এই বন্ধনমোচনের কাজে তিনি 'নিজ দেহ-প্রাণ বিসর্জ্জন' করে 'মাতৃঋণ প্রতিদান' করছেন এটাই তাঁর অনন্ত তৃপ্তি।[৩]

হাইকোর্টের বিচারে তাঁর ফাঁসীর হুকুম হল। আত্মীয় ও বন্ধুরা বড়লাটের কাছে আবেদন করার জন্য ধরলেন। আপীলে তাঁর তীব্র আপত্তি ছিল—এমনকি বৃদ্ধা মায়ের বিশেষ আবেদন সত্ত্বেও তিনি রাজী হননি। হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁর মায়ের ইচ্ছার দোহাই দিয়ে তাঁকে রাজী করাবার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আপীলে রাজী হলেন—যদিও জানতেন যে, এতে কোন কাজ হবে না।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সত্যেন কারাগারে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর দর্শন প্রার্থনা করেন। বিশেষ পুলিশ প্রহরায় কারাগারে লোহার গরাদের বাইরে দণ্ডায়মান থেকে বাংলার এই বিখ্যাত মনীষী মুমুক্ষু তরুণ সত্যেনের দর্শনের অনুমতি পান। আচার্য শিবনাথের আগমনে সত্যেন উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন—'আমাকে বলুন কিভাবে পরম শান্তিতে এই নরদেহ ত্যাগ করিব?' শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁকে বলেন—'তোমার মহান্ ও পরম ধার্মিক পিতা ও জ্যেষ্ঠ-তাতের কথা স্মরণ করো—তুমি তাঁহাদের নিকট পরম শান্তি ধামে যাইতেছ। জাগতিক

১ বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা—হেমচন্দ্র কানুনগো, পৃঃ ২২।

২ 'প্রকৃত সন্তান হবে সেই জন
নিজ দেহ-প্রাণ করি বিসর্জন,
যে করিবে মা'র বন্ধন মোচন
হবে তার মাতৃঋণ প্রতিদান।'—বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, পৃঃ ৩২৭।

৩ ঐ, পৃঃ ৩২৭-২৮

সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করো, সমস্ত আসক্তি বিসর্জন দাও—তুমি জান যে এ জগৎ তোমাকে ত্যাগ করিতেই হইবে, অতএব তাহার জন্য প্রস্তুত হও। তোমার তরফে যে আপীল রুজু হইয়াছে, তাহার উপর ভরসা রাখিও না। তোমার মরণ অনিবার্য্য। তোমার সুবিখ্যাত জ্যেষ্ঠতাত রাজনারায়ণ বসুর কথা স্মরণ করো—ভগবানে ভরসা রাখ। অনিচ্ছাকৃত ইচ্ছাকৃত সমস্ত পাপের জন্য ঈশ্বরের মার্জনা ভিক্ষা করো এবং বীরের মত মৃত্যু বরণ করিয়া নাও। ঈশ্বরের নাম জপ করিতে করিতে মৃত্যুবরণ করিও।'

এরপর পণ্ডিত শিবনাথ বৈদিক মন্ত্র পাঠ ও অন্যান্য কিছু শাস্ত্রীয় ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তাঁর উপদেশ মতো সত্যেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন—'ঈশ্বর আমায় শান্তি দাও, নির্ভীকভাবে ও পরম শান্তির সহিত আমায় মরিতে শিক্ষা দাও—আমায় শক্তি দাও হে সর্বশক্তিমান বিভু। আমি পরজীবনের অনিশ্চয়তার চিন্তায় বিচলিত, কিন্তু আমি তোমার শান্তিময় লোকে যাইতে উৎসুক।'

শাস্ত্রীজী তাঁর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বচন উচ্চারণ করেন—'ঈশ্বর তোমায় কৃপা করবেন—আমি নিশ্চিত।'[৪]

কেবলমাত্র এই নয়—তাঁর মানসিক শান্তির জন্য শাস্ত্রীজী তাঁকে গীতা ও কয়েকটি পুস্তক পাঠিয়ে দেন।[৫] পরে তিনি বলেন—'মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়াইয়া সত্যেনের মধ্যে অসাধারণ-ভাবে ঈশ্বরকে জানিবার বুঝিবার ও ঈশ্বরের কৃপালাভের স্পৃহা দেখা দেয়—এইরূপ মুমুক্ষু কখনও কোনো সাধারণ অপরাধীর মধ্যে দৃষ্ট হয় না। সত্যেনের পূর্বপুরুষগণ সকলেই পরম ধার্মিক ছিলেন—সেই ঐতিহ্যই তাহাকে ঐরূপ প্রেরণা দেয়।'[৬]

তাঁর আপীল অগ্রাহ্য হয়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২১ নভেম্বর তাঁর ফাঁসীর দিন স্থির হয়। অবিচল তিনি। ভগ্নী সুরবালা সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি তাঁর মা সম্পর্কে বলেন—'সুবোধ (ছোট ভাই) স্বেচ্ছায় আমেরিকা গিয়েছে—তাঁর (মাতার) ধন তাঁরই আছে কিন্তু চর্মচক্ষে তিনি আর তাকে দেখতে পাচ্ছেন না। সেইরূপ আমিও অত্যন্ত ইচ্ছা ও আগ্রহের সঙ্গে নিশ্চিন্ত ও নির্ভীক হৃদয়ে অন্য এক ধামে যাচ্ছি। আমি সেখানেও তাঁরই থাকব, কেবল আমার দেহ থাকবে না। অতএব তিনি যেন আমার জন্য খেদ না করেন। তাঁকে ভেবে দেখতে বলো অমর আত্মাকে বিনাশ করবার কারও সাধ্য নেই।'[৭]—এ তো গীতারই কথা। গীতা বলছে :

'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং
ভূত্বাঽভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে
হন্যমানে শরীরে ॥'
(গীতা, ২।২০)।

—আত্মা কখনও জাত বা মৃত হন না। আত্মা জন্ম ও মৃত্যুরহিত, অপক্ষয়হীন ও বৃদ্ধিশূন্য, শরীর নষ্ট হলেও আত্মা বিনষ্ট হন না (গীতা, ২।২০)। আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থির, অচল ও সনাতন (গীতা, ২।২৪)। —মৃত্যুর পূর্বে সত্যেন যথার্থই আত্মার স্বরূপ

৪ মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক ইতিহাস, চিত্তরঞ্জন দাস, মেদিনীপুর ইতিহাস রচনা সমিতি, সঙ্গতবাজার, মেদিনীপুর ১৯৬৭, পৃঃ ৭০—৭১

৫ ভারতের বিপ্লব-কাহিনী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৪

৬ মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক ইতিহাস, চিত্তরঞ্জন দাস, মেদিনীপুর, ১৯৬৭, পৃঃ ৭১-এর উদ্ধৃত।

৭ ফাঁসীর সত্যেন, ব্রজবিহারী বর্মন, বর্মন পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৯১—৯২

উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।

বৃদ্ধা মা একবার পুত্রকে দেখতে চান। সত্যেনের শর্ত—'যদি তিনি এখানে আসিয়া না কাঁদেন তবেই সাক্ষাৎ করিতে পারি, নচেৎ নহে।' মাকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বলেছিলেন—'মা, আমার মৃত্যু তোমাকে বড়ই আঘাত করিবে প্রাণে জানি, কিন্তু তীর্থে গেলে লোকে সর্বপ্রিয় ফলটি ভগবানকে দান করিয়া আসে। সেইরূপ দেশের জন্য তোমার সর্বপ্রিয় সন্তানকে দান করিলে এই মনে করিয়া প্রাণে সান্ত্বনা লাভ করিবে।'[৮]

এও গীতার কথা—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, দেবতাগণ যজ্ঞ দ্বারা আরাধিত হয়ে মানুষকে বাঞ্ছিত ভোগ্যবস্তু দান করেন। সুতরাং দেবতা-প্রদত্ত বস্তু দেবতাদের নিবেদন না করে যিনি ভোগ করেন, তিনি তস্কর। (গীতা, ৩।১২)

তাঁর ফাঁসীর পূর্বে এ. সি. রায় নামে জনৈক সুহৃদ সস্ত্রীক দুদিন তাঁকে দেখতে যান। সত্যেন তাঁদের সঙ্গে 'খুব সহাস্যবদনে' দুদিনই স্বদেশী-সংক্রান্ত কথাবার্তা বলেন। তিনি বলেছিলেন—'আমার বা কানাইয়ের মৃত্যু কি ছার। আমাদের মত সহস্র সহস্র মরিলে তবে দেশ উদ্ধার হইবে। তবে দেশে জাগরণ আসিবে।'[৯]

ফাঁসীর দু'দিন পূর্বে অর্থাৎ ১৯ নভেম্বর আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে শেষবারের মতো দেখতে আসেন। সেদিন তাঁর প্রফুল্লতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বলেন—'সমাজের নিয়মানুযায়ী প্রার্থনাদি করে যেন আমার শব দাহ করা হয়।' বিদায়কালে তিনি তাঁদের বলেন—'আমি যাচ্ছি, কেউ ভেবো না। আমি এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত—তিনি আমাকে শান্তি দেবেন।'[১০]

২১ নভেম্বরের সকাল—মৃত্যু-প্রতীক্ষায় সত্যেন তাঁর সেলে বসে আছেন। তাঁকে বলা হল—'সত্যেন্দ্র, প্রস্তুত হও।' তিনি হাসতে হাসতে বললেন—'আমি প্রস্তুত।' কারাকক্ষের দরজা খুলে গেল—হাসতে হাসতে এগিয়ে চললেন তিনি বধ্যমঞ্চের দিকে। নিজের হাতেই ফাঁসীর দড়ি গলায় তুলে নিয়ে অমৃতলোকে যাত্রা করলেন ছাব্বিশ বছরের বীর বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। জনৈক ইওরোপীয় সার্জেন্টের মতে 'আমি যখন তাকে ফাঁসী-মঞ্চে নিয়ে আসবার জন্য তার কারাগার-প্রকোষ্ঠে গেলাম, সে তখন জাগ্রত ছিল। আমি বললাম, "সত্যেন্দ্র, প্রস্তুত হও," সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত" এবং হাসতে হাসতে ধীরে ধীরে সে ফাঁসী-মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল এবং এই সাহসী বালক সাহসের সঙ্গে ও হাসিমুখে ফাঁসী-মঞ্চে ঝুলে পড়ল।' 'সত্যেন্দ্র সাহসের সঙ্গে মৃত্যু বরণ করল। কানাইও সাহসী ছিল। কিন্তু সত্যেন্দ্র ছিল আরও অধিক সাহসী।'[১১] বলা বাহুল্য, যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভ না করলে এভাবে মৃত্যুবরণ করা সম্ভব নয়।

কেবলমাত্র ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাই-লাল বা সত্যেন বসুই নন—সেদিন সব বিপ্লবীই গীতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। ভারতের ব্রিটিশ-বিরোধী মুক্তি-সংগ্রাম তাঁদের কাছে ছিল কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধ-তুল্য। কপিধ্বজ রথের সারথী পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের কাছে ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক। গীতা থেকেই তাঁরা পেয়েছিলেন মান-অপমান দুঃখ-কষ্ট ও জীবন-মৃত্যুর ঊর্ধ্বে ওঠার শিক্ষা।

৮ ফাঁসীর সত্যেন—ব্রজবিহারী বর্মন, বর্মন পাব্লিশিং হাউস, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১১০

৯ ঐ, পৃঃ ১১০ এবং বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, পৃঃ ৩০১

১০ ভারতের বিপ্লব-কাহিনী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৫

১১ বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, পৃঃ ৩০১

সৃষ্টিতত্ত্বপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ

ডক্টর জলধিকুমার সরকার

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোথা হতে এল, কি এর পরিণাম, মানুষ বা অন্যান্য জীবজন্তু জন্মের পূর্বে কোথায় ছিল, অথবা মৃত্যুর পরে কোথায় যায়—এইসব প্রশ্ন চিরকাল চিন্তাশীল মানুষের মনকে নাড়া দিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দেবে। বেদের প্রাচীনতম ভাগেও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়েছে—'কুতো আজাতা, কুত ইয়ং বিসৃষ্টি?'[১]—কোথা হতে জন্মাল, কোথা হতে এসকল নানা সৃষ্টি হল? এই প্রশ্ন না করে আমরা পারি না, কারণ এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে আর একটি চিরন্তন প্রশ্নও রয়েছে, এবং সেটি হল—মানুষের জীবনে যে অবশ্যম্ভাবী তিন প্রকার—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ রয়েছে, তাদের আত্যন্তিক নিবৃত্তি কি করে হয়। জীব ও জীবের উপলব্ধির বিষয় এই জগৎকে যে দৃষ্টিতে দেখা হয়—তার নাম 'দর্শন'[১ক]। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের উদ্ভব হয়েছে—সাংখ্যদর্শন, বেদান্তদর্শন, চার্বাকদর্শন প্রভৃতি। স্বামী বিবেকানন্দের (পরে স্বামীজী বলে উল্লিখিত হবেন) বিভিন্ন রচনাবলী, বক্তৃতা ও পত্রাবলীতে সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁর গভীর চিন্তার নিদর্শন পাই। যদিও তিনি প্রশ্নটিকে সাংখ্য ও বেদান্তের দৃষ্টিতে আলোচনা করেছেন, আধুনিক বিজ্ঞানের পটভূমিতে বিচার করেছেন এবং যদিও সেগুলির মধ্য হতে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আভাস পাই, তা সত্ত্বেও সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমাদের আকৃষ্ট করে। তাঁর ভাষায় "ইহাই (সাংখ্যদর্শনই) সমগ্র জগতের বিভিন্নপ্রকার দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি।...এই কাপিল দর্শনই পৃথিবীতে যুক্তি-বিচার দ্বারা জগত্তত্ত্ব-ব্যাখ্যার সর্বপ্রথম চেষ্টা।"[২]

যে শাস্ত্রে পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের পরিসংখ্যান বা গণনা করা হয়েছে, তাহাই সাংখ্যশাস্ত্র। সাংখ্য দ্বৈতবাদী; এর মূলতত্ত্ব দুটি—পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ নির্গুণ, নিত্য, জ্ঞানস্বরূপ, ক্রিয়ারহিত ও সর্বব্যাপী। প্রকৃতি বিশ্বের মূল উপাদান, মায়া নয়, বাস্তব পদার্থ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে কোন ব্যক্ত পদার্থের কারণ আছে, আবার তার কারণ আছে—এভাবে কারণের কারণ অন্বেষণ করতে করতে যে চরম কারণে আমাদের কারণজিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয়, তাই হল প্রকৃতি—বিশ্বের আদি জননী।[২ক] 'প্রকৃতি' শব্দের আক্ষরিক অর্থ—'প্রকরোতি' অর্থাৎ যা উৎপন্ন করে। প্রকৃতি বা Nature-এর আর এক নাম 'অব্যক্ত', অর্থাৎ যা ব্যক্ত বা প্রকাশিত নয়, কিন্তু যা হতেই সব প্রকাশমান বস্তুর জন্ম হয়েছে। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা; এতে তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ সাম্যাবস্থায় আছে। সাধারণত গুণ বলতে আমরা বুঝি বস্তুর ধর্ম, কিন্তু সাংখ্যে গুণ বলতে বুঝায় দ্রব্যপদার্থ। এ তিনটি গুণের স্বভাব, এরা নিয়ত পরিবর্তনশীল, পরিণত না হয়ে—এরা থাকতে পারে না। পরিবর্তনের, বা পরিণামের বা বিকারের ফলেই হয় সৃষ্টি। সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি হয় না, সেজন্য সৃষ্টি বললেই তার সঙ্গে বিকারও ধরে নিতে হবে। যখনই সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়, অর্থাৎ একটি শক্তি অপর দুটি হতে প্রবলতর হয়ে ওঠে, তখনই শক্তি সমুদয় বিভিন্নরূপে সম্মিলিত হতে থাকে এবং এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয়।

১ ঋগ্বেদ, ১০।১২৯।৬

২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৩।২১

১ক ভারতদর্শন কোষ—পরিশিষ্ট

২ক সাংখ্যকারিকা—ভূমিকা

এই বিশ্বশিশুটি যেন সৌরভের মতো বিশ্বজননীর অঙ্গে মিলিয়ে ছিল, ক্রমবিবর্তনের ধারায় ধীরে ধীরে মূর্ত হয়ে উঠেছে। অন্যভাবে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকে 'ক্রমবিকাশ' বলা যেতে পারে। আবার এমন সময় আসে যখন সকল বস্তুই অর্থাৎ সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড সাম্যাবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হয় অর্থাৎ স্থূল অবস্থা হতে সূক্ষ্ম কারণ অবস্থায় ফিরে যায়, যাকে বলতে পারা যায় 'ক্রমসঙ্কোচ'। সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায় গমনকে 'কল্পান্ত' বলে। ব্রহ্মাণ্ডের এই প্রলয় ও সৃষ্টি, অথবা ক্রমসঙ্কোচ ও ক্রমবিকাশ অনন্তকাল ধরে চলছে।

সাংখ্য বলেন পুরুষের সান্নিধ্যের ফলে পরিণাম-শক্তির উদয় হয়। প্রকৃতির প্রথম পরিবর্তন মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব। পরের পরিবর্তন-রূপ হচ্ছে অহঙ্কার

প্রকৃতি পুরুষ
↓ ⋮
মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব
↓
অহঙ্কার

একাদশ ইন্দ্রিয়
(৫ কর্মেন্দ্রিয়, ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন)

পঞ্চতন্মাত্রা
(শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ)
↓
পঞ্চ স্থূল ভূত (মহাভূত)
(আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী)

এবং অহঙ্কার হতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ তন্মাত্রার সৃষ্টি। পঞ্চ স্থূলভূত পঞ্চ তন্মাত্রার পরস্পর মিশ্রণে উৎপন্ন। সাংখ্য মতে পরমাণু জগতের আদি অবস্থা নয়, ইহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থা হতে পারে। বুদ্ধির সঙ্গেই সাক্ষাৎভাবে পুরুষের সম্পর্ক আছে, অন্য কারণের সঙ্গে নাই। পুরুষ মহৎতত্ত্বের উপর প্রতিবিম্বিত হন; একেই বলে 'সংযোগ' এবং অন্য দৃষ্টিকোণ হতে একে 'বন্ধন' বলা যেতে পারে। সে যাই হোক, মহৎ থেকে যা যা সৃষ্ট হয়—ইন্দ্রিয়, তন্মাত্রা ইত্যাদি—পুরুষ এভাবে সকলের মধ্যেই থেকে যান। মানুষ বা অন্যান্য জীবের বেলায় আমরা এই প্রতিবিম্বিত পুরুষকেই 'আত্মা' বলি। সাংখ্যমতে, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়—যা কিছু প্রকৃতি হতে তৈরি সবই জড় পদার্থ, কারণ তাদের 'মূলবস্তু' অর্থাৎ প্রকৃতি জড়। যা কিছু দেখি বা যা কিছু শুনি সে সকলের ছাপ ইন্দ্রিয়গণ বুদ্ধিকে দেয় এবং বুদ্ধির মাধ্যমে আত্মা বা পুরুষ তা জানতে পারেন।

সাংখ্যদর্শন অনুসারে বুদ্ধি, অহংকার, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চতন্মাত্রা এদের নিয়ে সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গশরীর। বুদ্ধি ও অহংকারকে এক ধরে সূক্ষ্মশরীর হচ্ছে সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট। সূক্ষ্মশরীরের বুদ্ধি, অহংকার ও মন—এই তিনটিকে অন্তঃকরণ বলে, আর প্রাণ হচ্ছে অন্তঃকরণের বৃত্তি বা অন্তর্নিহিত শক্তি। সূক্ষ্মশরীরও জড় পদার্থ এবং অতি সূক্ষ্ম কণিকার দ্বারা গঠিত। সাংখ্য মতে আত্মার বহুত্ব স্বীকৃত; আমাদের সকলের এক একটি আত্মা। সূক্ষ্মশরীর আত্মার ন্যায় অবধ্য। মৃত্যুকালে সূক্ষ্মশরীর স্থূলশরীর হতে বের হয়ে যায় এবং কর্মানুসারে লোকান্তরে তদুপযুক্ত স্থূলদেহকে, (যেমন দেবতা, গন্ধর্ব, মানব প্রভৃতি দেহকে) আশ্রয় করে। কর্মক্ষয়ে আবার ভুক্ত খাদ্যের মাধ্যমে প্রথমে পিতৃদেহে প্রবেশ করে এবং পরে মাতৃজরায়ুতে অর্থাৎ ভ্রূণে অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং আবার স্থূলদেহ ধারণ করে। এইভাবে সূক্ষ্মশরীর অভিনেতার মতো বিভিন্ন স্থূল-দেহরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে দেবতা, গন্ধর্ব, কিন্নর, মানুষ, পশুপক্ষী এমন কি বৃক্ষ প্রভৃতির বেশেও

বিভিন্ন মঞ্চে অভিনয় করে চলে[৩] যতদিন না সূক্ষ্ম-শরীরের সঙ্গে লেগে থাকা আত্মার বিবেকবোধ হয় বা মোক্ষলাভ হয়। সাংখ্য মতে আত্মা শুদ্ধ ও পূর্ণ, তবে সমস্ত স্থূল বা সূক্ষ্মভূত যাদের দ্বারা আমাদের স্থূলশরীর তৈরি, তাদের উপর আত্মা প্রতিবিম্বিত হওয়ায় ভ্রমাত্মক 'আমি' বোধ হয় (যেমন স্বচ্ছ স্ফটিকের উপর লাল ফুল প্রতিবিম্বিত হয়)। জন্ম-জন্মান্তরের ভ্রান্ত সংস্কারের ফলে মানুষ বুঝতে পারে না যে তার দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার 'আমি'টি সত্যিকার 'আমি' নয়; তার সত্যিকার 'আমি'টিকে সে কবে হারিয়ে ফেলেছে। তার বর্তমান 'আমি' তে প্রকৃতি ও পুরুষ মিশে গিয়ে যেন একাকার হয়ে গেছে। তার এই ভুলটাকেই বলে 'স্বরূপবিচ্যুতি'; এর ফলেই তার সংসার, তার ত্রিতাপজ্বালা। সাংখ্য সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা প্রয়োজন মানেন না—প্রকৃতি জড় হয়েও স্বাধীনভাবে জগৎ সৃষ্টি করেন। তবে কপিল এক বিশেষপ্রকার ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন: চেষ্টার ফলে মানবাত্মা মুক্ত হয়ে কিছু দিন প্রকৃতিলীন অবস্থায় থেকে আগামীকল্পের প্রারম্ভে সর্বশক্তিমান পুরুষরূপে আবির্ভূত হয়ে সেই কল্পের শাসনকর্তা হতে পারেন। এই অর্থে তাঁকে 'ঈশ্বর' বলা যেতে পারে, অর্থাৎ আমরা যে কেউ বিভিন্ন কল্পে 'ঈশ্বর' হতে পারি।[৪]

সাংখ্যের একটি মত তাঁর নিজস্ব। একটি মানুষ বা প্রাণী যে নিয়মে গঠিত, সমগ্র জগৎ ব্রহ্মাণ্ডও সেই নিয়মে গঠিত। একটি ব্যক্তির যেমন মন আছে; সেরূপ একটি সমষ্টি বিশ্বমনও আছে। স্থূলশরীর ব্রহ্মাণ্ডের পিছনে সূক্ষ্মশরীর, তার পিছনে অহংতত্ত্ব এবং তার পিছনে সমষ্টি-বুদ্ধি।

দৃষ্টির বিভিন্নতা থাকলেও বেদান্তবাদীরা সাংখ্যের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত যে বাহ্য বস্তুর জ্ঞান, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মনে, এবং পরে বুদ্ধির মাধ্যমে এক সত্তার নিকটে যায় যেটি আত্মা। তবে স্বামীজীর মতে[৫] সাংখ্যের তিনটি মতবাদ-বেদান্ত খণ্ডন করেছেন: (১) প্রথমত: সাংখ্য বলেছেন যে বুদ্ধি ও যুক্তি সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির অধিকারে, আত্মাতে ওগুলি নাই। বেদান্ত বলেন, আত্মার স্বরূপ অসীম, তিনি পূর্ণসত্তাস্বরূপ, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। আত্মার সেই নিরপেক্ষ জ্ঞানই মানবমনের মধ্য দিয়ে এসে আমাদের বিচার, যুক্তি ও বুদ্ধি হয়েছে। (২) সাংখ্য নিয়ন্তা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। স্বামীজী বলেছেন যদি এ সত্য হয় যে এই ব্যষ্টিশ্রেণীর পশ্চাতে প্রকৃতির অতীত এমন একজন পুরুষ আছেন যিনি কোন উপাদানে নির্মিত নন, তা-হলে ওই একই যুক্তি সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের উপরও খাটবে এবং উহার পিছনেও একটি চৈতন্যকে স্বীকার করারও প্রয়োজন হবে। বেদান্ত তাঁকেই 'নিয়ন্তা ঈশ্বর' বলেন। (৩) সাংখ্য আত্মার বহুত্ব বিশ্বাস করেন। বেদান্তের মত—আত্মা একই এবং সেই একই বহুরূপে প্রতীত হচ্ছেন মাত্র।

অদ্বৈত বেদান্তমতে আত্মা বা ব্রহ্ম হতে আকাশ, আকাশ হতে বায়ু, বায়ু হতে তেজ, তেজ হতে জল এবং জল হতে পৃথিবীর সৃষ্টি। শেষের পাঁচটি তন্মাত্রা; এদের সাত্ত্বিক অংশ হতে যথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এবং এদের রাজস অংশ হতে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও গুহ্যেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আবার এদের সম্মিলিত সাত্ত্বিক অংশ হতে অন্তঃকরণ এবং সম্মিলিত রাজস অংশ হতে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে।[৬] অদ্বৈতমতে এই বিশ্বের প্রকৃতপক্ষে

৩ উদ্বোধন, কার্তিক ১০৮৬, পৃঃ ৫০২

৪ বাণী ও রচনা, ৩।২১

৫ তদেব, ৩।৪৫—৫০

৬ উদ্বোধন, কার্তিক ১০৮৬, পৃঃ ৫০৫

কোন অস্তিত্ব নাই। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড, দেবগণ, এবং জন্ম মৃত্যুর অধীন অনন্ত কোটি জীবাত্মা— এ সমস্তই স্বপ্ন বা মায়া। তা হলে অদ্বৈতবেদান্তে সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনাই বা আছে কেন? উত্তরে বলা হয়—যাঁরা অদ্বৈত-বেদান্তের দৃষ্টিতে দেখতে অপারগ, তাঁদের জন্যই এই আলোচনা।

স্বামীজী অদ্বৈত-বেদান্তে বিশ্বাসী হলেও তাঁর কাছ থেকে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে তথ্য পাই, উপনিষদে ঠিক সেই রকম বর্ণনা পাই না। মনে হয় তাঁর বর্ণনাতে তাঁর নিজস্ব মতও অনেকটা যুক্ত হয়ে গেছে। হয়তো এই সত্যদ্রষ্টা ঋষি বেদান্তের চিন্তাধারাকে আধুনিক বিজ্ঞানের পটভূমিতে বাস্তব ও সহজবোধ্য রূপ দেবার জন্য এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে প্রকৃতিতে দুটি বস্তু আছে—একটি 'আকাশ', যেটি উপাদান পদার্থ ও অতি সূক্ষ্ম; অপরটি 'প্রাণ' বা শক্তি। আকাশ ও প্রাণ উভয়ই মহৎ বা ঈশ্বর হতে উৎপন্ন। একটি নূতন কল্পের আদিতে এই অব্যক্ত স্পন্দিত হতে থাকে আর প্রাণ আকাশের উপর ক্রমাগত আঘাতের উপর আঘাত করে; আকাশ ঘনীভূত হতে থাকে, আর ক্রমে ক্রমে আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তি দুটির ফলে পরমাণুর সৃষ্টি হয় এবং অবশেষে প্রাকৃতিক প্রত্যেক পদার্থ যে যে উপাদানে নির্মিত, সেই সকল স্থূলভূতে পরিণত হয়।[৭] বায়ু, মৃত্তিকা, বা সমস্ত দৃষ্ট বা শ্রুত বস্তুই জড়বস্তু এবং তারা আকাশ হতে উৎপন্ন।

কাশীপুরে স্বামীজীর নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল। সমাধিকালের সেই অনুভূতির কথাই 'প্রলয় বা গভীর সমাধি' গানে তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করে গেছেন। তারই বিপরীতক্রমে যেভাবে সৃষ্টি হয় এবং যা সমাধি হতে ব্যুত্থানের সময় তাঁর অনুভূতি হয়েছিল, তার বর্ণনা করেছেন 'সৃষ্টি' সঙ্গীতে। 'প্রলয়' এর শেষ দুই পংক্তি ও 'সৃষ্টি'র প্রথম দুই পংক্তি একই অবস্থার বর্ণনা। প্রথমে দেশকালের অতীত, নামরূপের অতীত, সর্বাতীত অনির্দেশ্য এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বস্তু, যিনি কখনও উচ্ছিষ্ট হন নাই, অর্থাৎ কোন বিশেষণ দিয়েই যাঁকে বুঝানো যায় না। তাঁর থেকেই জগতের কারণ ধারা প্রবাহিত--সেই কারণধারার 'ইচ্ছা' রয়েছে যে কথা উপনিষদে বলা হয়েছে 'তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়'—এক তিনি বহু হবার ইচ্ছা করলেন। তা থেকেই অহং-এর উৎপত্তি বা 'অহমহং'; সেই কারণধারাই প্রকাশ। সেই অপার ইচ্ছাসাগর থেকে কোটি কোটি সূর্যের উৎপত্তি। এইভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি—তাতে অবস্থিত সর্ববিধ জড়-চেতন পদার্থ, জীবের সুখ-দুঃখ-জরা-মৃত্যু। একভাবে দেখলে জীব সেই সূর্যরূপী ব্রহ্মবস্তুর কিরণ, অন্যদিকে (অদ্বৈত-বেদান্তের দৃষ্টিতে) সূর্য ও তার কিরণ অভিন্ন, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। জীবের সৃষ্টি হয় না; জীব নিত্য কূটস্থ স্বপ্রকাশ চৈতন্য, তার আবার সৃষ্টি কি! বড় জোর বলা যায়, উপাধিকৃত সৃষ্টি, ঘটের জলে যেমন ঘটাকাশের সৃষ্টি!

শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি আচার্যগণ সৃষ্টিতত্ত্ব উপনিষদ্ অনুসারে ব্যাখ্যা করেছেন, নিজেদের অনুভূতির কথা জানাচ্ছেন বলে কোথাও ব্যক্ত করেন নাই।[৮] আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা স্বামীজীর অনুভূতির কথা তাঁর নিজস্ব রচনাতেই পাচ্ছি।

৭ বাণী ও রচনা ৩।১৬

৮ স্বামী ধ্যানানন্দের ব্যক্তিগত চিঠি

ত্রিমূর্তিনমনম্

স্বামী হর্ষানন্দ

ঈশাবাস্যমিদং যদস্তি সকলং
হ্যেবেতি বেদৈঃ স্তুতং
যস্যেশস্য নরঃ স্বকর্ম সফলং
কুর্বীত পাদেঽর্পণম্।
যং দৃষ্ট্বা২ত্মনি ভূতজাতহৃদয়ে
মোহো ন শোকোঽস্তি বা
যশ্চৈনঃ সততং গদাধরমহং
যোযোতি মৎ তং ভজে ॥১

অবিরতস্তুতিশক্তের্যস্য পাদস্য নূনং
ছগলকপতিরজ্ঞঃ কালিদাসো বভূব।
ধবলকমলকান্তিঃ সারদামাতৃপাদঃ
সততবিনতমূর্ধ্নো যচ্ছতান্মে মনীষাম্ ॥২

সুরূপস্তেজস্বী ধৃতদৃঢ়বপুর্গানকুশলঃ
মিতির্নো যজ্ঞপ্তেঃ প্রবচনপটুর্গানকুশলঃ।
জগর্জাম্নায়াস্তং ভুবনজনবিনিদ্রামপহরন্
বিবেকানন্দস্য শ্রুতিমুখমতিং প্রেরয়তু মে ॥৩

বেদ যাঁকে স্তুতি করেন—'যা কিছু অস্তিত্ব সবকিছুই ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত', যাঁর শ্রীচরণকমলে মানুষ সমস্ত কর্মফল সমর্পণ করে, যাঁকে নিজের হৃদয়ে এবং সমস্ত প্রাণীর মধ্যে উপলব্ধি করলে মোহ-শোক অপসারিত হয় এবং যিনি আমার সমস্ত পাপ আকর্ষণ করে বিনষ্ট করেন আমি গদাধররূপী (শ্রীরামকৃষ্ণ) সেই ঈশ্বরকে পূজা করি।১

যাঁর পাদপদ্ম সর্বদা পূজা করে এবং যাঁর শক্তিতে একজন মূর্খ মেষপালক রূপান্তরিত হয়েছে মহা কবি কালিদাসে, সেই শুভ্রকান্তিযুক্তা মাতা সারদার পবিত্র চরণকমলে সতত বিনীত প্রার্থনা, তিনি আমাকে কৃপা করে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করুন।২

যিনি সুন্দর, জ্যোতির্ময়, যাঁর শরীর সুগঠিত, যিনি সঙ্গীতকুশলী, অসীম জ্ঞানের আধার, বক্তাশ্রেষ্ঠ, যাঁর মুখমণ্ডল শিশুর ন্যায় সরল ও পবিত্র, বেদান্তবাণী যাঁর বজ্রদীপ্ত ঘোষণায় জগতের বিনিদ্রিত জনগণকে উত্থিত করেছিল, সেই বিবেকানন্দ আমাকে জ্ঞানালোক প্রদান করুন যাতে আমি উত্তমরূপে শ্রুতিবাক্য অনুধাবন করতে পারি।৩

দীনতা সাধন

স্বামী শুদ্ধানন্দ

অনেকে, বিশেষতঃ ভক্তসম্প্রদায়ে, কথায় কথায় আপনাদিগকে দীনহীন বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। অবশ্য, কপটদের কথা ধরিতেছি না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা হীনবোধ সম্ভব কি না, আর যদি সম্ভব হয়, উহা উন্নতির সহায়ক, না, উন্নতির প্রতিকূল? আমার আশঙ্কার কারণগুলি বলিতেছি। যদি যথার্থ বিচার করিয়া দেখি, তবে ত দেখিতে পাই, আমি বাস্তবিক অনেকের হইতে শ্রেষ্ঠ। আমি জগতের সর্ব্বনিকৃষ্ট, এইরূপ ভাবা একটা নিরর্থক ভাবুকতা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? দেখিতেছি, কত লোকে দিন রাত কত ভয়ানক ভয়ানক অন্যায় কর্ম্ম করিতেছে! আমি সত্য সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ না হইলে কিরূপে মনে করিতে পারি, আমি তাহাদের অপেক্ষা হীন? কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, অসৎ ব্যক্তিগণ যে অবস্থাচক্রে পড়িয়া সেই সকল অসৎ কর্ম্ম করিয়াছে, আমি সেই সকল অবস্থায় পড়িলে তাহা অপেক্ষাও গুরুতর অসৎ কর্ম্ম করিতাম না, তাহার প্রমাণ কি? আমি বলি, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হইয়া পড়ে যে, অবস্থাচক্রকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না, আরও ইহাতে এই সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে যে, সকল মানুষই সমান, কারণ, অবস্থাচক্র অতিক্রমে সকলেরই সমান সামর্থ্য। তবে আর আমি অপরের অপেক্ষা হীন হইলাম কিরূপে? সুতরাং বোধ হইতেছে, কেহই সত্যের বিরোধী না হইয়া কখনই এই দীনতা সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

কিন্তু বাস্তবিক এই দীনতা সাধনের অন্যরূপ গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। মানুষ যখন উন্নতি করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার ক্রমশঃ আপনার দিকে প্রখর দৃষ্টি পড়িতে থাকে। অপরের দোষ গুণের আলোচনার দিকে দৃষ্টি ক্রমশঃ কমিয়া যায়। ক্রমশঃ সে দেখিতে পায়, বাস্তবিক যাহাদিগকে আগে অসৎ দেখিতেছিলাম, তাহাদের মধ্যে ভগবান রহিয়াছেন। সেই ভগবানের দিকে তাহার ক্রমাগত দৃষ্টিবশতঃ তাহার বাস্তবিকই সকলের উপর যথার্থ ভক্তি হইতে থাকে। এমন কি, জড় পদার্থগুলির উপর পর্য্যন্ত তাহার যে স্বাভাবিক ঘৃণা, তাহাও ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে থাকে। কিন্তু বাস্তবিক কেবল কি তাহার নিজের উপরই ক্রমাগত ঘৃণা হয়? তাহা কখনই হয় না। তাহার ঘৃণা হয় অহংভাবটীর উপর। যে অহংভাবটীর দরুন আমাদিগকে সকল ভূতে ও সকল বস্তুতে ব্রহ্মবোধ করিতে দেয় না, তাহারই উচ্ছেদে তাহার প্রাণপণ শক্তি নিয়োজিত হয়।

এই অহংভাব দূর করিবার জন্য মহাপুরুষগণ দুইটী পথ নির্দেশ করিয়া থাকেন, ১ম—আমিত্বের প্রসার, ২য়, আমিত্বের সঙ্কোচ। প্রথমটীতে 'আমি' এই সমুদয় জগদ্ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ—সবই আমি, এইরূপ চিন্তা করিতে হয়, দ্বিতীয়টীতে সেই বিরাট্ সর্ব্বব্যাপী পুরুষের সত্তাতে ক্ষুদ্র 'আমি' জ্ঞানটী ধীরে ধীরে ডুবাইতে হয়। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, উভয়টীতেই 'আমি' জ্ঞানের বিনাশ হয়, আবার উভয়টীতে প্রকৃত 'আমি' স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয়। এই উভয় অবস্থাই এক এবং অনির্ব্বচনীয়। এইরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ যথার্থতই জগদ্ব্রহ্মাণ্ডকে ও আপনাকেও প্রকৃত প্রেম ও ভক্তির সহিত পূজা করিতে পারেন।

দীনতার যথার্থ ধারণা করিতে হইলে বুঝিতে হইবে—দীনতা অর্থে আত্মবিসর্জ্জন। আমরা ভ্রান্তবুদ্ধিতে বুঝিয়া থাকি, জগৎ সংসার সমস্ত যেন আমারই জন্য—আমারই সুখভোগের জন্য—সৃষ্ট। এই বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া আমি সংসারে সকলকে

ঠেলিয়া আপনিই অগ্রবর্ত্তী হইতে বাসনা করি। কিন্তু যথার্থ সাধু পুরুষ জানেন, এ সংসার আমার জন্য নহে, সুতরাং তিনি আপনাকে সর্ব্বদা সকলের পশ্চাতে রাখিয়া থাকেন। তাঁহার এই উদাহরণের প্রভাবে সকলেই যদি আপনাকে সকলের পশ্চাৎ রাখিতে চেষ্টা করেন, তাহাতে অতি মহৎ ফলই ফলিয়া থাকে, জগতে সংঘর্ষ একেবারে উঠিয়া যায়; সুতরাং এই আত্মবিসর্জ্জন সাধনেই যথার্থ দীনতা সাধন হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যিনি 'আমি'র বিস্তার করিতে চান, তাঁহারও লক্ষ্য বাস্তবিক অহংবিনাশ। সুতরাং তিনিও প্রকৃত দীনতার সাধক, তাহার সন্দেহ নাই। এই জ্ঞানসাধক যতই উন্নত হউন না, তিনি কখনই ভাবিতে পারেন না, আমি খুব উন্নত হইয়াছি, কারণ, তিনি জানেন, আমি বাস্তবিক অনন্তস্বরূপ, সুতরাং আমি যে একটু উন্নতি করিয়াছি, মনে করিতেছি, তাহা ত কিছুই নয়। মোট কথা, যাহার মনে সর্ব্বদা অতি মহা আদর্শ বিরাজিত, তাঁহার কখন অভিমান আসিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং দিবানিশি ঈশ্বরচিন্তাই দীনতা লাভের সর্বোৎকৃষ্ট সাধন।

আমরা আমাদের অভিমান নানাপ্রকার লৌকিক বিষয়ের উন্নতির উপরও স্থাপিত করিয়া থাকি। আমি ধনী, আমি সদ্বংশজাত, আমি বিদ্বান পণ্ডিত, এই সকল অভিমান সচরাচর আমাদের হইয়া থাকে। আমরা যদি ধনমান বিদ্যা প্রভৃতির অনিত্যত্ব সর্ব্বদা চিন্তা করি এবং নিত্য অনন্ত পদার্থের চিন্তায় দিবানিশি মনকে ডুবাইয়া রাখিতে পারি, তবে এই সকল অভিমান ধীরে ধীরে কোথায় পালাইয়া যায়! নিউটনের সেই কথা স্মরণ করুন,—আমি অনন্ত জ্ঞানসমুদ্রের তটে কতকগুলি উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র, অনন্ত সমুদ্র সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। সক্রেটিসকে যখন ডেলফির প্রত্যাদেশবাণী গ্রীসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া ঘোষণা করিল, তখন তিনি আপনার মহত্ত্বের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে জানিলেন, আমি যে কিছু জানি না, আমি এইটাই জানি বলিয়াই আমাকে লোকে এত বড় বলিতেছে। বাস্তবিক যে প্রকৃত দীন, সেই যথার্থ সত্যের উপাসক—সে জগতের মধ্যে আপনার স্থান কতটুকু, জগতের সঙ্গে তাহার কি সম্বন্ধ, তাহা জানিয়াছে। সে বুঝিয়াছে, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমি একটী ক্ষুদ্র বেঙ্গাচিতুল্য; সে বুঝিয়াছে, জগতে যাহাদিগকে নগণ্য তুচ্ছাৎ তুচ্ছতম পদার্থ বলিয়া গণ্য করিতেছে, আমিও এক সময়ে সেই সকল ছিলাম। ক্রমবিকাশে আমি এখন এই মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছি, আবার কত উন্নতি হইবে, কে জানে?

দীনতা ব্যতীত উন্নতির কোন সম্ভাবনা থাকে না। অভিমানের অর্থ উন্নতির গতি রোধ—যে অবস্থায় আছি, তাহাতেই তৃপ্তি—সীমাবদ্ধ হইয়া থাকা। দীনতা ব্যতীত অপরের মহত্ত্ব বুঝা যায় না, অপরের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বদা অন্ধ হইয়া থাকিতে হয়, মনের প্রসার হয় না।

অতএব মনকে সর্ব্বদা এরূপ ভাবে গঠন করিতে হইবে, যাহাতে আমাদের জগতে সর্ব্ববিধ দোষ-দর্শন সত্ত্বেও সর্ব্বদা উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবের সম্ভবনীয়তাতে বিশ্বাস হয়। এই বিশ্বাস ব্যতীত কখন উন্নতি হইতে পারে না।

পূর্ব্বে দীনতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাতে অবশ্য শেষ বুঝিতে পারা গেল, এই দীনতা একটী মহাশক্তিস্বরূপ। এই দীনতার তেজের নিকট যাহাদিগকে আমরা বড় লোক বলি, রাজা মহারাজা, বিদ্বান সকলকেই মাথা নুয়াইতে হয়। অতএব এই দীনতা সাধনকে আমরা যেন কখন না ভুলি।*

* 'উদ্বোধন'-এর ৪র্থ বর্ষ, ২১শ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।
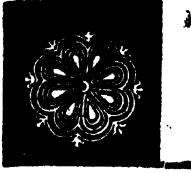
পুস্তক সমালোচনা

কলাপ প্রশস্তিঃ—(একাঙ্কনাটিকা, কলাপ-সূত্রসমেতা) অবনীশংকর ভট্টাচার্যেণ প্রণীতা। পৃষ্ঠা ২৫+৩৪+২০, মূল্য ঃ ৫ টাকা।

কলাপচন্দ্রিকা—অবনীশংকর ভট্টাচার্যেণ প্রণীতা, পৃষ্ঠা ২২৬+৩৪, মূল্য ঃ ২৫ টাকা।

প্রকাশক ঃ সুজন চন্দ্র, আনন্দশ্রী, ৫৬ এ, আনন্দমঠ, ইছাপুর, ২৪ পরগনা।

শব্দব্যুৎপাদক শাস্ত্র হল ব্যাকরণ। ভাষার বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ এবং ভাষার শৃঙ্খলা রক্ষাই ব্যাকরণের মূল উদ্দেশ্য। বেদকে পুরুষ কল্পনা করে ব্যাকরণকে সেই পুরুষের মুখস্বরূপ বলা হয়েছে—'মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।' শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ—এই ছয় শাস্ত্র বেদপুরুষের ষড়ঙ্গ। এগুলি আয়ত্ত হলে বেদার্থের বোধ হয়—এদের পাঠই সাঙ্গবেদাধ্যয়ন। ভারতবর্ষে ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রচার ও প্রসার খুব বেশি পরিমাণেই হয়েছে,—এমন কি ব্যাকরণকে দর্শন-শাস্ত্রের পর্যায়ে পর্যন্ত উন্নীত করা হয়েছে। ব্যাকরণের 'স্ফোটবাদ' প্রসিদ্ধ।

বিভিন্ন ব্যাকরণের মধ্যে পাণিনির ব্যাকরণ সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' যুগান্তর সৃষ্টিকারী এক ব্যাকরণ, সংস্কৃত সাহিত্যাকাশে দিঙ্‌নির্ণায়ক উজ্জ্বল ধ্রুবতারা। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির হাতে সম্পূর্ণতা লাভ করে। তাই এর নাম 'ত্রিমুনি ব্যাকরণ'। টোল, চতুষ্পাঠী, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ব্যাকরণের পঠন-পাঠনই সমধিক প্রচলিত। 'অষ্টাধ্যায়ী'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ হল পতঞ্জলি রচিত 'মহাভাষ্য'। মহাভাষ্যে বৈয়াকরণের প্রশংসা করে একটি বাক্য আছে। তা হল—"প্রথমে বিদ্বাংসো হি বৈয়াকরণাঃ"—তাঁরাই প্রথম বিদ্বান্ যাঁরা ব্যাকরণ জানেন। এই উক্তি থেকেই ব্যাকরণের স্থান কত উচ্চে, তা অনুমেয়। পাণিনির পূর্ববর্তী বৈয়াকরণগণের নামোল্লেখ থাকলেও তাঁদের গ্রন্থ পাওয়া যায় না। পাণিনি ব্যাকরণের রচনার পর অনেক ব্যাকরণ রচিত হয়। এগুলির মধ্যে আছে শর্ববর্মার কলাপ-কাতন্ত্র, বোপদেবের মুগ্ধবোধ, অনুভূতি স্বরূপাচার্যের সারস্বত, পদ্মনাভের সৌপদ্ম, ক্রমদীশ্বরের সংক্ষিপ্তসার, প্রয়োগরত্নমালা, হরিণামামৃত ইত্যাদি।

শর্ববর্মা রচিত 'কলাপ' ব্যাকরণ আকারে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু প্রকারে নয়। এই ব্যাকরণের প্রচার ও প্রসার পূর্ববঙ্গে, আসামে, শ্রীহট্টে সমধিক ছিল। বর্তমানে এর প্রচার খুবই সীমাবদ্ধ, অধুনা শুধু কোনও কোনও চতুষ্পাঠীতে এই ব্যাকরণ প্রচলিত আছে। কলাপ ব্যাকরণ রচনার মূলে একটি কাহিনী আছে। তা হল—শকাব্দ-প্রবর্তক রাজা শালিবাহন একদা মহিষীর সঙ্গে জলক্রীড়া করছিলেন। জলক্রীড়ায় ক্লান্তা রাজমহিষী রাজার উদ্দেশ্যে বললেন—"মোদকং দেহি রাজন্। যার অর্থ—রাজন্, জল দ্বারা আমাকে আঘাত করবেন না (মা+উদকম্)। কিন্তু রাজা ছিলেন সংস্কৃতভাষায় অজ্ঞ। বাক্যের অর্থ না বুঝে তিনি রাজমহিষীর উদ্দেশ্যে মোদক অর্থাৎ মিষ্টান্ন আনালেন। তা দেখে মহিষী হেসেছিলেন। জল-সিঞ্চন-নিষেধার্থক সংস্কৃত বাক্যের দ্বারা সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞ

রাজা নিজেকে অপমানিত মনে করলেন ও বিষণ্ণ হলেন। রাজা দুঃখে দিন কাটাচ্ছেন। রাজার দুজন পণ্ডিত অমাত্য ছিলেন—শর্ববর্মা ও গুণাঢ্য। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য দুই অমাত্য রাজাকে উৎসাহিত করলেন। পণ্ডিত শর্ববর্মা রাজাকে ছয় মাসের মধ্যে শিক্ষিত করার প্রতিজ্ঞা করলেন। রাজাকে শিক্ষাদানের জন্য শর্ববর্মা 'কলাপ' ব্যাকরণ রচনা করলেন ও রাজাকে ঐ ব্যাকরণ পাঠ করালেন। রাজাও ছয় মাসের মধ্যে সংস্কৃতভাষায় শিক্ষিত হয়ে উঠলেন। দুই অমাত্যের মধ্যে রাজাকে শিক্ষিত করার সময়-সীমা নিয়ে তর্কবিতর্ক ও প্রতিযোগিতা হয়। পণ্ডিত গুণাঢ্য পরাজিত হয়ে বনে গমন করেন ও প্রাকৃতভাষায় 'বৃহৎকথা' রচনা করেন।

সমালোচ্য গ্রন্থ দুটির একটি একাঙ্ক নাটিকা—কলাপপ্রশস্তিঃ, অপরটি ব্যাকরণগ্রন্থ—কলাপ-চন্দ্রিকা। রচনা করেছেন পণ্ডিতপ্রবর অবনীশঙ্কর ভট্টাচার্য। কলাপ ব্যাকরণের প্রশস্তিসূচক একাঙ্ক নাটিকাটিতে শর্ববর্মারচিত 'কলাপ' রচনার কাহিনীটি বিধৃত। নাটিকাটির অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে ও অভিনয় দেখে শিক্ষার্থীরা সংস্কৃত শিক্ষায় উৎসাহিত হবে। নাটিকাটির শেষাংশে কলাপ-সূত্রও দেওয়া আছে। নাটিকাটি সুলিখিত।

কলাপচন্দ্রিকায় লেখক কলাপ ব্যাকরণের সূত্রগুলির বঙ্গানুবাদসহ টীকাটিপ্পনী সংযোজন করেছেন। সুসম্পাদিত হয়েছে গ্রন্থটি। অধ্যাপনায় নিযুক্ত থেকে শিক্ষার্থীদের অসুবিধার কথা হৃদয়ঙ্গম করে লেখক গ্রন্থটি সহজবোধ্য করার চেষ্টা করেছেন, এবং এ চেষ্টায় তিনি সফল হয়েছেন। কলাপচন্দ্রিকার ভূমিকা লিখে গ্রন্থের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করেছেন বিদ্বৎসমাজে খ্যাতকীর্তি পণ্ডিতপ্রবর বিধুভূষণ ভট্টাচার্য। তিনি এখন লোকান্তরিত। ভূমিকায় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন কারণে সংস্কৃত পঠনপাঠন অনাদৃত ও সংস্কৃতচর্চায় রত পণ্ডিত মহাশয়গণ হতাশাগ্রস্ত। এমত অবস্থায় লেখকের উদ্যম প্রশংসাযোগ্য। গ্রন্থ দুটির প্রচ্ছদ সুদৃশ্য। ছাপার ভুল আছে। শুদ্ধিপত্র দেওয়া আছে। আশা করব, পরবর্তী সংস্করণে শুদ্ধিপত্র দেওয়ার প্রয়োজন থাকবে না। বিস্তৃতভাবে সংস্কৃত-ভাষায় সূত্রগুলির ব্যাখ্যা দেওয়া থাকলে ভাল হত। গ্রন্থ দুটির মূল্য অসামান্য। গ্রন্থ দুটির বহুল প্রচার কামনা করি।

— ডক্টর পরশুরাম চক্রবর্তী

সূরপদ-রত্নাবলী—রামবহাল তেওয়ারী, ২৪ অক্টোবর, ১৯৮৪ (দীপাবলী)। প্রকাশক: ডঃ সিদ্ধেশ্বরনাথ শ্রীবাস্তব, সাধারণ সম্পাদক, সূর-স্মারক মণ্ডল, ইং ১১০ কমলানগর, আগ্রা—২৮২০০৫, উত্তর-প্রদেশ। পৃষ্ঠা VII—XV+১—২০১, মূল্য: চল্লিশ টাকা।

মধ্যযুগের হিন্দী কবিকুল সম্পর্কে একটি সুভাষিতের তাৎপর্য—সূর-সূরজ অর্থাৎ কবি সূরদাস (বাংলায় সুরদাস শব্দটিই বেশি পরিচিত) সূর্যের তুল্য, তুলসী শশী অর্থাৎ তুলসীদাস চন্দ্রের তুল্য, উড়সান কেশোদাস অর্থাৎ কেশোদাস নক্ষত্রের সঙ্গে তুলনীয়। আর আর কবি খদ্যোতসম অর্থাৎ জোনাকির মতো এখানে সেখানে প্রকাশিত।

রামচরিতমানস-রচয়িতা তুলসীদাসের রচনার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের কিছু কিছু পরিচয় আছে, কেননা বাংলা অক্ষরেও তাঁর এই অমর কাব্যটি মুদ্রিত হয়েছে এবং এটির অনুবাদও পাওয়া যায়। সূর্যসদৃশ জ্যোতিষ্মান্ কবি সুরদাস কিংবদন্তী-পুরুষরূপে পরিচিত হলেও তাঁর মূল রচনাবলীর সঙ্গে বাঙালী পাঠকের সাক্ষাৎ পরিচয় যৎসামান্য। বাংলা হরফে মুদ্রিত দুশো পঞ্চান্নটি পদের এই সংকলনটি কেবল বাংলা সাহিত্যের একটি অভাব মোচন করবে তা নয়, বাঙালী

পাঠককে সুরদাস-বিরচিত কাব্যপাঠের বিমল আনন্দের অধিকারী করবে।

ডঃ শ্রীবাস্তব সুর-স্মারক মণ্ডল ও সুরপঞ্চশতী-জাতীয় সমিতির পক্ষ থেকে 'প্রকাশকীয় মন্তব্য' অংশে সুরদাসের স্মৃতিরক্ষা ও কাব্যপ্রচারপ্রকল্পের কিছু কিছু পরিচয় দিয়েছেন। লেখক ডঃ তেওয়ারী 'নিবেদন' অংশে বলেছেন—"আগ্রার সুর-স্মারক মণ্ডল প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য সমগ্র দেশে ও দেশের বাইরেও বৈষ্ণব-সাধক কবি সুরদাসের রচনার প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে ভারতের বাণী সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া।"—সুরদাসের প্রতি অনুরাগই মূল প্রেরণা। সংকলিত পদগুলির অনুবাদও তিনি দিয়েছেন। হিন্দী আর বাংলা দুটি ভাষাতেই পারঙ্গম হওয়ায় তাঁর পক্ষে যথাসম্ভব মূলানুগ অথচ সাবলীল অনুবাদ করা সহজ হয়েছে। হিন্দী ভাষায় অধিকার না থাকলেও বাঙালী পাঠক অনুবাদসহযোগে পদগুলির অর্থবোধ ও রসাস্বাদ করতে পারবেন। কিছু কিছু অপরিচিত শব্দের অর্থ বা টীকা দেওয়া থাকলে মূলটি আরও উপভোগ্য হত।

প্রথম পদটি প্রার্থনাত্মক। দ্বিতীয় পদটি থেকে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে ক্রমে ক্রমে শৈশব, বাল্য আর কৈশোরের নানা লীলা বা ভাবের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধকে আদর্শরূপে স্থাপনা করলেও পদকর্তা স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে পদরচনা করেছেন—তাঁর নিজের ভক্তিভাব বা রসানুভূতিই এর কারণ। অবশ্য আধ্যাত্মিক প্রেরণার কথাও স্বীকার করতেই হয়। সুরদাস যে বৈষ্ণব সাধক ছিলেন এটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। গ্রন্থের সূচনাংশে তাঁর যে ধ্যানতন্ময় রঙীন ছবি দেওয়া হয়েছে অনেক পদ পড়তে পড়তে সেটির কথা মনে আসে। পদগুলি গীতার্থে রচিত—প্রত্যেক পদেরই রাগসংকেত দেওয়া হয়েছে।

'পরিশিষ্ট' অংশে চারটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে—(১) ভক্ত কবি সুরদাস, (২) সুর-পদাবলীতে জাতীয় সংহতির সুর, (৩) সুরদাস ও বাঙালী কবির রচনায় বাৎসল্য, (৪) চণ্ডীদাস ও সুরদাস। প্রবন্ধগুলি সুলিখিত, তবে প্রথমটি আরও তথ্যসমৃদ্ধ ও বিস্তারিত হলে ভাল হত—ডঃ তেওয়ারী যেন সুরদাস সম্পর্কে বাঙালী পাঠকের কৌতূহল জাগিয়েই নিরস্ত হয়েছেন। পরবর্তী সংস্করণে তিনি সুরদাসের জীবনবৃত্তান্ত, কাব্যসাধনা, অধ্যাত্মজীবন সম্পর্কে আরও কিছু তথ্যসমাবেশ করে সে কৌতূহল নিবৃত্ত করবেন আশা করা যায়।

মুদ্রণাদি পরিপাটী।

ব্রহ্মবাণী (প্রথম খণ্ড)—**মণীন্দ্রনাথ সাহা ও নীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। শ্রাবণী পূর্ণিমা ১৩৯০, অগস্ট ১৯৮৩। প্রকাশক: শ্রীমতী ইলা সাহা ও শ্রীমণীন্দ্রনাথ সাহা। পৃষ্ঠা ১৮+৮৮, মূল্য: দশ টাকা।**

প্রচ্ছদে ও নামপত্রে গ্রন্থের সংকেতসূত্র—'পরমযোগী এক ব্রহ্মজ্ঞের নির্দেহী অলোকোদ্গত বাণীর সংকলন'।—সংকলন গ্রন্থটির প্রারম্ভে 'নেপথ্যকথা' থেকে জানা যায় যে গ্রন্থের নামকরণ ঐ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরই অনুমোদিত। সম্পাদকদ্বয় তাঁর নাম বা পরিচয় দেননি; জীবনবৃত্তান্ত দেননি, এমন কি তাঁর স্মৃতিচারণও করেননি।

বাণীগুলি প্রকৃতপক্ষে সম্পাদকদ্বয়ের উদ্দেশ্যে 'অধ্যাত্ম উপদেশ'-এর সংকলন। 'প্রস্তুতিপর্ব' অধ্যায়ে ছেষট্টিটি ও 'সাধনপর্ব' অধ্যায়ে একশো বিয়াল্লিশটি বাণী সংকলিত হয়েছে। বাণীগুলি বাংলায় দেওয়া হলেও মাঝে মাঝে ইংরেজী শব্দ (সংস্কৃতও আছে) আছে—পঁচিশটি বাণী ইংরেজীতে দেওয়া। অধিকাংশ বাণী উদ্দিষ্ট শিষ্যের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান হলেও পাঠক-সাধারণের কাছে সেগুলির বিশেষ কোন

তাৎপর্য নেই। তবে কোন কোন বাণীতে নৈর্ব্যক্তিকভাবে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা গুরুত্বপূর্ণ সাধনসংকেত আছে। সম্পাদকদ্বয় সংকলিত বাণীর কোন কোন শব্দ বা ভাব অবলম্বন করে পাদটীকায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, বিবেকচূড়ামণি, গীতা বা বিভিন্ন উপনিষদ্ থেকে অনুরূপ উদ্ধৃতি সন্নিবেশ করেছেন। এগুলি বিশেষ আকর্ষণীয়।

মুদ্রণাদি প্রশংসনীয়, ক্বচিৎ অশুদ্ধি দেখা যায় (শুদ্ধিপত্র আছে)। প্রচ্ছদে (ভিতরেও) ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের ছবি দেওয়া আছে। এ ক্ষেত্রে ব্যবহারিক-ভাবে তাঁর পরিচয় দেওয়া অসংগত হত না বলে মনে হয়।

—ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

মাধুর্য-লহরী (প্রথম খণ্ড)—**নিত্যকৃষ্ণ দাস। প্রকাশক : মনকুমার সেন. আনন্দ ভবন, ১৮ আনন্দগড়, কলিকাতা—৭০০০৫৬। পৃঃ ক—স+৫৬, মূল্য : ছয় টাকা।**

পুস্তকটির 'অবতরণিকা' অংশ গদ্যে ও গৌর মাধুরী অংশ পদ্যে লিখিত। গ্রন্থকার ক—স পৃষ্ঠায় অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা ব্যাপী যে অবতরণিকা লিখেছেন, তাতে আমরা পাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা। শ্রীগৌরসুন্দরে যুগলিত রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব, রাসলীলা ও রসতত্ত্ব, নাম সংকীর্তনের আনন্দ চমৎকারিতা, চৈতন্যদেবে প্রকটিত প্রেমধর্ম, তাঁর ঈশ্বরানুভূতির বৈশিষ্ট্য, প্রস্থানত্রয়ের সহিত 'রসপ্রস্থানে'র যোগ, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে'র প্রধান বিষয়সমূহ বর্ণনা, অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের দার্শনিক বিশ্লেষণ প্রভৃতি নানা আলোচনাও এই অবতরণিকাকে সমৃদ্ধ করেছে। এই গদ্যাংশ গ্রন্থকারের উল্লেখ-যোগ্য বৈদগ্ধ্যের পরিচায়ক।

"আমরা ভারতীয় বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতি যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট কতভাবে ঋণী" সে প্রসঙ্গে গ্রন্থকার সামাজিক, ঐতিহাসিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি পটসমূহে প্রতিফলিত শ্রীচৈতন্যদেবের মহান্ অবদানসমষ্টি অবতরণিকায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। "জাতির সংহতি সাধনে 'শ্রীমন্মহাপ্রভু' যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন" তার উল্লেখও অবতরণিকার মধ্যে পাই। "মহাপ্রভু ও তাঁহার পরিবারেরা শুধু অশিক্ষিত ও নিম্ন শ্রেণীর লোকদেরই নামধর্মে আকর্ষণ করিয়াছিলেন" তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এ ধারণা ভুল প্রমাণ করার জন্য গ্রন্থকার ডক্টর বিমান বিহারী মজুমদারের 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' নামক গবেষণা গ্রন্থের অংশবিশেষের উল্লেখ করেছেন।

এবার পদ্যাংশে অর্থাৎ 'মাধুর্য-লহরী'তে আসা যাক। 'অবতরণিকা'য় গ্রন্থকার বলেছেন, "যদিও মহাপ্রভুর সব লীলাই অতীব আস্বাদ্য তবুও নবদ্বীপলীলাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রধানরূপে উপাস্য এবং অধিকতর আদরণীয়। বিশেষতঃ নবদ্বীপলীলাতেই প্রভুর ঐশ্বর্য ও মাধুর্য পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে এবং লীলার বৈচিত্র্যও নবদ্বীপ ধামেই বেশি বিকাশ লাভ করিয়াছে। শ্রীগৌর হরির প্রকৃত ধাম শ্রীনবদ্বীপই যার ধামেশ্বর তিনি।" তাই নবদ্বীপলীলাই 'মাধুর্য-লহরী'র বিষয়বস্তু। "গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর মতে ভগবৎ নাম, রূপ, গুণ ও লীলার শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ ব্যাপারে প্রথমে নাম, তারপরে রূপ, তারপরে গুণ এবং সর্বশেষে লীলা এইক্রমে অগ্রসর হইলেই সাধন শীঘ্র ফলপ্রসূ হয়।" সেই ক্রম অনুসারেই গ্রন্থকার মাধুর্য-লহরী পরিবেশন করেছেন।

গ্রন্থকার, শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ গদ্যে ও পদ্যে এ পর্যন্ত লেখা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এ প্রয়াস কেন এই প্রশ্নের উত্তরে 'অবতরণিকা'য় লিখেছেন, "তার প্রধান কারণ আর কিছু নয় শুধু আত্মশোধন। লেখার ব্যপদেশে প্রভুর নাম,

রূপ, গুণ ও লীলার স্মরণে ও মননে এই ব্যর্থ জীবনের কিঞ্চিৎ সার্থকতা লাভ করিতে পারিব এই লোভে।" এই উদ্দেশ্য সার্থক করার জন্য সহজ ও সরলভাবে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলা ছন্দায়িত করেছেন। সকল শ্রেণীর পাঠক যাতে মহাপ্রভুর লীলামাধুর্য স্বচ্ছন্দে ও সুখকর-ভাবে উপলব্ধি করতে পারে, সেজন্য ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতির আড়ম্বর এখানে স্থান পায়নি। পুস্তকের এই প্রথম খণ্ড শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ববঙ্গ বিজয়লীলায় সমাপ্ত হয়েছে (যার শেষাংশে দেখি "লক্ষ্মীর গঙ্গাপ্রাপ্তি"র পর নিমাইয়ের পুনঃ বিবাহের জন্য শচীমাতা পাত্রীর সন্ধানে মনোনিবেশ করেছেন)।

নিক্তির ওজনে কাব্যগুণ বিচারের প্রশ্ন আলোচ্য পুস্তকটির ক্ষেত্রে গৌণ। আশা করি, প্রথম খণ্ড 'মাধুর্য-লহরী' পাঠে শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত-বৃন্দের মন আকাঙ্ক্ষিত ভক্তিরসে সিঞ্চিত হবে এবং 'দ্বিতীয় খণ্ডে'র রচনা ও তার প্রকাশনার সাগ্রহ প্রতীক্ষায় থাকবে।

—শ্রীপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাপ্তি-স্বীকার

শ্রীসারদা লীলাগীতি : শ্রীমতী অপর্ণা রায়, প্রকাশিকা : প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, সাধারণ সম্পাদিকা, শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা-৭৬, পৃষ্ঠা ১০৪, মূল্য : পাঁচ টাকা।

শৃণ্বন্তু : লেখক : শ্রীঅবধূত চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক : বিবেকানন্দ মিশন শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদ, তুলসী ডাঙা, পোঃ সমুদ্রগড়, জেলা-বর্ধমান, পৃষ্ঠা ১১০, মূল্য : তিন টাকা।

কর্পূরাদি শ্যামা স্তোত্রম্ বা শ্রীশ্রীদক্ষিণ-কালিকা স্তোত্রম্ : গুপ্তাবধূত শ্রীস্বচ্ছন্দানন্দ নাথ, প্রকাশক : শ্রীনির্মলকান্তি মুখোপাধ্যায়, ১২এম/১সি, পাইকপাড়া রো, কলিকাতা-৭০০০৩৭, পৃষ্ঠা ৪২, মূল্য : ছয় টাকা।

নীরব মুহূর্ত : শ্রীমতী তাপসী ঘোষ, প্রকাশিকা : শ্রীমতী মনীষা সরকার, ১৬৪এ।৪।২ লেক গার্ডেন্স, কলিকাতা-৭০০০৪৫, পৃষ্ঠা ২৫, মূল্য : দশ টাকা।

অর্ঘ্য : লেখক : শ্রীঅন্নদাচরণ সেনগুপ্ত, প্রকাশক : শ্রীজহর সেনগুপ্ত, এ।৩৬, সি, আই, টি, বিল্ডিং ; মদন চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৭০০০০৭।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

সৌরাষ্ট্রে খরাত্রাণ: রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রম ৫১০৭টি পরিবারের মধ্যে জল বিতরণ করা ছাড়াও, রাজকোট ও সুরেন্দ্রনগর জেলার ২২০টি গ্রামে ৩৬,৮৩৩ জনের মধ্যে গম, ডাল ও গুড় বিতরণ করে। উপরন্তু, ২,৫৫০টি গো-মহিষের জন্য প্রতিদিন পানীয় জল এবং ৫৬টি গ্রামে গো-মহিষাদির জন্য কচি ও শুকনো তৃণ বিতরিত হয়।

মহারাষ্ট্রে খরাত্রাণ: বম্বে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন এবং পুণে রামকৃষ্ণ মঠ এক-যোগে পুণে ও আহ্‌মেদনগর জেলার খরা-পীড়িত এলাকা সমূহে ২৯,১০,০০০ লিটার জল সরবরাহ করা ছাড়াও, ৩৫টি গ্রামে ৫৬৭টি পরিবারের মধ্যে খাদ্যশস্য, শাড়ি, ধুতি, বিছানার চাদর এবং বাসন-পত্র বিতরণ করে।

কর্ণাটকে খরাত্রাণ: বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রমের তত্ত্বাবধানে টুমকুর জেলার পাভগাদা তালুকস্থ তিরুমণি ও ভালুর গ্রামের দুটি পশু পালন কেন্দ্রে যথাক্রমে ১,০০০ ও ৪০০টি গো-মহিষকে খরার আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শ্রীলঙ্কা শরণার্থিত্রাণ: মাদ্রাজ ত্যাগরাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম কর্তৃক শ্রীলঙ্কা থেকে আগত শরণার্থীদের মধ্যে পুনরায় বিস্কুট, বাসন, দাঁতের মাজন, এবং দুধ বিতরণ করা হয়।

পুনর্বাসন: টুমকুর জেলার কোট্টালম্ গ্রামে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের জন্য বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রম ২০টি জনতা-গৃহ নির্মাণ কার্যের দায়িত্ব নিয়েছে। এ ছাড়া, এই গ্রামে এবং আশে-পাশের কয়েকটি গ্রামে গৃহপালিত পশুদের খাদ্য বিতরণের জন্য কয়েকটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

উদ্বোধন

মধ্য প্রদেশের উপজাতি-কল্যাণ মন্ত্রী শ্রীরণবীর শাস্ত্রী গত ৪ ও ৫ জুন ১৯৮৬, ইরাখ-ভট্টি ও কুটুলে যথাক্রমে বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির (প্রাথমিক বিদ্যালয়) এবং জল সরবরাহ কেন্দ্রের (হাত পাম্প) উদ্বোধন করেন। এগুলি নারায়ণপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ আশ্রমের তত্ত্বাবধানে অবুঝ্‌মার গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্গত। এর আগে, এই প্রকল্পের অধীনে উপরি-উক্ত দুটি স্থানেই মধ্য প্রদেশের বস্তার ডিভিশনের কমিশনার জে. এস. কাপানি দুটি ন্যায্য-মূল্য দোকানের উদ্বোধন করেন।

গত ১১ জুন ১৯৮৬, অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগেগং অপাং ইটানগর রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে শরীরাঙ্গের অক্ষমতা-দূরীকরণার্থ-চিকিৎসা-বিভাগ (Physio-occupational Therapy) এবং কৃত্রিম অঙ্গ-সংস্থাপন কেন্দ্রের (Artificial Limb Fitting Centre) উদ্বোধন করেন।

দেহত্যাগ

স্বামী পরমেশানন্দ (ধরণী মহারাজ) গত ১৮ জুন ১৯৮৬, দুপুর ২-৫০ মিনিটে ৮৭ বছর বয়সে বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করেন। পূর্বদিন সামান্য জ্বর ও

মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার জন্য তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর শেষ ক্ষণটি আসে আকস্মিকভাবে।

স্বামী পরমেশানন্দ ছিলেন শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীর মন্ত্রশিষ্য। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যোগদানের কেন্দ্র ছাড়াও তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বাঁকুড়া, উদ্বোধন, বারাণসী সেবাশ্রম, শ্রীলংকা, মাদ্রাজ মঠ, লক্ষ্ণৌ এবং বারাণসী অদ্বৈতাশ্রম শাখা-কেন্দ্রের কর্মিরূপে ছিলেন। গত ১৫ বৎসর যাবৎ তিনি বারাণসী রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে অবসর-জীবন যাপন করছিলেন। প্রাত্যহিক জীবন যাপনে তিনি ছিলেন অনাড়ম্বর ও কৃচ্ছ্রতা-পূর্ণ। তাঁর কাছে সমাগত সকলকে তিনি মধুর ব্যবহারে আপ্যায়ন করতেন।

তাঁর দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

শ্রীশ্রীমায়েরবাড়ীর সংবাদ

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী বিকাশানন্দ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

সংবাদ

হুগলী জেলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন

গত ২৯ ও ৩০ মার্চ ১৯৮৬, **আঁটপুর** রামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রমে হুগলী জেলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের ২য় বার্ষিক সম্মেলন শোভাযাত্রা, জনসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, 'স্মরণিকা' প্রকাশ ইত্যাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। বহু সন্ন্যাসী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এই পরিষদ এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে চন্দননগরে যুব-নেতৃত্ব শিক্ষণ শিবির (Youth Leadership Training Camp) অনুষ্ঠিত হয়েছে। হুগলী জেলা থেকে ২০ জন যুব-প্রতিনিধি এই শিক্ষণ শিবিরে যোগদান করে।

উৎসব

ঘুঁটিয়াবাজার (হুগলী) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ শিবির—অশোক পাঠচক্রে গত ১২ মার্চ ১৯৮৬,—মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরী, পূজা, পাঠ, ভজন, কীর্তন, প্রসাদ বিতরণাদির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব পালিত হয়।

আলিপুর (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপ সেবা-সমিতি ২৮ থেকে ৩১ মার্চ ১৯৮৬ পর্যন্ত চারদিন বিশেষ পূজা, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের ১৫১তম জন্মতিথি এবং মণ্ডপের ৭২তম বার্ষিক উৎসব পালন করে। এই উদ্দেশ্যে ২৩ মার্চ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। উৎসবের শেষ দিনে রাশিয়ান অধ্যাপক দানিলচুকের বক্তৃতা, উৎসবের আনন্দ বৃদ্ধি করেছিল। উৎসবের স্মারকরূপে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

গুড়দহ-শ্যামনগর (২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ যোগায়ন জনতীর্থের উদ্যোগে গত ১২ ও ১৩ এপ্রিল ১৯৮৬, শ্রীশ্রীঠাকুরের ১৫১তম জন্মোৎসব পূজা, হোম, প্রভাতফেরী, ভজন, প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত

হয়। অনুষ্ঠান শেষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন সম্বন্ধে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

বিজয়গড় (কলিকাতা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রমে গত ২৬, ২৭ ও ২৮ এপ্রিল ১৯৮৬, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের শুভ আবির্ভাব উপলক্ষে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রভাতফেরী, সঙ্গীত, দুঃস্থ নরনারীর মধ্যে কাপড় বিতরণ, ধর্মসভা, গীতিনাট্যের অভিনয় প্রভৃতি ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম অন্তরঙ্গ লীলাপার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের জন্মস্থান **রাজারহাট-বিষ্ণুপুরে** (উত্তর ২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ-নিরঞ্জনানন্দ আশ্রমে গত ২১ ও ২২ জুন ১৯৮৬ নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের জন্ম-জয়ন্তী উৎসব এবং 'নিরঞ্জনধামে' নব নির্মিত মন্দিরের শুভ উদ্বোধন-উৎসব সমারোহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিনে মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, নগর-পরিক্রমা, যুব-সমাবেশ, অধিবাস, ভক্তিমূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন প্রভৃতি ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। দ্বিতীয় দিনে বেদপাঠ, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও স্তব-স্তুতির মধ্য দিয়ে মন্দিরের শুভ উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। দুপুরে প্রায় দুই হাজার ভক্ত নরনারী বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে স্বামী নির্জরানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভা হয়। এই সভার প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ এবং বক্তা ছিলেন স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ। উৎসব উপলক্ষে একটি 'স্মরণিকা'ও প্রকাশ করা হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী** গত ২৯ এপ্রিল ১৯৮৬, রাত্রি ১০-৩০ ঘটিকায় ৭৫ বৎসর বয়সে ভিলাই-এ দেহত্যাগ করেন। শিলচরে থাকাকালীন ছাত্রাবস্থায় তিনি মহাপুরুষ মহারাজের কৃপা লাভ করেন। তিনি মাস্টার মশাই (শ্রীম), স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজ ও স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের চরণ স্পর্শ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম করতে করতে তাঁর অন্তিম মুহূর্তটি ঘনিয়ে আসে।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** গত ১৭ মে ১৯৮৬, ৮৭ বৎসর বয়সে তাঁর বহরমপুরের বাসভবনে সজ্ঞানে পরলোক গমন করেন। বহরমপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম শাখার প্রায় জন্মলগ্ন থেকে আজীবন তিনি ঐ আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। দৈনন্দিন কাজে এবং উৎসবাদিতে তাঁর আশ্রমের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিল।

বালিয়াটী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের প্রাক্তন সভাপতি **নৃপেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী** গত ১৭ মে ১৯৮৬ রাত্রি ১১-৪৫ মিনিটে ৮৬ বৎসর বয়সে তাঁর কলিকাতাস্থ বাসভবনে দেহরক্ষা করেন। তিনি ঢাকা জেলার (বাংলাদেশ) মাণিকগঞ্জে বালিয়াটী গ্রামের জমিদার ছিলেন। আজীবন তিনি সেবামূলক কাজে অতিবাহিত করেন।

বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক **কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত** দীর্ঘদিন রোগভোগের পর গত ১০ জুলাই ১৯৮৬, সকাল সওয়া ছটায় কলিকাতায় তাঁর লেকটাউনের বাড়িতে ৯৩ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে তিনি এম. বি. বিএস., ডি. টি. এম., এফ. সি. জি. পি. এবং সাহিত্যে ডি. লিট উপাধি পান। উদ্বোধন পত্রিকায় তাঁর অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। সেনগুপ্ত মহাশয় ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের কলিকাতা শাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি, এবং রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবেও তাঁর নাম আছে।

এঁদের সকলের দেহনির্মুক্ত আত্মার চিরশান্তি লাভ হোক এই প্রার্থনা।

সূচীপত্র ॥ আশ্বিন ১৩৯৩

কবিতা

॥ প্রচ্ছদ-পরিচিতি ॥

শ্রীশ্রীমা মহাশক্তি। জগদ্বাসীকে জ্ঞান দান করার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণা হয়েছেন। তাঁর আবির্ভাবের পর থেকেই ধীরে ধীরে অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষের মনে জ্ঞানালোকের উদয় হতে থাকে। এই ভাবটি শিল্পী শ্রীশিবরাম দত্ত প্রচ্ছদে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। অঙ্কিত শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তিটি শিল্পী অন্য একটি গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছেন।

মা-ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না,—ক্রমে পারবে। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা বলে। মা-ঠাকরুন ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে। ···জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির দুর্গাপূজা করতে বসেছে। দাদা, বিশ্বাস বড় ধন,—দাদা, জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব তবে আমার নাম।

—স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে পূজিত আলোকচিত্র।

৮৮তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

আশ্বিন, ১৩৯৩

দিব্য বাণী

জানাতি বিষ্ণুরমিতদ্যুতিরম্ব! সাক্ষা-
ত্বাং সাত্ত্বিকীমুদধিজাং সকলার্থদাঞ্চ।
কো রাজসীং হর উমাং কিল তামসীং ত্বাং
বেদাম্বিকে! ন তু পুনঃ খলু নির্গুণাং ত্বাম্॥
ক্বাহং সুমন্দমতিরপ্রথিতপ্রভাবঃ
ক্বায়ং তবাতিনিপুণো ময়ি সুপ্রসাদঃ।
জানে ভবানি! চরিতং করুণাসমেতং
যৎ সেবকাংশ্চ দয়সে ত্বয়ি ভাবযুক্তান্॥

জননি! ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর আপনাকে জানেন সত্য কিন্তু সম্যক্-রূপে অবগত নহেন। কারণ, অমিতদ্যুতি বিষ্ণু আপনাকে সকলার্থদাত্রী সত্ত্ব-গুণাধিষ্ঠাত্রী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলিয়াই জানেন; ব্রহ্মা আপনাকে রজোগুণাধীশ্বরী বলিয়াই স্থির করিয়াছেন; আর সংহারকর্ত্তা মহেশ্বর আপনাকে তমোগুণাধিষ্ঠাত্রী উমা বলিয়াই অবগত আছেন। কিন্তু মাতঃ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, কেহই আপনাকে সাম্যাবস্থস্বরূপিণী তুরীয়া নির্গুণা বলিয়া জানেন না।

ঈশ্বরি! আপনি এরূপ অবেদ্য হইলেও ভক্তজনের অনায়াসলভ্যা হয়েন। কারণ, বুদ্ধিপ্রভাব-বিহীন আমিই বা কোথায়! আর আপনার এরূপ সুপ্রসন্নতাই বা কোথায়!! ফলত এ উভয়ের একত্র সমাবেশ অতীব অসম্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু, ভবানি! আমি জানি যে, যাঁহারা আপনাতে একাগ্রভাবে রত থাকে, আপনি সেই সকল সেবকের প্রতি করুণা বিতরণ করিয়া থাকেন।

[শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্, ১।১২।৪৪-৪৫]

কথাপ্রসঙ্গে

আনন্দময়ীর আবাহন

'আজ আগমনীর আবাহনে কি সুর উঠেছে বেজে।' শরৎকাল আবার দ্বারে সমাগত। আগমনীর সুমধুর সুর আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইতেছে, ঘোষণা করিতেছে মর্ত্যে আনন্দময়ীর শুভ আগমনবার্তা। মানব-মনকে জানাইয়া দিতেছে তাঁহাকে যথাযোগ্য বরণ করিয়া পূজা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে। মা আসিতেছেন—এই সংবাদে সন্তান-হৃদয় আনন্দে আন্দোলিত। বৎসরান্তে 'মা আমাদের আবার দেখ্‌তে আসছেন।—স্মরণ করলে আনন্দে হৃদয় ভরে যায়। মা আমাদের কত দয়াময়ী! কতই স্নেহময়ী! প্রতি বৎসরই আমাদিগকে না দেখ্‌তে এসে থাকৃতে পারেন না। বেশীদিন ছেলেকে না দেখে কি থাকৃতে পারেন?' (উদ্বোধন, প্রথম বর্ষ, অষ্টাদশ সংখ্যা) বৎসরান্তে মাকে পাইয়া সন্তানদের যেমন আনন্দ, সন্তানদের কাছে পাইয়া মায়ের আনন্দও তদপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়।

যে মাকে ঘিরিয়া সন্তানদের এই আনন্দ, যে মায়ের আগমনের ইঙ্গিতে সন্তান-হৃদয় আনন্দে আন্দোলিত, যে মাকে যথাযথ বরণপূর্বক পূজা করিবার জন্য মানব-মনে প্রস্তুতি চলিতেছে—সেই মা কি রকম মা? তাঁহার স্বরূপই বা কি? —স্বভাবতঃই জানিতে ইচ্ছা হয়। উত্তরে আমরা বলি—সন্তান অতশত জানিতে চাহে না বা বুঝেও না, আর তাহার এত বুঝিবার দরকারই বা কি? কারণ সন্তানের নিকট মায়ের মতো ভালবাসার পাত্র, নিশ্চিত আশ্রয় আর কে আছে? তাহার নিকট মা শান্তি ও শক্তির ঘনীভূত মূর্তি। তাই সে জানে 'মা আছেন আর আমি আছি ভাবনা কি আছে আমার।' তবু আমাদের মা কি রকম মা? তাঁহার স্বরূপই বা কি?—এইসব প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি, আমাদের মা সব রকমই হইতে পারেন। তিনি সাকারও বটে, আবার নিরাকারও বটে। এবং এছাড়া আর কত কি হইতে পারেন, তাহা কে জানে? মহারাজ শিবচন্দ্রের একটি গানে আছে:

সাকার সাধকে তুমি যে সাকার,/নিরাকার উপাসকে নিরাকার,/ কেহ কেহ কয় ব্রহ্ম জ্যোতির্ময়,/ সেই তুমি নগতনয়া জননী;/ যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়,/সে অবধি সে পরব্রহ্ম কয়,/তৎপরে তুরীয় অনির্বচনীয়/সকলি মা তারা ত্রিলোকব্যাপিনী॥ তিনি ভক্তবৎসল। যে ছেলে তাঁহাকে যেরূপে পাইলে আনন্দ পায়, তাহার নিকট তিনি সেইরূপেই প্রকাশিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় আছে: 'ভক্ত যে রূপটি ভালবাসে, সেইরূপে তিনি দেখা দেন—তিনি যে ভক্তবৎসল!' (কথামৃত, ১।৩।৫) ললিতসহস্রনামস্তোত্রে (শ্লোক-৫০) আছে:

'নিস্তুলা নীলচিকুরা নিরপায়া নিরত্যয়া।
দুর্লভা দুর্গমা দুর্গা দুঃখহন্ত্রী সুখপ্রদা॥'

—যিনি দুর্লভ, যিনি দুর্গম সেই অবিচ্যুতা অনতিক্রম্যা মহামায়া দুর্গা ভক্তের দুঃখ হরণ করিবার জন্য অতুলনীয় ভগবতী মূর্তিতে নীলকেশজাল বিস্তার করিয়া ভক্তের সম্মুখে প্রত্যক্ষ আবির্ভূতা।

এই মহামায়া দুর্গাই জীবের বন্ধন ও মুক্তির

কর্ত্রী। ভক্তের মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য ইনি নানারূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূতা হন এবং ভক্তগণকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিয়া কৃতার্থ করেন। আবার এই মহামায়াই জীব ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহাকে মোহ ও মমত্ব দ্বারা বাসনাসক্ত করেন। তাঁহার শরণাগতি ব্যতীত মায়ামুক্ত হইবার উপায় নাই।

'শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥'
(চণ্ডী, ১১।১২)

—দেবী শরণাগত, দীন ও আর্তগণের পরিত্রাণ-পরায়ণা, অর্থাৎ মুক্তিদায়িনী এবং সকলের দুঃখ-হারিণী। তিনি নিত্যা, অর্থাৎ জন্মমৃত্যুরহিতা; অপরপক্ষে, সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চই তাঁহার বিরাট মূর্তি। এক কথায় বলিতে গেলে আমাদের এই মা সৃষ্টি ও পালনীশক্তির প্রতিমূর্তি। স্বীয় সন্তানকে তিনি অন্তরে ধারণ করেন, জন্ম দেন ও পালন করেন। তিনি একভাবে সৃষ্টির ঊর্ধ্বে ও পারে, আবার অপরভাবে সারা সৃষ্টির অণুতে মহতে ওতপ্রোত। এই জ্ঞানদায়িনী এবং জীবন-দায়িনী মা-ই সকলের লক্ষ্য, সকলের পথ। চণ্ডীতে (১১।২৯) আছে: 'ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং। ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি'—তোমার আশ্রিত মানবগণের বিপদ থাকে না; তোমাকে যাঁহারা আশ্রয় করিবে তাঁহারা সকলেরই আশ্রয়স্বরূপ হয়।

এই মহামায়ার আরাধনা করিলে যে শুধু পারলৌকিক মঙ্গল হয়, তাহা নহে; তাঁহার আরাধনা করিলে জীবনকে সংহত, সংযত, সমৃদ্ধ অথচ সুনিয়ন্ত্রিত করিবার প্রেরণা ও শক্তি লাভ হয়। কেন না, তিনি যে 'ভোগ-স্বর্গাপবর্গদা'। সাংসারিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, পরকালে স্বর্গসুখ, এবং ইহলোক ও পরলোকের অতীত তত্ত্বজ্ঞানরূপ মুক্তি—এই তিনটিই তাঁহার কৃপায় পাওয়া যায়। আমাদের মা, আপনার হইতেও আপনার। তাই তাঁহার নিকট জোর চলে, আবদার চলে। যে সন্তান তাঁহার নিকট যেরূপ আবদার, যেরূপ প্রার্থনা করেন, সেইরূপ আবদার প্রার্থনাই তিনি পূরণ করেন। সাংযাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি (চণ্ডী, ১২।৩৭)—তিনি সন্তুষ্টা হইলে সাধককে অযাচিতভাবে তত্ত্বজ্ঞান আর সকাম উপাসককে ঐশ্বর্য-সম্পদ প্রদান করেন। সুরথ-সমাধির আরাধনায় তুষ্টা হইয়া মহামায়া তাহাদিগকে বর দিতে চাহিলে, সুরথ চাহিয়াছিলেন ইহজন্মে শত্রুবিনাশপূর্বক হৃতরাজ্য উদ্ধার এবং জন্মান্তরে সাবর্ণি-মনুরূপে চিরস্থায়ী রাজ্য। অপরপক্ষে, সংসারসুখে বীতশ্রদ্ধ বৈরাগ্যবান সমাধি চাহিয়াছিলেন সংসারাসক্তি-নাশক তত্ত্বজ্ঞান; আত্যন্তিক মুক্তি। মহামায়া উভয়কেই স্ব স্ব প্রার্থিত বর প্রদান করেন।

অশিবকারী দানবশক্তি বহুবারই দেবশক্তিকে পরাজিত করিয়া জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। প্রত্যেকবারই অসহায় দেবতারা মহাশক্তি মহামায়ার আরাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছেন এবং দেবীও তাঁহাদের আরাধনায় তুষ্টা হইয়া সংহতশক্তিতে আবির্ভূতা হইয়া দানবশক্তির হাত হইতে দেবতাদের বার বার মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার কৃপায় দেবরাজ্য পুনঃস্থাপিত হইয়াছে। পুনঃস্থাপিত হইলেও দানবের উৎপাত চিরতরে বন্ধ হয় নাই। কিছুদিন বেশ চলে। কিন্তু হঠাৎ আবার উৎপাত শুরু হয়। দানবশক্তির দ্বারা দেবশক্তি হয় আক্রান্ত ও পরাজিত। পুরাণাদিতে দেখা যায়, যুগযুগান্তর ধরিয়া মায়ের খেলা এইভাবে চলিয়া আসিয়াছে। মায়েরই বোধ হয় অভিপ্রায় খেলাটা এইভাবে চলুক। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন: 'ছেলে চুষি নিয়ে ভুলে থাকে, মা রান্নাবান্না বাড়ির সব কাজ করে। ছেলের যখন চুষি আর ভাল লাগে না—চুষি ফেলে চীৎকার ক'রে কাঁদে

তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে দুড় দুড় করে এসে ছেলেকে কোলে নেয়।" (কথামৃত, ১।৩।৫) কাজেই মা-ই চাহেন ছেলে চুষিকাঠি লইয়া ভুলিয়া থাকুক। যখন খেলা আর ভাল লাগিবে না, 'মা যাই' বলিয়া চিৎকার করিবে, তখন তাহাকে কোলে লওয়া যাইবে। চণ্ডীতে আছে ভীষণাকৃতি ভয়ঙ্কর দানবদ্বয় মধু ও কৈটভের কাহিনী। বিষ্ণুর কর্ণমূল হইতে উদ্ভূত হইয়া তাহারা বিষ্ণুর নাভিকমলে অবস্থিত প্রজাপতি ব্রহ্মার জীবননাশে উদ্যত। কালান্তরে মদমত্ত দৈত্যাধিপতি মহিষাসুরের অত্যাচারে দেবলোক বিপর্যস্ত। পরাজিত ও লাঞ্ছিত দেবতারা স্বর্গ হইতে বিতাড়িত। যুগান্তরে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্যদ্বয়ের অত্যাচারে দেবতাদের চরম শোচনীয় অবস্থা। প্রত্যেকবারই অসুর-শক্তির দ্বারা পরাজিত ও লাঞ্ছিত দেবতারা নিরুপায় হইয়া পালনীশক্তি দেবী মহামায়ার শরণাপন্ন হইয়াছেন। তাঁহাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার আরাধনা করিয়া তাঁহাকে তুষ্টা করিয়াছেন। দেবতাদের আরাধনায় তুষ্টা দেবীও প্রত্যেকবারই আবির্ভূতা হইয়া দেবারিসমূহকে বিনাশ করিয়াছেন। দানবশক্তির হাত হইতে দেবতাদের মুক্ত করিয়াছেন। শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের পর বিপন্মুক্ত দেবতারা কৃতজ্ঞচিত্তে প্রণামপূর্বক প্রার্থনা করিয়াছিলেন: দেবি, সম্প্রতি স্মরণমাত্রই আপনি যেরূপ অসুরনাশ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন; ভবিষ্যতেও সেইরূপ আপনি সর্বদা আমাদিগকে শত্রুভয় হইতে রক্ষা করিবেন। দেবি, আপনি কৃপা করিয়া জগতের সমস্ত অধর্ম ও পাপজাত মহাউপদ্রব সকল শীঘ্র নাশ করুন।

'প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥'
(চণ্ডী, ১১।৩৫)

—হে বিশ্বার্তিহারিণি দেবি, আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্না হউন। ত্রিভুবনবাসিগণের আরাধ্যা দেবি, আপনার চরণে প্রণত, আপনার শরণাগত জনগণের প্রতি আপনি বরদা হউন। দেবী মহামায়াও প্রসন্না হইয়া দেবতাগণকে তাঁহাদের প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন:

'ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥'
(চণ্ডী, ১১।৫৪-৫৫)

—এইভাবে দানবের প্রাদুর্ভাববশতঃ যখনই তোমাদের কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইবে তখনই আমি আবির্ভূতা হইয়া তোমাদের শত্রুগণকে বিনাশ করিব।

মনে রাখিতে হইবে যে, দেবতা এবং অসুর—উভয়ই মহামায়ার সন্তান। স্বার্থ-ভোগ-প্রমত্ত অসুর মোহবশতঃ দৈবীশক্তিকে অস্বীকার করিয়া মায়ের অপর সন্তানগণ দেবতাদের উপর অত্যাচার-অবিচার করে। মা তাহাদের আসুরী-বৃত্তি বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগকেও দৈবীসত্তায় ফিরাইয়া আনিতে সদা সচেষ্ট। কারণ সন্তান অন্যায় করিলে, অবাধ্য হইলে মা তো তাহাকে কখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কথায় আছে: 'কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনও নয়।' তাই মায়ের অসুরনিধন-যুদ্ধেও দেখি তাঁহার 'চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ' (চণ্ডী, ৪/২২)—নিষ্ঠুরতার সহিত কৃপার অপূর্ব সংমিশ্রণ। আর এই সংমিশ্রণই তাঁহার বিশ্বমাতৃত্ব প্রমাণিত করে।

মায়ের স্বরূপ-সন্ধানে আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। কিন্তু তাহাতে সফলকাম হইলাম কি?—না। তাই বলি:

'ত্বং নাহপুমান্ন চ পুমানিতি মে বিকল্পো
যা কাহসি দেবী! সগুণা নন্থ নির্গুণা বা।
তাং ত্বাং নমামি সততং কিল ভাবযুক্তো
বাঞ্ছামি ভক্তিমচলাং ত্বয়ি মাতরন্তে॥'
(দেবীভাগবত, ১/১২/৫১)

—হে দেবি, তুমি পুরুষ কি নারী তাহা তো বিচার করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। তুমি সগুণা কি নির্গুণা তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইল না। আর বিচারে কাজ নাই। তুমি যাহাই হও, তুমি যে সনাতন জীবন্ত জাগ্রত সত্য তাহাতে একটুও সন্দেহ নাই। তাই সর্বদা হৃদয়ের সরল আবেগ-সহ তোমাকে প্রণাম করি। আর এই প্রার্থনা করি, অন্তিম সময়ে প্রাণের সকল ভালবাসা যেন তোমাতেই অচলা রাখিতে পারি।

সান্তের ভিতর অনন্ত

['প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক স্বামী অশোকানন্দকে লেখা স্বামীজীর শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দজী মহারাজের অপ্রকাশিত পত্র]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

লক্ষ্মীনিবাস, মধুপুর
E. I. R.
Dated. 23/6/1928

প্রিয় অশোকানন্দজী,

...যে বাঙালী ভদ্রলোকটির কথা লিখিয়াছ, তাঁহার নাম কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। ১৯১২ সালে কাশী অবস্থান কালে তাঁহাকে কাশী অদ্বৈতাশ্রমে স্বামীজির উৎসবের দিন বক্তৃতা করিবার জন্য যখন অনুরোধ করিতে যাই, তখন তিনি আমাকে নিম্নলিখিত গল্পটী বলেন—আমার সঙ্গে গয়ার পরমানন্দ ছিলেন।

"আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যাইতাম—স্বামীজির সঙ্গে তখন হইতেই আলাপ ছিল। তাঁহার নিকট একবার এইভাবের আলোচনা উঠে যে, সান্তের ভিতর অনন্ত কিরূপে থাকিতে পারে—তাহাতে তিনি বলেন, এ-সকল তত্ত্ব সাধনগম্য। তারপর ১৮৯৭ সালের শেষভাগে স্বামীজি আমেরিকা হইতে ফিরিয়া লাহোরে যখন যান, তখন তিনি Tribune আফিসে নগেন গুপ্তের বাড়ী থাকেন। নগেন বাবু Editor এবং আমি Sub-Editor ছিলাম। আমি ধর্মতত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য মুসলমান, আর্যসমাজী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের সহিত ইতিপূর্বে মিশিয়াছিলাম। স্বামীজি আমাকে খুব ভালবাসিতেন এবং প্রাতঃকালে রোজ ডাকিয়া নানা গল্পগুজব করিতেন—তিনি তামাসা করিয়া আমাকে এই বলিয়া আহ্বান করিতেন যে, কালীবাবু, এস, খোদার নাম করা যাক্। একদিন আমাকে সকালে ঐ বলিয়া ডাকিয়াছেন, আমি স্বামীজির নিকট যাইবার পর তাঁহাকে বলিলাম, স্বামীজি, ঠাকুরের নিকট আমাদের যে সান্তের ভিতর অনন্ত কি করিয়া থাকিতে পারে, এই প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল—এই কথা মনে আছে কি? স্বামীজি বলিলেন, খুব মনে আছে আর আমি আমেরিকার Philadelphia-র এক সাহেবের নিকট একটা বিষয় শিখিয়াছিলাম—তাহার দ্বারা ইহার Practical demonstration করিয়া দিতে পারি। তখন আমি স্বামীজিকে উহার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া ধরাতে তিনি বলেন, এখন শরীরটা কিছু খারাপ আছে—যা হউক চেষ্টা করিয়া দেখি। এই বলিয়া তিনি একটু ধ্যানস্থ হইয়া মিনিট খানেক আমার হাতটা ধরিয়া থাকেন এবং তাহার ফলে আমি নিম্নলিখিত Vision-টী দেখি" (আমি সেই সময় Tribune আফিসে স্বামীজির সঙ্গে ছিলাম। আমি উক্ত ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে এইটুকু সাক্ষ্য দিতে পারি যে, আমি একদিন প্রাতঃকালে স্নান করিয়া আসিয়া দেখি, স্বামীজি ধ্যানস্থ হইয়া কালীবাবুর হাত ধরিয়া রহিয়াছেন—কিন্তু তাহার ফলে কি হইয়াছিল, তাহা আমি তখন স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করি নাই এবং কালীবাবুর সহিত তত আলাপ না থাকাতে তাঁহাকেও জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। তখন বিশেষ কৌতূহলও হয় নাই। একটু peculiar ব্যাপার মনে হইয়াছিল মাত্র এবং ভাবিয়াছিলাম, স্বামীজি কালীবাবুকে কোনরূপ শক্তি সঞ্চার করিতেছেন। পরে কালীবাবুর নিকট গল্পটী শুনিয়া ঘটনাটী আমার স্মরণ হয়—শুঃ)

কালীবাবু বলিতে লাগিলেন—"দেখিলাম, আমি যেন একটা প্রকাণ্ড সমুদ্রের উপর দিয়া উড়িয়া চলিতেছি। Ages after ages ধরিয়া চলিতেছি—ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগ চলিতেছে। কতদিন চলিতেছি ঠিক নাই—শেষে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়ি। একটা আশ্রয় খুঁজিতে খুঁজিতে একটা ভেলা দেখিতে পাইলাম। এই ভেলাটি চড়িয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ উহা দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ঠেকিল—তখন উঠিয়া দেখি, ঠাকুর এবং আরও কেহ কেহ রহিয়াছেন।"

Vision-টীর বিশেষত্ব এই যে, এক মিনিট কালের মধ্যে এত দীর্ঘ সময়ের জ্ঞান। কালীবাবু আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমরা স্বামীজির কোন occult power দেখিয়াছি কি না। এবং আমরা বিশেষ কিছু দেখি নাই বলাতে তিনি উক্ত গল্পটী করেন। উক্ত কালীবাবু এক্ষণে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি দিনকতক অমৃতবাজার পত্রিকার Editorial staff-এ ছিলেন। পরে কাশীর ধর্ম্মমহামণ্ডল হইতে প্রকাশিত একখানা ইংরাজী কাগজের Editor ছিলেন। তিনি স্বামীজির প্রসঙ্গকালে তাঁহাকে 'গুরুদেব' বলিয়া উল্লেখ করিতেন। কাশী সেবাশ্রমের anniversary-তে কয়েকবার হিন্দী বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং কাশী অদ্বৈত আশ্রমে স্বামীজি ও ঠাকুরের উৎসবে কয়েকবার হিন্দী বক্তৃতা করেন। এমন কি, অদ্বৈত আশ্রমে স্বামীজি সম্বন্ধে হিন্দীতে আরও কয়েকটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তিনি খুব ভাল হিন্দী ও উর্দ্দু বক্তা ছিলেন। এমন কি, তাঁহাকে orator বলিতে পারা যায়।

ইতি

তোমার **শুদ্ধানন্দ**

চাই মা আমি অভয় চরণ

শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায়

চাই মা আমি অভয় চরণ,
অভয় তোমার কাছে,
দূর যেন হয় জমাট বাঁধা
ভয় যত মোর আছে।

জমাট বাঁধা কান্না আমার
তোমার চরণ পরে
বিষম ব্যথায় আঘাত পেয়ে
অশ্রু হ'য়ে ঝরে।

রোগে পাগল, শোকে পাগল,
জীবন ভরা অমঙ্গল;
সারা জীবন কাটল যে মোর
বৃথা বিফল কাজে।

চিত্ত অবশ, অলস চরণ,
তুমিই আমার ভরসা শরণ;
তুমি আমার ধ্রুবতারা
ব্যর্থ জীবন-সাঁজে।

তিব্বতের বৌদ্ধমঠ

স্বামী অখণ্ডানন্দ

স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ তিব্বতে গিয়ে সেখানকার একটি বৌদ্ধমঠে কয়েক মাস ছিলেন।—তাঁর জীবনীপাঠক মাত্রেই তা জানেন। সেখানকার বৌদ্ধমঠের রীতি-নীতি আচার-আচরণ সম্পর্কে সুন্দর বর্ণনা দিয়ে তিনি একটি চিঠি লেখেন। বিশ্লেষণী মনোভাব নিয়ে লেখা তাঁর এই অপ্রকাশিত পত্রটি এখানে প্রকাশিত হল। চিঠির ভিতরে প্রাপকের নামের কোন উল্লেখ না থাকায় জানা যায় না কাকে উদ্দেশ্য করে লেখা।—সঃ

ওঁ নমো ভাগবতে

রামকৃষ্ণায় কাশ্মীর

March 90

পূজনীয়েষু—শ্রীচরণে সহস্র সহস্র প্রণাম—

আজ আমার কি শুভ দিন। আপনার দুই-খানি পত্র পাইলাম। প্রথম পত্রের কথাগুলি আমার বড় মনে আছে। আর জানিলাম সেই সত্য। এখন সেই কর্ত্তব্য, সেই স্থির সিদ্ধান্ত, নিশ্চয় আর অন্য গতি নাই। এই ইসাক্ বলি-দিব, তাঁর ধন তাঁকে দিব, তাতে আমার কি! একি কথা! আমি দিব? কোথা পেলাম আমি? কোথা কাকে দিলুম? যিনি দিলেন—তিনি নিলেন তাঁর কথা।

আমার আবার আপনাকে কিছু লেখাই অহাম্মকি। কেবল প্রণাম ব্যতিরেকে আর আমি আপনাকে কি লিখিতে পারি—ক্ষমা করিবেন।

স্থানের কথা যদি বলেন ত বদরিকাশ্রম। ভগবান স্বয়ং তপস্যা করিয়াছিলেন, তপস্যার জন্য ভগবান উদ্ধব প্রভৃতি সকলকে ওখানেই পাঠাইয়া-ছিলেন, সে আপনি জানেন।

বদরিকাশ্রম সেই আছে, নাই কেবল বাদ-রায়নি ও সে আশ্রম। অতএব ঐ স্থানই সকল প্রকারে সুন্দর স্বাস্থ্যকর ও সুভিক্ষ হইবে। এ কয়েক মাসের জন্য এ স্থান অতিশয় সুন্দর হইবে—সকল প্রকারে অনুকূল, যাতায়াতেরও সুগম আছে। এ বৎসর শীতকালে খুব বরফ না পড়ায় আজকাল খুব শীত। তবে আপনি যদি বদরিকা-শ্রমে যাওয়াই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন—কোথায় থাকেন যেন দাস অবশ্য জানিতে পায়, তা হলে অবিলম্বে চরণে পৌঁছিব।

আপনি যা লিখিয়াছেন যে কেবল দেশ কালের সৌন্দর্য্যের জন্য ঘুরে বেড়ায় যথার্থই তাহার সপ্ত ভুবন দেখেও আশা মেটে না বরং আরও বৃদ্ধি হইবে—হয়রান। আপনি গত পত্রে যা লিখিয়াছেন তাহার অমোঘ মর্ম কি বুঝি—কি জানি যে লিখিব। সেখানে আর বক্তব্য মন্তব্য কর্ত্তব্য বোধ হয় কিছু থাকে না। তার পর যা তাই। শ্রীশ্রীগুরুদেব করুন আমাদের সকলের তাই হোক, সেরূপ পুরে বিচরণ করি।

তিব্বতের আচার ব্যবহারের কথা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সকল প্রকাশই আছে—আমি আর বিশেষ কি লিখিব? অগোচর নাই। তিব্বতের যে প্রদেশে আমি গিয়াছিলাম—তাহাকে 'ঙারি কুর সুম' কহে। তিব্বত চারি ভাগে বিভক্ত। ঙারি কুর সুম, ঙাম্ তোক্, সাং, উ···ইহার মধ্যে ঙারি প্রদেশের চতুর্থাংশের একাংশও বোধ হয় আমি দেখি নাই। আর অতি অল্প দিবস ছিলাম। তবে যা দেখেছি অতি সুন্দর, কি গম্ভীর স্থান। আর মঠগুলির আচার ব্যবহার সব ভাল, অতিশয় পবিত্র, এমন কি আজও যে স্ত্রী-সম্ভোগী, তার মঠে মন্দিরে কোন অধিকার নাই।

কি সুন্দর নিয়ম, কাহারও দ্বারা লঙ্ঘন হইলে আর রক্ষা নাই। তিব্বতের রাজা লামা। রাজ্যের

যা কিছু আয় কেবল মঠে মন্দিরে ব্যয় হয়। সুতরাং রাজকার্য্যও ইঁহাদের করিতে হয়। মঠে অনেক শ্রেণীর লোক আছে। লামারা যথার্থই এ সকল কার্য্য হইতে নিশ্চিন্ত থাকেন, নিম্ন শ্রেণীর ডাবারা এসকল কর্ম করে, এরা বাণিজ্যও করে, খুব ব্যাপার করে—তাহা হোক—এসকলই মঠের জন্ম করিতে হয়। কিন্তু আর কোন দোষে দূষিত হইলে, একেবারে মঠের বাহিরে যাইতে হয়। সত্য সত্যই প্রধান প্রধান বুদ্ধানুশাসনগুলি সকল মঠে আছে, সেই অনুযায়ী, তবে ভিন্ন ভিন্ন অধিকারী বিশেষে, যেরূপ হয়। এই বৌদ্ধ ধর্ম্ম বুদ্ধদেবের সময়েই কয়েকটি সম্প্রদায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার পরে আর কথা কি। আপনি যে তন্ত্রোক্ত ভয়ঙ্কর আচারের কথা কহিয়াছেন তাহা মঠ প্রভৃতিতে জানে না, ও সকল কথা হইতেও নিষেধ আছে। তবে সাধারণ লোক পশুর ন্যায়। তাহারা ওসকল ভয়ঙ্কর আচারকে কোন ভয়ঙ্কর বলে জানে না। এমন কঠিন ভয়ঙ্কর দেশ, তাতে কি ভাবে কাল যাপন করে তাহা কি বলিব। অধিকাংশ লোক ছোট ছোট তাঁবুর মধ্যে ছাগল ভেড়া রেখে পালে—তাহাতেই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। যদি যান ও দেখেন—কিছু বলিবার নয়।

ইহারা কেবল 'লামা সঙ্গ্যা কু জোঁক' এরূপ দেবতাদের নাম সদা করে—আর সাধু ধার্ম্মিকদের বড় ভক্তি করে, মান্য করে। ইহাদের মধ্যে কাহাকেও আমাদের দেবতার ন্যায় ধূপ দীপ দিয়া পূজা করিতে দেখিয়াছি, যাহা হোক এদের বড় আশ্চর্য্য গুণ। এদের কথা ছেড়ে দিতে হয়, এরা দেশাচার বলে এমনও দেখিয়াছি কোন অতিথিকে আপনার স্ত্রী দিয়া সৎকার করে, বোধ হয় পূর্ব্বে লিখিয়া থাকিব।

On the whole মঠের আচার ব্যবহার অত্যন্ত সুন্দর, অতিশয় বিশুদ্ধ, তন্ত্রের immoral একটিও জানে না। তবে দিন রাত্রি পূজা পাঠ বড় করে, সেও বড় আশ্চর্য্য এবং এক এক রকম পূজার সময় ভিন্ন ভিন্ন বেশ ও প্রকরণ। এমন দেশে দেখি দেবীর পূজার সময়ে একেবারে বলি মাংস রহিত। আবার ভস্মাসুরের পূজার সময় তাহা না হইলে হয় না। এখানে এক রকম মদের মতন (তিব্বতি সুরা) দিতে হয়, কিন্তু পূজকদের খাইতে অধিকার নাই। মঠস্থ লোকের খাইতে নিষেধ। মঠগুলির দিকে দেখিলে সত্য সত্যই মনে পবিত্র ভাবের উদয় হয়।

আপনি যে 'অমিতাভ বুদ্ধম্' লিখিয়াছেন, তাহাই নাম বটে, কিন্তু কোন জঘন্য আচরণকারী বলিতে শুনি নাই। আর তাঁহার তত্ত্বগাথা প্রভৃতি সুন্দর বাক্যের কুৎসিত ব্যাখ্যা করিতে শুনি নাই, যেমন বাউলেরা মহাপ্রভুকে বলে, সেরূপ ভ্রষ্ট হয় নাই, হইলেই বলিত আপনার মত পুষ্টিবর্দ্ধন। এখনও স্ত্রী সম্বন্ধে বিশেষ শাসন। এমন কি কোন বিশেষ আবশ্যক না হইলে স্ত্রীজাতির মঠে আসিবার অধিকার নাই। নৃত্যগীত, কোন রকমের মাদক বস্তু বড় নিষেধ আছে, যেমন যেমন বুদ্ধদেবের Law ছিল তদ্রূপই আছে। Morality বেগড়ায় নাই, তবে সে উন্নতি সকলের সমান হইতে পারে না। কেহ দেখুন কেবল পূজা পাঠ করিতেছেন, আর কেহ কেবল জপই করিতেছেন 'ওঁ মণি পদ্মে হুঁ' এই প্রধান মন্ত্র, নাম মাহাত্ম্য এমন কোথাও দেখি নাই। কেহ দেখুন 'লুং গম্ দুগ' ধ্যানস্থ, কেহ কেবল 'তোংবানি থাম্ জেৎ তোংবা' এই অভ্যাস করিতেছে—'সর্ব্ব শূন্য আমি'।

যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে ধ্যান সমাধির লোক অতি বিরল [।] বোধ হয় শুনিয়াছি—লাসার দিকে অনেকগুলি আছেন। একটি অল্প উন্নত (সাধক) কৈলাস পর্ব্বতের মঠে মিলিয়াছিল, তিনি একটি বুদ্ধের আসন বলেন—তাহা অতি

চমৎকার, সেরূপ করিয়া বসিলে প্রথমেই এমন গরম হইবে যে গায়ে কিছু সয় না। আমি এরূপ বসিয়া কি করিব জিজ্ঞাসা করাতে বলেন 'কিছু না, মন শূন্য কর।' আসন, শীত প্রধান দেশে— ঐরূপ মন্দ নয়।

অধিক আর কি লিখিব, আপনার কিছু অগোচর নাই। আমি যাহা দেখিয়াছি— তাহাতে মঠের আচার ব্যবহার সর্বতোভাবে নীতিশুদ্ধ। তারপর যে যা করুক। সব শক্তি পৃথক পৃথক, সুতরাং ক্রিয়াও পৃথক পৃথক, মোদ্দা সে সুন্দর নিয়মগুলির মধ্যে সকলকে থাকিতে হইবে। মঠগুলি প্রায়ই এমন সুন্দর স্থানে— একেবারে গ্রাম বসতি হইতে দূরে, উচ্চ উচ্চ স্থানে স্থাপিত। গৃহস্থদের সহিত কোন সংস্রব থাকে না।

'লামা, গেলাং, কুমার, নিংমা, সনশে, গেশে, খাম্বা' এই কয়টা sect প্রধান। তারপর অধিকাংশ 'ডাবা' দেখিবেন। 'দাগচ্যা তোম্বা শাক্য থুবা সেমজে খাম জেলা থুগ চিজিকৃছি;' এই আপনার সেই 'আমার ইষ্ট বুদ্ধদেব, আমার Every thing for others' (সব কিছু পরের জন্য)—এবিষয়ে আপনার যাহা বলিবার লিখিবেন। আর একটি তাহাদের মুখে শুনিয়াছি যে তিব্বতীদের নাকি পূর্বে কোন শাস্ত্র ছিল না, যাহা কিছু আমাদের নিকটে পাইয়াছে। গ্যাকর কাদীন ফাফ্‌পা (আর্য্য) বলে 'আমাদের যা কিছু সব তোমাদের।' আতিথেয় খুব, কেবল "ইংরেজের সঙ্গে মিশিয়াছ বলিয়া আমাদের ভয় হয়, আমরা তোমাদের সঙ্গে বড় মিশিতে পারি না" বলে; কিন্তু তবু সৎকারের ত্রুটি নাই।

আপনি যে তিব্বতে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা নেপাল হইতে সহাইয়া গেলেই ভাল হয়, বদরীনাথের রাস্তায় নয়। আর দেখুন হৃষিকেশে দশহরার পর হইতে কিছুতেই থাকা বিধেয় নয়, হয় উপরে—নয় নীচে—ওখানে নয়। নিবেদনমিতি—

অসংখ্য প্রণাম নমস্কার, যেরূপ ইচ্ছা লিখিবেন। আপনার address যেন আমি বরাবর জানিতে পাই।

পুঃ—তিব্বতে যে প্রদেশে আমি গিয়াছিলাম —তথায় বড় চোর ডাকাতের ভয়, সেখানকার লোকের একলা ঘোড়ায় চড়িয়া কোথায়ও যাইবার যো নাই। সদাই সশঙ্কিত। দারিদ্র্যের কারণ শস্যের উৎপাদন নাই। অত্যন্ত গরীব। আর বেশী কি লিখিব।

সংস্কৃতে তিব্বতকে 'উত্তরকুরুবর্ষ' কহে—উহা ম্লেচ্ছভূমি নহে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চভূমি —এজন্য শীত অত্যন্ত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সহিয়া যাইতে পারে।...তিব্বতীদের যে তন্ত্রাচারের কথা কহিয়াছ, তাহা বৌদ্ধধর্মের শেষ দশায় ভারতবর্ষেই হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস যে, আমাদিগের যে সকল তন্ত্র প্রচলিত আছে, বৌদ্ধেরাই তাহার আদিম স্রষ্টা।

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ মিশন

স্বামী গম্ভীরানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা ভগবানের ভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। কাজেই প্রশ্ন হতে পারে যে, তাঁর নামের সঙ্গে কর্মচঞ্চল রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নাম জুড়ে দেওয়ার যৌক্তিকতা কি? এ প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগতে পারে, এবং জাগাটা স্বাভাবিকও। অতীত কালের একদিনের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। আমাদের একজন প্রাচীন সাধু—স্বামী জগদানন্দজী—সাধুদের খাবার জায়গার সামনে বসে তরকারি কুটছিলেন। বর্তমানে যেটা বেলুড় মঠের অফিস, সেটাই ছিল তখন সাধুদের খাবার জায়গা। সেই বাড়ির সামনে বসে তিনি তরকারি কুট্‌ছিলেন। শ্রীমা তখন সেখানে এসে উপস্থিত। তরকারি কুটা দেখে তিনি বললেন: "ছেলেরা তো বেশ কুটনো কোটে।" তাতে জগদানন্দজী বলেছিলেন: "ব্রহ্মময়ীর প্রসন্নতালাভই হল উদ্দেশ্য তা সাধন-ভজন করেই হোক, আর কুট্‌নো কুটেই হোক।" কাজেই এই যে কর্মচঞ্চলতা যা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ভেতরে দেখতে পাচ্ছি, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের কৃপালাভ।

আবার আমরা শুনতে পাই, বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দজী) সাধুদের বলতেন: এই বেলুড় মঠেতে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘুরেফিরে বেড়ান। সুতরাং এখানেতে চোরকাঁটাটি পর্যন্ত জন্মাতে দেওয়া চলবে না। বাড়ি ঘর-দোর—সব সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, যাতে শ্রীরামকৃষ্ণের কোন প্রকার কষ্ট না হয়। এখানকার যা কিছু কাজ, সমস্ত হচ্ছে তাঁরই পূজাস্বরূপ, তাঁরই সেবাস্বরূপ। এই হচ্ছে তাঁর ভাব।

তৃতীয় ঘটনা কাশীধামে। সেখানে তখন পূজনীয় ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ উপস্থিত ছিলেন, শ্রীমাও ছিলেন, এবং কথামৃত-লেখক শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয়ও ছিলেন। অবশ্য তাঁরা থাকতেন বিভিন্ন জায়গায়। সেই সময়তে একদিন শ্রীমা কাশীধামে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম দেখতে এলেন। তাঁকে সবকিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো হল। এইদিন একজন সাধু মাকে প্রণাম করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: "মা, সেবাশ্রম কেমন দেখলেন?" মা উত্তর দিলেন: "দেখলুম, ঠাকুর সেখানে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন—তাই এ-সব কাজ হচ্ছে। এ-সব তাঁরই কাজ।" শুধু তাই নয়, তিনি সেই কাজের জন্য একখানা দশটাকার নোটও দান করেছিলেন, সেবাশ্রমের কাজের সাহায্যস্বরূপ। সেবাশ্রম-কর্তৃপক্ষ অবশ্য সে নোটখানাকে খরচ না করে সেটাকে সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন। এখনও পর্যন্ত সেই নোটখানা সেবাশ্রমে রক্ষিত আছে। শ্রীমার মন্তব্য যখন স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর কানে পৌঁছল, এবং তখন সেখানে মাস্টার মহাশয়কে আসতে দেখে, তিনি কয়েকজন ব্রহ্মচারীকে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে বললেন: "মা বলেছেন, সেবাশ্রম ঠাকুরের কাজ, সেখানে ঠাকুর প্রত্যক্ষ রয়েছেন; আপনি কি বলেন?" মাস্টার মহাশয়ের ধারণা ছিল যে, সাধুরা যে-সমস্ত কাজ কর্ম করছেন, রামকৃষ্ণ-উপদিষ্ট উপায়ের সঙ্গে তার ঠিক মিল নেই। এ-যেন নতুন পথে স্বামীজী এঁদের পরিচালিত করেছেন। এই ছিল তাঁর এক রকমের ভাব। এখন মাস্টার মহাশয় সেখানে আসতেই ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের শেখানো কথা ব্রহ্মচারীরা তাঁকে ঘিরে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে মাস্টার মহাশয় হাসতে

হাসতে বললেন: "আর অস্বীকার করবার জো নেই।"

এ-সব ঘটনা-পরম্পরায় ও কথা থেকে আমরা যারা ভক্ত এবং সাধু আছি, তাদের সকলের বিশ্বাস জন্মাবে যে, এরপরে আর যুক্তির প্রয়োজন নেই। এ ঠিক ঠাকুরেরই কাজ হচ্ছে, এ ঠিকই চলছে। কিন্তু সর্বসাধারণের পক্ষে এ যুক্তি অকাট্য নাও হতে পারে, সম্পূর্ণরূপে গ্রহণীয় নাও হতে পারে। সুতরাং বিষয়টি আরও একটু তলিয়ে দেখা আবশ্যক।

আপনারা সকলেই জানেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র কথা বলেছিলেন, 'শিবজ্ঞানে' অর্থাৎ মানুষকে শিব বলে জেনে তার সেবা করা। এ-কথা দক্ষিণেশ্বরে তিনি যেদিন বলেছিলেন, সেদিন সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নরেন্দ্রনাথও, পরবর্তিকালের স্বামী বিবেকানন্দ। ঠাকুরের কথা শুনে তিনি বলেছিলেন: ভগবান যদি সুযোগ দেন, তাহলে পরে আমি দেখাব যে, এ-কথার তাৎপর্য কি। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন। সে-সব পরের কথা। যাহোক, শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা বলেই শ্রীরামকৃষ্ণ থামেননি, কাজেও তিনি সেটাকে রূপায়িত করেছিলেন—দেওঘরে। আপনারা অবগত আছেন যে, তীর্থযাত্রার পথে মথুরবাবুর সহ ঠাকুর উপস্থিত হয়েছিলেন দেওঘরে। সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি দেখলেন, বৈদ্যনাথধামের দরিদ্র লোকেরা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত। তাদের রুক্ষ চুল, রুক্ষ চেহারা, অস্থিচর্মসার শরীর ও জীর্ণ বসন। এ-সব দেখে তাঁর হৃদয়ে করুণা জেগেছিল। মথুরবাবুকে বললেন: "তুমি তো মা-র দেওয়ান; এদের এক মাথা করে তেল ও একখানা করে কাপড় দাও, আর পেটটা ভরে একদিন খাইয়ে দাও।" মথুরবাবু চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, সংখ্যায় লোকগুলো অনেক। বললেন: "বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে, এও দেখছি অনেকগুলি লোক, এদের খাওয়াতে-দাওয়াতে গেলে টাকার অনটন হয়ে পড়তে পারে।" মথুরের এ-কথায় কোন কর্ণপাত না করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই গরীবদের দুঃখে কাঁদতে লাগলেন, এবং বললেন: "দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। আমি এদের কাছেই থাকব; এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাব না।" এই বলে তিনি গরীবদের মধ্যে বসে পড়েন। ভেবে দেখুন, যে রামকৃষ্ণ মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ীর দর্শন করেছিলেন, তিনি জগৎকে জানিয়ে দিলেন যে, হিন্দুরা মূর্তি-পূজক নয়; পরন্তু মূর্তিতে তারা ভগবানেরই পূজা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কালীময় ছিলেন। শিবের স্তোত্র পাঠ করতে করতে যিনি বাহ্যহারা হয়ে যেতেন, তিনিই আজকে বসে পড়লেন গরীবদের ভেতরে, তাদের ব্যথায় সমব্যথী হয়ে। সেটা কি শুধু গরীবদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে? না তাদের ভিতর শিব দর্শন করে? উত্তর আপনারা নিজেরাই খুঁজে বের করুন। আমার দেবার প্রয়োজন নেই।

তারপরেই দেখুন, শ্রীরামকৃষ্ণ গেলেন মথুরানাথের সঙ্গে তাঁর জমিদারিতে কলাইঘাটায়—রাণাঘাটের নিকট। সে বছরে ভাল ফসল হয়নি। তাই প্রজারা খাজনা দিতে পারছে না। শ্রীরামকৃষ্ণ গরীব প্রজাদের দুর্দশা দেখে অশ্রু বিসর্জন করেন এবং মথুরবাবুকে বলেছিলেন: এই হতভাগ্য প্রজাদের খাজনা মাপ করে তুমি এদের ভাল করে খাইয়ে দাও। মথুরবাবু সে আদেশও পালন করেছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভেতরেতে এভাবে দরিদ্র-সেবার একটা ভাব বরাবর ছিল। আরও একবার দেখতে পাই, একদিন দক্ষিণেশ্বরে

কথাবার্তা হচ্ছে। মণি মল্লিক মহাশয়কে ঠাকুর বললেন : "দেখ, রাখাল বলছিল, ওদের দেশে বড় জলকষ্ট। তুমি সেখানে একটা পুষ্করিণী কাটাও না কেন? তাহলে কত লোকের উপকার হয়। তোমার তো অনেক টাকা আছে, অত টাকা নিয়ে কি করবে?" আবার বললেন : "তা শুনেছি তেলিরা নাকি বড় হিসাবী।" ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন। উপস্থিত যাঁরা তাঁরাও চুপ করে রইলেন। কিন্তু খানিক পরে মল্লিক মশায় বললেন : "মহাশয়, পুষ্করিণীর কথা বলছিলেন। তা বললেই হয়, তা আবার তেলি ফেলি বলা কেন?" শুনে সকলে একটু হাসলেন। কিন্তু এই সকল কথার ভেতরে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবটি দেখুন। পুকুর হল কি না হল জানি না, ইতিহাসে সে-কথা লিপিবদ্ধ নেই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভাব, অপরের সাহায্যের জন্য টাকা খরচ করা দরকার,—এটা কিন্তু এ-কথাগুলির ভেতর দিয়ে ভাল করে ফুটে উঠেছে

আরেকদিনের কথা। নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) তখন অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত। তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়েছে। খেতে পান না, পরবার হয়তো কাপড়ও নেই। দুরবস্থা যতদূর হতে পারে ততদূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। সে সময়ে একদিন তিনি তাঁর টাকাওয়ালা এক বন্ধুর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত। ঠাকুর তখন তাঁর বন্ধুকে বললেন : "নরেন্দ্রের বাবা মারা গেছে, ওদের বড় কষ্ট, এখন বন্ধু-বান্ধবরা সাহায্য করে তো বেশ হয়।" বন্ধু চলে গেলে, পরে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভর্ৎসনা করে বলতে লাগলেন : "কেন আপনি ওর কাছে ওসব কথা বললেন?" তিরস্কৃত হয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন : "ওরে তোর জন্য যে আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে পারি!" দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা তাঁকে করতে হয়নি। কিন্তু ভাবটা দেখুন! অপরের জন্য যখন প্রাণ কেঁদে ওঠে, তখন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাও চলে। এটা হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাব।

তারপরে আরও ঘটনা দেখুন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলতেন। একদিন এমনিভাবে কথা চলছে। তখন শ্রোতাদের মধ্যে একজন বললেন : "সংসারে থাকতে গেলে টাকাও ত চাই, সঞ্চয়ও চাই। পাঁচটা দান ধ্যান—।" তাতে ঠাকুর উত্তর দিলেন : "দান-ধ্যান-দয়া কত! নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার হাজার টাকা খরচা—আর পাশের বাড়িতে লোক খেতে পাচ্ছে না। তাদের দুটি চাল দিতে কষ্ট হয়—অনেক হিসেব করে দিতে হয়। খেতে পাচ্ছে না লোকে—তা আর কি হবে, ও শালারা মরুক আর বাঁচুক,—আমি আর আমার বাড়ির সকলে ভাল থাকলেই হলো। মুখে বলে সর্বজীবে দয়া!" কথাটার তাৎপর্য দাঁড়াল কি? তোমার যদি থাকে তাহলে শুধু নিজে ভোগ না করে, অপরের দিকে তাকিয়ে, তাদের সহমর্মী হয়ে তাদের জন্য কিছু করা আবশ্যক। সাধুসেবার ভাবও শ্রীরামকৃষ্ণের মনে যথেষ্ট ছিল। তাই একবার মথুরবাবুকে বলেছিলেন সাধুদের আবশ্যকীয় দ্রব্য দিয়ে একখানি ঘর পূর্ণ করে রাখতে। মথুরবাবু সে আদেশ পালন করেছিলেন, এবং ঠাকুর সে-সব দ্রব্য দিয়ে দক্ষিণেশ্বরে আগত বা সাগরস্নানে যেতে উদ্যত সাধুদের সেবা করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর অন্ত্যলীলাকালে ব্রাহ্মসমাজে বা ভক্তদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এবং দক্ষিণেশ্বরে বসে সকলকে অকাতরে ভগবদ্ভাবে তিনি উদ্দীপিত করেছিলেন। আরেকটা মজার কথা মনে করুন। ঠাকুর লাটু মহারাজকে লেখা-পড়া শেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু লাটুমহারাজ 'ক'-কে 'কা' বলে উচ্চারণ করায় সে-চেষ্টা সেখানেই শেষ হয়ে

যায়। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ কথায় নয়, কাজেও সব জায়গায় নানাভাবে দেখিয়ে গিয়েছেন যে, অপরের জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করা, যাতে তাদের মঙ্গল হয়, যাতে তারা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারে—এটা মানুষের একটা কর্তব্য। যাকে Humanism (মানবতাবাদ) বলা হয়। এতক্ষণ পর্যন্ত যা শুনলেন তা ঠিক সেই Humanism (মানবতাবাদ) নয়। ঠাকুরের ভাবের ভিত্তি হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত যে মানবতা—তারই কথা শ্রীরামকৃষ্ণ শিখিয়ে গেছেন, বলে গেছেন এবং দেখিয়ে গেছেন—নিজের কথায় ও কাজে।

এতো গেল একদিকের কথা। তারপরে দাঁড়াল প্রতিষ্ঠান স্থাপন। এই যে মঠ গড়ে তোলা —এও কি শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রেত? অবশ্যই। এতে কোন সন্দেহ নেই। আপনারা যাঁরা 'কথামৃত' বা 'লীলাপ্রসঙ্গ' ইত্যাদি গ্রন্থ পড়েছেন, তাঁদের জানা আছে যে, কাশীপুরে অবস্থানকালে ঠাকুর নিজহাতে সন্তানদের গেরুয়া কাপড় দিয়েছিলেন এবং তাঁদের ভিক্ষা করতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি নিজেও ভিক্ষার অন্ন খানিকটা গ্রহণ করেছিলেন। তারপরে তিনি গোপনে স্বামীজীকে নানারকম উপদেশ দিতেন কি করে যুবক ভক্তদের ধরে রাখতে হবে, যাতে তারা বাড়িতে গিয়ে সংসারে আবদ্ধ না হয়। কি করে মঠ প্রতিষ্ঠা করতে হবে—সে-সব কথাও তিনি স্বামীজীকে ঐ সময় শিখিয়ে দিয়েছিলেন। স্বামীজী নিজেও ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ মে প্রমদাদাস মিত্রকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: "আমার উপর তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) নির্দেশ এই যে, তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগিমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব...। তাঁহার আদেশ এই যে, তাঁহার ত্যাগী সেবকমণ্ডলী যেন একত্রিত থাকে এবং তজ্জন্য আমি তার প্রাপ্ত।" শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর তিনি সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়কে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন: "তুই করছিস্ কি? আমার ছেলেরা সব পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তার আগে একটা ভাল ব্যবস্থা কর।" তারই ফলে বরাহনগর মঠ গড়ে উঠেছিল। সুতরাং এ মঠ শ্রীরামকৃষ্ণ-সংস্থাপিত। তাঁরই প্রেরণায়, তাঁরই উপদেশ অনুযায়ী, তাঁরই ইচ্ছা-অভিপ্রায় অনুযায়ী এ মঠ গড়ে উঠেছে। তথাপি আমাদের মনে আবার প্রশ্ন জাগে, একটা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এই যে বিভিন্ন শাখা গড়ে উঠল, আর যে প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে নানারূপ কাজ চলতে লাগল, যাকে ইংরেজীতে এক কথায় বলে Organisation (এককেন্দ্রিক বহুশাখাবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান), এই Organisation-টা কোথা থেকে এল? এটা কি শ্রীরামকৃষ্ণ-কল্পিত, অথবা স্বামী বিবেকানন্দের স্বকপোলকল্পিত?—এ প্রশ্নটা জাগে। একটু দেখা যাক্। আমরা জানতে পারি যে, স্বামীজীর নিজের ভেতরেও সন্দেহ ছিল, এভাবে Organisation গড়ে তোলা উচিত হবে কিনা। প্রথম অবস্থাতে তিনি যখন আমেরিকাতে ছিলেন, তখন একদিন বলেছিলেন: আমেরিকাতে এসে আমার জীবনে সর্বাধিক একটি প্রলোভনের ভেতর আমি পড়েছিলাম। এক মহিলার সঙ্গে কথা হচ্ছিল; সুতরাং তিনি বুঝে ফেললেন যে, এটা একটা প্রেমের ব্যাপার হবে। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: সে মেয়েটি কে, স্বামীজী? স্বামীজী উত্তর দিলেন: (আমরা ধরে নিতে পারি, একটু মুচকি হেসে) 'Organisation'। এই যে প্রতিষ্ঠান অবলম্বন করে, একটা বিশেষ কেন্দ্রকে অবলম্বন করে, বিভিন্ন শাখার ভেতর দিয়ে কর্ম পরিচালনা করা —এ জিনিসটাই তাঁকে প্রলোভিত করেছিল। তারপর আমেরিকা থেকে ফিরে এসে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব প্রচারের জন্য

শিবজ্ঞানে জীবসেবার জন্য, রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজের হাতে। প্রতিষ্ঠা করেও এ বিষয়েতে সন্দেহ—এটা ঠাকুরের ভাবে হল কিনা! এ সন্দেহ তখন অনেক ভক্তের মনেও ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাইদের ভেতর তো অবশ্যই ছিল। এ নিয়ে অনেক তর্কাতর্কি ইত্যাদি হয়ে গিয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের নিকট পর্যন্ত প্রশ্ন পৌঁছেছিল। মা তাতে উত্তর দিয়েছিলেন যে, নরেন যা করছে তা ঠিকই করছে। নরেন যা করছে ওটা ঠাকুরেরই কাজ। গুরু-ভাইয়েরা প্রথমে বুঝতে পারলেন বা না পারলেন, পরে কিন্তু স্বামীজীর ভাব তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। আমরা দেখতে পাই, স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, স্বামী শিবানন্দজী, স্বামী সারদানন্দজী, স্বামী রাম-কৃষ্ণানন্দজী, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী, স্বামী-অখণ্ডানন্দজী, স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী—এঁরা সকলেই নানাভাবে স্বামীজীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্বামীজী-পরিকল্পিত নানা কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। এমন কি শুনতে পাওয়া যায়, স্বামী তুরীয়ানন্দজী শেষ বয়সে যখন রোগে ভুগছিলেন, তখন বলেছিলেন: আমাকে এত কষ্ট পেতে হচ্ছে আমি স্বামীজীর কথা শুনে তাঁর কাজ করিনি বলে। আর স্বামীজী নিজে বলতেন: আমি যা কিছু করছি, ঠাকুর আমাকে হাতধরে করিয়ে নিচ্ছেন। তিনি কখনও দাবি করেননি যে, তিনি নিজে রামকৃষ্ণ মঠ বা রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বরং বলতেন, ঠাকুর তাঁকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন। এই ছিল তাঁর ভাব। সুতরাং শ্রীশ্রীমায়ের কথা থেকে, স্বামীজীর কথা থেকে, স্বামীজীর গুরুভাইদের ব্যবহার থেকে—আমরা ঠিক ঠিক প্রমাণ পাই যে, এ হচ্ছে ঠাকুরের কাজ।

সর্বশেষে আপনাদের বলতে চাই, এই যে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবধারা প্রচার এবং 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' করা—এটা শুধু রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এই ভাবটাকে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত সমস্ত জগৎময়। সমস্ত ভক্তবাড়িকে একটা মঠে বা মিশনেতে পরিণত করা চলে। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বলে গিয়েছেন, এই যে পরিবার-পরিজন এদের ভগবান দিয়েছেন, তাদের সেবার জন্যে, নারায়ণ ভেবে প্রতিপালনের জন্যে। পরিবার, পরিবার বলে নয়। নারায়ণ নানা রূপে আমাদের সামনে রয়েছেন, তাদেরই সেবার জন্যে। সুতরাং প্রত্যেক গৃহ সেবাকেন্দ্র-রূপে পরিণত হতে পারে। আর সেখান থেকে পাড়া-প্রতিবেশীরাও সৎ গৃহস্থকে দেখে অনুপ্রাণিত হবে, এইসব ভাবে। এভাবে ঠাকুরের ভাব তাদের ভেতর দিয়ে প্রচারিত হবে। আর যাদের সামর্থ্য আছে তারা হাত বাড়িয়ে আর সকলের সঙ্গে সমপ্রাণ হয়ে তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাবেন। এ হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার একটা দিক। আমি বলব না—এটাই সব। ঠাকুরের সম্বন্ধে বলবার মতো কথা আরও অনেক কিছু আছে। তিনি অনেক কিছু দিয়ে গিয়েছেন, যা নাকি গবেষণাদ্বারা, চিন্তাদ্বারা আমাদিগকে আবিষ্কার করতে হবে ও কাজে লাগাতে হবে। আমি একটা দিক মাত্র আপনাদের সামনে উপস্থিত করলাম।*

* ১২ মার্চ ১৯৮৬, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ধর্মসভার সভাপতি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষের অভিভাষণ। শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত।

সমাজগঠনে নারীর ভূমিকা

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

রাজমিস্ত্রীরা ঘরবাড়ি, প্রাসাদ, প্রাচীর, মন্দির, মসজিদ—যে কোন কিছু নির্মাণের কালে সর্বাগ্রে চুন-বালি-সুরকি-সিমেন্ট দিয়ে একটি 'মাখা মশলা' তৈরি করে নেয় (ওদের ভাষায় 'তাগাড়') গড়নের ইঁট, পাথর, টালিদের নক্সামাফিক জুড়ে তোলবার জন্যে।

গোল, চৌকো, কোনাচে, তেকোনা যে-কোন গড়নেরই ইট পাথর হোক না কেন তাদেরকে ঠিক মতো খাঁজে খাঁজে বসিয়ে জুড়ে জুড়ে খাড়া করে তুলতে ঐ মাখা মসলাটিই প্রধান উপকরণ।

মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সমাজ গঠনের আদি পর্ব থেকে আজ পর্যন্ত 'সমাজ' নামক বস্তুটির অজস্র ভাঙা-গড়া, আর অসংখ্য নক্সার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয়—সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা মিস্ত্রীর হাতের ঐ মাখা মসলাটির মতোই।

যুগে যুগে কালে কালেই সমাজসংস্কারকেরা পুরনো সমাজকে ভেঙে নতুন সমাজ গড়ে তুলতে যত্নবান হন। পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রেখে, আর নিজস্ব মৌলিক চিন্তা-ভাবনা নিয়ে যখনই যিনি বা যাঁরা 'নতুন সমাজ' গড়ে তোলবার কাজে হাত দিয়েছেন, তখনই নারীর এই ভূমিকাটিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সমাজ জীবনের সুবিধে-অসুবিধে, স্বস্তি-শান্তি, নিরাপত্তা-সুরক্ষা ইত্যাদির মুখ চেয়ে (অবশ্য সবটাই পুরুষ সমাজের চিন্তাভাবনার মুখ চেয়ে) যে নক্সাটি বানানো হয়ে থাকে তার সমস্ত অসমান কোনাচে খোঁচ-খাঁচগুলিকে ঠিক ভাবে গেঁথে তুলতে উপকরণ ঐ নারীসমাজ! সে কখনই কোন পরিকল্পনার শরিক নয়, তার ইচ্ছে অনিচ্ছে মতামতের কথা চিন্তাও করা হয় না কখনও। বিনা দ্বিধায় তাকে ঐ সব অসমান খাঁজের মধ্যে ঢেলে ঢেলে নতুন নক্সা গড়ে তোলা হয় মাত্র।

যখন যে নেতার আবির্ভাব ঘটে তখন তাঁর ভাবনাতেই ভাবিত হয় সমাজ। গড়ে ওঠে সমাজ মানসিকতা।

যদি কেউ বলেন 'নারী দেবী' তো নারী দেবী।

যদি কেউ বলে ওঠেন, 'নারী নরকের দ্বার!' তো ভাবা হোক নারী নরকের দ্বার।

যদি বলা হয়, 'শতপুত্রের জননী হওয়াই নারীর গৌরব' তো নারী সেই গৌরব অর্জনের চেষ্টায় লাগে। আবার কখন যদি বলা হয়, 'না না, একটির বেশি দুটি না।'···তো অপ্রতিবাদে সেই নির্দেশনামায় স্বাক্ষর দিতে আসে কারণ সে জানে নির্দেশ মানাই তার কাজ।

আর নির্দেশদাতারাই জানেন, এখন এই রকমই দরকার। এতেই সমাজের ভারসাম্য ঠিক থাকবে। সমাজ জীবনে হাজার হাজার বছরের ভাঙাগড়ার ইতিহাসের প্রায় এই একই ছবি।

একটি মাত্র যুগে নারীকে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে সমাজকে আলোকিত করতে দেখা গিয়েছিল। সেটি হচ্ছে বৈদিক যুগ। কিন্তু সে যুগে সাধারণীদের জীবন কেমন ছিল জানা নেই। তা সেই বৈদিক যুগ তো আপন ঔজ্জ্বল্য নিয়ে অচিরেই বিদায় নিয়েছিল। কেন সে ক্রমোন্নতির পথ ধরে নারী মহিমার ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করে চলতে পারল না,—তা পণ্ডিতজনেই জানেন। আপাতদৃষ্টিতে তো দেখা যায় তারপর একটি গভীর অন্ধকার যুগ। সেই অন্ধকারের পথ

পেরিয়ে, অনেক দূরে এসে পৌঁছে আমরা আমাদের মেয়েদের উজ্জ্বল আদর্শ দেখতে চাইলেই, সেই সুদূর অতীতে চোখ ফেলি, যেখানে গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী! যেখানে নারী-কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে, 'যে ঐশ্বর্যে আমার অমৃতত্বলাভ হবে না, তা নিয়ে আমি কী করব ?'

সেই আলো থেকে কোন্ পরিবেশ বেচারী নারীসমাজকে এমন গভীর অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছিল, যার থেকে আর উদ্ধার হল না তার ? বস্তুর মোহই তার সমগ্র শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, ফেলেই রাখল !

আর সমাজচিন্তাধরদের কাছে 'শিশু' 'নারী' 'বৃদ্ধ' সকলেই একই শ্রেণীতে পড়ে গেল।

আত্মরক্ষায় অসমর্থ, অসহায় পরমুখাপেক্ষী একটি গোষ্ঠী! শিশু, নারী, বৃদ্ধ!

অথচ আবার নারীর কাছে পাহাড় প্রমাণ প্রত্যাশা!

এও একটি রহস্য !

কই, 'সমাজ জীবনে, সমাজ গঠনে বা সমাজ রক্ষণে পুরুষের ভূমিকা কী ?' এ নিয়ে তো কখনও কোথাও তেমন প্রশ্ন উঠতে দেখা যায় না।

কারণ তার সম্পর্কে চিন্তা ভাবনাটি যেন সব শেষ হয়ে গেছে।

তার পক্ষে একটি মাত্রই নির্দেশ, সে যেন 'মানুষ' নামের যোগ্য হতে পারে। এইটি হতে পারাই তার পক্ষে পরম ও চরম।

অবশ্য ওই একটি মাত্র স্থিরীকৃত নির্দেশে সবই আছে। তাই সে একটি প্রশ্নাতীত ভূমিকায় স্থির আছে। তবে সবাই যে 'মানুষ' নামের যোগ্যতা অর্জন করছে, তা তো নয়। পারলে ভাল, না পারলে আর কী করা যাবে ?

কিন্তু নারী সম্পর্কে ?

অহরহ চিন্তা ভাবনা, আর প্রশ্ন। প্রশ্নের শেষ নেই।

নারীর করণীয় কী, কর্তব্য কী, আদর্শ কী, সমাজ জীবনে বা সমাজ গঠনে তার ভূমিকা কী, ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন।

শুধু আজই নয়—

এ প্রশ্নের ধারা চলে আসছে যুগ যুগান্তরের পথ বেয়ে।

একথা কোনদিন বলা হয়নি—তারও শুধু 'মানুষ' নামের যোগ্য হলেই চলবে।

হয়তো—এর একটিই কারণ, নারীও যে সমগ্র মানব সমাজের একজন এবং 'অধিকাংশই'—সমাজ একথা কোনদিন ভাবতে শেখেনি।

মেয়েদের নিয়ে সদাই তাই এত চিন্তা ভাবনা।

তাকে কোথায় রাখলে মানায়, কী ভাবে রাখলে সুবিধে হয়, কোন্‌দিকে চাপান দিলে বা নামিয়ে দিলে সমাজের ভারসাম্য রক্ষা হয়।

আদিকাল থেকে এই চিন্তা ভাবনার ইতিহাস দেখলে মনে হয় সে যেন এক সুস্থির মানব সমাজের মধ্যে হঠাৎ এসে পড়া একটা গোলমেলে বস্তু মাত্র।

তাই নারী সমাজ আজও উদ্বাস্তু।

আজ পর্যন্ত স্থির হল না এই জাগতিক জগতে তার যথার্থ জায়গাটি কী ? আজও তার পায়ের তলায় একটি শক্ত ভূমি নেই।

যা নাকি সমাজগঠনের আদি পর্ব থেকে পুরুষের জন্য স্থিরীকৃত হয়ে আছে।

অন্ধকার অতীতে অরণ্যচারী বন্য মানবগোষ্ঠী একদা যেদিন তাদের এলোমেলো জীবনের মধ্যে একটি সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল, তখনও তার প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল দলের মেয়েগুলোকে নিয়েই

অবশ্য ভাল ভাব নিয়েই।

বহিঃপৃথিবীর রুক্ষ কর্কশ নিরাপত্তাহীন পরিবেশের আওতা থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে কী করে তাদের নিরাপদে নিরাপত্তায় রাখবে এই ভাবনা।

পাহাড়ের গুহায়? না বৃক্ষ কোটরে? নাকি ঘন অরণ্যের অন্তরালে? তা সেখানেও তো হিংস্র প্রাণীরা। তাহলে? সঙ্গে করেই নিয়ে বেড়াবে?

কিন্তু সেটাইতো হয়ে আসছিল এতদিন, পশুপক্ষী জীবজন্তুর মতোই। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে একসঙ্গে ঘুরেই তো বেড়িয়েছে। তবে? নতুন ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থাটা কী হল? সদা জাগ্রত চিন্তা চেতনার রূপটি দিতে কোন পদ্ধতি?

এ প্রশ্নের উত্তর ওই নারীজাতির কাছেই।

নারী জননী, নারী ধাত্রী, নারী পালয়িত্রী! সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি রহস্যের ধারক বাহক নারী। তাই তখনও পর্যন্ত সেই অবোধ মানুষগুলোর কাছে নারী একটি বিস্ময়। আর বিস্ময়ের বস্তু বলেই মূল্যবান।

অতএব নিয়মের রীতিতে মূল্যবান বলেই তাকে ভালভাবে রক্ষা করার চিন্তা। আততায়ীর হা- থেকে, বহিঃশত্রুর হাত থেকে এবং দুরন্ত দুর্দান্ত আদিম প্রকৃতির নিষ্ঠুর আক্রমণের হাত থেকে।

এই নিয়েই ভাবনা করেছে সেই অরণ্যচারী মানবগোষ্ঠী। নারীর জন্য, আর তার শিশুর জন্য চাই, নিরাপদ আশ্রয়। তবে তাদের জন্যে ঘর বাঁধো, তাদের জন্যে আহরণ করে আনো খাদ্য পানীয়, আরাম আর সুবিধার আয়োজন।

পুরুষ ঝড়ে জলে, রোদে ঘামে জীবন সংগ্রামের পথ ধরে এগিয়ে চলুক ক্রমোন্নতির পথে, আর নারী তার গড়ে তোলা ঘরে তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকুক সেবা যত্ন মমতা সান্ত্বনার সম্ভার নিয়ে।

সমাজ গঠনের মূলে তো এই চিন্তা ভাবনা।

যার ফলে দাঁড়াল, এই নারী পৃথিবীর জন্যে নয়, নারী নিজের জন্যে নয়, নারী কেবলমাত্র পুরুষের জন্যে। মানবগোষ্ঠীর ক্রমোন্নতির অগ্রগতির জয়যাত্রার যে ঘটনাপ্রবাহ বয়ে চলেছে, নারী তার শরিক নয়। সহায়কমাত্র। যদিও সে সহায়তার স্বীকৃতি দেখা যায় না। পুরুষ তো আপন শক্তির নিত্য নতুন উন্মোচনের উল্লাসে মদমত্ত।

তারপর তো হাজার হাজার বছর কেটে গেল।

গুহা থেকে বেরিয়ে পড়া মানুষ অবিরত জয়ের সাধনায় এগোতে এগোতে চাঁদে গিয়ে হাজির হয়েও ক্ষান্ত হল না। মহাকাশ জয়ের সাধনায় লাগল উঠে পড়ে। হতেও থাকছে সকল, কিন্তু 'সমাজ গঠনের' আদি পর্বের সেই নক্সার কি খুব বেশি পরিবর্তন ঘটেছে? আজকের সমাজেও নারী সম্পর্কে ভাবভাবনা কি প্রায় সেই একই নেই?

'সংসার সন্তান', আর জয়োন্মত্ত পুরুষের সংগ্রামী জীবনে একটু 'শান্তি স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান' এই তো হচ্ছে নারী জীবনের প্রধান করণীয়। অথবা এইটুকুই তার করণীয়ের গণ্ডী, এমন মনোভাবই কি আজও সমাজের গভীর গোপনে বদ্ধমূল নেই।

নারীও যে একটি পরিপূর্ণ মানুষের অধিকার পাবার অধিকারী, এবং সুযোগ পেলে সেই ভূমিকা ভালভাবেই পালন করতে পারে এটা এখনও যেন সব সমাজে স্বীকৃত নয়।

যদিও এই হাজার হাজার বছরে জগতে আর সমাজে বহু রূপান্তর ঘটেছে। দেশে দেশে কালে কালে বহিরঙ্গে অনেক বদল হয়েছে। কিন্তু

হিসেব করলে দেখা যাবে যুগে যুগে এই রূপান্তরের আর পালাবদলের খেসারত জুগিয়ে এসেছে মেয়েরাই। তাদের নিয়েই ভাঙাগড়া। তাকে কখন কোন্ পরিবেশে কোথায় রাখলে সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকবে, এই নিয়েই যা কিছু বদল।

কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে—মেয়েগুলো তো জড়-বস্তু নয়, এই হাজার হাজার বছরে ওই মেয়ে-গুলোর মধ্যেও অনেক চিন্তা ভাবনা জন্ম নিয়ে চলেছে। তারা আর এই স্রোতের শ্যাওলার অবস্থায় থাকতে চাইছে না। নিজের জন্যে একটি কায়েম ভূমি চাইছে। পায়ের তলার জন্যে একটু শক্ত মাটি।

তাই কিছু লড়াকু মেয়ে 'অন্দর, অন্তঃপুর, অবগুণ্ঠন, হারেম, বোরখা' সব কিছুর জটিলজাল ছিন্ন করে পৃথিবীর হাটে বেরিয়ে পড়ে নারী সমাজের জন্য আদায় করে ছাড়ছে আইনের শক্তি, সহায়তা, পৃষ্ঠবল।

অবশ্য এর সঙ্গে কিছু কিছু উদার মহান্ সমদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষের সদিচ্ছার অবদানও আছে বৈকি! সমাজ যখন পুরুষশাসিত, তখন দাক্ষিণ্যটুকু যা আসবে তা সেই পুরুষের হাত থেকেই তো সবকিছু! স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতার চিন্তা পুরুষের মধ্যেই প্রথম এসেছে। তারাই প্রথম ভেবেছেন, রথের দুটো চাকার মধ্যে একটা পঙ্গু হয়ে থাকলে, সে রথ এগোবে কী করে?

তা আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, মেয়েদের দাবিদাওয়ার সবকিছুই তো পূরণ হয়েছে, কোথাও তো অধিকারের ভেদ দেখা যায় না। অবশ্য ধর্মীয় আচারের গোঁড়ামিতে আবদ্ধ কোন কোন সমাজ ব্যতীত। সেটা আলাদা ব্যাপার।

পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে তো সমাজের কোন ক্ষেত্রেই নারীপুরুষের অধিকারের তারতম্য দেখা যায় না। প্রাচ্যের থেকে পাশ্চাত্যের দেশগুলি অবশ্যই এ বিষয়ে অগ্রসর। অথচ—আশ্চর্য এই—

সেই সব দেশগুলিতেই নারীসমাজ অসন্তোষ অস্থিরতা বিদ্রোহ আর প্রতিবাদে সোচ্চার।

তাহলে রহস্যটা কী?

পায়ের তলায় শক্ত মাটি পেয়েও, কেন আজকের মেয়েরা সমাজে নিজের সঠিক ভূমিকা স্থির করে নিতে পারছে না?

কেন অনেক পেয়েও মনে হচ্ছে 'কিছুই যেন পাওয়া হয়নি।'

অথচ এই কর্মচঞ্চল বৃহৎ পৃথিবীতে আজ তো মেয়েরা সব কর্মযজ্ঞে হাত লাগাচ্ছে। সব কর্মকাণ্ডের শরিক হচ্ছে। সমকক্ষতায় আর দক্ষতায় তো তাক লাগিয়ে দিচ্ছে পৃথিবীকে! অনন্তকালের অনভ্যাসের ঘাটতিটি তো ধরা পড়তেও দিচ্ছে না।

তবে?

কেন এখনও নারীকণ্ঠ অভিযোগে সোচ্চার। কেন অসন্তোষ অশান্তি বিদ্রোহ?

এ প্রশ্নের উত্তরও শোনা যায়। 'মেয়েরা আইনের কাছে সমান অধিকার পেয়েছে, কিন্তু সমাজের কাছে সমান মর্যাদা পাচ্ছে না।'

এইখানেই আসে মেয়েদের মধ্যে আত্ম-সমীক্ষার প্রয়োজন।

কেন পাচ্ছে না সেই মর্যাদা? যা তার প্রাপ্য? 'প্রাপ্য' কিন্তু পাচ্ছে না। তা হলে ত্রুটিটা কোথায়? ঘাটতিটা কার মধ্যে?

ভেবে চিন্তে এই সিদ্ধান্তেই এসে পৌঁছতে হয়, ঘাটতিটা নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই।

পুরুষ জাতটি এযাবৎকাল যাদেরকে 'সম্পদ সম্পত্তি', আর নিজস্ব একটি 'বস্তুর' মতো ভেবে এসেছে, তাদের হঠাৎ 'পূর্ণ একটি মানুষ' বলে ভেবে উঠতে পারছে না। বরাবরের সঞ্চিত অবহেলা অবজ্ঞার স্তূপ সরিয়ে ফেলতে পারছে না।

'মেয়েদের দ্বারা কিছু হয় না' এই ভাবনাটি ছিল সুখকর। মেয়েদের দ্বারা সবই তো হয়ে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে, এমনকি তার মূল ভূমিকা ঘরসামলানোর মধ্যে থেকেও। এ অভিজ্ঞতাটি বিরক্তিকর। যেন বরাবরের একটি হেরে থাকা পার্টি হঠাৎ জিততে শুরু করেছে।

মজ্জাগত সংস্কার, যা সেই কোন অতীতকাল থেকে চিন্তায় চেতনায় রক্তে বদ্ধমূল হয়ে চেপে বসে থেকেছে, তাকে চট করে মুছে ফেলতে পারা শক্ত বৈকি। তাই আজও আমাদের এদেশে 'পণপ্রথা'র এই ভয়াবহ রূপ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

অপরপক্ষে সেই একই সমস্যা নারীসমাজের মধ্যেও।

একদিকে সে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারের দাবি নিয়ে লড়াইয়ে নামে, মর্যাদার ঘাটতিতে ক্ষিপ্ত হয়। অপর দিকে যুগযুগান্তরের অভ্যস্ত সংস্কারে 'পুরুষের চোখের মুগ্ধদৃষ্টির' আকাঙ্ক্ষায় 'মোহিনী' হতে চায়, 'মনোহারিণী' হতে চায়, পুরুষের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টায় সযত্ন সচেষ্ট হয়।

তার এই দুর্বলতাটি জগতের চোখে ধরা পড়ে বৈকি!

স্বভাবতঃই সেখানে 'মর্যাদার দৃষ্টি' সৃষ্টি হয় না।

অথচ এই বিপুল বিশ্বে পৃথিবীর সব প্রান্তে যুগ যুগ ধরে পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা এই মেয়ে জাতটি জেনে এসেছে মালিক পুরুষ, প্রভু পুরুষ এবং অত্যাচারী পুরুষকেও বশ মানাবার হাতিয়ার হচ্ছে তার লাবণ্যলালিত্য, সুষমা সৌন্দর্য কটাক্ষ ভ্রূভঙ্গী!

ওই হাতিয়ারটিকে 'অপ্রয়োজনীয়' বলে অবজ্ঞায় ফেলে দেবার মতো মানসিক মুক্তি আজও মেয়েদের মধ্যে আসছে না।

অবশ্য ব্যতিক্রম তো আছেই। থাকবেও। কোনদিনই মোহিনী মোহনিয়া হতে চায়নি, সমাজে এমন দৃঢ় বলিষ্ঠ মেয়েরাও চিরকাল ছিল, চিরকাল থাকবে।

কিন্তু আলোচনা তো অনেককে নিয়ে।

আজকের মেয়েরা জ্ঞানে বিজ্ঞানে বিদ্যায় পাণ্ডিত্যে উচ্চপদ-অধিকারে অনেক উঁচুতে উঠে গেলেও, সেই চিরকালের সংস্কারের কাছে আজও বন্ধনগ্রস্ত। আজও তার সমস্ত শক্তির সম্বলের থেকে বেশি ভরসা রাখে তার রূপকে! মনোহারিণীত্বকে।

এই দুর্বলতার প্রকাশ বড় শোচনীয়ভাবেই ধরা পড়ে, মেয়েদের 'কাজ'-এর সঙ্গে 'সাজ'-এর সামঞ্জস্যহীনতায়।

মেয়েদের এ 'দুর্বলতা' কমতে তো দেখা যায় না, বরং যেন বেড়েই চলেছে।

বরং যে সব অবোধ মেয়েরা আজও অন্ধকারে পড়ে আছে, যারা জানেও না নারীর অধিকার আর নারীর মর্যাদার লড়াইতে পৃথিবী তোলপাড়, তাদের মধ্যে এ দুর্বলতা কম। হয়তো বা 'অভাবেই' কম। জগতের এত সব দেখছে না বলেও কম।

কিন্তু শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নত অগ্রসর নারী সমাজের মধ্যে এই রূপসী রূপময়ী হবার চিন্তা চেষ্টাটি বড় শোচনীয়ভাবেই প্রকটিত! যেটা দুঃখের, লজ্জার!

একটু স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেই এ সত্য ধরা পড়ে, সমগ্র পৃথিবীতে আজ প্রসাধন ব্যবসায়ীরাই ক্রমশঃ ধনী থেকে আরও ধনী হয়ে উঠছে। সব চেয়ে জমজমাটি কারবার নারীর বসনভূষণ, সাজসজ্জা আর অঙ্গরাগের বিপুল সম্ভারের।

দেখলে লজ্জা করে, কিন্তু বিজ্ঞাপন দাতাদের নির্লজ্জ প্রচারে দেখতেও হচ্ছে অহরহ, সর্বত্র! পথে ঘাটে ছবিতে টি. ভি.-তে কাগজে পত্তরে,

এককথায় যন্ত্রতন্ত্র প্রচার কার্য চলেছে—

'হে নারী, দেখো তোমায় রূপসী আর মনোহারিণী করে তোলবার জন্যে আমাদের কত আয়োজন। তিল তিল করে তোমায় তিলোত্তমা করে তুলতে পারি আমরা।...তোমার লাবণ্য লালিত্য কোমলতা কমনীয়তা, সবই আমার ভাঁড়ারে মজুত।...তোমার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত। কটাক্ষ থেকে ভ্রূভঙ্গী পর্যন্ত সব কিছুর দায়িত্ব আমার হাতে তুলে দাও। দেখো তোমায় কী অপরূপা করে তুলতে পারি।'

এ প্রচার তো বেড়েই চলেছে। দেখে লজ্জায় দুঃখে মাথা কাটা যায় না কি? কিন্তু সেই প্রতিবাদ কোথায়? উচ্চমানের পত্রপত্রিকাগুলি পর্যন্ত তাদের দামী কাগজের অর্ধেকটা ধরে দিচ্ছে এই বিজ্ঞাপনদাতাদের হাতে।

একদা এক মেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে আমার সঙ্গে তর্ক করেছিল। 'প্রসাধনে মেয়েদের চিরন্তন অধিকার। আড়াই হাজার বছর আগে অজন্তার যুগেও মেয়েরা কীভাবে প্রসাধনের সাধনা করত, তার নজীর পাথরে খোদাই হয়ে আছে।'

তার কাছে আমার দুটি উত্তর অথবা প্রশ্ন ছিল। সেই মেয়েদের প্রসাধন ছিল আপন মনে সঙ্গোপনে। উন্মুক্ত পৃথিবীর সামনে, ব্যবসায়ী পুরুষের কাছে হাত পেতে নয়। আর সেই মেয়েরা কি সমান অধিকার আর সমান মর্যাদার লড়াইয়ে নেমেছে সেদিন?

আজ এই যে পৃথিবীজুড়ে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার বিজ্ঞাপনের খেলা চলছে, তার শিকার কারা? বেশির ভাগই শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত অভিজাত ঘরের মেয়েরাই। শুধু ধনী দেশেই নয়, আমাদের এই গরীব দেশেও।

বহু কোটি টাকা উসুল হবার আশা না থাকলে ব্যবসায়ীরা নিশ্চয় কোটি টাকা নিয়োগ করে না। কোথা থেকে উসুল হয় সেটি?

ক্রমশঃই বিজ্ঞাপনদাতাদের হাতে চলে যাচ্ছে দেশের সাহিত্য সংস্কৃতি শিল্প সঙ্গীত।

কিসে তাদের এত বাড়বাড়ন্ত?

সামান্য একটি কেশতৈল বা মুখে মাথার ক্রীমের দৌলতে কী করে এমন লাভের বাড়াবাড়ি? এর কতটুকু লাগে সমগ্র সমাজের? আর কতখানি লাগে কেবলমাত্র নারীসমাজের?

তাই একান্তে প্রশ্ন, 'এই মেয়েরা, আর কতদিন এই দুর্বলতার শিকার হবে?'

পুরনো অভ্যাসের জাল জঞ্জাল থেকে মুক্ত হয়ে কবে তোমরা মাথা তুলে দাঁড়াবে?

শ্রদ্ধা আর মর্যাদা অর্জন করতে হলে প্রথম প্রয়োজন ত্যাগের, নির্মোহের। লড়াই করে আন্দোলন করে অধিকার লাভ হতে পারে—মর্যাদা লাভ হয় না।

অথচ দেখা যাচ্ছে—ওইটিই পাওয়া সবচেয়ে জরুরি।

আজকের প্রগতিশীল পৃথিবীতে নারীসমাজও অনেক অধিকার পেয়েও শূন্যতা বোধ করছে। তার কারণ এখনও সমাজ পুরুষশাসিত।

রাজ্যে রাষ্ট্রে প্রশাসনে, নারীকে কর্ণধার হতে দেখা আর আশ্চর্য নয়। বহির্জগতে কর্মকেন্দ্রে কোন নারীকে পদমর্যাদার সর্বোচ্চশিখরে দেখতে পাওয়াও অসম্ভব নয়। তবু দেশে, রাজ্যে, এদেশে, বিদেশে সমগ্র মেয়েরা হাড়েহাড়েই জানে, আসল ক্ষমতা কাদের হাতে!

কাজেই মেয়েদের মধ্যে অনেক পেয়েও না পাওয়ার শূন্যতা। এর আর প্রতিকার কই?

তবে যদি কখন এমন দিন আসে মেয়েরা তার দুর্বলতার জাল জঞ্জাল থেকে মুক্ত হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, আর চিরকালের শাসকগোষ্ঠীর চিত্তে এ চৈতন্যের উদয় করাতে পেরেছে, —'এই পৃথিবীখানা যে কেবলমাত্র আমারই জন্যে আমার এই ধারণাটিতে বোধহয় ভুল ছিল।

ঈশ্বরের সৃষ্ট এই পৃথিবী বোধহয় নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যেই।'

অথবা উভয়েই পৃথিবীর জন্যে। একে অপরের প্রভুও নয়, দাসও নয়।

তাহলে হয়তো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন দুটো জাত একসঙ্গে হাত মিলিয়ে আজকের এই বিক্ষুব্ধ সমাজকে ভেঙে এক নতুন সমাজ গড়ে তুলবে, একটি সুস্থ সুন্দর সমাজ গড়ে তুলবে। যেখানে স্বীকৃত হবে রথের দুখানা চাকাই সমান দরকারী, আর দুখানাই সমান মজবুত হওয়া দরকার।

হয়তো কোন একদিন আসবে সেদিন। কোন একটা ভুল চিরকাল চলে আসছে বলেই যে চিরকাল চলবে, তা নাও হতে পারে।

কিন্তু সেই নতুন সমাজে নারীর ভূমিকাটি কি 'নতুন' আর আলাদা হবে?

মনে তো হয় না।

সে তার চিরকালের ভূমিকাটিতেই স্থির থাকবে। সেই রাজমিস্ত্রীর হাতের তৈরি 'জোড়ানোর মসলা'র ভূমিকায়।

সমাজে সংসারে যেখানে যত অসমান অমসৃণ ভাঙাচোরা তেকোনা কোনাচে টুকরো একত্রে জড়ো হয়ে ঠেলাঠেলি করে কর্কশধ্বনি তুলবে, সেখানেই পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরকে মিলিয়ে দেবার, খাপে খাপে বসিয়ে দেবার কাজে নিজেকে লাগিয়ে দেবে।

কারণ বিশ্বরাজমিস্ত্রী তাকে সেই ভাবেই গড়ে রেখেছেন। সে জানে সৃষ্টিকর্তার তার কাছে অনেক প্রত্যাশা। সে 'ঘর' চায়, সংসার চায়, স্বামী সন্তান নিয়ে একটি সুখী জীবন চায়। বাইরে যতই সমান অধিকারের লড়াইয়ে নামুক, তার অন্তরের গভীরের স্বপ্ন, শান্তি,স্বস্তি আনন্দময় সুন্দর একটি সংসারের। সেটিকে পেতে আর টিকিয়ে রাখতে তার চিরদিনই আত্মবিলোপের সাধনা। সমাজে সংসারে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব সম্প্রীতি রাখতে, সামাজিক জীবনের দায় বহন করতে,পরিবার জীবনে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে মেয়েরা সব সময় নিজের চাহিদাটিকেই তুচ্ছ করে চলে। জীবনের এই ছাঁচটিকে অটুট রাখতে হয়তো কত অভিনয় করে চলতে হয় তাকে, চেপে রাখতে হয় আপন ইচ্ছে অনিচ্ছের কথা। কারণ সে ঘর চায়, জীবন চায়।

হয়তো নারী হৃদয়ের এই 'চাওয়াটি' বিশ্বস্রষ্টার কোন নিগূঢ় অভিপ্রায় সাধনের নিমিত্তই। নারীর কাছে তাঁর অনেক প্রত্যাশা। তাই তিনি নারী হৃদয়ে মজুত রেখেছেন বাড়তি অনেকখানি স্নেহ করুণা মমতা ক্ষমা ধৈর্য সহনশীলতা শুভবোধ কল্যাণবোধ, আর ওই আত্মবিলোপের শক্তি।

তাই মনে হয়, সহজাত প্রবণতাতেই ভবিষ্যতের বিজয়িনী নারীও নতুন সমাজ গঠনের শরিক হতে পেলেও, সেই তার চিরকালের পুরনো ভূমিকাতেই রয়ে যাবে, বুঝে বা না বুঝে এযাবৎকাল যে ভূমিকা পালন করে এসেছে। তবে হয়তো সেটাই পালন করে চলবে স্বেচ্ছায় সানন্দে। কারণ সে জানে আর মানে সমাজ-জীবনে শান্তি বজায় রাখার দায়িত্বটি তারই।

আসল কথাটিই এই—

সমাজগঠনে নারীর ভূমিকা নিজেকে গৌণ রাখা, নিজস্ব সত্তার বিলোপ সাধন। তাতেই 'সমাজ' নামক বস্তুটির শান্তি স্বস্তি স্থিতি শৃঙ্খলা। নারী এইটি মেনে নিয়েছে বলেই সমাজের অস্তিত্ব বজায় আছে। ব্যতিক্রম ঘটলে সে অস্তিত্বটি আর থাকবে না।

ছন্নছাড়া স্ত্রীপুরুষের দল, নিতান্তই প্রাণী-জগতের মতো পৃথিবীর হাটে ঘুরে বেড়াবে, আর হয়তো ধীরে ধীরে আবার সেই সমাজবন্ধনহীন গুহাজীবনের দিকেই ফিরতে থাকবে।

কারণ নারীকে ঘিরেই সমাজগঠনের পরিকল্পনা। আর নারীর আত্মবিলোপকারী সহনশীলতার উপর ভিৎ গেড়েই সেই সমাজকে টিকিয়ে রাখা।

সাহিত্য-প্রসঙ্গে

স্বামী ভূতেশানন্দ

'সাহিত্য' শব্দটির অর্থ খুব ব্যাপক। সাহিত্যের নানারকম বিভাগ। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও নানারকম মত প্রচলিত আছে। কারও মতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য সামাজিক হিতসাধন, আবার কারও মতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা দেওয়া, কারও মতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ দান। আবার কেউ বলেন রস সৃষ্টিই সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য।

প্রাচীনকালে আমাদের সাহিত্যের পরিধি সীমিত ছিল। বেদ-উপনিষদ্‌কে আমাদের দেশের প্রাচীনতম সাহিত্য বলা যেতে পারে। সে যুগে অক্ষরের উদ্ভব হয়নি, ফলে সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার ছিল সীমিত এবং লিপিবদ্ধ না থাকায় এর অনেকাংশ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বেদ গুরুশিষ্য-পরম্পরা কিংবা বংশ পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। শুনে মনে রাখা হত বলে বেদকে শ্রুতিও বলা হয়। অক্ষর আবিষ্কারের পর সাহিত্য লিখিতরূপ পেল বটে কিন্তু একখানি গ্রন্থ নকল করা প্রভূত সময় ও আয়াসসাধ্য, তাই তার বহুল প্রচার হতে পারেনি। হাতে লিখতে হত বলে সে-যুগের অধিকাংশ গ্রন্থ সংক্ষেপে বা সূত্রাকারে লেখা হত। অল্প কথায় অনেকগুলি বিষয় পরিবেশন করা হত।

পঠন-পাঠনের সময়েও এক সঙ্গে দু-চার ছত্রের বেশি পড়ান হতো না। পরে ঐ কয়ছত্রের উপর তর্কবিচার আলোচনা চলত এবং ক্রমে ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনীর ফলে আয়তন বাড়ত।

সূত্র-সাহিত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ ব্রহ্মসূত্র ব্রহ্ম অর্থ বেদ, বেদের বাক্যগুলি যেন একটি সূত্রের দ্বারা গ্রথিত। বেদের বিশিষ্ট অংশগুলি স্মরণে রাখার জন্যই ব্রহ্মসূত্র রচিত হয়। পরে এর ব্যাখ্যার জন্য বহু টীকা, ভাষ্য করা হয়। আচার্য শঙ্কর এর একটি ভাষ্য রচনা করেন। তাঁর পূর্ববর্তিকালের ভাষ্য পাওয়া যায়নি। সেগুলি কেন লুপ্ত হয়েছে জানা যায় না। তবে অনুমান করা যায় শাঙ্কর-ভাষ্য এত সুন্দর ও সুরচিত যে অন্যান্য ভাষ্যগুলিকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে বর্জন করা হয়েছে। কালের অগ্নিপরীক্ষায় সেগুলি উত্তীর্ণ হয়নি। কিংবা লোপ পাবার অন্য কারণও থাকতে পারে। শাঙ্কর-ভাষ্যের উপর টীকা রচনা করেন ভামতী। ভামতী-টীকার উপর আর একটি টীকা হল, তার নাম 'বেদান্ত কল্পতরু', এবং তারও আর একটি টীকা হল যার নাম 'কল্পতরু পরিমল'। এরও টীকা রচিত হয়েছে। এইভাবে একই গ্রন্থকে পরম্পরাক্রমে বুঝবার চেষ্টা করা হয়েছে। সে-যুগে এইরকম রীতিই প্রচলিত ছিল।

তখন মানুষ চিন্তা করতেন বেশি, বলতেন কম। আর এ-যুগে দেখা যায় এর বিপরীত—আমরা চিন্তা করি কম, বলি বেশি। গুজরাটে দেখেছি যারই কিছু অর্থ আছে সে ধর্মপুস্তক ছাপায়। গ্রন্থের সংখ্যা এত বেশি যে, তুলনায় ক্রেতার সংখ্যা কম। তাঁদের একটি পত্রিকা আছে, যার গ্রাহক সংখ্যা দুলক্ষ। বিস্মিত হতে হয় এত লোককে শিক্ষা দেওয়া! নিজেকে শিক্ষা দেবার আর অবকাশ কই? নিজেকে বাদ দিয়ে অপর সকলকে শিক্ষা দেওয়া আমাদের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে।

আগে লোকে লেখাপড়া কম শিখত। বড় বড় জ্ঞানী পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। এখন শিক্ষার বিস্তার হয়েছে, হাজার হাজার গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে, হয়তো কিছু গ্রন্থ উপযোগী নয়; তবে বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানকে চারিদিকে প্রসারিত করবার প্রয়াস ক্রমবর্ধমান।

আমরা কখনও কখনও বলি মানুষের বুদ্ধি

অধোগামী হচ্ছে, সৎচিন্তার দিকে তার দৃষ্টি নেই। কিন্তু এ-কথা যে যথার্থ নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাদির ক্রমবর্ধমান চাহিদা থেকে। এসব গ্রন্থের চাহিদা এত বেশি যে তা অনেক সময় পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। মানুষের জ্ঞানপিপাসা বাড়ছে এবং মুদ্রণব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে পিপাসা চরিতার্থ করা সহজ হয়েছে। গ্রন্থ এখন মানুষের কাছে সহজলভ্য।

আবার একসময় লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা খুব কম ছিল। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে একখানা চিঠি পড়ে দেবার লোক কমই পাওয়া যেত। বিশেষতঃ ধনী-দরিদ্র উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরের সংখ্যা খুবই কম ছিল। আমরা জানি মা সারদাদেবী লেখাপড়া আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু ভাগিনেয় হৃদয়ের অত্যাচারে তা বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য তখন সামাজিক রীতি এইরকমই ছিল, মেয়েরা কেউ সাগ্রহে পড়তে চাইলে ঘরে বাইরে সকলেই বাধা দিতেন। এখন অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সকলকেই লেখাপড়া শেখাবার আগ্রহ এখন সর্বস্তরে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সরকারী প্রয়াসও প্রশংসনীয়। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের পক্ষ থেকেও বয়স্ক শিক্ষাদানের যে চেষ্টা চলছে, তা সর্বাংশে না হলেও বহুলাংশে সফল হয়েছে। এটা যে শুভলক্ষণ তাতে সন্দেহ নেই।

অধুনা শিক্ষা-সাহিত্য ও জ্ঞানবিস্তারের ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা নিয়েছে গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরী। সেকালে অভিজাত ধনীগৃহে ব্যক্তিগত সখের গ্রন্থাগার ছিল, কিন্তু সেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। তাদের কাছে সেসব সাহিত্যের রস অনাস্বাদিত থাকত। এখন শহরে গ্রামে সর্বত্র পাড়ায় পাড়ায় লাইব্রেরী হচ্ছে। ফলে বই কিনে পড়বার সামর্থ্য যাঁদের নেই তাঁরাও পড়বার সুযোগ পাচ্ছেন। কাজেই এরকম গ্রন্থাগারের প্রসার অবশ্যই কাম্য।

তবে সৎসাহিত্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিছু আবর্জনারও সৃষ্টি হয়, যেমন জমিতে সার পড়লে ভাল গাছের সঙ্গে কিছু আগাছাও জন্মায়। তাই বলে আগাছার ভয়ে জমিতে সার দেওয়া তো বন্ধ করা যায় না। বরং আগাছাকে বাড়তে না দিয়ে ভাল গাছের বাড়ের চেষ্টা করতে হবে। তেমনি সাহিত্যিক সুধী-সমাজের কর্তব্য সব্যসাচীর মতো এক হাতে সাহিত্যের ক্ষেত্রকে জঞ্জাল মুক্ত করে অন্য হাতে সৎসাহিত্যের সৃষ্টি করা। আইনকানুনের দ্বারা একাজ হয় না।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি—সে রস নানাবিধ কেউ হয়তো সব কটি রসাস্বাদনে আনন্দ পান, কারো কারো কাছে কোনও বিশেষ একটি রস প্রিয়। মানুষের রসতৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য সাহিত্যের প্রয়োজন। তাই সাহিত্য মানুষের বুদ্ধিকে মার্জিত, মনকে প্রসারিত, রুচিকে পরিশীলিত করতে ও মনকে উপরে ওঠাতে পারে। এভাবেই সৎসাহিত্যের দ্বারা মানুষের কল্যাণ হয়। মনকে উচ্চস্তরে নিয়ে যেতে, উঁচু সুরে বেঁধে রাখতে, মানুষকে পশুত্ব থেকে দেবত্বে উন্নীত করতে সৎসাহিত্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাই সাহিত্যিকদের শুধু সৃষ্টি-কার্যে নিরত থাকলে হবে না, সে সৃষ্টি সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর অথবা কল্যাণকর হবে কিনা সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এটি তাঁদের সামাজিক দায়িত্ব। আবার কেবল সুসাহিত্য সৃষ্টিই যথেষ্ট নয়, তার প্রচারের প্রয়াসও করতে হবে। সাহিত্য মানুষের মানসিক জীবনের সংস্কার করে, পাঠকের সামনে মহৎ ও বৃহৎ আদর্শ স্থাপন করে। সাহিত্য আলোচনাকালে প্রায়শঃ বলা হয়, সাহিত্য মানুষের মনকে প্রভাবিত করে

যেভাবে কল্যাণের পথে চালিত করে তা আর কিছুর দ্বারা হয় না।

সৎ শুদ্ধ জীবনযাপন করতে সৎসঙ্গ অবশ্য প্রয়োজন কিন্তু সর্বদা তা সহজলভ্য নয়। ইচ্ছা করলেও সৎসঙ্গ সর্বদা পাওয়া যায় না, কিন্তু সৎগ্রন্থ দুর্লভ নয়। সে গ্রন্থের চর্চা-আলোচনায় অনেকটা সৎসঙ্গেরই কাজ হয়। ভাল লোক খুঁজতে কোথায় যেতে হবে জানা নেই, কিন্তু ভাল বই হাতের কাছেই পাওয়া যেতে পারে।

আমাদের বর্তমান সাহিত্যসম্মেলনের আলোচ্য বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় যে এর উদ্দেশ্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারাকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রসারিত করবার জন্য সম্মিলিতভাবে প্রয়াস-প্রযত্ন করা। এ-চেষ্টা আমাদের পক্ষে কল্যাণজনক হবে। বক্তা ও শ্রোতাদের আগ্রহ থেকে বোঝা যাচ্ছে মানুষ উচ্চ ভাব গ্রহণ করতে আগ্রহী। আগ্রহ না থাকলে শ্রোতারা আসতেন না, বইও কিনতেন না। এমনকি আর্থিক সচ্ছলতা যাঁদের নেই তাঁরাও দু-চারখানা সৎগ্রন্থ কেনেন।

আগেই বলেছি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের চাহিদা এখন ক্রমবর্ধমান। বিশেষ করে স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকীর পর থেকেই এর ব্যাপক প্রসার হয়েছে। অনেক নতুন নতুন বই তখন প্রকাশ পায়। উদ্বোধন থেকে 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' নামে সমগ্র গ্রন্থাবলীর নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আনন্দের সংবাদ বলে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, স্বামীজীর শতবার্ষিকীর সময় গুজরাট সরকারের অকুণ্ঠ সহায়তায় গুজরাটি ভাষায় স্বামীজীর রচনাবলী প্রকাশিত হয় এবং পঞ্চায়েৎ গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়ে তা প্রায় গুজরাটের প্রত্যেক গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় আমাদের লক্ষণীয় যে, মানুষের জানবার আগ্রহ আছে, কাজেই নতুন নতুন গ্রন্থের দরকার। হয়তো তার সঙ্গে কিছু অবাঞ্ছিত সাহিত্যেরও সৃষ্টি হবে, কিন্তু সেই আশঙ্কায় সৎগ্রন্থের প্রকাশ বন্ধ হলে চলবে না। উচ্চ আদর্শের প্রসারের সঙ্গে ওগুলি লোপ পাবে। স্বামীজী বলেছিলেন যে, বৃহদংশকে বঞ্চিত করে আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে জ্ঞান ভাণ্ডারকে যে সীমিত রাখি এটা খুবই অন্যায়। এখন আমাদের কর্তব্য মণিমঞ্জুষায় সঞ্চিত ধনরত্নকে সর্বসাধারণ্যে বিতরণ করা। এসব গ্রন্থ যাতে সকলের পক্ষে সহজবোধ্য হয় সে চেষ্টাও সুধীসমাজকে করতে হবে।

তা বলে মৌলিক চিন্তা, নূতনতর সৃষ্টি হবে না, তা নয়। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর চিন্তাধারাকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়াও অবশ্য কর্তব্য। বিশেষকরে এই যুগসন্ধিক্ষণে দেশ যখন নানা সমস্যায় জর্জরিত, নানা ভিন্নমুখী ভাবধারায় বিভ্রান্ত, সেইসময় এই জাতীয় সাহিত্য আমাদের পথ-নির্ণয়ের সহায়ক হবে। এসব গ্রন্থ-পাঠে এখন যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে তাকে যথাযথভাবে পরিচালিত করলে দেশেরই কল্যাণ হবে। এ বিষয়ে দেশের জ্ঞানীগুণী সাহিত্যিকদের যে বিরাট দায়িত্ব আছে তা পালনে তাঁরা নিশ্চয় ত্রুটি করবেন না। তাঁদের কাছে আমাদের অনুরোধ এই যে, যাঁদের ভাবধারায় আমাদের জীবনকে ভাবিত করতে, যাঁদের জীবনালোকে নিজেদের মনকে আলোকিত করতে চেষ্টা করছি, সেই আলোক সকলের কাছে সহজলভ্য করে তোলা যেন তাঁদের জীবনব্রত হয়। আমরা এবিষয়ে তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করছি।*

* গত ১ মার্চ ১৯৮৬, উদ্বোধন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ। শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত।

নিবেদিত

শ্রীমতীসাধনা মুখোপাধ্যায়

অসার এই সংসারেতে ফণা দোলায় ফণী
অরণ্যের গভীরেতে লুকানো তার মণি
প্রদায়িনী বরদানে দেবেন হাতে তুলে
অমারাত্রির কথা গেলি চাঁদের আলোয় ভুলে
আতাগাছে সোনার ফসল স্বপ্নেই থাক ঝুলে
সুশ্রী রাইকিশোরী যান যমুনারই কূলে
খরায় ভরা পৃথিবীতে চিকন কালো চুলে
অমর যে তাঁর কৃষ্ণ-স্বপন উপল ভরা পথ
অকৃপণ যে দয়ার ঠাকুর কল্পতরুবৎ
উষ্ণ আশীর্বাণীতে তাঁর সিক্ত যে হয় সৎ।

আলো

শ্রীঅরবিন্দ

আলো, অন্তহীন আলো!
অন্ধকারের আর নেই কোন ঠাঁই···
জীবনের অজ্ঞান গহ্বর
ত্যাগ করেছে তার গোপন রহস্য···
বিশাল নিশ্চেতনার অপরিমেয় অতলতা
ঝিক্‌মিক্ করে এক বিরাট প্রত্যাশায়···

আলো, কালাতীত আলো—
যা ছিল কোন্ অব্যক্ত সুদূরে!
তার দিব্য রহস্যময় রুদ্ধ দুয়ার
আজ উদার উন্মুক্ত···
আলো, প্রজ্বলন্ত আলো!
অনন্তের হীরক-দ্যুতি হৃদয়
শিহরিত আমার এ হৃদয়ে—
যেখানে ফোটে এক মৃত্যুহীন গোলাপ···

আলো তার আপন উল্লাসে
বয়ে যায় আমার স্নায়ুতে স্নায়ুতে!
আলো, সমাহিত আলো!
আবেগে অভিভূত প্রতিটি দেহ-কোষ আজ
মূক জ্যোতির্ময় মহানন্দে
ধারণ করে জাগ্রত-বোধ সেই অবিনশ্বরকে···

বিপুল জ্যোতির মহাসাগরে
করি বিচরণ···
তাঁর চিরন্তন শিখরের সাথে
আমার অতলের আজ মহামিলন···*

* Light কবিতার অনুবাদ: শ্রীকান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়।

প্রণতি

শ্রীমতী হিমানী রায়

পুণ্যতিথিদিনে এ শুভলগনে,
প্রণমি তোমারে মাগো।
হৃদয়মন্দির আলোকিত করি—
চিরদিন তুমি জাগো।
সে আলোকরেখা ছড়ায়ে পড়ুক,
আমার সকল কাজে
যেখানেই রাখো তুমি আছ সাথে,
মনে যেন সদা রাজে।
শরণ তোমার লয়েছি যখন,
জানি, যাবেনাকো ছাড়ি,
তব পদ স্মরি, সংসার খেয়া,
অনায়াসে দিব পাড়ি।

পদে, পদে কত ঘটে পরমাদ,
তুমি মাগো সদা ধরে আছ হাত ;
তোমারি প্রসাদে, তোমারে লভিব,
বিফল হবেনা আশা,
সার্থক হবে মানবজনম
সফল সংসারে আসা।

অনিঃশেষ

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

যৌবনের দিনগুলি জয়োল্লাসে উন্মন,
কিন্তু কিছুই কি দেয় না উত্তর-যৌবন ?
সে-কি শুধু বিস্মরণের ঝড়, শুধু কীর্তিনাশার প্লাবন,
শুধু ক্ষয়ক্ষতির প্রলয়, শুধু সর্বনাশের মাতন ?
লাবণ্য চলে গেলে লালিত্য কি থাকে,
কোনো নারী কোনো দিন চোখ ফিরে দেখে ?
রূপহীন শক্তিহীন ক্লান্ত অমাবস্যা,
আসন্ন সন্ধ্যায় শুধু রাত্রির তপস্যা ?
তাই যদি হবে তবে মিথ্যা বেঁচে থাকা,
শুধু দিন যাপনের গ্লানিটারে ঢাকা।
কোরকের পরিণতি ফুলেতে কখনো নয়,
ফুল থেকে ফলে এসে পরিপূর্ণ রূপ পায়।
বাইরের চড়া আলো সেটা ক্ষণিকের দান,
অন্তরেতে ভরা জ্যোতি স্নিগ্ধ অনির্বাণ।

জয়ধ্বনি কর মানুষের

শ্রীসুনীল বসু

হঠাৎই সেদিন ভোর বেলায় মনে হল
রাস্তায় চলতে চলতে—
আমি ঈশ্বরের দূত।
আমি কবি নই প্রেমিক নই আমি অতি সামান্য মানুষ
আমি ঈশ্বরের দূত
প্রাণে বেজে উঠেছে এক স্বর্গীয় আদেশ
মানুষের মঙ্গল কর মানুষের জয় হোক
মানুষের জয়গান কর
এক্ষুণি যাই শ্যাম কামারের কাছে, সে এক টাকা পায়—
শোধ ক'রে দিয়ে আসি
আমার ভোঁতা কাটারিতে শান দিয়েছিল, ক্ষুদ্র ঋণ,
আমি সব ক্ষুদ্র ঋণও শোধ করে দিয়ে যাব

সেই লোকটার কথা মনে পড়ছে
সন্ধ্যের অন্ধকারে শিয়ালদহ স্টেশনের প্লাটফর্মে
যে বিশাল লোকটাকে আমি বলেছিলুম, আপনার
হাতটা ভাঙল কি করে?
লোকটা বলেছিল, ট্রেনের কামরায় সিট নিয়ে দুটো লোকের
কামড়া-কামড়ি থামাতে গিয়ে,
আমার গায়ে অসুরের মতো জোর ছিল, কিন্তু আমি তাদের মারিনি
তারা আমার হাত ভেঙে দিয়েছিল

আমি সেই পথের পথিক, যে পথে মানুষ চলেছে
রাস্তায় ছড়ানো পদ্মের পাপড়ি আর গঙ্গাজল আর দূরে
ঈশ্বরের মহামন্দির
সকলের কণ্ঠে এক গান, জয় হোক মানুষের, এই পৃথিবী বাসযোগ্য হোক
যুদ্ধ ক'র না, ক্ষমা কর, ভালবাসো, বুকে জড়িয়ে ধর
সেবা কর, নত হয়ে মানুষের পায়ের ধুলো নাও
আমি ঈশ্বরের দূত
আমি কবি নই প্রেমিক নই আমি নগণ্য মানুষ
আমার প্রাণে বেজে উঠেছে এই মহামন্ত্র
কর মানুষের জয় গান, জয়ধ্বনি কর মানুষের ॥

শক্তির উৎস দুর্গা

স্বামী আত্মস্থানন্দ

যে কোনও মানুষের জীবন খতিয়ে দেখলে দেখা যায় যে সংগ্রামই তার চলার একমাত্র সুর —অবিরাম একটানা দ্বন্দ্ব এবং অদম্য প্রচেষ্টা সকল সংঘর্ষকে অতিক্রম করার। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ —ত্রিগুণাত্মিকা শক্তির সৃষ্টি এই বিশ্বচরাচর। তাই দৈবী ও আসুরী সম্পদের অনিবার যুদ্ধ। রামায়ণ, মহাভারত এই অনস্বীকার্য সত্যের সাক্ষী। ত্যাগ ও ভোগ, জ্ঞান ও অজ্ঞান, সৎ ও অসৎ, হিংসা ও অহিংসা, সত্য ও মিথ্যা, জন্ম ও মৃত্যুর প্রবাহে ভেসে যাওয়ার জন্যই যেন আমাদের জীবন—সে ইচ্ছাতেই হোক, আর অনিচ্ছাতেই হোক। মোট কথা, আমরা 'বলাদিব নিয়োজিতঃ'। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয় এক অদৃশ্য মহাশক্তির ক্রিয়া—সৃষ্টি ও অনাসৃষ্টি উভয়ই শক্তি-নিয়ন্ত্রিত। এবং এই অজানা, অদেখা, অধরা শক্তির কাছে অন্য সকল শক্তি পরাহত এও সুস্পষ্ট।

কখনও কখনও দেখা যায় এই নানা বৈচিত্র্যময় অথচ মৃত্যুপর্যবসিত নাটকের রহস্য উদ্‌ঘাটনে তপোরত জীবন—নচিকেতা, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ। সাধনা ও সিদ্ধির দ্বারা সেই আদ্যাশক্তিকে উপলব্ধি করে আমাদের জীবনকে তাঁরা অর্থপূর্ণ, সুন্দর ও মহান্ করেন। তাঁদের আহ্বান শুনি, 'ওরে তোরা কোথায়? আয়, আয়—পেয়েছি অমৃতের সন্ধান। চল এই পথে, হয়ে যাবি অমর, দ্বন্দ্বাতীত, অনন্ত আনন্দের অধিকারী—মাভৈঃ।'

আবার আর এক শ্রেণীর মানুষ অসহায় অবস্থায় ছুটে যান বনবাসী, গিরিগুহাবাসী ঋষির কাছে পথের অনুসন্ধানে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্তবিভ্রান্তি অনুসন্ধিৎসু দুটি মানুষের কথায় আজ আমরা সকল প্রাণের প্রাণ, সব চেতনার চেতনা, সর্বশক্তির উৎস এবং সকল আনন্দের ঝর্ণাধারা দুরধিগম্য প্রাকৃত মনোবুদ্ধির অগোচর মহামেধা মহাস্মৃতি মহামায়া মহাশক্তি দুর্গার পরিচয় কিছু পাব।

হৃতসর্বসম্পদ স্বজনপরিত্যক্ত রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি বনগমনেও ক্রূর স্বার্থান্বেষী ভোগলিপ্সু, নিষ্ঠুর ও কপট পরিজন ও পার্থিব ঐশ্বর্যের মোহমুক্ত হতে অপারগ ও অপারগতা-জন্য সমধিক মনঃপীড়ায় লাঞ্ছিত ও বিপন্ন অবস্থায় মেধস্ মুনির আশ্রমে দৈবাৎ মিলিত হয়ে পরস্পরের মর্মান্তিক দুঃখের পর্যালোচনার পর ঐ মুনির নিকট শ্রদ্ধা ও বিনয়সহ বিশেষ জানতে চাইলেন:

তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি।
মমাস্য চ ভবত্যেষা বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা॥

তখন সুরথ ও সমাধির মানসিক বিপর্যয়ের কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মেধা মুনি বলেন:

তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়াপ্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণা॥
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী॥

অর্থাৎ, সংসারের স্থিতিকারিণী মহামায়ার প্রভাবে জীবগণ মোহরূপগর্তে ও মমতারূপ আবর্তে নিক্ষিপ্ত হন। এই শক্তিই সকলকে মোহাচ্ছন্ন রেখেছেন। দেবী ভগবতী মহামায়াই বিবেকীদেরও চিত্ত বলপূর্বক আকর্ষণ করে মোহাবৃত করেন। তিনিই সংসার মুক্তির হেতুভূতা পরমা বিদ্যারূপিণী ও

সনাতনী এবং তিনিই সংসার-বন্ধনের কারণ অবিদ্যা এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু আদি ঈশ্বরের ঈশ্বরী।

মেধা মুনির উক্ত উপদেশে সুরথ ও সমাধি ঐ মহাশক্তি দেবীর আবির্ভাব ও স্বভাবস্বরূপ বিষয়ে বিস্তৃত জানতে চাইলে মুনিবর দুর্গাদেবীর আবির্ভাবাদি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী মহাশক্তির বিস্তৃত বর্ণনা করেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই তত্ত্ব লিপিবদ্ধ।

অতুলনীয়া শক্তিরূপা দেবীর আবির্ভাব হয়েছে সকল দেবতার অনুপম তেজোরাশির একত্র সন্নিবেশে। 'অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্। একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা'। এই নারীমূর্তিতে মূর্ত মা জগদম্বা ত্রিশূলধারিণী মাহেশ্বরী শক্তিরূপা কৌমারী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতার দীপ্তিতে দেবীর অঙ্গাদি যেমন উৎপন্ন হয়েছে, তেমনি তাঁদের ও প্রকৃতির নানা অমোঘ অস্ত্রে, অনুপম অনবদ্য রূপলাবণ্যে, অঙ্গাভরণে সিংহবাহিনী সুসজ্জিতা হয়েছেন। মা দুর্গা সর্বশক্তিময়ী, সর্বশক্তিপ্রদাত্রী। অস্ত্রপরিবৃতা রণরঙ্গিণী অসুর নাশ করেন; অশুভ শক্তি ধ্বংস করেন উমাভয়ংকরা। কল্যাণীশক্তিতে জ্ঞানদাত্রী, মোক্ষবিধায়িনী, বিশ্বপরিপালিনী। চামুণ্ডা, উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডারূপে তিনি পাপকলুষাসুরনাশিনী। বিশ্বজননীশক্তিতে তিনি বরদাপ্রসন্না। কোমল ও কঠোর সকল শক্তির সংহত মূর্তপ্রকাশ মা দুর্গা। দুর্গম্যা হয়েও বিশ্বকল্যাণে সকল শক্তি ও ঐশ্বর্যময়ী হয়ে মহাশক্তি মহামায়া শ্রীদুর্গারূপে ধরা দেন শুদ্ধ শরণাগত মানসে।

এই মহাশক্তি দশভুজা প্রতিমার সঙ্গে থাকেন শ্রী ও ধনেশ্বরী লক্ষ্মী, বিদ্যা ও জ্ঞান অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী, সিদ্ধিদাতা গণেশ, বৈভব ও পরাক্রম-মূর্তি কার্তিক—কারণ পরিতৃপ্ত জীবনে চাই এ সকলই। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। দেবীর সঙ্গে তাই রয়েছেন সমাধিস্থ পূর্ণ মহেশ্বরও। দেবী তুষ্টা হলে তাঁর মহামায়ার আবরণ মুক্ত করেন, ফলে দেবীর প্রকৃত স্বরূপ অনুভূত হয়—অখণ্ড, অদ্বিতীয়া ব্রহ্মশক্তি 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা'। দেবতারা এই মহাদেবীর স্তুতিতে সেজন্য বিশ্বচরাচরের সব তত্ত্বের মধ্যেই তাঁর স্বরূপ দর্শন করে প্রণাম করেছেন :

ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ॥
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

সকল শক্তির সংহত মিলনে দেবী দুর্গার আবির্ভাব। সুতরাং তাঁর পূজার আয়োজন ও প্রয়োজন সকলের। তাই তাঁর পূজায় চাই সমাজের সকল স্তরের মানুষের শক্তি ও সামর্থ্যে উৎপন্ন বস্তুর—চাই নূতন বস্ত্র, চাই অলংকার, অস্ত্র, জয়ডংকা, চাই পশুরাজ, শস্য, ফুলফল, তরুলতাগুল্ম, আরও চাই সব নদনদী-সরোবরের জল, সর্বতীর্থোদক ও মৃত্তিকা, দন্তিকা প্রভৃতি। নিষিদ্ধপল্লীর মৃত্তিকাও প্রয়োজন মায়ের মহাস্নানে। বাদ যাবে না কিছু। ঠিকই তো 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ'। 'জগৎটাকে আপন বলে জানবে। কেউ পর নয়—সবাই আপন'—বললেন এই সেদিন দেবী-মানবী শ্রীসারদা।

দিব্যদর্শন আনন্দময়ী শক্তির উৎস শ্রীদুর্গা চৈতন্যময়ী বিশ্বজননী—বিশ্বের প্রতিটি ধূলিকণার স্নেহ, মমতা ও অফুরন্ত ভালবাসার নিবিড় সম্বন্ধে চিরবিশ্বগত। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক আপনার হতেও আপনার—পরমাত্মীয়তায় আবদ্ধা সর্বশক্তিময়ী দেবী। তাঁকেই জীবনের কেন্দ্রবিন্দু জেনে চলতে পারলে—যেমন মহাপ্রহেলিকাময় পরিস্থিতিতে

দিশেহারা রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি পূর্ণকাম হয়েছিলেন, অভয়ার করুণাদৃষ্টিতে যেমন তাঁদের সকল ভয় দূর হয়েছিল, যেমন তাঁরা দুর্জয় শক্তি-লাভ করেছিলেন, তেমনিই মহাভাগ্যোদয় সকল মানুষের হওয়া সম্ভব। তাঁর কৃপাকটাক্ষে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে যায় অক্ষয়, মরণশীল হয়ে যায় মৃত্যুঞ্জয়। সবার মাঝে এই সর্বেশ্বরী মা দুর্গা; আমরাও মায়ের মধ্যে নিত্য অনুভূতিতে সবার মাঝে আমাদের পেয়ে হয়ে যাই অজর, অমর, অভয়। সুতরাং আসুন আগমনীর সুপ্রভাতে আমরাও দেবতাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে পরমার্থলাভের জন্য শক্তির উৎস শ্রীদুর্গাকে প্রণাম করি :

সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গেদেবি নমোঽস্তুতে।
প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥*

* ১৬।১০।৮৫ তারিখে আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত।

মূল্যবোধের সঙ্কট থেকে মুক্তির পথ

শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী

একটি বহুকথিত মহাজন-বাক্যকে প্রথমেই স্মরণ করি : মানুষ শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারে না, বাঁচার জন্য তার আরও বেশি কিছুর প্রয়োজন। কারণ, দেহটাই মানুষের সব নয়, সেই সঙ্গে আছে তার বিবেক, আছে বিচারবোধ, আছে স্নেহ, এবং সর্বোপরি আছে আত্মা। আর সেই জন্যই দেহের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য যেমন খাদ্য চাই, তেমনি মনের ক্ষুধা বা আত্মার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য চাই একটা ধর্মবোধ এবং ধর্মবোধকে লালন-পালন করার জন্য চাই সুস্থিত কতকগুলি মূল্যবোধ। তা না হলে মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব নয়।

মানুষের এই মূল্যবোধের মধ্যে কতকগুলি আছে শাশ্বত—যা সর্বকালে এবং সর্বদেশে সমভাবে প্রযোজ্য। যেমন, সত্য, সত্যরক্ষা, সত্যকথা বলা। এগুলি ব্যক্তি-নিরপেক্ষ এবং সমাজ-নিরপেক্ষ। কেউ আমাকে সত্যবাদী বলবে বা বাহবা দেবে, তার জন্য আমি সত্যকে জীবন দিয়ে রক্ষা করব না, আমি রক্ষা করব, কারণ, এটা না করলে আমি নিজের কাছেই নিজে ছোট হয়ে যাব। তাই সত্যের জন্য সব কিছুকে ত্যাগ করা চলে। কিন্তু কোন কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা চলে না।

আমি সৎ হব বলেই সৎ হব—আইনের ভয়ে বা অন্য কোন ভয়ে নয়। নিজের বিবেকের কাছে শুদ্ধ থাকব বলেই আমি সৎ হব, সৎ থাকব। এইটি হচ্ছে শাশ্বত মূল্যবোধ। ভারতবর্ষ হাজার হাজার বছর ধরে এই মূল্যবোধকেই লালন-পালন করেছে। আর সেইজন্যই দরিদ্র ভারতবর্ষ অন্তরের সম্পদে সমগ্র বিশ্বে সব থেকে বেশি ঐশ্বর্যবান।

কতকগুলি মূল্যবোধ আছে ব্যক্তি-সম্পর্কিত। যেমন কৃতজ্ঞতা। একজন আমার উপকার করেছে, আমার জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছে—তাঁর প্রতি আমার অন্তরে যদি কৃতজ্ঞতাবোধ না থাকে, তাহলে সেটা মূল্যবোধহীনতারই নামান্তর। একইভাবে সমাজ-সম্পর্কিত বা রাষ্ট্র-সম্পর্কিত কতকগুলি মূল্যবোধও আমাদের জীবনে সদাই সঞ্চরণশীল। আর তা থেকেই জন্ম নেয় কর্তব্যবোধ এবং দায়িত্ববোধ।

আমরা অনেক সময় ভাবি, মূল্যবোধ শুধুই বুঝি আমাদের প্রাচীন তত্ত্বকথা, এর সঙ্গে বাস্তব-জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। এমন ধারণাও সঠিক নয়। বিজ্ঞানের বা বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে রয়েছে প্রান্ত মূল্যবোধ বা অন্তিম মূল্যবোধ (Terminal Value) এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর ব্যাপারে সাহায্যকারী হচ্ছে যান্ত্রিক মূল্যবোধ (Instrumental Value)। বিজ্ঞানের সঙ্গে মূল্যবোধের সম্পর্ক নেই, এমন ধারণা করার মূলে রয়েছে আমাদের একটি প্রথাসিদ্ধ চিন্তা এবং সেটি হচ্ছে এই যে, মূল্যবোধ এবং আদর্শবাদিতা ও নীতিবোধ সমার্থক। আসলে কিন্তু তা' নয়। মূল্যবোধ সব সময়েই ক্রিয়াশীল। মানুষ যখন কোন কল্পনাশ্রিত ধ্যানধারণাকে অস্বীকার করে বা প্রচলিত ধর্মকে অর্থহীন বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়, তখনও কতকগুলি নবাগত মূল্যবোধই তাকে একাজে প্রণোদিত করে। যুগে যুগে কালে কালে নতুন নতুন ধ্যান-ধারণার সঙ্গে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সংঘাতেই গড়ে ওঠে কতকগুলি মূল্যবোধ।

আবার যখন কোন মানুষ আত্মমুখী হয়—তখনও কোন-না-কোন মূল্যবোধই তাকে নিজের সত্তাকে জানতে প্রণোদিত করে। এসব কিছুকেই আমরা বিজ্ঞানের কাজ বলে উল্লেখ করতে পারি। কারণ, মানুষের সব কিছুই প্রণোদিত হয় বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞাত শক্তিতে বা একটা নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে। স্মরণে রাখা প্রয়োজন, শুধুমাত্র যে মনোবিজ্ঞান বা ধর্মই মূল্যবোধ অনুযায়ী পরিচালিত হয়, তা নয়, বরং বলা যায়, বিজ্ঞানের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রও মূল্যবোধ অনুযায়ীই পরিচালিত হয়। এই বস্তুগত পৃথিবীতে মূল্যবোধ অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াকে যান্ত্রিক মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এটাকেও আমরা বিজ্ঞান বলেই অভিহিত করতে পারি। অন্যদিকে, আধ্যাত্মিক পৃথিবীতে এই একই অনুসন্ধান যে মূল্যবোধগুলিকে চিহ্নিত করে, তা হচ্ছে সত্যবাদিতা, সৌন্দর্য, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, অনুভূতি, সততা ইত্যাদি।

এই মূল্যবোধ যেমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক, তেমনি সমাজভিত্তিক। আবার এই মূল্যবোধ যেমন শাশ্বত, তেমনি আপেক্ষিক। অনেক সময় আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই শাশ্বত মূল্যবোধকে গ্রহণ করি, আবার কখনও কখনও সাময়িক ভাবে বর্জন করি। কারণ, মূল্যবোধ হল পরম একের বোধ—যে বোধ সেবার আদর্শে প্রতিফলিত, যে বোধ অসৎ পন্থায় কোন সৎ লক্ষ্যে উপনীত হওয়াকেও সমর্থন করে না। সেই জন্যই সুস্থ একটি সমাজের জীবন-প্রবাহকে অব্যাহত রাখার জন্যই একত্বের বোধসূচক এই মূল্যবোধকে আমাদের জীবনে একান্তই প্রয়োজন।

আগেই বলেছি, মূল্যবোধ যেমন ব্যক্তি-কেন্দ্রিক, তেমনই সমাজভিত্তিক। ব্যক্তিনির্ভর মূল্যবোধ তখনই সমাজভিত্তিক হয়ে ওঠে, যখন ব্যক্তির মূল্যবোধ সমাজ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে। আর সেই গৃহীত মূল্যবোধ সমাজজীবনের সংস্কৃতি, শিক্ষা, ইতিহাস, গোষ্ঠী ব্যবহার—ইত্যাদি সকল ধারাতেই প্রবাহিত হয় এবং বাঞ্ছিত পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর ওই পরিণতির দিকে এগিয়ে চলার নামই প্রগতি।

কিন্তু শুধু প্রগতি চাইলেই কি প্রগতির দেখা পাওয়া যায়? ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে, শুধু চাওয়ার কোন মূল্য নেই, যদি না সেই চাওয়ার সঙ্গে যুক্ত হয় প্রবল চিন্তাশক্তি। চিন্তায় আনতে হবে Challenge এবং তাতেই মানুষ কর্মশক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়, হয় কর্মে উদ্বুদ্ধ। আর মানুষ যখন কর্মে উদ্বুদ্ধ হয়, তখনই সে

তার দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য এগিয়ে যায়। সুস্থ, স্বচ্ছ এবং সবল চিন্তার মাধ্যমেই মানব-সম্পদের যথার্থ বিকাশ ঘটে।

আমাদের দেশে ও সমাজে ইদানীং এমন কিছু কিছু অশুভ লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করেছে, যেগুলিকে মূল্যবোধহীনতার প্রকাশ বলে চিহ্নিত করা যায়। তবে আশার কথা, এই সঙ্কট থেকে মুক্তির পথ খুঁজে বার করার দিকেও বিভিন্ন মহলে সম্প্রতি পরিলক্ষিত হচ্ছে তৎপরতা।

প্রথমত, সুস্থ ও সবল সমাজজীবনের অস্তিত্ব এবং গতিকে অব্যাহত রাখার জন্য ব্যক্তিজীবন এবং সমাজজীবনে মূল্যবোধকে লালন-পালন করা যে অপরিহার্য—এমন একটা বোধ রাষ্ট্র-জীবনে ফিরে আসতে শুরু করেছে, সেটাই শুভলক্ষণ। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে একটা বড় অংশই ধরে নিয়েছিল যে, আমাদের পরম প্রাপ্তি ঘটে গেছে, স্বাধীন দেশ আমরা পেয়ে গেছি। এখন আর করার কিছু নেই। এখন শুধু পাওয়ার পালা। তাই কী কী পাইনি, তার তালিকা তৈরি হয়েছে, কিন্তু কী কী দিতে পারিনি, সেই সমীক্ষায় আত্মমগ্ন হইনি; বিদেশের কোন্ কোন্ দেশের মানুষ আমাদের তুলনায় অনেক বেশি সুখে আছে—সেই বর্ণনায় হতাশাজর্জরিত হয়েছি। কিন্তু ওই সব দেশে লব্ধ সুখ অর্জনে যে পরিশ্রম ও ত্যাগের ইতিহাস জড়িত রয়েছে, সেদিকে নজর ফেরাইনি।

ফলে ঘরে-বাইরে, স্কুলে-কলেজে, অফিসে-কাছারিতে, ট্রেনে-বাসে সর্বত্র আচারবিচারে লক্ষ্য করি, ঐতিহ্য-বিচ্যুত এবং আত্মবিশ্বাসহীন মূল্যবোধহীনতা আমাদের জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। আমরা নিজেদের দোষ দেখি না, অপরকে দায়িত্ববোধ সম্পর্কে উপদেশ দিই, কিন্তু নিজে দায়িত্ব পালন করি না। এরকম একটা পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে মানবিক মূল্যবোধগুলি স্বাভাবিক ভাবেই বিপন্ন হয়ে পড়ছে। মানবিক মূল্যবোধগুলি বিপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আক্রান্ত হয়েছে সামাজিক মূল্যবোধও।

দ্বিতীয়ত, পশ্চিমী কিছু ধ্যান-ধারণা এবং সেই সব ধ্যান-ধারণার ধারক এবং বাহকরা আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য এবং হাজার হাজার বছরের ঐশ্বর্যময় চেতনাকে অবজ্ঞা করতে শিখিয়েছে। বস্তুতান্ত্রিকতায় মোহাবিষ্ট হয়ে ঐতিহ্যগত মূল্যবোধকে অনেক ক্ষেত্রেই অস্বীকার করেছি। মাতা-পিতা এবং গুরুজনকে প্রণাম করা, শিক্ষক এবং বয়স্কদের শ্রদ্ধা করা—ইত্যাদি ধারণাগুলি কত সহজে আমাদের সমাজজীবন থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। এ ব্যাপারে ছেলেমেয়েরা নিজেদের বাবা-মাকে দেখেও কিছু শেখে না, কারণ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাবা-মাও এসব ব্যাপারে থাকেন উদাসীন। আমরা শ্রদ্ধা করতে ভুলে যাচ্ছি, অথচ শ্রদ্ধা পেতে লালায়িত, এমন একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছি।

ছাত্ররা শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করতে ভুলে যাচ্ছে। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্" কথাটাও পরিণত হয়েছে কথার কথায়। পারিবারিক জীবন থেকেও আজকের ছাত্ররা তেমন শিক্ষা পাচ্ছে না। অন্যদিকে শিক্ষকরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিছক চাকরির খাতিরেই শিক্ষকতা করেন। ফলে আগের মতো শিক্ষকগণ সন্তানসম স্নেহে ছাত্রদের পড়ান না। শ্রদ্ধা ও স্নেহের স্বর্ণসূত্রটি ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে মর্মান্তিক সঙ্কট। আর সেটাই এক ভয়ঙ্কর মূল্যবোধহীনতার জটিলতায় জড়িয়ে ফেলেছে বর্তমান প্রজন্মকে।

তৃতীয়ত, আমাদের পারিবারিক জীবন থেকে রামায়ণ মহাভারতের মতো মহাকাব্যের প্রভাবও

দিনে দিনে ক্ষীয়মান। আগে ঠাকুরমা বা মায়ের মুখে মুখে গল্প শুনে ছেলেমেয়েরা রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী আয়ত্ত করত—শিখত রামের মতো পিতৃ-আজ্ঞা এবং সত্য-পালনের অঙ্গীকার, শিখত লক্ষণের মতো ভ্রাতৃ-প্রেমের মহিমা, শিখত ভরতের মতো ত্যাগের আদর্শ, জানত গুহক চণ্ডালের সঙ্গে রাজা রাম-চন্দ্রের অপার সখ্যের কাহিনী। এতে তিলে তিলে শিশু ও কিশোর মনের পর্দায় অঙ্কিত হত কতক-গুলি মূল্যবোধের রেখা—যেগুলি হত তার সারাজীবনের সঞ্চয়। কিন্তু এখন সেটাই আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। ফলে দেখা দিচ্ছে আত্মবিশ্বাস এবং আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব। সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, স্বামী বিবেকানন্দ—অর্থাৎ যাঁরা আমাদের গৌরবান্বিত অস্তিত্বের সাক্ষী, যাঁদের নিয়েই আমাদের অস্তিত্ব—সেই মহাপুরুষদের জীবনকথাও আজকের ছেলে-মেয়েরা জানা বা শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। স্কুল-কলেজে যেমন সে সুযোগ নেই, তেমনি নেই পারিবারিক পরিমণ্ডলেও। ফলে বোধের সঙ্গে বোধির যে বিকাশ—সেটাই হয় ব্যাহত। রামায়ণ মহাভারতের মতো মহাকাব্যেই শুধু নয়, রক্তমাংসের মানুষের মধ্যেও ত্যাগ, শ্রদ্ধা, সত্য-রক্ষা, প্রেম, পরার্থপরতা ইত্যাদি মূল্যবোধগুলি যে কতখানি জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ ঘটনা, সেটাও আজকের ছেলেমেয়েরা জানার সুযোগ পায়নি।

চতুর্থত, আজকের যুবকযুবতীদের বিরুদ্ধে অনেকেই একটা অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন: স্বাধীনতা আন্দোলনে এদেশের যুবকরা কত মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, কত সহজেই আত্ম-দান করেছেন, কিন্তু একালের যুবকদের মধ্যে তেমন লক্ষণ নেই। অভিযোগটাকে আপাত-দৃষ্টিতে সত্য বলেই মনে হয়। কিন্তু প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে যুবকদের সামনে ছিল তিনটি জীবন্ত আদর্শ: (১) বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের প্রাণ জাগানো আহ্বান এবং সর্বস্ব ত্যাগের সংকল্প, (২) শহীদ ক্ষুদিরামের আত্মদান এবং (৩) বন্দেমাতরমের মন্ত্রশক্তি। সেদিন চোখের সামনে ছিল বিদেশী শাসকদের অস্তিত্ব এবং ছিল পরাধীন জীবনের যন্ত্রণা। তাই চোখের সামনে একটা লক্ষ্য ছিল স্থির। সেই সঙ্গে সেকালের রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক এবং সমাজকর্মীদের ত্যাগব্রতীজীবনও ছিল মূল্যবোধের প্রতীক। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পর সেরকম কোন আদর্শ কি আর চোখের সামনে অবশিষ্ট রইল? রইল কি তেমন কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যও? স্বাধীনতার পর যেসব শিশুরা জন্ম গ্রহণ করল—আজ যাদের বয়স তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে, কিংবা তারও কম—তারা চোখের সামনে কি দেখছে? দেখছে বাড়িতে অভিভাবক এবং স্কুলে শিক্ষক—সকলেই Ideal (আদর্শ) ছেড়ে যেন তেন প্রকারেণ Practical (বাস্তববাদী) হওয়া শেখাবার জন্য ব্যস্ত। কেউ কি বলেছেন, আমাকে দেখ, চরিত্রবান হও, আদর্শবান হও? তাহলে এই প্রজন্মের মধ্যে ত্যাগের ভাব, আদর্শের ভাব, চরিত্রবল এবং শ্রদ্ধার ভাব আসবে কেমন করে? কাজেই যুবকদের মনে এইভাব না আসার জন্য তারা দায়ী নয়—দায়ী বর্তমান সুযোগ-সন্ধানী এবং তথাকথিত Practical অভিভাবকরা। সেটাই আজ বোঝার সময় এসেছে।

তবু এই নিঃসীম হতাশার মধ্যেও ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎপ্রভার মতো বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ত্যাগের ইতিহাস রচিত হয়, রচিত হয় আত্মদানের ইতি-বৃত্ত, রচিত হয় সেবার আদর্শ—সেটাই আশ্বাসের কথা। অর্থাৎ, সবকিছু এখনও হারিয়ে যায়নি। এখনও যুবচিত্তে এবং যুবজীবনে মহৎবোধ এবং

অমূল্য মূল্যবোধগুলি মাঝে মাঝেই জেগে ওঠে, পথ খুঁজে পেতে চায়, চায় পরিপূর্ণ জীবন-মহিমাকে প্রকাশ করতে—কিন্তু তাদের পথ দেখাবে কে? এই স্বার্থপর সমাজে নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মতোই এখনও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের আদর্শ আমাদের সেই পথেরই সন্ধান দিতে পারে, যে পথ "বহুজনসুখায়, বহুজন-হিতায়" জীবনদানের সংকল্পে অটল, যে পথ ভারতীয় আদর্শ এবং ঐতিহ্যের দিগন্তে উপনীত এবং যে পথ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় শাশ্বত।

পঞ্চমত, প্রত্যেক দেশ ও সমাজের মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে সেই দেশ ও সমাজের ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের উপাদানে, গড়ে উঠেছে সমাজ-বিবর্তনের উপকরণে এবং গড়ে উঠেছে লোক-জীবনের উপহারে। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের দৃষ্টিকে সেদিকেই সঞ্চালিত করেছেন এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের মহৎ সম্পদের দিকে আমাদের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এই দেশ প্রকৃত-পক্ষে দুশ বছর ধরে বিদেশী শাসনের ছত্রছায়া-তলে টিকে ছিল এবং সেই সুবাদেই বহিরাগত চিন্তাভাবনা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং সংস্কার এদেশের বুকেই একশ্রেণীর বিজাতীয় ভাবধারা-সম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। রাজা রামমোহন রায়ের মতো মানুষও ইংরেজ শাসনকে এদেশের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ বলতে দ্বিধাবোধ করেননি। এইসব আদর্শগত সংঘাত এবং ভাব-গত সংঘর্ষের ফলে এদেশের ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রচলিত এবং ঐতিহ্যাশ্রিত মূল্যবোধের সঙ্কট অনিবার্যভাবেই দেখা দিয়েছিল। সেই সঙ্কটের লগ্নেই স্বামী বিবেকানন্দ মৃতপ্রায় জাতির বুকে নতুন জীবনের সঞ্চার করলেন, বললেন, "পূর্বের মতো ঠিক ঠিক শ্রদ্ধা আনতে হবে।... প্রথমতঃ মহাপুরুষদের পূজা চালাতে হবে। যাঁরা সেই সব সনাতন তত্ত্ব প্রত্যক্ষ ক'রে গেছেন, তাঁদের—লোকের কাছে ideal (আদর্শ বা ইষ্ট)-রূপে খাড়া করতে হবে। যেমন ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর ও শ্রীরামকৃষ্ণ। দেশে শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীরের পূজা চালিয়ে দে দিকি। বৃন্দাবনলীলা-ফীলা এখন রেখে দে। গীতা-সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালা, শক্তিপূজা চালা।...এখন চাই মহাত্যাগ, মহানিষ্ঠা, মহাধৈর্য এবং স্বার্থগন্ধশূন্য শুদ্ধবুদ্ধি সহায়ে মহা উদ্যম প্রকাশ ক'রে সকল বিষয় ঠিক ঠিক জানবার জন্য উঠে পড়ে লাগা।" (বাণী ও রচনা, ৯।১৪৪-৪৫)।

তারপরই স্বামী বিবেকানন্দ আত্মবিশ্বাস-হারা জাতির জীবনে স্বাধীনতালাভের প্রদীপ্ত কামনাটি জ্বালিয়ে দিয়ে বললেন: "ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নহে, চৈতন্যের শক্তিতে, বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নহে, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া—সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশসহায়ে; অর্থের শক্তিতে নহে, ভিক্ষাপাত্রের শক্তিতে। বলিও না, তোমরা দুর্বল, বাস্তবিক সেই আত্মা সর্বশক্তিমান।" (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৫)।

সেই নবজাগরণের মন্ত্রটি ভারতের কানে কানে প্রাণে প্রাণে ছড়িয়ে দিয়ে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে যে সতর্কবাণী সেদিন উচ্চারণ করেছিলেন, সেটি আজকের যুগেও সমভাবেই সত্য—মূল্যবোধের সঙ্কটে বিপন্ন এই দেশ ও সমাজের কাছে সেটিই সঠিক পথের দিশারী। স্বামীজী যেন সেদিনের মতোই আজকের মানুষকেও নিক্ষেপ করছেন সেই মর্মান্তিক প্রশ্নের সামনে: "হে ভারত এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা —এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে?" (বাণী ও রচনা ৬।২৪৭) বর্তমা

ভারতের বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং মূল্যবোধহীনতা যে ভয়াবহ সঙ্কটের সৃষ্টি করছে বারবার, তার মূলে রয়েছে স্বার্থপরতা এবং "ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা"। কিন্তু এথেকে মুক্তির পথ কোথায়? স্বামীজী কম্বুকণ্ঠে ডাক দিয়ে বলছেন: "তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই,—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।" (বাণী ও রচনা, ৬/২৪৯) স্মরণ করা যেতে পারে যে, এদেশের বুকে স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম ভারতবাসীর অখণ্ড অস্তিত্বের কথাটি সদর্পে তুলে ধরেন এবং জাতপাত, প্রাদেশিক সীমা, ভাষাগত বা ধর্মগত সংকীর্ণতাকে অস্বীকার করে সর্বপ্রথম ভারতীয় মূল্যবোধ তথা জীবনবোধের মন্ত্রটি সবীরত্বে উচ্চারণ করেন। মূল্যবোধের সঙ্কট সৃষ্টির মূলে থাকে বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির সংঘর্ষ। স্বামী বিবেকানন্দ সেই সংঘর্ষের নিষ্পত্তি ঘটিয়েছেন এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। আমরা পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে একদিকে ধর্ম এবং অন্য দিকে বিজ্ঞানকে রেখেছি, একদিকে বিশ্বাস, অন্যদিকে যুক্তিকে রেখেছি। স্বামীজী সেই ভুল প্রথম ভেঙে দিলেন। যুবকদের কাছে বিজ্ঞানও এক প্রকার ধর্ম, কারণ বৈজ্ঞানিক সত্যের জন্য তারা আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত। স্বামীজী দেখালেন, ধর্মও একরকমের বিজ্ঞান, তা হল আত্মবিজ্ঞান। সে বিজ্ঞানের ভাষা আলাদা। সে বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরি মানুষের হৃদয়, মানুষের আত্মা। সেই বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি মূল্যবোধ।

সেইজন্যই স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের সামনে এবং সর্বকালের যুবকদের সামনে চারটি অভ্রান্ত সূত্র তুলে ধরেছেন—যার ভিত্তিতে ব্যক্তিজীবনে রচিত হবে শাশ্বত মূল্যবোধের ক্ষেত্র। এই চারটির মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে শ্রদ্ধা। স্বামীজী বলছেন, শ্রদ্ধাবান হও। কেমন শ্রদ্ধাবান? না, নচিকেতার মতো শ্রদ্ধাবান। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, নির্ভয় হও, মাভৈঃ। তার সেই অভী-মন্ত্র। তৃতীয়টি হচ্ছে, নিঃস্বার্থভাবে ত্যাগ স্বীকার কর, পরার্থে ত্যাগ স্বীকার কর। এই ত্যাগের মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রেম। স্বার্থপরতা ত্যাগ করে ত্যাগের মাধ্যমে সেবা কর। "দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।" আর চতুর্থত, "সত্যের জন্য সবকিছুকে ত্যাগ করা চলে, কিন্তু কোন কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা চলে না।"

আর এই চারটি মূলমন্ত্রকে জীবনে রূপায়িত করার প্রয়োজনেই স্বামীজী "Three H" ফর্মুলার উল্লেখ করলেন। Head, Hand এবং Heart—মস্তিষ্ক, অর্থাৎ বোধি; কর্ম অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম এবং হৃদয়, অর্থাৎ বোধ, অপার অনন্ত প্রেম। এই তিনের সমন্বয়ে ব্যক্তিজীবনের মূল্যবোধ হয় বিকশিত এবং তখনই "হওয়া" থেকে "করায়" উত্তরণ ঘটবে।

স্বামীজী বলছেন, BE and MAKE—আগে নিজে হও, মানুষ হও, মানুষের মতো মানুষ হও, তারপর অপরকে মানুষ হতে সাহায্য কর। আজকের সমাজে নিজেরাই মানুষ হতে পারি না, অন্যদিকে অপরকে মানুষ করবার জন্য কত চেষ্টা! ফলে শেষপর্যন্ত কোনটাই হয় না। তাই মূল্য-বোধের তপস্যা ব্যক্তিজীবন থেকেই শুরু করা প্রয়োজন। ব্যক্তিজীবন থেকেই সঞ্চারিত হবে সমাজজীবনে।

ব্যক্তিজীবন থেকে মূল্যবোধের ধারণাটি ব্যাপ্ত হবে সমাজজীবনে—ঠিক কথা। কিন্তু তার ভিত্তিটি কি হবে? সেই ভিত্তিটি আমরা

পেতে পারি স্বামীজীর কাছ থেকে—যিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন চারটি মূল ধারণা। সেগুলি হচ্ছে: (১) মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তির উদ্বোধন, (২) প্রাচীন ভারতের গৌরব এবং মহিমা সম্পর্কে শ্রদ্ধা এবং একাত্মতা, (৩) সাধারণ আধ্যাত্মিক ভাবসূত্রে ঐক্য এবং (৪) ভারতের সাধারণ মানুষের আত্মিক শক্তিই হচ্ছে ভবিষ্যতের জন্য মূল আস্থা ও ভরসা।

কিন্তু এই যে মৌল কারণগুলি, এগুলির উৎস কোথায়? স্বামী বিবেকানন্দের মহান্ জীবন-বেদের সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন, তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে পেয়েছিলেন সত্যমূল্যে সত্যের দীক্ষা। এই সত্যই সমাজের প্রাণ। তাই তিনি বলছেন: "সত্য প্রাচীন বা আধুনিক কোন সমাজকে সম্মান করে না, সমাজকেই সত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে; নতুবা সমাজ ধ্বংস হউক। সত্যের উপরই সকল সমাজ গঠিত হইবে; সত্য কখনও সমাজের সহিত আপস করিবে না। নিঃস্বার্থতার ন্যায় একটি মহৎ সত্য যদি সমাজে কার্যে পরিণত না করা যায়, তবে বরং সমাজ ত্যাগ করিয়া বনে গিয়া বাস কর।...সেই সমাজই সর্বশ্রেষ্ঠ, যেখানে সর্বোচ্চ সত্য কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে—ইহাই আমার মত।" (বাণী ও রচনা, ২।৩৬—৩৮)

সত্যের বন্ধন ছাড়া আদর্শ সমাজ গঠিত হতে পারে না, এটা যেমন ঐতিহাসিক ঘটনা, তেমনি সেই সত্যকে ব্যক্তিজীবনে ধারণ করার জন্যও চাই একটি নিরাপদ আশ্রয়।

ব্যক্তিজীবনে অম্লান মূল্যবোধের অটুট আশ্রয় কী? অসত্য বা অন্যায় স্পর্শ করে কাকে? স্বামীজী এ প্রশ্নের উত্তরে সাহস এবং বীরত্বের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন: "কাপুরুষেরাই পাপ করিয়া থাকে, বীর কখনও পাপ করে না—মনে পর্যন্ত পাপচিন্তা আসিতে দেয় না। সকলকে ভালবাসিবার চেষ্টা করিবে। নিজে মানুষ হও, আর রাম প্রভৃতি যাহারা সাক্ষাৎ তোমার তত্ত্বাবধানে আছে, তাহাদিগকেও সাহসী, নীতিপরায়ণ ও সহানুভূতিসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। হে বৎসগণ, তোমাদের জন্য নীতিপরায়ণতা ও সাহস ব্যতীত আর কোন ধর্ম নেই...। যেন কাপুরুষতা, পাপ, অসদাচরণ বা দুর্বলতা একদম না থাকে, বাকি আপনা-আপনি আসিবে।" (বাণী ও রচনা, ৬।৩০২)।

ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ এবং সমাজ থেকে রাষ্ট্র—এভাবেই ঘটছে বিস্তৃতি। ফলে, মূল ভিত্তি বা Basic Unit হচ্ছে ব্যক্তি। ব্যক্তিজীবনের সামগ্রিক উন্নতির অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দ তিনটি পথের সন্ধান দিয়েছেন (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ৬।৩৯৬):

(১) "সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস।

(২) হিংসা ও সন্দিগ্ধভাবের একান্ত অভাব।

(৩) যাহারা সৎ হইতে কিংবা সৎ কাজ করিতে সচেষ্ট, তাহাদিগের সহায়তা।"

আবার দেখি ব্যক্তিজীবনের মূল্যবোধ প্রসঙ্গে স্বামীজী এক পত্রে (বাণী ও রচনা ৬/৫০৪) বলছেন: "হে বৎস, যথার্থ ভালবাসা কখনও বিফল হয় না। আজই হোক, কালই হোক, শত শত যুগ পরেই হোক, সত্যের জয় হবেই, প্রেমের জয় হবেই। তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নহে?...তোমার হৃদয়ে প্রেম আছে তো? তবেই তুমি সর্বশক্তিমান্।...... চরিত্রবলে মানুষ সর্বত্রই জয়ী হয়।" আবার

দেখি অপর এক পত্রে স্বামীজী লিখছেন (বাণী ও রচনা, ৭৷৯): "পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু। শতকরা নব্বই জন নরপশুই মৃত, প্রেততুল্য, কারণ হে যুবকবৃন্দ, যাহার হৃদয়ে প্রেম নেই, সে মৃত ছাড়া আর কি?"

প্রেমহীন হৃদয়ে কোনদিনই মূল্যবোধ স্থান পেতে পারে না। আর দুর্বল হৃদয়ে প্রেমের স্থান নেই। সেইজন্যই দুর্বলতা পরিহার করাই প্রথম কর্তব্য।

ব্যক্তিজীবনের মানবিক মূল্যবোধগুলির সম্যক বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার মূলে সদাসর্বদাই কতকগুলি ব্যবহারিক প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। স্বামী বিবেকানন্দের সূত্র অনুসরণ করে পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একজন মানুষ অনায়াসেই সেই প্রতিবন্ধকতার বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেতে পারে, খুঁজে পেতে পারে পূর্ণতর জীবনের লক্ষ্য। স্বামীজী লিখছেন (বাণী ও রচনা, ৭৷১৯৩-৯৪):

১॥ পক্ষপাতই সকল অনিষ্টের মূল কারণ জানবে। অর্থাৎ, যদি তুমি একজনের তুলনায় অন্যজনের প্রতি বেশি স্নেহ দেখাও, তাহলে ভবিষ্যৎ বিবাদের মূল পত্তন হবে।

২॥ কেউ তোমার কাছে অন্য কোন ভাই বা মানুষের নিন্দা করতে এলে, তা' বিলকুল শুনবে না—শুনাও মহাপাপ, ভবিষ্যৎ বিবাদের সূত্রপাত হয় তাতেই।

৩॥ অধিকন্তু, সকলের দোষ সহ্য করবে, লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করবে এবং সকলকে তুমি যদি নিঃস্বার্থভাবে ভালবাস, সকলেই ধীরে ধীরে পরস্পরকে ভালবাসবে। একের স্বার্থ অন্যের উপর নির্ভরশীল, একথা বিশেষভাবে বুঝতে পারলেই সকলে ঈর্ষা একেবারে ত্যাগ করবে; দশজনে মিলে একটা কাজ করা—আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে নেই, এজন্য ওইভাব আনতে অনেক যত্ন, চেষ্টা ও বিলম্ব সহ্য করিতে হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ বা রচনাবলীতে সরাসরি "মূল্যবোধ" শব্দটি অবশ্য ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু তাঁর যাবতীয় পথনির্দেশের মধ্যেই আমরা সেই মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করি। মূল্যবোধ হচ্ছে আমাদের সেই অন্তরতম সত্য—যার প্রকাশ ঘটে আত্মশক্তিতে এবং অন্তরশক্তিতে এবং যে শক্তি আমাদের বিশেষ কোন কাজে প্রেরণা দেয়, আমাদের প্রণোদিত করে বা প্ররোচিত করে একটা জিনিস আমাদের কাছে তখনই প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে, যখন আমরা তা' পেতে চাই, রাখতে চাই বা আরও বাড়াতে চাই। এই ধারণাকে অবলম্বন করলে আমরা দেখতে পাব, স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের বারবার সেই অন্তরতম সত্যের দিকে ধাবিত করেছেন, যা মানুষের আত্মশক্তিকে জাগ্রত করতে পারে।

সবশেষে এ কথাটা অবশ্যই স্মরণে রাখা প্রয়োজন, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-দর্শন মূলতঃ মানবকেন্দ্রিক। জার্মান দার্শনিক রুডল্‌ফ অয়কেন (১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান) বলেছিলেন: Man is the meeting point of various stages of reality. ভারতীয় উপনিষদ্‌ও মানুষকে নানাস্তরে বিশ্লেষণ করে, প্রত্যেক স্তরের মর্যাদা দিয়ে অবশেষে মানুষের নিগূঢ়তম সত্য-পরিচয়কেই বিধৃত করেছে। সেটাই মানুষের আসল পরিচয় এবং সেটাই মূল্যবোধসঞ্জাত। স্বামী বিবেকানন্দও মানুষকে এই দৃষ্টিতেই দেখেছেন। মানুষের দেহমন আশা-আকাঙ্ক্ষা কোনটাই অবহেলা করার বিষয় নয়, কিন্তু তার অন্তরতম সত্যই হচ্ছে সব থেকে আদরণীয়।

একটি হিসাবের খাতা

স্বামী প্রভানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ আজ শতকোটি মানুষের হৃদয় অধিকার করে বিরাজ করছেন। পরিসংখ্যানের পরিমাপেও বোধ করি তিনি ভারতভূমিতে সর্বাধিক সমাদৃত ঐতিহাসিক চরিত্র। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের হৃদয়ে বিস্তৃত তাঁর আসন। শ্রীরামকৃষ্ণ একজন আশ্চর্য-পুরুষ; তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ভূমিকা একটা প্রতীত ব্যাপার—রহস্যঘন কিন্তু বাস্তব। অনুপম ও আকর্ষণীয় তাঁর চরিত্র। গভীর তাৎপর্যপূর্ণ তাঁর জীবন ও বাণী।

স্বাভাবিকভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মহামানব সম্বন্ধে যে-কোন বাড়তি নির্ভরযোগ্য তথ্যই মূল্যবান; তাই তাঁর সম্বন্ধে কোন জ্ঞাত ঘটনার প্রেক্ষিত জানতে পারলে আমরা উপকৃত বোধ করি। দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণ বাস করেছিলেন ত্রিশ বছরের বেশি। এই কালের তাঁর জীবনের কয়েকটি বছর আরও গভীরভাবে বুঝবার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে কিছু নতুন তথ্যোদ্ভাসের ফলে। এই সুযোগ এনে দিয়েছে একটি হিসাবের খাতা।

উনিশ শতকে বাংলার মধ্যবিত্ত পরিবারে সাধারণতঃ দু-ধরনের রোজ্‌নামচা প্রচলিত ছিল। প্রথম, ব্যক্তির দিনচর্যার বাস্তব ঘটনাবলীর বা তার ভাবজগতের লেনদেনের বিবরণী। দ্বিতীয়, তার দৈনন্দিন খরচপত্রের হিসাব। প্রথম শ্রেণীর রোজ্‌নামচা কখনও কখনও সাহিত্যের মূল্যবান আকরের মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু দৈনন্দিন হিসাবপত্র সাধারণতঃ নিরস বাস্তব তথ্য-ভিত্তিক বলে চিরকালই কিঞ্চিৎ হেয়, যেন একটু নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু দৈনন্দিন হিসাবের খাতায় পাওয়া যায় অতি নির্ভরযোগ্য তথ্য, সেখানে কল্পনা বা ভাবোচ্ছ্বাসের স্থান নেই। যেখানে রোজ্‌নামচার মুখ্য উদ্দেশ্য লেখকের টাকাপয়সার সঠিক হিসাব রাখা সেখানে তথ্যের উপাদানগুলি সাদামাঠা হলেও খুবই বিশ্বাসযোগ্য। উপরন্তু, হিসাব থেকে পাওয়া বাড়তি তথ্য জীবনের সমকালীন ঘটনাবলীর পরম্পরা ও প্রেক্ষিত জানতে সাহায্য করে। আমাদের আলোচ্য হিসাবের খাতা থেকে আহৃত জ্ঞান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকাহিনী তথা লীলাবিলাসের উপর কিছু নতুন আলোকসম্পাত করবে সন্দেহ নাই।

আমরা পূজনীয় মাস্টারমশায় বা 'শ্রীম'র পৌত্র শ্রীঅনিল গুপ্তের সৌজন্যে একটি ৪৬ পৃষ্ঠার রোজ্‌নামচা তথা হিসাবের খাতা দেখবার সুযোগ পেয়েছি। এর মধ্যে চার বছর তফাতে দুটি বছরের পুরো হিসাব দেখতে পেয়েছি।

প্রথম বছরটি ১২৮৩ সাল, ইংরেজী ১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। এ বছরের প্রথমে জমা পড়েছিল ১২৮২ সালের বক্রী হিসাব ৩৬৯৶১৫ পয়সা; বছরের শেষে জমার ঘরে অঙ্ক দাঁড়িয়েছিল ৬৭৫৲ টাকা। সারা বছর ধরে খরচ হয়েছিল মোট ২৬৭।৴১০ পয়সা, ফলে বছরের শেষে অবশিষ্ট থেকে গেছিল ৪০৭॥৶১০ পয়সা; অনুরূপভাবে, দ্বিতীয় বছর অর্থাৎ ১২৮৭ সাল, ইংরেজী ১৮৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আয়ের ঘরে মোট অঙ্ক ছিল ৮২৫।৴১৫ পয়সা এবং মোট খরচ হয়েছিল ৫৮৯।৶১০ পয়সা। তার ফলে বছরের শেষে অবশিষ্ট থেকে গেছিল ২৩৫৸৵৫ পয়সা।

এই হিসাবের খাতা দক্ষিণেশ্বরে কামারপুকুর-আগত চাটুজ্যে পরিবারের। পরিবারের কর্তা শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। সুতরাং হিসাবের খাতা ছিল তাঁরই নামে। ১২৮৩ সালের

হিসাবের খাতার উপরের পৃষ্ঠায় শুধু লেখা রয়েছে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য।' তাঁর নামে টাকাপয়সার হিসাব রাখতেন অপরে। তিনি 'সংসারী' হলেও সাংসারিকতা তাঁর মধ্যে ঢুকতে পারেনি। আবার, তিনি সংসারের আবেষ্টনীর মধ্যে থেকেও সন্ন্যাসীর রাজা, ত্যাগীর বাদশা। হিসাবপত্রের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না।[১] আয়ের খাতে শ্রীরামকৃষ্ণের নামে অতি সামান্য কিছু টাকাপয়সা জমা পড়েছে। বেশির ভাগই জমা পড়েছে তাঁর ভাইপো রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের নামে। অপরপক্ষে ব্যয়ের খাতে শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী, রামলাল, শিবরাম, লক্ষ্মীদেবী প্রমুখ ব্যক্তিগণের এবং দক্ষিণেশ্বর সংসারের পুরো ও কামারপুকুর সংসারের আংশিক খরচপত্রের হিসাব স্থান পেয়েছে। রামেশ্বর দেহত্যাগ করেছিলেন ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৮০ (১১ ডিসেম্বর, ১৮৭৩)। তাঁর পরলোকগমনের একবছর পরে পুত্র রামলাল (১৮৬০-১৯৩৪) দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পূজারীর কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আলোচ্য দুটি বছরে রামলাল চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণেশ্বরে মোটামুটি সুপ্রতিষ্ঠিত। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার যে হৃদয়রাম নিজেকে এই পরিবারের মুরুব্বির ভূমিকায় সংস্থাপিত করেছিলেন। এবং ১২ জুন ১৮৮১ (৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮) খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত ঐ ভূমিকা সদর্পে পালন করেছিলেন।

১২৮৩ সালের হিসাবের প্রথম পৃষ্ঠার শুরুতেই তিনটি সিঁদুরের টিপ। তারপর লেখা 'শ্রীশ্রীকালীমাতার চরণে শরণ, মমগতি জীবন-ধনপরায়ণ'। হিসাবের খাতায় কোথাও লেখকের নাম বা সই না থাকলেও কয়েকটি লক্ষণের দ্বারা আমরা নিশ্চিতপ্রায় সিদ্ধান্ত করতে পারি যে এর লেখক মুখ্যতঃ হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়। খাতাতে শ্রীরামকৃষ্ণকে 'শ্রীযুক্ত' 'শ্রীযুক্ত মহাশয়' এবং সারদাদেবীকে 'শ্রীমতী মামী' 'শ্রীমতী ছোটমামী' বলে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়াও ২০ ফাল্গুন ১২৮৩ সালে লিপিভুক্ত করা হয়েছে, '২৪ কার্তিক তারিখের কামারপুকুরের দেনা শোধের জন্য রাজারাম মুখোপাধ্যায়কে যাহা চৌদ্দ টাকা দেওয়া হইয়াছিল তাহা রাজারাম দেনা শোধ না দেওয়ায় আমি হৃদয় মুখোপাধ্যায় উক্ত টাকা অদ্য ফেরত জমা দিলাম'। দ্বিতীয় বছরের হিসাবের মধ্যে কয়েকটি লেখা যেমন '৺পিতামহীর কাজের দরুন' 'ঠাকুরমার শ্রাদ্ধ' ইত্যাদি দেখে এবং হস্তাক্ষরে কিছু বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করে আমরা সিদ্ধান্ত করেছি যে দ্বিতীয় বছরের খাতার কিছু অংশ লিখেছিলেন রামলাল চট্টোপাধ্যায়। একই হাতে ১০০৲ টাকার একটি নোটের নম্বর উদ্ধৃত করে লেখা রয়েছে যে এর মালিক শ্রীরামলাল চট্টোপাধ্যায়। তখন রামলালের বয়স কুড়ি বছর।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করবার মতো। আয়ের দিকে বিশেষ বিশেষ দিনের প্রণামীর পয়সা, আতপচাল, কাড়াচাল ও সিদ্ধচাল বিক্রয়ের মূল্য, বস্তু[২] বিক্রয়ের মূল্য ইত্যাদি সমান দুই ভাগে ভাগ হত। এক হিস্যা যেত হৃদয়রামের হিসাবে (সে-হিসাব এ খাতায় নাই),

১ আমাদের এই সিদ্ধান্তের কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কাছে টাকা-পয়সা রাখতে পারতেন না। তাঁর পুরনো একটি অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে বলেছিলেন: 'লক্ষ্মীনারায়ণ তখন হৃদয়ের কাছে দিতে চাইলে। আমি বললাম, "তাহলে আমায় বলতে হবে, একে দে, ওকে দে, না দিলে রাগ হবে!" টাকা কাছে থাকাই খারাপ। সে সব হবে না।' (কথামৃত ৪।২১।৪)

২ বস্তু হচ্ছে পাত্রভূত দ্রব্যচয়—সিধা, ভূজ্যি ইত্যাদির সঙ্গে দেয় গামছা, ছাতা ইত্যাদি।

অপর হিস্যা জমা পড়ত চাটুজ্যে পরিবারের হিসাবের খাতায়। তাছাড়াও রামলালের হিসাবে ভোজনদান, প্রণামী এবং কদাচিৎ ঠাকুরের নামে কিছু প্রণামী জমা পড়েছে।

উপরন্তু হিসাবের খাতায় পাওয়া গেছে একটি আনন্দদায়ক তথ্য। ১২৭১ সালে ঠাকুরের প্রধান রসদ্দার মথুরানাথ সারদাদেবীর জন্য যে সোনার গয়নাপত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন তার হিসাবের একটা নকল স্থান পেয়েছে এই খাতার মধ্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তথ্য: স্বাভাবিক কারণেই হিসাবের খাতার তথ্যাদির ভরকেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ। ১৮ ফেব্রুআরি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রানী রাসমণিকৃত Deed of Endowment থেকে জানা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল মাসিক ৫৲ টাকা বেতন, বছরে ৩ জোড়া কাপড় বা তৎমূল্য ৪॥০ তাছাড়া খোরাকীর জন্য দৈনিক বরাদ্দ ছিল সিদ্ধ চাউল ৴॥০ সের, ডাল ৴৶০ পো, পাতা ২ খান, তামাক ১ ছটাক ও কাঠ ৴২॥০ সের। আলোচ্য হিসাবের খাতা থেকে দেখা যায় ১২৮৩ সালে (১৮৭৬-৭৭) শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতি-মাসে মাসোহারা পাচ্ছেন ৫৲ টাকা ও বস্ত্রবাবদ মূল্য হিসাবে।৶০ আনা। অবশ্য, দেখা যায় ২৫ আশ্বিন ১২৮৭ সালে কামারপুকুর থেকে প্রত্যা-বর্তনের পর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিমাসে মাসোহারা পাচ্ছেন ৭৲ টাকা* ও বস্ত্রবাবদ ।৶০ আনা। কিন্তু রামলাল, পূর্বের মতোই প্রতি মাসে ৫৲ টাকা বেতন ও বস্ত্রবাবদ ।৶০ পাচ্ছিলেন। আরও লক্ষ্য করবার বিষয়, কামারপুকুরে সাত মাস থাকবার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মাসিক বরাদ্দ কিছু পাননি।

প্রচলিত জীবনীগ্রন্থগুলি থেকে জানা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ ১২৮৬ সালের শেষভাগে একবার দেশে গিয়ে সেখানে সাতমাস বাস করেছিলেন। হিসাবের খাতা থেকে জানতে পারি শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে গেছিলেন ১২৮৬ সালের ফাল্গুন মাসে এবং দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন ২৫ আশ্বিন ১২৮৭। অন্য সূত্রে জানতে পারি, এবারই ৺রঘুবীরের সেবার জন্য তিনি জমি কিনে দিয়েছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে কোতুলপুরে ভদ্রদের বাড়িতে তিনি ৺সপ্তমী পূজা দেখে-ছিলেন। ঠাকুরের খোঁজ খবর নিয়ে আসার জন্য কেশবচন্দ্র লোক পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ঠাকুরের দেখা হয়েছিল বর্ধমানের কাছাকাছি কোনও স্থানে।

এই কয়েকমাসের জন্য কামারপুকুরের সংসারে বাড়তি খরচ হয়েছিল ১৪৭।০ আনা কামারপুকুর অঞ্চলে তখন ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ কষ্ট পেয়েছিলেন এবং একদিন বিরক্ত হয়ে বলে-ছিলেন, এখানে আর আসব না। বাস্তবিকই, তিনি স্থূলশরীরে আর কামারপুকুরে যাননি।

ঠাকুরের জামাকাপড় কি পরিমাণ লাগত এই তথ্যের অনুসন্ধান করে দেখতে পাই ১২৮৩ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে কেনা হয়েছে রাত্রিবাসের জন্য একখানা কাপড়, মূল্য ॥৴০; ১২৮৬ সালে পৌষ মাসে ১৶০ মূল্যের তিনটা জামা ও।০ আনা মূল্যের একটা (কান) ঢাকা টুপী। এবং ১২৮৭ সালে পৌষ মাসে কেনা হয়েছে একটা তেলধুতি —মূল্য ।৶১০, মাঘ মাসে তিনটা জামা—মূল্য ১৶০ ও চৈত্রমাসে একটি কাপড়—মূল্য ৸৶০।

* শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দিব্যোন্মাদের পর থেকে আর সই করে মাইনে নিতেন না। তিনি বলেছিলেন, 'এই অবস্থার পর আমায় মাইনে সই করাতে ডেকেছিল—যেমন সবাই খাজাঞ্চির কাছে সই করে। আমি বল্লাম—তা আমি পারবো না। আমি তো চাচ্ছি না। তোমাদের ইচ্ছা হয় আর কারুকে দাও।'

দক্ষিণেশ্বর থাকাকালীন শ্রীরামকৃষ্ণের ১২৭১ সালের জমাখরচ খাতার অংশবিশেষ। খাতার হিসাব হৃদয়রাম কর্তৃক লিখিত।

১২৮২ সালের জমাখরচ খাতার অংশবিশেষ। হিসাব হৃদয়রাম কর্তৃক লিখিত।

১২৮৭ সালের জমাখরচ খাতার অংশবিশেষ। খাতার অংশটি কার হাতের লেখা আমাদের জানা নেই।

১২৮৭ সালের জমাখরচ খাতার এই অংশটি হৃদয়রাম কর্তৃক লিখিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও চিকিৎসক : দীর্ঘ বারো বছর ধরে কঠোর তপস্যার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের সুঠাম স্বাস্থ্যের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তার লক্ষণ আলোচ্য সময়ের মধ্যেও স্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ ১২৮৩ সালের হিসাবের খাতায় দেখি ভাদ্রমাসের প্রথম দিকে শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। গরিফা থেকে এক কবিরাজ তাঁকে দেখতে এসেছেন ৪ ভাদ্র। পরদিন এসেছেন কবিরাজ আইকোল। ৬ ভাদ্র এসেছেন আগরপাড়া থেকে কবিরাজ। ১৪ ভাদ্র এসেছেন বীরেশ্বর সেন। এঁরা কেউই পারিশ্রমিক নেননি, শুধুমাত্র যাতায়াতের খরচটুকু নিয়েছেন। আবার ১৯ ও ২২ ভাদ্র আগরপাড়ার কবিরাজ এসেছেন। আর ২৬ ভাদ্র শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে গিয়েছেন আগরপাড়ার কবিরাজের কাছে।

১২৮৬-৮৭ সালে কামারপুকুরে বাসকালে শ্রীরামকৃষ্ণ ম্যালেরিয়ার পুনঃপুনঃ আক্রমণে বিশেষ কষ্ট পেয়েছিলেন। কষ্টের অনুবৃত্তি চলেছিল দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসার পরেও। ২৭ কার্তিক, ১২৮৭ মধু ডাক্তার ও জয়নারায়ণ ডাক্তার ঠাকুরকে দেখেছেন। প্রথম জনের ফি ১ টাকা, দ্বিতীয় জনের ২ টাকা। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য নিয়মিত দুধের ও জিওল মাছের ব্যবস্থা হয়। তাতেও সুবিধা হয় না। ১ ফাল্গুন ডাঃ জয়নারায়ণ সেন দেখতে আসেন। তিনি ডি. গুপ্তর আরকের ব্যবস্থাপত্র দেন। ১॥০ টাকা দিয়ে এক বোতল 'ডি. গুপ্ত' আসে। মনে হয় এই ঔষধে শ্রীরামকৃষ্ণ উপকার বোধ করেন। এর প্রতিধ্বনি শোনা যায় কথামৃতের পাতায়।

এ সময়ে ১২ ফাল্গুন বিখ্যাত জ্যোতিষী অম্বিকাচরণ আচার্য ঠাকুরের কোষ্ঠী বিচার করে দেন। তিনি পারিশ্রমিক নেন ১৲ টাকা। ২৫ ফাল্গুন আসেন মধু ডাক্তার। তাঁকে ভিজিট দিতে হয় ৫৲ টাকা। মনে হয় এর অনতিবিলম্ব পূর্বে মধু ডাক্তার কয়েকদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। সেজন্য তাঁকে একত্রে ৫৲ টাকা দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীমা সারদাদেবী সম্বন্ধে তথ্য : সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বরে তৃতীয়বার উপস্থিত হয়েছিলেন ৫ চৈত্র ১২৮২ (১৭ মার্চ, ১৮৭৬)। স্বামী গম্ভীরানন্দজীর মতে শ্রীমা পরের বছর কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন।[৪] হিসাবের খাতা অনুযায়ী তিনি গিয়েছিলেন ২৪ কার্তিক,১২৮৩।* বাড়ি যাওয়ার প্রসঙ্গে হিসাবের খাতায় লেখা রয়েছে : শ্রীমতী মামী ঠাকুরানীর বাটী যাইবার সময় (হাওড়া থেকে বর্ধমান) ট্রেনভাড়া ২।৴০, (দক্ষিণেশ্বর থেকে হাওড়া) নৌকা ভাড়া ॥০ আট আনা—এর অর্ধেক ।০, বর্ধমান হইতে কামার পুকুর যাইবার গরুর গাড়ির ভাড়া ৪৲ টাকা—এর অর্ধেক ২৲, রাস্তায় খাবার খরচ ১৸০ এক-টাকা বারো আনা, এর অর্ধেক ৸৵০। দেখা যাচ্ছে, শ্রীমা ও তাঁর একজন সঙ্গীর দক্ষিণেশ্বর থেকে কামারপুকুর যেতে খরচ পড়েছিল মোট ১১৲ টাকা এবং শ্রীমায়ের বাবদ খরচ লেখা হয়েছিল ৫॥০ টাকা। প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি থেকে মনে হয় যে শ্রীমায়ের সঙ্গী ছিলেন হৃদয়রামের কনিষ্ঠ ভাই রাজারাম মুখোপাধ্যায়। এইবারেই কামারপুকুরে রামলালের দেনার ১৪৲ টাকা শোধ করে দেবার জন্য তাঁর হাতে টাকা দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর জীবনীর সঙ্গে পরিচিত পাঠকমাত্রেই জানেন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সারদাদেবীর শুভ পরিণয় হয় ১২৬৬ সালের বৈশাখের শেষভাগে। বৈবাহিকের মনস্তুষ্টি ও বাইরের সম্ভ্রমরক্ষা করবার জন্য জমিদার

৪ শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৬৯

* ১২৮৩ সালে ফলহারিণী কালীপূজা হয়েছিল মঙ্গলবার, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৩ ; ইংরেজী ২৩ মে, ১৮৭৬।

লাহাবাবুদের বাড়ি থেকে গহনা চেয়ে এনে বালিকাবধূকে সাজানো হয়েছিল। বিয়ের পর্ব চুকে গেলে ঘুমন্ত বালিকার অঙ্গ থেকে গহনাগুলি খুলে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ জননী চন্দ্রাদেবীকে ফেরত দিয়েছিলেন। বালিকা ঘুম ভাঙার পর গহনার খোঁজ করলে চন্দ্রাদেবী সজলনয়নে তাঁকে কোলে নিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'মা! গদাধর তোমাকে ঐ সকলের অপেক্ষাও উত্তম অলঙ্কার-সকল ইহার পর কত দিবে।'[৫] মনে হয় ঠাকুরের জননীর এই প্রতিশ্রুতির বিষয় ঠাকুরের প্রধান রসদ্দার মথুরানাথ জানতে পেরেছিলেন। মথুরানাথ দেহত্যাগ করেছিলেন ১৬ জুলাই ১৮৭১। শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে প্রথম এসেছিলেন মার্চ ১৮৭২ (চৈত্র ১২৭৮)। শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে আসার পূর্বেই মথুরানাথ শ্রীমায়ের জন্য এক প্রস্থ সোনার গহনা তৈরি করে দিয়েছিলেন। আমরা এই তথ্য পাই হিসাবের খাতা থেকে। পুরনো একটি ফর্দ থেকে হৃদয় এই খাতাতে নকল করে রেখেছিলেন। সেখানে লেখা রয়েছে, 'সন ১২৭১ সালে শ্রীযুক্ত কর্তাবাবু (মথুরানাথ) মহাশয় শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য মহাশয়কে সোনার অলঙ্কার গড়াই আদেশ—তাহার এক ফর্দ থাকে—তাহার নকল।' তারপর রয়েছে অলঙ্কারের বিস্তারিত বিবরণ। ১টি ছড়া ৩।১০ তিন ভরি চারি আনা দুই পাই, গলায় তাবিজ ১ জোড়া ও হার ওজন ৩৸৵০, গন্তী (?) দুইটি ওজন ১।৶১০ পাই; দ্বিতীয় দফায় আরও কিছু গয়না তৈরি হয়, সোনার ওজন ২।৶১০ দুই ভরি সাড়ে ছয় আনা এবং সোনার ফুল ঝুমকো ওজন ১।৶১০ পাই (মূল্য ২২৲) অর্থাৎ ১২॥০ বারো ভরি আট আনা ওজনের সোনার গয়না, যার মূল্য ছিল টাকা ১৭১॥৫। ঠাকুর একবার বলেছিলেন, 'ও সারদা, সাজতে ভালবাসে।' অনুমান করতে পারি শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে আসার পর এই গয়না ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁর জননীর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পেরে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। হিসাবের খাতায় অন্যত্র দেখা যায়, ২২ আশ্বিন ১২৮২ সালে লেখা রয়েছে, 'গলার বাজু শ্রীমতী ছোটমামীর জন্য আনিয়া দেওয়া হইল।' কিন্তু শ্রীমা এসকল গয়না বেশিদিন ব্যবহার করতে পারেননি। একদিন ঠোঁটকাটা গোলাপ-মা উপদেশচ্ছলে বলেছিলেন, 'মা, মনোমোহনের মা বলছিল, "উনি কত বড় ত্যাগী, আর মা এই মাকড়ি-টাকড়ি এত গয়না পরেন, এ ভাল দেখায় কি?"' শ্রীমা সেদিনই হাতে দুগাছি বালা রেখে বাকী সব গয়না খুলে ফেলেছিলেন। পরদিন যোগেন-মা এসে অনেক বুঝিয়ে বলাতে তিনি আরও দু-একখানি গয়না পরলেন. কিন্তু সমস্ত অলংকার আর কোনদিনই পরা হয়নি।[৬] এ-প্রসঙ্গে একটি নথিভুক্ত তথ্য লক্ষ্য করবার মতো। ১২৮৭ সালে ৫ চৈত্র তারিখে লেখা রয়েছে: 'শ্রীমতী ছোটমামীর চাকরাণীর নাকছাবি সারান—১৲' এবং 'শ্রীমতী ছোটমামীর চাকরাণীর রূপোর গয়না—২৲ টাকা।' শ্রীমা শুধু নিজে গয়না ব্যবহার করেননি, তাঁর পরিচারিকাবৃন্দের জন্যও গয়নার ব্যবস্থা করেছিলেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ৩০ অগ্রহায়ণ ১২৮৭ সালে লেখা রয়েছে, 'আলমবাজারে স্যাকরাকে গহনার জন্য দেওয়া হয় ৩৲ তিন টাকা।' আরও একটি তথ্য জানা যায়। ২২ আশ্বিন ১২৮৩ সালে হৃদয় শ্রীমায়ের ব্যবহৃত গয়না থেকে একটা গলার চাপ (?) কিনে নিয়ে ১৪৲ টাকা জমা করেছিলেন হিসাবের খাতায়। অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে হৃদয় গয়নাটি কিনেছিলেন তাঁর পরিবারের জন্য।

৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, ২ খণ্ড, পৃঃ ১৭৭

৬ শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, (১৯৮৯) পৃঃ ১০২-০৩

শ্রীমায়ের জীবনী পাঠ করে জানা যায় তিনি ১২৮৩ সালে প্রধানতঃ দক্ষিণেশ্বরে বাসাবাড়িতে কিছুদিন এবং অন্য সময় নহবতে বাস করেছেন। আর ১২৮৭ সালে প্রধানতঃ তিনি দেশের বাড়িতে ছিলেন। শ্রীমায়ের ছিল খুবই সাদাসিধে জীবন, তাঁর চাহিদা ছিল নগণ্য। ১২৮৩ সালে দেখা যায় জ্যৈষ্ঠমাসে ।৵০ আনা মূল্যে একটি শাড়ি কিনেছেন। একবার ৵১০ মূল্যের সিঁদুর, ⁄৫ মূল্যের কাজই (?), ।⁄০ মূল্যের বাক্স কিনেছিলেন। ১২৮৩ সালের কার্তিক মাসে দেশে যাওয়ার সময় ।⁄০ আনা মূল্যের এক বোতল নারকেল তেল কিনেছিলেন। আর দেখা যায় ১২৮৭ সালে দক্ষিণেশ্বর থেকে একজোড়া শাড়ি দেশে পাঠানো হয়েছিল তাঁর জন্য। দক্ষিণেশ্বরে কখনও বা নিজের হাতখরচের জন্য নিয়েছেন ।০ আনা পয়সা।

দক্ষিণেশ্বরের বাসাবাড়ি সংক্রান্ত তথ্য ঃ দক্ষিণেশ্বরে 'রামলাল-দাদাদে'র বাড়ির পাশে ঠাকুরের দ্বিতীয় রসদ্দার শম্ভুনাথ মল্লিক এক খণ্ড জমি ২৫০৲ টাকা মূল্যে মৌরসী করে নিয়েছিলেন। বিশ্বনাথ উপাধ্যায় প্রয়োজনীয় কাঠ সরবরাহ করেছিলেন। একটি চালা ঘর গড়ে ওঠে। স্বামী গম্ভীরানন্দজীর মতে এই বাটী নির্মিত হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে।[৭] বাটী নির্মিত হলে শ্রীমা এই বাসাবাড়িতে উঠে যান। হিসাবের খাতা থেকে দেখি ২২ বৈশাখ ১২৮৩ সালে স্বস্ত্যয়ন করা হয়েছে, পুরোহিতকে দেওয়া হয়েছে ।০ আনা। ৩১ জ্যৈষ্ঠ রামতেলির কাছ থেকে ৩।০ টাকা দিয়ে একটি তক্তাপোষ কেনা হয়েছে। ঘরের কাজে সাহায্য করবার জন্য ও শ্রীমায়ের কাছে থাকবার জন্য মাসিক ১৲ টাকা বেতনে একটি চাকরানী নিযুক্ত করা হয়। তার নাম 'কালীর মা'। কিছুদিনের জন্য লক্ষ্মীদি এসে বাস করেন। হৃদয়ের পরিবারও এখানে বাস করতে থাকেন। জমির মালিক নবীনচন্দ্র ঘোষকে প্রথমে মাসে ।০ আনা করে এবং পরে প্রতি চারমাসে ১।৵০ করে খাজনা দিতে হয়েছে। ১২৮৭ সালে জ্যৈষ্ঠমাসে বিচালি দিয়ে বাসাবাটীর ছাদ মেরামত করা হয়, খরচ পড়ে ৩⁄০ আনা। মেরামত ভাল হয় না। আবার ফাল্গুন মাসে ভাল করে মেরামত করাতে হয়, এবং মোট খরচ পড়ে ১০।⁄১৫ পয়সা। মাঝে মাঝে বাজার* করা হত, তার জন্য বরাদ্দ ছিল ।৵০; তাছাড়াও কখনও কখনও ⁄০ বা ⁄১০ মূল্যের মাছ কেনা হত। কদাচিৎ আলু কেনা হত। প্রায়ই মিছরি কেনা হত। কখনও সাবুদানা কেনা হত। দুধ সরবরাহ করত কালীপদ গোয়ালা বা তার মা। এর জন্য মাসিক খরচ ছিল ৸০। ২৩ কার্তিক, ১২৮৩ সালে দেখা যাচ্ছে, বাজার খরচ হয়েছে মোট ১১, এবং তার অর্ধেক ৫।০ লেখা হয়েছে চাটুজ্যে পরিবারের নামে। হৃদয় নিজে বাজার করেছিলেন। মনে হয় সে সময়ে হৃদয়ের পরিবার এসে বাসা বাড়িতে উঠেছিলেন। সেকারণেই এই বাড়তি খরচ। সাধারণতঃ বাজার করত পরিচারিকা 'কালীর মা' নতুবা ঠাকুরবাড়ির জনৈক কর্মচারী গুপী।

অবশ্য, শ্রীমা এই বাসাবাড়িতে বেশিদিন বাস করতে পারেননি। তিনি নিজমুখে বলেছেন, 'দু-তিনবার (দক্ষিণেশ্বরে) আসবার পর শম্ভুবাবু (বাড়ি) করালেন।…ঘরে কিছুদিন রইলুম। …পরে কাশীর একটি প্রাচীন মেয়ে আমাকে বলে ও-বাড়ি থেকে নবতের ঘরে আনালে; তখন

৭ শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৭৯ পাদটীকা

* সেকালে দেওয়ান দাতারাম স্নানের ঘাটের নিকটেই ছিল একটি ছোট বাজার। বড় একটি বাজার ছিল দক্ষিণেশ্বরের দোলপিঁড়িতে। এর চাইতে বড় বাজার ছিল আলমবাজারে।

ঠাকুরের অসুখ, সেবার কষ্ট হচ্ছে।' শ্রীমা নহবতখানাতে উঠে গেলেও বাসাবাড়িতে হৃদয়ের পরিবার বাস করতে থাকে। কিন্তু দেখা যায় ১২৮৭ সালে কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ, এই তিন মাস হরি সানাইদার সেখানে বাস করছে এবং প্রতিমাসে ১৵০ আনা করে বাড়িভাড়া দিচ্ছে।

দক্ষিণেশ্বরে চাটুজ্যে পরিবারের অন্যান্য তথ্যঃ আলোচ্যকালে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভিন্ন চাটুজ্যে পরিবারের লোকজনের মধ্যে (শ্রীরামকৃষ্ণ থাকতেন নিজের ঘরে পুরনো বিষ্ণু মন্দিরের ভাঁড়ার ঘরে) মহিলারা থাকতেন নহবত ঘরে, নিকট-জন মেয়ে-পুরুষেরা বাসাবাড়িতে ও অপর পুরুষেরা ঠাকুরের ঘরে বা বারান্দায় বাস করতেন। কামারপুকুর থেকে লোকজনের যাওয়া-আসা লেগেই ছিল। এদের ভোজনাদি সাধারণতঃ নির্ভর করত ঠাকুরবাড়ির প্রসাদের উপর। আর পেটরোগা ঠাকুরের জন্য শ্রীমা নিয়মিত ঝোলভাত রান্না করে দিতেন।

ঠাকুর ও শ্রীমা ব্যতিরিক্ত পরিবারের অন্যান্য লোকজনের আলোচ্য সময়ে খরচের মধ্যে উল্লেখযোগ্যঃ রামলালের একটা তোষক ১।৵১৫, তাঁর জন্য একটি ধুতি ।৵৫, আবার একটা ধুতি ॥১০, জামা একখানা ।৵১০, রেপার (গরম চাদর) ৩।৵০, জুতা ১।৶০, লক্ষ্মীর জন্য একটা শাড়ি একবার ॥৵০, আরেকবার ১।৶০, শিবুর জন্য কাপড় ১ জোড়া ৸০, মেজমামী (রামেশ্বরের স্ত্রী)-র জন্য শাড়ি ॥৵০ ইত্যাদি।

শ্রীমাকে সাহায্য করবার জন্য বরাবর একজন ঝি-এর ব্যবস্থা ছিল। পূর্বে ছিল 'কালীর মা'। ১২৮৭ সালে এবং তারপরে বৃন্দে ঝি মাসিক ১৲ টাকা[৮] বেতন ও খাওয়া-থাকার চুক্তিতে কাজ করতে থাকে। কৃষ্ণদাস নামে একজন মেথর মনে হয় বাসাবাড়ির জন্য নিযুক্ত হয়েছিল। সে প্রতিমাসে পেত /০ এক আনা। তারাপদ ধোপাকে বছরের প্রথমদিকে ১৲ টাকা দাদন দেওয়া হত। সারা বছর কিছু কিছু কাপড় কেচে সে তা শোধ করত।

চন্দ্রমণিদেবী বা চন্দ্রাদেবী দক্ষিণেশ্বরে নহবতের দোতলায় বাস করতেন। প্রচলিত ধারণা যে চন্দ্রাদেবীর গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছিল ১২৮২ (ইং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে) সালে।[৯] কিন্তু ১২৮৩ সালের হিসাবে দেখতে পাই 'শ্রীযুক্ত মহাশয়ের মাতার' অর্থাৎ চন্দ্রাদেবীর জন্য কাপড় খরিদ করা হয় ॥৵০ মূল্যে। তারিখ ৩১ ভাদ্র ১৮৮৩। তাছাড়া হিসাবের কাগজ পত্র দেখে আমরা নিশ্চিত যে, তাঁর গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছিল ৩ ফাল্গুন ১২৮৩ (১৩ ফেব্রুআরি ১৮৭৭*)। লীলাপ্রসঙ্গসূত্রে জানা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের নিয়োগে ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল বৃদ্ধার দেহের সৎকার করেন। আড়িয়াদহ শ্মশানে সৎকার করা হয়।** শবদেহ বহনের

৮ ১২৮৭ সালে দেখা যায় কয়েকমাস যাবৎ প্রতিমাসে কোন ভক্ত, বৃন্দে ঝির মাসিক বেতনের খরচ বহন করছিলেন।

৯ স্বামী সারদানন্দের মতে ১২৮২ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি দিবসে। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের মতে ১৬ ফাল্গুন। ১২৮২ (ইং ২৭ ফেব্রুআরি, ১৮৭৬)

* এবছর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পড়েছিল বৃহস্পতিবার, ৫ ফাল্গুন, ১২৮৩; ইংরেজী ১৫ ফেব্রুআরি ১৮৭৭।

** তথ্যানুসন্ধানে জানা যায় যে বর্তমান WIMCO কোম্পানী ও পূর্বেকার সরকারী বারুদাগারের উত্তরে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ান দাতারাম মণ্ডল যে স্নানের ঘাট তৈরি করেছিলেন তার কাছেই ছিল দক্ষিণেশ্বরের শ্মশানঘাট ও 'শ্মশানেশ্বর শিব।' পরবর্তীকালে শ্মশানঘাট সেখান থেকে উঠে যায়। প্রয়াত ৺চন্দ্রাদেবীর সৎকার নিকটবর্তী এই শ্মশানঘাটে না করে দূরের আড়িয়াদহ শ্মশানঘাটে কেন করা হয়েছিল তা জানা যায় না।

জন্য ৷৹ আনা মূল্যের খাট কেনা হয়েছিল। মৃত-দেহ সৎকারের জন্য ব্যয় হয়েছিল ৩৬১৫ পয়সা। লীলাপ্রসঙ্গসূত্রে আরও জানা যায় যে, অশৌচ উত্তীর্ণ হলে রামলাল বৃষোৎসর্গ করে ৺চন্দ্রা'দেবীর শ্রাদ্ধক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন করেছিলেন। শ্রাদ্ধ, ভোজনাদি, অগ্রদানি বিদায়[১০] ইত্যাদির জন্য হিসাবের খাতায় দেখতে পাই মোট ৩৬৷৵১০ টাকার খরচ। অতঃপর ১২৮১ সালের ১২ অগ্রহায়ণে লেখা রয়েছে '৺পিতামহীর কাজের দরুন, ১০ আনা।' এটাও মনে হয় ৺চন্দ্রাদেবীর উদ্দেশে অর্পিত। এ-প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য পাই রামলালের হাতের লেখাতে। তিনি ১১ ফাল্গুন, ১২৮১ সালে লিখেছেন 'শ্রীশ্রীঠাকুর-মাতার শ্রাদ্ধের ভিক্ষা পাওয়া হয় শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারিকানাথ বিশ্বাস জমিদার মহাশয়ের কাছ থেকে ২৫৲; এবং গাড়িভাড়া—১৲।' স্বাভাবিক কারণেই মনে হয়, জানবাজারের বাড়িতে গিয়ে কর্তা দ্বারিকানাথের কাছ থেকে 'ধার আছে' ইত্যাদি বলে রামলাল এই টাকা আদায় করেছেন। এমনকি তাঁর যাতায়াতের গাড়িভাড়া ১৲ টাকাও আদায় করেছেন।

২৭ অগ্রহায়ণ, ১২৮০ সালের অগ্রহায়ণ সপ্তমী তিথিতে (ইং ১১ ডিসেম্বর, ১৮৭৩) রাম-লালের[১১] পিতা ৺রামেশ্বর পরলোকগমন করে-ছিলেন। ৮ পৌষ ১২৮৩ রামলাল বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধ করেন, খরচা হয় ৷৵৹ আনা; এবং ৯ পৌষ ১২৮১ তারিখে তিনি পিতৃশ্রাদ্ধ করেন, খরচা হয় ।৵১০ পয়সা।

১২৮৩ সালের হিসাবের মধ্যে পাই একটি তথ্য: '১৩ আশ্বিন: বিজয়া দিবস শ্রীযুক্ত মহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধ দিবস—খরিদ ১৲।' আমরা জানি শ্রীযুক্ত ৺ক্ষুদিরাম পরলোকগমন করেছিলেন ১২৪৯ সালের বিজয়াদশমীর দিন। অনুমান করতে পারি শ্রীরামকৃষ্ণের নিয়োগে রামলালই এই শ্রাদ্ধের দায়িত্ব পালন করেন।

রামেশ্বরের পরলোকগমনের (তারিখ ২৭ অগ্রহায়ণ, ১২৮০) কিছু পরেই রামলাল দক্ষিণেশ্বরে পূজক নিযুক্ত হয়েছিলেন। কামার-পুকুরের সংসার সামাল দেবার জন্য তাঁকে যখন অনুপস্থিত থাকতে হত তাঁর স্থলে কাজ করতেন দীননাথ চট্টোপাধ্যায়। দীননাথ জ্ঞাতি সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইপো। তিনি অল্পবয়সে ভাদ্র, ১২৮৩ সালে মারা যান। তাঁর স্থলে নিযুক্ত হন অধর মুখোপাধ্যায়। এদের দুজনে প্রত্যেকে খাইখরচ ছাড়া মাসে বেতন পেতেন ২৲ টাকা করে। তাছাড়াও হিসাবের খাতা থেকে দেখা যায় কখনও বা কেনা ভট্টাচার্য মাসিক ২৲ টাকা বেতনে পূজার কাজ করছেন। স্ত্রী অম্বিকাদেবী সহ তিনি দক্ষিণেশ্বরে বাস করতেন। কখনও বা রামবিষ্ণু চট্টোপাধ্যায় বা হৃদয় বন্দ্যোপাধ্যায় সাময়িকভাবে বদলির কাজ করেছেন। বলা বাহুল্য, ও-সকল খরচা বহন করত চাটুজ্যে পরিবার।

আমরা পূর্বেই বলেছি এই পরিবারের আয়ের উৎস ছিল মাসের বেতন ও বস্ত্র-বাবদ সামান্য কিছু অর্থ, পূজার বস্ত্রাদি থালা ঘটি বিক্রি করে কিছু অর্থ, রামলালের বিভিন্ন জায়গায় বিদায়-আদায় ও ভোজনদক্ষিণা, বিশেষ বিশেষ দিনে মন্দিরের প্রণামীর সামান্য অংশ, 'শ্রীমতী কর্তৃরানী মাতা' (জগদম্বা দাসী) নানা উপলক্ষে রামলাল প্রমুখ কর্মচারীদের প্রদত্ত "আশীষ"। পূজা ও দানাদিতে প্রাপ্ত অঙ্গুরীয়, কদকা, চম্পক ইত্যাদি

১০ মৃত্যুর পর চতুর্থ দিনে প্রেতের উদ্দেশে প্রদত্ত দান।

১১ রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের জন্মতারিখ ৭ বৈশাখ ১২৬৭ (১৮ এপ্রিল, ১৮৬০)। পিতার মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স মাত্র সাড়ে তেরো।

সামগ্রী কয়েক বছরে জমা করে বিক্রি করা হত। ১২৮১ থেকে ১২৮৭ এই কয়েক বছরের দ্রব্যাদি কিনে নিয়েছিলেন হৃদয়। তাছাড়া, রামলাল জনা চারেক ব্যক্তিকে কিছু টাকা ধার দিয়ে সুদ আদায় করতেন। কদাচিৎ শ্রীরামকৃষ্ণকেও কেউ প্রণামী দিতেন যেমন যদুলাল মল্লিক একদিন দক্ষিণেশ্বরে ১৲ প্রণামী দিয়েছেন, একদিন কলকাতায় তাঁর বাড়িতে ২৲ টাকা প্রণামী দিয়েছেন, একদিন শম্ভুচরণ মল্লিক দিয়েছেন ২৲ টাকা, 'শ্রীমতী কর্তৃরাণী' দক্ষিণেশ্বরে ১৲ টাকা দিয়ে প্রণাম করেছেন। মনোমোহন মিত্রের স্ত্রী দক্ষিণেশ্বরে ১৲ টাকা দিয়ে প্রণাম করেছেন। খরচের দিকে বিভিন্ন জনের জামা কাপড়, বিছানাপত্র, বাসনকোসন, যাতায়াতের খরচ, ঝি-চাকর ও বদলি পুরোহিতের বেতন, দক্ষিণেশ্বরের ও কামারপুকুরের সংসারের খরচপত্র ছিল। তাছাড়াও বেশ কিছু খরচ হত ঠাকুরের চিকিৎসা ও পথ্যের জন্য। কিছু খরচ হত লৌকিকতার জন্য। যেমন ১৫ পৌষ ১২৮৭ সালে বিশ্বনাথ উপাধ্যায় সপরিবারে দক্ষিণেশ্বরে এলে দোকান* থেকে ॥/০ খাবার কিনে এনে তাঁদের আপ্যায়ন করা হয়।

দেশের বাড়ি সম্বন্ধে তথ্য: কামারপুকুরের সংসারের অভাব দূর করবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে ও শিহড়ে কিছু জমি কেনার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং কিছু পরিমাণ জমি ৺রঘুবীরের নামে দেবোত্তর করে দিয়েছিলেন। কামারপুকুরে ডোমপাড়ায় দেড় বিঘা জমি ক্রয় করেছিলেন গঙ্গাবিষ্ণুর সাহায্যে।[১২] এবং শিহড়ে জমি ক্রয় করেছিলেন হৃদয়রামের সাহায্যে। হিসাবের খাতা থেকে জানা যায় শিহড়ে তিন খণ্ড জমির মোট পরিমাণ ছিল ১৮ বিঘা। ১২৮৭ সালে শিহড়ের জমির জন্য খাজনা দিতে হয়েছিল ৭৷৵০ আনা। শ্রীরামকৃষ্ণ পালকিতে করে গোঘাট সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে বলেছিলেন পরবর্তিকালে, 'রঘুবীরের নামের জমি ওদেশে রেজেস্ট্রি করতে গিছলাম। আমার সই করতে বললে, আমি সই করলুম না। আমার জমি বলে তো বোধ নাই। কেশব সেনের গুরু বলে খুব আদর করেছিল। আম এনে দিলে—তা বাড়ি নিয়ে যাবার যো নাই। সন্ন্যাসীর সঞ্চয় করতে নেই।'[১৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৭৬ থেকে পর পর তিনবছর দেশে গিয়েছিলেন। মাস্টার মশায়ের ডায়েরী থেকে পাই যে প্রথমবারে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরামের পৈতের সময় উপস্থিত ছিলেন। শিবরামের জন্ম ৩০ মার্চ, ১৮৬৬; এ-যাত্রায় তিনি কামারপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করেছিলেন ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬।

১২৮৩ সালে কামারপুকুরের সংসারের জন্য প্রতিমাসে ৩৲ টাকা করে পাঠানো হত। ১২৮৭ সালে পাঠানো হত প্রতিমাসে ২৲ টাকা করে। রামলাল, রাজারাম, রামধন, অখিলচন্দ্র, গঙ্গাবিষ্ণু, মঙ্গলাময় রানী ইত্যাদির হাতে পাঠানো হত। কখনও বা রেজিস্ট্রি করে গঙ্গাবিষ্ণুকে পাঠানো হত। তাছাড়াও কখনও কখনও জিনিসপত্র কিনে পাঠানো হত, কাপড়-চোপড় পাঠানো হত। ১২৮২ ও ১২৮৩ সালে জমির খাজনা দিতে হয়েছিল যথাক্রমে ৭৲ ও ৭।/০। ১২৮৭ সালে কিন্তু খাজনা দিতে হয়েছিল মাত্র ৫৲ টাকা। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, কিছু পরিমাণ জমি কি ইতিমধ্যে বিক্রি হয়ে

* তদানীন্তন কালে দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্তী জনপ্রিয় মিষ্টির দোকান ছিল আলমবাজারের পরাণ ময়রা ও যদু ময়রার দোকান।

১২ ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য: ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃঃ ২৭৬

১৩ কথামৃত, ৪।১।৩

গিয়েছিল ? ঘরদোর মেরামতের জন্য যা প্রয়োজন হত তাও যেত দক্ষিণেশ্বর থেকে। তাছাড়াও অন্যান্য খরচ, যেমন ২০ ফাল্গুন ১২৮৩ সালে রামলালের দেনা শোধের জন্য ৩৫৲ টাকা পাঠানো হয়েছে। তাছাড়াও গঙ্গাবিষ্ণু লাহার নিকট ১২৮৭ সালে ১০০৲ টাকা জমা রাখা হয়েছিল—খুব সম্ভবতঃ জমি কেনার জন্য।

তদানীন্তন বাজার দর : হিসাবের খাতা থেকে দক্ষিণেশ্বর অঞ্চলের তদানীন্তন বাজার দর সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারে। যেমন, আতপ চাল প্রতি মণ ১া০, গরুর দুধ টাকায় ১৫৷৷০ সের, মিছরি প্রতি সের ।৶০, সাবুদানা প্রতি সের—।০ আনা। ১২৭১ সালের সোনার দর ছিল ভরি প্রতি ১৩৶০ আনা, ১২৮৭ সালে ১৪৲ টাকা।

জামাকাপড় ইত্যাদির দর : মোটামুটি ভাল ধুতি ৸৶০ আনা, তেলধুতি ।৵১০ পয়সা মাঝারি শাড়ি ১৷৶০ আনা, সাধারণ গরম চাদর ৩।৵০ আনা, জুতো ১ জোড়া ১৷৶০ আনা, ছাতা ১৲ টাকা, ভাল গামছা ৶১০ পয়সা, চিরুনি ৵০ আনা, আয়না—৵৫ পয়সা, ১ বোতল নারকেল তেল—।৵০ আনা।

ঘরামির ১ দিনের মজুরি ।৶০, আনা, দক্ষিণেশ্বর থেকে বাগবাজার রিজার্ভ নৌকার ভাড়া ৵০ আনা, চাবিতালা ৵১০ পয়সা, একটা কাচের গেলাস ।৵০ আনা, দেশলাই ১টি ৵১০ পয়সা, 'ডি. গুপ্ত' মিক্সচার ১ বোতল ১৷০ আনা।

নতুন চরিত্রের সমাবেশ : হিসাবের পাতায় পাতায় দেখা দিয়েছে বেশ কয়েকটি চরিত্র যাদের পরিচয় আমরা প্রচলিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে পাই না। কামারপুকুর বা ঐ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে দেখতে পাই অখিলচন্দ্র, রামময় মুদী, ঈশ্বর চট্টোপাধ্যায়, গণেশ পাইন, রাম পাইন, মঙ্গলাময় রানী, বামাপদবাবু, কৈলাসের মা। সম্ভবতঃ রামবিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়/ভট্টাচার্য, কেশব ভট্টাচার্য, হৃদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতারক বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদার ভট্টাচার্যও ঐ অঞ্চলের লোক।

দক্ষিণেশ্বর অঞ্চলের মানুষের মধ্যে দেখতে পাই বিচালি বিক্রেতা রামসদন, পুরনো বাসন-পত্রের ক্রেতা সীতারাম, হরি সানাইদার, মেথর কৃষ্ণদাস, গোয়ালা কালীপদ, গোয়ালা মণীন্দ্র, তারাপদ ধোপা, মন্দিরের কর্মচারী পীতাম্বর, ভাণ্ডারি, কেনা ভট্টাচার্য ও অম্বিকা দেবী, তারাচাঁদ ঘোষাল, মণিময় খোট্টা, জমির মালিক নবীনচন্দ্র ঘোষ, নটবর পাঁজা, জনি বুড়ি ইত্যাদি।

দেখা গেল, আলোচ্য হিসাবের খাতাখানি নানাকারণেই গুরুত্বপূর্ণ। এ খাতায় খুব সু-বিন্যস্ত নির্ভুল হিসাবপত্র পাওয়া যায় না বটে কিন্তু অতি সাধারণভাবে হিসাব রাখার ফলেই এই খাতার মধ্যে নথিভুক্ত হয়েছে হিসাবের জন্য প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় অনেক তথ্য। সে সকল তথ্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-ইতিহাসের মূল্যবান সামগ্রী। এ-সকল তথ্যের আলোকে ১২৮৩ ও ১২৮৭ সাল, এ-দুটি বছরের শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ চিত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এবং এই চিত্রের সাহায্যে নিকটবর্তী বছরগুলির রামকৃষ্ণজীবনকেন্দ্রিক ইতিবৃত্ত স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। নিঃসন্দেহে, এ সকল তথ্যোদ্ভাস জীবনী পাঠকদের ও ভবিষ্যতের গবেষকদের নিকট মূল্যবান উপাদান, অবতারলীলার রসাস্বাদনেচ্ছু ভক্তজনের পক্ষে দুর্লভ সম্পদ।

মটরু

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

মেঘ দেখিলে যে কৃষ্ণকে মনে পড়িবে এমন শুভ সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই। কিন্তু অল্প দাড়িওয়ালা নধরকান্তি ছাগশিশু দেখিলে মটরুকে চকিতে যে মনে পড়িয়া যায় তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। সদাশিবের নন্দীর মতো, প্রতাপসিংহের চৈতকের মতো প্রায় চুরাশি বৎসর পূর্বে বেলুড় মঠের গঙ্গাতীরের ময়দানে বিচরণকারী—আচার্য বিবেকানন্দের বড় আদরের—সেই মটরু। এক এক জন বিরাট ঐতিহাসিক পুরুষের নামের সঙ্গে এক একটা সৌভাগ্যবান জানোয়ারের স্মৃতির এইরূপ নিবিড় সম্বন্ধ, বোধ করি, ইতিহাস ও জীবনীতে অনেকটা কাব্য ও নাটকের ভঙ্গী লইয়া আসে—পাঠকের একঘেয়েমি-ক্লিষ্ট মনে উহা কথঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দতা বহন করিয়া আনে।

পাহাড়ের কর্মহীন দুপুরগুলাতে নেপালীদের ছাগলটি তাই অলস মনটাকে বেশ কাব্যিক দোল দিয়া খুসি রাখিত। সকল প্রাণীর মধ্যে নির্বুদ্ধিতার কলঙ্ক হউক তাহার সবচেয়ে বেশি, তবুও তাহাকে দেখিতে, আদর করিতে বেশ লাগিত। যুগান্তরকারী একাধিক ধর্মাচার্যের কীর্তিকলাপের সহিত তাহারও নাম যে সোনার অক্ষরে লেখা হইয়া গিয়াছে! বুদ্ধ কাহার জন্য প্রাণ দিতে চাহিয়াছিলেন? খ্রীষ্টের কোলে কাহার সজাতীয় মূর্তি? আর—বিবেকানন্দ-পন্থী আমরা—আমাদের বিবেকানন্দ তাহাকে কত ভালবাসিতেন, মনে নাই? আমি তো তাই ছাগলটিকে একান্ত ভালবাসিয়া ফেলিলাম। আদিম মটরুকে ভাবিয়া ইহারও নাম দিলাম মটরু। আধ্যাত্মিক দৃষ্টি হানিয়া তাহাকে দেখিতাম। বৈষ্ণবের তুলসীর মতো, কাপালিকের ত্রিশূলের মতো, লিঙ্গায়েতের বক্ষবিলাসী প্রস্তরলিঙ্গের মতো মটরুও আমার কল্পনার একটি তীর্থাস্পদ বস্তু হইয়া বিলাস করিতে লাগিল।

সাময়িক নেপালী জাতির রূঢ় সংসারে মটরুর উপর ছোটখাটো নানা নির্যাতন দেখিয়া আমার বাঙালী বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে বড় কষ্ট হইত। হিড়হিড় করিয়া তাহাকে ট্রলির মতো টানিয়া উহাদের দুশমন চাকরটা দুইশত ফিট উপরকার ঘাসের ঢালু জমিটিতে উঠাইত—কথায় কথায় চাপড় মারিত—অকারণ শাসাইত। কখনও কখনও দেখিতাম তাহার দিকে চাহিয়া, তাহার পেট টিপিয়া নেপালী পরিবার ফিসফিস করিয়া কি মন্ত্রণা করিতেছে। আমাদের বাড়ির একজন বলিলেন, বোধ হয় তাহারা উহাকে কাটিবে। কাটিবে! ইহাও কি সম্ভব? আমার কল্পনা তখন বাস্তব ভুলিয়া গিয়াছে—ছাগল এবং আমিষাশী মানুষের কি সম্বন্ধ তাহা জোর করিয়া মনে পড়াইতেছে না। তাই শিহরিয়া উঠিলাম।

একদিন সত্যই নেপালীদের বাড়ির উঠানে অস্বাভাবিক একটা সোরগোল শোনা গেল। উঠানটি আমাদের উপরকার ঘরের জানলা হইতে বেশ দেখা যায়। দেখিলাম রং-বেরং চেহারায় ছোট বড় অনেকগুলি নরনারীর সমাগম হইয়াছে। একপাশে একটা কেরোসিনের টিনে জল ফুটিতেছে—জলের রঙ ঘোলাটে সাদা সাদা। আমাদের একজন বলিলেন, পাহাড়ীরা জলে চুন আর কি কি ছাড়িয়া দিয়া ফুটাইয়া লয়—ঐ জল মৃত পশুর চামড়া হইতে লোম উঠাইতে ব্যবহার করে। উঠানের এক কোণে একটা আগুন জ্বলিতেছে—আর এক কোণ ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। সব আয়োজনই আজ মটরুর অন্তিম ফাঁড়ার ইঙ্গিত করিতেছে।

কিন্তু লোকগুলির যেন কোন তাড়া নাই।

বিড়ি খাইতেছে, গল্প করিতেছে, হাস্যপরিহাসে ছোট্ট বাড়িটা মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। কাজের কাজ কখন হইবে, তাহাদের যেন কোন হুঁস নাই। দুশমন চাকরটা কেবল গম্ভীর—উঠানের এক কোণে পায়চারি করিতেছে—কি যেন একটা ভাবী কীর্তির অনাগত গৌরবের স্বপ্নে সে আজ বিভোর!

মটরু আজ উঠানে বাঁধা নাই—ঘরের মধ্যে ছোলা ও ঘাস খাইতেছে। ক্রমে জল তৈয়ার হইল—আগুনটা গন্‌গন্ করিতে লাগিল—লোক-গুলো দাঁড়াইয়া উঠিল। এইবার দুইজনে উঠানের পরিষ্কার কোণটিতে মটরুকে লইয়া আসিল। এমন বীরভঙ্গিতে সে দাঁড়াইতে পারে, ভাবি নাই। একটুও কম্প নাই, একটুও চাঞ্চল্য নাই। মানুষের নিষ্ঠুরতাকে সে থোড়াই গ্রাহ্য করে যেন। ঘাড়টি ঈষৎ বাঁকাইয়া ভূমিনত দৃষ্টি রাখিয়াছে—জীবন মরণ দুইটারই উপর একটা উদাসীনতা দুইচোখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

একজন তাহার ঘাড় ধরিয়াছে—আর একজন পিছু। অপর একজন মাথার দিকে একটা হাঁড়ি লইয়া বসিয়া আছে। দুশমনটা ছুটিয়া আসিল—সামরিক কায়দায় চকিতে খাপ হইতে কুকরীটা টানিয়া বাহির করিল—তারপরে এক সেকেণ্ডে কী একটা ব্যাপার হইয়া গেল। এক মটরু দুই হইয়া গিয়াছে—মাথাটা ঐ যে লুটাইতেছে—মস্তকহীন ঘাড়টাকে একজন হাঁড়ির মধ্যে গুঁজিয়া ধরিয়াছে—সমস্ত রক্তটা যেন তার মধ্যে জমে। ধড়টা কাঁপিতেছে। মটরু যেন এখনও বাঁচিতে চায়—ছুটিতে চায়—পলাইতে চায়—প্রাণের স্পন্দন এখনও থামে নাই। কাটা মাথাটা কিন্তু স্থির হইয়া গিয়াছে। দুইটি লোক তাড়াতাড়ি উহা গন্‌গনে আগুনের উপর বসাইয়া দিতেছে।

ধড় হইতে রক্তস্রাব ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। ঘাতকগণ উঠানে উহা শোয়াইয়া দিল। উহাকে আর মটরু বলিতে পারি না। এমন কোন স্পন্দন উহাতে দেখিতেছি না যাহা জীবিত মটরুতে দেখিতাম। মটরু মরিয়াছে।

কিন্তু এখনও অশ্রুসিক্ত নয়নে ঐ শ্মশানের দিকে চাহিয়া বলিতেছি—মটরুর মুণ্ডু উনুনে পুড়িতেছে, মটরুর গায়ের লোম ছাড়াইতেছে—মটরু ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, কিন্তু এখনও একেবারে নয়নের আড়ালে যায় নাই। মটরুর খণ্ডীকৃত অঙ্গগুলা মটরুরই ত বটে।

ঘণ্টাখানেক পরে মটরুকে আর চেনা যায় না। চর্ম নাই, লোম নাই, মুণ্ডু নাই, মটরু এখন শুধু এক মাংসের তাল, টুকরা টুকরা করিয়া কাটা। ইহাকে মটরু বলিতে ভয় হয়।

দুই

সে মাংসের তালও আর নাই। মটরুর সকল চিহ্ন পৃথিবীর বুক হইতে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। ছান্দোগ্যের বুড়া ঋষি মাথা নাড়িয়া বলিতেছেন—"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" মটরু একটা কথার কথা মাত্র। বাস্তবতা তাহাতে কিছু নাই—কোন দিন ছিল না। অসম্ভব নয়! চোখের সামনে হইতে অমন জল-জ্যান্ত বস্তুটা নইলে মহাশূন্যে কি করিয়া অকস্মাৎ লোপ পাইল? মটরু নামটি মাত্র এখন আমার কানে বাজিতেছে,—দুইদিন পরে তাহাও হয়তো বাজিবে না। আব্‌ছা আব্‌ছা তাহার চেহারাটা মানস চোখে ভাসিতেছে। আরও দুই চার দিন, বড় জোর আমি যতদিন বাঁচিব ততদিন হয়তো ভাসিবে, কিন্তু তারপর? তাহার নিরেট দেহটার মতো তাহার নাম এবং আকৃতিরও এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও একটু স্থান হইবে না। একেবারে মহানির্বাণ! মহাকাল ও মহাব্যোমের যদি চেতনা থাকে, তবে তাহারা হয়তো মহাশূন্যের প্রশ্নে একান্ত অনিচ্ছায় সাক্ষ্য দিবে—হাঁ হাঁ, ছিল মনে পড়ে—মটরু নামে একটা আকৃতি—সমুদ্রের

বুদ্‌বুদের মতো বিদ্যুৎঝলকানির নিমেষার্ধ সময়ে বুড়বুড় করিয়া উঠিয়াছিল আমাদের সীমাহীন বুকে। কিন্তু তাহার জন্য এত মাথাব্যথা কেন বল তো? ঐ রকম অর্বুদ অর্বুদ মটরু তো সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে হাজির হইতেছে—অদৃশ্য হইতেছে—কে তাহার হিসাব রাখে?

হায়রে মটরু, তুই যদি জানিতিস্ এই সংসারটা এত নির্দয়, সে তোকেই শুধু আচম্বিতে নিষ্ঠুরভাবে গ্রাস করিল না, তোর স্মৃতিটুকুকে পর্যন্ত কঠোর হস্তে নিঃশেষে বিসর্জন দিতে পারিল—তাহলে তুই কি এই কৃতঘ্ন সংসারকে বিন্দুমাত্র ভালবাসিতে পারিতিস্? এই সংসারের দেওয়া ছোলাপানি তুই কি সরোষে ছুড়িয়া ফেলিতিস্ না? ইহার আকাশ-বাতাস, ইহার সবুজ ঘাসের মাঠ, ইহার ফল-ফুল-সৌন্দর্য সকলই তোর কাছে কি শত্রুর মতো মনে হইত না? তুই কি এই কঠিন পৃথিবীর বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে কোনদিন এতটুকু সন্দেহ করিস্ নাই? তাই অন্তরের অকৃত্রিম ভালবাসা এই পৃথিবীকে অর্পণ করিয়া শপথ করিয়াছিলি—"বসুন্ধরে, অনন্তকালের জন্য তোমার সঙ্গে মিতালি পাতাইলাম।" কিন্তু বসুন্ধরা সে শপথের মর্যাদা রক্ষা করিল না। ঘুস খাইয়া মহাকালের হাতে তোকে সমর্পণ করিল। তোর সর্বনাশ ঘটাইল।

* * *

মটরুর জীবনের করুণ ট্র্যাজিডি সে বিশ্বের সকল প্রাণীর মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছে। মশা, মাছি, কেঁচো, ব্যাঙ হইতে আরম্ভ করিয়া গরু, ভেড়া, শেয়াল, কুকুর, বাঘ, ভালুক, বনের মানুষ পর্যন্ত সকলই আজ নেপালীদের দুশমন চাকরটার ঝকঝকে কুকরী দেখিয়া ভয়ে কম্পমান। মটরুর অদৃশ্য আত্মা অলক্ষ্যে থাকিয়া হাততালি দিয়া বলিতেছে—হাস, নাচ, ফুর্তি কর, খুব মজা লোট—কিন্তু হুঁশিয়ার—ঐ দুশমনটা খাপ হইতে কুকরী টানিল বলিয়া—তারপর সব ঠাণ্ডা। ঐ উনানে মুণ্ডুটা সাঁতলাইবে, ঐ ঘোলাটে ফুটন্ত ক্ষারজল গায়ে ঢালিয়া লোম ছাড়াইবে, ঐ কড়াইতে মাংস পাকাইবে। ব্যস্! রঙ্গমঞ্চে ড্রপসিন পড়িবে—বাউল ভিখারী একতারা বাজাইয়া ক্লোজিং সং ধরিবে, "মিছে বাজি এ সংসারে দুদিনের খেলা।" ভিক্ষু গুহায় বসিয়া গম্ভীর মানসে পঞ্চস্কন্ধের নিঃসারত্ব অনুধ্যান করিতে বসিবেন—nihil, nihil, আগে নাই, অন্তে নাই, অতএব মাঝেও নাই। শূন্যম্ মহাশূন্যম্। পদ্মপত্রে জলের নাচ কয় মুহূর্ত ধরিয়া সম্ভব? আকাশে বিদ্যুতের ঝলকানি কতটুকু সময়ের জন্য? শিরঃ-পাণি পাদ-বিশিষ্ট দেহপিণ্ডে প্রাণের বিলাস ক্ষণকাল মাত্র স্থায়ী।

তিন

লয়েড মর্গ্যান (Lloyd Morgan) প্রমুখ* এমার্জেণ্ট ইভলিউশনিস্ট্‌গণ প্রাণের মহিমা যত উদাত্ত স্বরেই ঘোষণা করুন না কেন, মটরু তাহার নিজের চরম দুঃখের অভিজ্ঞতা হইতে নিশ্চিত বুঝিয়াছে যে শরীর ধারণ বিড়ম্বনা। হয়তো লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া অচেতন পৃথিবীর রুক্ষ পাহাড়, নদী, সমুদ্রের নীরস অস্তিত্বের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার সৃজনশক্তি সম্যক চরিতার্থ হইতেছিল না, তাই তিনি একদিন জটিল অণুপুঞ্জকে কলয়ডাল (colloidal) অবস্থার মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া এক

* এমার্জেণ্ট ইভলিউশন—'আগন্তুক ক্রমবিকাশ'—হাইড্রোজেন পরমাণু ও অক্সিজেন পরমাণুর সম্মিলনে জলের অণু হয়। এই অণুতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের ধর্মগুলির যোগ করিলে যাহা হয়, তাহা ছাড়া অনেক আগন্তুক ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। তাই অণু একটি 'এমার্জেণ্ট'। ভূত (matter) হইতে প্রাণ (Life) এই-ভাবে "emerge" করিয়াছে। ভূতের ধর্ম ছাড়া অনেক অভিনব ধর্ম প্রাণে বিকশিত হইয়াছে। পরমাণুতে অণু নাই, অণুতে পরমাণু আছে। প্রাণে ভূত নিহিত কিন্তু ভূত প্রাণের পর্যায় হইতে বহু নিম্নে পড়িয়া আছে।

অভিনব সৃষ্টির পথে ঠেলিয়া দিলেন—কলমুড কথা একদিন নিজের দেহে এক আগন্তুক শক্তির বিকাশ অনুভব করিল—ধীরে ধীরে সেই শক্তি প্রথমতঃ সপ্তসমুদ্রে তাহার প্রভাব ছড়াইল—তারপর স্থলে, অন্তরীক্ষে, বায়ুতে, সমস্ত ভুবন ব্রহ্মাণ্ডে, নীল, রক্ত, শ্বেত, কৃষ্ণ, ছোট বড় কত ছাঁদের, কত কাটের, কত আকৃতির মধ্য দিয়া উহা ঝিক্ মিক্ করিতে লাগিল—নেড়া পাহাড় তৃণলতা-বনস্পতির নিবিড় সমারোহে সুন্দর হইল —নদীর স্রোতে অসংখ্য মৎস্য ভাসিয়া চলিল। সমুদ্রের গর্ভে সংখ্যাতীত ঝিনুক, মুক্তার সম্ভাবনীয়তা দেখা দিল—বনে বনচর—আকাশে খেচর ধুমধাম শুরু করিল—ডাঙায় মনুষ্য ভূমি কর্ষণ আরম্ভ করিল। সর্বত্র সেই নূতন শক্তির জয় জয়কার—যন্ত্রশক্তি (mechanical energy), তাপ, আলোক, চুম্বক-আকর্ষণ, তড়িৎ, এক্সরে, গামা রে (gamma ray), ভূত জগতের সকল শক্তি এই আগন্তুক তেজের বিপুল প্রভাব দেখিয়া বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এতদিনে সৃষ্টিকর্তার অন্তর তৃপ্তিলাভ করিল! পিতার বুকভরা আশীর্বাদ এবং স্নেহ পাইয়া প্রাণ নিখিল বিশ্বে একাধিপত্যের দাবি জানাইল। সত্য, অতি সত্য। প্রাণের মহিমা সত্যই অপরূপ। ক্রমবিকাশের যে সিঁড়িতে প্রাণ আবির্ভূত হইল সে অতি সুমঙ্গল তীর্থ—সেই ক্ষণ পরম পুণ্যক্ষণ। প্রাণহীন বিশ্ব, আর সপ্রাণ বিশ্ব, এই দুয়ে আকাশ পাতাল প্রভেদ। প্রাণ সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টিকর্তা যদি লক্ষ লক্ষ বৎসরের একটা মহাশূন্যতার পরিপূর্তি দেখিতে পান তাহাতে মটরুর বলিবার কিছুই নাই। প্রাণ সত্যই একটি অসাধারণ এমার্জেণ্ট, —মটরু ইহাকে শ্রদ্ধায় নমস্কার করে। কিন্তু তাহার শুধু বলিবার এইটুকু যে প্রাণ তাহার অন্তরের গভীরতম আশা মিটাইতে সক্ষম হয় নাই। অন্যান্য ভৌতিক শক্তি যেখানে মূক, মূঢ়, গতিহীন, দুই চারিটা বাঁধাধরা খাতে প্রবহমান, প্রাণের সাবলীল গতিভঙ্গি, সহস্রমুখী বিকাশধারা সত্যই সেখানে লক্ষ্য করিবার। মটরু তাহা জানে। যে দুই-চারটা দিন নেপালীদের দানাপানি খাইয়া সে বাঁচিয়াছিল, তাহার দেহপিণ্ডটার মধ্যে নর্তনময়ী মহাশক্তির কি বিশ্বতোমুখ স্পন্দনই না সে অনুভব করিয়াছিল! কিন্তু ব্যর্থ—সব ব্যর্থ! প্রাণকেও সে অবশেষে দেখিল হাজার বেষ্টনীতে বাঁধা। প্রাণও চঞ্চল—প্রাণও ভঙ্গুর। আবির্ভাব-তিরোভাবরূপ দ্বন্দ্বময় চাপল্য যে অপর দশটা শক্তির কাঁধে চাপিয়া আছে, প্রাণও সে কলঙ্কের বোঝা হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। শুধু তাই নয়—প্রাণের মলিনতম দিক এই—প্রাণ বিশ্বাসঘাতক।

* * *

তবুও ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর আহাম্মক দার্শনিকগুলার চোখের ধাঁধা কিছুতেই যেন কাটিতেছে না—মটরু অবাক হইয়া ভাবে। প্রাণের কথা বলিতে সকলেই আত্মহারা। স্পেন্সার ও বার্গ্‌সঁ, হলডেন ও হাক্সলি—সকলেরই এক সুর। এমন হয় নাই কখনও—এমনটি আর হইবে না—প্রাণই বিশ্বম্ভর—প্রাণই পরমতত্ত্ব—প্রাণের তুলনা নাই। খণ্ড প্রাণ ফাটিয়া যায় যাক্ না—অখণ্ড প্রাণের ধারা যে অবিনশ্বর—ধ্যানলোকে তার অনুভূতি কর। ব্যষ্টির কাঁধে থাকুক না নেপালীর কুক্‌রী বাঁধা। জাতি (species)-কে তো কুক্‌রী দ্বিখণ্ডিত করিতে পারিবে না—জাতি ঠিক টিকিয়া থাকিবে —মটরু মরুক—ছাগল চিরকালই পৃথিবীর বুকে ব্যা ব্যা করিবে। প্রাণ এখানে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না। জাতির অমরত্বে সে গ্যারাণ্টি দিতে প্রস্তুত।

এ সকল স্তোকবাক্যে মটরুর মন আজ ভেজে না। সে চায় ব্যষ্টির অমরত্ব—এখানেই, এখনই

(here and now)। প্রাণের উদ্গীথ যাহারা গাহিতেছে তাহারা দূষিত ক্ষতকে ফুল চাপা দিয়া ঢাকিয়াছে। শোপেনহাউয়ারকে মটরু বরং তারিফ করে। চোখ খুলিয়া যাহা দেখিয়াছেন নির্ভয়ে তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। প্রাণের ট্র্যাজিডি তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অন্ধ আহার-নিদ্রা-মৈথুনের একটা জগাখিচুড়ি—'এলান্ ভাইটাল্' (Elan vital) বলিলেই তার দোষ কাটিয়া গেল! কিসের উদ্দেশ্যে এত লাফালাফি? স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জুড়িয়া কোন্ মহাবস্তু লাভের আশায় এত মারামারি ঝুলাঝুলি? বংশের সংরক্ষণ (continuation of species)? হায় হায়, পর্বতের মূষিক প্রসব! কেন বংশের সংরক্ষণ, যদি জিজ্ঞাসা করি? বোকা প্রাণের মুখে তাহার কোন উত্তর নাই। কপালকুণ্ডলার ভাষায় তাহাকে বলিতে ইচ্ছা হয়—"পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ।"

চার

প্রাণের বিশ্বাসঘাতকতার একটা সমুচিত উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে মটরু প্রাচীন ভারতে আসিয়াছে। সেই বৈদিক ভারতের বনবাদাড়ে মুনিঋষিদের হোমকুণ্ডের ধারে মটরুর ক্ষুভিত আত্মা দাঁড়াইয়া।

"সত্য বল, সত্যসন্ধ তাপস! শ্রেষ্ঠ দেবতা কে?"—মটরু প্রশ্ন করিল।

"প্রাণ।"

"প্রাণ?" মটরু চমকিয়া উঠিল। "সেই চঞ্চল কৃতঘ্ন শয়তান প্রাণ? মিথ্যা কথা।"

"না, মিথ্যা নয়। সত্যই প্রাণের মহিমা অপার। দেখ পুঁথি খুলিয়া দেখাইতেছি। আমাদের পূর্বপুরুষগণ কতভাবে প্রাণের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন"—ঋষি বলিলেন। বিরাট বেদের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় কেবলি প্রাণের কথা ঋষি দেখাইতে লাগিলেন। কত বিচিত্র নামে উপাসকগণ প্রাণকে আহ্বান করিয়াছেন, কত বিচিত্রভাবে প্রাণদেবতার সন্তুষ্টির উপায় অন্বেষণ করিয়াছেন। প্রাণবিদ্ পুরুষগণের সৌভাগ্য, সমৃদ্ধির ফলশ্রুতিই বা কত!

গভীর একটি দীর্ঘশ্বাস মটরুর অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া বাহির হইল। হায় রে, ইহারাও কি সরল সত্য দেখিতে জানে না? প্রাণের ট্র্যাজিডি সম্বন্ধে ইহারাও কি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগুলার মতো একটু সচেতন নয়?

* * *

আড়ম্বরহীন শান্ত সহজ একটা নিবিড় স্বচ্ছন্দতার পরিবেষ্টনী জাগাইয়া উপনিষদের ঋষি বামদেব স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। হোমানল জ্বলিতেছে না—যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ডের বালাই তাঁহার নাই। পুঁথি-পাতড়ারও কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। ঋষির মুখে সর্ব ক্ষোভাতীত একটা নিরায়াস আনন্দের ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মটরু স্তব্ধ হইয়া তাঁহার মুখে শুনিতেছিল, সত্যের সন্ধানে জীবনের উষাকাল হইতে তিনি যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন—সেই সব কাহিনী।

নিবিড় অন্ধকার যখন অন্ধকারের বুকে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ কোন প্রকার সংবেদনই যখন আত্মপ্রকাশ করে নাই, সৃষ্টির প্রাক্ক্ষণের ভয়াবহ সেই কারণ-তিমিরকেই তিনি কত যুগ পর্যন্ত ভূমা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর সেই জটিল অন্ধকার ফুঁড়িয়া একটু একটু আলো দেখা দিতে লাগিল। একে একে বিভিন্ন আকৃতির প্রকাশ হইল। আকাশ আসিল। বেদবাণী শুনিলেন "খং ব্রহ্ম" *। এই সর্বব্যাপী সূক্ষ্ম ব্যোমতত্ত্বই ব্রহ্ম—ইহাই বৃহৎ—ইহাই ভূমা। প্রাণকে পরিতুষ্ট করিবার কত কৌশল আবিষ্কৃত

* ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৪।১০।৫

হইল—প্রাণের স্তুতিতে, প্রাণবিদ্যার বিবিধ বিস্তারে বহুশাখাযুক্ত ত্রয়ীর বিপুল অংশ ভরিয়া গেল। বহু উপাসক জীবন ভোর প্রাণেরই আনুগত্য করিয়া গেলেন। প্রাণের দোর্দণ্ড প্রতাপকে লঙ্ঘন করিয়া অন্য কিছু খুঁজিবার সাহস অনেকেরই হইল না।* "প্রাণো ব্রহ্ম।" মনে হইল ইহাই শ্রুতির শেষ কথা। বৃহতের সীমা বুঝি প্রাণেই আসিয়া সমাপ্ত হইয়াছে।

তাঁহাকেও কত সহস্র বৎসর প্রাণের উদ্গীথ গাহিতে হইয়াছে। তেত্রিশ সহস্র দেবতাকে গুটাইয়া তেত্রিশে আনিতে হইয়াছে। তেত্রিশকে সংক্ষেপে করিয়া অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যৌ এই ছয় সংখ্যায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইয়াছে—এই ছয়ও শেষে তিনে ঠেকিয়াছেন। তিনি অবশেষে দুয়ে—দুই দেড় দেবতায়—সর্বশেষে দেড়ের অর্ধও ভয় পাইয়া পালাইয়াছেন—'একো দেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম'†—রাজরাজ প্রাণ বৃহত্তম মর্যাদার একচ্ছত্র সম্রাট হইয়া উপাসকের অখণ্ড উপাসনা লাভ করিয়াছেন।

কিন্তু বামদেব ঈপ্সিত শান্তি পান নাই। প্রাণকেই বৃহত্তম বলিয়া স্বীকার করিতে কেন যেন তাঁহার বাধোবাধো ঠেকিতে লাগিল। যে সত্যানুসন্ধিৎসু মন তাঁহাকে মাতৃগর্ভ হইতে অনবরত সম্মুখে ঠেলিয়া ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে তাহারই ইঙ্গিতে বামদেব প্রাণের বশ্যতা একদিন দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

সে কি গহন অনিশ্চয়তার কুয়াসাচ্ছন্ন সন্ধিক্ষণ! কিন্তু বামদেবের ধৈর্য অটল—মহাসমুদ্রের মতো অচঞ্চল। ধীরে, অতি ধীরে সর্ববৃত্তিনিরুদ্ধ চিত্তাকাশে বেদমাতার মহাবাকা ধ্বনিয়া উঠিল—"অহং ব্রহ্মাস্মি"[১]। বৃহত্তম যাহা তাহা 'খং' নয়, বায়ু নয়, দ্যাবা-পৃথিবী নয়, রুদ্র-প্রজাপতি-বিষ্ণু নয়; জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, বরিষ্ঠ, বশিষ্ঠ প্রাণদেবতাও নয়—[২] তাহা আমি—তাহা আমি—দূরে নয়—অতি নিকটে—আমার সবচেয়ে নিকটে—আমারই সহিত মিশিয়া—তাহা আমি—তাহা আমি। যায়—যায়—প্রাণকে জয় করা যায়—সূর্য, চন্দ্র, অনল, অনিল, মৃত্যু, প্রজাপতি সকলের মহিমা ছাপাইয়া এই মর্ত্যে তিনপোয়া পিণ্ডবাসী মানুষের মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়—মানুষ যদি নিজেকে জানে—প্রাণ পরিচ্ছিন্ন সত্তাকে মহাবীর্যে উল্লঙ্ঘন করিয়া আপন প্রকৃত সত্তা—আত্মসত্তাকে যদি একবার স্বীকার করিয়া লয়।

আত্মাকে জানিয়া বামদেব প্রাণের লৌহ-শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিলেন[৩]। দেহটা তাঁহার রহিয়াছে—প্রাণও সেখানে ক্রিয়া করিতেছে—কিন্তু সে প্রাণ লক্ষ্যহীন,—আহার-নিদ্রামৈথুনের ঘূর্ণাবর্তে মুহ্যমান অন্ধ জৈব প্রাণ নয়—সে প্রাণ ভাস্বর, জ্ঞানালোকদীপ্ত শুদ্ধ, মৃত্যুহীন, আত্মভূত দিব্য প্রাণ।

পাঁচ

মটরুর বুকের প্রতিহিংসার বহ্নি নিভিয়াছে। প্রাণকে সে আর নিপীড়ন করিতে চায় না। শোপেনহাউয়ারের অ্যাসেটিসিজম্ (Asceticism) বা ঘেরণ্ডের শ্বাসনিরোধ অপেক্ষা প্রাণকে জয় করিবার প্রকৃষ্টতর পন্থা সে উপনিষদের আত্মবিদ্যাতে পাইয়াছে।

* তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ৩।৩
† বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৩.৯।৯
১ ঐ, ১।৪।১০
২ ঐ, ৬।১।১,২
৩ ঐতরেয় উপনিষদ্, ২।৫

প্রাণের উপর একটা নিবিড় সহানুভূতি আত্মজ্ঞ মটরুর অন্তরে জাগিয়াছে। হায়রে পথ-ভ্রান্ত প্রাণ!—দশজনে মিলিয়া অযথা স্তুতিগান করিয়া তাহাকে বিপথে লইয়া গিয়াছে। তার বাহিরের বৈভবের সুখ্যাতিই সকলে করিয়াছে। অন্তরে তাকাইবার সুযোগ তাহাকে কখনও এই হিতৈষীরা দেয় নাই। তাই প্রাণ বহির্মুখ, চঞ্চল,—ছলনা, চাতুরী করিয়া কাল কাটাইতেছে—প্রাণী সমূহের সর্বনাশ করিয়া বেড়াইতেছে। আহা বেচারী—কেহ তাহাকে উচ্চতর আদর্শের কথা বলে নাই।

যে প্রাণ নিষ্ঠুর চাপল্যে মটরুকে একদিন নিদারুণ পীড়া দিয়াছিল, সে প্রাণ আজ আত্মেশ্বর মটরুর কাছে শিশুটি হইয়া বসিয়া আছে। কোথায় তাহার নর্তন, কোথায় তাহার দস্যুতা! শত নেপালী দুশমনের শাণিত কুকরীর ঝকমকানি মটরুর আত্মপ্রতিষ্ঠ-মনে এতটুকু মাত্র আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছে না। আজ মৃত্যু একটা ছেলে-খেলা,—জন্মও তাই। স্বতঃস্ফূর্ত শাশ্বত জীবনের অধিকারী মটরু। সে আজ বার্গস, হলডেনের মুখে অমরত্বের আশ্বাস শুনিবার অপেক্ষা রাখে না। এখানে এবং এখনই মটরু নিঃসন্দিগ্ধ অমৃতত্ব লাভ করিয়াছে। প্রাণ মটরুর কাছে আজ আর ট্র্যাজিডি নয়,—কমিডি।

দুশমনটা গম্ভীরভাবে উঠানে পায়চারি করিতেছে। উনুন জ্বলিতেছে—জল ফুটিতেছে—মুরগীর দল প্রতীক্ষা করিতেছে—মটরু কিন্তু আজ খুব হাসিতেছে—হোঃ হোঃ হোঃ—আর নির্ভয়ে, নিরাতঙ্কে, নিরায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে ছোলাপানি খাইতেছে।

ললিতকলা ও ধর্ম

শ্রীধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা

ললিতকলা ও ধর্মের পরস্পরের মধ্যে প্রতি-কূলতা অথবা নিবিড় সম্বন্ধ কোন্‌টি আছে আমাদের ভেবে দেখতে হবে। আমাদের সকল চাওয়ার শ্রেষ্ঠ চাওয়া হল ধর্ম। ধর্মকে পেলে মানুষ সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে থাকে। বিশ্ব-সৃষ্টির আনন্দ, সৌন্দর্য, রসময়তা উপলব্ধির অধিকারী হয়ে থাকে। ললিতকলা-স্রষ্টা শিল্পীরাও বিশ্বসৃষ্টির আনন্দ, সৌন্দর্য ও রসময়তার সন্ধানী। শিল্পীরা তাদের রূপসৃষ্টিতে সেই সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। ধর্ম আচরণকারী ধার্মিক কঠিন, নীরস, শুষ্ক, সৌন্দর্যবোধহীন, অপ্রেমিক ব্যক্তি নয় বরং তার ঠিক উল্টো। যথার্থ শিল্পীর মধ্যেও এই গুণগুলি দেখা যায়। ধর্ম ও ললিতকলা একে অন্যকে প্রকাশ করতে সহায়তা করে। শিল্পকলার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় ভারতে বা ইউরোপে প্রাচীনকালে কয়েক শতাব্দী ধরে ধর্মকেই অবলম্বন করে শিল্প সৃষ্টি হয়েছে। বৌদ্ধযুগে বুদ্ধ ও জাতকের গল্পকে নিয়ে অজন্তাগুহার প্রাচীর-চিত্রগুলি অঙ্কিত হয়েছে। গুপ্তযুগে পাথর দিয়ে অপূর্ব সব বুদ্ধমূর্তি তৈরি হয়েছে। রাজপুত-চিত্রে কৃষ্ণ, রাধা বিশেষ একটি স্থান অধিকার করে আছে। ইউরোপীয় প্রাচীন চিত্রে, গির্জার প্রাচীরে যিশুখ্রীষ্টের জীবনী অবলম্বনে শিল্পীরা বহু চিত্র অঙ্কন করেছেন। অতীতে এক সময়ে শিল্পীদের অঙ্কন বিষয় প্রধানত ধর্মীয় চরিত্র অথবা ঘটনাদি ছিল। ধর্মের সঙ্গে শিল্পীদের নিবিড় সম্বন্ধ ছিল। পরবর্তিকালে এর ব্যতিক্রম হতে দেখা যায়। ধর্মের স্থান অধিকার করল শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক সম্রাট বা রাজারা। মুঘল আমলে দিল্লীর সম্রাট, সম্রাজ্ঞী,

ওমরাহদের চিত্রশিল্পীরা অঙ্কন করত। দীর্ঘকাল এইভাবে চলে আসছিল। সিন্দবাদের কাঁধে যেমন সেই বৃদ্ধ দৈত্যটি চেপেছিল তেমনি শিল্পের কাঁধে কখন ধর্ম কখন সম্রাট ইত্যাদি চড়ে বসেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শিল্পীরা এই কাঁধে-চড়া বৃদ্ধটির থেকে মুক্তি পেলেন। তাঁদের অঙ্কন বিষয়বস্তুতে আমূল পরিবর্তন এল।

ভারতীয় শিল্পধারায় শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের আগমন এ-বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। শিল্পীরা তাঁদের কল্পনা শক্তির, কবি মনের সন্ধান পেলেন। ধর্ম ও সম্রাটদের বিষয়কে বাদ দিয়ে শিল্পসৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টির নিজস্ব আনন্দ, রসসৃষ্টি, এই বিশ্বের সৌন্দর্যকে নিরীক্ষণ করবার প্রতি মনোযোগ দিলেন। শিল্পীর নিজের মনের কথাকে ছন্দের মাধুর্যে সুন্দর করে রূপদানের প্রতি সচেতন হলেন। এই শতাব্দীর শিল্পীরা চিত্রের বিষয়বস্তু নির্বাচনে যেমন স্বাধীন হলেন তেমনি নিজেকে প্রকাশ করবার অপূর্ব ক্ষমতাকে লাভ করলেন। পূর্বে ধর্ম ও সম্রাটদের বিষয়ের মধ্যে একটা গুরুত্ব বা অসামান্যতা ছিল, এখন সামান্য বিষয়কেও অসামান্যতা প্রদানের ক্ষমতা শিল্পীরা আয়ত্ত করেছেন। এখন বিষয়ের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু শিল্পীর কাজের গুণের উপর নির্ভর করে সামান্যকে অসামান্যে পরিণত করতে। শিল্পীরা এখন কত শক্তির অধিকারী, সামান্য মানুষকেও রচনার কলা-কৌশলের দ্বারা দেবত্বে পৌঁছে দিতে পারেন। এখানেই শিল্পীর যথার্থ মুক্তি ও স্বাধীনতা। এই গুণের অধিকারী হওয়ার যোগ্যতা ও গৌরব যে কয়েকজন শিল্পীর মধ্যে ছিল তাঁদের দেখেছি কোন প্রকার ঔদ্ধত্য বা গর্ব ছিল না, তাঁরা ছিলেন বিনয়ী, সংযত, নম্র, স্নেহশীল, ভক্তের পর্যায়ের লোক। তাই মনে হয় ধর্ম ও চারুকলার মধ্যে একটা নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে।

শিল্পীরা আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা লাভ করে কোন্ পথ ধরে তাঁদের শিল্পসৃষ্টিতে অগ্রসর হবেন এ-কথা ভাববার সময় এসেছে। অতি আত্মকেন্দ্রিক হওয়া, অসংলগ্ন কতকগুলি মানবাকৃতির দ্বারা চিত্রপট ভর্তি করে উচ্চমানের চিত্ররচনার দাবি করা আজকাল শিল্পীদের মধ্যে একটা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিন কয়েক পূর্বে ভাল শিল্পী বলে সুপ্রচারিত এক শিল্পীর চিত্র প্রদর্শনীতে গিয়ে দেখলাম একটি বড় আকারের চিত্রে বসা একটি মানুষের ঘাড়ে তিনটি মাথা, গা, হাত, পায়ের যা রঙ অন্য একটি হাত তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রঙের, ঐ হাতটির রঙ সম্পূর্ণ সাদা। দর্শকদের কাছে শিল্পীকে দার্শনিক ব্যাখ্যার দ্বারা চিত্রটিকে বুঝিয়ে দিতে দেখা যাচ্ছিল। কথায়ই যদি ব্যাখ্যা করে ছবিকে বুঝাতে হয় তবে ছবির মান রইল কোথায়? এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকর রেনয়ের কথা মনে এসে যায়। শিল্পীর কাছে তাঁর চিত্রের ব্যাখ্যা জানবার জন্য অনেকে প্রশ্ন করে রেনয়কে। শিল্পী তখন বলেছিলেন দেখ, কথার দ্বারা ছবির সব ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, যদি তাই হতে পারত তবে শিল্প হত না, অন্য কিছু হত। শিল্পের দুইটি প্রধান গুণ, প্রথমত তাকে বাক্যের দ্বারা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত তাকে নকল করা যায় না। প্রদর্শনীর চিত্রগুলি দেখে একটা কথাই মনে হচ্ছিল—চিত্ররচনায় সৌন্দর্য ও রসসৃষ্টির উদ্দেশ্য যেন লোপ পেয়ে গেছে, তার পরিবর্তে কতকগুলি technique বা করণ-কৌশলের কসরত দেখিয়ে শিল্পীরা আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। করণ-কৌশলের উপর প্রাধান্য দেওয়া বর্তমান ইউরোপের শিল্পীদের কাজের মধ্যে লক্ষ্য করা গেলেও রসসৃষ্টির গুণের অভাব বড় বেশি দেখা যায় না। যার জন্য ঐ সব শিল্পীদের কাজ দেখে নৈরাশ্যের পরিবর্তে মনে আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ

অধিকাংশ আধুনিক নামধারী ভারতীয় শিল্পীদের কাজে ইউরোপীয় শিল্পীদের করণ-কৌশলের নকল কসরতই চোখে পড়ে কিন্তু রসসৃষ্টির গুণের অভাব থেকে যাচ্ছে। তাতে করে ছবি দেখে যে-আনন্দ পাবার কথা তার বদলে ছবিতে শিল্পীর করণ-কৌশলের মারপ্যাচের বাহাদুরির দিক থেকে কতদূর সাফল্য লাভ করেছেন তার প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়। তাতে রসিক দ্রষ্টার মন ভরে না। মনে পড়ে বহু পূর্বে ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটির বাৎসরিক চিত্র-প্রদর্শনীতে এক একটি ছবি যখন দেখতাম তখন সমস্ত মনকে নাড়া দিয়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে যেতাম। দীর্ঘ সময় দিয়ে ছবিটিকে দেখতে হত। প্রদর্শনীর গৃহত্যাগ করবার পরেও মনের মধ্যে ছবির ছাপ থেকে যেত। এমন ছবিও ছিল যার স্মৃতি এখনও মনে জেগে আছে। ভাল ছবি দেখার সুযোগ পাওয়া একটা সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করি।

সেই সব দিনের শিল্পীদের শিল্পরচনার মধ্যে বড় একটা আদর্শকে প্রকাশ করবার, রসসৃষ্টি করবার, মনের ভাবকে সুন্দর করে দেখানোর প্রয়াসই প্রাধান্য লাভ করত, করণ-কৌশল তাকে ফুটিয়ে তোলবার সাহায্য করলেও নিজেকে জাহির করত না। ভারতীয় দেব-দেবীর বিষয়কে অবলম্বন করে তখন অনেক চিত্র আঁকা হলেও প্রকৃতি, মানুষ, পশু, পাখীর বিষয়েও বহু চিত্র আঁকা হয়েছে। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের চিত্রগুলির মধ্যে দেব-দেবীর চিত্র কিছু কিছু পাওয়া যায়। শিল্পাচার্য নন্দলালের দেব-দেবীর চিত্র অনেক আছে, শিল্পী অসিত কুমার হালদারও প্রথম দিকে মা যশোদা, কৃষ্ণ, কৃষ্ণের রাসলীলা, বৌদ্ধ বিষয়, কুনাল ইত্যাদির কতকগুলি চিত্র এঁকেছেন, শিল্পী ক্ষিতীন্দ্র মজুমদার বৈষ্ণববিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ সুদাম, শ্রীচৈতন্য জীবনী অবলম্বনে ধারাবাহিক অপূর্ব বহু চিত্রাদি অঙ্কন করেছেন। দেব-দেবীর, মহাপুরুষদের আখ্যান বা জীবনীর সৌন্দর্য যেখানেই শিল্পীদের মনকে আকর্ষণ করেছে সেখানেই তা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ছবির রূপে প্রকাশ পেয়েছে। ধর্ম বা মহাপুরুষদের জীবনের সৌন্দর্য স্বভাবতই শিল্পীদের মনকে আকর্ষণ করে থাকে।

সাধক যেমন সাধনার পথকে অবলম্বন করে চলেন শিল্পীকেও কতকটা সেই পথে চলতে হয়। বিশ্বসৃষ্টির সৌন্দর্যকে জানতে হলে যে পথে চলতে হয় তাকে সাধনা বলা যায়। যে এই পথের পথিক সে অনায়াসে প্রকৃতির ভাষা বোঝবার ক্ষমতা লাভ করে। প্রকৃতির নীরব ভাষা তাকে অনেক কিছু বলে থাকে।

অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন এমন একজন শিল্পী যিনি পুঁথিগত কথার চেয়ে সম্যক উপলব্ধির কথাই তাঁর ছাত্রদের বলতে ভালবাসতেন। শিল্পীদের ধ্যানধারণার কথা বলতে গিয়ে তিনি একবার বলেছিলেন যখন তাঁর বেশ বয়স হয়ে এল তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নাকি বলেছিলেন 'অবন এবার একটু ধ্যানধারণা কর, বয়স তো হয়ে এল।' 'রবি কাকার কথামত একদিন খুব ভোর বেলায় বাড়ির তে-তলার ছাদে গিয়ে আসন পেতে পূর্বমুখী হয়ে চোখ বুজে ধ্যান করতে বসলাম। অনভ্যাস বশতঃ হঠাৎ চোখ খুলে গেলে দেখতে পেলাম পূর্বাকাশে নব-অরুণোদয়ের রক্তিম আভা আকাশ ও খণ্ড মেঘগুলিকে রাঙিয়ে দিয়ে অপূর্ব এক দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। মন বিস্ময়ে পুলকিত হয়ে উঠল। হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম, ভাবলাম আমি শিল্পী মানুষ, এমন সুন্দর দৃশ্যকে না দেখে চোখ বুজে ধ্যান করব? তবে তো বিশ্বস্রষ্টার এমন সুন্দর প্রকাশ বৃথাই যাবে। আসন ছেড়ে উঠে পড়লাম এবং মনে মনে বললাম, "যোগীর ধ্যান চোখ বুজে, আর শিল্পীর ধ্যান চোখ খুলে।" বিশ্বস্রষ্টার এমন সুন্দর বিশ্বসৃষ্টিকে চোখ খুলে,

মন দিয়ে দেখার মধ্যেই শিল্পীদের ধ্যানধারণা রয়ে গেছে।

আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি—একবার একজন শিল্পী-ছাত্র অবনীন্দ্রনাথের নিকটে গিয়ে অনুরোধ করেছিলেন কতকগুলি ভাল শিল্প বিষয়ে পুস্তকের নাম বলতে যা পড়ে শিল্প বিষয়ে অনেক জ্ঞানলাভ করা যায়। অবনীন্দ্রনাথ সেই ছাত্রটিকে দুটি পাতার বইয়ের কথা তখন বলেছিলেন—একটি পাতা নীল, অপরটি সবুজ। এই দুপাতার বই পড়লে অন্য শিল্প বিষয়ে পুস্তক পড়ার প্রয়োজন হবে না। গুরু শিল্পী-ছাত্রটিকে ঠিক বইয়ের কথাই সেদিন বলেছিলেন। একটি পাতা—নীল আকাশ, দ্বিতীয় পাতাটি সবুজ পৃথিবী; এই দুইটি পাতা সারা জীবন পড়েও শেষ করা যায় না। এই পড়াতে কি যে আনন্দ সে কথা সহস্র কথাতেও বলে শেষ করা যায় না। কবিরা প্রেরণা পেলেন তার থেকে, সঙ্গীত রচয়িতা কথা, সুর পেলেন ঐ একই আনন্দের উৎস থেকে, দার্শনিক জ্ঞানের দ্বারা খুঁজলেন তার অর্থ। এই সবের উপলব্ধির পিছনে রয়েছে মানুষের মন। মন যদি আমাদের না থাকত—তাহলে মানুষ পশু পর্যায়ের সামিল হত। এই বিশ্বচরাচরের উপলব্ধি মানুষ মনের দ্বারা, কল্পনার দ্বারাই করে থাকে। মনের গতি সর্বত্র, তাই বুদ্ধ বলেছেন "মনোময় জগৎ"।

ধর্মের গতিপথ যে উদ্দেশ্যে চলেছে, শিল্পের মূল উদ্দেশ্যও সেই পথেই চলেছে বলে মনে করি।

অকাল-বোধন

স্বামী প্রমেয়ানন্দ

আশ্বিনের শুক্লা ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বিল্ব-শাখায় দেবীর বোধন শারদীয়া দুর্গাপূজার একটি অবশ্য-কর্তব্য অঙ্গ। এই বোধনকে অকাল-বোধন বলা হয়। এখন জানতে হবে বোধন কি, এবং এই বোধনকে অকাল-বোধনই বা বলা হয় কেন। বোধন অর্থাৎ জাগরণ। দেবী যেন নিদ্রিতা, পূজার জন্য তাঁকে ঘুম থেকে জাগানো। স্বাভাবিকভাবেই এখানে একটি প্রশ্ন জাগে। মা জগজ্জননী 'চৈতন্যস্বরূপিণী', তাঁর বোধেই সব বোধ, তাঁর চৈতন্যেই সব চৈতন্যময়, কাজেই তিনি নিদ্রিতা হবেন কিরূপে? আর নিদ্রিতা যদি না-ই হন, তাহলে তাঁকে জাগাবার প্রশ্নই আসে না। বিষয়টি নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, "আমাদের যখন যে বস্তুর বা গুণের অভাব বোধ হয়, পূর্ণস্বরূপা চৈতন্যময়ী মায়ে তখন সে বস্তু বা গুণের অভাব কল্পনা করিয়া আরোপের সাহায্যে তাঁহার যথার্থ স্বরূপের উদ্বোধন করিবার প্রয়াস পাইতে হয়। এইরূপ কৌশলের ফলে কার্যতঃ আমাদেরই সকল অভাব দূরীভূত হয়। আমি সুপ্ত—আমার ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবর্গ জড়ত্বের মোহে আচ্ছন্ন। চতুর্দিকে কেবল জড়ত্বের ঘনীভূত বিকাশ; ঐ অবস্থা হইতে চৈতন্যরাজ্যে উপনীত হইতে হইলে আমাকে জাগ্রত হইতে হইবে। আমি তখন সরল প্রাণে মাকেই নিদ্রিতা বলিয়া বুঝিলাম। আমি সুপ্ত, সুতরাং মাও যেন সুপ্তাই রহিয়াছেন। মা যদি জাগিতেন, তবে সন্তানও নিশ্চয়ই জাগিত, অতএব যে কোন উপায়েই হউক মাকে জাগাইতে হইবে—'মা তুমি জাগ, মা তুমি উদ্‌বুদ্ধা হও' এইরূপ বলিয়া আমরা তখন কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। এইরূপ প্রার্থনার ফলে

দেখিতে পাই—কার্যতঃ আমাদেরই সুপ্তি ভাঙ্গিয়া যায়, আমরাই জাগ্রত হইয়া উঠি।" (পূজাতত্ত্ব, ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব, ৫ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৬—৬৭)

যাহোক, এবার আমরা আবার অকাল-বোধন প্রসঙ্গে ফিরে আসি। প্রসিদ্ধি আছে, রাবণ-বধের জন্য রামচন্দ্র দেবীর কৃপা লাভ করবার উদ্দেশ্যে শরৎকালে দেবীর পূজা করেছিলেন। আমাদের ছমাসে দেবতাদের একদিন, এবং ছমাসে তাঁদের এক রাত। মাঘ থেকে আষাঢ় পর্যন্ত এই ছমাসকে উত্তরায়ণ, এবং শ্রাবণ থেকে পৌষ পর্যন্ত এই ছমাসকে দক্ষিণায়ন বলা হয়। উত্তরায়ণের সময় দেবতারা থাকেন জাগ্রত, অপরপক্ষে, দক্ষিণায়নের সময় তাঁরা থাকেন নিদ্রিত। শরৎকাল পড়ে দক্ষিণায়নের মধ্যে। দেবতারা তখন নিদ্রিত। তাই ঐসময় তাঁদের পূজা করতে হলে প্রথমে তাঁদের জাগাতে হবে। সেজন্য রামচন্দ্র দেবীর বোধন করলেন। তাঁকে জাগরিতা করে তাঁর পূজা করলেন। কৃত্তিবাসী-রামায়ণে রামচন্দ্রের শরৎকালীন এই ...ার বিশদ বিবরণ আছে। কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণে এই পূজার কোন উল্লেখ নেই। তাছাড়াও যেসব পুরাণে এই পূজার উল্লেখ আছে, সেসব পুরাণের মতেও দেবীর বোধন বা পূজা—কোনটাই রামচন্দ্র নিজে করেননি, করেছিলেন ব্রহ্মা। দেবী-ভাগবতে বোধনের কোন উল্লেখ নেই, দেবর্ষি নারদের পৌরোহিত্যে রামচন্দ্র নবরাত্র ব্রতের উদ্‌যাপন করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। তবে "ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্বয়ি কৃত পুরাঃ॥"—"হে দেবি, রাবণ বধের উদ্দেশ্যে এবং রামচন্দ্রকে অনুগৃহীত করবার জন্য পুরাকালে ব্রহ্মা অকালে তোমার বোধন করেছিলেন"—ইত্যাদি, বোধনের মন্ত্রে পূজায় ব্রহ্মার ব্রতী হওয়ার কথারই সমর্থন পাওয়া যায়। সে যাই হোক, দেবীকে অসময়ে জাগিয়ে পূজা করতে হয়েছিল বলে এই বোধনকে অকাল-বোধন, এবং এই পূজাকে অকাল-পূজা বলা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, সুরথ-সমাধি দুর্গতিনাশিনী দুর্গার পূজা করেছিলেন বসন্তকালে। ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণে (প্রকৃতিখণ্ড ১।১৪৭) আছে: "পূজিতা সুরথেনাদৌ দেবী দুর্গতিনাশিনী। মধুমাস সিতাষ্টম্যাং নবম্যাং বিধিপূর্বকম্॥"—রাজা সুরথ চৈত্র মাসের শুক্লা অষ্টমী ও নবমী তিথিতে সর্বপ্রকার শাস্ত্রবিধিমতে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার অর্চনা করেছিলেন। বসন্তকাল পড়ে উত্তরায়ণের মধ্যে। দেবতারা সে-সময়ে জাগ্রতই থাকেন। তাই বাসন্তী পূজায় বোধনের প্রয়োজন হয় না। তবে রামচন্দ্রের শরৎকালীন পূজা অকাল-পূজা হলেও, কালক্রমে এই পূজাই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। দেবীভাগবত ও কালিকাপুরাণে এই পূজার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

লঙ্কার যুদ্ধে অসময়ে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হলে রামচন্দ্রের অমঙ্গল-আশঙ্কায় দেবতারা সকলে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন, এবং তাঁর মঙ্গল-বিধানার্থ শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি করবেন ঠিক করলেন। এ-বিষয়ে পরামর্শের জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁরা পদ্মযোনি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। দেবতাদের কাছ থেকে সব শুনে ব্রহ্মা তাঁদের দুর্গতিনাশিনী দুর্গার পূজা করতে পরামর্শ দিলেন। বললেন, দেবীকে প্রসন্ন করা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। একমাত্র তাঁর কৃপাতেই রামচন্দ্রের পক্ষে রাবণকে বধ করা সম্ভব। শুধু তাই নয়। রামচন্দ্রের মঙ্গলবিধানার্থ এই পূজায় ব্রহ্মা স্বয়ং পূজার ব্রতী হতেও সম্মত হলেন।

আগেই বলা হয়েছে, শরৎকাল পড়ে দক্ষিণায়নের মধ্যে। দেবতারা তখন নিদ্রিত। কাজেই ঐ সময় তাঁদের পূজা করতে হলে প্রথমে তাঁদের জাগরিত করতে হবে। তাই দেবীকে

জাগরিতা করবার জন্য ব্রহ্মা অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে করজোড়ে দেবীর স্তব করলেন : "হে দেবি, তুমি গিরি-বাসিনী ও বিল্বদলবাসিনী, তুমি দুর্গা, দুর্গতিহরা, শান্তা, শান্তজনপ্রিয়া, পদ্মালয়া, পদ্ম-নয়না ও সহস্রদলবাসিনী। হে দেবি, তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি লজ্জা, তুমি বুদ্ধি এবং তুমিই ত্রিবিধ প্রসবিনী ; তোমাকে নমস্কার।" (বৃহদ্ধর্মপুরাণ ; পূর্বখণ্ড, ২১।৬০-৬১) স্তবে-তুষ্টা দেবী কুমারী-মূর্তিতে দেবতাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হয়ে বললেন : "আপনারা আগামীকাল বিল্ববৃক্ষমূলে দেবীর বোধন করুন। আপনাদের প্রার্থনায় তিনি প্রবুদ্ধা হবেন। তাঁকে প্রবুদ্ধা করে যথারীতি অর্চনা করলে রামচন্দ্রের কার্যসিদ্ধি হবে।" (বৃহদ্ধর্মপুরাণ, পূর্বখণ্ড, ২১।৬৪-৬৬) সে-অনুসারে দেবগণসহ ব্রহ্মা মর্তে এলেন এবং সেখানে অতি দুর্গম নির্জন এক স্থানে একটি বেলগাছের শাখায় সবুজঘন পত্ররাশির মধ্যে বিনিদ্রিতা পরমাসুন্দরী এক বালিকামূর্তিকে দেখতে পেলেন। (বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ, পূর্বখণ্ড, ২২।১-৩) এই বালিকামূর্তিই জগজ্জননী মহাদেবী হবেন—ব্রহ্মার এরূপ অনুভব হওয়ায় নতজানু হয়ে দেবগণসহ তিনি দেবীর বোধন-স্তব পাঠ করলেন। দেবগণসহ ব্রহ্মা যে স্তব পাঠ করলেন, তাতে আছে :

"জানে দেবীমীদৃশীং ত্বাং মহেশীং
ক্রীড়াস্থানে স্বাগতাং ভূতলেঽস্মিন্।
শত্রুস্ত্বং বৈ মিত্ররূপা চ দুর্গে
দুর্গম্যা ত্বং যোগিনামন্তরেঽপি॥" (বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ, পূর্বখণ্ড, ২২।৪)—"হে দেবি, তুমিই যে মহাদেবী তা আমি নিশ্চিতরূপে জেনেছি। ভূতল তোমার ক্রীড়াভূমি, তাই তুমি এখানে এসেছ। তুমি শত্রুরূপাও বটে, আবার মিত্র-রূপাও বটে। বন্ধন-কারিণীরূপে তুমি শত্রু ; আর বন্ধন-মোচনকারিণীরূপে তুমি মিত্র। মহাযোগিগণ ধ্যানযোগে অন্তরেও তোমাকে ধরতে পারে না।"

"ত্বং বৈ শক্তি রাবণে রাঘবে বা
রুদ্রেন্দ্রাদৌ ময্যপীহাস্তি যা চ।
সা ত্বং শুদ্ধা রামমেকং প্রবর্ত্ত
তৎ ত্বাং দেবীং বোধয়ে নঃ প্রসীদ॥" (বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ, পূর্বখণ্ড, ২২।১১)—"যেখানে যে শক্তির ক্রিয়া সকলই তোমার। আমি ব্রহ্মা, আমার শক্তিও তোমার। রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি সকল দেবতার শক্তিই তোমার, তুমি সর্বশক্তিস্বরূপিণী। রাম-রাবণের যুদ্ধে, রামের শক্তিও তোমার, রাবণের শক্তিও তোমার। আমরা কায়মনো-বাক্যে প্রার্থনা করি, তুমি তোমার সকল শক্তি নিয়ে রামচন্দ্রে প্রবর্তিতা হও। তোমার সকল শক্তি দিয়ে তুমি রামচন্দ্রকে সাহায্য কর। জননি, তুমি জাগরিতা হও,এজন্য তোমার বোধন করছি।"

ব্রহ্মার স্তবে দেবী জাগরিতা হলেন এবং তাঁর বালিকামূর্তি ছেড়ে চণ্ডিকারূপে ব্যক্ত হলেন। তখন ব্রহ্মা বললেন : "ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে তু শিবে বোধোস্তব দেব্যা কৃতোময়া॥"—"মা, আমরা অকালে তোমাকে ডাকছি রাবণ-বধে রামচন্দ্রকে অনুগ্রহ করবার জন্য।" শুধু তাই নয়। "রাবণস্য বধং যাবদর্চয়িষ্যামহে বয়ম্"—"যতদিন পর্যন্ত না রাবণ বধ হয়,ততদিন পর্যন্ত আমরা তোমার অর্চনা করে যাব।" আরও কথা। আমরা যেভাবে বোধন করে তোমার অর্চনায় ব্রতী হয়েছি, যুগ যুগ ধরে মানুষ "যাবৎ সৃষ্টিঃ প্রবর্ততে"—যতকাল ধরে এই সৃষ্টি থাকবে, ততকাল তোমার অর্চনা করবে। তুমি কৃপা করে তোমার সর্বশক্তি দিয়ে রাবণ-বধে রামচন্দ্রের সহায়ক হও। (বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ, পূর্বখণ্ড, ২২।৫-৮এর ভাবার্থ) স্তবে-তুষ্টা সদ্য-প্রবুদ্ধা দেবী বললেন : "সপ্তমী তিথিতে আমি রামচন্দ্রের দিব্য ধনুর্বাণে প্রবেশ করব। অষ্টমীতে রাম রাবণে মহাযুদ্ধ হবে। অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণে রাবণের দশমাথা ছিন্ন হবে,

আর সেই মাথা পুনর্যোজিত হলে নবমীতে রাবণ নিহত হবে। দশমীতে রামচন্দ্র বিজয়োৎসব করবেন।” (বৃহদ্ধর্মপুরাণ, পূর্বখণ্ড, ২২।১৪-১৭) দেবীর অনুগ্রহে রামচন্দ্র রাবণকে বধ করে সীতাদেবীকে উদ্ধার করলেন। “মহাবিপত্তার-কত্বাদ্ গীয়তেঽসৌ মহাষ্টমী। মহাসম্পদ্দায়কত্বাৎ যা মহানবমী মতা॥” (বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ, পূর্বখণ্ড ২২।২৫-১৬)—“মহাবিপদ কেটে গেল বলে এই অষ্টমীর নাম মহাষ্টমী, আর মহাসম্পদ লাভ হল বলে এই নবমীর নাম মহানবমী।”

রামচন্দ্রের এই দুর্গোৎসব স্মরণ করেই আমাদেরও শারদীয়া মহাপূজা। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বিল্ববৃক্ষতলে দেবীর যে বোধন-স্তব পাঠ করা হয় তা থেকে উহা সুস্পষ্ট। এই স্তবে আছে: হে দেবি, রাবণ-বধের উদ্দেশ্যে এবং রামচন্দ্রকে অনুগৃহীত করবার জন্য পুরাকালে ব্রহ্মা তোমার বোধন করেছিলেন। আমিও তদনুরূপভাবে আশ্বিন মাসে তোমার বোধন করছি, ইত্যাদি।

ব্রহ্মা দেবীর বোধন করেছিলেন রামচন্দ্রের হয়ে, রাবণ-বধে রামচন্দ্রকে অনুগৃহীত করবার জন্য। দেবীর অনুগ্রহে রামচন্দ্র রাবণকে বধ করে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন এবং সীতা-রূপী মহাসম্পদ লাভ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের তাতে কি? আমরা দেবীর বোধন ও পূজা করে কী বিপদ থেকে উদ্ধার পাব আর কী মহাসম্পদই বা লাভ করব? উত্তরে বলতে পারা যায় “যিনি পূজক তিনি স্থিত শ্রীরামের ভূমিকায়। সংসারাশ্রমী সাধারণ নরনারীর দারিদ্র্যই মহা-বিপদ, ঐশ্বর্যই মহাসম্পদ, জীবনযাত্রাই যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মহাবিপদের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া মহাসম্পদ লাভ মায়ের অনু-গ্রহেই হইয়া থাকে। ‘দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা’ (চণ্ডী, ৪।১৭)। যাঁহারা যোগী, সাধনই তাঁহাদের সমর, বিষয়বন্ধনই তাঁহাদের মহাবিপদ, মুক্তিলাভই মহাসম্পদ। জগজ্জননীর অর্চনায় যোগী সাধক সমরে জয়লাভ করেন, তাঁহার ভব-বন্ধন ছিন্ন হয়। তিনি মুক্তি-সুখে ডুবিয়া থাকেন। ‘যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ’ (চণ্ডী, ৪।৯)। যাঁহারা জ্ঞানমার্গের সাধক অজ্ঞানতাই তাঁহাদের মহাবিপদ, ব্রহ্মজ্ঞানই পরম ধন। মহাদেবীর অর্চনায় সাধন-যুদ্ধে তাঁহারা জয়লাভ করেন, কারণ জগজ্জননী নিজেই মূর্ত ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপিণী। যাঁহারা ভক্তিপথের উপাসক তাঁহারা বনবাসী রামচন্দ্রের ভূমিকায় নিরন্তরই ব্যথিত। তাঁহাদের হৃদয়ের ভক্তিরূপিণী সীতা-দেবীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে অপরাধরূপী রাবণ—এই বেদনা তাঁহাদিগকে বেদনাতুর করে। যোগমায়া কাত্যায়নীর আরাধনায় মহাপরাধরূপী দশাননের বধ হয় মহাষ্টমীতে, প্রেমভক্তিরূপিণী সীতার উদ্ধার হয় মহানবমীতে। দশমীতে এই পরম সত্যানুভূতিকে হৃদয়ের গভীর তলদেশে চিত্তদর্পণে নিরঞ্জন করিয়া ভক্ত-সাধক বিশ্বমানবকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করেন।” (চণ্ডীচিন্তা, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী সম্পাদিত, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ: ১১৭)

দ্বন্দ্বময় বিচিত্র এই জগতের মানুষ অন্তর-বাহির উভয়দিক থেকেই শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত। ধনী-নির্ধনের সংঘাত, উচ্চ-নীচের ভেদ, সবলের হস্তে দুর্বলের নির্যাতন—এ সবই মানুষের বাইরের শত্রু। এদের দৌরাত্ম্যে জগতে আজ মানবিক মূল্যবোধ বিপর্যস্ত। তাই যুদ্ধে এদের পরাভূত করতে না পারলে মানুষের জাগতিক অগ্রগতি, অভ্যুদয় অসম্ভব; অপরপক্ষে, দুর্দমনীয় ভোগ-লালসা, দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ ইত্যাদি মানুষের অন্তরশত্রু, সাধকের সাধনায় অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। এদের বিনাশ করতে না পারলে সাধক-জীবনে অগ্রসর হওয়া সুদূর পরাহত। তাই বোধনের এই পুণ্যলগ্নে দেবতাদের মতো আমরাও সঙ্কল্প গ্রহণ করি: হে দেবি, যতদিন পর্যন্ত না আমাদের বাহ্য ও আন্তরশত্রুরূপী রাবণকে আমরা যুদ্ধে পরাভূত করে বধ করতে পারছি, ততদিন আমরা তোমার অর্চনা থেকে বিরত হব না, হে সর্বশক্তিস্বরূপিণী দেবি, তুমি কৃপা করে সর্বশক্তি দিয়ে শত্রু-বিনাশে সর্বতোভাবে আমাদের সহায় হও। তোমার কৃপায় রামচন্দ্রের ন্যায় আমাদেরও যেন মহাবিপদ কেটে গিয়ে মহাসম্পদ লাভ হয়।

সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামী বিবেকানন্দ

মারি লুইস বার্ক

স্বামীজীর শিষ্যদের সম্বন্ধে যতটা আমরা জানি তা এখানে একটু আলোচনা করা যাক্। প্রথমেই মিস্ ডাচারের কথা দিয়ে শুরু করি। সিষ্টার ক্রিস্টিনের মতে 'মিস্ ডাচারের বিবেকবুদ্ধি ছিল প্রখর, তবে তিনি একনিষ্ঠ মেথডিস্ট।' প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যে যে সব দল খুব গোঁড়া, মেথডিষ্ট তাদের অন্যতম। এরা যেন-তেন-প্রকারেণ অপরের ঘাড়ে তাদের ধর্মমত চাপিয়ে দিতে চায়। এটা তাদের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। এই গোঁড়ামি ডাচারেরও ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশে ছিল। এ হেন মানুষ সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজীর অন্যান্য শিষ্য-শিষ্যাদের নিয়ে জমায়েত হলেন। শুধু কি তাই? তাঁরই উদ্যোগে এই জমায়েত ঘটল। আর স্বামীজীর থাকার জন্যে একটু পৃথক ব্যবস্থার দরকার, তাই তাঁর বাড়ির সঙ্গে একটা নূতন অংশও সংযোজন করে দিলেন। এগুলি ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এর একটা অর্থ আছে। অর্থটা হচ্ছে এই যে আপাত-দৃষ্টিতে আমরা ডাচারকে যা মনে করি ডাচার ঠিক তা ছিলেন না। অন্ততঃ সেটা তাঁর পূর্ণ পরিচয় নয়। তাঁর পরিচয় ভাল করে বুঝতে গেলে সেই যুগটার কথা একটু আমাদের জানা দরকার। সেই সঙ্গে তাঁর পারিবারিক পরিচয়, তাঁর ধর্মশিক্ষা—এগুলিও জানা দরকার। এসব মিলিয়ে দেখলে একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সেটা হচ্ছে এই যে তিনি স্বভাবতঃই একজন বিদ্রোহী। এই বৈশিষ্ট্য নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন।

তাঁর জন্ম হয় আনুমানিক ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে। জন্মেছিলেন অসোয়েগো শহরে। নিউ-ইয়র্কের কাছে, সহস্রদ্বীপোদ্যান থেকেও দূরে নয়। গরীব এক কৃষক ঘরে। ঐ যুগে তাঁর মতো গ্রাম্য মেয়েদের বাল্যজীবন যেমন ছিল তাঁরও তাই ছিল। অর্থাৎ শিক্ষাদীক্ষা হয়েছে ছোট্ট একটা পাঠশালায়। ঐ পাঠশালায় ঘর মাত্র একটি। গৃহস্থালীর কাজ বা চাষবাসের কাজেই অধিকাংশ সময় তাঁর কেটে যেত। যে সব অবশ্য-কর্তব্য ছিল তার মধ্যে রবিবারে গীর্জায় যাওয়া অন্যতম। মেথডিস্টরা এই সময়ে প্রায়ই নানা রকমের আলোচনা-সভার আয়োজন করতেন। ওই আলোচনা-সভার নামে যা ঘটত, তা হচ্ছে 'হাত পা ছোঁড়া আর চীৎকার'। একটু-আধটু নয়, বেশ ঘটা করে। মাঝে মাঝে এর ফাঁকে ধর্মকথাও শোনানো হত। কি রকম ধর্মকথা? পাপ, আমরা পাপী, আর আমাদের পাপের শাস্তি নরকের আগুনে পুড়ে মরা। ধর্মকথা মানে এই। সে সব কথা শুনলে মানুষ ভয়ে আধমরা হয়ে যায়, আর অপরাধবোধ তার মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়।

আমি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের কথা বলছি। সেই যুগে কোন গ্রাম্য মেয়ের পক্ষে ঐভাবের শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে তার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া এবং শিল্পকলা শেখার জন্যে নিউইয়র্ক শহরে এসে সেখানকার আর্ট স্টুডেন্টস লীগ এবং অ্যাকাডেমী অব্ ডিজাইন-এ পড়াশোনা করা সোজা কথা নয়। পড়াশোনা শেষ করে ডাচার কিন্তু কৃষিকর্মে আর ফিরে গেলেন না। তিনি রচেষ্টারে গিয়ে বসবাস শুরু করলেন। সেখানে তিনি ছবি আঁকা শেখাতেন, আর মাঝে মাঝে নিজের আঁকা ছবির প্রদর্শনী করতেন। পরে তাঁকে দেখে মনে হত বেশ এক শান্তশিষ্ট,

সভ্য-ভব্য, নিয়মনিষ্ঠ মানুষ ; আসলে কিন্তু তিনি ছিলেন দুঃসাহসী, বেপরোয়া ধরনের মানুষ। তাঁর ভরণ-পোষণ চলত ছবি এঁকে। এ থেকে কিছু অর্থ তিনি আবার সঞ্চয় করতেও পেরেছিলেন। এই সঞ্চয় থেকেই তিনি সহস্রদ্বীপোদ্যানে জমি কিনে ছোট একটা বাড়ি তুলেছিলেন। জমিটা কিনতে তাঁর আনুমানিক একশ ডলার লেগেছিল। তাঁর আয় স্বল্প, তবু যে এতটা টাকা এক সঙ্গে খরচ করতে পেরেছিলেন তাতে তাঁর বেশ দুঃসাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই দুঃসাহসের চেয়ে অনেক বেশি দুঃসাহস তিনি দেখালেন যখন তিনি একজন হিন্দুকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে বসলেন। এটা বেশ অনুমান করা যায়, তাঁর ধর্মান্ধ প্রতিবেশীরা কি ভাববেন তা নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু অনিবার্যভাবে তাঁর প্রতিবেশীরাও চুপচাপ ছিলেন না। ষোল বছরের ছোট একটি মেয়ে তার বাবা-মা'র সঙ্গে পাহাড়ের পাদদেশে বাস করত। শোনা যায় সে নাকি একদিন স্বামীজীর সঙ্গে 'কথা বলতে চেয়েছিল'। এতে তার মা তাকে এক ধমক দিয়ে বলেছিলেন—'খবরদার, ঐ লোকটার কাছে কখনও যেওনা। ও এক অখ্রীষ্টান বর্বর।' মিস্ ডাচার কিন্তু টলবার পাত্রী নন। একদিন তিনি তাঁর বাড়িতে স্বামীজীর বক্তৃতার ব্যবস্থা করে তাঁর প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন যাতে এই 'বর্বর' লোকটির সম্বন্ধে তাদের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়। এ বেলায় তিনি আর শান্তশিষ্ট ভাল মানুষটি নন, তাঁর যেমন উৎসাহ, তেমন মনের জোর, সাহস ও দৃঢ়তা। কিন্তু তাঁর মধ্যে কোমলতাও ছিল প্রচুর। আক্ষরিক অর্থে একটা মাছিকেও তিনি আঘাত করতে পারতেন না। অথচ মাছির উৎপাত ছিল খুব। তাই মাছি না মেরে ধরতেন। মাছি ধরবার একটা জালের তৈরি ফাঁদ ছিল তাঁর। তাতে মাছি ধরা পড়ত কিন্তু ব্যথা পেত না। সমস্ত দিন ধরে অনেক মাছি ঐ জালে বন্দী হয়ে থাকত, সন্ধ্যাবেলা জঙ্গলে নিয়ে যেয়ে তাদের ছেড়ে দিতেন।

স্বামীজী নিউইয়র্কে যখন ক্লাস করতেন মিস্ ডাচার সেগুলিতে যোগ দিতেন। তাঁর ভাষণ শোনার পর স্বামীজীর ধর্মচিন্তা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তাঁর কিছুটা ধারণা জন্মেছিল। স্বামীজীকে বাড়িতে ডেকে আনা মানে যেন খাল কেটে কুমীর আনা তা নিশ্চয়ই তিনি বুঝেছিলেন। স্বামীজীর ধর্মচিন্তা যেন প্রচণ্ড একটা ঝঞ্ঝা যা নিমেষে অন্য সব কিছুকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। মিস্ ডাচারেরও কিছু ধর্মমত ছিল, যা তিনি আবাল্য লালন-পালন করে এসেছেন, যার প্রভাবে তাঁর জীবন গড়ে উঠেছে, যা তাঁর জীবনসঙ্গী হয়ে আছে। তিনি নিশ্চয়ই জানতেন স্বামীজী নিমেষে তাঁর সমস্ত ধর্মমতকে তছনছ করে দিতে পারেন। কিন্তু ঝড় আসছে জানলেই কি ঝড় থেকে রেহাই পাওয়া যায়? বস্তুতঃ স্বামীজী সহস্রদ্বীপোদ্যানে এসে যা শিখিয়ে দিয়ে গেলেন তাতে তাঁর জীবনের ভিতটা পর্যন্ত নড়ে গেল। স্বামীজীও কারোর গায়ে আঁচড় না লাগে এমনভাবে শেখাবার পাত্র ছিলেন না। যা সত্য বলে তিনি জানেন, যা শেখাতেই তিনি এসেছেন, তা শেখাবেনই। কিন্তু স্বামীজীর বাণী, মিস্ ডাচার যাকে এতদিন সত্য ও সুন্দর বলে জেনে এসেছেন, ঠিক তার বিপরীত, এককথায় নাস্তিকতার চূড়ান্ত। কিন্তু তবু এই বাণীকে উপেক্ষা করবেন কি করে? এ যে এক সত্যদ্রষ্টার বাণী। সেই বাণী শুনে তাঁর অন্তর্জগতে যে ঝড় উঠল তাতে তিনি বিধ্বস্ত হয়ে পড়লেন। তাই তিনি মাঝে মাঝে দু-তিন দিনের জন্যে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন। খুব সম্ভব কোন

প্রতিবেশীর বাড়িতে লুকিয়ে থাকতেন। অন্যদের বুঝিয়ে স্বামীজী বলতেন—'ওর অসুখ সাধারণ অসুখ নয়। মনের মধ্যে যে তুমুল কাণ্ড ঘটছে, শরীর যেন তা আর সহ্য করতে পারছে না, এটা তারই অভিব্যক্তি।' কিন্তু মিস্ ডাচার শেষ পর্যন্ত তাঁর কর্তব্যে অবিচল রইলেন। পাশ্চাত্য জগতে স্বামীজীর বাণী প্রচারে তাঁর অবদান অমূল্য হয়ে রইল।*

* Swami Vivekananda in the West : New Discoveries, The World Teacher, (Part one), Vol III, (3rd Edition, 1985) গ্রন্থের 'Thousand Island Park' পরিচ্ছেদের অংশবিশেষ (পৃঃ ১১৯-২১) স্বামী লোকেশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত, সম্পূর্ণ অনুবাদ 'উদ্বোধন কার্যালয়' থেকে গ্রন্থাকারে যথা সময়ে প্রকাশ করা হবে।—সঃ

জলাতঙ্ক-রোগ

ডক্টর সন্দীপকুমার চক্রবর্তী

ভাইরাসজনিত মারাত্মক রোগগুলির মধ্যে জলাতঙ্কের স্থান শীর্ষে বলা যেতে পারে। 'রেবিস' নামে এক ধরনের ভাইরাসই এই রোগের কারণ। কামড় বা আঁচড়ের মাধ্যমে এই ভাইরাস এক পশু থেকে অপর এক পশুর দেহে সংক্রামিত করে রোগ সৃষ্টি করে থাকে। মানুষের মধ্যে এই রোগ দেখা দিলে তাকে জলাতঙ্ক বা hydrophobia বলে।

সভ্যতার শুরু থেকেই এই মারাত্মক রোগটির কথা জানা যায়। প্রাচীন মিশর, রোম, গ্রীস প্রভৃতি দেশের ইতিহাসে এই রোগের উল্লেখ আছে। বনে-জঙ্গলে পশু-পক্ষীর মধ্যে এই রোগের বিবর্তন চলছে। অনুমান করা হয় যে, প্রথম দিকে রেবিস রোগটি শিয়াল, খেঁকশিয়াল, হায়না প্রভৃতি বন্য শ্বাপদ-শ্রেণী জন্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; পরে কুকুরের মধ্যে সংক্রামিত হবার পর রোগটির প্রসার ঘটে লোকালয়ের মধ্যে। গৃহপালিত জীবজন্তুর মধ্যে কুকুরই মানুষের বেশি সান্নিধ্যে বাস করে ও তার ফলে সময়ে সময়ে এদের আঁচড় ও কামড়ের মাধ্যমে মানুষ এই মারাত্মক রোগের শিকার হয়।

শ্বাপদজাতীয় প্রাণী ছাড়াও রেবিস-রোগ যে-কোন উষ্ণশোণিত (warm blooded) প্রাণীতে দেখা যায়। দক্ষিণ আমেরিকায় এক ধরনের বাদুড় দেখতে পাওয়া যায় যারা নিজেরা রেবিস-রোগের লক্ষণ প্রকাশ না করলেও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে এই রোগ ছড়িয়ে থাকে। এই বাদুড়গুলি গবাদি পশুর দেহে কামড় বসিয়ে রক্ত শোষণ করে থাকে। কোন কোন সময়ে রেবিস-আক্রান্ত পশুর দেহে কামড় দেবার ফলে এই বাদুড়গুলোর দেহে রেবিসের ভাইরাস প্রবেশ করে ও লালাগ্রন্থির মধ্যে থেকে যায়; পরে অন্যান্য সুস্থ প্রাণীকে কামড়ানোর ফলে তাদের দেহে রোগ সৃষ্টি করতে পারে। এইভাবে ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশে বছরে কয়েক হাজার গবাদি পশু রেবিস-রোগে মারা যায়। আবার ঐ বাদুড়গুলো থাকে এই সকল দেশের পাহাড় পর্বতের বিভিন্ন গুহায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে অনেকে এই সকল গুহায় প্রবেশ করলে বাদুড়গুলো আত্মরক্ষার জন্য চতুর্দিকে নিজেদের লালা বিচ্ছুরিত করতে থাকে। এই লালায় যদি রেবিস ভাইরাস থাকে তবে অনেকেই প্রশ্বাসের মাধ্যমে এই রোগের শিকার হয়েছেন বলে শোনা গিয়েছে।

মানুষ থেকে মানুষে এই রোগ সংক্রামণের কথা শোনা যায়নি; তবে এ-প্রসঙ্গে একটি

ঘটনার অবতারণা এখানে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এক ব্যক্তির চোখের কর্নিয়া অপর এক ব্যক্তির চোখে প্রতিস্থাপন করায় ৫০ থেকে ৮০ দিনের মধ্যে কর্নিয়া-গ্রহিতা জলাতঙ্ক-রোগে মৃত্যু বরণ করেন। কর্নিয়া দান করার সময়ে দাতার দেহে জলাতঙ্ক-রোগের লক্ষণ দেখা যায়নি; পরে তিনিও (খুব সম্ভবত) জলাতঙ্ক-রোগে মারা যান।

কয়েকটি পরোক্ষ উপায়েও জলাতঙ্ক-রোগ সংক্রামণের সম্ভাবনা আছে। রেবিস-রোগে আক্রান্ত পশুর দুধ এবং মাংস ঠিকমত না ফুটিয়ে বা সিদ্ধ করে খাওয়া এবং শিশুর জলাতঙ্ক রোগাক্রান্তা মায়ের স্তন্যপান করার ফলে মুখগহ্বরস্থিত ক্ষত বা আঁচড়ের মাধ্যমে এই রোগের সম্ভাবনা থাকতে পারে। আবার অনেক সময়ে বাজারে মাংসের দোকানে অসাবধানতা-বশতঃ রেবিস রোগাক্রান্ত পশুর মাংস কাটার সময়ে হাতে কোন কাটা বা ক্ষতের মাধ্যমে এই রোগ হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। এইভাবে প্রতিষেধক টিকা নেওয়া না থাকলে গবেষণা-গারে রেবিস রোগাক্রান্ত পশুর মস্তিষ্ক বের করবার সময়েও অসাবধানতাবশতঃ ধারাল অস্ত্রে হাত কেটে গেলে ঐ ক্ষতের মধ্য দিয়ে বিপদের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকতে পারে।

পৃথিবীতে প্রতি বছর ন্যূনপক্ষে এক হাজার জনের মতো ব্যক্তি জলাতঙ্ক-রোগে মৃত্যু-বরণ করেন। যে সকল দেশে এই রোগের হার (তথা মৃত্যুহার) খুব বেশি তার মধ্যে ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি, উত্তর-আফ্রিকা ও দক্ষিণ-আমেরিকার কয়েকটি দেশের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল দেশে বছরে গড়ে দশ লক্ষেরও বেশি লোককে বিভিন্ন প্রাণীর দংশনের জন্য রেবিসের টিকা নিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে বছরে গড়ে প্রায় ৫০,০০০ ব্যক্তি বিভিন্ন প্রাণীর কামড়ে রেবিস চিকিৎসাকেন্দ্র-গুলিতে যান এবং ঐ প্রাণীগুলির মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগই কুকুর। এই রাজ্যে প্রায় দেড় লক্ষ লাইসেন্সবিহীন কুকুর বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়ায়, কলকাতায় বেলেঘাটা আই. ডি. হাসপাতালে বছরে গড়ে ১০০ থেকে ১৫০ বা তারও বেশি ব্যক্তি রেবিস-রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হন, যাদের মধ্যে মৃত্যুর হার শতকরা একশতভাগই। এই সকল তথ্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই রোগ কতটা ভয়াবহ।

জলাতঙ্ক-রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা সঙ্গত। রেবিস রোগাক্রান্ত জন্তুর কামড়ের কিছুদিন পরে মানুষের শরীরে রোগের লক্ষণ দেখা যায়। কামড়ের পর থেকে রোগ লক্ষণের সময়ের ব্যবধান (Incubation period) নির্ভর করে দেহের দংশিত স্থানের উপর। মোটামুটি-ভাবে, দংশিত স্থান দেহের নিম্নাঙ্গ হলে ৬০ দিন পর, উর্ধাঙ্গ হলে ৪০ দিন পর এবং মুখ এবং তৎসংলগ্ন স্থান হলে ৩০ দিন পর রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। এর কারণ এই যে দংশিত স্থান থেকে রেবিস ভাইরাসগুলি নিকটস্থ একটি নার্ভে প্রবেশ করে এবং ঐ নার্ভের মাধ্যমে দৈনিক ২-৩ মিলিমিটার গতিতে মস্তিষ্কের দিকে এগোয়। ন্যূনতম ৬দিন থেকে শুরু করে এক বছর পরেও রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। প্রথম প্রথম মাথাব্যথা, গলায় ব্যথা, ক্ষুধামান্দ্য-ভাব, কোন কিছু ভাল না-লাগা এবং সময়ে সময়ে সামান্য জ্বরভাব বোধ হয়। কামড়ানোর স্থানটি ঝিনঝিন করে ও কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ স্থানে স্নায়বিক অনুভূতি ব্যাহত হয়। এরপর খাদ্য গ্রহণে অস্বস্তি, বিশেষ করে তরল খাদ্য গ্রহণে বিষম লাগে যেটা ক্রমশঃই বাড়তে থাকে; কারণ শ্বাসনালি ও অন্ননালিদ্বয়ের পেশীগুলি রোগের ফলে সংকুচিত হয় (tracheo-oesophageal

Spasm)। এই সময়ে জল খাওয়া তো দূরের কথা, জল দেখলেও আতঙ্ক হয়, তাই রোগটির নাম জলাতঙ্ক। ধীরে ধীরে রোগী তার জ্ঞান হারাতে থাকে ও মাঝে মাঝে খিঁচুনি (Convulsion) দেখা যায়। শেষে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন (Coma) অবস্থায় ও শ্বাসকষ্টের মধ্যে রোগীর জীবনাবসান ঘটে।

রেবিস-আক্রান্ত প্রাণীগুলির, বিশেষ করে কুকুরের মধ্যে যে প্রধান লক্ষণগুলি দেখা যায় সেগুলিও জানা বিশেষ প্রয়োজন; কারণ এ সম্বন্ধে পূর্ব-অভিজ্ঞতা সহজেই রেবিস-চিকিৎসা সম্বন্ধে সচেতন করতে পারবে। সুস্থ কুকুর অপর কোন রেবিস-রোগাক্রান্ত কুকুর বা অন্য কোন প্রাণী দ্বারা দংশিত হবার ২-৮ সপ্তাহের মধ্যে রোগ-লক্ষণ প্রকাশ করে থাকে। যাদের পোষা কুকুর, তারা প্রথম প্রথম কুকুরটির ব্যবহারগত পরিবর্তন লক্ষ্য করে থাকবেন; অর্থাৎ শান্তশিষ্ট কুকুরটির মধ্যে অযথা ক্ষিপ্তভাব ও অপরকে দেখলে তেড়ে যাওয়া বা কামড়ানোর চেষ্টা; এমনকি বাড়ির লোকেরাও বিনা প্ররোচনায় এর কামড় বা আঁচড় থেকে অব্যাহতি পান না। যে কোন জিনিস, এমন কি কোন বস্তুর ছায়া পর্যন্ত দেখলেও তেড়ে যায় এবং গলার স্বরেরও পরিবর্তন দেখা যায়। এই ক্ষিপ্তভাব কয়েকদিন থাকবার পর কুকুরটি হঠাৎ নিস্তেজ হয়ে পড়ে ও ঘরের কোন নির্জন ও অন্ধকার কোণে চুপচাপ পড়ে থাকে; মুখ থেকে অতিরিক্ত লালা ঝরতে থাকে এবং খাদ্য ও পানীয়ের প্রতি আসক্তি থাকে না বললেই চলে। ক্রমশঃ প্রাণীটি আরও নিস্তেজ হয়ে পড়ে ও কয়েকদিনের মধ্যেই মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ে। এই-রূপ অসুস্থ কুকুরকে স্পর্শ করার ফলে, তার লালা মানুষের শরীরের কোন ক্ষত অংশের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে জলাতঙ্ক-রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

জলাতঙ্ক-রোগ যতই মারাত্মক হোক না কেন, এই রোগ দূরীকরণ করা সম্ভব। ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া-সমেত বিশ্বের কয়েকটি দেশ এখন সম্পূর্ণ রেবিসমুক্ত। সে সব দেশে বনে জঙ্গলে যে সব লোক কাজ করে, তারা নিয়মিতভাবে এই রোগের টিকা লয়। আরও অনেকগুলি দেশে এই রোগের হার ক্রমশঃ নিম্নমুখী। কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিলে এ রোগ আমাদের দেশেও অনেকাংশে কমিয়ে ফেলা সম্ভব। প্রথমে পথে-ঘাটে বেওয়ারিস কুকুর ও অন্যান্য প্রাণী যাদের থেকে কামড়ের সম্ভাবনা থাকে তাদের এখনই নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত। বাড়ির প্রতিটি পোষা কুকুরের জন্য লাইসেন্স ও রেবিস-প্রতিরোধক (antirabis) টিকা বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন জনসংযোগ মাধ্যমে জলাতঙ্ক-রোগের বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করা বিশেষ প্রয়োজন।

রেবিস-টিকা না-নেওয়া কুকুর বা অন্য কোন প্রাণীর কামড়ের পরেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া কর্তব্য; কারণ এ বিষয়ে শৈথিল্য মারাত্মক পরিণতির কারণ হতে পারে। কুকুর বা কোন জন্তুর কামড়ের পরেই ক্ষতস্থানটিকে প্রথমে সাবান দ্বারা ও পরে পরিষ্কার জলে ভাল ভাবে ধুয়ে ফেলা দরকার। এরপর ক্ষতস্থানে এলকোহল বা টিনচার আয়োডিন লাগানো যেতে পারে। এরপর জীবাণুমুক্ত (Sterile) পাতলা কাপড়ের দ্বারা স্থানটি ঢেকে রাখা দরকার। অনেকে ক্ষতস্থানটিতে কার্বলিক এ্যাসিড প্রয়োগ করে থাকেন; এটা করা কখনও উচিত নয়, কারণ এর দ্বারা ক্ষতস্থানটির নিকটস্থ নার্ভশাখাগুলির ক্ষতি হয়, যার ফলে ভাইরাসগুলির নার্ভের মাধ্যমে মস্তিষ্কের দিকে অগ্রসর হবার সুবিধা হয়। পরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই কোন চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

এখানে এন্টি-রেবিস চিকিৎসার কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার যা বিশ্ব-স্বাস্থ্যসংস্থার (W. H. O.) অনুমোদিত।

১। পাগলা কুকুর বা ঐ জাতীয় প্রাণীর সংস্পর্শে থাকলেও এদের থেকে যদি কোন আঁচড় বা কামড় না হয়ে থাকে, তবে প্রাণীটি রেবিস-আক্রান্ত হলেও কোন চিকিৎসার (এন্টি-রেবিস) প্রয়োজন নেই। তবে সেই জন্তু চাটলে বা অন্যভাবে কারও গায়ে লালা লাগলে, চামড়ার কোন ক্ষত স্থান দিয়ে রেবিস-ভাইরাস প্রবেশ করতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে টিকা লওয়া বাঞ্ছনীয়।

২। প্রাণীটি যদি কোন ব্যক্তিকে জিব দিয়ে চেটে থাকে অথবা তার দেহে আঁচড় বা কামড় বসিয়ে থাকে এবং প্রাণীটি যদি

(ক) পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে 'রেবিস' (বিশেষজ্ঞের পরীক্ষা দ্বারা) বলে প্রমাণিত না হয়, তাহলে কোন চিকিৎসার প্রয়োজন নেই।

(খ) সেই সময়ে বা পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে যদি রেবিস বলে প্রমাণিত হয়, তখনই সেই ব্যক্তিকে এন্টি-রেবিস চিকিৎসার অধীনে আনতে হবে।

৩। কামড়ের পর প্রাণীটির যদি কোন হদিস না পাওয়া যায় (বন্য প্রাণী বা রাস্তাঘাটের যে কোন দাঁতাল প্রাণী) তাহলে তাকে অবশ্যই এন্টি-রেবিস চিকিৎসার অধীনে আনতে হবে।

এন্টি-রেবিস চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ হল টিকা বা ভ্যাক্সিন। এ ছাড়াও আনুষঙ্গিক চিকিৎসার প্রয়োজন আছে। যদি দংশিত স্থানটি বিস্তৃত জায়গা জুড়ে অথবা ক্ষতটি গভীর হয়, সে ক্ষেত্রে টিকা ছাড়াও এন্টি-রেবিস ইমিউনোগ্লোবিউলিন (antirabis immunoglobulin) নেওয়া দরকার। সিরামে অবস্থিত এই জৈব পদার্থটিকে নির্দিষ্ট পরিমাণে ক্ষতস্থানে ওপেশীতে ইন্‌জেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হয়। এ ছাড়া কামড় বা আঁচড়ের স্থানটি—'টিটেনাস্' ও অন্যান্য বীজাণু দ্বারা দূষিত হওয়ার দরুণ টিটেনাস টক্সয়েড ইন্‌জেকসন্ ও উপযুক্ত এন্টিবায়োটিক প্রয়োগের দরকার।

এন্টি-রেবিস টিকার মধ্যে সর্বপ্রথম নার্ভটিস্যু-ভ্যাক্সিনের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সম্বন্ধে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী লুই পাস্তর কর্তৃক উদ্ভাবিত (ভেড়ার মস্তিষ্ক-কোষ থেকে) টিকার দ্বারা পরবর্তিকালে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি এই মারাত্মক রোগ থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। আমাদের দেশে ভেড়ার মস্তিষ্ক হতে তৈরি টিকাই প্রচলিত। প্রত্যহ একটি করে মোট ১৪টি ইন্‌জেক্‌শন্ পেটের মাংস পেশীতে দেওয়া হয়ে থাকে। স্নায়ুকোষ থেকে তৈরি হেতু কোন কোন ক্ষেত্রে টিকা চলাকালীন বা পরবর্তিকালে এলার্জিক এনসেফালাইটিস বা অন্যান্য স্নায়বিক অসুস্থতার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় এতে রোগীর মৃত্যু হয়—রেবিস ভাইরাসের জন্য নয়। সম্প্রতি মনুষ্য-দেহকোষে (W-I 38 human diploid cell culture) প্রস্তুত অধিক কার্যকরী রেবিস-টিকা আমেরিকা-সমেত অনেক উন্নত দেশে চালু হয়েছে। এই টিকা কোন জন্তুর মস্তিষ্কে তৈরি নয় বলে, এতে এনসেফালাইটিস হয় না। এই টিকা এখনও পর্যন্ত খুবই দুর্মূল্য। অবশ্য আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে এই টিকা আমাদের দেশেও সহজ-লভ্য হবে। তখন আর রেবিস-টিকা লওয়া অত ভীতিকর থাকবে না। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, জলাতঙ্ক একটি মারাত্মক ব্যাধি হলেও—সম্যক সচেতনতা এবং সরকার ও বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান-গুলির সম্মিলিত প্রয়াসে এই রোগ আমাদের দেশেও বহুলাংশে দূরীকরণ করা সম্ভব।

বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার : তৃতীয় দিনের কথা

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

তৃতীয় বার যেদিন হেমচন্দ্রের কাছে গেলাম সেদিনটি ছিল ১৪ এপ্রিল, ১৯৭৮। আমাকে দেখে খুশি হলেন। বললেন : আপনার কথাই ভাবছিলাম। সেদিন আপনার কাছে স্বামীজীর কথা বলার পর থেকে মাথায় শুধু স্বামীজীই ঘুরছেন। তাঁর কথাই ভাবছি শুধু। ভাবছিলাম আপনি এলে ভাল হত। আমার কাছে এখন কেউ এলেই তাঁকে স্বামীজীর কথাই বলছি। তাঁর কথা মানেই তো ভারতবর্ষের কথা, ভারতবর্ষের উত্থানের কথা। কোন নেগেটিভ কথা ছিল না তাঁর[১]। সব সময় আশা, উদ্যম আর এগিয়ে চলার কথা। পিছন-ফেরাকে, হতোদ্যম হওয়াকে তিনি ঘৃণা করতেন। দেশের আজ দুর্দশা দেখে অনেকে আমার কাছে এসে ক্ষোভ প্রকাশ করেন, হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। কিন্তু আমি ওদের দলে নই। বিবেকানন্দের কাছে আমরা ও-জিনিস শিখিনি। এ একটা ইতিহাসের পাসিং ফেজ। এ চলে যাবে। স্বামীজী বলেছেন : 'আমাদের ভবিষ্যৎ গৌরবময়। অতীতের সব গৌরবচ্ছটা সেই গৌরবের মহিমার কাছে ম্লান হয়ে যাবে।' এ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির বাণী। এ তো ব্যর্থ হতে পারে না। আসলে আমরা যারা কাঁদুনি গাইছি আজ আমাদের দেশকে, আমাদের সমাজকে, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে কী দিতে পেরেছি, কতখানি দিয়েছি তার কথা কেউ ভাবি না। বিবেকানন্দ আমাদের দিয়েছিলেন, আমাদের ভরে দিয়েছিলেন, আমাদের আত্মাকে জাগিয়ে দিয়েছিলেন। সেই শক্তিতে আমরা চলেছিলাম, আমরা লড়াই করেছিলাম। তারপর আমরা তাঁকে ভুলে যাবার চেষ্টা করেছি, অস্বীকার করার চেষ্টা করেছি। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য উৎস খোঁজার চেষ্টা করেছি শক্তি সঞ্চয়ের; দেশ গঠনের, জাতি গঠনের, সমাজব্যবস্থা গঠনের পরিকল্পনা করেছি, সমস্যার সমাধান খুঁজেছি অন্যতর পথে, ভিন্নতর আদর্শে। তবে আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষ আবার স্বামীজীর কাছেই ফিরে আসবে এবং আসছেও। আসলে আমরা

১ এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা স্মরণীয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলের শেষ। আলমবাজার মঠের বড় ঘরটিতে বসে স্বামীজী মঠের 'নিয়মাবলী' মুখে বলে যাচ্ছেন, লিখছেন স্বামী শুদ্ধানন্দ (তখন মঠে মাত্র নবাগত)। এক সময় স্বামীজী বললেন : 'দেখিস, যদি কোন নিয়মটা নেগেটিভ ভাবে লেখা হয়ে থাকে, সেটাকে পজিটিভ করে দিবি।' (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯।৩৪৩-৪৪) স্বামীজী সম্পর্কে রোমাঁ রোলাঁকে কথিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহু পরিচিত সেই বিখ্যাত উক্তিটিও মনে পড়ে। রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্যারিসে যখন প্রথম দেখা হয় (এপ্রিল, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ) শোনা যায় তখন রোমাঁ রোলাঁ ভারতবর্ষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কাছে জানতে চান। রবীন্দ্রনাথকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ বই পড়লে তিনি ভারতবর্ষকে জানতে পারবেন। উত্তরে রোমাঁ রোলাঁকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : If you want to know India, study Vivekananda. In him there is nothing negative, everything positive.' (যদি ভারতবর্ষকে আপনি জানতে চান তাহলে বিবেকানন্দের রচনাবলী পড়ুন। তাঁর মধ্যে নেতিবাচক কোন কথা নেই, সবকিছুই ইতিবাচক।) মঠের প্রাচীনতম সন্ন্যাসী স্বামী অভয়ানন্দজীর (ভরত মহারাজের) কাছে শুনেছি রোমাঁ রোলাঁ স্বয়ং এ তথ্য স্বামী অশোকানন্দজীকে জানিয়েছিলেন। রোমাঁ রোলাঁর ডায়েরীতে (ভারতবর্ষ—অনুবাদ : অবন্তী সান্যাল, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ১০-১৮) এই সাক্ষাতের যে বিবরণ রোমাঁ রোলাঁ নিজে লিখে রেখেছিলেন

হারিয়ে ফেলেছি একটা মূলবস্তু যেটা স্বামীজী আমাদের দিয়েছিলেন—আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা, আমাদের জাতীয়তাবোধ।

আমি: গতদিন আপনি বলেছিলেন ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণে স্বামীজীর অবদানের কথা। বলেছিলেন স্বামীজীই ভারতে যথার্থ জাতীয় জাগরণের সূচনা করেছিলেন।

হেমচন্দ্র: সে তো ইতিহাস। আমার কথা নয়। শুধু 'জাতীয় জাগরণ' বললে সবটা বোধ হয় বলা হয় না। জাতীয়তাবোধ—ন্যাশন্যালিজম্—এই বস্তুটি ভারতবর্ষে স্বামীজীরই দান। বাস্তবিক স্বামীজী যে জাগরণ এনেছিলেন তাই ভারতবর্ষে সামগ্রিকভাবে ন্যাশন্যালিজম্-এর উন্মেষ ঘটিয়েছিল। কিন্তু ন্যাশন্যালিজম্-এর যে ধারণা ভারতবর্ষ স্বামীজীর কাছ থেকে পেয়েছিল তার সঙ্গে 'ন্যাশন্যালিজম্' বলতে সাধারণভাবে যা বোঝায় তার একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। স্বামীজী যে ন্যাশনালিজম্-এর চেতনা ভারতবর্ষে সঞ্চার করেছিলেন তার মূলে ছিল একটা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি। 'দেশ' শুধু দেশ নয়, দেশ হল 'মা', আর জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সারা দেশের মানুষ হল পরস্পরের ভাই। কারণ তারা সবাই সেই বিরাট মায়ের সন্তান। এই দৃষ্টি, এই চেতনা, এই বোধ বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে দিয়েছিলেন। 'ন্যাশন্যালিজম্'—বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি জাতীয়তাবাদ। আর স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গিতে ন্যাশন্যালিজম্ হল জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয়তাবোধ। প্রথমটি বাইরের ব্যাপার। তার প্রধান তাৎপর্য রাজনৈতিক। দ্বিতীয়টি ভিতরের বস্তু, মানসিক ব্যাপার। তার তাৎপর্য শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে ছাড়িয়ে অনেক গভীরে তার ব্যাপ্তি। 'বোধ' প্রথমে একটা ভিত্তি প্রস্তুত করে মনে, পরে তা ক্রিস্ট্যালাইজড্ হয়ে বাইরে আত্মপ্রকাশ করে। সেটা হয় 'বাদ'। স্বামীজীর ন্যাশন্যালিজম্ এই 'বোধ' ও 'বাদ' এর মিলিত রূপ। এর মাধ্যমে

তাতে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির কোন উল্লেখ নাই। আমরা যতদূর অবগত আছি তা থেকে বলতে পারি যে রোলাঁ স্বামী বিবেকানন্দের নাম সম্ভবতঃ সেই প্রথম শুনেছিলেন। মনে হয় তাঁর সম্পর্কে আগে থেকে কোন ধারণা না থাকার জন্য রবীন্দ্রনাথের ঐ উক্তির কোন প্রভাব রোলাঁর উপর তখন পড়েনি। তাই তাঁর ডায়েরীতে তা উল্লেখিত হয়নি। ডায়েরীতে দেখছি রোলাঁ প্রথম 'নতুন রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের' নাম এবং তাঁদের কাজের প্রশংসা শোনেন ৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৬, জনৈক ভারতীয় খ্রীষ্টান কে. টি. পলের কাছে (পৃঃ ১৬২)। কে. টি. পল রোলাঁকে বলেন, 'আর্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে এই সম্প্রদায় ভারতবর্ষের মনে প্রকৃত সাড়া জাগায়।' রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সম্পর্কে রোলাঁ ভালভাবে অবহিত হন ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে এর মাস খানেক পর—৪ অক্টোবর। তখন সদ্যপ্রকাশিত ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Face of Silence'-এর সবেমাত্র 'কয়েকটি পাতা' তাঁর বোন তাঁকে পড়ে শুনিয়েছেন। তা এমনই তাঁকে 'পেয়ে বসেছে' যে তিনি লিখছেন: 'আমি সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করেছি, রামকৃষ্ণ ও তাঁর তেজস্বী শিষ্য বিবেকানন্দের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পড়াশুনা করা এবং ইউরোপে তাঁদের পরিচিত করা আমার কর্তব্য।' (পৃঃ ১৬৬) রোলাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের স্বামীজী সম্পর্কিত ঐ উক্তি সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যও জানা গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের (২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮) পর উদ্বোধন' পত্রিকায় (ভাদ্র, ১৩৪৮ সংখ্যায়) যে বিশেষ সংবাদ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয় তাতে লেখা হয়: 'মনীষী রোমাঁ রোলাঁ যখন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চরিত্রের উপাদান সংগ্রহ করিতেছিলেন, তখন শান্তিনিকেতনে একদিন আমাদের জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, 'রোমাঁ রোলাঁর সহিত আমার কথা হয়েছিল। আমি তাঁকে বলেছিলাম—"If you want to know India, study Vivekananda. In him there is nothing negative, everything positive." ' (পৃঃ ৪৪২-৪৩)

তিনি ভারতবর্ষের মানুষের মনে জাগ্রত করে দিতে পেরেছিলেন, বাংলা, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, গুজরাট, কাশ্মীর—যে প্রদেশের আমরা লোক হইনা কেন, যে ভাষায় আমরা কথা বলিনা কেন আমরা সকলেই ভারতবাসী এবং ভারতবাসী একটাই জাতি। ভারতবর্ষ সকলেরই জন্মভূমি—নিজ জননীরই আরেক রূপ। জন্মভূমিকে 'জননী' বলে ভাবনা এদেশে কিছু নতুন জিনিস নয়। প্রাচীনকাল থেকেই এ ভাবনা এদেশে প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রচলিত থাকলেও তা ছিল বিচ্ছিন্নভাবে ছোট ছোট গণ্ডী ও গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সমগ্র ভারতবর্ষকে আগে কখনও কোন ভারতবাসী নিজের জন্মভূমি হিসেবে দেখেছে বলে কোন প্রমাণ পাই না। এই দৃষ্টি, এই বোধ বর্তমানকালেই এসেছে এবং স্বামীজীই ছিলেন তার প্রথম বলিষ্ঠ প্রবক্তা।[২] স্বামীজী আমাদের বলেছিলেন : 'হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী—এই বিরাট দেশ হল আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি—আমাদের মা। আমরা বাংলায় জন্মেছি, কেউ জন্মেছে মাদ্রাজে, কেউ কাশ্মীরে, কেউ গুজরাটে, কেউ বা আর কোথাও। কিন্তু সকলেরই মাতৃভূমি এই ভারতবর্ষ। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম—ভারতের সকল প্রান্তের জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে নিয়েই আমরা একটা বিরাট পরিবার—একটা বিরাট জাতি। হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, বাঙালী-পাঞ্জাবী, মারাঠী-কাশ্মীরী—আমরা সবাই ভাই। সকলেরই জন্মভূমি এই ভারতবর্ষ। তারই বুকের রক্ত আমাদের সবাইকে বাঁচিয়ে রেখেছে।' আধুনিক ভারতবর্ষে স্বামীজীর পূর্বসূরীদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এই ধারণার আংশিক প্রকাশ দেখা যায়। 'আংশিক' বলছি এই কারণে যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেশমাতৃকা' এবং 'দেশবাসী'র ধারণা বাংলা এবং বাঙালীকে কেন্দ্র করেই সীমিত ছিল। 'বন্দেমাতরম্'-এ যে দেশজননীর বন্দনা করা হয়েছে তিনি স্পষ্টতই

২ ভারতবর্ষকে জননীরূপে কল্পনার ব্যাপারে বর্তমানকালের ইতিহাসে স্বামীজীকে 'প্রথম' বললে ইতিহাসের দিক থেকে ভ্রান্তি হবে। স্বামীজীর আগে একাধিক ব্যক্তি ভারতবর্ষকে জননী হিসেবে দেখেছেন। ঈশ্বরগুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) বলেছেন : 'জননী ভারতভূমি' ('ভারতের ভাগ্যবিপ্লব')। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৯০৩) ভারত-বিষয়ক একাধিক কবিতায় (রচনাকাল ১৮৭৫) 'ভারতজননী'র দুরবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-৯৪) তাঁর 'পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থে (রচনাকাল আনুমানিক ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ) যে 'অধিভারতী' দেবীর বন্দনা করেছেন তা আসলে ভারতমাতাই। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কাব্যনাট্য 'ভারতমাতা' কলকাতার ন্যাশন্যাল থিয়েটারে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি অভিনীত হয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'দশমহাবিদ্যা' প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (আশ্বিন, ১২৮০) প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানেও ভারতকে জননীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। হিন্দুমেলার যুগে (১৮৬৭-১৮৮০) গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১-১৮৬৯), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬ ', সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) প্রভৃতি রচিত গানগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের জননীরূপ ও অখণ্ড ভারতবর্ষের চিন্তা স্পষ্ট পরিস্ফুট। কিন্তু একথাও আবার ইতিহাসের দিক থেকেই স্বীকার করতে হবে যে ভারতবর্ষের জননীরূপ ও অখণ্ড ভারতের কল্পনা স্বামীজীর কিছু আগে জাগ্রত হয়ে থাকলেও তার প্রভাব ছিল বাংলার প্রধানতঃ কলকাতার এবং বিশেষতঃ শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সমগ্র ভারতবর্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সমর্থন নিয়ে ঐ কল্পনাকে প্রথম বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজীর সেই ভাবনা সমগ্র ভারতবর্ষে সাড়া জাগিয়েছিল। ইতিহাসের বিচারে এটিও অনস্বীকার্য তথ্য। সুতরাং সেদিক দিয়ে হেমচন্দ্র যে স্বামীজীকে ভারতবর্ষের জননীরূপের 'প্রথম বলিষ্ঠ প্রবক্তা' বলেছেন তা সত্য।

বাংলা-মা, আর যে 'সপ্তকোটি' মানুষের কথা বলা হয়েছে তারাও নিঃসন্দেহে বাঙালী। সে সময়ে বাংলার লোকসংখ্যা ছিল প্রায় সাত-কোটি[৩]। রবীন্দ্রনাথ কয়েক বছর পর[৪] বলছেন : 'সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী, রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি'। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'বন্দেমাতরম্' এবং 'আনন্দমঠ' সম্পর্কে আমাকে বলেছিলেন : 'এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনা বাংলাকেন্দ্রিক।'[৫] ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারেরও ঐ একই রকম ধারণা বলে আমাকে

৩ ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে সর্ব প্রথম লোকগণনা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যায় (চৈত্র, ১২৭৮ মার্চ-এপ্রিল, ১৮৭২) 'বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা' প্রবন্ধে দেখা যায় তখন বাংলার লোকসংখ্যা ছিল ছয় কোটি আটষট্টি লক্ষ আটান্ন হাজার দুশো ছাপ্পান্ন জন। তখন 'বাংলা' বলতে বোঝাত বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর ও আসাম নিয়ে গঠিত 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী'কে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আসাম এবং বঙ্গ-ভাষাভাষী শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া এই তিনটি অঞ্চলকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নতুন একটি প্রদেশ গঠন করা হয়। সুতরাং 'বঙ্গদেশে'র লোকসংখ্যা এর ফলে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের জনসংখ্যার থেকে বেশ কিছু হ্রাস পায়। কিন্তু ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের শেষে 'বন্দে মাতরম্' যখন সম্পূর্ণভাবে 'আনন্দমঠে' প্রকাশিত হয় তখন ১৮৭৪ থেকে ১৮৮২ এই আট বছরের মধ্যে বাংলার হ্রাসপ্রাপ্ত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে 'প্রায় সাতকোটি' হওয়াই সম্ভব। 'বন্দে মাতরম্'-এর 'সপ্তকোটি' প্রসঙ্গে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন বাংলার লোকসংখ্যা তখন ছিল সাত কোটি। (History of the Freedom Movement in India, Vol. 11, Calcutta, p. 150) প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, স্বদেশী আমলের প্রথম দিকে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' দেশবাসীর কাছে মুক্তি সংগ্রামের মহাসঙ্গীতরূপে পরিণত তখন 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে ভারতবর্ষকে উদ্দিষ্ট করার জন্য সরলা দেবী 'সপ্তকোটি কণ্ঠ'র জায়গায় 'ত্রিংশ কোটি কণ্ঠ' এবং 'দ্বিসপ্তকোটি ভুজ'-এর জায়গায় 'দ্বিত্রিংশকোটি ভুজ' করে দেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'গাও ভারতের জয়' (১৮৬৮) গান সম্পর্কে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় যে মন্তব্য করেছিলেন তাতে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা বিশ কোটি বলে তিনি উল্লেখ করেছিলেন। (দ্রষ্টব্য : প্রবোধচন্দ্র সেন, ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত, কলকাতা, ১৩৫৬, পৃঃ ৪৪)

৪ রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির রচনার তারিখ : ২৬ চৈত্র ১৩০২ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ। কবিতাটির নাম 'বঙ্গমাতা'।

৫ এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে যা থেকে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মতের সঙ্গেও আমরা পরিচিত হই। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মূলতঃ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের চেষ্টা ও উৎসাহে আয়োজিত বঙ্কিম-উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চুঁচুড়া থেকে কাঁঠালপাড়ায় আসছেন। তিনি লিখছেন : 'আমার পানসী কাঁঠালপাড়ার ঘাটে লাগিল, আমার পাশে একগলা গঙ্গাজলে উপাধ্যায় স্নান করিতেছিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া আমি প্রথমেই প্রশ্ন করিলাম, "আপনারা বঙ্গমাতা, বঙ্গমাতা লইয়া এত বাড়াবাড়ি করিয়া জগজ্জননী ভারতমাতাকে ভুলিতে বসিয়াছেন কেন ? আমরা কি কাশী কাঞ্চী মথুরার মায়া ভুলিয়া যাইব ? বেদ স্মৃতি পুরাণ ইত্যাদি সমস্তই ভুলিব ? রাম লক্ষ্মণ ভীষ্ম দ্রোণের কথা মনেই আনিব না ? সে কিরূপ Patriotism (দেশভক্তি) হইবে ?" ব্রহ্মবান্ধব আমার প্রশ্নে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। ধীরে ধীরে ঘাটে উঠিলেন, আমিও উঠিতে লাগিলাম। উপাধ্যায় মাথা পুঁছিতে পুঁছিতে বলিলেন, "আপনি বঙ্কিমোৎসবে আসিতেছেন, তিনি যে সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে বলিয়া গিয়াছেন—তবেই তো বাঙ্গালী হইল।" আমি বলিলাম, "সন্ন্যাসীরা বুঝিয়াছিল, ভারতমাতার তরবারি ধরিবার উপযুক্ত ব্যক্তি (fighting force) সপ্তকোটি।" ব্রহ্মবান্ধব আবার বলিলেন, "আনন্দমঠ জিনিসটা বাঙালী লইয়া।" আমি বলিলাম, "কে বলিল ? একজন হিমালয়দেশবাসী মহাপুরুষ পরিচালক, আর বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতে সমগ্র ভারতের সুবোধ্য সহজ সংস্কৃত ; ইহাতেই কি বুঝা যায় না যে, সেই সঙ্গীত ভারতমাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত ?" ব্রহ্মবান্ধব নিরুত্তর হইলেন, আমিও স্বস্তিলাভ করিলাম।' (দ্রষ্টব্য : বঙ্কিমসরণী, প্রমথনাথ বিশী, কলকাতা, ১৩৭৪, পৃঃ

জানিয়েছেন*। স্বামীজীর চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্রের সেই আংশিক ভাবনাই পূর্ণতা পেয়েছে। ব্রহ্মবান্ধবও একথা আমাকে বলেছেন। ঐতিহাসিক হিসেবে রমেশচন্দ্র মজুমদারও এই মতের সমর্থক। স্বামীজী যখনই বলেছেন, 'Our country' (আমাদের দেশ) অথবা 'My country' (আমার দেশ) তখন তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের কথাই বোঝাতেন। যখন বলেছেন, 'Our countrymen' (আমাদের দেশবাসী) অথবা 'My countrymen' (আমার দেশবাসী) তখনও সমস্ত ভারতবাসীর কথাই বলতে চেয়েছেন। আর সেই চেতনাই তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে সঞ্চার করতে। বলেছেন : 'সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।' বলেছেন : 'বল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ।' স্বামীজীর এই বাণীই ছিল আমাদের মন্ত্র। সে যুগে তাই ছিল আমাদের আদর্শ। শুধু সে যুগে কেন, আজও তাই। স্বামীজীর আগে জাতীয়তার এর চেয়ে মহত্তর বাণী এ যুগে আর কেউ শোনাতে পারেননি। আর পরেও কি কেউ পেরেছেন? স্বামীজী শুধু বাণীই দেননি, তিনি নিজেই ছিলেন তাঁর বাণীর মূর্ত পরাকাষ্ঠা। নিবেদিতা তাঁর সম্বন্ধে বলতেন : স্বামীজী ছিলেন 'Incarnation of India's national life.' (ভারতের জাতীয় জীবনের মূর্ত বিগ্রহ) বলতেন : 'Swamiji was himself the living embodiment of that idea which the word "nationalism" conveys.' ('জাতীয়তা' শব্দটি যে ভাবকে প্রকাশ করে স্বামীজী ছিলেন সেই ভাবের জীবন্ত দেহধারী প্রকাশ।) যা সত্যি তাই বলেছেন নিবেদিতা। ভারতবর্ষ এক, ভারতবাসীও এক—এই বাণী স্বামীজী দেশের সর্বত্র প্রচার করেছিলেন এবং নির্মাণ করে দিয়েছিলেন এক অখণ্ড ভারতবর্ষের বনিয়াদ, যে ভারতবর্ষ একদিন সর্বশক্তিমান বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল। আমি সেই মহাভারতের রূপ এবং তার রূপকারকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছি আমার জীবনে। তাই ভারত-বিভাগকে আমি কোনদিন মেনে নিতে পারিনি। স্বামীজী যে আমাদের শিখিয়ে গেছেন : ভারতবর্ষ এক, ভারতবাসীও এক। এবং ঐক্যবদ্ধ ভারতবাসী এক ও অখণ্ড ভারতবর্ষের মুক্তির জন্যেই বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে সেই অভূতপূর্ব জাতীয়তাবোধের জাগরণ ছিল স্বামীজীরই অবদান বলে আমি মনে করি।

১৭৯-৮০) অক্ষয়চন্দ্র সরকার ব্রহ্মবান্ধবের নীরবতাকে তাঁর মতের প্রতি সমর্থনসূচক বলে মনে করেছিলেন। ঘটনাটি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের। হেমচন্দ্র ঘোষ বর্তমান লেখককে বলেছিলেন (চতুর্থ সাক্ষাৎকার : ২০ এপ্রিল ১৯৭৮) যে তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সঙ্গে ঐ কথা হওয়ার পরেও ব্রহ্মবান্ধব তাঁর নিজ ধারণাতেই দৃঢ় ছিলেন যে 'বন্দে মাতরম্' (এবং 'আনন্দমঠ') বাংলাকেন্দ্রিক। অবশ্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মতো আরও অনেকে মনে করেন 'বন্দে মাতরম্' ও 'আনন্দমঠ' বাংলাকেন্দ্রিক নয়, ভারতকেন্দ্রিক। সম্প্রতি প্রকাশিত (১৩৮৯) 'আনন্দমঠ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' গ্রন্থটিতে (পৃ: ৭১-৭৪) জীবন মুখোপাধ্যায় সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

৬। 'বন্দে মাতরম্' প্রসঙ্গে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের লিখিত মন্তব্যও আমরা দেখেছি। তিনি লিখেছেন : 'It is really a song addressed to Bengal.' (History of the Freedom Movement in India, Vol. II, p. 149)

আমি হেমচন্দ্রকে বললাম : কেউ কেউ বলেন, বিবেকানন্দ পলিটিক্যাল ন্যাশন্যালিজম্-এর কথা না বলে স্পিরিচুয়াল ন্যাশন্যালিজম্-এর কথা বলেছেন। আপনিও কি তাই বলতে চান?

হেমচন্দ্র : আমি তো বললাম [স্বামীজী যে ন্যাশন্যালিজম্-এর চেতনা সঞ্চার করেছিলেন তার মূলে ছিল একটা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ স্বামীজী যে ন্যাশন্যালিজম্-এর কথা বললেন তাকে আমরা স্পিরিচুয়াল ন্যাশন্যালিজম্ বলতে পারি। স্বামীজী বলছেন দেশ তোমার শুধু জন্মভূমি নয়, দেশ তোমার জননী। শুধু তাই নয়। দেশ আবার জগজ্জননী মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রকাশ। দেশের মানুষ সেই মহামায়ার সন্তান। ভারতমাতা আসলে জগতের মা। স্বামীজীর এই চিন্তাকে অবলম্বন করেই পরবর্তিকালে ভারতবর্ষের বিপ্লব-আন্দোলনের ধারা পুষ্টিলাভ করেছিল এবং তা-ই পলিটিক্যাল ন্যাশন্যালিজম্ এর রূপ নিয়েছিল। তাঁর আদর্শের প্রেরণাতেই পরাধীন ভারতবর্ষ কাপুরুষতার বিরুদ্ধে, লজ্জাকর বিদেশী-অধীনতার বিরুদ্ধে, অত্যাচারী বৃটিশ-রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল হয়েছিল। তিনি প্রত্যক্ষভাবে এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেননি—যেমন নেমেছিলেন রাণা প্রতাপ, শিবাজী অথবা গুরু গোবিন্দ সিংহ। কিন্তু ভিন্নভাবে, প্রেরণার দিক দিয়ে সমগ্র জাতিকে তিনি ফায়ার করে দিয়েছিলেন। তিনি সংগ্রামের পটভূমি রচনা করে দিয়েছিলেন। তাঁর বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মাহুতি দিতে এগিয়ে এসেছিল সহস্র সহস্র সৈনিক এবং সেই সংগ্রাম পরিচালনার জন্য যোগ্য সেনাপতিরা। প্রতাপ, শিবাজী, গোবিন্দ সিংহ—এঁদের গভীর দেশপ্রেম ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু তাঁদের দেশপ্রেম ছিল ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সে দেশপ্রেম সমগ্র ভারতবর্ষের জন্যে ছিল না। স্বামীজীর দেশপ্রেম ছিল সারা ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে। তাঁর বেদনা ছিল গোটা ভারতবর্ষের পরাধীনতার জন্যে। সেই প্রেম, সেই দৃষ্টি প্রতাপ, শিবাজী, গোবিন্দ সিংহ কারোর ছিল না। তবে স্বামীজীর কথা মনে হলে আমার শিবাজীর গুরু স্বামী রামদাসের কথা মনে পড়ে। স্বামী রামদাস ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের এক সার্থক পূর্বসূরী; যদিও ক্ষুদ্র ছিল তাঁর প্রভাবের পরিধি, সীমিত ছিল তাঁর ঐক্য চেতনার দৃষ্টি। কিন্তু তবু তিনি চিরস্মরণীয়। কারণ তিনি ছত্রপতি শিবাজীর স্রষ্টা। ঐ সন্ন্যাসীর বাণীকেই পাথেয় করেছিলেন শিবাজী। তাঁর 'ভাগোয়া ঝাণ্ডা' ছিল স্বামী রামদাসের গৈরিক অঙ্গবাস। আর স্বামীজীর আদর্শকে সম্বল করে স্বাধীনতার ঝাণ্ডা তুলেছিলাম আমরা, তুলেছিলেন একালের শিবাজী নেতাজী। স্বামীজীর দেওয়া দেশ-প্রেমিকের যে রূপরেখা আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল সেই সর্বত্যাগী, দুঃসাহসী, সত্যাশ্রয়ী ভারত-প্রেমিক দেশনায়কের প্রতিচ্ছবি আমি দেখেছি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মধ্যে। স্বামীজীর ধারণা অনুসারী ছিল নেতাজীর দেশপ্রেমের ধারণা। দেশ ছিল তাঁর ধর্ম, তাঁর ধ্যানের দেবতা, তাঁর সাধনার বীজমন্ত্র—আর সে দেশ 'অখণ্ড ভারতবর্ষ'। ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে নেতাজী সুভাষচন্দ্রই ছিলেন স্বামীজীর যথার্থ উত্তরসাধক। সুভাষচন্দ্র আমাকে বলেছিলেন : 'ভারতবর্ষকে আমি ভালবেসেছি বিবেকানন্দ পড়ে। আর বিবেকানন্দকে আমি চিনেছি নিবেদিতার লেখায়।' বস্তুতঃ বিবেকানন্দের দেশপ্রেমের ফায়ারকে নিবেদিতা তাঁর জীবনের মধ্যে ধারণ করেছিলেন। শুধু ধারণই করেননি তিনি, সেই আগুনকে তিনি বহনও করেছিলেন ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। ভারতবর্ষের যেখানে তিনি গিয়েছেন, যেখানে তিনি থেকেছেন, সেখানেই তিনি জ্বালাময়ী ভাষায়

প্রচার করেছেন স্বামীজীর ভাব, স্বামীজীর বাণী, স্বামীজীর আদর্শ। সেই সঙ্গে তিনি প্রচার করেছেন ভারতবর্ষকে। বস্তুতঃ বিবেকানন্দকে আমরা তো চিনলাম নিবেদিতার মাধ্যমে তাঁর সাক্ষাৎ সান্নিধ্যে এসে। ভারতবর্ষকেও তো আমাদের চেনালেন তিনি। স্বামীজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় মাত্র চৌদ্দ দিনের। কিন্তু নিবেদিতার সঙ্গে মিশেছি অনেক বেশি। সুভাষ-চন্দ্রের মতো নিবেদিতার মাধ্যমেই স্বামীজীকে আমরা চিনতে পেরেছি, সেই সঙ্গে চিনেছি ভারতবর্ষকে। সুভাষচন্দ্রের অবশ্য নিবেদিতার সাক্ষাৎ সান্নিধ্যে আসা হয়নি। নিবেদিতার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য: স্বামীজীর বাণী ও ভাব প্রচারের ব্যাপারে তিনি দুটি ভূমিকা পালন করেছেন। একটি মহাদেবের, অপরটি ভগীরথের। স্বামীজীর বাণী ও আদর্শের প্রবল বেগকে তিনি মহাদেবের মতো নিজের মধ্যে ধারণ করেছেন, আবার ভগীরথের মতো সেই দুর্মদ স্রোতধারাকে তিনি বহন করে বেড়িয়েছেন। নিবেদিতা আমাদের বলতেন: 'India was Swamiji's greatest passion. The thought of India was virtually an obsession with him. India throbbed in his breast, India beat in his pulses, India was his day-dream, India was his nightmare. Not only that. He himself became India. He was the embodiment of India in flesh and blood. He was India, he was Bharat—the very symbol of her spirituality, her purity, her wisdom, her power, her vision and her destiny.' (ভারতবর্ষ ছিল স্বামীজীর গভীরতম আবেগের কেন্দ্র। স্বামীজীর কাছে ভারতবর্ষের চিন্তা ছিল প্রকৃতপক্ষে [সমগ্র সত্তা-পরিপ্লাবী] এক আচ্ছন্নতার মতো। ভারতবর্ষ নিত্য স্পন্দিত হত তাঁর বুকের মধ্যে, প্রতিধ্বনিত হত ভারতবর্ষ তাঁর ধমনীতে, ভারতবর্ষ ছিল তাঁর দিবাস্বপ্ন, ভারতবর্ষ ছিল তাঁর নিশীথের দুঃস্বপ্ন। শুধু তাই নয়। তিনি নিজেই হয়ে উঠেছিলেন ভারতবর্ষ—রক্তে-মাংসে গড়া ভারত-প্রতিমা। তিনি স্বয়ং ছিলেন ইণ্ডিয়া—ছিলেন ভারত। [বস্তুতঃ] ভারতের আধ্যাত্মিকতা, তার পবিত্রতা, তার প্রজ্ঞা, তার শক্তি, তার স্বপ্ন এবং তার ভবিষ্যৎ—সবকিছুর তিনি ছিলেন প্রতীক-পুরুষ।) স্বামীজীর সম্পর্কে এর চেয়ে যোগ্যতর বর্ণনা কিছু হতে পারে বলে আমার জানা নেই, আর কেউ কখনও করতে পারবেন বলেও আমি মনে করি না। স্বামীজীর সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ লেখা হয়েছে। কিন্তু কি গভীরতায়, কি বর্ণনায়, নিবেদিতার 'দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' এখনও সর্বশ্রেষ্ঠ। ভবিষ্যতেও তাঁর লেখাকে অতিক্রম করতে কেউ পারবেন না বলে আমার ধারণা। এখনও পর্যন্ত নিবেদিতাই স্বামীজীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ তাঁর কাছে বিবেকানন্দ উজাড় করে দিয়েছিলেন তাঁর ভাব ও আদর্শকে, উজাড় করে দিয়েছিলেন তাঁর ভারতবর্ষকে। প্রেরণার এক গভীর মুহূর্তে নিবেদিতার কাছে আত্ম-উন্মোচন করেছিলেন বিবেকানন্দ। নিবেদিতাকে তিনি বলেছিলেন, (জানিনা স্বামীজীর কোন জীবনীতে এ-কথা লিপিবদ্ধ আছে কি না[৭]), নিবেদিতার নিজের মুখ থেকে আমি শুনেছি, 'আমিই ভারতবর্ষ।'

৭। স্বামীজীর কোন জীবনীতে এই ধরনের কথা আমাদের চোখে পড়েনি। তবে অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীতে (১৯৬৫) আছে (P. 255): 'No wonder that he (Swamiji) spoke of himself to one of his beloved Western disciples in later times as "A condensed

সেই ভারতবর্ষের জন্যই নিঃশেষে নিবেদন করেছিলেন নিজেকে নিবেদিতা। ভারতবর্ষের জন্য ? অথবা বিবেকানন্দের জন্য ? কারণ নিবেদিতার চেতনায় ভারতবর্ষ ও বিবেকানন্দ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ : ভারতবর্ষের এক নাম বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দের আরেক নাম ভারতবর্ষ।

India." স্বামীজীর এই 'প্রিয় পাশ্চাত্য শিষ্য' কে ? ভগিনী নিবেদিতাই কি ? স্বামীজীর ঐ ধরনের আরও দু একটি উক্তির সংবাদ পাই রোমাঁ রোলাঁর ডায়েরীতে। রোলাঁ জানিয়েছেন, সেগুলির সূত্র মিস ম্যাকলাউড। রোলাঁ লিখছেন : 'বিবেকানন্দ বেশির ভাগ সময়ই ছিলেন কিশোরসুলভ চরম হাস্যচপল। তাই একদিন তাঁকে ঠাট্টা করে (মিস ম্যাকলাউড) বলেছিলেন, "স্বামীজী, আপনি ধর্মপ্রবণ লোক নন" ; আর তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়েছিলেন : "আমিই ধর্ম"'। (ভারতবর্ষ, পৃঃ ১৯৩) আর একবার স্বামীজীকে অনুযোগ করা হয়েছিল তিনি কোন নূতন ভাব আনছেন না। তেরশ বছরের পুরানো (শংকরাচার্য প্রচারিত অদ্বৈতবাদের) চিন্তাই তিনি পরিবেশন করছেন। তখন স্বামীজী বলেছিলেন : "আমিই শংকর"। (ঐ, পৃঃ ১৯৮)

সাগরসঙ্গমে

স্বামী চৈতন্যানন্দ

গঙ্গা। হিমালয়ের কন্যা গঙ্গা। গোমুখ থেকে বেরিয়ে ছোট বালিকার ন্যায় কলরব করে নৃত্যের তালে তালে ছুটে চলেছে। সে যেন চপল বালিকা। কারোর কোন বাধা মানে না। সব বাধাকে চূর্ণ করে সে তার গতিপথ করে নিচ্ছে। পাথরের বড় বড় বোল্ডার তার গতিকে ব্যাহত করতে সদা ব্যস্ত। কিন্তু তার গতি ব্যাহত করে এমন কারও শক্তি নেই। কারণ সে চলেছে সাগরের সঙ্গে মিলিত হতে। সাগরে মিলিত হওয়ার যে তীব্র বাসনা তা তাকে সব বাধাকে দূরে নিক্ষেপ করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তাই তো সে ছুটে চলেছে।

কত পাহাড়ী ঝরনাধারা গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়ে তার গতিবেগকে আরও দুর্বার করেছে। এখন সে পূর্ণযৌবনা। অনন্ত শক্তি তার। পাহাড়ী রাস্তার সমস্ত বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে এখন সে সমতলভূমির উপর দিয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে সাগরসঙ্গমে।

সাগরে মিলিত হয়ে তার সমস্ত উচ্চৈঃস্বরের কলরব স্তব্ধ। এখন শান্ত। মিলনের প্রশান্তির আনন্দে নিমগ্না।

তার দীর্ঘপথযাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটল।

মানবজীবনের যাত্রা শুরু হয় কবে থেকে তা কেউ জানে না। কোন্ অনাদি কাল থেকে যে সে চলতে শুরু করেছে তার ঠিক নেই। তবে আমরা একটি জীবনকে ধরে যাত্রা শুরু করতে পারি। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েই সেই যাত্রা শুরু।

ভূমিষ্ঠ হয়েই চলে শিশুর হাসি-কান্নার নৃত্য। সেই হাসি-কান্নার নৃত্য জীবনের নানা অবস্থায়—কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। এইভাবে নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে তাকে নানা বাধাবিঘ্নের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। পরিণতিতে মৃত্যু। এই মৃত্যু কি আমাদের যাত্রার শেষ পরিণতি—আমাদের গন্তব্যস্থল ? মৃত্যু-সাগরে মিলিত হওয়ার অনুপ্রেরণায় কি আমরা যাত্রা শুরু করি ?

সংসার জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ। সংসার-প্রবাহের

অব্যক্ত অবস্থা হল মৃত্যু। অতএব মানবজীবনের শেষ পরিণতি, গন্তব্যস্থল—মৃত্যু হতে পারে না। ঈশ্বররূপ মহাশক্তির সঙ্গে মানুষরূপ জীবশক্তির মিলনই মানবজীবনের শেষ পরিণতি। একে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেন। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা; যোগীরা বলেন, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন ঘটা; ভক্তরা বলেন, ঈশ্বরলাভ করা প্রভৃতি। যা হোক দার্শনিক মতবাদ নিয়ে আমাদের কচকচানি করার প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রয়োজন যাত্রার গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো, দীর্ঘ-যাত্রার পরিসমাপ্তি।

একটি জীবন কিভাবে নানা বাধা বিঘ্নের পথ পেরিয়ে সেই মহাশক্তির সঙ্গে মিলিত হল তাই আমাদের এখানে আলোচ্য বিষয়।

নিবেদিতা। পূর্বনাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল্। জন্ম ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ অক্টোবর উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের টাইরন্ প্রদেশের ছোট শহর ডানগ্যানন-এ। তাঁর ধমনীতে আইরিশ স্বাধীনতাস্পৃহার রক্ত প্রবাহিত। আর প্রবাহিত ছিল পূর্বপুরুষদের আদর্শনিষ্ঠা, ভগবদ্ভক্তি, সমাজসেবা প্রভৃতি গুণরাশি।

মার্গারেট ছোটবেলা থেকেই ভারী জেদী। কোন কিছুতেই সে হার মানবে না। যুক্তি দিয়ে সবকিছু যাচাই করে নিতে চায়। যা কিছু করবে প্রাণ-মন ঢেলে, তন্ময় হয়ে—সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে, এতটুকুও ফাঁকি থাকে না সেখানে। অপরকে প্রভাবিত করার তাঁর যে ব্যক্তিত্ব তার স্ফুরণ ছোটবেলা থেকেই হতে থাকে। তিনি যেখানেই গিয়েছেন তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ সেখানেই পড়েছে। সহপাঠিনীদের তিনি ছিলেন নেত্রী। বুদ্ধির প্রখরতা ও চিন্তাশীলতার দ্বারা তিনি খুব সহজেই সহপাঠিনীদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন। তাঁর সহপাঠিনীদের কারো কারো দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন গর্বিত, জেদী, অসহিষ্ণু ও তার্কিক।

মার্গারেট চার্চের অধীনে বিদ্যালয়ের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে মানুষ হয়েছেন। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দৈনন্দিন জীবনের কাজ করতে হয়েছে। কখন কখন অনুভূতিহীন, অনুদার ধর্মের আচার-আচরণ এবং শুধুমাত্র কঠোর নিয়মের বাঁধন তাঁর ভিতরের স্বাধীনচেতা মনকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। সব নিয়ম-কানুনের গণ্ডি ভেঙে চুরমার করে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের ভাল দিকগুলির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকায় এবং জীবনদেবতার আহ্বান যে-কোন সময় আসতে পারে এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি ঐ অসহনীয় নিয়ম-কানুনের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসেননি। তিনি নিজেকে সংযত রেখে যেন শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছেন আগামী দিনের বন্ধুর পথ চলার জন্য।

মার্গারেট নোব্‌ল্-এর শিক্ষার প্রতি ছিল প্রচণ্ড অনুরাগ। তাই শিক্ষা সমাপ্ত হওয়া মাত্র তিনি শিক্ষয়িত্রীব্রত অবলম্বন করেন। নিজস্ব প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়ার প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ। এইসময় তিনি পৃথিবীখ্যাত মনীষিবৃন্দের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁদের সঙ্গে একই মঞ্চে বক্তৃতা করেন। তখন আর তাঁর কত বয়স ? ৩০।৩২ বছর হবে। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় ও আলোচনার ফলে মার্গারেটের চিন্তাশক্তির প্রখরতা বৃদ্ধি পায়। মনীষিবৃন্দ তাঁর অদ্ভুত মেধাশক্তি দেখে খুব প্রশংসা করেন। ঐ মনীষিবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বার্নার্ড শ, হাক্সলী প্রমুখের মতো ব্যক্তিরা। মার্গারেটের নানা বিষয়ে মননশীল প্রবন্ধগুলিও সে-সময়ে সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, তেজস্বিতা, বুদ্ধিমত্তা, রচনাশৈলী, বাগ্মিতা তাঁকে লণ্ডনের বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত করে তুলেছিল।

মার্গারেট নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন শিক্ষায়-দীক্ষায়, বুদ্ধিমত্তায়, অভিজ্ঞতায়—সবকিছুর মধ্য দিয়ে। এখন তিনি দূরের আহ্বানের প্রতীক্ষায় আছেন। তাঁর অন্তরাত্মা সবসময় সচেতন ছিল কোন এক আহ্বানের জন্য। কিসের সেই আহ্বান তা তিনি জানতেন না। বহুমুখী প্রতিভার দ্বারা তিনি বিদ্বৎসমাজের প্রথম সারির একজন হয়ে উঠেছিলেন—যা সাধারণ মানুষের কাম্য, তবু তিনি মনে শান্তি পাচ্ছিলেন না। তাঁর যাত্রাপথের কোথায় যেন একটা বাধা। কোন্ পথ দিয়ে বেরিয়ে তিনি দুর্বার গতিতে ছুটে চলবেন মহাশক্তিরূপ সাগরের দিকে—ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাঁর ভিতরের শক্তি মহাশক্তির সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য যেন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

মার্গারেটের যুক্তিবাদী মন যেন চাইছিল এক সর্বজনীন ধর্ম। যে-ধর্ম বলে 'ধর্ম ও সত্য এক'। যে-ধর্ম জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের পক্ষে লভ্য। যে-ধর্মের কাছে সবাই সমান। কোথায় সেই ধর্ম? শুধুমাত্র আচারনিষ্ঠ, অনুদার খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে তার সন্ধান তিনি পাচ্ছিলেন না। তাই তাঁর যুক্তিবাদী মন সংশয় ও দ্বন্দ্বের মধ্যে দোলায়মান। মার্গারেট পথ পাচ্ছিলেন না এই সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসতে। হতাশ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তবে কি তাঁর জীবনদেবতার আহ্বান আসবে না? এমনি করে কি তাঁর জীবন বৃথা যাবে?

এমনি যখন মার্গারেটের মনের অবস্থা সেই সময় (১৮৯৫) স্বামী বিবেকানন্দ "তৃষ্ণার্তের নিকট সুশীতল পানীয়ের ন্যায় উপস্থিত" হলেন শান্তির বাণী নিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, কেবল মার্গারেট এই সংশয়-দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন না, সারা পাশ্চাত্যের মনীষিবৃন্দও ছিলেন। সেই সংশয়মুক্তির শুভক্ষণটি সম্বন্ধে মার্গারেট অনবদ্য ভাষায় লিখেছেন:

"আমাদের অনেকের নিকটেই স্বামী বিবেকানন্দের বাণী তৃষ্ণার্তের নিকট সুশীতল পানীয়ের ন্যায় উপস্থিত হইয়াছিল। ধর্ম সম্বন্ধে ক্রমবিবর্ধমান অনিশ্চয়তা এবং হতাশা বিগত অর্ধ-শতাব্দী ধরিয়া য়ুরোপের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। গত কয়েক বৎসর আমাদের অনেকেই এ বিষয়ে বিশেষ সচেতন হইয়াছেন। খ্রীষ্টীয় অনুশাসনে আস্থা রাখা আমাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব, আবার এখনকার ন্যায় আমাদের নিকট এরূপ কোন অস্ত্র ছিল না, যাহার সাহায্যে মত রূপ আবরণ ছিন্ন করিয়া ধর্মের অন্তর্নিহিত প্রকৃত তত্ত্বের মর্ম-উদ্ঘাটন করা যাইত। স্বীয় প্রত্যক্ষ-উপলব্ধ জ্ঞান সম্বন্ধে এই সকল ব্যক্তিগণের যে সন্দেহ ছিল, বেদান্ত তাহা সমর্থন করিয়া দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছে। অন্ধকারে যাহারা দিগ্‌ভ্রষ্ট হইয়াছিল, তাহারা আলোক দেখিতে পাইয়াছে।"[১]

গঙ্গা পাহাড়ী দুস্তর পথ অতিক্রম করে সমতলভূমিতে যেমন তীব্রবেগে ছুটে চলে সাগরসঙ্গমের জন্য তেমনি মার্গারেট সংকীর্ণ প্রবল বাধাবিঘ্ন উত্তরণের পর উদার পথ পেয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন মহাশক্তিসঙ্গমে। স্বামীজীর কাছ থেকে এই দুস্তর পথ অতিক্রমণের মহামন্ত্র লাভ করে এগিয়ে চলেছেন মার্গারেট।

স্বামীজী মার্গারেটের নতুন নাম দিয়েছিলেন নিবেদিতা। ভারতের নারীজাতির উন্নতিকল্পে তিনি নিবেদিতাকে বেছে নিলেন। ভারতীয় নারীর উন্নতি না হলে ভারতের উন্নতি সম্ভব নয়। ভারতীয় নারীদের উপর স্বামীজী তাঁদের উন্নতির দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন। ৬ এপ্রিল ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতী'-পত্রিকার সম্পাদিকা সরলা ঘোষালকে একটি পত্রে লিখেছিলেন:

১ ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, ২য় সং (১৯৬৩), পৃঃ ২১

"প্রভু করুন, যেন আপনার মতো অনেক রমণী এদেশে জন্মগ্রহণ করেন ও স্বদেশের উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করেন।"

স্বামীজীর এই আশা পূরণ করতে তখন ভারতীয় কোন নারী এগিয়ে আসেননি। লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত, লাঞ্ছিত নারীর দুঃখকষ্ট স্বামীজীর হৃদয়কে বিদীর্ণ করেছিল। স্বামীজীর এই হৃদয়-বেদনা তখন কোন ভারতীয় নারীর হৃদয় স্পর্শ করেনি, কিন্তু বিদেশিনী মার্গারেটের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। স্বামীজীর কাজের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি। মৃত-প্রাণকে সঞ্জীবিত করার স্বামীজীর সেই আহ্বান তাঁর কর্ণকুহরে অনুরণিত হয়ে হৃদয়ের মর্মস্থলে স্পর্শ করেছিল: "হে মহাপ্রাণ, ওঠ, জাগো! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে?"[২] এ যেন মরণ-পারে যাওয়ার আহ্বান!

বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে নিবেদিতা স্বামীজীর প্রদর্শিত নারীজাগরণের কাজে জীবনোৎসর্গ করতে ভারতে এলেন। স্বামীজীর সঙ্গে ভারতের বিভিন্নপ্রান্তে ভ্রমণ করে তিনি ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হলেন। প্রখর বুদ্ধি দিয়ে তিনি সবকিছু যাচাই করে নিলেন। যেখানে তাঁর মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছে সেখানেই তিনি তা প্রকাশ করতে আদৌ দ্বিধা বোধ করেননি। তাঁর সমস্ত সংশয়কে স্বামীজী তাঁর গভীর জ্ঞানালোক দিয়ে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। এমনিভাবে স্বামীজী তাঁকে তৈরি করে নিলেন ভারতের কাজের জন্য।

ভারতীয় নারীদের উন্নতিকল্পে কাজ করতে হলে এমন একজন নারীর সংস্পর্শে নিবেদিতার আসা প্রয়োজন যিনি হবেন ভারতীয় নারীর আদর্শস্বরূপা। কারণ এদেশের নারীদের মধ্যে কাজ করতে হলে এখানকার নারীদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করা দরকার। তাই স্বামীজীর চোখে যিনি ছিলেন ভারতীয় নারীকুলের আদর্শস্বরূপা, তাঁরই কাছে তিনি নিবেদিতাকে নিয়ে এলেন। সেই আদর্শস্বরূপা ছিলেন রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের জননী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী। স্বামীজী নিবেদিতারূপ জীবশক্তিকে মহাশক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন। গুরুর কাজই তো তাই, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন ঘটিয়ে দেওয়া।

নিবেদিতার বহুমুখী প্রতিভায় ভারতের বিদ্বৎসমাজ চমকিত। তাঁর প্রতিভার প্রভাব উনবিংশ শতাব্দীর এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন না যাঁর উপর পড়েনি। তাঁর দুর্বার ব্যক্তিত্বের কাছে অনেকে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছেন। যাঁরা নিজেদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চেয়ে-ছিলেন তাঁরা নিবেদিতার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতেন। তবু তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব তাঁরা এড়িয়ে থাকতে পারতেন না। বিরাট ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মহামনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন: "তাঁহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, সেই সঙ্গে তাঁহার আর একটি জিনিস ছিল, সেটি তাঁহার যোদ্ধৃত্ব। তাঁহার বল ছিল এবং সেই বল তিনি অন্যের জীবনের উপর একান্ত বেগে প্রয়োগ করিতেন—মনকে পরাভূত করিয়া অধিকার করিয়া লইবার একটা বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ করিত। যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব সেখানে তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া চলা কঠিন ছিল। অন্তত আমি নিজের দিক দিয়া বলিতে পারি তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জায়গায় অন্তরের মধ্যে আমি গভীর বাধা অনুভব

২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ২৯৯

করিতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা তাহা নহে, সে যেন একটা বলবান আক্রমণের বাধা।

"আজ এই কথা আমি অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতেছি তাহার কারণ এই যে, একদিকে তিনি আমার চিত্তকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও আর একদিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি এমন আর কাহারো কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারম্বার ঘটিয়াছে যখন তাঁহার চরিত স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।"[৩]

এ-হেন অগ্নিশিখার ন্যায় এক তেজস্বিনী নারীকে স্বামীজী নিয়ে এলেন পল্লীবালা, তথাকথিত শিক্ষায় শিক্ষিত নন সারদাদেবীর কাছে—ভারতীয় নারীর ঐতিহ্যের পাঠ নেওয়ার জন্য।

সারদাদেবীর সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাতের দিনটি অবিস্মরণীয়। নিবেদিতা এই দিনটিকে তাঁর ডায়েরীতে সযত্নে ধরে রেখেছিলেন। দিনটিকে তিনি উল্লেখ করেছেন "Day of days" রূপে। ১৭ মার্চ, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ ছিল এই অবিস্মরণীয় দিন। ছ'বছর পরে অর্থাৎ ১৭ মার্চ, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে নিবেদিতা এই দিনটির কথা স্মরণ করে আনন্দে মিস্ ম্যাকলাউডকে লিখছেন: "ছ'বছর পূর্বে আজকের দিনটিতে আমি শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দর্শন লাভ করি এবং তোমার সঙ্গে বেলুড় গিয়েছিলাম।...সেদিনও বৃহস্পতিবার ছিল। কালের প্রবাহে আবার আমরা সেই দিনগুলিতে এসেছি।...আমরা তাহলে সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করছি।"[৪]

নদী সাগরের সঙ্গে মিলিত হলে যেমন তার স্রোতের উচ্ছ্বাস এবং কোন কলরব থাকে না, তেমনি শ্রীশ্রীমা-রূপ মহাশক্তি-সাগরে এসে নিবেদিতার চঞ্চলতা, বাগ্মিতার প্রখরতা—সব হারিয়ে গেল। মহাশক্তি-সাগরে মিশে তিনি নীরব, শান্ত হয়ে গেলেন। সেখানে তিনি একান্ত মাতৃনির্ভর ছোট্ট 'খুকিটি'। প্রত্যক্ষদর্শিনী সরলাবালা সরকার লিখেছেন: "বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ে শ্রীশ্রীমাতাদেবী [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী] কখন কখন আসিয়া বাস করেন। ভগিনী নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিয়ানা দিনের মধ্যে একবারও অন্ততঃ তথায় গিয়া তাঁহার নিকট কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতেন। নিতান্ত বালিকা যেমন মায়ের মুখের দিকে আনন্দে চাহিয়া থাকে, নিবেদিতাও ঐ সময়ে সেইরূপভাবে মাতাদেবীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। ভগিনী নিবেদিতা—যাঁহার ন্যায় তেজস্বিনী রমণী রমণীকুলে দুর্লভ, যাঁহার বুদ্ধির আলোকে প্রদীপ্ত অন্তর্ভেদী নয়নের দৃষ্টি দেখিলে মনে হইত তাহা যেন জগতের সকল রহস্য-উদ্ঘাটনেই সমর্থ, মাতাদেবীর নিকট অবস্থিতা তাঁহাকে দেখিলে যেন পঞ্চমবর্ষীয়া নিতান্ত শিশুপ্রকৃতি একান্ত মাতৃনির্ভরপরায়ণা বালিকা বলিয়া মনে হইত। মাতাদেবী যখন তাঁহার দিকে সস্নেহ-হাস্যে চাহিতেন, তখন মায়ের আদরে বালিকার মতো তিনি একেবারে গলিয়া যাইতেন।"[৫]

মেয়ে যেমন মায়ের সেবা এবং তাঁকে এতটুকু সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারলে কত না আনন্দ অনুভব

৩ নিবেদিতা স্মৃতি—সম্পাদক: বিশ্বনাথ দে, (১৯৭২), পৃঃ ৫-৬

৪ Letters of Sister Nivedita—Edited by Sankari Prasad Basu, (1982), pp. 635-36

৫ নিবেদিতাকে যেমন দেখিয়াছি—সরলাবালা সরকার, (১৩৭৪), পৃঃ ৪০-৪১

করে। তেমনি নিবেদিতা শ্রীশ্রীমাকে একটুকু সেবা এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্যে রাখার জন্য কত না আশা পোষণ করতেন। সামান্য সেবা করার সুযোগ পেলে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করতেন। নিবেদিতার শ্রীশ্রীমাকে সেবা করার একটি মনোরম চিত্র তুলে ধরেছেন সরলাবালা সরকার: "মা যে আসনে বসিতেন, নিবেদিতা যেদিন সেই আসনখানি পাতিয়া দিবার অধিকার পাইতেন, সেদিন তাঁহার যে আনন্দ হইত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে—সে আনন্দ তাঁহার মুখের দিকে ঐ সময়ে চাহিলেই কেবল বুঝা যাইত। পাতিবার পূর্বে আসনখানিকে তিনি বারংবার চুম্বন করিতেন এবং অতি যত্নে ধূলা ঝাড়িয়া পরে উহা পাতিতেন; তাঁহার ভাব দেখিয়া তখন বোধ হইত, মাতাদেবীর ঐটুকু সেবা করিতে পাইয়াই যেন তাঁহার জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেছেন।"[৬]

সেবার আর একখানি চিত্র স্বামী অসিতানন্দ-প্রদত্ত বর্ণনায়: "প্রায় প্রতি বিকালে নিবেদিতা শ্রীমার কাছে এসে পদধূলি নিতেন। প্রতি রবিবার অবশ্যই আসতেন শ্রীমার ঘর পরিষ্কারের জন্য। বিছানা ঝাড়া, মেঝে পরিষ্কার করা, সাবানজলে দরজা জানালার কাঁচ ধোওয়া—এইসব করে চারিদিক ঝকঝকে তকতকে করে তুলতেন। এ কাজকে নিবেদিতা পরম কর্তব্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। নিতান্ত অনুগত সন্তানের মতো তিনি সেবা করতেন। শ্রীমার সামান্যতম সুখ-সুবিধার জন্যও ব্যস্ত থাকতেন।"[৭]

শ্রীশ্রীমাকে একটুকু সুখস্বাচ্ছন্দ্যে রাখার জন্য কিছু দিতে নিবেদিতার অন্তরের কি ব্যাকুলতা! তিনি ম্যাকলাউডকে একটি চিঠিতে লিখছেন: "তাঁকে কত রকমের আরামে রাখতে যে সাধ আমার হচ্ছে। একটি নরম বালিশ, জিনিস রাখার একটি তাক, একটি কম্বল, আরও কত কি দরকার। সব সময় ভিড়—লোকজন ঘিরে আছেই। তাঁকে একটি সুন্দর রঙিন ছবি দেবার ইচ্ছা।"[৮]

নিবেদিতার সবকিছু কাজ শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে এবং তাঁর আশীর্বাদেই পুষ্ট হয়ে উঠছিল। কর্মের উপর নিজের আত্মপ্রত্যয় থাকলেও নিবেদিতা সর্বদা শ্রীশ্রীমায়ের মুখাপেক্ষী। তাঁর উপর সর্বদা নির্ভর করে থাকতেন। তাঁর আশীর্বাদই প্রত্যেক কাজে নিবেদিতাকে অনুপ্রেরণা দিত। নারীশিক্ষার জন্য বাগবাজারে নিবেদিতা একটি স্কুল খুলেছেন। এই স্কুলের জন্য সর্বাগ্রে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ চান। শ্রীশ্রীমা স্কুলে আসবেন শুনে তাঁর কি আনন্দ! ছোট শিশুর মতো আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েন তিনি। প্রত্যক্ষদর্শিনী সরলাবালা সরকারের বর্ণনায় পাওয়া যায়: "মাতাদেবী একদিন বিদ্যালয় দেখিতে আসিবেন স্থির হইয়াছিল, ঐ কথা শুনিয়া অবধি নিবেদিতার কার্যের ও আনন্দের যেন আর বিরাম নাই। বিদ্যালয়ের সমস্ত ঘরগুলি ঝাড়াইয়া-ঝুড়াইয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন, পত্রপুষ্প আনাইয়া গৃহদ্বারে টাঙ্গাইয়া শোভাবর্ধন করিলেন, মাতাদেবী কোথায় বসিয়া মেয়েদের সহিত আলাপ করিবেন, মেয়েরা তাঁহাকে কি উপহার দিবে, কি শুনাইবে, কেমন করিয়া সংবর্ধনা করিবে ইত্যাদি সকল বিষয় স্থির করিতে তাঁহার আর বিন্দুমাত্র সময় রহিল না। তাহার পর মা যেদিন বিদ্যালয়ে

৬ তদেব,
৭ শতরূপে সারদা—সম্পাদক: স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, (১৯৮৫), পৃ: ১৪৭
৮ Letters of Sister Nivedita Vol-II—Edited by Sankari Prasad Basu, (1982) P. 631, শংকরীপ্রসাদ-কৃত অনুবাদ।

আসিবেন, নিবেদিতা সে দিন যেন আনন্দে একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন। সকল বস্তু যথাস্থানে আছে কিনা দেখিতে এখানে ওখানে ছুটাছুটি করিতেছেন, শিশুর মত অকারণ কেবলই হাসিতেছেন, আবার কখনও বা আনন্দে অধীর হইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদিগের এবং কখনও দাসীর পর্যন্ত গলা জড়াইয়া আদর করিতেছেন।"[৯] শ্রীশ্রীমা স্কুলে যথাসময়ে এসে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন: "আমি প্রার্থনা করছি, যেন এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয়, এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে।"[১০] স্কুলের উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীমায়ের এই আশীর্বাণী শুনে কন্যা নিবেদিতার হৃদয় আনন্দে ভ'রে উঠেছিল। তিনি শ্রদ্ধা-ভক্তিতে গদগদ হয়ে বলেছিলেন: "ভবিষ্যতের শিক্ষিতা হিন্দু নারীজাতির পক্ষে শ্রীমার আশীর্বাদ অপেক্ষা কোন মহত্তর শুভ লক্ষণ আমি কল্পনা করিতে পারি না।"[১১]

নিবেদিতার স্কুলে শ্রীশ্রীমা মাঝে মাঝে যেতেন তাঁদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য। স্কুলে তাঁর পদার্পণ উপলক্ষে আনন্দের বন্যা বয়ে যেত। সেই রকম একদিনের একটি চিত্র সরলাবালা সরকারের বর্ণনায়: "একদিন সিস্টার আমাদের বলিলেন, 'মাতাদেবী আজ আমাদের স্কুলে আসবেন। তোমরা সকলে খুব আনন্দ কর।' সকালের পরিবর্তে চারটার সময় মার গাড়ী আসিল। সঙ্গে রাধু, গোলাপ-মা প্রভৃতি। মা গাড়ী হইতে নামিতেই সিস্টার তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ঠাকুর-দালানে বসাইলেন। মার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য আমাদের হাতে ফুল দিলেন। মেয়েরা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া উঠানে দাঁড়াইলে সিস্টার একে একে সকলের পরিচয় দিলেন। মা মেয়েদের একটু গান গাহিতে বলিলেন। মেয়েরা গান গাহিল এবং একটি কবিতা পড়িল। শুনিয়া মা বলিলেন, 'বেশ পড়েছে।' তারপর মিষ্টি প্রসাদ করিয়া দিয়া আমাদের দিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে সিস্টার মাকে লইয়া সমস্ত ঘর এবং মেয়েদের হাতের কাজ প্রভৃতি দেখাইতে লাগিলেন। মা দেখেন আর আনন্দ করেন এবং বলেন, 'বেশ তো শিখেছে মেয়েরা!' পরে সিস্টার বিশ্রামের জন্য মাকে নিজের ঘরে লইয়া গেলেন।"[১২]

ভারতীয় নারীর শিক্ষাকল্পে অর্থসংগ্রহের জন্য নিবেদিতা পাশ্চাত্যে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে অনেকদিন থাকতে হয়েছিল। ফলে মাতৃদর্শনের জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। ছোট বালিকার মতো মাকে দেখার জন্য তিনি ছট্‌ফট করছেন। কখন তিনি মায়ের চরণপ্রান্তে হাজির হতে পারবেন সদা এই ভাবনা। ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার কয়েকটি চিঠিতে তাঁর মনের কথা স্পষ্ট ধরা পড়েছে: "অনেকদিন ধরে মাতাদেবীর জন্য উদ্বিগ্ন।...তাঁর কাছে ফিরে যেতে খুবই ব্যস্ত।"[১৩] "তোমার গতবারের চিঠি পড়লাম। মাতাদেবী জোর দিয়ে বলেছেন—আমাকে ফিরে যেতেই হবে। পড়ে খুবই আনন্দ হল। সারা [মিসেস বুল] যদিও উল্টো কথা বলেছেন তবু ধরে নেওয়া যায়—আমি বেরিয়ে

৯ নিবেদিতাকে যেরূপ দেখিয়াছি, পৃঃ ৪৯

১০ ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, (১৯৬৩), পৃঃ ১৩৫

১১ স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা, অনুবাদক: স্বামী মাধবানন্দ, (১৩৮৯) পৃঃ ১৪০

১২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, (১৩৬৮), পৃঃ ৩১৩-১৪

১৩ Letters of Sister Nivedita, Vol-I, p. 416, শংকরীপ্রসাদ বসু-কৃত অনু

স্বামীজী ও নিবেদিতা

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

স্থান : কাশ্মীর

শ্রীশ্রীমা ও নিবেদিতা

১৩০৫ সাল : ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

স্থান : বাগবাজার (বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার আবাস)

পড়েছি।"[১৪] "মাতাদেবীর কাছে ফিরে যেতে সমস্ত মনপ্রাণ ব্যাকুল।"[১৫] "শীঘ্র ভারতে ফিরে যেতে পারলে খুশি হব। তোমার মতোই আমি অনুভব করি, মাতাদেবীর ইচ্ছা সব সময় ধ্রুব।"[১৬]

শ্রীশ্রীমায়ের অসুখের কথা শুনে নিবেদিতা খুবই চিন্তিত। তাঁকে দর্শনের জন্য তিনি যেন মরিয়া হয়ে উঠেছেন। ম্যাকলাউডকে লেখা তাঁর আরও কয়েকটি চিঠিতে তা ব্যক্ত হয়েছে: "বিশেষ করে আমি মাতাদেবীর জন্য উদ্বিগ্ন। শুনছি তিনি বড় রোগা আর দুর্বল হয়ে গেছেন।"[১৭] "সারদাদেবীর আবাসে ফিরে যেতে কী যে ব্যাকুল, কি করে বোঝাব? যত সব আজে-বাজে কাজ নিয়ে আছি।"[১৮] "স্বামীজী ও মাতাদেবীর কাছে ফিরে যেতে চাই—আমার আকাঙ্ক্ষা তাতেই কেন্দ্রীভূত।"[১৯]

শ্রীশ্রীমাও তাঁর এই স্নেহের 'খুকি'টিকে দেখার জন্য ব্যাকুল। কার্যোপলক্ষে দূরদেশে অবস্থানরত তাঁর এই 'খুকি'টিকে তিনি কাজে উৎসাহ ও সান্ত্বনা দিয়ে একটি পত্র লেখেন। স্বামী সারদানন্দজী নিবেদিতার কাছে শ্রীশ্রীমায়ের চিঠিটি অনুবাদ করে পাঠান। ইংরেজী চিঠির অনুবাদ[২০] নিচে দেওয়া হল:

জয়রামবাটী
২১শে চৈত্র

শুভাশীর্বাদরাশয়ঃ সন্তু,

স্নেহের খুকি নিবেদিতা, তুমি আমার ভালবাসা জানিও। তুমি আমার নিত্য শান্তির জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। তুমি সেই সদানন্দময়ী মার প্রতিমূর্তি। আমার কাছে তোমার যে-ফটোটি রহিয়াছে, তাহার দিকে অনেক সময় চাহিয়া থাকি, তখন মনে হয়, তুমি যেন আমাদের মধ্যেই রহিয়াছ। তুমি কবে, কোন্ বৎসরে ফিরিয়া আসিবে তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকি। তোমার ব্রহ্মচর্যপূত হৃদয়ে আমার জন্য যে প্রার্থনা জাগিয়াছে, তাহা যেন পূরণ হয়। আমার শারীরিক কুশল। আমি আনন্দে আছি। ভগবানের নিকট সর্বদা প্রার্থনা, তিনি তোমার মহৎ উদ্যমে সহায় হউন, এবং তোমাকে দৃঢ় ও সুখী করুন। তুমি সত্বর ভালয়-ভালয় ফিরিয়া এসো, ইহাও প্রার্থনা করি। ভারতবর্ষে মেয়েদের আশ্রম সম্বন্ধে তোমার অভিলাষ তিনি পূরণ করুন; ভাবী আশ্রমটি যেন সকলকে যথার্থ শিক্ষা দিয়া নিজের উদ্দেশ্য সফল করে। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণবায়ুস্বরূপ—তিনি বন্দনামাত্র নিজেই গান করিতেছেন, তুমি সেই নশ্বর সকল বস্তুর মধ্যেই নিত্যসঙ্গীত শুনিতেছ। বৃক্ষলতা, পশু-পক্ষী, পাহাড়-পর্বত সকলই প্রভুর স্তোত্র গাহিতেছে। দক্ষিণেশ্বরের বটবৃক্ষ মা-কালীর গান করিতেছে; নিশ্চয় জানিও, যার কান আছে সে শুনিতে পায়।...

আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিও। আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতিলাভ করো, ইহাই প্রার্থনা। বাস্তবিক তুমি অতি চমৎকার কাজ করিতেছ। কিন্তু বাংলা ভাষা যেন ভুলিয়া যাইও না, নতুবা তুমি যখন ফিরিয়া আসিবে, তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিব না। ধ্রুব, সাবিত্রী, সীতা-রাম প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছ জানিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তাঁহাদের পবিত্র জীবনকাহিনী সাংসারিক সকল বৃথা বাক্যালাপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা বলাই বাহুল্য। প্রভুর নাম ও লীলা উভয়ই কত সুন্দর।

ইতি মাতাঠাকুরাণী

১৪ Ibid, p. 421-22
১৫ Ibid, p. 425,
১৬ Ibid, p. 427
১৭ Ibid, p. 429
১৮ Ibid, p. 431
১৯ Ibid, p. 441 শঙ্করীপ্রসাদ বসু-কৃত অনুবাদ
২০ শতরূপে সারদা, পৃঃ ১৫১-৫২

নিবেদিতার প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের ভালবাসা ছিল গভীর। তার কোন সীমা-পরিসীমা পাওয়া যায় না। তাঁর কাছে নিবেদিতা ছোট্ট 'খুকি'। তাঁকে শ্রীশ্রীমা 'আমার প্রাণের সরস্বতী' বলে ডাকতেন। লিজেল রে‍ঁমকে স্বামী অসিতানন্দ প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায়: "একদিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী নিবেদিতার কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়াছিলেন। নিবেদিতাকে তাতে ভারী সুন্দর আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। শ্রীমা খুব খুশী হলেন। পাঁচবছরের মেয়েকে যেমন চুমু খায় তেমনি চুমু খেয়ে আদর করলেন। শ্রীমা নিবেদিতাকে গভীর, অতি গভীর-ভাবে ভালবাসতেন। 'আমার প্রাণের সরস্বতী' বলে প্রায়ই ডাকতেন। নিবেদিতাও মায়ের আদরে গলে যেতেন।"[২১]

"একবার নিবেদিতা ভোগ রেঁধে ঠাকুরকে নিবেদন করে তার প্রসাদ শ্রীমাকে খেতে দেন। শ্রীমা পরম আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করেন। এর ফলে গোঁড়া মেয়েমহলে চাঞ্চল্য পড়ে যায় এবং তাঁরা শ্রীমায়ের কঠোর নিন্দা করেন। বিরক্ত ও ব্যস্ত হয়ে শ্রীমা বলেন, 'নিবেদিতা আমার মেয়ে, ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করার অধিকার তার আছে; তার দেওয়া প্রসাদ পরমানন্দে, কোনো দ্বিধা না রেখে আমি নেব; যদি কারো তাতে আপত্তি থাকে, সে নিজেকে নিয়েই থাক।"[২২] নিবেদিতার প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহ-ভালবাসা নানাভাবে প্রকাশ পেত। আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায় সরলাবালা সরকারের বর্ণনায়: "সিস্টার নিবেদিতা আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। মা তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া একখানি ছোট পশমের তৈয়ারী পাখা তাঁহাকে দিয়া বলিলেন, 'আমি এখানি তোমার জন্য করেছি।' সিস্টার উহা পাইয়া আনন্দে একবার মাথায় রাখেন, একবার বুকে ঠেকান, আর বলেন, 'কি সুন্দর, কি চমৎকার!' আবার আমাদের দেখান এবং বলেন, 'কি সুন্দর মা করেছেন দেখ!' মা বলিলেন, 'কি একটা সামান্য জিনিস পেয়ে ওর আহ্লাদ দেখেছ! আহা, কি সরল বিশ্বাস! যেন সাক্ষাৎ দেবী। নরেনকে (স্বামিজী) কি ভক্তিই করে! সে এই দেশে জন্মেছে বলে সর্বস্ব ছেড়ে এসে প্রাণ দিয়ে তার কাজ করছে। কি গুরুভক্তি! এদেশের উপরই বা কি ভালবাসা!'"[২৩]

নিবেদিতার মৃত্যু শ্রীশ্রীমার বুকে যেন শেল বিদ্ধ করেছিল। এই বিদেশী-কন্যার মৃত্যুতে তিনি ঝর ঝর করে কেঁদেছিলেন। সরলাবালা সরকার নিবেদিতার সম্বন্ধে একটি পুস্তক লেখেন। সেটি শুনতে শুনতে শ্রীমা নিবেদিতার জন্য কাঁদছিলেন আর আক্ষেপ করছিলেন। পাঠশেষে তিনি বলে ওঠেন: "যে হয় সুপ্রাণী, তার জন্য কাঁদে মহাপ্রাণী (অন্তরাত্মা), জান মা?"[২৪]

নিবেদিতার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য তাঁর দেওয়া যত তুচ্ছ জিনিসই হোক না কেন শ্রীশ্রীমা তা সযত্নে রক্ষা করতেন। নিবেদিতা একবার তাঁকে একটি জার্মান সিলভারের কৌটা উপহার দেন। তাতে তিনি শ্রেষ্ঠ সম্পদ "শ্রীশ্রীঠাকুরের কেশ রাখিতেন; বলিতেন, 'পূজার সময় কৌটাটি দেখিলে নিবেদিতাকে মনে পড়ে।'" নিবেদিতা একবার শ্রীশ্রীমাকে একখানা এণ্ডির চাদর দেন। সেটি ছিঁড়ে গেলেও তিনি ফেলে দেননি। বাক্সের মধ্যে তিনি সেটির ভাঁজে ভাঁজে কালজীরা দিয়ে

২১ তদেব, পৃঃ ১৪৭

২২ তদেব, পৃঃ ১৫১

২৩ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, (১৩৬৮), পৃঃ ৩১২-১৩

২৪ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, (১৩৭৯), পৃঃ ২২

সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন।[২৫] কাপড়খানা ছেঁড়া দেখে শ্রীশ্রীমায়ের এক সেবক বললেন : "মা, এই কাপড়টা ফেলে দিই, এটা ছিঁড়ে গেছে।" মা বললেন : "না বাবা ফেল না, ওটি বড় আদর করে 'খুকী' আমাকে দিয়েছিল। অনেক দিন পরেছি।"[২৬]

নিবেদিতা শ্রীশ্রীমাকে কি চোখে যে দেখতেন তা তিনি ভাষায় প্রকাশ করতে পারতেন না। তবু ভাষায় প্রকাশ করার জন্য কত ভাবে না তিনি চেষ্টা করেছেন! তিনি বিভিন্ন জায়গায় শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে যে-সব কথা লিখেছেন সেগুলি পর পর সাজিয়ে দেওয়া হল :

"আমার ধারণায় বর্তমান পৃথিবীর মহোত্তমা নারী।"[২৭] "তিনি অনাড়ম্বর সহজতম সাজে পরম শক্তিময়ী মহোত্তমা নারী।"[২৮] "আমার সব সময় মনে হইয়াছে, তিনি যেন ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী। কিন্তু তিনি কি একটি পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি, অথবা কোন নূতন আদর্শের অগ্রদূত? তাঁহার মধ্যে দেখা যায়, অতি সাধারণ নারীরও অনায়াসলভ্য জ্ঞান ও মাধুর্য; তথাপি আমার নিকট তাঁহার শিষ্টতার আভিজাত্য ও মহৎ উদার হৃদয় তাঁহার দেবীত্বের মতোই বিস্ময়কর মনে হইয়াছে।...তাঁহার সমগ্র জীবন একটানা নীরব প্রার্থনার মতো।"[২৯] "সন্ধ্যাবেলা তারার আলো, দ্বিতীয়ার চাঁদ আর প্রার্থনা—এ সবই যেন শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যের মতো। সেও তো গোধূলির প্রগাঢ় মাধুর্যের মতো—বিশেষ করে যখন তিনি পূজারতা। আহা, কি আহা, কি অপরূপ।" "তিনি মাধুর্যের প্রতিমূর্তি—অতি শান্ত, নম্র, স্নেহ-প্রবণ, আবার ছোট বালিকার মতোই সদা উৎফুল্ল।"[৩০] "অসীম মাধুর্যে ভরপুর ইনি। কি স্নিগ্ধ ভালবাসা এঁর! অথচ বালিকার মতোই হাসিখুশি।"[৩১]

নিবেদিতার ধ্যানে শ্রীশ্রীমা ও মেরীমাতা অভিন্ন। তিনি তাঁর ডায়েরীতে লিখছেন : "গির্জায় গিয়াছিলাম। সারদাদেবীকে আমার মেরীমাতা বলিয়া মনে হইল।"[৩২] ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বরে নিবেদিতা শ্রীশ্রীমাকে একটি অনুপম চিঠি লেখেন। চিঠিটির বঙ্গানুবাদ : "আদরিণী মাগো, আজ সকালে খুব ভোরে গির্জায় গিয়েছিলাম সারার জন্য প্রার্থনা করতে। সেখানে সবাই মেরীর কথা ভাবছিলাম, হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল তোমার কথা। তোমার মিষ্টি মুখ, তোমার ভালবাসায় ভরা চোখ, তোমার সাদা শাড়ী, হাতের বালা, সবকিছু সামনে ভেসে উঠল। তখন ভাবলাম, অভাগী সারার রোগের ঘরটিকে শান্তিতে আর আশীর্বাদে ভরিয়ে দিতে পারে একমাত্র তোমারই পরশ, আর মাগো, জানো কি, ভাবলাম সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার সময়ে তোমার ঘরে বসে ধ্যানের চেষ্টা করে কি বোকামিই করতাম। কেন বুঝিনে যে, তোমার শ্রীচরণের কাছে ছোট্ট মেয়েটির মতো বসে থাকাটাই সব—সব কিছু! মা, মাগো—ভালবাসায় ভরা তুমি! তোমার ভালবাসায় আমাদের মতো

২৫ ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ৩৮৭-৮৮
২৬ শতরূপে সারদা, পৃঃ ২৫৮
২৭ Letters of Sister Nivedita, Vol. II, p. 585
২৮ Ibid, Vol. I, p. 10
২৯ স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা, অনুবাদক : স্বামী মাধবানন্দ, (১৩৮৯), পৃঃ ১৩৯
৩০ নিবেদিতা স্মৃতি, পৃঃ ২৬১-২৬২
৩১ Letters of Sister Nivedita, Vol. I, p. 10
৩২ নিবেদিতা লোকমাতা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১১৯

উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা নেই, তা পৃথিবীর ভালবাসা নয়, স্নিগ্ধ শান্তি তা, সকলের কল্যাণ আনে, অমঙ্গল করে না কারো। সোনার আলোয় ভরা তা, খেলায় ভরা। সেই যে রবিবারটি কয়েক-মাস আগে, পুণ্যভরা সেই দিনটিতে গঙ্গাস্নান সেরে ছুটে তোমার কাছে ফিরে এসেছিলাম এক মুহূর্তের জন্য, তখন তুমি আশীর্বাদ করেছিলে, আর কি যে শান্তি আর মুক্তি বোধ করেছিলাম তোমার বাঞ্ছিত আবাসে! প্রেমময়ী মাগো, তোমাকে যদি একটি অপরূপ স্তোত্র কিংবা, প্রার্থনা লিখে পাঠাতে পারতাম! কিন্তু জানি সেও যেন তোমার তুলনায় শব্দমুখর, কোলাহলময় শোনাবে! সত্যিই তুমি ঈশ্বরের অপূর্বতম সৃষ্টি, শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের নিজস্ব পাত্র,—যে স্মৃতিচিহ্নটুকু তিনি তাঁর সন্তানদের জন্য রেখে গেছেন—যারা নিঃসঙ্গ যারা নিঃসহায়। আমরা তোমার কাছে খুব শান্ত হয়ে চুপটি করে বসে থাকব। তবে মজা করার জন্য একটু-আধটু গোলমাল করব বই কি? সত্যই ভগবানের অপূর্ব রচনাগুলি সবই নীরব। তা অজানিতে আমাদের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে—যেমন বাতাস, যেমন সূর্যের আলো, বাগানের মধুগন্ধ, গঙ্গার মাধুরী—এইসব নীরব জিনিসগুলি সব তোমারই মতো।

"বেচারা সারার জন্য তোমার শান্তির আঁচলখানি পাঠিও। রাগদ্বেষের অতীত সমুচ্চ শান্তিতে সমাহিত থাকে নাকি তোমার ভাবনা! তা কি পদ্মপাতায় শিশিরবিন্দুর মতো ভগবানের বুকের শিহরিত ভালবাসা নয়—যা পৃথিবীতে স্পর্শ করে না কখনো!

প্রিয়তমা মা আমার, তোমার চিরকালের বোকাখুকী নিবেদিতা।"[৩৩]

সাগরের গভীরতা অসীম, আকাশের প্রশস্ততা অনন্ত। শ্রীশ্রীমায়ের ভালবাসাও তেমনি। ঐ অসীম ও অনন্ত ভালবাসার সাগরে নিবেদিতারূপ-নদী মিশে যেতে চায়। শ্রীশ্রীমায়ের ভালবাসাই নিবেদিতার একমাত্র কাম্য। তাঁর কাছে কাছে থাকাটাই নিবেদিতার অন্তরের প্রার্থনা। তিনি না থাকলে নিবেদিতা চারদিকে শূন্যতা দেখেন।[৩৪] শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রয়ই তাঁর চির কাম্য। তিনি একটি পত্রে লিখছেন: "মাতাদেবী এখন এখানে আছেন। সেই একই মা। তিনি যখন এখানে থাকেন আমাদের আশ্রয় থাকে।"[৩৫]

নিবেদিতারূপ জীবশক্তি শ্রীশ্রীমারূপ মহাশক্তির সঙ্গে মিলেছে। জীবশক্তি পূর্ণতা লাভ করল মহাশক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে। নিবেদিতা স্বামী অভেদানন্দকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: "ভারতবর্ষে আসা আমার সার্থক হয়েছে।"[৩৬]

৩৩ Letters of Sister Nivedita, Vol. II, p. 1168-169, দ্রষ্টব্য: শতরূপে সারদা, পৃঃ ১৭৩

৩৪ Ibid.

৩৫ Ibid, p. 633

৩৬ নিবেদিতা স্মৃতি, পৃঃ ৭৩

স্বামি-শিষ্যের দু'টি দিন

ডক্টর অরুণকুমার বিশ্বাস

এক

বড় মধুময় স্মৃতিতে ভরা এই দুটি দিন : ২১ ও ২২ মার্চ ১৮৯৭। 'স্বামী' বলতে অবশ্যই স্বামীজী অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ। 'শিষ্য' কিন্তু প্রখ্যাত শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী নন; খেতড়ির অধিপতি রাজা অজিত সিংই এই আলেখ্যে স্বামীজীর 'শিষ্য', যাঁর সাহচর্যে স্বামীজীর জীবনের দুটি ঘটনাবহুল দিন কেটেছিল। এ দুটি দিনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে আমরা কুমুদবন্ধু সেন, 'কথামৃত'কার মাস্টার মহাশয়, স্বামী বিরজানন্দ ও শ্যামলাল ক্ষেত্রীর স্মৃতিকথার এবং খেতড়ি রাজদরবারের ওয়াকিয়ৎ রোজনামচার দুর্লভ সহায়তা পেয়েছি।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মে, স্বামীজী ভারতের মাটি থেকে বিদায় নিয়ে প্রথম জয়যাত্রায় বেরিয়েছিলেন। খুব অল্পসংখ্যক শিষ্যই তদানীন্তন স্বল্পখ্যাত সন্ন্যাসীকে প্রণাম ও শুভেচ্ছা জানাতে বোম্বাই-এর জাহাজঘাঁটিতে এসেছিলেন। জাহাজের ঘণ্টা পড়ে গেল। রাজা অজিত সিং-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং স্বামীজীর বিশ্বস্ত শিষ্য মুন্সী জগমোহনলাল 'সকলের শেষে কাষ্ঠের সিঁড়ি দিয়া নামিলেন, অমনি জাহাজ খুলিয়া গেল। স্বামীজী ইঙ্গিতে বিদায় লইলেন, জগমোহনের চক্ষু দুইটি যতক্ষণ তাঁহার গুরুকে দেখিতে পাইল, ততক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।'[১]

সেই জগমোহনই আবার রাজার আদেশে চার বছর পরে বিজয়ী বীর সন্ন্যাসীকে মাদ্রাজে অভ্যর্থনা করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলী উৎসব উপলক্ষে অন্যান্য রাজার সঙ্গে অজিত সিং ইংলণ্ড যাবেন এইরূপ স্থিরীকৃত হয়। তাঁর ইচ্ছা যে গুরুদেবকে সঙ্গে নিয়ে যান—তাতে স্বামীজীর স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবার সম্ভাবনা। জগমোহন মারফৎ এবং পরে পত্রযোগে প্রেরিত শিষ্যের এই নিবেদন স্বামীজীকে বিচলিত করে তোলে।

মাদ্রাজে ও কলকাতায় বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করার পর স্বামীজীর শরীর ক্লান্ত। ডায়াবিটিস্ রোগ ধরা পড়েছে। রবিবার ৭ মার্চ ১৮৯৭ তারিখে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব স্বামীজীর উপস্থিতিতে বিপুল সমারোহে দক্ষিণেশ্বরে পালিত হল। তার পরদিনই ৮ মার্চ, স্বামীজী বিশ্রামের জন্য দার্জিলিং রওনা হন। ১৬ মার্চ স্বামীজী তাঁর নাছোড়বান্দা শিষ্য রাজা অজিত সিং-এর তারবার্তা পান যে রাজা কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করছেন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করার জন্য, এবং সম্ভব হলে স্বামীজীকে নিয়ে বিলাতযাত্রা করবেন এই অভিপ্রায়ে। অগত্যা স্বামীজী প্রিয় শিষ্যের আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং কলকাতায় নেমে আসতে সম্মত হলেন। ১৮ মার্চ শিষ্যের কলকাতা আগমন। হাওড়া স্টেশনে স্বামী শিবানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ প্রভৃতি অনেকে অজিত সিংকে নারকেল ও ধান-দূর্বা দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন।

দুই

একুশ মার্চ ১৮৯৭, ৯ চৈত্র, রবিবার

সকাল ১০-৪৫ মিনিটে দার্জিলিং মেল স্বামীজীকে নিয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে প্রবেশ করল। আগেই রাজাজীর (অজিত সিং) দুই পারিষদ, মুন্সী লক্ষ্মীনারায়ণ এবং রামলাল মাস্টার,

১ খেতড়িরাজ ও স্বামী বিবেকানন্দ—প্রিয়নাথ সিংহ, উদ্বোধন, ভাদ্র ১৩১২, পৃঃ ৪৩৯

বারাকপুর স্টেশনে গিয়ে স্বামীজীকে রাজার প্রণাম জানিয়েছিলেন এবং অভ্যর্থনা-প্রস্তুতির কথা বলেছিলেন। অজিত সিং সপারিষদ শিয়ালদহ স্টেশনে পৌছান সকাল ১০টা নাগাদ। সঙ্গে শিউবক্স্জী বাগলা, যাঁর বড়বাজারস্থ চারতলা প্রাসাদে অজিত সিং উঠেছেন। স্বামীজীর দ্বিপ্রহরের বিশ্রামের ব্যবস্থাও ওখানেই করা হয়েছে।

স্বামীজীর ট্রেন স্টেশনে পৌছানো মাত্র অজিত সিং গুরুর প্রথম শ্রেণীর কামরায় প্রবেশ করলেন এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে প্রিয় গুরুদেবের সঙ্গে দীর্ঘ চা'র বৎসর বাদে মিলিত হলেন। স্বামীজীর চরণযুগল ধুইয়ে মুছিয়ে কেশরচন্দনে ভূষিত করলেন এবং ভক্তি ভরে ফুলের তোড়া নিবেদন করলেন: 'স্বামীজীসে দণ্ডবৎ করী পৈর প্রক্ষালন কর কেসর চন্দন চড়ায়ে পুষ্পো কী মালা পহরায় গুলদস্তে৷ দিয়ো।'[২] স্বামীজীর গুরুভাইদেরও মাল্যভূষিত করা হল। সমবেত মাড়োয়ারী ভক্তদের সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিয়ে রাজা পূর্বব্যবস্থা মতো স্বামীজীর উদ্দেশে একটি অভিনন্দনপত্র পাঠ করলেন। স্বামীজী অতি সংক্ষেপে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করে দুই এক কথায় প্রত্যুত্তর দিলেন।

প্লাটফর্মের বাইরে ভিক্টোরিয়া গাড়িটি সুসজ্জিত হয়ে স্বামীজীর জন্য অপেক্ষা করছিল। পুষ্পবৃষ্টির মধ্য দিয়ে স্বামীজী গাড়িটিতে আরোহণ করলেন, আর পেছনে পেছনে আরও ৫০।৬০টি গাড়ির শোভাযাত্রা চলল। ১৯ ফেব্রুআরি শুক্রবার বিশ্ববিজয়ী স্বামীজীকে কলকাতার যুবকেরা তুমুল অভ্যর্থনা জানিয়ে ছিল। একমাস পরে একই শিয়ালদহ স্টেশনের বাইরে সেই একই মহামানব সুদূর খেতড়ির জনগণের কাছ থেকে বিনম্র প্রণাম গ্রহণ করলেন।

বড়বাজারে বাগলার প্রাসাদে স্বামি-শিষ্য প্রবেশ করার পর স্বামীজীর অভ্যর্থনার দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হল। স্বামীজী স্নান করে আসন গ্রহণ করলে পর রাজা অজিত সিং আনুষ্ঠানিক ভাবে 'নজর' উপঢৌকন দিলেন এবং পরে খেতড়ির অন্যান্য শেঠ ও ধনী ব্যক্তিদের 'নজর' স্বামীজীর চরণে নিবেদিত হল।

আহার-বিশ্রামাদির পর স্বামীজী শিষ্যসহ পরমতীর্থ দক্ষিণেশ্বর দর্শনে বেরোলেন। এই মহাতীর্থ দর্শন শিষ্যের পক্ষে প্রথম (ও শেষ) এবং স্বামীজীর পক্ষেও শেষ! কুমুদবন্ধু সেন এই অপূর্ব তীর্থযাত্রার ছবি তাঁর উজ্জ্বল তুলিকায় চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন।[৩]

কুমুদবন্ধু যখন পূজনীয় (শ্রীম) মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হলেন তখন স্বামীজী ও মহারাজা "তাঁহার সেক্রেটারী (জগমোহনলাল?)-সহ কালীমন্দির ও রাধাকান্তের মন্দির দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের অভিমুখে যাইতেছেন। আমি (কুমুদবন্ধু) ও মাস্টার মহাশয় তাঁহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত। যে ছোট খাটে ঠাকুর বসিতেন তাহাও পুষ্পমালায় সুশোভিত।

২ খেতড়ির ওয়াকিয়ৎ রেজিস্টার ২১ মার্চ; বেণীশংকর শর্মার Swami Vivekananda—A Forgotten Chapter of his life, শর্মা পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮২, পৃঃ ১৯৩-১৯৮

৩ "কলিকাতায় স্বামীজী ও খেতড়ির মহারাজ"—কুমুদবন্ধু সেন, উদ্বোধন, শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৬৭, পৃঃ ৫২৯-৫৩১। কুমুদবন্ধু তারিখটিকে ২৫ এপ্রিল বলে লিখেছেন, কিন্তু হবে ২১ মার্চ।

স্বামী গম্ভীরানন্দজী লিখিত 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে (দ্বিতীয় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৪২৩) আছে, "স্বামীজী তারযোগে জানাইলেন যে, তিনি ২১ মার্চ সকাল এগারটায় শিয়ালদহ পেঁাছিবেন। তদনুসারে রাজাজী বন্ধু-বান্ধবসহ তথায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সমুচিত সংবর্ধনা করিলেন। —সঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল দাদা প্রভৃতিও তথায় প্রবেশ করিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়াই স্বামীজী ঐ ঘরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত লুটাইয়া গড়াগড়ি দিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে লাগিলেন। খেতড়ির মহারাজা পর্যন্ত দ্বার-সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন। কেহই ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সাহস করিলেন না। স্বামীজী এই প্রকার তিনবার গড়াগড়ি দিয়া লুটাইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে লাগিলেন। পরে যুক্তকরে ঠাকুরের সম্মুখে একপাশে অনিমেষ-নেত্রে ভাবগম্ভীর-নয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। তখন খেতড়ির মহারাজা প্রভৃতি সকলেই স্বামীজীর আদর্শ অনুসরণ করিয়া লুটাইয়া গড়াগড়ি দিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। সকলের প্রণাম হইয়া গেলে স্বামীজী খেতড়ির মহারাজাকে পঞ্চবটীর দিকে লইয়া চলিলেন।

"পঞ্চবটীর তলায় আসিয়া স্বামীজী অপূর্বভাবে বিভোর হইলেন। পঞ্চবটী প্রদক্ষিণ করিয়া একটু ধ্যানস্থ হইয়া বসিলেন। পরে বালকের মতো আনন্দে পঞ্চবটীর একটি ডালে বসিয়া ঝুলিতে লাগিলেন। মহারাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ছিলেন, তখন আমরা এই রকম গাছে দোল খেতাম, আনন্দ করতাম। আজ সেই কথা স্মৃতিপথে উদিত হচ্ছে। দেখ, এই গঙ্গাতীরে কী অপূর্ব দৃশ্য, কী সুন্দর পরিবেশ!' পরে সকলেই সেখানে স্বামীজীর সঙ্গে বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে স্বামীজী উঠিয়া পড়িলেন। পুনরায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের উত্তর দিকে সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"সেই সময় শ্রীযুক্ত রামলাল দাদা প্রভৃতি পুরোহিতগণ নারিকেলে পৈতা জড়াইয়া স্বস্তি-বাচন পাঠ করিয়া মহারাজা শ্রীঅজিত সিংকে পুষ্পমাল্য-সহ নারিকেল অর্পণ করিলেন। তিনিও নতমস্তকে উহা গ্রহণ করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন।"*

এমন সময় ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাসের পুত্র এসে স্বামীজীর পদধূলি গ্রহণ করলে স্বামীজী শ্রীঠাকুরের ভক্ত ও সেবক মথুরানাথ বাবুর পুত্র ত্রৈলোক্যনাথের কথা জিজ্ঞাসা করেন। ত্রৈলোক্য-নাথ রক্ষণশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উদার মনোভাব, জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে ভক্তসংঘ সংঘটন, এক পংক্তিতে আহার ইত্যাদি সমর্থন করতেন না। স্বামীজীর সমুদ্র-যাত্রাও তিনি অনুমোদন করেননি।

স্বামীজীর দুইজন ভক্ত-প্রতিনিধি ঐদিন অর্থাৎ ২১ মার্চ রবিবার ত্রৈলোক্যনাথ বাবুর ৭১নং ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের বাসভবনে যান এবং বলেন যে ত্রৈলোক্যনাথ বাবু স্বয়ং দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে এসে স্বামীজী-সহ মহারাজার অভ্যর্থনা করলে ভাল হয়। ত্রৈলোক্যনাথ এই সঙ্গত অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন, এবং কিছুদিন পরে সংবাদপত্রে লেখেন: "যে ব্যক্তি (স্বামীজী) বিদেশে যাওয়া সত্ত্বেও নিজেকে হিন্দু বলিতে পারে—এমন কাহারও সহিত আমার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক থাকা উচিত বলিয়া আমি বিবেচনা করি নাই।" স্বামী বিবেকানন্দ মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন বলে দেবীর পুনরভিষেকের প্রয়োজন হয়েছিল!

সাক্ষাতে অপমানিত না হলেও, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দরজা তাঁর জন্য চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[৪]

যাই হোক, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে স্বামীজী ও মহারাজাকে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা বা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। দক্ষিণেশ্বর

৪ শংকরীপ্রসাদ বসু, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৮৫, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৪০-১৪৭

থেকে তাঁরা আলমবাজার মঠে এলেন।

"মঠে শ্রীশ্রীঠাকুর-ঘরে পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ স্বামী শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতি করিতেছিলেন। মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা সমবেত-কণ্ঠে স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে স্বামীজীর 'জয়গুরু, জয়গুরু' হুঙ্কারে এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক ভাবের তরঙ্গে সকলের হৃদয় উদ্বেলিত হইল। আরতি শেষ হইলে স্বামীজী ও মহারাজা অজিত সিং এবং সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুর-ঘরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন।

"পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজা অজিত সিং ও গুরুভ্রাতাদের লইয়া বহিঃপ্রকোষ্ঠের লম্বা ঘরে উপবেশন করিলেন। আমি (কুমুদবন্ধু) ও মাষ্টার মহাশয় তথায় উপবেশন করিলাম। স্বামীজী মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে খেতড়ির মহারাজার পরিচয় করাইয়া দিলেন।

"ঠাকুরের কথা এবং স্বামীজীর শারীরিক অবস্থার আলোচনা চলিতে লাগিল। স্বামীজী সেই সময় প্রকাশ করিলেন, 'আমার তো ইচ্ছা ছিল, মহারাজার সঙ্গে বিলেত চলে যাই। জাহাজে সমুদ্রের বায়ুতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে। সব বড় ডাক্তারদের দেখিয়ে পরামর্শ নেওয়া হ'ল, কিন্তু কেউ আমার যাওয়া অনুমোদন করছে না।'

"অজিত সিং সকলের সম্মুখেই প্রকাশ করিলেন, 'আমার বিশ্বাস স্বামীজীর বর্তমান স্বাস্থ্য সমুদ্র-ভ্রমণে ভাল হবে, কিন্তু ডাক্তারদের কি অভিমত বুঝতে পারি না। যাই হোক, আগামীকাল সাহেব-ডাক্তার যা বলবেন, তাই করা হবে।' তারপর দু-একটি ভজন গান গাহিয়া স্বামীজী খেতড়ির মহারাজার সঙ্গে তাঁহার বাস-ভবনে চলিয়া গেলেন।"

আলমবাজারের মঠে ঐ সন্ধ্যায় স্বামী বিরজানন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর স্মৃতিচয়ন: "মহারাজা আলমবাজার মঠে ঠাকুরদর্শন করে এসে হলঘরে সতরঞ্চ পাতা ঢালা-বিছানায় স্বামীজীর সামনে হাঁটু গেড়ে করজোড়ে বসে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা করেছিলেন। তাঁর সাদাসিধে পোষাক ও বিনীতভাব দেখে সকলেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। স্বামীজীর আদেশমতো তাঁদের জন্য ঠাকুরকে বিশেষ করে ফল, মিষ্টান্ন ও হালুয়া-ভোগ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সুশীল (পরে স্বামী প্রকাশানন্দ) রান্নাঘরে হালুয়া তৈরি করেছিল। শেষের দিকে হরি মহারাজ… দেখলেন উহা যেন বেশী শুক্‌নো হবার মত হয়েছে। নামিয়ে ফেলতে বললেন। কিন্তু শক্ত চাবড়া মেরে গেল।…উহা হালুয়া না হয়ে এমন একটা নতুন ও উপাদেয় জিনিস তৈরী হল যে সকলেই খেয়ে তারিফ করতে লাগলো।"[৫]

স্বামীজী ও অজিত সিং-এর সঙ্গে প্রসাদ সকলকে দেওয়া হ'লে পূর্বব্যবস্থানুযায়ী দু'জনে দুলিচাঁদ কাঁকরানিয়ার দমদমস্থ বাগানবাড়ি Orchid Dale অভিমুখে যাত্রা করলেন। আলমবাজার থেকে দমদমের দূরত্ব বেশি নয়। সন্ধ্যা ৮টা নাগাদ তাঁরা পৌঁছে গেলেন। রাজা সারাদিনের চিঠি এবং তারবার্তা দেখে স্বামীজীর সঙ্গে কথোপকথন করতে করতে নৈশাহার সমাপন করলেন।[৫]

পরিব্রাজক জীবনে স্বামীজী একমাত্র খেতড়িতেই দীর্ঘদিন ধরে এক জায়গায় অবস্থান করেছেন। স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথের ভাষায়: "রাসমণির জামাতা মথুরচন্দ্র বিশ্বাস যেমন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবা করিয়াছিলেন, রাজা অজিত সিংও স্বামীজীকে সেইরূপভাবে ভক্তি করিতেন।"[৬] তিনিই স্বামীজীর দারিদ্র্যপীড়িত

৫ অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৬, পৃঃ ৯১-৯২

৬ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৭১, পৃঃ ২১২

পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাবে মাসোহারা পাঠাতেন। আমেরিকা-প্রবাসে স্বামীজী যাঁদের সঙ্গে বেশি পত্রালাপ করেছেন অজিত সিং তাঁদের অন্যতম। স্বামীজী আমেরিকা পৌছে সর্বপ্রথম চিঠি লেখেন খেতড়ির রাজাকে।[৭]

তিন

বাইশ মার্চ, ১৮৯৭ সোমবার

স্বামী ও শিষ্যের গতরাত্রি কেটেছে শুধু আনন্দ ও প্রশান্তির মধ্য দিয়ে নয়—কিছুটা মানসিক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাও তাঁদের ভোগ করতে হয়েছে। আজ চিকিৎসকেরা স্বামীজীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সন্তোষ প্রকাশ করলে আর রাজার সঙ্গে বিদেশযাত্রার অনুমতি দিলে, অজিত সিং-এর থেকে সুখী ব্যক্তি পৃথিবীতে আর কে হবেন?

স্বামীজী হয়তো ভাবছিলেন যে রাজার সঙ্গে গেলে পশ্চিমে বেদান্ত-প্রচারের কাজ আবার পুরোদমে চালাতে পারবেন এবং ভারতবর্ষের জন্য আরও বেশি অর্থসংগ্রহ করতে পারবেন। তবে অপরদিকে ভারতে রামকৃষ্ণ-সংঘের গোড়াপত্তন করার কাজ অবশ্য কয়েক মাস পেছিয়ে যাবে। এই বিষয়ে তিনি কিছুটা অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে দোদুল্যমান ছিলেন।

শেঠ দুলিচাঁদের প্রাসাদোপম বাগানবাড়িতে সুনিদ্রার পর স্বামী ও শিষ্য প্রভাতে নিজ নিজ কাজের জন্য তৈরি হতে লাগলেন। অজিত সিং বিলাত-যাত্রার প্রাক্কালে উপহারাদি কেনবার জন্য কলকাতার সাহেবী দোকানে যাবেন, আর স্বামীজী চিকিৎসকদের সঙ্গে দেখা করবেন, এবং পরে শ্রীমাকে দর্শন করতে যাবেন। এমন সময় সকালে প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় বাগানবাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। উনি শেঠ দুলচাঁদের সুহৃদ এবং সঙ্গীতপ্রেমী। খুব সম্ভব রাজা অজিত সিংকে বীণাবাদন শোনাবার আগ্রহ নিয়ে তিনি এসেছিলেন।[৮]

চিকিৎসকদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্বামীজী অপরাহ্নে বাগবাজারের বসুপাড়ায় শ্রীমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, 'একলা'। এসেই স্বামী যোগানন্দকে বললেন: "আমার বিলেতে যাওয়া হ'ল না। ডাক্তারদের সকলেই অমত করলেন,—এমন কি শশী ও বিপিন ডাক্তার পর্যন্ত। তাঁদের পরামর্শ যে আমি আলমোড়াতে চলে যাই। তাই কাল দার্জিলিং চলে যাচ্ছি।... একবার মাকে প্রণাম করে যাই।"[৯]

প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে কুমুদবন্ধু অন্যত্র লিখেছেন:

"এটা ছিল এক স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক ঘটনা। পাশ্চাত্য থেকে বিপুল যশোগৌরব নিয়ে প্রত্যাবৃত্ত স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের এই সাক্ষাৎ-দৃশ্যটি দেখার সৌভাগ্য যে অল্প কয়েকজনের হয়েছিল তাঁরা প্রত্যেকেই তখন আনন্দে বিহ্বল। মা অন্য দিনের মত অবগুণ্ঠনে আবৃত থেকে ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। স্বামীজী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য।... গোটা পরিবেশ অবর্ণনীয় মহিমা ও দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ।

"প্রণাম করার সময় স্বামীজী মায়ের পাদস্পর্শ করেননি। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে (অন্যদের) বললেন: 'মা'কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর, কিন্তু পাদস্পর্শ কোরো না। উনি এতই কৃপাময়ী, কোমলপ্রাণা স্নেহাতুরা যে, কেউ ওঁর পাদস্পর্শ করলে উনি তৎক্ষণাৎ তার জ্বালা-যন্ত্রণাকে টেনে নেন নিজের মধ্যে। তার ফলে অপরের জন্য ওঁকে নিঃশব্দে ভুগতে হয়। মন-প্রাণ দিয়ে ওঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা কর, কিন্তু মুখে

৭ খেতড়ি ও অজিত সিং সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য বর্তমান লেখকের দ্বারা অন্যত্র পরিবেশিত: (ক) প্রবুদ্ধ ভারত, ফেব্রুআরি ও মার্চ, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ৫৮—৭১, ১১৪—১২৬, ১৪০; (খ) উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৯১, পৃঃ ৫৪২—৫৫০।

কোনও কথা নয়। উনি সর্বদা এমন অতি চৈতন্য-লোকে থাকেন যে প্রত্যেকের অন্তরের সংবাদ জানেন।'"[৮]

গোলাপ-মার মাধ্যমে স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমা মৃদু আলাপ করলেন। স্বামীজী বললেন শ্রীমার আশীর্বাদেই তিনি আমেরিকা গমন করেছিলেন এবং বিজয় লাভ করেছেন। "মায়ের আশীর্বাদের ফলেই এই অলৌকিক কাণ্ড ঘটেছে।"[৮] খেতড়ির মহারাজা স্বামীজীকে বিলেত নিয়ে যাবে বলে ব্যস্ত করে তুলেছিল। এখন ডাক্তারদের অমতে বিলেত যাওয়া স্থগিত রইল। শ্রীমাকে বললেন: "মা, কাল আবার দার্জিলিং যাচ্ছি। শিগ্‌গির দার্জিলিং থেকে আবার ফিরে আসব। মা, আশীর্বাদ করুন যেন আমি ঠাকুরের যে কাজ আরম্ভ করেছি, সে কাজ শেষ করতে পারি।"

মা স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন: "এই কাজের জন্যই তুমি এসেছ। চিন্তা কোরো না, ঠাকুর শীঘ্রই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন।"

শ্রীমার প্রসাদ নিয়ে স্বামীজী খেতড়ির মহারাজার গাড়ি করে আবার ভুলিচাঁদের বাগান-বাড়িতে ফিরে গেলেন।

চার

চিকিৎসকদের সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই শিষ্য অজিত সিংকে গভীর হতাশার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। তবে রাজা এইটুকু সান্ত্বনা পেলেন যে স্বামীজী শুধু তাঁরই জন্য দার্জিলিং থেকে নেমে এসেছেন, তাঁকে দক্ষিণেশ্বর-তীর্থ দর্শন করিয়েছেন, দুদিন দেবদুর্লভ সঙ্গ দিয়েছেন

শ্যামলালজী এই মেহফিলের তারিখ না দিলেও, তাঁর বর্ণনা[৯] থেকে প্রমাণ করা গেছে[৭] যে ২২ মার্চ সোমবার সন্ধ্যায় পূর্বোক্ত সঙ্গীতসভা আয়োজিত হয়েছিল।

উক্ত সঙ্গীত-আসরের মূল প্রস্তাবক স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—'সঙ্গীতসার সংগ্রহ' পুস্তকের লেখক, বিখ্যাত সঙ্গীতশাস্ত্র-বিশারদ এবং রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর প্রখ্যাতা 'গোলাপ মা'র জামাতা। গৃহকর্তা ভুলিচাঁদ কাঁকুরানিয়া এবং বর্ণনাকার শ্যামলাল ক্ষেত্রী গোয়ালিয়র ঘরানার গণপৎরাও ভাইসাহেবের সাঙ্গীতিক শিষ্য। ঐ সন্ধ্যার সঙ্গীত-আসরের মুখ্য শিল্পী ছিলেন রাজা অজিত সিং নিজে।

শ্যামলালজীর স্মৃতিচারণ যা প্রায় অর্ধশতাব্দী বাদে পুনর্মুদ্রিত ও ভাষান্তরিত হল তা থেকে জানা যায়:

"রাজা সাহেব বীণা বজানে মে বড়ে নিপুণ থে। আপকা বীণা-বজানা শুনকর সমঝ্‌নে-বালে মুগ্ধ হো জাতে থে। একবার (২২ মার্চ, ১৮৯৭ প্রসঙ্গ) আপ বীণা বজা রহে থে। উস্ সময় স্বামী বিবেকানন্দ ভী মৌজুদ্ থে। স্বামীজী শির হিলা কর দাদ্ দেনে লগে। স্বামীজী নে কহা থা, 'রাজা সাহেব, আপ বীণা ক্যা বজাতে হৈঁ, মোহিনী মন্ত্র ক্যা প্রয়োগ করতে হৈঁ।'"[৯]

স্বামীজী সপ্রশংসভাবে মাথা নেড়ে বাহবা দিয়ে বলেছিলেন: রাজা সাহেব, আপনি বীণাবাদনের মধ্যে কি সুন্দর মোহিনীমন্ত্রের প্রয়োগ করেছেন। এই একটি কথায় শিষ্যের মনের সমস্ত দুঃখ অপসারিত হল, এবং তিনি গুরুর সাহচর্য-বিনা সমুদ্রযাত্রার জন্য মনে বল ও উৎসাহ পেলেন।

স্বামীজী পরদিনই অর্থাৎ ২৩ মার্চ দার্জিলিং অভিমুখে রওনা হন। রাজা অজিত সিং কলিকাতা পরিত্যাগ করেন ২৬ মার্চ। স্বামি-শিষ্যের দুটি মধুময় দিন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের পটভূমিকায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

৮ কুমুদবন্ধু সেন, প্রবুদ্ধ ভারত, ১৯৫২, পৃষ্ঠা ৪০৮—৪১০; 'শতরূপে সারদা', ১৯৮৫ পৃষ্ঠা ১৭ পাদটীকা এবং ৭৫৯—৭৬১। স্বামীজীর সঙ্গে শ্রীশ্রীমার সাক্ষাতের তারিখ ২৩ মার্চ ধার্য করা হয়েছে। সঠিক তারিখ হবে ২২ মার্চ ১৮৯৭। বর্তমান প্রবন্ধের পাদটীকা ২ দ্রষ্টব্য।

৯ শ্যামলাল ক্ষেত্রীর স্মৃতিচারণ: ঝাবরমল শর্মার "আদর্শ নরেশ" (হিন্দী পুস্তক), যশরাপুর, খেতড়ি, ১৯৪০, পৃঃ ৩৭৯—৩৮১

নাম-মাহাত্ম্য

স্বামী ধীরেশানন্দ

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—'হাততালি দিয়ে সকালে ও সন্ধ্যাকালে হরিনাম করো, তা হ'লে সব পাপতাপ চ'লে যাবে। যেমন গাছের তলায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে গাছের সব পাখী উড়ে যায়, তেমনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করলে দেহগাছ থেকে সব অবিদ্যারূপ পাখী উড়ে পালায়।

'...আগে লোকে যোগযাগ, তপস্যা করত; এখন কলির জীব অন্নগতপ্রাণ, দুর্বল মন, এক হরিনামই একাগ্র হ'য়ে করলে সংসারব্যাধি নাশ পায়।

'জ্ঞাস্তে, অজ্ঞাস্তে বা ভ্রাস্তে যে কোন ভাবেই হোক না কেন, তাঁর নাম করলেই ফল হবে।

'এই কলিযুগে নারদীয় ভক্তিমতই প্রশস্ত। অন্য অন্য যুগে নানা রকমের কঠোর সাধনের নিয়ম ছিল; সে সকল সাধনে এ-যুগে সিদ্ধিলাভ করা বড় কঠিন। একে জীবের অল্প পরমায়ু... কঠোর তপস্যা কেমন ক'রে করবে?' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ, যুগধর্ম ১-৫)।

কথায় বলে 'দেহের সুখ ঘুমে আর মনের সুখ নামে।' সুনিদ্রা হইলে দেহ স্বচ্ছ ঝরঝরে, উৎসাহ-উদ্যমপূর্ণ বোধ হয়। সব লোক দেহ লইয়াই ব্যস্ত, দেহের পুষ্টি-সাধনে আহার-বিহারাদি নিয়াই মত্ত। কিন্তু—Man cannot live on bread alone—কেবল দেহ লইয়াই মানুষ শান্তি পায় না। তাহার মনের খোরাকও দরকার। তাই কাব্য, নাটক, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার পরিশীলনও প্রয়োজন। বিভিন্ন বিদ্যার অভ্যাসে জীব আনন্দ পাইয়া থাকে বটে, কিন্তু ভগবন্নামে চরম সাত্ত্বিক আনন্দের বিকাশ হয়।

নামের অচিন্ত্য শক্তি। ইহাকেই শব্দশক্তি বলা হয়। একটি শব্দেই লোক চিরতরে শত্রু হয় এবং একটি শব্দেই মিত্র হইয়া যায়,—ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়।

'শব্দশক্তেরচিন্ত্যত্বাদ্ বিদ্মস্তম্মোহহানতঃ।'

'মাহাত্ম্যমেতৎ শব্দস্য যদ্বিদ্যাং নিরস্যতি।
সুষুপ্ত ইব নিদ্রায়া দুর্বলত্বাচ্চ বাধতে॥'

—শব্দশক্তি অচিন্ত্যনীয়। সেই শক্তিবলেই জ্ঞানোৎপত্তির দ্বারা অজ্ঞান নাশ হয়। ইহা শব্দেরই মহিমা। স্বনাম দ্বারা আহ্বানে শব্দ-সম্বন্ধ বিনাই সুষুপ্ত পুরুষের জাগরণ এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত। এই শব্দশক্তি প্রবলতর, অজ্ঞান দুর্বল। তদ্রূপ ভগবন্নাম শক্তিতেই কামাদি ও অবিদ্যা নাশ হইয়া যায়। কারণ তাহারা দুর্বল, নামের শক্তি প্রবলতর।

'রাম'—পরমাত্মারই একটি নাম। রামভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন—

'রামনাম মণিদীপধর জীহ দেহরীদ্বার।
তুলসী ভীতর বাহিরো জো চাহত
উজিয়ার॥'

—হে তুলসী! যদি ভিতরের ও বাহিরের অন্ধকার দূর করতঃ প্রকাশ পাইতে চাও তবে দেহের দ্বারস্বরূপ জিহ্বাতে রাম নাম রূপ মণির স্নিগ্ধ দীপ ধারণ কর।

উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্তন প্রভাবে আপন অন্তরের মলিনতা ও বাহিরের অপর শ্রোতাদেরও অবিদ্যা নাশ হইয়া থাকে। কারণ, তাহারা দুর্বল, অপরপক্ষে নামের শক্তি প্রবল।

এক রাম, তাঁর কত নাম। বিভিন্ন রুচির লোকদের সন্তোষ বিধানার্থ তিনিই কৃপায় বহুবিধ নাম ধারণ করিয়াছেন। যেমন—

'রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥'

—এই শ্লোকে রামচন্দ্রের সাতটি নাম আছে। এই নামগুলি রুচির বৈচিত্র্যবশতঃ বিভিন্ন ভক্তের নিকট প্রিয় হইয়া থাকে। যেমন মহারাজ দশরথের নিকট 'রাম' এই নামটি পরম প্রিয় ছিল। তিনি 'রাম' 'রাম' উচ্চারণ করিয়াই পরম আনন্দ অনুভব করিতেন। মৃত্যুকালেও—

'রাম রাম কহি রাম কহি রাম রাম কহি রাম।
তনু পরিহরি রঘুবর বিরহ রাউ গয়উ সুরধাম॥'

—এই রূপে ছয় বার রাম নাম উচ্চারণ করিয়া মহারাজ দশরথ প্রিয় পুত্রের বিরহে দেহত্যাগান্তর স্বর্গলোকে গমন করিলেন। মাতা কৌশল্যার নিকট পুত্র রাম পূর্ণিমার পূর্ণকলা বিকশিত হৃদয়ানন্দদায়ক চন্দ্রমার ন্যায় আনন্দদায়ক বলিয়া তিনি পুত্রকে 'রামচন্দ্র' বলিয়া আহ্বান করিতেন। পুরবাসিগণ রাম সর্বকল্যাণনিদান, সর্বমঙ্গলাধার জানিয়া তাঁহাকে 'রামভদ্র' বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহাকেই আবার ঋষি মুনিগণ বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা-রূপে ('বেধা') সম্বোধন করিতেন। রাজ্যের প্রজাগণ তাঁহাকে রঘুবংশের নাথ বা রক্ষক ভাবিয়া তাঁহাকে 'রঘুনাথ' আখ্যা দিয়াছিলেন। স্বয়ং মাতা জানকী রামচন্দ্রকে 'নাথ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আর ভক্তগণের নিকট তিনি 'সীতাপতি' নামে পরিচিত। এইরূপে দেখা যায় বিভিন্নলোক রুচি স্নেহ মমতা শ্রদ্ধাদির বৈচিত্র্য-বশতঃ ভগবানকে বিভিন্ননামে ডাকিতে পছন্দ করে।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নামমহিমা প্রসঙ্গে তাঁহার রচিত 'শিক্ষাষ্টক' স্তোত্রে বলিয়াছেন—

'নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥'

—তোমার নামাবলী বহুপ্রকারে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তোমার সকল শক্তি অর্পিত হইয়াছে, নামস্মরণ বিষয়ে কোনও সময়ের বিধিও নাই। হে ভগবান্, তোমার এমনই করুণা, কিন্তু আমার এমনই দুর্দৈব যে এই জন্মে অনুরাগ জন্মিল না।

ঈশ্বর পরম কৃপালু। তাঁহার কৃপার পরিচয় এই বহুবিধ নাম ধারণ ও সেই নাম সমূহে তাঁহার পরম পাবনী-শক্তি সঞ্চারণ। নাম-স্মরণ অতি সহজ সাধন। একটু ইচ্ছা করিলে সকলেই অনায়াসে করিতে পারেন। কিন্তু দুর্দৈব বশতঃ লোকে তাহা করিতে চায় না।

একদিন একটি ভক্ত কথামৃতকার শ্রীম-র নিকট মনের অশান্তি নিবেদন করিতেছিলেন। শ্রীম বলিলেন—'ঠাকুরের নিকট প্রাণভরে প্রার্থনা করুন। তাঁর কৃপায় সব অশান্তি দূর হয়ে যাবে।'

ভক্ত—'প্রার্থনা করিতেও যে মন চায় না।'

শ্রীম—'তাঁহার নিকট মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়া কাঁদুন। কান্নায় তাঁর কৃপা হইবে।'

ভক্ত—'কান্নাও ত আসে না।'

শ্রীম—'তবে তাঁর নাম করুন। নামে রুচি হ'লে সব অশান্তি দূর হইবে।'

ভক্ত—'তাঁর নাম করিতেও যে ইচ্ছা হয় না।'

শ্রীম—'তাহা হইলে case serious। নামে রুচি হচ্ছে last medicine। ইহাও করিতে না চাহিলে বুঝিতে হইবে রোগ দুঃসাধ্য। বাঁচিবার আশা কম। সুতরাং case serious।'

কৃপা চারি প্রকার—ঈশ্বরকৃপা, গুরুকৃপা, শাস্ত্রকৃপা ও আত্মকৃপা। ইহার মধ্যে আত্মকৃপাই মুখ্য। আত্মকৃপার অর্থ সাধকের নিজের পুরুষ-কার। আত্মকৃপা না থাকিলে অপর তিনটি কৃপা কার্যকরী হয় না। অপর তিনটি কৃপা চিরকালই রহিয়াছে। জীব আত্মকৃপার অভাবেই ঐ তিনটি

কৃপার সদুপযোগ করিতে পারে না ও তাহার সব কার্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন—

'অধিকারিণমাশাস্তে ফলসিদ্ধি বিশেষতঃ।

উপায়া দেশকালাদ্যা সন্ত্যস্মিন্ সহকারিণঃ॥'

—কোন কার্যের ফলসিদ্ধি অধিকারীর উপরই বিশেষ রূপে নির্ভর করে। অর্থাৎ যথাযোগ্য অধিকারীর অপেক্ষা থাকে। দেশকালাদি সাধন কেবল উহার সহায়ক মাত্র।

অনধিকারীর পক্ষে শাস্ত্রও ব্যর্থ। কারণ,—যার স্বয়ং প্রজ্ঞা নাই, সূক্ষ্ম বস্তু বুঝিবার ক্ষমতা নাই, শাস্ত্র তাহার কি করিতে পারে? নেত্র-বিহীন লোকের নিকট দর্পণ কি তার মুখ প্রতিবিম্ব তাহাকে দেখাইতে পারে?—এরূপ লোকের সাধুসঙ্গ, মহতের সেবা ও সশ্রদ্ধ নাম-কীর্তন সাধনই শ্রেয়।

ঠাকুর বলিয়াছেন, 'জ্ঞাস্তে অজ্ঞাস্তে বা ভ্রান্তে ভগবন্নাম করিলেও তাহার ফল হইবেই।' জ্ঞাস্তে অর্থাৎ জ্ঞানত, অজ্ঞাস্তে অর্থাৎ অজ্ঞানত, যথা অজামিল। ব্রাহ্মণ অজামিল শূদ্রাণীর প্রেমে বদ্ধ হইয়া কতিপয় সন্তানের জনক হন ও দস্যুবৃত্তি করিয়া পরিবার প্রতিপালন করতঃ কর্মচণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। লোমশ মুনির দুরারোগ্য গাত্রদাহ রোগ উপস্থিত হইলে নারদ তাঁহাকে বলিলেন যে, কোন কর্মচণ্ডালের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজনে এ রোগ দূর হইবে। লোমশ মুনি অনেক অনুনয়াদি করিয়া ঐ শূদ্রাণীর নিকট হইতে কিছু উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিয়া নিরাময় হইয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিবার উপায়রূপে তিনি অজামিলকে অনুরোধ করিলেন যে তাহার কনিষ্ঠ পুত্রটির নাম 'নারায়ণ' রাখা হউক। অজামিল সম্মত হইলেন। মৃত্যুকালে অজামিল ভীষণকায় যমদূতগণের দর্শনে ভয়ভীত হইয়া প্রিয়পুত্রকে ডাকিয়াছিলেন, 'নারায়ণ আয়' 'নারায়ণ আয়' এই দুটি শব্দ মিলিত হইয়া একটি শব্দ-রূপে পরিগণিত হইল 'নারায়ণায়' এইরূপে তাহার সর্বপাপ স্খালন হইল।—

ভ্রান্তে অর্থাৎ ভ্রান্তভাবে নাম উচ্চারণ করিলেও তাহার ফল হয়—

'মূর্খো জপতি বিষ্ণায় বিদ্বান্ জপতি বিষ্ণবে।

উভয়োস্তু ফলং তুল্যং ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ॥'

—বিদ্যাবিহীন মূর্খ 'বিষ্ণায় নমঃ' বলে। ব্যাকরণ মতে 'বিষ্ণবে নমঃ' শুদ্ধ। কিন্তু সে উহা জানে না। সে আগ্রহ ও আন্তরিকতার সহিত 'বিষ্ণায় নমঃ' মন্ত্র জপ করিয়া থাকে। আর বিদ্বান ব্যক্তি 'বিষ্ণবে নমঃ' এই শুদ্ধ মন্ত্র জপ করেন। কিন্তু ভগবানের দৃষ্টিতে উভয়ের ফলই সমতুল্য। কারণ তিনি ভাবগ্রাহী। লোকের মনের ভাবটুকুই মাত্র তিনি গ্রহণ করেন। ব্যাকরণগত শুদ্ধি-অশুদ্ধির দিকে দৃকপাত করেন না। ছোট শিশু যখন পিতাকে 'পা' 'পা' বলিয়া ডাকে, পিতা জানেন শিশু তাহাকেই ডাকিতেছে ও সস্নেহে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরেন।

বিচারদৃষ্টিতে সবই তাঁর নাম। কারণ তিনি সর্ববর্ণময়। 'কালী পঞ্চাশৎবর্ণময়ী—বর্ণে বর্ণে বিরাজ করে'। ইংরেজ কবি Tennyson-এর নিজ নাম জপে ভাব সমাধির কথা শোনা যায়। ঐ অবস্থায় সত্যস্বরূপের অনুভব তাঁহার জীবনে স্থায়ী হইয়াছিল কি না তাহা বলা যায় না। কারণ উহা বিশেষ সাধন সাপেক্ষ। তবে উহা যে চরমতত্ত্বের আভাস-অনুভূতি তাহা নিশ্চিত।

এরূপ বর্ণিত আছে যে Tennyson নিজের নাম স্বগতভাবে আবৃত্তি করিয়া নিত্যচৈতন্য সত্তা উপলব্ধি করিতেন। তিনি নিজের আত্মজীবনীতে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উহা অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক। তিনি লিখিয়াছেন:

'আমার বাল্যকাল থেকেই যখন আমি সম্পূর্ণ

একাকী থাকিতাম তখন একপ্রকার—জাগ্রত ভাব-সমাধি অনুভব করিতাম। সাধারণতঃ আমার নিজের নামটি ২।৩ বার স্বগতভাবে আপন মনে নীরবে উচ্চারণ করে এই ভাবটি আসত। হঠাৎ যেন ব্যক্তিত্বের একীকরণ ও তীব্রতার ফলে ব্যক্তিত্বই লুপ্ত হয়ে এক সীমাহীন অনন্ত সত্তায় ধীরে ধীরে মিশে যেত। এবং এটি কোন অজ্ঞানজনিত মূঢ় অবস্থা নহে—বরং সর্বতোভাবে ভাষার অতীত, স্পষ্ট হতেও স্পষ্টতম, নিশ্চিত বস্তু হতেও নিশ্চিততম, এবং স্থূল জগৎ থেকে ভিন্ন, রহস্যময় সূক্ষ্মতত্ত্ব হতেও সূক্ষ্মতম—যেখানে মৃত্যু ছিল প্রায় হাস্যকররূপে অসম্ভব। ব্যক্তিত্বের বিলুপ্তি যদি মেনেও নেওয়া যায়, তথাপি তাহা বিনাশরূপ না হয়ে সত্য জীবন-রূপে-ই প্রতিভাত হ'ল। আমি তা ভাষায় বর্ণন করতে না পারায় লজ্জিত। আমি কি বলিনি যে ঐ অবস্থা সর্বতোভাবে ভাষার অতীত?' (**Quoted in Alfred Lord Tennyson, a memoir, by His Son, Hallan Tennyson, Macmillan 1897 Vol.1**)।

জগতে বিভিন্ন ধর্মে ভগবানের নামও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন হিন্দুগণ জপ করেন—'রাম' 'কৃষ্ণ' 'হরি' 'কালী' 'নারায়ণ' 'শিব'—ইত্যাদি বহুবিধ দেবদেবীর নাম। খ্রীষ্টানগণ জপ করেন—'**Ava maria**', '**Jesus Christ my Lord have mercy on me, a sinner**'। মুসলমানগণ জপ করেন—'অল ওয়হিদ' 'আহাদ (এক অদ্বিতীয়)', 'আক্রাম (দয়ালু)', 'করীম (বদান্য)', 'কুদ্দুস (পবিত্র)', 'মহির (জীবনদাতা)', 'কাদির (শক্তিমান)', 'কবীর (মহান)', 'হাকেম (বিচারক)', 'হাকিম (মহাজ্ঞানী)', 'নূর (আলোক)',—ইত্যাদি আল্লার ২৪টি প্রসিদ্ধ নাম, এবং বৌদ্ধগণ 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' এই মন্ত্র জপ করেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রত্যেক ধর্মেই নাম জপ করার বিধান আছে। ভগবান এক হইলেও তিনি অনন্তমূর্তি—অনন্ত তাঁর নাম। পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে যে ভক্ত তাঁর রুচি ও ভাবানুযায়ী বিশেষ একটা নাম হয়তো ভাল-বাসতে পারেন। কিন্তু তাই বলিয়া ভগবানের অন্যান্য নামের মাহাত্ম্য কম—এইরূপ ধারণা করা ভুল। একই ব্যক্তির যেমন ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকে এবং তার মধ্যে যে-কোন একটি নামে তাহাকে ডাকিলেই সে যেমন সাড়া দিয়া থাকে, এই কথা ভগবানের ক্ষেত্রেও সেইরূপ। ঈশ্বরের সব নামেরই সমান মাহাত্ম্য—এই ভাবটি অবধারণ করিয়া ভক্তের রুচি ও ভাবানুযায়ী নাম-বিশেষকে তাঁর গ্রহণ করা কর্তব্য। আমরা যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে দেখি যে তিনি মা কালীর উপাসক হইয়াও বিভিন্ন নামে ভগবানের নাম-গুণগান করিতেন। এই ভাবটি গ্রহণ করিয়া চলিতে পারিলে মনে কোন সাম্প্রদায়িকভাব ও গোঁড়ামি প্রকট হইতে পারে না।

পূর্বেই যেমন বলা হইয়াছে, ভগবদুপলব্ধির পক্ষে নাম-স্মরণ অতি সহজ সাধন। শাস্ত্রানুযায়ী শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন ইত্যাদি ভক্তি-সাধনার প্রধান অঙ্গগুলির মধ্যে 'কীর্তন' অর্থাৎ ভগবানের নামগুণগানেরই বিশেষ প্রাধান্য বলিয়া মনে হয়। কারণ নামে ভালবাসা আসিলেই অন্যান্যগুলির প্রশ্ন আসে। তাঁহার নামেই যদি অরুচি হয় তবে তাঁহার সম্বন্ধে শ্রবণ, স্মরণ, সেবা, পূজার্চনা ইত্যাদির ভাব আসিতে পারে না। ভগবানের প্রতি প্রথমে ভালবাসা না আসিলেও নাম করিতে করিতে ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি ভালবাসা বা প্রেম জন্মে। শ্রীশ্রীমায়ের উক্তি 'জপাৎ সিদ্ধি' অর্থাৎ কেবল জপেতেই সিদ্ধিলাভ হয়। 'জপ' মানে বার বার ভগবানের নাম উচ্চারণ করা। ভগবানের নাম করিতে করিতে ভক্ত ক্রমশঃ এমন স্তরে উন্নীত হন যে তখন তিনি উপলব্ধি করতে পারেন—নাম ও নামী অভেদ।

শ্রীশ্রীরাজা মহারাজজীর স্মৃতি-তর্পণ

শ্রীবিধুরঞ্জন দাস

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। সবেমাত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হইয়াছে। আমি তখন ঢাকাতে, কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ইহার প্রায় তিন বৎসর পূর্ব হইতেই ঢাকা মঠে আমার যাতায়াত ছিল এবং ঐ সময় হইতেই মিশনের একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজও করিতাম। যাহা হউক, যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময় কলিকাতায় তথা বেলুড় মঠে যাওয়ার একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। জানিতে পারিলাম যে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী তখন কলিকাতায় উদ্বোধনের বাড়িতে ও পূজ্যপাদ রাজা মহারাজ বলরাম-মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। ঢাকা মঠ হইতে ব্রহ্মচারী দুর্গানাথদা বেলুড় মঠে যাইতেছেন—এই সংবাদ শুনিবামাত্র আমি, পরেশ সেন, ক্ষিতীন্দ্র নাগ—এই তিনবন্ধুও তাঁহার সঙ্গে জুটিয়া গেলাম। যদিও দুর্গানাথদাই পথপ্রদর্শকরূপে আমাদের সঙ্গে যাইতেছিলেন তথাপি, যাত্রার পূর্বে ঢাকা মিশনের তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিত-সন্তান ঠাকুরদা (৺ঠাকুরচরণ মুখার্জী) বেলুড় মঠে ও উদ্বোধনে কিভাবে যাইতে হইবে এবং কোথায় কিরূপ করিতে হইবে—সবকিছু ভাল করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন।

২২ বা ২৩ ডিসেম্বর যথাসময়ে আমরা শিয়ালদহ পৌছিয়া ওখান হইতে ট্রামে করিয়া বাগবাজার গেলাম এবং মায়ের বাড়িতে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন আশায় নিচের ঘরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ বাদেই অনুমতি পাইয়া উপরে উঠিলাম ও দুর্গানাথদাকে অগ্রবর্তী করিয়া আমরা তিনজন পরপর সারি দিয়া শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের (বর্তমানে ঠাকুরঘর) দরজায় দাঁড়াইলাম। ঘরের ভিতরে উঁকি দিতেই দেখিলাম করুণাময়ী জগজ্জননী নিজের খাটখানিতে অর্ধাবগুণ্ঠিতা হইয়া পা-দুইখানি ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। সরলতা, পবিত্রতা ও করুণামাখা মুখখানিতে কী এক অপূর্ব স্বর্গীয় আভা! চোখ দুইটি হইতে যেন স্নেহমমতা-করুণার রশ্মি বিচ্ছুরিত হইতেছে! প্রথমে দুর্গানাথদাই দোরগোড়াতে মাথা ঠেকাইয়া মাকে প্রণাম করিলেন। দেখাদেখি আমরাও একে একে অনুরূপভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। শ্রীশ্রীমা তখন খুব অসুস্থ, তাই কাহাকেও তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে দেওয়া হইত না। সুতরাং আমরাও তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইলাম। ইহাতে আমাদের, বিশেষ করিয়া আমার মনে যে কী দুঃখ হইয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার নয়। কিন্তু অন্যভাবে করুণাময়ী মা তাহা পোষাইয়া দিয়াছিলেন। রোগে বিমলিন পাণ্ডুর-বর্ণের তাঁহার সেই মুখখানির কী অপূর্ব দিব্য-শোভা দেখিলাম, করুণাময়ীর স্নেহমাখা প্রশান্ত নয়নের কৃপাদৃষ্টিতে কী যে মৌন আশীর্বাদ লাভ করিলাম তাহা বর্ণনাতীত! সমস্ত মনপ্রাণ যেন আনন্দে বিহ্বল হইয়া গেল, অনির্বচনীয় এক প্রশান্তিতে মনপ্রাণ ভরপুর হইয়া গেল। এখনও সেই দৃশ্যটি যখন মনশ্চক্ষুর সামনে ভাসিয়া উঠে তখনই অনুরূপ শান্তি ও আনন্দ লাভ করি। এই অনুভূতি আমার জীবনের পাথেয় হইয়া রহিয়াছে। নিচে নামিয়া আসার পরেই মা সেবক দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—"ছেলেরা যেন

দুপুরে এখানে প্রসাদ পেয়ে যায়।" । তারপর ৬।৭ দিন কলিকাতায় থাকাকালীন প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে মায়ের বাড়িতেই আমরা প্রসাদ পাইতাম। সেই প্রসাদের সঙ্গে মায়ের পাতের দুধভাত প্রসাদও একটু একটু থাকিত। সেই প্রসাদটুকু যেন অমৃতমাখা মনে হইত।

শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও প্রণামান্তে আমরা বলরাম-মন্দিরে গেলাম। সেইখানে একে একে পূজ্যপাদ রাজা মহারাজ, পূজনীয় হরি মহারাজ ও পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজকে দর্শন ও প্রণাম পূর্বক আমরা হলঘরে আসিয়া বসিলাম। ততক্ষণে আরও কতিপয় ভক্ত আসিয়া স্থান গ্রহণ করিয়াছেন ও শ্রীমহারাজের সহিত আলাপ করিতেছেন দেখিলাম। সেইসময় কয়েকদিন ধরিয়া বলরাম-মন্দিরে যেন চাঁদের হাট বসিয়াছিল। শ্রীশ্রী-ঠাকুরের পূর্বোক্ত তিনজন পার্ষদ ছাড়াও উদ্বোধন হইতে পূজনীয় শরৎ মহারাজও কখনও কখনও আসিতেন। তাহা ছাড়া পূজনীয় মাস্টার মহাশয় ও পূজনীয় বৈকুণ্ঠ সান্ন্যাল—শ্রীশ্রীঠাকুরের এই দুইজন সন্তানকেও মনে হয় ওখানে দেখিতাম। বিকালবেলা বহু ভক্ত-নরনারীর সমাগমে হল-ঘরটি জমজমাট হইয়া উঠিত। কখনও কখনও শ্রীমহারাজজীর নির্দেশে অম্বিকানন্দ মহারাজ সুললিত কণ্ঠে অরগ্যান বাজাইয়া শ্রীমহারাজের অতিপ্রিয় শ্যামাসঙ্গীত, যথা 'চলিয়ে চলিয়ে কে আসে সমরে' ইত্যাদি গাহিতেন। কখনও বা ভবানী মহারাজ গাহিতেন ও গোঁসাই মহারাজ তবলাতে সঙ্গত করিতেন। শ্রীমহারাজ ভজনগান শুনিতে শুনিতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবস্থ হইয়া পড়িতেন। পূজনীয় শুকুল মহারাজ (স্বামী আত্মানন্দ) আমাদিগকে ঢাকায় একদিন বলিয়াছিলেন, "দেবদেবীর গান বা শ্যামাসঙ্গীত হইতে থাকিলে শ্রীমহারাজ দিব্যচক্ষে ঐসব দেবদেবীর মূর্তি, বিশেষতঃ রণরঙ্গিণী ভীমা শ্যামা-মাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেন।"

বোধহয় পরের দিনই প্রাতে শ্রীমহারাজকে হলঘরের বারান্দায় একাকী পায়চারী করিতে দেখিয়া আমি ও পরেশ নিকটে গেলাম। ঢাকায় ব্রহ্মচারী যোগেন মহারাজ যেমন বলিয়া দিয়াছিলেন তদনুসারে নতজানু ও কৃতাঞ্জলি হইয়া আমরা তাঁহার নিকট কৃপা ভিক্ষা করিলাম। শ্রীমহারাজ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "সে হবে'খন, কটা দিন এখানে থাক্ না তোরা।" ইহার ২/১ দিন পরেই আবার সকাতরে কৃপা প্রার্থনা করাতে তিনি দীক্ষার জন্য একটি ভাল দিন নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং সেইদিন প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে নির্দেশ দিলেন। আমরাও স্নানান্তে যথানির্দিষ্ট সেই শুভদিনে সকাল ৭টা নাগাদ বলরাম-মন্দিরে পৌঁছিয়া হলঘরের পশ্চিমের ছোট ঘরটিতে প্রবেশ করিলাম (ঐ ঘরটিতে শ্রীমহারাজ তখন থাকিতেন) ও তাঁহার পাদবন্দনা করিলাম। ওখানে যাওয়ার আগেই আমরা দুইজনে চিৎপুর-শোভাবাজার হইতে ফুলের দুইটি সুন্দর বড় স্তবক কিনিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য সামান্য গুরুদক্ষিণা দিব, কারণ টাকাকড়ি বিশেষ কিছু আমাদের সঙ্গে ছিল না। শ্রীমহারাজ আমাদের একজনকে ঘরে থাকিতে এবং আর একজনকে ঘরের বাহিরে গিয়া অপেক্ষা করিতে বলিলেন। ঠিক মনে নাই। তবে পরেশ ভায়াই বোধ হয় ঘরে থাকিয়া গেল, আমি বাহিরে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। যথাসময়ে আমাদের দুইজনেরই পর পর দীক্ষা হইয়া গেল, শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটোর সম্মুখে। তারপর দুইজনে সেই দুইটি ফুলের স্তবক নিয়া শ্রীমহারাজের শ্রীচরণে রাখিয়া গুরুদক্ষিণা দিলাম ও প্রণাম করিলাম। ইহাতে তিনি প্রসন্নই হইয়াছিলেন বুঝিলাম, কেননা একটু হাসিয়া রহস্যচ্ছলে বলিয়া উঠিলেন, "দেখছি তোদের যে টাকাকড়িও আছে রে!"

শ্রীমহারাজের নিকট আমার দীক্ষা নেওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হওয়ার মূলে ছিল একটি দিব্য স্বপ্ন। তাঁহাকে দর্শন করার বহু পূর্বে ঢাকায় থাকিতে একরাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম তিনি একটি গাছের ডালে (সম্ভবতঃ কদম্ব) পা ঝুলাইয়া শ্রীকৃষ্ণের মতো বাঁশী বাজাইতেছেন এবং আমার দিকে কৃপাদৃষ্টি করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। তখন হইতেই মনে মনে তাঁহাকেই গুরুরূপে বরণ করিয়াছিলাম। দীক্ষাদানের পর একদিন তিনি একা আমাকে কিভাবে ধ্যানজপ করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে কিছু উপদেশও দিয়াছিলেন। ঠিক মনে নাই, বোধ হয় সেইদিন দ্বিপ্রহরে শ্রীগুরু-দেবের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদও কিঞ্চিৎ পাইয়াছিলাম।

ইহার পর যে-কয়েকদিন ওখানে ছিলাম, দিনের বেলায় যতটা সম্ভব বেশি সময় ও সন্ধ্যার পরেও বেশ খানিকক্ষণ শ্রীমহারাজের স্বর্গীয় বৈঠকে তাঁহার পবিত্র সান্নিধ্যে কাটাইতাম। খাঁটি ধর্মপ্রসঙ্গ বা আধ্যাত্মিক আলোচনা খুব কমই হইত। কিন্তু খুব কম হইলেও যখনই হইত তখনই শ্রীমহারাজের ভাবান্তর ঘটিত। তিনি হঠাৎ ভাবগম্ভীর হইয়া যাইতেন, বহির্জগত হইতে নিজেকে সরাইয়া অন্তর্মুখী হইয়া যাইতেন। এমনিতে শ্রীমহারাজ সাধারণতঃ ফষ্টিনষ্টি বা রঙ্গরসের কথাই বেশি বলিতেন। কিন্তু ঐ সকল কথাও যে কত তাৎপর্যপূর্ণ এবং তাহাতে কতই না মাধুর্য থাকিত! প্রতিটি কথাই যেন ত্রিতাপদগ্ধ মানুষের মনপ্রাণকে আনন্দরসে আপ্লুত করিত!

অল্প কয়েকদিন তাঁহার পূত সঙ্গ লাভ করিয়া আমার এই অভিজ্ঞতা হইয়াছিল যে, তাঁহার কাছে গেলে কাহারও কোন জিজ্ঞাসার কথা বা কোন প্রশ্ন সাধারণতঃ মনে পড়িত না, সকলের মন যেন এক অনাস্বাদিত আনন্দরসে ভরপুর হইয়া থাকিত, জিজ্ঞাসু তাহার জিজ্ঞাসার কথা ভুলিয়া শান্তমনে আত্মবিমোহিত হইয়া বিরাজ করিত।

কোন কোন দিন শ্রীমহারাজকে সকালবেলায় হলঘরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় একটি দরজার চৌকাঠে ভর দিয়া free hand exercise-এর মতো করিতে দেখিয়াছি। একদিন জনৈক প্রাচীন ভক্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: "দিন কেমন কাটছে মহারাজ?" তদুত্তরে তিনি বলিয়া-ছিলেন: "মশাই, যেদিন তাঁর স্মরণমনন বেশ হয় সেদিনই মনে হয় ভাল কাটছে, নতুবা নয়।"

যে-সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় একদিন বেলুড় মঠে একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। এক রাত্রে মঠের গোয়ালঘরে আগুন লাগে। পরের দিন প্রাতে মঠ হইতে আগত জনৈক ব্রহ্মচারী বলরাম-মন্দিরে আসিয়া শ্রীমহারাজকে এই দুঃসংবাদ দিলে, তিনি অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। যাহা হউক, এই ঘটনার ৬।৭ দিন পর একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মহারাজের আনন্দমেলা হইতে বিদায় লইয়া শ্রীআমাদিগকে ঢাকা চলিয়া আসিতে হইল।

অতঃপর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে এম. এ. পড়িবার জন্য আমি কলিকাতায় আসি ও ইডেন হিন্দুহোস্টেলে বাস করিতে থাকি। আমার আসার ৩।৪ দিন পরেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী নরলীলা সংবরণ করেন। শ্রীমহারাজ তখন মঠে ছিলেন না। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে তিনি মঠে আসিলে আমি ও পরেশ এক সঙ্গে শ্রীগুরুদর্শনে মঠে গেলাম। সেই সময় পুরাতন মঠবাড়ির দোতলায় সিঁড়ির পাশের বড় ঘরটিতে—যেখানে আগে লাইব্রেরী ছিল—শ্রীমহারাজ সেই ঘরে থাকিতেন। আমরা সেই ঘরে প্রবেশ করিবামাত্রই ঘরের অন্যান্য সকলকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীমহারাজ বলিয়া উঠিলেন "এরা সব আমার চেলা যে রে।" শ্রীমহারাজের শ্রীমুখ হইতে এই কথা শুনিয়া আত্মতৃপ্তি ও আনন্দে

অভিভূত হইলাম। এতদিনের সাক্ষাতের ও সংযোগের ব্যবধানেও শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র আমাদের মনে রহিয়াছেন!

এই সাক্ষাতের কিছুদিন পর একদিন সকাল ৮টা নাগাদ মঠে গিয়াছি। গিয়া দেখি মঠবাড়ির দোতলায় পূর্বদিকের গঙ্গামুখী বারান্দায় পূজ্যপাদ শ্রীমহারাজ, পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ, পূজনীয় শরৎ মহারাজ এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালদাদা বেশ মজলিস করিয়া বসিয়া আছেন—কেউ বা চেয়ারে, কেউ বা ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট। বোধহয় পূজনীয় খোকা মহারাজও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সরস কথাবার্তা, ফষ্টিনষ্টি চলিতেছে। এমন সময় শ্রীমহারাজ হঠাৎ রামলালদাদাকে অনুরোধ করিলেন গঙ্গা-স্তোত্র আবৃত্তি করিতে। শ্রীমহারাজের অনুরোধ। কাজেই রামলালদাদা শ্রদ্ধাসহকারে সুর করিয়া ৺গঙ্গামায়ীর স্তব আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন। সম্পূর্ণ পরিবেশটি নিমেষে ভাবগাম্ভীর্যে থমথমে ভাব ধারণ করিল। শ্রীমহারাজের অর্ধ-নিমিলিত নেত্র, অন্যান্যরাও চিত্রার্পিতের ন্যায় ধ্যানমগ্ন। এমন দৃশ্য চোখে দেখার ও এমন দৈবী-চিত্রে অবস্থান করার সৌভাগ্য বোধ হয় জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতির ফলেই হইয়াছিল।

অনুরূপ আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল বলরাম-মন্দিরে। শ্রীমহারাজ সেইদিন সন্ধ্যার পরে বলরাম-মন্দির হইতে ভুবনেশ্বর যাত্রা করিবেন। তিনি আজ ভুবনেশ্বর যাইতেছেন, এই খবর পাইয়া বলরাম-মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। ইতি-মধ্যে আরও অনেক ভক্ত উপস্থিত হইয়াছেন। যাত্রার সময় উপস্থিত হইলে, হলঘরের বারান্দায় আসিয়া শ্রীমহারাজ একখানি চেয়ারে বসিলেন। উপস্থিত ভক্তগণ একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। আমিও তাহাই করিলাম। অতঃপর তিনি অর্ধমুদ্রিত নেত্রে, কিয়ৎক্ষণ নীরবে, জোড়হস্তে প্রার্থনা করিলেন—যেন সকলের জন্য ভগবচ্চরণে নীরবে কল্যাণ কামনা করিলেন ও সকলকে তাঁহার আন্তরিক আশীর্বাদ জানাইলেন। সেই মুহূর্তেও সেখানকার বায়ুমণ্ডল নিস্তব্ধ ও শান্তভাব ধারণ করিল, সমবেত ভক্ত-নরনারী সেই আশীর্বাদের দিব্য প্রভাব নতমস্তকে অনুভব করিল

এখন ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের কথা বলিতেছি। শ্রীমহারাজের মহাপ্রয়াণের কিছুদিন পূর্বে বেলুড় মঠে তাঁহার জন্মতিথি-উৎসব খুব সমারোহের সহিত পালন করা হইয়াছিল। সেইদিনের স্মৃতি বেশ স্পষ্টভাবেই মনে পড়িতেছে। মঠে গিয়া দেখি সকাল হইতেই বহু ভক্ত-নরনারীর সমাগম হইয়াছে। শ্রীমহারাজকে পুষ্পাভরণে মনোহর বেশে সাজানো হইয়াছিল।' তাঁহার প্রিয় ভক্ত বশীদা (খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডঃ বশী সেন) আবদার করিয়া নিজের ইচ্ছামত ফটোও তুলিয়াছিলেন। শ্রীমহারাজকেও দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে ভক্তপ্রবর দেবেনবাবুর "ফুলসাজে রসরাজে কে সাজাল" গানটি মনে পড়িয়া গেল। অতঃপর শ্রীমহারাজ আসন গ্রহণ করিলেন এবং আমরা সকলে একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ লাভ করিলাম। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগরাগের পর মঠের ছোট পুকুরটির ধারে কলাবাগানের মধ্যে ভক্তদের প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা হইল। আমাদের প্রসাদ গ্রহণের সময় শ্রীমহারাজ ভক্তবৃন্দের খাওয়া তদারক করিতে করিতে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমরা উচ্চৈঃস্বরে "রাজা-মহারাজজী কি জয়" ধ্বনি দিয়া উঠিলাম। শ্রীমহারাজ হাসিমুখে বলিলেন "কিরে তোরা যে খুব খাচ্ছিস।" "হ্যাঁ, মহারাজ", আমরা উত্তরে বলিলাম। প্রসাদ পাওয়ার পরে ভক্তেরা বিশ্রাম বা পায়চারি করিতে লাগিলেন। অতঃপর বিকাল

চারিটার সময়ে দূর হইতে দেখিতে পাইলাম গঙ্গার ঘাটের উপরের চাতালে, গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া শ্রীমহারাজ একাকী একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন। সুযোগ বুঝিয়া আমি ওখানে গিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিলাম ও পা-দুইখানিতে সযত্নে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম। মনে হইল জীবনের এক শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত—সাক্ষাৎ ভগবানের মানসপুত্রের নিকট আকাঙ্ক্ষার সব বস্তু চাহিয়া লইব ও জীবনের কঠিন সমস্যা-গুলির সমাধান করিয়া নিব। কিন্তু কি আশ্চর্য, সব কিছু ভুলিয়া গেলাম—এক অপার্থিব আনন্দে নীরবে পদসেবা করিয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলাম। শ্রীমহারাজ সেই সময় অল্প দুই-একটি কথা আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এখন আর মনে নাই। এভাবে সম্ভবতঃ ২০।২৫ মিনিট একাকী বসিয়া গুরুসেবা ও গুরুর পূত সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলাম। এমন সুবর্ণ সুযোগ জীবনে আর দ্বিতীয়বার পাই নাই।

সেই বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের পরেই শ্রীমহারাজ বলরাম-মন্দিরে কিছুদিন বাস করিবার জন্য আসিয়া সেখানে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। অসুখের খবর পাইয়া প্রায় দিনই হয় ক্লাস শেষ করিয়া বা ক্লাসে যোগদান না করিয়া কলেজ স্ট্রীট হইতে বলরাম-মন্দিরে হাঁটিয়া যাইতাম এবং শ্রীমহারাজের শরীরের অবস্থার কথা জানিয়া ফিরিতাম। সদর দরজার ধারে শ্রীমহারাজের শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিত বিজ্ঞপ্তি টাঙানো থাকিত। আগন্তুক ভক্তরা উহা দেখিয়া শ্রীমহারাজের সেইদিনের অবস্থা অবগত হইয়া চলিয়া যাইতেন, কাহারও উপরে উঠিবার অনুমতি ছিল না। কদাচিৎ নিচে কোন পরিচিত সাধু-ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে মৌখিক প্রশ্ন করিয়া একটু তথ্য লইতাম। মহাপ্রয়াণের পূর্বদিন দুপুরে বলরাম-মন্দিরে গিয়া নিচতলায় একটু ঘোরাফেরার পর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সিঁড়ি বাহিয়া খানিকটা উপরের দিকে উঠিলাম। এমন সময় কৃষ্ণলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) এক বারান্দা হইতে অন্য বারান্দায় যাইতে যাইতে আমাকে দেখিতে পাইলেন ও ইশারায় আমাকে উপরে উঠিতে বলিলেন। তিনি আমাকে খুব আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি শ্রীমহারাজকে দর্শন করিতে চাই কিনা। এই অপ্রত্যাশিত সুযোগে আমি সানন্দে সম্মতি জানাইলাম। তিনি আমাকে হলঘরের উত্তর-পশ্চিম দরজার কাছে বাহিরে দাঁড়াইয়া শ্রীমহারাজকে দর্শন করিতে বলিলেন। আমি ওখানে দুই-এক মিনিট দাঁড়াইয়া যেইমাত্র চৌকাঠে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়াছি, ঠিক সেই মুহূর্তে শ্রীগুরুদেব পাশ ফিরিয়া শুইলেন এবং সকরুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইলেন। আমার মনে হইল আমার ভবপারের কর্ণধার তাঁহার জীবদ্দশায় আমাকে শেষবারের মতো আশীর্বাদ দিয়া গেলেন। প্রণাম করিয়া নীরবে নিঃশব্দে মনে মনে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিচে নামিয়া আসিলাম।

বলরাম-মন্দিরে শ্রীমহারাজকে শেষ দর্শন করিয়া আসার পরদিন প্রাতে কাগজে দেখিলাম, "বেলুড় মঠের চূড়া খসিয়াছে"—শ্রীমহারাজ সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন এবং তাঁহার নশ্বর দেহ বেলুড় মঠে লইয়া গিয়া শেষ-কৃত্য করা হইবে। তাই আর বলরাম-মন্দিরে না গিয়া যথা শীঘ্র সোজা মঠে চলিয়া গেলাম। গিয়া দেখি শ্রীমহারাজকে তখনও মঠে আনা হয় নাই, মঠের নৌকাটি পাঠানো হইয়াছে। কাতারে কাতারে নরনারী গঙ্গার তীরে শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে বিষণ্ণ বদনে প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল মঠের

নৌকাখানি গৈরিক পতাকা উড়াইয়া দক্ষিণ হইতে উত্তরে আসিতেছে। মঠের সন্ন্যাসীরাই কয়েকজন মিলিয়া দাঁড় টানিতেছিলেন। নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিলে শ্রীমহারাজের সুসজ্জিত-দেহ অতি সন্তর্পণে উঠাইয়া "শ্রীগুরুমহারাজজী কি জয়", "রাজা মহারাজজী কি জয়" ধ্বনি দিয়া বহন করিয়া মঠের প্রাঙ্গণে পুরাতন আম গাছটির তলায় রাখা হইল। অতঃপর শ্রীমহারাজের শরীর চন্দনচর্চিত ও পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া ধূপধুনা দিয়া আরতি করা হইল। সাধু-ভক্তগণ সকলেই একে একে পুষ্পাঞ্জলি ও মাল্যদান করতঃ প্রণাম করিলেন। আমি একটি গোলাপ চন্দনে মাখাইয়া শ্রীমহারাজের শ্রীচরণস্পর্শ করাইয়া আনিলাম, ফটোগ্রাফও তোলা হইল। সর্বশেষে শ্রীমহারাজের অতিপ্রিয় ও বাংলাদেশে তাঁহার দ্বারা প্রবর্তিত শ্রীরামনামসংকীর্তন করা হইল। ইতিমধ্যে গঙ্গাতীরে এখন যেখানে বর্তমানে "ব্রহ্মানন্দ মন্দির" সেইখানে চন্দনকাঠের চিতা-শয্যা রচিত হইল। শ্রীগুরুমহারাজের ও শ্রী-মহারাজের তুমুল জয়ধ্বনি করিতে করিতে তাহার নশ্বর দেহ নির্দিষ্ট স্থানে আনীত হইল। শেষ-কৃত্যাদি করা হইলে পর দেহ চিতার উপরে স্থাপন করিয়া বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করতঃ অগ্নি-সংযোগ করা হইল। প্রচুর ঘৃতাহুতি পাইয়া চিতাগ্নি হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। দাহ-কার্য শেষ হওয়ার পর কিন্তু জলধারা দিয়া আর চিতাগ্নি নির্বাপিত করার প্রয়োজন হইল না। উপস্থিত শোকার্ত নরনারীর বিস্ময়োৎপাদন করিয়া মা ভাগীরথী যেন শান্তিজলে চিতা ধৌত করিয়া দিতে আসিলেন এবং তাঁহার বানের জলধারা চিতাভস্ম ধৌত করিয়া দিলেন। এই অদ্ভুত ঘটনাটি প্রত্যক্ষ দেখিয়া একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম। কবিতার প্রথম দুইটি পংক্তি :

"কার ওই চিতা জ্বলে, পবিত্র জাহ্নবীকূলে,
ভেদিয়া গগন উঠে হবিতৃপ্ত হুতাশন।"

শ্রীমহারাজের দেহত্যাগের পর তাঁহার স্মরণে পরের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাসের উদ্বোধনে, তাঁহার সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার কবিতাটিও জ্যৈষ্ঠ মাসের উদ্বোধনে বাহির হইয়াছিল। শ্রীমহারাজের শেষকার্যের সময়কার একটি দৃশ্য আমার বেশ মনে পড়িতেছে। সেইটি হইল স্বামীজীর একান্ত অনুগতা, বৃদ্ধা বিদেশিনী ভক্তমহিলা মিস্ ম্যাক-লাউডের চিতাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকার দৃশ্য। তিনি নীরবে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাপুস নয়নে চক্ষের জল ফেলিতেছিলেন—মনে হইতেছিল যেন সদ্য পুত্রহারা শোকাকুলা বঙ্গজননীর প্রতিমূর্তি। সব শেষ হইলে গভীর বেদনা-হত হইয়া শূন্য-হৃদয়ে বাসস্থানে ফিরিলাম। যথা সময়ে বেলুড় মঠে শ্রীমহারাজের তিরোধান-উপলক্ষে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, ভোগরাগ ও সাধু ভক্তগণের ভাণ্ডারা হয়। আমিও তাহাতে যোগদান করিয়াছিলাম।

ওঁ ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি।

চৈতন্যদেব ও হিন্দী সাহিত্য

ডক্টর রামবহাল তেওয়ারী

আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে প্রেমভক্তির প্রতিমূর্তি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আমাদের যে প্রেমমন্ত্রে অভিষিক্ত করেছিলেন তার ভেতরের কথা হল: প্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ। নিঃশ্রেয়স্ লাভের প্রকৃষ্ট উপায় প্রেম। প্রেমই অমৃত। মানুষ চিরদিন উপেক্ষিত ও অপবিত্র হয়ে থাকবে কেন? তাকে 'চির পতিত' বলে দূরে সরিয়ে রাখা হবে কেন? প্রেমের স্পর্শে সে পরম পবিত্র ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। সে মুক্তির অধিকারী হবে। প্রচণ্ড দুরাচারীও প্রেমের প্রভাবে সাধু হয়ে ওঠে, অমরত্ব লাভ করে। এ-বিশ্ব তো বিশ্বেশ্বরেরই লীলাভূমি। মানুষ সেই লীলারই অঙ্গ। অকপট প্রেমে বিশ্ব ও বিশ্বনাথের সেবাই যথার্থ বৈষ্ণবের পরম কর্তব্য। সব মানুষই তা পারে। সকলের হৃদয়ে প্রেম রয়েছে, তাকে ঠিক-মতো জাগানো চাই। সহজ, সুন্দর ও উদার ভাবে প্রত্যেকটি জীবকে গ্রহণ করা চাই।

রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত সত্তার অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই প্রেমভক্তির বন্যায় বাংলা তথা ভারত এমন কি বিশ্বকেও ভাসিয়ে দিয়েছেন। সৃজন করেছেন প্রেমের জগৎ। এই প্রেমরাজ্য দেখা দেয় বাংলায়, উড়িষ্যায় ও উত্তর প্রদেশে সর্বপ্রথম। ক্রমে ক্রমে সমগ্র উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত, মহারাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলও তার সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রাদেশিকতা, ভাষা, জাতি, ধর্ম ও সমাজের খোলস আপনা-আপনি খসে পড়ে।

চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতক জুড়ে সারা ভারতবর্ষেই ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। দেখা দিয়ে-ছিল তখন ধর্ম ও অধ্যাত্ম-সাধনার মাধ্যমে এক নবজাগরণের সূচনা। উত্তর ভারতে মহাপ্রভু বল্লভাচার্য, কবীর, সুরদাস, তুলসীদাস; রাজস্থানে মীরাবাঈ, দাদূ দয়াল, রজ্জব; পাঞ্জাবে গুরু নানকদেব; আসামে মাধবকান্দলী, শংকরদেব, মাধবদেব; উড়িষ্যায় বলরাম দাস, জগন্নাথ দাস; মহারাষ্ট্রে নামদেব, তুকারাম এবং গুজরাটে নরসিমেহতা প্রমুখ সন্তকবিগণ জন-জীবনে যুগো-চিত সংস্কার ও নবীন উদ্যম সঞ্চার করেন। বাংলায় সে কাজটি সম্পন্ন করেন মহাপ্রভু চৈতন্য, ন্যায়শাস্ত্রী রঘুনাথ শিরোমণি ও স্মার্ত রঘুনন্দন প্রমুখের সহযোগিতায়। তাঁর আরব্ধ কাজ আরও ব্যাপক এবং সফল রূপ লাভ করেছে বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী ও অপরাপর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধক-দের প্রয়াসে। সে যুগের পরিবর্তমান ভারতকে ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের চিন্তন-মনন ও সৃজনমূলক রাখি-ডোরে বেঁধেছিলেন যে-সব মহা-পুরুষ চৈতন্যদেব তাঁদের মধ্যে বরিষ্ঠ। ভারতের জন-জীবনে তাঁর প্রেমধর্মের গভীর এবং ব্যাপক প্রসার ও স্বীকৃতি যেমন বিস্ময়কর তেমনি আশা-ব্যঞ্জক। রাগানুগা বা মাধুর্য-ভক্তি নিয়ে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অভিনব সাহিত্য-সৃষ্টি ঘটেছে, যা সংক্ষেপে 'চৈতন্য-সাহিত্য' নামে অভিহিত হতে পারে। সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া ও অসমীয়ায় চৈতন্য-সাহিত্যের বিশেষ ভূমিকা লক্ষিত হয়। মান ও পরিমাণের বিচারে সংস্কৃত ও বাংলা চৈতন্য-সাহিত্যের পরই হিন্দী চৈতন্য-সাহিত্যের স্থান। হিন্দী চৈতন্য-সাহিত্য রচিত হয়েছে প্রধানত ব্রজভাষায়। সূচনা ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ। বিংশ শতকে খড়ীহিন্দীতেও সে রচনার ধারা অব্যাহত।

হিন্দীর বিশাল ভক্তি-সাহিত্য 'নির্গুণ' ও 'সগুণ' নামে দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত। নির্গুণ শাখাটির 'সন্ত-সাহিত্য' ও 'সুফী-সাহিত্য' নামে দুটি উপবিভাগ আছে। 'রামভক্তি সাহিত্য'

এবং 'কৃষ্ণভক্তি সাহিত্য' নামে দুটি উপবিভাগ আছে 'সগুণ' শাখাটিরও। কৃষ্ণভক্তি সাহিত্য-শাখাটির আবার বল্লভ সম্প্রদায়, নিম্বার্ক সম্প্রদায়, চৈতন্য বা গৌড়ীয় সম্প্রদায়, রাধাবল্লভ সম্প্রদায়, হরিদাসী বা সখী সম্প্রদায় এবং ললিত সম্প্রদায় ভিত্তিক ছটি ভাগ রয়েছে। তা ছাড়াও সভাকবি এবং অন্য কবিদের রচিত কৃষ্ণকাব্যের একটি স্বতন্ত্র ধারাও পরিলক্ষিত হয়। আমাদের আলোচ্য চৈতন্যমতাশ্রয়ী কাব্যধারাটির স্থান হিন্দীকৃষ্ণকাব্যেও তৃতীয়। এই সাহিত্যধারাটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে অন্তত ১২২ জন ভক্ত-কবির স্বতঃস্ফূর্ত রচনায়। এই কবিদের মধ্যে উত্তর-প্রদেশ, বিহার, বাংলা, উড়িষ্যা, দক্ষিণভারত, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান ও পাঞ্জাবের ভক্তজন রয়েছেন। দেশের নানা অঞ্চল থেকে চৈতন্য-দেবের প্রেমভক্তির টানে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী মানুষ ব্রজধাম বৃন্দাবনে এসেছেন। তাঁরা প্রেম-ভক্তির সাধনার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজভাষারও সাধনা করেছেন। আর ভক্ত-হৃদয়ের আবেগ ও আর্তিতে সমৃদ্ধ করেছেন হিন্দীর ভক্তি-সাহিত্য। তাঁরা যেমন মাধুর্য-ভক্তির উৎকৃষ্ট সরসপদাবলী রচনা করেছেন, তেমনি চৈতন্যদেবের বন্দনা, জন্ম, বাল্যলীলা এবং অন্যবিধ লীলা নিয়েও বিবিধ ও বিচিত্র পদ লিখেছেন। চৈতন্যদেবের জীবন ও শিক্ষা নিয়েও বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। অনেকে চৈতন্য দেবের পরিকরবৃন্দের রচিত সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থের অবলম্বনে ব্রজভাষায় গ্রন্থরচনা করেছেন, কেউ কেউ বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের অনুবাদও করেছেন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতেরও ব্রজভাষায় অনুবাদ হয়েছে। এ-সবের মধ্যে সাহিত্যিক বিচারে মাধুর্য-ভক্তির পদাবলীই শ্রেষ্ঠ। এই পদাবলীকারদের মধ্যে রামরায়, সুরদাস মদনমোহন, গদাধরভট্ট, মাধুরীজী, বল্লভরসিক, ভগবানদাস, চন্দ্রগোপাল, রাধিকানাথ ও ব্রহ্মগোপাল প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চৈতন্যদেবের বন্দনা, জন্মোৎসব এবং বিচিত্র লীলাবিষয়ক পদকর্তাদের মধ্যে রাম রায়, গদাধরভট্ট, চন্দ্রগোপাল, ভগবান দাস, রসিকমোহন রায় ও মাধুরীজী প্রমুখ বিশেষভাবে স্মরণীয়। গৌরাঙ্গ-জীবনীকারদের মধ্যে—গৌর-চরণদাস (গৌরাঙ্গ জীবনী), লালমণি (শ্রীগৌর-শ্যাম প্রেম প্রকাশ), যজ্ঞদত্ত (শ্রীগৌরাঙ্গচরিত মানস), মনোহর দাস (চৈতন্যলীলা, গদ্যে), গৌরগণ দাস (গৌরাঙ্গভূষণ মঞ্জাবলী, গৌরাঙ্গ-ভূষণ বিলাস), কিশোরীদাস গোস্বামী (গৌড়েশ্বর সম্প্রদায় কা সচিত্র ইতিহাস) এবং চন্দ্রগোপাল (শ্রীগৌরাঙ্গ অষ্টযাম) প্রমুখের প্রয়াস শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সংস্কৃত ও বাংলা থেকে ব্রজ-ভাষায় যাঁরা বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন—সুফল শ্যাম তাঁদের অন্যতম। তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' চৈতন্যজীবনী-গ্রন্থটি অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে অনুবাদ করেন। মূল রচনাটি বাংলা পয়ারে কিন্তু অনুবাদটি ব্রজ-ভাষা-দোহাতে। একটি দোহা—

রূপসনাতন জগৎহিত, সুবল শ্যাম পদ আস।
প্রভুচরিত্রামৃত কোঁ লিখৈঁ ব্রজভাষাহি প্রকাশ ॥

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ড অনুবাদ করেন রাধাচরণ গোস্বামী। রূপ-গোস্বামীর 'স্মরণ মঙ্গল-স্তোত্র'-এর অনুবাদ করেন মধুসূদন গোস্বামী 'স্মরণ-মঙ্গল ভাষা' নামে। বালকৃষ্ণদাস নরোত্তম ঠাকুরের 'প্রার্থনা'র অনুবাদ করেন। ভক্ত বৈষ্ণবদাস 'রসজানি' 'গীতগোবিন্দভাষা' এবং 'ভাগবতভাষা' নামে যথাক্রমে গীতগোবিন্দ ও ভাগবতের অনুবাদ করেন। এই জাতীয় আংশিক এবং পূর্ণ অনুবাদের প্রয়াসী হয়েছেন বহু সাধক কবি। বহু কবি বৃন্দাবন এবং চৈতন্য পরিকরদের গুণগান করেও পদ রচনা করেছেন। চৈতন্যমতাশ্রিত ব্রজভাষা

সাহিত্যের বেশির ভাগ রচিত হয়েছে গোপালভট্ট গোস্বামী, ও নিত্যানন্দ গোস্বামীর শিষ্য রাম-রায়ের পরিকরদের হাতে, বৃন্দাবনেই। তবে গদাধর পণ্ডিত ও রূপ-সনাতন, রঘুনাথভট্ট প্রমুখের শিষ্যমণ্ডলীর সৃষ্টির পরিমাণও কম নয়। চৈতন্যমত ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নন এমন কবিদের রচনাও পাওয়া যায়।

সমগ্র হিন্দী ভক্তি-সাহিত্যের তুলনায় চৈতন্য-মতের হিন্দী সাহিত্যের পরিমাণ কম হলেও, তাঁর গুরুত্ব ও মহত্ত্ব কোন অংশে কম নয়। বৃন্দাবনের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্মভাব ও অভিরুচি নির্মাণে চৈতন্যদেবের দান অবিস্মরণীয়। চৈতন্য-সাহিত্য বাদে হিন্দী সাহিত্য অসম্পূর্ণ। তেমনি হিন্দী সাহিত্য ছাড়া চৈতন্যদেবের ধর্মমত ও প্রেমভক্তির ধারা ভারতের সর্বত্র ব্যাপক এবং বাঞ্ছিত বিস্তার লাভ করতে পারত কিনা, বলা সহজ নয়। সম্প্রতি একটি উল্লেখযোগ্য বই হাতে এসেছে। ব্রজধামবাসী প্রভুদয়াল মীতল তাঁর অতি মূল্যবান গ্রন্থ 'চৈতন্যমত ঔর ব্রজসাহিত্য'-এ নৈপুণ্যের সঙ্গে অন্তরের ভক্তি নিবেদন করেছেন। বইটির ভূমিকা থেকে হাজারী-প্রসাদ দ্বিবেদীর প্রাসঙ্গিক অভিমত উদ্ধার করা যেতে পারে। তা হল—"মহাপ্রভু চৈতন্যদেব কেবল ভাবুক ভক্তদের মণ্ডলীই তৈরি করেননি, ভক্ত আচার্যদের মহিমান্বিত চিন্তন-পরম্পরাও স্থাপন করেছেন। প্রেম ও জ্ঞানের মিলিত ধারায় যে বহু সরস ও সারবান্ সাহিত্য-স্রষ্টা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন—তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ব্রজের হিন্দী কবিগণ তাতে প্রভাবিত হবেন—এটা অতি নিশ্চিত ছিল।" সুতরাং হিন্দী-সাহিত্যিকদের একটি বলিষ্ঠ প্রেরণার উৎস চৈতন্যদেব তা নিঃসন্দেহ।

আমার জন্মভূমি

শ্রীমতী গীতি সেনগুপ্ত

আজ নিখিলে নিখিলে আকাশ বাতাস মাঝে—
শোনো কান পেতে শোনো মহা উল্লাসে
রক্ত-নূপুর বাজে॥
মোরা ধরায় ঢেলেছি প্রাণ—
দেশ-মায়ের রাখিতে মান।
মোরা সেজেছি অলস-বসন ছাড়িয়া
বীর সৈনিক সাজে॥

মোদের টুটেছে তন্দ্রা ঘোর
দুই নয়নে আলোক ভরি'
আজ র'য়েছি সজাগ গিরিকন্দরে
মোরা অতন্দ্র প্রহরী।
ঘরে তুলেছি ফসল ভ'রে
হাত পাতিবো না দোরে দোরে।
জেনো দীনহীন হ'য়ে বিশ্বের কাছে
ভারত রবে না লাজে॥

বিবেকানন্দ-বৃত্তে আরেকটি নামঃ শ্রীমতী মেরী হেল

শ্রীমতী চিত্রা বসু

স্বামী বিবেকানন্দ উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ, আচার্য এবং যুগনায়ক। শিকাগোর ঐতিহাসিক ধর্মমহাসভায় কয়েক সহস্র নরনারী মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনেছিল তাঁর বিশ্বজয়ী অমৃত-কথা। সে যুগে যা প্রায় অসম্ভব ছিল তাও সম্ভব করেছিলেন, তাঁর আরাধ্যা দেশমাতৃকা ভারত বিশ্বসভায় সসম্মানে প্রতিষ্ঠিতা হলেন। ভারতের এই সন্ন্যাসী ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জুলাই আমেরিকার শিকাগো নগরীতে যখন প্রথম পদার্পণ করেন, তখন তিনি পরিচয়পত্রহীন অজ্ঞাতকুলশীল এক ব্যক্তি মাত্র। তাঁর গায়ের রং শ্বেতকায়দের কাছে বিদ্রূপের বস্তু। শিকাগোয় কয়েকদিন থাকার পর সেখানকার খরচের বাহুল্য তাঁকে ভীত করে তুলেছিল। তাই প্রায় কপর্দকহীন অবস্থায় তিনি বোস্টনে চলে যান। কিন্তু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান, গুরুর আদর্শ-রূপায়নের সাফল্য সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসে অধিষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দকে গুরুই পথের লক্ষ্যে পৌঁছে দিলেন, যদিও পথিমধ্যে তাঁকে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করতে হয়েছে। ট্রেনে বৃদ্ধা স্যানবর্ণের সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ হয়। এই স্নেহময়ী নারী তাঁকে বোস্টনের দিনগুলিতে আতিথ্য দেন এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। অধ্যাপক রাইট তাঁর বন্ধু ডাঃ বারোজের কাছে চিঠি লিখে, স্বামীজীর বিশ্ব-ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ করে দেন।

স্বামীজী অধ্যাপক রাইটের দ্বারা ক্রীত ট্রেনের টিকিট, রাইট-প্রদত্ত পরিচয়পত্র এবং ধর্মসভার সভাপতি ডঃ বারোজের ঠিকানা নিয়ে আবার শিকাগোর উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু স্টেশনে যখন নামেন তখন দুর্ভাগ্যবশতঃ সে পরিচয়পত্র বা ডাঃ বারোজের ঠিকানা হারিয়ে যায়। তখন রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে; তিনি মহা সমস্যায় পড়েন, কোন একটি লোক একটা হোটেল পর্যন্ত দেখিয়ে দেয়নি। অগত্যা নিরাশভাবে স্টেশনের মালগাড়িতে রাত কাটিয়ে পরদিন প্রভাতে হ্রদের উপকূলবর্তী রাস্তা ধরে চলতে শুরু করলেন। পথের দুপাশে আমেরিকার ক্রোড়পতিদের গৃহ। গৃহগুলিতে ভিক্ষা চাইলেন, কিন্তু ভৃত্যেরা তাঁর কথায় কর্ণপাতমাত্র করেনি। স্বামীজী অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে কোনও একটি অট্টালিকার সামনে বসে পড়লেন। সেই মুহূর্তে অট্টালিকার দ্বার উন্মুক্ত করে মূর্তিমতী জননীস্বরূপা এক নারী তাঁকে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি ধর্মসভার প্রতিনিধি কিনা? স্বামীজী উত্তরে জানান যে তিনি ডাঃ বারোজের ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছেন এবং অত্যন্ত অসহায় অবস্থার মধ্যে রয়েছেন। সেই নারী সেদিন তাঁকে যত্নসহকারে তাঁর গৃহে নিয়ে যান, এবং পরিচর্যার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। এই নারী মিঃ জর্জ ডব্লিউ হেলের পত্নী শ্রীমতী বেলা এ্যালেন হেল। তিনি স্বামীজীকে বিশ্বধর্মমহাসভার কার্যালয়ে নিয়ে গিয়ে সভার ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। স্বামীজী ধর্মসভায় প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান। মিসেস্ হেলকে স্বামীজী 'মা' বলে সম্বোধন করতেন। অন্যের কাছে লেখা তাঁর চিঠিপত্রে 'মাদার চার্চ' এবং 'ফাদার পোপ' বলে উল্লিখিত হতেন যথাক্রমে শ্রীমতী হেল ও জর্জ হেল। স্বামীজী দুবার আমেরিকা সফরকালে শিকাগোয় থাকাকালীন বেশ কয়েকবার হেল পরিবারের ৫৪১ নম্বর ডিয়ারবর্ণ এভ্যুনিউ-এর বাড়িতে বাস করেন। শ্রীমতী স্যানবর্ণ ও

শ্রীমতী হেলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ঘটনাকে অতি আশ্চর্যজনক ও যুগান্তকারী বলে বর্ণনা করলে অত্যুক্তি করা হবে না। এঁদের আনুকূল্যই সহায়সম্বলহীন বিবেকানন্দের বিশ্বধর্মমহাসভার মঞ্চে আরোহণের পথ সুগম করেছে। তদানীন্তন আমেরিকায় অশ্বেতকায় এবং অপরিচিত এক ভারতীয় সন্ন্যাসীকে প্রথম সাক্ষাতেই অতি সমাদরে আহ্বান করে বোস্টন ও শিকাগো শহরের দুই বিশিষ্ট পরিবারে সম্মানিত অতিথিরূপে স্থান দেবার ঘটনা রূপকথার মতোই রোমাঞ্চকর। এঁরা না থাকলে স্বামীজী খাদ্য ও আশ্রয়ের অভাবে কি অবস্থায় পড়তেন, ধর্মমহাসভায় যোগদানের সুযোগই হত কি না, ইত্যাদি বিষয়ে কল্পনার জাল না বুনে, এই দুই মাতৃসমা নারীর আবির্ভাব এক বিরাট পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবেই ঘটেছিল বলে ভেবে নেওয়া সঙ্গত হবে। ভারতবর্ষ চিরকাল সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতায় প্রণাম জানাবে এই আমেরিকান মহিলাদ্বয়কে।

শ্রীমতী হেল ও জর্জ হেলের তিন সন্তান-সন্ততি—জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মেরী বারনার্ড হেল, পুত্র স্যামুয়েল হেল, এবং কনিষ্ঠা কন্যা হ্যারিয়েট হেল। এছাড়া হেল পরিবারে থাকতেন জর্জ হেলের দুই ভাগিনেয়ী ইসাবেল ও হ্যারিয়েট ম্যাক্‌কিণ্ডলী। হেল-পরিবারটি শিকাগো শহরের একটি বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবাররূপে গণ্য হত। গৃহকর্তা জর্জ হেল শিকাগো শহরের একটি বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন। শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের গোড়ার দিনগুলিতে এঁদের গৃহই ছিল স্বামীজীর প্রধান আশ্রয়। ভারত থেকে স্বামীজীর কাছে পাঠানো চিঠিপত্রগুলি, তাঁর বইপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির যত্ন নেওয়া, এবং স্বামীজীকে দরকারমতো আর্থিক সাহায্য—সবই সযত্নে করেছিলেন এই হেল-পরিবার। স্বামীজীর প্রতি তাঁদের কোন দাবি ছিল না। ক্লান্ত সন্ন্যাসীকে তাঁর আমেরিকায় বক্তৃতা সফরকালে তাঁদের নিভৃত আনন্দময় গৃহকোণে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছিলেন, যেখানে স্নেহময়ী ভগ্নীদের মধ্যে ভ্রাতার নিশ্চিত বিশ্রাম মিলত। স্বামীজীও হেল-ভগ্নীদের এত স্নেহ করতেন যে শ্রীমতী হেলের কাছে চিঠিপত্রে এঁদের 'Babies' (খুকীরা) বলে উল্লেখ করতেন। স্বামীজী যখন আমেরিকায় 'বিখ্যাত ব্যক্তি' ও 'আশ্চর্য বক্তা'-রূপে প্রতিষ্ঠা পেলেন, সে সময় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ফেব্রুআরি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে হেলদের লিখলেন, "তোমাদের চারবোনের কাছে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ; এদেশে আমি যা কিছু পেয়েছি তার জন্য তোমাদের কাছে ঋণী।"[১] অনেক পরে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মিস্ ম্যাক্‌লাউড কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করেছেন "যদি না তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে তাঁর শরীর পুষ্টির ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যত্ন নিতেন, আমরা তাঁকে কখনও আমাদের মধ্যে পেতাম না।"[২]

স্বামীজী তাঁর অন্তরঙ্গদের সঙ্গে মানবিক প্রেমের বন্ধন গড়ে তুলতেন। তাঁর গুরুভাইরা তাঁর প্রিয়তম ভ্রাতা, তাঁর শিষ্যরা তাঁর অতি স্নেহের সন্তান। কিন্তু ভারত নয়, পাশ্চাত্য তাঁকে উপহার দিয়েছিল নারীভক্তদের যাঁরা তাঁর অতি নিকট আত্মীয়সমা। মিস্ ম্যাকলাউডের মধ্যে পেয়েছিলেন এক অতি বিচক্ষণ সাহায্যকারিণী বন্ধু, সারাবুল তাঁর মাতৃসমা, নিবেদিতা মানসকন্যা, ক্রিশ্চিন অপরিসীম স্নেহধন্যা। আর হেল-কন্যারা হলেন তাঁর স্নেহের ভগ্নী। পূর্ণ হল সব রকম মানবিক সম্পর্ক। হেল-ভগ্নীদের মধ্যে মেরী স্বামীজীকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ৭।২২০

২ Prabuddha Bharat, Vol. 90 "What ever happened to Mary Hale," p. 62 (year 1985)

করেছিলেন, যদিও ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলীও তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। হেল-ভগ্নীদের কাছে লেখা চিঠিগুলিতে আমরা স্বামীজীর সঙ্গে এঁদের অন্তরঙ্গতার সুর দেখি। এঁরা স্বামীজীর অনুরাগী ভক্ত হয়ে ওঠেন। মেরী বা তাঁর মা শ্রীমতী হেল কিন্তু প্রথমে উপলব্ধি করতে পারেননি বিবেকানন্দকে। তাঁরা তাঁকে জানতেন এক প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন মেধাবী পুরুষ এবং ভগ্নীদের স্নেহপ্রবণ ভ্রাতা হিসাবে, যদিও মেরীর কাছে স্বামীজী নিজেকে উন্মুক্ত করেছেন বহু চিঠি-পত্রে। ১৮৯৯-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে নিবেদিতার সঙ্গে মেরীর সাক্ষাৎ এবং মেলামেশার পরই তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন বিবেকানন্দ-রূপ আধারকে। এরপরেই আমরা দেখি মেরী বিবেকানন্দের কাছে পত্র মারফত আধ্যাত্মিক প্রশ্ন করেন যার উত্তরে স্বামীজী ১৭ জুনের চিঠিতে মেরীকে ভারতবর্ষের পূজাপদ্ধতি, ভারতের সংস্কার, গুরুর স্বরূপ কি ইত্যাদি ব্যাখ্যা করেছেন এবং কালীসাধনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন সেটি তাঁর অত্যন্ত গোপনতম বস্তু।

মেরী হেলের সঙ্গে যখন স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয় তখন তাঁর বয়স আটাশ বছরের কাছাকাছি, অর্থাৎ স্বামীজীর চেয়ে তিনি দু-বছরের ছোট। মেরীকে স্বামীজী দেখলেন স্বতন্ত্র ধাতুতে গড়া বুদ্ধিদৃপ্ত নারী; তাঁকে লিখলেন, "বিবাহ নয়, সন্তান নয়, সেই এক চিন্তা ছাড়া আর কোন অনাবশ্যক আসক্তি নয়; সেই আদর্শের জন্যই জীবনধারণ এবং সেই আদর্শের জন্যই মৃত্যুবরণ। আমি এই শ্রেণীর মানুষ। আমার একমাত্র ভাবাদর্শ হল 'বেদান্ত'···তুমি ও ইসাবেল এই ধাতুতে গড়া।"[৩] স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা ত স্বামীজী হেল-ভগ্নীদের যে বর্ণনা দেন, তাতে দেখতে পাই মেরী ও ভগ্নী হ্যারিয়েট বাদামী চুলে শোভিতা, ম্যাক্‌কিণ্ডলী ভগ্নীদ্বয়ের কেশ কালো। এঁদের মধ্যে মেরী ও ইসাবেলের রূপ Venus-এর সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনীয়; বুদ্ধি, মেধা ও মানসিক স্থৈর্যেও এঁরা অপর দুই ভগিনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। মেরীকে স্বামীজী লিখছেন, "মেরী, তুমি হলে তেজী আরবী ঘোড়ার মতো অপূর্ব দীপ্তিময়ী; রূপে গুণে তুমি রাজেন্দ্রাণী—একমাত্র বীর শক্তিমান নির্ভীক স্বামীর তুমি উপযুক্ত গৃহিণী।" মেরী হেলের নিষ্পাপ কুমারীত্ব, গভীর আত্মস্থতা ও সংযম স্বামীজীকে চমৎকৃত করেছিল। তিনি তাঁকে আদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গে ডাক দিলেন এবং লিখলেন, "দর্শন বা বিজ্ঞান, ধর্ম বা সাহিত্য—যে-কোন একটিকে অবলম্বন কর এবং অবশিষ্ট জীবনে সেইটিই তোমার উপাস্য দেবতা হোক।"[৪] আরও লিখলেন, "পান ভোজন সজ্জা ও যত বাজে সামাজিক চালচলনের ছেলেমানুষির জন্য একটা জীবন দেওয়া চলে না—বিশেষতঃ মেরী, তোমার। অদ্ভুত মস্তিষ্ক ও কর্মকুশলতাকে তুমি মরচে পড়তে দিয়ে নষ্ট ক'রে ফেলছ, যার কোন অজুহাত নেই।"[৫]

মেরীকে লেখা পত্রে স্বামীজী নিজেকে বহু সময়ে উন্মুক্ত করেছেন এবং সেই পত্রগুলিতে গূঢ়তম আধ্যাত্মিক মুহূর্তগুলি ধরা আছে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মার্চের শেষের দিকে স্বামীজী মেরীর কাছে নিজের অধ্যাত্ম-হৃদয় উন্মোচন করে লিখলেন, "আমি মুক্ত। আমি একা—এক-মেবাদ্বিতীয়ম্।"[৬] আমেরিকায় তাঁর আদর্শ রূপায়ণের কাজে স্বামীজীকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল, ফলে তাঁর শরীর ভেঙে গিয়ে-ছিল। সন্ন্যাসীকে অত্যন্ত কষ্ট করে ধ্যানরত

৩ বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ৭।২৮৩

৪ বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ৭।২৮৩ ৫ ঐ, ৭।২৮৪ ৬ ঐ, ৮।২২৪

মনকে বাস্তবে নামিয়ে রাখতে হত। স্বামীজীর জীবন-সায়াহ্ন যে নিকটতম তা স্বামীজী জানতেন। তাই মেরীর কাছেই জানালেন, "ভগিনী, পথ দীর্ঘ, সময় অল্প, সন্ধ্যাও ঘনাইয়া আসিতেছে। আমাকে শীঘ্র ঘরে ফিরিতে হইবে। আদবকায়দার শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার সময় আমার নাই। আমি যে বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছি, তাহাই বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"[৭]

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে স্বামীজী যে সময়ে প্রতাপ মজুমদারের কুৎসা প্রচারে ও মিশনারীদের ক্রুর সমালোচনায় কষ্ট পাচ্ছিলেন, তখন হেল-ভগ্নীদের কাছেই নিজের হৃদয় উন্মুক্ত করে চিঠি লেখেন। সেই পত্রে তিনি তাঁর পরম প্রভু ঈশ্বরের জয়গান করেছেন ও যৌবনোচ্ছল "হোমা পাখীর বাচ্চা"দের (Birds of Paradise)[৮] আহ্বান জানিয়েছেন জগতের সকল পঙ্কিলতা থেকে উর্ধ্বে বিচরণ করতে। শুধু আধ্যাত্মিক চিঠি নয়, হেল-ভগিনীদের প্রতি চিঠিগুলিতে অনেক সময় ভ্রাতার হাসিঠাট্টা-মিশ্রিত অন্তরঙ্গতার সুরও থাকত। সর্বত্যাগী ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসীর জাগতিক বন্ধনের সুরটিও যেন ধরা পড়েছে মেরী বোনেদের সাহচর্যে। স্বামীজীর কালো প্রিন্স কোট, ঘন কালো ট্রাউজার ও হলদে ভাঁজ করা পাগড়িটি মেরীর ছিল বড় প্রিয় পোশাক। মেরীকে কবিতাকারে লেখা স্বামীজীর পত্রগুচ্ছ বিবেকানন্দ-মানসের এক নূতন আলোকপাত। ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসীর পরিহাসপ্রিয় চিত্রটিও অপরূপ। মেরী স্বামীজীকে আমেরিকার যাজক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে মতভেদ থেকে বিরত থাকতে পত্র মারফত চেষ্টা করেছিলেন। সেই সময় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১ ফেব্রুআরি স্বামীজী মেরীকে নিজ আচরণ সমর্থনে কড়া চিঠি লেখেন। তার-পরই আবার ১৫ ফেব্রুআরি নিউইয়র্ক থেকে এই পত্র-কবিতাটি পাঠান—

"শোন আমার বোনটি মেরী,
হয়ো না দুখী—যদিও ভারী
ঘা খেয়েছ, তবুও জানো
জানো বলেই বলিয়ে নাও—
আমি তোমায় ভালোবাসি
সারাটা এই হৃদয় দিয়ে।"[৯]

উত্তরে মেরী লিখলেন—

"সত্যই তারা অঙ্গার যেন
আমার উপরে হায়
বর্ষিত হ'ল, অনুতাপে মরি,
বোনটি যে ক্ষমা চায়।"[১০]

দ্বিতীয়বার আমেরিকা ভ্রমণের সময় স্বামীজী হেল-পরিবারে কিছুদিন বাস করেন। এঁদের গৃহ ছিল তাঁর আবাস গৃহের মতো। উল্লেখ করেছিলেন হেলদের গৃহ বিদেশের মরুভূমিতে মরূদ্যানসম। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ নভেম্বর সকালে স্বামীজী যখন নিউইয়র্ক থেকে শিকাগো পৌঁছালেন, মেরী স্টেশনে এসে স্বামীজীকে তাঁদের ১৫২, ওয়ালটন প্লেসের গৃহে নিয়ে যান। ইতিমধ্যে তাঁরা তাঁদের ডিয়ারবর্ণ এভিন্যু-এর বাড়ি বদল করেছেন। ঐদিনই বিকালে মেরী স্বামীজীর সম্মানে এক সম্মেলনের আয়োজন করলেন। সেখানে আমেরিকার বিদগ্ধ ও অভিজাত বহু নারী-পুরুষ সমবেত হলেন। মাদাম কালভে, ইউরোপের বিখ্যাত অপেরা গায়িকা এলেন স্বামীজীর সাক্ষাৎপ্রার্থিনী হ'য়ে। এই সময় মেরীর তত্ত্বাবধানে স্বামীজী কয়েকদিন বিশ্রাম লাভের সুযোগ পান। এমন কি নিবেদিতাকেও স্বামীজীর সঙ্গে কোন আলোচনার জন্য

৭ বাণী ও রচনা, ৭।৮৪
৮ ঐ, ৬।৪৪৫
৯ ঐ, ১০।২২৭
১০ ঐ, ১০।২৩১

বা স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কারুকে নিয়ে আসার ব্যাপারে মেরী-পিসীর সম্মতি নিতে হত। এই বাড়িতে এডিসনের ফোনোগ্রাফ মেশিনে স্বামীজীর কিছু বক্তৃতা রেকর্ড করা হয়।

হেল-পরিবারের সঙ্গে স্বামীজীর এই শেষ সাক্ষাৎ। বিদায়ের পূর্বরাত্রে তিনি অস্থির হৃদয়ে অতিবাহিত করেন, এমন কি শয্যা পর্যন্ত গ্রহণ করেননি। মেরী জিজ্ঞাসা করলে বলেছিলেন যে, মানুষের মায়ার বন্ধন কাটানো সন্ন্যাসীর পক্ষেও শক্ত। শেষ সাক্ষাতের পরও হেল-ভগিনীদের সঙ্গে স্বামীজীর চিঠির আদান-প্রদান ছিল। স্যানফ্রান্সিস্কো থেকে মেরীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লেখেন, "তুমি, অন্য ভগিনীরা এবং মা —সকলের উপর সর্ববিধ আশীর্বাদ। আমার ঘাত-প্রতিঘাতময় বেসুরো জীবনে মেরী, তুমি সব সময় মধুরতম সুরের মতো বেজেছ।"[১১]

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কী গভীর স্নেহ তাঁর পার্থিব জগতের ভগ্নীর জন্য! মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বেও ২৭ অগস্ট ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মেরীকে লিখেছেন, "প্রিয় মেরী, বিদায়; আশা করি এ জীবনে আমরা আবার কোথাও মিলিত হবো; তবে দেখা হোক বা নাই হোক, আমি সতত তোমার স্নেহশীল ভ্রাতা বিবেকানন্দ।"[১২]

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের হেমন্তকাল থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়া পর্যন্ত নিবেদিতা শিকাগো ও তার আশেপাশের শহরে বক্তৃতা-সফরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের নারী শিক্ষার জন্য অর্থসংগ্রহ। এই সময় মেরীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। দুজনের মধ্যে হার্দ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নিবেদিতা তাঁকে "My sweet aunt Mary" (আমার প্রিয় মেরী পিসী) বলে সম্বোধন করতেন। মেরীর কাছ থেকে তিনি পেলেন অকুণ্ঠ স্নেহ ও সাহায্য। মেরীই শিকাগোর Friday Club-এ নিবেদিতাকে ভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। নিবেদিতার সারাবুল ও মিস্ ম্যাকলাউডকে লেখা এই সময়কার চিঠিপত্রে আমরা মেরী হেলের চরিত্রের কোন কোন দিক দেখতে পাই।

নিবেদিতাই মেরীকে স্বামীজীর মৃত্যুসংবাদ জানান। নিবেদিতা শঙ্কিত হয়েছিলেন কারণ, তিনি জানতেন মেরীর স্বামীজীর প্রতি কী গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা; সেজন্য কত বড় আঘাতই না তাঁকে নিঃশব্দে গ্রহণ করতে হবে। স্বামীজীর মৃত্যুর পর নিবেদিতা যখন স্বামীজীর পত্রাবলী প্রকাশনার কাজে হাত দেন, তখন মেরী নিবেদিতার অনুরোধে হেল-ভগ্নীদের ও মাদার চার্চের কাছে লেখা স্বামীজীর চিঠিগুলি এবং Mrs wilson-কে লেখা চিঠিও সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেন।

স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের চার মাস পরে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ নভেম্বর এক অভিজাত ইটালিয়ান মিঃ সিগনোর গিনসেপ্পে মাল্‌টিনীকে (Mr. Signor Ginseppe Malteini) মেরী বিবাহ করেন। বিবাহকালে পাত্রের বয়স বাহাত্তর, কন্যার সাঁইত্রিশ। ৫ জুলাই ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজীর মেরীকে লেখা এক চিঠিতে দেখি, মেরী ইটালীর ফ্লোরেন্স ও ভেনিস শহরে অতীতের পুরাকীর্তি দেখে বেড়াচ্ছেন এবং এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়েছে। এই বৃদ্ধই বোধহয় মেরীর ভাবী স্বামী। বিবাহের পর মেরী ফ্লোরেন্সের কাছে স্বামীর প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বাস করতে থাকেন। কিন্তু ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীর মৃত্যুর পর মা শ্রীমতী হেলের সঙ্গে ফ্লোরেন্সের এ্যাংলো আমেরিকান হোটেলে এসে জীবনের বাকী দিনগুলি কাটান। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুআরি ফ্লোরেন্সেই তিনি দেহ

১১ বাণী ও রচনা, ৮।১০৪

১২ ঐ, ৮।১৯১

রাখেন। ট্রেসপিয়ানো সেমিট্যারিতে তাঁর দেহ দাহ করা হয়। পরে কোন এক মিঃ ফারনেত্তো মেট্টি তাঁর দেহাস্থি কেশোনাতে নিয়ে যান এবং পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করেন।

হেল-পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে অবিবাহিতা ভগ্নীদ্বয়ের চারিত্রিক প্রবণতা স্বামীজী ভালভাবেই লক্ষ্য করেছিলেন। সাংসারিক জীবনের গুণাবলীর অধিকারিণী হ্যারিয়েট হেলকে তিনি উৎসাহ দিতেন বিবাহিত জীবনে বিকশিত হবার জন্য। কিন্তু এক উচ্চ সংবেদনশীল মনের সন্ধান স্বামীজী পেয়েছিলেন মেরী হেলের মধ্যে। নিরাসক্তি ও আধ্যাত্মিকতার সাধনায় মেরী প্রস্ফুটিত হয়ে উঠুন, মেরীর প্রতি এই পথনির্দেশ স্বামীজীর পত্রাবলীর মধ্যে কয়েকবারই লক্ষ্য করা যায়। বিবাহ নয়, বন্ধন নয়, পরিপূর্ণ আত্ম-নিবেদন শুধু মহত্তম আদর্শের অনুসরণে ;—এ-কথা মেরীর সামনে কয়েকবার তিনি তুলে ধরেছেন। ব্যথিত হয়ে জানিয়েছেন যে মেরী এখনও যেন "school girl" (স্কুলের ছাত্রী); [১০] তাঁর মধ্যে রয়েছে লক্ষ্য-অভিমুখী একনিষ্ঠতার অনুসরণে চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব। স্বামী বিবেকানন্দের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উচ্চতম আদর্শ ও কর্মে আত্মনিয়োজিতা ভগ্নী নিবেদিতা, ক্রিশ্চিন, ম্যাক-লাউড এবং এ্যালেন ওয়ালডো (ভগিনী হরিদাসী) মহিমময়ী ও চিরস্মরণীয়া হয়ে আছেন। মেরী হেল সেখানে অনুপস্থিত। স্বামীজীর দেহান্তের পর মেরী বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করেন।

আপাতদৃষ্টিতে মেরীর জীবনের শেষার্ধ সক্রিয় বিবেকানন্দ-বৃত্তের বাইরে অতিবাহিত হয়েছে বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? নিবেদিতার কথায় মেরী ছিলেন মনোজগতে বিচরণশীল। সত্যদ্রষ্টা ঋষির চোখে উদ্ভাসিত হয়েছিল মহত্তম আদর্শের প্রবণতা,... যেদিকে তিনি মেরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ১ ফেব্রুআরি ১৮৯৫ তারিখে লেখা চিঠিতে মেরী হেলের প্রতি তাঁর স্বস্তিবাচন উচ্চারিত হয়েছে,—শঙ্কর-উমার কৃপায় ভুবনমোহিনীমায়া অপসারিত হয়ে যেন মেরীর সম্মুখে সত্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়। কোথাও কোনোভাবে মানবচক্ষুর সীমিত দৃষ্টির অন্তরালে মেরী হেলের জীবনের পূর্ণ পরিণতি-লাভের আভাস এ-আশীর্বাণীতে আছে বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

১০ Prabuddha Bharat, Vol. 91 (July 1986), p. 307

বিরাট বামন

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর

অণু হ'তে ভূমা-ব্রহ্ম তোমারি প্রকাশ।
সসীম বারিধি কিংবা অসীম আকাশ,
স্থূল-সূক্ষ্ম, হ্রস্ব-দীর্ঘ, বক্র-ঋজু আর,—
এই বিশ্বে যাহা হেরি সগুণ সাকার,—
সবার মাঝারে তুমি। আগম, নিগম—
সর্বশাস্ত্র বলে, তুমি স্থাবর, জঙ্গম,
সর্বব্যাপী, সনাতন, সর্বগুণান্বিত,
বিরাজিছ বিভুরূপে বাক্যমনাতীত।
জড়বুদ্ধি, ক্ষীণতনু ক্ষুদ্রমন ধরি'
বিরাট স্বরূপ তব বুঝিতে না পারি।
'আমার মাঝারে তুমি, তোমাতেই আমি'—
বুঝিবারে চাই নিত্য জগন্নাথ-স্বামি!
জানাতে স্বরূপ তব বিরাট বামন!
রথে চড়ি' চিত্তে মোর কর আগমন।

বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে

ডক্টর বন্দিতা ভট্টাচার্য

"যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা,—আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে।"

মর্ত্যলীলাবসানের মাত্র কয়েকদিন আগে বিশ্ব-ধর্মেতিহাসে অঘোষিতপূর্ব নিখিলজীব-অভয়-প্রদ এই মহাবাক্য যাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃত হয়ে অনন্তকাল ধরে কোটি কোটি দুঃখতাপক্লিষ্ট মানুষের তমসাচ্ছন্ন মানসলোকে অনির্বাণ আশা, ভরসা ও সান্ত্বনার প্রজ্বলিত দীপশিখাটিকে অম্লান করে রাখবে, তাঁর একটিই পরিচয়, তিনি আমাদের "সত্যিকারের মা"—শ্রীশ্রীসারদাদেবী।

উপরি-চিহ্নিত মাত্র দুটি শব্দের মধ্যে যে সুদূর-প্রসারী ব্যঞ্জনা নিহিত তা উদ্‌ঘাটন করলে কি পাই আমরা? জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষ—যারা আজও পৃথিবীর আলো দেখেনি এবং যারা অনাগত ভবিষ্যতে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবে, তারা কারা?—তারা সকলেই "মা"-এরই সন্তান!

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ তাঁর অনুপম "মাতৃস্তোত্র"-এর দুটি জায়গায় তদ্গত হয়ে বন্দনা করছেন—"শরণাগত-সেবক-তোষকরীং" এবং "কৃপাং কুরু মহাদেবি সুতেষু প্রণতেষু চ" ইত্যাদি। কিন্তু, উপরি-উক্ত দুটি শব্দ কি এই মুহূর্তে আমাদের বুঝিয়ে দেয় না যে শরণাগতি কিংবা সেবা অথবা প্রণতি—এর কোন কিছুই সেই অপার্থিব মাতৃস্নেহ প্রাপ্তির শর্ত নয়? এ যে অহেতুক! জলভারাবনত মেঘ অজস্র ধারাবর্ষণে নিজেকে নিঃশেষিত করে। কিন্তু এর "শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?" "মায়ের" করুণা জেকে পাওয়ার, চেয়ে পাওয়ার, কষ্ট করে পাওয়ার বস্তু নয়। এ যে আমাদের সাধনহীন সিদ্ধি, অনায়াসলভ্য সম্পদ, অচেষ্টিত চরিতার্থতা। জন্মানোর আগের থেকেই আমাদের ভাণ্ডার তিনি পূর্ণ করে রেখে দিয়েছেন, প্রয়োজন শুধু—অকৃপণ বিশ্বাস আর অমলিন ভক্তিরূপ দুই অতন্দ্র-প্রহরীকে সামনে রেখে সেই পরমৈশ্বর্যের সদ্ব্যবহার!

সৃষ্টির সহজতম সত্য এইটি যে, মানুষ ও অন্য কয়েকটি প্রাণী জন্মলাভের অব্যবহিত পরেই প্রথম যে ধ্বনিটি অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে, সেটি—"মা"। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এটি স্পষ্টতর হয় মাত্র। এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কিছু আছে কি না জানি না। কিন্তু যেকোন জীবের নিশ্চিন্ততম, নিরাপদতম আশ্রয় যে একমাত্র তার মা—এই সাধারণ সত্যটি সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই চলে আসছে এবং আসবেও—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। যেখানে একটিমাত্র সন্তানের জননীও দ্বন্দ্বসমস্যাসংকুল জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর সন্তানের প্রতি স্নেহ-ভালবাসায় অবিচল থাকতে পারেন না, সেখানে লৌকিক অর্থে নিঃসন্তানা "মা" কোন্ শক্তির বলে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বিশ্বের সমস্ত মানুষকে "আমার সকল সন্তান" বলে সম্বোধন করে অযাচিত স্নেহ-ভালবাসা উজাড় করে দিয়ে গেলেন,—তার অন্তর্গূঢ় রূপটি সামান্যমাত্র উন্মোচন করতে পারলেও কিছুটা আভাস পাব—সনাতন ভারতীয় ধর্ম ও জীবন-দর্শনের মূলীভূত সত্যটিকে।

বিশ্বে ভারতই একমাত্র দেশ, যেখানে সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ তার

ভাবনা-চিন্তাকে জড় জগতের ঊর্ধ্বে স্থাপিত করে "ঈশ্বর" বা "ব্রহ্ম"কে শুধু চরম লক্ষ্য স্থির করেই ক্ষান্ত হয়নি, পরন্তু তাঁকে আপন করে পাবার বহু বিচিত্র পথের সুস্পষ্ট নির্দেশ উত্তর-সূরীদের জন্য রেখে গিয়েছে। পরবর্তিকালের সাধনার বিভিন্ন ধারা সুসংহত হয়ে জ্ঞান ও ভক্তি যে মূল দুটি ভাব পরিগ্রহ করেছে—পরিণামে এক হলেও সম্প্রদায়গত ও আচারগত বৈষম্যে যখন এই দ্বিধারা পরস্পর বিমুখ হয়ে সাধক-মনে তথা জনমানসে বিভ্রান্তি ও বিরোধের সৃষ্টি করেছিল, তখনই প্রয়োজন হয়ে পড়ল এ দুয়ের মধ্যে একটি স্বর্ণসেতু রচনা করবার। সেই স্বর্ণসেতু রচনা করতে আবির্ভূত হলেন অবতার-বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি মাতৃসাধনার সুপ্রাচীন ধারাটিকে অদ্বৈতসিদ্ধির প্রধান সোপান হিসেবে ব্যবহার করে হাতে-কলমে প্রমাণ করে গেলেন—"ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, একটিকে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়।"

এতে আমাদের লাভ হল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, ঈশ্বর সাধনার সহজতম পথটি সর্বসাধারণের জন্য চিরকালের মতো উন্মুক্ত হল এই কারণে যে, যাঁকে সবচেয়ে কাছের মানুষ, আপন জন বলে জন্ম থেকে অনুভব করছি—সেই মাকেই ঈশ্বরের যে-কোন রূপে অবাধে আরোপিত করতে পারছি, এবং কোন শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান ছাড়াই। দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞানের পথ অর্থাৎ অদ্বৈত-সাধনা কঠিনতম হলেও মূলতঃ মাতৃভাবের সাধনার চরম পরিপুষ্টি বা উৎকর্ষ। ফলতঃ প্রথমোক্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারলেই দ্বিতীয়টিও অনিবার্যভাবেই সাধকের করতলগত হয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে রইল শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্ত সাধনা ও অভূতপূর্ব সিদ্ধি, যেখানে জ্ঞান এবং ভক্তি এক অপরূপ আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ে গেছে চিরতরে।

এখন প্রশ্ন হল—স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ যেকালে তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের কাছে ব্যক্ত করলেন—যে সচ্চিদানন্দ যুগে যুগে নরবপু ধারণ করে লীলা-ভিলাষে মর্ত্যে অবতরণ করেন, তিনি এবারে তাঁর (ঠাকুরের) দেহে বিরাজ করছেন "পূর্ণ সত্ত্বগুণ" বিশিষ্ট হয়ে, তাহলে শ্রীশ্রীমায়ের পৃথক্ সত্তার এমন কি প্রয়োজন ছিল? দুটিভাবে এর উত্তর এক্ষেত্রে বোধ হয় দেওয়া যেতে পারে। এক, মাতৃভাবের পূর্ণ প্রকাশ ও বিকাশ নারীতেই সহজাত বলে নারীমূর্তিতেই জাগ্রত মাতৃমূর্তির অনুধ্যান সহজসাধ্য এবং দুই, শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার অন্তর্নিহিত মাধুর্যরস জগতের আপামর মানুষকে আস্বাদন করিয়ে তাদের তৃপ্ত ও কৃতার্থ করা। কিন্তু জয়রামবাটী নামক গণ্ডগ্রামের প্রায়-নিরক্ষরা, জাগতিক অর্থে সন্তানহীনা, সদাবগুণ্ঠিতা "মা" কি কৌশলে বিশ্বের সকল দেশের, সকল জাতের, সকল ভাষার নরনারীর "মা" হয়ে উঠলেন? কেন স্বয়ং বিবেকানন্দ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। কিন্তু মা-ঠাকুরাণী গেলেই সর্বনাশ।" সিস্টার নিবেদিতা, মিসেস ওলিবুল, মিস্ ম্যাকলাউডের মতো পাশ্চাত্য সমাজের অভিজাত ও বিদুষী মহিলারা কি দেখেছিলেন, কি পেয়েছিলেন তাঁর মধ্যে যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর পায়ের তলায় বসে ধ্যান সমাহিতের মতো তাঁদের অবোধ্য বাংলাভাষায় মায়ের শ্রীমুখের বাণী শুনতে শুনতে নিজেদের ধন্য, কৃতকৃতার্থ মনে করতেন?

এর সমাধান খুঁজে বার করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হত, যদি না শ্রীশ্রীমা নিজে সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে স্ব-স্বরূপ উদ্ঘাটন করতেন। কারণ যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে প্রত্যক্ষ মহাশক্তিরূপে নিভৃতে পূজা করে সমস্ত সাধনার ফল তাঁরই পায়ে সমর্পণ করেছিলেন, তবুও এই অভূতপূর্ব ঘটনার সত্যতায় সাধারণ মানুষ আমরা সন্দিগ্ধ হয়েই

থাকতাম। সংঘজননী এবং গুরুপদে বৃতা শ্রীশ্রীমা তাঁর এক সন্তানকে বললেন, "ঠাকুর ও আমাকে অভেদভাবে দেখবে।" উদ্বোধনের পূজক-ব্রহ্মচারী (পরবর্তিকালে স্বামী দয়ানন্দ)-কে স্পষ্ট দেখালেন যে, ঠাকুর, তিনি এবং মা কালী তিনে এক, একে তিন। পাগলী সুরবালার অত্যাচারে জর্জরিতা মা বলে উঠলেন, "এর ভিতরে যিনি আছেন [তিনি] যদি একবার ফোঁস করেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কারও সাধ্য নেই যে তোদের রক্ষা করে।" ৺রামেশ্বরে সীতা-পূজিতা শিব-লিঙ্গ দর্শন করে অস্ফুটে বলে উঠলেন, "যেমনটি রেখে গিয়েছিলুম, ঠিক তেমনটিই আছে।"

কালী, সীতা ও রাধার মধ্যে নিত্য অবস্থিতা —সেই আদ্যাশক্তি মহামায়া যখন "সচ্চিদানন্দের" লীলাসঙ্গিনী হয়ে মাতৃমূর্তিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হন, তখন তাঁর অপার করুণাস্রোত আচণ্ডালে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র মর্ত্যভূমি পরিপ্লাবিত করে। বিনা আহ্বানে লক্ষ কোটি যোজন অতিক্রম করে মানুষ ছুটে এসে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে, অনায়াসে সমর্পণ করে নিজেকে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অবতার বরিষ্ঠত্বের মাতৃসিদ্ধির সাক্ষাৎ প্রমাণ-স্বরূপ রেখে গেলেন শ্রীশ্রীমাকে।

তবুও প্রশ্ন উঠবে—নারীমাত্রেই যদি আদ্যা-শক্তির অংশ হয়, এবং শাস্ত্রমতে গর্ভধারিণীই যেখানে সন্তানের শ্রেষ্ঠ পূজ্যা, সেক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমা-এর মাতৃভাবের কি সেই পরম তাৎপর্য যা সমগ্র বিশ্বকে নবতর চেতনায় উদ্বোধিত, উদ্ভাসিত করেছে, শাশ্বতকাল ধরে আলোড়িত করবে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়-মন ?

স্বল্প পরিসরে এর উত্তর দিতে হলে বলতে হয়—মায়িক সম্পর্কে আবৃত জগতের সমস্ত নারী তথা সমস্ত জননীর সর্ববিধ অপূর্ণতার ঊর্ধ্বে "জগতের মা" হবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে শ্রীশ্রী-মায়ের আবির্ভাব। এই রাজ্যে নেই কোন লৌকিক সম্পর্ক, সাংসারিক বন্ধন। আর আত্ম-পরের ভেদও এখানে খণ্ডিত করেনি সীমাহীন স্নেহ-ভালবাসার প্রস্রবণ। বাৎসল্য-প্রেম আর "সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন" এখানে মিলে মিশে একাকার। এইটিই হল মাতৃভাব আর অদ্বৈত-ভাবের অভিনবতম সমীকরণ। তিনি ছাড়া আর কোন্ নারী কবে বলতে পেরেছেন— "আমি তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের মা।"

যাঁর সম্বন্ধে এত কথা এ পর্যন্ত বলা হল তাঁর বাহ্যিক জীবন ছিল কি রহস্যেই না আবৃত! তিনি বাল্যকাল থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত বাবা মা-ভাইদের সংসারে "বাঁধা ঝি"—এর মতো উদয়াস্ত কাজ করেছেন, উদ্বোধনে বিরাট সংসার প্রতিপালন করেছেন, সন্ন্যাসী-সন্তান থেকে শুরু করে ডাকাত আমজাদের উচ্ছিষ্ট পর্যন্ত স্বহস্তে পরিষ্কার করেছেন। আবার অহেতুকী কৃপায় মন্ত্র-দীক্ষা দিয়ে হেলায় পার করেছেন শত শত সন্তানকে! আসলে, এতেই একদিকে চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেল যে, তিনি স্বয়ং মহামায়া, কারণ অন্য কোন নারীর পক্ষেই যে এ সম্ভবপর নয়, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। অন্যদিকে নারীমাত্রেরই শ্রেষ্ঠত্ব যে মাতৃত্বে, তার পূর্ণ উদ্বোধন ঘটাতে পারলে যে তা সর্বজীবে প্রসারিত হয়ে পরিণামে বহু-কল্প-দুর্লভ ঈশ্বর-সাক্ষাৎকাররূপ পরম মূল্যে সংসারী জীবকে চিরকৃতার্থ করে, তাও প্রমাণিত হল।

"মা" বলছেন, "সর্বদা মনে রাখবে, তোমাদের একজন মা আছেন।" আর তাহলে ভয় কি? সংসারের সমস্ত কাঁটাই তো তাঁর শ্রীচরণ-স্পর্শে ধন্য হয়ে ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে। আমরা মাঝে মাঝে এই বিশ্বাসটুকু হারিয়ে ফেলে অযথা ভুগে মরি, কুটিল আবর্তে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে ঘুরপাক খাই। জগজ্জননীর এই পরম আশ্বাসবাণীটুকু যেন সদা সম্বল করে হাসতে হাসতেই তাঁর কাছে চলে যেতে পারি— "আমার ছেলে যদি ধুলো কাদা মাখে আমাকেই তো তা ধুয়েমুছে তাকে কোলে তুলে নিতে হবে।"

উপনিষদের গল্প

উপনিষদে যে সকল উপাখ্যান আছে, তাহা আধুনিক ভাষায় প্রকাশ করিলে তাহা দ্বারা অনেকের উপকারের সম্ভাবনা। উহাতে যেমন নানা উপদেশ নিহিত, তদ্রূপ উহা দ্বারা অনেক প্রাচীন আচার ব্যবহার জানিতে পারা যায়। আরও ঐ সকল গল্প পাঠ করিলে মূল উপনিষদ্ পাঠেও অনেকের কৌতূহল হইতে পারে, এই সকল বিবেচনা করিয়া আমরা উপনিষদের প্রধান প্রধান গল্পগুলি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম।

দেবগণের ব্রহ্মদর্শন।

কেনোপনিষদে এই উপাখ্যান আছে। ব্রহ্ম দেবতাদের হইয়া যুদ্ধে জয় লাভ করিলেন। আমরা যে কোন উচ্চকার্য্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকি, তাহা যেমন বাস্তবিক ব্রহ্মশক্তিবলে হইলেও তাহা নিজেতে আরোপিত করিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া থাকি, দেবগণেরও ঠিক সেই দশা হইল। দেবগণও ব্রহ্মকে ভুলিলেন, ভুলিয়া আপনারাই অভিমান করিতে লাগিলেন, আমাদেরই কৃত এ বিজয়, আমাদেরই এ মহিমা। বাস্তবিক কি সকল জাতির জীবনেও এই ব্যাপার ঘটে না? মহাশক্তির কৃপায় তাঁরই শক্তিবলে এক জাতি জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করে। কিন্তু যখন সে বিজয়লক্ষ্মী ও ধন-ধান্য সম্পদ্ প্রাপ্ত হয়, তখন সে সেই বিজয়লক্ষ্মী কোথা হইতে আসিল, তাহা ভুলিয়া আপনিই আপনার গৌরবে স্ফীত হইয়া অপরকে আপনার গৌরব, আপনার মাহাত্ম্য দেখাইতে যায়। তখনই সেই জাতির পতনের সূচনা হয়।

দেবগণের প্রতি তাঁহার বিশেষ কৃপা। তাই তিনি তাহাদের এই অভিমান জানিতে পারিয়া তাহাদের নিকট নিজ যোগমাহাত্ম্যনির্ম্মিত অভ্যদ্ভুত বিস্ময়জনক রূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন। দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ও পূজ্য বলিয়া স্থির করিলেন, কিন্তু তিনি কে, তাহা সবিশেষ জানিতে পারিলেন না।

তখন তাঁহারা অগ্নিদেবকে বলিলেন, জাতবেদঃ, এই পূজনীয় স্বরূপ কে, আপনি জানিয়া আসুন। অগ্নি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' অগ্নি উত্তর দিলেন, 'আমি অগ্নি, আমি জাতবেদা।' 'আচ্ছা তোমার কি শক্তি আছে?' 'আমি সব দগ্ধ করিতে পারি—এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সবই মুহূর্ত্তে ভস্মসাৎ করিতে পারি।' 'এই তৃণগাছটী দগ্ধ কর দেখি।' হায়, হায়, অগ্নি, কাহার সম্মুখে অভিমান করিতেছ? অভিমানভরে বুঝিতেছ না, যাঁহার এককণা শক্তি পাইয়া তোমার এই অগ্নিত্ব, তাঁহার ইচ্ছায় কোটি কোটি অগ্নির সৃজন হইতে পারে। অগ্নির যত শক্তি, সব সেই তৃণদাহে নিয়োজিত হইয়া বিফল হইল, তখন তিনি মানে মানে স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেবগণকে নিবেদন করিলেন, 'জানিতে পারিলাম না, পূজনীয় স্বরূপ ইনি কে'।

তখন তাঁহারা বায়ুকে প্রেরণ করিলেন। বায়ুকেও সেই প্রশ্ন গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসিত হইল। বায়ুও অগ্নির ন্যায় নিজের বড়াই করিয়া বলিলেন, 'আমি বায়ু, আমি মাতরিশ্বা।' 'আচ্ছা তোমার কি শক্তি আছে?' 'আমি ইচ্ছা করিলে জগতের সব জিনিষ একেবারে উড়াইয়া দিতে পারি।' তাঁহাকেও সেই তৃণ প্রদত্ত হইল। তিনি অনেক চেষ্টায়ও তাহাকে তাহার স্থান হইতে এক বিন্দুও বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন হেঁটমস্তকে দেবগণের নিকট ফিরিয়া আসিয়া তিনিও আপনার অক্ষমতা জানাইলেন।

এইবার দেবদেব ইন্দ্র প্রেরিত হইলেন। কিন্তু

একি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। কোথায় সেই জ্যোতির্ম্ময়? এ যে বহুশোভমানা হৈমবতী উমাদেবী আকাশে আবির্ভূতা। ইন্দ্র ভক্তিভরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, 'মা, যিনি এইমাত্র ছিলেন, বিদ্যুতের মত প্রকাশ হইয়া ক্ষণপরেই লুকাইলেন, তিনি কে'? তখন জগজ্জননী গম্ভীরস্বরে কহিলেন, 'স্বয়ং ব্রহ্ম তোমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তোমরা ইঁহারই শক্তিতে যুদ্ধে জয় করিয়াছ। এক্ষণে তোমরা উঁহাকেই তোমাদের সর্ব্ববিজয়ের মূলীভূত কারণ জানিয়া অভিমানশূন্য হও।'

হায়, হায়, কবে ব্রহ্ম আমাদের ঘাড় ধরিয়া এইরূপে অভিমানশূন্য হইতে শিখাইবেন? কবে আমাদের এই এক ছটাকের আমি অনন্ত ব্রহ্ম-সমুদ্রে ডুবাইয়া দিয়া আত্মহারা হইয়া থাকিব? যখন ভাবি, তখন ত হাসি পায়। হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা। তুই কে যে, তা করবি? যে করবার, সে ত কচ্ছে। তুই কেবল আপনাকে চিনে নে। হে অনন্ত আকাশের অনন্ত বাণী, নিত্য গম্ভীরস্বরে তুমি বল, 'আমি আছি' 'আমি আছি।' ভুলে যাই দেহ, ভুলে যাই মন—ভুলে যাই সংসার, ভুলে যাই কর্ম্ম—প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে তোমার নাম গেয়ে বেড়াই। নাহং নাহং তুহুঁ তুহুঁ। মুক্তি হবে কবে, আমি যাবে যবে। এক ভস্ম আর ছার, দোষ-গুণ কব কার, আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।*

* 'উদ্বোধন'-এর ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ॥

—আমিই একা এই জগতে বিরাজিতা। আমি ছাড়া আমার সহায়ভূত অন্যা দ্বিতীয়া আর কে আছে? ব্রহ্মাণীপ্রমুখ এই সকল দেবী আমারই অভিন্না শক্তি। ইঁহারা আমাতেই বিলীনা হইতেছে।

(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১০।৫)

পুস্তক সমালোচনা

The Gospel of Sri Krishna :—Text in Sanskrit with English Rendering by: Swami Gabhirananda, Published by: Sri Ramakrishna Math, Puranattukara 680551, Trichur, Kerala, page xx+232, Price: Rs. 18·00

গীতা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে একটি অতি উচ্চস্থান অধিকার করে। বলতে গেলে হিন্দুধর্ম এবং দর্শনের যা সারকথা তা এই একটি গ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। বেদ অথবা উপনিষদ্ সকলের পড়ার সৌভাগ্য বা সুযোগ হয় না, এবং তা হৃদয়ঙ্গম করাও সকলের পক্ষে সহজসাধ্য নয়, কিন্তু গীতা প্রায় সকল হিন্দুই পড়েন এবং অনেকেই নিয়মিত পাঠও করে থাকেন। সংস্কৃততে লেখা হলেও এর ভাল ভাল অনুবাদ প্রায় সব ভাষাতেই হয়েছে এবং অতি সুন্দর ও সহজ ব্যাখ্যাসম্বলিত অগণিত সংকলনও প্রায় সব দেশীয় ভাষাতেই পাওয়া যায়।

বিদেশীরাও গীতা সম্বন্ধে খুবই আগ্রহশীল। দুই শত বৎসর আগেই ইংরেজী এবং পরে অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। আমাদের দেশেও গীতার বহু ইংরেজী অনুবাদ হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন থেকে প্রকাশিত অন্ততঃ চারটি ইংরেজী অনুবাদ আমি দেখেছি। তার মধ্যে একটি পূর্বতন মঠাধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী-কৃত (১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) এবং বর্তমান মঠাধ্যক্ষ স্বামী গম্ভীরানন্দজী-কৃত (১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) অনুবাদও আছে। সুতরাং স্বামী গভীরানন্দজী কর্তৃক আর একটি অনুবাদের সার্থকতা কোথায়, সে প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে। উত্তরে বলা যায় যে, গীতা এমনই একটি গ্রন্থ এবং তার মহিমা এতই বিরাট যে এর সম্বন্ধে লিখতে একটা আকর্ষণ অনুভব করা খুবই স্বাভাবিক এবং এর অনুবাদ বা আলোচনা যত বেশি হয় ততই ভাল—তা সে যে-ভাষাতেই হোক না কেন।

স্বামী গভীরানন্দজীর অনুবাদ বেশ সহজ-পাঠ্য এবং সহজবোধ্য। তবে দুই এক জায়গায় তিনি প্রচলিত অর্থের পরিবর্তে অন্য অর্থ করেছেন। যেমন দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫২ নং শ্লোকে তিনি "নির্বেদ"কে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম এবং নির্দেশ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য বলে অনুবাদ করেছেন। "নির্বেদ" কথার অর্থ "বৈরাগ্য"ও হয় এবং সাধারণতঃ ওই অর্থেই কথাটা এখানে ব্যবহৃত বলে ধরা হয়। অন্য এক জায়গায় (২।৩১) তিনি "ক্ষত্রিয়"কে রাজা বা রাজন্য বলে অনুবাদ করেছেন। যদিও "ক্ষত্রিয়" আমাদের দেশে যোদ্ধা বা যোদ্ধৃজাতি অর্থেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত—রাজাও এই জাতির অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য ব্যক্তিভেদে অনুবাদের কিছু কিছু পার্থক্য হবে, সেটা স্বাভাবিক। তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, অনুবাদক মূলের স্বাদ, গন্ধ ও গভীরতা বজায় রেখে গীতার মূল বক্তব্য পাঠকের মনে সঞ্চারিত করতে কৃতকার্য হয়েছেন।

বইখানির ছাপা ও কাগজ ভাল এবং প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়। বইখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

—ডক্টর সচ্চিদানন্দ কর

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত অভিধান—সম্পাদক ডঃ নীরদবরণ হাজরা। মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য ৩০ টাকা।

একদা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে বাণীগুলি পরম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে লিখে নিয়েছিলেন কালক্রমে তার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে ভারতের সীমা অতিক্রম করে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই বাণীর অমৃত-স্পর্শে উজ্জীবিত হয়েছেন, কেউ বা ঘর ছেড়ে বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করে জীবনের সার্থকতার সন্ধান পেয়েছেন। কথামৃত আজ আর শুধু বাংলাদেশের নয়, সমগ্র পৃথিবীর সম্পদ। পাঁচখণ্ডে বিভক্ত কথামৃতের সেই বাণী ও উপদেশগুলিকে বিষয়ানুসারে বিন্যস্ত করে ডঃ নীরদবরণ হাজরা 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত অভিধান' সঙ্কলন করে একটি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান কাজ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও উপদেশের আয়তন বিপুল। তার মধ্যে যেমন ধর্মাচরণের রীতি-প্রকরণের ব্যাখ্যা আছে, ভারতীয় দার্শনিক-চিন্তার সরল বিশ্লেষণ আছে, তেমনি আছে মানুষের লৌকিক-জীবনের আদর্শ-নির্দেশ, এ-যুগের অন্নগতপ্রাণ মানুষের জীবিকার্জনের ঐহিকতাকে রক্ষা করে ঈশ্বরলাভের পথানুসন্ধান। শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাচার্য—লোকশিক্ষক। শিক্ষাদানের জন্য তিনি একই বিষয় নানাভাবে, নানা কাহিনী ও রূপকল্পের মধ্য দিয়ে শিষ্যমণ্ডলীর অন্তরে প্রবিষ্ট করে দিতে চেয়েছেন। স্বভাবতই কখন কখন তার মধ্যে পুনরুক্তি আছে—যা যে-কোনও আদর্শ-শিক্ষকের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। আবার একই উপদেশের মধ্যে একাধিক বক্তব্যও উপস্থাপিত হয়েছে।

এই অভিধানের সঙ্কলক সেই কথাটি স্মরণ রেখে বাণী ও উপদেশগুলিকে বিন্যস্ত করেছেন বিষয়ানুসারে। যেখানে বক্তব্যটি একাধিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সেখানে মূল অর্থটি অবলম্বন করে নির্দিষ্ট শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়াও অন্য কোন্ কোন্ শিরোনামে সেটি ব্যবহৃত হতে পারে পাদটীকায় তা উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটি মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত—(১) বাণী ও উপদেশাভিধান (২) আত্মচরিতাভিধান এবং (৩) ভক্ত ও পরিকর চরিতাভিধান। দ্বিতীয় ভাগের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের কোষ্ঠীর নকল ও জীবনপঞ্জী। এই পর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন উক্তির মধ্যে তাঁর ব্যক্তি ও সাধক জীবনের পরিচয় বিধৃত। এখানেও লেখক অভিধানের রীতি অনুসরণ করে বিষয়ানুসারে ভাগ করে বিভিন্ন শিরোনাম যুক্ত করেছেন। তৃতীয় ভাগে রামকৃষ্ণ সান্নিধ্য-প্রাপ্ত ভক্ত ও সাধারণ দর্শকদের সম্ভবমত ব্যক্তি-পরিচয় দিয়েছেন, তবে সে পরিচয় কোন কোন ক্ষেত্রে আংশিক ও অসম্পূর্ণ।

কথামৃত অবলম্বন করে ইদানীং বহু আলোচনা ও গবেষণা শুরু হয়েছে—কথামৃত সম্পর্কে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, তাই অন্তত প্রথম দুটি খণ্ড পাঠকের কাছে যথেষ্ট সমাদরের বস্তু হবে। তবে 'বাণী ও উপদেশে'র সঙ্গে আকর-গ্রন্থের (কথামৃতের) ভাগ, খণ্ড ও পরিচ্ছেদের উল্লেখ থাকলে গবেষকদের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হত। সম্পাদক পরবর্তী সংস্করণে সেইটুকু সংযোজিত করলে ভাল হয়।

তৃতীয় পর্বটিতে সম্ভবত অতি দ্রুত প্রকাশনার আগ্রহের জন্য, কিছু কিছু অসতর্কতার চিহ্ন বর্তমান। দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি—(১) শর[ৎ] চন্দ্র মিত্র—ব্যায়াম ও কুস্তি করত···ঠাকুরের পরামর্শমত লড়ে হারিয়ে দেন···" (পৃঃ ৩১০)। পাঁচপঙক্তির মধ্যে একবার 'করত', পরক্ষণেই 'দেন', বিশেষ দৃষ্টিকটু। (২) গোলাপ-মা—ঠাকুরের তিরোধানের পর তিনি শ্রীমাকে

দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে আসেন এবং তাঁর দিবারাত্রির সঙ্গী হন। শ্রীমাও গোপাল মা ছাড়া অসহায় বোধ করতেন…" (পৃঃ ২৮৮)। রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে 'গোলাপ-মা' ও 'গোপাল-মা' বিভ্রান্তি ঘটাতে পারে। (৩) গিরিশচন্দ্র ঘোষ—"ইতঃপূর্বে বাগবাজারের বলরাম বসু বা রামদত্তের বাড়িতে ঠাকুরকে দেখলেও ওখান থেকেই (স্টার থিয়েটার) তাঁর আকর্ষণের সূচনা। …গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল তাঁর ক্যান্সার নিয়েই ঠাকুরের ঐ কষ্ট।…দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে তাঁর এক হাবাগোবা পুত্র হয়—পুত্রটি শতায়ু ছিল।" (পৃঃ ২৮৭)। স্টার থিয়েটারে সাক্ষাতের আগে গিরিশচন্দ্র রামদত্তের বাড়িতে ঠাকুরকে দেখেননি—দেখেছিলেন দীননাথ বসুর বাড়িতে (প্রথম সাক্ষাৎ)। গিরিশের বিশ্বাস ছিল তাঁর পাপ গ্রহণ করেই ঠাকুরের ক্যান্সার—গিরিশের কখনও ক্যান্সার হয়নি। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভের উল্লিখিত পুত্রটি অত্যন্ত শৈশবে মারা যায়—'শতায়ু' নয় 'স্বল্পায়ু' ছিল।

তৃতীয় ভাগে এই ধরনের কয়েকটি ভুল থাকলেও গ্রন্থটির মধ্যে সম্পাদকের নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের স্বাক্ষর সুপরিস্ফুট। এই ধরনের একটি মূল্যবান গ্রন্থ পাঠককে উপহার দেওয়ার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সাধুবাদের যোগ্য। সুরুচিপূর্ণ প্রচ্ছদ, বাঁধাই ও মুদ্রণ মণ্ডল বুক হাউসের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। গ্রন্থমধ্যে শ্রীগণেশ বসু অঙ্কিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতিটি অতিরিক্ত আকর্ষণ।

—অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

প্রাপ্তি-স্বীকার

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীম : লেখক : শ্রীহীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক : শ্রীদেবকুমার বসু, মৌসুমী প্রকাশনী, ১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯, পৃঃ ১৫০, মূল্য : দশ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা ও সদাচার : প্রকাশক : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, দিনাজপুর, বাংলাদেশ, পৃঃ ৮৮, মূল্য : সাত টাকা।

বেদান্তডিণ্ডিম : শ্রীমন্ন্‌সিংহ সরস্বতীতীর্থ বিরচিত, ভাবানুবাদক ও প্রকাশক : শ্রীমানসকুমার সান্যাল, ১৮২, এস. এন. রায় রোড, কলিকাতা-৭০০০৩৮, পৃঃ ১২০, মূল্য : দশ টাকা।

হিন্দু-সৎকর্ম্মমালা (প্রথম ভাগ) : শ্রীমৎ মন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন সম্পাদিত, প্রকাশক : শ্রীহেমন্ত ভট্টাচার্য, ৯।২, শ্রীকান্ত চৌধুরী লেন, (বুড়াশিবতলা), বরাহনগর, কলিকাতা-৩৬, পৃঃ ১২৮, মূল্য : দশ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ অমিয়কথা : সংকলক : শ্রীপ্রণব কুমার সিংহ, প্রকাশক : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, দিনাজপুর, বাংলাদেশ, পৃঃ ১৮৪, মূল্য : পনর টাকা।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

মহারাষ্ট্রে খরাত্রাণ: বম্বে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন এবং পুণে রামকৃষ্ণ মঠ এক-যোগে পুণে জেলার খরা-পীড়িত ৭টি গ্রামের পরিবারগুলির মধ্যে খাদ্যশস্য, শাড়ি, ধুতি, বিছানার চাদর এবং বাসন-পত্র বিতরণ করে।

কর্ণাটকে খরাত্রাণ: তিরুমণি ও ভালুর গ্রামের দুটি পশুপালন কেন্দ্রে যথাক্রমে ১,২০০ ও ৮০০টি গো-মহিষের প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি সরবরাহ করা ছাড়াও খরার আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রমের তত্ত্বাবধানে নোগালাসান্দিকা এবং আরও কয়েকটি গ্রামে কয়েকটি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১,০০০টি গো-মহিষের জন্য পর্যাপ্ত শুকনো ঘাস, ভুসি ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। এছাড়া খরা-ক্লিষ্ট পরিবারগুলির মধ্যে রাগি ও সুজি বিতরণ এবং জল-কষ্ট নিবারণের জন্য রাইচাযলু গ্রামে একটি গভীর নলকূপ খনন করা হয়।

শ্রীলঙ্কা শরণার্থিত্রাণ: মাদ্রাজ ত্যাগ-রাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম মন্দাপম্ ও তিরুচি শিবিরে আগত শরণার্থীদের মধ্যে ত্রাণ-কার্য আগের মতই চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ শরণার্থিত্রাণ: আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরা সীমান্তে আগত 'চাকমা' শরণার্থীদের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পুনর্বাসন: কর্ণাটকের টুমকুর জেলার কোট্টালম গ্রামে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতি-গ্রস্ত গ্রামবাসীদের জন্য বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক আরব্ধ ২০টি গৃহের নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হতে চলেছে।

উদ্বোধন ও দ্বারোদ্ঘাটন

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী গত ৭ জুলাই ১৯৮৬, **মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমস্থ** উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (দক্ষিণ) নব-নির্মিত বিজ্ঞান-ভবনের এবং এই বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন।

ঐ দিনই তিনি **মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে** অডিটোরিয়াম বিভাগের এবং বিবেকানন্দ স্টাডিজ্ ইন্‌স্টিটিউটের উদ্বোধন করেন।

গত ৯ জুলাই ১৯৮৬ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী **চেঙ্গলাপট্টু রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের** স্বামী ব্রহ্মানন্দ ধামের দ্বিতলের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

ঐ দিনই তিনি **রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোমের** পরিচালনাধীনে মালিয়াকারানাই-স্থিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনটির দ্বিতলের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

গত ১৩ অগস্ট ১৯৮৬, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ, বহু সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে **মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মঠের** উদ্বোধন এবং মঠ-অন্তর্গত একটি নতুন পাঠাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। মঠের শুভ-উদ্বোধনের আনুষঙ্গিক অঙ্গ হিসাবে ১৩ থেকে ১৬ অগস্ট পর্যন্ত চারদিনব্যাপী আনন্দ-উৎসবে

পূজা, হোম, নরনারায়ণ সেবা, ধর্মসভা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

ছাত্র-কৃতিত্ব

১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের কর্ণাটকের এস. এস. এল. সি. (মাধ্যমিক) পরীক্ষায় **মহীশূর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যাশালার** একজন ছাত্র দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন সারদা বিদ্যালয়ের দুজন ছাত্রী ১৯৮৬ র তামিলনাড়ু এস. এস. এল. সি. পরীক্ষায় ৯ম স্থান অধিকার করেছে।

উৎসব

গত ৭ ও ৮ জুন ১৯৮৬, **তমলুক** (মেদিনীপুর-জেলা) **রামকৃষ্ণ মঠে** প্রায় ১৭০ জন ভক্ত নরনারীর উপস্থিতিতে ভজন, বেদপাঠ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনাদির মাধ্যমে ৭ম বার্ষিক ভক্ত-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

গত ২৩ জুন থেকে ১ জুলাই ১৯৮৬, **মরিশাস রামকৃষ্ণ মিশন** কেন্দ্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের ১৫০তম জন্মোৎসব এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালিত হয়। মরিশাসের রাষ্ট্রপ্রধান, মরিশাস-স্থিত ভারতীয় হাইকমিশনার এবং আরও অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

বালিয়াটী (বাংলাদেশ) **রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে** গত ৪ জুলাই ১৯৮৬, শ্রীশ্রীঠাকুরের বার্ষিক জন্মোৎসব পালিত হয়। পূজা, হোম, বেদপাঠ, ভক্তিমূলক গান, ধর্মসভা প্রভৃতি ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। প্রায় দুই হাজার ভক্ত নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দেহত্যাগ

স্বামী কাশিকানন্দ (ইন্দ্রেশ্বর মহারাজ) গত ১১ জুলাই ১৯৮৬, রাত্রি ৩-০০ ঘটিকায় বেলুড় মঠস্থ আরোগ্য ভবনে দেহরক্ষা করেন। শ্বাসযন্ত্রে ক্যান্সার তাঁর দেহরক্ষার কারণ। দেহরক্ষাকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। কাশিকানন্দজী ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যোগদানের কেন্দ্র ছাড়াও রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কিষেণপুর, টাকি, কনখল, বাঁকুড়া, গুয়াহাটি, শিলং, বাগবাজার মঠ ও বেলুড় মঠ কেন্দ্রের কর্মিরূপে তিনি কাজ করেছেন। গত কয়েক বছর যাবৎ তিনি মঠে অবসর জীবন-যাপন করছিলেন। অতিশয় সরল ও দয়ালু-স্বভাবের জন্য তিনি বহু লোকের শ্রদ্ধার্ঘ্য পেয়েছেন।

স্বামী মহাবীরানন্দ (গোপাল মহারাজ) গত ১২ জুলাই ১৯৮৬, সকাল ৯-০০ ঘটিকায়, খাদ্যনালীতে ক্যান্সার হবার ফলে ফুসফুস ও হৃদ্‌যন্ত্রের কাজ ব্যাহত হওয়ায় বেলুড় মঠের আরোগ্য ভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগ-কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। শরীর অসুস্থ থাকায় গত কয়েক মাস যাবৎ তিনি শয্যাগত ছিলেন।

স্বামী মহাবীরানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের দীক্ষিত-শিষ্য। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের যে সকল কেন্দ্রে তিনি সঙ্ঘের সেবা করেছেন, সেগুলি হল—ঢাকা, মেদিনীপুর, বালিয়াটী, তমলুক, দিনাজপুর, সারদাপীঠ, শ্যামলাতাল, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, কাঁকুড়গাছি, বাগবাজার মঠ ও বেলুড় মঠ। কয়েকটি ত্রাণকার্যেও তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ জীবন-যাপনে এবং কঠোর পরিশ্রমে তিনি

ছিলেন অভ্যস্ত। সরল ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি বহু লোকের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

এঁদের পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি লাভ হোক—এই প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

গত ৩ ও ১৯ অগস্ট ১৯৮৬, **শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী** এবং **শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের** শুভ আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর তাঁদের জীবনী ও উপদেশ আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী সত্যব্রতানন্দ এবং স্বামী বিকাশানন্দ। গত ২৭ অগস্ট ১৯৮৬, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবতিথি 'জন্মাষ্টমী' উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর স্বামী বিকাশানন্দ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কথা আলোচনা করেন।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনাঃ সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত; স্বামী বিকাশানন্দ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

বিবিধ সংবাদ

সমুদ্রবক্ষে বোতলে বার্তা-প্রেরণ

সমুদ্রে বিপদ্‌গ্রস্ত নাবিক ও যাত্রীরা উপকূলবর্তী মানুষের কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশায় তাঁদের বিপদের সংবাদ বোতল-বন্দী করে সমুদ্রের জলে ফেলে দেন। বিশ্বের বিভিন্ন সমুদ্র-তটে প্রতি বছর এরকম বহু বার্তা-সম্বলিত বোতল পাওয়া যায়। জার্মানির হাইড্রোগ্রাফিক ইনস্টিটিউটে এরকম ৬০০টি বার্তার সংগ্রহ আছে। জার্মান জাহাজ লোমিয়ার ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জুলাই-এ জল-নিমজ্জনের সংবাদ—এই বোতল-বার্তা থেকেই পাওয়া যায়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি কুমেরু অভিযাত্রী-দল সমুদ্রের জলে যে বোতল-বার্তা পাঠিয়েছিল, ৫২ বছর পরে নিউজিল্যাণ্ডের উপকূলে সেটি পাওয়া যায়। আরও অনেক মজার মজার খবর পাওয়া গেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একদল ছাত্র 'পত্রবন্ধু' পাতাতে চেয়ে যে বোতল-বার্তা পাঠিয়েছিল, অতলান্তিকের সমুদ্র-গর্ভে সেটি ছিল ১৫ মাস।

গারো পাহাড়ে পাঁচ লক্ষ বছর পূর্বেকার পুরানো-প্রস্তর যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক-নিদর্শন আবিষ্কার

সম্প্রতি গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তরুণ শর্মার নেতৃত্বে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক-গোষ্ঠী গারো পাহাড়ের গানোল-রংগ্রাম উপত্যকার বারোটি জায়গায়, নাগাল-বিবরা সেতুর কাছে সিমসাং নদীর তীরে, ত্রোনগিরি এবং মিচিমাগিরি অঞ্চলে খনন-কার্য চালিয়ে যে সমস্ত প্রস্তর-নির্মিত সামগ্রী পেয়েছেন, সেগুলি পাঁচ লক্ষ বছর আগেকার পুরানো-প্রস্তরযুগের ছাঁদের সঙ্গে মেলে। এছাড়া, ডলোরাইট পাথরের তৈরি উন্নত ধরনের আরও কিছু অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া গেছে, যেগুলি, প্রত্নতাত্ত্বিকদের বিশ্বাস, খ্রীষ্ট-জন্মের পঞ্চাশ হাজার বছর আগেকার মধ্য-প্রস্তরযুগের নিদর্শন। মিচিমাগিরি, থেগরোগিরি, সেলিবালগিরি অঞ্চলে আরও উন্নতমানের নতুন প্রস্তরযুগের ছাঁদ-যুক্ত যন্ত্রাংশ সকল পাওয়া গেছে। রংগ্রাম নদীর উপত্যকায় আলাগিরি গ্রামে প্রাচীন সংস্কৃতির এমন নিদর্শন পাওয়া গেছে যা খ্রীষ্টপূর্ব বারো হাজার বছর আগের।

ভাব-সমাধি উৎসব

গত ২১ জুলাই ১৯৮৬, **পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটস্থ** (উত্তর কলিকাতা) **যদু মল্লিকের বাসভবনে** শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব-সমাধি উৎসব পালিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শ্রীশ্রীঠাকুর ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ২১ জুলাই তারিখে এই বাড়িতে সিংহবাহিনী মূর্তি দর্শনে ভাব-সমাহিত হন। এই উপলক্ষে একটি আলোচনা-সভারও আয়োজন হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশনের পর উৎসবের সমাপ্তি হয়।

সাধন বল, ভজন বল, তীর্থদর্শন বল, অর্থোপার্জন বল—সব প্রথম বয়সে করে নিতে হয়। বৃদ্ধ বয়সে কফ-শ্লেষ্মায় ভরা, শরীরে সামর্থ্য নেই, মনে বল থাকে না—তখন কি কোন কাজ হয়?

—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

"যেমন ফুল নাড়তে চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎতত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।"

—শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী

অন্তর্বহিঃ উভয় প্রকারেই সন্ন্যাস অবলম্বন করা চাই। আচার্য শঙ্করও উপনিষদের 'তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ'—এই অংশের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলছেন, লিঙ্গহীন অর্থাৎ সন্ন্যাসের বাহ্য চিহ্নস্বরূপ গৈরিকবসন, দণ্ডকমণ্ডলু প্রভৃতি ধারণ না ক'রে তপস্যা করলে দুরধিগম্য ব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয় না। বৈরাগ্য না এলে, ত্যাগ না এলে, ভোগস্পৃহা-ত্যাগ না হ'লে কি কিছু হবার জো আছে? 'সে যে ছেলের হাতে মোয়া নয় যে ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে।'

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীনগেন্দ্র-উপদেশামৃত

সংকলক ঃ যুগাচার্য মহর্ষি শ্রীশ্রীনগেন্দ্রনাথের প্রশিষ্য, শ্রীমৎ ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ও শ্রীশ্রীনগেন্দ্র মঠের বর্তমান মোহন্ত—**শ্রীমৎ ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী** [সন্ন্যাস-নাম ঃ দণ্ডিস্বামী শ্রীহরিভক্তিদেব তীর্থ]। কাপড়ে বাঁধাই [৮½"×৫½"]ঃ—**প্রথম পর্ব** [চৌষট্টি+৩২০ পৃঃ] মূল্য ঃ ২০.০০, **দ্বিতীয় পর্ব** [ছাপ্পান্ন+৩২০ পৃঃ] মূল্য ঃ ২৫.০০।

উক্ত গ্রন্থ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত ঃ [১] প্রখ্যাত দার্শনিক ও মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ-এর মন্ত্রশিষ্য **ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার** ব'লেছেন ঃ…"তিনি আমাদের নিত্যই ব্রহ্মানন্দ রস পান করাতেন। তাঁর কথামৃত সত্যই ছিল মলনাশক, হৃদয় শোধক।…সুন্দরে এত অভিষিক্ত ছিল তাঁর চিত্ত যে তিনি কথায়, কাজে, আচরণে ছিলেন সুন্দর।"…[২] স্বনামধন্য ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যাপক **ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন** ব'লেছেন—"তাঁর জীবনকথা জানলে পাঠক জীবনে অনেক দিকে উপকার পাবেন।…বইটি পড়লে তাঁরা একসঙ্গে অ-তিক্ত ঔষধ, সুপাচ্য পাচন এবং সুমিষ্ট পথ্য পেয়ে যাবেন।" [৩] কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন দর্শনাধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক **শ্রীপরেশনাথ ভট্টাচার্য** লিখেছেন—"…শুধু বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যই এই উপদেশের বৈশিষ্ট্য নয়। উপদেশ দেওয়ার প্রণালী এবং ভাষা সুনিপুণ কলাকৌশলে সমৃদ্ধ। তা' ছাড়া উপদেশগুলি যেমন তত্ত্বদ্রষ্টার সাক্ষাৎ প্রতীতিতে সহজ এবং জীবিত, তেমনই শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্যে পূর্ণ।"… [৪] **Prof. Tripurasankar Sen Shastri says :** "…We can pay our tribute of respect best to the hallowed memory of Maharshi Nagendranath by following his teachings and preaching his biography and gospel throughout the length and breadth of India." [৫] প্রখ্যাত নাট্যকার **ডক্টর শ্রীমন্মথ রায়** লিখেছেন—"…আজ যখন আমাদের জাতীয় সমাজ জীবন বিজাতীয় আদর্শে বিভ্রান্ত অথবা আদর্শহীনতায় পথভ্রষ্ট, তখন মহর্ষি শ্রীশ্রীনগেন্দ্রনাথের উপদেশামৃত আশ্চর্যভাবে আমাদের পথের আলো রূপে বিরাজ করছে।…'সংসারী সাজিও, সংসারী হইও না'—অথবা, 'সাধু হইও, সাধু সাজিও না' শ্রীশ্রীনগেন্দ্রনাথের এমনি সব উপদেশ সামান্য কয়েকটি কথায় আমাদের জীবনে ও মনে কী অসামান্য আত্মসমীক্ষার প্রেরণা।" [৬] "শ্রীরামকৃষ্ণোত্তর যুগে যে ক'জন সাধক স্বীয় মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছিলেন —তাঁদের মধ্যে মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ অন্যতম। আত্মপ্রচার-বিমুখ এই পরম সাধকের জীবনী ও বাণী অধ্যাত্ম পিপাসু ব্যক্তিবর্গের নিকট যে এক মহার্ঘ পাথেয় তাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই…।" —**বিশ্ববাণী** [৪১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৮৩]।

শ্রীশ্রীনগেন্দ্র মঠ থেকে **'শ্রীগুরুচরণতলে'**, **'জীবন-পাথেয়'**, **'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শান্তি-গীতা'** (অনূদিত), এবং **'নারদসূত্র'** প্রভৃতি বহুমূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

[ক] **শ্রীশ্রীনগেন্দ্র মঠ**, ২-বি, রামমোহন রায় রোড, কলিকাতা-৯।

[খ] **মহেশ লাইব্রেরী**, [ফোন ঃ 31-1479], ২-১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩।

[গ] **সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার**, [ফোন ঃ 34-1208], ৩৮, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬।

* **'ব্রহ্মচারী জন্মোৎসব তহবিল'-এর পক্ষ থেকে প্রচারিত।** *

ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, 'আমার চিন্তা যে করে সে কখনও খাওয়ার কষ্ট পায় না।'

—শ্রীশ্রীমা

* * *

"Ye are the children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings. Ye divinities on earth—sinners! It is a sin to call a man so; it is a standing libel on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep; you are souls immortal, spirits free, blest and eternal."

—Swami Vivekananda

…আহা, দেশে গরীব-দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে; যে মেথর-মুদ্দাফরাশ একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরে হাহাকার রব ওঠে,—হায়! তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশের এমন কেউ নেই রে!…আমরা দিনরাত কেবল তাদের বলছি—'ছুঁসনে ছুঁসনে'—দেশে কি আর দয়াধর্ম আছে রে বাপ! কেবল ছুঁৎমার্গের দল! অমন আচারের মুখে মার ঝাঁটা, মার লাথি! ইচ্ছা হয় তোর ছুঁৎমার্গের গণ্ডি ভেঙে ফেলে এখনি যাই—'কে কোথায় পতিত-কাঙাল দীন-দরিদ্র আছিস্' ব'লে তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠলে মা জাগবেন না। আমরা এদের অন্ন-বস্ত্রের সুবিধা যদি না করতে পারলুম, তবে আর কি হ'ল? হায়! এরা দুনিয়াদারি কিছু জানে না, তাই দিনরাত খেটেও অশন-বসনের সংস্থান করতে পারছে না। দে—সকলে মিলে এদের চোখ খুলে। আমি দিব্য চোখে দেখছি, এদের ও আমার ভেতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র। সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার না হ'লে কোন দেশ কোনও কালে কোথায় উঠেছে দেখেছিস্? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও ঐ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না—এ নিশ্চয় জানবি।

—স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন : R. N. 8793/57

বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রকাশিত বা পরিবেশিত পুস্তকাবলী

১। **বীরবাণী** (১৯শ সং) ... ... ৫ টাকা

স্বামী বিবেকানন্দের সংস্কৃত স্তোত্র, ইংরাজী-বাংলা কবিতা সংগ্রহ

২। **জাতীয় সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ**

(সদ্য প্রকাশিত—৩য় সং) ১২ টাকা

স্বামী সুন্দরানন্দ (উদ্বোধন পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক)

৩। **বিবেকানন্দ শিষ্য শরৎচন্দ্রের জীবনী ও রচনাবলী** ১০ টাকা

(স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর আশীর্বাদ ও স্বামী নিরাময়ানন্দজীর ভূমিকাসহ)

প্রকাশক : শরৎচন্দ্র-পুত্র শ্রীব্রহ্মপদ চক্রবর্তী। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রশংসিত

প্রাপ্তিস্থান : বিবেকানন্দ সোসাইটি—১৫১ বিবেকানন্দ রোড, কলি-৬

উদ্বোধন কার্যালয়—১ উদ্বোধন লেন, কলি-৩

বেলুড় মঠ—শোরুম

অদ্বৈত আশ্রম—৫ ডিহি এণ্টালি রোড, কলি-১৪

উদ্বোধন কার্তিক ১৩৯৩

সূচীপত্র

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

[উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন]

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

কর্মযোগ	৫·৯০	ধর্ম-সমীক্ষা	৫·০০
ভক্তিযোগ	৪·৫০	ধর্মবিজ্ঞান	৫·৫০
	৫·০০	বেদান্তের আলোকে	৪·৫০
জ্ঞানযোগ	১৪·০০	কথোপকথন	৫·০০
জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে	১০·০০	ভারতে বিবেকানন্দ	২০·০০
রাজযোগ	১০·০০	দেববাণী	৮·০০
সরল রাজযোগ	১·৮০	মদীয় আচার্যদেব	২·৫০
সন্ন্যাসীর গীতি	০·৮০	চিকাগো বক্তৃতা	২·২৫
ঈশদূত যীশুখৃষ্ট	১·০০	মহাপুরুষপ্রসঙ্গ	১২·০০
পত্রাবলী। (সমগ্র পত্র একত্রে, নির্দেশিকাদি সহ) রেক্সিন বাঁধাই	৪০·০০	ভারতীয় নারী	৫·০০
পওহারী বাবা	১·২৫	ভারতের পুনর্গঠন	২·৫০
স্বামীজীর আহ্বান	১·২৫	শিক্ষা (অনূদিত)	৪·২০
বাণী-সঞ্চয়ন	১২·০০	শিক্ষাপ্রসঙ্গ	৮·০০

স্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচনা

পরিব্রাজক	৪·২৫	ভাববার কথা	২·৩০
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য	৫·০০	বর্তমান ভারত	২·৫০

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণ। প্রতি খণ্ড—২৫ টাকা। সম্পূর্ণ সেট ২৫০ টাকা
সাধারণ বাঁধাই সুলভ সংস্করণ। প্রতি খণ্ড—১৭·৫০ টাকা। সম্পূর্ণ সেট ১৭৫ টাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

স্বামী সারদানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (দুই ভাগে)

রেক্সিন-বাঁধাই : ১ম ভাগ ৩৫·০০, ২য় ভাগ ৩০·০০

সাধারণ (পাঁচ খণ্ডে)

১ম খণ্ড ৬·০০, ২য় খণ্ড ১৩·৫০, ৩য় খণ্ড ৯·৫০,
৪র্থ খণ্ড ৯·৫০, ৫ম খণ্ড ১৪·৫০

অক্ষয়কুমার সেন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি — ৪৫·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা — ৫·৫০

স্বামী প্রেমঘনানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প — ৪·০০

শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ — ১·৫০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র) — ৫·৫০

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বাণী — ·৭৫

স্বামী তেজসানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী — ৯·০০

৮৮তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

কার্তিক, ১৩৯৩

দিব্য বাণী

ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা॥

ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া।
সর্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্বদেবময়ী তনুঃ॥

ত্বমেব সূক্ষ্মা ত্বং স্থূলা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥

—তুমিই কালী, দুর্গা, তারিণী, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতী, বগলা, ভৈরবী ও ছিন্নমস্তা। আবার তুমিই অন্নপূর্ণা, সরস্বতী ও লক্ষ্মী। তোমার দেহ সর্বদেবময় ও তুমি সর্বশক্তিস্বরূপিণী। তুমিই স্থূল, তুমিই সূক্ষ্ম, তুমিই ব্যক্ত এবং অব্যক্তস্বরূপিণী। তুমি নিরাকার হইয়াও সাকার, তোমার প্রকৃততত্ত্ব কেহই অবগত নহে।

[মহানির্বাণ তন্ত্র, চতুর্থোল্লাস, শ্লোক নং ১৩—১৫]
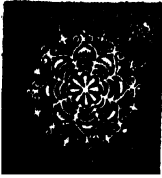
কথাপ্রসঙ্গে

শুভ ৺বিজয়া

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ী, অনুরাগী ও সংশ্লিষ্ট সকলকেই আমরা শুভ ৺বিজয়ার শুভেচ্ছা ও প্রীতি-সম্ভাষণাদি জানাইতেছি। শ্রীশ্রীজগন্মাতার কৃপায় সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হউক, ইহাই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

শক্তি-আরাধনা

অনির্বচনীয়া এক মহাশক্তি এই জগৎ-মঞ্চে বিভিন্নভাবে অভিনয় করিতেছেন। সমগ্র বিশ্বের ভিতরে এবং বাহিরে, দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল বস্তুতে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপে তাঁহার বিচিত্র লীলাভিনয় চলিতেছে। জন্ম-মৃত্যু সুখ-দুঃখ, জ্ঞান অজ্ঞান প্রভৃতি সব কিছুতেই একই শক্তি বিভিন্নভাবে পরিব্যক্ত। জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর, সৃষ্টির সঙ্গে প্রলয়ের, জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞানের, ধর্মের সঙ্গে অধর্মের, দেবভাবের সঙ্গে অসুরভাবের অনুক্ষণ যে সংগ্রাম চলিতেছে—শক্তি প্রতীকমাত্রেই তাহারই প্রকাশ। শক্তি একাধারে এই উভয়গুণ-সম্পন্না। সৃষ্টি ও প্রলয়, জীবন ও মৃত্যু—একই মহাশক্তির দুইটি দিক মাত্র।

মানুষ ইন্দ্রিয়-সহায়ে যাহা কিছু স্পর্শ করে, মন-সহায়ে যাহা কিছু কল্পনা করে, এবং কল্পনা-সহায়ে যাহা কিছু অনুমান করে—তাহা সবই শক্তিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। একই শক্তি কোথাও গুপ্ত, আবার কোথাও ব্যক্তভাবে বিরাজিতা। সাধারণদৃষ্টিতে জড়পদার্থে তিনি গুপ্তভাবে বিরাজিতা, যদিও জড়পদার্থও বস্তুতঃ শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। আকাশ, বায়ু, সাগর, পর্বত প্রভৃতি হইতে অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণু-পুঞ্জে পর্যন্ত এই শক্তিরই বৈচিত্র্য প্রকটিত। জীব-জগতে, বিশেষ করিয়া মানুষের মধ্যে এই শক্তির বিশেষ প্রকাশ, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে শক্তির ব্যক্তভাবের খেলা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। "গুপ্ত হইতে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত হইতে গুপ্ত—শক্তির এই দুই ভাবের খেলা জগতে নিরন্তর সর্বত্র বিরাজিত! যে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিতে শক্তির প্রথমোক্ত ভাবের খেলা হইতেছে, তাহাকেই আমরা জীবন্ত, উন্নতিশীল এবং ভাগ্যবান বলিয়া বোধ করিতেছি এবং যাহাতে শেষোক্ত ভাবের খেলা, তাহাতেই বার্দ্ধক্য, শ্রীহীনতা, অবনতি এবং মৃত্যুর ছায়া উপলব্ধি করিতেছি।" (ভারতে শক্তিপূজা, পৃঃ ৫-৬)

শক্তির উপাসনা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। নিজের ভিতরে শক্তির বিকাশের, তাহার সংরক্ষণের এবং যথাযথ প্রয়োগের উপরই মানুষের জীবনের সুখ-শান্তি, আত্মোৎকর্ষ এবং পরিণামে নিজের সত্তার পূর্ণতা সম্পাদন বহুলাংশে নির্ভরশীল। মানুষের জীবনধারা শক্তিরই পরিণাম প্রবাহ মাত্র। তাই এই শক্তির যথোচিত বিকাশের পথে বাধা উপস্থিত হইলে তাহার জীবনধারাই অবরুদ্ধ হইয়া যায়। শক্তির অপচয়েই তাহার মৃত্যু; অপরপক্ষে সংরক্ষণে, যথাযথ প্রয়োগে ও বিকাশেই তাহার জীবনের সার্থকতা। সুতরাং প্রকৃতির মধ্যে অনুস্যূত মহাশক্তির সন্ধান করা এবং সেই

শক্তির পূর্ণ বিকাশ-সাধনে উদ্যোগী হওয়া-মানুষ-মাত্রেরই কর্তব্য। আগেই বলা হইয়াছে, শক্তি কখনও গুপ্ত, আবার কখনও ব্যক্তভাবে বিরাজিতা। এই গুপ্ত ও ব্যক্ত—এই উভয়ভাবে বিরাজিতা থাকিলেও শক্তির পরিমাণের কিন্তু কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। ঘন-সূক্ষ্ম আবরণের অর্থাৎ মায়িক জগতের মধ্য দিয়া দেখি বলিয়া আমাদের নিকট উহা কখনও হ্রাস, কখনও বৃদ্ধি, আবার কখনও একেবারে লুপ্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আসলে তাহা নহে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন, চিকের আড়ালে দেবী সর্বদাই রহিয়াছেন।

পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি না থাকিলেও শক্তির প্রকাশের তারতম্য আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, "তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?" উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "তিনি বিভুরূপে সর্বত্র আছেন। পিঁপড়েতে পর্যন্ত। কিন্তু শক্তি বিশেষ, তা না হলে একজন লোকে দশজনকে হারিয়ে দেয়, আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়। আর তা না হলে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো? তোমার দয়া, তোমার বিদ্যা আছে—অন্যের চেয়ে, তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে।" (কথামৃত, ৩।১।৪)

শক্তির প্রকাশের যেরূপ তারতম্য আছে, সেইরূপ আছে তাহার ক্রমবিকাশ ও স্তরভেদ। নিম্নতর স্তর হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষের জীবনের সাধনা চলিয়াছে ক্রমশঃ ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতর স্তরের দিকে। প্রাথমিক স্তরে শক্তির সাধনা শরীরকেন্দ্রিক। শারীরিক শক্তিই এখানে শক্তির পরিমাপক। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।৮।৪) ইন্দ্র-বিরোচন-প্রজাপতির উপাখ্যানে আছে অসুর-প্রতিনিধি বিরোচন প্রজাপতির নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি প্রজাপতির উপদেশের মর্মার্থ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন এই দেহটাই মহনীয় পরম সত্য। তাই ইহারই পরিচর্যা একমাত্র কর্তব্য। দেহকে মহিমান্বিত করিয়া দেহের সেবা দ্বারা আমরা ইহলোক ও পরলোক—উভয়লোকে যাহা কিছু কাম্য সব লাভ করিতে সমর্থ হইব। শক্তির এই শরীরকেন্দ্রিক স্তরের বিকাশ হয় আসুরিক বল-বীর্য, দম্ভ-দর্প ইত্যাদির মধ্য দিয়া। এইগুলি মানুষকে দেহের স্তরেই আবদ্ধ রাখে। তারপর দেখা দেয় মানসিক স্তরের বিকাশ। এই স্তরে শুরু হয় বুদ্ধির সাধনা। শক্তির এই সাধনার ফলে মানুষ তাহার প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করিতে সক্ষম হয় এবং ঐ অবস্থাকে জয় করিয়া সে স্বার্থ-সুখভোগে মত্ত হয়। তার পরের স্তরে দেখা যায় বুদ্ধি হইতে ক্রমশঃ হৃদয়ের বিকাশ ঘটিতে থাকে। শক্তির এই আরাধনার ফলে মানুষ স্বার্থসুখ ত্যাগ করিয়া পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে শিক্ষা করে। এইভাবে উচ্চ হইতে উচ্চতর শক্তির সাধনার মাধ্যমে মানুষ ক্রমে জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে সক্ষম হয়।

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, জীবনের সর্বস্তরে যে শক্তির এই অপরিসীম প্রভাব, সেই শক্তির মূলই বা কোথায়, আর তাহার স্বরূপই বা কি? চণ্ডীতে (৫।৩৪) আছে:

"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

—কি জড় কি চেতন—সকলের মধ্যে কোথাও গুপ্ত, কোথাও ব্যক্তভাবে অবস্থিতা দেবীকে আমরা নমস্কার করি। তন্ত্রমতে এই দেবীই পরমেশ্বরী মহামায়া। ইনিই অঘটনঘটন পটীয়সী ব্রহ্মাত্মিকা শক্তি। এই শক্তির দ্বারাই জগদীশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি সংহার এবং জন্মলীলাদি সকল কার্য করিয়া থাকেন। এই মহামায়া "নিত্যৈব সা

জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্" (চণ্ডী, ১।৬৪)—নিত্যা অর্থাৎ জন্মমৃত্যু-রহিতা, অপরদিকে এই জগৎপ্রপঞ্চ তাঁহারই বিরাট মূর্তি।

মহিষাসুর বধের পর ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতারা নতজানু হইয়া আনন্দ-গদ্‌গদচিত্তে দেবী মহাশক্তির যে স্তব করিয়াছিলেন তাহাতে আছে :

"দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ।"

(চণ্ডী, ৪।৩)

—আমরা সেই মহাশক্তিরূপিণী দেবীকে প্রণাম করি—যিনি দেবতাদের শক্তিপুঞ্জের ঘনীভূত মূর্তি, যিনি স্বীয় মায়া-শক্তির প্রভাবে এই বিশ্বজগৎ উৎপাদনপূর্বক তাহার প্রত্যেক অণুপরমাণুর ভিতরে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন এবং যিনি সমস্ত দেবতা ও মহর্ষিগণের আরাধ্যা—সেই বিশ্বজননী মহাশক্তি আমাদের সর্ববিধ মঙ্গল বিধান করুন। তাঁহার বিশ্ববিধানের মধ্যে আমরা যেন সর্ববিধ কল্যাণ উপলব্ধি করি। বিশ্ববিধায়িনী এই মহাশক্তিকে যত গভীর ও ব্যাপকভাবে আপনারই স্নেহময়ী জননীরূপে প্রাণে প্রাণে অনুভব করা যায়, ততই সমস্ত শক্তি, সমস্ত ঐশ্বর্য ও সমস্ত বিদ্যা আপনার করতলগত বলিয়া বোধ হয়। তখনই এই সংসারে সকল শত্রু নিঃশেষে বিজিত, সকল বিঘ্ন সুদূরে অপসারিত এবং সকল অজ্ঞান এক অনন্ত জ্ঞানে নিমজ্জিত হয়।

বৈদিকযুগের ঋষিকন্যা ব্রহ্মবিদুষী বাক্ এই মহাশক্তিকে ভিতরে বাহিরে উপলব্ধিপূর্বক আপনাকে এই মহাশক্তি হইতে অভিন্ন অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন : জীবসমূহ যে অন্নাদি আহার করে, দর্শনশ্রবণাদি ব্যাপার সম্পাদন করে, শ্বাস-প্রশ্বাসাদি দ্বারা প্রাণধারণ করে—এ সমস্ত ক্রিয়াই আমার দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমি স্বেচ্ছায় কাহাকেও শিবত্ব, কাহাকেও ব্রহ্মত্ব, কাহাকেও বিষ্ণুত্ব, আবার কাহাকেও ঋষিত্ব প্রদান করি। আমি স্বর্গ ও মর্ত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করি, আবার এই বিশ্বজগৎ অতিক্রম করিয়াও স্বমহিমায় বিরাজিত থাকি। আমি ছাড়া বস্তুতঃ কিছুই নাই। [দেবীসূক্ত, ৫-৮ ভাবার্থ]

যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ এই শক্তির আরাধনায় ব্যস্ত। সাধনার দ্বারা মানুষ বিশ্বরূপিণী এই মহাশক্তির সহিত নিজের একত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। আর এই একত্ব উপলব্ধিতেই মানুষের শক্তি-সাধনার পরিসমাপ্তি, আত্মবিকাশের পরিপূর্ণতা। মানুষ তখন সমগ্র বিশ্বকে নিতান্ত আপনার বলিয়া অনুভব করে, বিশ্বের সর্বত্রই আপনাকে দর্শন করে। জরা, ব্যাধি, মৃত্যু সে তখন নিতান্ত তুচ্ছ বোধ করে এবং নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত আনন্দের সহিত সংসারবক্ষে বিচরণ করে।

জীবন ও জগতের মধ্যে এই শক্তির দর্শন লাভ করিতে হইলে, শক্তিসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, সমগ্র শরীর-মন সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিতে হইবে, স্বার্থসুখ চিরতরে ত্যাগ করিতে হইবে। স্বার্থসুখ, তথা সর্বত্যাগেই অমৃতত্বলাভ সম্ভব—'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ (কৈবল্যোপনিষদ্, ৩)—অন্য কিছুতেই নয়। তাই বৃথা শক্তিক্ষয় নিবারণ করিয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত শক্তির আবাহন, পূজা ও সর্বোপরি তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করিতে হইবে। মহাশক্তিকে সুপ্রসন্না করিবার ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায় এবং শক্তি সাধনায় সিদ্ধিলাভের ইহাই একমাত্র রহস্য। তাই "শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত ধীরভাবে যথাযথ উপায় অবলম্বন কর, সকল কষ্ট সহ্য করিয়া বিন্দু বিন্দু হৃদয়ের শোণিতপাত পর্যন্ত স্বীকার করিয়া শক্তির উদ্বোধন এবং তর্পণ কর, আপনার প্রিয় যাহা

কিছু এবং অতি প্রিয় দেহমন পর্যন্ত ইষ্টলাভোদ্দেশ্যে দেবীর সম্মুখে বলিদান দাও, দেখিবে নবজীবনের সহিত যে উদ্দেশ্যে তুমি পূজা করিতেছ, তাহা সিদ্ধ হইবে এবং তোমার একাঙ্গী ভক্তিপূত সাধনায় তোমার কুল, জাতি ও দেশের মহা-কল্যাণ সাধিত হইবে ; আপনি ধন্য হইয়া অপর সাধারণকেও ধন্য করিবে।" (ভারতে শক্তি-পূজা, পৃঃ ১১) মহাশক্তি মহামায়ার নিকট আমাদের প্রার্থনা, তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্না হউন, আমাদের সকল কাপুরুষতা দুর্বলতা দূর করিয়া আমাদিগকে তাঁহার আরাধনার যোগ্য অধিকারী করিয়া তুলুন।

"সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি
নমোঽস্তু তে।।"
(চণ্ডী, ১১।২৪)

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[স্বামী নিখিলানন্দকে লিখিত]

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ শরণম্

৺কাশীধাম
১২. ৪. ২১

শ্রীমান দীনেশ,

তোমার একখানি দীর্ঘ পত্র সেদিন পাইয়াছি। তোমরা সকলে ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। নির্ম্মলের এক পোষ্টকার্ড অনেকদিন হইল পাইয়াছিলাম, তাহার উত্তর দেওয়া হয় নাই। তাহাকে আমার ভালবাসাদি জানাইবে। এত হাঙ্গাম হুজ্জুত করিয়াছ কেন। ভগবানকে ডাকিবে তুমি জানিবে ও তিনি জানিবেন। ভুল হইলে তিনি সোধ্‌রাইয়া দিবেন। তিনি সর্ব্বান্তরযামী, চাই কেবল আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতা। ঠাকুরের সেই জগন্নাথদর্শনে যাইবার যাত্রীর কথা মনে রাখিবে। যাত্রী পথ জানিত না কিন্তু হৃদয়ে ঠিক ২ ভাব থাকায় কোনরূপে জগন্নাথ মন্দিরে পৌছিয়াছিল। তুমি ত শ্রীশ্রীমার কৃপা পাইয়াছ, সুতরাং তোমার ভাবনা কি। তুমি যেরূপ ধ্যান কর লিখিয়াছ তাহা ত অতি সুন্দর। গুরু ও ইষ্টে এক করিতে পারিলে কার্যসিদ্ধি। উতলা হইলে চলিবে না, দীর্ঘকাল ধরিয়া অভ্যাস করিতে হয়। সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সমান জ্ঞান করা চাই। ভজন করিয়া যাইবে, দেখিবে মন কত তাহাতে নিযুক্ত থাকিতেছে। যদি তাহা হইতে দূরে যায় আবার তাহাকে যত্ন করিয়া ফিরাইয়া আনিতে হইবে। একি ২।৪ দিনের কর্ম্ম। ইহাতেই জীবনপাত কর। আর কি করিবে, যদি তাঁহাকেই সার বলিয়া মনে করিয়া থাক, তাঁহাকে লাভ করাই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে সেই কাজেই আপনাকে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত কর। যেরূপে পার করিবে আর ত কিছু করিবার নাই, সুতরাং কেন চঞ্চল হও। তবে যদি ভিতরে অন্য বাসনা থাকে, যদি নাম, যশ, খ্যাতি ইত্যাদির অভিলাষ থাকে তবেই তাড়াতাড়ি ভগবান লাভ করিয়া ঐ সকল অর্জন করিবার ইচ্ছায় চঞ্চল হইতে হয়। কিন্তু তাহাও হইবার নহে বরং আগে নাম, যশ প্রভৃতি অর্জ্জন করিয়া আইস, পরে ভগবান লাভের যত্ন করিও। আবার ঠাকুরের কথা স্মরণ করাইতেছি

—"সুতোর মধ্যে একটু ফেসো থাকিলেও সুঁচের মধ্যে প্রবেশ করিবে না। সুঁচের মধ্যে সুতা প্রবেশ করাইতে হইলে সকল ফেসো দূর করিয়া তাহাকে একাগ্র করিতে হইবে, তবেই উহা সুঁচের মধ্যে প্রবেশ করিবে।" অন্য সকল ইচ্ছা ছাড়িয়া এক ইচ্ছা লইয়া ভগবানের ভজন করিতে হয়। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন, বহুশাখা (হি) অনন্তাশ্চ বুদ্ধয়ো অব্যসায়িনাম্। ইহা হইতেই সকল মর্ম্ম বুঝিয়া লইবে। ভজন করিয়া যাও তাহাতেই কাজ হইবে। তুলিসদাস বলিতেছেন বীজ উল্টা বা সোজা করিয়া যেমনভাবেই মাটিতে নিক্ষেপ কর না কেন, অঙ্কুর উর্দ্ধেই উঠিবে। সেইরূপ হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে ভজন করিতে পারিলে, ভ্রমের জন্ম আসিয়া যায় না তাহাতে ভুলচুক থাকিলেও সুফল আনিবে। হৃদয়ে ভক্তি থাকিলে তিনি ভুলচুক দেখেন না, ভাবই গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন। মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে দ্বয়োঃ এব সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন। অতএব ভাবিও না ধ্যান ঠিক হইতেছে কিনা (।) আগে গুরুর ধ্যান করিতে হইবে, ইষ্টের কি রকম ধ্যান করিতে হইবে কিছুই ঠিকানা নাই। যেমন তেমন সহিত ভক্তির সহিত ভজন করিয়া যাও দেখিবে তিনিই সব ঠিক করিয়া দেন। দুইপ্রকার ভজন আছে—বৈধী ও রাগানুরাগ। যাহাদের হৃদয়ে ফলকামনা আছে তাহারাই বৈধী ভজন (ভজনে) আগ্রহ প্রকাশ করে, কিন্তু যাহাদের ভগবানের ভক্তি লাভই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য তাহারা বিধিকিঙ্কর হইতে ইচ্ছা করে না। তাহারা প্রাণের টানে তাহার প্রতি যাহাতে ভালবাসা হয় তাহারই চেষ্টা করে। ঠাকুর বলিতেন গরুর জাব পচা পাচপো যেমনই হউক না কেন ফলের ছড়া থাকিলে গাভি তাহা সকলই খাইয়া ফেলে সেইরূপ উপাসনায় দোষাদি থাকিলেও যদি উহা আন্তরিক হয়, তাহা হইলে ভগবান সেই উপাসনা অঙ্গীকার করেন। অধিক আর কি লিখিব। আজ এই পর্যন্ত। আমার শরীর ভাল নাই। খুব অসুখ যাইতেছে, বিশেষ বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। প্রভু যেমন রাখেন তাহাই ভাল। সকলকে আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা দিবে ও তুমি জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীতুরীয়ানন্দ

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
সারগাছি পোঃ মহুলা
মুর্শিদাবাদ—২১ ভাদ্র ১৩৪১
ইং 3-9-34

পরমস্নেহাশীর্ব্বাদমস্তু,

বিশেষঃ পরে সমাচার এই যে অনেকদিন পরে তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমি এখানে আসিয়া অপেক্ষাকৃত ভাল আছি বটে কিন্তু এযাবৎ অসুস্থ ও ডাক্তারদের চিকিৎসাধীনে রহিয়াছি। আমি এখন এখানেই আছি। মঠে কবে যাইব স্থির নাই। সেসব

ঠাকুর জানেন। তোমাদের আবার ভাবনা কি? তোমরা চিরকাল প্রভুর শরণাগত আছ। আমি আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করি শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে তোমার ভক্তি লাভ হউক। আশ্রমের ভূপতিবাবু প্রভৃতি সকল ভক্তগণকে আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ দিবে। তুমি পুনরায় আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। নিজেকে কখনও ভুলেও অপদার্থ মনে করিবে না। ঠাকুরের কত কৃপা তোমাদের উপর। মাঝে ২ তোমার কুশল সংবাদ দিও। তোমার শরীর বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে ত? এই বর্ষায় তোমার এত অসুস্থতার কারণ কি? আজকাল কেমন আছ লিখিও। কোন ঔষধপত্র সেবন করিয়াছ কি? ইতি—

নিয়ত শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীঅখণ্ডানন্দ

সুবোধানন্দ-স্মৃতি সংগ্রহ

শ্রীজগন্নাথ বসুরায়*

১৯২৯ : ২৭ ডিসেম্বর

আজ বেলা দশটার পর উদ্বোধন-এ গিয়াছিলাম। সেখানে পৌঁছিয়া পূজ্যপাদ খোকা মহারাজের [স্বামী সুবোধানন্দজীর] দর্শনলাভার্থ উপরে যাই। শুনিলাম, তিনি স্নান করিবেন।

শ্রীশ্রীমার পূজার ঘরে ঠাকুর দর্শন করিলাম। ঠাকুর প্রণাম করিয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজের ঘর দেখিতে গেলাম। খানিক পরে দেখি, খোকা মহারাজ ঠাকুর ঘরে আসিতেছেন। ঘরে প্রবেশ করিবার আগে সূর্যদেবের দিকে চাহিয়া প্রণাম করিলেন, অতঃপর ঘরে ঢুকিলেন। ঠাকুর ঘরে প্রণাম করিয়া তিনি আহার করিতে গেলেন। আমি নিচে গিয়া অপেক্ষা করিতে থাকিলাম।

কিছুক্ষণ পরে জনৈক সন্ন্যাসী মহারাজ আমাকে ডাকিলেন। উপরে গিয়া দেখিলাম, তিনি [স্বামী সুবোধানন্দজী] বসিয়া আছেন। আমি প্রণাম করিলে তিনি বলিলেন, 'কাল তোমাকে মঠে দেখেছি না?' উত্তরে জানাইলাম, মহাপুরুষজী মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে আগের দিন মঠে গিয়াছিলাম; সেখানে তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়াছিলাম।

মহারাজ বলিলেন: 'আমার শরীর অসুস্থ, তাই তাড়াতাড়ি খেয়ে নিই।' আমাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছে, তাই বুঝি এই কথা জানাইলেন। আমার পরিচয়াদি লইবার পর মহারাজ নিজের শরীরের অসুস্থতা প্রসঙ্গে বলিলেন যে, শরীর এতদূর অসুস্থ হইয়াছিল যে ডাক্তাররা আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পরে বলিলেন, 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে—মারে কৃষ্ণ রাখে কে? জামতাড়ায় ছিলাম তখন, মনে হল অগঙ্গার দেশে মরব! অসুখের সময়ে শরীর

* শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য শ্রীজগন্নাথ বসু রায় কিছুকাল শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজীর পূত সঙ্গলাভে কৃতার্থ হন। স্বামী সুবোধানন্দজীর [পূজনীয় খোকা মহারাজের] কথাবার্তা ও উপদেশ তিনি তাঁর ডায়ারিতে লিখে রাখতেন। ১৯২৯ ডিসেম্বর থেকে ১৯৩০ ডিসেম্বর এই সময়ের মধ্যে তিনি পূজনীয় মহারাজজীর যে-স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন সেই বিবরণ এখানে প্রাপ্ত তারিখ এবং প্রসঙ্গ অনুসারে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শ্রীযুক্ত বসু রায়কে লেখা পূঃ শিবানন্দজী মহারাজের দুখানি মূল্যবান পত্র ইতিপূর্বে উদ্বোধন পত্রিকায় [১৩৯১ ভাদ্র সংখ্যায়] প্রকাশিত হয়।

নড়াতে পারতাম না। যাঁর শক্তি তিনি টেনে নিয়েছিলেন। কৃষ্ণের দেহত্যাগের পূর্বে অর্জুনের শক্তি চলে যাওয়াতে তিনি গাণ্ডীব তুলতেও পারতেন না—সব শক্তি তো তাঁর! যার মনে অভিমান হয়, আমি সাধু—সংসারী হতে ভাল, সে কি আর সাধু? ঠাকুরই সব করাচ্ছেন। আমি বড়, আমি এই করছি—এসব অভিমান যেন না হয়! সংসার এল কোথা থেকে? সেও তাঁর।

'যখন প্রথম ঠাকুরের কাছে যাই, তিনি বললেন, "তুই যে আসবি তা আমি জানি।" কবে জেনেছিলেন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন, "সে তোর জন্মের আগে।" তারপর আমার হাত নিয়ে হাতে রেখে ভার পরীক্ষা করলেন। বললেন, "শনিবার কিংবা মঙ্গলবার আসিস; তোকে সব শিখিয়ে দেব।" আমি বললাম, "যা দেবেন, এখনই দিন না!" তিনি বললেন, "তা কি হয়? যখন কথা দিয়েছি, তার নড়চড় হবে না। আর একদিন আসিস।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আগে আমাকে ডাকেননি কেন?" ঠাকুর বললেন, "যখন সময় হয় তখনই সব হয়।"

'ঠাকুরের গঙ্গার উপর বিশেষ ভক্তি ছিল। বলতেন, "গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি।" কেউ শোক, তাপ বা মোহে অভিভূত হলে বলতেন, "যা, একটু গঙ্গাজল খেয়ে নে, সব ভাল হয়ে যাবে।" ভাল হয়েও যেত।

'ঠাকুরের এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছি। একঘর লোক—তিনি এককথায় সকলের মনের কথার [জিজ্ঞাসার] উত্তর দিয়ে দিচ্ছেন। আবার একেবারে বালকের ভাব। একদিন আমি বললাম [ঠাকুরের গলরোগের সময়ে], "আপনি চা খান, তাতে আপনার উপকার হবে।" তিনি শুনে খুশী হলেন। তারপর রাখাল মহারাজকে দেখে তাঁকে এ-বিষয়ে বললেন। মহারাজ বললেন, "চায়ের গরম আপনার সহ্য হবে কি?" তাঁর সন্দেহ দেখে ঠাকুর অমনি তাতেও আবার সায় দিলেন।

'কেশববাবু [কেশবচন্দ্র সেন] একদিন তাঁর নিজের বাড়িতে ঠাকুরকে পেয়ে তাঁর চরণে সচন্দন-পুষ্প দেন ও তাঁকে বলেন, "একথা আপনি কাউকে যেন বলবেন না। লোকে তাহলে বলবে, আমি নরপূজা করেছি।" ঠাকুরের বালকের স্বভাব—বিজয়কে [বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-কে] এবং অন্য একজনকে [খাজাঞ্চিকে] বলে দেন, "কেশব আমার পায়ে ফুল দিয়েছে আর সেকথা কাউকে বলতে বারণ করেছে—তুমি যেন বোলো না।"

'বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুরের কাছে কতবার এসেছেন। পরে বিজয়কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, আমি তখন তাঁর কাছে চা খেতে যেতাম। সেই সময়ে একদিন ঠাকুরের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, "অমনটি আর দেখি নাই। তবে যার যা মনের ভাব মনেই রাখা উচিত।"

'দেবদেবী সম্বন্ধে ঠাকুরকে একদিন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন দেবদেবী সব আছেন, তাঁদের দেখতে পাওয়া যায়।'

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের অবতারত্ব প্রসঙ্গে কি বলিতেন এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে মহারাজ বলিলেন, 'তিনি ভাবস্থ অবস্থায় ঐ কথা বলতেন। অন্য সময়ে আবার নিজেকে দাসও বলতেন। আমাকে একদিন বলেছিলেন, "এই শরীরটা তো হাড়মাসের খাঁচা। এর ভেতর যা খেলে বেড়াচ্ছেন।...যে রাম যে কৃষ্ণ সেই এই দেহের ভেতর রয়েছেন।" একদিন নিজের সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "হ্যাঁ রে, তোর কি মনে হয়?" আমি তখন বললাম, "দেখি কিছু দিন, তবে তো বলব!" নিরভিমান ঠাকুর শুনে বলেন, "হ্যাঁ, একটা টাকা লোকে বাজিয়ে

দেখে, নেয়। ভাল করে দেখে, পরীক্ষা করে নিবি

সংসারে মন নানা কারণে বিক্ষিপ্ত হয়। এই কথা মহারাজকে জানাইয়া তাঁহার আশীর্বাদ ভিক্ষা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'ঠাকুরই মহাপুরুষ মহারাজের ভেতর দিয়ে তোমাকে আশীর্বাদ করছেন।'

১৯৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর

এই সময়ের মধ্যে স্বামী সুবোধানন্দজীকে কয়েকবার বেলুড় মঠে দর্শন করি। সেই সময়ে তাঁহার পবিত্র সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হয়। বিভিন্ন প্রসঙ্গে তখন যাহা তিনি বলেন, এখানে তাহা লিপিবদ্ধ হইল।

স্বামী সুবোধানন্দজী বলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণ অত্যন্ত কোমল ছিল, তাই জুতা ব্যবহার করিতে হইত। তাঁহার স্বর্ণ ইষ্টকবচ প্রসঙ্গে মহারাজ বলেন, প্রথম বয়সে ঐ কবচ তিনি ধারণ করিতেন। পরবর্তী কালে পৈতা পর্যন্ত দেহে ছিল না। তখন ধাতুদ্রব্য তিনি স্পর্শ করিতে পারিতেন না। তাঁহার জন্য গাড়ু অপরে লইয়া যাইত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শেষ অসুখ প্রসঙ্গে মহারাজ বলেন, 'তখন তাঁর কথা কইতে কষ্ট হত। একদিন আমি ঠাকুরকে বলেছিলাম, "আপনি ইচ্ছা করলেই ভাল হতে পারেন। আপনি ভাল হোন।" ঠাকুর একথা শুনে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই সত্যি তা বিশ্বাস করিস?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, বিশ্বাস করি।" তখন ঠাকুর বললেন, "আমার গায়ে হাত দিয়ে বল্।" আমি তাঁর গা ছুঁয়ে বললাম। ঠাকুরের বালক-স্বভাব, তাই আবার তিনি বললেন, "মাইরি বল্ দেখিনি!" "মাইরি" বললাম। এবার ঠাকুর বললেন, "যা বলছিস তা সত্য ; কিন্তু হাড়মাস পুঁজরক্তে তৈরি যে দেহ তাকে রাখবার চেষ্টা করব না। যা সৃষ্টি হয় তা লয় হয়।" তারপর তিনি আমাকে বললেন, "প্রতিজ্ঞা কর, আর কখনো এরকম অনুরোধ করবি নে।" আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন।'

একদিন মহারাজ [স্বামী সুবোধানন্দ] শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী, মহাপুরুষ মহারাজ এবং বিজ্ঞান মহারাজ প্রসঙ্গে নানা কথা বলেন। তাঁর নিজের সম্বন্ধেও বলেন। তিনি বলেন কিভাবে ঠাকুর ৺ভবতারিণীর সহিত কথা কহিতেন, কিভাবে তাঁহার নিকট জগন্মাতা ঐ মূর্তিতে জীবন্ত হইয়া উঠিতেন। পরে মহারাজ বর্ণনা করেন কিভাবে স্বামীজী এক শিবরাত্রির দিন বেলুড় মঠে ঠাকুর-ঘরের নিচে ধ্যানমগ্ন হইয়া দুই-তিন ঘণ্টা নিস্পন্দ হইয়া ছিলেন। কিভাবে স্বামীজী কোল কুলিদের সহিত অন্তরঙ্গভাবে মিশিতেন তাহাও তিনি বর্ণনা করেন। মহাপুরুষ মহারাজ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'মহাপুরুষকে [মহাপুরুষ মহারাজকে] ঠাকুরের কাছে এক-বস্ত্রে আসতে দেখেছি। তিনি গায়ে কিছু দিতেন না। এইভাবে তিনি কঠোর সাধনা করেন।'

শ্রীশ্রীঠাকুর পূঃ খোকা মহারাজকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'তুই তো এখানকার লোক।' তাঁহার দীক্ষাপ্রসঙ্গে মহারাজ বলেন, ঠাকুর তাঁহার জিভে যখন মন্ত্র লিখিয়া দেন তখন তিনি অবর্ণনীয় আনন্দে অচেতন মতো হইয়া পড়েন। ঠাকুর আবার তাঁহার মাথায় হাত দিয়া বলেন, 'মা, নেমে যাও, নেমে যাও!'—ইহাতে তিনি প্রকৃতিস্থ হন।

মহারাজ বলিলেন, ঠনঠনে কালীবাড়ি যাঁহাদের, সেই বংশের ছেলে তিনি। তিনি বাল্যকালের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলেন। ছেলেবয়সে তিনি ও তাঁহার ভাইবোনেরা এক-সঙ্গে ঢালা বিছানায় শয়ন করিতেন। নিজেদের

মধ্যে একদিন গণ্ডগোল হইলে তাঁহার গর্ভধারিণী মা একটি কম্বল মুড়ি দিয়া, হাত তুলিয়া ভয় দেখাইতে আসিয়াছিলেন। ভয় পাইয়া সকলে চিৎকার করিয়া উঠিলে মা কম্বল ফেলিয়া দেন এবং বলিয়া ওঠেন, 'এই যে আমি!' মহারাজ তখন জননীর দিকে তাকাইয়া বলেন, 'আর কখনও ওইভাবে এলে ভয় খাব না।' এই ঘটনার ভিতর দিয়া মহারাজ বুঝাইলেন, মহামায়াকে মা বলিয়া চিনিলে আর ভয় থাকে না।

পরিব্রাজক জীবনে মহারাজ কলিকাতা হইতে বিন্ধ্যাচল পদব্রজে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে রাত্রে কাহারও গৃহে থাকিতেন না। বটগাছের নিচে শয়ন করিতেন। মহারাজ বলিলেন, সাধুদের সম্পর্কে বাঙালীদের বড় কৌতূহল। তাহারা নানা প্রশ্ন করিত, চৌদ্দ পুরুষের খবরে তাহাদের প্রয়োজন। হিন্দুস্থানীরা বা অন্য সাধুরা তাহা করিত না। পূঃ খোকা মহারাজের সেবক যিনি, তিনি একদিন বলেন যে, এখনও শুইবার সময়ে বালিশের নিচে হাত না রাখিলে মহারাজের ঘুম হয় না। এই বিষয়ে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, পরিব্রাজক অবস্থায় কত সময়ে মাঠে বা গাছতলায় শুধু মাটির উপর অথবা ঘাসের উপর মাথার নিচে হাত রাখিয়া রাত্রি কাটাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি একরাত্রির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। ঘটনাস্থল বিহার অথবা উত্তর প্রদেশের কোনও অঞ্চল। তিনি বলেন, 'পথে রাত হয়ে যেতে এক বটগাছের তলায় শুয়েছি। কিছুক্ষণ পরে স্বপ্নে দেখি, এক বুড়ি আমাকে বলছেন, "তুই ওঠ্ এখান থেকে। তোর জন্যে সাপেরা গর্ত থেকে বেরুতে পারছে না। তুই একটু সামনে এগিয়ে যা, একটা পুলিসের থানা পাবি, সেইখানে শুগে যা।" [স্বপ্নেই] তাঁকে বললাম, "তারা আমাকে থাকতে দেবে কেন?" বুড়ি বললেন, "তা দেবে। তুই ওখানে গিয়ে দরজায় ঘা দিবি, তারা জিজ্ঞাসা করবে, 'কওন্ হ্যায়?'—তুই বলবি, 'মুসাফির'; তারপর তোকে থাকতে দেবে।" ঘুম ভেঙে গেল। বুড়ির কথামতো থানায় গিয়ে আশ্রয় পেলাম। সেই রাতটা থানার বারান্দায় শুয়ে কাটালাম। পরের দিন সকালে গাছতলায় গিয়ে দেখলাম, সেখানে অনেক গর্ত রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম জায়গাটা গোখরো সাপের আস্তানা।' মহারাজকে সেদিন শ্রোতাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করেন, 'মহারাজ, বুড়ি কে?' কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মহারাজ উত্তর দিলেন, 'আদ্দিকালের বদ্যিবুড়ি।'

পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি কোন-কোন অঞ্চলের মধ্য দিয়া গিয়াছেন যেখানে বাঘের ভয় ছিল। সেখানেও তিনি রাত্রে বাহিরে শয়ন করিতেন।—সর্বত্যাগীকে এইরূপ অভীঃ হইতে হয়।

মহারাজ একদিন বলেন, 'সংসারে যারা আছে তাদের অর্থের প্রয়োজন আছে, নানা কর্তব্য আছে। অনেককে তাদের প্রাপ্য দিতে হয় নচেৎ অসুবিধায় পড়তে হয়। সবাইকে থামিয়ে থুমিয়ে রাখলে তবে স্থির হয়ে ভগবানের চিন্তা করা যেতে পারে। আগে শব-সাধনা হত; সাধক সঙ্গে ছোলা-ভিজানো, মদ এইসব রাখত। শব যখন সাধককে ফেলে দিতে চেষ্টা করত তখন ঐ ছোলা ও মদ শবের মুখে দিলে শব চুপ করে থাকত।

'সব শক্তি তাঁর। নামজপের ফল হবেই। যেমন বীজ জমিতে পড়লে—সোজাভাবেই পড়ুক বা উল্টোভাবেই পড়ুক—অঙ্কুর হবেই। সবই তিনি—যিনি অশান্তি দেন, তিনিই শান্তি দেন। নাম করতে করতে সব বাধা কেটে যায়।

'ধ্যান আর কিছুই না, ধ্যান তাঁর চিন্তা করা—নিবিষ্ট মনে তাঁর চিন্তা করা।'

আর একদিন মহারাজ বলেন, 'তাঁর নিকট খুব ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা করবে—যেমন ছেলে মার কাছে কেঁদে কেঁদে আবদার করে। প্রাণের সহিত ডাক। তিনিই সব ঠিক করে দেবেন।'

প্রশ্ন করিলাম, 'যদি প্রার্থনা সকাম হয়?'

তিনি বলিলেন, 'তাতে দোষ কি? যার জন্ম ডাকছ তার ভিতরও তিনি—সেই আত্মা। সেই আত্মার সেবার জন্ম ডাকবে। মনে করবে, তোমরা দাসদাসী, বড় মানুষের বাড়িতে আছ। ছেলেমেয়েদের ভার তোমাদের উপর—তাদের সেবা করবে, যত্ন করবে, দেখবে। দাসদাসীরও [গৃহকর্তার] ছেলেদের উপর টান হয়, অসুখ হলে বা কিছু হলে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ঠিক জানে যে তারা তাদের আপনার নয়।

'ধ্যানজপ, পূজা করবে। নামের শক্তি অশেষ। তোমাকে তুলসীদাসের দোঁহার কথা বলেছি: বীজ সোজাভাবেই ফেল বা বাঁকাভাবেই ফেল, অঙ্কুর উঠবে ঠিক সোজাভাবে। যখন তাঁর দিকে মন যাবে তখন কোনও কামনা-বাসনা থাকে না। তিনি যে-রূপে দেখা দেন না কেন, সেই রূপকে আঁকড়ে ধরবে। যে-রূপ তোমার ভাল লাগে সেই রূপটি ধরবে। জপের সময় ভাববে, তিনিই আমার হৃদয়ে রয়েছেন। যখন কোন কাজ থাকবে না, অর্থাৎ মন যখন শূন্য (ভেক্যাণ্ট), তখন মনে মনে নাম জপ করবে। সর্বদা নামজপ করতে করতে, তাঁর চিন্তা করতে করতে স্বপ্নেও তাঁকে দেখতে পাবে।'

'গুরু মেহেরবান্ তো চেলা প্যাহলবান্।

'মহামায়া সব মায়ার পিছনে—তাঁকে জানলে মায়ায় বদ্ধ হতে হয় না।'

শ্রীরামকৃষ্ণঃ এক নতুন ধর্মের প্রবক্তা

স্বামী আত্মস্থানন্দ

[ভাদ্র, ১৩৯৩ সংখ্যার পর]

এই হল ধর্মের নমুনা। ভাগবতকার যা বলেছেন, উপনিষদ্‌কার সূত্রাকারে যা গেঁথে দিয়েছেন, চৈতন্যচরিতামৃতে আমরা তাই পাচ্ছি। বড় চমৎকার করে চৈতন্যচরিতামৃতকার বলেছেন, 'কৃষ্ণ ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে'। এ যেন **'divinity manifest'** হয়ে যাচ্ছে, মানুষ ভগবান হয়ে যাচ্ছে। মোটামুটি সনাতন ধর্ম, ভারত ধর্ম বলতে আমরা এই বুঝি। অন্যান্য সমস্ত ধর্ম—খ্রীষ্ট ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, আরও যত ধর্ম আছে, সেগুলি যদি আমরা খুব বিশ্লেষণ করে মূলতত্ত্বটি দেখি, তাহলে দেখব এসব কথারই অনেক প্রতিধ্বনি সে-সব ধর্মেও রয়েছে। আমাদের দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে একটা ঝড় বয়ে গেছে, সে ঝড় এখনও থামেনি। সেই সময়ে ভারতীয় সভ্যতায় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব পড়েছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতায় যে দর্শন নেই তা নয়। তাঁদের দর্শন আছে, তাঁদেরও ধর্মতত্ত্ব আছে, তাঁরাও ধর্ম মানেন। কিন্তু এত সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই, সে দেশে যাঁরা এসব বিষয়ে মনীষার পরিচয় দিয়েছেন, সে-সব তাত্ত্বিক দার্শনিকেরা ধর্ম সম্বন্ধে যা বলেছেন, তার সঙ্গে আমাদের যে অনুভূতি, যে শ্রদ্ধা, যে বিশ্বাস, তা মেলে না।

আধুনিক চিন্তাবিদ্‌রা বিষয়টিকে জটিল করে তুলেছেন। William James বলেছেন, "একা একা নিরিবিলিতে যে অভিজ্ঞতা হবে তাই

ধর্মের রূপ।"[৫] ফ্রয়েড বলেছেন, "ঈশ্বর হলেন প্রকৃত পক্ষে পিতা যিনি জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকে ছোট্ট শিশুরূপে প্রকাশিত হতে চান।"

E. B. Talyor—তিনি খুব সোজা কথা বলেছেন, "ধর্ম হল আধ্যাত্মিক প্রাণীসমূহে বিশ্বাস।"[৫(ক)] এখন বুঝে নিতে হবে "Spiritual being" কাকে বলে। Mathew Arnold বলেছেন, "ধর্ম হল আবেগমিশ্রিত নৈতিকতা।"[৫(খ)] অর্থাৎ নীতি আর তার সঙ্গে খানিকটা ভাব, আবেগ ইত্যাদি থাকবে। J. E. Mc Taggart বলেছেন, "ধর্ম হল একটি আবেগ যা নির্ভর করে আমাদের ও বিপুল বিশ্বের মধ্যে সঙ্গতির দৃঢ় প্রত্যয়ের উপর।"[৫(গ)] ইনি বোধহয় আর একটু কিছু আভাস পেয়েছেন। ব্যক্তি এবং সমষ্টি-এর একটা সম্পর্কের কিছু একটা হাতছানি পেয়ে তিনি এক রকম বলছেন। Max Muller বলছেন, "একটা মানসিক শক্তি বা প্রবণতা, যার সাহায্যে মানুষ অনন্তকে বুঝতে সক্ষম হয়।"[৬] আমাদের কিন্তু 'যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে মনসা ইন্দ্রিয়াণিসহ' মনে রাখতে হবে। Manzizs বলছেন, "আধ্যাত্মিক পুরুষের উপাসনা সৃষ্টি হয় একটা প্রয়োজন-বোধে।" এটা যেন বড্ড আমাদের কাছে কেমন লাগছে। এই যে ভূত-প্রেতে-অসহায় মানুষ খুঁজতে গেছে, সেই যে একটা প্রয়োজন তারই জন্য। একদিক দিয়ে ঠিক। এখানে হাতড়ে হাতড়ে মানুষ দেখল কিছু নেই, সবই ফাঁকা, ভুয়ো। সুতরাং অসহায় হয়ে খুঁজতে যাচ্ছে, সেদিক দিয়ে ঠিক।

আশ্চর্য, ধর্মের এত রকম সংজ্ঞা দেওয়া সত্ত্বেও এই ধর্ম প্রথম ভারতেই চরিতার্থতা লাভ করেছিল। মানুষের হৃদয়াসনে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য পূজিত হয়েছেন। শংকর, রামানুজ, বল্লভ, নানক, স্বামী নারায়ণ, কত সাধু, সন্ত, কত ঋষি, কত মুনি, কত যোগী এসেছেন। স্ত্রী-পুরুষ সবার মধ্যে, সর্ব মানুষের মধ্যে আমরা কতরকম ভাবে যে দেবতার স্পর্শ পেয়েছি, দেবত্বের পরিচয় পেয়েছি। আবার তা সত্ত্বেও আমাদের বিভ্রান্তিও ঘোচেনি।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর মাঝখানে আমাদের দেশে একটা ঝড় এসেছিল। যান্ত্রিক সভ্যতা খুব এগিয়েছিল। বিজ্ঞানের প্রচণ্ড অগ্রগতি হয়েছিল। তখন আমরা ভারতবাসীরা ছিলাম পরাধীন। আমাদের শাসক ছিল ব্রিটিশ। ব্রিটিশের যে 'রাজনৈতিক বিজয়', সে বিজয় খুব একটা বড় জিনিস নয়। রাজনীতি দিয়ে ব্রিটিশ যা অধিকার করেছিল তা—আমাদের ভূমি ও অর্থ-সম্পদ। কিন্তু তার আবেষ্টন ছিল এত সামান্য যে, তা দিয়ে মানুষকে জয় করা যায় না। তাই তারা বুঝেছিল যে, মানুষের উপর যদি আধিপত্য স্থাপন করতে হয়, মানুষকে যদি জয় করতে হয়, তাহলে তার সংস্কৃতিকে জয় করতে হবে, তার সংস্কারকে বদলে দিতে হবে, তার মনকে জয় করতে হবে, তার হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পরিবর্তিত করে শাসকের অভিমুখী করতে হবে, তবেই সেটা সম্ভব হবে।

ব্যবসায়িক জাত ব্রিটিশ, জানত ভারতের মেরুদণ্ড ধর্ম। আর এটাও তারা বুঝতে পেরেছিল যে ভারতবাসীর উপর যদি আধিপত্য বজায় রাখতে হয়, তাহলে এদের সমাজের যে মেরুদণ্ড ধর্ম, সেই ধর্মের উপর আঘাত করতে হবে এবং আঘাত করে নিজেদের খ্রীষ্টধর্মে তাদের ধর্মান্তরিত করতে হবে। ধর্মান্তরিত করলে

৫ The Varieties of Religious experience by William James (1929), P. 31

৫(ক), ৫(খ), ৫(গ) Encyclopaedia of Religion & Religions, P. 319-20

৬ Thoughts on Life and Religion—By Max Muller (1915), P. 154

এদের সংস্কার পাল্টে যাবে, এরা নিজেদের আভিজাত্য ভুলে যাবে। তারা ছিল শাসক। আমরা তাদের পদানত হবার ফলে, তারা তাদের নীতি, তাদের রীতি, তাদের গৌরব, তাদের গরিমা এবং সেই সঙ্গে তাদের যান্ত্রিক সভ্যতা, তাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এবং বৈজ্ঞানিক সভ্যতা আমাদের উপর চাপিয়ে দিল। ফলে সেই যুগে আমাদের দেশের ধর্মের আরও অধঃপতন হয়েছিল। আমরা আমাদের নিজেদের খেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমাদের সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। তখন ভারত-আত্মা নতুন করে নিজেকে প্রকাশ করতে চাইল, ফলে শুরু হল এক সংগ্রাম। আমরা জানি, এই সংগ্রামের মুখে আসছেন রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। এঁরা এসে সংগ্রাম শুরু করলেন। তার ফলে নিজেদের বাঁচবার জন্য এই দেশে এল ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনাসমাজ, দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্যসমাজ প্রভৃতি। এখানেও একটা অসংগতি ছিল। এই ব্রাহ্মসমাজ, সনাতন ধর্মকে যে উপেক্ষা করেছেন তা নয়। তার অংশবিশেষ নিয়ে নিলেন এবং তার সঙ্গে যুক্ত করলেন আধুনিকতার আবরণ। দয়ানন্দ সরস্বতী—তিনি আর একরকম কর্মকাণ্ড নিয়ে বসে থাকলেন। আর আমাদের Theosophist-রা, তাঁরা করলেন আরও বিচিত্র ব্যাপার। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেকটা 'Cocktail'-এর মতো। অনেক কিছু মিশিয়ে একটা পানীয় তৈরি হল যেন।

এইভাবে তখন ধর্মীয় সংগ্রাম চলছে ভারতে। অন্যদিকে আবার ছিল পরকীয়া বৈষ্ণবধর্ম, তন্ত্রের অধঃপতন, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম প্রভৃতি। বৈদিক-ধর্ম সে সময়ে একটা ভয়ানক পতনোন্মুখ অবস্থায় এসেছিল। আমরা সেই সময় নিজেদের হারিয়ে ফেলছিলাম, আমাদের ভিত নড়ে যাচ্ছিল। সেই সময় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঐতিহাসিক এইচ. জি. ওয়েলস তাঁর Outline of History গ্রন্থের শেষের দিকে লিখেছেন যার বাংলা তর্জমা হচ্ছে, "এই যে দুর্যোগ এসেছে (এই দুর্যোগের সময়), বর্তমানকালের এই দুর্যোগ, ঘটনার এবং আমাদের সমূহ বিভ্রান্তির ভেতর থেকে একটা বৌদ্ধিক ও নৈতিক পুনর্জাগরণ, একটা ধর্মজাগরণ আসতে পারে। যার সঙ্গে আসবে সরলতা, আসবে বিভিন্ন জাতির মানুষদের মধ্যে ঐতিহ্যের দিক থেকে আপাত বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও জগদ্ধিতায় নিবোধিত একটা সাধারণ ও সুরক্ষিত জীবনধারায় মিলিত হবার সুযোগ।" আমাদের হৃদয়াকাশ যখন একরকম মেঘাচ্ছন্ন, শ্রদ্ধা যখন আমরা প্রায় হারিয়ে ফেলেছি, তখন আমাদের দরকার ছিল মহাশক্তিধরকে, মহাঋষিকে, যাঁর জীবনকে জীবন্ত করে দেখবে সকলে;—ঠিক ঠিক ধর্ম কি, মানবধর্ম কি, সর্বজাতির সর্বকালের সর্বদেশের জন্য ধর্ম কি। এজন্যই দরকার ছিল একজন মহাশক্তিধরের; প্রয়োজন ছিল গ্রহণ-বর্জনের, কেননা মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞান কিন্তু অন্য ভাবে আমাদের এক করে এনেছে, ভৌগোলিক দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আত্মিক দূরত্ব বেড়েছে। আজ মানুষ এক হওয়ার চেষ্টা করছে। স্বামীজী যখন বলেছিলেন, 'One World'—এক বিশ্ব, এক মানুষ, এক ধর্ম, এক ঈশ্বরের কথা, তখন লোকে হেসেছিল, লোক সন্দেহ করেছিল, লোকে গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু আজ United Nations-এর কাছে দৌড়ে সকলকে যেতে হচ্ছে। যার যার অবস্থায় তাকে ধরে রাখা হচ্ছে। এই ঐক্য, এই একতা, এই যে আমরা এক, সবাই আমরা এক—এটি জানাবার জন্য প্রয়োজন একটি মহাশক্তিধরের; সেই দিব্য শক্তির আসবার প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজন মেটাবার জন্যই,

নবযুগ প্রবর্তন করার জন্য এসেছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ।

যুগের প্রয়োজনে আসতে হয়েছিল আমাদের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে। সে সময়ে আমাদের যে অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল, যে অশ্রদ্ধা দেখা দিয়েছিল, সেই যুগ-সন্দেহ দূর করতে, যুগ-প্রয়োজন মেটাতে, ঠাকুর এলেন আমাদের কাছে। মত ও পথের দ্বন্দ্বে, এবং বাহ্যিক আচার-আচরণের ফলে ধর্মের যে গ্লানি উপস্থিত হয়েছিল, সেটি মেটাতে এলেন ঠাকুর। কাজেই, তাঁকে যুগের মতো করে ধর্মকে নূতন রূপ দিতে হল, অবশ্য সনাতন আদর্শকে রক্ষা করে। সনাতনের তত্ত্ব দুটি। প্রথমতঃ—'অহং ব্রহ্মাস্মি' —আমিই ব্রহ্ম। দ্বিতীয়তঃ সর্ব্ব জীবে 'ঈশাবাস্য-মিদং'—অর্থাৎ তিনিই সর্বত্র ওতপ্রোত রয়েছেন, তিনিই সব হয়েছেন। এ বিজ্ঞানীর কথা, কথামৃতের কথা। এইটি মূল সত্য। পূর্বে ধর্ম-প্রসঙ্গে মানবধর্ম, স্বধর্মের কথা উল্লেখিত হয়েছে। 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ' এই কথাটা ঠিক। মানুষের যে আসল ধর্ম, সেই ধর্মকে আশ্রয় করে থাকতে হবে। যুগ পাল্টে যায়, মানুষের ভাষা পাল্টে যায়, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি সব পরিবর্তিত হয়। আর সেজন্য সেই ভাব, সেই ভাষা, সেই পথেরও কিছু পরিবর্তন ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই এসেছিলেন যুগ-প্রয়োজনে, এই যুগের মানুষের জন্য। মানুষ বদলে গেছে, তার চিন্তাধারাও আজ বদলে গেছে। তাই ঠাকুর এসেছিলেন ধর্মকে এই যুগের উপযোগী করে তাকে দেখিয়ে দেবার জন্য। এ-যুগের মতো করে তিনি যে পথ দেখালেন—সে পথ নূতন, সে মতও নূতন। সে-হিসাবে যদি বলা হয় শ্রীরামকৃষ্ণ একটি নূতন ধর্মের প্রবক্তা। তখনই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগবে—তাহলে ঠাকুর কোন নূতন ধর্মের প্রবক্তা? তিনি আর একটা নূতন সম্প্রদায় করে গেছেন নাকি?

এই প্রসঙ্গে বলব, সমস্ত অবতার পুরুষরা বা আচার্যরা ধর্মকে স্থান, কাল ও প্রথানুযায়ী প্রচার বা প্রবর্তন করেন। এমনভাবে করেন যাতে মানব-সমাজ স্বধর্মচ্যুত না হয়। এর ফলে বিভিন্নভাবে বা রূপে ধর্মের অভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রীষ্ট, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সকল ধর্মের সম্বন্ধে একথা বলা যায়। আমরা শ্রীরাম-কৃষ্ণের জীবনে পরিলক্ষিত সাধনা ও সিদ্ধির কথা জানি এবং এও জানি যে, তাঁর প্রচারিত যে ধর্ম তার বৈশিষ্ট্য হল তা প্রাচীন হয়েও নতুন, আবার সনাতন হয়েও তাতে আধুনিকের সমন্বয় ঘটেছে। শুধু তাই নয়, তা হয়েছে আগামীকালের আশ্বাস বা আশ্রয়স্থল।

ঠাকুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা যা আয়ত্ত করেছেন, সাধনার মধ্য দিয়ে যা অনুভব করেছেন —তাই প্রকাশ করেছেন। এই যে বিজ্ঞান—পরিশীলিত মন নিয়ে তাঁর সব কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নানা ধরনের সাধনার মধ্য দিয়ে একই লক্ষ্যে পৌঁছুবার অনুভূতি—এরই সূত্রে রচনা হয়েছে নূতন ধর্মের। ধর্ম সম্পর্কে ঠাকুরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সাধন, অনুভূতি প্রভৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন সুধীজন যেসব মন্তব্য করেছেন তা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

ব্রাহ্ম নেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, "তাঁর ধর্ম কি? হিন্দুধর্ম, কিন্তু একটু অন্য রকমের, রামকৃষ্ণ পরমহংস হিন্দুধর্মের কোন দেবতা-বিশেষের উপাসক নন; শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক—এর কোনটাই তিনি নন—তথাপি তিনি এ সবগুলিরই উপাসক।"[৭] তিনি শৈব,

৭ সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, (১ম সং ১৩৭৫), পৃঃ ১১৮-১৯

শাক্ত, বৈষ্ণব—সবই। তিনি হিন্দু কিন্তু একটু অন্যরকমের। এটাই নূতনত্ব। আমরা তাঁর মধ্যে দেখব, তিনি মূর্তির উপাসক। তথাপি সেই অসীম নিরাকার ঈশ্বর—যাঁকে তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ নামে অভিহিত করতেন—তাঁর উপাসনার অতি বিশ্বস্ত মাধ্যম। তিনি মা কালীর পূজা করেছেন, মূর্তি পূজা করেছেন। কিন্তু আমরা এও জানি তিনি তোতাপুরীর কাছে চূড়ান্ত যে সাধনা ও সিদ্ধি, তা কেমন করে লাভ করেছিলেন। "তাঁর ধর্ম সাধারণ হিন্দু সাধু-সন্তের মতো নয়, মতবাদের পরিপক্কতা বা যুক্তি-তর্কের কুশলতাও নয়। কিংবা ফুল-চন্দন ধূপ-ধুনা ও ফল-মূলাদির সাহায্যে বাহ্যপূজাও নয়।" প্রতাপবাবু বলেছেন যে, এই যে আমরা পুজো বলতে যা বুঝি—এই পুষ্প, চন্দন, ধূপ ইত্যাদি, এ নয়। তবে কি? "তাঁর ধর্ম বলতে বুঝায় অনুভূতি।"

'Ecstasy' মানে অনুভূতি, সমাধি। অতীন্দ্রিয় লোকের যে অনুভূতি, অতীন্দ্রিয়কে ধরে ফেলা। তাই বারবার স্বামীজীর বক্তৃতায় শুনি, তিনি বলেছেন, "ঈশ্বরকে অনুভব করতে হবে। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য করতে হবে।" একথা, আর কোথাও আছে কিনা জানি না। যাকে ইন্দ্রিয়াতীত বলা হয় তাঁকে আমার পেতে হবে এই সবের ভিতরে।

প্রতাপ মজুমদার শ্রীরামকৃষ্ণকে হিন্দু বলে একটা ড্যাস দিয়ে বলেছেন, "কিন্তু এ এক ধরণের অদ্ভুত হিন্দু"। 'অদ্ভুত' বলতে তিনি সাধারণ হিন্দুদের চিহ্নিত করেছেন, আচারসর্বস্ব ধর্মের অনুসারী হিসেবে। আগেই উল্লেখিত হয়েছে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন মত ও পথের কথা। এই যে বিভিন্ন পথ, সেই পথগুলির বিভিন্নতা হিসেবে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন আচার্যকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়েছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা দেখতে পাচ্ছি অভিনবরূপে। ইনি নানা পথ, নানা ভাব, নানান দৃষ্টিভঙ্গি সবই গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সব গ্রহণ করেও এর মূলে যে সনাতন আদর্শ—সেইটিকে তিনি কেন্দ্র করেছেন। অন্যান্য ধর্মে আমরা দেখতে পাই—নিজ নিজ বাহ্যিক অনুষ্ঠান, আড়ম্বর, বিধিনিষেধ ইত্যাদিকে আশ্রয় করেই, সেই সেই ধর্মের নামকরণ হয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দেশিত ধর্মের অভিনবত্ব এই যে একে 'ইউনিভার্স্যাল' বলা যেতে পারে, অর্থাৎ এতে যা আছে তা সকলের, সর্বদেশের এবং সকল কালের পক্ষে প্রযোজ্য।

স্বামীজী তাঁর একটি পত্রে লিখেছেন, "ধর্মের জন্য উৎসাহের, উদ্যমের প্রয়োজন। আর সে সঙ্গে সম্প্রদায়, সাম্প্রদায়িকতা যাতে না বাড়ে, নানা রকম গোষ্ঠী যাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তার জন্য কি করতে হবে? আমাদের অসাম্প্রদায়িক হতে হবে।" এটা স্বামীজীর কথা। সত্যিই আমরা অসাম্প্রদায়িক। এই যে অসাম্প্রদায়িকরূপ ভাব এটাকে হয়তো পরোক্ষভাবে একটা 'সম্প্রদায়' বলা যায়। অবশ্য এর সঙ্গে থাকবে বিশ্বধর্মের উদারতা। এভাবকে আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে, নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়ে ধরে থাকব।

সিস্টার নিবেদিতা বলছেন, "তাঁহার উপদেশে নূতন কিছু ছিল না—এ উক্তি সম্পূর্ণ-ভাবে সত্য নয়। এ-কথা কখনও ভুলিলে চলিবে না যে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অনুভূতি যাহার অন্তর্গত, সেই অদ্বৈত দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াও স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মে এই শিক্ষা সংযুক্ত করিয়া দিলেন যে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত একই বিকাশের তিনটি অবস্থা বা ক্রমিক স্তর মাত্র, একই বিকাশের চরম লক্ষ্য

হইতেছে শেষোক্ত অদ্বৈত তত্ত্ব।"[৮]

একই বস্তুর তিনটে ধাপ, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত—এ কথা কেউ কোনদিন বলেনি। এই কথা শ্রীরামকৃষ্ণের মুখেই শোনা যায়। নিবেদিতা আরও বলেছেন, "ইহা আর একটি আরও মহৎ ও আরও সরল তত্ত্বেরই অপরিহার্য অঙ্গ। বহু এবং এক—একই সত্তা, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় মনের দ্বারা অনুভূত একই সত্তার বিভিন্ন বিকাশ অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন, 'ঈশ্বর সাকার নিরাকার দুইই, তিনি এমন এক তত্ত্ব—যাহাতে সাকার নিরাকার দুইই আছে।'"[৯] "তিনি সাকার, তিনি নিরাকার, তিনি সগুণ, তিনি নির্গুণ, তিনি আরো কত কি। তার কি ইতি করা যায় রে?"—ঠাকুরের কথা।

ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখছেন, "এ মতবাদ দ্বৈত, অদ্বৈত এবং অন্যান্য মতের সমন্বয়-সাধন করে বলে ইহা সমন্বয়ী বেদান্ত। এ মতবাদ যেমন ব্রহ্মকে সগুণ ও নির্গুণ এই উভয়রূপেই গ্রহণ করেছে, তেমনি (ব্রহ্মকে) সাকার ও নিরাকাররূপেও গ্রহণ করেছে। সে হিসাবে ইহা শঙ্কর-পরম্পরাগত অদ্বৈতবাদ থেকে ভিন্ন।"[১০] তারপর বলেছেন, স্বামীজীকে বলা হয়—'নব-বেদান্তবাদী'। "শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর মধ্যেই দেখা যায় এই নববেদান্তের অঙ্কুর, তার মূলনীতি ও বাস্তব প্রায়োগিক দিকের সূচনা। আর কর্মে পরিণত বেদান্তের ভিত্তি স্থাপন করে তাকে নববেদান্তের দর্শনে উন্নীত করেন স্বামী বিবেকানন্দ।"[১১] ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার স্বামীজীর Neo-Vedantism-এর উৎস খুঁজতে গিয়ে ঠাকুরের কাছে পৌঁছেছেন। সত্যিই তো, স্বামীজীকে ঠাকুর যা শিখিয়েছেন, যা বলেছেন, যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তাই তিনি করে গেছেন।

এখন দার্শনিকের কথায় যাই। দর্শনশাস্ত্রের পণ্ডিত ডঃ এস. সি. চ্যাটার্জি লিখছেন, "ইহা ব্রহ্মের নির্গুণ ও অসীম সত্তায় বিশ্বাসী, যা রামানুজ বিশ্বাস করেন না। ইহা শঙ্করেরই মতানুসারী অদ্বৈতবাদ, কিন্তু একটু নতুন ধরণের।" শ্রীরামকৃষ্ণ নূতন ধর্মের প্রবক্তা। কাজেই এটি একটু—নতুন ধরনের অদ্বৈতবাদ। "শঙ্কর মতানুসারী অদ্বৈতবাদের সঙ্গে কতকগুলি মৌলিক দিক ব্যতীত রামকৃষ্ণের অদ্বৈতবাদ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক দিয়ে শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে অতিক্রম করে গিয়েছে। ইহা দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, তন্ত্রোক্ত শাক্ত-অদ্বৈত এবং অন্যান্য প্রকার অদ্বৈতবাদকে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিয়েছে; শঙ্করের অদ্বৈতবাদ যা পারেনি। যদিও তত্ত্বের দিক দিয়ে এগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হয়েছে, বাস্তব প্রয়োগের দিক দিয়েও এগুলির মধ্যে আপস মীমাংসা কার্যকরী হতে পারে।"[১২] শ্রীরামকৃষ্ণের এই শিক্ষার ফলস্বরূপ একটা ঘটনা উল্লেখ করছি। শঙ্করের সঙ্গে কোথায় কি রকম তারতম্য কতটা হয়েছিল এই ঘটনায় স্পষ্ট হবে। স্বামী তুরীয়ানন্দজীর (হরি মহারাজ) শরীর যাবার পূর্ব মুহূর্তের বর্ণনা মানুষকে স্তম্ভিত করে দেয়। শরীর যাবে যাবে অবস্থা—গঙ্গাধর মহারাজ এসেছেন ঘরে। হরি মহারাজ বলছেন, 'বল ভাই, সত্যং জ্ঞানং

৮, ৯ Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. I, P. xiv, Introduction

১০ Swami Vivekananda : A Historical Review by Dr. R. C. Mazumdar, P. 107-108

১১ ঐ,

১২ Classical Indian Philosophy : Their Synthesis in the Philosophy of Sri Ramakrishna by Dr. S. C. Chatterjee (1963), P. 149-150

অনন্তং ব্রহ্ম'। গঙ্গাধর মহারাজ বলছেন 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম'। এই রকম দু'বার, তিনবার বলে শেষটায় বলছেন, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য, সব সত্য'। আমরা কি শুনে এসেছি সনাতন-রীতিতে, উপনিষদের কথায়—'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'। হরি মহারাজ কি শেখাচ্ছেন তাঁর শরীর যাবার আগে? 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য, সব সত্য। সত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। রামকৃষ্ণ আমার প্রাণ। রামকৃষ্ণ সত্য। ওঁ তৎ সৎ' বলে উনি শরীর ছাড়ছেন।[১৩] কোথায় পেলেন এটি? এই ঠাকুরের কাছে পেয়েছেন। ঠাকুরের কাছ থেকে পাচ্ছি আমরা বিজ্ঞানীর অবস্থা।

শঙ্করের সনাতন অদ্বৈত সব শেষ কথা, চূড়ান্ত কথা। কিন্তু সেই চূড়ান্ত কথার সঙ্গে কেমন তফাৎ হয়ে যাচ্ছে এ অনুভূতির। অবশ্য এই বিজ্ঞানীর কথা শাস্ত্রে বা উপনিষদে কোথাও নেই, এমনটি বলা যায় না। কারণ তৈত্তিরীয় উপনিষদে যেমন—'নেতি নেতি' করে আমরা ব্রহ্মবিদ্যালাভ বা ব্রহ্ম বস্তুতে গিয়ে পৌঁছি, সেই রকম আবার ঠাকুরই বুঝিয়েছেন যে, 'পাকা খেলোয়াড়ই ঘুঁটি কাঁচিয়ে খেলে'। তখন তার বন্ধন নেই, বাধা নেই। মনে হয়, যেখানে তৈত্তিরীয় উপনিষদে "অহমন্নাদোঽহমন্নাদোঽহমন্নাদঃ"[১৪]—ইত্যাদি মুখে গান গাওয়া হচ্ছে, সেখানে বোধ হয় বিজ্ঞানীর অবস্থার ইঙ্গিত করা হয়। যাই হোক, এটা ঠিকই যে—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য, সব সত্য, পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে খেলা, চিকে উঠে আবার পরে খেলা। এই যে অবস্থা, এর খবর অন্য কোন ধর্ম-প্রবক্তার জীবনে বা কথায় প্রকাশ হয়নি। স্বামীজী বলেছেন, "ধর্মের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথম প্রচার করেছেন—'আমার ধর্ম ও তোমার ধর্ম অথবা আমার জাতীয় ধর্ম এবং তোমার জাতীয় ধর্ম—ধর্মের এরূপ বিভিন্নতা কখনও ছিল না। ধর্মের এরূপ বিভিন্নতা কখনও থাকতে পারে না; একই সনাতন ধর্ম চিরকাল ধরে রয়েছে, চিরকাল থাকবে; আর এ ধর্মই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।'"[১৫] স্বামীজীর কথা। একই ধর্ম, একই সত্য।

মিসেস বুলকে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি চিঠিতে স্বামীজী লিখেছেন, "আমার গুরুদেব বলতেন, হিন্দু খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন নাম—মানুষে মানুষে পরস্পর ভ্রাতৃভাবের বিশেষ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আগে আমাদিগকে ঐগুলি ভেঙে ফেলার চেষ্টা করতে হবে।"[১৬] শুনেছেন কেউ কখনো একথা? এত ধর্ম-প্রবক্তাদের ইতিহাস রয়েছে, জীবনী রয়েছে যেখানে 'আমার ভগবানই একমাত্র ভগবান'—এই বিশ্বাস, যদি তুমি না কর তবে তুমি কাফের। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ নূতন ধর্মের প্রবক্তা। এ নূতন আলো। তিনি কি বলছেন? বলছেন, হিন্দু খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন নাম—মানুষে মানুষে পরস্পর ভ্রাতৃভাবের বিশেষ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

[ক্রমশঃ]

১৩ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম ভাগ (১৩৭১), পৃঃ ৫০০ এবং স্বামী আত্মস্থানন্দের ডায়েরী

১৪ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ৩।১০

১৫ Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. IV (9th Edn.) (1966), P. 180

১৬ Letters of Swami Vivekananda (1981), P. 218

'পথচলা'

শ্রীপ্রবীর মিত্র

এ চলার হয়েছিল শুরু
সেদিনের দোলের উৎসবে
প্রদোষের প্রসন্ন আকাশ
জন্মলগ্নে চেয়েছিল ক্ষণিক নীরবে।

কত 'ক্ষণ' কত 'লগ্ন' গেছে বহে
কালের রথের চাকা চলিয়াছে বেগে
নব নব জন্ম লাগি নব নব পথে
অবিরাম অফুরান অশান্ত আবেগে।

সুখ দুঃখ শ্রান্তি ক্লান্তি ঠেলে
জীবনের তরীখানি ভাসায়েছি স্রোতে
ওগো নেয়ে পথশ্রমে অহংকার গলে
শান্ত রূপ স্পষ্ট হয় অসীমের ব্রতে।
স্মৃতি আজ নীরবে গাহিতে চাহে গান
কালে কালে পথে পথে ক্ষয় সঞ্চয়ের খতিয়ান।

বালকে উৎসুক জিজ্ঞাসা ?
মাতৃক্রোড় ভরসা করে
জগতেরে ভীরু চোখে দেখা।
কিশোর জাগিল যবে
নবারুণ পাতে
স্বপ্নালু চোখের তারা ঘিরে
আনন্দ ধ্বনিল সংগীতে।
যৌবন হাসিল অট্টহাসি
আপনারে অজেয় জানি
উজানের স্রোতে ভাসি
নির্ব্বাসিল জীর্ণতার গ্লানি।
এরপর পরন্ত বিকালে
অস্তরবি গোধূলির রঙিন আমেজ
জীবনের স্তিমিত পটে তিলক পরালে
বাহির ধূসর হোল অন্তর সতেজ।

তব মহাযাত্রা পথে আঁধারে আলোতে
খোলা হোল হিসাবের খাতা
শুরু হোল পিছু ফিরে দেখা।
আনন্দের আমন্ত্রণে এ বিশ্ব সংসারে
মানবের দেহ নিয়ে যাত্রা শুরু থেকে
কত পথ চলেছি এঁকে বেঁকে।
ক্ষণে ক্ষণে ক্লান্তি শ্রান্তি ব্যাহত করেছে চলা
রাত্রির অন্ধকার বারে বারে এনেছে সংশয়
প্রভাতের রবি প্রত্যহ বহিয়াছে বাণী না বলা
তোমার নির্দ্দেশে শান্ত স্নিগ্ধবেশে
এসেছে প্রত্যয়।
আজ যবে সম্মুখেতে দেখি পরপার
দৃষ্টিতে পূর্ণতা আনে শূন্য চরাচর।
আজ যবে স্থির স্নিগ্ধ আঁখি
মধুরেরে বারে বারে কোলে নেয় ডাকি
অধরারে ঘিরে ঘিরে গান গায় পাখী।
সন্ধ্যারতির সুরে বাজে বিদায়ের বেলা
তব পথে সার্থক হোল মম পথ চলা।

রক্তজবা

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক

বৃষ্টি, বৃষ্টি আর এই বৃষ্টি—
অনর্গল বৃষ্টির জোলো হাওয়ায় দৃষ্টি
স্বচ্ছ কিম্বা অস্বচ্ছতা—
সৃষ্টির অপাপবিদ্ধ শিশু
দেখছে সমকালের আকাশ।

বিরাট বিভূতি—
কিন্তু মানবীয় ক্ষুদ্র অনুভূতি।

অখণ্ড চৈতন্য
কিন্তু খণ্ডিত চেতনা

তবু অনাদি অনন্ত কাল
খোঁজে পৃথিবীর সকাল—
সূর্যোদয়ের ভোর।
রাত্তিরের পর রক্তজবার ভোর

স্বামিজী বন্দনা

(গান—ভূপালী-কাহারবা)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

হে ঋষি—
কোন সুদূর দেবলোক হতে
নেমে এলে ধরাতলে।
আর্ত্ত আতুরের ক্রন্দন ধ্বনি
পশিল কি কর্ণমূলে।
শৌর্য্য বীর্য্য তব উজ্জ্বল দীপ্তি
উদাত্ত স্বরে ভেঙেছ যে সুপ্তি।

উত্তিষ্ঠ—জাগ্রত—
ভেদাভেদ যাও ভুলে।
বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ
এনে দিলে জীবনের নূতন ছন্দ।
হে তাপস—হে ঋষি—
প্রণাম চরণ তলে।

তৃপ্তি

শ্রীমতী বীণাপাণি ভট্টাচার্য

প্রভু, দুচোখ বুজে বৃথাই আমি
ঘুরাই শুধু জপের মালা।
ধূপের আগুন মিছেই পুড়ে
রয় সাজানো পূজার থালা

হৃদয় মাঝে আসন পেতে
তোমায় যদি বসাই আমি
কোনো কিছুই লাগবে না আর
তুমি প্রেমের টানে আসবে নামি।

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে সংস্কৃত ও ভারতীয় সংস্কৃতি

ডক্টর হরিপদ আচার্য

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ। সমসাময়িক কাল থেকেই তাঁর প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভারতাত্মাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে চলেছে। স্বামীজী গড়তে এসেছিলেন, ভাঙতে নয়; 'নেতি'-বাদকে তিনি কোনদিন স্বীকার করেননি। প্রাচীনের কোলেই নবীন ভারত এবং নব-ভারত-সংস্কৃতির আবির্ভাব কামনা করেছেন তিনি। তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতি-পুষ্ট বিজ্ঞানভিত্তিক সুগভীর ইতিহাস-চেতনার সহায়তায় সহজেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব, প্রাচীনত্ব আর মৌলিকত্ব। তিনি অনুভব করেছিলেন, সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঠিক পরিচয় পেতে হলে আমাদের বৈদিক ঋষিকুল, ব্যাস-বাল্মীকি আর কালিদাস প্রভৃতি যুগন্ধর সত্যদ্রষ্টা কবিদের রচনাবলীর উপরই বেশি পরিমাণে নির্ভর করতে হবে। সে-সকল প্রাচীন সাহিত্য থেকে শাশ্বত ভারতের প্রকৃত পরিচয় জেনেই বর্তমানের আর ভবিষ্যতের ভারত-সংস্কৃতিকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা সম্ভব। তাই তো স্বামীজী সংস্কৃত ভাষার দুর্ভেদ্য রত্ন-পেটিকায় সুরক্ষিত প্রাচীন ভারতের জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শনের দুর্লভ তত্ত্বগুলিকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, "সংস্কৃত শব্দের শত শত শতাব্দীর কঠিন আবরণ হইতে সেগুলিকে বাহির করিতে হইবে।"[১] ভবিষ্যৎ-ভারতকেও ডাক দিয়ে বললেন, "অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম। অতএব যতদূর পারো অতীতের দিকে তাকাও। পশ্চাতে যে অনন্ত নির্ঝরিণী প্রবাহিত, প্রাণ ভরিয়া আকণ্ঠ তাহার জল পান কর, তারপর সম্মুখ-প্রসারিত দৃষ্টি লইয়া অগ্রসর হও এবং ভারত প্রাচীনকালে যতদূর উচ্চ গৌরবশিখরে আরূঢ় ছিল, তাহাকে তদপেক্ষা উচ্চতর, উজ্জ্বলতর, মহত্তর, অধিকতর মহিমান্বিত করিবার চেষ্টা কর।"[২]

সংস্কৃতি শব্দটির অর্থ অতি ব্যাপক। সংক্ষেপে বলা যায়, ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত জীবনের সর্বাঙ্গীণ মানসিক উৎকর্ষই সংস্কৃতি। অপরপক্ষে, মহর্ষি পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ রচনা করে প্রাচীন বৈদিক ভাষার সংস্কার সাধন করেছিলেন বলেই ভাষাটির নাম হয় সংস্কৃত। চিরাচরিত আচার-আচরণের ক্রমশ সংস্কার দ্বারা গড়ে ওঠে নতুন সংস্কৃতি। অর্থাৎ কোন জাতির সৌন্দর্য বুদ্ধির পুনঃপুনঃ সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত বৃত্তির অভ্যুদয় হেতু জীবত্ব থেকে দেবত্বে উত্তরণের অনুভূতি এবং তার বহিঃপ্রকাশই সভ্যতা বা সংস্কৃতি।

সংস্কৃত সাহিত্যে সংস্কৃতি শব্দটিকে খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, সৌন্দর্যবুদ্ধিজাত শিল্পময় যে কাজের দ্বারা আত্মার বা নিজের সংযত জীবনের সংস্কার সাধিত হয় তা-ই সংস্কৃতি—

"আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পম্।
অনেন যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে।"[৩]

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ ৫।১৮৬

২ ঐ, ১৮২

৩ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—চৌখাম্বা, ১ম সংস্করণ, ৬।৫।১

সুতরাং ব্যক্তিগত বা জাতিগত সংস্কারের প্রকাশই হ'ল সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতিবান ব্যক্তিরাই হলেন তার স্রষ্টা ও ধারক, এবং আমাদের দেশে তাঁদের সংস্কার করা সংস্কৃত ভাষা হল তার বাহক। স্বামীজীও আত্মসংস্কারের দ্বারা অন্তর্নিহিত দেবত্বের অনুভব এবং বিভিন্ন শিল্পকর্মের মাধ্যমে তার প্রকাশকেই বলেছেন সভ্যতা বা সংস্কৃতি।

উনবিংশ শতাব্দীর যে সময়ে স্বামীজী আবির্ভূত হয়েছিলেন সে সময়টা বাংলা, তথা ভারতের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। সুপ্রাচীন ভারত-সংস্কৃতি যুগে যুগে নানাভাবে নানারূপ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েও স্বকীয়তার স্নিগ্ধ আলোতে যখন আলোকিত করছিল, তখন এল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির চোখ ধাঁধানো আলোর তীব্র স্রোত। সে স্রোতের বন্যায় ভারতের শিক্ষা, ধর্ম, সমাজব্যবস্থা প্রভৃতি সামগ্রিকভাবে যখন অত্যন্ত বিব্রত, বিশেষ করে ইয়ংবেঙ্গলেরা যখন ভারতের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-আচরণ, ভাব-ভাষা, ধর্ম-কর্ম সব কিছুকে বর্জন করে পরানুকরণে রত, ভারতের চিরন্তন বেদকে চাষীর গান, ভারতের দর্শনকে স্বপ্নবিলাসীর অলীক চিন্তা, ভারতের ধর্মকে পৌত্তলিকতা, আর ভারতের গৌরব সংস্কৃত ভাষাকে 'মৃতভাষা' বলে নস্যাৎ করে দিয়ে সর্বপ্রকারে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করতে ব্যস্ত, তখন ভারত-সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চিন্তাশীল জনমানসে একটা আন্দোলনের মনোভাব দেখা দিল। এ আন্দোলন প্রধানত শিক্ষা, ধর্ম ও স্বাদেশিকতা—এই তিনটি ধারায় চলতে লাগল। সমগ্র-দেশব্যাপী এ ত্রিধারার ভগীরথ বলা চলে রাজা রামমোহন রায়কে। স্বদেশের কল্যাণ-কামনায় রামমোহন প্রাচ্যের ভাবধারাকে গ্রহণ করে পাশ্চাত্যের ছাঁচে ফেলে নতুনভাবে ভারতীয় ভাবধারায় রূপায়িত করতে সচেষ্ট হন। রামমোহনের এ পাশ্চাত্যঘেঁষা দৃষ্টিভঙ্গীতে কিন্তু একশ্রেণীর মানুষের, বিশেষ করে রক্ষণশীল হিন্দুদের মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। তাই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের নেতৃবৃন্দ রামমোহন প্রবর্তিত উপনিষদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে পুরাণের ধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে ব্রতী হলেন। তাঁদের চেষ্টায় গীতা, ভাগবত, পুরাণ, মনু প্রভৃতি সংহিতা এবং স্মৃতি-গ্রন্থাদি অনূদিত ও মুদ্রিত হয়ে সংস্কৃত-চর্চা ও ভারত-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে সহায়ক হল। তাছাড়াও বিভিন্ন সংস্কারকগণ বিভিন্ন দিক থেকে ভারত-সংস্কৃতির উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হলেন।

রামমোহনের কাল থেকে আন্দোলনের যে ত্রিধারা বয়ে চলেছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সংস্পর্শে এসে তা সর্বদেশের সর্বভাবের সমন্বয়ে এক নতুন ধারায় প্রবাহিত হল। স্বামীজী শিক্ষায় আনতে চাইলেন প্রাচ্যের সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার সমন্বয়, ধর্মে চাইলেন রামকৃষ্ণদেব প্রবর্তিত সর্বধর্ম সমন্বয় আর স্বাদেশিকতায় চাইলেন দেশ-মাতৃকার কল্যাণে নির্ভয়ে আত্মত্যাগ।

ভবিষ্যৎ-ভারতের কল্যাণ পথের দিশারী স্বামীজী ভারত-সংস্কৃতির উজ্জীবন ও জগৎসভায় তার শ্রেষ্ঠ আসন লাভের উপায় নির্দেশ করে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বললেন, "সাধারণকে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা দাও, তাহাদিগকে ভাব দাও, তাহারা অনেক বিষয় অবগত হউক ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু প্রয়োজন। তাহাদিগকে কৃষ্টি দিতে চেষ্টা কর। যতদিন পর্যন্ত না তাহা করিতে পারিতেছ, ততদিন সাধারণের স্থায়ী উন্নতির আশা নাই। উপরন্তু একটি নূতন জাতির সৃষ্টি হইবে, যে জাতি সংস্কৃত ভাষার সুবিধা লইয়া অপর সকলের উপরে উঠিবে ও পূর্বের মতোই

প্রবুদ্ধ করিবে। নিম্নজাতীয় ব্যক্তিদের বলিতেছি—তোমাদের অবস্থা উন্নত করিবার একমাত্র উপায় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা।"[৪] তার কারণও স্বামীজী নিজেই বিশ্লেষণ করে বলেছেন, "কারণ সংস্কৃত শিক্ষায়, সংস্কৃত-শব্দগুলির উচ্চারণ মাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব—একটা শক্তির ভাব জাগিবে।"[৫] স্বামীজীর শিক্ষানীতিতে প্রাচীন সাহিত্যের পুনরালোচনার কথা অগ্রাধিকার লাভ করেছে। তিনি বলেছেন, "ভারতে আমি কতকগুলি শিক্ষালয় স্থাপন করিব—তাহাতে আমাদের যুবকগণ ভারতে ও ভারত-বহির্ভূত দেশে আমাদের শাস্ত্র-নিহিত সত্যসমূহ প্রচার করিবার কাজে শিক্ষালাভ করিবে।"[৬]

ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত, বাংলা ভাষার নতুন রূপকার স্বামীজী সংস্কৃত ভাষায়ও অনর্গল কথা বলতে পারতেন। স্বামি-শিষ্য সংবাদ গ্রন্থের প্রণেতা শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে তিনি সাধারণ কথাবার্তাও অনেক সময় সংস্কৃতে বলতেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। সংস্কৃতের প্রতি স্বামীজীর এই স্বাভাবিক অনুরাগ বাল্যকাল থেকেই ছিল। সারাজীবন সংস্কৃতের প্রতি তাঁর এই অনুরাগের তিনটি উৎস লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত—পিতা ও পিতামহের সংস্কৃতচর্চার উত্তরাধিকার। দ্বিতীয়ত—রামকৃষ্ণ-ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের পিতা নৃসিংহ দত্তের সান্নিধ্যে শিশুকাল থেকেই মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সূত্র আর দেবদেবীর স্তবস্তোত্রাদি মুখস্থ করা। তৃতীয়ত—নরেন্দ্রনাথ থেকে বিবেকানন্দে রূপান্তরের রূপকার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ ও অনুপ্রেরণা।

মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউটের নবম শ্রেণীর ছাত্র নরেন্দ্রনাথ অতীতের ঐতিহ্যকে জানবেন বলেই তাঁর পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে বেছে নিলেন ইতিহাস আর সংস্কৃতকে। এফ. এ. ক্লাসে পড়ার সময়ও সংস্কৃত তার পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কলেজে পড়ার সময় অবশ্য তিনি শুধু সংস্কৃতপাঠ্য-পুস্তক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন না, কালিদাসের অধিকাংশ গ্রন্থ তিনি সে সময় অধ্যয়ন করেছিলেন। বিশেষভাবে মেঘদূত আর অভিজ্ঞান শকুন্তলা তাঁর প্রায় মুখস্থ ছিল। বরানগর মঠে থাকাকালে ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও ইতিহাস যেমন তাঁর নিত্য পাঠ্য ছিল, তেমনি সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যের পঠন-পাঠন চলত। যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্যকে স্বামীজী সে সময় মেঘদূত এবং শকুন্তলা পড়িয়েও ছিলেন।

পরিব্রাজক অবস্থায়ও ভারতপথিক স্বামীজী যখনই যেখানে প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থ ও সংস্কৃতজ্ঞ মনীষীর সন্ধান পেয়েছেন তখনই সংস্কৃত পড়েছেন। পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি পুণায় উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মহারাজের গৃহে তিনি অতিথি। কথা-প্রসঙ্গে জানতে পারলেন পুণায় প্রচুর প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ পাওয়া যায়। তখনই মাধুকরীবৃত্তি-ধারী পরিব্রাজকের ভ্রমণে ছেদ পড়ল। স্বামীজীর মনোভাব জানতে পেরে তিলক মহারাজ সানন্দে তাঁর গৃহের একটি অংশ ছেড়ে দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ দিয়ে যেন স্বামীজী অধ্যয়নাদি করতে পারেন তার যথাযথ ব্যবস্থা করে দেন। সেখানে কিছুদিন থেকে স্বামীজী জয়পুর যান এবং ওখানকার মহারাজের অতিথি হয়ে দু-সপ্তাহ ওখানে থাকেন। সেখানেও তিনি এক মহা-বৈয়াকরণের সন্ধান পেয়ে তাঁর নিকট মহাভাষ্য অধ্যয়নের অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। মহাবৈয়াকরণ সানন্দে স্বীকৃত হয়ে স্বামীজীকে পড়াতে আসেন। কিন্তু পাঠ অধিকদূর অগ্রসর হল না।

৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫।১৯৮

৫ ঐ, ৫।১৯৭

৬ ঐ, ৫।১১৩

জয়পুরে তাঁর ব্যাকরণচর্চা অগ্রসর না হলেও খেতড়িতে এলে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয়। খেতড়ির মহারাজ অজিত সিং-এর সভাপণ্ডিত বৈয়াকরণ নারায়ণ দাসের নিকট তিনি পতঞ্জলির মহাভাষ্য বিশদভাবে অধ্যয়ন করেন। পরবর্তিকালে ত্রিবাঙ্কুর মহারাজের বৃত্তিভোগী বৈয়াকরণ পণ্ডিত বক্ষীশ্বর শাস্ত্রীর সাথে ব্যাকরণের এক জটিল তর্কবহুল সমস্যার আলোচনায় স্বামীজী তাঁর ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তি ও সংস্কৃত ভাষার পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। শুধু সংস্কৃত শাস্ত্রপাঠই নয়, সে ভাষায় কথা বলতে স্বামীজী নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতেন। ইংলণ্ড থেকে মিস্ মেরী হেলকে তিনি লিখেছেন, সংস্কৃত প্রেমিক জার্মান অধ্যাপক ডয়সনের সঙ্গে তাঁর সর্বদা সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তা হয়। কাশীপুরের গোপাল লাল শীলের বাগানে অবস্থান কালে একদিন বড়বাজারের কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সেখানে এসে তাঁকে সংস্কৃত ভাষায় দর্শন-শাস্ত্রের কয়েকটি কঠিন প্রশ্ন করেন। স্বামীজী সুললিত সংস্কৃত ভাষাতেই সেগুলির উত্তর দিয়ে তাদের মুগ্ধ করেছিলেন।

সংস্কৃত-গ্রন্থাদি পাঠ দ্বারা আধ্যাত্মিক ভাবের উন্নতির জন্য গুরুভাইদের কর্তব্য বিষয়ে নির্দেশ দিতে গিয়েও স্বামীজী সংস্কৃত শিক্ষার উপরই বার বার জোর দিয়েছেন। স্বামী অখণ্ডানন্দকে এক পত্রে, পাঞ্জাব থেকে গুণনিধি ভট্টাচার্যকে আনিয়ে ভালভাবে সংস্কৃত পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। আমেরিকা থেকে প্রিয় শিষ্য আলাসিঙ্গাকে লিখেছেন, "সংস্কৃত ভাষা বিশেষতঃ বেদান্তের তিনটি ভাষ্য অধ্যয়ন কর।"[৭] শুধু ভারতীয়দেরই নয়, ভারতকে ঠিকভাবে জানার জন্য বিদেশী শিষ্যদেরও তিনি সংস্কৃত শিখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করতেন। ইংলণ্ড থেকে মিসেস্ বুলকে লিখছেন, "মিঃ ষ্টার্ডিকে সংস্কৃত শিখতে সাহায্য করা ছাড়া এ পর্যন্ত আমি উল্লেখযোগ্য কোন কাজই করিনি।"[৮] ইংলণ্ডে থাকাকালে প্রচার কাজে সাহায্যের জন্য একজন গুরুভাইকে পেতে চান স্বামীজী। তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখছেন, "প্রথমত এরূপ লোক চাই, যাঁহার ইংরেজী এবং সংস্কৃতে বিশেষ বোধ।"[৯] স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও স্বামী অখণ্ডা-নন্দকে একই সময়ে উত্তম ইংরেজী ও সংস্কৃত জানা সন্ন্যাসীর প্রয়োজনের কথা লিখেছেন।[১০]

ঊনবিংশ শতাব্দীর যে সময়ে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষাপ্রচারের জন্য ভারতীয় এবং বিদেশীয় অনেকেই সচেষ্ট, সে সময়ে স্বামীজী একটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চিন্তা করেছিলেন। কাশ্মীরের তদানীন্তন মহারাজ ঝিলাম নদীর তীরে একখণ্ড জমি স্বামীজীকে দিতে চান। সে জমিতে স্বামীজী সংস্কৃতচর্চার একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। বেলুড় মঠের দক্ষিণ পাশে নীলাম্বর বাবুর বাগান বাড়িতে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় করার ইচ্ছাও স্বামীজীর ছিল। একবার ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রিয় শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সাথে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "মঠের দক্ষিণ ভাগে ঐ যে জমি দেখছিস্, ওখানে বিদ্যার কেন্দ্রস্থল হবে। ব্যাকরণ, দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, অলংকার, স্মৃতি, ভক্তিশাস্ত্র আর রাজকীয় ভাষা ঐ স্থানে শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রাচীন টোলের ধরনে ঐ 'বিদ্যামন্দির' স্থাপিত হবে।"[১১] তাছাড়া বহির্ভারতে সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ের জন্য ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ পঠন-পাঠনের বিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছাও নীতিগতভাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন।[৬] [ক্রমশঃ]

৭ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭।৫৬
৮ ঐ, ৭।১৬০
৯ ঐ, ৭।১৬১
১০ ঐ, ৭।১৫৭।১৫৫
১১ ঐ, ৯।১২৫

বাংলার যুগল চাঁদ

স্বামী প্রভানন্দ

[ভাদ্র, ১৩৯৩ সংখ্যার পর]

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েই সন্ন্যাস-গ্রহণ করেছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানের প্রেরণায়। মুরারি গুপ্তের কড়চা অনুসারে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ জীবোদ্ধারের জন্য। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে শ্রীচৈতন্য বলেছিলেন, 'উদ্ধরামি জনান্ সর্বান্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ'; কিন্তু সামগ্রিকভাবে শ্রীচৈতন্যের জীবনী আলোচনা করলে মনে হয় তিনি মুখ্যতঃ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রেরণাতেই সন্ন্যাসগ্রহণ করেছিলেন জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসী কেশবভারতীর নিকটে। শ্রীরামকৃষ্ণও ব্রহ্মজ্ঞ তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণ করেছিলেন অদ্বৈততত্ত্ব সাধনার জন্য। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে উভয়েই নিজ নিজ সন্ন্যাস-গুরুর মধ্যে ভক্তিভাব সঞ্চালিত করে দিয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের কণ্টকনগর বা কাটোয়াতে এসে সন্ন্যাসগ্রহণের পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন, 'করিলেন মাত্র প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ।/ মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্তন॥/"বোল" "বোল" বলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।/চতুর্দ্দিগে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য॥/···নাচিতে নাচিতে প্রভু গুরুরে ধরিয়া।/আলিঙ্গন করিলেন বড় তুষ্ট হঞা॥/পাইয়া প্রভুর অনুগ্রহ-আলিঙ্গন।/ভারতীর প্রেমভক্তি হইল তখন॥/পাক দিয়া দণ্ডকমণ্ডলু দূরে ফেলি।/সুকৃতী ভারতী নাচে "হরি" "হরি" বলি॥'[২৬] শুষ্ক জ্ঞানমার্গী কেশবভারতী ভক্তির সরোবরে অবগাহন করে পরিপূর্ণতা লাভ করলেন। এদিকে দেখি ব্রহ্মজ্ঞ তোতাপুরীর নিকট শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান আয়ত্ত করেছেন। তোতাপুরী ত্রিগুণময়ী ব্রহ্ম-শক্তি মায়াকে মানতেন না। একদিন সন্ধ্যাবেলা শ্রীরামকৃষ্ণ হাততালি দিয়ে হরিনাম করছিলেন। তোতা বিদ্রূপ করে বলে ওঠেন, 'আরে কেঁউ রোটি ঠোক্‌তে হো?' শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বলেন, 'দূর শালা! আমি ঈশ্বরের নাম করচি, আর তুমি কিনা বলচ আমি রুটি ঠুক্‌চি'। তোতাপুরী কোনও স্থানে তিন দিনের বেশি থাকতেন না, কিন্তু শিষ্যপ্রেমে পড়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরে থেকে যান। এগারো মাস পরে তাঁর প্রবল রক্তামাশয় দেখা দিল। ঔষধপত্র যন্ত্রণার উপশম করতে ব্যর্থ হল। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে এক রাত্রে পুরীজী গঙ্গায় দেহ বিসর্জন দেবার সঙ্কল্প করলেন। মনকে ব্রহ্মচিন্তায় স্থির রেখে পুরীজী গঙ্গার জলে নামলেন, হেঁটে নদী প্রায় অতিক্রম করে ফেললেন, কিন্তু ডুববার মতো জল পেলেন না। তিনি ভাবেন, 'একি দৈবী মায়া!' এমন সময় পুরীজীর চোখের সামনে থেকে যেন পর্দা সরে গেল। তিনি দেখতে পেলেন চৈতন্যরূপিণী জগজ্জননী মা, অচিন্ত্য শক্তিরূপিণী মা, জলে, স্থলে সর্বত্র মা, শরীর মা, মনও মা, আবার শরীর-মন-বুদ্ধির পারেও সেই মা—তুরীয়া নির্গুণা মা। তিনি বোধে বোধ করলেন, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ। সূর্যোদয় হলে পুরীজী মন্দিরে গিয়ে মা-ভবতারিণীকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। পুরীজীর মধ্যে জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি মিশে সোনায় সোহাগা হল।

উভয় মহাপুরুষই তীর্থ পরিভ্রমণ ও সেবা করে তীর্থস্থানকে যেভাবে তীর্থীকৃত করেছিলেন,

২৬ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, ৩।১।৫—১০ শ্লোক।

তার মধ্যে রয়েছে সাদৃশ্য। মথুরায় তীর্থসেবায় রত শ্রীচৈতন্যের চরিত্রচিত্রের সামান্য অংশ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় উদ্ধৃত করা যাক। তিনি লিখেছেন, 'পথে যাঁহা যাঁহা হয় যমুনা-দর্শন ।/তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন ॥/মথুরা নিকটে আইলা—মথুরা দেখিয়া।/দণ্ডবৎ হৈঞা পড়ে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥/মথুরা আসিয়া কৈলা বিশ্রান্তিঘাটে স্নান।/জন্মস্থানে কেশব দেখি করিলা প্রণাম ॥/প্রেমানন্দে নাচে গায় সঘন হুঙ্কার।/প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোকে চমৎকার ॥'[২৭] কি পশ্চিমে, কি দক্ষিণে মহাপ্রভু যেদিকেই তীর্থযাত্রা করেছেন সেদিকেই তিনি এরূপ নিজানন্দে বিভোর হয়ে অগ্রসর হয়েছেন। প্রায় অনুরূপ ভাবের বিচ্ছুরণ শ্রীরামকৃষ্ণচরিতের মধ্যেও প্রোজ্জ্বল। পুঁথিকার তাঁর মথুরা থেকে বৃন্দাবন-গমন সম্বন্ধে লিখেছেন, 'কংস-ত্রাসে বসুদেব কৃষ্ণ করি কোলে।/যে-ঘাটে যমুনা পার পালায় গোকুলে ॥/সেই ঘাটে আসামাত্র প্রভু গুণমণি।/দেখিলেন বাসুদেব আকুল পরাণী ॥/অন্ধকার যামিনী ভীষণা অতিশয়।/কোলে কৃষ্ণরূপে আলো করে দিকচয় ॥/…যায় পার যমুনার ছুটে উর্দ্ধশ্বাস।/দেখিয়া প্রভুর মহাভাবের উচ্ছ্বাস ॥/গভীর সমাধিযুক্ত কিসেও না ছুটে।/অবিরাম কৃষ্ণনাম কর্ণমূলে রটে ॥/…মহাভাবে ডুবে ডুবে প্রভু পরমেশ।/নরযানে বৃন্দাবনে করেন প্রবেশ ॥' লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে শ্রীরামকৃষ্ণ কতকটা গোপনে তীর্থসেবা করেছিলেন, মুখ্যতঃ নিজেই তীর্থমধু পান করেছিলেন। অপরপক্ষে শ্রীচৈতন্য তীর্থস্থানে নেচে গেয়ে নিজে মেতে উঠেছেন, উপস্থিত অপর সকলকে মাতিয়ে দিয়েছেন।

এ-সকল বৃহৎ ঘটনা ছাড়াও উভয়ের দিনচর্যার প্যাটার্নের মধ্যে রয়েছে অনেক মিল। যেমন, আশ্চর্যের বিষয় উভয়েই স্পর্শ করে বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তির মনে নতুন ভাব সংক্রামিত করে দিতেন। নবদ্বীপে হরিসংকীর্তন মহা আলোড়ন সৃষ্টি করলে মুসলমান কাজী সংকীর্তন নিষেধ করে দেন। এই আদেশ অমান্য করে শ্রীচৈতন্য এক সন্ধ্যায় সংকীর্তনের বিরাট একটি দল নিয়ে কাজী সাহেবের বাড়িতে উপস্থিত হন। 'এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া।/কহিতে লাগিলা কিছু কাজিরে ছুঁইয়া ॥' স্পর্শের অদ্ভুত গুণ। কাজির মনের ভাব পাল্টে যায়, তিনি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। অনুরূপভাবে দেখা যায়, দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর নাটমন্দিরে পণ্ডিতদের সভা বসেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করেন। ভাবের ঘোরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কাঁধে চেপে বসেন; সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর দিব্যস্পর্শের অনুপ্রাণনায় বৈষ্ণবচরণ মুখে মুখে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করে শ্রীরামকৃষ্ণের স্তব করতে থাকেন।

উভয় মহাপুরুষের জীবন-চত্বর উদার মলয় হাওয়া দ্বারা পরিসেবিত। শ্রীচৈতন্য ছিলেন পরম নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, কিন্তু তাঁর মধ্যে সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামির কোন স্থান ছিল না। নবদ্বীপ থেকে নীলাচল, নীলাচল থেকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, নীলাচল থেকে বৃন্দাবন যাতায়াতের পথে তিনি প্রধান সকল দেবদেবী দর্শন করেছেন। যাজপুরে আদ্যাশক্তি বিরজা, কটকে সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ, জিয়াড়ে নৃসিংহদেব, স্কন্দ-তীর্থে কার্তিকেয়, রামনাথনগরে রামচন্দ্র, তাঞ্জোর জেলায় শিয়ালী ভৈরবী, কাশীতে বিশ্বনাথ প্রভৃতি দর্শন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ অশূদ্রযাজী ব্রাহ্মণগৃহে জন্ম-গ্রহণ করেও সকল হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরে গেছেন, গেছেন মুসলমানের মসজিদে, গেছেন

২৭ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ২।১৭।১৫৫—৫৮ শ্লোক

খ্রীষ্টয়ানের গির্জায়।

আবার দেখা যায় পরোপকারের ভাবাদর্শে উভয় মহাপুরুষের জীবন উজ্জ্বল। শ্রীমদ্ভাগবতে বিধৃত দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীচৈতন্য পরোপকারের আদর্শ নিজের জীবনে গ্রহণ করেছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে পাই একটি ঘটনা। প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীন হীন জনে।/দুঃখী কাঙাল আনি করায় ভোজনে॥/কাঙালের ভোজনরঙ্গ দেখে গৌরহরি।/"হরি বোল" বলি তারে উপদেশ করি॥/"হরি হরি" বোলে কাঙাল প্রেমে ভাসি যায়।/ঐছন অদ্ভুতলীলা করে গৌররায়॥" সঠিক ভাব রক্ষা করে সেবা করবার জন্য শ্রীচৈতন্য নির্দেশ দিতেন, 'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান।' অপরপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ 'নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবন' এই বৈষ্ণবমত পূর্ণভাবে সমর্থন করতে পারেন-নি। তাঁর মতে মানুষের মানুষকে দয়া করবার অধিকার নেই। মানুষ মানুষকে শ্রদ্ধাভরে সেবা-পূজা করবে। এবং এই সেবার আদর্শ তিনি নিজের জীবনে আচরণ করে দেখিয়েছেন। একবার কলাইঘাটাতে মথুরানাথের জমিদারীতে গিয়ে প্রজাদের দুর্দশা দেখে তিনি মথুরানাথকে বাধ্য করেছিলেন তাদের তিনবছরের বাকী খাজনা মকুব করে দিতে। আর একবার বৈদ্যনাথধামের নিকটবর্তী চুরুলিয়া গ্রামে বুভুক্ষু একদল নরনারীর দুরবস্থা দেখে ব্যথিত হয়েছিলেন। সঙ্গী মথুরানাথ এদের জন্য পয়সা খরচ করতে গররাজি দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের মধ্যে বসে পড়ে মথুরানাথকে বলেছিলেন, 'দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। আমি এদের কাছেই থাকব; এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাব না।' মথুরানাথ শেষ পর্যন্ত প্রত্যেককে একমাথা তেল, একখানা কাপড় ও পেট ভরে খাইয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে শান্ত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সুখী-দুখী সবাইকে নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা করেছিলেন।

জাতিভেদ প্রপীড়িত হিন্দুসমাজের জটিল সমস্যার একটি সুষ্ঠু সমাধান দিয়েছেন এই দুই মহাপুরুষ। সনাতনের প্রতি শ্রীচৈতন্যের উপদেশ ছিল, 'যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত—হীন ছার।/কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥' এই উপদেশের সম্যক্ প্রয়োগের ফলে সমাজে উপস্থিত হয়েছিল আলোড়ন। সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে পদকর্তা গেয়েছেন, 'ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ-রঙ্গ।' শুধু কি তাই? শ্রীচৈতন্য আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি রায় রামানন্দকে বলেছিলেন, 'কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।/যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥' ভক্তির পাদপীঠে সকল স্তরের মানুষকে আত্মমর্যাদার সমান অধিকার দান করে শ্রীচৈতন্য জীর্ণ দীর্ণ হিন্দু-সমাজের মধ্যে সংহতি এনেছিলেন। এই ভাবধারাই ব্যাপক ও গভীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'জাতিভেদ? কেবল এক উপায়ে জাতি ভেদ উঠতে পারে। সেটি ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই। অস্পৃশ্য জাত শুদ্ধ হয়—চণ্ডালের ভক্তি হলে আর চণ্ডাল থাকে না। চৈতন্যদেব আচণ্ডালে কোল দিয়েছিলেন।' শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে সদাসর্বদা আচরণ করে তাঁর এই বাণীকে সার্থক করে তুলেছিলেন। উপরন্তু তিনি তাঁর অব্রাহ্মণ শিষ্য রাম দত্ত, গিরিশ ঘোষ প্রমুখদের আচার্যের ভূমিকায় নিয়োগ করেছিলেন। কায়স্থ নরেন্দ্রনাথ দত্তকে আশ্রয় করে তিনি সৃষ্টি করে গেছেন একটি অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়, তার প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রগতিশীল বন্ধনমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী।

এই দুই অবতার পুরুষের জীবনধারার সামঞ্জস্য আলোচনা প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়

স্মরণযোগ্য। শ্রীচৈতন্যের জীবিতকালেই তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠাপূর্বক পূজা আরম্ভ হয়েছিল। মুরারি গুপ্তের কড়চা অনুসারে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীই সর্বপ্রথম শ্রীচৈতন্যের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় সমকালেই গৌরীদাস পণ্ডিত গৌর-নিতাই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।[২৮] নিত্যানন্দ প্রেমধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা প্রচার করে বলেন, 'চৈতন্য সেব, চৈতন্য গাও, লও চৈতন্য-নাম।/ চৈতন্যে যে ভক্তি করে, সেই মোর প্রাণ॥' অনুরূপভাবেই দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিতকালেই তাঁর আলোকচিত্র ভক্তদের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহেও স্থান পেয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং নিজের ছবিতে ফুলচন্দন দিয়েছিলেন।

উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকে প্রমাণিত হয় শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রের মধ্যে সাদৃশ্য প্রতুল। অপরপক্ষে বিচার করলে দেখা যাবে দুজনের মধ্যে বৈষম্যও অপ্রতুল নয়। বৈষম্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক। ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীগৌরাঙ্গ একসময়ে বিরুদ্ধ মতবাদীদের বাগ্‌যুদ্ধে পরাজিত করাকে জীবনের একমাত্র সার্থক কর্ম বলে মনে করতেন। তারপর এল পরিবর্তন। তিনি বিসর্জন দিলেন বাদ্‌বিতণ্ডা, পরিহার করলেন ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা, তিনি প্রেম ও ভক্তির সাগরে ডুব দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে কেউ কখনও এ-ধরনের তর্কযুদ্ধে প্রবর্তিত হতে দেখেনি। এগারো বছর বয়সে এক দিব্যদর্শনের পর তাঁর জীবনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল।

দুই মহামানবই ত্যাগবৈরাগ্যের জ্বলন্তমূর্তি। কিন্তু যুগপ্রয়োজনে শ্রীচৈতন্য আহারে-বিহারে যে কঠোরতা করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তা করেননি। শ্রীচৈতন্য নিজে 'কলা শরলা' বিছিয়ে শয়ন করেছেন। তিনি শিষ্য রঘুনাথ দাসকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।' এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবনে প্রখর বৈরাগ্যানল প্রজ্বলিত রেখেও শরীর-পোষণের জন্য যখন যা জুটেছে তখন তা প্রয়োজনমত গ্রহণ করেছেন।

কামিনী সম্বন্ধেও শ্রীচৈতন্য যেন বেশি কঠোরতা করেছেন। সন্ন্যাসের পর তিনি জননী ভিন্ন কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেননি। ছোট হরিদাস একজন স্ত্রীভক্তের সঙ্গে কথা বলেছিলেন এই অপরাধে তিনি তাঁকে বর্জন করেছিলেন। মনোদুঃখে হরিদাস প্রয়াগে আত্ম-বিসর্জন করলেন। এ-খবর শুনে শ্রীচৈতন্য মন্তব্য করেন, 'প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত।' এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ কামিনী বর্জন করলেও সহধর্মিণীকে ত্যাগ করেননি, বরঞ্চ নিজের গুরু-দায়িত্বের অংশীদাররূপে তাঁকে গড়ে তুলেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্ত্রীলোকের হাওয়া বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারতেন না বটে, কিন্তু বেশ কয়েকজন স্ত্রীভক্তকে মন্ত্র ও উপদেশাদি দিয়েছিলেন। দুজনেই কাঞ্চন বিষবৎ বর্জন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মুদ্রা বা ধাতু স্পর্শে হাত তেউরে যেত, গায়ে বিছার কামড়ের জ্বালাবোধ হত; কিন্তু সে-রকম কোন ঘটনা শ্রীচৈতন্যের জীবনে দেখা যায় না। শ্রীচৈতন্য মহারাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে দেখা করতে আপত্তি করেছিলেন, অপরপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ—কেশবচন্দ্র, যদুলাল মল্লিক, শম্ভুনাথ মল্লিক, বিদ্যাসাগর প্রমুখ ধনী-মানীদের সঙ্গে সানন্দে দেখা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে বলেছেন, 'চৈতন্য অবতারে বড় নিষ্ঠা কাষ্ঠা।' আর শ্রীরামকৃষ্ণ মা ৺জগদম্বার শরণাগত হয়ে

২৮ মুরারি গুপ্ত: শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতম্ ৪।১৪।৮ ও ৪।১৪।১২-১৪; এবং বিমানবিহারী মজুমদারের শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃঃ ৬১১ দ্রষ্টব্য।

রসে-বসে দিনযাপন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-গুরুদের একজন তপস্বিনী নারী, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সাধনক্ষেত্রে নারীর কোন স্থান ছিল না। শ্রীচৈতন্য দুর্ধর্ষ জগাই ও মাধাই, নরোজী দস্যু, পাঠান বিজলী খাঁর মতো ব্যক্তিদের নির্ভয়ে সম্মুখীন হয়ে তাদের চরিত্রে পরিবর্তন এনেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে এ-ধরনের কোন রোমহর্ষণ কাহিনী দেখা যায় না। অবশ্য তাঁর পূত সান্নিধ্যে নট গিরিশ ঘোষের পরিবর্তন একটি বিরাট ঘটনা। শ্রীচৈতন্য নিজের ভক্ত দামোদরের বাক্যদণ্ড মাথা পেতে নিয়েছিলেন। এ-ধরনের কোন ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনচর্যাতে দেখা যায়নি।

শ্রীচৈতন্য মুখ্যতঃ রাগানুগা ভক্তির সাধন করেছিলেন এবং প্রেম-ভক্তির প্রচার করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের লোককল্যাণের জন্য বাইরের ভাব ছিল দ্বৈত-ব্যবহার, আর নিজের ভিতরের ভাব ছিল অদ্বৈত-আস্বাদন। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ছিল অনন্তভাবের সাগর। তিনি বিশাল হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও হিন্দু-অতিরিক্ত ইসলাম ও খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম সাধন করে 'যত মত তত পথ'-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর কাছে উপস্থিত ব্যক্তিদের নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস ও ভাব অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন উপদেশ দিতেন। তিনি ছিলেন যেন চাঁদমামা—সকলের মামা। সকল মতপথের লোক তাঁকে মনে করত আপন মতের লোক।

'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং'—শ্রীচৈতন্যের শেষ বারো বছরের জীবনচর্যাতে কৃষ্ণবিরহে দিব্যোন্মাদনার একটি ঝড় বয়ে গিয়েছিল। তাঁর গম্ভীরার জীবন প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন। দু-তিনজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ভিন্ন অপরের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। গম্ভীরার গভীর অন্তর্মুখী ভাব থেকে তিনি কখনও কখনও নেমে আসতেন। শেষের দিকে তাও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অপরপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট সকলের ছিল অবারিত দ্বার। গলায় ভীষণ ক্যান্সারের যন্ত্রণা সত্ত্বেও তিনি দিবারাত্র লোককল্যাণে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর ইহজীবনের শেষ দিনটিতেও তিনি জনৈক সাধকের সঙ্গে যোগ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল আলোচনা করেছিলেন।

চরিতামৃতকার বলেছেন 'সংকীর্তন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। চৈতন্যধর্মের সার সংকীর্তন-যজ্ঞ। এ-যজ্ঞের দুটি ধারা। বিদগ্ধ ভক্তরসিকের জন্য লীলা-সংকীর্তন আর সর্বসাধারণের জন্য নাম-সংকীর্তন। অপরপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বসাধারণের জন্য উপদেশ করেছেন নারদীয়া ভক্তি তথা জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি এবং সে-সঙ্গে নারায়ণ-জ্ঞানে মানুষের সেবা। অবশ্য তিনি বিশেষ অধিকারীর জন্য পরাভক্তি, অদ্বৈততত্ত্ব, রাজযোগ ইত্যাদি অথবা চারযোগের সমন্বয় উপদেশ করেছেন। এভাবে উভয়ের জীবনধারার মধ্যে আরও অনেক বিষয়ে বৈষম্য তুলে ধরা যেতে পারে।

স্বল্পকালের ব্যবধানে প্রায় সমজাতীয় পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আবির্ভূত শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনলীলার মধ্যে সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করে ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য তাঁর 'শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ' -গ্রন্থের অবতরণিকায় মন্তব্য করেছেন, 'তাঁহাদের অভিন্নরূপ সমগ্রভাবে ও নানাদিক দিয়া উপলব্ধি করিবার ও সেই উপলব্ধির উপরে জাতীয় অধ্যাত্ম জীবন প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি।' আমরা কিন্তু এই দুই মহাপ্রাণের 'অভিন্নরূপের' উপর গুরুত্ব দেওয়ার বিশেষ কোন প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে বলে মনে করি না। সবচেয়ে বড় কথা, ঐতিহাসিক বিচারে তাঁদের দুজনের একটি অভিন্নরূপ মনে করবার যথেষ্ট যুক্তি আছে কি? একই অবতারী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে

আবির্ভূত হলেও তাঁদের জীবনালেখ্যের মধ্যে বেশ কিছু মিল থাকতেই পারে। শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের বেশ কিছু মিল আছে, তেমনি তাঁদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণেরও মিল আছে। এই মিলের উপর গুরুত্ব আরোপ করেই চৈতন্য-ভাগবত ও রামকৃষ্ণ পুঁথি যথাক্রমে সিদ্ধান্ত করে বসেছেন যে পূর্বে পূর্বে যিনি শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তিনিই শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ অবয়বে আবির্ভূত হয়েছেন। কথায় বলে, একই অবতার বার বার। একই অবতারী জগতের হিতের জন্য পুনঃপুনঃ আবির্ভূত হয়েছেন, সে-কারণে এক অবতার পুরুষের সঙ্গে অন্য এক অবতার পুরুষের কিছু সাদৃশ্য সামঞ্জস্য না থাকাই তো অস্বাভাবিক।

তাছাড়া বাস্তবধর্মী যুক্তিনিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণ আশ্রয় করলে দেখা যাবে, প্রাগুক্ত সাদৃশ্যগুলিকে যতটা সদৃশ মনে করা হয়েছে সেগুলি বাস্তবিক ততটা সদৃশ নয়, উপরন্তু আপাত-সাদৃশ্যের অন্তরালে দুই মহামানব নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে মহীয়ান্। এমন কি যুগপ্রয়োজন মেটাতে গিয়েও একের ঐতিহাসিক ভূমিকা অপরের ভূমিকা থেকে ভিন্ন। নির্মোহ যুক্তির পথ ধরে অগ্রসর হলে দেখা যাবে রামকৃষ্ণজীবন চৈতন্যজীবনের অনুশীলনমাত্র মনে করা বাতুলতা। বরঞ্চ এই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, কালের স্বল্প ব্যবধানে প্রায় সমজাতীয় সাংস্কৃতিক বাতাবরণে রামকৃষ্ণ-জীবনে স্বাভাবিকভাবেই চৈতন্যাবভাস এসে পড়েছিল। একথাও বলা সঙ্গত যে, উভয়চরিত্রের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজতে গিয়েই রামকৃষ্ণ-অনুরাগীদের একাংশ চৈতন্যচরিতের অবভাস আরোপ করে-ছিলেন রামকৃষ্ণচরিতের উপর। অপর একদল আবার শ্রীচৈতন্যের জীবনালোকেই শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝতে ও জনসাধারণকে বুঝাতে সচেষ্ট হয়ে-ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবলোকে চৈতন্য-উদ্ভাস ও তাঁর জীবনচর্যাতে চৈতন্যাবভাস, এ-সকলের সঙ্গে বৈষ্ণবসাহিত্যে বিভাসিত শ্রীচৈতন্যের একরূপতা রয়েছে। কিন্তু বৈষ্ণবসাহিত্যে প্রকাশিত তত্ত্ব ও তথ্যের অতিরিক্ত অনেক কিছু শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবলোকে অনাবৃত হয়েছিল যা কাল-মাকড়সার জালে আবৃত হয়ে এবং সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার ধূলাতে চাপা পড়ে জনমানস থেকে অপসৃত হয়ে গিয়েছিল এবং যা উন্মোচিত হওয়ার ফলে কৃষ্ণ-চৈতন্যচরিতের মহিমা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীচৈতন্যের এই নবমূল্যায়ন নানাকারণেই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ-উদ্ঘাটিত এ-সকল তত্ত্ব ও তথ্যের প্রধান কয়েকটি আমরা এখানে তুলে ধরব :

(ক) শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন যে অবতারমাত্রই মায়াশক্তি আশ্রয় করে লীলাবিলাস করে থাকেন। এবং স্বাভাবিক কারণেই তাঁরা প্রত্যেকে আদ্যা-শক্তির উপাসনা করে থাকেন। শ্রীরামচন্দ্রের শারদীয়া দুর্গোৎসব সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণও রাধা-যন্ত্র কুড়িয়ে পেয়ে তা নিয়ে অনেক সাধনা করে-ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র জীবনও আদ্যা-শক্তির লীলাভূমি। স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে শ্রীচৈতন্য কি এর ব্যতিক্রম? গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের শক্তি-আরাধনার উল্লেখমাত্র নাই, পরন্তু শক্তিপূজকদের নিন্দাবাদ রয়েছে। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণের যোগজদৃষ্টিতে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছিল। তিনি ভাবদর্শনের সাহায্যে জানতে পারেন যে, শ্রীচৈতন্যও শক্তির আরাধনা করেছিলেন। তিনি আরও জানতে পারেন যে শ্রীচৈতন্য অন্নপূর্ণাদেবীকে আপন ইষ্টরূপে উপাসনা করেছিলেন।

(খ) শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা ও ভক্তিপ্রেম পরস্পরবিরোধী নয়। শ্রীচৈতন্য ব্রহ্ম-জ্ঞানের প্রেরণাতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন

জ্ঞানপন্থী সন্ন্যাসী কেশবভারতীর নিকটে। শ্রীচৈতন্য যুগপ্রয়োজনে ভক্তিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের যোগজ-দৃষ্টিতে উদ্ঘাটিত হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ-পরিচয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'চৈতন্যদেবের জ্ঞান সৌরজ্ঞান—জ্ঞানসূর্যের আলো। আর তাঁর ভিতর ভক্তিচন্দ্রের শীতল আলোও ছিল। ব্রহ্মজ্ঞান, ভক্তিপ্রেম, দুই-ই ছিল।

(গ) শ্রীরামকৃষ্ণের যোগজদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিত্বের স্বরূপটি। শ্রীরামকৃষ্ণের আবিষ্কার যে, শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিসত্তায় পুরুষ ও প্রকৃতিভাবের সার্থক মিলন ঘটেছিল। সে-কারণে তাঁর ব্যক্তিত্বে আমরা লক্ষ্য করি কোমল ও কঠোরের মেলবন্ধন। শ্রীচৈতন্য পুরী থেকে মথুরা-বৃন্দাবন গেলেন গৌড়দেশ হয়ে। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বললেন, 'গৌড়দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়।/জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময়॥' অদ্বৈত আচার্যের গৃহে এসে তিনি মাকে আনালেন নবদ্বীপ থেকে, মায়ের রান্না ভক্তগণ সহ পরমানন্দে ভোজন করলেন, মায়ের কাছে বৃন্দাবন যাত্রার অনুমতি নিলেন। অপরপক্ষে দেখি কঠোর সন্ন্যাসী বৈষ্ণবাপরাধে অপরাধী শচীমাতাকে শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত হননি, প্রিয় রায় রামানন্দের অনুজ গোপীনাথ পট্টনায়ককে রাজা প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুদণ্ড থেকে রক্ষার চেষ্টা না করে উদাসীন হয়ে রয়েছেন, ইত্যাদি। একদিকে দৃঢ়তা, কঠোরতা ও বীরত্বের উজ্জ্বল নিদর্শন, অন্যদিকে রাধাভাবে ভাবিত হয়ে অভূতপূর্ব কৃষ্ণ-বিরহের আর্তিপ্রকাশ—এ নিয়েই শ্রীচৈতন্যচরিত্র।

(ঘ) আবার সামগ্রিকভাবে বিচার করে তিনি শ্রীচৈতন্যের স্বরূপসত্তা সম্বন্ধে নতুন আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'কালী গৌরাঙ্গ এক বোধ হলে, তবে ঠিক জ্ঞান হয়। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। তিনি নররূপে শ্রীগৌরাঙ্গ।' আরও গভীরে অগ্রসর হয়ে তিনি বলেছিলেন, 'চৈতন্য কিনা অখণ্ডচৈতন্য। বৈষ্ণবচরণ বলত গৌরাঙ্গ এই অখণ্ডচৈতন্যের একটি ফুট।' এভাবে শ্রীচৈতন্যের নিত্যরূপ ও লীলারূপ দুই-ই প্রকটিত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের মননালোকে।

(ঙ) সাধক জীবনের ক্রম-বিবর্তনে চারটি অবস্থা—প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ ও সিদ্ধের সিদ্ধ। সিদ্ধের সিদ্ধ ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'সিদ্ধের সিদ্ধ, যেমন চৈতন্যদেবের অবস্থা—কখনও বাৎসল্য, কখনও মধুরভাব।' শ্রীচৈতন্য শ্রীভগবানের রসমাধুর্য আস্বাদন করতেন কখনও বাৎসল্যভাবে, কখনও মধুরভাবে। এ-বিষয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের বাৎসল্যভাবটি কতকটা যেন অবহেলা করে তার মধুরভাবটির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই একদেশদৃষ্টি সংশোধন করে দিয়েছেন।

(চ) শ্রীরামকৃষ্ণ আবিষ্কার করেছিলেন যে তাঁর নিজের অন্তরঙ্গদের মধ্যে কয়েকজন পূর্ব-জীবনে ছিলেন শ্রীচৈতন্যের সাঙ্গোপাঙ্গ। শ্রীরামকৃষ্ণ মহেন্দ্র মাষ্টারকে বলেছিলেন, 'সাদা চোখে গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ সব দেখেছিলাম। তার মধ্যে তোমায় যেন দেখেছিলাম। বলরামকেও যেন দেখেছিলাম।' এই সাঙ্গোপাঙ্গগণ দুই অবতার পুরুষের লীলাবিলাসের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন।

(ছ) শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অবদান শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের আধুনিক মূল্যায়ন। শ্রীরামকৃষ্ণের সমকালীন বৈষ্ণবসমাজে প্রেমধর্মের মধ্যে আবিলতা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ দুঃখিত হয়েছিলেন। তিনি নিজের জীবনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রেম-ধর্মের প্রকৃতরূপটি প্রচার করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'প্রেম কি সামান্য জিনিস গা? চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল। প্রেমের দুটি

লক্ষণ। প্রথম—জগৎ ভুল হয়ে যাবে। এত ঈশ্বরেতে ভালবাসা যে বাহ্যশূন্য। চৈতন্যদেব "বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে; সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে।" দ্বিতীয় লক্ষণ—নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, এর ওপরেও মমতা থাকবে না। দেহাত্মবোধ একেবারে চলে যাবে। ঈশ্বরদর্শন না হলে প্রেম হয় না।' দ্বিতীয় লক্ষণটি বিস্তার করে অন্যত্র বলেছেন, 'প্রেমোন্মাদ কি রকম? সে-অবস্থা হলে জগৎ ভুল হয়ে যায়। নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, তাও ভুল হয়ে যায়! চৈতন্যদেবের হয়েছিল। সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, সাগর বলে বোধ নাই। মাটিতে বার-বার আছাড় খেয়ে পড়ছেন—ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, নিদ্রা নাই; শরীর বলে বোধই নাই।' শ্রীরামকৃষ্ণের এই মূল্যায়নের ফলে চৈতন্য-প্রচারিত প্রেমধর্ম অধিকতর বলশালী হয়ে উঠেছিল।

(জ) স্বামী বিবেকানন্দ দুঃখ করে বলে-ছিলেন, 'শ্রীচৈতন্যদেব মহাত্যাগীপুরুষ ছিলেন; স্ত্রীলোকের সংস্পর্শেও থাকতেন না। কিন্তু পরে চেলারা তাঁর নাম করে নেড়া-নেড়ীর দল করলে।' সংসার কঠিন ঠাঁই। কামকাঞ্চনে আসক্তি সাংসারিক দুর্গতির মূলে। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যকে উদ্ধৃত করে বলে-ছিলেন, 'শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই, সংসারী জীবের কভু গতি নেই।' প্রশ্ন ওঠে, তাহলে সংসারী মানুষের কি উপায়? শ্রীচৈতন্যের তো অনেক সংসারী ভক্তও ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এ রহস্যের সমাধান দিয়ে বলেছিলেন, 'চৈতন্যদেবের সংসারী ভক্তও ছিল। তারা সংসারে নামমাত্র থাকতো। অনাসক্ত হয়ে থাকতো।' শ্রীচৈতন্যও বলতেন, 'যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা।' শ্রীভগবানের পদাশ্রয় করে সংসারে থাকতে হবে—শ্রীচৈতন্য-নির্দেশিত এই পথটি শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় তুলে ধরেছিলেন ত্রিতাপতাপিত সংসারী মানুষদের জন্য। তিনি 'গৃহস্থ-সন্ন্যাসী'র আদর্শ পুনঃ-প্রবর্তন করেছিলেন।

(ঝ) শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র পরিশীলিত মন ছিল সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিষয় নিরূপণের একটি পরিচায়ক ও পরিমাপক যন্ত্র। নবদ্বীপে পরিভ্রমণ-কালে শ্রীরামকৃষ্ণ উচ্চ ভাবভূমিতে থেকে সেখানে দিব্যভাবের বিশেষ প্রকাশ অনুভব করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এই অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে লীলা-প্রসঙ্গকার লিখেছেন, 'নবদ্বীপে যে আজ পর্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গের সূক্ষ্মাবির্ভাব বর্তমান তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।' শ্রীরামকৃষ্ণের এই উপলব্ধির দ্বারা নবদ্বীপধামে গোরা রায়ের নিত্যলীলা বা অপ্রকটলীলা প্রমাণিত হয়।

(ঞ) স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, প্রচলিত চৈতন্যধর্মের যে কয়েকটি ধারা তার কোন্‌টি শ্রীরামকৃষ্ণের সমর্থনপুষ্ট? শ্রীচৈতন্যকে অনুসরণ করে মুখ্যতঃ দুটি ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল: (১) মুরারি গুপ্ত, বৃন্দাবন দাস, কবি কর্ণপুর প্রমুখ চরিতকারগণ সমর্থিত নবদ্বীপ-ধারা এবং (২) বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীদের অনুসৃত ভাব-ধারা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীদের কাছ থেকে যেমন তত্ত্ব জেনেছিলেন, তেমনি নবদ্বীপবাসিগণের নিকট থেকে সংগ্রহ করেছিলেন চৈতন্যজীবনের প্রথমার্ধ সম্বন্ধে টাট্‌কা উপাদান। ফলে চরিতামৃতে ব্যাখ্যাত চৈতন্যধর্মে এ-দুই ধারার অনেকাংশে সমন্বয় ঘটেছে।[২১] চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার কথা রয়েছে, আবার অনেকস্থলে গৌরভজনের কথাও রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সমর্থিত চৈতন্যধর্ম

[২১] Dr. S. K. De: Early History of the Vaishnava faith & Movement in Bengal, 1942, Introduction.

এই সমন্বয়ী-দৃষ্টিতে আলোকিত। গৌড় ও বৃন্দাবনের ভজনাদর্শের মধ্যে যে পার্থক্য তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাননি।

শ্রীরামকৃষ্ণের মননালোকে বিভাসিত তথ্য ও তত্ত্ব শ্রীচৈতন্যের একটি নির্ভরযোগ্য কালোপযোগী মূল্যায়ন মাত্র নয়, এই মূল্যায়ন নিঃসন্দেহে শ্রীচৈতন্যের জীবনসাধনায় নবতর রস আস্বাদনের আনন্দ দান করেছে।

ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির গগন চৈতন্যচন্দ্র ও রামকৃষ্ণচন্দ্র—এই যুগলচন্দ্রের আলোকে সমুদ্ভাসিত। যুগলচন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণধারা ধর্ম ও সমাজের সর্বস্তরে এনেছে এক নতুন জাগরণের ভাববন্যা। এই ভাববন্যায় সঞ্চিত পলিমাটি ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত—এ-সকল জমিতে সোনার ফসল ফলিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও ফলাবে।

একেই কি বলে ভগবানকে ধরে থাকা

শ্রীনন্দদুলাল চক্রবর্তী

ঘরের ভেতর জ্বলছে কেরোসিনের কুপি। ঘরের উত্তর দিকে পাটকাঠির বেড়া। সেই বেড়ায় টাঙানো লক্ষ্মীর ছবিওয়ালা একখানা ক্যালেণ্ডার। অনেক দিনের পুরানো। জায়গায় জায়গায় পোকায় নষ্ট করে দিয়েছে। কোথাও রঙ চটে গেছে। অন্য বাড়ি থেকে চেয়ে এনে আজকের জন্য টাঙানো হয়েছে। এই ছবিতেই আজ পুজো হয়েছে। ছবির সামনে একটি মাটির ঘট। তার ওপরে পল্লব। একটি কলা। ফুল বেলপাতা ছড়ানো রয়েছে। মাটির পিলসুজে প্রদীপটি তখনও জ্বলছে। মাটির ধুনুচি নিভে রয়েছে। একহাত লম্বা কলাগাছের দুখানা খণ্ড দুদিকে। তার ওপরেই কলাপাতায় নৈবেদ্য। অল্প খই বাতাসা আর সামান্য একটু ফল। এই হল পূজার উপকরণ। পুজো হয়ে গেছে। ঘরের সবাই প্রসাদ পেয়েছে। কর্তা বাইরের বারান্দায় খেজুর পাতার চাটাইয়ের ওপর বসে গান ধরেছে—'গুরু তোরে কি ধন দিল চিনলি নারে মন।' ছেলেমেয়েরা উঠানে জল-কাদায় মধ্যেই খেলছে। ওদের মা এখনও প্রসাদ নেয়নি। যদি কেউ আসে—যদি সব ফুরিয়ে যায়। আয়োজন তো বেশি নেই। তাই প্রসাদ নেয়নি। পুজো করেছেন বামুন ঠাকুর। দক্ষিণা এক সিকি—মানে আগের ষোল পয়সা—এখনকার পঁচিশ পয়সা।

কলিকাতা বিমান বন্দর থেকে যশোর রোড ধরে হাবড়া। হাবড়া থেকে বসিরহাট রোড ধরে কৃষ্ণনগর একখানি গ্রাম হাবড়া ব্লকের মধ্যে। গ্রামের পূবদিকে নতুন বসতি—সত্যনারায়ণ পল্লী। পল্লীর পূব পাশে উত্তর-দক্ষিণে নিকাশী খাল উত্তরে যমুনা নদীতে গিয়ে পড়েছে। খালের ওপর পাকা সেতু। হাবড়া থেকে বসিরহাটের বাস চলে এই পথ দিয়ে। খালের পশ্চিম পাশে সরকারী জমি। মাঠের ফসল আনার জন্য গরুর গাড়ি চলার পথ। সেই পথের উপরেই উত্তর দক্ষিণে লম্বা বসতি। জোর করেই দখল নিয়ে বসেছে। পল্লীতে ১৬৮টি পরিবার। সবারই এক মাপের জমি। ১৮ হাত লম্বা ১৮ হাত চওড়া। এর মধ্যেই থাকার ঘর, রান্না ঘর, গরুর ঘর, ছাগলের ঘর, হাঁস, মুরগী রাখার জায়গা। আবার প্রত্যেকেরই তুলসী মঞ্চ। দিন মজুরী এখানকার মানুষের প্রধান জীবিকা। বছরে তিন চার মাস কাজ প্রায় থাকে না। তখনই হয় মুশকিল। কেউ কেউ রিক্সা ভ্যান

চালায়। কেউ ছোটখাট ব্যবসা আর রেলে হকারি করে দিন চালায়। সবার ঘরেরই মাথায় খড়, বেড়া পাটকাঠির। মেয়েরাও বসে থাকে না। লোকের বাড়িতে কাজ করে। ধান সেদ্ধ করে চাল করে বেচে। যারা দিন-মজুর তাদের অনেকে মাসের সবদিনই কাজ পায় না। যেদিন কাজ থাকে না সেদিনই উপোস অতিথি হয়ে ঘরে জাঁকিয়ে বসে। দেনা বাড়ে। দোকানদার ফিরিয়ে দেয়। পল্লীর সকলেই পূর্ববঙ্গের লোক। তফসিল সম্প্রদায়ের, নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের দরিদ্র মানুষ। এরা কেউ সেই '৭০ খ্রীষ্টাব্দের ভারত-পাক যুদ্ধের সময় উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল—আর ফিরে যায়নি। কেউ মরিচঝাপি থেকে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছে এখানে। কিছু আছে, সম্প্রতি এসেছে গোপনে, ভারত-বাংলাদেশের সীমানা ডিঙিয়ে গোপন পথে। আবার কেউ এখানে সেখানে ছিল; আত্মীয়স্বজনের সূত্র ধরে এসে ঘর বেঁধেছে পল্লীতে।

পল্লীর মানুষের চলার জীবনে দুঃখ আছে, কষ্ট আছে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি আছে। আছে ঈর্ষা। আবার আনন্দও আছে। সবাই মিলে কালীপূজা করে। ঘরে ঘরে মনসা-পূজা আছে, আছে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। মেয়েদের এই দুঃখের মধ্যেও ব্রত-নিয়ম আছে। এখানকার মানুষের অনেকের গলায় মালা। আছে তাদের হরি। আছে তাদের গুরু। আছে মন্ত্র। আছে সন্ধ্যায় হরির লুঠ। আছে দলাদলি। বিচার-আচার সবই আছে। আবার আছে সন্ধ্যায় সব ভুলে হরিনামে বিভোর-করা কীর্তন। সারারাত ডঙ্কা বাজিয়ে 'হরিবোল' ধ্বনি। সারা রাত ধরে কালীপূজায় গান-বাজনা-নাচ করে আনন্দ করা। এসব নিয়ে পল্লীর মানুষের চলমান জীবন।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ থেকে এই পল্লীতে কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করা হয়েছে। পল্লীর যুবকদের নিয়ে তৈরি হয়েছে একটি সংগঠন—'নারায়ণ সেবা সংঘ'।

এই নারায়ণ সেবা সংঘের কর্মিদের মাধ্যমেই চলছে লোকশিক্ষা পরিষদের কাজ। পল্লীতে লোকশিক্ষা পরিষদের সহায়তায় বসেছে তিনটি নলকূপ, জল পিপাসা নিবারণের জন্য। তিনটি বিধিমুক্ত শিক্ষাকেন্দ্র চলছে লোকশিক্ষা পরিষদের সাহায্যে। পল্লীর মানুষেরা ভিক্ষে করে জিনিস-পত্র সংগ্রহ করে শিক্ষাকেন্দ্রের ঘর তৈরি করেছে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন-কর্মিদের চেষ্টায় তৈরি হয়েছে 'নারায়ণ সেবা সংঘের' কার্যালয় গৃহ। আশ্রমের অধ্যক্ষ পল্লীর প্রত্যেক ঘরের জন্য একটি করে ফল গাছের কলম নিজ হাতে বিতরণ করে যান। অতি যত্ন করে পল্লীর মানুষেরা গাছগুলি বাঁচিয়েছিল। কিন্তু বন্যায় সব ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে।

কাজের সূত্রে মিশন-কর্মিদের অনেক সময় আসতে হয় এই পল্লীতে। তাতে পল্লীর মানুষের সাথে গড়ে উঠেছে এক সুন্দর সম্পর্ক। সেই সম্পর্কের দাবীতেই কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার নিমন্ত্রণ। আর সেই সম্পর্কের টানেই মিশন-কর্মী উপস্থিত হয়েছেন পূর্ণিমার রাত্রে এই জলকাদাময় পল্লীতে। পাকা রাস্তা থেকে নামতেই যে ছোট্ট মেয়েটি হাত ধরে বলল, আমাদের বাড়ি যেতে হবে, তাদের বাড়ির কথা দিয়েই এই নিবন্ধের শুরু।

মিশন-কর্মী ওদের বাড়ি যেতেই ঘরের কর্তা গান বন্ধ করে বাইরে এসে আপ্যায়ন করে ঘরে নিয়ে বসাল। মাটির কলসির জলে পা ধুয়ে মিশন-কর্মীটি এসে বসল কর্তার চাটাই-এর এক পাশে। মেয়েটি ঘরে চলে গেল। মাকে গিয়ে জানাতেন শুরু করল প্রসাদ দিতে। মহিলা বিপন্না। ভদ্র-লোককে দেবার মতো প্রসাদ তো নেই! আর দেবার মতো পাত্রই বা কোথায়? মিশন-কর্মী

মেয়েটিকে বলল—কলাপাতায় খই, বাতাসা আর জল নিয়ে আয়। কর্তা বললেন—কি আর দিমু আপনাগো। মা লক্ষ্মী আমাগো দিকে চাইলেন কই! এই তো বন্যায় সব ডুইব্যা গেল। স্কুল ঘরে গিয়ে ওঠলাম। মহারাজ লেবু গাছটা দিছিলো, তিনগা লেবু অইছিল। কারোরে ছুঁইতেও দেই নাই। ভাবছি, মহারাজ হাতে কৈর‍্যা দিছে। মহারাজ আইলে সরবৎ কৈর‍্যা খাওয়ামু। তারপরে আমরা খামু। জলে সব ভাসাইয়া নিল। কাম কম্ম নাই। বছরের পূজা। না করলে কি গেরস্তের চলে! পাঁচটা টাকা ধার কৈর‍্যা আনলাম। দুই টাকার আটা কিনছি নিজেগো খাওনের লাইগ্যা। আর তিন টাকার পূজার জিনিস আনছি। কি করুম কন? গেল বছরও ঠাকুর কিন্যা মার পূজা দিছি। এবার আর পারলাম না। খুকির মা যেই বাড়ি কাম করে হেইখান থিকা ছবিখান আনছে। পোলা-পানরা ছাড়ে না। আর পোলাপানের দোষ দিমু কি—পোলাপানের মায় কি কম? উপাস কইর‍্যা আছে। যে বাড়ি কাম করে হেই বাড়ির ফুল, চন্দন, ধূপ, একটু ফল চাইয়া আনছে। হেইয়া দিয়া মার পূজা অইলো। মার যেমন ইচ্ছা!

—তা এবার এই বন্যা গেল, এবার না হয় পূজা নাই বা করতেন—ঘরের জলও তো এখনও শুকোয়নি!

কর্তা বললেন—এইডা কি কইলেন? বছরকার পূজা না করলে অয়? সবই মায়ের ইচ্ছা! বড়-লোকের বাড়িতে মা ভাল কৈর‍্যা পূজা নিবো। আমাগো তিন টাকার পূজাতেই মার আসতে অইবো। না আইয়া পারবো না। ক্যান আমরা অন্যায়ডা করছি কি? মা আমারে বড়লোক বানাইয়া দিলেই পারতো? হেইলে তো ভাল কৈর‍্যা পূজা পাইতো। ছাখেন, আমরা অইলাম হিন্দু মানুষ—আমরা এইসব না কৈর‍্যা পারুম না। ইষ্টিসনের প্লাটফরমে রইছি—হেইয়াও মার পূজা ভুলি নাই। এইয়া না কৈর‍্যা আমরা বাঁচতে পারুম না।

মেয়েটি পাতায় করে প্রসাদ নিয়ে এল। খই, বাতাসা, কলা, একটু শশা। ওর মা এসে দাঁড়িয়েছে দুয়ারে। নিচু গলায় বলল—আমাগো কি আছে কি দিমু আপনারে—

মিশন-কর্মী: মা লক্ষ্মী যা খেয়েছেন তাই তো দিয়েছেন—আবার কি দেবেন?

কর্তা: এইবার তুমি পেরসাদ লও। রাইত তো কম অয় নাই। সারাডা দিনই তো উপাসে কাডাইয়া দিলা। মিশন-কর্মীর নজর পড়ল ঘরের প্রসাদের দিকে। অবশিষ্ট আর তেমন কিছু নেই। প্রসাদ খেতে খেতে কর্তার সাথে কথা: সারা জীবন ধরেই তো মায়ের পূজা করলেন। কই, মা তো কৃপা করলেন না।

কর্তা যেন একটু রুষ্টই হলেন: মার কিরপা না থাকলে বাইচ্যা আছি কেমনে? জীবনডার উপর দিয়া তো কম যায় নাই। মা সব সময় বাঁচাইয়া রাখছে। গুরু রক্ষা কৈর‍্যা যাইতাছে। আমরা তো হেই ভরসা লইয়াই থাকি। হরির নাম, গুরুর নাম করি। গুরু যেমন রাখে—

মিশন-কর্মী: হরির নাম গুরুর নাম করে কি হল বলুন—

কর্তা: না কৈর‍্যাই বা কী অইতো কন? আমরা হিন্দু মানুষ। হরির নাম—গুরুর নাম না করনই তো আমাগো পাপের কাম। হেইয়া তো বাদ দেয়ন যায় না। হেইলে আমাগো থাকলো কি?

মিশন-কর্মী: এ করে কি মনে বল পাচ্ছেন?

কর্তা: হেইয়া কইমু ক্যামনে। হরির নাম, গুরুর নাম কৈর‍্যাই তো আছি। বাঁচাইয়া তো দেয় দেখি। শোনেন হেই দিনের কথা। হেই দিন কোন কাম পাই নাই। ঘরে কিছু নাই। পোলাডার জ্বর। মুখে কিছু দেয়ন যায় নাই। বিকালে একটা কাম কৈর‍্যা তিনডা টাকা

পাইলাম। হেইয়া লাইয়াই আডে (হাট) গেলাম। তিন টাকায় কি অইবো কন পাঁচজন মাইন্‌ষের। পোলাডার জন্ম সাবু, চিনি কেনলাম। আর একটা কুমড়া কেনলাম। ভাবলাম, কুমড়াডা সেদ্ধ কৈর‍্যা লবণ মরিচ দিয়া সবাই খাইমু। আডের থিকা আইথে রাইত অইলো। এমনও কপাল, বাড়ি আইয়া দেখি দুইজন অতিত আইছে। কন দেহি তখন কি করি? অতিত্‌রে যত্ন কইরা বওয়াইলাম। অতিত তো ভগবান। হারে তো ফালান যায় না। কিন্তু খাইতে দিমু কি? ঠাকুরের কাছে কাইন্দা কইথে লাগলাম—ঠাকুর এহন আমি কি করুম। এমন সময় আমার জ্যাডাতো ভাই দয়াল আইয়া কইলো, অতিতরা আমাগো বাড়িতে খাইবো। পাক চড়াইয়া দিছে। মনডা খারাপ অইয়া গেল। অতিত্‌রে ফেরত দিতে অইবো। মনে করলাম, ঠাকুরের ইচ্ছা। দয়াল অতিতগো লইয়া গেল। আমাগো এইডাই তো বিশ্বাস। এই ভরসা কৈর‍্যাই তো দুঃখ-কষ্টের মধ্যে বাইচ্যা আছি। কি কন আপনে?

মিশন-কর্মী: আমি আর কি বলব? ভগবানের যা ইচ্ছা তাই হবে।

কর্তা: হার ইচ্ছা ছাড়া কিছু অয়? হেইজনের ইচ্ছাতেই খাডি-পিডি খাই। যেদিন কাম পাই না, না খাইয়া থাকি। ভাবি আইজ মাপায় নাই। কার লগে মারপিট করতে যামু? চেষ্টা তো করি। হ্যাখেন ছাগল পালি, হাঁস পালি, বৌ কাম করে, কেউ তো বইয়া থাকি না। তেনার যেমন ইচ্ছা! ঠাকুরের কাছে কাইন্দা কই—মরার আগে তোমার নাম লইয়াই যেন মরণডা অয়।

এই পল্লীর ঘরে ঘরে আজ আনন্দ। এক সপ্তাহ আগেও জলে ডোবা ছিল। আজ কে বলবে পল্লীটা জলে ডোবা ছিল! ঘরে ঘরে পুজো। অনেকের ঘরেই হয়তো ভাত নেই। তবু পূজা ছাড়া যাবে না। পূজা না করলে ওরা বাঁচবে না। মিশন-কর্মীকে কাদা ঠেলে ঠেলে অনেকের বাড়িতেই যেতে হল। না গেলে ওরা রাগ করবে। ঘরে ঘরে ক্ষুদ্র আয়োজন। অথচ কি ভক্তি কি নিষ্ঠা! তার কোথাও কমতি নেই। কাদা ঠেলে লোকেরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে। প্রসাদ নিচ্ছে। কীর্তন বসছে। ওদের অনেক কিছুই নেই। তবু মনের জোরের কমতি নেই। সারাদিন মাঠ-ঘাটে খাটে। সারারাত খোল বাজায়। হয়তো সবদিন খাওয়া হয় না। তবু হরির নাম করতেই হবে। অনেক রাত অবধি খোল বাজাতে হবে। কোথায় পায় এই শক্তি? কে যোগায় এই প্রেরণা? ওদের হরি আর গুরুই কি এই শক্তির উৎস? তাই যদি হয় তবে ওদের পেটে দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোটে না কেন?

আর জোটে না বলেও তো ওদের ক্ষোভ নেই। আমরা আমাদের স্বার্থে ওদের বোঝাই, ওদের নিয়ে দল করি, ওদের নিয়ে মিছিল, ধর্মঘট করি—ওরা কি সত্যিই তাই চায়? ওদের মনের রাজ্যে, ওদের হৃদয়ের দুয়ারে কি আমরা সত্যি পৌঁছোতে পারি? বোধ হয় স্বামীজী ওদের চিনতে পেরেছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন, পেরেছিলেন ভালবাসতে। তিনি জেনেছিলেন ওদের শক্তির কথা—একমুঠো ছাতু পেলে ওরা দুনিয়া উলটে দিতে পারে। ওদের তেমন করে চেনা আমাদের হয়নি। তাই ওদের জন্য মমতা, ওদের জন্য দরদ আমাদের উৎসারিত হয় না। আমরা আমাদের স্বার্থে ওদের উপকার করি—ভালবাসি না।

কী বিশ্বাস ভগবানের উপর! ঘর ছাড়তে পারবে—এই বিশ্বাস ছাড়তে পারবে না। এই বিশ্বাসই তো অসীম দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ওদের বেঁচে থাকার প্রেরণা। একেই কি বলে ভগবানকে ধরে থাকা?

পল্লীতে তখনও শাঁখ বাজছে, মুহুর্মুহুঃ উলু-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, কীর্তনের খোল-করতাল দ্রুত তালে বাজছে। সবার ঘরের পুজো এখনও শেষ হয়নি। পুজো এখনও চলছে। পল্লীর দুঃখ-কষ্টময় জীবনে আজ আনন্দের উচ্ছ্বাস। আর সেই আনন্দের উৎস—মা লক্ষ্মীর আগমন। ওদের জীবনে এটাই সত্য।

ধর্মমহাসম্মেলন

(পার্লামেণ্ট অব্ রিলিজিয়ানস্)

মারি লুইস্ বার্ক

১১ সেপ্টেম্বর সকালে চিকাগোর আর্ট[1] ইন্‌স্টিট্যুটে ধর্মমহাসম্মেলন শুরু হল। আর্ট ইন্‌স্টিট্যুট এবং আর্ট প্যালেস—এই দুটির মধ্যে গোলমাল যেন না হয়। আর্ট প্যালেস মেলা-প্রাঙ্গণে একটা সাময়িক ব্যবস্থা, যদিও তার জাঁক-জমক কিছু কম ছিল না। আর্ট ইন্‌স্টিট্যুট চিকাগো এভিনিউতে অবস্থিত পাকা এবং নব-নির্মিত সৌধ—তবে সেটা যে কাজের জন্য তৈরি হচ্ছিল সেই শিলাসামগ্রী রক্ষণের উপযোগী হয়ে তখনও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। সেখানে প্রায় ত্রিশটা 'হলে' সম্মেলনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়েছিল। এই বাড়িটির সঙ্গে মেলার প্রকৃতপক্ষে কোন সম্পর্ক ছিল না এবং প্রদর্শনী সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বহু অস্থায়ী বাড়ির মতো এটি অবলুপ্ত হয়নি পরন্তু ইতালীয় রেনেসাঁসের আদলে চুনাপাথরে তৈরি পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর যাদু-ঘরটি আজও বর্তমান। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এর বর্তমান বিশাল আয়তন তো ছিলই না, বলতে গেলে, প্রথম পর্যায়টিমাত্র সম্পূর্ণ হয়েছিল—তাও পুরো-পুরি নয়। এর কেন্দ্রীয় গোল গম্বুজটি তখনও অসম্পূর্ণ—চমৎকার সিঁড়িটিও শেষ হয়নি। ব্রোঞ্জের যে সুন্দর সিংহদুটি আজ প্রবেশপথে রক্ষী হয়ে আছে, এই সম্মেলনের পরের বছরের আগে তাদেরও আবির্ভাব ঘটেনি। বিশ্বধর্ম সম্মেলনের জন্য দুই সৌধের পার্শ্ববর্তীস্থানে অস্থায়ীভাবে তৈরি হয়েছিল প্রত্যেকটিতে ৩০০০ হাজার লোক বসতে পারে এমন দুটি বড় 'হল' এবং তার সংলগ্ন ঘর যাতে হাজার লোকের স্থান হতে পারে। উত্তরেরটি 'হল অব্ কলম্বাস' এবং দক্ষিণেরটি 'হল অব্ ওয়াশিংটন' (অতিরিক্ত একটা গ্যালারী সংযুক্ত)। প্রথমোক্ত 'হল'-টিতেই সেই স্মরণীয় দিবসের সকালে সমবেত হয়েছিলেন সম্মেলনের প্রতিনিধিরা।

"তোমাদের কাছে আমার নব-নির্দেশ—পরস্পরকে ভালবাসো" এই কথাগুলি খোদিত 'নিউ লিবার্টি বেল'-এ দশটি পবিত্র ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে ঘোষিত হল সম্মেলনের উদ্বোধন, বেলা দশটায়। আস্তিক্য (ব্রাহ্মসমাজ), ইহুদী, ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, তাও, কনফুশিয়াস, শিণ্টো জরথুস্ত্র, ক্যাথলিক, গ্রীকচার্চ ও প্রোটেস্টাণ্ট—সভাপতি বোনীর তালিকাভুক্ত এই দশটি প্রধান ধর্মের প্রতীক হিসাবে দশবার ঘণ্টাধ্বনি। কোন প্রতিনিধির পক্ষে অবশ্য সেই ঘণ্টাধ্বনি শোনা সম্ভব ছিল না, কারণ মেলার অন্যতম দর্শনীয় বস্তু হিসাবে সেটি স্থাপিত হয়েছিল সম্মেলনের স্থান থেকে বেশ অনেকখানি দূরে। দর্শকদের আহ্বান জানানোর ব্যাপারেও ঘণ্টাটির কোন ভূমিকা ছিল না। বহু আগে থেকেই ইন্‌স্টিট্যুটের ওক কাঠের বড় বড় দরজার সামনে অজস্র মানুষের ভিড়[1]—চার হাজার শ্রোতা 'হল অব্ কলম্বাসে'র মধ্যে এবং গ্যালারীতে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিল প্রতিনিধিদের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায়। সে যেন চার্চের স্তব্ধতা। শোনা যায় "এই বিপুল জন-সমষ্টি এত আশ্চর্যজনক ভাবে শান্ত ছিল যে, একটি ছোট্ট পাখী খোলা জানলা পথে এসে শূন্য মঞ্চের উপর দিয়ে যখন উড়ে গিয়েছিল তখন তার ডানার শব্দটিও শোনা গিয়েছিল।"[2]

পুরো প্রেক্ষাগৃহের সম্পূর্ণ প্রস্থের কম জায়গা

১ চিকাগো ডেলি ইন্টার ওসান, সেপ্টেম্বর ১২, ১৮৯৩

২ ওয়াল্টার অব্ হাউটন (সম্পাদিত) 'দি পার্লামেণ্ট অব্ রিলিজিয়ানস্ অ্যাণ্ড রিলিজিয়াস কংগ্রেস অ্যাট দি ওয়ার্ল্ড'স্ কলাম্বিয়ান এক্সপোজিসন—৩৪

জুড়ে তৈরি মঞ্চটি লম্বায় আনুমানিক পঞ্চাশ ফুট গভীরতায় দশফুট। প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে শূন্য মঞ্চটিকে বিষণ্ণ এবং নানাবস্তুর সমবায়ে এলোমেলো দেখাচ্ছিল। মঞ্চের দেওয়ালে যেখানে জাপানী ও হিব্রু পুঁথির মতো কিছু ঝুলছিল—তার প্রায় ২৫ ফুট দূরে সিসেরো ও ডেমোস্থিনিসের দুটি চিন্তামগ্ন মর্মর মূর্তি। ডেমোস্থিনিসের বাম পাশে তুলনায় ছোট একটি ব্রোঞ্জের কুমারী মূর্তি—হাতে উড্ডিন্নপক্ষ পাখীর নীড়, যার মধ্যে থেকে একটি পাখীকে সেই কুমারী তার উর্ধ্বাগ্নিত ডান হাত দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে। সবচেয়ে অভিনব বস্তু ছিল সিংহাসনের আকারের একখানি লোহার চেয়ার যার পিঠের দিকটা সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত। উদ্বোধনী দিবসে দুটি মর্মরমূর্তির মধ্যবর্তীস্থানে সেই চেয়ারখানি সংরক্ষিত ছিল আমেরিকার চার্চের সর্বোচ্চ যাজক কার্ডিন্যাল গিবন্সের জন্য। সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে তিন সারিতে তিরিশটি করে সরু লম্বা পিঠওয়ালা চেয়ার—সম্মেলনের প্রতিনিধি, কর্মকর্তা এবং নিমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য অপেক্ষারত। বক্তাদের জন্য স্বতন্ত্র একটি মঞ্চ দৃশ্যপটটিকে সম্পূর্ণ করেছিল।

ঠিক উদ্বোধনী দিবসে নয়, তারপরে কোনও একদিন বক্তৃতামঞ্চটির সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় একটি বিজ্ঞপ্তি—"চিকাগো ডেলি এক্সপ্রেসের অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি ভিন্ন অন্যের প্রবেশ নিষেধ।" বক্তৃতামঞ্চটির নিচেই ছিল সংবাদপত্রের ভারপ্রাপ্ত সংবাদদাতা ও দ্রুতলিপিকার জন্য রক্ষিত কতকগুলি ছোট টেবিলে সভার কার্য-বিবরণী গ্রহণের ব্যবস্থা। কিন্তু শ্রোতাদের অনেকেই কিছু আগে উপস্থিত হয়ে এগুলি দখল করত। আবার কিছু উৎসাহী শ্রোতা বা ম াদা-সম্পন্ন মানুষও সম্মেলনের শেষের দিকে মঞ্চের কাছাকাছি এগিয়ে আসার জন্য চাপ সৃষ্টি করে একটা সারি তৈরি করার চেষ্টা করতেন। তাদের উদ্দেশ্যেই ছিল এই বিজ্ঞপ্তি। একজন মহিলা-সাংবাদিক (সাংবাদিকদের মধ্যে দুজন মহিলা ছিলেন) পরে জানিয়েছিলেন—উৎসাহী জনতা মঞ্চের দিকে এগিয়ে এসে স্বামীজীর বস্ত্রপ্রান্ত স্পর্শের জন্য কিভাবে চাপ সৃষ্টি করত। সেই মুহূর্তে স্বামীজী তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন যে মহত্ত্ব ও অবিচলিত নম্রতার সঙ্গে গ্রহণ করতেন তা দেখে মহিলা-সাংবাদিক বিশেষভাবে অভিভূত হয়েছিলেন।

উদ্বোধন দিবসের সেই শূন্য মঞ্চের কথায় ফেরা যাক। মঞ্চটিতে যেন একটা দ্রুত অস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের চেহারা ফুটে উঠেছিল। দেখে মনে হয়, যেন বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলার জন্য ব্যক্তিবিশেষের একটা অসফল প্রয়াস,—যেন পরস্পর অসম্পর্কিত বস্তুসমূহের জগাখিচুড়ি, যার মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা আকর্ষণীয় কেউ কিছু খুঁজে পাবেন না। যাই হোক, রেভারেণ্ড ব্যারোজ পরে অন্য সূত্রে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলে-ছিলেন, "কোন আড়ম্বরের চেষ্টা থাকলে সেটা নৈতিক মর্যাদা এবং সম্মেলনের উদ্দেশ্যের গাম্ভীর্য রক্ষার অনুকূল হত না।"[৩]

আড়ম্বর অবশ্য যথেষ্টই ছিল, তবে তাকে সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করার জন্য চিন্তাভাবনার কিছু পরিচয় মেলেনি। অট্টালিকার অন্য পাশে সভাপতি বোনীর অফিসটি পরিণত হয়েছিল অভ্যর্থনা কক্ষে, "যেখানে কমলা রঙের পোষাক-পরিহিত বেনী-সমন্বিত চীনারা, পবিত্র বর্ণাঢ্য পোষাক ও বহুবিচিত্র রঙের উষ্ণীষ-পরিহিত জাপানীরা; লাল, কমলা ও সবুজের সমারোহ-পূর্ণ আলখাল্লা-পরিহিত ভারতীয়রা; জার্মান, রাশিয়ান, স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ানরা; ব্রিটেনের অধিবাসী

৩ জন্ হেনরি ব্যারোজ (সম্পাদিত) 'দি ওয়ার্ল্ডস্ পার্লামেন্ট অব্ রিলিজিয়ান্স্'—৬২

এবং তাদের অধিকৃত উপনিবেশের মানুষজনেরা, আধ ডজন দোভাষী—সবাই মিলেমিশে বিশ্ব-ঐক্যতানের সুষমা সৃষ্টি করেছিল। কিছু মহিলাও ছিলেন এবং তাঁরাও যথেষ্ট মনোযোগের অধিকার লাভ করেছিলেন—এ ধরনের জন-সমাবেশে ভগ্নীত্ববোধের বাড়াবাড়ি ছিল না। পরিবেশটা ছিল ভ্রাতৃত্ববোধ প্রধান এবং পুরুষালি ধরনের, তবে নারীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই সে পরিবেশ ছিল উপযুক্ত।"[৪]

নির্ধারিত সময়ে, বেলা ১০টায় এই বর্ণোজ্জ্বল দলটির যাত্রা শুরু হল। মিছিলের পুরোভাগে পরস্পর করবদ্ধ হয়ে সভাপতি বোনী এবং কার্ডিন্যাল গিবন্স—কার্ডিন্যালের পরনে দীপ্ত রক্তাম্বর এবং সভাপতির পরনে মর্যাদা ও আভিজাত্যপূর্ণ প্রভাতী পোষাক। এঁদের ঠিক পেছনেই বিশ্বপ্রদর্শনীর বোর্ড অব্ লেডি ম্যানেজার্স-এর সভানেত্রী শ্রীমতী পটার পামার ও সহ-সভাপতি শ্রীমতী চার্লস এইচ হেনরোটিন। তাদের পরনে ছিল স্ফীত-হাতা, বিস্তৃত পরিধির পোষাক। মিছিলটি ধীর পদক্ষেপে রাজকীয় চালে প্রেক্ষাগৃহের পশ্চাতের দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে দর্শকদের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নানাজাতির পতাকাগুলির নিচে দিয়ে কেন্দ্রীয় স্তম্ভের নিচে পৌঁছল। শ্রোতৃমণ্ডলীর তরঙ্গায়িত হর্ষধ্বনির মধ্যে দিয়ে অবশেষে মঞ্চে আরোহণ করল।

"সে এক অপূর্ব মনোহর দৃশ্য (বলেছেন হাউটন)। বিচিত্র পোষাক, উষ্ণীষ আর আচ্ছাদনে, ক্রশ আর অর্ধচন্দ্রাকৃতি-আভরণে, দীর্ঘ-কেশ আর মুণ্ডিত মস্তকের সমবায়ে এক অপরূপ সমন্বয়।"[৫] সকলের মাঝখানে লৌহ-নির্মিত সিংহাসনে বসলেন কার্ডিন্যাল গিবন্স। তাঁর দক্ষিণে দীর্ঘ-তরঙ্গায়িত শুভ্র পরিচ্ছদে চীনদেশ থেকে আগত পাঁচজন বৌদ্ধ পুরোহিত এবং বামে "মাথায় অদ্ভুত ধরনের টুপি, পরিধানে রহস্যময় কালো আলখাল্লা, প্রাচীন ধর্মীয় ক্রিয়া-কাণ্ডের নক্সা কাটা গজদন্তের ছড়িতে ভর দিয়ে"[৬] প্রাচীন গ্রীক চার্চের যাজক। কনফুশিয়াস মতবাদ উপস্থাপনার জন্য চীন সম্রাট কর্তৃক মনোনীত ওয়াশিংটনের চীন দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারীর আচ্ছাদন ছিল কমলা রঙের। ছবিতে দেখা যায় তিনি চীনাপুতুলের মতো চন্দ্রাকৃতি গোলাকার মুখে দর্শকের দিকে ফিরে ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক ভঙ্গীতে সোজা হয়ে বসে আছেন। আবার হাউটনের কথাই উদ্ধৃত করি "জাপানের রাষ্ট্রীয় ধর্মের প্রধান পুরোহিতের পরনে ছিল রামধনু রঙের ঢেউ খেলানো পোষাক। বৌদ্ধ শ্রমণদের আচ্ছাদন ছিল সাদা ও হলুদের··· বাণ্টের আর্কবিশপের শিরোধান থেকে কোমর পর্যন্ত কালো উড়ানী, পরিধানে ছিল উজ্জ্বল লাল রঙের ঢিলা আঙরাখা, বুকে ঝকমক করছিল সোনার চেন। ধর্মপালকে চেনা যাচ্ছিল তার পশমী পোষাকে [ছোটখাট কোমল মানুষটি পরেছিলেন নিখাদ সাদা পোষাক—স্কন্ধ পর্যন্ত প্রলম্বিত তাঁর কালো কুঞ্চিত কেশ] এবং ইউরোপীয় কেতা থেকে প্রায় স্বাতন্ত্র্যহীন কালো পোষাকে সজ্জিত 'ওরিয়েন্টাল ক্রাইস্ট' গ্রন্থ প্রণেতা মজুমদার।" চিত্রটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রত্যক্ষদর্শী মিঃ ওয়াল্টের (ধর্মপাল সম্পর্কিত বন্ধনীর কথাগুলিও তাঁর) শেষবাক্যটি উদ্ধৃত করছি[৭]—"আফ্রিকার মেথডিস্ট চার্চের বিশপ এবং আফ্রিকার এক রাজকুমারের আবলুষ কালো অথচ উজ্জ্বল মুখগুলির একঘেয়েমি দূর হয়েছিল সঙ্গিনীদের সুন্দর পোষাকগুলির জন্য—এই সঙ্গে প্রোটেস্টান্ট প্রতিনিধি এবং আমন্ত্রিতদের সকলের

৪ চিকাগো ডেলি ইণ্টার ওসান, সেপ্টেম্বর ১২, ১৮৯৩

৫ হাউটন, ৩৪ ৬ ঐ ৭ ঐ, ৩৪—৩৫

কালো পোষাকে একটা বিষণ্ণ পটভূমিকা রচিত হয়েছিল।"[৮]

এই চিত্তাকর্ষক গোষ্ঠীর মধ্যে বসে ছিলেন স্বামীজী। সকল বিবরণীতেই দেখা যায় "মাথায় কমলা রঙের উষ্ণীষ এবং পোষাক ছিল দৃষ্টি আকর্ষণকারী" অথবা মিঃ ওয়াণ্টের কথাটাই ভাল। "বর্ণোজ্জ্বল লাল আঙরাখা এবং ব্রোঞ্জ মুখমণ্ডল ঘিরে হলুদ পাগড়ী।"[৯]

এই হল মঞ্চের উপরের দৃশ্য। এর মুখোমুখি বসেছিল নারীপুরুষ সমন্বয়ে বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলী। মেঝে এবং গ্যালারীর প্রতিটি আসন পূর্ণ, আর তার মধ্যে ছিলেন ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ উভয় সম্প্রদায়ের সমকালীন বুদ্ধিজীবীরা। হাউটন লিখেছেন, "এরকম দৃশ্য পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো দেখা যায়নি।"[১০] পরবর্তিকালে স্বামীজী লিখেছেন "আমার হৃদ্‌কম্প হচ্ছিল, জিভ শুকিয়ে আসছিল।"[১১] এতে আশ্চর্যের কিছু নেই কারণ তিনি আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করলেন, তাঁকে ঘিরে বসে আছেন মহিমান্বিত গুরুগম্ভীর বুধ-মণ্ডলী, যাঁরা সারা পৃথিবীর ধর্মচিন্তার প্রতিনিধি। যদিও এর আগে তিনি আমেরিকাতে ছোট ছোট গোষ্ঠীর কাছে বক্তৃতা দিয়েছেন (সে কথা পূর্ব অধ্যায়ে জানিয়েছি) কিন্তু এত বিরাট জন-সমাবেশে বক্তৃতা করা দূরে থাক কখনও প্রত্যক্ষও করেননি।

অকস্মাৎ গ্যালারীতে স্তোত্রধ্বনি ঝঙ্কৃত হল এবং সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর কণ্ঠে ধ্বনিত হল "Praise God, from whom all blessing flow./Praise him all creatures below ;/ Praise him above, Ye heavenly hosts ;/ Praise father, son and Holy Ghost".

দিকে দিকে প্রবাহিত যাঁহার করুণা
গাও তাঁর নাম।
মর্ত্যধামবাসী প্রানিগণ সবে
গাও তাঁরি নাম।
হে দিব্যাত্মাগণ! গাও তাঁর নাম
(সেই) পিতা, মানবপুত্র, পুণ্যাত্মার
উচ্চে লহ নাম।

আরও কয়েকটি পদ গীত হল এবং অবশ্যই সে সংগীতে হল অব্ কলম্বাস প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। প্রার্থনা-সংগীত শেষে কার্ডিন্যালের উত্তোলিত হস্ত কিছুক্ষণের জন্য প্রশান্ত নৈঃশব্দে পূর্ণ করল। সেই মনোরম স্তব্ধতার মধ্যে কার্ডিন্যালের কণ্ঠে শোনা গেল প্রার্থনা মন্ত্র— "স্বর্গধামবাসী আমাদের পরম পিতা······"(Our Father which art in heaven···) সমবেত প্রতিটি কণ্ঠ যুক্ত হল সেই সঙ্গে। হাউটন বলেছেন "আমরা উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মুহূর্তটিতে উপনীত হলাম।"[১২] *

৮ ব্যারোজ, ৬৪ ৯ ঐ, ৬২ ১০ হাউটন, ২২
১১ স্বামীজীর রচনাবলী (ইংরাজী) ৫, পৃঃ ২০ ১২ হাউটন, ৫৪

* Swami Vivekananda in the West : New Discoveries, Part one (3rd Edition, 1983) গ্রন্থের The Parliament of Religions পরিচ্ছেদের অংশবিশেষ (পৃঃ ৭৭-৭৯) অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত। সম্পূর্ণ অনুবাদ 'উদ্বোধন কার্যালয়' থেকে গ্রন্থাকারে যথাসময়ে প্রকাশ করা হবে।—সঃ
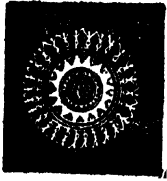
পুরাতনী

সত্যের মহিমা

কোশল দেশে দেবদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর কোন সন্তানাদি ছিল না। তাই পুত্রলাভের জন্য এক সময় তিনি যথাবিধি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। যজ্ঞের ফলস্বরূপ যথাসময়ে তাঁর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করল। দেবদত্ত পুত্রের নাম রাখলেন উতথ্য। কিন্তু যজ্ঞক্রিয়ায় সামান্য কোন ত্রুটি হওয়ার দরুন উতথ্য জড়বুদ্ধি হয়ে জন্মেছিল।

যাহোক, আট বৎসর বয়স হলে দেবদত্ত পুত্রের যথাবিধি উপনয়নের ক্রিয়া সম্পাদন করে বেদ-অধ্যয়নের জন্য গুরুর নিকট পাঠালেন। কিন্তু জড়বুদ্ধি-বশতঃ উতথ্য গুরুবাক্যের কিছুই বুঝতে পারতো না। গুরু যখন পড়াতেন তখন সে কোন বাক্য উচ্চারণ না করে মূঢ়ের মতো বসে থাকতো। পুত্রের এই অবস্থা দেখে পিতা নিজেই পুত্রের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। এতে দেবদত্ত যদিও অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হলেন, কিন্তু আশা ছাড়লেন না। চেষ্টা করে যেতে লাগলেন যাতে ছেলেটি লেখাপড়া শিখতে পারে। কিন্তু লেখাপড়া শেখা তো দূরের কথা, উতথ্য ব্রাহ্মণের অবশ্য-কর্তব্য সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্য কর্মও শিখতে সমর্থ হল না। 'ব্রাহ্মণের পুত্র হয়েও উতথ্য মূর্খ ছিল'—এ-কথা সমাজের সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। ব্রাহ্মণ হয়ে মূর্খ থাকা এবং শাস্ত্র-বিহিত কর্মাদি পালন না করা সেকালে অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল। তাই উতথ্যকে দেখলেই লোকে উপহাস করতো। পিতা-মাতাও নানা প্রকার ভৎর্সনা করতেন। এভাবে সমাজের লোকজন, মাতা-পিতা ও বন্ধু-বান্ধবকর্তৃক সর্বদা নিন্দিত হয়ে উতথ্যের মনে ভারী দুঃখ হলো এবং মনের দুঃখে কাউকে কিছু না বলে একদিন বনে চলে গেল। বনে গঙ্গার তীরে একটি গ্রামের নিকট কুটির নির্মাণ করে সে তপস্যা করবে স্থির করলো। কিন্তু শাস্ত্র-অধ্যয়ন, জপ, ধ্যান ও উপাসনার কোন বিধিই সে জানতো না। এমন কি জড়বুদ্ধিবশতঃ শুচি-অশুচি জ্ঞানও তার বিশেষ ছিল না। কিন্তু সে মনে মনে একটি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে বসলো। প্রতিজ্ঞা করলো 'আমি কখনও মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করবো না।' অন্য কোন প্রকার তপস্যাদি করতে না দেখলেও গ্রামবাসীরা যখন দেখলো যে উতথ্য কখনও মিথ্যা কথা বলে না, তখন তাকে তারা শ্রদ্ধার চোখেই দেখতে লাগলো এবং তাকে 'সত্যতপা' বা 'সত্যব্রত'—এই নামে অভিহিত করল।

ফল-মূলাদি ও ভিক্ষান্নে উতথ্যের জীবন এক প্রকার কাটতে লাগলো। কিন্তু মূর্খ বলে তার মনে শান্তি ছিল না। সে প্রায়ই মনে মনে আক্ষেপ করতো—'হায়! মূর্খের জীবনে ধিক্; কেন আমি মূর্খ হলাম, দৈবই আমাকে মূর্খ করেছেন। হায়! আমি মানব-জীবন লাভ করলাম, কিন্তু দৈববশে তা বিফল হল। আমি তো তপস্যার বিধি-নিয়ম জানি না, তবে আর কি প্রকারে তপস্যা করবো? তপশ্চরণ বিষয়ে আমার সংকল্প করাই বৃথা। আমার ভাগ্য অতিশয় মন্দ, একমাত্র মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়।' এভাবে চৌদ্দ বছর কেটে গেল, তথাপি তপস্যা বিষয়ে তার কোন জ্ঞানই জন্মাল না। শুধু খেয়ে শুয়ে প্রাকৃত মানুষের মতো জীবন

কাটতে লাগলো। তবে সর্বদা সত্যকথনের জন্য তার যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। যদিও এই যশের প্রতি তার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না। কারণ বুদ্ধি কম বলে নিন্দা-প্রশংসার সে বিশেষ কিছুই বুঝতো না।

একদিন এক ব্যাধের তীরে আহত হয়ে প্রাণভয়ে ভীত একটি শূকর নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে সত্যব্রতের কুটিরের নিকট এসে ভয়ে কাঁপতে লাগলো। ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রুধির-ধারায় শূকরটির দেহ ভেসে যেতে লাগলো। শূকরের এই দুর্দশা দেখে সত্যব্রতের মনে অত্যন্ত দয়ার সঞ্চার হল। কিন্তু সমবেদনা প্রকাশ করার মতো কোন শব্দ জানা না থাকায় আহত শূকরের প্রতি সে শুধু পুনঃপুনঃ 'ঐ' 'ঐ' শব্দ উচ্চারণ করে মনোবেদনা প্রকাশ করতে লাগল।

এদিকে আহত ও ভীত শূকর বাইরে যাওয়ার কোন পথ না পেয়ে কুটিরের পেছনে চুপ করে বসে রইল। কিছুক্ষণ পর ব্যাধ এসে কুটিরের সামনে উপবিষ্ট সত্যব্রতকে দেখে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল "হে দ্বিজবর! বাণবিদ্ধ শূকর কোন্ দিকে গিয়েছে দয়া করে বলবেন কি? শুনেছি, আপনি সত্য বই মিথ্যা কখনও বলেন না। তাই আপনার নাম 'সত্যব্রত'। এজন্যই আপনাকে আমার বাণবিদ্ধ শিকারের কথা জিজ্ঞাসা করছি। তাছাড়া আমি এ শূকরকে বাণবিদ্ধ করে কোন পাপ কাজ করিনি। কারণ ইহাই আমার একমাত্র জীবিকা। এ শূকরটিকে না পেলে আমার পরিবারবর্গ আজ উপবাসী থাকবে। অতএব হে ব্রাহ্মণ! দয়া করে আহত শূকরের সন্ধান বলে দিন।" ব্যাধের কথা শুনে সত্যব্রত এক মহা সঙ্কটের মধ্যে পড়ল। সত্যকথা বললে শূকরের প্রাণনাশ হবে এবং তজ্জনিত পাপের ভাগীও তাকে হতে হবে। অপর দিকে শূকরের সন্ধান জানা থাকা সত্ত্বেও না বললে সত্য ভঙ্গ হবে, তার যে একমাত্র প্রতিজ্ঞা তা নষ্ট হবে। এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়ে স্বভাবতই সে অত্যন্ত বিচলিত ও চিন্তিত হয়ে পড়ল।

তার মনের যখন এই অবস্থা তখন হঠাৎ তার মুখ দিয়ে নিজের অজান্তেই একটি শ্লোক নির্গত হল। যেমন আদি কবি বাল্মীকির মুখ দিয়ে ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে ব্যাধ কর্তৃক শরবিদ্ধ হতে দেখে সহসা অতি সুন্দর একটি শ্লোক নির্গত হয়েছিল। উতথ্যের মুখ দিয়ে যে শ্লোকটি বেরিয়েছিল তা হল:

যা পশ্যতি ন সা ব্রূতে যা ব্রূতে সা ন পশ্যতি।
অহো ব্যাধ! স্বকার্য্যার্থিন্! কিং পৃচ্ছসি পুনঃ পুনঃ॥

—যে-শক্তি দর্শন করে সে কিছু বলে না; আর যে বলে সে দর্শন করে না। অর্থাৎ দর্শন এবং বলনের কর্তা এক নয়। দর্শনের কর্তা চক্ষুরিন্দ্রিয়, সে কিছুই বলতে পারে না। আবার বলন ক্রিয়ার কর্তা বাগিন্দ্রিয়, কিন্তু সে দর্শন করতে পারে না। অথবা আত্মা সব কিছুরই সাক্ষিস্বরূপ বা দ্রষ্টা। বলনাদি ক্রিয়া আত্মার কার্য নয়। আত্মার উপস্থিতিতে ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য বলন, দর্শনাদি ক্রিয়া করে থাকে কিন্তু সাক্ষিস্বরূপ দ্রষ্টা তারা নয়। অতএব হে ব্যাধ! তুমি পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা না করে নিজ কার্যে গমন কর। অর্থাৎ তুমি নিজেই নিজের শিকার খুঁজে বের কর। একথা শুনে ব্যাধ শূকরের খোঁজে চলে গেল।

নিজের মুখ দিয়ে এরূপ তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোক বের হতে দেখে উতথ্য বড়ই আশ্চর্য হল। সহসা সে অনুভব করল, অখিল বিদ্যারাশি, বেদ-বেদান্তের সমস্ত জ্ঞান যেন তার করায়ত্ত হয়েছে এবং এক দিব্য জ্ঞানালোকে যেন তার অন্তর উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

শরাহত ও রুধিরলিপ্ত শূকরকে দেখে উতথ্য পুনঃপুনঃ 'ঐ' 'ঐ' শব্দ করে মর্মবেদনা প্রকাশ করেছিল। 'ঐ' বর্ণের মাথায় '৺' যোগ করলে সরস্বতীর বীজমন্ত্র 'ঐঁ' হয়। সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির মুখে স্বীয় বীজমন্ত্র উচ্চারিত হতেই দেবী সরস্বতী তা শুনতে পেলেন। মন্ত্র অর্ধ উচ্চারিত হলেও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির মুখে তা উচ্চারিত হওয়ায় দেবী তার দোষ না নিয়ে বরং প্রীতি লাভ করেন। তাই কৃপা করে তিনি উতথ্যকে সমগ্র জ্ঞানরাশি দান করলেন। দেবী সরস্বতীই উতথ্যের মুখ দিয়ে এমন তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য বলালেন যাতে সত্যনিষ্ঠের সত্যভঙ্গ না হয় এবং প্রশ্নকারীও যথাযথ উত্তর পেয়ে সন্তুষ্টি লাভ করে। জ্ঞানলাভ করে ধন্য হয়ে উতথ্য গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

দেবদত্ত-পুত্র উতথ্য জড়বুদ্ধি এবং মূর্খ হয়েও এবং কোন প্রকার তপস্যা না করেও সকল তপস্যার ফল লাভ করেছিলেন। কারণ একমাত্র সত্যে অটল থাকায় সকল তপস্যাই তার হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: "সত্যকথা কলির তপস্যা।...সত্যে থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায়" ইত্যাদি। (কথামৃত, ৩।১৪।৩) উপরোক্ত পৌরাণিক কাহিনীটিতে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত উপদেশের প্রতিধ্বনিই শুনতে পাই।

(শ্রীমদ্দেবীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের দশম ও একাদশ অধ্যায় অবলম্বনে)

পুস্তক সমালোচনা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থপরিক্রমা (প্রথম খণ্ড)— নির্মলকুমার রায়। প্রকাশক: নবভারতী প্রকাশনী, ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলিকাতা-৯। পৃষ্ঠা ২৮৭, মূল্য: ৩০ টাকা।

নরলীলায় অবতীর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সকল লীলাস্থলই ভক্তের নিকট তীর্থ বিশেষ। তিনি যেখানে বাস করেছেন, সাধনা করেছেন, যে সকল দেবালয়ে গমন করেছেন, এমন কি যেসব গৃহে পদার্পণ করেছেন, সবই তাঁর স্মৃতিবিজড়িত পুণ্যস্থান। শ্রদ্ধেয় মাস্টার মশাই বলেছেন, 'সবই মহাতীর্থ। তাঁর চরণরজে সব জীবন্ত। এসব কেউ যদি দেখে বেড়ায়, তাতেই তার হয়ে যাবে।' স্বামী প্রেমেশানন্দজীর ভাষায়:

'তীর্থযাত্রা যাঁর তরে, রামকৃষ্ণ রূপ ধরে
এবার আবার বঙ্গে তাঁর আগমন।
আর কেন তাঁরে দূরদেশে অন্বেষণ!'

মঠের কয়েকজন প্রবীণ সাধু ও অনেক ভক্তের অনুরোধে স্বামী নিত্যাত্মানন্দ 'ঠাকুরের পদস্পৃষ্ট কলিকাতা মহানগরীর স্থানসমূহ' দর্শন করে প্রাচীন নাম, নম্বর ও বিবরণ সংগ্রহ ও নূতন সব পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করার সংকল্প করেন। মাস্টার মশাই তাঁর এই পরিকল্পনাকে অনুমোদন করেন এবং নিজে ৮৫টি এইরূপ 'নবীন তীর্থের' সন্ধান দেন। স্বামী নিত্যাত্মানন্দ তাঁর 'শ্রীম-দর্শন' গ্রন্থে এই তালিকাটি এবং কয়েকটি তীর্থদর্শনের বিবরণও লিপিবদ্ধ করেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে মাস্টার মশাইয়ের তিরোধানের ফলে স্বামী নিত্যাত্মানন্দ তাঁর এই আরব্ধ কাজটি অসম্পূর্ণ রেখে দেন।

সম্প্রতি যাঁরা এই বিষয় নিয়ে নানা রচনা ও গ্রন্থাদি লিখেছেন ও লিখছেন তাঁদের মধ্যে সুলেখক ও গবেষক শ্রীনির্মলকুমার রায় অন্যতম। আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীরায় ৬২টি শ্রীরামকৃষ্ণতীর্থের বিবরণ আমাদের উপহার দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান লীলাস্থল দক্ষিণেশ্বর থেকে আরম্ভ করে কাশীপুর মহাশ্মশানের বিবরণ দিয়ে তাঁর

গ্রন্থের প্রথম খণ্ড শেষ করেছেন। কালানুক্রমে অথবা ভৌগোলিক অবস্থিতি অনুসারে সাজানো না হলেও নিবন্ধগুলি প্রত্যেকটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ। 'ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা উপস্থিতির দ্বারা যথাযথ অনুসন্ধান এবং সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এসব স্থানের অতীত ও বর্তমানের কাহিনী' লিপিবদ্ধ করে তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। প্রত্যেকটি লীলাস্থলের আলোকচিত্র, বর্তমান ঠিকানা ও পথনির্দেশ আলোচ্য গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করেছে। বস্তুত এটি একটি ভাল গাইড বুক। ভক্তজনের তো বটেই, সাধারণ অনুসন্ধিৎসুর কাছেও গ্রন্থটি সমাদর পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে মথুরামোহন বিশ্বাসের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন প্রসঙ্গে শ্রীরায় লিখেছেন: '১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জুলাই মথুরামোহন বিশ্বাস দেহত্যাগ করেন' (পৃ:৭১)। ১৮৭৯ নিঃসন্দেহে মুদ্রণ-প্রমাদ। ১৮৭১ হবে।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সম্বন্ধে বলা হয়েছে: 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ তাঁরই অমর কীর্তি' (পৃঃ ৯৯)। কথাটি ঠিক নয়। তিনি ছিলেন Indian Association for the Cultivation of Science-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক (১৮৭৬-১৯০৪)।

রাজেন্দ্রনাথ মিত্র প্রসঙ্গে শ্রীরায় লিখেছেন: 'তিনি ভাইসরয়ের আইন মন্ত্রীও হয়েছিলেন' (পৃঃ ১২৪)। এ তথ্যটিও যথার্থ নয়।

শশিভূষণ সামন্তের লেখা বইটির উল্লেখ করা হয়েছে 'রামকৃষ্ণ—লীলাতত্ত্ব' নামে (পৃঃ ২২১)। প্রকৃত নাম: দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাতত্ত্ব।

শ্রীরায় লিখেছেন: 'হোলি ট্রিনিটি চার্চে ভক্ত মথুরামোহন বিশ্বাসের সঙ্গে একদা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন হয়েছিল' (পৃঃ ২২৭)। পরে আরও বলেছেন: 'তিনি মা-জগদম্বার কাছে খ্রীষ্টান ভক্তদের উপাসনা প্রত্যক্ষ করার জন্য আন্তরিক প্রার্থনাও জানান এবং সত্যসত্যই তাঁদের উপাসনা দেখতে কলকাতার তালতলায় 'মেথডিষ্ট চার্চে' এবং ধর্মসভা দেখতে কলকাতার বৈঠকখানা পাড়ায় 'হোলি ট্রিনিটি চার্চে' শুভাগমন করেন' (পৃঃ ২২৮)। কথামৃত পঞ্চম ভাগ, প্রথম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদে জগন্মাতার কাছে ঠাকুরের উক্ত বিশেষ প্রার্থনাটি পাওয়া যায়: 'মা, খৃষ্টানরা গির্জাতে তোমাকে কি করে ডাকে, একবার দেখিও।' ইহা ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের কথা। এর এগার বছর পূর্বে মথুরবাবু দেহত্যাগ করেছেন। সুতরাং এই প্রার্থনার পরে তাঁর সঙ্গে গির্জায় যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া, পূর্বেই মথুরবাবুর সঙ্গে গির্জায় উপাসনা দেখে থাকলে এতদিন পরে 'একবার দেখিও' এই প্রার্থনা অমূলক হয়ে পড়ে।

উল্লিখিত ত্রুটিগুলি কিন্তু গৌণ। গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য—ভক্তজনের মধ্যে এই সব তীর্থ পরিক্রমায় আগ্রহ সঞ্চার করা—নিশ্চয়ই সার্থক হয়েছে।

ডঃ চন্দন রায়চৌধুরীর ভূমিকাটি সংক্ষিপ্ত হলেও সুলিখিত। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

—শ্রীদেবব্রত বসুরায়

উদ্দীপন—প্রকাশক: স্বামী অক্ষরানন্দ, অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা, বাংলাদেশ। পৃষ্ঠা ২৬৬+১৭+১৮+২৬। মূল্য—দেওয়া নাই।

ঢাকার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন হতে প্রকাশিত 'উদ্দীপনের' এটি দ্বিতীয় সংখ্যা। শ্রীরামকৃষ্ণের ১৫০তম জন্মোৎসবকে উপলক্ষ্য করে প্রকাশিত হয়েছে বলে এর গুরুত্ব বুঝা যাচ্ছে শুধু স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ এবং স্বামী ভূতেশানন্দের আশীর্বাণীর মধ্য দিয়েই নয়, এর

প্রবন্ধ নির্বাচনের মাধ্যমেও। পূর্ব-প্রকাশিত পত্রিকা বা গ্রন্থ হতে সঙ্কলিত ছয়টি বাঙ্গালা এবং দুইটি ইংরাজী প্রবন্ধের প্রতিটিই সুনির্বাচিত, এবং সেগুলি শুধু কালোপযোগীই নয়, যাঁরা আগে পড়েন নাই, তাঁদের অত্যন্ত আনন্দ দেবে। বাকি ২৫টি মৌলিক বাঙ্গালা ও সাতটি ইংরাজী প্রবন্ধের লেখক বা লেখিকারা সকলেই হয় বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর বিদগ্ধ গোষ্ঠীর, অথবা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রখ্যাত সাধু। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধধর্মের ছোটখাট বহুবিধ গণ্ডীর অন্তরালে তাদের মূলতত্ত্বকে তুলে ধরে শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ'-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য বা একতা দেখান হয়েছে 'ইসলাম ও বিবেকানন্দ' (দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ), 'যীশুখ্রীষ্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণ' (গোবিন্দ চন্দ্র দেব),'আত্মার মুক্তি ও সুফী সাধনা' (কাজী দীন মুহম্মদ), 'হিন্দু ও ইসলামধর্মের মিলনভূমি' (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ), 'ধর্মসমন্বয় ও শ্রীরামকৃষ্ণ' (কাজী নুরুল ইসলাম), 'Teachings of Ramakrishna in the light of Buddhist morality' (Niru kumar Chakma), এবং 'Religion, Man and World' (M. Jalil Mia) প্রবন্ধে। বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয়—সম্বন্ধে যুক্তি ও তথ্যভিত্তিক আলোচনা আছে 'Science and Religion' (Swami Lokeswarananda), 'Science, Philosophy and The Religious Concept of Vivekananda' (K. M. Raisuddin khan), 'On The Synthesis of Science and Religion' (M. Shamser Ali), এবং Spiritual and Ethical Values' (Swami Ranganathananda) প্রবন্ধগুলিতে। 'পূর্ববঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ' (স্বামী প্রভানন্দ) একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ। বেগম সুফিয়া কামালের শ্রীশ্রীমায়ের উদ্দেশ্যে রচিত 'বরণীয়া তুমি' উদ্দীপনের একমাত্র কবিতা। স্থানাভাবে অন্য রচনাগুলির উল্লেখ না করলেও, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সেগুলির মানও উচ্চস্তরের। শেষের দিকে ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্বন্ধে ৩৫ খানি ফটোসহ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকায় পাঠকের মনে এই মঠ ও মিশন সম্বন্ধে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। তা ছাড়া ২২টি ফটোসহ ওই মঠ ও মিশনের বাংলাদেশে সেবারত অন্যান্য কেন্দ্র এবং ভক্তদের পরিচালিত আশ্রম সমূহের বর্ণনা প্রকাশনটির অন্যতম আকর্ষণ। এগুলি হতে বুঝা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা ও স্বামী বিবেকানন্দের সেবামূলক ধর্মকে বাংলাদেশের জনসাধারণ কত গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছে।

'উদ্দীপন'কে বার্ষিক পত্রিকা বলব কি না জানি না, তবে রচনাগুলিতে বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা সম্বন্ধে বহু জ্ঞানীগুণীজনের উচ্চস্তরের আলোচনা প্রকাশনটিকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের একটি সুপ্রকাশিত গ্রন্থের মর্যাদা দিয়েছে। বারবার পড়ার যোগ্য বহু রচনা-সন্নিবিষ্ট হওয়ায় 'উদ্দীপন' ভারতবর্ষের বাঙ্গালাভাষী অঞ্চলের এবং বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রন্থাগারে স্থান পাওয়ার দাবী রাখে।

—ডক্টর জলধিকুমার সরকার

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

অন্ধ্রপ্রদেশ বন্যাত্রাণ: পশ্চিম গোদাবরী জেলায় ১৪টি গ্রামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪৩১৬টি পরিবারের মধ্যে রাজমুন্দ্রী রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে চাল, আলু, পেঁয়াজ, তেঁতুল, তার্মিসেলি, লঙ্কাগুঁড়ো, শুকনো লঙ্কা, বাসন-পত্র ও বিছানার চাদর বিতরণ করা হয়। এছাড়া ৪৬৮৩ জন রোগীর চিকিৎসাও করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে বন্যাত্রাণ: অদ্বৈত আশ্রম (কলিকাতা শাখা), রামকৃষ্ণ মিশন ইন্স্টিটিউট্ অব্ কালচার এবং রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের পরিচালনায় হাওড়া ও কলিকাতার নিচু এলাকা-গুলিতে বন্যা-বিধ্বস্ত পরিবারগুলির মধ্যে প্রাথমিক ত্রাণকার্য শুরু হয়েছে।

কর্ণাটকে খরাত্রাণ: পুনরায় ২০৮ মেগাটোন গো-মহিষের খাবার বিতরণ এবং কোট্টালম গ্রামে আর একটি গভীর জলের নলকূপ খননের পর গত ১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ টুমকুর জেলার পাভগাদা তালুকে বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক আরব্ধ ত্রাণকার্য সমাপ্ত হয়।

বাংলাদেশ শরণার্থিত্রাণ: টাকুমবারি, কারবুক এবং শিলাচরি ত্রাণ-শিবিরে 'চাক্‌মা' পরিবারগুলির মধ্যে পুরানো কাপড় বিতরণের পর গত ২৯ অগস্ট ১৯৮৬, আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক পরিচালিত ত্রাণকার্যের সমাপ্তি হয়।

শ্রীলঙ্কা শরণার্থিত্রাণ: মাদ্রাজ ত্যাগ-রাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম কর্তৃক মন্দাপম্ ও তিনটি শিবিরে আগত শরণার্থিদের মধ্যে কম্বল, মুড়ি, দুধ ও মিষ্টি-খাবার বিতরণ করা হয়।

পুনর্বাসন: কর্ণাটকে কোট্টালম গ্রামের অগ্নি-বিধ্বস্ত পরিবারগুলির মধ্যে ২০টি নবনির্মিত গৃহ হস্তান্তরের পর বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক পরিচালিত পুনর্বাসন কার্যের সমাপ্তি হয়।

দেহত্যাগ:

স্বামী নিরোধানন্দ (যতীন মহারাজ) গত ১৫ অগস্ট ১৯৮৬, সকাল ১০-৫৫ মিনিটে কন্‌খল রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ৮৮ বছর বয়সে পরলোক-গমন করেন। গত প্রায় ১০ বৎসর যাবৎ তিনি বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন প্রকার রোগে ভুগছিলেন। বর্তমান বছরের ১৫ ফেব্রুআরি থেকে তাঁকে হাসপাতালে বিশেষ চিকিৎসাধীনে রাখা হয়। কিন্তু তাতেও তাঁর স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হয়নি।

স্বামী নিরোধানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শাখাকেন্দ্র গদাধর আশ্রম, ভুবনেশ্বর, বরিশাল, জলপাইগুড়ি, বারাণসী সেবাশ্রমে কর্মীরূপে এবং পুরী মঠ, বাঁকুড়া ও ফরিদপুর কেন্দ্রে অধ্যক্ষরূপে তিনি সঙ্ঘের সেবা করেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি কন্‌খল আশ্রমে অবসর-কালীন জীবন-যাপন করছিলেন। সরল ও মধুর ব্যবহারের জন্য সমীপাগত সকলের নিকট তিনি প্রিয় ছিলেন।

তাঁর দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

উদ্বোধন কার্যালয় থেকে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণকথামৃতের নতুন প্রকাশনা

গত ২৩ অক্টোবর ১৯৮৬, **গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অব্ কালচারের বিবেকানন্দ হলে** এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের প্রথম খণ্ড আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট্ অব্ কালচারের অধ্যক্ষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ।

অনুষ্ঠানের আগে এক সাংবাদিক-বৈঠকে স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী সদ্য প্রকাশিত এই বইটির বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করে বলেন, প্রথম খণ্ডটিতে ১৮৮২ থেকে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঘটনাবলী ও কথোপকথনের বিবরণ কালানুক্রমে সন্নিবেশিত হয়েছে। বানান ও যতি চিহ্নের কিছু পরিবর্তন করা ছাড়া অন্য সমস্তই অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। বইটিতে ২২টি আর্ট প্লেটে ৭৭টি ছবি আছে। প্রথম খণ্ডটি শেষ হয়েছে ৮৪৯ পৃষ্ঠায়। প্রথম খণ্ডের মূল্য ধার্য করা হয়েছে ৫০ টাকা। তবে প্রথম প্রকাশনা উপলক্ষে ১ নভেম্বর ১৯৮৬ পর্যন্ত ক্রেতাদের ১০% ছাড় দেওয়া হয়। বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের সভাপতি স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী তাঁর ভাষণে বলেন, কথামৃত সম্বন্ধে মানুষের ঔৎসুক্য দিন দিন বেড়েই চলেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কথামৃত অনূদিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে—এতেই তা প্রমাণিত হয়। সভার প্রারম্ভে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর অধ্যক্ষ স্বামী নির্জরানন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে স্বাগত এবং সভান্তে সকলকে ধন্যবাদ জানান।

আবির্ভাব তিথি-পালন: গত ৩ ও ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, **শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী** এবং **শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের** শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে স্বামী বিকাশানন্দ এবং ৩ অক্টোবর ১৯৮৬ মহালয়ার দিনে, **শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের** শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ, সন্ধ্যারতির পর তাঁদের জীবনী ও উপদেশ আলোচনা করেন।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত; স্বামী বিকাশানন্দ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের দীক্ষিত-শিষ্য **অমিতাভ রায়** গত ২২ অগস্ট ১৯৮৬ পরলোক গমন করেন। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ বিশুদ্ধানন্দ সমিতির একজন আজীবন সদস্য।

তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তিলাভ হোক—এই প্রার্থনা।

—বিশেষ দ্রষ্টব্য—

* অতঃপর বর্তমান পৃষ্ঠাসংখ্যা নিচে।
* পুনর্মুদ্রিত অংশের পৃষ্ঠাসংখ্যা উপরে।

পুনর্মুদ্রণ

২য় বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা ● কার্তিক ১৩০৭ (পৃষ্ঠা ৫২৩—৫৩৫)

UDBODHAN PUBLICATIONS (In English)

WORKS OF SWAMI VIVEKANANDA

MY MASTER
Price : Rs. 1.60

THE SCIENCE AND PHILOSOPHY OF RELIGION
Price : Rs. 3.80

RELIGION OF LOVE (12th Ed.)
Price : Rs. 5.00

CHRIST THE MESSENGER (9th Ed.)
Price : Rs. 1.25

A STUDY OF RELIGION
Price : Rs. 4.25

REALISATION AND ITS METHODS
Price : Rs. 3.00

SIX LESSONS ON RAJA YOGA
Price : Rs. 2.25

VEDANTA PHILOSOPHY (9th Ed.)
Page 63, Price : Rs. 3.00

WORKS OF SISTER NIVEDITA

THE MASTER AS I SAW HIM
(13th Ed.)
Price : Rs. 16.00

CIVIC AND NATIONAL IDEALS
(Sixth Edition)
Price : Rs. 7.00

SIVA AND BUDDHA
(Sixth Edition)
Price : Rs. 1.50

HINTS ON NATIONAL EDUCATION IN INDIA (Sixth Edition)
Price : Rs. 6.00

AGGRESSIVE HINDUISM
(Fifth Edition)
Price : Rs. 1.10

NOTES OF SOME WANDERINGS WITH THE SWAMI VIVEKANANDA
(Sixth Edition)
Price : Rs. 7.50

BOOKS ON SRI RAMAKRISHNA

WORDS OF THE MASTER COMPILED
BY SWAMI BRAHMANANDA
Price : Rs. 8.50

RAMAKRISHNA FOR CHILDREN
(Pictorial) (Fourth Edition)

BY SWAMI VISHWASHRAYANANDA

Price : Rs. 6.50

BOOK ON VEDANTA

VEDANTA, ITS THEORY AND PRACTICE
BY SWAMI SARADANANDA
Price : Re. 1.20

UDBODHAN OFFICE, 1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003

প্লেগ উপস্থিত হইল, সকলে গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন; স্বচ্ছন্দে, আত্মীয় স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, নির্ভরশীল নিরাশ্রয়, দরিদ্র অনাথ প্রভৃতি, সকলকেই ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলেন; হৃদয়ে একটুও বাজিল না; যাহাদিগের পলাইবার কোনও স্থান নাই, যাহাদিগের দেখিবার কেহ নাই, যাহাদিগকে ছোটলোক বলিয়া অনেকে ঘৃণা করেন, তাহাদিগের জন্য কিছুমাত্রও বন্দোবস্ত না করিয়া ভয়ে রাতারাতি পলায়ন করিলেন। ইহাও বুঝিলেন না যে, যেখানে যাইয়া উপস্থিত হইবেন, সেখানে সেই রোগবীজ লইয়া তত্রস্থ তাঁহাদিগকেও বিপদগ্রস্ত করিবেন। এ সকল স্বার্থপর লোকের দ্বারা জগতের (জগতের কথা দূরে থাকুক, নিজের দেশের) কি-হিতসাধন হইতে পারে? দেশের আপদ বিপদে যদি জন-সাধারণের কিছুমাত্র যথাসাধ্য উপকার না করিলেন, ত জনপদে বাস না করিয়া, 'মনুষ্য' নামে নিজেকে পরিচয় না দিয়া, জঙ্গলে গমন করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে চতুষ্পদের ন্যায় অনায়াসে দিন যাপন করিতে পারেন। কষ্ট হইবেন না, সহৃদয়তা না থাকিলে, পরের জন্য প্রাণ না কাঁদিলে, দয়া ধর্ম্ম বা সদসৎজ্ঞান না থাকিলে, মনুষ্য—পশু সমান; এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। নিজের উদর পূর্ণ হইলেই হইল, অভুক্তকে যদি এক মুষ্টি অন্ন না দিলাম; নিজের স্বার্থ পরিতৃপ্ত হইলেই হইল, পরার্থে যদি কিছু না করিলাম; জগতে অসংখ্য কীট তুল্য জন্মাইলাম, খাইলাম পরিলাম, আর মরিয়া যাইলাম—যদি বিশেষত্ব কিছু না থাকিল, তবে মনুষ্যে আর পশুতে তফাৎ কি?

যদি বলেন, পরের উপকার করিবার আমার সাধ্য নাই, তা বলিয়া কি নিজেরও উপকার করিব না? আপনি বাঁচিলে ত বাপের নাম? পরকে রক্ষা করিতে যাইয়া নিজে যে মরি? পরকেও রক্ষা করিতে পারিব না, নিজেকেও রক্ষা করিতে পারিলাম না, ইহা কি বুদ্ধিমানের কায? নিজেকে রক্ষা করা কি প্রকারান্তরে পরের বা দেশের উপকার করা হইল না? নিজে বাঁচিলে ত পরের উপকার করিব? মনে করুন: গঙ্গায় নৌকা করিয়া যাইতেছি; অনেক গুলি যাত্রী আছে—স্ত্রী, পুরুষ, ছেলে মেয়ে, ছোট লোক, ভদ্র লোক ইত্যাদি; সকলেই পরস্পর অপরিচিত। কিয়দ্দূর যাইয়া গঙ্গায় হঠাৎ তুফান; তরি টস টলায়মান, ডুবে যায় যায়। সাঁতার আমি একাই জানি, যাত্রিগণের মধ্যে আর কেহ জানে না, যেরূপ তুফান এবং আমারও যেরূপ সামর্থ্য, তাহাতে আমি একা নিজেকেই বাঁচাইতে পারি কিনা সন্দেহ। এখন কি করা কর্ত্তব্য? আর একটিকে পৃষ্ঠে চাপাইয়া দুইজনেই ডুবিব; না- সকলকার হাত ছিনাইয়া নিজে বাঁচিবার চেষ্টা করিব? কোনটি বুদ্ধিমানের কর্ম্ম? এরূপ অনেক শুনা গিয়াছে যে, একজন ডুবে যাইতেছে দেখিয়া, আর একজন তাহাকে বাঁচাইতে যাইয়া দুইজনেই ডুবিয়া মরিয়াছে।—আমার নিজের বেড়ালই পথ্য পায় না, পরের দিকে চাই কি করে? সারাদিন খাটিয়া খুটিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, কষ্টে শ্রেষ্টে কোনও রকম করে নিজের পেটের একমুষ্টি অন্ন জোগাড় করি মাত্র; তাহার ভিতর হইতে অপরকেই বা দিই কি, নিজেই বা খাই কি? সময়ই বা পাই কখন, পরের সেবা করিবার? কাজে কাজেই ভিখিরী এলে দূর দূর করি, প্লেগ এলে পলায়ন করি।

—বেশ। আবার এও এক শ্রেণীর লোক আছে:—

ফাল্গুন, ১৩১২ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

(কার্তিক, ১৩১৩, পৃঃ ৬৬৫)

নিশীথ সময়, সকলেই ঘোর নিদ্রিত; হঠাৎ আকাশসমান বন্যা আসিয়া জেলার যাবতীয় গ্রাম, লোক জন, ঘর বাড়ি সমস্ত তীব্র বেগে ঘুরাইতে ঘুরাইতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। নিদ্রাভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে, সুষুপ্ত অবস্থাতেই, অনেকে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন; ভাসিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই অগাধ জলমধ্যে অনেককে প্রাণত্যাগ করিতে হইল; কে কোথায় কেমনে মরিল কাহারও খোঁজ খবর নাই। একজন উঁহাদিগের মধ্যে অর্দ্ধ নিদ্রিত ছিলেন; তিনি জাগরিত হইয়াই দেখেন, অতি ভীষণ ব্যাপার মধ্যে নিপতিত, প্রাণ রক্ষা করা ভার। কিয়দ্দূর পরে দেখেন, পার্শ্ব দিয়া একটি বৃক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে; সেই বৃক্ষটীর উপর নির্ভর করিয়া যাইতে লাগিলেন; ক্ষণিক পরেই দেখেন, একটি লোক মৃতপ্রায় হইয়া নিকটেই আসিতেছে; অমনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেই বৃক্ষের উপর অতিকষ্টে তুলিয়া লইলেন। বৃক্ষটী এতবড় নহে যে, দুইটী ব্যক্তির ভার বহন করে, বুঝিতে পারিয়াই স্বয়ং বৃক্ষটী ত্যাগ করিলেন। কিয়দ্দূর ভাসিয়া আসিতে না আসিতেই, নিজে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। সেই অচেতন অবস্থায় ২০ ক্রোশ দূরে এক সহরের নিকট কিনারায় আসিয়া লাগেন। পরদিন প্রাতে সহরস্থ লোকজন অন্বেষণ করিতে করিতে দেখেন যে, এইরূপ একটী লোক পড়িয়া আছেন। অনেক সেবা শুশ্রূষার পর, তিনি জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। ঘটনাটী সত্য; ঘোগা বন্যার সময় ঘটিয়াছিল।

তিনি অতি পরোপকারী লোক ছিলেন; যদি স্বার্থপর হইয়া নিজের বৃক্ষে অপরকে তুলিয়া না লইতেন, তাঁহার এতদূর জীবন সংশয় হইত না। যাঁহারা সহৃদয়, তাঁহারা কখনই অন্যরূপ আচরণ করিতে পারেন না। নলরাজা বনবাসেও, মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও, পরোপকার করিতে ছাড়েন নাই; দেখিয়া, কলি হার মানিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির স্বর্গ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন, তত্রাচ আশ্রিতকে কোনও মতে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। শুনিয়া থাকিবেন, নিজের জীবনকে তুচ্ছ করিয়া সকলকে রক্ষা করিবার জন্য, কিরূপ ভয়ানক বারুদের বস্তা হইতে, একজন, জলন্ত বাতি সরাইয়া আনিয়া ছিলেন। ইহাও শুনিয়া থাকিবেন, একজন সামান্য ভৃত্য কিরূপ নিজের জীবন দান করিয়া ব্যাঘ্রের "দ্রংষ্ট্র করাল" হইতে কতকগুলি লোককে বাঁচাইয়াছিলেন। পুস্তক ও পুরাণাদি পাঠ করিলে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

বৎসর সাতেকের কথা হইল; পদব্রজে অযোধ্যা যাইতেছিলাম। সঙ্গে কেহ বা কিছুই ছিল না; একা মাত্র, ও একবস্ত্র—তাহাও অর্দ্ধাংশ। একদিবস পথে গ্রাম বা বসতি কোনও প্রকার পাওয়া গেল না; দিবা প্রায় অবসান; সমস্ত দিবসই অনাহার। পূর্ব্বদিবস মধ্যাহ্নে যৎসামান্য ভিক্ষা পাওয়া গিয়াছিল মাত্র। পূর্ব্ব অপরাহ্নে পাঁচক্রোশ ও সে দিবস প্রায় সাত ক্রোশের পথশ্রম। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময়ে দূরে গুটীকতক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝুপড়ি দেখিতে পাওয়া গেল। নিকটে যাইয়া বুঝিলাম, লোক গুলি সাঁওতাল অথবা ধাঙ্গড় জাতীয়, অতি গরিব; আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ক্যা মাংতা"; বলিলাম, "খানেকো ভিক্ষা মাংতা।"—হামারা ভাত খায়েগা? হাঁ জি খায়েগা।—বয়ঠো। হাত ডেড়েক লম্বা ও আধহাতটাক মোটা একখণ্ড বৃক্ষের শাখা উপবেশনার্থ দিলেন। তাঁহাদিগের একখানি ঝুপড়ি; হাত চারেক চওড়া ও প্রায়

৮ হাত লম্বা ; কোথাও পাতা, কোথাও চারিটি খড়, কোথাও বেনা বা উলু, কোথাও বা কাটামুটী, কোথাও বা একটু চট্ দিয়া মাত্র আবৃত। যেমন চাল, তেমনি দেওয়াল। সম্মুখে হাত আষ্টেক জমি একটু পরিষ্কার করা উঠানের মত। উপরে বিমল চন্দ্রলোক। চতুর্দ্দিকে ময়দান ; মধ্যে মধ্যে এক একটী খর্ব্বাকৃতির বৃক্ষ। দাতার পরিবারের মধ্যে—তাঁহারা দুইজন উজ্জ্বল কৃষ্ণকায় স্ত্রী পুরুষ, এবং তদনুরূপা একটী কুমারী কন্যা। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রন্ধন হইয়া গিয়াছিল। হাঁড়ির ভিতর হইতে তিনটী গোল গোল পাকানো ডেলা বাহির করিলেন—দুইটী বড় ও একটী ছোট ; তিনটী ভাঙ্গিয়া চারিটী করা হইল ; রাখিবার স্থান নাই, বোধ হয় তাঁহাদের আবশ্যকও করে না, মাটীতেই রাখিলেন ; কিয়ৎক্ষণ পরে, আমাকে হাত পাতিতে বলিলেন। সেই চারিটী লাড্ডু হইতে একটী আমার হাতে দিলেন ; তাঁহারাও তিন জনে এক একটী লইয়া বসিলেন। লাড্ডুগুলি অতি নিকৃষ্ট আউসচাউলের খুদ সিদ্ধ ; এক একটীতে ৫।৭ গ্রাস হইবে মাত্র ; তাহাই তাঁহাদিগের খাদ্য ; দুইবেলা এইরূপ এক এক লাড্ডু জুটিলেই পরম ভাগ্য মনে করেন।

দেখুন, যাহাদিগকে আমরা নিকৃষ্ট নীচজাতিসম্ভূত বলিয়া ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করি, তাহারাই আবার নিজেদের একমুষ্টি অন্ন হইতে যথাসাধ্য আমাদিগকে প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হয় না। আর আমরা কি করি ? প্রচুর থাকিতেও দিই না। দিবার ইচ্ছা থাকিলে ত দিব। ইচ্ছা থাকিলেই সব হয়। ইচ্ছা না থাকিলেই নানাপ্রকার বড় বড় বিপরীত যুক্তি দেখাই। যাঁর অন্তরে যথার্থ ভালবাসা আছে, যাঁর প্রাণ অন্যের জন্য কাঁদে, যিনি যথার্থ সকলকার হিতাকাঙ্ক্ষী, যিনি যথার্থ দেশ-হিতৈষী, তিনি কখনই স্বার্থপর হইতে পারেন না ; নিরাশ্রয় বা অনাথ দেখিলে তিনি কখনই চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত কোনও পল্লীগ্রামে যাইলেই দেখিতে পান। সকলকারই সাধ্য কিছু না কিছু আছেই আছে। যথাসাধ্য উপকার সকলেই করিতে পারেন, কোনও সন্দেহ নাই। করেন না, সে কেবল ছল মাত্র ; ইচ্ছা নাই বলিয়াই করিতে পারেন না। ইচ্ছাই বা আসিবে কেমন করিয়া ? ইচ্ছা আসিবার মত আচরণ করিলে ত ? দিবা রাত্রি অসৎসঙ্গ ও অসৎচর্চ্চা করিলে মনুষ্যত্ব, জাতীয়ত্ব প্রভৃতি সর্ব্বস্ব লোপ হইয়া যায়। নিজে ত পরোপকার করিব না, অপরে যদি করে তাহাতেও ছল ধরিব ও বাধা দিব।—আজকাল আমাদের এইরূপই অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রত্যেক পাড়াতেই প্রায় একটী করিয়া (ছোট বা বড়) আড্ডা আছে। সকাল বেলা ঘুমের থেকে উঠিয়াই সেই আড্ডাতে যাইলাম ; ৮৷৷০টা বা ৯টা যতক্ষণ না বাজে, যতক্ষণ না আফিসের বেলা হয়, ততক্ষণ আড্ডা দিতেছি ; আফিস থেকে আসিলাম, আসিয়াই আবার সেই আড্ডা—যতক্ষণ না রাত্রি ৮টা বা ৯টা বাজে ; কেহ বা সন্ধ্যা আটটার সময় খাইয়া আসিয়াই, আবার সেই আড্ডায়—রাত্রি ১১।১২টা পর্য্যন্ত। কেহ বা, এ পাড়া ও পাড়া, দুই চারিটী আড্ডা ঘুরিয়া থাকেন। আড্ডায় সাধারণতঃ হইয়া থাকে কি ?—কেবল পরচর্চ্চা। পরচর্চ্চা যদি সৎ হয়, খুবই ভাল। কিন্তু সাধারণতঃ আড্ডায় লোকের অহিত-চর্চ্চাই হইয়া থাকে। পরনিন্দা ত হয়ই, ইহা ছাড়া আবার, যদি কেহ দেশের বা জনসাধারণের কোন বিশেষ উপকার করিতে যান, ত তাহার নানা প্রকার অযথা ছল বা দোষ ধরিতে আরম্ভ করেন, এবং বিধিমতে বিঘ্ন করিতে চেষ্টা

(কার্ত্তিক, ১৩১৩, পৃঃ ৬৬৭)

করেন। মনে করুন কোন পাড়ায় সাহিত্য-সভা, পুস্তকাগার, হরিসভা, সামাজিক সভা, স্বাস্থ্য-রক্ষাসম্বন্ধীয় সভা প্রভৃতি রকমের যদি কিছু নূতন স্থাপিত হয়, আড্ডাধারিগণ সূক্ষ্ম এবং দূর-দৃষ্টির অভাবে কেবল তাহার অযথা ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, এবং সে সকলের নিষ্ফলতা বা অনিষ্টকারকতা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। অনুসন্ধান করিলে আড্ডা মাত্রেরই এ সকল দোষ, কিছু না কিছু, দেখিতে পাইবেন। একটী আড্ডার কথা আমাদিগের স্মরণ পড়িতেছে; সেদিন রাস্তা দিয়া আসিতেছিলাম, একটী আড্ডায়, শুনিতে পাইলাম, 'উদ্বোধন' এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অনাথাশ্রম সম্বন্ধে কথা হইতেছে—"উদ্বোধনের এই কয় সংখ্যায় আমাদিগের পড়বার বেশী কিছু নাই, কেবল অনাথ-আশ্রম, দুর্ভিক্ষ-মোচন এবং প্লেগনিবারণ প্রভৃতি নিজেদের কার্য্যাদি দিয়াই কাগজখানি পূর্ণ করিয়াছেন;" "এ সকল ত নিজেদেরই বিজ্ঞাপন"।

দেখুন একবার; অপরাধ কি না, রামকৃষ্ণ-মিশন কিরূপ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ভারতের অনাথগণকে কুড়াইয়া আনিয়া লালন পালন করিতেছেন, এবং অনাথগণ তাঁহাদিগের আশ্রমে থাকিয়া কিরূপ উন্নতি লাভ করিতেছেন, তাহাই দুই একবার কিছু উদ্বোধনে বলা হইয়াছিল। অপরাধ কিনা, রামকৃষ্ণ-মিশন কিরূপ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া প্রাণপণে ভারতের দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন; অপরাধ কিনা রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রতধারিগণ কিরূপ জীবন সমর্পণ করিয়া প্লেগাক্রমণ হইতে স্বদেশবাসিগণকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; তাহাই এক আধবার কিছু উক্ত কাগজে লেখা হইয়াছিল।

এ সকল দেশহিতকর কার্য্যের কথা যদি না লিখিব, ত কাগজ-পত্রের আবশ্যক কি? কেবল গল্প দিয়াই যদি কাগজ ভরিয়া দিলাম, ত মাসিক পত্রের পরিবর্ত্তে, উপন্যাস-ভাণ্ডার বা দারগার-দপ্তর লিখিলেই ত ছিল ভাল? যে পত্রে, হৃদয়বান্ দেশহিতৈষিগণের কার্য্য যদি জন-সাধারণের নয়নপটে চিত্রিত করিয়া তাঁহাদিগের অন্তরস্থ প্রসুপ্ত সদুদ্যম বা সদ্বৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা না করিলাম, ত সে পত্রের 'উদ্বোধন' নাম রাখিবার প্রয়োজন কি? মুর্শিদাবাদ-অনাথা-শ্রমের একটী ঘটনা বলি:—একদা একটী চতুর্ব্বর্ষীয় অনাথ বালকের অত্যন্ত পীড়া হওয়াতে, একদিবস শয্যায় অচেতন অবস্থায় তার মল নিঃসৃত হয়। শীতকাল, অর্দ্ধরাত্র; অনাথটীকে বিষ্ঠাক্তকলেবর দেখিয়া দুর্গন্ধে ও ঘৃণায়, আশ্রমস্থ কেহই তাহার ত্রিসীমানায় যাইলেন না। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দ দুই হস্ত দিয়া সেই অনাথের বিষ্ঠা মুক্ত করিয়াছিলেন। ইহা কি হৃদয়বত্তার লক্ষণ নহে? না—প্রশংসনীয় ও উল্লেখযোগ্য নহে? সম্প্রতি আমরা

মুর্শিদাবাদ-অনাথাশ্রম

হইতে স্বামী অখণ্ডানন্দের যে পত্র পাইয়াছি তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন, অনাথ-আশ্রম কর্ত্তৃক কতদূর জাতীয় উপকার সাধিত হইবার সম্ভব। অখণ্ডানন্দস্বামী লিখিতেছেন:—

"গত জুলাই মাস হইতে অনাথ-আশ্রমের স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। আশ্রমে প্রাতে ৩ ঘণ্টা কাল যে স্কুল, তাহাতে আশ্রমের ছাত্র ১১টি, আর বাহিরের ৯।১০টি। আশ্রমের স্কুলে আপাততঃ লোয়ার প্রাইমার ক্লাস খুলিয়া তদুপযুক্ত পুস্তকাদি ধরানো গিয়াছে। অন্যান্য

টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার (শিল্পবিত্তার) সহিত ইহাদিগকে ইউনিভারসিটি-এডুকেশনও আমরা দিব। এবং বালকগণকে রীতিমত পরীক্ষা দিতে পাঠাইব।

উক্ত স্কুল ছাড়া আবার একটী নৈশবিত্তালয় (নাইট-স্কুল) খুলিয়াছি। ইহাতে আশ্রমের বড় ছেলে কয়টীকে ইংরাজী পড়াইয়া, বাকী কয়টীকে, যে যা পড়ে, পড়াইয়া, বাহিরের ৬।৭টী যুবা চাষী ছাত্রকে একটু একটু লেখা পড়া শিখাইয়া থাকি। গত মাস হইতে কয়েকটী চাষী বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত নিয়ম পূর্ব্বক পড়িতে আসিতেছে দেখিয়া আমি বড়ই উৎসাহিত হইয়াছি। রাত্রে ১০॥ টা পর্য্যন্ত পড়াইয়া থাকি।

টেক্‌নিক্যাল-এডুকেশনের মধ্যে আপাততঃ, তাঁতের, ছুতারের, ও দরজির কায শিখাইতেছি। আশ্রমের ছেলেরা 'ষ্টিলপেনের হ্যাণ্ডল্' অতি সুন্দর তৈয়ার করিতে শিখিয়াছে। বহরমপুর সহরে ইহার বড় আদর হইয়াছে। সেদিন সহরে কতকগুলি লইয়া যাওয়াতে, তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকটী দুই পয়সা করিয়া সব গুলি বিক্রয় হইয়া গেল। কাশীমবাজারের মহারাজা সন্তুষ্ট হইয়া ২০০ কলমের অর্ডার দিয়াছেন। বার্নিশ করিয়া দিলে, তিনি প্রত্যেক কলম তিন পয়সা করিয়া লইবেন, বলিয়াছেন। আমরা যোগাইতে পারিলে, তাঁহার সদর ও মফঃস্বল কাছারীতে এই কলমই চালাইবেন বলিয়াছেন। আরও ২।১টী জমীদারের নিকট হইতে কলমের অর্ডার পাইয়াছি। বালকেরা একটী ছোট টেবিলের নমুনা দেখিয়া অতি সুন্দর একখানি টেবিল প্রস্তুত করিয়াছে। সেই রকম আর একখানি টেবিলেরও অর্ডার পাইয়াছি।

রেশম-কীট প্রতিপালন করিবার জন্য আমরা সমস্ত আয়োজন করিতেছি। বোধ হয় শীঘ্রই সফল হইব।"

পশ্চিমাঞ্চলে রাজপুতানার অন্তর্গত কিশেনগড়ে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ

রাজপুতানা-অনাথালয়

নামক, রামকৃষ্ণ-মিশনের অপর একটী অনাথাশ্রম হইতে অধ্যক্ষ স্বামী কল্যাণানন্দ আমাদিগকে গত ভাদ্রমাসে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহারও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

"* * * এক্ষণে অত্র অনাথ বালক-বালিকার সংখ্যা ১১২। তাহার মধ্যে ৭৭ জন বালক, এবং ৩৫টী বালিকা। ইহাদিগের সকলকার স্বাস্থ্য অতি সুন্দর; ব্যারাম একেবারে নাই বলিলেই হয়। দুইবেলা অনাথদিগকে, যব ও গম মিশ্রিত ময়দার রুটি এবং ডাল দেওয়া হয়। ছোট ছোট বালক-বালিকাদিগকে বৈকালে সামান্য জল খাবারও দিয়া থাকি। অনাথদিগের বিছানার জন্য জাজিম করা হইয়াছে; শীঘ্রই প্রত্যেককে এক একখানি কম্বল দেওয়া যাইবে; পানীয় জলের উত্তম বন্দোবস্ত আছে; তত্রাচ তন্মধ্যে পারমাঙ্গানেট অভ-পটাস দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ফেনাইল, কারবলিক-পাউডার, চূণ ইত্যাদি অকাতরে খরচ করা হয়। কতকগুলি অনাথবালক-বালিকাকে এখানকার সুতা ও কারপেটের কারখানায় কার্য্য শিখিতে পাঠান হয়, ইহা ইতি পূর্ব্বে শুনিয়া থাকিবেন।

অনাথগণকে ভরণ-পোষণ করা ব্যতীত, প্রত্যেক দিন দুইবেলা প্রায় পাঁচশত গরীবকে একমণ চাউল ও ডাউলের খিচড়ি দেওয়া হয়। অতি দরিদ্র ও ছিন্নবস্ত্র-পরিধান স্ত্রীলোকদিগকে

(কার্তিক, ১৩৯৩, পৃঃ ৬৬৯)

ঘাগরা, চাদর, পাজামা, এবং পুরুষদিগকে কাপড়, পাজামা, কোর্ত্তা ইত্যাদিও দিয়া থাকি। ঈশ্বর-ইচ্ছায়, শীঘ্রই বোধ হয় গরীবদিগকে প্রায় একশত কম্বল বিতরণ করিতে পারিব। বর্ষাকালে যাহাদিগকে সর্ব্বদাই বৃষ্টিতে ভিজিতে হয়, তাহাদিগের মোটা কাপড় বা কম্বল একান্ত আবশ্যক।"

দেখুন! এত গুলি অনাথ আজ আশ্রয় ও শিক্ষা অভাবে, হয়ত ভিক্ষাবৃত্তি বা চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইত। অথবা, দয়াময় হিন্দুদিগের আশ্রয় ছাড়িয়া খৃষ্টান-কবলে পতিত হইত। অন্বেষণ করিলে সমগ্র ভারত হইতে এমন আরও সহস্র সহস্র বালক-বালিকা পাওয়া যাইতে পারে, যাহারা নিরাশ্রয় হইয়া বেড়িয়া বেড়াইতেছে, অথবা সাহায্য অভাবে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এ সকল অনাথবালক কি ভারতের নহে? তাহারা কি ভারতজাত নহে? তাহারা কি ভারতের ধন-সম্পত্তি নহে? ভারত-জাত হইয়া, ভারতের ধন-সম্পত্তি হইয়া ভারতবাসীর যত্ন ও সাহায্য কেন পায় না? হিন্দু-নামধেয় হইয়া, হিন্দু ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া, নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িলেই যে, হিন্দুর সাহায্য না পাইয়া তাহারা পরধর্ম্মীর হস্তগত হয়, কেন?—ভারত আজ ভারতবাসী শূন্য, না হিন্দুর আজ হিন্দুত্ব লুপ্ত? তবে কেন ভারতের এত দুগ্ধপোষ্য শিশু অনাথ হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হইতেছে? ভারত জননী কি ভারত হইতে অন্তর্ধান করিয়াছেন? দেশে কি আর জননী-নাম মাত্র নাই? দেশ কি আজ পিতামাতা শূন্য? আর কি কেহ এখানে হৃদয়ে বাৎসল্য স্নেহ পোষণ করেন না?—যে, আজ দুগ্ধপোষ্য শিশু, আহা! একবিন্দু দুগ্ধাভাবে, ভারতের ক্রোড় হইতে যমালয়ে নীত হইতেছে? যান, যাইয়া দেখিয়া আসুন, ভারতের দুর্ভিক্ষাক্রান্ত দেশ সমূহে কত শিশু-সন্তান রাস্তায় মরিয়া পড়িয়া রহিতেছে! প্রতিবৎসরেই এরূপ ঘটিতেছে কেন? ইহাদিগকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিলে, আমাদিগের দেশের কি কোনও উপকারে ইহাদিগকে লাগাইতে পারা যায় না? আমরা ঘরের ভিতরে বসিয়া বেশ নানাবিধ চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় রূপে দিবা রাত্র আকণ্ঠ ভোজন করিয়া ক্রমশঃ স্থূলকায় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছি; আর, ঘরের বাহিরে যে, কতশত জন যাহারা প্রকারান্তরে, আমাদিগের অন্নের সংস্থান করিয়া দিবে, তাহারা না খাইতে পাইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহা আমাদিগের জ্ঞান-গোচর হইতেছে না; জ্ঞান-গোচর হইলেও আমাদিগের হৃদয় স্পর্শ করিতেছে না। উল্টে, সংবাদবক্তাগণের উপর ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকি। কেন? যথার্থতঃ দেখিতে গেলে, আমাদিগের যে দয়া ধর্ম্ম একে বারেই লোপ পাইয়াছে তাহা নহে। আমাদিগের অন্তরে আজও ভারতের সেই প্রাচীন গুণাবলীর বীজসমূহ নিহিত রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। তবে কেন আমরা এত নির্দ্দয়তা ও স্বার্থপরতার পরিচয় দিতেছি? কেবল একমাত্র জিনিষের অভাবে এত নির্দ্দয় প্রকাশ পাইতেছি; কেবল এক মাত্র জিনিষের অভাবে আমাদিগের দেশ ক্রমশঃ 'ছার খারে' যাইতেছে, যাবতীয় গুণরাশি লুপ্ত প্রায় হইয়া আসিতেছে, ধনরাশি পরহস্তগত হইতেছে, অনাথশিশুগণকে পর্য্যন্তও আমরা হারাইতেছি! সেই জিনিষ কি? কি সেই জিনিষ, যাহার অভাবে দেশের এত দুর্দ্দশা? কি সেই জিনিষ যাহার সত্তায় ভারত আবার স্বর্গতুল্য হইতে পারে? সেই জিনিষ হইতেছে—

জাতীয়ত্ব-বোধ।

("জাতীয়ত্ববোধ" সম্বন্ধে আগামী সংখ্যায় বলা যাইবে।)

(৮৮তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পৃঃ ৬৭০)

সৃষ্টিতত্ত্ব।

(বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিত।)

সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশেই দার্শনিকগণ সৃষ্টিতত্ত্ব লইয়া ব্যস্ত। আধুনিক বাহ্যবিজ্ঞানের লক্ষ্যও তাহাই কি না, স্থির বলা যায় না। বিজ্ঞানের দৃষ্টি বহির্ম্মুখী; দর্শন অন্তর্ম্মুখ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যেক পদার্থের সংশ্লেষণ করিয়া বৈজ্ঞানিক চাহেন, ঐহিক সুখ সুবিধার অনন্ত উৎসের আবিষ্কার। সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির মূল-কারণানুসন্ধান। দার্শনিক চাহেন, মনোবুদ্ধি-অহঙ্কারাদি মানসিক ব্যাপারের সংশ্লেষণ করিয়া দুঃখত্রয়াতীত পরমশান্তিলাভ। সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্বের কারণ-সমাধান। বৈজ্ঞানিক চাহেন, ভূতপঞ্চককে ক্রীড়নক করিয়া অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সমাজে অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের, মনীষার ও দৈবীকল্প লীলার প্রদর্শন। দার্শনিক চাহেন, অনন্ত-ভাব-ভাণ্ডার মনের উপর নিঃশেষাধিপত্য বিস্তার করিয়া ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান রাজ্যের ক্রান্তিদর্শন। একজন ভৌতিক পদার্থের (matter) দাস; আর একজন মানসিক ব্যাপারের (mind) ক্রীড়া পুত্তলিকা। একজন প্রত্যক্ষ বাহ্য জগতের গূঢ়নিয়মরহস্যভেদে উদ্যোগশীল; আর একজন মনোব্যাপারের অলৌকিক শক্তিবিকাশে পরিমগ্ন। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ এই দুইয়ের একেতর রাজ্যে অবশ্যই বিচরণ করেন।

প্রত্যক্ষ ভিন্ন অনুমান হইতে পারে না। যাহা বাহিরে দর্শন করা যায়, তাহার ভাবগুলি (Ideas) মনে সঞ্চিত হয়; এইরূপ ভূয়োদর্শনজনিত ভাবের সমষ্টিই মন। সুতরাং, এই বিচার প্রণালীতে দেখা যায়, মনের উপর বহির্জ্জগতের প্রাধান্য সম্পূর্ণ ও নিত্যবিদ্যমান। ফরাসী পণ্ডিত কোমৎ ও তন্মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ (positivists) এজন্য প্রত্যক্ষবাহ্য বিজ্ঞানবাদী। তাঁহারা বলেন, এই ভূতভৌতিক সংমিশ্রণোৎপন্ন বাহ্য জগৎ ভিন্ন মন আর কিছুই জানিতে পারে না। কিন্তু মনস্তত্ত্ববাদী দার্শনিকগণ বলিতেছেন, বহিঃপ্রত্যক্ষদৃষ্ট পদার্থের ভাব (idea) মনে বর্ত্তমান আছে বলিয়াই, তোমার বাহ্য জগৎ আছে। নতুবা কে বুঝিতে পারিত যে, বাহ্যজগৎ বর্ত্তমান আছে? আমার ভাবেই তোমার জগৎ; নতুবা তোমার জগতের অস্তিত্ব কোথায়? ভাব ছাড়া জগৎ নাই; আবার জগৎ ছাড়াও ভাব নাই; এজন্য উভয়ই উভয়ের আপেক্ষিক বা অন্যোন্যাশ্রয়ী। জড় ও মন এ উভয়ের পক্ষসমর্থনকারীরা তাই আবহমান কাল হইতেই সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন।

প্রত্যক্ষবিজ্ঞানবাদী ও মনস্তত্ত্ববাদী উভয়েই নিজ নিজ মতানুকূলে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যানে অগ্রসর। জল, বায়ু, বিদ্যুৎ বা অম্লজান সংশ্লেষণ বা বিশ্লেষণ করিয়া বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, আমার একেতর উপাদানেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নির্ম্মাণ হইয়াছে। দার্শনিক বলিতেছেন, অহঙ্কারাত্মক বিরাট্ মন বা অব্যক্ত মহৎ হইতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; সুতরাং মনই জগতের উৎপত্তি-কারণ। ন্যায়, সাংখ্য, মীমাংসা প্রভৃতি ভারতীয় দর্শন, প্লাটো, হেগেল, কোমৎ, কাণ্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য দর্শন সকলেই এই সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যানে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ফলাইয়াছেন। এমন কি, যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র জগতে সাক্ষাৎ ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করা হয়, সেই বেদ, বাইবেল ও

কোরাণাদি ধর্মশাস্ত্রেও সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যার অসদ্ভাব নাই। তাহারা সকলেই ভ্রান্ত, এ কথা বলা অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক; তথাপি এ বিষয়ের কিঞ্চিদালোচনা করা যাক্।

মনের করণ (instruments) গুলি সীমাবদ্ধ। চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তি নাতিদূরেই প্রতিহত হয়। দূরদর্শন, দূরশ্রবণ প্রভৃতি শক্ত্যাদির স্ফুরণ দার্শনিকগণ স্বীকার করিলেও, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এই অনন্ত গ্রহতারাখচিত অসীম ব্রহ্মাণ্ডের সকল রূপরসাদিগুণের উপর তাহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পূর্ণাধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছে কি না? যদি না হইয়া থাকে, তবে ইন্দ্রিয়াদি যে দেশকালনিমিত্তাদি দ্বারা সীমাবদ্ধ, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। মন যখন জ্ঞানেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানসমষ্টি মাত্র, তখন মনও সসীম হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং মনোবিম্বিত জগৎও সীমাবদ্ধ। জীবগত মন ভিন্ন ভিন্ন। এজন্য ব্যক্তিগত জগৎও ভিন্ন ভিন্ন—যেমন দূরত্ব ও নৈকট্য বশতঃ একই পদার্থ বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং, যাহা লইয়া আমরা জগৎ জগৎ করিতেছি, তাহার মূলস্বরূপ যে কি, তাহা কোনকালে, কেহই জানিতে পারে নাই, পারিবেও না। যে জগৎই জানিবার উপায় নাই, তাহার আবার কারণানুমান করিতে যাওয়া বাতুলতা ও প্রবল সাহসিকতা প্রদর্শন ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। অগণ্য গ্রহতারাখচিত অনন্ত বিমান, অনন্তস্থাবর-জঙ্গম-ব্যূহ-বেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড, ও অযুত-নদ-নদী-পর্ব্বত-সাগর পরিবেষ্টিত ভূমণ্ডল দর্শন করিয়া, কোন্ অর্ব্বাচীন বৈজ্ঞানিক ইহার কারণানুসন্ধানে হতাশ না হইয়াছেন? অনন্তভাবতরঙ্গের গভীর উৎস মনের সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ করিয়াই বা কোন্ দার্শনিক সৃষ্টিরহস্যের নিঃশেষ মীমাংসায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এজন্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিচারপথে সৃষ্টিতত্ত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্বানুসন্ধানে অন্বয়ী প্রমাণে জীবত্ব ও ঈশ্বরত্বাদি গভীর প্রশ্নের মীমাংসা হইতেই পারিতেছে না।

ক্ষীণমস্তিষ্ক ভাবপ্রবণ (sentimental) একদল লোক জগতে জন্মিয়াছেন, যাহারা বলেন, এই সৃষ্টি দেখিয়াই সৃষ্টিতত্ত্বরহস্য বা জগৎ-কারণ বা ঈশ্বরানুমান হইতে পারে। তাহাদের মধ্যে কেহ বা ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুল্লেখা দর্শন করিয়া কালীলীলাদর্শনে আত্মহারা হন। কেহ বা শ্যামলশাদ্বলপূর্ণ শস্যক্ষেত্রে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম দর্শন করেন। কেহ বা সমুদ্র, আকাশ ও পর্ব্বতে ঈশ্বরের হস্তাক্ষর দর্শনে কাঁদিয়া আকুল হন। হে ভাবুক! যদি তুমি ঐ সকল রমণীয় বা গভীর দৃশ্যের সৌন্দর্য্যে বা গভীরতায়, কেবল সৌন্দর্যের বা গভীরতার জন্য (beauty for beauty's sake) অভিভূত বা আত্মহারা হইয়া থাক, তবে তোমাকে সাধুবাদ দিতেছি, আমিও সে ভাবের জন্য লালায়িত। কিন্তু ভাবপ্রবণতার প্রাবল্যে অথবা কীটভক্ষিত মস্তিষ্কের বৈকল্য বশতঃ যদি তুমি 'অবাঙ্মনসগোচরং' ব্রহ্মের হস্তাক্ষর যথাযথতথায় দর্শন কর, তাহা হইলে তোমাকে ভাবপ্রবণ উন্মাদ বলিয়া দয়ার পাত্র মনে করিব।

পক্ষান্তরে দর্শনবিৎ যুক্তিপ্রাণ একদল লোক জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাহারা বলেন, একমাত্র শাস্ত্রযুক্তি ও স্বাধীনযুক্তি সহায়তায়ই ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তাহাদের মধ্যে কেহ বা শরীরকৃচ্ছ্রকারী তপস্যাবলম্বনে মনোজয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, কেহ বা যুক্তিতর্কের ফাঁসে ঈশ্বরের হাত বাঁধিয়া কয়েদীর ন্যায় তাঁহাকে বিচারালয়ে উপস্থিত করিতে চাহেন।

উদ্বোধন : অগ্রহায়ণ ১৩৯৩

সূচীপত্র

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

[উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন]

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

কর্মযোগ	৫.৭
ভক্তিযোগ	৪.৫
ভক্তি-রহস্য	৫.০
জ্ঞানযোগ	১৭.০
জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে	১০.০
রাজযোগ	১০.০০
সরল রাজযোগ	১.৮০
সন্ন্যাসীর গীতি	০.৮০
ঈশদূত যীশুখৃষ্ট	১.০০
পত্রাবলী। (সমগ্র পত্র একত্রে, নির্দেশিকাদি সহ) রেক্সিন বাঁধাই	৪০.০০
পওহারী বাবা	১.২৫
স্বামীজীর আহ্বান	১.২৫
বাণী-সঞ্চয়ন	১২.০০
ধর্ম-সমীক্ষা	৫.০০
ধর্মবিজ্ঞান	৫.৫০
বেদান্তের আলোকে	৪.৫
কথোপকথন	৫.০০
ভারতে বিবেকানন্দ	২০.০০
দেববাণী	৮.০০
মদীয় আচার্যদেব	২.৫০
চিকাগো বক্তৃতা	২.২৫
মহাপুরুষপ্রসঙ্গ	১২.০০
ভারতীয় নারী	৫.০০
ভারতের পুনর্গঠন	২.৫০
শিক্ষা (অনূদিত)	৪.২০
শিক্ষাপ্রসঙ্গ	৮.০০

স্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচনা

পরিব্রাজক	৪.২৫
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য	৩.০০
ভাববার কথা	৪.০০
বর্তমান ভারত	২.৫০

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণ। প্রতি খণ্ড—৩০্ টাকা। সম্পূর্ণ সেট ৩০০্ টাকা
সাধারণ বাঁধাই সুলভ সংস্করণ। প্রতি খণ্ড—২০্ টাকা। সম্পূর্ণ সেট ২০০্ টাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

স্বামী সারদানন্দ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (দুই ভাগে)
রেক্সিন-বাঁধাই ; ১ম ভাগ ৩৫.০০, ২য় ভাগ ৩০.০০
সাধারণ (পাঁচ খণ্ডে)
১ম খণ্ড ৬.০০, ২য় খণ্ড ১৩.৫০, ৩য় খণ্ড ৯.৫০,
৪র্থ খণ্ড ৯.৫০, ৫ম খণ্ড ১৪.৫০

অক্ষয়কুমার সেন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি	৪৫.০০
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা	৫.৫০

স্বামী প্রেমঘনানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প	৪.০০

শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ	১.৫০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)	৫.৫০

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বাণী	.৭৫

স্বামী তেজসানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী	৯.০০

৮৮তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা অগ্রহায়ণ, ১৩৯৩

দিব্য বাণী

সন্তান মাতা ও পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা জানিয়া সর্বদা সর্ব প্রযত্নে তাঁহাদের সেবা করিবে। তাঁহাদের সম্মুখে ঔদ্ধত্য, পরিহাস, চঞ্চলতা ও ক্রোধ প্রকাশ করিবে না।

মাতাপিতা চারি বর্ষ বয়স পর্যন্ত সন্তান-সন্ততিকে লালন-পালন করিবেন; পরে ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত নানাবিধ সদ্‌গুণ ও বিদ্যাশিক্ষা দিবেন। তারপর আত্মতুল্য বিবেচনা করিয়া তাহাদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিবেন।

[মহানির্বাণতন্ত্র ৮।২৩, ৩০, এবং ৪৫-৪৬]

আচার্য অতি তাড়না সহকারে শিষ্যকে শিক্ষা দিবেন না। যিনি শিক্ষাদান করিবেন, শিষ্যের প্রতি তিনি মধুর ও প্রীতিজনক বাক্য বলিয়া শিক্ষাদান করিবেন।

শিষ্য উপবেশন করিয়া কিংবা অন্যদিকে মুখ রাখিয়া গুরুর সহিত সম্ভাষণাদি করিবে না। আসন হইতে উত্থিত হইয়া, গুরু দূরে থাকিলে তাঁহার সম্মুখস্থ হইয়া এবং তৎসন্নিধানে মস্তক অবনত করিয়া শিষ্য গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ ও তাহার সহিত সম্ভাষণাদি করিবে। গুরু দেখিতে পান এমন স্থানে যথেচ্ছ করচরণাদি প্রসারণপূর্বক শিষ্য উপবেশন করিবে না।

[মনুসংহিতা ২।১৫৯ এবং ১৯৫-৯৭]
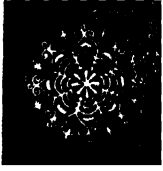
কথাপ্রসঙ্গে

শিষ্টাচার

শিষ্টাচার বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি মহৎ ব্যক্তি কর্তৃক আচরিত বা পালিত আচার-আচরণ। 'শিষ্ট' শব্দটির ব্যুৎপত্তি শাস্+ক্ত, অর্থাৎ যিনি নিজেকে শাসন করেন। সহজ কথায়, যেসব আচরণে মানুষের সুশৃঙ্খল ও সুমার্জিত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়—তাহাই শিষ্টাচার। সেই হিসাবে সুশৃঙ্খল ও সুমার্জিত মনোভাবের পরিচায়ক সমস্ত আচরণই শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, এক জাতিতে বা দেশে যে আচরণকে শিষ্টাচারসম্মত বলিয়া মনে করা হয়, অন্য জাতিতে বা দেশে সেই একই আচরণ শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং দেশ, কাল ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করিয়া কোন জাতি বা দেশবিশেষের আচরণের বিচার করিতে গেলে তাহার যথার্থ মূল্যায়ন হইবে না, বরং তাহাদের সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তথাপি ইহাও অনস্বীকার্য যে, অধিকাংশ শিষ্টাচারই সকল দেশের ও সকল জাতির পক্ষেই প্রযোজ্য। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর একটি কথা এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি বলিয়াছেন: "এক দেশে যাহা সুনীতি বলিয়া বিবেচিত হয়, অপর দেশে হয়তো তাহা সম্পূর্ণ দুর্নীতি বলিয়া পরিগণিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ—কোন কোন দেশে জ্ঞাতি ভাই-ভগিনীদের মধ্যে বিবাহ সম্ভব, অপর দেশে আবার উহা অতিশয় নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়।...কোন দেশে একবার মাত্র বিবাহ সম্ভব, অপর দেশে বহুবিবাহ প্রচলিত। এইরূপে আমরা সদাচারের অন্যান্য বিভাগেও দেখিতে পাই যে, উহার মান দেশে দেশে অতিশয় ভিন্ন, তথাপি আমাদের ধারণা—সদাচারের একটি সার্বভৌম মান ও আদর্শ আছে।" (বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ১।৫২-৫৩) প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শিষ্টাচার, সৌজন্য, সদাচার প্রভৃতি শব্দ সমার্থক।

শিষ্টাচার মনুষ্য-চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ, যে গুণের বিকাশ ব্যক্তিচরিত্রকে অধিকতর সুষমামণ্ডিত করিয়া তুলে। আর ব্যক্তিচরিত্রে এই গুণের বিকাশ যে পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতীয়—সকল জীবনকেই প্রভাবিত করিবে তাহা বলাই বাহুল্য। শিষ্টাচার মনুষ্য-চরিত্রকে কতদূর মহিমান্বিত করিতে পারে এবং কিভাবে সমাজের পরস্পরকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে সাহায্য করে, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে মহাভারতের একটি চিত্রের কথা মনে পড়ে। পাণ্ডব ও কৌরব—উভয় পক্ষের সেনারা যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন। যুদ্ধ শুরু হইবার প্রাক্‌মুহূর্ত। হঠাৎ দেখা গেল নিরস্ত্র যুধিষ্ঠির কৌরবপক্ষের সেনানিবাসের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তাহা দেখিয়া অনেকে ভাবিলেন যুধিষ্ঠির হয়তো ভীত হইয়া প্রতিপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে যাইতেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল প্রকৃত ঘটনা তাহা নহে। যে কোন বৃহৎ কাজের প্রারম্ভে গুরুজনদের আশীর্বাদ গ্রহণ একান্ত কর্তব্য। যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াও যুধিষ্ঠির তাহা

ভুলিয়া যান নাই। তাই তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য প্রভৃতি গুরুজনদের প্রণামপূর্বক তাঁহাদের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিলেন। তাঁহারাও যুধিষ্ঠিরের জয় কামনা করিয়া তাঁহাকে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করিলেন। যুধিষ্ঠিরের এই ব্যবহার শিষ্টাচারের একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত।

দুঃখের বিষয়, শিষ্টাচার কি জিনিস বর্তমানে আমরা তাহা ভুলিতে বসিয়াছি। ফলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিচয় দিতেছি আমাদের অশিষ্ট আচরণের ও অশান্ত মনোভাবের। বিদ্যালয়ে, বিধানসভায়, লোকসভায় ও অন্যান্য সভা-সমিতিতে—সর্বত্রই মানুষের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ লক্ষ্য করা যায়। ধর্মঘটের নামে ট্রাম-বাস পুড়াইতে, বিদ্যালয়ে শিক্ষককে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিতে, রাজনৈতিক দলাদলির জন্য প্রতিপক্ষের লোককে হত্যা করিতে, কিংবা খেলার মাঠে দলবিশেষের পৃষ্ঠপোষকরা প্রতিপক্ষের পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি হিংসাত্মক আক্রমণ করিতে কেহ কুণ্ঠিত হয় না। এই অশিষ্ট আচরণের ফল যে শুধু ব্যক্তিবিশেষকেই ভোগ করিতে হয় তাহা নহে, ইহার ফল সমগ্র সমাজকে তথা জাতিকে ভোগ করিতে হয়। সুতরাং সমাজের সকল স্তরের প্রতিটি মানুষ যদি এই শিষ্টাচার সম্বন্ধে সচেতন না হন, তাহা হইলে সমাজ সুশৃঙ্খলভাবে চলিতে পারে না। আর তাহার বিষময় ফল যে কি, তাহা সহজেই অনুমেয়।

গুণী ও সম্মানীয় ব্যক্তিকে যথাযথ সম্মান-প্রদর্শন শিষ্টাচারের একটি বিশেষ অঙ্গ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন: "যাকে অনেকে গণে-মানে—তা বিদ্যার জন্যই হউক, বা গান-বাজনার জন্যই হউক, বা লেকচার (lecture) দেবার জন্যই হউক, বা আর কিছুর জন্যই হউক—নিশ্চিত জেনো যে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে।" (কথামৃত, ১।১২।৩)। গীতাতেও (১০।৪১) আছে:

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥

—যাহা যাহা ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন বা শক্তিমান, সেই সকলই আমার অংশসম্ভূত বলিয়া জানিবে। তাই তাহাদের প্রতি যথাযথ সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শন একান্ত কর্তব্য, এবং ইহাই শিষ্টাচার-সম্মত।

একসঙ্গে যখন অনেক ব্যক্তি কথাবার্তা বলেন, তখন একজনের কথার মাঝখানে আর একজনের কথা বলা শিষ্টাচারসম্মত নয়। তাহা ছাড়াও, একসঙ্গে অনেক ব্যক্তির কথোপকথনকালে সর্বজনবোধগম্য ভাষাতেই কথা বলা উচিত। শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতিতে একবার শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত অধর সেন মহাশয় পরস্পরের মধ্যে ইংরেজীতে কথাবার্তা বলিতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের তাহা বোধগম্য না হওয়ায় তিনি জানিতে চাহিলেন তাঁহারা কি বিষয়ে কথাবার্তা বলিতেছিলেন। উত্তরে অধর বলিলেন: "আজ্ঞা, এই বিষয় একটু কথা হচ্ছিল, কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যার কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, সকলের প্রতি)—একটা কথা মনে পড়ে আমার হাসি পাচ্ছে। শুনো, একটা গল্প বলি। একজন নাপিত কামাতে গিয়েছিল। একজন ভদ্রলোককে কামাচ্ছিল। এখন কামাতে কামাতে তার একটু লেগেছিল। আর সে লোকটি ড্যাম (Damn) বলে উঠেছিল। নাপিত কিন্তু ড্যামের মানে জানে না। তখন সে ক্ষুর-টুর সব সেখানে রেখে, শীতকাল, জামার আস্তিন গুটিয়ে বলে; তুমি আমায় ড্যাম্ বললে, এর মানে কি, এখন বল। সে লোকটি বললে, আরে তুই কামা না; ওর মানে এমন কিছু নয়, তবে একটু সাবধানে কামাস্। নাপিত সে ছাড়বার নয়, সে বলতে লাগল, ড্যাম মানে যদি ভাল হয়, তা হলে আমি ড্যাম, আমার বাপ ড্যাম, আমার

চৌদ্দপুরুষ ড্যাম্। (সকলের হাস্য)। আর ড্যাম্ মানে যদি খারাপ হয়, তা হলে তুমি ড্যাম্, তোমার বাবা ড্যাম্, তোমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম্।" (কথামৃত, ৫। পরিশিষ্ট 'ক'। ১) এই গল্পের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুত বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত অধর সেন মহাশয়কে এই শিক্ষাই দিলেন যে, একসঙ্গে কথোপকথনকালে সর্বজনবোধগম্য ভাষাতে কথা বলাই শিষ্টাচারসম্মত। বিপরীত আচরণ যে শুধু শিষ্টাচারবিরুদ্ধ তাহাই নয়, তাহাতে অনেক সময় পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝা-বুঝিরও সম্ভাবনা থাকে।

বিনয় ও নম্রতা শিষ্টাচারের প্রধান অঙ্গগুলির অন্যতম। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাষ্টকে (শ্লোক ৩) আছে :

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

—তৃণ হইতেও অবনত এবং বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু হইয়া নিজ অভিমান ত্যাগ করিয়া এবং অপরের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করিয়া সর্বদা শ্রীহরির কীর্তন করিবে।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপ্রণালীতে আমরা দেখি, গুরুর প্রতি শিষ্যের কী অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা, অপরপক্ষে গুরুরও শিষ্যের প্রতি পুত্রের ন্যায় কী স্নেহ! গুরুর প্রত্যক্ষ শিক্ষায় তাঁহার চরিত্রের সদ্গুণরাশি শিষ্যে সঞ্চারিত হইয়া শিষ্যের চরিত্রকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিত। আজকাল এই জাতীয় শিক্ষা-পদ্ধতির কথা অকল্পনীয়। কারণ, আজকাল আগের মতো বিদ্যালয়ে এই শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ খুবই সীমিত। আর এই সীমিত সুযোগের প্রধান কারণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাধিক্য। অধিকসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে শিক্ষকের পক্ষে ছাত্র-ছাত্রী-বিশেষের উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। তাহা ছাড়া বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় নীতিশিক্ষা ও আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যগত আচার-আচরণের দিকটিকে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার ব্যবস্থাও নাই বলিলেই চলে। তবে এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও বর্তমান ব্যবস্থায়ও যে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া একেবারে অসম্ভব তাহা বলা অসমীচীন। শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার আসল পদ্ধতি হইল, নিজেরা আচরণ করা। কথায় বলে, 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।' নিজেরা আচরণ না করিয়া অপরকে শিখাইতে যাওয়া বৃথা। কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা স্বভাবতই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুকরণ করিয়া থাকে। তাহারা যদি দেখে যে যাঁহারা তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিতেছেন তাঁহারা শিষ্টাচার রক্ষা করিয়া চলেন তবে তাহারাও স্বাভাবিকভাবেই শিষ্টাচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবে।

শিষ্টাচার শিক্ষা করিবার এবং শিক্ষা দেওয়ার প্রথম ও প্রধান জায়গা হইল পরিবার। কেননা, পরিবারের লোকজনের সঙ্গেই মানুষকে অধিক সময় কাটাইতে হয়। আর সেইজন্যই সেখানে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার এবং উহা শিক্ষা করিবার সুযোগ বেশি। বিদ্যাশিক্ষার ন্যায়—শিষ্টাচার শিক্ষারও কোন বয়স বা কাল নির্দিষ্ট নাই। তথাপি শৈশবকালই হইল শিষ্টাচার শিক্ষার উৎকৃষ্ট সময়। পিতা-মাতার চরিত্রই ছেলে-মেয়েদের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। তাই পিতা-মাতাকেই এই শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে এবং বলা নিষ্প্রয়োজন যে, নিজেদের আচরণের আলোকে এই শিক্ষা দিতে হইবে। সন্তানেরা যদি দেখে যে তাহাদের পিতা মাতা তাহাদের পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহী এবং পরিবারের ও প্রতিবেশী অন্যান্য গুরুজনদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন, তবে তাহারাও পরিবারের ও প্রতিবেশী গুরুজনদের

প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবে। পিতা-মাতা যদি এই আদর্শ স্থাপনে অক্ষম হন, তবে সন্তান-সন্ততিরা তাহাদের পিতা-মাতার নিকট হইতে কী শিক্ষা লাভ করিবে? ফলে পিতা-মাতাও নিজ সন্তানদের নিকট হইতে কোনরূপ সম্মানলাভের আশা করিতে পারেন না। যে-সব ছেলে-মেয়েরা নিজ পিতা-মাতাকে সম্মান বা শ্রদ্ধা করিতে পারে না, সমাজের অন্যান্য গুরুজনদের প্রতি তাহারা শিষ্ট আচরণ করিবে—এইরূপ আশা করা যায় না। সুতরাং সন্তান-সন্ততিদের শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য, তাহাদের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ জাগরিত করিবার জন্য, পিতা-মাতার সংযত আচরণও বাঞ্ছনীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সম্মুখে কোন বয়োজ্যেষ্ঠ, সম্মানিত ব্যক্তি এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রভৃতি গুরুজন সম্পর্কে কোনরূপ অশোভন ও বিরূপ মন্তব্য করা কোন পিতা-মাতারই উচিত নয়। কারণ গুরুজনদের সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য শ্রবণ করাও ছোটদের পক্ষে হানিকর।

পরিশেষে বলি, আজকাল যাঁহারা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহাদের আচার-আচরণেও অনেক সময়ই শিষ্টাচারের অভাব পরিলক্ষিত হয়। যুবসমাজের মধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণের বা শিষ্টাচারের অভাব লক্ষ্য করা যায়, তাহার জন্য ঐ সকল ব্যক্তিরাই অনেকাংশে দায়ী। বড়রা যদি নিজ নিজ কার্যক্ষেত্রে তাহাদের মর্যাদা অনুযায়ী শিষ্টাচারসম্মত আচরণ করিতে সক্ষম হন, তবে সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার অনেকটারই সুরাহা হইবে বলিয়া আশা করা অযৌক্তিক নয়। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুশৃঙ্খল ও শিষ্টাচার-সম্পন্ন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য এই বিষয়টি তাঁহাদের গভীরভাবে ভাবিয়া দেখা ও জীবনে কার্যকরী করিয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন।

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

(স্বামী মাধবানন্দকে লিখিত)

শ্রীশ্রীদুর্গাসহায়

৫৭নং রামকান্ত বসু [স্ট্রীট]
কলিকাতা, ২৫।১১।১৮

প্রিয় নির্ম্মল,

তোমার ১৯শে নভেম্বরের পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। আমার শরীর বেশ ভাল নাই, সম্প্রতি ১দিন খাইবার সময় হঠাৎ নিচের ঠোঁট বাঁকিয়া যায়। ডাক্তাররা দেখিয়া Facial paralysis হইয়াছে বলিয়াছে (,) অতি mild form (;) বিশেষ ভয়ের কিছুই নাই। আজ গঃ ভট্টাচার্য্য আসিয়া সকল দেখিয়া ঔষধ ও plaster ব্যবস্থা করিয়াছে, বলিয়াছে অল্পেই সারিয়া যাইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা যেমন হয় হইবে। মহারাজ ভাল আছেন ও অন্যান্য সকলেও ভাল। সীতাপতিকে মহারাজ শীতকালে এইখানেই অর্থাৎ মঠে থাকিতে বলিয়াছেন (।) স্বামিজীর জ্ঞানযোগ পড়িয়া আনন্দ-লাভ করিয়াছ জানিয়া সুখি হইলাম। তিনি নিজে সাক্ষাৎকার করিয়া সকল বলিয়াছেন বলিয়াই তাহাতে এত জোর ; দেখে বলা এবং শুনে বলা ইহাই প্রভেদ। তুমি এত দুঃখ করিয়াছ কেন? অহং যদি না যায়, "এ অহং কার"? ঠাকুরের এই কথা স্মরণ করিয়া তাঁহারই এ অহং এই জানিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে। যদি অহং না যায় তাহা হইলে দাস অহং সন্তান অহং হইয়া থাক ইহাই ঠাকুরের উপদেশ। তাঁহার সহিত সম্বন্ধ করিয়া লইলে আর

কোনও ভয় ভাবনা থাকে না। প্রভু যেখানে রাখেন সেইখানে থাকিয়া তাঁহার পাদপদ্মে মন রাখিতে পারিলে সকল স্থানেই আনন্দ। নৈকট্য বা দূরত্ব বাস্তবিক মনেই রহিয়াছে (।) তাই উপনিষৎ বলেন "তদ্দূরে তদ্বন্তিকে তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদ্ উ সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ"। তোমার কামনা ভগবান পূর্ণ করুন এই তাঁহার নিকট আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। তোমরা সকলে ভাল আছ জানিয়া সুখি হইয়াছি। আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে এবং সকলকে জানাইবে। সনৎ প্রিয়নাথ প্রভৃতি সকলে তোমাদিগকে নমস্কার ভালবাসাদি জানাইতেছে।

ইতি শুভানুধ্যায়ী

শ্রীতুরীয়ানন্দ

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

(শ্রীপ্রমদা দাস মিত্রকে লিখিত)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

আজমীর

পূজনীয় মহাশয়েষু— ৪।৫।৯৪

বহুদিন পরে আপনার ২৯ তারিখের পত্র পাইয়া যৎপরোনাস্তি সুখী হইলাম। এ অকিঞ্চন জীবের প্রতি আপনার যে অতুল স্নেহ তাহার বিনিময় আমি কি দিয়া করি? অথবা আমার এমন কোন গুণ নাই যাহা দ্বারা আপনার ঐ অমানুষী স্নেহপ্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারি। বাস্তবিক আমি কেবল অতিমাত্র লজ্জিত হই। কোথায় আপনার ভক্তিরসাপ্লুত সরল অন্তঃকরণ কোথায় আমার নীরস শুষ্কপ্রায় কঠিন অন্তঃকরণ। অতএব মহাশয় আপনার যেরূপ ভগবানে অচলা ভক্তি সেরূপ কেবল আপনার মত সৌভাগ্যবানের ভাগ্যেই ঘটে। ২।৩ দিনের মধ্যে আমার এখান হইতে উদয়পুর যাইবার ইচ্ছা আছে। পরে বলিতে পারি না—তাহার ইচ্ছা। পত্রাদি দিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় দিবেন।

শ্রীমৎ স্বামীজি আমাদের এবার ইউরোপে ও আমেরিকা খণ্ডে প্রকৃতই নূতন যুগ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা বোধ করি আপনি সচরাচর সংবাদ পত্রে দেখিয়া থাকিবেন। তাঁর একখানি পত্র অল্প দিন হইল ক্ষেত্রীর রাজাজীর নিকট দেখিয়াছি। তাহাতে তিনি আগামী শীতকালে এখানে আসিবার কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার দিব্যমূর্ত্তি, অসাধারণ বুদ্ধি, উদার মত, সরল স্বভাবে আমেরিকাবাসিগণ এককালীন বিমোহিত হইয়াছেন। সমস্ত ভারতবাসীরই এক বাক্যে সমস্বরে চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। সেখানে কেবল তিনিই গৌরবান্বিত নহেন, কিন্তু তাঁহার সহিত সমগ্র ভারত গৌরবান্বিত হইয়াছে। যাহা হোক এ সম্বন্ধে অনেক বলিবার আছে, পরন্তু এখানে স্থানাভাবে সংক্ষেপেই উপসংহার করিতে চাই। মহাশয় আমার একটি উপহার—"ভূষা ভস্ম ভুজঙ্গাস্থি নিচয়ঃ স্থানং শ্মশানাশ্রয়ং ত্রৈলোক্যোপচয়োদ্ভবং বিষমপি তত্রাহমৃতং স্বীকৃতম্। যত্ত্যক্তং সকলৈঃ সুরাসুর নরৈ স্তত্তে প্রিয়ং প্রায়শঃ, ত্যক্তুং নার্হসি দেব মামপি যত স্তত্রোহস্মি সর্ব্বৈঃ প্রভো।"

C/o Maneesee Samartha Dasji, Editor Proprietor "Rajasthan Samachar" Ajmer, Rajputana.

স্মৃতিমালা

শ্রীমতী চিন্ময়ী বসু*.

জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখেছি যে মামার বাড়িতেই (বলরাম-মন্দিরে) আছি। মামার বাড়ি ছিল তখন সাধু-সন্ন্যাসীদের একটি লীলাক্ষেত্র। আমাদের মামাবাবু রামকৃষ্ণ বসু ছিলেন একজন নম্র, ধীর, স্থির ও অতি শান্ত প্রকৃতির লোক। অত সাধু যে তাঁর বাড়িতে আসছেন, থাকছেন, তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার, শোয়া-বসার, অসুখ-বিসুখে সেবা-শুশ্রূষার—সব ব্যবস্থা নিজে করতেন। আর এ-সবই তিনি এমনভাবে করতেন যে, দেখে কেউ বুঝতে পারত না তিনি এই বাড়ির মালিক। মামার বাড়িতে তখন যত সাধু থাকতেন অত সাধু এক বেলুড়মঠে ছাড়া আর কোথাও থাকতে দেখিনি। আর অত সাধু একসঙ্গে যেখানে থাকেন সেটাই তো মন্দির। তাই 'বলরাম-মন্দির' নাম সার্থক হয়েছে। শ্রীশ্রীমহারাজ (অর্থাৎ পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ) যখন থাকতেন তখন যেন উৎসব লেগে থাকত। বলরাম বসু কি রকম ছিলেন, তা আমি দেখিনি। তবে বইয়েতে পড়ে এবং তাঁকে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কাছ থেকে শুনে মনে হত মামাবাবু যেন তাঁরই প্রতিমূর্তি।

শ্রীশ্রীমাকে বহুবার বহুভাবে দেখবার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, তখন তাঁকে দেবী বলে একটুও মনে হয়নি। মামাবাবুর একটি ঘোড়ার গাড়ি ছিল। সেই গাড়িতে দিদিমা গঙ্গায় নাইতে যেতেন—শ্রীশ্রীমাও অনেকদিন যেতেন, আমিও তাঁদের সঙ্গে অনেকবার গেছি। আমার মামাতো বোনেরাও অনেক সময় সঙ্গে থাকত। কখন কখন গোলাপ মা, যোগেনমা, নলিনীদি, মাকুদি আরও অনেকে, যেমন বলরাম মন্দিরের পাশের বাড়ির চুনিলাল বসুর স্ত্রী অথবা পাড়ার কোন কোন বিধবারাও থাকতেন। প্রতিদিন অনেক লোক দিদিমার শ্রীশ্রীজগন্নাথের প্রসাদ পেতেন। শ্রীশ্রীমা যেদিন গঙ্গায় নাইতে যেতেন সেদিন গাড়িতে বেশি লোক থাকত না। দিদিমা বলতেন, 'শ্রীশ্রীমায়ের কষ্ট হবে'। গঙ্গায় নাওয়া হলে শ্রীশ্রীমা হাত ধরে আমাদের ছোটদের গাছতলায় বামুনদের কারুর কাছে নিয়ে গিয়ে বলতেন, 'দাও বাবা! এদের চন্দন পরিয়ে।' খুব আনন্দের সঙ্গে চন্দনের ছাপ পরে আবার শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে গাড়িতে করেই ফিরে আসতাম। কখন কখন দেখেছি, গঙ্গাস্নান সেরে ফিরে মামার বাড়িতেই সবার নামা হল—বোধ হয় সকলের খাওয়া ওখানেই সেদিন হত। দেখেছি বড়রা খুব ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে যেতেন, আমার কিন্তু অত ধৈর্য নেই। এতক্ষণ যা ঘটল সে সমস্ত খবরই তো মহারাজকে দিতে হবে! তারপর খেয়ে আবার নিবেদিতা স্কুলে যাওয়া আছে। যাওয়ার সময় আবার শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে হবে—তবে যাওয়া। দিদিমার সামনে একটু কিছু ত্রুটি হওয়ার উপায় নেই।

মামার বাড়ির বাইরের ঘরে (এখন যেটা ঠাকুরঘর) মহারাজ থাকতেন। বাড়িতে যখন যা ঘটুক না কেন সব কথা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে গিয়ে বলা চাই। এমন কি স্কুল থেকে এসেই আগে মহারাজের কাছে সব কথা বলতে হবে। তিনিই ছিলেন আমাদের বন্ধু, আমাদের খেলার সাথী।

ভেতরের বাড়িতে দিদিমার সামনে সমস্ত কাজ ঠিকঠাক করতে হবে—বড়দের প্রণাম করা, পায়ের ধুলা নেওয়া, কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে তার যথাযথ উত্তর দেওয়া ইত্যাদির মধ্যে একটুও এদিক ওদিক হবার জো ছিল না।

* ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের দৌহিত্রী।

কিন্তু বাইরের বাড়িতে মহারাজের কাছে এলেই আমাদের সব ভয় কেটে যেত। ওখানে আমাদের কেউ কিছু বলতে সাহস পেতেন না।

শ্রীশ্রীমা উদ্বোধনের বাড়িতে থাকাকালীন আমার মা কোনদিন মামার বাড়িতে এলে উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতেই দুপুরে সাধারণতঃ প্রসাদ পেতেন। আমিও অনেকদিন গঙ্গা-স্নানের পর তাঁর সঙ্গে গিয়ে মায়ের বাড়িতে প্রসাদ পেয়েছি। তবে স্কুল থাকত বলে রোজ যাওয়া হত না। দিদিমাকে কিন্তু ঐরূপ প্রসাদ পাওয়ার জন্য যেতে খুব কম দেখতাম, কারণ মামার বাড়ির এই যে বিরাট সংসার সেটা ধরে থাকতেন তো দিদিমা! তিনি কি করে যাবেন?

মঠে পুরানো ঠাকুরঘরের নিচের ঘরে তখন সাধুরা যেভাবে বসে তরকারি কাটতেন মামার বাড়ির ভেতরের দোতলায় ঠাকুরঘরের কোলে বড় বারান্দায় সেইভাবে তরকারি কাটা হত। অনেক তরকারি, আর বড় বড় ঝুড়ি। আর অনেক লোক (অবশ্য সব মেয়েরা) বড় বড় বঁটি নিয়ে বসে তরকারি কাটত।

আমরা মামার বাড়ি এলে যেদিন গঙ্গা থেকে উদ্বোধনে প্রসাদ পেতে যেতাম, দেখতাম শ্রীশ্রীমা ঠাকুরঘরে যেতে বাঁদিকের ঘরটার জানালার কাছে বসে আছেন, 'পা' ছড়িয়ে। ফল মিষ্টির বড় থালাটা আনা হত, শাল পাতায় মা প্রসাদ ভাগ করে দিতেন। শ্রীশ্রীমায়ের মত হচ্ছে ভোগ হলে আগে প্রসাদ খেয়ে সবাই শরীর ঠাণ্ডা কর। এ তো গেল জল খাওয়া। তারপর যখন প্রসাদ পেতে বসবেন তখন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে হাত পেতে সবাই একটু একটু প্রসাদ নেবে। শ্রীশ্রীমা আগে সব রকম প্রসাদ মেখে মুখে দিতেন। আমি ছোট ছিলাম। মনে আছে, আমার মা কৃষ্ণময়ী বলতেন, মায়ের পাতে হাত দিবি না, হাত পেতে নিবি। আমি দুটো হাত জোড়া করে পাততাম। শ্রীশ্রীমা কিন্তু তাঁর বাঁ হাত আমার হাতের তলায় রেখে আমাকে ছুঁয়েই হাতে প্রসাদ দিতেন।

আগেই বলেছি, আমি মামার বাড়িতেই মানুষ হয়েছি। আমার মা, মামা এবং মামার বাড়ির সবাই লেখাপড়া ভালবাসতেন। কিন্তু আমার বাবা মেয়েদের লেখাপড়া একেবারেই পছন্দ করতেন না। আমার দিদিমা বেনারস যাবেন স্থির হল, মনে হয় সেটা ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ। তখন আমার মার মনে খুব ভাবনা হল, আমি থাকব কোথায়? পড়াশোনা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। এসব আলোচনা শুনে আমার খুবই খারাপ লাগল। শেষ পর্যন্ত মায়েরা মহারাজের শরণাপন্ন হলেন। বিপদতারণ শ্রীকৃষ্ণের মতো তিনিই সব ব্যবস্থার ভার নিলেন। আমার বাবাও শ্রীশ্রীমহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত ছিলেন। তাই মহারাজরা যা বলতেন তার ওপর কিছু বলতেন না। বিশেষ করে মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, হরি মহারাজ—এঁদের কথা নির্বিচারে মেনে নিতেন। মহারাজ স্থির করলেন আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে না। নিবেদিতা স্কুলের বোর্ডিং-এ রেখে তিনি আমার পড়াশুনার ব্যবস্থা করে দেবেন। বলাবাহুল্য বাবা সেই ব্যবস্থা মেনে নিলেন। মায়ের ভয় ছিল বাবা না একটা বিশ্রী কাণ্ড করে বসেন। কিন্তু বুঝতে পারলাম না কোথা দিয়ে কি হল। ব্যবস্থামতো আমি বোর্ডিং-এ গেলাম। যদিও তখন বোর্ডিং-এ খুবই কষ্ট ছিল, আমার কিন্তু একটুও কষ্ট হয়নি। বোর্ডিং-এ কত মেয়ে, সবাই আমাকে খুবই ভালবাসে। আর তাছাড়া স্কুলে যাওয়া, শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি যাওয়া, এবং মাঝে মাঝে এখানে-সেখানে বেড়াতে যাওয়া—এতেই আনন্দ, খাওয়াটা কিছুই নয়। একদিন স্কুল নিয়ে উদ্বোধনে গেছি, দেখি শ্রীশ্রীমা ঠাকুর-ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। বাঁ হাতটা দরজায় রাখা, ডান হাতে যেন একটা কিছু

আছে। ভূমানন্দ স্বামী বললেন, মা আপনি এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে কেন? শ্রীশ্রীমা বললেন, সুধীরা রোজ চিনিকে ফুল দিয়ে পাঠায়, ছেলে-মানুষতো! মনে আছে শ্রীশ্রীমা সেদিন বেশ বড় একটি সন্দেশ দিলেন। আমি তো মহা খুশি!

রাধুর অসুখ বলে তাঁকে নিয়ে শ্রীশ্রীমা আমাদের স্কুলের বোর্ডিং-এ নিরিবিলিতে থাকবেন শুনলাম। আমাদের বোর্ডিং-এর যে অংশটাতে ঠাকুরঘর ছিল ঐ অংশটা ছেড়ে দিয়ে আমরা অপরদিকের বাড়িটাতে চলে গেলাম। বড়রা অবশ্য অনেকে স্কুল বাড়িতেই রইলেন। ওখানেও অর্থাৎ বোর্ডিং-এর ঠাকুরঘরেও শ্রীশ্রীমাকে ফুল দিতে গেছি। শ্রীমা জানালার ধারে পা-টা লম্বা করে বসে আছেন। বাড়িটা একেবারে নির্জন। উদ্বোধনের মতো লোকজনের ভিড় নেই। একদিন শ্রীশ্রীমা বল্লেন আজ তো গদাইরা এখনও আসেনি, চন্দন ঘষবে? মহা আনন্দ হল। কার জন্য চন্দন ঘষতে বলছেন, কে পুজো করবে,—এসব কিছুই তখন মনে হয়নি। শ্রীশ্রীমা চন্দন ঘষতে বলছেন, এই আনন্দেই তখন আটখানা। একটু পরেই মাসিমা, বাণীদি, মীরা মাসিমা, বড়রা আরও অনেকে আস্তে আস্তে একটুও শব্দ না করে এলেন; বললেন সাবধানে করবি। নিবেদিতা স্কুলে প্রথম থেকেই ঠাকুরের কাজ খুব নিখুঁত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে করার দিকে সকলেই খুব নজর দিতেন। তাই সেই ছোট থেকেই স্বভাব হয়ে গেছে পূজার বাসন ঝক্ ঝক্ করবে, চন্দনপিঁড়িতে এক ফোঁটাও কিছু লেগে থাকবে না।

মামার বাড়ি থেকে যেদিন উদ্বোধনে আমার গর্ভধারিণীর সঙ্গে প্রসাদ পেতে যেতাম শীতকাল হলে শ্রীশ্রীমা ছাদে একটু বসতেন, পাশের ঘরটায় গোলাপ মা থাকতেন ও মায়েরা। আমার মেজবোন (উষারানী বসু) শ্রীশ্রীমার চুল আঁচড়ে দিতেন, আর দেখতাম আঁচড়াবার সময় উঠে আসা চুলগুলো আঁচলে বেঁধে রাখতেন। একদিন আমারও ইচ্ছা হল আঁচড়াতে। মেজদি বড্ড বকতেন। কাজেই উনি থাকলে ওধারে যেতাম না। আমার গর্ভধারিণী থাকলে গেছি, ইসারায় ওঁকে বললাম আমি শ্রীশ্রীমায়ের চুল আঁচড়াব। কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। আস্তে আস্তে গুটি গুটি শ্রীশ্রীমায়ের সামনে ভাল মানুষের মতো বসে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। তখুনি দয়ার সাগর মা বললেন, কৃষ্ণময়ী, ওকে একটু দে, ছেলে মানুষ। দুবার চিরুনি টেনেছি। মনে হয় শ্রীশ্রীমায়ের লেগেছিল, কারণ বললেন, আজকের চুলগুলো সব চিনিই পাবে। মা বুঝতে পেরে বকে আমাকে সরিয়ে দিয়ে চিরুনি কেড়ে নিলেন। ঐ দুবারে কি এমন লাগতে পারে সেটা আমার মাথায় এল না। আরও আগেকার কথা, শ্রীশ্রীমা মামার বাড়ি এলেন। বাইরের সিঁড়ি দিয়ে শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে অনেকে উপরে এলেন। তাঁকে দেখে রাজা মহারাজ হাত জোড় করে প্রণাম করে এমন ভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন যে, এরূপ এর আগে আমি কখনও দেখিনি; যেন একেবারে স্থির, ধ্যানস্থ। মহা-রাজকেই সবাই ভক্তি করবে, প্রণাম করবে, আর সেই মহারাজ-ই কিনা শ্রীশ্রীমাকে এইভাবে প্রণাম করলেন!

যাইহোক, কবে মনে নেই শ্রীশ্রীমা অন্য কোথাও চলে গেলেন, আর ফিরলেন খুব অসুখ নিয়ে। তখন আবার আমাদের বোর্ডিং-এর মেয়েদের পালা করে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি গিয়ে কখনও শ্রীশ্রীমাকে হাওয়া করা, কখনও গায়ে হাত বোলানো ইত্যাদি সেবা করতে হত। কিন্তু তাতে স্কুলের নিয়মের একটুও গোলমাল হবার জো নেই। স্কুলের সব নিয়ম ঠিক রেখে এসব কাজ করতে হত। শ্রীশ্রীমায়ের ঐভাবে শুয়ে

থাকা, অন্তদের কথাবার্তা ইত্যাদি থেকে বুঝতে পারছি তিনি আর ভাল হয়ে উঠবেন না। তাই মনটা খুবই খারাপ লাগছিল। শ্রীশ্রীমাকে যাঁদের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরা বুঝতে পারবেন শ্রীশ্রীমায়ের এমন একটা ভাব ছিল, যার জন্য তাঁকে না ভালবেসে পারা যেত না। আপনিই তাঁকে ভালবাসতে হবে। তারপর এল সেই কাল রাত্রি, আমরা ভোর থেকে লাইন দিয়ে প্রণাম করে এলাম, খুব কান্না পেয়েছিল। বোর্ডিং-এ এসে সবায়ের মন খুব খারাপ, একটা আনন্দের হাট ভেঙে গেল।

শ্রীশ্রীমা চলে যাওয়ার পরেও ফুল দিতে উদ্বোধনে গেছি, মহারাজরা, গোলাপমা-রা সবাই 'চিনির' হাতে প্রসাদও দিয়েছেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, কেমন যেন খালি খালি লেগেছে, সেরকম আনন্দ আর পাইনি। শ্রীশ্রীমা যাকে যেমন ভাবে দিতেন—পূজনীয়া গোলাপমাও কিন্তু খুব নিষ্ঠার সঙ্গে সেগুলো পালন করতেন ; বুঝতে পারতাম, নলিনীদি, মাকুদি, সবাই সেই রকম আছে, কিন্তু তবুও মনে হত সব খালি। পূজনীয় শরৎ মহারাজ একইভাবে কী ভালবাসা নিয়ে ঘরে বসে আছেন! সব ঠিক ঠাক, তবু যেন কী একটা হারিয়ে গেল—এই মনে হত। সব সময় একটা অভাব বোধ হত।

মহারাজ সন্ধ্যাবেলা বলরাম-মন্দিরের হলঘরে আমাদের সঙ্গে ধ্যান করতে বসতেন। তুলসীরাম ঘোষের দুই নাতি, চিতু, আমি এবং আরও অনেকে ধ্যানে বসলাম। মহারাজ এক মজা করলেন। একটা বাঘ না ভালুক—কিসের একটা ছাল জড়িয়ে বিকট আওয়াজ করে ধপ্ ধপ্ করে লাফাতে লাফাতে ঘরে এলেন। অন্ধকার ঘর, আর ঐ চেহারা ও আওয়াজ! যদিও আমরা জানতাম মহারাজই এভাবে এসেছেন তবুও ভয় পেয়ে 'জানি তুমি মহারাজ', 'জানি তুমি মহারাজ' বলছি, আর ছুটছি। তখন অন্য সব সাধুরাও বেরিয়ে এসে খুব হাসাহাসি করলেন। আমাদের কী রাগ তাঁদের ওপর! কেন তাঁরা আমাদের নিয়ে হাসছেন? আর কেনই বা ভয় দেখানো হল? আমরা আর ধ্যানে বসব না ঠিক করলাম। কিছুতেই রাজী করাতে পারলেন না আমাদের। দুষ্টুমি বুদ্ধিতে ভরা ছিলেন মহারাজ! একদিন নিজেই ধ্যানে বসে পড়লেন, অন্য সাধুরাও এমন ভাব দেখালেন যেন নিজেরা খুব ভক্তির সঙ্গে মহারাজের সঙ্গে ধ্যানে বসবেন। আমাদের বসতে দেবেন না। তখন আমরাও বসে পড়লাম। কিন্তু বুঝতে পারিনি কখন মহারাজ তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে হঠাৎ কোথায় সরে পড়েছেন!

একবার মহারাজ মাদ্রাজ গেলেন। কিন্তু যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর আগের সেবক বিশ্বরঞ্জন মহারাজকে দেখলাম না, ঈশ্বর মহারাজ বলে আর একজন নতুন সেবককে সঙ্গে নিয়ে এলেন। মহারাজকে জিজ্ঞাসা করা হল, আমাদের বিশ্বরঞ্জন মহারাজকে কোথায় রেখে এলেন? মহারাজও খুব গম্ভীর মুখ করে উত্তর দিলেন, তপস্যা করতে। সেখানে সে খুব ধ্যান করবে। তোদের মতো ধ্যান নয়, খুব গভীর বনে গিয়ে ধ্যান করবে, বাঘ ভালুক কত কি আসবে, একটুও ভয় পাবে না। ধ্যান করলে কি ভয় আসে? আবার মনে দ্বন্দ্ব দেখা দিল, সত্যিইতো যদি উনি অত জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে ভয় না পান, আমরাই বা কেন পাব? তাই নিজেরাই আবার আগ্রহ করে ধ্যানে বসলাম। মহারাজকেও খুব কাকুতি-মিনতি করে অনুরোধ করা হল যেন ভয় না দেখান। বসা তো গেল। কিন্তু আবার সেই আগের নাটকেরই পুনরাবৃত্তি। যতই মনে করি উঠব না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভয়ে উঠে পড়লাম। আর সব রাগ গিয়ে পড়ল

মহারাজের উপর। আমরা রাগ করলে কি হবে, মহারাজ কিন্তু আমাদের উপর একটুও বিরক্ত হতেন না। পরে বুঝতে পারতাম আমাদের সঙ্গে ঐ রকম হুম্বি করে মহারাজ আনন্দই পেতেন। কারণ তিনি খেলার সাথীর মতোই আমাদের সঙ্গে মিশতেন। আজ কেবলই মনে হয় তখন কিছুই বুঝিনি।

মহারাজের সঙ্গে তাস, লুডো, আর গোলক ধাঁধাঁ খেলতাম। যতবার খেলব ততবারই মহারাজ যাবেন জিতে। গোলক ধাঁধাঁর একেবারে উপরে স্বর্গ আর নিচে নরক। অবশ্য মাঝে আরও অনেক ঘর থাকে, সেগুলো মনে নেই। মহারাজ একটু খেলেই একেবারে স্বর্গে উঠে যেতেন আর আমরা কেমন করে জানি না একেবারে নিচে নরকের ঘরে চলে আসতাম। যেই হেরে যেতাম এমনি, 'তুমি মহারাজ জুচ্চুরি করছ' বলে তাঁর উরুতে দু-চারটি ঘুসি মেরে খানিক কান্না-কাটির পরই কিন্তু আবার যখন খেলতে বসতাম ঠিক জিতে যেতাম। মহারাজজীর শরীর যে কী নরম ছিল, যাঁরা দেখেননি তাঁরা তা কল্পনাও করতে পারবেন না।

রামলাল দাদা খুব সুন্দর মেয়ে সেজে নাচতে পারতেন। একবার মহারাজের হুকুম, নাচতে হবে। ওঁর বোধ হয় লজ্জা করছে, কিন্তু মহারাজ যা বলবেন তাই তো হবে। বুঝতে পারলাম না কোথা থেকে সব ভাল ভাল কাপড় এল, সাজবার জন্য। পরে মার কাছে শুনেছি, ভিতর থেকেই দেওয়া হয়েছিল। সবাই খুব আনন্দ উপভোগ করলাম।

গঙ্গাধর মহারাজ প্রায়ই সারগাছিতে থাকতেন। তিনিও ছিলেন যেন ছোট ছেলের মতো। আর মহারাজও আমাদের নিয়ে ওঁর পেছনে লাগতেন। বলরাম-মন্দিরের যে ঘরটায় এখন ব্রহ্মচারীরা থাকেন গঙ্গাধর মহারাজ ঐ ঘরেই মাটিতে বিছানা পেতে শুতেন। আমরা ভোর বেলা এসে তাঁকে প্রণাম করতাম আর 'সুপ্রভাত' বলতাম। মহারাজ শিখিয়ে দিলেন; 'তোরা যখন "সুপ্রভাত" বলবি তখন তাঁকে (গঙ্গাধর মহারাজ) একটা চোখ দেখাবি।' আমরাও খুব মজা পেয়ে গেলাম। 'সুপ্রভাত' বলে প্রণাম করার সাথে সাথে একটি চোখ দেখানো হল আর গঙ্গাধর মহারাজও আমাদের খুব বকে তেড়ে এলেন। আমরা পালালাম মহারাজের কাছে। উনি কিন্তু তখন গম্ভীর, যেন এসব ব্যাপার কিছুই জানেন না। গঙ্গাধর মহারাজ মহারাজের কাছে গিয়ে খুব রাগ দেখালেন; বললেন, রাজা এসব তোমারই কাজ। আজ আমার সারগাছি যাওয়া হল না। মহারাজ আমাদের বকলেন, 'তোরা কেন এরকম কাজ করলি?' এটা কিন্তু আসল রাগ নয়, রাগের ভান করে মজা করা। যত দিন যাচ্ছে তাঁদের স্নেহ-ভালবাসার কথা তত গভীরভাবে অনুভব করতে পারছি। তখন কিন্তু তাঁদের আমাদের খেলার সাথী ছাড়া অন্য কিছুই মনে হয়নি।

আজও বলরাম মন্দিরে গিয়ে বসলে গান বাজনা সব শুনি আর কেবল তাঁকে (মহারাজকে) মনে পড়ে। তাঁর হাত, পা, কী সুন্দর ছিল! কেবলই মনে হয় এই সেই বলরাম-মন্দিরের হলঘর যেখানে গেরুয়া কাপড় পরা সব সন্ন্যাসী বসে আছেন, আর সে কী গান! শ্রীশ্রীমহারাজের সঙ্গে রথও টেনেছি। একবার, নাচ গানও দেখেছি। কিন্তু সেটা খেলার সাথীর সঙ্গে যেমন হয় তেমন। গত ১৯৮৪-তে যখন রথযাত্রা দেখতে বলরাম-মন্দিরে যাই তখন মন কেবলই অজান্তে মহারাজের কাছে, মার কাছে, মামার কাছে চলে যাচ্ছিল। ওখানে (বলরাম-মন্দিরে) কিছু দেখলেই সেই সব পুণ্য স্মৃতিই মনে আসে আর মন বহু দূরে চলে যায়। কী পেয়েছিলাম, অথচ তখন বুঝিনি ভেবে এখন বড় কান্না পায়। মনে হয় মহারাজের পায়ে মাথা ঠুকি, আর বলি তখন কেন বুঝতে দাওনি। সন্ধ্যায় একদল কীর্তনওলাদের সঙ্গে সব সাধু-ভক্ত কীর্তন করছেন। দেখে মনে হতে লাগল—মহারাজ আর মামা দাঁড়িয়ে দেখছেন, হাসছেন—আর বলছেন 'কী সুন্দর তীর্থস্থান করে দিয়ে গেলাম দেখুক সবাই'।

সহস্র-দ্বীপোদ্যানে স্বামী বিবেকানন্দ

মেরী লুইস বার্ক

এই পার্কে স্বামীজীর শেষ দিনটা কিভাবে কাটল তা আর একবার দেখা যাক্‌। দুপুরের খাওয়ার পর অন্যান্য দিনের মতো এই দিনেও স্বামীজী বেড়াতে বেরুলেন। এই দিনে অর্থাৎ এই শেষ দিনটায় কিন্তু ক্রীস্টিন ও মেরী ফাঙ্ককে সঙ্গে নিলেন। এদের দুজনকে বেছে নেবার কারণ এরা নবাগত। আর যারা তারা সমস্ত গরম কালটা তাঁর সঙ্গ পেয়েছে। অর্থাৎ গোড়া থেকেই তারা তাঁর কাছে থেকেছে। এরা পরে এসেছে তাই তিনি বললেন: বিদায় নেবার আগে এই নবাগতদের সঙ্গে আলাদা করে একটু কথা বলতে চান। পরে মিসেস ফাঙ্কের লেখা থেকে পাই তাঁরা 'আধ মাইল দূরে একটা পাহাড়ের উপর চড়লেন। স্থানটি জঙ্গলে ভরা, আর একেবারে নিঝুম।' (ইদানীং যাঁরা এদিকটায় গেছেন তাঁরা বুঝতে পারবেন ঠিক কোন জায়গাটায় স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গিনীরা গিয়েছিলেন। তাঁরা উত্তর-পূর্ব দিকে যে পাহাড় আছে সেটা পেরিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর কিছুটা জঙ্গলের পথ, আর কিছুটা পাহাড়ের গাত্রসংলগ্ন গ্র্যানিট পাথরের পথ। এই পথ দিয়ে এগিয়ে গেলে তাঁরা একটা ওক গাছের কাছে এসে পৌঁছুলেন। এ জায়গাটার দূরত্ব যে বাড়িতে স্বামীজীরা ছিলেন তা থেকে আধ মাইলের কম। এই গাছটার ডালপালা আজ অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। এই ডালপালার নিচে প্রকাণ্ড এক সমতল পাথর। ঠিক এই জায়গা থেকে পাহাড়টা খাড়া নেমে গেছে নিচে নদী পর্যন্ত। এখান থেকে মাইলের পর মাইল দেখা যায় নয়ন মুগ্ধকর সবুজ বনভূমি।) মেরী ফাঙ্ক লিখে চলেছেন: 'শেষ পর্যন্ত তিনি (অর্থাৎ স্বামীজী) একটা গাছ বেছে নিলেন যার ডালগুলি নিচে ঝুঁকে পড়েছে। (খুব সম্ভব যে ওক গাছটি আজ ঐ জায়গাটির আচ্ছাদন হয়ে আছে সেই গাছটিই) আমরা নিচে ঝুঁকে পড়া ডালগুলির তলায় বসে পড়লাম। আমরা আশা করে এসেছিলাম স্বামীজী আমাদের কিছু উপদেশ দেবেন। কিন্তু তা না দিয়ে হঠাৎ বলে বসলেন: "এসো, আমরা ধ্যান করি। বোধিবৃক্ষের নীচে আমরা যেন সবাই বুদ্ধ।" দেখতে দেখতে তিনি এমন ধ্যানে ডুবে গেলেন যে তাঁকে দেখে মনে হতে লাগল যেন ব্রঞ্জের তৈরি একটি মূর্তি! ঠিক এই সময়ে বজ্রসহ ঝড় শুরু হয়ে গেল, আর মুষলধারে বৃষ্টি। কিন্তু স্বামীজীর ভ্রূক্ষেপ নেই। আমি আমার ছাতি খুলে যতদূর সম্ভব তিনি যাতে জলে ভিজে না যান তার চেষ্টা করতে লাগলাম। তিনি কিন্তু ধ্যানে সমাহিত, বাইরের সব কিছু যেন তাঁর চেতনার বাইরে।'

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 'দেববাণী'র যে সংস্করণ বের হয় তার মুখবন্ধে স্বামী নিখিলানন্দ লিখছেন: 'শোনা যায় যে থাউজাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে থাকতে স্বামীজীর একবার নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল।' এই ঘটনাকেই লক্ষ্য করে কি তিনি এই কথা লিখেছেন? যদি তাই হয় তাহলে স্বামীজীর নির্গুণ ব্রহ্মে লীন হয়ে যাবার যে চেষ্টা, তা আর একবার বাধা প্রাপ্ত হল। মেরী ফাঙ্কের কথায় ফিরে আসি। তিনি লিখছেন অবিলম্বে আমরা দূরে চেঁচামেচি শুনতে পেলাম। অর্থাৎ আমাদের সঙ্গী সাথীরা আমাদেরই খোঁজে ছাতা ও বর্ষাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। স্বামীজী যেন খুব দুঃখভারাক্রান্ত এমনভাবে চোখ খুলে চারিদিকে তাকালেন, কারণ এবার আমাদের তো ফিরতে হবে। স্বামীজী বললেন! 'আবার দেখছি আমি কলকাতার বর্ষার মধ্যে ফিরে

গেছি।' আপাতদৃষ্টিতে কথাটা খুবই সাধারণ, কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার কাশীপুরে বর্ষার সময়কার এই রকম একটা ঘটনার কথা। তাঁর জীবনীতে এই ঘটনাকে এই বলে অভিহিত করা হয়েছে—'নরেনের সাধনার সব চেয়ে দিব্য পরিণতি, তার আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বোচ্চ ও গৌরবদীপ্ত অনুভূতি।'[১] স্বামীজী কি থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে আধ্যাত্মিকতার সেই সর্বোচ্চ শিখরে আবার একবার পৌঁছেছিলেন? তারপর কি কেউ তাঁকে সেই শিখর থেকে 'ধাক্কা দিয়ে' নিচে ফেলে দিয়েছিল? যে উদ্দেশ্যে তাঁর দেহধারণ, এই মর্ত্যধামে নেমে আসা, তা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে বলে?

সেই রাত্রেই পৌনে নটায় স্বামীজী মিস্ ওয়াল্ডোর সঙ্গে ক্লেটনের উদ্দেশে নদীপথে স্টীমারে চাপলেন। ক্লেটন থেকে ট্রেনে চেপে মিস ওয়াল্ডো যাবেন এ্যালবানীতে, আর স্বামীজী যাবেন নিউইয়র্কে। শোনা যায় যে স্বামীজী পার্ক ছেড়ে যাবার সময় বলেছিলেন: 'এই থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কের উপর আমার আশীর্বাদ রইল।' স্বামীজী এ কথাগুলি বলে জায়গাটির কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেলেন, যে পরম শান্তি তিনি এখানে লাভ করে গেলেন তার জন্যে। তবে এই কৃতজ্ঞতা তাঁর জানাবার কোন প্রয়োজন ছিল না কারণ তিনি যে এতদিন এখানে কাটিয়ে গেলেন এইটেই ওর উপর তাঁর স্থায়ী আশীর্বাদ হয়ে রইল। তিনিই একদিন সকালে ক্লাসে বলেছিলেন—'যাঁরা ঈশ্বরকে ভালবাসেন তাঁরা যেখানেই থাকেন সেই জায়গা পবিত্র হয়ে যায়। ঈশ্বরের সন্তানদের পুণ্যপ্রভাবে এটা সম্ভব হয়।' ঈশ্বরের সন্তানেরাই ঈশ্বর। তাঁরা যখন যা বলেন তাই আপ্তবাক্য হয়ে যায়। তাঁরা যেখানে থাকেন সেখানকার আকাশ-বাতাসে তাঁদের ব্যক্তিত্বের স্পন্দন ভরপুর করে রাখে। যারাই সেখানে যায় তারাই সেই স্পন্দন অনুভব করতে পারে। তাদেরও চরিত্র ধীরে ধীরে মহৎ থেকে মহত্তর হতে থাকে। স্বামীজী তাঁর বিদায়সূচক আশীর্বাণীর দ্বারা এই সত্যেরই ঘোষণা করে গেলেন।

এরপর স্টীমার নদীর মাঝপথের দিকে এগুতে থাকল। স্বামীজী তখন 'ছোট ছেলের মতো আনন্দ করতে করতে তাঁর টুপি নাড়িয়ে' ডকে তাঁর যে পাঁচ-ছয় জন শিষ্য-শিষ্যা উপস্থিত ছিল তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। দেখতে দেখতে স্বামীজী দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন।*

১ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম ভাগ, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১৮০ দ্রষ্টব্য।

* Swami Vivekananda in the West: New Discoveries, The World Teacher (part one), Vol. III (3rd Edition, 1985) গ্রন্থের 'Thousand Island Park' পরিচ্ছেদের অংশবিশেষ (পৃঃ ১৭৬-৭৮) স্বামী লোকেশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত। বইখানির সম্পূর্ণ অনুবাদ 'উদ্বোধন কার্যালয়' থেকে গ্রন্থাকারে যথাসময়ে প্রকাশ করা হবে।—সঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ এক নতুন ধর্মের প্রবক্তা

স্বামী আত্মস্থানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ধর্ম মানুষের হৃদয়কে সম্প্রসারিত করবে। তা না করে নানা ধর্ম মানুষকে নানা পথে পরিচালিত করছে। ফলস্বরূপ সমাজকে খণ্ডিত করে দিচ্ছে। আমরা খণ্ড খণ্ড হয়ে যাচ্ছি। আমরা সব পর দেখছি। "দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি"—সবই তো দ্বিতীয় করে ফেলছি। স্বামীজী বলেছেন: "এই ব্যক্তি তাঁর একান্ন বর্ষব্যাপী একটা জীবনে পাঁচ হাজার বছরের জাতীয় আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন করে গেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষাপ্রদ আদর্শরূপে আপনাকে গড়ে তুলে গেছেন।"[১৩] শুধু তাই নয়, তিনি বলেছেন: "এখানকার (আমার) অনুভূতি সকল বেদ-বেদান্ত ছাড়াইয়া গিয়াছে।"[১৪] তাই তো শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু প্রাচীন নন, শুধু নবীন নন, তিনি আগামী দিনের আশ্রয়, তিনি ভবিষ্যতের আশ্বাস। "এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই। সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে সহানুভূতি বদ্ধ-জীবের জন্য—এ জগতে আর নাই।"[১৫] পূর্বে কখনও এই রকম হয়নি, অশ্রুতপূর্ব, অভূতপূর্ব। সুতরাং তাঁর জীবন, তাঁর সাধনা, সবই নতুন। স্বামীজী আরও বলেছেন: "রামকৃষ্ণ বর্তমান যুগের উপযোগী ধর্মশিক্ষা দিতে এসেছিলেন; তাঁর ধর্ম গঠনমূলক, এতে ধ্বংসাত্মক কিছু নেই। তাঁকে নূতন করে প্রকৃতির কাছে গিয়ে সত্য জানার চেষ্টা করতে হয়েছিল, ফলে তিনি বৈজ্ঞানিক ধর্ম লাভ করেছিলেন। যে ধর্ম কাউকে কিছু মেনে নিতে বলে না, নিজে পরখ করে নিতে বলে; বলে, "আমি সত্য দর্শন করেছি, তুমিও ইচ্ছা করলে করতে পার।"[১৬] তারপর বলছেন: "শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সবচেয়ে আধুনিক এবং সবচেয়ে পূর্ণবিকশিত চরিত্র—জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিতচিকীর্ষা, উদারতার জমাট।"[১৭]

এই প্রসঙ্গে বলি একটি ঘটনা। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ একবার কাশী সেবাশ্রমে গিয়েছিলেন। তা, উনি ভোরবেলা উঠে বসে আছেন। দুজন কি তিনজন ব্রহ্মচারী একটু আধটু সেবা করেন। ওঁরই কাছে তাদের দীক্ষা হয়েছে। তারা গিয়ে বলছে, "মহারাজ, একটু বলবেন"। "কি বলব"? "তা মহারাজ, যদি একটু ঠাকুরের কথা একটু বলেন।" খানিকক্ষণ বলার পরে, তারপর হঠাৎ বলছেন, "তালগাছ দেখেছ, তালগাছ?" কোথায় ঠাকুর আর কোথায় তালগাছ! তারমধ্যে যে অতিচালাক অর্থাৎ বোকা, সে ঝট করে বলে উঠল, "হ্যাঁ মহারাজ, দেখেছি।" এখানেই শেষ নয়। আরও এগিয়ে গিয়ে বলল: "মহারাজ, দেখেছি শুধু নয়, তালগাছে চড়তে পারি। তবে কি জানেন ভারী মুস্কিল, খোঁচা খোঁচা থাকে। কোনরকমে ডালপালা পর্যন্ত যাওয়া যায়। তার একটু পরে ভীষণ খোঁচা। আর যাওয়া যায় না। তারপরে তো চড়াই যায় না।" তখন বিজ্ঞান মহারাজ বলে উঠলেন: "ব্যাস, এই যা বুঝেছ, ঠিক জান কতদূর পৌঁছতে পারছ, যেখানে বসে আছে

১৩ Complete Works of Swami Vivekananda, vol. v (1979), p. 53

১৪ শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ (১৩৮০), গুরুভাব-পূর্বার্ধ, গ্রন্থ পরিচয়, পৃষ্ঠা (২)

১৫ Complete Works of Swami Vivekananda, vol. vi (1978), p. 231

১৬ ঐ vol. vii, P. 24 ১৭ ঐ, P. 483

স্বামীজী। তারপর যে খোঁচা খোঁচা, আর পারা যাচ্ছে না, তারপরে আছেন মা। তারপরে বাবা ঠাকুর বসে আছেন"। এ বিজ্ঞান মহারাজের ঠাকুরের সম্বন্ধে কথা।

স্বামীজী আবার বলেছেন: "পরমহংসদেব পুরাতন ঠাকুরদের উপরে যান এবং শিক্ষা সম্বন্ধে সকলের চেয়ে উদার ও নূতন এবং প্রগতিশীল।"[১৮] আগের সকলকে হার মানিয়ে দিয়েছেন। এই হারমানানোকে হারাতে কত যুগ লাগবে কে জানে? আমরা কেউ 'New Religion' (নতুন ধর্ম) বলতে চাই না। কিন্তু বিবেকানন্দ বলেছেন: "অন্যভাবে বলা যায়, পুরানোরা সব একঘেয়ে—এ নূতন অবতার বা শিক্ষকের এই শিক্ষা যে, এখন যোগ ভক্তি জ্ঞান ও কর্মের উৎকৃষ্ট ভাব এক করে নূতন সমাজ তৈরি করতে হবে···পুরানোরা বেশ ছিলেন বটে, কিন্তু এ যুগের এই ধর্ম······।"[১৯]

এই যুগের নতুন ধর্ম হচ্ছে "···একাধারে যোগ জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম—আচণ্ডালে, আবালবৃদ্ধবনিতায় জ্ঞান ভক্তি দান।···এখন আমাদের নূতন ভারত, নূতন ঠাকুর, নূতন ধর্ম এবং নূতন বেদ।"[২০]

শ্রীঠাকুর যে সমন্বয় ঘটিয়েছেন, সেই সমন্বয় দিয়ে নতুন সমাজ তৈরি হবে, মানব জাতি নতুন রূপ ধারণ করবে। তাতে যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম—এই সবগুলির সুন্দর সমন্বয় হবে। এবং তুমি ব্রাহ্মণ—তোমার অধিকার আছে, তুমি শূদ্র—তোমার নেই, তুমি স্ত্রী জাতি—তুমি দূরে সর—এ সব নয়। স্বামীজী বলেছেন—সকলের সমান অধিকার এই ধর্মে। স্বামীজী বলেছেন: নিষ্কাম কর্মের সঙ্গে জ্ঞান, ভক্তি ইত্যাদি সব সংযুক্ত হয়ে একটা যোগ হবে। যদি বলি, 'রামকৃষ্ণ যোগ' বোধহয় কোন অসুবিধা নেই। সমন্বয় যোগ—সব মিলিয়ে মানুষ। আমাদের ভিতর বুদ্ধি আছে, আমাদের ভিতর আবেগ আছে, অনুভূতি আছে, ভাব আছে, আমাদের কর্মক্ষমতা আছে, আমাদের বিচারশক্তি আছে। এই সবগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় ভগবানের দিকে, ভগবানলাভ করার দিকে, এবং সবগুলির সমন্বয়ে মানুষ যখন ঈশ্বরমুখী হয়ে যায়, ঈশ্বর লাভ করে তখনই একটা বিবেকানন্দ, একটা তুরীয়ানন্দ, একটা প্রেমানন্দ, একটা ব্রহ্মানন্দ পাওয়া যায়। এটা একঘেয়েমি নয়। বিভিন্ন শক্তিকে সংহত করে, মোড় ফিরিয়ে এক পূর্ণাঙ্গ সমন্বয় যোগ দেখালেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ।

প্রশ্ন থাকে, ঠাকুরকে আমরা কি বলব—ঠাকুর হিন্দু? কেমন করে বলব হিন্দু? তিনি তো ইসলাম ধর্ম সাধনা করেছিলেন। আমরা তো জানি, "যখন আমি ইসলাম ধর্মের উপাসনা করি, ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী হই, তখন মুসলমান হয়ে যাই।" এটাই তো যুক্তি বলে। তাহলে একবার তিনি হিন্দু ছিলেন, একবার তিনি মুসলমান হয়েছিলেন, আবার তিনি খ্রীষ্টান হয়েছিলেন। একবার তিনি বৈষ্ণব হয়েছিলেন। একবার তিনি শাক্ত হয়েছিলেন। একবার তিনি দ্বৈতী, একবার তিনি অদ্বৈতী। এ কি রকম কথা? এতো পরস্পরবিরোধী কথা। কিন্তু সত্যিই তিনি এই সব করেছেন। কাজেই বলব তিনি মুসলমান, তিনি খ্রীষ্টান, তিনি হিন্দু, তিনি বৈষ্ণব, তিনি শাক্ত। তিনি দ্বৈতী, তিনি অদ্বৈতী, তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতী, তিনি কি নন, তিনি সব। যা কিছু সব তিনি, আপত্তি করতে পারবেন না। তাঁর প্রামাণিক জীবন আপনারা অনুশীলন করুন, পড়ে দেখুন, তিনি কি করেছেন। সব তিনি

১৮ Complete Works of Swami Vivekananda, vol. vii (1979), p. 496

১৯ ঐ, P. 496　　২০ ঐ, P. 496

হয়েছেন। কাজেই "সর্ব ধর্ম সত্য"[২১]—তার তিনি নতুন প্রবক্তা। ইনি নতুন প্রবক্তাই হলেন, এবং তাঁর উপায়ও যেটি তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন, সে উপায়টিও অভিনব। এবং 'অভূতপূর্ব', 'অদৃষ্ট-পূর্ব' 'অশ্রুতপূর্ব'। আগে কোথাও শোনা যায়নি। ঐ 'অদৃষ্টপূর্ব' শব্দটি আমার নয়, এটি সারদা-নন্দজীর কথা। এবং সারদানন্দজী আর একটি কথাও বলেছেন: যেটা তাঁর ঠাকুর জানতেন। তিনি বলেছেন, "তাঁর এটি নিজস্ব সম্পত্তি, জগদম্বা দিয়েছেন এবং জগত ঠাকুরের কাছে প্রথম পায়"। দেখুন অদ্ভুত, অপূর্ব। কোন ধর্ম প্রবক্তাকে বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি শুধু তাঁর প্রচারিত ধর্ম নিয়ে থেকেছেন, আর অন্য ধর্মকে খণ্ডন করেননি এবং অন্য ধর্মের দিকে তাকাননি, ইত্যাদি। বাদরায়ণ পর্যন্ত কত খণ্ডন করেছেন, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, শঙ্করের কত মত খণ্ডিত হয়েছে। সমস্ত 'কথামৃত' অনুসন্ধান করুন, সমস্ত 'লীলাপ্রসঙ্গ' অনুসন্ধান করুন, ঠাকুর কোন মতকে খণ্ডন করেননি। কাউকে ক্ষুণ্ণ করেননি। আমাদের ঠাকুর সর্বগ্রাসী। তিনি ইসলাম, খ্রীষ্টান, হিন্দু যে যেখানে আছে, সাকার-আকার-নিরাকার, যা যেখানে আছে—সব গ্রাস করে বসে আছেন। এবং তারই ফলে তিনি সম্প্রদায়হীন একটি সম্প্রদায়ের প্রবক্তা হয়েছেন।

তারপর পাই ঠাকুরের আর একটা অপূর্ব কথা, যখন অন্য কোথাও তার আঁচড়ও খুঁজে পাই না, যখন বললেন: "ভাবমুখে থাক্।"[২২] এ বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছি। তখন শ্যামলাতালে ছিলুম। তা শ্যামলাতালে আমাদের ওখানে কাছে একটা পাহাড় আছে, তাকে বলা হয় 'পিক'। একদিন 'পিকে'র উপরে গেছি। গিয়ে দেখি, একদিকে দিগ্‌দিগন্তব্যাপী তুষারমালা নীল আকাশের কোলে, যতদূর দেখা যায় শুধু তুষারমালা। আর এদিকে নিচে টনকপুর, পিলিবিট লাইন। ঐসব লাইনে ম্যাচ বক্সের মতোন গাড়িগুলো, জঙ্গল, ছোট ছোট পাহাড় দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, এই বোধ হয়, ভাবমুখের অবস্থা। আমার ভাবমুখ মানে ঐ পাহাড়, আর ছোট ছোট রেলগাড়ি। ঠাকুরের অবস্থা তা নয়। ঠাকুরের সেই নির্বিকল্প সমাধির ব্যাপার জানি না তো। সেখানে একটা কোথায় যাচ্ছেন। কিন্তু আবার জীব-জগতের দিকেও থাকছেন। এইটা অদ্ভুত তত্ত্ব।

আচ্ছা, ঠাকুর কি সন্ন্যাসী না গৃহী? তোতাপুরী তো তাঁকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন। তিনি কি আমাদের মতো মুণ্ডন করেছিলেন, গেরুয়া পরে বেড়াতেন? তিনি কি করেছিলেন? সংসার সম্বন্ধে তাঁর দরজা বন্ধ করেছিলেন। মায়ের মনে কষ্ট হবে বলে কিছু কিছু আবার খোলা রেখেছিলেন। কি অদ্ভুত সামঞ্জস্য। এ কোথাও নেই। এ একটা নূতনত্ব। তিনি সন্ন্যাসী, তোতাপুরীর কাছে তাঁর সন্ন্যাস হয়েছে। কিন্তু তিনি শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে স্বীকার করেছেন। শ্রীশ্রীমা-র প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধা, আদর, তঁ'র স্নেহদৃষ্টি—তাতে তাঁর কোন ত্রুটি হয়নি। আবার তাঁকে তিনি ষোড়শীরূপে পূজা করেছেন, এ সবই নতুন।

ধর্মের যিনি শিখরে ছিলেন, যাঁর মুহুর্মুহু 'নির্বিকল্প সমাধি' হত, তিনি আবার কেমন সহজ করে সেই অতীন্দ্রিয় সত্যকে লাভ করার প্রথম সোপানের যে মন্ত্র, তাকে সংস্কৃত শব্দের দ্বারা কিছু বলে, একটা নাম সংযুক্ত করে কিছু বলছেন না। বলছেন: "দেখো, মন মুখ এক

২১ লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, সাধকভাব, একবিংশ অধ্যায়, পৃঃ ৩৭৮

২২ ঐ, গুরুভাব-পূর্বার্ধ, ১ম অধ্যায়, পৃঃ ১

করো।" নতুন প্রবক্তা। অতি নতুন কথা। এ কখনও কেউ শোনেনি।

খ্রীষ্টধর্মে দানের (Charity) কথা রয়েছে। বুদ্ধের অনুকম্পার কথা রয়েছে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে দয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা', এ তো অতি নতুন কথা। এই নতুন সত্য শুনে, মুগ্ধ হয়ে, আমাদের মতো হাজার হাজার নরনারী, এই মহান্ সত্যকে পাবার জন্য আত্মোৎসর্গ করতে উৎসাহী হয়েছেন। বনে যেতে হবে না। বেদান্ত লাভ করার জন্য, আত্ম-সাক্ষাৎকার করার জন্য হিমালয়ে যেতে হবে না। এইখানে বসেই আমি বনের বেদান্তকে পেতে পারব। কত বড় সত্য ঠাকুর কত সহজ ভাবে বলেছেন। মন্দিরে যদি দেবতার পুজো করতে পার, এই যে জ্যান্ত, জীবন্ত চেতন মানুষ—তার মধ্যে তুমি তোমার দেবতাকে দেখতে পাচ্ছ না? এক সময় তাঁর মুখে নরেন্দ্রনাথ 'জীবে দয়া নয়, জীবে শিবজ্ঞানে সেবা' শুনে বলেছিলেন: "আজ একটা মহান সত্য আমি শুনেছি, এবং ঠাকুর যদি দিন দেন, সময় দেন, তাহলে জগতের কাছে এই মহান সত্য আমি প্রচার করব।"

আর একটি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত ঠাকুরের জীবনে আমরা দেখতে পাই, যার কোন তুলনা কোথাও নেই। সেটা হচ্ছে ঠাকুরের ত্যাগ। সে ত্যাগ কি তীব্র! 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' শুধু করেছিলেন তাই নয়। তার পরীক্ষাও দিয়েছিলেন নরেন্দ্রের কাছে। আজকের জগতের মূল ব্যাধিকে উপলব্ধি করেই ঠাকুর অমনটি করলেন। 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' শুধু দেখালেন তাই নয়, নরেন্দ্রনাথ পরীক্ষা করলেন আমাদের প্রতিনিধি হয়ে, গদির তলায় টাকা রেখে। সে শয্যা স্পর্শে তাঁর যেন বৃশ্চিক-দংশনের কষ্ট হল। এই যে দেহ দিয়ে, ইন্দ্রিয় দিয়ে, সব ভাবে ধর্মের এই মহান সত্যকে এমন করে বাস্তবায়িত আর কে করেছেন? আমরা অন্য কোন ধর্মপ্রবক্তার জীবনে তা দেখিনি। 'যত মত তত পথ' সর্বভাবে, সর্ব যোগের সমন্বয়, সর্বভাবের সমন্বয়, সর্বমত ও সর্বপথের সমন্বয়, সর্ব ব্যক্তিতে একত্ব দেখা, শিবজ্ঞানে জীবসেবা, এবং যথার্থ সে মন অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করছে। ভাবমুখে থেকে অতীন্দ্রিয় রাজত্বে থাকলেও, সে মন এই জীবজগৎকে উপেক্ষা করছে না। তাকেও শ্রদ্ধায় দেখছে। স্বামীজীর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব। "বারংবার এই ভারতভূমি মূর্ছাপন্ন হইয়াছিলেন এবং বারংবার ভারতের ভগবান আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইঁহাকে পুনরুজ্জীবিতা করিয়াছেন। কিন্তু ঈষন্মাত্রযামা, গতপ্রায়া, বর্তমান গভীর বিষাদরজনীর ন্যায় কোনও অমানিশা ইতঃপূর্বে এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতন সমস্ত গোষ্পদের তুল্য।

"...সনাতন ধর্মের সমগ্র—ভাবসমষ্টি, বর্তমান পতনাবস্থাকালে, অধিকার হীনতায়, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়-আকারে কোথাও আংশিকভাবে পরিরক্ষিত এবং কোথাও বা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছিল।

"...মানবসন্তান যে সেই বিখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যা সমষ্টিকৃত করিয়া নিজ জীবনে ধারণা ও অভ্যাস করিতে এবং লুপ্ত বিদ্যারও পুনরাবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে, ইহারই নিদর্শনস্বরূপ পরম কারুণিক শ্রীভগবান বর্তমান যুগে সর্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্বভাবসমন্বিত, সর্ববিদ্যাসহায়, পূর্বোক্ত যুগাবতাররূপ প্রকাশ করিলেন।

"অতএব এই মহাযুগের প্রত্যূষে সর্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্ত ভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্মে নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা

পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চ নিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে।

"এই নব-যুগধর্ম সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান; এবং নব-যুগধর্ম-প্রবর্তক শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ পূর্বগ শ্রীযুগ-ধর্ম-প্রবর্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ!—হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর, ধারণ কর!

"হে মানব, মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না—গতরাত্রি পুনর্বার আসে না—বিগতোচ্ছ্বাস পূর্বরূপ আর প্রদর্শন করে না—জীবও দুইবার একদেহ ধারণ করে না। অতএব অতীতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে প্রত্যক্ষের পূজাতে আহ্বান করিতেছি—গতানুশোচনা হইতে বর্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি—লুপ্ত পন্থার পুনরুদ্ধারের বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে, সদ্যোনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান, বুঝিয়া লও!

"যে শক্তির উন্মেষমাত্রে, দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর, এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্বলতা ও দাসজাতসুলভ ঈর্ষা-দ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগ-চক্র-পরিবর্তনের সহায়তা কর"![২৩]

২৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম, গুরুভাব-পূর্বার্ধ (১৩৮০) হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃঃ, ৮—৯

ভ্রমসংশোধন

বিগত ১৩৯৩-র আশ্বিন সংখ্যায় ৫৩৬ পৃষ্ঠার ২৪, ২৭, ২৯ ও ৬২, ৫৪১ পৃষ্ঠার ১০ এবং ৫৪৩ পৃষ্ঠার ১৯ ও ২৬ পঙ্‌ক্তির ।৶৹, ।৶৹, ।৶৹, ১৵৹, ৸৵৹, ১০ আনা, ৩।/০ এবং /১০ পয়সার পরিবর্তে যথাক্রমে ।৵৹, ।৵৹, ।৵৹, ১৶৹, ৸৶৹, ।১০, ৩৷/০ এবং ৫১০ পড়তে হবে—সঃ

যুগধৃত শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীঅনিলেন্দু ভট্টাচার্য

সকল মানুষ একই সময়ে সকলের সঙ্গে
পরিচিত হতে পারে না।
সব মানুষ একটানা সকলকে
ভালোবাসা দিতেও অক্ষম।
একটি সূর্য কিন্তু অখণ্ড আকাশ জুড়ে
সমস্ত পৃথিবীকে অত্যুজ্জ্বল আলো দেয় ;
চন্দ্রিমা যেমন সমুদ্রকে আকর্ষণ করে
উত্তাল-উদ্দাম জোয়ারে-প্লাবনে।
অলোকসামান্য মহাপ্রতিম মানব
স্বার্থমগ্ন পৃথিবীর ঈর্ষা-পীড়িত বাতায়নে
তিল-তিল সংগ্রামে নিজেকে পুড়িয়ে
সূর্যের মতো নিরূপণহীন স্বরূপতায়
অগণিত মানুষকে কাছে টানে
অনুকম্পায়, শ্রদ্ধায় আর ভালবাসায়।
জন্মচক্রের আবর্তনে অধিকৃত
সুসংস্কৃতির অভিজ্ঞান হাতে
আমরা সেই পুণ্য স্রোতধারায় স্নাত হলে
বিনম্রতায় তাঁর কাছে নতজানু হই
একদিন—
কলুষ হৃদয়কে পরিমার্জিত করি প্রার্থনায়।
নিষ্কলঙ্ক চিরস্থির জীবন-শিখা থেকে
আলো জ্বালিয়ে
উদ্ভাসিত করি নিজেদের।

প্রহ্লাদ-বিশ্বাস দাও

শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী

আমাকে বিশ্বাস দাও হৃদিমূলে ছড়ানো শিকড়ে,
প্রহ্লাদ-বিশ্বাস দাও ; স্ব-নির্ভর সন্নিষ্ঠ প্রত্যয়ে—
শত্রুর কৃপাণ যদি মত্ত হয় রুধির আস্বাদে—
বিশ্বাসে উন্নত শির অবিশ্বাসে নত নাহি হয়॥
তুমি আছ এই স্থির ধ্রুবতারা বিশ্বাস আমার,
তুমি আছ তাই আমি অটল সুস্থির আছি আজও ;
তুমি আছ এ বিশ্বাসে মেরুদণ্ড হয় না শিথিল
তুমি আছ জলে স্থলে, ফুলে ফলে, তরুতৃণমূলে॥
তুমি আছ—আছ তুমি—এ ধ্বনিই রক্তের ধারায়,
তুমি সূর্য তারা চন্দ্র জল স্থলে ব্যাপ্ত দূর নভে—
তুমি আছ সর্বদাই—অনুভবে পাই যেন সাড়া—
এই প্রাণ উন্মূলনে এ বিশ্বাস নাহি পায় নাড়া॥
তোমাকে দেখিনি আজও চাক্ষুষ প্রমাণ দেওয়া দায়,
তোমার অস্তিত্ব তবু প্রাণ থেকে মুছে ফেলা যায় ?

সাম্যবাদ-প্রসঙ্গে স্বামীজী

শ্রীবীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

"সাম্যভাব লাভ করিলে গতি বা জীবন-সংগ্রাম থামিয়া যায়। সৃষ্টিব্যাপারেও এইরূপ। সমত্বে পৌছিলে অস্থির ভাবগুলি নিবৃত্ত হয় এবং তথাকথিত জীবনযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। জীবনের সঙ্গে মন্দ জড়িত থাকিবেই, কারণ সাম্যভাব ফিরিয়া পাইলে জগৎ লোপ পাইবে; যেহেতু সাম্য ও ধ্বংস একই বস্তু। দুঃখশূন্য সুখ বা অশুভশূন্য শুভ কোন কালেই সম্ভব নয়। কেন না সাম্যভাবের অভাবই জীবন। আমরা চাই মুক্তি;...।"[১]

ভারতে অধ্যাত্মবাদ প্রতি মানুষে, প্রতি জীবে, উদ্ভিদে এমনকি জড়বস্তুতে পর্যন্ত—সর্বত্রই ব্রহ্মের অস্তিত্ব ঘোষণা করে। এ-হিসাবে ভারতীয় দর্শন যে মহাসাম্যবাদের সন্ধান দিয়েছে, পাশ্চাত্য দর্শনের সাম্যবাদ তার ধারেকাছেও যেতে পারেনি। কিন্তু পাশ্চাত্য-সাম্যবাদ যখন বলে মানুষে মানুষে সমান তখন তারা দেহগতভাবে সমান, এই কথাই বলে। দেহের অতীত কোন কিছুর সত্তা পাশ্চাত্য বস্তুবাদ বিশ্বাস করে না। সুতরাং তাদের মতে সাম্যবাদ বলতে দেহগত বা বস্তুগত সাম্য ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না। এখানেই ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শনের সাম্যবাদে প্রভেদ। ভারতীয় দর্শনের মূল কথা, আত্মিক, অপরপক্ষে পাশ্চাত্যের মূল কথা, বস্তু-তান্ত্রিক। জীবে জীবে সেই একই আত্মা বিরাজমান যিনি পরমাত্মার অংশস্বরূপ, যার সন্ধান পাওয়াতে মানবজীবনের চরম সার্থকতা—অনাদি কাল হতে মানব-মনের চিরন্তন জিজ্ঞাসা হয়ে আছেন তিনি। যুগযুগান্তরের এই জিজ্ঞাসায় মানুষের কত কোলাহল, দ্বন্দ্ব, আনন্দ, আশা, নিরাশা, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও অসাম্য। এই কোলাহলের মাঝে কিছু বোঝার সময় যেন তার নাই, পথের কোলাহলে গন্তব্যের কথা যেন সবাই ভুলে আছে। গন্তব্যস্থল তিনি, আর তাঁর পরিচয় পেলেই কেবল আমরা সাম্য বা সমত্বের পরিচয় পাই। তাঁর পরিচয় না পেলে সবই অসাম্য। বস্তুতে বস্তুতে ভেদ, দেহে দেহে ভেদ, মানুষে মানুষে ভেদ থেকেই যায়।

স্বামীজীর ভাষায়—"বহুত্বের মধ্যে একত্বই সৃষ্টির নিয়ম। আমরা সকলেই মানুষ অথচ আমরা সকলেই পরস্পর পৃথক। মনুষ্যজাতির অংশ হিসাবে আমি ও তুমি এক,...কিন্তু প্রাণী হিসাবে স্ত্রী, পুরুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদ্ সকলেই সমান; এবং সত্তা হিসাবে তুমি বিরাট বিশ্বের সহিত এক। সেই বিরাট সত্তাই ভগবান্—তিনিই এই বৈচিত্র্যময় জগৎপ্রপঞ্চের চরম একত্ব। তাঁহাতে আমরা সকলেই এক হইলেও ব্যক্তপ্রপঞ্চের মধ্যে এই ভেদগুলি অবশ্য চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে।"[২]

"...এমন সময় কখন হইবে না, যখন সমস্ত লোকের মুখ এক রকম হইবে।...সমস্ত জগতে কখনও এক প্রকার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রচলিত হইতে পারে না।...যদি কখনও হয়, তবে সৃষ্টি লোপ পাইবে। কারণ বৈচিত্র্যই জীবনের মূলভিত্তি। আকৃতি-বিশিষ্ট জীবরূপে আমরা সৃষ্ট হইলাম কিরূপে? বৈচিত্র্য হইতে। সম্পূর্ণ সাম্যভাব হইলে আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।"[৩]

১ স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ৩য় সংস্করণ, ২।৪৩০

২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ ৩।১৫৬

৩ ঐ, ৩।১৫৭

মার্ক্সীয় দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের মধ্যে যে সুস্পষ্ট প্রভেদ রয়েছে, স্বামীজীর ব্যাখ্যায় তাহা অতি প্রাঞ্জল। মার্ক্সীয় দর্শন নাস্তিক্যবাদী আত্মা ও ঈশ্বর-বিশ্বাসহীন। ভারতীয় দর্শনে বস্তু-জগতের উর্ধ্বে আত্মা ও ঈশ্বরের স্থান। মার্ক্সীয় দর্শন বস্তুবাদ (Materialism)-সর্বস্ব। আগেই বলা হয়েছে, বস্তুবাদীরা যখন মানুষে মানুষে সমান বলে, তখন দেহগতভাবে সমান এ-কথাই বুঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেহগতভাবে মানুষ সমান নয়। দেহের উর্ধ্বে যে সত্তা রয়েছে তাহাই একমাত্র সমান। আত্মা হিসাবে আমরা সকলেই এক এবং সেই পরমাত্মার অংশ, সুতরাং অভিন্ন। কিন্তু আত্মার বিকাশের তারতম্যে দেহগতভাবে আমরা পরস্পর থেকে পৃথক। এক কথায় আমাদের বস্তুগত সত্তা এক নয়, একজন হতে আর একজন পৃথক। এখানে সাম্য নেই। কিন্তু বাস্তবসত্তার অতীত আত্মিক সত্তায় সকলেই এক, এখানে একজন হতে আর একজন পৃথক নয়। বাস্তব সত্তার অতীত আধ্যাত্মিক সত্তায় যারা বিশ্বাসী নয় তাদের পক্ষে সাম্যবাদের কথা বলার অর্থ বাস্তব সত্তায় সাম্যবাদের কথা বলা। মানুষ বাস্তবসত্তার উর্ধ্বে উঠে সাম্যের দর্শন পায়। যেমন বহু উর্ধ্বে উঠলে গাছপালা ঝোপ-ঝাড় মাঠ-ঘাট সবই একাকার দেখা যায়, তেমনি সাম্যের দর্শন বাস্তবসত্তাতীত পরম সত্তার দর্শন। পাশ্চাত্যের ঘোর বাস্তববাদের মধ্যে যে-সব মনীষী সাম্যবাদ প্রচার করেছেন তাঁরা সেদেশে যে দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছিলেন তাতে জীবের প্রতি করুণা-মমতায় ক্ষণকালের জন্যও অন্তত: তাঁদের দিব্যদর্শন হয়েছিল। সাম্যসত্তার দিব্য-দর্শন লাভ করে তাঁরা ধন্য হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের দেশ-কাল অনুযায়ী ঐ সাম্যসত্তা ও তৎ-সম্পর্কীয় চিন্তাধারা নিজস্বরূপ অর্থাৎ স্বদেশের ধারানুযায়ী স্বরূপ গ্রহণ করেছিল। এখানেই মহাভ্রান্তি, আর পাশ্চাত্য সাম্যবাদের যতকিছু অসঙ্গতি তার মূলকথাই এই বাস্তব জড়সত্তায় সাম্যভাব আরোপ করা। জড়সত্তার মূল কথাই হল বিভিন্নতা। এখানে সাম্যের অভাবই প্রকৃতিতে বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য এনে দিয়েছে। বস্তুর বিভিন্নতা বস্তুর সৃষ্টির বৈচিত্র্য ঘোষণা করে এবং এই বৈচিত্র্যের অর্থই হল সাম্যের অভাব।

স্বামীজী বলছেন: "যখন এই জগৎ ধ্বংস হইবে, তখনই কেবল সাম্যরূপ ঐক্য আসিতে পারে; অন্যথা এরূপ হওয়া অসম্ভব। কেবল তাহাই নয়—এরূপ হওয়া বিপজ্জনক। আমরা সকলেই এক প্রকার চিন্তা করিব, এরূপ ইচ্ছা করা উচিত নয়। তাহা হইলে চিন্তা করিবার কিছুই থাকিবে না। তখন যাদুঘরে অবস্থিত মিশরীয় মামিগুলির (mummies) মতো আমরা সকলেই এক রকমের হইয়া যাইব, এবং পরস্পরের দিকে নীরবে চাহিয়া থাকিব—আমাদের মনে ভাবিবার মতো কথাই উঠিবে না। এই পার্থক্য, এই বৈষম্য,আমাদের পরস্পরের মধ্যে এই সাম্যের অভাবই আমাদের উন্নতির প্রকৃত উৎস, উহাই আমাদের যাবতীয় চিন্তার প্রসূতি। চিরকাল এইরূপই চলিবে।"[৪]

সুতরাং জাগতিক প্রয়োজনে সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কারণে এই অসাম্য থাকবে। আর থাকার প্রয়োজনও আছে। এই কারণে, অসাম্যই আমাদের মধ্যে গতির সৃষ্টি করেছে। বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানের নিয়ম হল ভোল্টেজ বা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সই বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি করে—অন্যথায় কোনবিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে পারে না।

স্বামীজীর মতে "সৃষ্টি মানে একটা কিছু নির্মাণ বা তৈরি করা নয়, সৃষ্টি মানে—যে সাম্য-

৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ৩।১৫৭

ভাব নষ্ট হয়ে গেছে, সেইটাকে আবার ফিরে পাবার চেষ্টা, যেমন একটা শোলার ছিপি (Cork) যদি টুকরো টুকরো ক'রে জলের নীচে ফেলে দেওয়া যায়, তা হ'লে সেগুলো যেমন আলাদা আলাদা বা একসঙ্গে কতকগুলো মিলে জলের উপরে ভেসে ওঠবার চেষ্টা করে, সেই রকম। যেখানে জীবন, যেখানে জগৎ, সেখানে কিছু না কিছু মন্দ, কিছু না কিছু অশুভ থাকবেই থাকবে। একটুখানি অশুভ থেকেই জগতের সৃষ্টি হয়েছে। জগতে যে কিছু কিছু মন্দ রয়েছে, এ খুব ভাল; কারণ সাম্যভাব এলে এই জগৎই নষ্ট হয়ে যাবে। সাম্য ও বিনাশ যে এক কথা। যতদিন এই জগৎ চলছে, ততদিন সঙ্গে সঙ্গে ভাল-মন্দও চলবে; কিন্তু যখন আমরা জগৎকে অতিক্রম করি, তখন ভাল-মন্দ দুয়েরই পারে চলে যাই—পরমানন্দ লাভ করি। জগতে দুঃখবিরহিত সুখ, অশুভবিরহিত শুভ—কখন পাবার সম্ভাবনা নেই; কারণ জীবনের অর্থই হচ্ছে বিনষ্ট সাম্যভাব।"[৫]

অথচ আজ পাশ্চাত্যে সাম্যবাদের প্রবক্তারা নানা সমস্যার মীমাংসায় সাম্যনীতির প্রয়োগ করে বৃথা সমাধান-প্রচেষ্টা করছেন। স্বামীজী তাঁর জীবদ্দশায়ই এই প্রচেষ্টা লক্ষ্য করেছিলেন। বলেছিলেন :

"সেই কাপড়চোপড়, খাওয়া-দাওয়া, সেই সব এক চঙ, দুনিয়াশুদ্ধ সেই এক কিম্ভূত কালো জামা, সেই এক বিকট টুপী! তার উপর--উপরে মেঘ আর নীচে পিল্‌পিল্ করছে এই কালো টুপী, কালো-জামার দল; দম যেন আটকে দেয়। ইউরোপ-সুদ্ধ সেই এক পোশাক, সেই এক চাল-চলন হয়ে আসছে। প্রকৃতির নিয়ম—ঐ সবই মৃত্যুর চিহ্ন! শত শত বৎসর কসরত করিয়ে আমাদের আর্যেরা আমাদের এমনি কাওয়াজ করিয়ে দেছেন যে আমরা এক ঢঙে দাঁত মাজি, মুখ ধুই, খাওয়া খাই ইত্যাদি ইত্যাদি; ফলে—আমরা ক্রমে ক্রমে যন্ত্রগুলি হ'য়ে গেছি; প্রাণ বেরিয়ে গেছে, খালি যন্ত্রগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছি! যন্ত্রে 'না' বলে না, 'হ্যাঁ' বলে না, নিজের মাথা ঘামায় না, 'যেনাস্য পিতরো যাতাঃ'—(বাপ দাদা যে দিক দিয়ে গেছে) সে দিকে চলে যায়, তার পর পচে মরে যায়। এদেরও তাই হবে! 'কালস্য কুটিলা গতিঃ' —সব এক পোশাক, এক খাওয়া, এক ধাঁচে কথা কওয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি,—হ'তে হ'তে ক্রমে সব যন্ত্র, ক্রমে সব 'যেনাস্য পিতরো যাতাঃ' হবে, তার পর পচে মরা!!"[৬]

বর্তমান যুগের সাম্যভাব (equality), মার্ক্সীয় দর্শনে মানুষের সাম্য, ভারতীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞান অনুমোদিত নয়। ভারতীয় দর্শন বলে শুধু মানুষ কেন, জীবজন্তু পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ স্থাবর জঙ্গম সর্বভূতে যে ব্রহ্ম রয়েছেন সেই ব্রহ্ম বস্তুতঃ এক ও অভিন্ন, কিন্তু ভিন্নরূপে তার বিকাশ। বৈচিত্র্যের স্ফুরণের জন্য এই বিকাশ সর্বত্র ভিন্ন। পাশ্চাত্যের সাম্যের আদর্শ বস্তুজগতে আমাদের এক ভ্রান্ত কল্পনার মোহজাল সৃষ্টি করে অনিবার্য সংঘাতের দিকে পৃথিবীকে এগিয়ে দিতেছে। কেননা বস্তুবাদী পাশ্চাত্য সাম্যবাদ শুধু মানুষের বস্তুগত অভাব দূর করার কথাই চিন্তা করে। ভোগ্যপণ্য উৎপাদন, বণ্টন, সাহায্যদান ইত্যাদির কথা বলা হয়; কিন্তু আবার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ফলে অহং বুদ্ধিও উগ্র থাকে। ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য। এই অবস্থার কথা বিশ্লেষণ করেই স্বামীজী বলেছেন: "কেবল শারীরিক সাহায্য দ্বারা জগতের দুঃখ দূর করা যায় না। যতদিন না মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইতেছে, ততদিন এই শারীরিক অভাবগুলি সর্বদাই আসিবে এবং

৫ স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ৪।২১২

৬ ঐ, ৬।১০০

দুঃখ অনুভূত হইবেই হইবে। যতই শারীরিক সাহায্য কর না কেন, কোনমতেই দুঃখ একেবারে দূর হইবে না।"[৭] "যতদিন না মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইতেছে, ততদিন এই অভাবগুলি সর্বদাই আসিবে"—এ-কথা দ্বারা স্বামীজী বোঝাতে চেয়েছেন যে, আত্মিক সত্তার দিক দিয়ে প্রতিটি মানুষই সমান—এই সত্য উপলব্ধি না করতে পারলে মানুষের দুঃখ-কষ্ট অনিবার্য।

তবু আমরা দেখতে পাই স্বামীজী মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত, করেছিলেন। একজন বেদান্তবাদী হিসাবে তিনি সর্বভূতে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। এই আত্মার প্রকাশ হিসাবে মানুষের সমত্বে (equality) তিনি বিশ্বাসী। তাই ব্যবহারিক জীবনে বেদান্তকে কার্যকরী করতে তিনি আমাদের উদাত্ত আহ্বান করেছেন। ব্যবহারিক জীবনে বেদান্তকে কার্যকরী করার অর্থ হল—"সকলের মধ্যেই ঈশ্বর বা আত্মা বিরাজমান"—এই বোধে মানুষের প্রতি ব্যবহার করা, সমাজের প্রতি কর্তব্য করা। ব্যক্তি ও সমাজজীবন এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিচালিত হলে সমাজে বৈষম্য থাকলেও বিশেষ অধিকারসমূহ সমাজ থেকে বিলুপ্ত হবে বলে স্বামীজী মত ব্যক্ত করেছেন। এ-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন: "সমাজের প্রকৃতিই এই—বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া, তবে চলিয়া যাইবে কি ? বিশেষ বিশেষ অধিকারগুলি আর থাকিবে না।...সামাজিক জীবনে আমি কোন বিশেষ কর্তব্য সাধন করিতে পারি, তুমি অন্য কাজ করিতে পারো। তুমি না হয় একটা দেশ শাসন করিতে পারো, আমি একজোড়া জুতা সারিতে পারি। কিন্তু তা বলিয়া তুমি আমা অপেক্ষা বড় হইতে পার না।...তুমি খুন করিলে প্রশংসা পাইবে, আর আমি একটা আম চুরি করিলে আমাকে ফাঁসি যাইতে হইবে—এরূপ হইতে পারে না। এই অধিকার-তারতম্য উঠিয়া যাইবে।...জীবনসমস্যা-সমাধানের ইহাই একমাত্র স্বাভাবিক উপায়।...যেখানেই যাও, জাতিবিভাগ থাকিবেই। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, অধিকার-তারতম্যগুলিও থাকিবে। এগুলিকে প্রচণ্ড আঘাত করিতে হইবে।" তিনি আরও বলেছেন: "যদি জেলেকে বেদান্ত শিখাও, সে বলিবে—তুমি যেমন আমিও তেমন, তুমি না হয় দার্শনিক, আমি না হয় মৎস্যজীবী; কিন্তু তোমার ভিতর যে-ঈশ্বর আছেন, আমার ভিতরও সেই ঈশ্বর আছেন। আর ইহাই আমরা চাই—কাহারও কোন বিশেষ অধিকার নাই, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি করিবার সমান সুবিধা থাকিবে।"[৮]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ করতে পারলেই ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ বিশেষ অধিকার লুপ্ত হয়ে উৎপাদিত ভোগ্যপণ্যের সমবণ্টন, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সাম্যবাদী নীতিগুলি সামাজিক ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়ে মানবজাতিকে সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য স্থাপনে সাহায্য করবে।

৭ স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ১।৭৪

৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ৩য় সংস্করণ, ৫।১৩৭-৩৮

গিরিশ-সাহিত্যের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ

অধ্যক্ষ শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

আমাদের বিষয় "গিরিশ-সাহিত্যের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ"। আমরা এখানে গিরিশচন্দ্রের নাট্য-সাহিত্যের মধ্যেই আলোচনা সীমিত রাখব। বিভিন্ন পত্রিকায়, যথা উদ্বোধন, তত্ত্বমঞ্জরী, জন্মভূমি, সৌরভ প্রভৃতিতে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধেও গিরিশচন্দ্র ঠাকুরের কথা বলেছেন, কিন্তু আমরা তার মধ্যে যাব না। গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকের কাহিনী, সংলাপ, ঘটনা, চরিত্র ও বক্তব্যের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে দর্শকের সামনে কিভাবে প্রতিভাত করেছেন সেটাই দেখানোর চেষ্টা করব। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী, তাঁর কথোপকথন ও শিক্ষাদানের বিশেষ ভঙ্গি, তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গিরিশচন্দ্রের কয়েকখানি নাটকে বিশেষ ভাবে পরিস্ফুটিত। মনে হয় নাটকের ঐ বিশেষ বিশেষ অংশ ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ করেই লেখা।

"গিরিশ-সাহিত্যের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ" আলোচনা করতে গেলে পূর্বপট হিসেবে দেখা দরকার এই গিরিশকে শ্রীরামকৃষ্ণ কী ভাবে দেখেছেন, অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকে গিরিশ-চন্দ্র। কারণ, যে গিরিশচন্দ্রকে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখে-ছেন ও দেখিয়েছেন সেই গিরিশচন্দ্রই শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়েছেন তাঁর নাট্য-সাহিত্যে। প্রথমেই স্মরণ করুন স্বামী সারদানন্দ মহারাজের 'লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে উল্লেখ করা সেই কাহিনী, যেখানে ঠাকুর বলেছেন: "তখন দক্ষিণেশ্বরে কালিমন্দিরে মার জন্যে খুব কাঁদছি। দেখলুম একটি উলঙ্গ বালক, মাথায় ঝুঁটি বাঁধা, ডানহাতে সুরাপাত্র আর বামহাতে সুধাভাণ্ড নিয়ে মা'র ঘরে প্রবেশ করছে।" জিজ্ঞাসা করতে সে উত্তর দিল "আমি ভৈরব, আপনার কাজ করতে এসেছি।…নাচতে নাচতে সে আমার কোলে মিলিয়ে গেল।" —এই গিরিশ, ভক্ত-ভৈরব গিরিশ। ভৈরব গিরিশ নটরূপে ডান হাতের সুরাপাত্র নিঃশেষ করে তাণ্ডব-নৃত্য করেছে। ভক্ত গিরিশ নাট্য-কাররূপে বামহাতের সুধাভাণ্ড থেকে বিতরণ করেছে ভক্তিরসসুধা, বিশ্বাসের অমৃত, ভগবৎ প্রেমের মধুমহিমা। আমরা গিরিশচন্দ্রের কয়েক-খানি নাটক থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করব পরমহংসদেব প্রচারিত এই ভক্তি-বিশ্বাস-ভগবৎ প্রেমের বাণী কিভাবে সেখানে বিবৃত হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটবর্তী হওয়ার আগে গিরিশচন্দ্র 'রাবণবধ' (১৮৮১) থেকে 'চৈতন্যলীলা' (১৮৮৪) পর্যন্ত চৌদ্দখানি পরপর ধর্মাশ্রয়ী নাটক লিখেছিলেন। ঠাকুরের আশীর্বাদ পাওয়ার পর তাঁর জীবিতকালে লিখলেন প্রহ্লাদ চরিত্র (১৮৮৪), নিমাই-সন্ন্যাস (১৮৮৫), প্রভাসযজ্ঞ (১৮৮৫), বুদ্ধদেব চরিত (১৮৮৫) ও বিল্বমঙ্গল (১৮৮৬)।

ঠাকুরের দেহাবসানের পর লিখেছেন রূপ সনাতন (১৮৮৭), পূর্ণচন্দ্র (১৮৮৮), নসীরাম (১৮৮৮), জনা (১৮৯৩), করমেতি বাঈ (১৮৯৫), কালাপাহাড় (১৮৯৬), মায়াবসান (১৮৯৭), ভ্রান্তি (১৯০২), শঙ্করাচার্য (১৯১০) ও তপোবল (১৯১১)। এ-ছাড়া অন্যান্য নাটকও লিখেছেন। যে কখানির এখানে নাম করা গেল তার প্রত্যেকটি কোনও না কোনও ভাবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবালোকিত। সীমিত পরিসংখ্যায় সবগুলি থেকে উদাহরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই কয়েকটির আলোচনা করব।

ঐ যে সুরা আর সুধাপাত্র হাতে উলঙ্গ

বালকটি যে "আমি তোমার কাজ করতে এসেছি" বলতে বলতে ঠাকুরের কোলে মিলিয়ে গেল— এতো ঠাকুরের কাছে গিরিশের সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের চিত্র,—আর যে-কাজ সেই বালক ভবিষ্যতে করবে তা কোন মঠে-মন্দিরে বা নির্জন সাধন-পীঠে নয়, করবে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের পাদপীঠের আলোকে, বহুজনের হিতার্থে, তাদের শিক্ষার জন্য। এই পরিকল্পনা ঠাকুরের ছিল বলেই গিরিশ যখন ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন: "আমি আপনাকে দর্শন করিয়াছি, আবার কি আমায় যা করিতে হয় তাহা করিতে হইবে?" ঠাকুর বলেছিলেন "তা করো না।" দক্ষিণেশ্বরে সপ্তম দর্শনের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রকে এই কথা বলেন। অর্থাৎ, থিয়েটার যেন সে না ছাড়ে, থিয়েটারে লোকশিক্ষা হয়। নরেনের জন্য সমগ্র পৃথিবীর বিরাট মঞ্চ, আর গিরিশের জন্য তদানীন্তন ভারতের রাজধানী কলকাতার রঙ্গমঞ্চ, যা গিরিশেরই সৃষ্টি। এই সপ্তম দর্শনের পরই গিরিশের বিক্ষুব্ধ, সন্দিগ্ধ, দোলায়িত চিত্ত স্থির হয়। গিরিশ লিখেছেন: "তদবধি গুরু কি পদার্থ তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইলাম। গুরুই সর্বস্ব আমার বোধ হইল···গুরুর কৃপায় একটি অমূল্য রত্ন পাইয়াছি। আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে গুরুর কৃপা আমার কোনো গুণে নহে··· অহেতুক কৃপা। জয় রামকৃষ্ণ।" 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ' শীর্ষক প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র নিজেকে নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি শিষ্যদের সঙ্গে তুলনা করে লিখেছেন যে ঐ সমস্ত "পবিত্র বালকবৃন্দ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শরণাপন্ন হইয়াছে, ইহাতে স্নেহ জন্মিবার কথা। কিন্তু আমার প্রতি স্নেহ, অহেতুকী দয়া-সিন্ধুর পরিচয়। ভগবানের একটি নাম পতিতপাবন; মানবদেহে সে-নামের সার্থকতা আমি দেখিয়াছি।"

২

এবার দেখা যাক, গিরিশ-সাহিত্যের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ কি ভাবে উদ্ভাসিত হয়েছেন 'শঙ্করাচার্য' নাটকে। স্বামী ব্রহ্মানন্দের পরামর্শে ও স্বামী সারদানন্দের উৎসাহে কাশীতে লেখা এই নাটক গিরিশ উৎসর্গ করেছেন তাঁর বন্ধু কালীপদ ঘোষকে। কালীপদ তখন স্বর্গত। গিরিশ উৎসর্গ পত্রে লিখেছেন: "ভাই, আমরা উভয়ে একত্রে বহুবার শ্রীদক্ষিণেশ্বরে মূর্তিমান বেদান্ত দর্শন করেছি। তুমি এখন আনন্দধামে, কিন্তু আমার আক্ষেপ—তুমি নরদেহে আমার 'শঙ্করাচার্য' দেখলে না।" শঙ্করাচার্যের মধ্যে ঠাকুর কীভাবে এসেছেন? মূর্তিমান বেদান্ত। শিষ্য সনন্দনকে শঙ্কর বলছেন:

"বৎস, অস্তি, ভাতি, প্রিয়—
এই মহা বাক্য ত্রয়ে—
সমুদয় বেদার্থ স্থাপিত।
বিদ্যমান পরব্রহ্ম, নিত্য সপ্রকাশ,
প্রিয় তিনি,—এই সার জ্ঞান।
এই মহাসত্যের আভাস
যে মুহূর্তে পাইবে হৃদয়ে,
অরুণ-উদয়ে যথা হয় তমোনাশ,
সেই ক্ষণে হবে তব সন্দেহ দূরিত।
··· ··· ··· ···
এক জ্ঞানে বহু জ্ঞান ক্ষয়।"

সনন্দন প্রশ্ন করে: "এক জ্ঞান জন্মিবে কেমনে···?" শঙ্করাচার্য বলছেন:

"ধীরভাবে কর বৎস, মন সন্নিবেশ,
আমা হ'তে প্রিয় আর কি আছে আমার?
পুত্র পরিবার—প্রিয় বস্তু যা আছে সংসারে,
প্রিয় তাহা আমার বলিয়ে।
ব্রহ্মবস্তু প্রিয় মম আমার সমান,
জন্মিলে এ জ্ঞান—
আমি তিনি ভেদ নাহি রহে,

প্রিয় জ্ঞানে এক জ্ঞান জন্মে ব্রহ্ম সনে।
এই প্রিয় জ্ঞানে ক্ষুদ্র অহম্ বিনাশ,
ক্ষুদ্রত্ব ত্যজিয়া হয় অসীম অহম্।
ব্রহ্মজ্ঞানে বিলুপ্ত অহম্
উদয় সোঽহং ভাব অহম্ বর্জনে।"
(শঙ্করাচার্য ৩।৪)

এ তো শ্রীরামকৃষ্ণেরই কথা, শুধু ভাষা দার্শনিকের। ঠাকুর সোজা কথায় বোঝাতেন। ইতিহাস-বিশ্রুত অবতারপুরুষের মাধ্যমে গিরিশচন্দ্র স্বচক্ষে দর্শন করা 'মূর্তিমান বেদান্ত'কে রঙ্গালয়ের দর্শকদের সামনে আলোকিত করলেন। এবার দেখুন মহাপুরুষের 'অহেতুকী কৃপা'। তর্কে পরাজিত মহাপণ্ডিত মণ্ডন মিশ্র বলছে:

"মহাশয়, জেনেছি নিশ্চয়,
সামান্য মানব তুমি নও ;
মান হত, দম্ভ বিচূর্ণিত
প্রভাবে তোমার যতীশ্বর।"

তার্কিক নরেন্দ্র, অবিশ্বাসী গিরিশ এবং আরও অনেককেই বলতে হয়েছে: "মনে হত, দম্ভ বিচূর্ণিত/প্রভাবে তোমার যতীশ্বর।" শিষ্যত্ব গ্রহণের পর মণ্ডন মিশ্র বলছে:

"গুরু—কল্পতরু।
অহেতুকী কৃপার আধার!
এত কৃপা সন্তানে তোমার ?
মহাকষ্ট করি অঙ্গীকার,
সহি তিরস্কার,
এসেছ মঙ্গলদাতা মঙ্গলপ্রদানে!"

অবিশ্বাসী ২য় পণ্ডিত মণ্ডন মিশ্রকে সাবধান করছে:

"মিশ্র, তুমি কুহকীর কুহকে কেন মুগ্ধ হচ্চ ? অনাচারী, ভণ্ড সন্ন্যাসী ভোজ-বিদ্যা-বলে তোমায় পরাজয় করেছে। এখনি প্রত্যক্ষ দেখ্‌বে—ও সামান্য ব্যক্তি।"

এই ধরনের উক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধেও একদা করা হত। বলা হত 'ছেলেধরা সন্ন্যাসী।' উত্তরে মণ্ডন মিশ্র বলছে:

"হ্যাঁ, কুহকী বটেন। যাঁর কুহকে ভুবন মুগ্ধ—সেই কুহকী। আর সামান্য কি বল্‌ছেন, সামান্য হতেও সামান্য ; নচেৎ আমার ন্যায় হীনের দ্বারে উনি প্রার্থী হন ?"

এখন স্মরণ করুন গিরিশের প্রতি ঠাকুরের 'অহেতুকী কৃপা'। দুটি ঘটনার উল্লেখ করছি: এক, যে-গিরিশ তাঁকে দেড়খানা লুচি খাইয়ে যথেচ্ছ গালাগাল দিয়ে থিয়েটার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে বলে ভক্তদের জানালেন, সেই ভক্তদেরই নিষেধ অগ্রাহ্য করে, নিজে গিরিশের দরজায় গিয়ে পরে ডাক দিলেন: 'গিরিশ, আমি এসেছি'। স্তম্ভিত, বিস্মিত গিরিশ ঠাকুরের পায়ে লুটিয়ে পড়ে অশ্রুজলে চরণ সিক্ত করে দিলে। আর দুই, দক্ষিণেশ্বরে পায়েস হয়েছে। গিরিশ পায়েস ভালবাসে। ঠাকুর তার জন্যে এক বাটি পায়েস আগেই সরিয়ে রেখেছেন। সেই পায়েস উনি গিরিশকে নিজে হাতে খাইয়ে দিলেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ' শীর্ষক প্রবন্ধে গিরিশ লিখেছেন:

"হায় কত অস্পৃশ্য ওষ্ঠে আমার এই ওষ্ঠ স্পৃষ্ট হইয়াছে, আর তিনি তাঁহার নির্মল হস্ত এই অপবিত্র ওষ্ঠে ঠেকাইয়া পায়েস দিতে লাগিলেন। মা যেমন চেঁচে পুঁচে খাওয়াইয়াছেন, সেইরূপে খাওয়াইতে লাগিলেন। আমি যে বুড়ো ধাড়ি তাহা আমার মনে হইল না। নগ্ন বালকের ন্যায় হইলাম। মা খাওয়াইয়া দিতেছেন মনে হইল।"

শ্রীরামকৃষ্ণের অহেতুক কৃপালাভে ভাগ্যবান গিরিশচন্দ্র—এটাই তিনি আলোকিত করলেন 'শঙ্করাচার্য' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের অষ্টম গর্ভাঙ্কে,

গুরু-শিষ্যের সংলাপের মাধ্যমে। আর আপাত-সামান্যের মধ্যে ঠাকুরের অসামান্য রূপটিও সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধরলেন, ঐ কটি কথার মধ্য দিয়ে: "কুহকী বটেন, যাঁর কুহকে ভুবন মুগ্ধ, সেই কুহকী।"

'শঙ্করাচার্য' নাটকে গিরিশের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্ক সোজাসুজি প্রতিফলিত হয়েছে পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে, যেখানে শান্তিরাম শঙ্করাচার্যকে বলছে:

> "প্রভু, আজ আপনাকে ছাড়্‌বো না, আমার সকলের সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করে,......আজ একলা পেয়েছি, ছাড়্‌বো না। আমার বড় গোল বেধে গিয়েছে, আমি মেধা হীন—আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি না।"

শঙ্কর বল্লেন: "বৎস, সাধন প্রয়োজন। সাধন করো—সমস্ত বুঝ্‌বে।" শান্তির উত্তর:

> "যা কর্‌তে হয়—সে আপনি করুন॥ সাধন করে তো মন বশ কর্‌তে বলেন? সে আমার কর্ম নয়। সে সব পদ্মপাদ প্রভৃতিকে বলুন। আমি চোখ বুজে মনঃস্থির কর্‌তে নির্জনে বসলেই, মন বেটা বরং সোজায় ছিল ভাল, চোখ বুজ্‌লেই অমনি সৃষ্টি-সংসার ঘুর্‌তে চল্‌লো। এ মন নিয়ে—কি সাধনা কর্‌বো বলুন? আমি একটা সোজা-সুজি বুঝেচি, আমার মিষ্টিও লাগে,—'ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্‌।/মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা'॥"

এই মন্ত্র আউড়ে আমি নমস্কার করলাম, যা করবার করবেন।"

শঙ্করাচার্য বল্লেন: "বৎস, সার তত্ত্ব তোমার উপলব্ধি হয়েছে,...ব্রহ্মজ্ঞান তোমার করগত"

এখানে শান্তিময় গিরিশচন্দ্র, শঙ্করাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ।

শঙ্করাচার্যের কণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত, নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে, যেখানে শঙ্করাচার্য আহ্বান জানাচ্ছেন:

> "এসো কে কোথায়, মহাকার্যে যে
> আছ সহায়,
> এসো ত্বরা কাল ব'য়ে যায়।
> মহা কার্য্যভার—ধর্ম সংস্কার,
> জ্ঞানজ্যোতি বিকাশ ধরণী তলে,......
> শুদ্ধ তত্ত্ব করিতে প্রচার, জীবের উদ্ধার,
> স্বেচ্ছায় সে মহাভার করেছি গ্রহণ।
> উচ্চ প্রয়োজনে আবাহন করি তোমা সবে,
> এস, এস বিলম্ব না সহে'আর,
> অনাচার ব্যভিচারে কলুষিত ধরা!"

শঙ্করাচার্যের এই আকুল আহ্বান দক্ষিণেশ্বরের কুঠি বাড়ির ছাদ থেকে প্রতিসন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বানকেই স্মরণ করিয়ে দেয়: "ওরে আয়, আয়, কে-কোথা আছিস! আরও একটা দিন যে চলে গেল!" সদ্য পূর্ণালোকে আলোকিত হৃদয় ঠাকুরের। তিনি সেই আলো জেলে দিতে চান সকলের হৃদয়ে। তাঁরও "মহা-কার্য্যভার—ধর্ম সংস্কার", ইতিহাসের আর এক সন্ধিক্ষণে। তাঁর আর বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না। কখন ভক্তরা আসবে, কখন মহাকার্য শুরু হবে। তার জন্যে অপেক্ষা।

৩

এবার 'কালাপাহাড়' নাটকে আসুন।

'ভক্তিরসাত্মক ঐতিহাসিক নাটক' বলে গিরিশ কর্তৃক চিহ্নিত এই নাটকের সংলাপ শুনে আর চরিত্র দেখে আপনাকে ভাবতে হবে আপনি স্টার থিয়েটারে অভিনয় দেখছেন না দক্ষিণেশ্বরের ঘরে বসে ঠাকুরের কথা শুনছেন। রামকৃষ্ণ-অনুরাগী ভক্ত মাত্রেই জানেন বাগবাজারে বলরাম

বন্ধুর বাড়িতে চতুর্থ দর্শনের দিন গিরিশ হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন: 'গুরু কী?' ঠাকুর বল্লেন: 'গুরু হচ্ছে ঘটক', অর্থাৎ ভক্তের সঙ্গে ভগবানের মিলন ঘটিয়ে দেয়। নাটকে কালা-পাহাড় জিজ্ঞেস করছে 'গুরু কে?' চিন্তামণি উত্তর দিচ্ছে: 'ঘটক হে ঘটক; জুটিয়ে দেয়!' (১।৩) এখানে কালাপাহাড় গিরিশ, চিন্তামণি শ্রীরামকৃষ্ণ। কালাপাহাড়ের চারিদিকে অন্ধকার। সে বলছে: "কি বুঝবো? সকলি অন্ধকার।" চিন্তামণি: "তা তো সত্যি, গুরু না আলো জেলে দিলে কি করে দেখবে?" (১।৩)

ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার আগে গিরিশচন্দ্র নিজের মানসিক অশান্তি ও বিভ্রান্তির কথা 'জন্মভূমি' পত্রিকায় ১৩১৬ আষাঢ় সংখ্যায় লিখেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক-দিকে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার ও খ্রীষ্টান মিশনারিদের প্রচারের প্রভাবে ধর্মত্যাগের প্রবণতা, নাস্তিকতা, জড়বাদিতা, হিন্দুধর্মের প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ, অন্যদিকে সনাতন হিন্দুধর্মের নানাভাবে অধঃপতন। সর্বত্র নৈরাজ্যভাব। গিরিশ বিভ্রান্ত। তিনি লিখেছেন: "তখন একদিন প্রার্থনা করিলাম, ভগবান, যদি থাকো, আমার পথ নির্দেশ করিয়া দাও।" এই পথ নির্দেশ কে করে দেবে? 'কালাপাহাড়' নাটকে চিন্তামণি উত্তর দিয়েছে, এবং চিন্তামণির কণ্ঠে ঠাকুরেরই কথা।

চিন্তামণি॥ "ক্ষুদ্র নর ক্ষুদ্র জ্ঞানে বুঝিবে কেমনে
উপদেশ বিনা, তত্ত্ব কিবা স্বর্গ মর্ত্য
রসাতলে-বুদ্ধিবলে নির্ণয় না হয়!
সংশয়, সংশয়—মন পরাজয়—ক্লান্ত
... ...
গুরুপদ সার, অন্য নাহি আর; তারে
দুস্তর পাথারে নরে গুরু বিনা কেবা!
কর গুরু-পদাশ্রয়, নিশ্চয় সংশয়
যাবে দূরে; ভবপারে গুরু কর্ণধার—
ঈশ্বর বিরাজমান নর-কলেবরে!"(১।৩)

ঠাকুর সম্বন্ধে গিরিশের কি ঠিক এই বিশ্বাসই ছিল না? নরেন্দ্র-গিরিশ তর্কের কথা স্মরণ করুন। নরেন বলে "অসীম অনন্ত ঈশ্বর, তিনি সসীম মানুষের মধ্যে রূপ নিতে পারেন না।" গিরিশ জোর দিয়ে বলে: "পৃথিবীর প্রয়োজনেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এই সীমার মধ্যেই নিজেকে প্রকাশ করে নিজকার্য্য সাধন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার।" অন্য ভক্তদের গিরিশ বলে: "তোমরা কি জানো ঠাকুর কেন এই পৃথিবীতে এসেছেন? উনি এসেছেন মানুষের মুক্তির জন্যে, মানুষের রূপ নিয়ে উনি এসেছেন অবতার রূপে।" এই বিশ্বাসের কাছে বিবেকানন্দ মাথা নত করেছিলেন। বলেছিলেন "ধন্য তোমার বিশ্বাস, ঘোষজা।" ঠাকুর বলতেন "গিরিশের বিশ্বাস আঁকড়ে পাওয়া যায় না।" "আমি চেয়েছিলুম ষোলো আনা ও দিয়েছে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা।"

গিরিশের নাট্যসাহিত্য এই যুগাবতার শ্রীরাম-কৃষ্ণের ওপরই আলোকপাত করেছে। 'কালা-পাহাড়' নাটকে (১।৩) কালাপাহাড়কে চিন্তামণি যখন বলছে:

"ভবপারে গুরু কর্ণধার—
ঈশ্বর বিরাজমান নর-কলেবরে"!

তখন কালাপাহাড় প্রশ্ন করেছে:

হায় অন্ধ-বিশ্বাস আশ্রয়, যুক্তিশূন্য
অনুমান! যাহে বিশ্বব্যাপী কহে, নর-
কলেবরে বিরাজিত মানিব কেমনে?
গুরু, গুরু, কেবা গুরু, কোথায়—কোথায়!
কি প্রত্যয় কথায় তাঁহার? মম সম
ক্ষুদ্র নর, আবদ্ধ এ দেহের পিঞ্জরে,—"

চিন্তামণির উত্তর:

ক্ষুদ্র নর তোমা সম গুরু! গুরু কল্প-
তরু ভবে, ভীরু জনে অভয় প্রদানে

আবির্ভাব ধরা মাঝে ; দীন নরসাজে
সমাজে বিরাজে, নামে হৃদিতন্ত্রী বাজে !
… … …
গুরু কৃপা যার, তার কিবা অগোচর ?
গুরুর কৃপায় অনায়াসে ইষ্টবস্তু
পায়, পূর্ণ হয় আশ, দূরে যায় ত্রাস,
অবিশ্বাস-তমো-নাশ জ্ঞানের প্রভায় ।"

এই কালাপাহাড়ের মানসিক অবস্থাই একদা গিরিশের ছিল। ১৩১৬-র আষাঢ় সংখ্যা 'জন্মভূমি' পত্রিকায় 'ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন : "আমার মনোমধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব, কোন পথ অবলম্বন করি ?…সকলেই বলে গুরু ব্যতীত উপায় হয় না। তবে গুরু কাহাকে করিব ? শুনিতে পাই গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করিতে হয়। কিন্তু আমার ন্যায় মানুষকে ঈশ্বর জ্ঞান কিরূপে করি ! মনুষ্যকে গুরু করিতে পারি না।"

এই দ্বন্দ্বের অবসান হয় শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে। ঘোর অবিশ্বাস অবিচল বিশ্বাসে পরিণত হয়। আগেই তার উল্লেখ করা হয়েছে।

'কালাপাহাড়' নাটকে লেটো (লাটু মহারাজ ?) বলছে : "ভগবান মানুষের মত মানুষ হয়, তাহলে বুঝি ভগবান প্রেমময় বটেন।" চিন্তামণি তাকে বলেছে : "আহা লেটো, সে মানুষ হয়ে এসে রে, মানুষ হয়ে এসে।" শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশকে বলেছিলেন : "ঈশ্বর অনন্ত হউন আর যত বড় হউন—তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সারবস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে ! তিনি অবতার হয়ে থাকেন।" (কথামৃত) আটপৌরে ভাষায় নাটকে চিন্তামণি এই কথাই বলেছে। চিন্তামণি-চরিত্র শ্রীরামকৃষ্ণকেই বারংবার স্মরণ করিয়ে দেয়।

সকল ধর্মদ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে ঠাকুরের সেই ঐতিহাসিক ছোট্ট চারটি কথা : 'যত মত তত পথ' নাটকে কিভাবে এসেছে দেখুন। এই তথ্য এবং সত্য বোঝাতে ঠাকুর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদাহরণ বা উপমা দিয়েছেন। তারই একটি 'কালাপাহাড়' নাটকে। চিন্তামণি লেটোকে বলছে : "ছিঃ তুই ঠাকুর আর আল্লায় ভেদাভেদ করিস ?—

এক বিভু বহু নামে ডাকে বহুজনে,
যথা জল, একওয়া, ওয়াটার, পানি,
বোঝায় সলিলে, সেই মত আল্লা, গড্,
ঈশ্বর, যিহোভা, যীশু নামে, নানাস্থানে
নানা জনে, ডাকে সনাতনে। ভেদজ্ঞান
অজ্ঞান-লক্ষণ, ভেদবুদ্ধি কর দূর !" (৩:৬)

এ তো শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের মুখের কথা, মঞ্চে চিন্তামণি বলছে। আর মঞ্চের চিন্তামণি গিরিশ নিজেই। কালাপাহাড়, শিষ্য অমৃতলাল মিত্র এবং লেটো, পুত্র দানীবাবু।

শেষ পর্যন্ত লেটো চিন্তামণিকেই হরি বলে চিনেছে। চিন্তামণি আপত্তি করে। "আরে ছিঃ, লেটো ছিঃ ! কি বলছিস কি ? ঠাকুর বলতেন "আমি কৃষ্ণ নই। কৃষ্ণের দাস মাত্র।" 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী সন্ন্যাসী সোমগিরিও এই কথা বলেছে : "কৃষ্ণই গুরু, আর গুরু কেউ নেই।" গিরিশকে ঠাকুর বলেছিলেন "ভক্তবৎ ন চ কৃষ্ণবৎ। তুমি যা ভাবো তা ভাবতে পারো। আপনার গুরু ত ভগবান—তা বলায় ও-সব কথা বলায় অপরাধ হয়।" (কথামৃত) তাই বলে গিরিশ কি বারবার এইকথা বলেননি ? তেমনি নাটকে লেটো বলছে : "ভগবান্ আর কে বাবাজি ? তুমি নও ?" চিন্তামণি বলে : "ছি, লেটো ছিঃ, ও-কথা বল্‌তে আছে !" লেটো বলছে : "বাবাজি, শোনো, তুমি ভগবান হও, আর না হও, বাবাজি, আমার ভগবান তুমি।" (৪।৫) অন্যত্র বলেছে : "ছিঃ বল আর যাই বল, আমি হরি বলে তোমার পায়ে ফুল দি ! হরিবোল,

হরিবোল !" কালীপদ ঘোষের বাড়ি কালীপূজার দিন গিরিশ 'জয় মা' বলে কার পায়ে ফুল দিয়েছিল ?

চিন্তামণির মুখে ঠাকুরের কথা আর একটু শুনুন। কালাপাহাড় জিজ্ঞেস করছে: 'আমি কে !' চিন্তামণির উত্তর: "একটা মজা দেখেছ, ভাই ! প্যাজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে আর কিছু থাকে না, আর পুঁটুলিমুটুলি হয়ে প্যাজটা হ'য়ে আছে—তেমনি 'আমি'। খোসা ছাড়িয়ে যাও, 'আমি' খুঁজে পাবে না, আর হুঁ,—'আমি' বলে দিন-রাত গর্জাচ্ছে 'অহং অহং'।" (১।৩) আবার অষ্টসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বীরেশ্বরকেও চিন্তামণি বলেছে:

"অহম্ অহম্' ত্যজ বিচক্ষণ, জপ
'তুঁহু তুঁহু', 'নাহম্ নাহম্' !

…লোকশিক্ষা দিতে এসেছ, অহঙ্কার ছেড়েছ ! দেখছ ভাই, অহঙ্কারের ফের ? ওকি ছাড়ে ! 'নাহম্ নাহম্' 'তুঁহু তুঁহু তুঁহু তুঁহু' !" (১।৪) কথামৃতে পড়ি ঠাকুর ত্রৈলোক্যকে বলছেন: "আমি গেলে ঘুচবে জঞ্জাল। যতক্ষণ 'আমি'টুকু থাকে ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি ! 'আমি' গেলে কি রইলো তা কেউ জানতে পারে না—মুখে বলতে পারে না। যা আছে তাই আছে।" কালাপাহাড়কে চিন্তামণি বলেছে: "ঘোরাচ্ছে আমি, অহং, অভিমান, ঘুরছেও আমি, ঘোরাচ্ছেও আমি। আমি আমায় খুঁজে ঘুরে মরছি, আমি ছাড়লেই ঘোরাঘুরি ফুরোয়।"

অনুতাপদগ্ধ বীরেশ্বর যখন বলছে: "কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না। বোধহয় তুষানলে অনুতাপানল নির্বাণ হবে না,—অন্তরে, বাহিরে, শিরায়, মর্মে পাপস্মৃতি জলছে" ! তখন চিন্তামণি আশ্বাস দিয়ে তাকে বলেছে: "ভয় কি ? তুমি তোমার পাপ আমায় দাও।" সবিস্ময়ে বীরেশ্বর তখন বলে:

"কি বললে ! তুমি আমার পাপ-তাপ নেবে ? তাপহর পতিতপাবন সত্যিই আছেন, তবে আর ভয় কি,…" (৫।৩)

এখানে বীরেশ্বর গিরিশচন্দ্র; চিন্তামণি রামকৃষ্ণ। কালাপাহাড়ের তাপ-জ্বালাও চিন্তামণি এইভাবে নিজে নিয়েছে। কালা॥ "ওহো-হো, বড় জ্বালা।" চিন্তা॥ "তোমার জ্বালা আমায় দাও।" কালা॥ "কি, তুমি আমার জ্বালা চাও ? কে তুমি ? তাপহর তুমি আমার সঙ্গে ফিরছ ? দয়াময়, দয়াময়।" (৫।৩) স্মরণ করুন শ্রীমা-র কথা: "পাপ গ্রহণ করে তাঁর (ঠাকুরের) শরীরের ব্যাধি। বলতেন গিরিশের পাপ। ও কষ্ট ভোগ করতে পারবে না।"

এইবার দেখুন ঈশ্বরীয় কথা। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে কালাপাহাড় জিজ্ঞেস করছে: "মহাশয়, ঈশ্বর আছেন ?" চিন্তামণি উত্তর দিচ্ছে: "খুব আছে, সত্যি আছে, তিন সত্যি আছে ! আর কিছু আছে কি না, জানি নে।" কালাপাহাড় প্রশ্ন করে: "কোথায় ঈশ্বর ?" চিন্তামণি দেখায়: "ঐ তেঁতুল গাছে।" কালাপাহাড় বলে: "এ পাগল না কি ?" তখন চিন্তামণি বলছে: "কেন পছন্দ হোলো না ? আচ্ছা ভাল করে বলছি—তোমার কাছে অন্তরে অন্তরে সর্বত্রে ! এই যে, এই যে, হৃদয়েশ্বর এই যে আমার হৃদয়ে।" নাটকের শেষে কালাপাহাড় বুঝতে চাইছে 'ঈশ্বর কি ?' এর উত্তর চিন্তামণির নেই। সে বলছে: "ঈশ্বর আছে জানি, কি তা জানি নে; তবে এই জানি যে, সে ছাড়া কিছুই নেই।" কালাপাহাড় প্রশ্ন করে: "তুমি কি বলছো, তুমি ঈশ্বর, আমি ঈশ্বর ?" চিন্তা॥ "ঈশ্বর, ঈশ্বর। তুমি আমি, তুমি আমি।" (৫।২)—এসব তো ঠাকুরেরই কথা। আরও অনেক আছে।

৪

এবার দেখা যাক 'নসীরাম' নাটক। 'সেবক' ছদ্মনামে গিরিশ এই নাটক লিখেছিলেন ঠাকুরের

দেহাবসানের অল্পকাল পরে। চিহ্নিত করেছেন 'ভগবদ্‌বাক্যমূলক নাটক' বলে। 'নসীরাম'-এ ঠাকুরকে স্পষ্টভাবেই মঞ্চে আনা হয়েছে। নসীরাম চরিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্ভাসিত।

নসীরাম মনের আনন্দে হরিনাম করে আর হরিনাম বিলিয়ে বেড়ায়। লোকে বলে পাগল। শ্রীরামকৃষ্ণকেও লোকে এক সময় পাগল ভাবত। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় (৭ম বর্ষ, ১৫ মাঘ, ১৩১১) প্রকাশিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ' প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন: "বিবেকানন্দ বলিতেন, (ঠাকুরের সহিত প্রথম দর্শনের পর) 'আমি ভাবিতে লাগিলাম, এ কি উন্মাদ! রামদাদা আমায় কার নিকট আনিল? বুদ্ধি উন্মাদ বলিতেছে, কিন্তু প্রাণ আকৃষ্ট! অদ্ভুত খ্যাপা—অদ্ভুত তাঁহার আকর্ষণ—অদ্ভুত তাঁহার প্রেম! খ্যাপাও ভাবিলাম, মুগ্ধও হইলাম!' 'কালাপাহাড়' নাটকে চিন্তামণি সম্পর্কে কালাপাহাড় এমনিই ভেবেছিল: "এ কে! এ বালক নয়, পাগল নয়, মূর্খ নয়, পণ্ডিত নয়, এ কে? কিভাবে থাকে?" (২।১) নসীরাম বলে "দু একটা পাগল আছে তাই সংসার আছে।" বিবেকানন্দ উত্তর-কালে বলেছিলেন: "Such mad men are the salt of the earth।" রাজপুত্র অনাথকে নসীরাম বলেছে সে যদি হরিনাম করে বেড়ায় লোকে তাকেও 'অনা' পাগলা বলবে, যেমন লোকে তাকে বলে নসে পাগলা। সে বলছে:

> "লোকের কি, শালাদের আমি দেখেছি, যে বেটারা তাদের মতন পাগল না হয়, আপনার মজায় থাকে, তারেই বলে পাগল। কোনো শালা ধনের কাঙাল, কোনো শালা মানের কাঙাল, কোনো শালা মেয়ে মানুষের কাঙাল, কোনো শালা ছেলের কাঙাল।—যে শালা ক্যালাবৃত্তি না করে সে শালাই পাগল।" (২।৩)

এখানে 'পাগলা' থেকে 'শালা' পর্যন্ত সবই His Master's Voice.

আরও আছে। অনাথ নসীরামকে জিজ্ঞেস করছে "নসীরাম, তোমার কি সংসারে চাইবার কিছু নেই?" নসীরামের উত্তর: "চাইবার মত একটা জিনিষ দেখিয়ে দাও······সব ভুয়ো, সব ভুয়ো···টাকা কড়ি আজ বলছ তোমার, তোমার থেকে গেলেই ওর, আবার ওর থেকে গেলেই তার। যদি খরচ করো তা দু'হাতে দু' মুঠো ধুলো ধর না কেন, এই আমার টাকা, এই আমার টাকা!" এ তো ঠাকুরের 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'রই প্রতিধ্বনি। অনাথ জিজ্ঞেস করে, "তুমি যে হরি হরি কর, হরিকে চাও না?" নসীরাম বলে: "আরে দূর, যে আমার জন্যে ঘুরে বেড়ায় তারে আর চাইব কি?" ঠাকুর তো কতবা·ই বলেছেন ভক্ত যেমন ভগবানকে খোঁজে, ভগবানও তেমনি ভক্তকে খুঁজে বেড়ায়। ঠাকুর নিজে কি করেছিলেন? গিরিশ তাঁকে খুঁজেছিল না তিনিই গিরিশের কাছে এসেছিলেন? আর এসেছিলেন কোথায়? এসেছিলেন থিয়েটারে—স্টার থিয়েটার, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪। থিয়েটার—তখনকার মানুষের কাছে শয়তানের লীলাক্ষেত্র। সেখানে এলেন দক্ষিণেশ্বরের সাধু, বিনা নিমন্ত্রণে। আগের দুটি দর্শনের কথা স্মরণ করুন। দীননাথ বসুর বাড়ি প্রথম দর্শনের পর গিরিশ লিখেছিলেন: "তথায় যাইয়া শ্রদ্ধার পরিবর্তে অশ্রদ্ধা লইয়া আসিলাম।" দ্বিতীয় দর্শন বলরাম বসুর বাড়ি। বিধুকীর্তনওয়ালির কীর্তন হচ্ছিল। এ দিক-ওদিকে কিছু বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য শোনা যাচ্ছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষ "দেখলেত আর কি দেখবে?" বলে গিরিশকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। গিরিশ ঠাকুরের কাছে এলেন না। তখন ঠাকুরই গিরিশের কাছে এলেন, অযাচিতভাবে। কেন এলেন? গিরিশের

নাটক 'চৈতন্যলীলা' তখন হরিনামের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। ভক্তিমূলক নাটক, লিখেছে একজন নট-নাট্যকার। এ-নাটক যে লিখেছে সে ভক্ত না হয়ে যায় না। তাই ভক্তর কাছে ভগবান সেদিন এসেছিলেন। এসেই গিরিশকে সামনে দেখে নত হয়ে নমস্কার। গিরিশ তো অবাক। করলেন প্রতি-নমস্কার। ওদিকে আবার নমস্কার, এদিকেও তাই। খানিকক্ষণ এ-রকম চলার পর ওঁকে একটি বক্সে বসার বন্দোবস্ত করে দিয়ে গিরিশ বাড়ি চলে গেলেন। কথাবার্তা কিছু হল না। কিন্তু ঠাকুর ছাড়ার পাত্র নন। এরপর বলরাম বসুর বাড়িতে একদিন নিজেই লোক দিয়ে ডেকে পাঠালেন। তখন গিরিশ গেলেন। চতুর্থ দর্শন। ঐদিনই গিরিশ প্রশ্ন করেন : 'গুরু কি ?' উত্তরে ঠাকুর যখন জানালেন, "তোমার গুরু হয়ে গেছে", গিরিশ তো অবাক। এখানে গিরিশের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ আলোকপাত করলেন। এই আলোকপাত গিরিশের বাইরের আকৃতির উপর নয়, অন্তরের প্রকৃতির উপর। গিরিশের নিজেরই অজান্তে তার অন্তরের গভীরে যে ধর্মপ্রবণতা বা অধ্যাত্মচেতনা চাপা পড়েছিল পার্থিব মলিনতা—জটিলতা, দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষের কারণে, ঠাকুর দিব্যদৃষ্টিতে তা দেখতে পেয়েছিলেন। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখা সেই উলঙ্গ ভৈরববালককে তিনি চিনেছিলেন। আমরা গিরিশের বাল্যকালের কথা জানি। পিতৃগৃহে গৃহদেবতা শ্রীধরের নিত্যপূজা, পরিবারের সকলের ঈশ্বর-ভক্তি ও বিশ্বাস, বালক গিরিশের একাগ্র চিত্তে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী শোনা, কথকতার আসরে যাতায়াত ইত্যাদি। যৌবনে নোটো গিরিশ ভিন্ন জগতে গিয়ে পড়েছিল। তার পারিপার্শ্বিক, সামাজিক আবহাওয়াও ধর্মভাবের অনুকূল ছিল না। কিন্তু এরই মধ্যে গিরিশকে নাটক লেখা শুরু করতে হল, সদ্য-প্রতিষ্ঠিত বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়কে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। কয়েকখানি খুচরো নাটক-নাটিকা লেখার পর গিরিশ উপলব্ধি করলেন : "হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।" ১৮৮১-তে 'রাবণবধ' থেকে শুরু করে ১৮৮৪-তে 'চৈতন্যলীলা' পর্যন্ত ১৪খানি ধর্মাশ্রয়ী নাটক গিরিশ লিখলেন। [ক্রমশঃ]

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে সংস্কৃত ও ভারতীয় সংস্কৃতি

ডক্টর হরিপদ আচার্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

ঊনবিংশ শতকের শেষ প্রান্তে সঙ্ঘ-সংগঠনের কাজে স্বামীজী খুব ব্যস্ত। কিন্তু ব্যস্ততার মধ্যেও সময় পেলেই তিনি সংস্কৃতশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় কিছু সময় কাটাতেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কথা প্রসঙ্গে স্বামীজী প্রিয়শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছিলেন, "মঠে শীঘ্রই ক্লাস খুলছি। বেদ, উপনিষদ্, গীতা, ভাগবত, অষ্টাধ্যায়ী পড়াব।"[১২] আমেরিকা এবং ইংলণ্ডে বসেও তিনি দিনরাত অনন্তরত্নপূর্ণ সংস্কৃতসাগরে রত্নের খোঁজে চলেছেন। চিঠির পর চিঠি লিখছেন ভারত থেকে প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠাবার তাগাদা দিয়ে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্ক থেকে বৈকুণ্ঠ সান্ন্যালকে লিখেছেন নারদ ও শাণ্ডিল্যসূত্র পাঠাতে, আলাসিঙ্গাকে লিখেছেন রামানুজভাষ্যের জন্য। ইংলণ্ড থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছেন, একখানা ভাল তরজমাসহ পঞ্চদশী, সবরকমের ভাষ্যসহ একখানা গীতা, কাশীর ছাপা নারদীয়-ভক্তিসূত্র, শাণ্ডিল্যসূত্র, কালীবর বেদান্তবাগীশের শাঙ্কর ভাষ্যের তরজমা এবং একখানা বাচস্পত্য অভিধান পাঠাতে। নিউইয়র্ক থেকে সাংখ্যকারিকা, কূর্মপুরাণ, আর যোগসূত্রের

১২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ৯।১৭

প্রাপ্তি-স্বীকার জানিয়েছেন মিঃ স্টার্ডিকে, এবং ভাগবতের প্রাপ্তি-স্বীকার জানিয়েছেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে। লণ্ডন থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখছেন, ঋক্-সাম-যজুঃ-অথর্ব-সংহিতা, শতপথাদি সবগুলি ব্রাহ্মণ, বিভিন্ন সূত্রগ্রন্থ, যাস্কের নিরুক্ত, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি অতি সত্বর পাঠাতে। স্বামীজী নিজেই কেবল নানাশাস্ত্র-গ্রন্থ অধ্যয়ন করে ক্ষান্ত থাকতেন না, অন্তরঙ্গদের নানাভাবে প্রাচীন শাস্ত্রাদি পাঠ এবং সংস্কৃত-ভাষার প্রচারে উৎসাহিতও করেছেন। মাদ্রাজের ভক্ত ডঃ নঞ্জুণ্ড রাওকে নিউইয়র্ক থেকে লিখছেন, "সংস্কৃত সাহিত্যে যে-সব অপূর্ব গল্প ছড়ানো আছে, তা সহজবোধ্য ভাষায় আবার লেখা ও জনপ্রিয় করা দরকার;"[১৩] দাক্ষিণাত্যে রামকৃষ্ণ-ভাবপ্রচারের অন্যতম পুরোধা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে সেখানে নব প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রগুলির জন্য কর্মপ্রণালীর নির্দেশ দিতে গিয়ে তামিল ভাষাভাষী ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে যাতে সংস্কৃতবিদ্যার বিশেষ চর্চা হয় তার উপর জোর দিয়ে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিং থেকে বিস্তৃত চিঠি লিখছেন।

বিবেকানন্দ-সাহিত্যে গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি বেদান্তাদিগ্রন্থের প্রভাব এবং উদ্ধৃতির প্রাচুর্য যেমন লক্ষ্য করার মতো, তেমনি সংস্কৃত-কাব্য-নাটকাদির প্রভাব এবং উদ্ধৃতিরও কমতি নেই। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিদের কাব্য-নাটকাদির সৌন্দর্যে স্বামীজী যেমন মুগ্ধ হয়েছেন তেমনি বাণভট্টাদির লেখায় সমাস এবং বিশেষণের আধিক্যবশতঃ ভাষার দুরূহতা দেখে দুঃখ প্রকাশ এবং উপহাস করে বলেছেন, "বাপ্‌রে, সে কি ধুম—দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম ক'রে—'রাজা আসীৎ'!!! আহাহা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!!—ও সব মড়ার লক্ষণ।"[১৪] অপর পক্ষে কিন্তু মহাভাষ্য, শাঙ্কর ভাষ্য, শ্রীভাষ্য, শবরভাষ্য প্রভৃতির সাবলীল ভাষার অকুণ্ঠ প্রশংসাও করেছেন। 'প্যারি প্রদর্শনী' নামক প্রবন্ধে স্বামীজী কতগুলি মৌলিক ও বিতর্কিত প্রশ্ন তুলে ধরে তার প্রকৃত সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করেছেন। সেখানে তিনি হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতশাস্ত্রাদি বিষয়ে যে সব অদ্ভুত এবং অবৈজ্ঞানিক মতবাদ বৌদ্ধযুগের অবক্ষয়কালে প্রাচ্যগণ, আর সে সূত্র ধরে পাশ্চাত্যগণ নিজেদের সুবিধামতো প্রচার করে আর্যধর্ম ও শাস্ত্রাদির অসারতা প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, স্বামীজী দৃপ্তকণ্ঠে সেসব মতবাদের প্রতিবাদ করে নিজ মত প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছেন যে, সে সকল মতবাদ অর্বাচীনকালের স্বকপোল-কল্পিত ও ভ্রান্ত। আরও দেখিয়েছেন যে, ভারত পাশ্চাত্যের কাছে ঋণী নয়, বরং পাশ্চাত্যই প্রাচীন শাস্ত্রাদির জন্য নানাভাবে ভারতীয়দের কাছে ঋণী। প্রবন্ধটিতে স্বামীজী প্রসঙ্গক্রমে মহাভারতের মাহাত্ম্য কীর্তন করে বলেছেন, "...প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের উপর জীবন উৎসর্গ করুন; অনেক আলোক জগতে আসিবে। বিশেষতঃ এ মহাভারত ভারতেতিহাসের অমূল্য গ্রন্থ। ইহা অত্যুক্তি নহে যে, এ পর্যন্ত উক্ত সর্বপ্রধান গ্রন্থ পাশ্চাত্য জগতে উত্তমরূপে অধীতই হয় নাই।"[১৫] প্রসঙ্গতঃ বলতে হয়, রামায়ণ ও মহাভারত হল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের উজ্জ্বল দর্পণ। তাই সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য স্বাধীন ভারতেও আবার নতুন করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এদুটি গ্রন্থের পঠনপাঠন একান্ত প্রয়োজন।

১৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ৭।২৩৫

১৪ ঐ, ৬।৩৬ ১৫ ঐ, ৬।৫১

এখন আমরা স্বামীজীর সংস্কৃত রচনাগুলির দিকে লক্ষ্য করি। স্বামীজীর সংস্কৃতে রচিত-পত্রের সংখ্যা তিন আর স্তোত্রের সংখ্যা পাঁচ। পত্র তিনটির মধ্যে দুটি লিখেছেন প্রিয় শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে, আর একটি স্বামী শুদ্ধানন্দকে। স্বামী শুদ্ধানন্দজীর পত্রটি আলমোড়া থেকে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুন লেখা। এটি গতানুগতিক পত্র মাত্রই নয়। এতে স্বামীজী "যাবানর্থ উদপানে…" ইত্যাদি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ছেচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকটির ব্যাখ্যা করেছেন। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা পত্র দুটিও একই বৎসরে লিখেছেন। প্রথমটি লিখেছেন ১৯ মার্চ দার্জিলিং থেকে। পত্রটিতে মুমুক্ষুত্বের প্রশংসা করে শিষ্যকে অভয় দান করেছেন। আলমোড়া থেকে ৩ জুলাই লেখা দ্বিতীয় পত্রটিতে বিপদে ধৈর্য অবলম্বনের উপদেশ এবং ত্যাগ-বৈরাগ্যের প্রশংসা কীর্তন করেছেন। পত্রটি শুরু করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি প্রণাম মন্ত্র লিখে। স্বামীজীর লেখা বাংলা ভাষার মধ্যেও একটা অভিনবত্ব লক্ষ্য করার মতো। আধুনিক বাংলা লেখাতেও স্বামীজী দু এক পংক্তি সংস্কৃত লিখে সেগুলিকে অধিকতর শক্তিশালী এবং হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। নিউইয়র্ক থেকে মঠের ভাইদের লক্ষ্য করে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা পত্রে গুরুভাইদের উদ্বোধিত ও তাঁদের মনে শক্তি সঞ্চারের জন্য তিনি তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে লিখলেন—"কুর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ। কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্—রামকৃষ্ণ দাসা বয়ম্।"[১৬] আমরা (আকাশের) তারকা চর্বণ করি, শক্তিতে ত্রিভুবন উৎপাটিত করি। আমাদের জান না কি? আমরা রামকৃষ্ণের দাস। অনেক সময় ব্যঙ্গ করে সংস্কৃতের প্যারডি করে লিখেছেন। যেমন রঘুবংশে কালিদাস সূর্যবংশীয় রাজাদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বিনয় প্রকাশ করে বলেছেন, কোথায় মহান্ সূর্যবংশ আর কোথায় অল্প বুদ্ধি আমি "ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশ ক্ব চাল্পবিষয়মতিঃ।"[১৭] এর প্যারডি করে পরিব্রাজক গ্রন্থে সূর্যবংশের চূড়ামণি রামচন্দ্রের একান্ত শরণাপন্ন মহাবীর হনুমানের সাগরলঙ্ঘন প্রসঙ্গে লিখলেন "ক্ব সূর্যপ্রভববংশচূড়ামণি-রামৈকশরণো বানরেন্দ্রঃ আর কোথা আমি দীন—অতি দীন।"[১৮] নীরস ব্যাকরণকে নিয়েও রসিকতা করতে ছাড়েননি সুরসিক স্বামীজী, "তোমরা ভূত কাল—লুঙ্, লঙ্, লিট্ সব এক সঙ্গে।…তোমরা ইৎ—লোপ্ লুপ্।"[১৯] ব্যাকরণ শাস্ত্রে ভূতকাল হল অতীতকাল, লুঙ্ অর্থাৎ পুরাঘটিত বর্তমান, লঙ্ হল সাধারণ অতীত আর লিট্ হল পুরাঘটিত অতীত, আর ইৎ, লোপ্, লুপ্ অর্থ হল অস্থায়ী অংশ, কার্য সিদ্ধির পর আর যার কোন প্রয়োজন থাকে না। ব্যাকরণের এই বিশেষ অর্থবোধক শব্দগুলির কি অপূর্ব প্রয়োগ কৌশল! এমন আরও অসংখ্য সংস্কৃত উক্তি স্বামীজীর সমগ্র রচনা ভরে রয়েছে। তাছাড়া একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের চিঠিও সংস্কৃত ভাষায় লেখার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে। রামকৃষ্ণ সেবক সন্ন্যাসিগণ—ভগবান্ রামকৃষ্ণের আশীর্বাদসহ বহুসম্মানপূর্বক আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি—এই মর্মে সংস্কৃত ভাষায় চিঠির প্রারম্ভিক পঙ্ক্তি "আমন্ত্রয়ে ভবন্তং সাশীর্বাদং ভগবতো রামকৃষ্ণস্য বহুমানপুরঃসরঞ্চ… "এবং শেষ পঙ্ক্তি "রামকৃষ্ণসেবকাঃ সন্ন্যাসিনঃ"[২০]

১৬ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ৬।৪৮৯
১৭ রঘুবংশম্—কালিদাস, শ্লোক ৫
১৮ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ৬।৫৯
১৯ ঐ, ৬।৮৭ ২০ ঐ, ৭।২০৩

লিখে পাঠিয়েছেন আমেরিকা থেকে।

স্তোত্রগুলির মধ্যে পাঁচটি রামকৃষ্ণদেবের স্তোত্র, দুইটি রামকৃষ্ণদেবের প্রণাম মন্ত্র আর একটি শিবস্তোত্র ও একটি অম্বাস্তোত্র। 'ওঁ হ্রীং ঋতং…' স্তোত্রটি আর 'ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য…' 'প্রণামমন্ত্রটি রামকৃষ্ণভক্তমাত্রেরই নিত্য প্রার্থনামন্ত্র। 'ওঁ হ্রীং ঋতং…' "স্তোত্রটি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মঠ যখন বেলুড়ে ভাড়া বাড়িতে ছিল, সেখানে অবস্থানকালে রচনা করেন। বসন্ততিলক ছন্দে রচিত স্তোত্রটি রচনার পর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে ছন্দপতনাদি দেখে দিতে বলেছিলেন। চারটি স্তবকের স্তোত্রটির প্রতিটি শেষ পঙ্‌ক্তিতে হে দীনবন্ধো! তুমিই আমার আশ্রয়।—এই বলে শরণাগতি ও প্রার্থনা জানিয়েছেন। স্তোত্রটিতে রামকৃষ্ণদেবকে সত্যস্বরূপ, ত্রিগুণজয়ী, মোহনিবারক, সংসার বন্ধননাশকারী, ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাপক, অমৃতস্বরূপ, মৃত্যুনাশক, মায়াদূরকারী, পাপনাশী, মঙ্গলময়, একমাত্রলভ্য ও নিরাশ্রয়ের আশ্রয়রূপে বর্ণনা করেছেন। "আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ"—ইত্যাদি দ্বিতীয় স্তোত্রটি একই সময়ে মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত। দুইটি মাত্র শ্লোকে লেখা এই স্তোত্রটির প্রথম শ্লোকটিতে শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন আর দ্বিতীয় শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করে শেষাংশে সেই উভয় বিরাট পুরুষের মিলিত রূপকেই শ্রীরামকৃষ্ণরূপে বর্ণনা করেছেন। স্তোত্রটির বর্ণনা নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় সেই সময়ই স্থললিত ভাষায় ইহার পদ্যানুবাদ করেছিলেন। 'নরদেব দেব…'ইত্যাদি তৃতীয় স্তোত্রটিও একই সময়ে দোধকছন্দে রচিত। জ্ঞান প্রেম ভক্তি ও কর্মের সমন্বয়কারী নরদেব শ্রীগুরুর জয়গান করা হয়েছে এখানে। ইহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে শক্তিরূপ সমুদ্র থেকে উত্থিত, নানা লীলাময়, সংসার রোগের চিকিৎসক, অদ্বৈতব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয়রূপী বলা হয়েছে। একটি মাত্র শ্লোকে মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত "সামাখ্যাদৈর্গীতিসুমধুরৈ-র্মেঘগম্ভীরঘোষৈঃ"—ইত্যাদি চতুর্থ স্তোত্রটিতে বলা হয়েছে শুদ্ধ হৃদয় বেদজ্ঞ ঋষিগণ মেঘগম্ভীর সুমধুর স্বরে সামগান দ্বারা যাঁর স্তব করে আকাশ বাতাস মুখরিত করতেন তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তগণ সর্বদা তাঁরই ভজনা করেন। পঞ্চম স্তোত্রটি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা পত্রে স্থান পেয়েছে। স্তোত্রটিতে আত্মশক্তির উদ্বোধন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে আশ্রয় গ্রহণের প্রশংসা করা হয়েছে। স্তোত্রটির ছন্দ বিন্যাস গতানুগতিক নয়। কোথাও ষোল কোথাও সতর মাত্রায় বিষমছন্দে রচিত। "ক্ষীণাঃ স্ম দীনাঃ সকরুণা জল্পন্তি মূঢ়া জনাঃ"—ইত্যাদি তিন স্তবকের এই স্তোত্রটিতে ক্ষীণতা এবং দীনতাই নাস্তিক্য আর বীরত্বই আস্তিক্য এইরূপে আস্তিক-নাস্তিকের নতুন সংজ্ঞা দিয়ে নিজেদের রামকৃষ্ণের দাস বলে চিহ্নিত করেছেন। শেষ দুইটি স্তবকে বিশ্ববাসীর উদ্দেশে সর্বপ্রকার আসক্তিহীন ও স্বার্থত্যাগের উপদেশ দিয়ে ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাদির শক্তিতে শক্তিমান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অমৃতের পূর্ণপাত্র স্বরূপ বলেছেন। স্তোত্রটির আগে "কিন্নাম রোদিষি……"ইত্যাদি একটি শ্লোক স্তোত্রটির ভূমিকারূপে পত্রে স্থান পেয়েছে। সেখানেও সর্বশক্তির আধার ভগবানের কাছে আত্মশক্তির উদ্বোধনের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

দুইটি প্রণাম মন্ত্রের একটি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩ জুলাই আলমোড়া থেকে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে সংস্কৃতে লেখা চিঠির প্রথমেই লিখিত হয়েছে। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর এবং

শিবস্বরূপ বলা হয়েছে। আর সর্বজন-পরিচিত "স্থাপকায় চ ধর্মস্য…"ইত্যাদি প্রণামমন্ত্রটি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুআরি মাঘী পূর্ণিমায় হাওড়ার রামকৃষ্ণপুরের নবগোপাল ঘোষের বাড়িতে স্বামী প্রকাশানন্দ কর্তৃক রামকৃষ্ণদেবের পূজা ও আরতির পর মুখে মুখে রচনা করে প্রণাম করেছিলেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত এই মন্ত্রেই স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে ধর্মের সংস্থাপক, সকল ধর্মস্বরূপ এবং অবতারবরিষ্ঠ বলে প্রণাম জানিয়েছেন।

হ্রস্ববর্ণ বহুল কোমলতালের মালিনীছন্দে রচিত "নিখিলভুবনজন্মস্থেমভঙ্গপ্রোহাঃ…" ইত্যাদি শিবস্তোত্রটি জগতের কারণ স্বরূপ, প্রেমময়, জ্ঞানস্বরূপ পরম কল্যাণ কারুণিক শিবের বন্দনা গীতি। আর বসন্ততিলক ছন্দে রচিত "কা ত্বং শুভে শিবকরে সুখদুঃখহস্তে…" ইত্যাদি অম্বা স্তোত্রটি শ্রুতিমাধুর্যে সকলকে মুগ্ধ করে। স্তোত্রটিতে জাগতিক সুখ-দুঃখদায়িনী, মোক্ষ-প্রদায়িনী, আদি কারণরূপিণী, কল্যাণময়ী জগন্মাতার বন্দনা গান। স্তোত্রটির ভাব ও ভাষার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সুললিত দীর্ঘত্রিপদী ছন্দে স্তোত্রটির বঙ্গানুবাদ করেন। শিবস্তোত্র ও অম্বাস্তোত্রের রচনাকাল সম্বন্ধে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে অমরনাথ এবং সেপ্টেম্বর মাসে ক্ষীরভবানী দর্শন করে তাঁর মনে যে দৈবীভাবের উদয় হয়েছিল তার বহিঃ-প্রকাশের ফলই যে এই দুইটি স্তোত্র—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। অমরনাথ দর্শনের পর স্বামীজীর মনোভাবের পরিচয় দিয়ে 'যুগনায়ক-বিবেকানন্দ'-এ বলা হয়েছে, "তিনি তখন সর্বদা শিবভাবে বিভোর থাকিতেন, আর মুখে অনুক্ষণ শিবমহিমা কীর্তিত হইত। মহাদেব চিরকালই তাঁহার উপাস্য ছিলেন—অমরনাথ সে ভাব-প্রবাহে বন্যা আনিয়াছিলেন।"[২১] ক্ষীরভবানী মন্দির দর্শন করে স্বামীজীর মনে যে মাতৃভাবের উদয় হয়েছিল তারই প্রবল প্রেরণায় তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'কালী দি মাদার'ও সেই সময়েই রচিত হয়েছিল। ভারতীয় সংস্কৃতিতে যেমন শিবদুর্গা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে, স্বামীজীর সমগ্র জীবনও তেমনি শিব এবং শক্তির ভাবে ভাবিত। তাঁর জীবনে আধ্যাত্মিক ভাবের সাথে সংস্কৃত ভাষার চর্চা,জ্ঞানের গভীরতা ও সেই ভাষার প্রয়োগকুশলতার হরগৌরী সম্মেলন সত্যই অতুলনীয়।

স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র জীবন যে সংস্কৃতের ভাবধারায় ভাবিত, তার প্রমাণ রচনাবলীর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। সংস্কৃতের অফুরন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে নানা রত্ন আহরণ করে তিনি যেমন বিশ্বকে উপহার দিয়েছেন তেমনই যে রত্ন সংগ্রহ করে তিনি ভারতসংস্কৃতিকে উপহার দিয়েছেন তা-হল বিশ্বপ্রেম। এই বিশ্বপ্রেমের বাণীই ভারত-সংস্কৃতিরও মূলকথা। বৈদিক যুগ থেকে কালিদাসাদি মহাকবিদের যুগ পর্যন্ত সকল ঋষি কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে এক মৈত্রীর বাণী, একত্বের বাণী। বৈদিক ঋষিকণ্ঠে "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্…"[২২] ইত্যাদি মন্ত্রে একসাথে চলার, এক সাথে বলার এবং একমন হওয়ার যে বাণী উচ্চারিত হয়েছিল এই মৈত্রীর বাণীই স্বামীজীর মতে বৈদান্তিকের দৃষ্টিতে সকলের মধ্যে সেই প্রেমময়কে দেখার বাণী, বিশ্বমৈত্রীর বাণী—ভারতাত্মার শাশ্বত বাণী। এই মিলনের বাণীই ভারতকে বলতে শিখিয়েছে, 'সর্বং বিশ্বং ভবত্যেক-নীড়ম্', বুঝতে শিখিয়েছে,

২১ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ২য় সংস্করণ, ৩।১৫৮

২২ ঋগ্বেদ, ১০।১৯১।২

'স্বদেশঃভুবনত্রয়ম্'। 'সখার প্রতি' কবিতায় শোনা যায় তারই প্রতিধ্বনি—

"শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্যসার—/তরঙ্গ আকুল ভবঘোর, একতরী করে পারাপার—/মন্ত্র-তন্ত্র প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,/ত্যাগ-ভোগ বুদ্ধির বিভ্রম; 'প্রেম' 'প্রেম'—এইমাত্র ধন।"

বর্তমানের নানা সংঘাতময় পৃথিবীতে স্বামীজীর প্রেম ও মৈত্রীর বাণীই দেবে প্রকৃত শান্তিপথের সন্ধান আর তার সহায়ক হবে প্রাচীনের আলোতে নবীনের সামঞ্জস্য রেখে ভারতসংস্কৃতির পরিপূর্ণ অগ্রগতি।

স্বামীজীর দৃষ্টিতে সংস্কৃত শুধু একটি ভাষা মাত্রই নয়। ভারত সংস্কৃতির বাণীময় রূপ এই সংস্কৃত। ভারতের সঠিক পরিচয় জানতে হলে সংস্কৃতই একমাত্র সহায়ক। ভারতের সংস্কৃতি ও সংস্কৃত তাই অবিচ্ছেদ্য। স্বামীজীর ভাষায়—"ভারতে সংস্কৃত-ভাষা ও মর্যাদা সমার্থক।"[২৩] এই প্রাচীন সাহিত্যের পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের দ্বারাই জগতের বিস্ময় শাশ্বত ভারতের অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হয়ে বিশ্বকল্যাণ সাধিত হবে। ভারতসংস্কৃতির অরুণোদয় কাল থেকে মনীষা সূর্যের প্রকাশকে ধরে রেখেছে এই ভাষা। তাই সামগ্রিক ভারতসংস্কৃতির যথার্থ উত্তরাধিকার নিয়ে জগতের সামনে দাঁড়াতে হলে সংস্কৃতকে অবহেলা করা কিছুতেই সম্ভব নয়।*

২৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ৫।১৯৬

* ১৯৮৪-এর ২৬ জানুআরি উদ্বোধন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ।

আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের কয়েকটি আশ্রম

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসাক

বেশ কিছুদিন থেকে মনে মনে ইচ্ছা ছিল, একবার স্যাক্রামেণ্টো (Sacramento) আশ্রমে যাব। উদ্দেশ্য পূজনীয় বিমলদার (স্বামী শ্রদ্ধানন্দের) সঙ্গে দেখা করা ও সেই সঙ্গে আশেপাশের আরও কয়েকটি আশ্রম দেখে আসা। যতবারই আমার ইচ্ছার কথা বিমলদাকে বলেছি, ততবারই 'এখন নয়' বলে তিনি আমায় নিরস্ত করেন। শেষ পর্যন্ত গত বছর মে মাস নাগাদ হঠাৎ তাঁর কাছ থেকে একটি 'কেব্‌ল' পাই। তিনি অক্টোবর নাগাদ যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। পাসপোর্ট হয়ে গেল। 'ভিসা'র ব্যবস্থা করতে যাব, হঠাৎ তাঁর কাছ থেকে আর একটি 'কেব্‌ল।' তিনি খুব অসুস্থ বলে আমাকে যেতে নিষেধ করেছেন। সব উৎসাহ,উদ্দীপনা নিমেষে অন্তর্হিত হল। তবুও মনের ভেতরে ভেতরে ধূমাবৃত অগ্নির মতো স্যাক্রামেণ্টো যাবার পরিকল্পনা সদাই জাগরূক ছিল। বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। তারপর বিমলদার কাছ থেকে এক পত্র পাই। পত্রে তিনি পরিষ্কার করে লিখলেন, তাঁর বর্তমান শারীরিক পরিস্থিতিতে ওদেশে আমার দেখাশুনার ব্যবস্থাদি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে ঐ দেশের কোন সাধু যদি আমার ভার নেন, তাহলে তাঁর কোন আপত্তি নেই।

গত বছরের শেষের দিকে সিয়াট্‌ল (Seattle) আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দ বেলুড় মঠে এসেছিলেন। তাঁকে সব জানাতে, তিনি সানন্দে সব ব্যবস্থাদি করে দিতে রাজি হলেন। আমার ট্রাভেল এজেণ্ট প্যান্ আর্জ অ্যাণ্ড্ কোং (Pan

Urge & Co.)-এর সুব্যবস্থাপনায় আমেরিকা যাবার ভিসা সহজেই পেয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে কানাডা ও জাপানের ভিসাও করে নিলাম। ৫ এপ্রিল দমদম এয়ারপোর্ট থেকে 'থাই' ইণ্টার-ন্যাশনাল এয়ার লাইন্স্-এর প্লেনে রওনা হলাম। ব্যাঙ্কক-এ পৌছলাম সন্ধ্যা প্রায় ৬টা নাগাদ। ঐ রাত্রে ব্যাঙ্কক্-এ থাকতে হবে। পরের দিন আবার 'থাই' প্লেনে যাত্রা শুরু হবে। 'থাই' এয়ার লাইন্স্-এর খরচায় একটা রাত অতি আধুনিক রুচিসম্মত 'এয়ারপোর্ট হোটেলে' খুব আরামেই থাকা গেল। এখানে একটা খুব মজার ব্যাপার হয়েছিল। এয়ারপোর্ট হোটেলের মহিলা-রিসেপসনিস্ট (receptionist) আমাকে ঘরের নম্বর বলে দিয়ে চাবি দিয়ে দিলেন। দোতলায় ঘর। বিরাট হোটেল। দোতলায় গিয়ে নম্বর দেখে ঘর খুঁজে বের করে, চাবি দিয়ে ঘর তো খুললাম। কিন্তু একি? ঘরের সুইচ্ জ্বালছি। আলো তো জ্বলে না! ঘরের টেলিফোন থেকে রিসেপ-সনের মহিলাকে বললাম "এমন ঘর দিয়েছ, ঘরের আলো জ্বলে না।" উত্তরে আমাকে মহিলা বললেন "Put the key in the key box"—চাবির বাক্সে চাবি রাখুন। দেখি ঘর খুলতেই, পাশে একটি ছোট বাক্স রয়েছে, তাতে লেখা রয়েছে, "Put the key here" (এখানে চাবি রাখুন)। আশ্চর্য, চাবিটা বাক্সের মধ্যে রাখতেই সব আলো জ্বলে উঠল। ইতিমধ্যে মহিলা একটি লোককেও আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি একটু লজ্জিত হয়ে বললাম, "ধন্যবাদ, এখন সব ঠিক আছে।" যাই হোক ঘরটি অতি সুন্দর, সুসজ্জিত। টি. ভি., এয়ার কুলার প্রভৃতি আছে। পরিষ্কার ধপধপ্ করছে বিছানা। মেঝেতে দামী কার্পেট।

পরের দিন 'থাই' এয়ার লাইন্স্-এর ব্যবস্থাপনায় এয়ারপোর্টে এলাম। এর পর দীর্ঘ সময়ের জন্য আকাশে থাকতে হবে। টোকিওতে পৌছতে প্রায় ছয় ঘণ্টা লাগবে।

টোকিওতে প্লেন একবার নামল, পেট্রোল ভরে নিল। টোকিওর যাত্রীরা নামল, আবার কিছু উঠলও। আমরা 'ট্রানসিট্ লাউঞ্জ'-এ (Transit Lounge) অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঘণ্টাখানেক পরে প্লেন ছাড়ল। এবারে একেবারে সিয়াট্ল-এ পৌছে দেবে। আকাশ পথে থাকতে হবে প্রায় নয় ঘণ্টা। প্লেনে সিনেমা দেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া খাদ্য, পানীয়ের যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকায় কোন কিছুর অসুবিধা নাই। এয়ার হোস্টেসরা 'ট্রে' করে নানা রং বেরঙের পানীয় নিয়ে ঘুরছে, আর বিনীতভাবে বলছে 'প্লীজ' (please)। যত খুশি নাও। আমি বারে বারে লেমনেড্ ও অরেঞ্জ স্কোয়াসই নিলাম। প্লেনে সারা রাস্তা মাথার ভেতর নানান চিন্তা ঘুরছে, যদি সিয়াট্ল এয়ারপোর্টে কেউ না আসে; কাস্টম্‌স্ থেকে বেরোতে না জানি কত ঝামেলা হবে, ইত্যাদি।

পরদিন সকালে সিয়াট্ল-এ পৌছলাম। কাস্টম্‌স্ থেকে বেরোতে ১০ থেকে ১৫ মিনিট-এর বেশি সময় নিল না। ২।৩টা 'কিউ'—চটচট্ করে লোক এগিয়ে যাচ্ছে। আমাকে শুধু জিজ্ঞাসা করল, কোন কৃষিজাত দ্রব্য (agricultural product) সঙ্গে এনেছি কিনা, কোথায় থাকব, কদিন থাকব। বাস্, ছুটি। 'কাস্টম্‌স্' থেকে বেরোতেই দেখি একটি ওদেশীয় সাহেব-যুবক আমার দিকে এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করছে: "আপনি কি অমর বসাক?" (Are you Amar Basak)। তার হাতে একটা বড় কাগজে বড় বড় হরফে লেখা ছিল—(Amar Basak from Calcutta)কলকাতা থেকে আগত অমর বসাক। যাই হোক আশ্রমের গাড়ি অপেক্ষা করছিল। যুবকটি (Mr Scott-আশ্রমের দীক্ষিত

ভক্ত) আমাকে নিয়ে এল সোজা বেদান্ত সোসাইটিতে। সেদিন ছিল রবিবার। এইদিনে বেলা ১১টায় স্বামী ভাস্করানন্দের বক্তৃতা থাকে। বেশ ভক্ত সমাগম হয়। তারা সঙ্গে করে আনে অনেক রান্না করা খাবার-দাবার। বক্তৃতা শেষে সকলে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করে যে যার বাড়ি চলে যায়। আমি যখন গেলাম, তখন সবে ক্লাস শেষ হয়েছে, একটু পরে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া ও সকলের সঙ্গে কথাবার্তা হল।

এখানকার বেদান্ত সোসাইটির দুটি বাড়ি। একটিতে ঠাকুর ঘর, লাইব্রেরী, বক্তৃতা-হল, রান্নার জায়গা, খাবার ঘর প্রভৃতি রয়েছে। ঠাকুর ঘরটি বেশ প্রশস্ত। শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমার প্রতিকৃতি আর সেইসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের ফটোগুলি বেদীতে সাজানো রয়েছে। প্রত্যহ সকালে পূজা ও সন্ধ্যায় আরতি হয়। আরাত্রিকের গানগুলির, একটি গান শেষ হলেই তার ইংরেজী অনুবাদ সকলে একসঙ্গে পাঠ করে। এ ছাড়া আরতির পর ভক্তেরা ভক্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করে। আরাত্রিকের গান ছাড়া ভক্তরা অন্যান্য গানও শিখেছে, হার-মোনিয়ামযোগে সুন্দর গাইতে পারে। রামনাম করে দেখলে অবাক হতে হয়, ওদেশের লোক কি সুন্দর আমাদের ভাবধারা নিয়েছে। শ্রীযুত স্কট্ (Mr. Scott) আরতির সময় নামাবলী গায়ে জড়িয়ে বসে। মন্দিরে কয়েকটি চেয়ার রাখা আছে, যাদের পায়ে ব্যথা, তারা ইচ্ছা করলে চেয়ারে বসে আরতি দর্শন করতে পারেন।

বক্তৃতা হলে মঞ্চের ওপর শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি সুন্দর ছবি। পাশে বক্তৃতা করবার একটি স্ট্যাণ্ড্। সামনে সারি সারি চেয়ার। এখানেই রামনামও হয়। তাছাড়া, এই হলে সপ্তাহে একদিন সকলে একসঙ্গে ধ্যান করে একঘণ্টা ধরে। ধ্যানের সময় হলের সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। খালি শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে একটি মোমের দীপ নিবাত-নিষ্কম্পভাবে জ্বলতে থাকে। নিস্তব্ধ শান্ত পরিবেশ। এক ঘণ্টা অতীত হবার পর ভাস্করানন্দজী শান্তি পাঠ করে ধ্যানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বেদান্ত সোসাইটির আর একটি বাড়ি ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত—নাম 'বিবেকানন্দ হাউস'। এখানে একতলায় স্বামী ভাস্করানন্দ থাকেন। তাছাড়া এখানেও রান্না করার সব ব্যবস্থাই আছে। দোতলায় অতিথিদের থাকবার ঘর। দুজন ব্রহ্মচারীও দোতলায় থাকেন। বাড়ির তলার ঘরেও (Basement) থাকবার ব্যবস্থা।

আশ্রম থেকে কিছু দূরে একটি নির্জন-আবাস (Retreat)। এদেশের আশ্রমসমূহের প্রায় প্রত্যেকটিরই একটি করে নির্জন-আবাস (Retreat) আছে। সিয়াট্‌ল-এর নির্জন-আবাসটি একটি শান্ত, নির্জন পরিবেশে অবস্থিত। মাঝে মাঝে আশ্রম থেকে সকলে এসে এখানে পাঠ, ঈশ্বর-প্রসঙ্গ প্রভৃতি করেন। ভক্তসমাগম ভালই হয়। খালি হাতে কেউ আসেন না। প্রত্যেকেরই হাতে কিছু না কিছু খাবার।

সিয়াট্‌ল থেকে আশ্রমের গাড়িতে ভাস্করা-নন্দজীর সঙ্গে ভাঙ্কুবর (বি. সি.) যাওয়া হল। কানাডার ভিসা না থাকলে এখানে আসা যায় না। এখানে তিন দিন ছিলাম, এক ভারতীয় ভক্তের বাড়ি। একদিন বক্তৃতা, ধর্মপ্রসঙ্গ ইত্যাদি হল। শ্রীশ্রীঠাকুর-মার সম্বন্ধে ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ সুন্দর বললেন। তারপর আবার সিয়াট্‌ল ফিরে এলাম। সিয়াট্‌ল-এ থাকাকালীন একদিন বিমলদার টেলিফোন পেলাম—"ওখানে বসে কি করছ? তোমার জন্য বসে আছি। এখানে চলে এসো।" পরের

দিনই স্যাক্রামেণ্টোতে আসি। এয়ারপোর্টে নিতে এসেছিলেন স্বামী প্রমথানন্দজী ও মিঃ গ্রীয়ার।

স্যাক্রামেণ্টো—বহু আকাঙ্ক্ষিত স্থান। বিমলদা আমাকে দেখেই 'হ্যালো' বলে সস্নেহ সম্ভাষণ করলেন। খুবই খুশি, আমি এসেছি বলে। বিমলদার শরীর অপেক্ষাকৃত শীর্ণ দেখলাম। তবে এখন পূর্বাপেক্ষা ভাল। বৈকালে অল্পক্ষণের জন্য হলেও, একটু পায়চারি করেন সম্মুখের প্রান্তরে। আমি থাকাকালীন একদিন অল্পক্ষণের জন্য ভাষণ দিলেন,—বিষয়-বস্তু ছিল 'The Lonely Traveller'। ভাষণটি খুবই ভাবোদ্দীপক ও চিন্তাকর্ষক হয়েছিল। এখানে স্বামী প্রমথানন্দজীও ক্লাস নেন, গীতা ব্যাখ্যা করেন। স্বামী গণেশানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত (Gospel of Sri Ramakrishna) পাঠ করেন, সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যায়। ভক্ত-সমাগম ভালই। আমেরিকায় অন্যান্য আশ্রমের মতো এখানেও সাধু ব্রহ্মচারীরা পালা করে রান্নাবান্না ও আশ্রমের অন্যান্য কাজও করেন। ভক্তরাও এসে আশ্রমের কাজে সহায়তা করেন। স্যাক্রামেণ্টো অপেক্ষাকৃত ছোট আশ্রম—কিন্তু পরিবেশ সুন্দর, বেশ নির্জন ও শান্ত।

একদিন 'লেক টাহো' দেখতে পাঠালেন বিমলদা। দূরত্ব একশো মাইলেরও উপর। লেকের কাছ বরাবর দেখলাম—রাস্তার দুদিকে বরফ জমে রয়েছে।—গাছ পালা সবেতেই বরফের আস্তরণ। রাস্তায় দুদিকে চাব্‌ড়া চাব্‌ড়া বরফ। সঙ্গে প্যাকেটে করে দুপুরের খাবার (Lunch packet) ছিল। এক জায়গায় বসে খাওয়া হল। খাবারের টুকরা একটিও মাটিতে না ফেলে, সন্তর্পণে একটি কাগজের ঠোঙায় রেখে, সেগুলি আশ্রমে নিয়ে আসা হল। আমি ভুলক্রমে মাটিতে কিছু অংশ ফেলেছিলাম। আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি এগুলি তুলে নিয়ে কাগজের ঠোঙায় রাখতে বললেন।

স্যাক্রামেণ্টোতে থাকাকালীন বিমলদা একদিন জনৈক ভক্তের গাড়িতে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন স্যানফ্রান্‌সিস্‌কোতে। এখানে রাত্রিবাস করলাম। স্বামী প্রবুদ্ধানন্দজী আশ্রমটি ঘুরে ঘুরে দেখালেন। এখানে লাইব্রেরী, ও সুন্দর বৃহৎ ঠাকুরঘর রয়েছে। ইনি থাকেন নতুন আশ্রমে। পুরানো আশ্রমে পূজ্যপাদ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ স্বামীর প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু টেম্প্‌ল' (Hindu Temple)-এ আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। পরদিন সকালে হিন্দু টেম্প্‌ল ভাল করে ঘুরে দেখলাম। মন্দিরের চূড়ায় ছোট একটি ঘর দেখলাম। এখানেই স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীর পূজার ঘর ছিল। নিচে একতলায় বক্তৃতা ঘর, সেই বক্তৃতামঞ্চ, যেখানে বক্তৃতা দেবার সময় পূজ্যপাদ ত্রিগুণাতীতানন্দজী জনৈক বিকৃত-মস্তিষ্ক যুবকের বোমায় আহত হয়েছিলেন।

সকালের জলখাবার খেয়ে রওনা হলাম। পথে পড়ল 'ওলেমা' কেন্দ্র। অনেকখানি জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছে এই আশ্রম। এখানে দুপুরের আহার শেষ করে পুনরায় রওনা হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে বার্কলে (Berkeley) আশ্রমে এলাম। স্বামী অপরানন্দজী তখন বাইরে ছিলেন। আমরা গাড়ি থেকে নেমে শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন করে, আবার যাত্রা শুরু করলাম এবং সন্ধ্যার একটু আগে স্যাক্রামেণ্টোয় ফিরে এলাম।

স্যাক্রামেণ্টোতে বেশ কিছু দর্শনীয় স্থান আছে। কিন্তু লেক্ টাহোই আমার কাছে সব-চেয়ে ভাল লেগেছে। এখানে ৮।৯ দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতেই পারিনি। পূজনীয় বিমলদার তত্ত্বাবধানে মনের আনন্দে ও আরামে ছিলাম। আমার আমেরিকা ভ্রমণ অত্যন্ত সুখ-কর হবার একমাত্র কারণ, তিনি প্রায় সর্বত্র

আমার আগমনবার্তা জানিয়ে রেখেছিলেন। সব এয়ারপোর্টেই আমাকে নিতে লোক এসেছিল।

বিমলদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম আবার সিয়াট্‌ল-এ। বস্তুতঃ এটাই হয়েছিল আমার আমেরিকা ভ্রমণের হেড্‌কোয়ার্টার। স্বামী ভাস্করানন্দজী আমাকে কত ভাবে যে সাহায্য করেছেন, বলে শেষ করা যাবে না। কোথায় কদিন থাকব, প্লেনের রিজার্ভেশন, প্লেনে বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা—সব ঠিক করে দিয়েছিলেন তিনি।

সিয়াট্‌ল থেকে পোর্টল্যাণ্ড্—'গ্রে হাউণ্ড্' বাসে। আশ্রম থেকে ব্রঃ মুক্তিচৈতন্য বাস-স্টেশনে তুলে দিয়ে এলেন। সিয়াট্‌ল থেকে পোর্টল্যাণ্ড্ যাতায়াত ভাড়া ৩৫ ডলার। বাস স্টেশন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—সুন্দর বসবার ব্যবস্থা। ছোটখাট এয়ারপোর্ট বলে মনে হয়। এখানে একটি মেসিন দেখলাম। এর ভিতর ডলারের নোট ঢুকিয়ে দিলে, মেশিনের অন্য এক জায়গা দিয়ে বেরিয়ে আসবে খুচরো মুদ্রা। নোটটি যদি জাল হয়, তাহলে নোটটি আপনা থেকে বেরিয়ে আসবে।

'গ্রে হাউণ্ড্' বাস যথাসময়ে এল। যাত্রীরা সারিবদ্ধভাবে বাসে উঠল। ড্রাইভার সাহেব টিকিট দেখে দেখে যাত্রীদের বাসে উঠতে দিল। কোন কণ্ডাকটর নেই। যখন সকলে বাসে উঠে গেল, ড্রাইভার সাহেব নিজ সিটে উঠে, একটি হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে দিল। বাসের দরজা আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেল। বাস চলল নিজ 'রুট্' ধরে। এক একটি স্টেশন আসার আগে ড্রাইভার সাহেব মাইক্রোফোনে জানিয়ে দিচ্ছে কোন স্টেশন আসছে। তিনি ধোপ দোরস্ত সুট পরে, 'টাই' বেঁধে গাড়ি চালাচ্ছেন। দেখলে কোন সম্মানিত ব্যক্তি বলে মনে হয়। যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ প্রয়োজন হলে, তাকে 'স্যার' (Sir) বলেই সম্বোধন করছিল।

পোর্টল্যাণ্ড (Portland) পৌঁছলাম। বাস স্টেশনে মিঃ ভোঁস হাজির। গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আশ্রমে আসা গেল। পূজনীয় স্বামী অশেষানন্দজীর সঙ্গে পূর্বে আলাপ ছিল না। কিন্তু ভারি ভাল লাগল তাঁকে। খুব যত্ন করলেন। এই বৃদ্ধবয়সেও তিনি নিজে দুবেলা আরতি করেন। সন্ধ্যার পর 'গসপেল' পাঠ হয়। তিনি মাঝে মাঝে কোন অংশ বিশদভাবে বুঝিয়ে দেন। এ ছাড়া তিনি উপনিষদের ক্লাসও নেন।

পোর্টল্যাণ্ডেও একটি নির্জন-আবাস (Retreat) আছে। একদিন আমাকে নিয়ে গেলেন। তপস্যার স্থান। আমাকে বললেন 'Retreat করবার সময় ভক্তদের কত আগ্রহ, যখন হল, তখন আর থাকবার লোক নেই।' দেখে অবাক হলাম, বৃদ্ধ সাধুটি স্বহস্তে grassmower চালাচ্ছেন। পাশে ব্রহ্মচারী তাঁকে আবর্জনাদি সরিয়ে সাহায্য করছিলেন, কিন্তু তাকে grass-mower চালাতে দিতে চান না।

তিন রাত্রি পোর্টল্যাণ্ডে ছিলাম। এখানে যেসব দর্শনীয় স্থান আছে,—সেসব দেখাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। আবার ফিরে এলাম সিয়াট্‌ল-এ। বাস স্টেশনে আবার ব্রঃ মুক্তি-চৈতন্যকে পেলাম।

এবার আর একটা ঘোরার পালা আরম্ভ হবে। পরের দিনই সকাল ১০টা আন্দাজ প্লেনে লস্ এঞ্জেলস্ রওনা হই। বিকাল ৩টায় পৌঁছে যাই লস্ এঞ্জেলস্। এয়ারপোর্টে গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন স্বামী ভবেশানন্দ। প্রায় ঘণ্টাখানেক গাড়ি চলার পর জিজ্ঞাসা করলাম "আশ্রম আর কত দূর?" উত্তরে মহারাজ বললেন, আমরা এখন হলিউডে যাচ্ছি না। আমরা যাচ্ছি 'ট্রবুকো'

কেন্দ্রে। ওখানে স্বামী স্বাহানন্দজীরও থাকবার কথা। আরও ঘণ্টাখানেক চলার পর 'ট্রবুকো'তে পৌঁছলাম। আশ্রমের পরিবেশ অতি মনোরম। অতি নির্জন। সামনেই দিগন্তবিস্তৃত পর্বতশ্রেণী। মায়াবতীর কথা বার বার মনে হচ্ছিল। এই কেন্দ্রে ছোট ছোট ভিন্ন ভিন্ন বাড়ি। থাকবার জায়গা এক বাড়িতে। অন্য বাড়িতে লাইব্রেরী হল, রান্নার ব্যবস্থা, ডাইনিং হল, বসবার ঘর প্রভৃতি। শ্রীমন্দির আর একটি স্বতন্ত্র জায়গায়। মন্দিরের ভেতরে সামনে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি। গোলাকার প্রশস্ত ঘর। মাটিতে বসবার রবার কুশন্ রয়েছে; বসে ধ্যান করার সুবিধার জন্য। তাতে যাদের অসুবিধা তাদের জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা রয়েছে। মন্দিরের ভেতর এক অপূর্ব অপার্থিব পরিবেশ, ঢুকলেই মনটা স্বতই যেন গুটিয়ে আসে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটোর সামনে প্রদীপ জ্বলছে, অন্য আলো জ্বালা হয় না। প্রথমটা বাইরের আলো থেকে এসে, বসবার জায়গা দেখে নিতে একটু অসুবিধা হয়। সকাল থেকে দূর দূর জায়গা থেকে আসা ভক্তদের ধ্যানে সমাসীন দেখতে পাওয়া যায়।

একদিন এখানে সাউথ ক্যালিফোর্নিয়ার বিখ্যাত 'ল্যাগুনা সি বিচ' (Laguna Sea Beach) দেখতে যাওয়া হল। দুদিকে অনন্ত-প্রসারী সাগরসৈকত—মধ্যে নীল জলরাশির তর্জন গর্জন। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া, তা সত্ত্বেও সাগরসৈকতে কটিবাস মাত্র পরে—তরুণ-তরুণীরা ইতস্ততঃ শুয়ে বা বসে আছে। রোদের দিনে তাদের এটা একটা খুব আকর্ষণের বস্তু। দিন তিনেক 'ট্রবুকো'তে থাকবার পর স্বামী স্বাহানন্দজীর সঙ্গে হলিউড আশ্রমে এলাম। এই আশ্রমের পাশেই 'হাইওয়ে' দিয়ে সতত গাড়ি যাতায়াত করে। এজন্য একটা সোঁ সোঁ আওয়াজ। অবশ্য আশ্রমের ভেতরে বাসভবনে সে আওয়াজ পৌঁছায় না। হলিউড একটি বড় কেন্দ্র। সান্ধ্য-উপাসনায় বেশ ভক্ত-সমাগম হয়। আরাতির আগে থেকেই অনেকে শ্রীমন্দিরে বসে জপ-ধ্যানাদি করে। আরতি করেন এই আশ্রমের কন্‌ভেণ্টের এক ব্রহ্মচারিণী। অতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে আরতি করেন। আরতির পর আরাত্রিকের গান। এই আশ্রমে নিয়মিত বক্তৃতা, আলোচনাদি হয়। স্বামী স্বাহানন্দজী ক্লাস নেন। আমি থাকাকালীন 'ভক্তিসূত্র'র ওপর ক্লাস নিচ্ছিলেন। ক্লাসের পর এদেশের যথারীতি প্রশ্নোত্তরের আসর।

অনেকদিন হল এদেশে এসেছি। জামা গেঞ্জি ময়লা। জামা কাপড় আমাদের দেশী প্রথায় বাথরুমে সাবান দেওয়া চলবে না। এদেশে মেশিনে (washing machine) সব পরিষ্কার করতে হয়। মেশিন চালাতে জানি না। স্বাহানন্দজী জনৈক অন্তেবাসীকে বলে দিলেন, আমাকে সাহায্য করতে। [ক্রমশঃ]

পুস্তক সমালোচনা

সাগরদ্বীপে ছিলাম—স্বামী নিরাময়ানন্দ। প্রকাশক : রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগনা। পৃঃ ৫২, মূল্য ৫ টাকা।

এই অনুপম স্মৃতিচারণগ্রন্থটিতে লোকান্তরের ওপার থেকে লেখক স্বামী নিরাময়ানন্দ মহারাজের কলকণ্ঠধ্বনি ছাপার অক্ষরে ঝর্নাধারার মতো মনের উপর ঝরে পড়ল। কত কম তিনি লিখেছেন, তবু কত বেশি পাঠকহৃদয়কে তৃপ্ত করেছেন। 'সাগর দ্বীপে ছিলাম' মানুষ চেনার অপূর্ব সব কাহিনী—যা একদা সত্যি তাঁর জীবনে ঘটেছিল।

একাধারে সন্ন্যাসী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী স্বামী নিরাময়ানন্দ নিজস্ব শৈলীর স্বাদুতা ও অন্তরঙ্গতায় পাঠকচিত্তের সঙ্গে সেতুবন্ধনে কী অনায়াস নৈপুণ্যের অধিকারী ছিলেন, সেকথা এই স্বল্প পরিসর গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আনন্দোজ্জ্বল প্রকাশে পরিস্ফুট।

শিল্পী বিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তীর আঁকা বেশ কয়টি ছবির মাধ্যমে এই স্মৃতিকথার অনেকগুলি দৃশ্য কল্পনায় অনেক সহায়তা করে। প্রচ্ছদ চিত্রে এ কথামালার অন্যতম সেরা ঈশ্বর মাঝির ব্যক্তিত্ব অকূল সমুদ্রে দৃঢ় হাল-ধরায় সুপরিস্ফুট। লেখকের ভাষায়—"সত্যি, নৌকার হাল ধরা দেখেছি ঈশ্বর মাঝির! যদি ক্যামেরা থাকত ছবি তুলে রাখতাম। আর ভাস্কর হলে তার সেই কষ্টিপাথর রঙের পেশীপুষ্ট হালধরা চেহারাটি কুঁদে রাখতাম। কী তার দৃঢ়নিবদ্ধ একাগ্র দৃষ্টি! কারো কোন কথায় ভ্রূক্ষেপ নেই, তখন সে যেন দুরন্ত ভবনদীর কাণ্ডারী, এতগুলি প্রাণীর জীবনরক্ষার ভার তার হাতে। বাঁক কেটে গেল, তখন শুনেছি সেই কথামৃতের ঢঙে বলা 'নে এখন তামাক সাজ'।" (পৃঃ ৪১)

সাগরদ্বীপে স্বামী নিরাময়ানন্দজী চার বছর সেখানকার আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। সাগর অঞ্চলের নানা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ঘটেছে এবং ভারতবর্ষের দীনতম সাধারণ মানুষের মধ্যে যে মনুষ্যত্বের মূল উপাদান-গুলি নিহিতভাবে ক্রিয়াশীল তা হৃদয় ও মস্তিষ্ক দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। মানুষ চেনার সহজাত শক্তি নিয়ে তিনি ওই অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন, সেই দেখার ফসল 'সাগরদ্বীপে ছিলাম' গ্রন্থে অজস্র চরিত্রের নব নব আবিষ্কার। সেই সঙ্গে পল্লীগ্রামের নিভৃততম অঞ্চলে অর্থনৈতিক, সমাজ-নৈতিক, শিক্ষাগত, আধ্যাত্মিক নানা দিকে সমুন্নতির দিক থেকে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এককালীন আংশিক ইতিহাস।

সাগরদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের স্রষ্টা ছিলেন স্বামী ইষ্টানন্দ—যিনি এ অঞ্চলের উন্নয়নের পরিকল্পনা করেন এ আশ্রমকে কেন্দ্র করে। কিছুটা তাঁর কথাও এসেছে গ্রন্থে।

একদিকে ভয়াল অরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে মানুষের বসতি স্থাপনের ইতিহাস, আর একদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের অক্লান্ত প্রয়াস—এ দুয়ের পটভূমিতে মানবপ্রেমিক 'নরনারায়ণে'র পূজারী স্বামী নিরাময়ানন্দজী এমন এক আনন্দঘন স্মৃতিকথা রচনা করে গেছেন, যা সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে অনন্য। প্রকাশক এজন্য অজস্র সাধুবাদের যোগ্য।

—ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

প্রাপ্তি-স্বীকার

রবীন্দ্রমানসে বাঁশী—শ্রীকৃষ্ণ : লেখক : শ্রীঅতুলচন্দ্র নিয়োগী, প্রকাশক : শ্রীউত্তমকুমার রায়, শ্রদ্ধা প্রকাশন, এ. ই. ১৩১ বিধান নগর, কলিকাতা-৭০০০৬৪, পৃঃ ৪০, মূল্য : ছয় টাকা।

আমি যদি জবা হতাম : গীতিকার : শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রকাশিকা : শ্রীমতী অঞ্জনা ভট্টাচার্য, ৩৯/১, জয়নারায়ণ ব্যানার্জি লেন, কলিকাতা-৭০০০৩৬, পৃঃ ৩৮, মূল্য : ছয় টাকা।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে গত ১০ থেকে ১২ অক্টোবর প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে সুসম্পন্ন হয়। আবহাওয়া মোটামুটি ভাল থাকায় পূজার কয়দিন প্রচুর জনসমাগম হয়। পূজার দিনগুলিতে ভক্ত নরনারীকে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রগুলিতেও প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে: আগরতলা, আসানসোল, বালিয়াটি, বারাসত, বরিশাল, বোম্বাই, কাঁথি, শেলা, (চেরাপুঞ্জী) ঢাকা, গুয়াহাটি, হবিগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, লখনৌ, মালদহ, মরিশাস, মেদিনীপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, রহড়া, শিলং, শিলচর, শ্রীহট্ট ও বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা-শতবার্ষিকী-উৎসব

গত ১৮, ১৯ এবং ২১ অক্টোবর ১৯৮৬, **বেলুড় মঠে** রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা-শতবার্ষিকী-উৎসব বিশেষ পূজা, হোম, অখণ্ড জপ, অখণ্ড পাঠ ও ভজনের মধ্য দিয়ে পালিত হয়। এই উপলক্ষে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণের জন্য অনুষ্ঠিত একটি সভায় সঙ্ঘের আদর্শ ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে আলোচনা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের স্মৃতিচারণ করেন সঙ্ঘের প্রাচীন সন্ন্যাসিগণ। 'জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ' নামে একটি সংস্কৃত নাটকও ব্রহ্মচারী শিক্ষণ কেন্দ্রের ব্রহ্মচারিগণ কর্তৃক ঐ উপলক্ষে অভিনীত হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রগুলিতেও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা-শতবার্ষিকী-উৎসব পালিত হয়েছে: বালিয়াটি, মরিশাস, কালাড়ি, দিনাজপুর, ব্যাঙ্গালোর। তাছাড়া প্রথম পর্যায়ে এই উৎসব পালিত হয়েছে সরিষা, চিঙ্গেলপুট্টু, মহীশূর, পুনে, খেতড়ি, বলরামমন্দির, কোয়েম্বাটোর, সালেম এবং ইন্স্টিট্যুট্ অব্ কালচার-এ।

ভক্ত-সম্মেলন

গত ২৮ অক্টোবর ১৯৮৬, **সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে** ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক ভক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম, পাঠ, ভজন, লীলাগীতি, ধর্মপ্রসঙ্গ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ ছিল। ভক্তসমাবেশে ধর্মালোচনা করেন স্বামী নির্জরানন্দ ও স্বামী প্রমেয়ানন্দ এবং স্বামী পরেশানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এই সম্মেলনে প্রায় ৪০০ ভক্ত যোগদান করেন।

যুবসম্মেলন

কালাড়ি রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম গত ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, এক যুব-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে প্রচুর সংখ্যক যুবপ্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণ অংশ গ্রহণ করেন।

দ্বারোদ্ঘাটন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গত ১ অক্টোবর, ১৯৮৬,

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ রাঁচি

কেন্দ্রের (স্যানাটোরিয়াম্) নবনির্মিত অ্যাড্-মিনিস্ট্রেটিভ্ ব্লকের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী **বারাণসী সেবাশ্রম কেন্দ্রে** বৃদ্ধ সাধুদের থাকার জন্য সাধু নিবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

গত ২ অক্টোবর **রাঁচি মোরাবাদী আশ্রমে** রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ কৃষিবিষয়ক ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী সম্বলিত একটি জাদুঘরের উদ্বোধন করেন।

ছাত্রকৃতিত্ব

গত ১ অক্টোবর **নয়া দিল্লীতে** 'গ্রীন্ রেভলিউশন্ অ্যাণ্ড আওয়্যার ফিউচার' বিষয়ে যে জাতীয় সেমিনার হয়; তাতে মহীশূর,নরোত্তম নগর এবং পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ১ জন করে ছাত্র যুগ্মভাবে ২য় স্থান অধিকার করে।

গত ১ থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত **নয়া দিল্লীতে** অনুষ্ঠিত ফুটবল প্রতিযোগিতায় 'অল ইণ্ডিয়া সুব্রত মুখার্জি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ১৯৮৪'-র রানারস্ কাপটি লাভ করেছে—আমাদের আলং (অরুণাচল) স্কুলের ছাত্ররা। ছাত্রদের এই সাফল্যে স্কুলের খেলাধূলার উন্নতিকল্পে অরুণাচল সরকারের শিক্ষামন্ত্রী আলং স্কুলকে এক লক্ষ টাকা উপহার দেন।

দেহত্যাগ

স্বামী ভূদেবানন্দ (ভূপেন মহারাজ) গত ৮ অক্টোবর ১৯৮৬, সকাল ৭-৩৫ মিনিটে যকৃতের রোগে আক্রান্ত হয়ে ৬৬ বছর বয়সে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

স্বামী ভূদেবানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর-এ যোগদান করেন এবং যথাসময়ে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যোগদানের কেন্দ্র ছাড়াও তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চেরাপুঞ্জী, কনখল, শ্যামলাতাল এবং উদ্বোধন কেন্দ্রে বিভিন্ন সময়ে কর্মী ছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি বেলুড় মঠে অবসর জীবনযাপন করছিলেন। শান্ত স্বভাব, অনাড়ম্বর ও কৃচ্ছ্র সাধু জীবনের জন্য তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

স্বামী কীর্তনানন্দ (কমল মহারাজ), গত ২০ অক্টোবর ১৯৮৬, রাত ৯-৫০ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৫৭ বছর বয়সে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯ অক্টোবর পেটে ব্যথা অনুভব করায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু পরের দিন হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

স্বামী কীর্তনানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন শিলচর কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর গুরুর কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যোগদানের কেন্দ্র ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভুবনেশ্বর, বোম্বাই, পুরুলিয়া, করিমগঞ্জ, বাঁকুড়া, জয়রামবাটী এবং মালদহ কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন।

হৃদযন্ত্রের অবস্থার অবনতির জন্য কাজ থেকে অবসর নিয়ে গত আড়াই বছর যাবৎ তিনি কাশীপুর মঠে বাস করছিলেন। সরল ও হাসি-খুশি স্বভাবের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

তাঁদের দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায় মহাষ্টমীর দিন বিশেষ পূজা ও হোম প্রভৃতি হয়। পূজার তিনদিনই অগণিত ভক্তনরনারীর মধ্যে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

১ নভেম্বর রাত্রে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে ভাবগম্ভীর পরিবেশে শ্রীশ্রীকালীপূজা সুসম্পন্ন হয়। পরদিন সকালে বহু ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

[বি]বিধ সংবাদ

প্রতিষ্ঠা দিবস

গত ২৭ থেকে ৩০ অগস্ট ১৯৮৬ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ পদার্পণধন্য শ্যামপুকুর বাটীতে (কলিকাতা) শ্যামপুকুর বাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সংঘের নবম প্রতিষ্ঠা দিবস ধর্মীয় আলোচনা ও ভক্তিমূলক সঙ্গীতাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

রজতজয়ন্তী ও মন্দির প্রতিষ্ঠা

গত ৫ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ পর্যন্ত গোয়ালিয়র শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের রজত জয়ন্তী ও মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব সমারোহের সঙ্গে পালিত হয়। ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ ছিল মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন। ঐদিন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ বহু সাধু ও ভক্তের উপস্থিতিতে নব-নির্মিত মন্দিরের দ্বার উন্মোচন করেন ও মন্দিরমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। পূজা, হোম, ভজন, ধর্মসভা প্রভৃতি ছিল উৎসবের অন্যান্য প্রধান অঙ্গ।

বরানগর মঠের শতবার্ষিকী উৎসব

গত ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, 'বরানগর মঠ সংরক্ষণ সমিতি'র উদ্যোগে বরানগর মঠের শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির পর বরানগরের প্রামাণিক ঘাট রোড-স্থিত একটি পুরানো বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয় ও সেখানেই ভাবী শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মঠ-স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ ধারণ করে। এই পুরানো বাড়িটি পরে 'বরানগর মঠ' নামে পরিচিতি লাভ করে।

উৎসব উপলক্ষে দুই দিনই শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম হয়। ১৩ তারিখ সকালে রামচরিতমানসের পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী পুরাণানন্দ। ১৪ তারিখ সকালে স্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। ১৩ ও ১৪ তারিখ বিকালের ধর্মসভায় বরানগর মঠের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী নির্জরানন্দ, স্বামী রমানন্দ, ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার, স্বামী প্রমেয়ানন্দ, স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ ও স্বামী প্রভানন্দ। ১৪ তারিখ সন্ধ্যায় 'ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র' গীতিনাট্য পরিবেশিত হয়। উৎসব উপলক্ষে 'শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের হোমকুণ্ড বরানগর মঠ' নামে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করা হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য সুধীন্দ্রমোহন দে গত ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, ভোর ৪-৪৫ মিনিটে ৭৪ বছর বয়সে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রয়াত দে শ্রীশ্রীঠাকুরের চারজন সন্ন্যাসী-শিষ্যের পূত সংস্পর্শ ও তাঁদের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা অরুণা দেবী গত ২৬ অক্টোবর ১৯৮৬, ৭৬ বছর বয়সে তাঁদের দক্ষিণ কলিকাতার বাস ভবনে পরলোকগমন করেন। তাঁর গুরু ছাড়াও তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসী-শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী, শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী এবং শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজীর পূত-সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন।

তাঁদের পরলোকগত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক—এই প্রার্থনা।

—বিশেষ দ্রষ্টব্য—

* অতঃপর বর্তমান পৃষ্ঠাসংখ্যা নিচে।
* পুনর্মুদ্রিত অংশের পৃষ্ঠাসংখ্যা উপরে।

২য় বর্ষ, ১৭শ—১৮শ সংখ্যা ● কার্তিক ১৩০৭ (পৃষ্ঠা ৫৩৫—৫৫২)

সূচী :

হে জ্ঞানিন্! যদি অনুরাগের সহিত সুধু ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের জন্য, তুমি শাস্ত্র বা যুক্তির আশ্রয় লইয়া থাক, তবে তোমাকে সাধুবাদ দিতেছি। আমিও যে শ্রুত্যনুকূল যুক্তিপথের পথিক। কিন্তু বিদ্যা ফলাইবার বাসনায়, যদি তুমি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" ব্রহ্মের সত্তাপ্রমাণে অগ্রসর হইয়া থাক, তবে তোমাকেও দয়ার পাত্র মনে করিব।

যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত বিচার প্রণালীতে আমরা দেখিয়াছি, এ সৃষ্টিতত্ত্বের মূল কারণ এক প্রকার অজ্ঞেয়। সুতরাং, স্পেনছাবের অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism) বা কপিলের নিরীশ্বরবাদ আসিয়া পড়িতেছে। আস্তিক! তুমি হতাশ হইও না। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিগুলি তোমার অনুকূলেই উপস্থাপিত হইয়াছে। ঐ দেখ, বৈজ্ঞানিক বাহ্যজড়শক্তির সমীকরণে অসমর্থ হইয়া, নিজের অজ্ঞতা ও ধৃষ্টতা বুঝিয়া বলিতেছে, "I am collecting the pebbles only", আমি জ্ঞানসমুদ্রের তীরে কতিপয় উপল সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র। দার্শনিক অণিমাদি মহাশক্তি লাভ করিয়াও বলিতেছেন, "ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষঃ।" নিজের অজ্ঞতার দিকে উভয়েরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। উভয়েই হতবুদ্ধি হইয়াছে। উভয়েই বুঝিয়াছে, "ইহা কারণ নহে", "ইহা কারণ নহে"—"নেতি", "নেতি।" প্রত্যক্ষে বা অনুমানে যাহা যাহা জগৎ-কারণ বলিয়া দৃষ্ট বা অনুমিত হইতেছে, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তখনি বুঝিয়াছেন, "নেতি" "নেতি"। এই আত্ম-অজ্ঞতাই আত্মজ্ঞানের উদ্ভাসক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "যস্যামতং তস্যমতং", "বিজ্ঞাতমবিজানতাম্", প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের সাক্ষীরূপে তাহারা দণ্ডায়মান হইতেছেন। উভয়েই সৃষ্টিতত্ত্ব ছাড়িয়া অনন্ত ব্রহ্মতত্ত্বে অবগাহনোন্মুখ হইয়াছেন। দেশ, কাল নিমিত্তের অলীক পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। আর মুখে কেবল "নেতি" "নেতি"। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বুঝিয়াছেন, যে সৃষ্টি-রহস্য-ভেদে এত গ্রন্থ লিখিলাম, এখন দেখি সে সৃষ্টিই নাই। এক অখণ্ড চৈতন্য আমিই দিক্ দেশ কাল ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি। বেদমুখে তাই ঋষি গাইতেছেন :—

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

সমালোচনা।

১। "দি প্যাসটোরাল শ্রীকৃষ্ণ" (অর্থাৎ রাখাল শ্রীকৃষ্ণ)।

২। "শ্রীকৃষ্ণ দি কিং মেকর" (অর্থাৎ রাজকর্ত্তা-শ্রীকৃষ্ণ)।

১৩০৪ এবং ১৩০৬ সালের জন্মাষ্টমী দিবসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজ সহরে ইংরাজী ভাষায় দুইটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। সেই দুই বক্তৃতা উক্ত দুইখানি পুস্তিকাকারে তদীয় মাদ্রাজী

কার্ত্তিক, ১৩১৩ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

(অগ্রহায়ণ, ১৩১৩, পৃঃ ৭২১)

শিষ্যগণ বাহির করিয়াছেন। প্রথমটী "ট্রীপ্লিকেন লিটারারী সোসাইটীতে" এবং দ্বিতীয়টী "এগ্‌মোর রিডিং রুমে" দেওয়া হয়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মান্দ্রাজস্থ রামকৃষ্ণমিশনের মঠের অধ্যক্ষ। ইনি একজন সুশিক্ষিত সন্ন্যাসী।

প্রথম বক্তৃতায় শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা এবং দ্বিতীয়টীতে তাঁহার মথুরা ও পাণ্ডব-লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত মতে করিয়াছেন এবং অতি সুন্দর হইয়াছে। গোপীলীলা অতি সাবধানে লিখিত, সকলেই অনায়াসে সন্তোষের সহিত পাঠ করিতে পারেন। ভাষা অতীব সুন্দর, ইসপস্ ফেবলের সারল্য, এরেবিয়ান নাইটের মাধুর্য্য এবং লাইফ্ অফ্ বোনাপার্টের লোমহর্ষণ ঘটনাবলীর চিত্র, বক্তৃতাদ্বয়ে একত্র সমাবিষ্ট দেখিতে পাইবেন। নভেল-নাটক না পড়িয়া, এইরূপ গ্রন্থ পাঠ করিলে ভাষাও শিক্ষা হয়, গল্পও পড়া হয়, এবং স্বদেশের প্রাচীন পুরাণাদির এবং সহজ সহজ ধর্ম্মতত্ত্বেরও চর্চ্চা করা হয়। মূল্যও অতি যৎসামান্য—চারি আনা করিয়া এক এক খানি; "ব্রহ্মবাদিন আফিস, ট্রীপ্লিকেন, মান্দ্রাজ", এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

প্রকাশকগণ দ্বিতীয় সংস্করণে, বক্তৃতাগুলির একটু সূচীপত্র যেন করিয়া দেন। দুঃখের বিষয় বক্তৃতাগুলিতে মধ্যে মধ্যে হেডিং মাত্রও করিয়া দেওয়া হয় নাই। এ সকল গ্রন্থকার না করিলেও, প্রকাশক বা সম্পাদকের একান্ত কর্ত্তব্য।

প্রাপ্তি স্বীকার।

বড়বাজার নিবাসী, উদ্বোধনের জনৈক গ্রাহক শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল সেঠ মহাশয় কিষেণগড় অনাথাশ্রমের সাহায্যের জন্য, এক কালীন ৫০৲ টাকা দান করিয়া আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন।

ভগবদ্গীতা-শঙ্করভাষ্যানুবাদ

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত)

[গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ১৮ সংখ্যক ভাষ্যের শেষাংশের অনুবাদ এবং ১৯, ২০, ২১ সংখ্যক শ্লোকের মূল, অন্বয়, মূলের অনুবাদ, ভাষ্য ও ভাষ্যের অনুবাদ এবং ২২ সংখ্যক শ্লোকের মূল, অন্বয়, মূলের অনুবাদ, ভাষ্য ও ভাষ্যের অনুবাদের প্রথমাংশ—বর্ত্তমান সম্পাদক।]

উদ্বোধন

২য় বর্ষ।] ১৫ই কার্ত্তিক। (১৩০৭ সাল) [১৮শ সংখ্যা

বঙ্গ-যুবকের প্রতি।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখিত।)

হে বঙ্গ-যুবক,
কর অবধান—
ভবিষ্য ভরসা তুমি জগতের ;
এই মোহ সাজে কি তোমারে ?
কভু সুখ-প্রলোভনে মোহিত অন্তরে,
কভু বা কলহ-বশে, কাল গোঁয়াইছ রসে,
এ ভাব কি সাজে হে তোমারে ?
এই মোহ সাজে কি তোমারে ?
তুমি হে অনন্ত শক্তিধর,
সর্ব্বশক্তি তোমার ভিতর,
ব্রহ্মাণ্ড এ ভাণ্ডের ভিতর,
এই মোহ সাজে কি তোমারে ?
ভারতের সব গেছে—গেছে তন্ত্র বেদ,
গিয়াছে বাল্মীকি ব্যাস—কিবা তাহে খেদ ?
জাগাও হৃদয়-তন্ত্র, জপ স্বার্থত্যাগ-মন্ত্র,
হও ঋষি—মন্ত্রদ্রষ্টা—ত্যজি ভেদাভেদ।
ক্ষুদ্র দৃষ্টি ভুলে গিয়ে, মাত সে ভূমারে লয়ে,
ইন্দ্রিয়-অতীত যেবা, নাহি যাহে ক্লেদ।
ভারতের প্রাণ ধর্ম্মের কৌটায়,
ধর্ম্ম-নাশে ভারতের প্রাণ যায়—
ধর্ম্ম-উদ্দীপনে পুন সমুদয়।

তাই বলি,—
উড়াও ত্যাগের ধ্বজা, জগতের পাবে পূজা,
ত্যাগ সর্ব্ব-সদ্গুণ-আলয়,
ত্যাগেরে ত্যজিলে হায়, ত্যক্ত সমুদয়।
ছাড় কন্যা পুত্র প্রিয়া, ছাড় পিতা মাতা মায়া,
ছাড় বন্ধু, ছাড় ভ্রাতা, ছাড় ছাড় অন্য কথা,
পরিবার সুখ শান্তি সময় এ নয়।

(অগ্রহায়ণ, ১৩১০, পৃঃ ৭২৩)

কোটি কোটি ভগ্নী ভ্রাতা মরে অনাহারে,
কে আছ হৃদয়বান্, হও হও আগুয়ান—
একটী বোনের কিম্বা ভ্রাতার উদ্ধারে।
এক অঙ্গ পুষ্টি হয়, আর অঙ্গ পায় ক্ষয়,
পুষ্টি নয়, ভিষকেরা রোগ তাকে কয় ;
ধনিক যুবক কেহ, শিক্ষিত বলিষ্ঠ দেহ,
পাশে তার ক্ষীণ ভ্রাতা, পাশে তার শীর্ণা মাতা,
রোগশোকে ক্ষুধাবশে মরে দলে দলে ;—
—আছে কি ঈশ্বর কেহ দয়ার শরীর,
যার রাজ্যে এই সব হয় অনাচার,—
স্বাধীনতা আশে কেহ ঝরায় রুধির,
স্বার্থপর করে কেহ বিজয়-হুঙ্কার ?
নাহিক ঈশ্বর হেন শূন্যে স্বর্গোপরে,
মেঘমন্দ্রে কিম্বা সেই বর্জের ঘর্ঘরে।
শোভাময়ী বিদ্যুল্লতা, নাই তথা নাই তথা,
নাই অগ্নি কিম্বা বনস্পতির ভিতরে,
অথবা সে হিমালয়-নিভৃত-কন্দরে।
হে বঙ্গ যুবক,
তোমার ভিতরে তাঁর মহিমা-বিকাশ,
স্বার্থ-ত্যাগ, দয়ারূপে যাঁহার আভাস।
হৃদয়ে মহান্ কর, বৈরাগ্যের বেশ ধর,
এস দলে দলে, শীঘ্র ব'বে সুবাতাস—
ঘুচিবেক জননীর দীর্ঘ হা হুতাশ।

যাও,
ভুখে দাও অন্ন, পিয়াসীরে দাও জল,
বিদ্যাহীনে দাও বিদ্যা, জ্ঞানহীনে জ্ঞান,
দেখাও চরিত্র-বল, জিনিবে পাশব-বল,
ধর্ম্মতেজে জিনিবে হে, বিজয়ীর দলে—
রহিবে অক্ষয় যশ তব ধরাতলে।
ধর্ম্মের বিস্তার কর শুভাশিষ সনে,
সকলে অভয় দাও, হিংসারে বিদায় দাও,
আর যাহা প্রয়োজন আসিবে আপনি,
হাসিবে পুলকে পুন হাসিবে জননী।

(৮৮তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, পৃঃ ৭২৪)

তাই বলি হে বঙ্গ-যুবক!
উঠ নব অনুরাগে,
দেশের ভরসা তুমি, দরিদ্র-সম্বল,
দেখাও দেখাও তব ত্যাগ-মন্ত্র-বল—
যেন পুন এ ভারত জাগে।
জাগিলে ভারত, জগৎ জাগিবে—
ভারতের আলো গগন ছাইবে।

জাতীয়ত্ব-বোধ।

[পূর্ব্ব সংখ্যায় ৫৩২ পৃষ্ঠার পর]

আমাদিগের জাতীয়ত্ব-বোধ নাই বলিয়াই—সমগ্র দেশের যাবতীয় লোকের পরস্পর পরস্পরের কদর ও একান্ত আবশ্যকতা আমরা কেহ বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই—পরস্পর পরস্পরের সহিত যে কি নিকট সম্পর্ক তাহা আমাদিগের দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করা নাই বলিয়াই—দেশে এত ভেদাভেদ জ্ঞান, এত ছোট বড় জ্ঞান, এত তুচ্ছজ্ঞান, ও আত্মাভিমান; এবং সেই কারণবশতঃই আমাদিগের ভিতর এত ঘনিষ্ঠতার, আত্মীয়তার ও একতার অভাব; এবং আমরা সেই একতারূপ বৃহৎ কল্পতরুমূলে নাই বলিয়াই দেশের এত দুর্দ্দশা, এত বিশৃঙ্খলতা ও এত ভূয়োভূয়ঃ অনিষ্ট-সম্পাত!

আমরা জানিনা যে, দেশের সকল শ্রেণীর লোকই আমাদিগের একান্ত আবশ্যক—তা মুখ্য ভাবেই হউক, আর গৌণভাবেই হউক, সম্যক্ ভাবেই হউক, আর প্রকারান্তরেই হউক। আমরা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না যে, দেশের যত লোক বা দ্রব্য সমস্তই আমাদের। আমাদের দ্রব্য, আমাদের লোক, আমাদের দেশ, আমাদের জাতি, আমাদের আচার ব্যবহার, সকল বিষয়েই আমাদেরত্ব—আমাদের বলিয়া টান—নাই, এই জন্যই এত জাতীয়ত্বের অভাব। আমাদিগের বলিয়া জ্ঞান না আসিলে কোন বিষয় রক্ষা বা যত্ন করিতে ইচ্ছা হয় না।

যেমন "তুমি আমার, আমি তোমার"—এইরূপ জ্ঞান না হইলে বিশুদ্ধ প্রেম লাভ হয় না। তেমনি, 'দেশ আমাদের, আমরা দেশের', এইরূপ জ্ঞান না থাকিলে প্রকৃত ও মহাপবিত্র জাতীয়ত্ব-বোধ উদিত হয় না। আমরা কেহ, কেবল মাত্র নিজের জন্য নহি; নিজের জন্য কতটুকু?—যতটুকু একান্ত না হইলে, পরের উপকারে আসিতে পারিব না। নিজেকে দেখি কেন—নিজেকে রক্ষা করি কেন? পরকে দেখিব বা রক্ষা করিব বলিয়া। নিজের জন্য করি কেন?—পরের জন্য যদি কিছু করিতে পারি। পরের জন্য করাই—শ্রেষ্ঠ 'করা'; পরকার্য্য—শ্রেষ্ঠ কার্য্য; 'পর' মানেই—শ্রেষ্ঠ। যে হৃদয়, পরের জন্য প্রশস্ত হয় নাই, সে হৃদয়ে পরব্রহ্মের ছায়া পড়ে না; 'পর' মানেই—ব্রহ্ম। ক্রমশঃ অগ্রসর না হইলে কি রূপে 'দূর' নিকট হইবে? আগে নিকটস্থদিগের সেবা করিয়া, চতুঃপার্শ্বস্থদিগের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া, হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা ও নিজের স্বার্থপরতা ত্যাগ করিতে অভ্যাস করি; সকলকে আপনার ভাবিয়া, নিজের পরমাত্মীয়

বোধ করিয়া, পরম স্নেহপূর্ণনেত্রে দেখিতে আগে অভ্যাস করি ; তবে ত সেই হৃদয় পবিত্র হইবে, সেই নয়ন নির্ম্মল হইবে ; এবং তবেই ত, সেই নয়ন "দূরাৎ দূরতরম্"কে অতি সন্নিকটেই দেখিতে পাইবে ; এবং তবেই ত সেই হৃদয়, সেই "মহতো মহীয়ান্"এর সহিত নিজের আত্মার একত্ব অনুভব করিতে পারিবে।

ভারত যেন একটী বৃহৎ বপু। হিমালয় ইহার শির ; পূর্ব্ব ও পশ্চিমাঞ্চল ইহার সুবৃহৎ হস্তদ্বয় ; আর্য্যাবর্ত্ত ইহার হৃৎমণ্ডল ; মধ্যদেশ—যেন দেহের অতি সুন্দর অধোভাগ ; এবং দক্ষিণাঞ্চল যেন ইহার পুণ্যময় পাদদেশ।

পাশ্চাত্য দেহতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, জীবন-ধারণের জন্য—তিনটী একান্ত আবশ্যকীয় বস্তু ; যথা, রেসপিরেশন (অর্থাৎ প্রাণবায়ুর ক্রিয়া), নার্ভাস-সিসটেম অর্থাৎ স্নায়ুমণ্ডলী, এবং ব্লাড সার্কুলেশন অর্থাৎ শোণিত-প্রবাহ। এই তিনটী বিষয়ের মধ্যে পরস্পর সুন্দর সম্বন্ধ। একটীর অভাবে অপর দুইটী অত্যন্ত অনর্থক, এবং মৃত্যু অনিবার্য্য। জীবন-ধারণ করিতে হইলে, ভারতেরও পক্ষে, তদ্রূপ, তিনটী ব্যাপারের প্রধান প্রয়োজন,—আত্মীয়তা, একতা, ও সম্মিলন। একতা—যেন ভারতের প্রাণবায়ু। আত্মীয়তা—যেন ইহার স্নায়ুমণ্ডলী, এবং পরস্পর সম্মিলন—যেন ভারতের শোণিত প্রবাহ। এই তিনটীর মধ্যে কোন একটীর বিশেষ ক্ষতি হইলেই জানিবেন—ভারতের জীবন-সংশয়।

শোণিত যেমন শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক, ভারতের জাতীয় সম্মিলনেরও তদ্রূপ স্বার্থশূন্য ও অতিপবিত্র হওয়া প্রয়োজন ;—সম্মিলনের সমিতি কোথাও উপস্থিত হইলে কোনও সভ্যের হৃদয়ে দেশ-ভ্রমণ; হাওয়া পরিবর্ত্তন, নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য, যশ বা অর্থ, প্রভৃতি কোন প্রকার স্বার্থ-মলিনতা না থাকে। শোণিত যেমন প্রাণ বায়ুর স্পর্শে শুদ্ধ হইয়া শরীর পুষ্টি ও রক্ষার্থে স্ব স্ব স্থানে প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ, আমরা সকলেও যেন একতা-ভাবে ভাবিত হইয়া অতি শুদ্ধান্তঃকরণে সাধারণের মঙ্গলার্থ স্বস্বক্ষেত্রে ধাবমান হই। দ্বেষ,হিংসা, আলস্য, বা কোনও প্রকার স্বার্থ হইতেছে দূষিত বায়ু ; ইহারা প্রকৃত প্রাণ-বায়ু নহে, প্রাণ বা জীবন রক্ষার্থ সাহায্য করিতে পারে না। আমরা যেন সে সকল মলিন বায়ু সেবন না করি। অন্তরস্থ যাবতীয় মলিনতা, যেন সেই শোণিত-পাবক প্রাণবায়ু স্পর্শে, যেন সেই শক্তিসঞ্চারক ও পরমশুভদায়ক একতা-ভাবের সংসর্গে নিঃশেষ-ভাবে বহির্ভূত হইয়া যায়। চরক ঋষি শরীরস্থ বায়ু সম্বন্ধে এক স্থলে বলিতেছেন, "বায়ুরেব স ভগবান্"। একতাই যেন ভারতের পতিতপাবন-ভগবানের স্বরূপ হইতে পারেন ; আমরা যেন সেই একতার শরণাগত হইতে ক্রটী না করি।

আমাদের যেন বিশেষ স্মরণ থাকে, একতাই দেশের প্রাণবায়ু ; আত্মীয়তা—স্নায়ুমণ্ডলী ; সম্মিলন—শোণিত-প্রবাহ ; এবং আমরা যেন সেই শোণিতের সারভূত জীবাণু (corpuscles)। শরীরের কোনও স্থলে একটু সামান্যও কোনও আঘাত লাগিলে, যেমন ইনফ্লামেশন্ (প্রদাহ প্রভৃতি) হয় অর্থাৎ স্থানীয় শোণিতাণু সমূহ যেমন তৎক্ষণাৎ রণ-সাজে দ্রুতবেগে আসিয়া উপস্থিত হয়, তদ্রূপ ভারত-দেহের কোনও অংশে কিছু আঘাত লাগিলেই যেন তৎক্ষণাৎ চতুঃপার্শ্বস্থ অধিবাসীগণ রক্ষার্থ দণ্ডায়মান হন।

(৮৮তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, পৃঃ ৭২৬)

যেমন একটি অঙ্গুলিতে বিশেষ আঘাত লাগিলে, সমবেদনাবাহক স্নায়ুর অস্তিত্ববশতঃ, অপর অঙ্গুলিগুলি তৎক্ষণাৎ অস্পন্দ বা আড়ষ্ট হয়; যেমন দেহের কোনও স্থানে ভয়ানক আঘাত প্রাপ্ত হইলে, পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি হইতে শিরের কেশ পর্য্যন্ত বেদনা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, ভারতের কোনও অংশে আপদ বিপদ উপস্থিত হইলে, যেন কুমারিকা হইতে হিমাদ্রি-শিখর পর্য্যন্ত সমবেদনায় কম্পমান হইয়া উঠে। এইরূপ আত্মীয়তা যেন ভারতে দৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। স্নায়ু-মণ্ডলী যত দৃঢ় হইবে, শরীর তত বলিষ্ঠ হইবে। পরস্পর আত্মীয়তা যত পরিপক্ক হইতে থাকিবে, ভারতও তত সুস্থ ও বলবান্ হইতে থাকিবেন।

জাতীয়তার অপর এক নাম 'আত্মীয়তা' দিলে বোধহয় কিছু ক্ষতি হয় না। আত্মীয়তার স্থাপন ও রক্ষণেই জাতীয়তার স্থাপন ও রক্ষণ। লোকের খবরাখবর লইলে, আপদ-বিপদে সাহায্য করিলে, সুখ-দুঃখের ভাগী হইলে, লোকের সহিত মিষ্ট আলাপন করিলে, ও দোষ ঢাকিয়া গুণ গ্রহণ করিলেই, আত্মীয়তা স্থাপিত হয়; এবং সেইটী নিঃস্বার্থ হৃদয়ে অন্তরের সহিত রক্ষা করিয়া আসিলেই অতীব মঙ্গলকর ও সুখদায়ক হয়। তাহা না করিয়া আমরা কেবল লোকের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াই; বড়লোক, ধনীলোক, বা গুণীলোকের, কোনও প্রকারে (না থাকিলেও) দুটা দোষ পাঁচজনের সমক্ষে বা কাগজপত্রে বাহির করিতে পারিলেই, যেন নিজের পাণ্ডিত্য ও স্পর্দ্ধা মনে করি; কাহারও গুণ গাহিতে যেন নিজের অবমাননা মনে করি। কাহাকেও কিছু দিব না, বরং কিসে লোকের নিকট হইতে দু পয়সা লইব, তাহারই চেষ্টা করি। এরূপ করিলে কি আর পরস্পর সদ্‌ভাব থাকে? না—জাতীয়তা রক্ষা হয়?

হয় ত, এম-এ পাশ করিয়াছি; বহিরই দুটা কথা তোতা-পাখীর মত মুখস্থ করিয়া দুই একবার পারিতোষিক লাভ করিয়াছি; আর কি রক্ষা আছে? যারা লেখা-পড়া জানে না, বা অল্প জানে, অথবা যারা সে-কালের বুড়া, তাদের কথাত ছাড়িয়াই দিন, আমার "কোট" বজায় রাখিবার জন্য—যারা যথার্থ লেখা-পড়া জানে, তাদিগকেই যারে তৃণ-জ্ঞান করি—অপরে কা কথা! এরূপ করিলে কি আর পরস্পর সদ্ভাব থাকে? না—জাতীয়তা রক্ষা হয়?

হয়ত গায়ের গন্ধে ভূত পালায়; অমাবস্যার নিশায় দাঁড়াইলে বোধ হয়, সে নিশার ঘনীভূত কেন্দ্র যেন আমিই; আমা হইতেই যেন অমাবস্যার গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের ছটা নিঃসৃত হইতেছে—এমনি আমার রঙ। পেটে জোটে না ভাত, পরিয়াছি মস্ত এক হ্যাট এবং কোট এবং প্যাণ্ট এবং বুট; ইংরাজী দুটা কথা এক করিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু সাহেব সাজিয়াছি! তার উপর,—এক বাইসাইকল চাপিয়া রাস্তা দিয়া যাইতেছি; ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই হউন আর বুড়ো-বুড়ীই হউক, বাচ্ছা ছেলে-মেয়েই হউক, বা কোনও ভদ্রলোকই হউক—সম্মুখে না পড়িলেও, সে দাম্ভিক ইংরাজী-ধরণের ঘৃণাসূচক বক্র আওয়াজে লোক হটাইবার কায়দা কি!—সে আওয়াজ নির্গত করিতে ইংরেজ তা হার মানেই, এমন কি ফিরিঙ্গি পর্য্যন্তও হার মানিয়া যায়!! দেখিলে, লোকের মনে উদয় হয়, "বা বাঙ্গালী! বা! 'কাঠ-খোট্টা' বা সাঁওতালও যে ইহার অপেক্ষা অনেক ভাল; এই কি বাপু সভ্যতা-শিক্ষা? জাতীয়তা বজায় রাখিয়া কি সভ্য হওয়া যায় না? বাঙ্গালী-পোষাকে, বাঙ্গালী-আহারে, বাঙ্গালী-আওয়াজে, বা বাঙ্গালা ভাষায়, বা দেশীয় দ্রব্য-

(অগ্রহায়ণ, ১৩১৩, পৃঃ ৭২৭)

ব্যবহারে কি সভ্যতা নষ্ট হয়? এ দেশের কোনও শাস্ত্রে ত বলেই না; বলি—ইংরাজীই কোন শাস্ত্র এইরূপ সভ্যতার শিক্ষা দেন কি?" একদা এক বড়লাটের নিকট কলিকাতার একটী বড় বাঙ্গালী-বাবু হ্যাট কোট কলার কফ পরিয়া "পুরো দস্তুরের" সাহেব সাজিয়া উপস্থিত হন; বড়লাট বলিলেন, "তুমি যদি তোমার জাতীয় পোষাকে আসিতে, আমি তোমার প্রতি বেশী সন্তুষ্ট হইতাম"। লাট বাহাদুর হইতেছেন—লর্ড রীপন; বাঙ্গালী বাবুটির আর নাম করিব না; মনে করুন—"আমিই" (কেননা, এইরূপ অসভ্যতার হাওয়া অনেকের গায়ে লাগিতে পারে ত?)।

বড় লোক হইব বা হাকিম হইব বলিয়া বিলাতে যাইলাম। যাইবার সময় হয়ত, কত মহৎ মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। সাত্ত্বিক দেশের সাত্ত্বিক উপাদানে গঠিত আধারে কি অত তীব্র রাজসিক-তৈল রক্ষা করিতে সকলে পারেন? না—জানেন? অতি সাবধানতার সহিত, অনেক বুদ্ধি খাটাইয়া অতি কৌশলে রক্ষা করিতে হয়; নচেৎ বিষ উৎপন্ন হইয়া পড়ে। যাইলাম—স্বদেশের উপকার করিতে শিখিব, জাতীয়তা রক্ষা করিতে শিখিব, ইংরেজ-শাসনের গৌরব বৃদ্ধি করিব—এই সকল উদ্দেশে; আসিলাম তার ঠিক বিপরীত হইয়া—দেশে লোকের উপর অত্যাচার করিতে, জাতীয়তা লোপ করিতে এবং ইংরেজ-শাসনে কলঙ্ক ঢালিতে! হয়ত, সকলকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া, অবশেষে, নিজে কবরস্থ হইবার জন্য আবার সেইখানেই ফিরিয়া যাইলাম। হাড় ক'খানা কেন—এই দেশের জিনিষ—এই দেশেই দিই না?—তা হবে না, মরিয়া সত্যই সাহেব হইতে হইবে কি না। এখানে মরিলে জানি কি, যদি আবার কালা আদমী জন্মাই? এরূপ করিলে কি আর পরস্পর সদ্ভাব থাকে? না—জাতীয়তা রক্ষা হয়? থিয়েটারের শ্রীকৃষ্ণ হইলেও বা একদিন এরূপ বলা সাজিত যে,—

"আর ত ব্রজে যাব না ভাই, যেতে মন নাহি চায়।
বাপ পেয়েছি, মা পেয়েছি; ছেলে খেলা ভুলে গেছি;..."

অবশ্য, কোনও ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া আমরা কিছু বলিলাম না, কেন না, অনেকে হয়ত, সৎ উদ্দেশ্যেই সেইখানে বাস করিতেছেন।

আমার পিতা-পিতামহ হয়ত প্রজার প্রজা তস্য প্রজা ছিলেন। না খাইয়া না দাইয়া ক্রমশঃ কোনও রকম করিয়া, একটু জমিদারী রাখিয়া গেছেন, আমি সেইটী বন্ধক দিয়া সাহেবিয়ানা করিতেছি, প্রজাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছি, বিলাতী ও বিদেশীয় দ্রব্যাদির আমদানি করাইতেছি, দেশীয় কার-কারবার লোপ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি। এইরূপ করিলে কি আর পরস্পর সদ্ভাব থাকে? না—জাতীয়তা রক্ষা হয়?

হয়ত—স্মৃতির দুইখানা পাতা উল্টাইয়াছি, বা সবে একটু সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতে শিখিয়াছি, আর কি মাটিতে পা পড়ে? পা এখন যাবতীয় লোকের মাথায়—তাও গরীব হইলে। ধনী যদি শূদ্রাৎ শূদ্রতর বা অতি নীচাশয়ও হয়, তবুও, তাঁর দুয়ারে দু বেলা "হত্যা" দিতেছি, তাঁর পিছন পিছন সর্ব্বদাই বেড়াইতেছি—যদি তিনি একবার কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। গরীবের বা শূদ্রের মাথায় পা দি, ক্ষতি নাই—যদি আশীর্ব্বাদটা করি; তা নয়—কেবল ঘৃণাই করিব, তা তার হাজার গুণই থাক, আর হাজার সে আমাদের উপকারই করুক।

(৮৮তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, পৃঃ ৭২৮)

"স্বামী বিজ্ঞানানন্দ স্মৃতি"

একটি আবেদন

সকলে অবগত আছেন অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ, শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের চতুর্থ অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ একদা বেলঘরিয়া পল্লীর অধিবাসী ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর কৈশোর জীবন এই বেলঘরিয়ায় (১০৮ নং ফিডার রোড, ৭৮-সি বাস স্ট্যাণ্ডের নিকট) অতিবাহিত হয়েছে। এই বাটীতে বাস করবার সময়ই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রথম দর্শন করেছেন। কিশোর হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এই গ্রামের অধিবাসী হিসাবে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন।

খুবই আনন্দের বিষয়, সম্প্রতি পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্যগণের বিশেষ আগ্রহে পূজনীয় মহারাজের উদার-হৃদয় বংশধরেরা রামকৃষ্ণ মিশনকে ঐ বাটী সহ সমস্ত ভূখণ্ড (প্রায় আট কাঠা) দান/বিক্রয় কোবালা করে দিয়েছেন। শতাধিক বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষী এই তীর্থসম বাস্তুভিটাটি আজ জরাজীর্ণ অবস্থায় পরিণত। এর সংস্কার সাধন করে "স্বামী বিজ্ঞানানন্দ-স্মৃতি" রূপে একটি সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন ষ্টুডেণ্টস্ হোম ভারপ্রাপ্ত হয়েছে। অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার মণ্ডলীর সাহায্যে Plan, Estimate ইত্যাদি তৈরির কাজ যথারীতি চলছে। তাতে মনে হচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য তিন লক্ষ টাকা আশু প্রয়োজন। বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হল :

(ক) সম্পত্তির হস্তান্তর এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়—	৩০,০০০·০০
(খ) বসত বাটীর আমূল সংস্কার	১,৫৫,০০০·০০
(গ) সীমানা প্রাচীর মেরামত, কেয়ার-টেকারের ঘর, প্রবেশদ্বার, গো-ডাউন, পানীয় জলের ব্যবস্থা ইত্যাদি	৬৫,০০০·০০
(ঘ) সাপ্তাহিক ধর্মসভা, মেডিক্যাল ইউনিট, পাঠাগারের ব্যবস্থা	৫০,০০০·০০
মোট—	৩,০০,০০০·০০

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী সহৃদয় জনসাধারণের নিকট সর্বপ্রকার সাহায্য প্রার্থনা করছি। চেক বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট পাঠালে Ramakrishna Mission Calcutta Students' Home—এই নামে হবে। এই দান আয়কর মুক্ত।

স্বামী অমলানন্দ
কর্মসচিব
রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা ষ্টুডেণ্টস্ হোম
বেলঘরিয়া, কলিকাতা, ৭০০০৫৬
ফোন : ৫৮-১৫৬৪

তারিখ : ২৩-৮-৮৬

উদ্বোধন : পৌষ ১৩৯৩

সূচীপত্র

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

[উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন]

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

কর্মযোগ	৮·০০	ধর্ম-সমীক্ষা	৫·০০
ভক্তিযোগ	৪·৫০	ধর্মবিজ্ঞান	৫·৫০
ভক্তি-রহস্য	৫·০০	বেদান্তের আলোকে	৪·৫০
জ্ঞানযোগ	১৪·০০	কথোপকথন	৫·০০
জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে	১০·০০	ভারতে বিবেকানন্দ	২০·০০
রাজযোগ	১০·০০	দেববাণী	৮·০০
সরল রাজযোগ	১·৮০	মদীয় আচার্যদেব	২·৫০
সন্ন্যাসীর গীতি	০·৮০	চিকাগো বক্তৃতা	২·২৫
ঈশদূত যীশুখৃষ্ট	১·০০	মহাপুরুষপ্রসঙ্গ	১২·০০
পত্রাবলী। (সমগ্র পত্র একত্রে, নির্দেশিকাদি সহ) রেক্সিন বাঁধাই	৪০·০০	ভারতীয় নারী	৫·০০
পওহারী বাবা	১·২৫	ভারতের পুনর্গঠন	২·৫০
স্বামীজীর আহ্বান	১·২৫	শিক্ষা (অনূদিত)	৪·২০
বাণী-সঞ্চয়ন	১২·০০	শিক্ষাপ্রসঙ্গ	৮·০০

স্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচনা

পরিব্রাজক	৪·২৫	ভাববার কথা	৪·০০
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য	৫·০০	বর্তমান ভারত	২·৫০

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণ : প্রতি খণ্ড—৩০্ টাকা : সম্পূর্ণ সেট ৩০০্ টাকা
সাধারণ বাঁধাই সুলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্ড— ২০্ টাকা : সম্পূর্ণ সেট ২০০্ টাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

স্বামী সারদানন্দ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (দুই ভাগে)
রেক্সিন-বাঁধাই : ১ম ভাগ ৩৫·০০, ২য় ভাগ ৩০·০০
সাধারণ (পাঁচ খণ্ডে)
১ম খণ্ড ৬·০০, ২য় খণ্ড ১৩·৫০, ৩য় খণ্ড ৯·৫০,
৪র্থ খণ্ড ৯·৫০, ৫ম খণ্ড ১৪·৫০

অক্ষয়কুমার সেন
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি — ৪৫·০০
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা — ৫·৫০

স্বামী প্রেমঘনানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প — ৭·০০

শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ — ১·৫০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র) — ৫·৫০

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বাণী — ·৭৫

স্বামী তেজসানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী — ৯·০০

৮৮তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা পৌষ, ১৩৯৩

দিব্য বাণী

শ্রীশ্রীমার স্থূলদেহ আমাদের চক্ষুর অন্তরালে গিয়াছে বটে সত্য, এবং তজ্জন্য ভক্তদের খুব দুঃখ হইয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভক্তদের ইহা পূর্ণ ধারণা থাকা আবশ্যক যে, তিনি সাধারণ মানবী নন বা সাধিকা নন বা সিদ্ধা নন। তিনি নিত্যসিদ্ধা জগজ্জননীর এক বিশেষ রূপ, যেমন দশমহাবিদ্যা। তিনিই এইবার ভগবান—অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহায়িকা শ্রীমতী সারদামণি দেবী হইয়া জীব উদ্ধারের জন্য শুদ্ধ সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া জগতে অবতীর্ণা হইয়াছেন। যে ভক্তেরা তাঁর কৃপালাভ করিয়াছেন, তাঁদের মানবজন্ম সার্থক হইয়াছে। তাঁরা ধন্য হইয়াছেন। তাঁরা যখনই 'মা' বলিয়া তাঁকে কাতরে দেখিতে চাইবেন, তাঁকে দেখিতে পাইবেন, নিশ্চয়ই।...গর্ভধারিণী মা দেহত্যাগ করিলে সন্তানেরা আর তাঁকে দেখিতে পান না সত্য।...কিন্তু এ মা যে জগজ্জননী, জীবের ত্রাণের জন্য অবতীর্ণা হইয়াছেন। ভক্তেরা কাতরে ক্রন্দন করিলেই তিনি দেখা দিবেন। তোমরা যে মহাভাগ্যবান্ সাক্ষাৎ তাঁর কৃপা পাইয়াছ। তোমরা যখনই তাঁর বিচ্ছেদে কাঁদিবে, তখনই তিনি তোমাকে সান্ত্বনা করিবেন, ইহা নিশ্চয় জানিও।

—স্বামী শিবানন্দ

[উদ্বোধন, ৬৩তম বর্ষ—১২শ সংখ্যা]
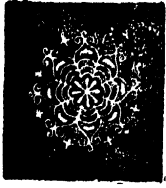
কথাপ্রসঙ্গে

'দোষ কারো নয় গো মা শ্যামা'

মর্ত্যলীলা সংবরণের মাত্র পাঁচদিন বাকী। জনৈকা ভক্ত-মহিলা অন্নপূর্ণার মা শ্রীশ্রীমাকে দেখিতে আসিয়াছেন। ভিতরে যাওয়া নিষেধ, তাই ঠাকুরঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন। হঠাৎ পাশ ফিরিয়া শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ইশারায় নিকটে ডাকিলেন। তিনি নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া কাঁদিতে থাকিলে করুণাবিগলিত ক্ষীণকণ্ঠে শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া 'একটু পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "তবে একটি কথা বলি—যদি শান্তি চাও মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।"' (শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৬৬১) সহজ সরল কয়েকটি কথা। কিন্তু কী আন্তরিকতায় ভরা! প্রতিটি শব্দের মধ্যে ঝঙ্কৃত হইতেছে জীবনের পরম সঙ্গীত, প্রীতির রাগিণী, আত্মীয়তার সুর। কথাগুলি এতই সহজ সরল ও হৃদয়স্পর্শী যে, কোনরূপ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। আর ব্যাখ্যাসাপেক্ষ যদিই বা হয়, তাহা হইলেও শ্রীশ্রীমায়ের কথার যথার্থ তাৎপর্য কে নির্ণয় করিতে পারে? এ-যে নুনের পুতুলের সমুদ্র মাপিতে যাওয়ার ধৃষ্টতা! তবুও মানুষের স্বভাব এই যে, যাহার যেরূপ বুদ্ধি সে তাহার বুদ্ধি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিবেই। এবং ইহাই রীতিসম্মত। আমরাও এই রীতিরই অনুসরণ করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র সীমিত বুদ্ধি অনুযায়ী শ্রীশ্রীমায়ের উপরি-উক্ত কথাগুলির তাৎপর্য যেরূপ বুঝিয়াছি সেইরূপ ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হইয়াছি। জানি শিব আমরা কখনও গড়িতে পারিব না, তথাপি দুরাশাও ছাড়িতে পারি না।

'যদি শান্তি চাও মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার'—শ্রীশ্রীমায়ের শান্তির এই সমাধান কোন দার্শনিক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে নয়, কোন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানরূপে নয়, সমাধান নিছক ব্যক্তি-জীবনের প্রয়োজনে। তথাপি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, এই কথাগুলির মধ্যেই রহিয়াছে বিশ্বশান্তি সমাধানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। কারণ, ব্যক্তিজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপরই নির্ভর করে পারিবারিক জীবনের, তথা সমাজ, জাতীয় ও বিশ্বজীবনের শান্তির কাঠামো। পূজায় স্বস্তি-বাচনের মন্ত্র পাঠ করা হয়। সর্বভূতের কল্যাণের জন্য প্রার্থনাই স্বস্তিবাচনের মূল কথা। ব্যষ্টির কল্যাণে সমষ্টির কল্যাণ, আবার সমষ্টির কল্যাণে ব্যষ্টির কল্যাণ—স্বস্তিবাচনের মন্ত্রে এই ভাবটি পরিস্ফুট। শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখনিঃসৃত কথাগুলি শান্তি-পূজার স্বস্তিবাচনের মন্ত্রস্বরূপ, শান্তি-সমাধানের মূল সূত্র।

শান্তি কে চায়? সকলেই মুখে 'শান্তি চাই, শান্তি চাই' বলে, কিন্তু মনেপ্রাণে শান্তি চায় কয় জন? তাই তো শান্তির প্রতিমূর্তি শ্রীশ্রীমায়ের কণ্ঠে প্রথমেই উচ্চারিত হইল: 'যদি শান্তি চাও, মা।' জগতে যথার্থ শান্তিকামীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। কারণ, দেখা যায় মানুষ যতই

অশান্তিতে থাকুক আর মুখে যতই 'শান্তি চাই, শান্তি চাই' বলুক না কেন, শান্তির জন্য যাহা করণীয় কার্যক্ষেত্রে সে তাহা করে না, বা করিতে পারে না। শুধু তাহাই নয়। যে-সব কারণে অশান্তির সৃষ্টি হয়, কার্যকালে বারবার সে তাহাই করিয়া বসে। ইহাতে অবশ্য বিস্মিত হইবার কিছু নাই। ইহাই সংসারের নিয়ম, জীবনের রূঢ় সত্য। তাহা সত্ত্বেও মানুষ চেষ্টা করিবে, প্রাতিকূল পরিবেশকে জয় করিয়া জীবনে শান্তি লাভ করিতে, চেষ্টা করিবে সমাজে শান্তি স্থাপন করিতে, চেষ্টা করিবে বিশ্বের নানা জাতি ও নানা ধর্মের মানুষের অশান্তি দূর করিয়া বিশ্বশান্তিকে বাস্তবে রূপ দিতে।

আগেই আমরা বলিয়া আসিয়াছি, জগতে প্রকৃত শান্তিকামীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। আর এই মুষ্টিমেয়ের মধ্যেও অনেকেই জানে না—প্রকৃত শান্তি কিভাবে লাভ করা যায়। প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে হইলে প্রথমেই বিচার করিতে হইবে—অশান্তি কেন হয়? অশান্তির কারণ কি? বিচার-বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে অশান্তির প্রধান কারণ অপরের দোষদর্শন। আমরা নিজেরা প্রত্যেকেই ধোয়া তুলসীপাতা, আর জগৎশুদ্ধ বাকী সকলেই খারাপ! তাই জগৎকে ভাল করিবার জন্য, জগৎকে পরিবর্তন করিবার জন্য আমাদের কী মাথাব্যথা! আমরা বুঝিতে পারি না যে শান্তিলাভের উপায়টি একেবারে ব্যক্তিগত। সরিষার ভিতরে ভূত থাকিলে সেই সরিষা দিয়া ভূত তাড়াইবার চেষ্টা যেরূপ অপচেষ্টার সামিল, সেরূপ নিজেকে ভাল করিবার, পরিবর্তন করিবার চেষ্টা না করিয়া জগৎকে ভাল করিবার, পরিবর্তন করিবার চেষ্টা পণ্ডশ্রমমাত্র। জগৎ-সংসার যে-ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, সেই-ভাবেই চলিবে। ইহাই সংসারের রীতি। সুতরাং প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে হইলে অপরের দোষ-দর্শন না করিয়া নিজের দোষ-ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংশোধন করিতে হইবে নিজেকে। তাই প্রকৃত শান্তির সমাধানকল্পে দেবীমুখে উক্ত হইল: 'যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের।'

আমরা বলিবার সময় বলি: 'দোষ কারো নয় গো মা শ্যামা।/আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা॥' কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আচরণের বেলায় করি তার ঠিক উল্টোটা। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের 'ব্রাহ্মণ ও গোহত্যার' গল্পটির কথা মনে পড়ে। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব পূর্বার্ধ, ১ম অধ্যায়) যত্ন ও পরিশ্রম সহায়ে সুন্দর করিয়া বাগানখানি রচনা করিবার যত কৃতিত্ব তাহা ব্রাহ্মণের, আর বাগানের গাছগুলি গরুতে খাওয়ার জন্য ক্রোধোন্মত্ত হইয়া গরুটিকে মারিয়া ফেলিবার দোষটি ইন্দ্রের! আমাদের অবস্থাও ঠিক ঐ ব্রাহ্মণেরই মতো। ভাল কাজের কৃতিত্বটুকু নেওয়ার জন্য আমরা যতটুকু লালায়িত, নিজের দোষের বোঝা, ভুলের দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়ার জন্য আমাদের ব্যগ্রতা তাহা হইতে কোন অংশেই কম নয়। তাই তো সন্তানের মঙ্গল কামনায় অশুভনাশিনী জননীর উপদেশ: 'কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের।'

সংসারে মানুষের দোষ-দুর্বলতা যে নাই তাহা নয়। কিন্তু সেইগুলিকে বড় করিয়া দেখিলে, তাহা লইয়া মাতিয়া গেলে অশান্তি হয় নিজেরই—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর তাহাতে যে শুধু নিজেরই অশান্তি হয় তাহা নয়, তাহা হইতে অশান্তি হয় অপরেরও। তাই অপরের দোষ দর্শন না করিয়া আত্ম-বিশ্লেষণ সহায়ে চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে নিজের দোষ দূরীভূত হয়। সতত প্রার্থনা করিতে হইবে, নিরন্তর সাধনা করিতে হইবে যাহাতে এই দোষ

চিরতরে দূরীভূত হইয়া হৃদয় পবিত্র হয়, এবং চেষ্টা করিতে হইবে ব্যবহারিক জীবনেও যাহাতে তাহার প্রতিফলন হয়। তাহা হইলেই এই প্রার্থনা, এই সাধনা সার্থক হইবে, জীবন ধন্য হইবে।

অশান্তির আর একটি কারণ মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধি, আপন-পর বিচার। এই আপন-পর বিচারবোধ কখন কখন মানুষের মধ্যে এত প্রবলভাবে দেখা দেয় যার ফলে অনেক সময় ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে মহা অকল্যাণ উপস্থিত হয়। আপন-পর ভেদবুদ্ধি প্রাবল্যের ফলেই ব্যক্তিস্বার্থ মাথাচাড়া দিয়া উঠে; আরম্ভ হয় স্বার্থের সংঘাত। তখন অপরের সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া লোকে নিজের সুখ-সুবিধা রক্ষায়ই বেশি ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ফলে অপরকে বঞ্চনা করিতে বিবেকে বাধে না। কিন্তু তাহার ফল হয় চরম অশান্তি। আজ যে আমরা ব্যক্তি-স্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই—যে দ্বন্দ্বেরই বৃহত্তররূপ বিচ্ছিন্নতাবাদ—তাহার কারণ পরস্পর পরস্পরকে আপন করিয়া নেওয়ার মানসিকতার অভাব। সুতরাং আপন-পর ভেদবুদ্ধি মহা অনর্থকারী। এই ভেদবুদ্ধির প্রাবল্য যার মধ্যে যত কম সে-ই তত মহৎ, ফলে সেই মানব-জাতিকে তত বেশি আপন করিয়া লইতে সক্ষম। হিতোপদেশে (মিত্রলাভ ১০৬) আছে:

অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদার চরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

ইনি আপন, উনি পর ইত্যাদি বিবেচনা নীচাশয়গণ করিয়া থাকে। অপরপক্ষে উদার-চিত্তগণের নিকট সমগ্র পৃথিবীর মানুষই আত্মীয় বলিয়া প্রতিভাত হয়। আপন-পর ভেদ ভুলিয়া জগৎ-সংসারকে আপনার করিয়া না নিতে পারিলে প্রকৃত শান্তিলাভ সুদূর পরাহত। তাই তো শান্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখে শান্তির সমাধানকল্পে ধ্বনিত হইল: 'জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।' সংসারে কেউ পর নয়, সবাই আপন, সবাই একই ঈশ্বরের সন্তান—এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-বোধ হয়। আর এই 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-বোধেই মানুষ সর্বভূতে প্রেমময় ঈশ্বরকে দর্শন করে। সতত অভ্যাসের দ্বারা মানুষ যখন এই অবস্থায় উপনীত হয় তখনই সে সকলের ভিতর ঈশ্বরের প্রকাশ দেখে, সকলকেই, ঈশ্বরের সন্তান, তাই পরমাত্মীয়—এই বোধে ভালবাসে। তাহার নিকট তখন 'মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।/বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥' (স্তবকুসুমাঞ্জলি, উদ্বোধন কার্যালয়, অন্নপূর্ণা স্তোত্র-১২)—দেবী পার্বতী আমার মাতা, দেব মহেশ্বর আমার পিতা, শিবভক্তগণ আমার বন্ধু এবং সমগ্র ত্রিভুবন আমার স্বদেশ এইরূপ মনে হয়। আর তখনই তার মনে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করে। পরের দোষান্বেষণ না করিয়া সকলকে আত্মীয়বোধে ভালবাসার আদর্শ লইয়া চলিতে পারিলে ব্যক্তিজীবনে যেমন শান্তি আসিবে, তেমনি শান্তি আসিবে সমষ্টি তথা সমাজ ও বিশ্বজীবনে।

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের পুণ্য লগ্নে তাঁহার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা: হে শান্তিস্বরূপিণী দেবি, আমাদের এই শক্তি দাও যাহাতে আমরা তোমার প্রদর্শিত শান্তির পথে চলিতে সক্ষম হই। অপরের দোষদর্শন না করিয়া আত্ম-বিশ্লেষণের দ্বারা নিজের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করিতে পারি, এবং জগৎকে আপনার করিয়া লইয়া নিজের হৃদয়ে 'শান্তির ঘট' চির সংস্থাপন-পূর্বক সার্থক মানব জীবন লাভের অধিকারী হই।

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

(শ্রীপ্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

At the Temple of Pala Ganeshji
Golap bage উদয়পুর ও মেবাড়
পালা গণেশজীকা মন্দির, গোলাপবাগ।
June 1894

শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয়,

অনেক দিন হইল আপনার এক পত্র পাইয়াছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হওয়ায় বোধ করি আপনি আমার প্রতি বিরক্ত হইবেন না। আপনি কেমন আছেন জানিবার জন্য বিশেষ উৎসুক আছি। শীঘ্র শুভ সমাচার দিয়া সুখী করিবেন।

আপনাকে আমি উদয়পুরের রাজ সিংহাসনে আসীন মনে করি নাই। আমি ইতিপূর্ব্বে আপনাদের বিষয় ব্যাপার সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, ও কোন কথা বলিও নাই। গত পত্রেই কেবল এ বিষয় উল্লেখ করিয়াছি।

নিবেদন করি—আপনার যে কয়জন প্রজা আছে বা যে পরিমাণ কোষ আছে, তাহাতে যাহা করা উচিত তাহা কি আপনারা করিয়া থাকেন? যাহাদের নিকট আপনারা কর আদায় করেন, তাহাদিগের সুখ দুঃখের সংবাদ কি আপনারা লইয়া থাকেন?

মহাশয় যদি দেশের উন্নতি করিতে চাহেন বা যথার্থই নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া চিত্ত শুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন ত কায়মনোবাক্যে দরিদ্রদিগের সেবা করুন।

আপনার যত সাধ্য প্রথমতঃ স্বীয় কুটুম্বের দুঃখ দূর করুন। এখানে কুটুম্ব বলিতে আপনার গৃহস্থ কয়েকটিকে না বুঝেন। আপনার যতগুলি প্রজা আছে, তাহারা সকলেই আপনার সন্তান স্থানীয়। তাই বলি Charity begins at home. আপনার প্রজাগণকে পালন করিয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে ত তৎক্ষণাৎ তাহা দরিদ্রের সেবায় অর্পণ করুন। 'দানমেকং কলৌ যুগে'। The helping of man is the best serving of God. এ বাক্যটি যেন সদা আপনার হৃদয়ে জাগরূক থাকে। আপনাকে বলিনা—আপনার পুত্র দুটিকে আপনার জমিদারীর কার্য্যের ভার দেন ও সদাই যেন তাঁরা প্রজার হিত চেষ্টা করেন। কেবল ঘরে বসিয়া কাজ হয় না। ইহার জন্য মধ্যে মধ্যে গ্রামে গ্রামে ঘোরা উচিত ও প্রজাদিগের কি কি অভাব আছে ও কি হইলে তাহারা সুখে থাকে এ বিষয়ে তত্ত্বাবধান নিত্য করা কর্ত্তব্য।

গত পরশু দিন Chicago হইতে স্বামীজির একখানি পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন—"পড়েছ 'মাতৃদেবো ভব', 'পিতৃদেবো ভব', আমি বলি 'দরিদ্রদেবো ভব', 'মূর্খদেবো ভব'।" ভারতের দৈন্য দশা দেখিয়া তিনি বড় ব্যথিত হইয়াছিলেন। তাহা তাঁহার পত্রে আরও স্পষ্টরূপে জানিতে পারিলাম। তার সে পত্র ২৮শে···সেখান হইতে রওনা হইয়া গত মঙ্গলবার এখানে আসিয়াছে। তিনি, বোধ করি এখনও সেখানেই আছেন ও আরও কিছুদিন থাকিবেন।

কিমধিকমিতি—আপনার
গঙ্গাধর

ঐশ্বর্যময়ী মা

ডক্টর সুখময় সরকার

জগজ্জননী শ্রীশ্রীসারদামণি রক্তমাংসের দেহ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন বাঁকুড়া জেলার মাটিতে, জয়রামবাটী গ্রামে। আমার পরম সৌভাগ্য, আমিও জন্মেছি ঐ বাঁকুড়া জেলার মাটিতে; তবে শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকট হওয়ার বছর কয়েক পরে। আমি মাকে চোখে না দেখলেও মায়ের কৃপাধন্য এমন একজন সন্ন্যাসীর কাছে শোনা কাহিনী বলব যিনি মাকে কেবল স্বচক্ষে দর্শন করেছিলেন তাই নয়, দীর্ঘকাল ধরে লাভ করেছিলেন মায়ের পবিত্র নিবিড় সঙ্গ। যাঁর কথা বলছি তিনি আমার পিতৃব্যদেব স্বর্গত হরিপদ সরকার, যিনি আমার জন্মের পূর্বেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসিসঙ্ঘে যোগদান করে স্বামী হরিপ্রেমানন্দ নামে খ্যাত হন।

আমার পিতৃদেব স্বর্গত অতুলকৃষ্ণ সরকারের মুখে প্রায়ই শুনতাম, "আমার ছোট ভাই হরি শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎ শিষ্য; সে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী; এখন তার নাম স্বামী হরিপ্রেমানন্দ। সংসার ত্যাগ করার বারো বৎসর পরে একবার গ্রামে এসেছিল; একদিন একরাত চণ্ডীমণ্ডপে থেকে আবার চলে গিয়েছিল। তখন তোর জন্ম হয়নি। হরি বোধহয় বেলুড়মঠে থাকে।"

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেওয়ার পর একদিন বেলুড় মঠে গিয়ে তাঁর খোঁজ করেছিলাম, কিন্তু সাক্ষাৎলাভের সৌভাগ্য হয়নি। একজন সন্ন্যাসীর মুখে শুনেছিলাম, স্বামী হরিপ্রেমানন্দজী কাশীতে অদ্বৈত-আশ্রমে থাকেন। কিন্তু তখন কাশীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ হয়ে উঠল না। এর পর বেশ কয়েক বৎসর পার হয়ে গেল।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ, আমি তখন বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করছি। শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-শতবার্ষিকী উৎসব চলছে সারা পৃথিবীতে। তবু যে গ্রামে তাঁর আবির্ভাব, সেই জয়রামবাটীর মঠেই চলছে সবচেয়ে সাড়ম্বর সমারোহ। আমার সন্ন্যাসী-কাকা নিশ্চয় এসময় জয়রামবাটী-মঠে উপস্থিত থাকবেন, এই বিশ্বাস মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দর্শনলাভের আশায় বাঁকুড়া থেকে রওনা হলাম জয়রামবাটীর পথে। তেত্রিশ বৎসর পূর্বে যানবাহনের এত সুযোগ-সুবিধা ছিল না। অনেক কষ্ট স্বীকার করেই পৌছালাম জয়রামবাটী-মঠে।

বেশ কয়েকদিন ধরেই চলছে মহোৎসব। জয়রামবাটী গ্রাম নব-সাজে সজ্জিত হয়ে উঠেছে। আমার ছেলেবেলার দেখা জয়রামবাটীকে যেন চেনাই যাচ্ছে না। গৈরিকধারী সন্ন্যাসীরা নানা-কাজে ব্যস্ত হয়ে এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করছেন। শুভ্রবেশধারী মুণ্ডিতশির ব্রহ্মচারীরা উৎসবের আয়োজনে তৎপর। সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের মধ্যে নানা বয়সের মানুষ আছেন। আমার সন্ন্যাসী-কাকা প্রৌঢ়, পঞ্চাশোর্ধ—এই টুকুই জানি; কখনও তো চোখে দেখিনি। এঁদের মধ্যে কোন্ জন স্বামী হরিপ্রেমানন্দ, কে জানে? ইতি-উতি তাকাতে তাকাতে অবশেষে মাতৃ-মন্দিরে গিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করলাম। মাতৃমন্দিরে অগণিত মানুষের ভিড়। মন্দিরের ভেতর থেকে একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে বেরিয়ে আসতে দেখে তাঁকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলাম, "বাবা, স্বামী হরিপ্রেমানন্দজী মহারাজ এখানে আছেন কি? আমি একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।"

সন্ন্যাসী বললেন, "এসো আমার সঙ্গে।"

সন্ন্যাসীকে অনুসরণ করে মিনিট দুই হেঁটে তরুলতা-বেষ্টিত একটি গৃহের দ্বারে এসে উপস্থিত হলাম। দ্বার থেকে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী হাঁক দিলেন, "হরিপ্রেম মহারাজ আছেন না কি? একটি ছেলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

ছেলে! হ্যাঁ, ছেলেই তো। হলামই বা আমি পঁচিশ বছরের যুবক স্কুলমাস্টার; আমি যে সন্ন্যাসীকে প্রথমেই 'বাবা' বলে ডেকেছি!

কুটিরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন জনৈক প্রৌঢ় সন্ন্যাসী। পরিধেয় গৈরিক বস্ত্রের বর্ণ অন্যান্য সন্ন্যাসীদের বস্ত্র বর্ণের তুলনায় কিঞ্চিৎ গাঢ়তর। মুণ্ডিত নগ্ন শির। চরণে ফিতে-দেওয়া কাষ্ঠ পাদুকা। মুখকান্তিতে আমার পিতৃদেবের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ইনিই স্বামী হরিপ্রেমানন্দ। আমি চললাম।" তিনি অন্য দিকে চলে গেলেন।

স্বামী হরিপ্রেমানন্দজীর চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করে বললাম, "আমার নাম সুখময় সরকার। বাবার নাম অতুলকৃষ্ণ সরকার। বাড়ি খাতড়া থানার দুলালপুর গ্রামে।"

সন্ন্যাসী ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। সে দৃষ্টিতে কৌতূহল ছিল, প্রসন্নতা ছিল, করুণা ছিল। আর কিছু ছিল কি না, জানি না। আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, "তা তোর বাবা কেমন আছেন?"

"বাবা মারা গেছেন ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি।"

সন্ন্যাসী এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর শান্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, "জয় মা! জয় শ্রীরামকৃষ্ণ! তা তুই এখন কী করিস্?"

"বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজিয়েট স্কুলে মাস্টারি করি।"

"বিয়ে করেছিস্?"

"আজ্ঞে না।"

"কী জন্যে এসেছিস্? উৎসব দেখতে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তা ছাড়া আপনাকেও দর্শন করতে এলাম। আগে তো দেখিনি কখনও। বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম, আপনি তখন বেনারসে।"

"আমাকে দর্শন করতে!" বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসিটি অবিকল আমার বাবার মতো। কয়েক সেকেণ্ড পরেই বললেন, "আয়।"

তাঁকে অনুসরণ করে কুটিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। কক্ষের একদিকে অনাড়ম্বর শয্যা, অন্য দিকে একটি চৌকিতে শ্রীশ্রীঠাকুর এবং মায়ের প্রতিমূর্তি। দেওয়ালে স্বামী বিবেকানন্দের ছবিসহ একটি ক্যালেণ্ডার। সন্ন্যাসী এক প্লেট ফল-মিষ্টি এনে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "মায়ের প্রসাদ। খা। খেয়ে নিয়ে স্নান করে আয়। একটু পরেই অন্নভোগ হবে, তারপর অন্নপ্রসাদ পাবি। আজ থাকছিস্ তো?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

সন্ন্যাসীর আদেশগুলি বর্ণে বর্ণে পালন করলাম। অন্নপ্রসাদ গ্রহণের পর তিনি নিজের হাতে মেঝের ওপর একটা মাদুর বিছিয়ে দিয়ে বললেন, "বিশ্রাম কর। ধর্মসভা আরম্ভ হবে বিকেল চারটের পর। সন্ধ্যের পর হবে রামায়ণ। এসব দেখে-শুনে কাল ফিরে যাবি।"

একান্ত আপনজনের মতোই আচরণ। কিন্তু নির্লিপ্ত।

আমি মাদুরে বসে; তিনি টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে বসে বই পড়ছেন। স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ'। সাহস করে বলে ফেললাম, "কাকা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব

"কাকা কী রে বেটা? স্বামীজী কিংবা মহারাজ বলবি। তা কী জিজ্ঞাসা করবি, কর্ না?"

যাঁর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, তাঁকে 'স্বামীজী' অথবা 'মহারাজ' বলতে কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকতে লাগল। কিন্তু সন্ন্যাসীকে পিতৃসম্বোধনে বাধা নেই। বিশেষতঃ পিতৃব্য তো পিতারই প্রতিভূ! তাই অভয় পেয়ে বললাম, "বাবা, আপনি তো শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎ শিষ্য। আপনি মায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছেন বহুদিন ধরে। আপনার মুখে মায়ের কথা কিছু শুনতে ভারি ইচ্ছে হচ্ছে।"

"মায়ের কথা এক-আধ ঘণ্টা বলে কি শেষ করা যায় রে? তাঁর লীলার যে অন্ত নেই। অবশ্য সন্ন্যাস-জীবনের প্রথম পর্বে আমি দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছি; মায়ের কাছে থাকার সুযোগ বেশি পাইনি। এজন্য মনে বড় একটা ক্ষোভ ছিল। শেষ দিকে কিন্তু মা আমায় সব সময় কাছে কাছে রাখতেন। তাঁর শেষ জীবনে অনেক সেবা করার সুযোগও পেয়েছিলাম। তাঁর প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়ে এ-জীবনটা ধন্য হয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ, বাবা। মায়ের প্রকৃত স্বরূপ কেমন করে জেনেছিলেন, আমায় কৃপা করে সেই কথা বলুন।"

সন্ন্যাসী বোধ হয় অনুভব করলেন, আমার এই কৌতূহল শ্রদ্ধাহীন নয়, বিষয়-বুদ্ধি-প্রণোদিত নয়, এ-কৌতূহলের সঙ্গে মিশে রয়েছে সভক্তি ব্যাকুলতা। তাই ক্ষণিকের জন্য অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন যেন। হঠাৎ নেমে এলেন চেয়ার থেকে। আমি যে মাদুরে বসে আছি, তারই ওপর বসে পড়লেন আমার মুখোমুখি হয়ে। তপঃস্নিগ্ধ দুটি নয়ন আমার মুখের ওপর নিবদ্ধ করে বলতে লাগলেন, "মায়ের কথা শুনতে তোর খুব আগ্রহ, তাই না? তবে শোন্। একদিনের ঘটনা বলি। সাল, তারিখ কি মনে আছে ছাই? আর সাল তারিখের দরকারই বা কী? মায়ের একটি ভাইঝি ছিল, তার নাম রাধু। রাধু অনেকদিন থেকে একটা দুরারোগ্য রোগে ভুগছিল। ভুগতে ভুগতে চেহারা হয়েছে কঙ্কালসার। কথা বলতে পর্যন্ত পারে না, গলা থেকে চিঁ চিঁ আওয়াজ বেরোয়। মায়ের বড় দয়া হল। বললেন, হরি, চল্ তো আমার সঙ্গে—মেয়েটাকে নিয়ে বাঁকুড়া যাই। বাঁকুড়ায় বৈকুণ্ঠ আছে; এলোপ্যাথিক এম-বি ডাক্তার, কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করে। খুব নাম হয়েছে…।"

তাঁর কথার মধ্যেই বাধা দিয়ে বললাম, "বৈকুণ্ঠ মানে বৈকুণ্ঠ মহারাজ? স্বামী মহেশ্বরানন্দ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুই তো বাঁকুড়া শহরেই থাকিস্। নিশ্চয় চিনিস্।"

"হ্যাঁ, বাবা। খুব চিনি। বাঁকুড়া মঠের অধ্যক্ষ। হোমিওপ্যাথিতে ধন্বন্তরি।"

"হ্যাঁ রে। ওঁর কথাই বলছি। তা, মা তো এলেন ভাইঝিকে নিয়ে। আমি এলাম ওঁদের সঙ্গে। বাঁকুড়া মঠে তখন ঘরবাড়ি বিশেষ হয়নি। বাইরের লোককে, বিশেষ করে মেয়েছেলেকে থাকতে দেবার মতো জায়গা মোটেই ছিল না। তাই ফীডার রোডে একটা ছোট ঘর ভাড়া নেওয়া গেল। সেখানেই মায়ের ভাইঝির চিকিৎসা হতে লাগল। ঘরে মাত্র দুটি কামরা। একটিতে থাকে রোগী, আর একটিতে মা আর আমি। সেদিন সন্ধ্যার পর ডাক্তার মহারাজ রোগী দেখে ফিরে গেছেন। আমাদের কামরায় একটা ছোট টুল ছিল; মা তার উপর বসে আছেন। আমার কী মনে হল, মায়ের দুটি পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। শুষ্ক দু-খানি পা। মায়ের শরীর তখন জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গেছে। পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে হঠাৎ মনে প্রশ্ন জাগল—মা কি সত্যিই জগজ্জননী?…জগজ্জননীর এমনি

শিরা-বের-করা পা? প্রশ্নটা মনে উদয় হলেও মুখে কিছুই বলছি না। পায়ে হাত বুলিয়ে যাচ্ছি। ধীরে ধীরে অনুভব করতে লাগলাম, এ তো একজন বৃদ্ধার শীর্ণ পা নয়, এক যুবতী নারীর সুপুষ্ট পা! কাছেই একটা হারিকেন জ্বলছে; তার আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, আলতাপরা অপরূপ দু'টি চরণ, ঘনসন্নিবিষ্ট পরিপুষ্ট অঙ্গুলিতে অর্ধ-চন্দ্রের মতো পদনখের শোভা! দুই চরণে সোনার নূপুর—নূপুরে খচিত রয়েছে মণিমুক্তা! ...এ কার পদসেবা করছি আমি! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চরণ থেকে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চেষ্টা করলাম মায়ের মুখের ওপর। তাকিয়ে দেখি,—স্বর্ণকান্তি, ত্রিনয়না, চতুর্ভুজা, নানা অলঙ্কারশোভিতা জগদ্ধাত্রী মূর্তি! মাথায় মুকুট, হাতে অস্ত্র! তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অপরূপ জ্যোতিঃ! ভাল করে দেখবার আগেই 'মা' 'মা' বলে চৈতন্য হারালাম। কতক্ষণ যে ঐ অবস্থায় ছিলাম, কে জানে? যখন চেতনা ফিরে এল, তখন দেখি, মা আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলছেন, "ও হরি! ও হরি! কী হল তোর? ওঠ্! ওঠ্!"... উঠে বসলাম। দেখলাম, শীর্ণদেহা বৃদ্ধা মা রোগ যন্ত্রণা-কাতর ভাইঝিটির দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। এই আমাদের জগজ্জননী, মা সারদা-মণি। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা-সঙ্গিনী! জয় মা! জয় ঠাকুর!"

সন্ন্যাসী নিঃস্তব্ধ হলেন। কিছুক্ষণ পরে দুজনে উঠে গেলাম ধর্মসভায় যোগ দিতে।

শ্রীশ্রীমায়ের বাবুরাম

ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

'প্রেমানন্দ-প্রেমকথা'র মুখপত্রে ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য লিখেছেন,

"লীলাপ্রিয় ভগবানের দুই নিত্যসঙ্গী শ্রীরাখাল ও শ্রীবাবুরাম—ব্রহ্মানন্দ ও প্রেমানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ-যুগলীলায় দুই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। রাখালকে লইয়া ঠাকুরের বাৎসল্য-রসের সম্ভোগ; বাবুরামকে দরদীরূপে পাইয়া তাঁহার মহাভাবোত্থ মাধুর্যরসের আস্বাদন। রাখালকে ঠাকুর ব্রজমণ্ডলের ভিতর দেখিয়াছিলেন; শ্রীবাবুরামও যে ব্রজমণ্ডল হইতেই আসিয়াছিলেন ঠাকুরের উক্তির মধ্যে ইহার ইঙ্গিত বিদ্যমান।"

গ্রন্থসূচনায় তিনি স্বামী প্রেমানন্দ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের তিনটি উক্তি স্মরণ করেছেন।—

"বাবুরামকে দেখলুম দেবীমূর্তি—গলায় হার, সখী সঙ্গে।" "ও নৈকষ্য কুলীন, হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ।" "ও রত্নপেটিকা।"

সেইসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—"সূত্রাকারে ইহাই শ্রীপ্রেমানন্দের স্বরূপ-পরিচয়।"

ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপা, ব্রজগোপীও অবশ্যই ভাবময়ী। সম্ভবত সেইজন্যই স্বামী প্রেমানন্দ (তখন বাবুরাম) শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরে বসেছিলেন যাতে তাঁর ভাবসমাধি হয়।

সন্তানের আবদার কী করে রাখা যায় ভেবে শ্রীরামকৃষ্ণ শেষে জগদম্বা শ্রীশ্রীভবতারিণীকে আবেদন জানালেন—"মা, বাবুরামের যাতে একটু ভাবটাব হয় তাই করে দে।"—কেন না "যদি না হয় তাহলে সে আর এখানকার কথা মানবেনি।"

কিন্তু মা বললেন, "ওর ভাব হবে না, ওর জ্ঞান হবে।"

যিনি স্বরূপে স্বয়ং ভাবময়ী তাঁর আর আলাদা করে 'ভাব'-এর কি দরকার।

শ্রীশ্রীজগদম্বার এই নির্দেশের গূঢ় তাৎপর্যও আছে বলে মনে হয়। ঠাকুরের লীলাসহচর হয়ে

বাবুরাম যে জন্য এসেছেন, তাতে ভাবসমাধিতে মগ্ন বা ভাবাবিষ্ট হয়ে থাকলে চলবে না।

বিশেষ প্রয়োজন সাধনের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ বাবুরামের মাকে বলেছিলেন, "তোমার এই ছেলেটিকে ইখানকে দাও।"

শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবী উত্তর দিয়েছেন, "বাবা, আপনার কাছে আমার ছেলে থাকবে এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।"

ঐ বিশেষ প্রয়োজন ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ঠাকুরের সেবা। শেষ ক-বছর যাঁরা তাঁর কাছে থাকতেন তাঁদের মধ্যে 'দরদী' বাবুরামকে নিয়তই সজাগ থাকতে হত—বিশেষ করে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন সমাধিতে বা ভাবাবস্থায় বাহ্যজ্ঞানের স্তর পার হয়ে যেতেন। ঐ অবস্থায় ঠাকুর "নৈকষ্য কুলীন, হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ"—আঠারো আনা শুদ্ধসত্ত্ব বাবুরাম ছাড়া আর কারও স্পর্শ সহ্য করতে পারতেন না।

পরবর্তিকালে ঠাকুরের সেবা ভক্তসেবায়, শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠাশ্রিত কনীয়ান্ সাধু-ব্রহ্মচারীদের লালনে পালনে রূপান্তরিত হয়েছে। ঠাকুরের অন্তহীন ভালবাসার অনুধ্যান তাঁর অন্তরে অবশ্যই ছিল, ঠাকুরের গল্পচ্ছলে সহজ শিক্ষা দেবার কথা তিনি বার বার বলেছেনও; কিন্তু পরিণত বয়সে তাঁর হৃদয় থেকে স্নেহ-প্রীতির যে সুশান্ত ধারা নিঃসৃত হয়েছে, তার মূলে পরম করুণাময়ী জননীর অতল-গভীর স্নেহের প্রেরণা ছিল না কি!

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গলাভের সমকাল থেকেই বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীমার সান্নিধ্যে এসেছিলেন। শ্রীশ্রীমা এ সময়ে নিজেকে এমন-ভাবে সংবৃত করে রেখেছিলেন যে তাঁর সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না। তবে সন্তানদের উপর তাঁর যে নিয়ত সজাগ দৃষ্টি ছিল তা অজানা থাকেনি।

দক্ষিণেশ্বরে একরাত্রের কথা। ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে বাবুরাম জ্বর-গায়ে শুয়ে আছেন—ঠাকুর তাঁর খাটটিতে ভাবনিমগ্ন।

নহবতের ছোট ঘরটিতে শ্রীশ্রীমাও ধ্যানলীনা; কিন্তু তিনি দেখছেন—তাঁর বাবুরামের খুব খিদে পেয়েছে, সেজন্য তিনি ঘুমোতে পারছেন না।

সন্তানবৎসলা তখনই ঠাকুরের ঘরে ছুটে গেছেন—হাতে একখণ্ড মিছরি।

শ্রীরামকৃষ্ণ সজাগ হয়ে বলেছেন, "দিও না, দিও না।"

বাবুরাম সাধু হতে এসেছেন—তিতিক্ষা তাঁর সাধনার অঙ্গ।

ঠাকুর প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে চিহ্নিত ত্যাগী সন্তানের ভবিষ্যৎ দেখছেন; কিন্তু হৃদয়ের গভীর থেকে জননী প্রত্যক্ষ করেছেন সন্তানের আশু প্রয়োজন কী!

মাতৃহৃদয়েরই জয় হয়!

দক্ষিণেশ্বরেরই আর একটি ঘটনা।—

যেসব বালক ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাস করতেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের রাত্রের আহার্যের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। বাবুরামের বরাদ্দ চারখানি রুটি। ঠাকুর একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে শ্রীশ্রীমা তাঁকে পাঁচ-ছখানি রুটি খাওয়ান।

শ্রীরামকৃষ্ণ "এইরূপ বিবেচনাহীন স্নেহের দ্বারা বালকদের ভবিষ্যৎ নষ্ট" করার অনুযোগ করেছেন।

উত্তরে শ্রীশ্রীমা বলেছেন, "ও দুখানি রুটি বেশি খেয়েছে বলে তুমি অত ভাবছ কেন? তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব! তুমি ওদের খাওয়া নিয়ে কোনো গালাগালি কোরো না।"

মা জানেন, তাঁর সন্তানদের কার পেটে কী সয়, কতটা সয়! উপদেশক্রমে ঠাকুর নিজেও এই উপমা কতবার দিয়েছেন।

সন্তানেরাও মায়ের উপর একান্ত নির্ভর। তাঁর ইচ্ছা তাঁর অনুজ্ঞাই সব।

পরে একসময় (১৯১২ খ্রীঃ) মালদহের ভক্তরা যখন স্বামী প্রেমানন্দকে তাঁদের উৎসবে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁকে নিতে এসেছেন, তিনি শ্রীশ্রীমার অনুমতি-ভিক্ষা করেছেন।

বাবুরাম মহারাজ অল্প কিছুকাল আগে অসুখ থেকে উঠেছেন বলে শ্রীশ্রীমা প্রথমে মত দেননি; কিন্তু তিনি না গেলে উৎসব একেবারে পণ্ড হবে শুনে বলেছেন, "এরা এত করে বলছে, তবে কি তুমি যাবে?"

বাবুরাম মহারাজ বলেছেন, "আমি কী জানি মা, আমি কী জানি! আমাকে যা আদেশ করবেন তাই করব। জলে ঝাঁপ দিতে বলেন, জলে ঝাঁপ দিব, আগুনে ঝাঁপ দিতে বলেন, আগুনে ঝাঁপ দিব, পাতালে প্রবেশ করতে বলেন, পাতালে প্রবেশ করব। আমি কী জানি?"

শ্রীশ্রীমা একটু চুপ করে থেকে বলেছেন, "যাও, একবার এসো গিয়ে, তবে বেশি দিন থেকো না।"

['শ্রীশ্রীমায়ের বাবুরাম', প্রেমানন্দ-প্রেমকথা]

বেলুড় মঠ স্থাপিত হওয়ার তিন বছর পরে (অক্টোবর ১৯০১ খ্রীঃ) স্বামী বিবেকানন্দ মঠে দুর্গোৎসবের আয়োজন করেছিলেন। পরের বছরই স্বামীজী ঠাকুরের চরণে লীন হলে পূজা কয়েক বছর বন্ধ থাকে। স্বামী প্রেমানন্দ মঠের নিত্যকর্ম পরিচালনার ভার নিলে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা পরে বার্ষিক উৎসবে পরিণত হয়।

'প্রেমানন্দ-প্রেমকথা' থেকে কিছু অংশ—

"পূজার প্রথম বৎসর যজমানরূপে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর নামে সংকল্প করা হইয়াছিল, তদবধি সেই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে। ঠাকুরের সন্তানেরা মাকে সাক্ষাৎ জগদম্বা জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের ভাবনায় তিনিই ছিলেন একাধারে যজমান ও যাজ্যা, অর্থাৎ আরাধ্যা দেবী। পূজার সময় কলিকাতায় থাকিলে মা মঠে আসিয়া পূজার কয়দিন উত্তরপাশের বাগানবাড়ীতে অবস্থান করিতেন। তাঁহার আগমনে উৎসবের উল্লাস শতগুণে বৃদ্ধি পাইত।"

'বোধনের দিন' (১৯১২) মার গাড়ি আসিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া বাবুরাম মহারাজ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং মঠের প্রবেশ-দ্বারে কদলীবৃক্ষ রোপিত ও মঙ্গলঘট স্থাপিত হয় নাই দেখিয়া বলিলেন, "এখনো কলাগাছ মঙ্গলঘটের দেখা নাই, মা আসবেন কি!" দেবীর বোধন শেষ হইবামাত্র মার গাড়ি আসিয়া মঠে পৌঁছিল। গোলাপ-মা তাঁহাকে হাত ধরিয়া গাড়ি হইতে নামাইলেন, নামিয়াই মা বলিয়া উঠিলেন, "সব ফিটফাট, আমরা যেন সেজে গুজে মা-দুর্গাঠাকরুণ এলুম!"······

"মহাসপ্তমীর দিন (১৯১৬) প্রত্যুষে চণ্ডী-মণ্ডপে নব পত্রিকা প্রবেশের পর শ্রীশ্রীমা ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া মঠে আসিলেন।······মঠের প্রবেশদ্বার হইতে চণ্ডীমণ্ডপ পর্যন্ত সমস্ত পথ পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। প্রেমানন্দ স্বামিজী মাকে সাদরে আহ্বান করিয়া মঠের ভিতর লইয়া আসিলেন।···'মহামায়ী কী জয়' রবে গঙ্গাতীর মুখরিত হইয়া উঠিল। মা ঠাকুরঘরের সিঁড়ির নিকট উপস্থিত হইলে শুকুল মহারাজ তাঁহাকে পঞ্চপ্রদীপে আরতি ও বাবুরাম মহারাজ চামরব্যজন করিলেন।" (শ্রীশ্রীসারদা দেবী)

এই বছরই অষ্টমী পূজার দিন শ্রীশ্রীমা প্রতিমা-দর্শন করতে এসে মঠ ঘুরে ঘুরে দেখেছেন। রান্নাঘরের পাশের হলঘরে কয়েকজন ভক্ত আর সাধু-ব্রহ্মচারী কুটনো কুটছেন দেখে তিনি বলেছেন, "ছেলেরা তো বেশ কুটনো কোটে!"

স্বামী জগদানন্দ বলেছেন, "ব্রহ্মময়ীর প্রসন্নতা-লাভই হল উদ্দেশ্য, তা সাধন-ভজন করেই হোক,

আর কুটনো কুটেই হোক।"

কথাগুলি স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের শিক্ষারই বাঙ্ময় প্রকাশ।—মঠের প্রতিটি কাজই তাঁর কাছে ঠাকুরের সেবা, অদ্বয়স্বরূপা শ্রীশ্রীমায়ের অর্চনা।

শ্রীশ্রীমাকে তিনি যে কী দৃষ্টিতে দেখতেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' প্রথম ভাগে উদ্ধৃত একটি পত্রাংশে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এক ভক্তকে তিনি লিখেছেন, "শ্রীশ্রীমা মনুষ্যদেহধারিণী হ'লেও তাঁর অপ্রাকৃত ভাগবতী তনু; জীবের কল্যাণের জন্য মনুষ্যবৎ লীলা করছেন।"

'প্রেমানন্দ প্রেমকথা' থেকেও দুটি দৃষ্টান্ত চয়ন করা যেতে পারে।—

বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ী'তে (উদ্বোধন) প্রবেশ করার সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে চাতাল থেকে ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে সঙ্গী স্বামী বরদানন্দকে অনুরূপ আচরণ করতে বলে তিনি বলেছেন, "উপরে কে আছেন জানিস? এবার দুহাত আর মুণ্ডমালা রেখে এসেছেন তোদের জন্যে।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তিনটি ছেলেকে দীক্ষা দেবার জন্য চিঠি দিয়ে জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। স্বামী গৌরীশানন্দ এ সম্পর্কে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে মা মন্তব্য করেছেন, "ছেলে আমার বিদেশে গিয়ে শেষকালে এই জিনিস পাঠালে।"

শুনে মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) স্তব্ধ হয়ে গেছেন।

স্বামী প্রেমানন্দ দুহাত তুলে মার উদ্দেশ্যে বারবার প্রণাম করতে করতে বলেছেন, "ধন্য মা। তিনি ঐসব বিষ নিজে গ্রহণ করে আমাদের মতন সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখছেন। তিনি নিজে ঐ বিষ গ্রহণ না করলে আমরা কবে জলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতুম।"

মায়ের ভালবাসা দিয়ে তিনি ঠাকুরের সন্তান-সন্ততিদের যেন বুকে করে আগলে রাখতেন। ছেলেদের কাছে (ভক্ত মেয়েদের কাছেও) তিনি ছিলেন মঠের মা!

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' প্রথম ভাগে [পৃ ৭৪] দেখি, স্বামী প্রেমানন্দ যেদিন (১৩ শ্রাবণ, ১৩২৫) ঠাকুরের চরণে মিলিত হন, সেদিন রাত্রে শ্রীশ্রীমা এক ভক্ত মেয়েকে বলছেন—

"এসেছ, মা, বস! আজ বাবুরাম আমার চলে গেল। সকাল হতে চক্ষের জল পড়ছে।...... বাবুরাম আমার প্রাণের জিনিস ছিল। মঠের শক্তি, ভক্তি, যুক্তি সব আমার বাবুরামরূপে গঙ্গা-তীরে আলো করে বেড়াত।"

একটু পরে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বড় ছবির পায়ে মাথা রেখে মর্মভেদী করুণ স্বরে বলেছেন, "ঠাকুর নিলে!"

এরপর কদিন তিনি ফিরে ফিরে তাঁর বাবুরামের কথাই বলেছেন।

মাতৃহৃদয়ের এই হৃদয়মথনী আর্তির পরি-প্রেক্ষায় ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য-লিখিত 'শ্রীশ্রীসারদা দেবী'র একটি বর্ণনা স্মরণ করতে পারি। স্বামী প্রেমানন্দের মহাসমাধির মাত্র দুদিন আগে স্বামী মহাদেবানন্দ শ্রীশ্রীমার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, "মা, আপনি বলুন যাতে বাবুরাম মহারাজ সেরে ওঠেন।"

শ্রীশ্রীমা উত্তর দিয়েছেন, "আমি কি তা বলতে পারি? ঠাকুরের যা ইচ্ছে তাই হবে।" [সপ্তবিংশ অধ্যায় 'ভক্তবৎসলা: নিত্যলীলাময়ী']

সন্তানবৎসলা করুণাময়ী, কিন্তু দিব্যা জননী। যিনি স্বয়ং মহামায়া, দেবপুরুষ সন্তানের সঙ্গে কি তাঁর মায়িক সম্পর্ক! মাতৃহৃদয় বিচ্ছেদ-বেদনায় কাতর, কিন্তু এ তো তাঁর অজানা নয়—নদী গিয়ে মহাসাগরে মিশছে!

আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের কয়েকটি আশ্রম

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসাক

[পূর্বানুবৃত্তি]

এদেশ থেকে যাওয়ার সময় মাত্র এক জোড়া গরম মোজা নিয়ে গিয়েছিলাম। সতত ব্যবহারে সেটা গোড়ালির দিকে একটু কেটে গেছে। স্বামী স্বাহানন্দের দৃষ্টি এড়ায় না। সঙ্গে সঙ্গে দুজোড়া মোজা দিয়ে দিলেন। অত্যন্ত দরদী, স্নেহপ্রবণ মন। তাঁর গায়ের একটি জ্যাকেট আমার পছন্দ হওয়ায়, আমি ঐরূপ একটি জ্যাকেট কিনতে চাইলে, তিনি মার্কেট থেকে আমার গায়ের মাপের একটি জ্যাকেট আনিয়ে আমাকে উপহার দিলেন। আমেরিকান ডলার খরচ করতে নিষেধ করলেন, পরে অন্য কাজে লাগবে বলে। আশ্রমের দীক্ষিতা ঐ দেশীয় জনৈকা ভক্ত শ্রীমতী অমৃতা একদিন আমাকে এখানের একটি মার্কেটিং কমপ্লেক্সে (marketing complex-এ) নিয়ে গিয়েছিলেন। সে যেন এক ইন্দ্রপুরী। ৪।৫ তলা বাড়ি। সব জিনিস এক জায়গায় পাওয়া যায়। উপরে যাতায়াতের জন্য চলন্ত সিঁড়ি (escalator) রয়েছে। এক একটা তলায় এক একটা বিভাগ (department)। লোকের হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি নাই, নাই কোন চিৎকার। সবই হচ্ছে অতি সংযত, সুষ্ঠুভাবে।

একদিন স্বামী ভবেশানন্দের সঙ্গে হলিউডের নামকরা ইউনিভার্সেল স্টুডিও (Universal Studio) দেখতে গেলাম। অনেকখানি জায়গা নিয়ে এই স্টুডিও। হেঁটে দেখা সম্ভব নয়, তাই Conducted tour-এর বাসে চাপতে হল। যাবার পথে দেখানো হল একটি বাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলছে, যখনই কোন বাড়িতে আগুন লেগেছে এমন ছবির দরকার হয়, তখন এখানে ছবি তোলা হয়। এ বাড়ি কোনদিন ভস্মীভূত হয় না। দরকার মতো আগুন নিভিয়ে দেওয়া হয়। যেতে যেতে হঠাৎ ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি। আসলে নকল বৃষ্টি (artificial rain)। খুব উঁচুতে জল পাম্প করে তুলে, ফোয়ারার মাধ্যমে ছাড়া হচ্ছে। এক জায়গায় দেখলাম, কাছারি বাড়ি, ডাকঘর, বহু পুরানো আমলের রাজা মহারাজের বিচার স্থান—কিন্তু সবই শূন্য। লোক নেই। যখন যেমন দরকার হয়, এসব জায়গায় অভিনয় করে ছবি তোলা হয়।

একদিন যাওয়া হল Disney Land-এ। হলিউডের এ-জায়গা সবাই দেখতে আসে। স্বামী স্বাহানন্দ স্বয়ং নিয়ে গেলেন। সঙ্গে ছিলেন, স্বামী কৃষ্ণানন্দ, বোস্টন কেন্দ্র থেকে সদ্য আগত লালজী মহারাজ, আর হলিউড কেন্দ্রের অমৃতা। বহু দেখবার জিনিস রয়েছে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে দেখেও শেষ করা যায় না। Disney Land-এর সব দ্রষ্টব্য স্থানের উল্লেখ সম্ভব নয়। ২।১টা উল্লেখ করছি। একজায়গায় ওদেশীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হচ্ছে। সমস্ত অডিটরিয়ামটি (auditorium) ধীরে ধীরে চারিদিকে ঘুরছে। আমাদের দেশে, স্টেজ (stage) ঘোরে, অডিটোরিয়াম স্থির থাকে। অন্য আর এক জায়গায় ওদেশের গান (Symphony orchestra) হচ্ছে। সেখানে নানান রকমের পাখী (stuffed bird), ফুল পাতা—সকলেই সেই ঐকতানে যোগ দিচ্ছে। তালে তালে, ফুলের পাপড়ি খুলছে, বন্ধ হচ্ছে। দুই পাপড়ির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট গানের কথা বেরোচ্ছে। লতাপাতা গানের তালে তালে হেলছে, দুলছে। পাখিদের ঠোঁট খুলছে, বন্ধ হচ্ছে, ঠোঁটের মধ্য থেকে গানের কলি বেরুচ্ছে। সর্বত্র যেন চৈতন্যময়। এত সুন্দর যে নকল (artificial) বলে মনে হয় না।

তারপর নৌকাভ্রমণ। নৌকায় চালক নেই। এক একটা নৌকায় ৫।৬ জন আরোহী নিয়ে নৌকা আপনা আপনি চলে জলের মধ্যে—গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। সে সব জঙ্গলে বাঘ, ভল্লুক প্রভৃতি নানান হিংস্র জন্তু সাজানো রয়েছে। জলে রয়েছে জলহস্তী, কুমীর প্রভৃতি। নৌকা পাশ দিয়ে গেলে, তারা বিরাট 'হাঁ' করে, কিন্তু কোন ক্ষতি করবার সামর্থ্য নেই। সবটাই নকল। তারপর রয়েছে সাবমেরিন। এতে চড়ে সমুদ্রের অতল গহ্বরের দৃশ্য দেখুন। দেখবেন, এর ভেতরে মৎস্যকন্যা (mermaid) ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রথমটা চমকে উঠতে হয়, তারপরই মনে হয়, খেলাঘর করেছে ভাল। আরও কত কি রয়েছে। ভুতুড়ে বাড়ি রয়েছে। তার ভেতর ঢুকলে কতরকম উদ্ভট ভৌতিক ব্যাপার দেখবেন ও শুনবেন।

হলিউড থেকে স্যাণ্টাবারবারা। অতি রমণীয় স্থান স্যাণ্টাবারবারা। সমুদ্রের নীলাভ জল ও সুদূরপ্রসারী সৈকত আশ্রমের বসবার ঘর থেকে দেখা যায়। শুধু তাকিয়ে থাকুন, কোথা দিয়ে সময় কেটে যাবে। একজন সাহেব ভক্ত এই আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক। স্যাণ্টাবারবারার সন্ন্যাসিনীরা আমাদের একদিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন। দু-রাত্রি এই কেন্দ্রে কাটিয়ে আমরা আবার হলিউডে ফিরে এলাম।

হলিউড থেকে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য স্মৃতিবিজড়িত মিড্‌ভগিনীদের প্যাসাডেনার বাড়ি দেখতে আসি। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী মিড্‌ভগিনীদের আমন্ত্রণে এই বাড়িতে এসে প্রায় ছয় সপ্তাহকাল অবস্থান করেন। বাড়িটি প্রায় একইভাবে আছে। যে ঘরে স্বামীজী থাকতেন, সেটি অধুনা ধ্যানঘরে রূপায়িত। তাঁর ব্যবহৃত ডাইনিং টেবিল, এখনও বর্তমান। যে রান্নাঘরে তিনি রান্না করেছিলেন, তা এখনও অতীতের সাক্ষিরূপে রয়েছে। এই বাড়িটি ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হলিউড্‌ কেন্দ্রের কর্তৃত্বাধীনে আসে। অনতিদূরে রয়েছে গ্রীন হোটেল, সেক্সপীয়ার ক্লাব, যেখানে স্বামীজী কয়েকটি অতি মূল্যবান বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

হলিউড কেন্দ্রে প্রায় ১০।১২ দিন ছিলাম। বিদায়ের দিন এসে গেল। সকালে বয়োবৃদ্ধ সাধু স্বামী কৃষ্ণানন্দ এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবার জন্য তৈরি। তাঁর হাতে একটি প্যাড্‌ দেওয়া গরম জ্যাকেট—আমাকে উপহার দেবেন। আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিত বোধ করছিলাম। যাহোক তিনি আমাকে লস এন্‌জেলস্‌ এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিলেন।

সেণ্ট লুই এয়ারপোর্ট। প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জে পা দিয়েই দেখি, স্বামী চেতনানন্দ ও আর একজন ওদেশীয় ব্রহ্মচারী (পরে জেনেছিলাম, ব্রঃ কিথ) উপস্থিত। মিনিট কুড়ির ড্রাইভ্‌,—আশ্রমে পৌঁছে গেলাম। স্বামী চেতনানন্দ বললেন: 'বেস বল' (Base Ball) খেলা দেখতে যাবেন? টিকিট আছে। সম্মতি জানাই। ৬টা নাগাদ স্টেডিয়ামে গেলাম—স্বামী চেতনানন্দ ও আরও দুই ব্রহ্মচারীর সঙ্গে। বেশ বড় স্টেডিয়াম। প্রায় ৫০ হাজার দর্শক বসে খেলা দেখতে পারে। যেই এক একটা খেলা শেষ হচ্ছে, টি. ভি-তে সেটা পুনরায় দেখানো হচ্ছে। জানলাম, এই দেখে ঠিক করা হয়, referee-র judgment-এ কোথাও কিছু ভুলত্রুটি আছে কিনা। রাত ১০টা। তখনও খেলা চলেছে। 'টাই' চলেছে। কোনপক্ষই জয়ী হতে পারছে না। মহারাজকে বললাম "আর নয়, চলুন"। আশ্রমে ফিরে আসি।

সেণ্ট লুই আশ্রমে যথারীতি অন্যান্য কেন্দ্রের মতো, বক্তৃতা ঘর, ঠাকুরঘর, লাইব্রেরী ইত্যাদি রয়েছে। বেশ সাজানো, ছিমছাম ছোট আশ্রম। অন্তেবাসী ব্রহ্মচারিগণ মহারাজের সঙ্গে সকাল,

সন্ধ্যায়, বহুক্ষণ ধ্যানধারণা করেন। এই কেন্দ্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের, শ্রীশ্রীমার, শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের relics আছে। চেতনানন্দের কাছে শুনলাম, কেন্দ্রের আগের অধ্যক্ষ স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ এ-সব সংগ্রহ করে রেখে গেছেন। সেণ্ট লুই-এর প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান প্রায় ৬০০ ফুট উঁচু একটি আর্চ (Arch)। তার অনেকটা জায়গা জুড়ে basement (ভিত্তি)। সেখানে সিনেমায় দেখানো হয়, কেমন করে এই Arch তৈরি করা হয়েছিল।

তারপর শিকাগো। সেণ্ট লুই এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিলেন, স্বামী চেতনানন্দ। রওনা হলাম শিকাগোর দিকে।

শিকাগো এয়ারপোর্ট। রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের রিপোর্ট হলদে বইখানা বুকে রেখে ঘুরে বেড়াই। চেতনানন্দ শিকাগো আশ্রমে ফোনে আমার পৌঁছাবার সময় জানিয়ে দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন, মঠ মিশনের 'রিপোর্ট'খানা আমার হাতে থাকবে। ব্রঃ হ্যারল্ড এয়ারপোর্টে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি ভুল করে মনে করেছিলেন, আমার হাতে থাকবে মোটা বই Gospel of Sri Ramakrishna, তাই তিনি খুঁজছেন কার হাতে আছে 'Gospel'। ফলে কেউ কাউকে খুঁজে পেল না। খানিক্ষণ অপেক্ষা করে একটা ট্যাক্সি নিয়ে আশ্রমে আসি। ঝিরঝির বৃষ্টি হচ্ছিল। ট্যাক্সি ঠিক আশ্রমের দরজায় পৌঁছে দিল। ভাড়া নিল ১৫ ডলার। মিডওয়ে এয়ারপোর্ট থেকে এলাম, ভাড়াটা কম পড়ল। ইণ্টারন্যাশ্‌নাল পোর্ট থেকে এলে, অনেক বেশি পড়ত। শিকাগো আশ্রমের একতলায় খাবার ঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি। দোতলায় লাইব্রেরী, সুন্দর প্রশস্ত ঠাকুর ঘর। পাশের সংলগ্ন বাড়িতে থাকেন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ভাষ্যানন্দজী ও তাঁর সেক্রেটারী ব্রঃ জগন্নাথ। আশ্রমে যথারীতি সকালে পূজা, সন্ধ্যায় আরাত্রিক, ভজন হয়। একদিন ভাষ্যানন্দজী আমাকে জনৈক স্থানীয় ভক্তের সঙ্গে শিকাগোর দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে আসতে বললেন। সামনেই লেক মিচিগান। লেক না বলে 'সাগর' বললেই ভাল। পারাপার দেখা যায় না। আর্ট ইন্‌স্টিটিউটে এলাম। সেই আর্ট ইন্‌স্টিটিউট যেখানে ঐতিহাসিক পার্লামেণ্ট অফ্ রিলিজিয়নের সভা হয়েছিল,—যেখান থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম জগতে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন। এই জায়গাটিতে একটি মিউজিয়াম রয়েছে, কিন্তু এখানে যে এত বড় ঘটনা ঘটেছিল, তার কোন নিদর্শন নাই। বাড়িটিও অনেক ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত। একটি মহিলা গাইড্ আমাদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে জায়গাটি দেখাল, যেখানে একসময়ের 'পার্লামেন্টের' প্ল্যাটফর্ম ছিল, ও যেখানে ডেলিগেটরা বক্তৃতা করেছিলেন। সামনে অনেকটা খালি জায়গা। মনে হয় সেখানেই সহস্র সহস্র শ্রোতা বসে বক্তৃতা শুনেছিল। স্বামী ভাষ্যানন্দের নিকট শুনেছি তিনি এখানে স্বামীজীর একটি আবক্ষমূর্তি (bust) স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন, কিন্তু 'চার্চে'র আপত্তিতে তাঁর উদ্যম সফল হয়নি।

৫৪১, ডিয়ারবর্ন এভিন্যুতে হেল ভবন দেখতে গেলাম। সে বাড়িও নেই, নম্বরও পরিবর্তিত। হেলপরিবারের বাসভবনের স্থলে এখন নতুন অট্টালিকা শোভা পাচ্ছে। ভাষ্যানন্দজীর কাছে শুনেছি তিনি এই বাড়িটি কিনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিন লক্ষ ডলার দাম চাওয়ায়, তিনি নিরস্ত হন। কিছুদূরেই লিন্‌কন্ পার্ক। হেলপরিবারে থাকাকালীন, স্বামীজী এখানে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসতেন।

এরপর ভাষ্যানন্দজীর সঙ্গে একদিন গ্যাঞ্জেস্

টাউনে (Ganges Town) এলাম। শিকাগো থেকে অনেকটা দূর। প্রায় ১৫০ মাইল। এখানে অনেকটা জায়গা কেনা হয়েছে। ভাস্বানন্দজী ঘুরে ঘুরে দেখালেন, কেমন করে ধীরে ধীরে এখানে আশ্রম গড়ে উঠেছে। প্রথমে এখানে কিছুই ছিল না। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় গড়ে উঠেছে এখানে ছোটখাট সুন্দর আশ্রম। বিরাট হলে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি স্থাপিত। হলটি লেকচার, আলোচনা, পাঠ প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়। এই গ্যাঞ্জেস্ টাউন কেন্দ্রে একটি মিউজিয়াম আছে, যেখানে স্বামীজীর হেলপরিবারকে স্বহস্তে লিখিত বহু পত্র রয়েছে। সব চিঠিরই ঠিকানা ৫৪১ ডিয়ারবর্ন এভিন্যু। আর—একটি রয়েছে হেলপরিবারের তদানীন্তন গৃহের কাঠের দরজার একটি অংশ। গ্যাঞ্জেস্ টাউনে তিন রাত্রি মহা আনন্দে কাটাবার পর ফের শিকাগোতে ফিরে আসি।

পরের দিন সিয়াট্‌ল রওনা হবার দিন। ভাস্বানন্দজীর সঙ্গে ইণ্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট-এ এলাম। মহারাজজী আমার লাগেজ 'চেক্ ইন্' করিয়ে, প্লেনের বোর্ডিং পাশ করিয়ে, বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমার প্লেন ছাড়তে বেশ কয়েক ঘণ্টা দেরি। তা ছাড়া ঐ দিন স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী কিছুক্ষণ পরে শিকাগো এয়ার-পোর্টে এসে পৌছবেন। তাঁকে নিয়ে তিনি আশ্রমে ফিরে যাবেন।

যথাসময়ে প্লেন ছাড়ল। আবার সিয়াট্‌ল। এয়ারপোর্টে ভাস্বরানন্দজী মহারাজ ও ব্রঃ বিনয়-চৈতন্য আমাকে নিতে এসেছিলেন।

সিয়াট্‌ল পৌছবার পর স্যাক্রামেণ্টো থেকে পূজনীয় বিমলদার ফোন—"কেমন আছ? শরীর ঠিক আছে তো?" স্যাক্রামেণ্টো ছাড়বার পর যে যে আশ্রমে গেছি, বিমলদা সেই সেই আশ্রমে ফোন করে আমার খবরাখবর করেছেন। দেখতে দেখতে মাস দেড়েকের বেশি হয়ে গেল দেশ ছেড়েছি। এবার ফেরার পালা। চল মুসাফির—বাঁধ গাঁঠরিয়া।

এখানের একটি দ্রষ্টব্য স্থান—প্রায় ১০০ মাইল দূরে—মাউণ্ট রেইনার (Mt. Rainier) এখনও দেখা হয়নি। একদিন সকালে আশ্রমের গাড়িতে মহারাজ আমাকে পাঠালেন—সঙ্গে ব্রঃ মুক্তিচৈতন্য ও ব্রঃ বিনয়চৈতন্য। এঁরা পালা করে ড্রাইভ করবেন। দিনটা ছিল মেঘাচ্ছন্ন। রওনা হবার পর এল বৃষ্টি। ব্রহ্মচারিদ্বয় বললেন, এখানের আবহাওয়া অত্যন্ত অনিশ্চিত। হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পর পাহাড়ের পাদদেশে পৌছলাম। চারিদিকে বরফ পড়ে রয়েছে। আমরা যখন পৌছলাম, দারুণ ঝড়, সঙ্গে সঙ্গে তুষারপাত হচ্ছে। সারা আকাশময় তুষারপাতের অবর্ণনীয় দৃশ্য যে দেখেছে, সেই জানে, কি বিস্ময়কর ব্যাপার যাই হোক, সামনেই বিশ্রামের জায়গা। এখান থেকে ঘুরে ঘুরে উঠতে হয় উপরে কাঁচঘের প্রশস্ত বসবার স্থানটিতে—যেখান থেকে চারি-দিকের অপরূপ দৃশ্য দেখা যায়। গাড়ি থেকে নেমে বিশ্রামাগারে যেতে না যেতে গায়ের কো তুষারকণায় ভরে গেল। মজা এই, সেগুলি ঝেড়ে ফেললেই পড়ে যায়। আমরা ওপরে উঠে তুষারপাতের দৃশ্য দেখছি। ভাবছি আজ মাউণ্ট রেইনার দেখবার কোনই সম্ভাবনা নেই। হঠাৎ ব্রহ্মচারিদ্বয়ের চিৎকার—'Look', 'Look'—'দেখ, দেখ'। ক্ষণেকের জন্য তুষারপাত বন্ধ হয়ে, মেঘ, কুয়াসা অপসারিত হয়েছে। চোখের সামনে অভ্রভেদী তুষারমৌলী মাউণ্ট রেইনার ঝলমল্ করে উঠল। আর সেইসঙ্গে আশেপাশের শৃঙ্গরাজিও স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। কি অদ্ভুত দৃশ্য! কিন্তু অতি অল্পক্ষণের জন্য। ১০।১৫ মিনিটের মধ্যেই আবার সব ঢেকে গেল।

আমাদের সঙ্গে ছিল লাঞ্চ প্যাকেট ও থার্মসে গরম কফি। মনের তৃপ্তির সঙ্গে শারীরিক তৃপ্তি মিশিয়ে 'পূর্ণকাম' হয়ে আশ্রমে ফিরলাম সন্ধ্যার একটু আগে।

বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষে সিয়াট্‌ল-এর এক বৌদ্ধ মন্দিরে অনুষ্ঠিত হবে এক সভা,—বিষয় 'Harmony of Religions'। ২৫ মে সভার দিন নির্দিষ্ট হয়েছে। হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিস্বরূপ স্বামী ভাস্বরানন্দ সে সভায় আমন্ত্রিত। মহারাজজীর সঙ্গে আমরা অনেকেই গেলাম। দেখি, বড় হল-ঘর প্রায় ভরে গেছে। আমরা যাবার কিছু-ক্ষণের মধ্যেই সব স্থান পূর্ণ, বহু লোক চেয়ারের অভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সভা আরম্ভ হল। খ্রীষ্টান, জৈন, মুসলমান, বৌদ্ধ, পারসী ধর্মের প্রতিনিধিদের মধ্যে কেউ বা করলেন প্রার্থনা, কেউ সঙ্গীত, কেউ বা দিলেন সংক্ষিপ্ত ভাষণ। তারপর এল হিন্দুধর্মের পালা। আগে থেকে ঠিক করা ছিল, আমরা অনুষ্ঠান কিভাবে করব। প্রথমেই আরম্ভ হল শুভ শঙ্খধ্বনি দিয়ে। পর পর দুটি ভক্তিগীতি পরিবেশিত হল। তার ইংরেজী অনুবাদ করলেন জনৈক ভক্ত। শেষে ভাস্বরানন্দজী অতি সংক্ষেপে বেদান্তের সার কথা বললেন এবং বৈদিকমন্ত্র আবৃত্তি করে হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠান শেষ করলেন। হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠানটি এই সভায় সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ও মর্মস্পর্শী হয়েছিল।

পরদিনই (২৬ মে) আমার বিদায়ের দিন। বেশ কিছুদিন থেকে সিয়াট্‌ল আশ্রমের সঙ্গে যেন নিবিড় আত্মীয়তাসূত্র গড়ে উঠেছিল। চলে যেতে একেবারেই মন চাইছিল না। যাই হোক, এইদিন সকালে এয়ারপোর্টে এলাম স্থানীয় ভক্ত শ্রীযুক্ত পার্থ মুখোপাধ্যায়ের গাড়িতে। সঙ্গে এলেন স্বামী ভাস্বরানন্দ, মিঃ জেমস্‌, ও মিসেস্ দেবরা ফ্রিড্‌ম্যান। প্রণাম ও করমর্দনের পালা শেষ করে, বিদায় নিয়ে ভারাক্রান্ত মনে প্লেনে উঠলাম।

প্লেন ছাড়ল, আমার শরীরই চলল প্লেনের সঙ্গে, কিন্তু মন পড়ে রইল সিয়াট্‌ল বেদান্ত সোসাইটির আনাচে কানাচে। ২৭ মে পৌঁছলাম ব্যাঙ্কক-এ। আবার সেই এয়ারপোর্ট হোটেল। তবে এবার আর কোন অসুবিধা হয়নি। ২৮ পৌঁছলাম দমদম এয়ারপোর্টে।

কতই খেলা করছ

শ্রীশান্তশীল দাশ

আমার জীবনখানি নিয়ে
ভাঙছ এবং গড়ছ,
ইচ্ছেমতো কতই খেলা করছ।
চোখের জলে ভাসিয়ে আবার
মুছিয়ে দিয়ে সেই আঁখিধার
আনন্দেরই ঝরনাধারায়
জীবন আমার ভরছ।

করার কিছু নেই যে আমার,
কাঁদছি এবং হাসছি;
কান্নাহাসি দুয়ের স্রোতে
বারেবারেই ভাসছি।
ভাসতে ভাসতে যেন শেষে
একেবারেই না যাই ভেসে;
দেখি যেন আমায় তুমি
দু হাত দিয়ে ধরছ।

শ্রীশ্রীমা ও নারীজাতির আদর্শ

শ্রীমতী ব্রততী চন্দ

আজ সারা পৃথিবীতে নারীজাতির দৃষ্টিভঙ্গিতে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। পুরুষ ও স্ত্রীর প্রকৃতি ও ক্ষমতা আলাদা। সামাজিক ও জাতীয় জীবনে পুরুষ ও নারীর কাজ ভিন্ন ভিন্ন—ইতিহাসের এই প্রাচীন ধারণাকে ম্লান করে দিয়েছে পাশ্চাত্যের নারীরা। জীবনের চলার পথের প্রতিটি পদক্ষেপে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার, নারীমুক্তি, নারী-স্বাধীনতা আন্দোলনের ধ্বনিতে আজকের পৃথিবী সোচ্চার। ভারতবর্ষের মেয়েদের চিন্তাধারাও অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। কেবলমাত্র পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে নিজেদের আবদ্ধ রাখতে আর রাজী নয় ভারতীয় নারীরা। শত শত বৎসর ধরে ভারতীয় নারীর প্রধান কর্মকেন্দ্র গৃহ। কিন্তু ঠিক আজকের দিনে অন্তঃপুরের অন্তঃকোণ আর বহির্জগতের মধ্যে এক সুন্দর সেতুবন্ধন করে পূর্ণতর জীবনযাপনের দাবি করছি আমরা ভারতীয় নারীরা। বলাবাহুল্য, আমাদের ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় এই বিপ্লবাত্মক মনোভাবকে বাস্তবে রূপ দেওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আমাদের ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারীর স্থান আদৌ সন্তোষজনক নয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পরাধীন ভারতের নারীর জীবনে এতবছর পরেও স্বাধীনতা তেমন কোন সৌগন্ধ বহন করে আনেনি। কিছু ব্যতিক্রম সবকালেই ছিল, আজও আছে। সাধারণ নারীর জীবন পারিবারিক গণ্ডির বাইরে এখনও আসতে পারেনি। প্রাচীন কুসংস্কার যাই যাই করেও বেশ শক্ত হাতে বেঁধে রেখেছে আমাদের। উইমেন্‌স লিব—পাশ্চাত্যের নারীর জীবনকে আলোকিত করেছে। অবশ্য এতে তাদের কতটা সুখ হয়েছে বলা শক্ত। অগ্রগতির আলো আমাদের ভারতীয় নারীর একান্ত কাম্য। কিন্তু আমাদের সনাতন নীতির পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে অবশ্যই নয়।

আমাদের দেশে সুপ্রাচীনকাল থেকেই পতিকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা নারীত্বের অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। রামায়ণ, মহাভারতে গান্ধারী, দ্রৌপদী, সীতার পতিভক্তির অপূর্ব নিদর্শন দেখতে পাই। গান্ধার দেশের রাজার মেয়ে গান্ধারী। অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে বিবাহিত হওয়ার পরে নিজের চোখ বেঁধে অন্ধ হয়েছিলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন চোখের বাঁধন খোলেননি। পুরাণে এরকম অনেক দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই। পরবর্তী যুগেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে পাই শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনে।

গীতা, রামায়ণ ও মহাভারতের যে ভারতবর্ষ, উপনিষদের যে ভারতবর্ষ তার নারীর চিরন্তন রূপ শ্রীসারদা মায়ের জীবনে পরিস্ফুট হয়েছিল। নারীর নারীত্ব বিকশিত হবে প্রকৃত পথে। সে পথে নারী কখনও বিচলিত হবে না। বিজয়িনীর মতো সে পথ পার হয়ে চরম সার্থকতার পথে এগিয়ে চলবে। সে পথ—বিদ্যার, প্রেমের, পাতিব্রত্যের, ধর্মনিষ্ঠার, সেবা ও ত্যাগের। আমাদের জননী সারদাদেবীর জীবনেও সেবা ও ত্যাগের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখতে পাই যা তাঁর জীবনকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছে। নারী কন্যারূপে পিতা-মাতার, বধূরূপে শ্বশুর-শাশুড়ীর, আত্মীয়-পরিজনের; স্ত্রীরূপে স্বামীর ও মাতারূপে পুত্র-কন্যার সেবা করে থাকে। আত্মবিশ্বাস আর সন্তানের প্রতি বিশ্বাস—মাতৃত্বের চরম রূপ। তাই শ্রীমা জগতের

'মা'। শ্রীশ্রীঠাকুরই তাঁকে করেছেন জগন্মাতা। তিনি বলতেন, 'তুমি যে মা; মায়ের কি তুলনা হয় গো'।

শ্রীমা ছিলেন মূর্তিমতী সেবারূপিণী। সেবাই নারী-জীবনের স্বভাবজাত ধর্ম। এই ধর্ম যার স্বভাবে বিকশিত হয়ে মাধুর্য দান করেছে সেই নারীই অনন্যা, অসাধারণী, মহীয়সী। বিদেশিনী নিবেদিতা সেই গাঁয়ের মেয়ে সলজ্জ বধূ সারদা-দেবী প্রসঙ্গে বলেছেন, 'অতি সাধারণ নারী-চরিত্র, কিন্তু জ্ঞান আর মাধুর্যের অপূর্ব সমাবেশ। প্রার্থনার নীরবতার মতো পবিত্র শান্ত তাঁর জীবন।' শ্রীমা ভারতীয় নারীদের পাতিব্রত্যের আদর্শস্বরূপা। কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্য দেশে এমন চরিত্র নেই বললেই চলে।

মানবধর্মের অপর একটি মূল্যবান সম্পদ ত্যাগ। ভারতবর্ষে ত্যাগই শ্রেষ্ঠ ও মহৎ ধর্ম। পুরাণ, উপনিষদে ভারতীয় নারীর ত্যাগের বহু নিদর্শন পাই। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বানপ্রস্থে যাওয়ার আগে পার্থিব সম্পদ দুই পত্নী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীর মধ্যে ভাগ করে দিতে চাইলে মৈত্রেয়ী স্বামীর কাছে গিয়ে বললেন, 'প্রভু যে পার্থিব সম্পদ আপনি আমাদের দান করে যাচ্ছেন, তা থেকে আমি কি পরমাত্মার সন্ধান পাব? ঋষি বললেন, 'না, তা তো সম্ভব নয় মৈত্রেয়ী।' স্বামীর কথা শুনে মৈত্রেয়ী তৎক্ষণাৎ তাঁর সমস্ত পার্থিব ঐশ্বর্য ত্যাগ করে স্বামীর অনুগামিনী হলেন। এই অপূর্ব ত্যাগের রূপ আবার আমরা দেখতে পাই উনবিংশ শতাব্দীর শ্রীমা সারদামণির জীবনে।

শ্রীমার হাতের সেবা শ্রীশ্রীঠাকুরের অতি প্রিয় হলেও তিনি কাউকে তাঁর সেবার জন্য পথরোধ করে দাঁড়াননি। একদিন ঠাকুরের ঘরে খাবারের জায়গা হয়েছে। শ্রীমা নহবত থেকে থালা হাতে নিয়ে বারান্দায় এসেছেন, এমন সময় 'দিন মা, আমাকে দিন' বলে একটি মেয়ে ঠাকুরের থালা ধরে নিয়ে গেল। ঠাকুর খাবার আসনে বসেই বল্লেন, 'তুমি একি করলে? তুমি কি ও-মেয়েটিকে জাননা? ও অমুকের ভাজ—দেওরকে নিয়ে থাকে।' শ্রীমা বল্লেন, 'তা আমি কি জানি, আজকে খাও।' ঠাকুর বল্লেন, 'আমি যে খেতে পাচ্ছি না। আর কোনদিন কারো হাতে আমার খাবার দেবে না বলো।' মা বল্লেন, 'তা সে আমি পারবনি ঠাকুর। তুমি তো শুধু আমার ঠাকুর নও—তুমি সকলের।' মহৎ আর উদারতার এতবড় মিলন বুঝি দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রশান্ত ব্যক্তিত্ব আমাদের নারী-সমাজের অনুপ্রেরণার চির উৎস। কতশত কাজ ও ঝামেলার মধ্যেও তাঁর মুখে কোন চাঞ্চল্য দেখা যায়নি কোনদিন। তাঁর অন্তর ছিল মহা-সমুদ্রের মতো স্থির, গভীর, অপ্রকম্প। মেয়েদের চালচলনের উপর মা সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। কারও কোন বিসদৃশ আচরণ দেখলে সঙ্গে সঙ্গে সাবধান করে দিতেন। প্রয়োজন হলে কঠোর শাসন করতেন। স্ত্রীলোকের কথাবার্তা, আচরণে সর্বদা লজ্জা, নম্রতা, মৃদুতা, সংযম প্রকাশ পায় তিনি এই চাইতেন। নিরক্ষরা কিন্তু অসাধারণ সংস্কারবতী এই রমণী উনিশ বৎসর বয়সে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে এসেই নিজের কর্তব্যপথ স্থির করে নিয়েছিলেন। সতীর ধর্ম, পতির সেবা, সহধর্মিণীর কর্তব্য, এক কথায় হিন্দু সংস্কৃতির আদর্শ নারীর পথ তিনি আমাদের দেখিয়েছেন।

মা ছিলেন 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'—বাক্যটির মূর্ত প্রতীক। তাইতো মা বলেছেন, মানুষ নিজের মন খতাতে চায় না, কেবল অপরের দোষ দেখে। নিজের দোষগুলো যদি তার চোখে পড়ে, আর সেগুলো যাতে চলে

যায় যদি তার জন্যে চেষ্টা করে, তাহলে আর অপরের দোষ দেখার প্রবৃত্তি থাকে না। সকলেই যে ঠাকুরের—এটা মনে থাকলে সকলকেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে। সকলের ভিতর ঠাকুরকে দেখতে না পেলেই ঐ সব পরনিন্দা, পরচর্চা ভাল লাগবে। নিজের উন্নতির চেষ্টা না থাকলেই অপরের ভালমন্দ নিয়ে নিজের মনকে কেবল অযথা উত্তেজিত করবেই।

সামাজিক সংস্কারের অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন আমাদের মা। জাতপাতের প্রভেদ ছিল না তার কাছে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, চণ্ডাল সকলেরই তিনি ছিলেন মা। সাগরপারের বিদেশিনীরাও মাতৃস্নেহ থেকে এতটুকু বঞ্চিত হননি। ঠাকুরের দেহ রাখার পর ঠাকুরের দর্শন পেয়ে সমাজের লোকনিন্দাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলেন। তিনি দু-হাতে দুগাছি বালা রাখতেন, সরু লালপেড়ে কাপড় পরতেন।

অতীতের ইতিহাস পড়লে দেখতে পাই ধর্মজগৎ নারীকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। 'নারী নরকের দ্বার'—সাধনার বিঘ্ন। সিদ্ধার্থ গোপাকে ত্যাগ করে অভীষ্ট সাধনার পথে চলে গিয়েছিলেন। শ্রীগৌরাংগ মহাপ্রভু সুদূর নীলাচল থেকে জননী শচী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়াকে একটিবারও দর্শন দিলেন না। আচার্য শংকর জীবনে স্ত্রী গ্রহণ করেননি। সাধনার পথে নারীর প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রীশ্রীমা কারুর অনুমতি বা আহ্বানের অপেক্ষা না করে দৃঢ়তার সঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'নারী অমৃত পথেরও দ্বার'—নতুন ভাবে পরিচিত হল নারী। শ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক জীবন ছিল আপন মহিমায় ভাস্বর। বাগানে ফুল ফোটে। সুরভিতে আমোদিত হয় চারিদিক। ফুল আপনিই ঝরে পড়ে মাটির বুকে। সাগরের অতলদেশে মুক্তার জন্ম। নীল সাগর তার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে যায়। কেউ তার খোঁজ রাখে না। শ্রীমায়ের আত্মগোপন শক্তি ছিল অসাধারণ। নিজেকে প্রচার করবার কোন ব্যাকুলতাই তাঁর ছিল না। ভারতবর্ষে নারীজাতির মধ্যে মাতার স্থান সর্বোচ্চ। শ্রীমার জীবনে মাতৃত্ব ও দেবীত্বের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ হয়েছে। 'আমি'র লেশমাত্র ছিল না তাঁর জীবনে। তাঁর সমস্ত জীবনটাই ছিল পরের সেবার জন্য উৎসর্গীকৃত।

আজ পৃথিবীর রং বদলেছে। আমরা আধুনিক হয়েছি। পাশ্চাত্য ভাবধারা আমাদের আচ্ছন্ন করে। আমরা অনুকরণপ্রিয় হয়েছি পাশ্চাত্যের। কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের জীবনবেদ থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের সনাতন আদর্শ বজায় রেখে আধুনিক পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারি। অন্তঃপুর আর বহির্জগৎ সামলাতে গিয়ে প্রতিনিয়ত বেসামাল হয়ে পড়ছি। মা বলেছেন, 'সংসারের কি সুখ আছে? এই আছে, এই নেই। সংসার বিষের গাছ। বিষে জরে ফেলে। সংসার মহা দঁক (পাঁক)। দঁকে পড়লে ওঠা মুশকিল। সংসারে থাকতে গেলে কেমন করে থাকতে হয় জান? যেখানে যেমন, সেখানে তেমন, যাকে যেমন, তাকে তেমন, যখন যেমন, তখন তেমন।'

ঠিক আজকের দিনে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের এক অদ্ভুত টানাপড়েন চলছে আমাদের নারী-সমাজে। আর তাই যুগযুগান্তের আকাঙ্ক্ষিত শান্তি আমাদের ছেড়ে যেতে বসেছে। আমাদের সব দ্বন্দ্ব আর বিরোধের অবসান ঘটিয়ে আমরা চাই শান্তি। শান্তির প্রতীক শ্রীশ্রীমার কথাই আবার স্মরণ করি, 'যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।'

শ্রীশ্রীসারদানন্দসপ্তকম্

শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার দেব

মাতৃভাবানুরঞ্জিতং শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদং
বন্দে শ্রীসারদানন্দং সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদম্ ॥১॥
গণেশপ্রতিমসৌম্যং শান্তং তথা চ গম্ভীরং
বন্দে শ্রীসারদানন্দং শান্তিমোক্ষপ্রদায়কম্ ॥২॥
সংঘসম্পাদকং স্থিরমবিচলদৃঢ়ব্রতং
বন্দে শ্রীসারদানন্দং নরেনাজ্ঞাপালকম্ ॥৩॥
ব্যাসাবতারং প্রাজ্ঞং 'লীলা প্রসঙ্গ'গ্রন্থকং
বন্দে শ্রীসারদানন্দং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্ ॥৪॥
মাতৃমন্দিরস্থাপকমাখ্যাতং দ্বারপালকং
বন্দে শ্রীসারদানন্দং সদা কর্মানুরতম্ ॥৫॥
করুণাবতারং ধীরং ভক্তানুগ্রহকারকং
বন্দে শ্রীসারদানন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ॥৬॥
মাতৃসেবানুরতমিষ্টভাবপ্রচারকম্
বন্দে শ্রীসারদানন্দং সদ্‌গুরুং দীনশরণম্ ॥৭॥

মাতৃভাবে অনুরক্ত সকল প্রকার বাঞ্ছিত ফলদাতা শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ শ্রীসারদানন্দকে বন্দনা করি।১

গজানন তুল্য সৌম্য, শান্ত অথচ গম্ভীর, শান্তি এবং মুক্তি প্রদানকারী শ্রীসারদানন্দকে বন্দনা করি।২

সঙ্ঘ সম্পাদক, স্থির একনিষ্ঠ, দৃঢ়ব্রত, নরেন্দ্রের আদেশ পালনকারী শ্রীসারদানন্দকে বন্দনা করি।৩

পরমজ্ঞানী, অবতীর্ণ সাক্ষাৎ ব্যাসদেব, 'লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থকর্তা, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শ্রীসারদানন্দকে বন্দনা করি।৪

মাতৃমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, (মায়ের) দ্বারী রূপে আখ্যাত, সর্বদা কার্যনিরত শ্রীসারদানন্দকে বন্দনা করি।৫

করুণার মূর্তবিগ্রহ, ধীর, ভক্তের অনুকম্পাকারী সচ্চিদানন্দমূর্তি শ্রীসারদানন্দকে বন্দনা করি।৬

মাতৃসেবায় অনুক্ষণ নিরত, ইষ্টদেবতার (শ্রীরামকৃষ্ণের) ভাব প্রচারক, সদ্‌গুরু, অকিঞ্চনের আশ্রয় শ্রীসারদানন্দকে বন্দনা করি।৭

ধর্মমহাসম্মেলন

(পার্লামেণ্ট অব্ রিলিজিয়ানস্)

মেরী লুইস্ বার্ক

ধর্মমহাসম্মেলন আরম্ভ হয়ে গেছে। সতেরো দিনব্যাপী—সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা—একটানা বক্তৃতা। উদ্বোধন দিবসের পরে জনসমাবেশ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। চতুর্থ দিবসে দেখা গেল মানুষের ভিড় 'হল অব কলম্বাস' ছাপিয়ে পৌছেছে 'হল অব ওয়াশিংটন'-এ। সেখানেও অনুষ্ঠানের প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি শব্দ নতুন করে শোনাবার ব্যবস্থা হল। পঞ্চম দিনে মহাসম্মেলনের বিজ্ঞান বিভাগের উদ্বোধন হল। এর পর থেকে সম্মেলন বিভক্ত হল দুভাগে—সাধারণ অধিবেশন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের অধিবেশন—যেটির উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেক ধর্মের মূলসূত্র সংগ্রহ এবং নিরপেক্ষভাবে সেইগুলির বিচার—আদর্শবাদী সভাপতি মেরুইন-মারী স্নেলের ভাষায় 'ধর্মগুলির মধ্যে মৌল পার্থক্যগুলি সম্পূর্ণ বিনাশ করে সত্য ও নীতির উপর ধর্মকে স্থাপন করার জন্য পূর্ণ ও অভেদ্য ভিত্তি'র সন্ধান।'[১]

একটা কথা বলা দরকার—সৌভাগ্যের বিষয় ধর্মমহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শরৎকালে যখন দিনগুলোতে ভ্যাপসা গরম ছিল না, একমাত্র ব্যতিক্রম জনসমাকীর্ণ চতুর্থ দিনটি। সেদিন তাপমাত্রা উঠেছিল ৯৫ ডিগ্রীতে;—আর একদিন সকালে তাপমাত্রা নেমে গিয়েছিল ৩৯ ডিগ্রীতে। এ ছাড়া অন্য দিনগুলো আবহাওয়ার দিক থেকে মনোরম ছিল। অবশ্য ঝোড়ো হাওয়া এবং মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত হয়েছে। একদিন তো হাওয়া এত প্রবল হয় যে তার দাপটে বৃষ্টি 'হলে'র মধ্যেও ঢুকেছিল এবং অনেকেই ছাতা খুলে আত্মরক্ষা করেছিলেন। ছাদে ঝড়-বৃষ্টির শব্দ এমন আলোড়ন তুলেছিল যে অনেক-সময় শব্দে বক্তাদের কণ্ঠ ডুবে গিয়েছিল। শুধু ঝড়বৃষ্টির শব্দই নয়। আর্ট প্যালেসের একদিকে ছিল মিচিগান হ্রদের তীরবর্তী একটি পার্ক, সেদিক দিয়ে বেশ চমৎকার পরিবেশই। কিন্তু অন্যদিকে ছিল সেণ্ট্রাল ইলিওনিশ রেলের প্রধান স্টেশন। শোনা যায় 'বক্তারা হল অব ওয়াশিংটন ও কলম্বাসে [শব্দের সঙ্গে] ছমাস ধরে লড়াই চালিয়েছিলেন।'[২] এটা অবশ্যই অতিশয়োক্তি কারণ আমরা জানি শ্রোতারা প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সম্মেলনের বেশ কিছু কাব্যময় কথা শুনতে পেয়েছিলেন।

প্রথম দিনটি ব্যয়িত হয় কর্তৃপক্ষের স্বাগত-ভাষণ এবং প্রতিনিধিদের উত্তর দানে। প্রথমটির সংখ্যা ছিল সাত। চমৎকার বাক-বিন্যস্ত ভাষণে প্রভাতী অনুষ্ঠানের বেশির ভাগ সময় কেটে যায়; সাতটি সংক্ষিপ্ত প্রতিভাষণে সে অধিবেশন শেষ হয়। কোন কোন প্রতিভাষণ শ্রোতাদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন লাভ করে। প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রথম ভাষণ দেন গ্রীক চার্চের প্রতিনিধি জান্টের আর্কবিশপ। ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে তিনি শুরু করেন 'সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা একজন, ফলে একজনের মধ্যেই তারা ঈশ্বরের সন্ধান পায়' এবং পরিসমাপ্তিতে বলেন 'আমি উত্থিত

১ ওয়াল্টার আর হাউটন (সম্পাদিত) দি পার্লামেণ্ট অব্ রিলিজিয়ানস্ অ্যান্ড রিলিজিয়াস কংগ্রেস অ্যাট্ দি ওয়ার্ল্ডস্ কলম্বিয়ান এক্সপোজিসন—২৫৯

২ দি ইনল্যান্ড আর্কিটেক্ট অ্যান্ড নিউজ রেকর্ড (চিকাগো) ডিসেম্বর, ১৮৯৩—১৮৯৪

হচ্ছে সপ্রেম আশীর্বাদ জানাচ্ছি মহান দেশ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি—সেখানকার মহিমামণ্ডিত সুখী অধিবাসীদের প্রতি।'[৩] সভাপতি সোচ্ছ্বাসে বল্লেন 'এটি সত্যই মহত্ত্বসূচক।'[৪] শ্রোতারা ঘন ঘন হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ল। বিগত দশ বৎসর যাবৎ আমেরিকার অধিবাসী হিসাবে অনেকের নিকট পরিচিত, কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি প্রতাপ মজুমদারও অভিনন্দন লাভ করলেন তাঁর ভাষণের জন্য। কিন্তু পুং কুয়াং উ যে স্বাগত অভিনন্দন পেলেন, বারোজের ভাষায়, তা 'মঞ্চের অন্য কোনও প্রতিনিধি পাননি। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রোতা দাঁড়িয়ে উঠে পাগলের মত টুপি ও রুমাল নাড়তে-লাগল।'[৫] এটা কিন্তু কনফুশিয়াস-ধর্মের প্রতি বিশেষ মমত্ববোধের জন্য নয়। এর কারণ হল, সভাপতি বোনী তাঁর প্রারম্ভ-ভাষণে বলেছিলেন, 'আমরা চীনের প্রতি সুব্যবহার করিনি।'[৬]

বারোজের পুস্তকে উদ্ধৃত ২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ তারিখের সেণ্ট লুই অবজার্ভারের সংবাদ থেকে বোঝা যায়, স্বামীজী পরে যাকে 'চমৎকার ছেলে' বলেছিলেন সেই সিংহলাগত বৌদ্ধ ধর্মপাল সাধারণভাবে বেশ নাড়া দিয়েছিলেন। তাঁর 'কালো চোখ, চওড়া কপাল থেকে ওলটানো কোঁকড়ানো কেশগুচ্ছ, দর্শকদের প্রতি নিবদ্ধ স্থির দৃষ্টি, শিহরণ জাগানো স্বরক্ষেপণের সঙ্গে হলুদবর্ণ আঙুল দিয়ে বক্তব্যের মধ্যে দৃঢ়তা প্রকাশ—সব মিলিয়ে তাঁকে প্রচারণার প্রতিমূর্তি বলে মনে হচ্ছিল। এই-রকম একজন মানুষকে বুদ্ধের ভক্তদের সংহত করার কাজে এবং "এশিয়ার আলোকবর্তিকা"-কে (লাইট অব এশিয়া) সমগ্র সভ্য বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার আন্দোলনের নেতৃত্বে দেখে কেউ কেউ শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন।'[৭]

এ-সব যতক্ষণ চলছিল ততক্ষণ স্বামীজী ধ্যান-নিমগ্ন ও প্রার্থনারত অবস্থায় স্থিরভাবে অপেক্ষা করেছিলেন তাঁর ভাষণের নির্দিষ্ট কালের জন্য। বৈকালিক অধিবেশনে চারজন বক্তা তাঁদের তৈরি ভাষণ পাঠ করার পর স্বামীজীর পার্শ্ববর্তী সহৃদয় সুপণ্ডিত ফরাসী যাজক জি. বোনে ম্যরি স্বামীজীকে ভাষণ দানের অনুরোধ জানান। মনে মনে দেবী সংস্বতীকে প্রণাম জানিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন সম্মেলন তথা সমগ্র বিশ্বের কাছে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করতে। তাঁর প্রারম্ভিক সম্ভাষণ শ্রোতাদের মধ্যে কি বিদ্যুৎশিহরণ সৃষ্টি করেছিল তা সুবিদিত। সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে বারোজ ও হাউটন উভয়েই মন্তব্য করেছেন, 'যখন স্বামী বিবেকানন্দ শ্রোতাদের "আমেরিকাবাসী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ" বলে সম্বোধন করলেন তখন যে করতালি ধ্বনি উঠেছিল, তা কয়েক মিনিট স্থায়ী হয়।'[৮] স্বামীজী স্বয়ং আমাদের জানিয়েছেন 'সম্ভাষণ অন্তে দুমিনিট ব্যাপী কানে তালাধরানো করতালি'-র কথা।[৯] অনেক পরে যিনি লস্ এঞ্জেলস্-এ স্বামীজীকে আতিথ্যদান করেছিলেন, সেই শ্রীমতী ব্লজেট তাঁর বিবরণীতে লিখেছেন, 'আমি ১৮৯৩ সালে চিকাগোর ধর্ম-মহাসম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম। এই তরুণটি উঠে "আমেরিকাবাসী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ" বলে সম্বোধন করার পর সাত হাজার শ্রোতা তাদের কাছে অভাবনীয় এই কথাগুলিকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। তারপর অজস্র মহিলা সামনের বেঞ্চগুলি টপকে স্বামীজীর নিকটবর্তী হয়। আমি তখন মনে মনে বললাম "বাছা, যদি এই

৩ হাউটন—৮৬ ৪ ঐ ৫ ঐ, ৮৮ ৬ ঐ, ৮৮ ৭ ঐ, ৯৫
৮ বারোজ—১০১
৯ স্বামীজীর রচনাবলী (ইংরেজী) ৫ম,—২১

আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পার তবে বুঝব তুমি স্বয়ং ঈশ্বর।"[১০] (স্বামীজীর জীবনীগ্রন্থে আছে সম্মেলন উদ্বোধনের পরদিন একটি বিলাস-বহুল গৃহে অতিথি হয়ে রাত্রে স্বামীজী তাঁর দেশবাসীর দারিদ্র্য দুর্দশার কথা স্মরণ করে বেদনার্তহৃদয়ে কেঁদেছিলেন।. এই ছিল সেই আকস্মিক লাভ করা খ্যাতি প্রতিপত্তির প্রতিক্রিয়া!)

আগেই দেখেছি, শ্রোতারা গোমড়ামুখে চুপ-চাপ বসে থাকেনি। স্বামীজীর বক্তৃতার আগেও তারা বক্তাদের সোচ্চার অভিনন্দন জানিয়েছে। আধ্যাত্মিক অনুভূতির দিক দিয়ে বিচার করলে শ্রোতারা ছিল সাধারণ মানের। তাদের আধ্যাত্মিক আকৃতি ভোগবাদের আস্তরণের ভিতর অদৃশ্যভাবে প্রবাহিত ছিল। এটা ভারতবর্ষ নয়—ভারতে মহত্ত্বের একটাই অর্থ—আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব। সেখানে সেই মহত্ত্ব সহজেই উপলব্ধ হয়। ধর্মমহাসম্মেলনের শ্রোতারা নিজেরাই সঠিকভাবে জানত না (শ্রীমতী ব্রজেট যে কথা বলেছেন) যে কেন তারা স্বামীজীর প্রথম সম্ভাষণেই এত-খানি অভিনন্দন জানাল। আগের ক্ষেত্রে অভিনন্দনের স্পষ্ট কারণ ছিল—বক্তার পূর্ব-পরিচিতি অথবা নিজেদের প্রাক্তন অপরাধের অপনোদন। কিন্তু স্বামীজীর ক্ষেত্রে এসব কিছু ছিল না। আবার তাঁর প্রারম্ভ-সম্বোধনটাই কেবল করতালির কারণ হতে পারে না যেহেতু শ্রোতারা সকাল থেকেই বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধের কথা অনেকের বক্তৃতাতেই শুনে আসছে। স্বামীজীর সম্বোধনের মধ্যে অব্যক্তপূর্ব কিছুর দ্বারাই কি তাদের আবেগ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেনি? আমেরিকায় বিশাল জনতার সামনে আজই তিনি প্রথম বক্তৃতা দিচ্ছেন এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তিনি নিজেই বিশেষরূপে ভাববিচলিত—এই কথাগুলি মনে রাখলে কেউ না ভেবে পারেন না যে, যখন তিনি মঞ্চে ভাষণ দিতে উঠেছিলেন তখন তার সমগ্র প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হয়ে উঠেছিল। আরও মনে হয়, সেই সঙ্গে সমবেত জনতার সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক সত্তার নিবিড় ঐক্যবোধ তাঁর অন্তরে প্রাধান্যলাভ করেছিল এবং তাঁর কণ্ঠে তা নির্ঘোষিত হয়েছিল, আর দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যে সেটা অপ্রতিরোধ্যভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল। সংক্ষেপে একটা কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না যে স্বামীজীর সম্বোধনের কথাগুলিতে একটানা স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন সেই গভীর অনুভূতি থেকে উৎসারিত হয়েছিল যে অনুভূতি ছিল সম্বোধন শব্দগুলির উৎস। তার ফলে বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার মধ্যেই নিহিত ছিল স্বামীজীর পাশ্চাত্য পরিদর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য। এটাই অন্ততঃ মনে হয়, যদিও সে-সময় খুব কম লোকই বুঝতে পেরেছিলেন কোন্ শক্তি তাদের এমন গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে।

স্বামীজীর রচনাবলীতে তাঁর উদ্বোধনী-ভাষণের যে পাঠ আমরা পাই তা গৃহীত হয়েছে বারোজের 'হিস্ট্রি অব দি ওয়ার্ল্ড'স পার্লামেণ্ট অব রিলিজিয়ান।'[১১] থেকে কিন্তু পরদিন চিকাগোর সংবাদপত্রগুলিতে বক্তৃতার যে পাঠ প্রকাশিত হয়েছিল তার সঙ্গে বারোজের পুস্তকের পাঠের তুলনা করলে কতকগুলি বিষয়ে পার্থক্য চোখে পড়ে। কোন সংবাদপত্রই পুরো বক্তৃতা মুদ্রিত করেনি—সে কথা ঠিক কিন্তু এদের মধ্যে অন্তত চারটি পত্রিকা বক্তৃতার বিভিন্ন অংশ

১০ 'রেমিনিসেন্‌সেস' (জোসেফাইন ম্যাকলাউড) ২৪৭, ব্রহ্মচারিণী উষা (প্রব্রাজিকা আনন্দপ্রাণা) 'স্বামীজী ইন সাদান' ক্যালিফোর্নিয়া', 'বেদান্ত অ্যাণ্ড দি ওয়েস্ট'—১৫৮ (নভেম্বর, ডিসেম্বর, ১৯৬২)—৩৯-৪০

১১ স্বামীজীর রচনাবলী (ইংরেজী) ১ম—৩-৪

ছেপেছিল।[১২] আমার বিশ্বাস, এগুলি একত্র করলে সেদিন শ্রোতারা সেই প্রিয়দর্শন হিন্দু-সন্ন্যাসী, যাঁর প্রথম পাঁচটি শব্দ বিদ্যুৎ শিহরণ সৃষ্টি করেছিল, তাঁর মুখ থেকে কি শুনেছিলেন সেটা পাওয়া যাবে। সম্ভাষণ অন্তে করতালি ধ্বনি অবসিত হলে তিনি বলে চলেন :

"আজ আপনারা আমাদের যে মধুর বাক্যে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন তার উত্তর দিতে উঠে আমার হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ। পৃথিবীর প্রাচীনতম সন্ন্যাসী সমাজ—গৌতম বুদ্ধ যাঁর অন্যতম সদস্য মাত্র—সেই সমাজের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম যার শাখামাত্র, সেই সর্বধর্মের প্রসূতি-স্বরূপ হিন্দুধর্মের নামে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাই সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর পক্ষ থেকে। এই সভামঞ্চের সেই কয়জন বক্তাদেরও ধন্যবাদ জানাই যাঁরা আশা প্রকাশ করেছেন, দূরদেশাগত মানুষ এখানে যে পরমত-সহিষ্ণুতার ভাবটি দেখবেন সেটিকে তাঁরা বহন করে দেশে দেশে নিয়ে যাবেন। তাঁদের ধন্যবাদ এই ভাবকল্পনাটির জন্য।

"যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়ে এসেছে আমি সেই ধর্মভুক্ত বলে গর্ববোধ করি। শুধু ধর্মীয় সহনশীলতাই নয়, আমরা সকল ধর্মমতকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি। যে ধর্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজী 'একস্‌ক্লুশন' শব্দটি অনুবাদ করা যায় না, নিজেকে সেই ধর্মভুক্ত বলতে আমি গৌরববোধ কর্রি (করতালি)। যে জাতি পৃথিবীর সকল ধর্মের ও জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয় দিয়ে এসেছে আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে গৌরবান্বিত। আমি সগর্বে আপনাদের জানাই, আমরাই ইহুদীদের খাঁটি বংশধরগণের অবশিষ্ট অংশকে বক্ষে ধারণ করে রেখেছি; যে বৎসর রোমান উৎপীড়নে তাদের পবিত্র মন্দির ধূলিসাৎ হয়েছিল সে-বছরই তাদের অবশিষ্টাংশ দক্ষিণ ভারতে আমাদের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। মহান পারসিক জাতির অবশিষ্টাংশকে যে ধর্মাবলম্বিগণ আশ্রয় দান করেছিল এবং আজও যারা তাদের প্রতিপালন করছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলে আত্মশ্লাঘাবোধ করি।

"ভ্রাতৃগণ, প্রত্যেক হিন্দুশিশু প্রতিদিন যে স্তোত্রটি আবৃত্তি করে তারই কয়েকটি পঙ্‌ক্তি আমি আপনাদের কাছে আবৃত্তি করে শোনাব। এই স্তোত্রটি আমি শৈশবকাল থেকে আবৃত্তি করে আসছি এবং ভারতের কোটি কোটি মানুষ এটি প্রত্যহ আবৃত্তি করে। সেই স্তোত্রটির অন্তর্নিহিত ভাব এতদিনে সত্য হতে চলেছে : "রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং। নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।" (বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্নস্থানে, কিন্তু তারা সকলেই যেমন এক সমুদ্রে আপন আপন জলরাশি মিলিয়ে দেয়, তেমনি, হে ভগবান, নিজ নিজ রুচির বৈচিত্র্যবশতঃ সরল ও কুটিল নানাপথে যারা চলেছে, তুমিই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

"পৃথিবীর ইতিহাসে এ যাবৎ অনুষ্ঠিত পবিত্র সমাবেশসমূহের অন্যতম, এই মহাসম্মেলন গীতোক্ত সেই অপূর্ব শ্রেষ্ঠ মতেরই সত্যতা প্রতিপন্ন করছে এবং সেই বাণীটিই ঘোষণা করছে, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।' (যে যেভাব আশ্রয় করে আসুক না কেন আমি তাকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করে থাকি। হে অর্জুন,

১২ চিকাগোর যে সব সংবাদপত্র ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩, ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামীজীর উদ্বোধনী বক্তৃতা ছাপিয়েছিল, সেগুলি হল—'দি হেরাল্ড', 'ইণ্টার ওসান', 'ট্রিবিউন' এবং 'রেকর্ড'। এর মধ্যে হেরাল্ডের রিপোর্টই সবচেয়ে সম্পূর্ণ।

মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার পথেই চলে।) সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি এবং এগুলির ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে হিংসায় পরিপূর্ণ করেছে, নরশোণিতে সিক্ত করেছে, ধ্বংস করেছে সভ্যতা এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় নিমজ্জিত করেছে। আজ এর মৃত্যুকাল উপস্থিত। আমি সর্বতোভাবে বিশ্বাস করি, আজ এই ধর্মমহাসম্মেলনে সমাগত বিভিন্ন প্রতিনিধিবর্গের সম্মানার্থে যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হল, সে ঘণ্টাধ্বনি যেন সর্ববিধ ধর্মোন্মত্ততার, তরবারি অথবা লেখনীমুখে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার নির্যাতনের এবং একলক্ষ্যাভিমুখী ভ্রাতৃবৃন্দের পথের সকল অন্তরায়ের মৃত্যু ঘোষণা করে।"

মাঝে মাঝে করতালির সাময়িক ছেদের মধ্যে স্বামীজীর ভাষণ শেষ হল হর্ষধ্বনির বজ্রনির্ঘোষে। সমবেত জনতা চিনে নিয়েছে তাদের বরণীয়কে এবং তাঁকে বরণ করে নিয়েছে হৃদয়ের মধ্যে। তারপর থেকে তিনি ধর্মমহাসম্মেলনের জ্যোতিষ্ক।

স্বামীজীর ভাষণের পর প্রথম দিনের অধিবেশন শেষ হবার আগে আরও চারটি বক্তৃতা হল—সকাল ও বিকালের অধিবেশন মিলিয়ে মোট চব্বিশটি। এর পর সমবেত প্রতিনিধিগণ এবং আমেরিকার জনসাধারণ পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন। এবার সূত্রপাত হতে চলেছে মহাসম্মেলনের গভীরতর কার্যাবলীর।*

* Swami Vivekananda in the West: New Discoveries, part one, (3rd Edition, 1983) গ্রন্থের 'The Parliament of Religions' পরিচ্ছেদের অংশবিশেষ (পৃঃ ৭১-৭৫) অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত। সম্পূর্ণ অনুবাদ 'উদ্বোধন কার্যালয়' থেকে গ্রন্থাকারে যথাসময়ে প্রকাশ করা হবে।—সঃ

চিরকালের মা

শ্রীমতী মিনতি দত্ত রায়

তোমার পৃথিবীর সন্তানদের
দিয়ে গেলে এক অভয়বাণী
আর কেউ না থাক—জানবে
তোমার এক মা আছে,
মা—চিরকালের।
তোমার সেই অভয়বাণী নিয়ে
চলেছি আজও
কখনও বুঝেছি মনে হয় তোমাকে
কখনও বুঝিনি—
তুমি যে চিরকালের এক হেঁয়ালি।
সুখের দিনে দেখেছি তোমার হাসি,
দুঃখের ঘোর অমানিশায়
দুরু দুরু বক্ষ মোর
কখন যে পার করেছ দুর্গম সে পথ
নিশ্চিন্ততায় হাঁফ ছেড়েছি।
আবার অকারণে নিন্দা অপবাদে
জর্জরিত করেছ মোরে
বিশ্বাসকে মোর করেছ খান্ খান্
তোমার নিঠুর পীড়নে।
বুঝি নাই তোমারে গো জননী।
তোমাকে জানার অহঙ্কার
করেছ ধূলিসাৎ বারে বার।
শোকে তাপে বন্দী, আত্মা মোর
খুঁজেছে মুক্তি, পথে প্রান্তরে;
খুঁজেছি তোমাকে অতলান্ত
সমুদ্রের সীমানায়
খুঁজেছি পর্বতে কন্দরে শ্যামলিমায়
পুণ্য সলিলা তীর্থস্নানে
কখন চকিত আনন্দে
পূর্ণ করেছ মোরে,
চির পবিত্রতারূপিণী তব স্বরূপ সন্ধানে
খুঁজিয়া ফিরেছি বাহির বিশ্বে—অকারণে—
ঘরে ফিরে দেখি কোন অগোচরে
বসিয়া আছ মোর হৃদিকন্দরে
জীবন মরণের চিরসাথী হয়ে
তুমিই কি গো সেই—
চিরকালের মা?

গিরিশ-সাহিত্যের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ

অধ্যক্ষ শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে আসার আগেই গিরিশ সনাতন হিন্দুধর্মাশ্রিত নাটক লিখেছেন। মুখ্য উদ্দেশ্য থিয়েটারে লোক টানা, টিকিট বিক্রি বাড়ানো। গিরিশ ধর্মাশ্রয় করে মর্মাশ্রয়ী নাটক লিখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কোন নাটকই মর্মাশ্রয়ী হতে পারে না, দর্শকের মর্ম স্পর্শ করতে পারে না যদি না তা নাট্যকারের মর্মনিঃসৃত না হয়। নিছক কলমবাজি করে থিয়েটারে বাজিমাৎ করা যায় না। সবার উপরে নাট্যকারের নিজস্ব অনুভূতি, উপলব্ধি বা বিশ্বাস থেকে তাঁর বক্তব্য লেখনীতে আসা চাই। অন্তরে ভক্তিরসের ফল্গুধারা প্রবাহিত না হলে 'চৈতন্যলীলা' নাটকের সংলাপ বা গীতরচনা সম্ভব হত না। বিডন-স্ট্রীটের হরিধ্বনি দক্ষিণেশ্বরে পৌছেছিল! ঠাকুর গিরিশকে চিনেছিলেন, যেমন চিনেছিলেন নরেন্দ্রকে।

'চৈতন্যলীলা' দেখার পর ঠাকুর একদিন বলরাম বসুর বাড়িতে গিরিশকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন: "জ্ঞান সূর্য্যের আলো তোমার উপর পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। তোমার মনের ময়লা পরিষ্কৃত হইয়া যাইতেছে, এবং তথায় ভক্তির রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে।" আমি বলিলাম যে "আমার মধ্যে এ-সকল সদ্‌ভাবের কিছুই নাই। কেবল অর্থলাভের উদ্দেশ্যেই এই পুস্তক লিখিয়াছি।" (শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ: গিরিশচন্দ্র, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, পৃঃ ১৯৬)। অর্থাৎ, গিরিশ তখনও নিজেকে চেনেননি, ঠাকুর গিরিশকে চিনেছেন। পরবর্তী নাটক 'প্রহ্লাদ চরিত্র' দেখতে এসে ঠাকুর যখন বল্লেন: "বাঃ তুমি বেশ লিখেছ।" গিরিশ বল্লেন: "শুধু লিখছিই, কিন্তু ধারণা কই?" ঠাকুর প্রতিবাদ করে বলেছিলেন: "না, তোমার ধারণা আছে। ভেতরে ভক্তি না থাকলে চালচিত্র আঁকা যায় না।" লক্ষণীয়, শ্রীরামকৃষ্ণ এখানেও গিরিশের উপর আলো ফেললেন, ওর ভেতরটা দেখিয়ে দিলেন, ওর নিজের কাছে ওর সঠিক পরিচয় তুলে ধরলেন।

৫

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভক্ত খুঁজে বেড়াতেন তা আমরা দেখি 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী সন্ন্যাসী সোমগিরির মধ্যে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের আভাস পাই। সোমগিরি ঠাকুরের পুনঃপুনঃ উচ্চারিত বাণীর পুনরাবৃত্তি করেছে:

"কামিনী-কাঞ্চন—
এক মায়া দুই রূপে করে আকর্ষণ,
বিষম বন্ধনে রহে জীব মুগ্ধ হয়ে।
ভ্রমি এ সংসারে, হের দ্বারে দ্বারে,
কেবা চায় নিরঞ্জনে কামিনী-কাঞ্চন ত্যজি।
সেই মহাজন,
এ বন্ধন যে করে ছেদন;—
অবহেলি কামিনী-কাঞ্চন,
নিরঞ্জন করে আশা।" (৩,৩)

নাটকে এই সোমগিরি-বিল্বমঙ্গল অংশটি শ্রীরামকৃষ্ণ-গিরিশ সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। বেশ্যাসক্ত, প্রেমোন্মাদ বিল্বমঙ্গলকে দর্শন করতে সুদূর কাশীধাম থেকে এসেছেন সন্ন্যাসী সোমগিরি। শিষ্য আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করছে:

শিষ্য ॥ অদ্ভুত এ তত্ত্ব কিছু নারি বুঝিবারে।
যবে, মহাশয় ত্যজিলেন কাশীধাম
সাধুজন-দর্শন-মানসে,
বেশ্যা-প্রেমে বদ্ধ ছিল এ বিল্বমঙ্গল,
'পরে, প্রেমের লাঞ্ছনা-বৈরাগ্য-ঘটনা,

কয়দিন মাত্র ইহা ?
ত্যজি প্রতারণা
গুরুদেব কহ মোরে,
ভবিষ্যৎ গোচর কি তব ?
সোমগিরি॥ নহে কিছু গোচর আমার।
সর্বজ্ঞ সে ভগবান্,
তাঁহারই নিয়মে
প্রাণে প্রাণে অপূর্ব বন্ধন ;
সাগর লঙ্ঘিয়া
পরস্পরে করে দেখা,
প্রাণ বোঝে কোথা তার টান
এ সন্ধান বিষয়ীর নহেক গোচর ; (৩।৩)

নারীপ্রেমোন্মত্ত বিল্বমঙ্গলের ভেতরটা সন্ন্যাসী সোমগিরি ঠিকই দেখতে পেয়েছিলেন, যেমন, দেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ নোটো, মাতাল, বেশ্যাসক্ত গিরিশের ভেতরটা। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে প্রথম দর্শনেই সোমগিরি বিল্বমঙ্গলকে বলেছেন : "আপনি প্রেমোন্মাদ মহাপুরুষ। আপনাকে নমস্কার করি।" বিল্বমঙ্গলের উত্তর : "আপনি যে হন, আমি হীন, লম্পট—আমাকে নমস্কার করবেন না। আপনার চরণে আমার নমস্কার।" (স্টার থিয়েটারে গিরিশ-ঠাকুরের পরস্পরকে নমস্কারের দৃশ্য স্মরণ করুন)। গিরিশ বিল্বমঙ্গল, সোমগিরি শ্রীরামকৃষ্ণ। গিরিশ-সাহিত্যের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ।

তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে শিষ্য সোমগিরিকে জিজ্ঞেস করছে যে মহাপুরুষকে দেখতে প্রভু কাশী থেকে বাঙলায় এলেন সে মহাপুরুষ কোথায় ? সোমগিরি বলছেন : "আমার সে মহাপুরুষ দর্শন লাভ হয়েচে। তুমি কি দেখ নি ?…বিল্বমঙ্গলকে দেখ নি ?" শিষ্য তো অবাক ! শিষ্য বলছে : "প্রভু কেমন আদেশ কচ্চেন ? আপনি একজন লম্পটকে দেখতে এসেচেন ! ওর বেশ্যার দায়ে বৈরাগ্য হয়েচে, কতদূর স্থায়ী হয়, বলা যায় না।" সোমগিরির উত্তর :

"যেই জন বেশ্যার কারণ
শবে দেয় আলিঙ্গন—
কালসর্প ধরে অনায়াসে।
ঈশ্বরের তরে কিবা নাহি পারে সেই ?"

ঠাকুরের কাছে গিরিশের নামে কত অভিযোগ ! মোদো, মাতাল, লম্পট গিরিশ। ঠাকুর বলেন : "ওর আলাদা থাক, যোগও আছে, ভোগও আছে। যেমন রাবণের ভাব, দেবকন্যাও নেবে, রামকেও লাভ করবে।" "ও শূর ভক্ত, বীর ভক্ত, মদে ওর দোষ হবে না……ওর ভৈরবের অংশে জন্ম, তাই মদ্যপানে এত আসক্তি।" বলেন : "ও মদ-মাতাল আছে মন-মাতাল হয়ে যাবে।" 'উদ্বোধন' (১৩১৯-২০) পত্রিকায় শ্রীশ মতিলাল লিখিত 'ভক্ত গিরিশচন্দ্র' প্রবন্ধে দেখতে পাই একদিন রাত ১১টায় গিরিশচন্দ্র ও তাঁর এক বন্ধু মত্ত অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সামনে গিয়ে উপস্থিত। ভাবাবেশে ঠাকুর গান ধরেছিলেন : "সুরা পান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালি বলে" ইত্যাদি।

কিন্তু কাম ?

ঠাকুর বলেন : "দেহ ধরিছিস, কাম থাকবে না ? কাম না থাকলে ত ঈশ্বর কামনাও থাকবে না। একটু বেঁকিয়ে দে, কামকে প্রেম কর।" সোমগিরি এই কথাই বলেছে : "যেই জন বেশ্যার কারণ/শবে দেয় আলিঙ্গন,/কালসর্প ধরে অনায়াসে,/ঈশ্বরের তরে কিবা নাহি পারে সেই ?" 'নসীরাম' নাটকে নসীরাম অনাথকে বলেছে : "তুই প্রেম দান করে সব ধুয়ে নে। বোঝ্, কামে প্রেমে তফাৎ কোথা—কাম স্বার্থপর, মনকে কুঁকড়ে দেয় ; প্রেম জগদ্ব্যাপী, প্রাণমন জগদ্ব্যাপী হয়।" (৫।৩) 'কালাপাহাড়' নাটকে চিন্তামণি ঐ ঠাকুরেরই কথা বলেছে : "কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। প্রেমে রিপু জয় কর।"

গিরিশচন্দ্র শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের ওপরই আলোকপাত করেননি। তাঁর যুগের উপরও আলোকপাত করেছেন। যে সামাজিক ও ধর্মীয় নৈরাজ্যের মধ্যে ঠাকুরের আবির্ভাব তার চিত্র তিনি দিয়েছেন 'চৈতন্যলীলা'র প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে, যেখানে পাপের সভায় ছয় রিপু নিজ নিজ কৃতিত্ব বর্ণনা করছে। দৃশ্যটি প্রতীকী; ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ছবি। পাপে যখন ধরা পূর্ণ হয় তখনই আবির্ভূত হন ভগবান, অবতার রূপে। গীতার বিখ্যাত শ্লোক স্মরণীয়। 'চৈতন্যলীলা' লেখা পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে গিরিশ উদাসীন ছিলেন। নাম শোনা সত্ত্বেও তাঁর কাছে আসার কোন আগ্রহ দেখাননি। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে যাঁকে তিনি কিছু দিনের মধ্যেই গুরুরূপে বরণ করবেন, যাঁর অবতারত্বে তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাবে, এবং পরিচিতদের মধ্যে যে বিশ্বাস তিনি সোচ্চারে ঘোষণা করবেন, সেই মহাপুরুষের পূর্বাভাস তিনি দিয়েছেন, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় anticipation, 'চৈতন্যলীলা' নাটকে। যথা, রিপুদল যখন নিজ নিজ প্রতাপের কথা সদর্পে ঘোষণা করছে তখন সহসা কলির প্রবেশ। কী সংবাদ? কলি পাপকে বলছে:

"শুন শুন সর্বনাশ হইল উদয়,
এতদিনে গেল তব অধিকার,
কাঁপিছে অবনী, শুন হরিধ্বনি!
......চৈতন্য হলেন অবতার,
......অধিকার গেল তব।—
......কি করিতে পারে রিপুগণে,
ভক্তজনে রিপুর কি অধিকার?"

পাপ উত্তর করে হতাশ হবার কারণ নেই। রিপুরা না পারে, বিজ্ঞান আছে, যুক্তি-তর্ক আছে, তাই দিয়ে ধর্মকে রোখা যাবে।

"ভাল...যদি রিপুচয় পায় পরাজয়,
যুক্তি আর বিজ্ঞান সহায়ে,
শাসন করিব ধরা।"

কলি উত্তর দেয়:

"ভক্তি-স্রোতে যুক্তি ভেসে যায়,
হেরি তরঙ্গ-নিচয়
সভয়হৃদয় বিজ্ঞান পলায় দূরে।" (১।১)

লক্ষ্য করুন পঞ্চদশ শতকের কাহিনীর মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর যুক্তি-বিজ্ঞান প্রবেশ করেছে। স্মরণ করুন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সামনে কত তর্ক, কত যুক্তি, কত বৈজ্ঞানিক বাদানুবাদ—ঈশ্বরের অস্তিত্ব, সৃষ্টি, আত্মা, জীবন, মৃত্যু এই সব নিয়ে। 'নসীরাম' নাটকে অনাথ জিজ্ঞেস করছে: "হরি কে—হরি কি আছেন?" নসীরাম বলছে: "তা নিয়ে তোমার মাথা ব্যথা কেন? জল জল করলে যদি তেষ্টা মেটে তো জল নাই থাকলো।"

অনাথ　:　তা কি হয়?

নসীরাম:　হয় না হয়, পরখ করে দেখলে বুঝতে পার। হরি নাই বলে কারা জান? যারা একবার হরি হরি করেন—মনে করেন হরিকে খুব কৃপা করেছি—তবু হরি কেন এসে তার পাপের বাগানের মালি হয় না; আর হরি আছে কি না, জিজ্ঞাসা করে না কারা জান? যাদের হরিনাম করতে করতে প্রাণ ভরে যায়। যত হরি হরি করে, তত আমোদ হয়, তারা সাবকাশ পায় না যে, জিজ্ঞাসা করে, 'হরি তুমি আছ কি না?' ততক্ষণ আর দুটো হরিনাম করবে। (২।৩)

ঠাকুর বলতেন আম খেয়ে যদি আনন্দ পেয়ে থাক তারপর আর আমগাছের অন্য বৃত্তান্ত জানার

দরকার কি? 'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকায় (৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩১৮ 'তাও বটে—তাও বটে' প্রবন্ধে গিরিশ লিখেছেন: "গুরু বলিতেন—তিনি রস। আমরা রসিক।······সংসার মায়া কি নয়—এ-কথা লইয়া কে মাথা ঘামায়, কেন সৃষ্টি হইল? কেন সংসার এমন? এ পুত্র, এ কলত্র, এ-কথা কে কানে তোলে, কে ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখে? ···গুরু বলিতেন: 'কে জানে তোর গাঁই গুঁই। বীরভূমের বামুন মুই।' দেখিলাম গাঁই গুঁই জানিবার প্রয়োজন নাই।"

'চৈতন্যলীলা'র তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে জ্ঞান-ভক্তির আলোচনা হচ্ছে। ভক্ত হরিদাসকে প্রশ্ন করা হল: "জ্ঞান বিনা ভক্তি, কোথা পায় স্থান?" হরিদাস উত্তর দিল:

"কষ্ট সাধ্য জ্ঞান-উপার্জন
নীরব সাধন মদন দহন করি,
কিন্তু ভক্তি অন্তরের ধন
নাহি হেন দীন, নাহি শক্তিহীন
ভক্তির যে নহে অধিকারী,···
সীমাশূন্য ভক্তির মহিমা।"

এ-সব শ্রীরামকৃষ্ণেরই কথা। গিরিশ লিখেছেন ঠাকুরের কাছে আসার আগেই। অর্থাৎ ঠাকুরকে না দেখেই আলো ফেলেছেন, সে-আলোতে এসে দাঁড়িয়েছেন শ্রীচৈতন্য। মঞ্চে শ্রীচৈতন্যের ছায়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ—জীবন আর বাণী একই। এক অবতারের মাহাত্ম্য বর্ণনায় আর এক অবতার আলোকিত হল। 'চৈতন্যলীলা' আর 'প্রহ্লাদচরিত্র' দেখার পর শ্রীরামকৃষ্ণ বৃথাই বলেননি: "তোমার মনের ময়লা পরিষ্কৃত হইয়া যাইতেছে এবং তথায় ভক্তির রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে", কিংবা "তোমার ধারণা আছে" ইত্যাদি। ঠাকুর সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের ধারণা তাঁর সংস্পর্শে আসার আগেই প্রকাশিত হয়েছে 'চৈতন্যলীলায়'। যখন প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ভক্তি বলছে:

"এল আনন্দের দিন,
চিন্তা কর দূর,
গোলকবিহারী হরি,
ধরায় উদয়!
হেরি জীবের দুর্গতি,
আপনি শ্রীপতি; নব ভাবে অবতার।"

৭

'করমেতি বাঈ' নাটকে করমেতির শ্যাম-অন্বেষণের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃ-অন্বেষণ প্রতিভাত। গিরিশচন্দ্র এই নাটককে "ভক্তিও জ্ঞানমূলক" বলে চিহ্নিত করছেন। দুজনেরই অন্বেষণ জীবনের শুরু থেকে, আন্তরিক, ঐকান্তিক বাসনাশূন্য, কোন কিছু পাওয়ার আশায় নয়। আলোক করমেতিকে প্রশ্ন করে: (২৷২)।

আলোক ॥ তুমি কাকে খোঁজ?
করমেতি ॥ শ্যামকে।
আলোক ॥ কে সে?
করমেতি ॥ শ্যাম।
আলোক ॥ কেন খোজচো?
করমেতি ॥ তাকে ভালবাসি।
আলোক ॥ এ কি ভাল?
করমেতি ॥ তা জানিনি। ভাল হয় ভাল। মন্দ হয় সে-ও আমার ভাল। সেই ভাল, তার সব ভাল, তার ভালয় আমি ভাল, তার ভালবাসা ভাল, তারে আমি ভালবাসি।
আলোক ॥ তোমায় যদি কেউ ভালবাসে?
করমেতি ॥ ভাল।
আলোক ॥ তুমি তারে ভালবাস?
করমেতি ॥ আমি শ্যামকে ভালবাসি তাই জানি, আর কাকে ভালবাসি কি না জানিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরের গভীরে একান্ত ভগবদ্‌গত-চিত্ত মানুষটির উপর করমেতি বাঈ আলোকপাত করেছে। আবার এই নাটক ঠাকুরের বাইরের লীলাও মঞ্চে নিয়ে এসেছে। ব্রাহ্মণ বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণ করমেতিকে বলছে : (২।১)

শ্রীকৃষ্ণ ॥ ওগো, তুমি একবার এদিকে এস ত গা! এস, এস, একটু বাতাস কর। বসো, কাছে বসে বাতাস কর।

করমেতি ॥ তুমি কে?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ দাঁড়াও, হাঁপিয়েছি, বলচি—বাতাস কর।

করমেতি ॥ আচ্ছা, জিরোও।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ ঘেমেছি, মুখ মুছিয়ে দাও। শুধু কি আর হেঁপিয়েছি? ছুটে ছুটে হেঁপিয়ে গেছি। এই ছুটে ছুটে তোমায় দেখতে এলুম।

করমেতি ॥ আমায় দেখতে এলে কেন?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ অত কেন আমি জানিনি।

এখানে দেখা যাচ্ছে ভগবান ভক্তের হাতে সেবা নিচ্ছেন। ঠিক এমনি ভাবেই ঠাকুরও ভক্তদের সেবা নিতেন—কাকেও বলতেন গা-হাত-পা একটু টিপে দিতে, কাকেও বলতেন মাথায় হাত বুলোতে, আবার কাউকে বলতেন তামাক সাজতে।

৮

করমেতি বাঈ-এর শ্যাম অন্বেষণ আর 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে 'পাগলিনী'র মাতৃ-অন্বেষণ। ছবিটা শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে পাগলিনী গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে—

"ও মা! কেমন মা কে জানে?
মা বলে মা, ডাকচি কত,
বাজে না মা, তোর প্রাণে?"

চতুর্থ গর্ভাঙ্কে সে উন্মত্তবৎ মাতৃসন্ধানে ছুটেছে :

"বল, কোথা গেল?
হৃদয়ের মণিহারা আমি পাগলিনী,
দেখ দেখ এসেছি শ্মশানে—
সে ত নাই গো এখানে,
পর্বত গুহায় নিবিড় কাননে,
তারই অন্বেষণে কেঁদে গেছে কতদিন!
কভু ভস্ম মাখি গায়,
এ প্রাণের জ্বালা না জুড়ায়;
শূন্যে শূন্যে ফিরি, বুকে বজ্র ধরি,
সে কোথায় দেখা ত' হ'ল না!" (১।৪)

এই সঙ্গীত, এই সংলাপ দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরের মাতৃ-সন্ধানে উন্মত্ত পূজারী ব্রাহ্মণেরই স্মরণ করিয়ে দেয়—এ শ্রীরামকৃষ্ণেরই কণ্ঠস্বর

এবার আর একটু গভীর তত্ত্বে আসা যাক। ঠাকুরের গভীর বাণী, সর্বধর্ম সমন্বয়, সাকার-নিরাকার, দ্বৈত-অদ্বৈতবাদ তর্কের মীমাংসা, সবই এই পাগলিনীর অসংলগ্ন উক্তিতে শোনা যায়। আটপৌরে গ্রাম্য মেয়েলি ভাষায় :

চিন্তামণি ॥ তোমার স্বামী কে মা?

পাগলিনী ॥ আমি মা পাঁচ-ভাতারী;—এই দুর্গা,
কালি, শিব, কৃষ্ণ—
না মা, আমি এক-ভাতারী এয়ো;
আমার ভাতার সেই মা, সেই,
সে বিনে আর নেই মা, নেই। (৩।৪)

অর্থাৎ ঈশ্বর এক, শুধু ভিন্ন নামে ডাকা। কথামৃতে পড়ি ঠাকুর বলছেন মাস্টারকে—

"এগুলো (নরেন্দ্র প্রভৃতির তর্কাতর্কি) আমার ভাল লাগছে না। আমি সব তাই দেখছি। বিচার আর কি করবো? দেখছি তিনিই সব হয়েছেন। তাও বটে, আবার তাও বটে। …তিনিই জীব ও জগৎ হয়েছেন। তবে চৈতন্য না লাভ করলে চৈতন্যকে জানা যায় না।"

আবার সাধু ভাষায় পাগলিনীর মধ্যে দার্শনিক

তত্ত্ব শুনুন। পতিতা রমণী চিন্তামণির প্রেমে পাগল বিল্বমঙ্গল বলছে: "চিন্তামণির জন্যে আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে"। 'চিন্তামণি' শুনেই পাগলিনীর মনে পড়ে যায় তার চিন্তামণিকে, যিনি সারা বিশ্বের চিন্তার ভার মাথায় নিয়ে বসে আছেন। সে নাম শোনা মাত্রই সবেগে দাঁড়িয়ে উঠে বলে:

পাগলিনী: চিন্তামণি—কভু এলোকেশী
উলঙ্গিনী ধনী,
বরাভয় করা, ভক্ত মনোহরা,
শবোপরে নাচে বামা।
কভু ধরে বাঁশী,
ব্রজবাসী বিভোর সে তানে।
কভু রজত-ভূধর—
দিগম্বর, জটাজুট শিরে,
নৃত্যকরে বব বম্ বলি গালে।
কভু রাসরসময়ী প্রেমের প্রতিমা,
সে রূপের দিতে নারি সীমা;—
প্রেমে ঢলে বনমালা গলে,
কাঁদে বামা "কোথা বনমালী বলে"।
একা সাজে পুরুষ-প্রকৃতি,
বিপরীত রতি;—
কেহ শব, কেহ বা চঞ্চলা।
কভু একাকারে, নাহি আর
কালের গমন,
নাই হিল্লোল কল্লোল;
স্থির—স্থির সমুদয়।
নাহি—নাহি 'ফুরাইল' বাক্;
বর্তমান বিরাজিত। (১।৪)

দক্ষিণেশ্বরে এক পাগলী যাতায়াত করত 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের পাগলিনী তারই উপর ভিত্তি করে কল্পিত। কিন্তু এ পাগলিনী আমাদের কোথায় নিয়ে গেল? এ তো দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, মায়াবতী—সর্বতীর্থ ঘুরিয়ে নিয়ে এল ঐ কয়েকটি কথার মধ্যে। স্বামী বিবেকানন্দ অকারণে বিল্বমঙ্গলকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক বলে অভিহিত করেননি।

শ্রীরামকৃষ্ণের নরলীলা সাঙ্গ করার পরবৎসরই (১৮৮৭) গিরিশচন্দ্র লিখলেন 'রূপ সনাতন'। চতুর্থ অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কে দেখা যাচ্ছে চন্দ্রশেখরের বাড়িতে চৈতন্যদেব ভক্তদের পদধূলি নিচ্ছেন। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত কিছু দর্শক এই দৃশ্যের বিরূপ সমালোচনা করেন। গিরিশ তাঁদের বলেছিলেন: "আমি স্বচক্ষে পরমহংসদেবকে ভক্তপদধূলি গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি।" পরের বছর (১৮৮৮) 'নসীরাম' নাটকে দেখালেন নসীরাম, যাকে লোকে 'নেমো' পাগলা বলে, কিন্তু আসলে যে মহাজ্ঞানী, মহাজন; সে অনাথকে প্রণাম করছে। অনাথ প্রতিবাদ করে: "প্রভু করেন কি, এতে যে আমার অপরাধ হয়।" নসীরাম বলে: "যে হরি হরি করে, তাকে আমি প্রণাম করি।" ঠাকুরও করতেন। অনাথ বলে: "প্রভু ভাবনা ত' দূর হয় না!" নসীরাম উত্তর করে: "যখন তোর জন্যে আর একজন ভাবছে, তখন এত ভাবনার দরকার কি?...কিন্তু বাবা, ভাবের ঘরে চুরি কোরো না।" (৩।২) নাটকের শেষ দৃশ্যে নসীরাম সরাসরি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় বলেছে: "দেখ্, মনে আড় রাখিস নি।" অর্থাৎ চাই পূর্ণ বিশ্বাস। পরমহংসদেবের সহিত একদিন কথোপকথনের সংবাদ গিরিশ দিয়েছেন। লিখেছেন: "পরমহংসদেব আমার সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন। আমার বোধ হইতে লাগিল যে কি একটা স্রোত যেন আমার মস্তক অবধি উঠিতেছে নামিতেছে। ইতিমধ্যে তিনি ভাবনিমগ্ন হইলেন। ভাব ভঙ্গ হইলে বলিলেন: 'তোমার মনে আড় (বাঁক) আছে।' জিজ্ঞাসা করিলাম: 'যায় কিসে?' পরমহংসদেব বলিলেন: 'বিশ্বাস করো।'"

৯

এই বিশ্বাসের প্রতীকী চরিত্র 'জনা' নাটকের বিদূষক—গিরিশচন্দ্রের এক অপূর্ব সৃষ্টি, বিশ্বসাহিত্যে এক দুর্লভ সংযোজন। বিদূষকের এমনই বিশ্বাস যে সে স্থির-নিশ্চিত একবার নাম

উচ্চারণ করলেই হরি এসে উদয় হবেন—আর হলেই সর্বনাশ, সর্বস্ব ছাড়তে হবে, এতদিন তাকে যে রাজা নীলধ্বজ খাইয়ে-পরিয়ে তার আশ্রয়ে রেখেছে, তাকে ছেড়ে হরির পেছনে ছুটতে হবে। এ সে পারবে না, রাজার প্রতি অবিশ্বস্ত হতে সে পারবে না। তাই নাটকের ১ম অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে সে অগ্নিকে বলেছে: "আজ দেখছি তোমার ভারী বাড়াবাড়ি, হরি নীরে ছড়াছড়ি, তাই হচ্ছে ভয়, কৃষ্ণ দয়াময়, নাম কল্লেই হন উদয়। কিন্তু যেখানে দেন পদাশ্রয়, সেখানে যে সর্বনাশ হয়, একথা নিশ্চয়।" অগ্নি বলে: "তুই কৃষ্ণ নিন্দা করছিস?" বিদূষক উত্তর দেয়: "নিন্দে কেন? তোমার শ্রীহরির গুণ। যেখানে যান জ্বালেন আগুন।···ডাকলেই দয়াময় এসে উদয় হবে···আর যে ফেরে তার আশে, দয়াময় হরি তার নাকে ঝামা ঘষে।" সবটাই ব্যাজস্তুতি। 'সর্বনাশ হয়'—অর্থাৎ, হরিকে পেতে গেলে সর্বস্ব ত্যাগ করতে হয়। 'জ্বালান আগুন'—অর্থাৎ, যার ভগবৎ প্রেম জেগেছে তার চিত্ত অগ্নিশুদ্ধ হয়েছে। অগ্নি বলছে: "তোমার আপনার দশার কথা কিছু ভাব না?" বিদূষকের উত্তর: "ঐ যে তোমার ঠেলায় পড়ে বিশবার 'হরি' 'হরি' বল্লুম, একবার নাম করলে তরে যায়।" শ্রীরামকৃষ্ণেরও এই বিশ্বাস ছিল। বলতেন: "আমি মা'র ছেলে, মা'কে ডেকেছি, আমার আর কি ভয়?" গিরিশকে বলেছিলেন দিনান্তে একবার মাকে ডাকতে। গিরিশ যখন বল্লে, তাও সে পারবে না, ডাকার সময় তার নেই, তখনই সেই বকলমার কাহিনী। ভক্তের সব ভার ভগবান নিলেন। সেই ধ্যান-নেত্রে দেখা উলঙ্গ ভৈরব বালক নাচতে নাচতে ঠাকুরের কোলে মিলিয়ে গেল।

এই ঠাকুরকে গিরিশ নানাভাবে তাঁর সাহিত্যে দেখিয়েছেন। জয় শ্রীরামকৃষ্ণ।*

* গত ৪ মার্চ ১৯৮৬, উদ্বোধন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে লেখক-কর্তৃক পঠিত ভাষণ।—সঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত

শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় তথা সমগ্র ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু দুটি উল্লেখযোগ্য নাম। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে মুরারিপুকুর বোমার মামলা চলাকালে কারাগারের অভ্যন্তরে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরাধীনে রক্ষিত দেশদ্রোহী নরেন গোঁসাইকে হত্যা করে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল বিহারের মজঃফরপুরে বিস্ফোরিত ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর বোমার সূত্র ধরে বাংলার নানা স্থানে ব্যাপক ধর-পাকড় ও খানাতল্লাসী হয় এবং শুরু হয় ইতিহাসখ্যাত মুরারিপুকুর বোমার মামলা। এই মামলার অন্যতম আসামী হিসেবে ৫ মে শ্রীরামপুরের জমিদার-পুত্র নরেন গোঁসাইকে গ্রেপ্তার করা হয়। নরেন গোঁসাই ছিলেন লঘু চরিত্রের মানুষ—বিপ্লবীদের চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁর ছিল না। আত্মরক্ষার তাগিদে পুলিশের কাছে তিনি দলের সব গুপ্ত তথ্য ফাঁস করে দেন। সহ-বন্দীরা যাতে তাঁর কোন অনিষ্ট না করতে পারেন, এজন্য বিশেষ পুলিশ প্রহরায় ইওরোপীয় ওয়ার্ডে যথেষ্ট নিরাপত্তার মধ্যে তাঁকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এত সতর্কতা অবলম্বন

করা সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কানাইলাল দত্ত গোপনে পিস্তল সংগ্রহ করে জেলের অভ্যন্তরে পুলিশ প্রহরাধীন নরেন গোঁসাইকে হত্যা করেন।

চন্দননগরের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিপ্লবী নায়ক অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে তরুণ কানাইলালের বিপ্লবী জীবন গড়ে ওঠে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে তিনি তাতে সর্বান্তঃকরণে ঝাঁপিয়ে পড়েন। চারুচন্দ্র রায়ের মাধ্যমে কানাইলাল ও পরবর্তিকালের বিশিষ্ট বিপ্লবী নায়ক মতিলাল রায়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের কিছু পূর্বে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ মতিলাল রায় 'সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন, যার লক্ষ্য ছিল দরিদ্র-নারায়ণের সেবা এবং যুবকদের চরিত্র গঠন করা। অধ্যাপক চারুচন্দ্র এবং কানাইলাল এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ধর্ম ছিল এই সমিতির প্রাণস্বরূপ এবং সম্ভবতঃ কানাইলালের গীতা পাঠের সূচনা এখানেই। স্বদেশী আন্দোলন-কালে কানাইলালের উদ্যোগে চন্দননগরে প্রায় পাঁচ-ছটি লাঠিখেলার আখড়া গড়ে ওঠে এবং এর মূল কেন্দ্রটি ছিল তাঁর বাড়িতেই। এইসব আখড়ায় যোগদানকারী শত শত তরুণকে নিয়ে মতিলাল রায় একটি রবিবাসরীয় পাঠচক্র গঠন করেন। তরুণদের মনে ধর্মভাব জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে এই পাঠচক্রে গীতা উপনিষদ রামায়ণ-মহাভারত এবং নানা দেশাত্মবোধক রচনাদি পাঠ ও আলোচনা হত।

হুগলী কলেজ থেকে বি. এ পরীক্ষা দেবার পর ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নেতৃবৃন্দের আহ্বানে চন্দননগর ত্যাগ করে কানাইলাল মানিকতলার বাগানবাড়িতে বারীন ঘোষের বোমার কারখানায় যোগ দেন। মানিকতলা বাগানে তখন চলছে বিপ্লবের প্রস্তুতি—বোমা তৈরি ও অধ্যাত্মসাধনা।

মানিকতলার বাগানে নয়—তাঁর স্থান হল ৪১ নং চাঁপাতলা ফার্স্ট লেনে অবস্থিত বিপ্লবী পত্রিকা 'যুগান্তর'-এর কার্যালয় 'যুগান্তর বোর্ডিং'-এ। বিপ্লবী নায়ক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কানাইলাল সম্পর্কে লিখছেন, "বাগানে বসিয়া ধর্মচর্চা করা তাহার ভাল লাগিত না—সে কাজ চায়।...ধর্মকর্মের সে বড় একটা ধার ধারিত না। আত্মা পরমাত্মা লইয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যকতা অনুভব করিত না।" বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগোর রচনা থেকে জানা যায় যে, আলিপুর জেলে তিনি জনৈক সহ-বিপ্লবীর গীতা পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দেন, কিন্তু এর ঠিক বিপরীত বিবরণ পাওয়া যায় বিপ্লবী নায়ক অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের ভ্রাতা বিপ্লবী-দলভুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যের রচনায়। তাঁর রচনা থেকে জানা যায় যে, কানাইলাল ছিলেন যথার্থই গীতাধ্যায়ী এবং তাঁর মতে তিনি হলেন 'কলির শ্রীকৃষ্ণ'। তিনি লিখছেন—"সেই সময় কানাই দত্ত যুগান্তর বোর্ডিং-এ থাকিতেন। শিব-মন্দিরের সম্মুখের দ্বিতলের বারান্দায় কম্বল পাতিয়া তিনি গীতা, ভাগবত প্রভৃতি পাঠ করিতেন।"

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল ক্ষুদিরামের বোমা বিস্ফোরণের পর ষড়যন্ত্র ও সম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার অভিযোগে মোট একচল্লিশ-জন আসামীর বিরুদ্ধে শুরু হয় বিখ্যাত মুরারি-পুকুর বোমার মামলা। জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন জড়িত এই মামলা সম্পর্কে আসামীরা সকলেই উদাসীন ছিলেন। হাসি গান আনন্দ ও কৌতুকে ভরপুর ছিল তাঁদের জীবন। বিপ্লবী নায়ক অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার, দেবব্রত বসু

(পরবর্তিকালের স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) ও তাঁদের অনুগামীরা সাধন-ভজন ও ধর্মালোচনায় মগ্ন থাকতেন। কানাইলাল এ-সবের ধার ধারতেন না। চার-পাঁচজন সহবন্দীর সঙ্গে সন্ধ্যার পরেই তিনি ঘুমিয়ে নিতেন এবং রাত্রি দশটা-এগারটার সময় যখন অন্য সবাই নিদ্রামগ্ন, তখন তাঁরা উঠে অন্যদের লুকানো বিস্কুট সন্দেশ আম প্রভৃতির অনুসন্ধান করে তার সদ্ব্যবহার করতেন।

বিপ্লবীরা সকলেই ধরে নিয়েছিলেন যে, তাঁদের কাজের যোগ্য শাস্তি তাঁরা পাবেনই—কোনভাবে মুক্তি পাওয়ার আশা তাঁরা করেননি। কানাইলালের বিরুদ্ধে তেমন কোন গুরুতর অভিযোগ ছিল না এবং এ কারণে তাঁর অগ্রজ আশুতোষ দত্ত (পরবর্তিকালে ডাক্তার) তাঁকে জামিনে খালাস করে আনার জন্য উকিল নিযুক্ত করতে চাইলে তিনি ঘোরতর আপত্তি করে বলেন যে, সঙ্গীদের অদৃষ্টের সঙ্গে তাঁর অদৃষ্টও জড়িত। সুতরাং সহবন্দীদের সঙ্গে তিনি সমান দণ্ডই ভোগ করতে ইচ্ছুক। কারাগারে মতিলাল রায় তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন। তিনি দেখে এলেন কানাইলালের "সদাপ্রফুল্ল মুখশ্রী, হৃষ্টপুষ্ট ওষ্ঠপুট"। "তাহাকে দেখিয়া মনে হইল না যে, বন্দী অবস্থায় সে বিন্দুমাত্রও বিষণ্ণ হইয়াছে।" মতিলালকে তিনি সেদিনই স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, জেলে পচে মরার জন্য বা আন্দামান বা ফাঁসির কাঠে নিরীহ মেষের মতো প্রাণ দেবার জন্য তিনি জন্মাননি।

শ্রীরামপুরের নরেন গোঁসাই তখন রাজসাক্ষীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। পুলিশ পাহারায় তাঁকে ইওরোপীয় ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করেছেন। কানাইলালের ইচ্ছানুসারে মতিলাল রায় শ্রীশচন্দ্র ঘোষের মারফত কারাগারে তাঁর কাছে দুটি রিভলভার পাঠিয়ে দেন। রিভলভার হাতে পেয়ে তিনি হৃষ্টচিত্তে, শ্রীশচন্দ্রকে বলেছিলেন: "আমি মরিব—নরেনের রক্ত-তর্পণের কথা তোমরা সংবাদপত্রে পড়িও! কেবল একটি অনুরোধ—আমার মৃতদেহ বিপুল শোভাযাত্রা করিয়া যেন শ্মশানক্ষেত্রে নীত হয়। ইহা আমার মহিমা প্রচারের জন্য নহে—মির্জাফর, উমিচাঁদ যে-দেশে প্রাণধারণ করিয়াছে, সেই দেশে প্রথম মৃত্যুদণ্ড বিশ্বাসঘাতক আমাদের হাতে গ্রহণ করিল, ইহার গৌরব-মহিমা দেশ যেন উপলব্ধি করিতে পারে।"

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ অগস্ট জেল-হাসপাতালে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন সত্যেন্দ্রনাথ। আহত নরেন প্রাণভয়ে ছুটছেন। রিভলভার হাতে তাঁকে ধাওয়া করেছেন জ্বরাক্রান্ত কানাইলাল ও অসুস্থ সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁদের বাধা দিতে আসছে ইওরোপীয় ওয়ার্ডাররা। কিছু ধস্তাধস্তির পর তাদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে নরেন গোঁসাইয়ের বুকের উপর বসে কানাইলাল তাঁর রিভলভারের সব কটি গুলি নিক্ষেপ করলেন। ঘটনাস্থলেই নরেনের মৃত্যু ঘটল।

নরেনকে হত্যার পর কানাইলাল পলায়ন করেননি—শূন্য রিভলভার হাতে হাসিমুখে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। পুলিশ এলে রিভলভার ফেলে দিয়ে তিনি স্বেচ্ছায় ধরা দেন। নরেনকে হত্যার পর একটা গুলি তিনি নিজের জন্য রাখেননি কেন? বন্ধুদের এ-প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন: "আমরা যাহাই করি তাহাই narrow escape হইয়া ব্যর্থ হয়, তাই যতগুলি গুলি পিস্তলে ছিল, সব একে একে নরেনের শরীরেই চালাইয়াছি, কি জানি যদি দৈব-দুর্বিপাকে বাঁচিয়া উঠে।…সাধ ছিল একবার নিজের মুখে বলিয়া মরিব যে, যাহা করিয়াছি তাহা দেশের খাতিরে করিয়াছি।…যাহা করিলাম,

তাহার মর্যাদা আমাকেই রাখিতে হইবে।”

আদালতে তিনি স্পষ্টই বললেন ; “হ্যাঁ, আমি ও সত্যেন আমরা উভয়েই নরেনকে মেরেছি।”

ম্যাজিস্ট্রেট প্রশ্ন করলেন : “কেন মেরেছ ?”

কানাইলাল বললেন : “নরেন দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, তাই তাকে খুন করেছি।”

৭ সেপ্টেম্বর দায়রা আদালতে বিচার শুরু হল। কানাইলালের পক্ষে কোন উকিল নেই। আদালতকে তিনি জানালেন, “নির্দোষ বলতে আমি অস্বীকার করি।”

—“তুমি কোন উকিল দেবে ?”

—“না।”

বিচারক তাঁকে প্রশ্ন করলেন যে, তিনি পূর্বের কোন কথা প্রত্যাহার করতে চান কিনা ?

তিনি উত্তর দিলেন : “নরেন গোঁসাইকে আমিই খুন করেছি। সত্যেন সেখানে ছিল বটে কিন্তু খুনের ব্যাপারে কোনরূপে সে লিপ্ত ছিল না। তার সম্বন্ধে আমি তাড়াতাড়ি ভুলে বলেছি। আমি পূর্বে যা বলেছি তা সত্য নয়। আমি একাই খুন করেছি।”

বিচারক তাঁকে প্রশ্ন করেন যে, তিনি রিভলভার কোথায় পেলেন ? এর উত্তরে তিনি বলেন ; “ক্ষুদিরামের আত্মা আমাকে রিভলভার দিয়ে গিয়েছে।”

দায়রা আদালতের বিচারে কানাইলালের ফাঁসির হুকুম হল। কানাইলালের অগ্রজ আশুতোষ দত্ত মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অনুজের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখে এলেন হাস্যোজ্জ্বল নির্ভীক এক প্রাণবন্ত তরুণকে। অগ্রজের সঙ্গে দেখা হওয়া-মাত্র কানাইলাল প্রফুল্লবদনে প্রথমেই তাঁকে ফাঁসির দিন স্থির হয়েছে কিনা—জিজ্ঞাসা করেন। মতিলাল রায় লিখছেন ; “যেন সে জীবনের কাজ শেষ করিয়া পরপারের প্রতীক্ষা করিতেছে, মুখে চাঞ্চল্যের চিহ্ন নাই।” প্রাণ-দণ্ডের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করার জন্য আশুবাবু একজন উকিল সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তীব্র আপত্তি জানালেন কানাইলাল। তিনি বললেন : “আপীল করে বৃথা সময় নষ্ট করে কি হবে ? যে-কদিন আগে মরতে পারি, সে-কদিন আগে আবার মায়ের কোলে ফিরতে সুযোগ পাব, আমার বয়স সে-কদিন বেড়ে যাবে।”

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখছেন ; “সে বড় সাধের মরণ, মরিতেই আসিয়াছে, মরিয়াই তার সুখ ; কি জানি আপীল করিতে গিয়া যদি মরণ-বঁধুর কুঞ্জ-পথে কাঁটা পড়ে।” তিনি আপীল করলেন না। তাঁর এক কথা—“আপীল হবে না।”

১১ অক্টোবর হাইকোর্টের রায় বেরোল। কানাইলালের মৃত্যুদণ্ড বহাল রইল। ৯ সেপ্টেম্বর দায়রা আদালতে কানাইয়ের মৃত্যুদণ্ড হয় এবং তাঁর ফাঁসি হয় ১০ নভেম্বর। এই দুমাসের মধ্যে মৃত্যুর ভয়াল ছায়া কখনই তাঁর মনের প্রফুল্লতাকে বিনষ্ট করেনি। কানাই সেদিন মৃত্যুঞ্জয়ী শিব—গীতাকথিত যথার্থ স্থিতধী ও যোগক্ষেম পুরুষ। জীবন-মৃত্যুর এই চরম সন্ধিক্ষণে রুদ্ধ কারাকক্ষে নবীন স্বাস্থ্য ও অনাবিল প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে তাঁর দেহ-মন। ফাঁসির হুকুমের পর তাঁর দেহের ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে ষোল পাউণ্ড। “দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ” (গীতা, ২।৫৬)—তিনি সেদিন দুঃখে উদ্বেগহীন, সুখে নিঃস্পৃহ, আসক্তিশূন্য ও ভয়মুক্ত স্থিতধী তাপস। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিল একখানি গীতা এবং স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগ। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখছেন যে, “মরণের আশা-পথ চাওয়া দিনগুলি সে ঘুমাইয়া ও গীতা পড়িয়া কাটাইত।” উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখছেন যে, কানাইলাল প্রত্যহ স্নান-আহ্নিক সেরে গীতা-

ভাগবতাদি পাঠ করার পর জেলের কদর্য আহার গ্রহণ করতেন। মুরারিপুকুর বোমার মামলায় অন্যতম বিচারাধীন বন্দী বিপ্লবী নায়ক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন : "জীবনে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী দেখিয়াছি, কানাই-এর মত অমন প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর বড় একটি দেখি নাই। সে মুখে চিন্তার রেখা নাই, বিষাদের ছায়া নাই, চাঞ্চল্যের লেশ মাত্র নাই—প্রফুল্ল কমলের মতো তাহা যেন আপনার আনন্দে আপনি ফুটিয়া রহিয়াছে। চিত্রকূটে ঘুরিবার সময় এক সময় এক সাধুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে, জীবন ও মৃত্যু যাহার কাছে তুল্যমূল্য হইয়া গিয়াছে, সে-ই পরমহংস। কানাইকে দেখিয়া সেই কথা মনে পড়িয়া গেল। ...প্রহরীর নিকট শুনিলাম, ফাঁসির আদেশ শুনিবার পর তাহার ওজন ১৬ পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে! ঘুরিয়া ফিরিয়া, শুধু এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, চিত্তবৃত্তিরোধের এমন পথও আছে, যাহা পতঞ্জলিও বাহির করিয়া যান নাই। ভগবানও অনন্ত, আর মানুষের মধ্যে তাঁহার লীলাও অনন্ত।"

মৃত্যুপথযাত্রী বীরকে শেষবারের মতো দেখতে এলেন বৃদ্ধা মা। মাকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বললেন : "মা আমার জন্য কিছু ভেবো না, আমি বেশ আছি, আমি ভাল জায়গায় যাচ্ছি।"

মা জানতে চাইলেন যে, তিনি কী খেতে চান। তিনি বললেন : "যা দরকার তাতো পাচ্ছি মা, এর উপরে আর আমার কিছুরই দরকার নেই।"

১০ নভেম্বর তাঁর ফাঁসি হবে। ফাঁসির পূর্বদিন সন্ধ্যায় তিনি মুরারিপুকুর বোমার মামলায় বিচারাধীন বন্দীদের সেলের সামনে এসে স্মিতহাস্যে সকলকে বিদায় নমস্কার জানিয়ে যান। প্রহরী সেদিন বাধা দেননি। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ কানাইকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি লিখছেন : "সে সহাস্য প্রসন্ন জ্যোতির্ময় রূপ আমি কখনও ভুলিব না, কানাই তখন মহাতাপস, প্রকৃত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী।" মৃত্যু দরজায় করাঘাত করছে, অথচ তাঁর মনে কোন ভয় ভাবালুতা চাঞ্চল্য—কিছুই নেই। তাঁর মুখে স্মিতহাসি। আইরিশ ওয়ার্ডার ফুকারিয়া তাঁকে প্রশ্ন করেছিল : "কানাই, ফাঁসির সময় এ হাসি থাকবে তো?" রাত্রি সাড়ে নটা পর্যন্ত প্রসন্নচিত্তে তিনি গীতা-ভাগবতাদি পাঠ করলেন —তারপর মগ্ন হলেন গভীর নিদ্রায়। ভোর চারটের সময় জেলকর্তৃপক্ষ তাঁকে ডাকতে এসে দেখলেন যে, ফাঁসির আসামী গভীর নিদ্রায় মগ্ন। ঘুম থেকে উঠে খুবই শান্ত ও অচঞ্চল অবস্থায় প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করলেন। তারপর ব্যায়াম, স্নান, গীতাপাঠ সেরে জেলের আহার গ্রহণ করে গীতা হাতে হাসিমুখে দৃঢ় পদক্ষেপে ঋজুদেহে পুলিশ পরিবেষ্টিত অবস্থায় এগিয়ে চললেন বধ্যমঞ্চের দিকে। উপস্থিত পুলিশ কর্মচারীদের সঙ্গেও কিছুক্ষণ পরিহাস করলেন, কিভাবে ফাঁসি দেওয়া হয় তাও তিনি জেনে নিলেন। ফাঁসির দড়িটি পরীক্ষা করে বললেন যে, দড়িটি বড় কষা, একটু মেজে দিলে ভাল হয়। শেষ পর্যন্ত দড়িটি তিনি নিজেই ঠিক করে নেন।

১০ নভেম্বর—যথাসময়ে হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে উঠলেন বন্দীবীর—তাঁর বুকে জড়ানো আছে গীতা। চিৎকার করে বললেন : 'বন্দে মাতরম্'। তাঁর মুখ ঢেকে দেওয়া হল, ফাঁসির দড়ি গলায় উঠল—কাছেই ছিল সেই আইরিশ প্রহরী ফুকারিয়া। কানাইলাল হাসতে হাসতে তাকে বললেন : "মিঃ, আমায় তুমি কেমন দেখছ?" এবার পায়ের তক্তা সরে গেল। মাতৃসেবায় উৎসর্গীকৃত হল একটি মহাপ্রাণ।

মৃত্যুকালে কানাইয়ের এই নির্ভীকতা ও হাস্যোজ্জ্বল মুখচ্ছবি উপস্থিত রাজকর্মচারীদের স্তম্ভিত করে দেয়। অনেক ইওরোপীয় প্রহরী গোপনে বারীন্দ্রকুমারকে জিজ্ঞাসা করে: "তোমাদের হাতে এরকম ছেলে আর কতগুলি আছে?" সৎকারের জন্য মৃতদেহ আনতে গিয়েছিলেন মতিলাল রায় এবং কানাইলালের অগ্রজ আশুতোষ দত্ত। তাঁদের কাঁদতে দেখে আইরিশ ফকারিয়া আশুতোষ দত্তের করমর্দন করে বলেছিলেন: "মিঃ দত্ত, আপনি কাঁদিবেন না। আপনার ভাই একজন খাঁটি বীর এবং এত বড় নির্ভীক দেশপ্রেমিক আয়ার্ল্যাণ্ডেও অধিক মিলিবে না।" সে আরও বলে যে, "এরূপ বীর যুবক যে দেশে জন্মিয়াছে সে দেশ ধন্য, জন্মিলে তো মরিতেই হয়, এমন মরা ক'জন মরিতে পারে?" সে জানায়; "কাল সন্ধ্যার পর তাহার মুখে এমন মিষ্টি হাসি দেখিয়াছি, তাহা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না।"

কানাইলালের মৃতদেহ একটি কালো কম্বলে ঢাকা ছিল। মতিলাল রায় কম্বল সরিয়ে দেখলেন মৃত কানাইলালের অনিন্দ্যসুন্দর দিব্যরূপ—মৃত্যুর মালিন্য তাঁকে সামান্যতম স্পর্শও করেনি। তিনি লিখছেন: "সে তপস্বী কানাইয়ের দিব্যরূপের পরিচয় দিবার ভাষা নাই—অর্দ্ধনিমীলিত নেত্র যেন এখনও অমৃত আস্বাদে ঢুলু ঢুলু, দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠপুটে সঙ্কল্পের জাগ্রত রেখা ফুটিয়া উঠিতেছে,…।" আশ্চর্য! মৃত্যুযন্ত্রণার একটি কুঞ্চিত বীভৎস চিহ্নও কানাইয়ের কোন অঙ্গে আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না।

গীতা বলে আত্মা অবিনশ্বর, মৃত্যু দেহান্তর গমনমাত্র—জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করে নূতন বস্ত্র পরিধান করা। গীতা বলে—সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদে নিঃস্পৃহ, আসক্তিহীন ও ভয়শূন্য হওয়ার কথা। গীতার এই তত্ত্বোপলব্ধি না হলে কোন মানুষই এমনভাবে হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করতে পারে না। গীতাধ্যায়ী এই বিপ্লবীর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। তাঁর মৃতদেহ নিয়ে বের হয়েছিল বিরাট শোভাযাত্রা। দর্শনার্থী নরনারী সেদিন ফুল-চন্দন ও বেলপাতার সঙ্গে শেষ অর্ঘ্য হিসেবে শবদেহের উপর ছুঁড়ে দিয়েছিল অসংখ্য গীতা। গীতায় গীতায় গীতাময় সেদিন কানাইলালের শেষ-শয্যা। তাঁর শবদেহ যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ।

মতিলাল রায় কানাইলালের মৃত্যুর মধ্যে গীতার তত্ত্বই মূর্ত হতে দেখেছিলেন এবং নানা স্থানে তিনি একথাই বলে বেড়াতেন। বিপ্লবী প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী লিখছেন: "মতিবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মী কানাইলাল দত্তের ফাঁসির মঞ্চে আত্মোৎসর্গের মধ্যে ভারতের বৈপ্লবিক সাধনার মর্মকথাটি কিভাবে রূপায়িত হয়েছে তাও তিনি ব্যাখ্যা করতেন। গীতার তত্ত্ব কিভাবে কানাইলালের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়েছিল তা আমাদের মধ্যে আলোচিত হ'ত। বাস্তবিক, আমাদের সেদিনের বিপ্লবী যুবকদের আমরা গীতার এই আদর্শই বোঝাতে চেষ্টা করতাম—নিষ্কাম কর্ম, আত্মসমর্পণ যোগ, সুখে-দুঃখে সমে কৃত্বা, লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ, ন হন্যতে ন হন্যমানে শরীরে; মৃত্যু জীর্ণ বস্ত্রের মত দেহত্যাগ…ইত্যাদি।"

তোমাদের মন-মুখ এক হোক—ভাবের ঘরে চুরি যেন একদম না থাকে, তোমরা যেন জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত মরতে পার—ইহা সদাসর্বদা বিবেকানন্দের প্রার্থনা।

—স্বামী বিবেকানন্দ

পুরাতনী

মানুষের মতো মানুষ

পুরাকালে একদা পৃথিবীতে বহু বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টি চলিতে থাকিলে খাদ্যাভাব হেতু বহু প্রজা বিনষ্ট হইতে লাগিল। তাই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কোন পুণ্যবান ব্যক্তিকে পৃথিবীর অধিপতি করিতে পারিলে তবেই পৃথিবী রক্ষা পাইবে—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তিনি মনুবংশে জাত তপস্যারত রাজর্ষি রিপুঞ্জয়ের সমীপে সমাগত হইয়া বহু সম্মানপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন: হে মহামতে রিপুঞ্জয়! তুমি পৃথিবীপতি হইয়া দিবোদাস নাম গ্রহণপূর্বক পৃথিবী পালন কর—এই আমার অভিপ্রায়। রিপুঞ্জয় ব্রহ্মার আদেশ শিরোধার্য করিয়া করজোড়ে বলিলেন: হে সর্বলোক পিতামহ! আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মত আছি। তবে আমার একটি নিবেদন আছে। আমি যদি পৃথিবীপতি হই, তাহা হইলে দেবগণকে মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে অবস্থান করিতে হইবে। তাহা না হইলে আমি নিষ্কণ্টকে প্রজাপালন করিতে পারিব না। পিতামহ ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া রিপুঞ্জয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। কিন্তু সমস্যা হইল শিবকে লইয়া। পৃথিবীতে কাশীধাম শিবের অতি প্রিয় স্থান। দেবাদিদেব মহাদেবকে কি করিয়া কাশীত্যাগী করা যায়, এই ভাবনায় ব্রহ্মা অতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন।

তখনকার দিনে পর্বতেরও প্রাণ ছিল এবং তাহারা অনায়াসে একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনাগমন করিতে পারিত। পর্বতশ্রেষ্ঠ মন্দর কঠোর তপস্যা করিয়া শিবকে তুষ্ট করিলে শিব তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন। মন্দর প্রার্থনা করিলেন: হে শিব! আপনি অদ্য হইতে উমার সহিত আমার শিখরে বসবাস করুন,—এই বরদানেই আপনি আমাকে কৃতার্থ করুন। মন্দরের এই কথা শুনিয়া শিব বরদানে ইতঃস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এমন সময় ব্রহ্মা সেখানে উপস্থিত হইয়া শিবকে সবিনয়ে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া মন্দরের প্রার্থনা পূরণ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। শিবও ব্রহ্মার সম্মানরক্ষার্থে মন্দরকে 'তথাস্তু' বলিয়া বর প্রদান করিলেন এবং স্বীয় অনুচরবর্গসহ কাশীক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া মন্দর পর্বতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে ব্রহ্মার আদেশে রিপুঞ্জয় দিবোদাস নাম গ্রহণ করিয়া বারাণসীতে রাজধানী স্থাপনপূর্বক দেবগণকে ব্রহ্মার আদেশ জানাইয়া পৃথিবীত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলে দেবগণ মর্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন এবং দিবোদাসও নিষ্কণ্টকে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

রাজা দিবোদাস অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও দক্ষ নৃপতি ছিলেন। তাঁহার তপস্যাপূত পুণ্যের প্রভাব পৃথিবী হইতে অনাবৃষ্টি দূর করিয়া তাহাকে শস্য-শ্যামলা ও সমৃদ্ধিশালিনী করিল। তাঁহার শাসনগুণে সকল প্রজাই সুখে-শান্তিতে দিন যাপন করিত। সকল প্রজাকেই তিনি নিজ সন্তানতুল্য জ্ঞান করিতেন। প্রজাদের সর্ববিধ সুখ-সুবিধা ও মঙ্গলের দিকে তাঁহার সর্বদা তীক্ষ্ণ

থাকিত। তাঁহার ধর্মনিষ্ঠ আচরণ ও প্রজা বাৎসল্যের জন্য সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। দিবোদাসের সুশাসনে সমৃদ্ধিশালিনী পৃথিবী স্বর্গকেও হার মানাইল।

দিবোদাসের এরূপ রাজ্য পরিচালনা দেখিয়া দেবতাগণ ঈর্ষান্বিত হইলেন। তাঁহারা কেবল তাঁর ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন যার ফলে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করা যায়। কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা আদর্শ-চরিত্র রাজর্ষি দিবোদাসের কোন ত্রুটি আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। দেবরাজ ইন্দ্রের চিন্তা হইল এইবার বুঝি তাঁহার ইন্দ্রত্ব চিরকালের মতো লোপ পায়! তিনি দেবগুরু বৃহস্পতির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী অগ্নিদেবের শরণাপন্ন হইলেন। অগ্নির সমীপস্থ হইয়া তিনি বিনীতভাবে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন: হে হব্যবাহন! দিবোদাস দেবতাগণকে পৃথিবীচ্যুত করিয়াছে। তাঁহাকেও রাজ্যচ্যুত করিতে আপনি আমার সহায় হউন। আপনার যে শক্তি পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত আছে তাহা আপনি পৃথিবী হইতে অপসৃত করুন। তাহা হইলে প্রজারা রাজার উপর বিরক্ত হইবে। প্রজারঞ্জন বিনষ্ট হইলেই রাজা বিনষ্ট হয়। হে হুতাশন! দিবোদাসকে পৃথিবীচ্যুত করিতে আপনিই আমার একমাত্র সহায়।

দেবরাজ ইন্দ্রের অনুরোধে অগ্নি পৃথিবী হইতে নিজ শক্তি অপসৃত করিলেন। পৃথিবীতে হঠাৎ অগ্নির ক্রিয়া লোপ পাওয়ায় রন্ধনাদি ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেল। মধ্যাহ্নকালে উপাসনাদি সাঙ্গ করিয়া ক্ষুধার্ত রাজা দিবোদাস ভোজনালয়ে প্রবেশ করিলে পাচকগণ নিবেদন করিল যে হঠাৎ অগ্নি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় আজ রন্ধন করা সম্ভব হয় নাই। কেন এইরূপ হইল তাহারা জানে না। অনন্তর দিবোদাস ক্ষণকাল চিত্তস্থির করিয়া তপোবলে জানিতে পারিলেন যে ইহা দেবগণের চক্রান্ত। ইতিমধ্যে অমাত্যগণের সহিত পুরবাসীরা রাজপ্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইয়া রাজার নিকট তাহাদের দুর্দশার কথা জানাইল। তাহাদের নিকট হইতে সব শ্রবণ করিয়া রাজা বলিলেন: হে আমার সন্তানসম প্রজাগণ, তোমরা ধৈর্য অবলম্বন কর। আমরা দেবগণের ষড়যন্ত্রের শিকার হইয়াছি। তবে দেবতারা আমাদের যতই অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করুন না কেন তোমরা আমার উপর ভরসা রাখ। আমার তপস্যাবলে আমি নিজেই ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, সোম—সকল দেবতার কার্য সম্পাদন করিব। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার প্রসাদে আমি এই রাজ্যলাভ করিয়াছি। সূর্যদেব আমার বংশের পূর্বপুরুষ। তাঁহারা অনুকূল থাকিলে দেবতারা আমাদের কোন অনিষ্টই করিতে পারিবেন না। তোমরা স্ব-স্ব গৃহে গমন কর। আমার জীবন থাকিতে তোমাদের কোন কষ্ট হইবে না। পুরবাসিগণ রাজার এইরূপ সান্ত্বনাবাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া প্রসন্নবদনে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিল। দিবোদাস তাঁহার তপস্যা প্রভাবে সুষ্ঠুভাবে রাজ্য চালাইতে থাকিলেন। দেবতারা তাঁহার কোন অনিষ্টই করিতে সক্ষম হইলেন না।

এদিকে বিশ্বনাথ মন্দর পর্বতে আরামে কালযাপন করিলেও বহুদিন কাশীছাড়া থাকায় তাঁহার মনে সুখ ছিল না। বারাণসীর নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের কথা তাঁহার মনের মণিকোঠায় উঁকি মারিলেই তথায় যাইতে মন চাহিত। কিন্তু ব্রহ্মার সহিত অঙ্গীকারের কথা মনে করিয়া তাঁহার মন বিষাদপূর্ণ হইয়া যাইত। শিবের এই বিরস বদন লক্ষ্য করিয়া গৌরী একদিন তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পতির কাশী-বিরহের কথা অবগত হইলেন। তখন তিনিও কাশীর নানা প্রশংসা করিয়া তথায় ফিরিয়া যাইবার

ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মহাদেব জানাইলেন যে মহাত্মা দিবোদাস রাজা থাকাকালীন তাঁহারা কাশীতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

অতঃপর পার্বতীর সহিত পরামর্শ করিয়া দিবোদাসের কোন দোষ ধরা যায় কিনা তাহা দেখিয়া আসিতে শিব যোগিনীগণকে আদেশ করিলেন। তদনুসারে তাঁহারা ছদ্মবেশে কাশীতে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু দিবোদাসের কোন ত্রুটি বাহির করিতে পারিলেন না। উপরন্তু কাশীর সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন, মন্দরে আর ফিরিয়া আসিলেন না। এদিকে তাঁহাদের কোন সংবাদ না পাইয়া শিব অধৈর্য হইয়া পড়িলেন এবং ক্রমান্বয়ে সূর্য, ব্রহ্মা ও নিজ তনয় সিদ্ধিদাতা গণেশকে কাশীতে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারাও অনুসন্ধান করিয়া দিবোদাসের কোন দোষ বাহির করিতে পারিলেন না।

অতঃপর ভগবান বিষ্ণু ব্রাহ্মণের বেশে কাশী-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ব্রাহ্মণবেশধারী বিষ্ণু দিবোদাসের সমীপস্থ হইয়া নানা প্রকার মিষ্টবাক্যে তাঁহার চরিত্রের ও রাজ্য পরিচালনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিলেন: মহারাজ, তোমার ন্যায় নির্মল-চরিত্র ব্যক্তি অতি দুর্লভ। সকল রাজকীয় গুণরাশিদ্বারা তুমি ধন্য। দেবগণকে পৃথিবী ত্যাগ করাইয়া তুমি কোন অন্যায় কর নাই। তবে শিবকে কাশী হইতে বিতাড়ন করিয়া ভাল কাজ কর নাই। ইহাই তোমার একমাত্র দোষ বলিয়া আমার মনে হইতেছে। তুমি যদি এই কাশীধামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কর, তবে তোমার এই অপরাধ স্খালন হইবে। আমি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখিতেছি অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলে তোমাকে সশরীরে শিবলোকে লইয়া যাইবার জন্য একখানা শিব-বিমান তোমার নিকটে উপস্থিত হইবে।

ব্রাহ্মণের কথা শ্রবণ করিয়া দিবোদাস তাহাকে যথাযথ সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক বলিলেন: হে দ্বিজবর! আমি বহুবৎসর নিষ্কণ্টকে রাজ্য-ভোগ করিয়াছি। আর রাজ্যভোগে আমার স্পৃহা নাই। এখন আপনি যাহা উপদেশ করিলেন তাহাতে কৃতার্থ হইলাম। আপনার আদেশানুযায়ী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিব। অতঃপর রাজর্ষি দিবোদাস শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠান্তে পুত্রের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সন্তানসম প্রজাপুঞ্জ ও স্বীয় পুত্রের নিকট বিদায় লইয়া সংসার পরিত্যাগপূর্বক শিবপ্রেরিত যানে আরোহণ করতঃ নরদেহেই অমৃতধামে গমন করিলেন।

সর্বতোভাবে প্রজানুরঞ্জনই ছিল প্রাচীন ভারতে রাজার ধর্ম। প্রজার সুখে সুখী এবং দুঃসময়ে তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া দুঃখ-কষ্টের প্রতিকার করাই ছিল তাঁহাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য। দিবোদাসের কাহিনীটি আমাদের ঐ কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। বর্তমান ভারতবর্ষে রাজতন্ত্র নাই; কিন্তু দেশ শাসনের দায়িত্ব যাহাদের উপর অর্পিত আছে দিবোদাসের চরিত্র তাঁহাদেরও অনুসরণীয়। তাহা হইলে দেশের ও দশের যে মঙ্গল হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

[স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড অবলম্বনে]

পুস্তক সমালোচনা

ভক্তি ভক্ত ভগবান— শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশকঃ স্বামী নিত্যানন্দ সরস্বতী, আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, পোঃ হালিসহর, ২৪ পরগণা। পৃঃ ১২+ক—গ+২৬১; মূল্যঃ চব্বিশ টাকা।

গ্রন্থের পৃষ্ঠাবরণীতে যে লেখক-পরিচিতি মুদ্রিত হয়েছে তা হতে জানা যায় যে কবি শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায়ের কাব্যপ্রতিভায় প্রীত হয়ে ভাটপাড়ার পণ্ডিতসমাজের পক্ষে পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডঃ শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয় তাঁকে 'কবিরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন।

শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর 'নিবেদনে' উল্লেখ করেছেন যে এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই উদ্বোধন, প্রণব, আর্যদর্পণ, উজ্জীবন, বিশ্ববাণী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

৭৩টি কবিতায় কিঞ্চিদধিক ৬১জন সাধক (ও সাধিকার) জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী ছন্দাকারে রচনা ও পরিবেশন করে কবিরত্ন মহাশয় অধ্যাত্মরসপিপাসু ভক্তগণের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। প্রকাশক তাঁর 'নিবেদনে' বলেছেন, ইহার মধ্যে প্রায় প্রতিটি ঘটনাই রোমাঞ্চকর ও শিক্ষাপ্রদ। ভক্ত কে, ভক্তি কি ও ভগবান কে এই তিনটি বিষয়ে প্রাচীন শাস্ত্র ও ঋষিমুনিদের কিছু কিছু উধৃতি একত্রিত করে লেখক কবি কেবল যে কবিতাগুলির মূল্যবান প্রাক্-পরিচিতি দিয়েছেন তা নয়, পরিবেশিত বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশের সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশিকাও পাঠকবর্গকে সরবরাহ করেছেন। ফলে, 'প্রকাশকের নিবেদন'মত 'মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় ভক্তির প্রবণতা, ভক্তের আকুলতা এবং ভগবানের লীলামধুরতা' এই তিনের সমন্বয়ে বিরচিত গ্রন্থ 'ভক্তি ভক্ত ভগবান'-এর তাৎপর্য তাঁরা প্রারম্ভেই বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

লেখক-কবি তাঁর সংগ্রহে যে সব অধ্যাত্ম-চরিত্রের (ও কাহিনীর) সমাবেশ ঘটিয়েছেন তার মধ্যে আছে (১) প্রহ্লাদ, অজামিলের ন্যায় পৌরাণিক চরিত্র, (২) সাক্ষীগোপালের কাহিনী, (৩) বৌদ্ধকাহিনী হতে সংগৃহীত কয়েকটি চরিত্র, (৪) বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় অবতারগণ, (৫) বৈষ্ণবসাধকবর্গ ও মহাজনেরা এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পার্ষদ কয়েকজন, (৬) শ্রীরামকৃষ্ণগোষ্ঠীর স্বামী বিবেকানন্দ, ভক্ত নাগ-মহাশয় ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ, (৭) শঙ্কর, রামানুজ, মধ্বের ন্যায় আচার্যগণ, (৮) মধ্যযুগীয় ভারতের সাধনার ধারাবাহক কবীর, নানক, রুইদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতি, (৯) বিখ্যাত তন্ত্রসাধক কয়েকজন, (১০) রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি শাক্ত কবি ও সাধক কয়েকজন, (১১) তুলসীদাস, তুকারাম, নরসিংমেহতা, জয়দেব প্রভৃতি সাধক কবিদের কয়েকজন, (১২) ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী, রাম-ঠাকুর, সাঁইবাবা প্রভৃতি সাধুসন্তেরা।

মহাভারত হতে ভীষ্মচরিত্র ও দধীচির আত্ম-ত্যাগ কাহিনী শেষ দুটি কবিতায় স্থান পেয়েছে। সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অনুযোগ করা যেতে পারে যে রামায়ণের দুই একটি কাহিনীও কবিতায় আহৃত হলে মন্দ হত না।

১০ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি কবিতায় 'কবি-রাজ কৃষ্ণদাস কবিরাজ'কে লেখক কবি যে উচ্ছ্বাসময় প্রশস্তি জানিয়েছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। প্রতি স্তবকের শেষে ছন্দে মিলানো 'তোমারে নমস্কার' শব্দদ্বয়ের ঝঙ্কার সমমর্মীদের মনে স্বতঃস্ফূর্ত অনুরণন তুলতে থাকবে।

দুইটি ছন্দাশ্রয়ে তাঁর কাব্যপ্রতিভার স্ফূর্তি এই গ্রন্থে; ১৭টি কবিতায় একটি ছন্দের ও বাকী সমস্ত কবিতায় অপর ছন্দটির ব্যবহার দেখা যায়।

করে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী ২৬ অক্টোবর প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে এবং পরদিন এক জনসভায় পৌরোহিত্য করেন। এই আলোচনাচক্রে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

ছাত্র-কৃতিত্ব

মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজের দুজন ছাত্র মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুষ্ঠিত ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের বি. এস. সি. এবং এম. এ. পরীক্ষায় যথাক্রমে রসায়নশাস্ত্রে ও সংস্কৃতে ১ম স্থান অধিকার করেছে।

মরিশাসের ভ্যাকোয়া শহরের মিউনিসিপ্যালিটি মরিশাস রামকৃষ্ণ মিশনকে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য মরিশাসের গভর্ণর জেনারেলের উপস্থিতিতে স্বর্ণপদক 'মেডেল অব্ টাউন' প্রদান করেছেন।

দেহত্যাগ

স্বামী সূত্রানন্দ (শৈলেশ মহারাজ) গত ১১ নভেম্বর বেলা ২-৪০ মিঃ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৬৯ বছর বয়সে বেলুড় মঠের আরোগ্য ভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

স্বামী সূত্রানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হবিগঞ্জ (অধুনা বাংলাদেশ) রামকৃষ্ণ আশ্রমে যোগদান করেন এবং যথাসময়ে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যোগদানের কেন্দ্র ছাড়া রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সারগাছি, ফরিদপুর (বাংলাদেশ), বাঁকুড়া এবং শিলচর কেন্দ্রে বিভিন্ন সময়ে কর্মী হিসাবে এবং কয়েক বছর পুরী মঠের অধ্যক্ষ হিসাবে সঙ্ঘের সেবা করেন। হৃদ্‌যন্ত্রের অবনতির জন্য বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি অবসর জীবনযাপন করছিলেন। অবসর জীবনে প্রথমে বারাণসী অদ্বৈত-আশ্রমে ও পরে বেলুড় মঠে আসার পূর্ব পর্যন্ত শিলচরে বাস করেন। সরল ও অনাড়ম্বর সাধুজীবনের জন্য তিনি অনেকের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে গত ১৩ নভেম্বর শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজীর এবং গত ১৫ নভেম্বর শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর জন্মতিথি উপলক্ষে সন্ধ্যায় তাঁদের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী বিকাশানন্দ ও স্বামী চৈতন্যানন্দ।

বিবিধ সংবাদ

ত্রিপুরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ

গত ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, ত্রিপুরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের অর্ধবার্ষিক সম্মেলন কৈলাসহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভক্তসম্মেলন, ভজন-সঙ্গীত, ধর্মালোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন স্বামী গহনানন্দ। ১৪ তারিখে নাট মন্দিরে এবং ১৫-তে কৈলাসহর রামকৃষ্ণ আশ্রম মহাবিদ্যালয়ের হলে ধর্মালোচনা হয়। এই উপলক্ষে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এক বিতর্ক প্রতিযোগিতা হয়। স্বামী ক্ষান্ত্যানন্দ, স্বামী উদ্‌গীথানন্দ, স্বামী-শান্তিদানন্দ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জাপানের দশ হাজার পদার্থ-বিজ্ঞানী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ যুদ্ধ পরিকল্পনায় জাপানের অংশ গ্রহণ-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন যতই টাকার লোভ দেখান হোক না কেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁরা মহাকাশ যুদ্ধের কোন পরিকল্পনার গবেষণাতে কোনভাবেই অংশ নেবেন না।

উৎসব

গত ১৪ থেকে ১৭ অগস্ট ১৯৮৬ খড়্গপুর (মেদিনীপুর) রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটির পরিচালনায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব সমারোহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়েছে। বিশেষ পূজা, হোম, নর-নারায়ণ সেবা, ভজন এবং ঠাকুর-মা-স্বামীজীর জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে উৎসব সুসম্পন্ন হয়।

গত ১৭ অগস্ট ১৯৮৬, চকপাড়া (হাওড়া) প্রবুদ্ধ ভারত সংঘের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়। প্রভাত ফেরি, পূজা-হোম, প্রসাদ বিতরণ, ভক্তি গীতি এবং ধর্মসভা ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ।

ভারতের পরিবেশ দূষণে ডি. ডি. টি

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কীটপতঙ্গ, মশা প্রভৃতি ধ্বংসের কাজে ডি. ডি. টি. প্রথম ব্যবহৃত হয়। আজ পর্যন্ত জনস্বাস্থ্যের জন্য দুই লক্ষ টন এবং কৃষি-কার্যের জন্য ৫০০০ টন ডি. ডি. টি. ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে প্রতি বৎসর জনস্বাস্থ্যের জন্য ১২০০০ টন এবং কৃষিকার্যের জন্য ২০০০ টন লাগে। ম্যালেরিয়া দূরীকরণের কাজে এই রাসায়নিক দ্রব্য বিপুলভাবে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে রোগ সংক্রামক নানা ধরনের মশা বা অন্যান্য কীটের মধ্যে এই রাসায়নিক দ্রব্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মেছে, তবে কৃষিসংক্রান্ত কীট-পতঙ্গের মধ্যে এরূপ প্রতিরোধ ক্ষমতা পাওয়া যায় না। তবে বিরাটভাবে এর ব্যবহারের জন্য ফলশ্রুতি হচ্ছে নানা পরিবেশ, এমনকি মানুষের শরীরাংশে এর অবস্থিতি। কিন্তু ঘটনাটা যে রকম সাংঘাতিক বলে শোনা যায়, সে রকম নয়। পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় কৃষকদের বাড়ি ও বাজারের ৫৪ জায়গা হতে সংগৃহীত গম, চাল ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এর মধ্যে ২১ জায়গার সামগ্রীতে ডি. ডি. টি. রয়েছে, কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশে পাওয়া গেছে ৬৬ শতাংশের মধ্যে। দিল্লীতে বেগুন বাঁধাকপি ইত্যাদির ২৫ শতাংশের মধ্যে, শরীরের ক্ষতিকর পরিমাণে ডি.ডি.টি. দেখা গেছে। কোন কোন জায়গার দুধ, ঘিতে, এমনকি টিনে ভরা শিশু খাদ্যেও এই রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া গেছে। ছাগল, ভেড়া ও মুরগির মাংসে এটি পাওয়া গেলেও পরিমাণে বেশি নয়। মোটা-মুটিভাবে দেখা গেছে যে খাদ্যের মাধ্যমে প্রতি-দিন ০.২৭ মিলিগ্রাম ডি.ডি.টি. আমাদের শরীরে ঢোকে—যা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বাঁধত মান অনুযায়ী পরিমাণে বিপদ সীমার অনেক নিচে (৫০ কে. জি. ওজনের লোকের শরীরে ০.৫ মিলিগ্রাম ডি. ডি. টি. প্রতিদিন শরীরে ঢুকলেও বিশেষ ক্ষতি করে না)। বাস্তবিক পক্ষে ভারতের পরিবেশে আগের চেয়ে বর্তমানে এর পরিমাণ কমই পাওয়া যাচ্ছে। পরিবেশে একবার এসে গেলে ঠাণ্ডা দেশে ৪—৩০ বৎসর এটি থেকে যায়; কিন্তু আমাদের দেশের জলহাওয়ায় এটি ৩ মাসের বেশি থাকে না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে যে সামান্যভাবে ক্রমাগত শরীরে ঢুকলে বিপদের আশঙ্কা থেকেই যায়। সেজন্য আস্তে আস্তে এর ব্যবহার কমিয়ে এটি একেবারে বন্ধ করে ফেলাই ভাল।

[Proceedings of the Indian National Science Academy, (Biological Sciences, Part B), vol 51, 1985, pp 169—184.]

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের দীক্ষিত-শিষ্যা কুন্দরানী নাগ গত ২৩ নভেম্বর ৭৫ বৎসর বয়সে মাদ্রাজে পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের দীক্ষিত শিষ্য ও সিলেট (বাংলাদেশ) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত পরলোকগত প্রফুল্লচন্দ্র নাগের সহধর্মিণী।

তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তিলাভ হউক এই প্রার্থনা করি।

গ্রন্থটিতে কবি ছন্দবৈচিত্র্য দেখাননি কেন, সে সম্বন্ধে তাঁর 'নিবেদন'হতে প্রাসঙ্গিক উধৃতি দেওয়া গেল—'আমি আধুনিক কবি নই। অন্ত্যানুপ্রাস-যুক্ত কবিতা লিখি। এই কবিতা লিখে আনন্দ পাই।'

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে এই কবিতাসমূহ যেন hagiology-র একটি নাগালের মধ্যে সাজানো ছোটখাটো সুশোভিত সেল্ফ্ বিশেষ। পণ্ডিতবর শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয় ভূমিকায় লিখেছেন: 'নিত্যপাঠ্য নিত্যসঙ্গীরূপে ঘরে ঘরে এই গ্রন্থখানি সমাদৃত হউক—এই কামনা করি।' আমরাও সেই কামনা করি।

গ্রন্থটির মুদ্রণ ইহাকে সহজপাঠ্য করেছে। সুশোভন প্রচ্ছদ লেখক কবির স্বপরিকল্পিত। গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ অলংকরণে সহায়তা করেছে অধিকাংশ কবিতার সমাপ্তিসূচক ছোট ছোট চিত্রাংকণ। যে-সব কবিতার শেষে চিত্রাঙ্কণ নেই, সেখানে গীতা, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ, সাধক কবিগণের নিজেদের রচনা, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ (দত্ত), কুমুদরঞ্জনের কবিতা হতে উধৃতি প্রশংসনীয় সংযোজন।

—শ্রীপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—শ্রীশ্রীমধুসূদন সরস্বতী বিরচিত গূঢ়ার্থদীপিকা-ব্যাখ্যা সম্বলিত। অনুবাদক: পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ। প্রকাশক: নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। পৃ: ১২৮৪+১২, মূল্য: ৭৫ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীশ্রীমধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা বাঙ্গালীজাতির বড় গৌরবের এবং আদরের বস্তু। অদ্বৈত বেদান্তের একনিষ্ঠ সেবক এই সন্ন্যাসী শুধু অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন না। জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয়ে গূঢ়ার্থদীপিকা টীকাখানি রচনা করে তিনি ভগবদ্গীতার পাঠকদের পরম কল্যাণসাধন করে গিয়েছেন। দীর্ঘকাল পর পণ্ডিত শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ আমরা একটি নির্ভরযোগ্য বঙ্গানুবাদ এবং তার সঙ্গে অনুবাদের ভাবপ্রকাশ পেয়ে মধুসূদনের টীকার স্বাদ গ্রহণ করার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছি। এই শ্রেণীর প্রকৃত পণ্ডিত ব্যক্তির লেখা সম্বন্ধে অধিক কথা বলার যোগ্য ব্যক্তি বাংলায় বিরল।

এই গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম এম. এ., পি. আর. এস., পি. এইচ. ডি. মহাশয়ের ভূমিকায় লিখিত দু একটি উধৃতি দিয়েই গ্রন্থের সমালোচনা শেষ করছি।

"মধুসূদনের টীকায় সন্নিবেশিত অমূল্য রত্ন-রাজি সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠকবৃন্দের নিকট এতদিন অপ্রাপ্য ছিল। আজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ মহাশয়ের অশেষ পরিশ্রমের ফলে ও অনুগ্রহে বাঙ্গালীর একটী বিশেষ অভাব দূরীকৃত হইল, এজন্য বাঙ্গালী-মাত্রেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।"

"মধুসূদন সমগ্র গীতাকে কাণ্ডত্রয়ে বিভক্ত দেখিয়াছেন,—গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্মকাণ্ড, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তিকাণ্ড ও অন্তিম ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানকাণ্ড। গীতাকে এইভাবে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় গ্রন্থভাবে আলোচনা করিতে শিক্ষা দেওয়া মধুসূদনের অমূল্য দান। মধুসূদনের টীকা পাঠের ফলে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা দূর হইয়া গীতার যথার্থ তাৎপর্য্য পাঠকদের হৃদয়ঙ্গম হইলে, গ্রন্থের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।"

গ্রন্থখানি অতি যত্নের সহিত ছাপানো এবং বাঁধাই হয়েছে। ছাপার ভুল দেখতে পাইনি। গ্রন্থের আকৃতি দেখে মনে হয় যথাসম্ভব কম মূল্য ধার্য হয়েছে। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

—স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ

স্বামী অভেদানন্দের জীবনস্মৃতি—লেখক-প্রকাশক : নারায়ণচন্দ্র গুহরায়, অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যার্থী আশ্রম, পোঃ সেবায়তন, ঝাড়গ্রাম মেদিনীপুর, (?) ১৯৮২। পৃঃ-ম+১৩৩, মূল্য : পাঁচ টাকা।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ) গ্রন্থটির একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখেছেন। 'গ্রন্থকারের নিবেদন' ও 'সংকলনের স্মৃতিচারণ'—ছুটি নাতিদীর্ঘ বিবরণে লেখক স্বামী অভেদানন্দের কাছে তাঁর দীক্ষার ইতিহাস আর এই গ্রন্থরচনার বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন।

গ্রন্থটি দুভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে 'স্বামী অভেদানন্দের জীবনস্মৃতি (১-৫৫), পরিশিষ্ট অংশে (৫৭-১৩৩) স্বামী অভেদানন্দের কয়েকটি পত্র সংকলিত হয়েছে। লেখক প্রথমে 'প্রিয় শিষ্য অভেদানন্দের সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি', তারপর শ্রীশ্রীসারদাদেবীর আশীর্বাণী আর স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি মন্তব্য সন্নিবেশ করেছেন। এরপর একটি অনুচ্ছেদে স্বামী অভেদানন্দের জন্ম থেকে শুরু করে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে (১০ নভেম্বর) 'পাশ্চাত্য দেশ থেকে বরাবরের জন্য ভারতে প্রত্যাবর্তন' পর্যন্ত মূল কয়েকটি ঘটনার পরিচয় দিয়েছেন। তারপর থেকে স্বামী অভেদানন্দের মহাসমাধি (৮. ৯. ১৯৩৯) পর্যন্ত ঘটনাবলীর বিবরণ এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

গ্রন্থের নামকরণে 'জীবনস্মৃতি' বলা হলেও এটি স্মৃতিচারণ নয়,—গ্রন্থটি মুখ্যত তথ্যমূলক। স্বামী অভেদানন্দের জীবনের শেষ আঠারো বছরের বিশিষ্ট কিছু কিছু ঘটনার বিবরণ এই গ্রন্থে আছে। লেখকের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব এই যে তিনি একান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সহজ সরল ভঙ্গিতে তাঁর শিক্ষাগুরুর জীবনের ঘটনাবলীর পরিচয় দিয়েছেন, অনর্থক উচ্ছ্বাস বা বাগাড়ম্বর করে নিজেকে জাহির করতে চাননি।

'পরিশিষ্ট' অংশে সংকলিত পত্রাবলী অতি মূল্যবান সংযোজন। সন্তানদের উদ্দেশ করে লেখা স্বামী অভেদানন্দের স্নেহপূর্ণ উপদেশ ভাব বা তত্ত্বের দিক দিয়েও গভীর।

সম্ভবত নামমাত্র দক্ষিণায় গ্রন্থটি ভক্তদের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্য থাকায় প্রকাশক গ্রন্থটির পারিপাট্য-বিধানে অতিশয় যত্নবান হননি। মুদ্রণাদি প্রশংসনীয়—গ্রন্থশেষে একটি শুদ্ধিপত্র আছে। স্বামী অভেদানন্দের একটি ধ্যানাসনে বসা ছবি ও একটি পত্রের লেখচিত্র উল্লেখযোগ্য।

—ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ—গোপীনাথ কবিরাজ। প্রাচী পাবলিকেশন্স, ৩।৪ হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০১। ১৩৮৯। পৃঃ ৮+২৯৬, মূল্য : পঁচিশ টাকা।

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের তিন প্রকার লীলার কথা কোন কোন বৈষ্ণব আগমগ্রন্থে বলা আছে—পারমার্থিক, প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক। এই তিন প্রকার লীলার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় গ্রন্থকার আমাদের জানিয়েছেন, পারমার্থিক লীলাটি হয় নিরন্তর অক্ষরব্রহ্মের অভ্যন্তরে, প্রাতিভাসিক লীলার ক্ষেত্র ভক্তের হৃদয়ে ও ব্যবহারিক লীলাটি হয় আমাদের এই ধরাধামে। তিনটি লীলার মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে এবং পার্থিব লীলাটি ঐতিহাসিক আলোচনার বিষয়। বর্তমান গ্রন্থে কোন কোন বৈষ্ণব সাধক সম্প্রদায়ের ভাব কখন কখন থাকলেও কোন বিশেষ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি লেখা হয়নি। সকল সম্প্রদায়ের দৃষ্টিকোণকেই সমান শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। গ্রন্থকার মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ভগবৎ-তত্ত্বের স্বরূপভূত হয়েও তার অতীত একটি দিক্, যা উপলব্ধি করতে না পারলে ভগবৎ-তত্ত্বের পূর্ণ আস্বাদন লাভ করা যায় না।

গ্রন্থের গোড়ার দিকে 'শক্তি-ধাম লীলা-ভাব' আলোচিত হয়েছে। 'লীলানুভূতির ক্রমবিকাশে প্রেম ভক্তি রস রূপে পরিণতি লাভ করে। প্রেম

ভক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি মহাভাব। যিনি মহাভাবরূপা তিনিই ভক্তকুলের চূড়ামণি। তিনিই হ্লাদিনী সারভূতা স্বয়ং শ্রীরাধা।' (পৃঃ ৯৭) ধামতত্ত্ব সম্পর্কে যা জ্ঞাতব্য তাও উল্লেখিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে লেখক তান্ত্রিক যন্ত্রবিজ্ঞান ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণরূপ ঠিক এক বস্তু নয়। তত্ত্বটি নিত্য, রূপটি অনাদি কাল থেকেই স্ব-স্বরূপে বিরাজ করছে। রূপটি তত্ত্বেরই বাহ্য প্রকাশ মাত্র।

গ্রন্থটিতে লেখকের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রকাশ রয়েছে, কিন্তু সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করে তা পরিবেশিত হয়নি। তা ছাড়া এখানে 'তত্ত্ব'-কথা ও 'গুহ্য' কথার প্রাচুর্যে, দর্শনের জটিলতায় ও তন্ত্রের কুটিলতায় ভক্তিরসের সহজ স্রোতটি যেন মাঝে মাঝে রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। উপসংহারে কিন্তু লেখক সব তত্ত্ব ও তথ্যের ঊর্ধে উঠতে পেরেছেন—

'স্থাবর ও জঙ্গম—সমগ্র জগৎ তাঁহার রূপ দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়। ইহা ছাড়া প্রেম অথবা প্রীতি—শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় অন্যত্র এতটা পরিদৃষ্ট হয় না। তিনি যেমন ভক্তের প্রেম গ্রহণ করেন তেমনি ভক্তকে প্রেম দানও করেন।'

এই প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণই আমাদের সকলের উপাস্য। যোগমায়া, জ্যোতির্লিঙ্গ, সুষুম্না নাড়ীর রহস্য কিংবা শ্রী, ভূ, কীর্তি, ইলা প্রভৃতি ষোলটি শক্তির স্বরূপ আমরা জানলাম কি জানলাম না তাতে কি খুব একটা এসে যায়? এই সব বিষয় সম্পর্কে প্রগাঢ় জ্ঞান হল অথচ প্রাণে যদি ভালবাসাই না থাকে তার চেয়ে দুঃখের কথা আর কি হতে পারে? আর সামান্য কিছু পেয়েই তো তিনি খুশি, অল্পতেই তিনি তুষ্ট; গীতার নবম অধ্যায়ে তাই তিনি বলেছেন:

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬

পাতাই দি, ফুলই দি, ফলই দি কিংবা জল, তাঁকে যা দেব তা যেন সভক্তি দিতে পারি, অন্তরের ভালবাসা মিশিয়ে দিতে পারি। তা হলেই জনার্দন তা সানন্দে গ্রহণ করবেন। কারণ তিনি ভাবগ্রাহী। দার্শনিক গোপীনাথ কবিরাজ স্বয়ং বড় সাধক; তাঁর কঠিন বই থেকে আমরা এই সহজ সত্য যেন গ্রহণ করতে পারি।

—ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রাপ্তি-

হিন্দুর দুর্গতির মূলে দুর্মতি হিন্দুর, পৃঃ ৭৮, মূল্য: ২'৫০

জাতিস্মরের কাহিনী, পৃঃ ৯৮, মূল্য: ৩'০০

Death—Not an end of life, pp. 92, Price : Rs. 2'50

লেখক ও প্রকাশক: শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য বি. এ., ৩০ই, দ্বারিক জঙ্গল রোড, পোঃ ভদ্রকালী, জেলা: হুগলী।

আত্মকথা: স্বামী তপানন্দ, প্রকাশক: শ্রীরামকৃষ্ণ তারক মঠ, কেতিকা, পুরুলিয়া, পৃঃ ৩৯৬, মূল্য: ২৫'০০

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর স্মৃতিপূজা, লেখক ও প্রকাশক: শ্রীহরিচরণ শীল, ৯ হরঘোষ লেন, কলিকাতা-৫, পৃঃ ১০৭, মূল্য: ৫'০০

অনন্য কেশবচন্দ্র: সম্পাদনা: শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষাল, প্রকাশক: গ্রন্থসম্পুট, ৪৪/১সি, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯, পৃঃ ৯৬, মূল্য: ১২'০০ (শ্রীরামকৃষ্ণ-বিশুদ্ধানন্দ আশ্রম ও সেবাকেন্দ্রের সাহায্যার্থে)

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

বৌদ্ধ ধর্মগুরু দালাই লামা গত ২১ নভেম্বর বেলুড় মঠ পরিদর্শন ও ব্রহ্মচারী শিক্ষণ কেন্দ্রে ভাষণ প্রদান করেন।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা-শতবার্ষিকী-উৎসব

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রগুলিতে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা-শতবার্ষিকী-উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়েছে: মাদ্রাজ স্টুডেন্টস্ হোম, সেবা প্রতিষ্ঠান, টাকি, তমলুক, কাঞ্চিপুরম্ ও রায়পুর। দ্বিতীয় পর্যায়ে এ উৎসব পালিত হয়েছে বরিশাল, সালেম ও পুনা কেন্দ্রে।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ: মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামের ৩নং ব্লকে ও ভগবানপুরের ১নং ব্লকে বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে চণ্ডিপুর কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩,৪০০টি ধুতি, ২২০০টি শাড়ি, ২৫০০টি সুতি চাদর, ৪২৫টি ফতুয়া, ৬২৮ জন শিশুর জামা-কাপড়, ১২৮১টি পুরানো পোষাক, ৬০টি উলের কম্বল, ৫০০টি বিছানার চাদর এবং ৪৫০টি লণ্ঠন বিতরণ করা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যেও কাপড় ও কম্বল বিতরণের ব্যবস্থা সারগাছি কেন্দ্রের মাধ্যমে করা হয়েছে।

উড়িষ্যার উপদ্রুত অঞ্চলে ত্রাণ: উড়িষ্যার কটক জেলার জয়পুর মহকুমার আরি গ্রামের ২২০টি ক্ষতিগ্রস্ত হরিজন পরিবারকে ভুবনেশ্বর কেন্দ্রের মাধ্যমে ২২০টি উলের কম্বল, ২২০টি মাদুর ও ২২০ সেট গৃহস্থালীর সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়েছে।

শ্রীলঙ্কা শরণার্থিত্রাণ: মাদ্রাজের ত্যাগরাজনগর কেন্দ্র শ্রীলঙ্কা থেকে আসা মন্দাপম্ ও তিরুচি শিবিরের শরণার্থীদের মধ্যে ত্রাণকার্য চালিয়ে যাচ্ছে।

বেলুড় মঠের নিকটস্থ সাপুইপাড়া গ্রাম ও তার সন্নিহিত নিচু অঞ্চলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের "নিজের ঘর নিজেই তৈরি কর" কর্মসূচীর মাধ্যমে গৃহনির্মাণ সমীক্ষার কাজ আরম্ভ করা হয়েছে।

রজতজয়ন্তী উৎসব

গত ২ অক্টোবর ত্রিচুর কেন্দ্রের রজতজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। চারদিন ব্যাপী এই উৎসবের উদ্বোধন করেন কেরালার রাজ্যপাল শ্রী পি. রামচন্দ্রন্। যুবসমাবেশ, শিক্ষামূলক আলোচনা, রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের উপর প্রদর্শনী প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের অঙ্গ। ৫ অক্টোবর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কেরালার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কে. করুণাকরণ।

উদ্বোধন

গত ১০ নভেম্বর রায়পুর কেন্দ্রের অন্তর্গত নারায়ণপুরস্থ বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের সাধুনিবাসের এবং ১৪ নভেম্বর উপাসনা গৃহের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী।

শিক্ষামূলক আলোচনা চক্র

মহীশূর কেন্দ্রের অন্যতম বিভাগ 'রামকৃষ্ণ ইন্‌স্টিট্যুট অব মর‍্যাল্ অ্যাণ্ড স্পিরিচুয়্যাল্ এডুকেশন' গত ২৬ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত 'ভ্যালিউ-ওরিয়েন্টেড্ এডুকেশন'-এর উপর এক জাতীয় আলোচনাচক্রের আয়োজন